ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৭—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্বক ২০শে জ্যৈষ্ঠের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১২৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

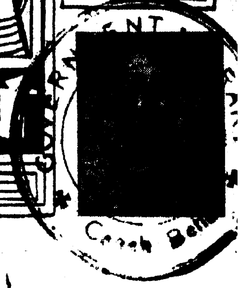
কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ



শিল্পী : শ্রীপরিমলকান্তি দত্তরায়   নাগা রমণী   ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্





পৌষ—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা*

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—বিশেষ করিয়া আণবিক বিজ্ঞানের যুগ। যুগোপযোগী হইয়া জীবনযাপন করিতে হইলে বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অধুনা বিজ্ঞানের প্রসার এত দ্রুতগতিতে চলিয়াছে যে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের প্রধান কারণ হইল বহুদেশ জাতীয় গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিপোষণায় বহুমুখী গবেষণা নিরন্তর চলিয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পোন্নতির যুগে শিল্পপতিরা শিল্পোন্নয়নে নব নব পন্থা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। যুদ্ধাস্ত্র ও রণযন্ত্রের নব নব আয়ুধ উদ্ভাবনে বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয়েরা অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন—বিশেষ করিয়া আণবিক শক্তি আহরণ ও প্রয়োগে এবং কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনে প্রত্যেক জাতিই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছে এবং যে জাতি বিজ্ঞানে যত উন্নত, তাহাদের অর্থনৈতিক মান তত উর্দ্ধে ও ভূমণ্ডলে তাহারাই তত প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী। শিল্প-বিজ্ঞান অর্থ ও সামরিক সাজসরঞ্জামে উন্নত আমেরিকান জাতিকে কেহ তোষামোদ, কেহ শ্রদ্ধা, কেহ ভয়, কেহবা হিংসা করেন, কারণ প্রত্যেক স্তরের স্তাবকেরা জানেন, আমেরিকানরা বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কবি হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতের' অসভ্য জাপান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া এশিয়াবাসীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

নববিজ্ঞান শিক্ষার যে প্রয়োজন তাহা আজ আমরা নূতন করিয়া উপলব্ধি করি নাই। আজ হইতে প্রায় দেড়-শতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের একান্ত উদ্যোগে বিজ্ঞানের নব নব শাখার সহিত পরিচিত হইবার

সুযোগ হইয়াছিল। সেই সঙ্গে এও উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত দেশের মাতৃভাষা—বাংলাভাষা।

সেই যুগে উচ্চশিক্ষার মান ও মাধ্যম ছিল শাসক সম্প্রদায়ের ভাষা—ইংরাজিভাষা। জ্ঞান যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিতে হয় তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কেন না বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে যে পরিশ্রম ও প্রয়াস নষ্ট হয় তাহার কিয়দংশ যদি জ্ঞানান্বেষণে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে বহু বিষয়ে বহু জ্ঞানাহরণ সম্ভব। তাই বোধ হয় শ্রীরামপুরের শিক্ষাব্রতী-মিশনারী সম্প্রদায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্য তৎকালীন প্রচলিত কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কার্য্যের সূচনা করেন। দীর্ঘ বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় রসশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র, চতুষষ্ঠী কলার বিশদ বিবরণের বিষয়ে জাতির বিস্মরণ হইয়াছিল। বৈদেশিক বিজ্ঞানের ও ভাষার মোহ জাতিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাধনা ও চর্চ্চার পুরাবৃত্ত অনুধাবন করিতে মাত্র দেড় শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পূর্ব্ব পর্যন্ত যাইলেই পর্য্যাপ্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দশবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফাগু'সন্ সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত 'জ্যোতিষ' নামক এক বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ করেন ইয়েনস্ সাহেব। এই পুস্তকটি পালিত ভ্রাতৃবৃন্দ ও ব্রজমোহন মজুমদার কর্তৃক অনূদিত হয়। জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্রের এবং পদার্থবিদ্যার অংশ। পরন্তু জ্যোতিষ অতি প্রাচীন শাস্ত্র, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী—পঞ্জিকার বিজ্ঞানাংশ—ফলিত জ্যোতিষ ছাড়া কিছু নয়, তাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক "জ্যোতিষ" প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারীগণ কর্তৃক "জ্যোতিষ" নামক আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইয়েট্সের পুস্তকে পৃথিবীর গতি, আকৃতি, আয়তন, সূর্য্য-গ্রহণ, মাধ্যাকর্ষণ, আলো, পৃথিবীর দৈর্ঘ্য, গ্রহ, জোয়ার ভাঁটা, নক্ষত্র, গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট আছে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্স্ সাহেব "পদার্থবিদ্যা" নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মার্টিনেট সাহেবের "Catechism of Nature", উইলিয়ম্ সাহেবের "Preceptor's Assistant" এবং বেলী সাহেবের "Useful Knowledge" প্রভৃতি পুস্তক সংকলন করিয়া ইয়েট্স্ সাহেব "পদার্থ বিদ্যাসার" রচনা করেন। ইহাতে তিনি বস্তুর গুণ, আকাশ, জ্যোতিষ্ক, বায়ু, বাত্যা, বাষ্প, বৃষ্টি, মানুষ, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট, কৃমি, উদ্ভিদ, পুষ্প, তৃণ, শস্য, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই শ্রীরামপুর হইতে Mack (ম্যাক্) সাহেব Chemistryর অনুবাদ করিয়া "কিমিয় বিদ্যাসার" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহাতে রাসায়নিক শক্তি, উদ্ভূত তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য, অক্সজন (Oxyzen), কুলহরিণ, (Chlorine) বরমীণ (Bromine), আদ্র'জন (Hydrogen), নেত্রজন, (Nitrogen), গন্ধক (Sulphur) ফাস্ফরস্, (Phosphorus) কারবণ (Carbon), বোরণ (Boron), শিলীকণা (Silicon) বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাই বাংলা ভাষার রসশাস্ত্রের প্রথম ও আদি পুস্তক। এই পুস্তকের উপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটী প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক প্রণয়নের প্রস্তাব হয়। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ফেলিক্স কেরী (Felix Carey) ৬৩৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী "বৈদ্যহাড়াবলী" (Anatomy নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রামকমল সেন মহাশয় চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারে ব্রতী হইয়া "ঔষধসার সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে তিনি ৫৬ প্রকার ঔষধের নাম, প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবহার প্রণালী ও উপযুক্ত অনুপান সম্বলিত করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "রোগান্তকসার" নামক একটী পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ সময় "নিদান আত্মপ্রকাশ" নামক পুস্তক মুদ্রিত হয়। ডাক্তার ব্রেটন সংস্কৃত, পারসী ও বাংলায় ডাক্তারী পরিভাষা প্রকাশ করেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার এইচ উইলিসমের সভাপতিত্বে "ইউরোপিয়ান্ বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি" নামক একটি সমিতি সংস্থাপিত হয়। প্রোফেসার উইলসন, জে সাদারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য সকলে প্রয়োজনীয় জ্ঞানভাণ্ডার

বাংলাভাষায় আহরণ করিবার মানসে "বিজ্ঞান সেবধি" নামক পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়। ইহাতে উদস্থিতিগণিত (hydrostatics), যন্ত্রবিজ্ঞান (mechanics), ভারতবর্ষীয় ভূগোল, আলো, বিজ্ঞানের উপকারিতা, জ্যোতিষ প্রভৃতি তথ্যের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশের পর ইহার মুদ্রণ বন্ধ হয়। ঐ গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সরকারের ও কতকগুলি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহায়তা ছিল মাত্র, কিন্তু জনসাধারণের ইহাতে বিন্দুমাত্র সাড়া ছিল না—তাই এ প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত ফলবতী হয় নাই।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে useful Knowledge societyর introduction to mechanics ইউরোপীয় বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি কর্ত্তৃক অনূদিত পদার্থবিদ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বস্তুর গুণ, মাধ্যাকর্ষণ, গতি ও গতির প্রকার ভেদ, ঘাত-প্রতিঘাত, স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি তথ্যের আলোচনা আছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালীকৃষ্ণ introduction to art and science নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি পদার্থ বিদ্যা, আবহাওয়া তত্ত্ব, জোয়ার ভাটা, জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ দেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে খড়দার বিশ্বাসবংশসূর্য্য প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রত্নাবলী বা medical manual নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহারই অজস্র ব্যয়ে ও অধ্যবসায়ে নবদ্বীপের তান্ত্রিক শিরোমণি সাধক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত "প্রাণতোষণী তন্ত্র"—প্রাচীন ও বর্ত্তমানে প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থের সারসংগ্রহ গ্রন্থ। এই ১৮৩৩ সালেই ডাক্তার র‍্যাম্‌সে "রোগান্তসার" নামক materia medica প্রণয়ন করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় "পদার্থ বিদ্যা" শীর্ষক বায়ু, সূর্য্য, বাত্যা, বৃষ্টি, পৃথিবী, সমুদ্র, মনুষ্য, দেহ, শক্তি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেণ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। এই সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় "বঙ্গ সাহিত্য সমিতি" নামক আর একটি সমিতি সংস্থাপিত হয়। এই সমিতির সাধু উদ্দেশ্য ছিল—বাংলার ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের বাণী প্রচার করা, কিন্তু সে আশা তাঁদের ফলবতী হয় নাই, বাঙ্গালী অত্যন্ত শ্রমবিমুখ জাতি। পরিশ্রম করিয়া কোন কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞানানুলিপ্সা নাই। ডিটেক্‌টিভ গল্প ও উপন্যাস তাদের প্রিয়। বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে তাহারা পরাঙমুখ। ঐ সমিতি পর পর সতেরখানি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন মিত্র রচিত "কৌতুক তরঙ্গিনী" প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ ও একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবেশিত আছে। ইহা ছাড়া ১৫টি বিভিন্ন সমসাময়িক পরীক্ষাও লিপিবদ্ধ আছে।

যে মহাপুরুষ বিজ্ঞানের ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে তৎকালীন ঈশ্বরগুপ্তের চিত্তবিমোহিনী কবিতা যুগের দুঃস্থভাষার পিচ্ছিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, যাঁহার ভাষার ওজস্বিতাময়ী গাম্ভীর্যশালিনী ও জ্ঞানগভীর মনোহারিতা গুণে পরবর্ত্তীযুগে আদর্শ ভাষারূপে পরিগণিত, যাঁহার রচনার অনায়াসলভ্য মাধুর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা জনসাধারণকে অপরিসীম প্রীতি প্রদান করিত, সেই বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের অগ্রদূত শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আবির্ভূত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার চারুপাঠ প্রথম ভাগ প্রণয়ন করেন। অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞান-তৃষ্ণার প্রতীক—অপরের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার মানসে এই পুস্তক প্রকাশ করেন। চারুপাঠ সম্বন্ধে তাঁহার পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ গম্ভীর মনোহারিতা, বিষয় বৈচিত্র্য এবং চিত্ত বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারুপাঠ যুগযুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক-কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কতদূর যে মনোরম হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ…।" চারুপাঠ প্রথম ভাগের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'চারুপাঠ' বাংলা ভাষার শুধু খাঁটি বিজ্ঞানের পুস্তক নহে। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ইহা লিখিত আছে :—

"এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত

প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্য ও চিত্ত-রঞ্জনার্থে প্রয়োজনানুসারে অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশ করা গিয়াছে।" চারুপাঠ প্রথম ভাগে আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার, পুরুভুজ, পৃথিবীর পরিমাণ, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, উষ্ণ প্রস্রবণ, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমানুষ, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান, জলস্তম্ভ, পরমাণু এবং চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগে প্রবাল, বেলুন, দিগ্দর্শন যন্ত্র, চন্দ্র, সৌরজগৎ, তাপমান, ধূমকেতু ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে। ইহার প্রকাশ-কালও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত বলেন:—"১৭৭৪ শকে চারুপাঠ প্রথম ভাগ, ৭৬ শকে দ্বিতীয় ভাগ এবং ৮১শকে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। "ধর্ম্মনীতি" ও"পদার্থবিদ্যা"যথাক্রমে ৭৭ এবং ৭৮শকে প্রকাশিত হইয়াছিল।" রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার "প্রতিভা পরিচয়ে" অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, "তাঁহার রচনা প্রণালীর গুণে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়—এরূপ পরিস্কৃত ও সুবোধ্য হইয়াছে যে বিজ্ঞান শিক্ষার্থিগণ আমোদ-সহকারে উহা পাঠ করিতেছেন। অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠকগণ এরূপ আমোদ লাভ করিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমার সরল ও কবিত্বের সরস ভাষায় "পদার্থবিদ্যা" লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, মাতৃভাষায় সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার করিয়াও সেইরূপ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ অনু-সন্ধান ও গভীর আলোচনায় তাঁহার গ্রন্থসমূহ নানা বিষয়ে জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে।"

অক্ষয়কুমারের পর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে প্রবৃত্ত হন। ১২৮০ সালে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম" নামক পুস্তক রচনা করেন ও পরিশিষ্টে কতকগুলি ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার বাংলা প্রতি-শব্দ সংযোজন করেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় 'বিজ্ঞান-প্রাণ' রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, "এই গ্রন্থে তড়িৎ বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে বোধহয় কেহ কোন কথা লেখেন নাই, অদ্যাপি সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছে বোধহয় না।"...

অক্ষয়কুমারের পর যাঁহারা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মোট ১২৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ১০ খানি পুস্তক বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "প্রকৃতির ভূগোল" নামক বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় 'সারস্বত সমাজের' প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা ভৌগোলিক পরিভাষা নিরূপণে প্রথম প্রয়াস পান।

অক্ষয়কুমার বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় যে সকল বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ সম্বলিত পুস্তক লিখিয়াছিলেন তাহা বিক্ষিপ্ত—তাহা কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া নহে। ভূদেববাবুর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বিশিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিত। ইহা বিস্ময়-উদ্রেকিনী চিন্তা উদ্বোধিনী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নহে। ইঁহার রচিত "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" ও "যন্ত্র বিজ্ঞান" পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের গোড়ার কথার কিছু পরিচয় দিয়া তৎপরে Mechanics —Statics and Dynamicsএর ক্রমানুক্রমিক সরল বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। "যন্ত্র বিজ্ঞানে" তিনি বিভিন্ন সরল যন্ত্র যেমন—

১। সরল দণ্ড যন্ত্র (Lever) ২। বক্র দণ্ড যন্ত্র ৩। অক্ষচক্র যন্ত্র (Wheel and Axle) ৪। বদ্ধ কপি যন্ত্র (Pulty) ৫। অবদ্ধ কপি যন্ত্র ৬। ক্রমোনিম্ন-ধরাতল যন্ত্র (Inclined Plan) ৭। ছেনি যন্ত্র (Wedge) ৮। স্ক্রু যন্ত্র (Screw) তারপর দন্তরচক্র, মুকুট দন্তর, পার্শ্ব দন্তর, সরল দন্তর, ধারক দন্তর (Toolted wheel) এবং Theory of Machineএর কথা এবং পরিশেষে বাষ্পীয় যন্ত্র বা Steam Engineএর কথা বলিয়া শেষ করিয়াছেন। ইহাতে নানা চিত্র সম্বলিত আছে।

তাঁহার রচিত প্রাণীতত্ত্ব, আলোক তত্ত্ব, উত্তাপ তত্ত্ব প্রভৃতির পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে "ভূদেব চরিত" হইতে বৈজ্ঞানিক ভূদেব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"...হুগলী নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া (২২।৬।১৮৫৬) ভূদেববাবু আপন স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায়ের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ওই সময় গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক ছিল না। তাঁহাকে প্রাণীতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, উত্তাপতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য অংশগুলি মুখে মুখেই শিখাইতে হইল। ছাত্ররা তাহা খাতায় লিখিয়া লইত। পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য ঐ সকল বিষয়ের কতক কতক কথা তিনি ঐ সময় নিজের খাতায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যন্ত্র বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব (জ্যামিতি) মাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; অপরগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মুখবন্ধ এবং প্রথম অধ্যায় এরূপ সরলভাবে লিখিত যে বালক-বালিকারাও অতি সহজে বাহ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিতে পারে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে গতির নিয়ম ও যন্ত্র বিজ্ঞানের কথা থাকায় সাধারণ পাঠক অনেকে ভয়প্রযুক্ত ঐ প্রথমাংশ পাঠ না করিয়া বড়ই বঞ্চিত হইয়া থাকেন।"

"প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের" প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে ভূদেব-বাবু ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা বলিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়া লেখেন, "ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কি পর্য্যন্ত উন্নতি করিয়াছেন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাদিগের নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্র, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি অতীব চমৎকারজনক ব্যাপার, সমস্ততেই তাঁহাদিগের অপূর্ব ক্ষমতা দেদীপ্যমান প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে।

তৎকালীন সংবাদপত্রে কিভাবে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও বিজ্ঞানের প্রসার হইত তাহার আলোচ্য অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে—প্রথম বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের সহিত বিজ্ঞানেরও আলোচনা হইত। ইহার নাম "দিগ্‌দর্শন"। ইহা শুধু বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা নয়, ইহা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাধনার প্রথম বাহন। ইহার পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্র মিত্রের সম্পাদকতায় "জ্ঞানোদয়" নামক বহু হিতৈষিণী, তত্ত্বগর্ভ ও বিজ্ঞানের পত্রিকা প্রকাশ হয়। (২০) কুড়িটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সেনের সম্পাদনায়—"বিজ্ঞান সেবধি" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যাসারসংগ্রহে" বিজ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ স্থান হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের উৎসাহে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় "বিদ্যাদর্শন" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা ছয় মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে "তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালার" পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক, অক্ষয়কুমার দত্ত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রবন্ধ সম্ভারে, রচনা বৈচিত্র্যে ইহা তৎ-কালীন বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ শতে দাঁড়ায়। সমানভাবে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা স্বীয় মর্য্যাদা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহার বার্ষিক-মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। তত্ত্ববোধিনী সম্বন্ধে রজনীকান্ত বলিয়াছেন—

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল; সংখ্যাতেই অক্ষয়কুমারের তেজস্বিনী ভাষার সহিত তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া পাঠক-গণ অপরিসীম প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতা ও সমান লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগি-লেন। তিনি যখন ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে অসামান্য জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখন পদার্থ বিদ্যার বিষয় রচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দূরদর্শী ও সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইত।......তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তি-বিন্যাস চাতুরী ও সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে।"

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক একটি মাসিক পত্রিকা ইতিহাস, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে সম্ভাবিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।* ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্যোৎসাহিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "প্রভাকর" পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তারপর আসিলেন এক প্রতিভাশালী মহাপুরুষ—যিনি ভাষার ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের প্রতীক অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির সংস্কৃত-বহুল ভাষার গতির সহিত প্যারীচাঁদের নিত্য-ব্যবহার্য্য কথিত আলালী ভাষার গতির সমন্বয় করিয়া ভাষার সুধাংশু উদ্ধার করেন, যাঁহার ভাষা আজিও আদর্শ লিখিত ভাষারূপে পরিগণিত তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের বিজ্ঞান রহস্যের† প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন কোন উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত আছি। তাঁহার "চন্দ্রলোক", "গগন পর্য্যটন" প্রভৃতি বিজ্ঞান রহস্য প্রবন্ধগুলি অতীব উপাদেয়। ঢাকার সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষও কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিশীথ-চিন্তার অন্তর্গত "তারা আর ফুল" একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা।

এ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের সাধনা নির্দ্দিষ্ট মার্গে পরিচালিত হয় নাই। বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পরিভাষা প্রচলিত হয় নাই। সকলেই পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া Text Book Committee দ্বারা অনুমোদন করিয়া অর্থকরী আয়ে মনোযোগী ছিলেন। তখন বিজ্ঞান সাধনা ছিল ব্যবসা হিসাবে, সিদ্ধিলাভের জন্য নহে। পরিভাষা সকলন করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চার সূত্রপাত করেন প্রথম—রামেন্দ্রসুন্দর। কিন্তু ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেবের পরিপোষকতায় যখন Bengal Academy of Literature তাহার বিজাতীয় ভূষা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম গ্রহণ করিল সেই সময় হইতে রজনীকান্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ন। ইনিই 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ও শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত তদানীন্তন সভাপতি। রজনীকান্তের প্রস্তাবে 'পরিভাষা সমিতি' ও 'ব্যাকরণ সমিতি' স্থাপিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ এ পর্য্যন্ত যে সকল গঠনমূলক প্রধান প্রধান কার্য্য করিয়াছেন রজনীকান্তই তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রজনীকান্ত একটি ক্ষুদ্র 'পদার্থ বিদ্যাপ্রবেশ' নামক পুস্তকও রচনা করেন।

তারপর আসিলেন বিজ্ঞানের প্রিয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার ১৩০১ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বৈজ্ঞানিক' পরিভাষা, ১৩০৬ সনের দ্বিতীয় সংখ্যায় রাসায়নিক পরিভাষা, ১৩০৬ সনের চতুর্থ সংখ্যায় 'বৈদ্য পরিভাষা' রচনা করেন। ১৩০৫ সনের চতুর্থ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তিনি 'কিমীয় বিদ্যাসার' অর্থাৎ কেমিষ্ট্রী সংক্রান্ত পুস্তকের বিষয় আলোচনা করেন। ইনি স্বয়ং 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র জগৎ' 'জিজ্ঞাসা', 'শব্দকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন। 'প্রকৃতি'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ করেন—

---

* বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'প্রসিদ্ধ ইংরাজি কবি উইলিয়ম্ শেক্সপিয়রের নাটক হইতে সঙ্গহীন গল্পের' বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে:—

'নিম্নোলিখিত পুস্তক সকল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস—প্রাণি-বিদ্যা-শিল্প সাহিত্যাদি—দ্যোতক মাসিক পত্র, নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত।

বার্ষিক মূল্য—২ টাকা

প্রতি সংখ্যার মূল্য—।॰ আনা

প্রথম পর্ব্বের মূল্য—১॥॰ টাকা

২। সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয়করণার্থে লালবাজারস্থ মেং ডি রোজারিও কোং তথা জোড়াসাঁকো তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ব করিয়া পুস্তকপ্রাপ্তি হইবে।

* সমাজের বিচার্য্য পত্রাদি সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হজ্‌সন্ প্রট সাহেবের নামে ডি রোজারিও কোম্পানির নিকট প্রেরিতব্য।

† বিজ্ঞান রহস্যের প্রবন্ধগুলি—

১। আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত, ২। আকাশে কত তারা আছে ৩। ধূলা ৪। গগন পর্য্যটন ৫। চঞ্চল জগৎ ৬। কতকাল মনুষ্য ৭। বৈজ্ঞানিক ৮।। পরিমাণ রহস্য ৯। চন্দ্রলোক।

মানবজাতির সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গতি ঊর্দ্ধ-মুখ; এই শাস্ত্র বসিয়া নাই, কেবল ঊর্দ্ধে উঠিতেছে।' ইহাতে 'সৌরজগতের উৎপত্তি', 'আকাশতরঙ্গ', 'পৃথিবীর বয়স' 'জ্ঞানের সীমানা', 'প্রাকৃত সৃষ্টি', 'প্রকৃতির মূর্ত্তি', 'ক্লিফোর্ডের কীট', 'প্রাচীন জ্যোতিষ', 'মৃত্যু', 'আলোক তত্ত্ব', 'পরমাণু-প্রলয়' প্রভৃতি কতগুলি উপাদেয় চিন্তা-উদ্রেকী প্রবন্ধ সম্বলিত আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা'র দার্শনিক প্রবন্ধগুলি বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। তিনি ধর্ম্মের নানা জটিল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বর্ত্তমান বাতাবরণে সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশ হইতে যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'রসায়ন' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারের অভিপ্রায়ে বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ম্যাক্‌মিলন কোম্পানীর উদ্যোগে বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লেখকদের রচিত ও বহুল প্রচলিত পুস্তকের বাংলা অনুবাদের প্রকাশ সুরু হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হাক্সলীর (Huxley) 'বিজ্ঞান-প্রবেশ' রামেন্দ্রসুন্দর ও অধ্যাপক 'গীকি'র 'প্রাকৃত ভূগোল' যোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসে। ব্যবসাসূত্রে বিদ্যালয়ে পাঠ্য করার অভিপ্রায়ে ম্যাকমিলন কোম্পানী ভ্রমবহুল পুস্তকগুলির অনুবাদ করেন।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার চুণীলাল বসু ও রায়সাহেব জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান গ্রন্থের রচয়িতারা মূল বিজ্ঞান পুস্তকের রচনা করেন। আশ্চর্য্য জগদীশচন্দ্রের 'অব্যক্ত' কতকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি। এগুলির রচনাশৈলী এত মনোরম যে এগুলি একাধারে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও রসোত্তীর্ণ ভাষায় কাব্য সম্ভারের মত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'নব্য রসায়ন বিদ্যা', 'দেশী রং', 'সরল প্রাণীবিজ্ঞান' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার History of Hindu Chemistry ও ইহার আত্মজীবনী ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ। রায়বাহাদুর চুণীলাল বসুর 'খাদ্য' ও 'বায়ু' বহুলপ্রচারিত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।

রায়সাহেব জগদানন্দ রায় পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন শাখার স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'তাপ' (Heat), আলো (Light), শব্দ (Sound), তড়িৎ চুম্বক (Electricity and Magnetism)। জ্যোতিষ সংক্রান্ত 'গ্রহনক্ষত্র', 'নক্ষত্র পরিচয়' তাঁহার অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীববিদ্যা সংক্রান্ত 'পোকামাকড়', 'মাছ ব্যাং সাপ', 'পাখী', 'বাংলার পাখী' বহু প্রশংসিত।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র অমৃতলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞান'ই সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা। ১৩১৯ সনে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে'র চট্টগ্রাম অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্দীপনায় একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতায় ১৩২০ সনে সপ্তম অধিবেশনে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার প্রবর্ত্তন ও বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য সকলে একমত হইয়া রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম প্রস্তাব করেন।

তারপর ১৩৩১ সালে ডাক্তার সত্যচরণ লাহার সম্পাদনায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'শুভমস্তু' শীর্ষে লইয়া স্বল্পায়ু 'প্রকৃতির' জন্ম হয়। ইহাই তখন বাংলাভাষায় একমাত্র সচিত্র দ্বৈমাসিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, ইহার বার্ষিক মূল্য চারিটাকা ছিল। গভীর পরিতাপের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে বাংলার ধনী সন্তান ও সরস্বতীর বরপুত্র কখন চারিমাস কখন ছয়মাস অন্তর এই পত্রিকা প্রায় দশ বৎসর চালাইবার পর অসমর্থ হইলেন।

তখনই মনে হয় আমেরিকার ম্যাক্‌গ্রো হিল্ কোম্পানী (Mcgrow Hill co) কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত অজস্র চিত্র সম্বলিত কত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ ও পরিচালনা করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ Electrical world, Engineering news record, Engineering and mining Journal, Chemical and Metallurgical Engineering, coalage, Electric Railway Journal, American Machinist, Ingeneria, International Merchandising, Journal of Electricity And Western Industry, Industrial Year 'প্রভৃতি।

ইংলণ্ডের Morgan Brothers (Publishers) Ltd. শতবৎসরেরও অধিক কাল—The Inginer, The Ironmonger, The Chemists Drugyist পত্রিকা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন ও প্রায় তিন হাজার পাতারও অধিক একটি ইঞ্জিনিয়ারিং The Engineer's Year Book. বর্ষপঞ্জী প্রায় ছয়টি বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় জ্ঞানপিপাসা ইহাদের কত তীব্র ? জ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টাই বা কত বিশাল! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অধ্যাপকগণের পরিপোষকতায় 'জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকাটি বর্ত্তমানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সজীব পত্রিকা। তবে এর জ্ঞান পরিবেশনের পরিধি অতি অল্প।

অধুনা দেখা যায় প্রতি উচ্চশ্রেণীর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি না একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। পরিভাষা রচনায় যে সকল সুধী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাতৃভাষার কোষাগার সমৃদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উমাপতি বাজপেয়ী রসবিজ্ঞান পরিভাষায়, মণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসায়নিক পরিভাষায়, অরুণ কুমার সেনশর্ম্মা রসবিদ্যার পরিভাষায়, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রাণীবিজ্ঞান পরিভাষায় ও জীববিদ্যার পরিভাষায়, জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় পতঙ্গতত্ত্বের পরিভাষায়, ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষায়, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় ভৌগোলিক পরিভাষা, অরুণ কুমার সেনশর্ম্মা পদার্থবিদ্যার ও ডাক্তার বনওয়ারি-লাল চৌধুরী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিভাষা সমিতি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করিয়াছেন। বাংলা সরকার ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদজ্জনের সহায়তায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উদ্দীপনায় পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণে ইংরাজি শব্দের বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রিক শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগে যাহার প্রয়োজন—বাংলা পরিভাষা রচনা ও সংকলন করিয়াছেন। সরকারী পরিভাষার রচনাশৈলী সংস্কৃত বহুলতায় সাধারণের আয়ত্তাধীন ও ব্যবহার্য্য হইয়া জন সাধারণের সমাদর লাভে সমর্থ হয় নাই।

রাজশেখর বসু মহাশয়, তাঁর অভিধান—'চলন্তিকার পরিশিষ্টে একটি পারিভাষিক শব্দের অমূল্য সংযোজন করিয়াছেন। ইহা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। যেমন পাটীগণিত (Arithmetic), বীজগণিত (Algebra), জ্যামিতি (Geometry), কনিক (Conics), ত্রিকোণ-মিতি (Trigonometry) বলবিদ্যা (Mechanics) পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chenistry), জ্যোতিষ (Astronomy), ভূগোল (Geography) জীববিদ্যা (Biology), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণি-বিদ্যা (Zoology), শরীরবৃত্ত (Physiology), স্বাস্থ্য-বিদ্যা (Hygiene), অর্থবিদ্যা (Economics), মনো-বিদ্যা (Psychology), দর্শন (Philosopohy) ও বিবিধ (Miscellaneous) এই পরিভাষা সঙ্কলন হইতে বঙ্গভাষার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টাই প্রতীয়মান হয়।

এখন বিজ্ঞানের বহু বিভাগ হইয়াছে, বহু উপবিভাগ হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগে বহু প্রশাখাযুক্ত প্রতি-ভাগও হইয়াছে। বিজ্ঞানে জ্ঞানের প্রসার এত দ্রুতগতিতে চলিয়াছে যে কঠিন পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় ব্যতিরেকে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের সম্যক পরি-চয় করানো একেবারে অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগ বিশেষজ্ঞতার যুগ। তাই ফলিত বিজ্ঞানের প্রগতি অতি দ্রুত—বিশেষ করিয়া এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। বাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং পরি-ভাষা রচনায় ভাষাবিদদের অক্ষমতা অনস্বীকার্য্য, হিন্দীতে এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রবীণকালে আধুনিক বিজ্ঞানের ও সৃষ্টিতত্ত্বের সারতথ্য সম্বলিত 'বিশ্বপরিচয়' শুধু চিন্তা-উদ্রেকিনী জ্ঞানগর্ভ রচনা নয়, ইহা বিজ্ঞান সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জটিলতত্ত্বের সহজ বর্ণনায় কবি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বৈজ্ঞা-নিক পরিভাষা রচনায় রবীন্দ্রনাথের অমরদান অবিস্মরণীয়। বিচার ও বিজ্ঞানের কবি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় বিজ্ঞানের মূল সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা।
জানিগো জানি তাও হয়নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে,
ঝরিল ধরণীতে

যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানি গো জানি তাও হয়নি হারা ॥

এটীর মূলতত্ব হ'ল (Conservation of Matter & Energy) বস্তু ও শক্তির নিত্যতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় শিক্ষার বাহন বাংলা হওয়ায় এবং বর্ত্তমানে 'বিজ্ঞান' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হওয়ায় বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বাংলায় বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী আছেন। তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া প্রায় অসম্ভব, কেননা এঁদের উদ্ভব বর্ষাশেষে ভেকছত্রের মত। তবে কয়েকটী প্রাচীন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রচয়িতার নাম প্রবন্ধ শেষে সংযোজন করিলাম।

প্রাচীনকালে ফলিত বিজ্ঞান অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার একটি শাখাই ছিল—সেটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। তাহা বর্ত্তমানে এত বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে যে সেইগুলির বর্ত্তমানে আরও বিভাগের প্রয়োজন। যেমন যন্ত্র ইঞ্জিনিয়ারিং (Mechanical Engineering), বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনিয়ারিং (Electrical Engineering), জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং (Public Health Engineering), দূরভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং (Tele Communication Engineering) নৌ-ইঞ্জিনিয়ারিং (Naval Engineering) স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা (Architecture and Town Planning)

ধাতু ইঞ্জিনিয়ারিং (Metallurgy)
সেচ ইঞ্জিনিয়ারিং (Irrigation)
রাস্তা-ইঞ্জিনিয়ারিং (Highway Engineering)
ঔদক-ইঞ্জিনিয়ারিং (Hydraulics)
রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং (Railway Engineering)
গঠন ইঞ্জিনিয়ারিং (Structural Engineering)
মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং (Automobile Engineering)
খনি-ইঞ্জিনিয়ারিং (Mining Engineering)
রসায়ন ইঞ্জিনিয়ারিং (Chemical Engineering)
পৌর-ইঞ্জিনিয়ারিং (Municipal Engineering)
ইত্যাদি কত নব নব ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার শাখা।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনে (১৩৩৮) ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের কি সম্বন্ধ? সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার স্থান কোথায়? তাহা নির্দ্দেশ করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বিজ্ঞানের গবেষণা যতদিন বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষান্তরে আবদ্ধ থাকে ততদিন সাহিত্যের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি অল্প। যখন ঐ গবেষণা মূর্ত্ত হয়, তখন উহা সাহিত্যের সামগ্রী—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার সমস্তই সাহিত্যের দানে। তাই ভাষার খর্ব্বতার দরুণ বিজ্ঞান নিষ্ফলক্রিয় হয়।

নব নব ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরিভাষা রচনার আশু প্রয়োজন। প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল কারিগরী বিদ্যার উপর বিশেষ জোর দিতে বলিয়াছেন, কেননা জাতির সম্পদ ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি কার্য্যে সহস্র সহস্র ইঞ্জিনিয়ার কারিগর ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বহুসংখ্যক কারিগরের প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষায় ঐ সমস্ত গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণের বিশেষ দখল না থাকায় মাতৃভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং তত্বের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। তাহার জন্য প্রয়োজন, সুলভ বাংলা ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তকের প্রচলন। এই সকল পুস্তক রচনার দায়িত্ব কাহার? মূলতঃ রাষ্ট্রের, কিন্তু তাহা বলিয়া শিল্পপতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দায়িত্ব কম নহে। এ বিষয়ে আশু চিন্তার ও বিবেচনার প্রয়োজন।

আমার মনে হয় যে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পারদর্শী যাঁহাদের সাহিত্যের রসবোধ আছে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষা সমিতির মাধ্যমে রচিত পরিভাষাকে অনুমোদিত করিয়া লইতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষা সমিতি গঠনে ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের সভ্যদের পুরোভাগে আসিতে হইবে ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পরিভাষাও পরিভাষা-সম্বলিত ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তকের অর্থকরী মূল্যায়নের অনিশ্চিততার জন্য সাধারণ প্রকাশকেরা পশ্চাৎপদ। এ বিষয়ে সরকারী আনুকূল্যে এ গুলির প্রকাশ ও প্রচারের প্রয়োজন—বিশে

করিয়া প্রাথমিক পর্য্যায়ে। বিলাতে ও আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারিং পুস্তকের প্রকাশকেরা যোগ্য পুস্তক প্রকাশে বিশেষ আগ্রহী। বিলাতে ভারতীয় গ্রন্থকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বইও প্রচলিত। যোগ্য পুস্তক অর্থকরী হইবে, প্রকাশকেরা সুনিশ্চিত।

কয়েকখানি প্রাচীন বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের বিবরণী

(ক) জ্যোতিঃবিদ্যা সম্বন্ধীয়

১। জ্যোতিসংগ্রহ—পালপাড়ানিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত—১৮১৬ খৃষ্টাব্দ

২। জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় ১৮১৯ „

৩। জ্যোতির্বিদ্যা ইয়েটস্ —১৮৩৩ „

(খ) ভূগোল সম্বন্ধীয়

১। ভূগোল—পিয়ারসন্—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ

২। ভূগোল—অক্ষয় দত্ত—১৮৫৯ „

৩। ভূগোল বিবরণ—রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৪৬ „

৪। প্রাকৃত ভূগোল—রাজেন্দ্রলাল মিত্র—১৮৫৪

৫। প্রাকৃত ভূগোল—কালিদাস মৈত্র

(গ) পদার্থ বিদ্যা-রসায়ন-উদ্ভিদবিদ্যা

১। পদার্থ বিদ্যাসার—ইয়েটস্—১৮২৫ খৃষ্টাব্দ

২। পদার্থ বিদ্যাসার—পূর্ণচন্দ্র মিত্র—১৮৪৭

৩। উদ্ভিজ্জ বিদ্যা—ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার—১৮৫৪

৪। পদার্থ জ্ঞানমান—ক্ষেত্রমোহন রায়—১৮৬০

৫। কিমিয় বিদ্যাসার—মোহন ম্যাক্

৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৭। যন্ত্র বিজ্ঞান ও ক্ষেত্র তত্ব—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যা

১। এনাটমী ও ফিজিওলজী—মধুসূদন গুপ্ত

২। কার্ম্মোকোপিয়া— „

৩। চিকিৎসার্ণব—১৮৪২ সালে মুদ্রিত ও ষোল বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত হয়

৪। গার্হস্থ্য-চিকিৎসা—গ্রেহাম

অভিশপ্ত

তারিণীপ্রসাদ রায়

ক্ষুদ্র কুসুম ভার—
বহিতে না পারি আর—
ভূতলে লোটায় খসি
সুরভিত মালা,
রসহীন নিঃস্ব হিয়া
বুঝিবে না ওগো প্রিয়া
ব্যথাহীন বেদনার
কেন এত জ্বালা।
সোনালী প্রভাত মোর
আবছা ঘুমের ঘোর
হতাশ বেদন বাজে
পূরবীর তানে,
করুণ পরশে বীণ
ওঠে ধ্বনি ঝিন-ঝিন
ভরে মন নিরাশার
গানে আর তানে।

মেঘ-ভরা কালো জল
যৌবন ঢল ঢল
বুক চিরি ছোটে ক্ষীণ
অশনি ঝলক,
আকাশ বাতাস কাঁপে
প্রলয় পরশ তাপে
অনিমিষ আঁখি পাত
পড়ে না পলক।
বহে ধারা অনিবার
রোধিবে কে গতি তার
অতৃপ্ত তৃষিতার
অন্তর ক্ষুধা,
হৃদি জ্বালা দাহ তাপ
বিধাতার অভিশাপ
হলাহল ভরা সখি
স্বরগের সুধা।



বিসর্জন

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

গঙ্গাসাগরের মেলা শেষ। ফিরে চলেছে দূরাগত যাত্রীরা। কোলাহল স্তিমিত, উৎসাহ উল্লাস প্রায় স্তব্ধ। অসহ্য শীত। দোকানীরা দোকানপাট গুটাতে সুরু করেছে। সম্বৎসরের আয়োজন সারা।

রামনাথ কিন্তু নির্বিকার। যাবার নাম নেই।

পত্নী দেবযানী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল: সঙ্গীরা তো সব চলে যাচ্ছে একে একে, আমরা আর ক'দিন থাকবো এখানে?

তার কথা শুনে বিরক্ত হলো রামনাথ। বলল, এই শীতের কষ্ট সয়ে, ব্যবসায়ের ক্ষতি করে বিহার থেকে বাংলায় তো শুধু হাওয়া খেতে আসিনি আমরা। এসেছি, জীবনের সবচেয়ে বড় আশা পূরণের প্রার্থনা জানাতে, দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। শুনেছি, ভগবান কপিলদেব শুভ মুহূর্তে তাঁর ভক্তের কাছে সশরীরে উপস্থিত হন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এখনও ভগবানের আদেশ পাইনি। তাই, সবাই চলে গেলেও আমাকে থাকতে হবে একা। তোমার ইচ্ছে হয় তো দেহাতিদের সঙ্গে যেতে পার।

অপুত্রক রামনাথ গঙ্গাসাগরে এসেছে পুত্র কামনায়—একথা আর কেউ না জানুক, দেবযানী জানে। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পৌঁচেছে দুজনে, কিন্তু আজো কোন সন্তান হয়নি। দু'জনেই স্বাস্থ্যবান অথচ সন্তান সুখে বঞ্চিত। এ কি বিধাতার অভিসম্পাত নয়? তাই রামনাথের অবিচল সংকল্প—যেমন করে হোক্ দেবতাকে তুষ্ট করে অভিলষিত বর পেতে হবে। যদি বংশই না রইল, তবে কী প্রয়োজন ছিল এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার?

চুপ করে রইল দেবযানী।......

দু'দিন পরে।

সকাল হয়নি তখনও। বিছানায় লাফিয়ে উঠলো রামনাথ।

দেবযানীকে বলল, আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেবযানী। দেবতার আদেশ আমাদের সঙ্গে ধন-রত্ন যা কিছু আছে সবই গঙ্গাসাগরে—বিসর্জন দিতে হবে। তবেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

: বেশ তো, তাই দাও। কী হবে টাকা পয়সায়? সর্বস্ব দিয়ে যদি সাত রাজার ধন মাণিক পাওয়া যায়। এই নাও গহনার বাক্স, এর মধ্যে রয়েছে আমার সব অলঙ্কার, হীরে-মুক্তা-মাণিক্য—আমার সব চেয়ে দামী জিনিসগুলো।

সুটকেশ খুলে গহনার বাক্স নিয়ে এলো দেবযানী।

: দাও।

ভারী বাক্সটি হাতে নিল রামনাথ। কী যেন ভাবলো একবার, বলল, এর মধ্যে কী কী আছে দেখে নিলে হয় না? চাবিটি কোথায়?

: চাবিতো আনিনি। বাক্স এনেছি শুধু। এখানে তো আর গয়না পরবো না। তাই—

: আচ্ছা, দাও—

ধীরে ধীরে এলো রামনাথ। সামনে নিস্তরঙ্গ স্থির সাগর, অনেক দূরের আলোয় চকচক করছে কালো জল। এগিয়ে এসে বাক্সটি জলে ছুঁড়ে ফেললো রামনাথ।

নিঃশব্দে গঙ্গাসাগরের বুকে একটি শব্দ হলো—ঝুপ্।

তারপর অতল জলের তলে তলিয়ে গেল বাক্সটি।

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো রামনাথ: একি সর্বনাশ

করলাম, কী সর্বনাশ করলাম। একী হলো আমার! দেবযানী—আজ আমার সব গেল—সব গেল।

কপাল চাপড়াতে লাগলো রামনাথ। এগিয়ে এলো দেবযানী, ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলল, কী হয়েছে, অমন করছ কেন?

: সর্বনাশ হয়েছে আমার! আজ যে আর কিছু নেই আমার—সব আশা শেষ হয়ে গেল। না না, আমি সন্তান চাই না, মাধুরীর উপর আর অবিচার করতে পারবো না আমি, তার অভিশাপে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।

: মাধুরী! কে মাধুরী? সে তোমায় অভিশাপ দিতে যাবে কেন আবার?

অবাক হয়ে রামনাথের দিকে চাইল দেবযানী।

রামনাথ বলল, তুমি জান না—কিছুই জান না দেবযানী। কিন্তু সে তোমায় চেনে। সে ছিল তোমার পরম হিতৈষিণী। জীবন দিয়ে তোমায় উপহার দিয়েছিল আমায়।...না না, এই মেলা, এই তীর্থই আমার কাল। যদি এখানে না আসতাম! কেন এলাম? কেন পেতে চাইলাম যা পাইনি এতকাল—যা' পেয়েছিলাম কিন্তু নিতে পারেনি নিজের দুর্বলতায়? কেন হারালাম জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়াকে?

দেবযানী বলল, কেন মিছিমিছি মন খারাপ করছ কী এক পুরনো কথা ভেবে? আমি জানি, তুমি নির্দোষ, নিরপরাধ, পাপ স্পর্শ করেনি তোমায়। ভয় কি তোমার? আগামী বছরে আবার আসবো এখানে আমাদের সন্তান নিয়ে। দেবতার আদেশ তো মিথ্যে হতে পারে না কখনও।

উত্তর দিল না রামনাথ। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো শুধু।

রামনাথের মনে পড়লো অনেককাল আগেকার কথা:

...আনন্দ-খুশিতে উচ্ছল দু'টি কিশোর-কিশোরী। দুজনে ভালবাসে দু'জনকে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে বড় হয়ে তারা বাঁধবে ঘর। কিন্তু নিয়তি। কিশোরী মাধুরী তখনও যুবতী হয়নি। তার বাবা তার বিয়ের ঠিক করলেন রাঘব পাঁড়ের সঙ্গে। রাঘব বিপত্নীক প্রৌঢ়। আপত্তি করলো মাধুরী। কিন্তু কে শোনে তার কথা? যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল মাধুরীর। নিয়তি যেন কিছুতেই স্বস্তি দেবে না তাকে। বিয়ের ছ'মাস পরেই বিধবা হলো মাধুরী, শ্বশুর বাড়িতে যায়গা হলো না তার। ফিরে আসতে হলো পিতৃগৃহে।

মাধুরীকে ফিরে পেয়ে তৃপ্ত হলো রামনাথ।

মাধুরী বলে, আমি আর তোমার কাছে আসবো না। কেন আসবো? আমি যে বিধবা হয়েছি। পুরুষের সঙ্গে মিশতে নেই আমার। তাছাড়া, দু'দিন পরেই তো তোমার বৌ আসবে ঘরে, তখন আমায় ভুলে যাবে তুমি। আমাদের সমাজে বিধবার বিয়ে যে চালু হয়নি এখনও।

তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেয় রামনাথ। বলে, আমি কখনও বিয়ে করব না, চিরদিন থাকবো তোমারই। এ জীবনে আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে অটুট।

আপত্তি করলো প্রতিবেশীরা। মাধুরী বিধবা, রামনাথ যুবক, অবিবাহিত। এদের অবাধ মেলামেশা অনুমোদন করে না কেউ। প্রেম যদি হয়ে থাকে দু'জনের—তবে বিয়ে করে মাধুরীকে ঘরে আনে না কেন রমানাথ? যেখানে প্রেম, সেখানে সমাজের বিধি নিষেধ তো তুচ্ছ। এ তবে প্রেম নয়, ব্যভিচার। সমাজ তা সইবে না কিছুতেই।

মাধুরী রামনাথকে বলল সেদিন: এখন উপায়?

রামনাথ সহজভাবে বলল, আমাদের তো বিয়ে হয়নি। বিয়ের আগে যে এলো, কেউ তো তাকে নেবে না। তার চেয়ে তাকে আসতে দিয়ো না; অবাঞ্ছিতকে ডেকে এনো না আমাদের মাঝখানে, এতে বিপদ হবে দু'জনের।

: তুমি আমায় বিয়ে কর। আমায় তো ভালবাস তুমি। একথা তো মিথ্যে নয়।

: তোমায় বিয়ে করবো আমি? বামুনের ছেলে হয়ে বিধবাকে বিয়ে করবো?

: মানে?

: মানে অতি সহজ। একবার মন্ত্র পড়ে তোমার বিয়ে হয়েছে। আর তো বিয়ে হতে পারে না তোমার। একবার যে-দেহ অপরকে উৎসর্গ করা হয়েছে তা' তো আর দেবতার সামনে আনা যায় না।

: তা'হলে—কী করবো আমি? কেমন করে বাঁচবো কলঙ্ক থেকে?

চুপ করে রইল রামনাথ। নীরবে চলে গেল মাধুরী। তার দু'টি চোখ অশ্রু ছলছল।...

পরদিন এলোনা মাধুরী। তার খবর নিল না রামনাথ। যদি কোন বিপদ হয় খবর নিতে গিয়ে? একটি সপ্তাহ কেটে গেল, তবু দেখা নেই মাধুরীর। রামনাথের মনে কোন দুঃখ নেই সেজন্য।…

সবেমাত্র সন্ধ্যা। হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এলো মাধুরী। মুখে হাসি টেনে এনে বলল, তোমায় একটি কথা বলতে এলাম।

: বেশ তো, বল।

: তুমি বিয়ে কর। আমি আর আসবো না তোমার কাছে। আমি যাচ্ছি। যাবার আগে তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।

: কোথায় যাবে? বেশ তো ছিলাম দু'জনে।

হাসলো মাধুরী। রামনাথকে প্রণাম করলো, তারপর তার হাতে একটি নীল খাম দিয়ে বলল, কাল সকালে এটি খুলে দেখো—তার আগে নয়। এই আমার অনুরোধ।

আর অপেক্ষা না করে চলে গেল মাধুরী। ইতস্তত করলো রামনাথ। কৌতূহল হলো—চিঠিটি একবার পড়ে দেখলে হয় না? কিন্তু মাধুরীর শেষ অনুরোধটা রাখতে আপত্তি কি? এ তো আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

উদ্বেগের মধ্যে কেটে গেল রাত। ভোরের আলো উঠলো ফুটে। চিঠি খুলে পড়লো রামনাথ। মাধুরী লিখেছে:

…স্বেচ্ছায় এই কলঙ্কিত জীবনের অবসান ঘটানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার। আমি চললাম তাই। তুমি হয়তো আমায় খুঁজে বেড়াবে না কখনও। বিয়ে করে সংসারী হবে। স্বার্থপর মানুষ নিজের স্বার্থে অপরের স্বার্থের কথা ভাবেনা—ভাবতে পারে না। তোমায় দোষ দিই না, দোষ আমারই। ভালবাসার চরম মূল্য হয়তো এমনি করেই দিতে হয়।……

স্তব্ধ বিমূঢ় হলো রামনাথ।

দুপুরবেলা মাধুরীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো পল্লীর দু'মাইল দূরবর্তী একটি পুষ্করিণী থেকে। পুলিশ এলো। তদন্ত হলো, কিন্তু রামনাথের গায়ে আঁচড় লাগলো না। মৃত্যুর আগে মাধুরী সে-পথ বন্ধ করে গেছে। লিখে গেছে, আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছি, কেউ দায়ী নয় আমার জীবনের জন্য।…

কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালো রামনাথ। তারপর দেবযানীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হলো। মাধুরীর লেখা চিঠিখানি সীল-মোহর করে সযত্নে দেবযানীর গহনার বাক্সে রেখেছিল রামনাথ। দেবযানীকে বলেছিল, কখনও যেন ঐ সীলমোহর না খোলে। দেবযানী স্বামীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।…

বিয়ের পর দেবযানীর সঙ্গে শুয়েছিল রামনাথ। হঠাৎ কান্নার শব্দে জেগে উঠে দেখেছিল মাধুরীকে। সে দাঁড়িয়ে আছে সশরীরে মশারীর বাইরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিজের পরিবেশ ভুলেছিল রামনাথ। প্রশ্ন করেছিল, তুমি আজ এখানে কেন এসেছ মাধুরী? তুমিই তো বলেছিলে আমায়, তুমি বিয়ে কর।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চাই তুমি সুখী হও। আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমার এ আনন্দের দিনে আমার বুঝি আসতে নেই? সত্যি, বেশ হয়েছে তোমার বৌ।

: মাধুরী!

চমকে উঠেছিল দেবযানী। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কী হয়েছে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

: স্বপ্ন দেখছিলাম। ও কিছু না, কিছু না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল দেবযানী এ কথা শুনে।…

দেবযানীর ভালবাসায় বিভোর থেকেও মাধুরীকে মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি রামনাথ। কেমন করে ভুলবে? দেবযানীর মধ্যে সে যে মাধুরীকে দেখতে পায়। দেবযানী যখন সন্তানের জন্য দুঃখ করে তখন মাধুরীর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে: এখন উপায়?

অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয় রামনাথ। ছি ছি, এত সংকীর্ণ-চিত্ত সে। সমাজকে সে ভয় করে, না নিজের কপটতার জন্য এমন কাজ করেছে, সব জেনেও অসহায়া মাধুরীকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিয়েছে?…

জীবনের প্রাক-অন্তিম প্রান্তে এসে রামনাথ বুঝেছে তার ভুল। স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে দষ্ট হয়েছে নিশিদিন। কিন্তু উদ্ধারের পথ খুঁজে পায়নি তবু। সেদিনের বেদনার স্মৃতিটুকু আগলে রয়েছে। আজ সেটুকুও সে বিসর্জন দিল—এ দুঃখ, এ অনুশোচনা উন্মাদ করে তুললো রামনাথকে।……

অনেকক্ষণ পরে দেবযানী বলল, ও হ্যাঁ, সত্যি ভুল

হয়ে গেছে। তোমার সেই খামটিও যে গয়নার বাক্সের সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কি ছিল ওতে? কোন দরকারী দলিল নিশ্চয়। আমি দেখিনি খুলে।

একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো রামনাথ। বলল খুলে দেখলেই ভালো করতে দেবযানী। তাহ'লেই বুঝতে সব, জানতে সেই কথাটি যেটি এখনও না বলা হয়ে রয়েছে তোমার আমার মধ্যে। মাধুরী আমায় ভালবেসেছিল, তারপর জীবন দিয়ে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

দেবযানী বলল, ওসব এখন আর কী হবে ভেবে? যা' হবার হয়েছে। চল এবার রওনা হই।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রামনাথ। বলল, আচ্ছা বলতে পার দেবযানী, বিসর্জনের পর আবাহন, না আবাহনের পর বিসর্জন?

রামনাথের প্রশ্ন বুঝতে পারলো না দেবযানী। বলল, বিসর্জনের পরেই আবাহন। এ বছর যাকে বিসর্জন দিলাম, আগামী বছরে আবার তারই আবাহন হবে।

মাধুরার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে অনাগত ভবিষ্যতের এক স্বপ্নমধুর ছবি, সে যেন আবাহন করছে তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান

শ্রীসৌমেন দত্ত

ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন—এই চারটি উৎপাদকের সমবায়েই কোন দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্ভবপর। এদের মধ্যে ভূমি ও শ্রমই হল যথার্থ মৌলিক উপাদান। পুঁজি হল অতীত শ্রমের বর্তমান-রূপ মাত্র। আবার শ্রম ও সংগঠনের অনেক সময় এক আধারে অবস্থিতি সম্ভব। অতএব কোন দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন নির্ভর করে প্রধানতঃ সে দেশের ভূমি ও শ্রমশক্তিকে কি ভাবে ও কতখানি কাজে লাগানো হয় তার ওপর। উৎপাদনের জন্য এদের এই যে কাজে লাগানো এ'কেই বলা হয় কর্মসংস্থান। দেশে ভূমির পরিমাণ সীমিত। একমাত্র জনসংখ্যা ও তজ্জনিত সম্ভাব্য শ্রমশক্তিই ক্রমবর্ধমান। অতএব এই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোই হল আসল সমস্যা। এর সবটুকুকে ঠিকভাবে নিয়োগ করতে পারলেই কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ণ কর্মসংস্থানস্তরে (Full employment level) পৌছায়। তখনই সে দেশের হাত থেকে সত্যিকার শ্রীবৃদ্ধি। ধনোৎপাদন পৌছায় চরমতম স্তরে।

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন যে দীর্ঘকালের বিচারে (long run analysis) পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরই হল কোন দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থা। কেননা সেই অবস্থাতেই একমাত্র উৎপাদনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কর্মাভাব যদি থাকে ত থাকতে পারে দু'রকমের—ইচ্ছাকৃত কর্মাভাব (Voluntary unemployment) ও ঘর্ষণজনিত কর্মাভাব (Frictional unemployment) ইচ্ছাকৃত কর্মাভাব হল সেই অবস্থা যখন কিছু শ্রমিক বস্তুত প্রকৃত বেতনের হারে কাজ করতে নারাজ। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যদি রীতিমত প্রতিযোগিতা থাকে, তবে এ ধরণের কর্মাভাব বিদূরিত হতে বাধ্য। আবার কোন একটি শিল্পের থেকে অপর একটি শিল্পের গুরুত্ব ও সেই সঙ্গে শ্রমচাহিদা যদি হঠাৎ বেড়ে যায়, তখন যে ধরণের কর্মাভাব দেখা দেবে তাকে বলা হয় ঘর্ষণজনিত কর্মাভাব। মন্দার সময় যে চক্রাবর্তিত কর্মাভাব (Cyclical unemployment) দেখা যায় তা'ও হয় সেই ইচ্ছাকৃত নয় ঘর্ষণজনিত কর্মাভাবের ছদ্মরূপ মাত্র। অতএব কোন দেশের অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থায় কর্মাভাবের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। যদি না অবশ্য সরকার বা ট্রেডইউনিয়নগুলি কম বেতনের হারে শ্রমিকদের কাজ করতে না দেয়।

ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণের এই ধরণের সিদ্ধান্তের কারণ হল এই যে, তাঁরা কর্মসংস্থানকে শ্রমের চাহিদা আর যোগানের ওপর নির্ভরশীল মনে করেন। শ্রমের চাহিদা হল তার প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি (Merginal Productivity) নিয়মিত। আর শ্রমযোগান প্রকৃত বেতনহার সাপেক্ষ। অতএব প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য যখন প্রকৃত বেতনহারের সমান হয় তখনই নির্ধারিত হয় নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা। তখন বস্তুতর প্রকৃত বেতনের হারে শ্রমযোগান অব্যাহত থাকলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি কম হলেও তার চাহিদা সমানই থাকবে। ফলে কর্মাভাব ও দেখা দেবে না। এ অবস্থায় কর্মসংস্থান নির্ভর করে প্রধানতঃ বস্তুতর প্রকৃত বেতনের হারে শ্রমিকদের কাজ করার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। তাদের এই ইচ্ছা অনিচ্ছা আবার প্রতিযোগিতার তীব্রতার ওপর নির্ভর করে। অতএব সীমিত শ্রমশক্তির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার অবস্থা ধরে নিয়েই ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ সিদ্ধান্ত করলেন

র অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থায় কর্মাভাব থাকতে পারে না। আর থাকলেও তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ঘর্ষণজনিত কর্মাভাব—সমগ্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রভাব নগণ্য। আর এই ধরণের কর্মাভাবও দূর করা যায় সংগঠনের উন্নতি ও ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি প্রসারের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু কেইনস্-এর মতে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণের এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধতাত্ত্বিক কল্পনা মাত্র। বাস্তবের অবস্থা ঠিক এরকম নয়। সেখানে শ্রমশক্তি সীমিতও নয় এবং তার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতাও বিদ্যমান নেই। উপরন্তু শ্রমযোগান প্রকৃত বেতন (real wage) নয়, নিম্নাভিমুখী অর্থ বেতনের (money wage) হার সাপেক্ষ। তাছাড়াও মোট শ্রমশক্তির তুলনায় কাজের সংখ্যাও থাকে কম। সে'র ক্রয় বিক্রয় নিয়ম (Say's law of markets) কে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়ার জন্য এই শেষোক্ত অবস্থাটি ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা যে যোগান সর্বক্ষেত্রেই স্বীয় চাহিদা সৃষ্টি করে। অতএব শ্রমের যোগান ও চাহিদা দীর্ঘকালের বিচারে সমান হতে বাধ্য। আর তখনই সম্ভব হয় পূর্ণ কর্মসংস্থান। যা হ'ল দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা। কিন্তু কেইনস্ বলেন যে অবকর্মসংস্থানস্তরেরও (Under employment level) এ সাম্যাবস্থা সম্ভব। আর এটাই হ'ল প্রগ্রেসিভ পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। কেননা এই ধরণের সমাজের উপভোগ প্রবৃত্তি (Propensity to consume) অত্যন্ত কম। সেজন্য অর্থের সঞ্চয় হয় বেশী। এদিকে যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে উৎপন্নের চরমবৃদ্ধির জন্য নতুন মূলধনের প্রান্তিক কার্যাকরিতা (Marginial efficiency of capital) ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। ফলে উদ্যোক্তারাদিতে চায় কম হারে সুদ। এর জন্য লোকের মধ্যে নগদ মজুত মনোবৃত্তিও (liquidity preferenee) বেড়ে যায়। আর এই পূর্ণ কর্মসংস্থানাস্তরের সবটুকু সঞ্চয়ের বিনিয়োগ সম্ভব হয় না বলেই অবকর্মসংস্থানাস্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সাম্য হল উপভোগ ও বিনিয়োগ খাতে ব্যয়ের সহিত জাতীয় আয়ের সাম্য—কিন্তু এমন একটি স্তরে, দেশের প্রতিটি কর্মেচ্ছু লোকের জন্য কর্মসংস্থান করে দেওয়া যায় না। ঠিক এই ধরণের অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায়।

এখন এই কর্মেচ্ছু লোকের কর্মাভাব ক্লাসিকাল ধারণার বিরোধী। তাঁদের মতে দীর্ঘস্থায়ী কর্মাভাব মাত্রই প্রধানতঃ ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ স্বল্পতর প্রকৃতবেতনের শ্রমিকদের কাজ করার অনিচ্ছা। কিন্তু কেইনস্ বলেন যে শ্রমিকরা কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না—তাঁর মতে প্রকৃতবেতন নয় অর্থবেতন হ্রাসেই শ্রমিকদের যথার্থ আপত্তি। অতএব অর্থ বেতন না কমিয়ে জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধির দ্বারা প্রকৃতবেতন কমিয়ে উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান বাড়ানো যেতে পারে। দরবৃদ্ধির ফলে শুধুই যে উপভোগ খাতে খরচ বাড়ে তা'ই নয়, উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকতর বিনিয়োগেরও প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব সমাজের কার্য্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘটে বৃদ্ধি। এই চাহিদার ওপরই নির্ভরশীল কোন দেশের জাতীয় আয়। কেননা আমরা জানি—

আয় = উপভোগ + বিনিয়োগ

[Y = C + I]

আবার,

কার্য্যকরী চাহিদা = উপভোগ চাহিদা + বিনিয়োগ চাহিদা। অতএব কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর

আয় = কার্য্যকরী চাহিদা

কিন্তু আমরা জানি যে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরেই কোন দেশের জাতীয় আয়ের চরমবৃদ্ধি সম্ভব। কেননা একমাত্র এ অবস্থাতেই সমাজের প্রতিটি কর্মক্ষম ব্যক্তির কিছু না কিছু ব্যয়সামর্থ্য থাকে। এজন্য উপভোগ চাহিদা বেড়ে যায়। আর এই চাহিদা পূরণ করতে হলে চাই উৎপাদনের কাজে অধিকতর বিনিয়োগ। অতএব বিপরীত ভাবে দেখতে গেলে উপভোগ ও বিনিয়োগ চাহিদা (বা মোট কার্য্যকরী চাহিদা) বাড়িয়ে তুলতে পারলেই কর্মসংস্থানের পূর্ণতা সম্ভব।

এ কাজে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি। আজ 'লেসে-ফেয়ার' অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যর্থতা ক্রমশই আত্মঘাতী রূপ নিতে চলেছে। সমস্ত জগৎ জুড়ে একটা বিরাট মন্দার ভাব। এ সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন এর সীমানা নিয়ে। পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সামাজিক লক্ষ্য সিদ্ধির পথে রাষ্ট্র দুভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যয় পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয়তঃ কর হ্রাস-বৃদ্ধির মারফত।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ জনকল্যাণের কাজে বা বৃহত্তর বিনিয়োগের কাজে নিয়োজিত হতে পারে। প্রত্যক্ষ জনকল্যাণের কাজেব্যয়িত হলে ধনবণ্টন বৈষম্যের আংশিক বিদূরণ সম্ভব। এর ফলে কেইনসের উপভোগ ক্রমায়ণ (Consumption function) সূত্রানুসারে উপভোগ চাহিদার ঘটে বৃদ্ধি। আবার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগব্যয়কে প্ররোচিত করার পাম্প প্রাইমিং অবস্থায় সৃষ্ট হয়। ফলে বিনিয়োগ চাহিদাও বেড়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয় সামর্থ্য নির্ভর করে প্রধানতঃ করহারের ওপর।

এই করহার বৃদ্ধির ফলে শুধুই যে রাষ্ট্রের ব্যয়সামর্থ্য বাড়ে তা'ই নয়, ধনবণ্টনেরও ক্রমশঃ সাম্য আনা যেতে পারে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য করহার কমানোরও প্রয়োজন আছে। যদিও করহার নির্ধারণে প্রধানতঃ পুনর্বণ্টনের নীতি অনুসরণ করাই সমাজের কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধির অনুকূল। কিন্তু করহার বৃদ্ধি বিশেষ একটি সীমা পর্য্যন্ত সম্ভব। অথচ কর্মসংস্থানে পূর্ণতা সম্পাদনের কাজে অধিকতর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই রাষ্ট্রীয় ব্যয় সামর্থ্য বৃদ্ধি কেইনসের মতে তিনভাবে সম্ভব। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ ঘাটতি বাজেট (Deficit financing) ও তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে। এই তিনটি উপায়ের সহায়তায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিষেধক ব্যয় (Compensetory spending) ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সবটুকু প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জন সম্ভব। এর ফলে সমাজের কার্য্যকরী চাহিদাকে এমন একটি পর্য্যায়ে স্থির রাখা যেতে পারে, যাতে করে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়।

হিমাচল পথে

অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

চারদিকে রাতের কালো বন্যা। ওরই মধ্যে ডুবে আছে অজানিত রহস্য-ঘেরা পার্বত্য জগৎ। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় খেয়ালি মেঘের আনাগোনা, চীড় ও দেওদারের শ্যামল শোভা, শিলায় শিলায় চঞ্চল ঝরণার নূপুর-ঝংকার। এই রমণীয় কল্পনা মনকে আবিষ্ট ক'রে রাখে। কিন্তু এই জগতের আকর্ষণ যেমন, ভয়ও তেমনি। পিছনে ফেলে এসেছি পরিচিত সমতল ক্ষেত্রের জগৎকে। একে বোঝা যায়, আঁকড়ে ধরা যায়। আবার দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। এই মাটি বুক পেতে আছে, এর সহিষ্ণু ও স্নেহশীল আশ্রয়ে এক নিশ্চিৎ নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু পাহাড়ে তো তা পাবার উপায় নেই। সে যে রূপের মায়ায় ভুলিয়ে তাদের অতল তলে টেনে নিতে চায়।

রহস্যজালে ভীষণ ও মধুর একই সঙ্গে যে বাঁধা পড়ে। তন্দ্রা-জড়ানো মনে স্বপ্ন শিহরণ লাগে। প্রিয় মুখগুলি অন্ধকারের বুকে ঝিক্‌মিক করতে থাকে। কলকাতা বহু দূর।

পাঠানকোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। অমৃতসর থেকে রাত বারটার সময় পৌঁচেছি পাঠানকোটে। ইচ্ছা ছিল, রাত আড়াইটের সময় কাংড়া উপত্যকাগামী ট্রেণ ধরব। কিন্তু সেই ট্রেনের অবস্থা দেখে মনে হলো, ট্রেণে ওঠা অসম্ভব, অতএব দুর্ভোগ আছে কপালে। তীর্থযাত্রীরা চলেছে জ্বালামুখী-তীর্থে সেখানে নবরাত্রির উৎসবে যোগ দেবে। তাদের ভিড়ে ট্রেণের উপরে নীচে আর কোথাও তিলার্ধ জায়গা নেই। ট্রেণের আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্ল্যাটফর্মে শয্যা পাতলাম—টিনের আচ্ছাদনের নীচে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শয্যা। আশে পাশে অনেকেই শুয়ে রয়েছে মুড়ি দিয়ে। আমাদের কাছেই আশ্রয় নিল একটি পাহাড়ী মেয়ে পুরুষের দল। তাদের ট্রেণ ধরবার তাড়া নেই। নেই আগামী কালের পরোয়া। তাদের বিচিত্র পোষাক। বিচিত্রতর অলঙ্কার।

কনকনে শীতের হাওয়া ছুঁচের মত বিঁধছে। অন্ধকার আকাশের তারার চুমকী দেওয়া একটু প্রান্ত চোখে পড়ছে। পাহাড়ী দলটি ততক্ষণে গান সুরু ক'রে দিয়েছে। তাদের গানের ভাষা বুঝলাম না, কিন্তু সেই সুর মিলল দূরের কালোয় ঢাকা পাহাড়ের সঙ্গে। দেওদার ও গিরি-নদী-ঘেরা এক টুকরো স্বপ্ন জেগে উঠল।

শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি চলছে। টপ টপ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে টিনের ছাদ থেকে। চারদিকেই জলের ধারা—যাই কোথায়? কাপড় চোপড় ভিজে গেল, বিছানাপত্রের যা দশা হলো তা' আর বলবার নয়। আমরা ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছি, কিন্তু পাহাড়ী দলটি নির্বিকার। তাদের মধ্যে কয়েকজনের ঘুম এখনো ভাঙেনি, একজন নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানছে, আর একটি মেয়ে আয়না নিয়ে প্রসাধনে নিবিষ্ট। ফর্সা হ'য়ে এলো, কিন্তু বৃষ্টি থামল না। এবারকার যাত্রায় বৃষ্টি যে আমাদের নিত্যকার সহযাত্রী তা' তখনো বুঝে উঠতে পারিনি। ভিজতে ভিজতে কাংড়াগামী বাসে গিয়ে উঠলাম।

ভোর ছয়টা। রাতের অন্ধকার তখনো ভালো ভাবে কাটেনি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টির একটুও বিরাম নেই। এই বিষণ্ণ পরিবেশে আমাদের মোটর বাস সমতল রাজ্য ছেড়ে বক্র ও বন্ধুর পাহাড়ী রাজ্যে প্রবেশ করলো। আস্তে আস্তে ধূম্রকিরীটী প্রহরীগুলি চোখে পড়তে লাগল ডানে বাঁয়ে, সামনে পিছনে—সবদিকে। মাটির স্নেহ দূরে স'রে গেল, শিলার শাসনে নিজেকে স'পে দিলাম।

একটি পাহাড়ী নদী অবিরাম আমাদের অনুসরণ ক'রে চলেছে। ছোট বড় পাথর তার চারদিকে ছড়ানো—

হাজার হাজার বুনো মোষ যেন জলের ধারে শুয়ে। দু'পাশে পাহাড়ের পর পাহাড়ে চূড়ায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী—যুগ যুগ সঞ্চিত আগুন বুঝি আজ বেরিয়ে আসতে চাইছে। হয়তো বা কোন প্রচ্ছন্ন পার্বত্য-গুহায় বিশ্বকর্মার গোপন কর্মশালায় কাজ চলছে। আকাশে আলোর রেখা অবলুপ্ত, মেঘের রঙ ধূসর ঘোমটায় আচ্ছন্ন। এই দীপ্তিহীন, বর্ণহীন জগৎই কি দেখতে এলাম ?

মাঝে মাঝে এক একটি জায়গায় গাড়ি থামছে। দু' একটি দোকান সেই সব জায়গায় আশে পাশে। দোকানে বিক্রী হচ্ছে আপেল, কলা, আঙ্গুর ও বড় বড় পেয়ারা। দোকানে ঝুলছে হিন্দী চিত্র-জগতের নাম-করা নায়িকাদের ছবি, কলকাতার রাস্তায় যাদের দেখা যায়। আমার লোভ আপেলের দিকে, কিন্তু বন্ধু নির্মলের ঝোঁক কলার দিকে। যাই হোক, দু'জনে আপোষ ক'রে আপেল ও কলা দুই-ই কিনলাম। বৈজনাথে কখন কি জুটবে তা অনিশ্চিত, তাই ফলাহার করা সমীচীন মনে করলাম।

কাংড়ায় এসে গাড়ি থামল অনেকক্ষণ। নীচে নেমে একটু দেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নামবার সাধ্য আছে কি ? মুষলধারায় বৃষ্টির বর্ষণ চলছে। দূরে কাংড়া দুর্গ দেখা যাচ্ছে। কাংড়া মন্দিরও পড়ছে চোখে। কিছুক্ষণ পরে বাস আবার চলতে সুরু করলো। অনেক পাহাড় ঘুরে আর উপত্যকা পেরিয়ে বাস এল পালামপুরে। পালামপুর বড় জায়গা, শহরের মতই মনে হলো। আমাদের গন্তব্যস্থল বৈজনাথ এখান থেকে আর বেশি দূরে নয়।

বেলা বারটা নাগাদ বাস এসে পৌছল বৈজনাথে। বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ মূর্তির নাম থেকেই এই জায়গাটির নামের উৎপত্তি। পাহাড়-ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে জায়গাটি অবস্থিত। বিচিত্র জগৎ আর বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয় সুরু হলো।

বৈজনাথের ডাকবাংলোর কথা অনেক শুনেছিলাম। মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ডাকবাংলোর দিকেই রওনা হলাম। বৃষ্টির বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। আসতে আসতে জামাকাপড়, মালপত্র সব ভিজে গেল। নির্মলের পরামর্শ মত ছাতা এনেছিলাম তাই একটু বাঁচোয়া, কিন্তু, ছাতার সাধ্য কি ঐ বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। ডাকবাংলোয় যখন এসে উঠলাম, তখন বৃষ্টিবানে শরীর ক্ষতবিক্ষত। এখন চাই একটু নিরাপদ আশ্রয়, শুষ্ক ও উষ্ণ একটি থাকবার স্থান। কিন্তু হা-হতোস্মি! ডাকবাংলোয় গিয়ে শুনলাম, কোন ঘর খালি নেই। চৌকিদার তো আইন মাফিক কথা বলেই খালাস ! কিন্তু আমরা যাই কোথায়,কোথায় একটু আশ্রয় পাই ! খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শীতে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছি, এক একটি বরফের গুলির মত বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। সামনেই শুভ্র ধোঁয়া রাশি নীরব পাহাড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে চলেছে। বৈজনাথের পুণ্য ক্ষেত্রে একটু আশ্রয়ের কি এতই অভাব ! ধর্মশালা একটি আছে শুনলাম, অগত্যা তারই উদ্দেশে ক্লান্ত ও অনিচ্ছুক পা দুটিকে চালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম। জয় বৈজনাথজী !

আমাদের কথাবার্তা শুনে ডাকবাংলোর একটি কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন এক বাঙালী দম্পতী। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হিমালয় পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। কাশ্মীর বেড়িয়ে কাংড়া উপত্যকায় এসেছেন। কাশ্মীরের বানিহাল নামক জায়গায় প্রবল ঝড় বৃষ্টির ফলে এঁরা প্রায় মৃত্যুমুখে পড়েছিলেন। পথশ্রমে ও জ্বরে অচেতন স্বামীকে ঝড়-বৃষ্টি ও মৃত্যু-কঠিন শীতের হাত থেকে ভদ্রমহিলা কিভাবে বাঁচিয়ে এনেছেন তার বিবরণ শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। এই মহিলাটির স্থিরবুদ্ধি ও অত্যধিক মানসিক শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠলাম। কথাবার্তার সময়েও তাঁর ব্যক্তিত্বই বেশি ফুটে উঠছিল। স্বামীটি দেখলাম তাঁর ক্ষীণ দেহ ও দুর্বল মন নিয়ে স্ত্রীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেই আছেন, আর স্ত্রী মিনিটে মিনিটে তাঁর খবরদারি ক'রে চলেছেন, খাওয়া থাকার সব নির্দেশ দিচ্ছেন, আবার বাইরের লোকেদের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনাও ক'রে চলেছেন। যাই হোক, এঁদের সহৃদয় মধ্যস্থতায় আশ্রয় একটি জুটল। পাশের ঘরেই একজন অবাঙালী ভদ্রলোক এসে উঠেছেন। তাঁকে অনুরোধ ক'রে তাঁর ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

যে ভদ্রলোক তাঁর একটি ঘরের স্বত্ব আমাদের ছেড়ে দিলেন তিনি সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী, কলকাতার ঠাকুরলাল

হীরালাল নামক হীরক-ব্যবসায়ী দোকানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই ভদ্রলোককে যত দেখতাম, যত তাঁর কথা শুনতাম ততই অবাক হ'তাম। মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করতে তিনি যান দূরে দূরান্তরে—দুর্গম কুলু উপত্যকায়, অজানা ভুটানের অন্ধকার পথে, নিষিদ্ধ তিব্বতের গহন অন্তঃপুরে। তাঁর কাছে কত গল্প শুনলাম,—কত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, কত বিপদের কাহিনী। মনে হতো, ঐই যে লোকটি চলেছে পাহাড়ের ভীতি সঙ্কুল পথে পথে—এ কিসের আশায়? সৌন্দর্য ভোগ করবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়; পাহাড়ের গোপন কক্ষে কক্ষে যে ধনরত্ন সঞ্চিত আছে তারই লুব্ধ আশায়। পাহাড়ের উপরে যে ধন ছড়িয়ে থাকে তার ভাসমান মেঘে, তুষার ধবল শিখরে, কম্পমান দেবদারু পত্রে আর কলস্বিনী ঝরণার কলকথায়,তাকে পাবার জন্যে আসে মানুষ; আর পাহাড়ের তলে তলে যে ধনসঞ্চিত থাকে তার শিলাময় যক্ষপুরীর গোপন ভাণ্ডারে তাকেও পাবার জন্যে আসে মানুষ। একই মানুষ, কেউ আসে ধন দিতে। কেউ বা নিতে। লোকটির কাজ আর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, লোকটিকে ভালো লাগত, পর্বতকে এ কত কাছে পেয়েছে—কত সহজভাবে, কত রহস্য এর জানা, কত কথাই না এর বুকে সঞ্চিত! রাত্রে দেখতাম, লোকটি একটি সুটকেস থেকে কত টাকা বার করছে, কত তাড়ায় তাড়ায় নোট—বোধ হয় হাজার হাজার, হয়তো বা লাখ লাখ—নির্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে। পাহাড়ের পাঁজর থেকে আনা টাকা—পাহাড়ী লোকের যা সম্পদ তা' হয়ে ওঠে সমতলী লোকের সৌন্দর্য—হীরে-চুনী-পান্না-নীলা—রূপের আলোয় চোখ ঝলসে যায়।

বাইরে অশ্রান্ত বেগে বৃষ্টিধারা ব'য়ে চলেছে। ধূমল মেঘগুলি বিরহ-বেদনায় পীড়িত হয়ে পর্বত ছাড়িয়ে আকাশ পথে অভিসারে চলেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একখণ্ড বৃহৎ মেঘ পর্বতের সানুদেশে সংলগ্ন হ'য়ে আছে—ঠিক যেন সেই—'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।' অন্ধকার ঘনিয়ে এল পর্বত শিখরে শিখরে। নীচে ক্ষীরগঙ্গার কলোচ্ছ্বাস প্রবলতর হয়ে উঠল। দুর্যোগ রজনীতে যমুনার আহ্বান উত্তরোল হলো বুঝি—মানস সুরধুনী পারে হরি রয়েছেন, রাধা বেরিয়ে পড়েছেন পথে—

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি জাত॥
দশ দিশি দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনতার॥

বাইরে বাদলের উৎসব আরো উদ্দাম হ'য়ে উঠলো 'জলের করুণ কান্নার আর বিরাম নেই'। অলকাপুরীর পথ আর কত দূর? বিরহিণী যক্ষনারী আজকের রাত কাটাবে কেমন ক'রে?

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ—
—সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

আকাশের অবস্থার কোন উন্নতি নেই। পাহাড়ের বিচিত্র রঙবাহার বর্ষার মেঘে অবগুণ্ঠিত। বাইরে বিষণ্ণ মনে তাকিয়ে আছি। অদূরে বৈজনাথ মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। বাদলের ধারা ঐ চূড়া প্রদক্ষিণ ক'রে ক'রে চলেছে। গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে বৈজনাথের আরতি সুরু হলো বুঝি। হোক্ বৃষ্টি, কিন্তু বৈজনাথ দর্শন করতেই হবে। দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

জনবিরল নিঃসঙ্গ পরিবেশে মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে আরও কয়েকটি ছোটখাট মন্দির রয়েছে। মন্দিরের সম্মুখেই একটি বৃষমূর্তি দাঁড়িয়ে এবং আর একটি বৃষ পা গুটিয়ে ব'সে। এরূপ বৃষমূর্তি ক্যাংড়া উপত্যকা ও মণ্ডির অনেক মন্দিরেই দেখেছি। মন্দিরের ভিতরে ও বাইরের পাথরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য ও নানা মনোহর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে।

মন্দির-প্রাচীরসংলগ্ন একটি ঘরে একজন সন্ন্যাসী ধুনী জ্বেলে বসে আছেন। আমরা গেলাম। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নেই কোন কৌতূহল। এই নির্মানব শৈলমন্দিরে তিনিই একমাত্র প্রাণের একক পসরা সাজিয়ে রয়েছেন। তাঁরই মত প্রাণবান মানুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ দু'একটি কথার আদান প্রদান করবার আগ্রহ তাঁর নেই! কি নির্মম সন্ন্যাসী! ঐ অদূরবর্তী বৈজনাথের লিঙ্গমূর্তির মতই নির্মম এর নীরবতা! তবুও ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির সম্মুখে এই ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি মনের মধ্যে এক

বেদনাকরুণ শ্রদ্ধা উদ্রেক করলো। বৃষ্টিবাদলের আক্রমণ থেকে সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত সুখে মগ্ন। প্রিয়জনের যত্ন ও আদর তাদের ঘিরে রেখেছে। কিন্তু এই একক সন্ন্যাসীটি সব ছেড়ে, সব হারিয়ে নিঃসঙ্গ দুর্যোগের মধ্যে তাঁর সর্বরিক্ত উপাস্য দেবতার সাধনায় নিরত হ'য়ে আছেন।

হিমালয়ের শিখরে শিখরে যোগীশ্বর মহাদেবের যোগাসন পাতা রয়েছে। ঐ যে বৈজনাথ—প্রায় হাজার বছর ধ'রে তিনি এই শৈল পরিবেশে মৌন যোগসাধনায় মগ্ন হ'য়ে আছেন। যুগ যুগ ধ'রে ভক্ত তীর্থযাত্রীরা এসেছে, বৈজনাথ মন্দিরের ঘন্টা নেড়েছে। সেই ঘন্টা শৈলেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেছে দূর পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পাশের ক্ষীরগঙ্গা অবিরাম স্তব গেয়ে চলেছে। আজ বৈজনাথ-মন্দিরে ভক্তের আনাগোনা বিরল হয়ে এসেছে। কচিৎ দু'একজন লোক পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু মাথা নীচু ক'রে প্রণাম জানিয়ে চলে যায়।

মেঘের আড়াল থেকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নির্মল তার শেষ ফটোগুলি তুলে নিতে ব্যস্ত। আমি মন্দিরের ভিতরে ব'সে চারদিকে অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। ছোট একটি পাহাড়ী মেয়ে, যেন সদ্য-ফোটা একটি কুটজ কুসুম, আমাদের সঙ্গে খুব উৎসাহের সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিলে। কখনো নির্মলের ক্যামেরার সরঞ্জাম বইছে, কখনো বা আমার কাছে এসে তার চোখ দুটি বিদ্যুতের মত ঘুরিয়ে তার সংসারের কথা বলে চলেছে। জাতিতে রাজপুত। বংশে আভিজাত্য আছে, কিন্তু অবস্থায় নেই। বড় গরীব এরা, কিন্তু বড় সরল, বড় সৌহার্দপূর্ণ। মন্দিরের পূজার কথা বলল, একটু চন্দন ঘসেও আমাদের দিল। মন্দিরের আনাচে-কানাচে মেয়েটি ছুটোছুটি করতে লাগল, হিমালয়ের মৌন বুকে শিহরণ জাগিয়ে চঞ্চল ঝরণার খেলা চলল যেন। মন্দির থেকে চলে এলাম, কিন্তু সেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে ঝরণার খেলা ভুলতে পারলাম না।

এখানকার সনাতন-ধর্মপ্রচারিণী সভার তত্ত্বাবধানে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়ে উঠেছে সেগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ না করলে বৈজনাথের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এখানে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় রয়েছে। এঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা ও মহৎ আদর্শ সত্যই প্রশংসনীয়। যে মন্দিরটি এখানে রয়েছে তাতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছেন। সেখানে অহোরাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও ভজনপূজন চলছে। দূরশব্দবহ যন্ত্রে সে সব চতুর্দিকে ঘোষণা করা হচ্ছে। ডাকবাংলোয় ব'সে ঝরঝর বৃষ্টি-সজল ভাবগম্ভীর দিনে সেগুলি শুনতে বেশ ভাল লাগছিল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। পাহাড়, মেঘ, তরুলতা সব অন্ধকারের অন্তঃপুরে লুকিয়ে পড়লো। চারিদিকে নীরন্ধ্র নীরবতা। কেবল সেই নীরব অন্ধকারের অবরোধে ক্ষীর-গঙ্গার অশ্রান্ত গর্জন। দু'দিন ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে ক্ষীর-গঙ্গার জল স্ফীত ও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছিল, এ যেন 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রোষে', এর আঘাতে আঘাতে শিলাগুলি গুঁড়িয়ে তলিয়ে যাচ্ছে, অসহায়ভাবে ছিটকে ছিটকে পড়ছে দূরে। যোগেন্দ্রনগরের রেল লাইন ঐ বুঝি গ্রাস ক'রে নিল। এই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী তার লোলুপ মুঠি দিয়ে পাহাড়ের গাছ, মাটি, পাথর সব ছিঁড়ে আনছে। এ মাথা তুলছে, উপরে, আরও উপরে, আমাদের ধরবে নাকি? ধরুক। এখন আর ভয় করিনা। সম্মুখে এগুবার পথ নেই, পিছনে ফেরবার উপায় নেই। এই প্রলয়ঙ্কর রাত্রি আমার জীবনের যদি শেষ রাত্রি হয়, তবে তাই হোক। বৈজনাথ, এ-রাত্রি তোমার পায়েই সঁপে দিলাম।

এখানকার কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী অমরেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হলো দু'দিনের মধ্যেই। ভদ্র-লোকের বয়স ত্রিশের মধ্যে। শিল্পকলার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। সুদূর বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে শিল্প সাধনায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। কাংড়া শিল্পকলা নিয়ে ইনি নানারকম অনু-সন্ধান করছেন এবং এই শিল্পকলার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে ইনি এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশছেন। কোন ভদ্রতার অভিমান নেই, নেই কোন শিক্ষার অহমিকা। তাই এখানকার মানুষকে জানতে পেরেছেন ইনি।

এঁর কাছে এখানকার মানুষের পরিচয় পেলাম, যার অরণ্যদেরা পাহাড়ের বুকে তাদের অজ্ঞাত জীবনের ধারা

বহন করে চলে সেই সব গন্দি পুরুষ ও রমণীর কথা। তাদের মধ্যে আছে ভুবনমোহন সৌন্দর্য, সভ্য ও উন্নত মানুষের মধ্যে যা দুর্লভ—আর আছে চিরশান্ত সরলতা যা মানুষের সমাজে কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু বড় গরীব এরা, বড় দুর্বল, বড় অসহায়, আর্থিক দারিদ্র্যের ফলে এদের জীবনের শুভ্র সৌন্দর্যে লাগে কালিমার স্পর্শ, যে দেহ দেবতার নৈবেদ্য হতে পারে তা হয়ে ওঠে কামনার পানপাত্র। এদের জীর্ণ ও মলিন গৃহে কাংড়া শিল্পকলার কত দুর্লভ নিদর্শন হয়তো লুকিয়ে রয়েছে। শিল্পী অমরেন্দ্র চৌধুরী সেগুলি পরম যত্নে সংগ্রহ ক'রে চলেছেন।

সকালে বৃষ্টিধারা বুঝি একটু থামল। ক্ষীরগঙ্গার উগ্র মূর্তিও বুঝি একটু শান্ত হয়ে এল। আজ এখান থেকে যাবার দিন, তাই বাইরের দিকে তাকিয়ে একবার ধবল পাহাড়ের অবগুণ্ঠিত রূপ দেখার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল তার বর্ণনা করবো কি ভাষা দিয়ে! বৃষ্টি ভেজা প্রভাতী আলোর এক আকাশ-জোড়া ইন্দ্রধনু এক পাহাড়ের চূড়া থেকে বহুদূরবর্তী আর এক পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করেছে। এ যেন শেলির সেই 'triumphal arch,' অথবা রামায়ণে পড়া হরধনু—তেমনি বিরাট, তেমনি অপরূপ। চোখ ফেরাতেই আর এক দৃশ্য দেখে মন ভ'রে এল। হঠাৎ ধবলাধার পর্বত-শ্রেণীর শাদা চূড়া মেঘের যবনিকা ছেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করলো। প্রভাতের আলোয় তার তুষারগাত্র ঝলমলিয়ে উঠল। এতদিন কালো মেঘের অন্তরালে যেরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল আজ হঠাৎ তা' প্রকাশিত হ'য়ে পড়াতে তাকে দুর্লভ সৌন্দর্যমণ্ডিত বলেই মনে হলো। মনের সব অন্ধকার, সব হতাশা ঐ তুষারমৌলির আবির্ভাবে কেটে গেল। বৈজনাথের স্মৃতি এক মুহূর্তেই মনের পটে অবিস্মরণীয় রেখায় প্রতিফলিত হলো।

অকস্মাৎ

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

ছোট ঘরখানি মনে হলো মোর অকস্মাৎ অনেক বড়ো।
আমার মনের স্বপনেরা সব হয়েছে জড়ো।
রাংচিতা দিয়ে ঘেরা বেড়াখানি আলসে হেলি
সুদূর মাঠের পানে চেয়ে হাসে নয়ন মেলি;
কাঁপে ঝাউবন বুঝিবা বিভোল বাতাস লেগে,
পারাবতগুলি করিছে কূজন হৃদয়াবেগে;
ওপাশে নদীটি ক্ষীণতোয়া বহে অসম্বৃতা,
দেবদারু বুকে জড়ায়ে উঠেছে অপরাজিতা।
জমেছে যত না গৃহজঞ্জাল মলিন ধূলি,
তাদেরো গায়ে কে বুলায় আজিকে রঙের তুলি?

* * * *

অথবা কি ওরা আমারি মনের প্রতিচ্ছবি নূতনতম?
আমারি গানের প্রতিধ্বনি কি এ অনুপম?
আমার হৃদয়পদ্ম সহসা মেলেছে দল,
তাহারে হেরিয়া ধরণী কি হলো সচঞ্চল?

নাহি তো কোথাও কালিমা কাজল বিষণ্ণতা—
আকাশে মাটিতে আলোকে ছায়ায় আত্মীয়তা!
ভেসে আসে কানে অনাহূত মিঠে মধুর রোল,
দোলে সুন্দর সুষম ছন্দে দোদুল দোল!
সমুখে কি আছে চাহিনা দেখিতে কি ছিল পিছে,
নাহি অবসর নাহিকো—সে-সব ভাবনা মিছে।

* * *

অথবা কি সবি তোমারি আমার উদ্বোধনী
মধুর হইতে ক্রমে হয়ে এলে মধুরতমা।
লুলিত অধরে ভাসিছে হাসিটি, আনত চোখ;
জানো যদি বলো, বলো না কোথায় অমৃতলোক?
বিশাল পৃথ্বী—রচনা বিপুল মনেতে হয়,
মোরা কি তাহারে করিব না আরো মহিমাময়?
বক্ষে তোমার যে-মধু করেছ সঙ্গোপন
গন্ধে তাহার করো একাকার তনু ও মন।

এসো তবে বসি ঢালো মধু পানপাত্র ভরি,
আমরা দু'জনে নবীনজীবন সৃজন করি।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁর দেশকাল

অধ্যাপক রামদুলাল বসু এম-এ

১

ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্কিমবন্দিত কবি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে সুরু ক'রে প্রথমার্ধের'ও কিছু বেশিকাল বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে ঈশ্বরগুপ্তকে কবি হিসাবে অনন্য দেখা যায়। তিনি একান্তভাবে বাঙালীর কবি। তাঁর গভীর স্বদেশানুরাগ তাঁর সাহিত্য অনুশীলনের স্তরে স্তরে বিকশিত। ঈশ্বরগুপ্তের কবিধর্মের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বঙ্কিমের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি—ঈশ্বরগুপ্ত বাংলার কবি…কবিতাগুলি মায়ের প্রসাদ"। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরগুপ্তের কবি-কৃতির মৌল সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ঈশ্বরগুপ্ত আজ বিস্মৃতপ্রায় কবি। কারণ, তাঁর কবিতায় সেই শাশ্বত রস আবেদন নেই যার বলে তাঁর কাব্যতরণী একালের রসিকবৃন্দের হৃদয়-কূলে এসে দাঁড়াতে পারে। সাহিত্যের একটা স্থায়ী রূপ আছে, যা তাকে যুগও কালের উর্ধ্বে স্থাপন করে তাকে চিরন্তনত্ব দান করে। যুগ ও কালের ব্যবধান, রুচি ও ভাষার বিভিন্নতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তাকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। এই চিরন্তনতার তারে বাঁধা আছে পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য-কর্ম। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় চিরন্তনত্বের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সৃষ্ট যুগ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে একান্তভাবেই বদ্ধ! কিন্তু সেই প্রাচীন বেষ্টনীর উর্ধ্বে কখনো বা তাঁর কলালক্ষ্মীর আর্তস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—আর পবনবাহিত সেই ধ্বনি সমাজের সংঘর্ষ লগ্নের ইতিকথা রূপে ছড়িয়ে পড়ে একালের সমাজের ঘাটে ঘাটে। মনে হয় আজকের এই সাহিত্য-সাধনার সঙ্গে ঐ গানের কোথায় যেন একটা যোগ আছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ করার প্রয়োজন কম নয়। প্রয়োজন আছে সেই সময়কার দেশকালকে জানার। সেই জানার মধ্য দিয়ে আমরা গুপ্ত কবিকে নিরীক্ষণ করব। তাঁর কবি ধর্মের দীপ্তি দিয়ে তাঁর জীবনধর্মের পরিচয় লাভ করব।

২

ঈশ্বরগুপ্তের সমকালীন দেশকালকে জানবার পূর্বে তাঁর পূর্ব দেশকালের প্রতি একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরগুপ্ত জন্মগ্রহণ করলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যজীবনকাল বিস্তৃত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত এই সত্তর বছরের সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে কবিদের পাঁচালী গান, আকড়াখড়াই গান প্রভৃতির উন্মত্ত বন্যায় বাংলাদেশ প্লাবিত ছিল। নতুন সৃষ্ট কলকাতা নগরীর 'হঠাৎ রাজাদে'র চিত্তবিনোদনের জন্য এই জাতীয় গানের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর বহুলপ্রচারিত রূপ ও ভাষা এইসব গানের কোন কোন স্থানে পুন-প্রয়োগের ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। এইসব সংগীত-স্রষ্টারা কাব্যের form বা বহিরঙ্গগঠনে তৎপর ছিলেন। কিন্তু বাংলা কাব্যে এইসব বহিরঙ্গ সাধকের দল তৎকালীন সমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি অক্লেশে সমাধিলাভ করেছে। সাহিত্য-সৃষ্টি করতে যে সংযম দর্শন ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় তা থেকে এইসব লেখকেরা বঞ্চিত ছিলেন। কাজেই মরশুমী ফুলের মতো সাময়িক বিভা বিকশিত করে তাঁরা নিষ্প্রাণ হলেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁরা নামবাচক হয়ে বেঁচেছিলেন শুধু—সৃষ্টি হারিয়ে গেল অকালে। রূপের জৌলুষ অবসিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ নটীর মত অপাংক্তেয় হয়ে পড়ল। সাহিত্যের আসর থেকে ধূলায় হতে হল লীন। অমরত্বের স্বাদ ভাগ্যে জুটল না।

বাংলা সাহিত্যের এই অসার ও বহুনিন্দিত যুগের পটভূমিকায় গুপ্ত-কবির আবির্ভাব। তাই স্বভাবতই তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের প্রভাব থেকে নিজেকে সর্বাংশে মুক্ত রাখতে পারেননি। নিজে কিছুকাল কবি-গণের "বাঁধনদার" ও ছিলেন। এই কারণে চপলতা অভিজ্ঞাবণ বিদ্রূপ বহিরাড়ম্বর অনুপ্রাস গুপ্তকবির রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণের সচেষ্ট সাধনার ফল তাঁর কবি-মনকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। পরিণামে—বাংলা সাহিত্যের অন্তর বাহিরে এলো পরিবর্তন। বাংলার মাটি থেকে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল বিশ্বের সাহিত্যচেতনার কেন্দ্রভূমিতে। তাই "বাংলা সাহিত্যে বাঙালী গৌণ হইয়া বিশ্ববাসী প্রধান হইয়া উঠিল।" গুপ্ত কবির এই-কালে হ'ল যাত্রা সুরু এবং বাঙালীর প্রাণের ভাষা শেষবারের মতো ধ্বনিত হয়ে উঠল তাঁর কবিতায়। তাই তিনি বাংলার শেষ কবি।

৩

উনিশ শতকের সুরুতে হল বাংলা গদ্য ভাষার জন্ম। গদ্য হ

বুদ্ধিজীবীদের ভাষা। যুক্তি-বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গদ্য ভাষার প্রয়োগ অনিবার্য। রামমোহনের মধ্যে ঘটল তার অবধারিত প্রকাশ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Anglicist দলের জয়লাভে এদেশীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তন সূচিত হলো। পুরোপুরিভাবে ইংরাজী শিক্ষা চালু হলো এদেশে। ইতিপূর্বে কলকাতার দেশনায়কেরা হিন্দু কলেজ (১৮১৭ খৃঃ) প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছেন। অচিরেই এই শিক্ষার ফল আত্মপ্রকাশ করল। কলকাতার সমাজে দেখা দিল ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব। রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের মতবাদের সঙ্গে প্রচলিত সংস্কারের হ'ল বিরোধ। আর এই বিরোধের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করল হিন্দু কলেজের তৎকালীন ছাত্রদল আর য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলাফল। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ঢেউ শিক্ষিত বাঙালীকে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা থেকে বিচ্যুত করে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দিকে সজোরে নিক্ষেপ করল। তার অন্যতম কারণ —নতুন শিক্ষার মূলে ছিল স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা। সমকালীন শিক্ষকেরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও বিশ্ব-মানবতাকে জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক ডিরোজিও ছিলেন তার মূর্তপ্রতীক। ডিরোজিওর মানস-জীবন ও চরিত্র গড়ে উঠেছিল ফরাসী বিপ্লবের মূলভিত্তি যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে কেন্দ্র ক'রে। ডিরোজিওর অসাধারণ প্রতিভা ও উদার মানবতার প্রভাবে ছাত্রদল আত্মহারা হয়ে পড়লেন। শুরু করলেন ধর্ম ও সমাজের চিরাচরিত ধারাকে আঘাত হান্‌তে। সৃষ্টি হলো 'একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন।' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা। রামতনু লাহিড়ী,শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতৃরূপে উপস্থিত থাকিতেন।" হরমোহন চট্টোপাধ্যায় এই সভার সম্পর্কে লিখেছেন,—"The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates, their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people." ডিরোজিওর শিক্ষাদর্শ প্রাচীন ও নবীনপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করল। প্রকাশ্যভাবে শুরু হল ধর্মদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতা। ডিরোজিও আনলেন ইয়ং বেঙ্গলের কল্লোল।

উনিশ শতকের য়ুরোপীয় চিন্তা intuition বা আত্মপ্রত্যয়কে আশ্রয় করে মানুষের অভিজ্ঞতার মীমাংসা করতে চেয়েছিলো। তার প্রভাব পড়েছিলো নব্য ইংরেজীনবীশদের উপরে। ইংরেজীনবীশদের মত হ'ল দ্বিধা বিভক্ত। সৃষ্টি হ'ল দুটি দল। একদল হিন্দুধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে নাস্তিক হলেন। এঁদের দৃষ্টিতে জনকল্যাণই হ'ল সমাজনীতির মূল সূত্র। এঁরা সত্যনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র—'Such a boy is incapable of falsehood because he is a College boy." আর একদল প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারালেও অন্য ধর্মে বিশ্বাস হারালেন না। খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের সূত্র খুঁজতে তৎপর হলেন। প্রটেস্টেন্ট খৃষ্টান ধর্মে আঠার শতকের যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিছুটা স্থান আছে। তারই প্রেরণায় এইদল প্রটেস্টেন্ট খৃষ্টান ধর্মে আত্ম-সমর্পণ করলেন। হিন্দু সমাজে অনুভূত হল ভাঙনের ভূমিকম্প। হিন্দু সমাজ সন্ত্রস্ত হল। রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দুনেতারা এই নতুন ভাব বন্যার হাত থেকে গতানুগতিক হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে তৎপর হলেন। সমাজের অন্তরে তিনটি ধারা ভিন্ন খাতে বইতে সুরু করল।

(১) বিশুদ্ধ বেদান্তবাদী পুরাণ বিরোধী রামমোহন প্রবর্তিত মত-ধারা।

(২) ডিরোজিও নীতি প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গলের কল্লোলিত ধারা।

(৩) রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিপোষণায় হিন্দুধর্মীয় ধারা।

সমাজের অন্তরে সুরু হল এক অসহ্য যন্ত্রণা। সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতির চিরাচরিত ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রবল বন্যা এসে সমাজের অন্তরে অসংখ্য সংঘর্ষবহুল তরঙ্গের সৃষ্টি করল। এই সীমাহীন অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত আবির্ভূত হলেন। হাতে তীক্ষ্ণধী লেখনী, কণ্ঠে অসহ্য শ্লেষ ও বিদ্রূপ। অস্ত্র—'সংবাদ প্রভাকর।' সমকালীন দেশকাল তাঁর শিল্পী-মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সংঘর্ষ লগ্নে দাঁড়িয়ে তিনি দ্বন্দ্বমুখর যুগটি নিরীক্ষণ করেছেন। তাই অতীত ও ভবিষ্যতের ভাব রশ্মির বিভায় তাঁর মন সমআলোকিত।

কবি ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। তাই নিজেকে একটি দলে অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাসী স্বদেশানুরাগী হিন্দু কবি বিনা দ্বিধায় হিন্দুধর্মের মত ও পথকে বরণীয় করলেন। বঙ্কিমের কথায় "তিনি হিন্দু ছিলেন…বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে তাঁহার যে বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল তাঁহার প্রণীত গদ্য পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়।" কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে তৎকালীন প্রগতির অস্তিত্ব ও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিম বলেছেন, "এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন…এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন।" প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক মার্জনা এই দ্বৈতধারার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কবি-ধর্ম আন্দোলিত। ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও আধুনিক প্রগতির সমন্বয় ঘটেছিলো। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে, প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ ও নীতির বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এবং যাঁরা বিরোধিতা করেছেন তাঁদের কোনদিনও তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি।

ঈশ্বরগুপ্তের অকৃত্রিম দেশপ্রেম তাঁর কবিতায় বিভিন্নরূপে ব্যক্ত

রেছে। বাংলার ফল ফুল, স্ত্রীপুরুষ, উৎসব আন্দোলন, বাংলার প্রাকৃতিক বচিত্র্য ঋতুর ঐশ্বর্য তাঁর কাব্যে উল্লেখজনক স্থান পেয়েছে। দেশকে তনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতি, সাহিত্য ও তিহ্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। সেই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার শেই তিনি প্রাচীন কবিদের জীবনী সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাচীন কবি সম্পর্কে তিনি লেখেন,…"আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে উক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।" (সংবাদ প্রভাকর: ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৫)।

ঈশ্বরগুপ্ত মানব দরদী কবি। মনুষ্যত্বের পূজারী। জাতিবিচারের প্রেকাপটে মনুষ্যত্বের অকাল বিনাশ তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। অথচ উপায়হীন ঈশ্বরচন্দ্র। মানুষ মাত্রই ভগবানের সন্তান এটাই তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের পরম উপলব্ধির বশে মানুষের কাছে জানালেন তাঁর আবেদন—'জগতে হাঁড়িমুচি সবাই শুচি সমভাবে সবে।' সমাজে কতই কদর্য ঘটনা ঘটে। মানুষ কুপথগামী হয়—রমণীও বালক হত্যা করে। সুরু হয় বিভীষিকার রাজত্ব। কবি ব্যথিত হন এই মনুষ্যত্ব বিনাশী আচরণে। এই পাপধারা কে রোধ করার কোন প্রচেষ্টা নেই,—না মানুষের পক্ষে, না শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে। শুধু কবির অভিমানাহত মন আছড়ে পড়ে ঈশ্বরের দরবারে—'নিজবলে দুষ্টদলে রসাতলে দেহ'। কিন্তু ঈশ্বর মূক হয়ে একেবারে নীরব। অভিমানে ভরে ওঠে ঈশ্বরচন্দ্রের মন। ঈশ্বরগুপ্ত কৌলিন্য প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাই ব্যঙ্গ, এ য কুল কুল নয় সার সার আটি। কৌলীন্য প্রথার সৌজন্যে বহু বিবাহ সামাজিক জীবনে বীভৎসতার সৃষ্টি করেছিল। কুলের সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষপাতী তিনি নন। কারণ, শতেক বিধবা হয় একের মরণে। বেদনাহত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রার্থনা যখন মানুষের কানে পৌঁছায় না, তখন তিনি কণ্ঠ উত্তোলন করেন শূন্যের দিকে, ঈশ্বরের দরবারে ;—'হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার। এদেশের কুলধর্ম করহ সংহার। শুধু কবির অভিমান ক্ষোভে পরিণত হয়। কবি এখানে আধুনিক, এখানে সংস্কারক প্রগানে অগ্রগামী।

সমাজব্যবস্থায় নারীকে প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বিধবা বিবাহ নারীর পবিত্র সতীত্বে আঘাত হানবে এই তাঁর ধারণা—'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে, সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে। এ ক্ষেত্রে যুগের নির্দেশ তিনি মেনে নিতে পারেননি। বিধবা বিবাহের ফলে হিন্দু নারীর সতীত্ব তথা পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। এ ছিল তাঁর পক্ষে অসহনীয়। দেশকাল ও যুগের নিয়মধর্মের উর্ধ্বে ঈশ্বরগুপ্তের সংস্কারবাদী মনের দুরন্ত অভিব্যক্তি আধুনিক জনসমাজে হাস্যোদ্রেক সৃষ্টি করে মাত্র। কিন্তু ধর্মের অনুশাসন যেখানে কঠিন সেখানে তিনি অসহায়। আর স্ত্রী শিক্ষা? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু কেন? যে ইংরাজী শিক্ষা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে সেই শিক্ষা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রচার করার পক্ষপাতী তিনি নন। হিন্দুর প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসী ঈশ্বরচন্দ্র নারীদের মধ্যে দেশীয় আদর্শে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা নারীর কর্তব্যের পথে অচলায়তন সৃষ্টি করবে। ব্রতধর্ম বিসর্জন দিয়ে তারা নিজেদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য চ্যুত হবে। তাই এই বিরোধিতা—'আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রত কর্ম, করত সবে, একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে।' ঐ শিক্ষার বিরোধিতা নয়—শিক্ষানীতির বিরোধিতা। দেশে ধর্মান্তরণের কাজ চলেছে তখন ব্যাপক ভাবে —ঈশ্বরগুপ্তের মন শিশুহারা মাতা আর পতিহারা পত্নীদের কথা ভেবে মুহ্যমান। জননীর হৃদয় ভাণ্ডার শূন্য করে তারা নিঃসংকোচে সাধের কুমারকে হরণ করে। আর বাক্যের কুহক যোগে যীশুমন্ত্র ছেড়ে যুবতী বুকচিরে পতিলয় কেড়ে। 'কামিনীর কোল শূন্য'। তাই বিলাপের ধ্বনি কবির মনকে সিক্ত করে তোলে। আর কবির উপলব্ধি দুঃখের বরষায় স্নাত হয়—কণ্ঠস্বর বেদনায় রুদ্ধ হয়ে আসে, যখন দেখেন—নীলকরের দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারে বাঙালী, "অন্ন বিনে অনাহারে প্রাণে মরে।" রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আপন প্রার্থনা পৌঁছে দেন—'ওমা কুইন তোমার ইণ্ডিয়াধাম রুইন কোরো নাক।'

বাঙালীকে ঈশ্বরগুপ্ত ভালবাসতেন তাই তাদের অধঃপতন তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলত। শুধু রঙ্গরসেব নয়, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে তিনি বাঙালী জাতির চারিত্রিক রূপটি স্পষ্ট করে তুলতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বাস্তববাদী মনে গভীর স্পর্শ তাঁর কবিতার স্তরে সাজান। এক কথায় "ঈশরগুপ্ত এবং ঈশরগুপ্ত ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।"

॥ ৪ ॥

ঈশরগুপ্তকে আজও আমরা প্রধানত তাঁর লঘু হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে স্মরণ করি। তাঁর তপসে মাছ, পাঁঠা, আনারস, হেমন্তের বিবিধ খাদ্য। পৌষপার্বণ, বিবিজান চলে যান লবেজান করে, বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে প্রভৃতি বিষয় ও প্রবাদানুরূপ উক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মনের দর্পণে ঈশরগুপ্তের একটি অপূর্ব রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। ধর্ম ও দেবানুসৃত সাহিত্যের রাজত্ব থেকে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে মুক্তি দিলেন বাস্তবজীবনের আবহাওয়ায়। নেমে এলেন প্রকৃতি ও মানুষের অঙ্গন তলে। যে যুগ সমাজকে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল সে যুগের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত থাকতে পারলেন না। তাই সমাজ ও ধর্মের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও তাঁর হাতে মুক্তি পেলো। রূপ বৈচিত্র্যে নয়—বিষয়বৈচিত্র্যে।

'তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন।' বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র। 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে' তিনি নিজে যা দিতে পারেননি এ যুগের বিশ্ব-কবির অনুসন্ধিৎসার মতো তিনিও সেই বস্তু খুঁজে ফিরেছেন। নিজে যা দিতে পারলেন না তার সার্থকরূপ দেখতে চেয়েছেন উত্তরসূরীদের সৃষ্টিতে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি সাহিত্য স্রষ্টারা ঈশ্বর গুপ্তকে গুরুপদে বরণ করলেন। তাঁর

পোষণায় বাংলা সাহিত্যে নব যুগ আনতে তৎপর হলেন। কীর্তির চেয়ে মহৎ হয়ে রইলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র। কিন্তু কালচক্রের কঠিন ঘর্ষণে গুপ্ত কবির সাহিত্য কর্ম আজ পিষ্ট হয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে চলেছে। প্রতিভাবান স্রষ্টার সৃষ্টি পলিরূপে সঞ্চিত হয়ে গুপ্ত কবির কাব্য রঙ্গ-ভূমির স্তর প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়েছে। সেই যুগেই, তাঁর মৃত্যুর কিছু-কাল পরেই কাব্যমঞ্চ থেকে তাঁর সুসজ্জিত শূন্য আসন অন্তর্হিত হয়েছিলো। শ্রীমধুসূদনের আবির্ভাব তাঁর সৃষ্টিকে অকস্মাৎ তলিয়ে দিলো বিস্মৃতির নিভৃত কন্দরে। কিন্তু মধু কবি বিস্মৃত হননি কাব্য ব্রজধামের 'রাখালরাজ'কে। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করেছেন, আর খেদ করেছেন—

এই ভাবি মনে
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে
তব চিন্তা ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে
স্নেহ শিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে ?

কাব্যসত্যের কঠোর বিচারে গুপ্ত কবির কবিতা ক্ষতজর্জর, অনাদৃত, অবলুপ্ত প্রায়। কিন্তু অতীতের সাধন ভূমিতেই বর্তমানের অধিষ্ঠান, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই কাব্য ব্রজধামের 'রাখাল-রাজ'কে অস্বীকার করা আর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত হানা একই কথা।

মালাবর হিল

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ বার-এট-ল

আজকাল নানাকাজে আমাকে প্রায় বোম্বাই যেতে হয়। বোম্বাই আমার খুব ভাল লাগে তাই কাজ মিটে গেলেও আমি সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করি। কলকাতায় একঘেয়ে কর্ম্মব্যস্ত জীবনে যখন ক্লান্তি আসে তখন আমার মন ছুটে চলে যেতে চায় বোম্বাই নগরীতে। আরব সাগরের কূলে, সমুদ্র ও পাহাড়ের বিচিত্র সমাবেশে বোম্বাই নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করে। এখানে সমুদ্রতীরে নবনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর সৌধরাজি দেখলে মনে হয় যেন ইহা ইউরোপের অংশ। এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির অপূর্ব্বসমাবেশ। সকালে আরব সাগরের কূলে গেট ওয়ে অব ইণ্ডিয়ার নিকট ভ্রমণ অতি মনোমুগ্ধকর। সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বোম্বাই এর বিখ্যাত তাজমহল হোটেল যাহা জল পথে ভারতবর্ষ প্রবেশের সময় ভ্রমণকারীর প্রথম দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। বৈকাল ও সন্ধ্যায় আরব সাগরের তীর দিয়ে বিখ্যাত মেরিণ ড্রাইভ রাজপথ অতিক্রম করে, চোপাটি বিচ পার হয়ে মালাবার হিলসের উপর বেড়াতে আমার খুব লাগে। সে সময় অস্তগামি সূর্য্যের শোভা ও বিচিত্র রংএর ছটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। বোম্বাই এ যার গৃহে আমি অতিথি তার সঙ্গে আমার অতি মধুর সম্পর্ক। সমস্ত দিনটা হাস্যরস পরিবেশের মধ্য দিয়ে কোথায় যে কেটে যায় বোঝা যায় না। তাদেরই গাড়ী নিয়ে আমি যেখানে খুশী বেড়াতে যাই, কখনও ওরা সঙ্গে থাকে ; কখনও আমি একাই সুদূরের পথে পাড়ি দিয়ে ফিরে আসি। গতবার আমি যখন বোম্বাইএ ছিলাম তখনও আমি প্রতি সন্ধ্যায় আমার অতি প্রিয় মালাবার হিলসে বেড়াতে যেতাম। সেই এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা ও তার বিচিত্র পরিবেশের কথা আজ লিখছি। ড্রাইভার গাড়ী ছুটিয়ে চলল মেরিন ড্রাইভের উপর দিয়ে সেখানে অগণিত স্ত্রীপুরুষ সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে, বালক-বালিকার বালুর উপর খেলছে। চোপাটি বিচ পার হয়ে গাড়ী ঘুরে ঘুরে মালাবার হিলসে উঠলাম, অবশেষে কমলা নেহেরু উদ্যানের পাশে এসে গাড়ী থামল। অভ্যাসমত আমি প্রথমে পিরোজশাহ মেহটা গার্ডেনস বেড়ালাম তারপর কমলা নেহেরু উদ্যানে এলাম। সমস্ত বাগানটি ঘুরলাম—সেখানে মরাঠি গুজরাটি পার্শি প্রভৃতি মেয়েদের সঙ্গে বাঙ্গালী মেয়েরাও বেড়াচ্ছেন—ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে—প্রকৃত পক্ষে এটি ছোট ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া উদ্যান। বেড়ান শেষ হলে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। বোম্বাইএর আভিজাত্যের কেন্দ্রস্থল মালাবার হিলসের উপর কমলা নেহেরু উদ্যানের রমণীয় পরিবেশে বসে, নিম্নে আরব সাগরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখছিলাম। পাহাড়ের তলায় সমুদ্রস্নানে রত অসংখ্য নরনারী, আর অল্পদূরে সমুদ্রবক্ষে শ্বেতপাল তুলে ছোট ছোট নৌকা বা ইয়াটগুলি ঢেউএর সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে আরব সাগরের উপর সন্ধ্যা নেমে আসছে, একা বসে কত কথাই ভাবছে। আমার মন বার বার ছুটে চলে যাচ্ছিল সেই তিরিশ বছর আগের একটি দিনে যখন ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রমের সহিত প্রথমবার মালাবার হিলস দেখেছিলাম। তারপর দীর্ঘ অদর্শনের পর অনেকবারই দেখলাম। মালাবার হিলসের সেই আভিজাত্যের মুখোস খসে পড়েছে ফ্যাসনেবল লোকের বসবাস থাকলেও তার ভিতরে ও বাহিরে জীর্ণতা এসে পড়েছে আগে মালাবার হিলস ছিল অল্পসংখ্যক ধনী ও বিলাসীর প্রমোদ কানন। এখন উহা সর্ব্বস্তরের লোকের ভ্রমণ কেন্দ্র এবং সেই হিসাবে সমাজে কল্যাণকর স্থান নিয়েছে। মালাবার হিলসের উপরে বসে আরব সাগরের দৃশ্য উপভোগ কালীন এই যে নিভৃতচিন্তা ইহাও এক প্রকার বিলাস।

গত তিরিশ বছরের ঘটনাবলী মনে উঁকি দিচ্ছিল, কত দেখলাম, কত পেলাম, কত হারালাম। সেই সব পুরাতন দিনের বন্ধুদের কথা মনে পড়ছিল যাদের সাহচর্য্যে এসে একদা জীবন রঙ্গীন ও মধুময় হয়ে উঠেছিল, আজ সংসারের মরুপথে তারা কোথায় হারিয়ে গেল। কাহারও সঙ্গে বা মাঝে দেখা হয় কিন্তু বেশীর ভাগ কোথায় তলিয়ে গেল। একা বসে এলোমেলো কত চিন্তাই না করছি এমন সময় বাগানে আলো জ্বলে উঠল, হঠাৎ দেখলাম ছোট ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া ও কাকলি থেমে গেছে। দূরে মেরিণ ড্রাইভের বিশাল সৌধরাজির আলোকমালা দেখা যাচ্ছে। অল্পদূরে অন্য বেঞ্চিতে বসে আরও অনেকে মুক্তবায়ু সেবন করছেন। কেহ বা আমার মত একা, আবার অনেকে যুগলে আছেন। এমন সময় অতি নিকটে একটি সুশ্রী সুবেশা তরুণীকে দেখে আমার চমক ভাঙ্গল। মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় আমাকে বলল, "নমস্কার, আপনি কি বাঙ্গালী? মেয়েটিকে অপরূপ সুন্দরী বলা যায় না, তবে তার সুষমামণ্ডিত মুখশ্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাকে কথা বলতে না দেখে মেয়েটি আবার বলল, "আমরা বাঙ্গালী, আমার বাবা ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করেন, বোধহয় আপনারা উভয়ে পূর্ব্বপরিচিত।" ইহার পর আর চুপ করে থাকা অভদ্রতা বুঝে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার বাবার কি নাম, কোথায় তিনি বসে আছেন"? মেয়েটি তার বাবার নাম বলল শ্রীতুষারলাল চট্টোপাধ্যায় এবং অল্পদূরে একজনকে দেখিয়ে দিল। অতি পরিচিত নামটা শুনে আমি চমকে উঠে বললাম, "আপনার বাবার নিকট নিয়ে চলুন"। কাছে গিয়ে দেখলাম আমার প্রবাসজীবনের অতিপ্রিয় বন্ধু তুষারলাল। আমাকে দেখে তুষার উঠে দাঁড়িয়ে তার বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সুরেশ, আমি দূর থেকে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তুমি পুরোপুরি কলকাতার বাসিন্দা, কি করে মালাবার হিলে এলে এইটা বুঝতে না পেরে সন্দেহ হল হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, আমি হয়ত ভুল দেখেছি। কিন্তু যতই তোমাকে দেখছিলাম ততই তোমার কথা বারবার মনে পড়ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন আজ তোমার মত বন্ধুকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন।" আমরা বেঞ্চিতে বসলাম, তুষার তার মেয়ের পরিচয় দিয়ে বলল যে তার নাম দেবলা, আর আমি তার কাকাবাবু হই, যেহেতু তুষারের থেকে আমি দুবছরের ছোট। দেখলাম তুষারের চুল সাদা হয়ে গেছে। শরীরে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন। তুষারের সঙ্গে পুরাতন দিনের গল্প আরম্ভ হল। তার প্রথম জীবনের ইতিহাস আমার অপরিচিত নহে। ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষাসমাপ্ত করে তুষার দেশে ফিরে এসে অল্পদিনের মধ্যে নাচগান শিল্পকলার এক নূতন যুগ সৃষ্টি করেছিল যাহা সারা ভারতে ও ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এসকল কাজে তার প্রধান সহায় ছিলেন বিখ্যাত মরাঠী শিল্পী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রেমলা দেবী। ওদের দুজনের সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারপর ওরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হল। ওদের বিবাহের পরই কলকাতায় একটা পার্টিতে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তুষার তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, "আমার বিশেষ বন্ধু, অত্যন্ত ভাল ছেলে, কিন্তু কোনদিন নাচতে শিখল না। তুমি ওকে নাচ শেখাবে?" ইহার পর ওরা আমাদের বাড়ীতেও এসেছিল কয়েকবার। তারপর দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে দেখা না হলেও খবরের কাগজের পাতায় তাদের শিল্পীপ্রতিভার পরিচয় পেতাম। কিছুদিন পরে শুনেছিলাম যে একটি কন্যা রেখে বিখ্যাত আর্টিষ্ট প্রেমলাদেবী অকালে পরলোকগমন করেছেন এবং তাঁর স্বামী শিল্পীর জীবন ছেড়ে দিয়ে একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বোম্বাইএ স্বগৃহে বাস করছেন। আমি তুষারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মেয়েকে এমন সুন্দর বাঙ্গলা শেখালে কোথা থেকে?" সে বলল, "দেবলা বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গলা না বলবে কেন। তারপর জানাল যে দেবলা প্রায় দশবৎসর শান্তিনিকেতনে পড়েছে এবং সঙ্গীত ও নানাবিধ শিল্পকথায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছে এবং তার খুব ইচ্ছা যে সে ছবি আঁকা আরও ভাল করে শিখতে ইউরোপের বিভিন্ন কলাকেন্দ্রে যায়, কিন্তু তুষারের শরীরের অসুস্থতার জন্য তা পারছে না। তারপর মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিবাহ সে দিয়ে যেতে চায়, তার নিজের জীবনের উপর আর আস্থা নাই। সে বড় অসুস্থ। আমরা অনর্গল কথা বলছিলাম, তার মধ্যে দেবলা বলল, "বাবা, তুমি আজ এত কথা বলছ, তোমার হার্টের অসুখ বেড়ে যেতে পারে। তার চেয়ে কাকাবাবুকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল। তুমি ঔষধ খেয়ে বিশ্রাম করবে। তারপর কাকাবাবু আমাদের সঙ্গে রাত্রিভোজন করবেন, তাঁকে আমরা বাড়ী পৌঁছে দেব।" আমি ইতস্তত করছিলাম যে আমার যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে, এইবার বাড়ী না ফিরলে আমার আত্মীয়া খুব চিন্তিত হয়ে পড়বে। আমায় চিন্তিত দেখে দেবলা বলল, "আপনি ভাববেন না, আপনার গাড়ীর নম্বরটা বলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি।" তাকে গাড়ীর নম্বরটা বলতেই সে বাগানের বাইরে গিয়ে আমার ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে এল। ড্রাইভার এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই আমি তাকে বললাম সে গাড়ী নিয়ে ঘরে ফিরে যাক এবং মেমসাহেবকে জানাক যে এখানে আমার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আমি তাদের বাড়ী যাচ্ছি, সেখানেই রাত্রে খাওয়া হবে ও তারা গাড়ী করে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে, মেমসাহেব যেন আমার জন্য চিন্তিত না হন। ড্রাইভার চলে গেল। তুষার, দেবলা ও আমি ধীরে ধীরে বাগান থেকে বেরিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠলাম। আমাদের নিয়ে তুষারের গাড়ী মালাবার হিলসের অপর একদিকে একটি সুন্দর বাগানবাড়ীর গেটের ভিতর প্রবেশ করল। গৃহসজ্জার ব্যবস্থাপনা ও সৌন্দর্য্য দেখে বুঝলাম যে প্রকৃত শিল্পীর বাড়ীতে এসেছি। ড্রইংরুমে বসলাম, তুষার ঔষধ খেয়ে কিছু সুস্থ বোধ করল। তারপর খাওয়ার টেবলে বসে আমরা গল্প করতে লাগলাম। তুষার বলল, "প্রেমলা ও আমি শিল্পী জীবনে যা কিছু রোজগার করেছিলাম তার অনেকখানি খরচ করে এই বাড়ী কিনে মনের মত করে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলাম, এর কিছু দিনের পরেই প্রেমলার অকালমৃত্যু হয়। তখন থেকে দেবলা ও আমি এই বাড়ীতেই আছি। বিশেষ কোথাও যাই না।" তুষারের কথায় দেবলা আমাকে তার মার ঘরে নিয়ে গেল। এই ঘরে সব কিছুই প্রেমলা দেবীর নিজহাতে সাজান। তাঁর ব্যবহৃত

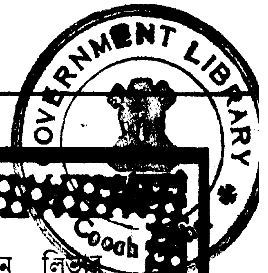
পোশাক পরিচ্ছদ সব সাজান রয়েছে । তাঁর তৈলচিত্রে টাটকা ফুলের মালা ঝুলছে। ধূপ ও ফুলের গন্ধে মনে হচ্ছিল এটা যেন একটা পূজার ঘর—শিল্পীর সাধনার উপযুক্ত স্থান। রাত বাড়তে লাগল, আমি বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হলাম। তুষার বলল, "আজ এত বছর পরে তোমাকে কাছে পেয়ে এত ভাল লাগছে কি আর বলব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা আছে, আজ কতটুকু বলার সুযোগ পেলাম। আমার হার্টের অসুখ খুব বেশী, কখন কি হয় বলা যায় না। একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। দেবলার বয়স প্রায় উনিশ। আমার মৃত্যুর পর কে তাকে দেখবে? এই বাড়ী ছাড়া আমার আরও একখানি বাড়ী আছে ও ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সে সমস্তই দেবলার। তাকে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত করেছি। সে তার মার মত সুন্দরী না হলেও দেখতে ভালই। অনেকে তার পাণিপ্রার্থী হয়ে আছে, কিন্তু আমি মনস্থির করতে পারি না আর দেবলাও আমাকে ছেড়ে যেতে চায় না। আর আসল কথা তোমাকে বলি, আমার ও দেবলার ইচ্ছা বাঙ্গালীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তুমি চেষ্টা করলে ব্যবস্থা করতে পারবে। আজকাল ত আমাদের সমাজ অনেক উদার হয়েছে। সেরকম শিক্ষিত উদারহৃদয় বাঙ্গালী যুবক কি পাওয়া যাবে না যে আমার দেবলাকে সাদরে গ্রহণ করতে সম্মত হবে?" বিদায় নেবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। তুষার আমার ডান হাতটা তার মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার বলল, "ভাই, তুমি আমার অনুরোধ রাখবে ত? দেবলাকে উপযুক্ত স্বামীর হাতে সমর্পণের ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলাতে তুষার একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, "যদি তোমার কষ্ট না হয়, যে ক'দিন তুমি বোম্বাই-এ আছ আমাদের বাড়ীতে রোজ বৈকালে এলে আমরা খুব আনন্দিত হব। আমার শরীর অসুস্থ, রোজ বেড়াতে যেতে পারি না। ভাগ্যিস আজ দেবলার পীড়াপীড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার মন বলছে, তোমাকে যখন হাতের কাছে পেয়েছি তখন তুমি দেবলার জন্য যাহা করা উচিত করবে।" দেবলা আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমার টেলিফোন নম্বরটা জিজ্ঞাসা করে রাখল। বারবার করে বলল আগামীকাল যেন তাদের বাড়ী আবার যাই। গাড়ী ছেড়ে দিল। তখন একবারও ভাবি নাই যে আগামীকালের মধ্যে অনেক কিছু ঘটবে আর আমি তাহাতে জড়িত হয়ে পড়ব। তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। প্রায় রাত সাড়ে এগারটায় বাড়ী পৌঁছালাম। আমার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে ড্রইংরুমে বসে আমার আত্মীয়রা—অর্থাৎ আমার ছোট শালী রত্না ও তার স্বামী সমীর। আমাকে দেখেই রত্না বলে উঠল, "আমি ত ভাবলাম যে জামাইবাবু বুঝি কোনও বোম্বাই সুন্দরীর কবলে পড়েছেন। রোজ রোজ আপনার একা মালাবার হিলসে বেড়ানর পেছনে একটা রহস্য দেখা যাচ্ছে—ব্যাপারটা যদি খুলে না বলেন তবে দিদিমণিকে কলকাতায় জানাতে হবে।" আমি তখন সন্ধ্যা থেকে যা কিছু ঘটেছে সব বললাম, আমার শিল্পী বন্ধুর নাম, তার পরলোকগত স্ত্রীর নাম ও তাদের মেয়ের কথা বললাম এবং আরও বললাম যে তোমরা সকলে চেষ্টা করে দেবলার জন্য একটি ভাল বাঙ্গালী পাত্র ঠিক করে দাও। রাত প্রায় একটার সময় শুতে গেলাম। রাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল পাশের ঘরে টেলিফোনের আওয়াজে ও সমীরের ডাকে। ঘুমের ঘোরে শুনলাম মালাবার হিলস থেকে দেবলা আপনাকে ডাকছে বিশেষ জরুরি দরকার। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটা। কোনরকমে উঠে টেলিফোনটা ধরতে দেবলা বলল যে আমি রাত্রে চলে আসার পর সে তার বাবাকে ঘুমের ঔষধ খেতে দেয়, তুষার ঘুমুতে পারছিল না, তাকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। তারপর একটু ঘুমিয়েছিলেন, ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেবলাকে ডাকেন। দেবলা গিয়ে দেখে তার বাবা নিশ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছেন। তখনই সে ফোন করে ডাক্তারকে আনার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছে। তার খুব ভয় হয়েছে, তাই এত রাত্রে আমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকেছে, যদি গাড়ী পাঠায় আমি তাদের বাড়ী যেতে পারব কিনা জানতে চাইছে। দেবলার কথা শুনে আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। "ভয় পেও না" বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে গাড়ী পাঠাতে বারণ করে বললাম আমি এখানকার গাড়ীতেই যাচ্ছি। এমন সময় রত্না এসে বলল, "জামাইবাবু, চা খেয়ে পোশাক পরে নিন, আমিও তৈরী হচ্ছি, আপনার সঙ্গে যাব।" সামনে বিপদ বুঝতে পেরে আমিও নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, রত্না সঙ্গে যাবে শুনে সাহস পেলাম। তাকে বললাম, দেবলা একলা, যদি কোনও কিছু ঘটে তুমি সঙ্গে থাকলে তাকে সামলাতে পারবে।" সমীর গাড়ী চালিয়ে আমাকে ও রত্নাকে যখন মালাবার হিলে দেবলাদের গেটের সম্মুখে নামিয়ে দিল তখন পাঁচটা বাজল। ড্রইংরুমে ওদের ডাক্তার বসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন। "আপনি এসেছেন ভালই হল দেবলা একা। মিঃ চাটার্জ্জি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, বোধ হয় আর জ্ঞান ফিরবে না। ডাক্তারের পক্ষে যাহা করা সম্ভব সব করা হয়েছে, এখন সবই অদৃষ্ট।" ডাক্তার চলে গেলেন। দেবলার সঙ্গে আমি ও রত্না তুষারের ঘরে গেলাম। মনে হল তুষারের জ্ঞান ফিরে আসছে, আমি তার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম, সে যেন আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করে বালিসে ঢলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। পাশে নার্স দাঁড়িয়েছিল, পরীক্ষা করে বলল যে হার্টফেল করে মিঃ চাটার্জ্জি মারা গেছেন। দেবলা তার বাবার বুকের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল। আমি রত্নাকে বললাম, "তুমি দেবলাকে দেখ, আমি আর এই ঘরে থাকতে পারছি না।" ড্রইংরুমে এসে বাড়ীতে ফোন করে সমীরকে এখানকার বিপদের কথা জানালাম। ফোন শেষ করে আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে গত বার ঘণ্টার ঘটনাবলী ভাবছিলাম। তখনও পাশের ঘর থেকে দেবলার কান্নার শব্দ পাচ্ছিলাম। মাত্র বার ঘণ্টা আগে হঠাৎ বহু বর্ষ পরে তুষারের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, আর এখন সে বেঁচে নাই, যেন আমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার জন্য বেঁচেছিল। তুষার সমস্ত ভার আমার উপর ফেলে দিয়ে চলে গেল। এখন আমি কি করব সেই চিন্তাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। বেলা বাড়তে লাগল, আমি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে দেবলার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়াতেই সে আবার কাঁদতে লাগল।

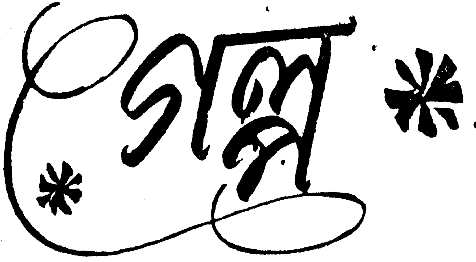
আমার ইঙ্গিতে রত্না তাকে বিছানা থেকে ডেকে তুলে ড্রইংরুমে নিয়ে এল। দেবলাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে আত্মীয়স্বজন বলতে কেহ নাই, তবে তার বাবার কয়েকজন বন্ধু আছেন। তাঁদের নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে ফোন করে খবর দেওয়া হল। তাঁরা এসে তুষারের শেষ কৃত্যাদির সব ব্যবস্থাই করলেন। আমি ভাবছিলাম দেবলার ভবিষ্যৎ, এই শূন্য পুরীতে সে একা কেমন করে থাকবে। এমন সময় পরিচিত গাড়ীর হর্ণের শব্দ কাণে এল, সঙ্গে সঙ্গে সমীর ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। সমীর ও রত্নার মধ্যে কি কথা হ'ল, রত্না আমার কাছে এসে বলল, "জামাইবাবু, আমার ইচ্ছা যে দেবলাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই, সে আমাকে মাসিমা বলে ডেকেছে, তাকে আমি একা এই শোকের পুরীতে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করি না। এখন দেবলা আমাদের সঙ্গে চলুক, তারপর রাত্রে কলকাতায় দিদিমণিকে ফোন করে তাঁকে আসার জন্য বলব, তিনি এলে পর মেয়েটার সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন, আপনাকে এত ভাবতে হবে না।" আমি বললাম,—"ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম, তুমি আমাকে মহা সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছ, কিন্তু কথা হচ্ছে দেবলা কি আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে।" দেবলাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমি বললাম, "মা দেবলা, তোমার বাবা যে এমন হঠাৎ চলে যাবেন তাহা আমি একবারও ভাবি নাই। তোমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে, তুষার সেই ভার আমাকে দিয়ে গেছে। তুমি খুব ব্যথা পেয়েছ। তোমাকে একলা এই নির্জ্জনগৃহে ফেলে রেখে চলে যেতে আমাদের মন সরছে না, তাই বলছি তুমিও দিনকতকের জন্য আমাদের বাড়ী চল, সেখানেই থাকবে, মনটা একটু শান্ত হলে তারপর ফিরে আসবে।'' দেবলা প্রথমে আপত্তি করেছিল যে সে তার বাবার স্মৃতি-মন্দির থেকে চলে যেতে চায় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রাজী হল, আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম। বাড়ীতে পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যরা রইল। রত্নার গৃহে ও তার স্নেহের স্পর্শে দেবলাকে অনেকটা শান্ত মনে হল। পরদিন সকালে দেবলার গাড়ী এল, আমি আর দেবলা তাদের বাড়ী ফিরে গেলাম, সেখানে কাজ ছিল। দেবলা তার বাবার সমস্ত কাগজপত্র ও ব্যাঙ্কের পাশবহি এনে দিল। দেখলাম তুষার বৈষয়িক ব্যবস্থা ভালই করে গেছে। তার ভাড়াটে বাড়ীটা থেকে মাসিক আয় হয় হাজার টাকা, উহাতে সংসার চলে। তুষারের অবর্ত্তমানে তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তার একমাত্র কন্যা দেবলা পাবে। ব্যাঙ্কের টাকা সমস্তই দেবলার নামে। একটা চিন্তা দূর হল—এদিক দিয়া কিছু করার নাই। আসল সমস্যা দাঁড়াল দেবলার ভবিষ্যৎ। বুঝলাম সে বিষয়ে এখনই কিছু করা বা বলা উচিত হবে না, কয়েকদিন যা'ক, তারপর কথা তুললেই হবে। এই ভাবে আমি ও দেবলা প্রত্যহ তাদের মালাবার হিলের বাড়ীতে যেতাম ও সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আবার আমাদের বাড়ী ফিরে আসতাম। ইতিমধ্যে তাঁর বোনের কাছ থেকে টেলিফোনে সব কথা শুনে আমার স্ত্রী বোম্বাই এসে পৌঁছলেন, দেবলাকে তাঁর খুব ভাল লাগল। একদিন দেবলা বলল, "কাকিমা যখন এসেছেন, চলুন এইবার কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবেন।" এখানে আমার স্ত্রীর স্নেহে ও যত্নে দেবলা আগের মত প্রফুল্ল হয়ে উঠল। দেবলা অল্পবয়সে মাকে হারিয়েছে, মায়ের স্নেহ ভালবাসা সে পায় নাই, তাই আমার স্ত্রীর স্নেহ ভালবাসা তাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। সে আমদের ছেড়ে যেতে চাইত না। দেখতে দেখতে প্রায় একমাস কেটে গেল, আমার কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য তাগাদা আসছিল। আমার স্ত্রী বললেন যে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না করে তিনি যেতে পারবেন না। সুপাত্রের হাতে দেবলাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হতে পারে? তাই একদিন রাত্রে খাওয়ার পর আমাদের বাড়ীর ড্রইংরুমে বসে আমি দেবলার বিবাহের কথা তুললাম। প্রথমে আমি দেবলাকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে তার পরিচিত মরাঠী যুবকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যাহাকে তার পছন্দ হয়। দেবলা মরাঠী মায়ের মেয়ে, বিনা দ্বিধায় বলল যে সে রকম কেহ নাই। সে একথাও জানাল যে বিবাহে তার আপত্তি নাই, তবে তার বাবার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে শিক্ষিত বাঙ্গালী শিল্পীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বুঝলাম সে রকম একটি বাঙ্গালী পাত্র খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হবে না, বিশেষ বোম্বাই যখন শিল্পকলা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। সে রাত্রে আর কিছু কথা হল না। দেবলাকে না জানিয়ে আমরা আমাদের কর্ম্মপন্থা চিন্তা করতে লাগলাম। সুযোগও এসে গেল। ঠিক সেই সময় বোম্বাইএ এক চিত্র প্রদর্শনীতে কয়েকজন নামকরা বাঙ্গালী চিত্র-শিল্পী যোগ দিয়েছিলেন। আমরা দেখতে গেলাম। সেখানে শিল্পীদের সঙ্গে আলাপও হল। তারপর এক সন্ধ্যায় দেবলার মালাবার হিলের বাড়ীতে শিল্পীদের এক সমাবেশ করা হল, তাহাতে আমরা শিল্পীদের অভিনন্দন জানালাম। দেবলা নিজে একজন কৃতী চিত্রশিল্পী, সে শিল্পীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল। কলকাতা থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ছাড়া বোম্বাইবাসী কয়েকজন শিল্পীও ছিলেন। দেবলার অসাধারণ চিত্র-শিল্প প্রীতি দেখে এবং শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে সে তার শোক দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে আবার হাস্যময়ী তরুণীতে পরিণত হয় দেখে আমরা তাকে উৎসাহিত করার জন্য মধ্যে মধ্যে কয়েকজন শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করে বাটীতে ডেকে আনতাম। উদ্দেশ্য ছিল যে এইভাবে মেলামেশার ফলে যদি দেবলার কাহাকেও পছন্দ হয় এবং অপর পক্ষে যদি বিশেষ কোনও বাধা না থাকে তবে উভয়ের মিলনের চেষ্টা করা। দেবলাদের নির্জ্জন গৃহ আবার হাস্যমুখরিত হয়ে উঠল। কয়েকদিন পরে আমার স্ত্রী বললেন, "দেখ, পার্থ নামে যে বাঙ্গালী ছেলেটি প্রায় আসে, মনে হয় তাকে যেন দেবলার পছন্দ হয়েছে, তার বিষয় একটু খোঁজ-খবর নাও।" শীঘ্র সুযোগ হল। পরদিন বৈকালে আমার স্ত্রী তাঁর বোনের বাটী গেলেন দেবলাকে নিয়ে। মালা-বার হিলের বাড়ীর বাগানে আমি একা বসে সমুদ্রের শোভা দেখছিলাম, এমন সময় বেয়ারা এসে কার্ড দিল, লেখা পার্থ মুখার্জ্জি, আর্টিষ্ট। তাকে বাগানে ডেকে আনতে বললাম। বেয়ারা আইসক্রিম দিয়ে গেল, আমরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ সুরু করলাম। পার্থকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে তার বাবা, মা, ভাইবোন কেহ নাই। শৈশব থেকে সে পরের

গৃহে ও পরের যত্নাতেই মানুষ হয়েছে ও সরকারি চিত্র বিদ্যালয় থেকে সসম্মানে সে পাশ করেছে, চিত্রাঙ্কনকে সে জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসে, তার একান্ত ইচ্ছা বোম্বাইএর নামজাদা চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করে তারপর ইউরোপের বিভিন্ন চিত্রশালাগুলি পরিদর্শন করে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটালীর আর্ট বিষয়ে পাঠ করবে ও হাতে কলমে শিক্ষা নেবে। আমি তাকে বললাম দেবলারও খুব ইচ্ছা চিত্রশিল্পী হওয়া। পার্থ দেবলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলল, যে, সে লক্ষ্য করেছে দেবলার মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা আছে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা পেলে সে খুব বড় আর্টিষ্ট হয়ে উঠবে। আমি পার্থকে দেবলার মার ও বাবার বিবাহের ইতিহাস, পরবর্তী জীবন এবং দেবলার বাবা তুষারলালের সঙ্গে আমার তরুণ বয়সের বন্ধুত্বের কথা সবই একে একে বললাম এবং ইহাও বললাম যে অদৃষ্ট মানুষকে কোথায় কিভাবে নিয়ে গিয়ে জড়িত করে তাহা কাহারও জানা থাকে না। আমি ত এদানিং বছরে দুই তিনবার বোম্বাই আসি ও বোম্বাই এ থাকলে মালাবার হিলে রোজ বৈকালে বেড়াতে যাই। তুষার তার মেয়েকে নিয়ে বোম্বাই বাস করছে জানতাম, কিন্তু অন্তবার আগে দেখা হয় নাই, এবারই আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল, তুষার আমাকে তার বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল, পুরাতন দিনের কত গল্পই হল। তখনও জানতাম না যে সেই শেষ কথা। তারপর তেমনই আকস্মিক ভাবেই দেবলার সব ভার আমাদের উপর এসে পড়ল। একা কি করব বুঝতে না পেরে কলকাতা থেকে আমার স্ত্রীকে ডেকে আনলাম। এখন দুজনে সব সময় চিন্তা করছি কি করে দেবলাকে একটি সুপাত্রের হাতে সমর্পণ করে পরলোকগত বন্ধুর প্রতি আমার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করতে পারি। আবার দেবলার মা মারাঠী হলেও দেবলা বাঙ্গালী ছাড়া অপর কাহাকেও বিবাহ করতে চায় না, নচেৎ দেবলার মত সর্বগুণালঙ্কৃতা মেয়ে—তার উপর তার আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে অনেক কৃতী যুবকই এগিয়ে আসবে তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে কিন্তু আমরা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে চাই না। পার্থ আমার কথাগুলি একমনে শুনছিল, হঠাৎ আমার কি খেয়াল হল আমি বলে উঠলাম—"আমি দেবলার জন্ত উপযুক্ত জীবন-সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছি অথচ আমার সামনেই সেইরকম সুপাত্র উপস্থিত রয়েছে।" আবেগভরে বললাম, "পার্থ, সে তুমিই, তুমি দেবলাকে গ্রহণ কর, তাকে সুখী কর ও আমাদের চিন্তার অবসান কর।" পার্থ বলল, "তার কিছু নাই। সে সামান্ত শিল্পী, দেবলা কি তাকে গ্রহণ করতে রাজী হবে?" আমি বললাম, "দেখ পার্থ, আমার বয়স হয়েছে। তোমাকে কয়েকদিন দেখে তোমার মধ্যে যে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির পরিচয় পেয়েছি তার বেশী দেবলার জন্ত আমরা আর কিছু চাহি না। সে বড় অভিমানিনী মেয়ে, তুমি স্নেহ, ভালবাসা ও মর্য্যাদা দিয়ে তার সকল ব্যথা দূর করে তাকে সুখী করতে পারবে, আর দেবলার মত মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেয়ে তোমার জীবন সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে—তোমরা দুটিতে হবে আদর্শ শিল্পী-দম্পতি।"

পার্থ বলল, "এত বড় দায়িত্ব গ্রহণের আমি উপযুক্ত কিনা তাহা ভাববার সময় দিন। ইতিমধ্যে আপনি দেবলার মত জানুন। আপনার চিঠি পেলেই আমি আবার আসব।" পার্থ বিদায় নিয়ে চলে গেল। রাত্রে আমি আমার স্ত্রীকে সমস্ত জানিয়ে বললাম তুমি সুবিধামত একবার দেবলাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ পার্থকে তার পছন্দ কিনা। পরদিন সন্ধ্যায় রত্না ও সমীরের গৃহে তাদের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পার্থও নিমন্ত্রিত হয়ে এল। নানারকম গল্প-গুজবে সন্ধ্যাটা আমরা বাগানে বসে কাটালাম। ডিনার টেবিলে দেখলাম পার্থর পাশেই দেবলার আসন হয়েছে। মনে মনে দুই বোনের বুদ্ধির তারিফ করলাম। একবার দেখলাম যে পার্থর কথায় দেবলা খুব হাসছে, এমন প্রফুল্ল ভাব তার অনেকদিন দেখি নাই। খাওয়া শেষে আমরা আবার বাগানে গেলাম, চন্দ্রালোকে আরব সাগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে গল্প আরম্ভ করলাম, বয় কফি দিয়ে গেল। কফি পরিবেশনের সময় দেখা গেল পার্থ ও দেবলা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বাগানের রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে তন্ময় চিত্তে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আলাপ করছে। আমি ওদের ডাকতে যাচ্ছিলাম, রত্না বারণ করল। অল্পক্ষণ পরে পার্থ ও দেবলা হাসতে হাসতে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে কফিতে যোগদান করল। রাত এগারটায় সময় অতিথিরা সকলে চলে গেলেন। সব শেষে গেল পার্থ। সে রাত্রে দেবলা আমাদের বাড়ীতে রইল। পরদিন সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে দেরী হল। প্রাতঃরাশের জন্ত টেবিলে এসে দেখলাম সকলের খাওয়া শেষ। আমার স্ত্রী ও রত্না বলে উঠল, "জামাইবাবু, দেবলাকে নিয়ে আর আপনার ভাবনা নাই। দেবলা পার্থকে ভালবাসে এবং বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে। বিবাহের ভোজ কবে এবং কোথায় দিচ্ছেন বলুন।" আমি বললাম, "খুব সুখবর শোনালে, সন্দেশ খাওয়াব, এখন তুমি ও তোমার দিদি দুজনে মিলে বিবাহের যোগাড়ে লেগে যাও।" আমি তখনই চিঠি লিখে পার্থকে সন্ধ্যায় সময় দেবলার মালাবার হিলের বাড়ীতে আসার জন্ত জানালাম। বৈকালের দিকে আমরা দেবলাকে নিয়ে তার বাটীতে পৌছালাম, অল্পক্ষণ পরে পার্থ এল। আমরা বাগানে গিয়ে বসতেই আমার স্ত্রী পার্থকে জানিয়ে দিলেন যে দেবলার মত হয়েছে, এখন বিবাহের দিন স্থির করা আবশ্যক। ঠিক হল যে ওদের সিভিল ম্যারেজ হবে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল যে হিন্দু-মতে বিবাহ হয় কিন্তু অনেক অসুবিধা আছে বুঝতে পেরে আর কিছু বললেন না। আরও কথা হল যে বিবাহের এক সপ্তাহ পরে পার্থ ও দেবলা ইউরোপ চলে যাবে, সেখানে বিভিন্ন কেন্দ্রে ওরা দুজনে চিত্রকলায় উচ্চ শিক্ষা নেবে ও দুই বছর থাকবে, তারপর বোম্বাই ফিরে এসে দেবলার মালাবার হিলের বাড়ীতে একটি উচ্চাঙ্গের কলামন্দির স্থাপন করবে। যথাদিনে পার্থর হাতে আমি দেবলাকে সমর্পণ করলাম, ওদের বিবাহ রেজিষ্টারি হয়ে গেল। স্বর্গত বন্ধুর প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করতে পারার জন্ত—যেমন আনন্দও হচ্ছিল, তেমনই কি যেন একটা ব্যথাও মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম। বিবাহের রাত্রে মালাবার হিলের বাড়ীতে ওদের বন্ধু-বান্ধবরা সব নিমন্ত্রণে এসেছিলেন এবং বিবাহের

ৎসব অনেক রাত্রেই শেষ হয়। সে রাত্রে আমরা সকলে ওদের ড়ীতেই ছিলাম। পরদিন সকালে পার্থ ও দেবলাকে মালাবার হিলের ড়ীতে রেখে আমরা ফিরে এলাম। রত্না ও সমীর ওদের সে রাত্রে ামাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিল—ওরা এসেছিল—দেবলাকে নববধূর জায় খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। পার্থ ও দেবলা এসে আমাদের সকলের ায়ের ধূলা নিল। আমার স্ত্রী যখন দেবলার মুখখানি তুলে ধরে তাকে কে জড়িয়ে নিলেন তখন তাঁর ও দেবলার চোখে আনন্দের অশ্রু খলাম। সমীর খবর দিল আগামী সপ্তাহের পি এণ্ড ও কোম্পানির ণ্ডনগামী জাহাজে দুই বার্থের একখানি প্রথম শ্রেণীর কেবিন পার্থ ও বেলার জন্য ঠিক হয়েছে। আরও কথা হল যে ওরা ইউরোপ চলে লে দেবলার মালাবার হিলের বাড়ীও ভাড়া দেওয়া হবে এবং দুইটি ড়ীর ভাড়ার টাকা দেবলার ব্যাঙ্ক আদায় করে প্রতি মাসে দেবলারা খানে থাকবে সেখানে পাঠিয়ে দেবে। দেখা গেল মাসিক আয় খুব লই হবে এবং ওরা বেশ হেসে খেলে ভালভাবেই থাকতে পারবে, রের কয়েকটি দিন খুব আমোদে কাটল। লণ্ডন যাত্রার আগের রাত্রে বার আমরা সকলে শেষবারের মত ওদের মালাবার হিলের বাটীতে মিলিত হলাম। যথা সময়ে আমরা সকলে ব্যালার্ডপিয়ারে গিয়ে ওদের সঙ্গে জাহাজে উঠলাম। বিরাট শ্বেতকায় জাহাজখানি সুদূরের পথে পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। আমাদের মত যাঁরা যাত্রীদের বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁদের নেমে যাওয়ার জন্য সঙ্কেত ঘণ্টা পড়ল। ধীরে ধীরে আমরা নেমে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলাম। পার্থ ও দেবলা আমাদের পায়ের ধূলা নিল, আমরা প্রাণ-ভরে ওদের আশীর্বাদ করলাম। দেবলার সঙ্গে আমার স্ত্রীও কাঁদলেন। আমারও চোখে জল আসিছিল, সামলে নিয়ে দেবলাকে বললাম, "আমাদের মেয়ে নাই, তুমি আজ সে স্থান পূর্ণ করেছ। নিয়মিত চিঠি লিখো। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, হাসি মুখে আবার দেশে ফিরে এস, আর এবার সোজা কলকাতায় আমাদের কাছে চলে আসবে।" আমরা জাহাজ থেকে নামলাম, পার্থ ও দেবলা ডেকের ধারে এসে হাত নাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেল। আমরাও বাড়ী ফিরলাম। এরপর বোম্বাইএ আমাদের আর মন টিকল না, পরদিন আমরাও কলকাতা ফিরে এলাম।





ধারা

সুধীররঞ্জন গুহ

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

একটা জরুরী কাজে ডুবেছিল সঞ্জয়। সময় পাচ্ছিল না নিঃশ্বাস নিতে। তেমন সময়ে টেলিফোনে একটু বিরক্তই হ'য়ে উঠল সে।

মিষ্টি সুর রীণার। তারের ভেতর দিয়ে আরো মিষ্টি লাগল সঞ্জয়ের। জিজ্ঞেস্ করল, কি ব্যাপার?

তোমার কি ব্যাপার তাই জিজ্ঞেস করছি!

মহাভারত ছাড়া সঞ্জয় আর কি শোনাতে পারে? টেলিফোনে তা' শোনান যায় না।

কবে শোনাতে আসছ?

দেখি!

দেখাদেখি নয়—তাড়াতাড়ি। আমার বিশেষ দরকার।

মনের তৃষ্ণায় হ'লে রীণার এ-টেলিফোন অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। তা' আসেনি। সুতরাং রীণার বিশেষ প্রয়োজনেই যে এ-টেলিফোন তা' বুঝল সঞ্জয়। কিন্তু বল্‌ল না কিছুই। ঝগড়া করা চলে না টেলিফোনে!

জরুরী কাজে আর মন দিতে পারল না সঞ্জয়। রীণার টেলিফোন কেড়ে নিল তার মনটাকে; কেড়ে নিয়ে মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিল কতকগুলো স্মৃতির ছেঁড়া পাতায়।

দু'মাস আগে রীণার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হ'য়েছে সঞ্জয়ের। রীণার তখনকার মুখখানা ভেসে এলো তার সামনে।

রীণা! সারাজীবন তা'কেই বিশ্বাস করতে চেয়েছিল সঞ্জয়। চেয়েছিল রীণার হাতে নিজেকে তুলে দিয়ে সাহিত্য-সেবা করে' জীবন কাটাতে। জরুরী কাজে মন না দিয়ে রীণার স্মৃতিতে মন বুলাতে লাগল সঞ্জয়। কি অদ্ভুত মেয়ে! দীর্ঘদিনেও চিনতে পারল না ওকে। একদিন তাই সঞ্জয় বলেছিল, কা'র পেছনে যে ছুটছি···

খুব সহজ সুরেই উত্তর করেছিল রীণা, আলেয়ার!

শুনেছি তাতে নাকি লোকের মৃত্যু হয়?

এখানে হয়তো হবে না।

কিন্তু হ'ল প্রায় তাই। দু'মাসে একটা লাইনও লেখেনি সঞ্জয়। লিখতেও পারেনি। যেন প্রতিভাশূন্য হয়ে গিয়েছে সে। বাজারে নাম রয়েছে বলে মাসিক কাগজের তরফ থেকে লোক এসেছিল তা'র কাছে লেখা চাইতে। তা'দের ফিরিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়। বলেছে, লিখবার সময় পাচ্ছি না ভাই! বড্ড ব্যস্ত রয়েছি।

ব্যস্তই সঞ্জয়। হাতের সময়কে কাজে লাগাতে না পারার ব্যস্ততা। সময়ের বুক থেকে সোনার ফসল না তুলে স্মৃতির পথে ঘুরে ঘুরে সে-সময়কে দিচ্ছিল নষ্ট করে। দু'মাস আগেও তা' ছিল না। তখন গল্প লিখত। লিখত উপন্যাস। লেখা শেষ ক'রেই ছুটে যেত রীণার কাছে।

বিকেলে। প্রায় দিনই বৈকালী প্রসাধন শেষ করে রাখত রীণা। চুল বেঁধে রাখত সঞ্জয়ের ইচ্ছে মতো। আবার কোনদিন বাঁধত না চুল। সঞ্জয় এলে হাত দিত তাতে। ঘুরে ঘুরে আঁচড়াত চুল। দু'ভাগ বেণীকে হাতে নিয়ে সঞ্জয়ের দিকে তাকাত আয়নার ভেতর দিয়ে। নীরবে জিজ্ঞেস করত, কি ভাবে বাঁধাব চুল? মনের পাত্রে এমন নির্বাক মন দেওয়ায় হেসে উঠত রীণার ঘরখানি!

আবার কোনদিন বা সঞ্জয় ঘরে পা দিতেই রীণা একচোখ তাকিয়ে সঞ্জয়কে দেখার প্রাথমিক তৃষ্ণা নিত মিটিয়ে। পরে বের করত ইজিচেয়ারখানা। মাথা রাখার তেল-মলিন জায়গায় পেতে দিত একখানা ধব্‌ধবে তোয়ালে। ডানপাশে এনে দিত টেপয়। রাখত

এসট্রে! দেশলাই দেওয়ার সময় বলত, নেশাও কি আমি দিয়ে দেব নাকি?

পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে হেসে উত্তর করত সঞ্জয়, চরম নেশা তো একদিনেই দিয়ে রেখেছ—আর কি দেবে? বলতে বলতে লেখাও বের করত সঞ্জয়।

একমনে শুনত রীণা। কোন জায়গা একটু খারাপ লাগ্‌লে বলতে একটুও মুখে বাধত না তা'র। আর যদি লাগত ভালো, থাকত চুপ করে।

তাতে খুশী হ'তে পারত না সঞ্জয়। অভিমানের ফল্গু-ধারা বইত ভেতরে। লেখাটা কাগজে প্রকাশিত হ'লে হাজার পাঠক-পাঠিকা তা' পড়বে, সমালোচনা করবে—তা' করুক। যা' ইচ্ছে বলুক—তাতে কিছু এসে যায় না সঞ্জয়ের। তা'র হিসেব শুধু রীণাকে নিয়েই। রীণাই যেন তা'র একমাত্র শ্রোতা, পাঠিকা, সমালোচক! তাই রীণার নীরবতায় জিজ্ঞেস করত সঞ্জয়, চুপ ক'রে রইলে কেন? রিনিঝিনি ক'রে বেজে ওঠো! বলো কিছু?

রীণা যেন তখন ঝর্না কিন্তু বাঁধা। তবুও আড়-চোখে দরজার দিকে একবার চোখ দুটিকে ফেলত সে। ধীরে ধীরে সঞ্জয়ের একখানি হাত নিজের কোমল মুঠোয় নিত তখন। তারপরে ভেবে পেত না কি করবে সে হাত-খানা নিয়ে,—কোথায় রাখবে। তেমন অবস্থাতেই সঞ্জয়ের সে-হাতে চাপ দিতে দিতে বলত, খু-উ-ব খারাপ!

বৈদ্যুতিক হ'য়ে উঠত সঞ্জয়। কোন চঞ্চল বন্যায় মন করে উঠত টল্‌মল্‌। সারা মনে তারই ঢেউ নিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত রীণার মুখের দিকে। হ'ত চার চোখের মিলন! সঞ্জয়ের চোখের পরশে গোলাপী হ'য়ে উঠত রীণা। সুন্দর লাগত তাকে। আরো ভালো লাগত তার সুন্দর ছোট্ট কপালের দু'পাশে ছেড়ে দেওয়া দুগোছা চুলের স্বপ্নমাখা হাতছানি! কোথায় যে নিয়ে যেতে চাইত সঞ্জয়কে!

এমন সাহিত্য-বাসরকে রীণা ভেঙে দিয়েছে নিজ হাতে। শুধু একদিনের একটা ঘটনার আঘাত দিয়ে। হয়তো ওটাই ছিল রীণার তূণে হিসেব-করা অব্যর্থ তীর। ছুড়ে মারল, সজোরে আঘাত করল ঠিক জায়গায়। টুকরো টুকরো ক'রে দিল সঞ্জয়ের অন্তরকে।

প্রিয়জনের আঘাত! জীবনের হাসি, গান, ফুলছড়ান দিনের সব মধু-স্মৃতি সঞ্জয়ের মন থেকে মুছে গেল তখন। বিয়োগান্ত নাটকের সেই ব্যথাভরা দৃশ্যটাই বিদ্যুতের গতিতে এসে চোখের সামনে দাঁড়াল সঞ্জয়ের। মনে পড়ল সব!

অন্যদিনের মতো সেদিনও একটা লেখা শেষ ক'রে পাগল হয়ে উঠেছিল সঞ্জয়। রীণাকে না-শোনান পর্যন্ত তা'র ঐ পাগলামী।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রীণা। মাইনে পেত কম। কিন্তু সংসারে অভাব ছিল বেশী। অভাবের জন্যই একটা সেলাই মেসিন কিনেছিল কয়েকমাস আগে। কিস্তিতে। সে মেসিনটাকে কোলে করে সেলাই নিয়ে বসেছিল তখন রীণা।

ঝড়ের গতিকে রাস্তায় রেখে শুধু ক্লান্তি আর হাঁপানী নিয়ে সঞ্জয় তখন রীণার সামনে উপস্থিত। বলল, গল্প এনেছি রীণা!

সেলাই করতে হবে যে! জানাল রীণা।

কতোক্ষণ আর লাগবে—বড় জোর পনের মিনিট! হাসতে হাসতে আরেকটু যোগ দিল সঞ্জয়, আর কিছু তো চাইছি না—মাত্র এই সময়টুকু!

কিস্তির টাকা দিতে হবে! এই দেখ কোম্পানীর রক্ত-চক্ষু! বলেই রীণা একখানি কার্ড এগিয়ে দিল সঞ্জয়ের হাতে।

পড়ল সঞ্জয়। বলল, ঠিক আছে। আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি—সেলাই রাখো তুমি।

তোমার টাকা দিয়ে না-হয় সংসারের অভাবকে আরেকটু তাড়াব···করি সেলাইটা কি বলো? তাছাড়া আমার তো মরণ হবে না···কালকেই শুনব, কেমন?

গল্প শোনার মন আলাদা। জোর ক'রে তা' তৈরী করা যায় না। রীণাকে তাই আর কিছু বলল না সঞ্জয়। চলে এলো নীরবে।

কিন্তু মনে মনে নীরব থাকতে পারল না সঞ্জয়। সারা রাত পারল না ঘুমোতে। ভাবল, এ কোন রীণা? এতোদিন কি তবে সে জোর করে গল্প শুনিয়েছে রীণাকে; জোর করে খাইয়েছে অষুধের মতো?···না··· না, তা-ই বা কী করে হয়! বলতে গেলে রীণাই তো

তার প্রেরণাময়ী। তার সাহিত্য প্রতিভাকে ভাস্বর করেছে সে। বলেছে, কোনদিনই আমার কাছে খালি হাতে আসবে না; লেখা আনবে—দেখাবে নূতন সৃষ্টি, তবেই পাবে দরজা খোলা।

সঞ্জয়ের পৌরুষে লেগেছে। প্রেম আর প্রতিভা জেগে উঠেছে এক সঙ্গে। প্রেম বাড়িয়েছে তৃষ্ণা, প্রতিভা করেছে সৃষ্টি! তা' নিয়েই হাসিমুখে সঞ্জয় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে রীণার কাছে। ব'লেছে, আজকের মতো তা' হ'লে পাশ,—কি বলো?

আগে শুনি তারপরে তো পাশ-ফেল। যা' তা' হাতে ক'রে নিয়ে আসবে আর গেট-পাশ পাবে তা' হবে না।

এমন সময় ভাবনার সম্পূর্ণ মোড় ঘুরে গেল সঞ্জয়ের। দমকা বাতাসের মতো কার্ডখানার কথা মনে উঠল তা'র! কার্ডের নাম-সই তা'র চেনা। মানস তার বাল্যবন্ধু!

মানস এজেন্ট! কলকাতার এক সেরা জায়গায় দোকানখানিকে বাহ্যিক সাজিয়েছে ষোড়শীরূপে ভেতরেও যথেষ্ট বাহার! সব সাজান-গুছান ছিম-ছাম।

সঞ্জয় মানসের চেম্বারের দিকে যেতেই বেয়ারা এসে বাধা দিল তাকে,—ভেতরে যাবেন না স্যর।

হঠাৎ সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, কেন?

লোক রয়েছে।

আমিও তো লোক!

একটু মুচকি হাসল বেয়ারাটা। জানাল, আজ্ঞে হুকুম নেই। আপনি দয়া করে ওখানে বসুন···

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসল সঞ্জয়। প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল, লোক বের হওয়ার নাম নেই। সঞ্জয় বিরক্ত হ'ল মনে মনে। ঠিক করল চলেই যাবে। এমন সময়ই ভেতরের লোক বের হ'ল চেম্বার থেকে।

বুকের মধ্যে একটা ভূমিকম্প হ'য়ে গেল সঞ্জয়ের। আরক্তিম মুখ, মেঝের দিকে চোখ ফেলেই বেরিয়ে গেল রীণা! আর কোনদিকে তাকাল না সে। চোখের চশমা খুলে মুছল কাচ, মুছল চোখ! কি দেখল সে? স্বপ্ন?

অনেক দুঃখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল সঞ্জয়ের মুখে। কতো নিষ্ঠুর রীণা! গত পূজায় ঐ শাড়ি আর ব্লাউজ সঞ্জয় কিনে দিয়েছে তা'কে। পূজার মধ্যেই ঐ পোশাকে রীণাকে দেখে' সঞ্জয় বলেছিল, তোমাকে খুব সুন্দর দেখছি। আমার সঙ্গে যেদিন বের হবে এই পোশাক পরেই বের হবে কিন্তু।

বেশি সুন্দর দেখায় বলে' সেই পোশাক পরেই বেরিয়েছে রীণা। নিজেকে সুন্দরী দেখাতে কতো পাকা হিসেবী! কিন্তু···একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সঞ্জয়! সে যে-চোখে রীণাকে দেখে সে-চোখ মানস কোথায় পাবে?

তা'ছাড়া পোশাক ছেড়ে দিল সঞ্জয়, পোশাক কথা বলে না। ঘড়িটা তো কথা বলে! প্রথম দিন সঞ্জয় নিজেই রীণার হাতে ঘড়িটা বেঁধে দিয়ে বলেছিল, ঘড়িটা টিকটিক্ করে কি বলছে জানো রীণা?

কি? জিজ্ঞেস করেছিল রীণা।

এখন থেকে আমার প্রতিনিধি হ'য়ে চিরকাল বলবে, তুমি আমার! তুমি আমার!!

ভাবতে ভাবতে আবার ম্লান হাসি হাসল সঞ্জয়। স্কুল মিস্ট্রেস্ রীণা! চাকরী জীবন আর ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে সব সময়ই সমন্বয় রক্ষা ক'রে চলত সে। সঞ্জয়ের শত অনুরোধেও রিল্ দিয়ে চুল বাঁধেনি কোনদিন। সাদা সাদা জমিনের তাঁতের শাড়ি ছাড়া পরেনি রঙীন। সেই রীণার দিন-রাত পরিবর্তন! রিল্ দিয়েই বেঁধেছে চুল! খোঁপার মুখে ফোটা একটা গন্ধরাজের একমুখ হাসি। ঝালর দেওয়া আলোর মতো কানে দুল্‌ছে কাচের দুল্। ডান হাতেই চরম—একগোছা কাচের চুড়ি!

না···না নিজের চিন্তার গতিকে বাধা দেয় সঞ্জয়। কি সব বাজে বাজে ভাবছে সে। কালকেই তো নিজেই সে কড়া তাগাদার কার্ডখানা দেখে এসেছে। তাগাদা পেয়ে নিশ্চয়ই টাকার ব্যাপারেই এসেছে রীণা! তাছাড়া আর কি হবে। ভাবতে ভাবতে মানসের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল সঞ্জয়।

সঞ্জয়কে দেখে' মানস তো অবাক, আরে তুই! অনেকদিন পরে কিন্তু!!

তাই অনেকক্ষণ বাইরে বসিয়ে রেখেছিস্!

মানে?

তাছাড়া আর কি! যাক আমি তো ভেবেছিলাম কা'র সঙ্গে কী এতো কথা হচ্ছে। পরে যখন বেরিয়ে

যেতে দেখলাম তখন আবার মনে করলাম, এতো তাড়াতাড়িই তোদের কথা শেষ হ'ল।

মানসের মুখে মুহূর্তেই হাসি এবং সে-হাসির শেষ দেখা গেল। আর বলিস না ভাই! মেয়েটা গ্রাজুয়েট টিচার। সংসারে অভাব। ঘরে বসে সেলাই করে' কিছু আয় করবার জন্যে আমার কাছ থেকে একটা মেসিন নিয়েছে। ইন্‌স্টলমেণ্টে টাকা দেওয়ার কথা!

পাচ্ছিস্ ঠিক মতো?—জিজ্ঞেস করল সঞ্জয়।

কোথায় আর দিচ্ছে। প্রত্যেক বারই এমন ভাবে এসে ধরে···বিপদেই পড়ে গেছি।

তুই ও তো দানছত্র খুলে বসিস্‌নি। কিছু আদায় করছিস নিশ্চয়ই। মুখে বেশ আলতো হাসির ছোঁয়া লাগিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সঞ্জয়—মন্দ কি! কেরাণী মেয়ের চেয়ে শিক্ষয়িত্রীর প্রেম অনেক তাজা!

আগের দিন গল্প শুনতে চায়নি রীণা। পরের দিন লজ্জা জড়িয়ে মানসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল সে। উপরন্তু মানসের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে আরো যা শুনল তাতে স্বভাবতই সঞ্জয়ের ভয় হ'ল রীণাকে আর বিশ্বাস করতে। তাই রীণাদের বাসায় যেতেও আর ইচ্ছে হয়নি তার—অনিচ্ছাতেই চলেছিল দুমাস। তখনই রীণার টেলিফোন,—জানাল তার বিশেষ দরকার।

কথায় কথা আনে। সঞ্জয়ের তখন মনে পড়ল রীণার প্রসঙ্গে মানসের একটা কথা: বিপদে পড়েছি। মানসের কি বিপদ আর রীণারই বা কি বিশেষ প্রয়োজন কিছুই বুঝতে পারল না সঞ্জয়। বুঝবার জন্যে এক পা'ও বাড়াল না কোনদিক্।

কিন্তু মানুষের মন। রীণার ঐ টেলিফোন পাওয়ার মাসখানেক পর—সময়ের কোন্ অজানা প্রলেপে পরিবর্তন হ'ল সঞ্জয়ের মন। গেল রীণাদের বাসায়। তার সেই সাহিত্য-বাসর বসাতে নয়, নয় মন খুলতে—শুধু দেখতে ···রীণাকে একবার দেখতে!

সঞ্জয় ঘরে পা দিতেই রীণার সব চেয়ে ছোটবোন তার বালিকাসুলভ চপলতায় বলে উঠল, সঞ্জয়দা! দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে···

উত্তর দিতেই হ'ল সঞ্জয়কে—বাঃ আমার নিমন্ত্রণটা তবে বাদ গেল! বলতে বলতে সঞ্জয় লুকাতে চাইল একটা ব্যথাভরা নিঃশ্বাস। পারল না। ধরা পড়ল রীণার পরের বোন বীনার চোখে!

ভাঁজকরা ইজিচেয়ার খানা পেতে দিল বীনা। তেল-মাখা জায়গাটা ঢেকে দিল ধবধবে তোয়ালে দিয়ে। টেপয়টা এগিয়ে দিল ডানপাশে। দিল এস্‌ট্রে এবং দেশলাই।

নিজহাতে এগুলো করে' বীনা বলল, নেশাটাও কি আমি দিয়ে দেব? মনের কানে যেন তখন সঞ্জয় শুনছিল রীণার সেই কথা—সেই মিষ্টিসুর। ঠিক সে মুহূর্তেই সে বাস্তবে শুনল বীনার গলা: গল্প এনেছেন?

গল্প! কে শুনবে? অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস্ করল সঞ্জয়।

কেন! আমি শুনব।

তুমি তো কোনদিনই শোননি!

রোজই শুনেছি আড়াল থেকে। আজ দিদি নেই বলে' আপনি ফিরে যাবেন, তাই সাম্‌নে এলাম। দিলাম ইজি-চেয়ারখানি পেতে—টেপয়, এস্‌ট্রে এবং দেশলাই। এতোই যখন করতে পারলাম তখন আপনার লেখা শুনবার জন্যে আমার কান এগিয়ে নিতেই বা দোষ কি?

কথাগুলো শুনতে শুনতে সঞ্জয় অপলক চোখে তাকিয়েছিল বীনার মুখের দিকে; সে চোখে ইতিহাস! বীনা কিন্তু একটুও লজ্জা পাচ্ছিল না তাতে!



ভগবান বুদ্ধের সাধনা

শ্রীশিবেন্দ্র নাথ সাহা

ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীর অনন্যসাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যুগের স্থান ও কালের গণ্ডীতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন না। তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তাবলী ও সাধনা যেরূপে ব্যক্ত করেন, সেইরূপেই তাঁহারা তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। চতুর্দ্দিকের সকল কিছু হইতেই তাঁহাদের চিন্তা ও সাধনার অনুভূতি গঠিত হয়। উদার ও মহান ব্যক্তিরা তাঁহাদের যুগধর্ম্মের আবেষ্টনীতে ব্যক্তিগত অবদানকে স্মরণীয় করিয়া রাখেন। কন্তু তাঁহারা তাঁহাদের যুগের নির্দ্দিষ্ট স্তরকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তাঁহাদের চিন্তা যেমন অস্বাভাবিকভাবে যুগের স্তরকে লঙ্ঘন করে না, তেমনি ইহা নতুন কোনও চিন্তনকে ব্যক্ত করিবার সময় প্রাচীন চিন্তনগুলিরই পুনরভিব্যক্তি ঘটাইয়া তাহার উপর সংস্থাপিত হইয়া অগ্রগতির পথযাত্রী হয়। দার্শনিকত্ব, নাস্তিক্যবাদ ও নৈতিক মানবিকতাকে জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। আবার মানবতাবাদীগণ বুদ্ধকে সুখ, সম্ভ্রম, মানবের মানসিক পূর্ণতা প্রভৃতি সকল, বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী ও প্রবীণতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিশিষ্ট হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। বর্ত্তমান কালে ভগবান তথাগতের বাণীর সমাদর নিতান্ত কম নহে। তাই তাঁহার সকল পরিপ্রেক্ষিত ও আবেষ্টনী সম্বন্ধে জনগণের স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তাঁহার মহামূল্য বাণীর প্রকৃত বাস্তবতা নিরূপিত হওয়া খুবই কঠিন।

ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ এবং উচ্চাভিলাষ চিরদিনই অতৃপ্ত থাকে। তাই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী জীবনের আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার আলোচনার মধ্যে প্রায়ই শুনা যাইত—"পূত জীবনের মহত্তম পরিণতির জন্য সংসারী ব্যক্তিরা সংসার ত্যাগ করে এবং সংসারহীন সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করে।" তিনি তাই সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও সুন্দরী যুবতী জায়ার মায়া স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সত্যের অব্যর্থ পথসন্ধানে ধাবমান হন। তিনি কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। আত্মসংযমের দ্বারা বাসনা-কামনা বিসর্জ্জিত প্রাণে তিনি তপস্যার স্তরগুলি সমাপ্ত করেন। তিনি আবিষ্কার করেন—নিখিল বিশ্ব একটি মাত্র নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এখানে সকল জীব সুখী-অসুখী, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন ভেদাভেদে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গমনের জন্য সততঃ সচেষ্ট। রাত্রির অবসানে তাঁহার মন হইতে সকল অবিদ্যা অপসারিত হইল। তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে শুনা গেল—"যখন আমি একাগ্রচিত্তে অতিশয় উদ্যমের সহিত দৃঢ়সংকল্প লইয়া সেইস্থানে বসিয়াছিলাম, তখনই আমার চিত্তে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।" গৌতম, বোধি বা জ্ঞানলাভ করিলেন—জ্ঞানী বা বুদ্ধ নামে খ্যাত হইলেন। জীবনের কর্ম্মব্রতে ব্রতী হইলেন।

মৌখিক উপদেশ দান অতি সহজ। তাই গৌতম বুদ্ধ শুধুমাত্র মৌখিক উপদেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না তিনি মনুষ্যজীবন যে ভাবে যাপন করা উচিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। জনগণের অসন্তুষ্টি ও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ যাহার মনন, তিনি এইরূপ সেবাধর্ম্মী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিতেছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে জীবের প্রতি শিবজ্ঞানে অহিংসাব্রত পালন করিতেন। অসংখ্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—"এখন তোমরা বহুলোকের উন্নতির জন্য, বহুলোকের মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর সকল লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য, সকলের যাহাতে ভাল হয় তাহার জন্য এবং দেবও মানবের মঙ্গল ও উন্নতির যাত্রাপথে বাহির হও। তোমরা একই পথে এক জনের বেশী দুইজন করিয়া যাইও না। তোমরা যে জীবন সকল সময়ই স্বীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল, সেই পূর্ণ এবং পূত-পবিত্র জীবনযাপন সম্বন্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে, চূড়ান্তভাবে উপদেশ প্রচার করিবে।"

বুদ্ধের জীবিতকালে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানী বলিয়া বহুব্যক্তি পরিচয় দিতেন। তাঁহারা ঘোষণা করিতেন, ঈশ্বর নিশ্চিতরূপে আছেন। তাঁহারা ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তন, মনন এবং কর্ম্ম সম্বন্ধেও নির্দ্দিষ্টরূপে বহু কথা বলিতেন। কিন্তু পক্ষান্তরে বুদ্ধ তাঁহাদের প্রায় সকলকেই আধ্যাত্মিকতার নাগপাশে আবদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—"যে শিক্ষক ব্রহ্মের বিষয় বলেন, তিনিও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন নাই। যে লোক প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে পারে না যে তাঁহার প্রেমিকাটি কোন রমণী অথবা যে লোক প্রাসাদটি কোথায় তাহা না জানিয়াই সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করেন অথবা যে লোক নদী অতিক্রমণেচ্ছু হইয়া নদীর অপর তীরকেই তাঁহার নিকট আসিতে বলেন, ঐ সকল শিক্ষকদের অবস্থা এই সকল ব্যক্তিরই মত।" তবে একথা সত্য যে, ভক্তিকে ন্যায়সঙ্গত করিতে হইলে তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাই তিনি বলিতেন—"যাহা কিছু শোনা যায়, সেই সব কিছু গ্রহণ করিও না, কিংবদন্তী বা পরম্পরাগত কথা বিশ্বাস করিও

। এবং সত্বর কোনও সিদ্ধান্ত করিও না যে—'ইহা নিশ্চয়ই এইরূপ ইবে।' যে কোনও বিবরণ কেবলমাত্র পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই াহা গ্রহণযোগ্য নহে, অথবা 'ইহা গ্রহণযোগ্য' এই ধারণার বশবর্ত্তী ইয়া কোনও কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে, অথবা যেহেতু শিক্ষক মহাশয় লিয়াছেন সুতরাং তাঁহার কথা নিশ্চিতরূপে গ্রহণযোগ্য ইহাও মনে রিও না।"

ভগবান বুদ্ধ বিরুদ্ধমত বা অসত্যদৃষ্টির অস্বাভাবিকরূপে সমালোচনা রিতেন। যথার্থরূপে তিনি জানিয়াছিলেন যে, সে যুগের সকল ভ্রান্তি এবং সকল অমিতাচারকে বিদূরিত করিতে হইলে অসীম অধ্যবায়ের সহিত মতবাদকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন সকল মানুষের বচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে জীবনকে যাচাই করিয়া নবতররূপে জীবনক গঠন করা। তিনি সকল ধর্ম্মগুলির কুৎসিত সমালোচনা পরিহার রিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি কোনও লোক উপর দিকে াহিয়া আকাশমার্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে, তবে তাহা আকাশমার্গকে লিন তো করিতে পারেই না, বরং ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই মলিন রিয়া তোলে।" ভগবান বুদ্ধ কদাপি ক্রুদ্ধ হইতেন না, কদাপি কর্কশ াক্য ব্যবহার করিতেন না। অপরিসীম ধৈর্য্যধারণ তাঁহার চরিত্রকে হিমান্বিত করিয়াছে। 'তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে দুষ্ট, অবোধ মন কি বিদ্রোহী না বলিয়া অতৃপ্ত বলিতেন।

ভগবান তথাগত বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করা পছন্দ করিতেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংঘের ভিত্তি ছিল অভ্যাস—বশ্বাস নহে। তিনি একটি অভ্যাস এবং মহান ভক্তির উদ্ভোক্তা ছিলেন। ানুষ তাহাদের ভ্রান্ত কামনা-বাসনার জন্যই অতৃপ্ত থাকে। যদি মনুষ্য-মাজ তাহাদের অসৎ চিন্তাবৃত্তিসমূহকে প্রশমিত না করে এবং সৎ চিন্তাবৃত্তিসমূহকে প্রাণে প্রতিষ্ঠা না করে, তাহা হইলে অসৎ এবং অসুখী ন সৎ এবং সুখী মনে রূপান্তরিত হইতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ বর্ত্তিতবৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন—"ওহে ন্ন্যাসীগণ, যেরূপ গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি মহানদী যখন সাগরে পতিত য়, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব নাম ও রূপ হারাইয়া ফেলে এবং সাগর ামে অভিহিত হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিও যখন গবান তথাগত-প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করে, গৃহহীন জীবন-যাপনের আদর্শ, র্ম এবং নীতিকে গ্রহণ করে, তখন তাহারা তাহাদের নাম, গোত্র, াতি প্রভৃতি হারাইয়া ফেলে এবং সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হয়।"

গৌতম বুদ্ধ, সক্রেটিস ও যীশুখ্রীষ্ট—পৃথিবীর ইতিহাসে এই তিনজন শ্রষ্ঠ ব্যক্তিই তাঁহাদের যুগের আবিলতা এবং কুসংস্কারকে তিরোহিত রিতে প্রয়াসী ছিলেন। সক্রেটিস এথেন্সের রাজধর্ম্মের প্রতিকূলতা রিয়াছিলেন এবং যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ার বুদ্ধ অতি তীব্রভাবে বৈদিক বিধি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রিয়াছিলেন এবং জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই তিনি াহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতকে বাস্তবিকই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। র্ণপুত জীবন-যাপনের পক্ষে আত্ম-দমন ও আত্ম-অসংযম—এই দুই কঠিনতম পন্থা পরিহার করিয়া এক মধ্যবর্ত্তীপন্থা গ্রহণ অপরিহার্য্য—ইহা সম্যকরূপে জানিয়া তিনি চারিটি সত্যবাণী প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিশ্বে দুঃখ আছে, ঐ দুঃখের কারণ আছে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব এবং দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি পথ আছে।

প্রতিটি বিষয়েরই স্বতন্ত্র কারণ আছে। সেই কারণের দ্বারাই প্রতিটি কার্য্য সংগঠিত হয়। এই সহজ, সরল নিয়মটি সমগ্র বিশ্ব, দেবও মানব, আকাশমার্গ ও পৃথিবীকে পরিচালিত করে। দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের কারণ সন্ধান করিয়া তাহা বিদূরিত করিলে দুঃখ-কষ্ট আপনা হইতেই তিরোহিত হয়। দুঃখ-কষ্ট ভোগের নির্দ্দিষ্ট কারণ অস্তিত্ব লাভের কামনার মধ্যে নিহিত। অবিদ্যা আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রশমিত হয় আর বাসনা-কামনা নৈতিক সংযমের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। কর্ম্ম এবং জন্মান্তরকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ মনে করতেন। বুদ্ধ সর্ব্বদাই অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে—ইহাই ছিল ভগবান বুদ্ধের বদ্ধমূল ধারণা। দুঃখ-কষ্টভোগ, জরা-ব্যাধি, ক্ষয়-ক্ষতি, ব্যর্থতা—হতাশা, প্রেমে বেদনা, সংকল্পে বিফলতা—এইগুলির নৈতিক-মূল্য আছে এবং নৈতিক কার্য্য কারণের ধারানুযায়ী এই সকলকে বিচার-বিবেচনা করা বিধেয়। ভগবান তথাগত বলিতেন—"আমার কর্ম্ম আমার সম্পদ, আমার কার্য্য আমার উত্তরাধিকার, আমার কার্য্য যেন সেই গর্ভাশয় যাহা আমাকে ধারণ করে; আমার কার্য্যের দ্বারাই আমার জাতি নিরূপিত হয় এবং আমার কার্য্যই আমার আশ্রয়স্থল।"

গৌতম বুদ্ধ সর্ব্বদাই কর্ম্মবাদী ছিলেন। তিনি কর্ম্মবিরতি অপছন্দ করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি বাক্যের দ্বারা এবং দেহের দ্বারা কোনরূপ অন্যায় করা হইতে বিরত হইবার নীতি প্রচার করি। চিন্তার দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং দেহের দ্বারা সৎকার্য্য করিবার বাণী প্রচার করি। আমি সকল প্রকার ভাল কার্য্য করিবার নীতি প্রচার করি।" বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত নীতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—"সৎকার্য্য করা অপেক্ষা সকল জীবে প্রেম করিবার মূল্য অনেক বেশী। বহু সৎকার্য্য করিলেও তাহা প্রেম ও ভালবাসার এক ষোড়শাংশের সমান হয় না, কারণ প্রেম হৃদয়কে মুক্ত করে। যে প্রেম হৃদয়কে মুক্ত করে তাহা সৎকার্য্যগুলিকেও "ধারণ করে।" ইহা কিরণ দান করে, আলোক ও দ্যুতি বিকীরণ করে।" কোনও সৎ বৌদ্ধ আমোদ-আহ্লাদ উপভোগের জন্য অথবা মাংসাহারের জন্য জীবহত্যা করেন না। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ঈশ্বরের অকৃপণ কৃপায় যে সকল নিম্নশ্রেণীর জীবগণের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা তাঁহাদেরই ভ্রাতৃসমকক্ষ।

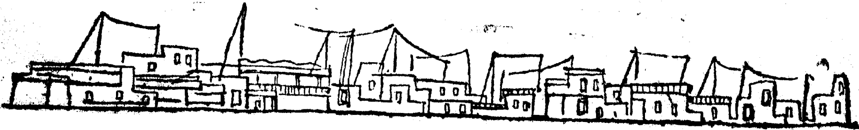
ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—"সুখভোগ পরিত্যাগ করিও, কাহাকেও হিংসা করিও না, কাহারও কোন ক্ষতি করিও না। সত্যকথা বলিবার জন্য, মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, তিরস্কার করা, কর্কশ বাক্য এবং অহেতুক বাক্য পরিত্যাগ করা দরকার। সৎকার্য্য করিতে গেলে অপরের প্রাণহানি, অপরের দ্রব্য অপহরণ করা এবং বল্গাহীনভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগ পরিত্যাগ করা দরকার। "সৎজীবন যাপন করিতে গেলে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবসায়ী, ক্রীতদাস ব্যবসায়ী, মাংস বিক্রয়কারী, শৌণ্ডিক বা

বিষ-বিক্রেতারা যেরূপ জীবন-যাপন করে, সেইরূপ নিষিদ্ধ জীবনযাত্রা প্রণালী পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বুদ্ধ তাঁহার মঠবাসী সন্ন্যাসীদিগকে সৈনিকব্রত গ্রহণে বিরত থাকিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত অষ্ট-মার্গ নীতিশাস্ত্রেরও ঊর্দ্ধে বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা জীবনের পথ নির্দ্দেশক। উদীয়মান কুচিন্তাবৃত্তিকে সংযত এবং কুচিন্তাবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া সাধু চিন্তাবৃত্তিকে অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা এবং সাধু চিন্তাবৃত্তিগুলিকে সক্রিয় করার উপর অর্থই সাধু উদ্যম। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ইহাই আদি অধ্যায়। ভগবান বুদ্ধ সকল জনগণের জন্য পাঁচটি নৈতিক নিয়ম দান করেন—"হত্যা করিও না; অপহরণ করিও না; অন্যায়ভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করাকে প্রশ্রয় দিও না; মিথ্যা কথা বলিও না; মদ্যপান করিও না।"

বৌদ্ধমতে বিদ্যার অর্থ শিক্ষা নহে। ইহার অর্থ অনন্যচিন্ত ধ্যান। বিদ্যার দ্বারা মানুষ পরমাত্মার সহিত একাত্মতা অনুভব করে। এই সময় সকল জাগতিক আকর্ষণ সমাহিত হইয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ আত্ম-সংযম ও আত্ম-অসংযমের মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং শেষোক্ত মতবাদকেই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অলৌকিক কার্য্যের প্রতি মনঃসংযোগ করিলে মন নৈতিক মূল্য ও সত্যানুসন্ধান লাভ করে। সত্যানুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করা যায়। সত্যানুসন্ধান-লব্ধ জ্ঞান মানুষকে কামনা-বাসনা বিবর্জ্জিত পথে চালিত করে। বুদ্ধ তাঁহার ব্যবহারিক জীবন সাধনা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানুষ কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার কর্ত্তব্য গ্রহণ করিলে সে তাহা সমাধান জন্য বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করে। সে স্বায়াশক্তিকে জীবনের জন্য কোন কল্যাণ পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পায় না। ভগবান বুদ্ধ জনপ্রিয় দেবতাদের স্বীকার করিতেন। তিনি তাঁহাদের পরীরূপে কল্পনা করিতেন। কিন্তু তিনি চাক্ষুষ বিষয় এবং উদাহরণ দ্বারা উদ্দীপনাময় জীবনধারণের পথনির্দ্দেশ করিতেন। মনুষ্য জীবনে আশ্চর্য্যজনক অসামঞ্জস্যগুলির জন্য স্রষ্টা ভগবান দায়ী নহেন—দায়ী মানুষের কৃতকর্ম্ম ভিন্ন আর কেহ নহে।

ঈশ্বর একজন সর্ব্বশক্তিমান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি; তিনি আপদকালে মানুষকে রক্ষা করেন; তিনি বিশ্বের নিয়ম ও গতি বিষয়ে হস্তক্ষেপে সমর্থ এই ধারণাকে বুদ্ধ অবিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, এই জাতীয় ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর শক্তিকে ন্যস্ত করায় অর্থ মানুষকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা এবং মানুষকে কোন একটি অনুভূতির শেষ-প্রান্তে উপস্থিত করাবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করা। কিন্তু ইহা কোনক্রমেই মানবোচিত নহে। বিশ্বশক্তিরূপে কোন নিয়ন্তার অস্তিত্ব আছে কি-না এবং তাহা অলৌকিক জগতে কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভগবান বুদ্ধ খুব বেশী সময় নষ্ট করেন নাই। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ এবং বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভই ছিল ভগবান বুদ্ধের নিকট অবিস্মরণীয় কার্য্য। নিখিল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে নৈতিক নিয়ম। তাই নৈতিক নিয়মই হইল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে কাহারও উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস ন্যস্ত করিলে হইবে না—প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিতে হইবে, প্রত্যেককেই কঠোর তপস্যা দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে, প্রত্যেককেই নৈতিক নিয়ম পালন দ্বারা ধর্ম্মলাভ করিতে হইবে। তাই বুদ্ধ বলিলেন—"হে আমার শিষ্যগণ, আমি যাহা জানিয়াছি, এবং তোমাদের নিকট বলি নাই, যাহা বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কিন্তু হে আমার শিষ্যগণ, তোমাদের নিকট আমি সেই সকল বলি নাই কেন? কারণ ইহা দ্বারা তোমরা কোনরূপ লাভবান হইতে পারিবে না। ইহা পবিত্রতার পথে উন্নীত করিতে পারিবে না, কারণ ইহা পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ হইতে তোমাদের দূরে লইয়া যাইতে পারিবে না, সমস্ত বাসনা-কামনাকে দমন করিতে পারিবে না, কপমাচিত্তকে রোধ করিতে পারিবে না এবং শান্তি, জ্ঞান, উজ্জ্বলতা এবং নির্ব্বাণ আনয়ন করিতে পারিবে না; সেইজন্য আমি তোমাদের নিকট তাহা প্রচার করি নাই।"

কোন মানুষ যখনই অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে সমাহিত করেন, তখনই তাহার সম্পাদিত কামনা-বাসনা ও অনুতাপ-পরিতাপ প্রশমিত হয় এবং তিনি পরম জ্ঞানলাভ করেন। বুদ্ধের কোনও আলোচনা কাল্পনিক নহে। অনন্তকাল হইতে তিনি জ্ঞানভাণ্ড হস্তে এই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন—এই ধারণা তাঁহার কখনই ছিল না। তিনি তাঁহার অনুগামীদের নিকট শুধুমাত্র নীতি শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উপরন্তু আধ্যাত্মিক জীবন ধারণোপযোগী একটি মন্ত্রণা দিয়াছিলেন। তিনি একটি কল্যাণপথের সুষ্ঠু সন্ধান দিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধের জীবন সাধনার মধ্যে মানব-জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে প্রাচ্যের একটি মহান মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি সকলের নিকটই আদরণীয়। এই ধর্ম্মের বিস্তৃতি অন্য যে কোনরূপ ধর্ম অপেক্ষা গভীর ও সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর চিন্তাধারার ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধের মহান অবদান অবিস্মরণীয়। সকল সভ্য সমাজের সংস্কৃতি উৎসও তিনি। কারণ মানসিক পূর্ণতার দিক হইতে বিচার করিলে নৈতিক একাগ্রতার দিক হইতে বিচারকরিলে এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিক্ হইতে বিচার করিলে নিঃসন্দেহে তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁহার নিরলস কর্ম্মভিত্তিক জীবন-সাধনা অবশ্যই সার্থকতালাভ করিয়াছে—একথা বিশ্বাসীগণ কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে স্বীকৃত।



"আলোকতীর্থের" সমালোচনা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

শ্রীশৈলেন্দ্র ঘোষাল "আলোকতীর্থ" নামক বহিতে হিন্দুর পূজা পদ্ধতি এবং ধর্মমতকে অশিষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে "জঘন্য লীলাখেলা" বলিয়াছেন (পৃ: ২০৩)। ভাগবতের লেখককে "মূঢ় ভাগবতকার" বলিয়াছেন (পৃ: ১৯৪)। ভাগবতে "মিথ্যার বেসাতি" আছে বলিয়াছেন (গ্রন্থসূচী পৃ: ৬)। পুরাণ-রচয়িতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "অজ্ঞ পুরাণকার" (পৃ: ৩৪০) "ভণ্ড পুরাণকার" (পৃ: ২২৬)। অবতার-বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "অবতারবাদের মূলে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থবোধ এবং কুৎসিত বিদ্বেষভাব আছে" (পৃ: ৩৪০), বিষ্ণুর বরাহ অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ঘোঁত ঘোঁত করে দৌড়ে এসে পৃথিবীকে দণ্ডে তুলিয়া ধরিলেন (পৃ: ৩৩৬)। এইভাবে বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছেন (পৃ: ৩৩৬-৩৩৯)। যাহারা মূর্তি পূজা করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "জড়বাদী মূর্তিপূজক ভণ্ডের :দল" (পৃ: ৯৩)। এই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি হিন্দুর ধর্মভাবের উপর আঘাত করিয়াছেন। এ জন্য গবর্ণমেণ্টের উচিত পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করা এবং ইহার প্রচার বন্ধ করা।

আমেরিকাতে মহম্মদের একটি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীয় বিদ্যা ভবন তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতে মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হইয়া হাঙ্গামা করিল। পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হইল। স্বয়ং নেহরু মাপ চাহিলেন। শৈলেনবাবু আলোকতীর্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দু-ধর্মের উপর আরও বেশী আঘাত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা অবশ্য কর্তব্য। হিন্দুরা শান্তিপ্রিয় বলিয়া তাহাদের ধর্মের উপর আঘাত করিলে কোনও প্রতিবিধান করা হইবে না, ইহা অন্যায়।

বলা বাহুল্য শৈলেনবাবু হিন্দু ধর্মের যে সকল দোষ দেখাইতে চাহিয়াছেন সে সকল দোষ হিন্দুধর্মের নাই। ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি "জঘন্য লীলা খেলা" বলিয়াছেন—কিন্তু এই কৃষ্ণ লীলার চিন্তায় শ্রীচৈতন্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, শ্রীধরস্বামী, রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামদাস কাঠিয়া, সন্তদাস বাবাজি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই লীলাকে পরম পবিত্র বলিয়াছেন। মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করিবার জন্য যে সকল নীতি প্রচলিত আছে, সে সকল নীতি ভগবচ্চরিত্রে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ তিনি সর্বনিয়ন্তা এবং স্বয়ং সকল নিয়মের উর্ধ্বে। ভক্তরা ভগবানকে যেভাবে চাহেন ভগবান সেইভাবেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ভক্ত হিন্দুর দৃষ্টিতে পরমপবিত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি হিন্দুরা ভক্তিভাবে ধ্যান করে। শৈলেনবাবু হিন্দুর ধর্ম-নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "কৃষ্ণরূপে পরমাত্মা বস্ত্রহরণ, রাসলীলাদি সাধ্বী পরিত্রাণমূলক অনেক গোপন লীলা-রসের অনুষ্ঠান করে তাঁর ভক্তদের সামনে পূর্ণ ভক্তবত্ত্বা (বানান ভুল—'ভগবত্তা হবে) প্রমাণ করে গেছেন। ঐসব অশ্লীল লীলারসাস্বাদনে ভক্তরা পরিতৃপ্ত এবং তাহার ধ্যানে "রসাবিষ্ট" (পৃ: ৩৩৯—৩৪০)

পুরাণসমূহকে শৈলেনবাবু এত নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতে ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "রামায়ণ, মহা-ভারত এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ ভাল ভাবে বুঝিতে হয়। যাহারা এই সব গ্রন্থ পড়ে নাই তাহারা বেদের ব্যাখ্যা করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা।"

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপ বৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদ মাময়ংপ্রহরেদিতি॥

মহাভারত ১-১-২৬৭

ন্যায়দর্শনের ৪-১-৬৩ মন্ত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে সকল ঋষি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের দ্রষ্টা ও বক্তা তাঁহারাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রেরও বক্তা। "য এব মন্ত্রব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারো বক্তারশ্চ এব ইতিহাসপুরাণস্য ধর্মশাস্ত্রস্য চ"। ব্রহ্মসূত্রের ১-৩-৩৩ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "মন্ত্রব্রাহ্মণদ্রষ্টা ঋষিদের সামর্থ্য আমাদের সামর্থ্যের সহিত তুলনা করা যায় না। অতএব রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যথার্থ।" ঋষীনামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং ন অস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুংযুক্তং। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্।" মহর্ষি জৈমিনি পূর্বমীমাংসা দর্শনের ১-১-৩ সূত্রে বলিয়াছেন যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির বাক্য বেদের সহিত বিরোধ না হইলে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। "বিরোধে তু অনপেক্ষং স্যাৎ, অসতি হি অনুমানম্"। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—কর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ" গীতা ১৬-২৪। শাস্ত্র দ্বিবিধ শ্রুতিও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। পুরাণ স্মৃতির অন্তর্গত। ব্রহ্মসূত্র ১.১।৩ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", এই সূত্রে শাস্ত্রকে প্রামাণিক বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক পণ্ডিতগণ পুরাণকে বেদমূলক অভ্রান্ত বলিয়াছেন। শৈলেনবাবু সেই পুরাণকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহারা অজ্ঞ ও ভণ্ড ছিলেন। মহাদেব, কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর অবতারদের চরিত্র মনুষ্যোচিত নীতি অনুযায়ী হওয়া উচিত এইরূপ মনে করিয়া তিনি পুরাণকে মন্দ ভাবিয়াছেন এবং অশিষ্ট ভাষায় তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন—শকুনি আকাশে খুব উর্ধ্বে উঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের দিকে। শৈলেনবাবুও পুরাণ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু পুরাণের দোষ বাহির করিতে তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার টীকার উপক্রমণিকায় মহাভারত হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥" অর্থাৎ পুরাণ, মনুসংহিতা, বেদ, বেদাঙ্গ এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব অভ্রান্ত, তাহাদিগকে যুক্তির দ্বারা আঘাত করা উচিত নহে।

ভগবানের অবতার হইতে পারে না এই উক্তির সমর্থনে শৈলেনবাবু নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন, "যিনি অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী পরমাত্মা তাঁর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে আসা অসম্ভব।" কিন্তু "কেন" উপনিষদে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম একটি যক্ষের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্ত ও অসীম হইয়াও যদি "যক্ষের" রূপ ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইচ্ছা অনুসারে মৎস্য কূর্ম বা মনুষ্য রূপ ধারণ করিতে পারিবেন না কেন? ব্রহ্ম যখন অবতারের রূপ ধারণ করেন তখনও তিনি নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন, যেমন তিনি যখন যক্ষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তখনও নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্য কি বেদ জানিতেন না যে তাঁহারা ভগবানের অবতার হয় বলিয়াছেন? গীতার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই বলিয়াছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈলেনবাবু লিখিয়াছেন যাহারা তাঁহাদের মত অনুসারে সাধনা করে তাহারা "দেখতে পায় হৃদয় আলো করে আলোক পুরুষ বিরাজিত" (পৃঃ ৬১)। ভগবান ত অনন্ত, তাঁহার ত অংশ হয় না তাহা হইলে ভগবান কিরূপে ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করেন? সুতরাং শৈলেনবাবু নিজের উত্থাপিত আপত্তিতে নিজেই অবরুদ্ধ হইতেছেন। শৈলেনবাবু বলিয়াছেন যে "অবতারবাদ দেশের বহু সর্বনাশ করেছে, —এজন্যই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষাদ্বেষি" (পৃঃ ৩৩৩)। কিন্তু তিনি নিজেই অবতারবাদ, মূর্তি পূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উদারতা আছে তাহা তিনি কি জানেন না? শিবপুরাণে মহাদেব বিষ্ণুকে বলিতেছেন, "মদ্দর্শনে ফলং যদ্বৈ তদেব তব দর্শনে" (আমার দর্শনে যে ফল হয় তোমার দর্শনেও সেই ফল হয়)। পদ্ম পুরাণে শ্রীরাম শিবকে বলিতেছেন, "মমাসি হৃদয়ে সর্ব ভবতো হৃদয়ে ত্বহম্" (হে শিব তুমি আমার হৃদয়ে আছ, আমিও তোমার হৃদয়ে আছি।" নারদ পঞ্চ রাত্রে বলা হইয়াছে, "যঃ কৃষ্ণঃ সা এব দুর্গাস্যাৎ,

যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" (যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ)।

মূর্তিপূজকদিগকে লক্ষ্য করিয়া শৈলেনবাবু লিখিয়াছেন, "জড়বাদী মূর্ত্তিপূজক ভণ্ডের দল" (পৃঃ ৯৩)। এই মূর্ত্তি পূজকদের মধ্যে আছেন—শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, তুলসী দাস, রামকৃষ্ণ পরমহংস,বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি। অপরাধভঞ্জন স্তবে শঙ্কর বলিতেছেন,

দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈ র্দধিশিত সহিতৈঃ স্নাপিতং নৈবলিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈ র্কণকবিরচিতৈ পূ'জিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈ কর্পূর দীপৈঃ বিবিধরসযুতৈঃ নৈব ভাজ্যোপহারৈঃ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিবভোঃ শ্রীমহাদেব সম্ভো॥

"মধু ঘৃত দধি শর্করা সহিত দুগ্ধের দ্বারা আমি শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত করি নাই, ফুল দিয়া পূজা করি নাই, ধূপ, কর্পূর, দীপ এবং বিবিধ ভোজ্য দ্বারা ও পূজা করি নাই—হে মহাদেব আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।"

রামানুজ বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজের বিগ্রহ পূজা করিতেন, পরে দীর্ঘকাল শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথস্বামীর বিগ্রহ পূজা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম যখন জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন তখন উন্মত্তের ন্যায়, ছুটিয়া গিয়া বিগ্রহ আলিঙ্গন করিতে যান এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। রামকৃষ্ণ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরী কালীপূজা করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ করেন। এ বিষয়ে শৈলেনবাবু বলিয়াছেন "তোতাপুরীর নির্দেশমত উপনিষদ প্রতিপাদিত ব্রহ্মসাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, ভবতারিণী কালীমূর্ত্তি পূজা করে নয়।" কিন্তু ইহা সত্য নহে। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—সাধক ভাব—১১০-১১১ পৃষ্ঠাতে "শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ" দেখা যায়। "মায়ের দেখা পাইলাম না, এ জীবনে কাজ নাই" এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্দিরের একটি তরবারি লইয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন এমন সময় তাঁহার দিব্য দর্শন ও সিদ্ধিলাভ হয়। আরও কয়েকবার ঈশ্বর দর্শন হয়। তাহার অনেক পরে তোতাপুরী আসেন। সুতরাং ইহা সত্য নয় যে মূর্ত্তিপূজা করিয়া পরমহংসদেবের সিদ্ধিলাভ হয় নাই।

মূর্ত্তিপূজা এক প্রকার প্রতীক উপাসনা। প্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা উপনিষদে আছে। সূর্য্য, মন প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৮ "আদিত্যো ব্রহ্ম-ইত্যাদেশঃ" ছাঃ উঃ ৩।১৯। প্রতীক উপাসনার প্রয়োজন এই যে ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর "ন তত্র চক্ষু গচ্ছতি ন বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন উপনিষদ ১-৩) অর্থাৎ তাঁহাকে চক্ষু দিয়া দর্শন করা যায় না, বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, মন দ্বারা চিন্তা করা যায় না। এজন্য অন্য একটি বস্তুকে ব্রহ্ম মনে করিয়া উপসনা করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজা বেদ-বিরোধী নয়। মূর্ত্তিপূজা বেদানুযায়ী না হইলে শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি বেদজ্ঞ আচার্য্য মূর্ত্তিপূজা করিতেন না।

শৈলেনবাবু বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ যদি ঈশ্বরের অবতার হইতেন তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু পাণ্ডবদিগকে মুক্তি দিলেন না কেন, তাঁহারা নরকে গিয়াছিলেন কেন? কিন্তু ভগবান অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে মুক্তি দিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। ভগবানের বন্ধুই হউক, আর যেই হউক সকলকে নিজকৃত কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। পাণ্ডবরা নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিয়াছিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন না—ইহা অযৌক্তিক কথা। মহাভারতে অনেক স্থলে কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলা হইয়াছে। গীতাও এরূপ কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এবিষয়ে সন্দেহের কোনও অবসর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বজন্মে নারায়ণ ঋষিরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন ইহা হইতে শৈলেনবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন। ইহাও অযৌক্তিক। ভগবানের ইচ্ছা হইলে তিনি নিশ্চয় তপস্যা করিতে পারেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্পষ্ট :ভাবে বলা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য বৃহন্নারদীয়পুরাণ হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ইহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন

নামবিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র সারনাম এই শাস্ত্র মর্ম॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ)

শৈলেনবাবু এই সহজ অর্থবিকৃত করিয়া বলিয়াছেন রাম, কৃষ্ণ এই সব নাম জপ করিয়া কিছু হইবে না, পুরুষোত্তম হইতে আগত Current কে হরির নাম বলিয়া শ্রীচৈতন্য mean করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সমাধির ভাষা, ইহার প্রকৃত অর্থ রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেহ বুঝিতে পারেন নাই, শৈলেন বাবু ঠিক বুঝিয়াছেন (পৃঃ ৯৮)। ঐ শ্লোক শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্লোকই নহে। উহা বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোক। ইহার অর্থও সুস্পষ্ট। রূপ, সনাতন প্রভৃতি কেহ ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, শৈলেনবাবুই বুঝিয়াছেন, ইহা বড় কৌতুকপ্রদ সন্দেহ নাই।

[illegible]

বা[illegible]

ভগ[illegible]

ভাবে তাহাকে ফুল জল প্রভৃতি দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীতা ৯।২৬

শৈলেনবাবু নানারূপ কূট তর্কজাল বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ফুল জল দিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে বলেন নাই।

শুক্লযজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায় রুদ্রাধ্যায় নামে পরিচিত। ইহা রুদ্রের স্তব। কিন্তু এই রুদ্র যে শিব তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ ইহাতে আছে "নমঃ শিবায়" (৪১) "কৃত্তিং বসান" (৫১) "পিনাকং বিভ্রৎ" (৫১) "নীলগ্রীব" (১১)। এই অধ্যায়ে রুদ্র বা শিবকে পরমেশ্বর বলিয়াই স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু শৈলেনবাবু বলেন যে শিব ছিলেন "তিব্বতের অধিবাসী, আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন" (পৃঃ ২২৬)। শৈলেনবাবু কোনও প্রমাণ দেন নাই যে শিব তিব্বতের অধিবাসী ছিলেন।

শৈলেনবাবু তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে কতকগুলি সাধুর উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা বাহ্য আচার, শাস্ত্র, ভেখ প্রভৃতির প্রয়োজন মানেন নাই (পৃঃ ১)। মহাভারত বলিয়াছেন [illegible]র্মঃ" (বিষ্ণু সহস্রনাম স্তোত্র)। আচার [illegible]ন্দ্রিয় সংযম করিতে হয়, সাত্ত্বিক আহার [illegible]য় ধর্মের সহায়ক। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না (গীতা ১৬।২৩)। শৈলেনবাবু বোধহয় ঐ সাধুদের অনুসরণ করেন। উপনিষদের ভাষায় "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

মৃত্যু করেছি জয়

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

এই জীবনের দীপ্ত তৃষায় মৃত্যু করেছি জয়
দেখেছি তাহার তিমির তোমার চোখে,
ক্ষণিকের ভুলে করিনি কখনো বেদনারে আমি ভয়,
খুলে গেছে দ্বার তাই আলোকের লোকে।

প্রলয় যখন এসেছে বিছায়ে মত্ত ঝড়ের ডানা
ভগ্নশাখায়, ছিন্ন নীড়ের সুখ,
বিজুলী ঝলকে হয়েছে আমার হৃদয় তখন জানা,
বৃষ্টি-অলক আড়ালে তোমার মুখ।

দীপ নিভে গেছে অন্ধকারের নিষ্ঠুর ফুৎকারে
সাগরের ক্ষুধা বিশ্ব করেছে গ্রাস,
সঙ্গীত মোর হয়েছে ফেনিল উত্তাল ঝঙ্কারে,
তারপর তার নাই কোন ইতিহাস।

ছিল না আমার কোন সকরুণ অকারণ সংশয়,
বক্ষে বহেছি পূত হোমাগ্নিশিখা,
দু'জনার হাতে পেয়েছি দুজনে যাহা হারাবার নয়,
ঘুমের আকাশে শুকতারা অনিমিখা।



এ মল্লার

মেঘের বুক বাদল-ভার
সইতে নারে, দুর্নিবার
হিম অঝোর ঝরছে আর
স্তব্ধ ওই দূর পাহাড় !
শুধু আমি···সঙ্গীহীন···
এই বাগান···মৌনদিন···
মৌন মন···মৌন প্রাণ···
মুখর শুধু এই বাগান !

পাতায় পাতায় কার নাচন ?
নাচে পাতায় মন-পবন !
কোন নারদ তন্ত্রীহীন
পাতায় পাতায় বাজায় বীন ?
এ কোন সুর ?   এ মল্লার !
তান কোথায় ?   অন্তরার
নেই ষড়জ···নেই নিখাদ···
হৃদয়-তলে কান্না স্বাদ !

কথা ঃ শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়   সুর স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা -া মা গা | মা -া -া -া I মা -া পা মা | পা -া -া -া I
মে ০ ঘে র   বু ০ ০ ক   বা ০ দ ল   ভা ০ ০ র

I ধা ণা র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া -া I র্সর্রা- পা -া ধা | পধা র্সণা -া -া I
স ই তে না   রে ০ ০ ০   দু০ ' র্ নি   বা০ ০ ০ র্

I ণা -র্রা -া র্সা | র্রা -া -া -া I র্সণা -ধা -র্সা ণা | ধপা -ধা -পা -া I
হি ০ ম্ অ   ঝো ০ ০ র্   ঝো ০ র্ ছে   আ০ ০ র্ ০

I পা -া -া পা | পা -র্সা -া -া I ধপা -ধা -া পমা | মা -া -া -া II
স্ত ০ ব্ ধ ঐ ০ ০ ০ দৃ০ ০ র্ পা হা ০ ০ ড়্

II ধা -র্সা র্সা র্সা | র্রর্গা -র্মা -া -া I র্গর্মা -র্পা -া র্মা | র্গর্রা -র্সর্রা র্সা -া I
স্ত ব্ ধ আ০ মি০ ০ ০ ০ স০ ০ ঙ্ গি হী০ ০ ন্ ০

I ধা র্সা -া র্সা | র্রা -র্মা -া -া I র্রর্মা -র্রর্মা -া র্র | র্সণধা -পধা -পা -া I
এ ই ০ বা গা ০ ০ ন্ মৌ০ ০০ ০ ন দি০ ০ ন্ ০

I পা র্সা -া ণা | ণধা -পধা -া -া I মা -া -পধপা মগা | মা -া -া -া I
মৌ ০ ০ ন ম০ ০ ০ ন্ মৌ ০ ০০ ০ ন০ প্রা ০ ০ ণ

I সা পা -া জ্ঞা | পা -া -া -া I ধর্সা -ধা -র্সা ধা | পমা -া -া -া II
মু খ র্ শু ধু ০ ০ ০ এই ০ ০ বা গা ০ ০ ন

II মা র্রা -া র্সা | র্রা -া -া -া I র্সা -র্রা -া র্পা | র্মা -া -া র্সা I
পা তা য়্ পা তা ০ ০ য়্ কা ০ র্ না চ ০ ন্ না

I র্রা -া -া র্সা | র্রা -া -া -া I র্সধা -র্সধা র্সা ধা | পমা -া -া -া I
চে ০ ০ পা তা ০ ০ য়্ ম০ ০০ ন্ প ব ০ ন্

I মা -ণা -া ধা | ণা -া -া -া I ণপা র্সা -া না | র্সা -া -া র্সা I
কো ০ ন্ না র ০ ০ দ্ ত০ ০ ন্ ত্রী হী ০ ন্ পা

I র্ধা -া -া র্পা | র্ধা -া -া র্পর্মা I র্পা -া -া র্মর্গা | র্পা -া -া -া I
তা ০ য়্ পা তা ০ য়্ বা০ জা ০ ০ ০য়্ বী ০ ০ ন্

I ধা -র্সা র্সা -া | র্রর্গা -র্মা -া -া I জ্ঞর্রা -া র্গর্মা -র্গা | র্মা -া -া -া I
এ ০ কো ন্ সু০ ০ ০ র্ এ০ ০ ম০ ল্ লা ০ ০ য়্

I র্গর্মা -র্পা -া র্মা | র্পা -া -া -া I র্মর্গা -র্পর্মা -া র্গা | র্রর্সর্রা -র্স -া -া I
তা০ ০ ন্ কো থা ০ ০ য়্ অ০ ০ ন্ ত রা০ ০ ০ য়্

I ধা -র্সা -া র্সা | র্রা -র্মা -া -া I র্রর্মা -র্রর্মা -া র্রা | র্সণধা -পধা -পা -া I
নে ই ০ য ড় ০ ০ জ্ নেই ০০ ০ নি থা০ ০ দ্ ০

I রা পা -া জ্ঞা | পা -া -া -া I ধর্সা -ধা -র্সা ধা | পমা -া -া -া IIII
হৃ দ য়্ ত লে ০ ০ ০ কা০ ০ ন্ না স্বা ০ ০ দ্

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

কাবুল অভিযান

মুহরম মাসে কারগানার প্রান্ত থেকে যাত্রা করি খোরাসানে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। ইলাকের গ্রীষ্মকালীন আবাস কুটিরে কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। ইলাক হিসার প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। গরমকালে পশুচারণের একটি উপযুক্ত স্থান।

এখানে আমি তেইশ বছরে পা দিলাম। প্রথম দাড়ি কামানোর জন্য ক্ষুর ব্যবহার আরম্ভ করি এইখান থেকেই। আমার অনুচরেরা যারা তখনও আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের সংখ্যা পদস্থ আর সাধারণ মিলিয়ে দুইশ'র কিছু বেশী, কিন্তু তিনশ'র কম ছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই কর্কশ মোটা চামড়ার জুতো পায়ে পদব্রজেই চলতো হ'তো। তাদের হাতে হাতিয়ারের মধ্যে ছিল লাঠি, আর লম্বা কোর্ত্তা তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলতো। আমাদের দুরবস্থা তখন এমন যে দুটোর বেশী তাঁবু ছিল না। আমার মায়ের জন্য খাটানো হ'তো আমার তাঁবুটি। আমার অনুচরেরা পথে বিশ্রামের সময় আমার জন্য খাটিয়ে দিত আড়া-আড়ি দণ্ডের ওপর একটা পশমি বস্ত্রের ঢাকনি। সেই সঙ্কীর্ণ পটাবাসেই আমাকে থাকতে হতো।

আমি খোরাসানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও আমার বর্ত্তমান অবস্থাতেও খসরু সার অধিকারভুক্ত রাজ্যে তার অনুগতদের ভাবান্তর ঘটাতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস হয়েছিল। এই সময় এমন দিন যায় নাই—যেদিন কোনও না কোনও লোক আমার দলে যোগ দিয়ে এই দেশের এবং ভবঘুরে জাতের মনোভাবের কথা জানিয়ে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার ইন্ধন না জুগিয়েছে।

সিরিম-তা-থাইয়ের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল—যার মত বিশ্বাস আমি আর কাউকেও করিনি। সেই বিশ্বাসী লোকটি কিন্তু আমার খোরাসান যাত্রার মতলবকে ভাল চোখে না দেখার দরুণ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করার চিন্তা করছিল। সে তার পরিবারবর্গকে আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে একাই আমার সঙ্গে ছিল—এই মনে করে যে যখন ইচ্ছা সে নির্বিঘ্নে আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে। সে স্বভাবে কাপুরুষ ছিল এবং সে কয়েকবারই আমার সঙ্গে এই রকমের খেলাই খেলেছে।

এই সময় বাকি বেগ বারংবার অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তার এই মনের কথা বলেছিল যে, একই রাজ্যের দুই রাজা এবং একই সেনাবাহিনীতে দুইজন সেনাপতির স্থান কিছুতেই থাকা উচিত নয়—কারণ তা শুধু বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসেরই সৃষ্টি করে। এই রকম দ্বৈত ব্যবস্থায় বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং ফলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। কারণ কবি বলেছেন—

'দশজন দরবেশ
পুলকের নাহি শেষ,
একখানা কম্বল
যদি পান বসিবার।
দুইজন অধিরাজ
হিংসায় জরজর
যদি পায় রাজ্যের
ভাগা-ভাগি অধিকার।
একজন সাধুলোক
রুটি পেলে একখানি,
আনন্দে বিলোবেন
দুখিজনে আধখানি।
যদি কোনও সম্রাট
কোনও দেশ বশে আনে,
তবু তার লোভী মন,
ধেয়ে চলে অন্যখানে।

যখন একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অল্পকালের মধ্যেই খসরুসার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ রাজার অর্থাৎ আমার সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের আনুগত্য জানাবে—তখন বাকি বেগের জোরালো অভিমত এই যে জাহাঙ্গির মির্জ্জাকে এখনই সরিয়ে দেওয়া ভাল। কিন্তু আমি তার যুক্তিতে সায় দিতে পারিনি।

এই সময় সংবাদ এল যে সিবানি খাঁ আন্দেজান দখল করেছে। এই কথা শুনে খসরু সা কোনও সাহায্য পাওয়ার ভরসা না থাকায় তার সমস্ত সেনা ও লোকজন নিয়ে কাবুলের পথে যাত্রা সুরু করে। সে কুন্দেজ ছেড়ে এলে আমার পরক্ষণে তারই কয়েকজন পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কুন্দেজ দুর্গ অধিকার করে নিয়ে সিবানি খাঁর হাতে সমর্পণ করে। আমি লোহিত নদীর ধারে পৌঁছালে মোগল জাতের তিন চার হাজার পরিবারের কর্ত্তাব্যক্তিরা—যারা এতদিন খসরু সার অধীন ছিল তাদের—সমস্ত পরিবার পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে আমার দলে যোগ দিল। এই-খানে বাকি বেগকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমি কাম্বের আলি মোগলকে পদচ্যুত করতে বাধ্য হলাম। এর কথা আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি। সে অত্যন্ত অপরিণামদর্শী ও রূঢ়ভাষী ছিল। তার আচার ব্যবহার বাকি বেগ সহ্য করতে পারতো না।

খসরু সা যখন শুনতে পেলো যে মোগলরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তখন সে তার অসহায়তার কথা উপলব্ধি করলো। আর কোনও

উপায়ান্তর না দেখে সে দূত হিসাবে তার জামাতাকে আমার কাছে পাঠায়। তার প্রস্তাব ছিল যে যদি আমি তার সঙ্গে কয়েকটা চুক্তিতে আবদ্ধ হই, তা'হলে সে আমার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেবে এবং সে নিজে এসে আমার কথা স্বীকার করবে।

বাকি চেথানিয়ানি—যদিও আমার কাজে তার অনুরক্তির অভাব নাই এবং তার মতামতেরও বেশ মূল্য আছে তবুও তার ভাইয়ের দিকে স্বাভাবিক কোমলতা থাকায়, মীমাংসায় আমার প্রস্তাবটা সমর্থন করলো, তবে সর্ত এই থাকবে যে খসরু সার জীবন রক্ষার ও তার নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি তারই অধিকারে থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এই সব সর্তেই একটা সন্ধি হয়ে গেল।

তারপর আমার শিবির তুলে কাবুলের দিকে যাত্রা করি এবং 'খাজে জিদে' এসে থামি। এই জায়গায় খসরু সার অস্ত্রাগারে যে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্ম্ম অবশিষ্ট ছিল তা আমার সৈন্যদের বণ্টন করে দিই। প্রায় সাত আটাশ' বর্ম্ম এবং ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম পাওয়া যায়। এগুলি খসরু সা ফেলে চলে যায়। আরও অনেক রকমের জিনিষ অবশ্য ছিল, কিন্তু সেগুলো কোনও কাজের ছিল না।

এ পর্য্যন্ত কোনও দিনই আকাশে ক্যানোপাস নক্ষত্র (বশিষ্ঠ) আমার চোখে পড়েনি। সেদিন একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম দক্ষিণ আকাশের নীচের দিকে একটি তারা জলজ্বল করছে। আমি বল্লাম—এটা কখনই 'ক্যানোপাস্' নয়। আর সবাই বল্লে—ওটা নিশ্চয় 'ক্যানোপাস'। বাকি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলো।

'হে বশিষ্ঠ নক্ষত্র !
কতদূরে উদয় তোমার
কোথায় তোমার স্থান ?
তোমার দৃষ্টি পড়ে যার ওপরে
সে যে অশেষ ভাগ্যবান।

যখন আমরা পাহাড়ের তলায় নেমে এলাম তখন সূর্য্য উঠছে। সেখান থেকে যাত্রা করে শ্বেত-প্রাসাদের সম্মুখে তৃণাস্তৃত ভূমিতে বিশ্রাম নিলাম। খসরু সার অনুচররা বরাবর বর্ব্বরতার অভিযানে লিপ্ত থাকতে প্রলোভিত হয়ে এসেছে। কোনও শৃঙ্খলা বা নীতিবোধ তাদের ছিল না। এখন তারা আমার সঙ্গী হয়েও এই দেশের লোকদের উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করলো। অবশেষে আলি দারবানের দলের একজন সৈন্য যখন জোর-জুলুম করে এক পাত্র তেল এই দেশের একজন বাসিন্দার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো, তখন আমি সেই সৈন্যকে ধরে এনে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলাম। এই শাস্তির ফলে তাকে প্রাণ দিতে হলো। এই আদর্শ শাস্তির পর জুলুমবাজি বন্ধ হলো।

এইস্থান ত্যাগ করে আমাদের দ্বিতীয় বারের যাত্রা সুরু হলো। আমরা চালাকের পশুচারণ ক্ষেতে এসে থামলাম। এখানে আলাপ আলোচনা করে স্থির হলো যে কাবুল অবরোধ করার জন্য এইবার এগিয়ে যেতে হবে। আবার আমরা চলা সুরু করলাম।

একদিন আমার সৈন্যব্যূহের প্রধান দল, দক্ষিণ ও বাম বাহু—সকলকে ভাল ভাবে অস্ত্র সজ্জিত করে এবং অশ্বদের বর্ম আবৃত করে কাবুল নগরের প্রান্তে, পৌঁছিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের আড়ম্বর দেখিয়ে নগরবাসীদের অল্পদল্প সায়েস্তা করতে আদেশ দিলাম। আমার সৈন্যরা অপমানকর ভঙ্গি করে জোর কদমে চামার ফটকের কাছে এগিয়ে যায়। যে কয়জন নগরবাসী বেরিয়ে এসেছিল—তারা প্রতিরোধ করার কোনও আশা নাই দেখে স্থান ত্যাগ করে নগরের ভিতর পালিয়ে গেল। কাবুল সহরের কয়েকজন অধিবাসী দুর্গের ওপর থেকে যে ঢালু পথে নেমে এসেছে সেই বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে কি ব্যাপার ঘটছে দেখবার জন্য সমবেত হয়েছিল। তারা পালাতে সুরু করলে এমন ধুলোর ঝড় উঠলো যে তাদের মধ্যে অনেকেই বাঁধ থেকে নীচে পড়ে গেল। এটক এবং সেতুর মাঝামাঝি উঁচু জমিতে এবং রাস্তায় জায়গায় জায়গায় গর্ত্ত করে তার মধ্যে সূঁচলো বাঁশ পুঁতে ওরা ঘাস দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। সুলতান কুলি চেনার এবং আরও কয়েকজন অশ্বারোহী যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তারা এই গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যায়। আমার দলের দক্ষিণ দিকের দুই একজন অশ্বারোহী সৈন্য কুচবাগের দিক থেকে যে দুর্গরক্ষীর দল এগিয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে তরবারির ঘাত-প্রতিঘাত সুরু করে। কিন্তু যুদ্ধ করার কোনও নির্দেশ না থাকায় তারা ফিরে আসে।

সহরের লোক দস্তুর মত ভীত ও মনমরা হয়ে পড়েছে। মোকিম কয়েকজন আমির মারফৎ অধীনতা স্বীকার এবং কাবুল দুর্গ সমর্পণ করার সম্মতি জানালো। তাকে আমার সম্মুখে আনা হলো। সে আমার আনুগত্য স্বীকার করলো। যতদূর সম্ভব তার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। স্থির হলো যে সে পরদিন তার সমস্ত সেনা, অনুচর এবং জিনিষপত্র নিয়ে দুর্গের বাইরে চলে আসবে এবং দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করবে।

পরদিন সকালে মির্জ্জা আর বেগদের মধ্যে যারা ফটক পর্য্যন্ত গিয়েছিল তারা জনসাধারণের হল্লা এবং হুল্লোড় দেখে আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে জানায় যে আমি উপস্থিত না হলে এই উত্তেজনার দমন হবে না। আমি অশ্বারোহণে সেই জায়গায় উপস্থিত হলাম এবং গণ্ডগোল থামিয়ে দিলাম। কিন্তু তা করতে তিন চারজন দাঙ্গাকারীকে শরবিদ্ধ করে হত্যা এবং দুই একজনকে টুকরো টুকরো করে কাটতে আদেশ দিতে হয়েছিল। মোকিম তার দলবল নিয়ে নিরাপদে টিবায় পৌঁছে গেল।

রবিয়ল্ মাসের শেষের দিকে আল্লার দয়ায় আমি কাবুল ও গজ্নি দখল করলাম। সেই সঙ্গে ঐ দুই দেশের অধীন প্রদেশগুলোও বিনা যুদ্ধে আমার অধীনে এসে গেল।

কাবুল দেশটা পৃথিবীর জন-অধ্যুষিত স্থানগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর চার দিকেই পাহাড়ে ঘেরা। শীতকালে এর সবগুলি রাস্তাই শুধু একটি ছাড়া, অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কাফের দস্যুরা পর্বত থেকে নেমে এসে রাস্তায় হানা দেয়। কাবুল দেশটা পাথুরে। বিদেশী কিংবা শত্রুর পক্ষে এদেশ দুর্গম। এর গরম ও ঠাণ্ডা জেলাগুলি কাছে কাছেই আছে। একদিনেই তুমি এমন জায়গায় যেতে পার যেখানে তুষারপাত হয় না। আবার সেখান থেকে দুঘণ্টার পথ চললেই

এমন যায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। কাবুলের উত্তর পশ্চিমে চলকের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র। সেখানে গ্রীষ্মকালে মশার উৎপাত এমন যে ঘোড়াগুলোর বিরক্তির আর সীমা থাকে না।

কাবুল শস্যসম্পদসমৃদ্ধ নয়। একটা শস্য বীজ বুনে যদি চার-পাঁচটা শস্য পাওয়া যায় তা হলে খুব ভাল ফলন হয়েছে বলা যেতে পারে। এখানকার ফল—আঙুর, ডালিম, বাদাম, খোবানি, আপেল, আখরোট, পীচ। আমি চেরিগাছ আনিয়ে এখানে বুনে দিলাম। এই গাছে চমৎকার ফল ধরে। গাছটিও বেশ বাড়তে থাকে। আমিই এখানে আখের চাষ প্রথম আরম্ভ করি।

'কাবুল দুর্গে সুরা চালাও।
পিও নিজে আর পেয়ালা বিলাও।
যে যত পার লোট তো মজা।
একাধারে এটা পাহাড়, নগর,
মরুভূমি আর বিশাল সাগর,
কাবুল জায়গা নয় তো সোজা।'

'কিল্‌কেনে' নামে একটা নির্জন গুপ্ত জায়গা আছে। এইখানে আমাদের অনেক বেলেল্লাপনা চলেছিল।

'কিল্‌কেনে'তে যখন ছিলাম মোরা।
কি সুখেরই দিন ছিল যে
মুক্ত বাঁধন হারা।
সুনাম কিছু ছিল না তখন।
সংযম বাঁধে ভাঙ্গলো যখন,
ছিলাম মোরা স্বাধীন বেপরোয়া।'

এখানকার বাজার ব্যবসায়ীদের পক্ষে চমৎকার আর লাভজনক। যদি ব্যবসায়ীরা জিনিষপত্র নিয়ে চীন কিংবা তুর্কি দেশে যায় তাহলে কাবুলের বাজারে তারা যে মুনাফা করবে সেই রকম মুনাফা ঐ সব দেশে কিছুতেই করতে পারবে না।

হিন্দুস্থান থেকে ব্যবসায়ীর দল নিয়ে আসে বছরে কুড়ি হাজার কাপড়। ক্রীতদাস, শ্বেতবস্ত্র, আখ, ওষুধ, এবং মশলাও হিন্দুস্থান থেকে আমদানি হয়। সওদাগররা শতকরা তিন চারশ' টাকা লাভ করলেও সন্তুষ্ট হয় না।

এগারো বারো রকমের ভাষা কাবুলে চলতি—যেমন, আরবি, পার্শি, তুর্কি, মোগলি, হিন্দী, আফগানি, পাশাই, পরাবি, গেবেরি, বেরেকি ও লামঘানি।

পাহাড়ের পথে নীচে নেমে এলে তুমি এক অন্য জগতে পৌঁছে গেছ। এখানকার বড় বড় গাছ, শস্য, পশু সবই অন্য ধরণের। এদিকের জনসাধারণের ব্যবহার রীতিনীতিও আলাদা।

কাফেরিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে নোয়ারের পিতা সাধু লোমোচের সমাধি আছে। পর্ব্বতগুলির প্রান্তভাগ নানাধরণের টিউলিপ গাছে ভরতি। আমি আমার লোকদের কতরকমের টিউলিপের গাছ আছে গুণে দেখতে বলেছিলাম। তারা নানারকমের তেত্রিশটা গাছ এনে হাজির করে। এখানে খুব বড়বড় সুন্দর ঝাঁকড়া মাথা গাছ আছে।

আমি নদীর ধারে ধারে উদ্যান রচনা করি। একটা পাহাড়ের ধারে আমি ফোয়ারা তৈরী করার আদেশ দিই। এখানে পীতবর্ণের আর ধুগান ফুলের গাছ অপর্য্যাপ্ত। যখন সেই গাছে লাল রংয়ের ছিটে দেওয়া পীতবর্ণের ফুল ফোটে তখন এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য হয় যে তা দেখে আমার মনে হতো—পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর স্থানের কথা কল্পনাতেও আনা যায় না।

শুনতে পেলাম—গজনির একটি সমাধি মন্দির আছে। সেখানে নাকি যখনই কোরানের কোনও বাণী পড়া হয় তখন কবরটা অমনি নড়তে থাকে। আমি সেখানে গেলাম এবং ব্যাপারটাও দেখলাম। সত্যই মনে হলো যে কবরটা চলার গতি পেয়েছে। কিন্তু শেষে বুঝতে পারলাম যে সবটাই কবরখানার অনুচরদের ধাপ্পাবাজি। তারা কবরের ওপর এমন ভাবে একটা মঞ্চ তৈরী করেছে যে তার ওপর কোনও লোক চড়লেই সেটা নড়তে থাকে। দর্শকরা কিন্তু মনে করে যেন কবরটাই নড়ছে। নৌকা চড়ে যেতে হলে যেমন মনে হয় যেন নৌকাটি স্থির হয়ে আছে আর দুই পাশের তীর দুটি চলেছে—ব্যাপারটি ঠিক এই রকম। কবরখানার যে সব লোক ঐ মঞ্চের উপর ছিল তাদের নেমে আসতে বল্লাম। তারপর তারা যতই কোরাণের স্বস্তি বচন আওড়াক না কেন, আর কোনও নড়নচড়ন চোখে পড়েনি। আমি মঞ্চ সরিয়ে ফেলে কবরের ওপর একটা গম্বুজ তৈরী করার আদেশ দিলাম। কবরখানার লোকদের বলে দিলাম যেন ভবিষ্যতে এমন লোক ঠকানো বুজরুকি দেখানোর সাহস তাদের না হয়।

কাবুলের রাজস্ব বন্দোবস্তীর জমির খাজনা আর অবন্দোবস্তীর জমিতে যে সব লোক বাস করে তাদের মাথা পিছু কর মিলিয়ে তিনকোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলো খুব নীচু। তাতে ঘাস জন্মায় না বলিয়া শ্যামলতার অভাব। জলও নাই, একটা গাছও সেখানে জন্মায় না। একটা কুশ্রী, মূল্যহীন পাহাড়ী দেশ। অপর দিকে বড় পর্ব্বতগুলি মানুষের বাসের যোগ্য। কথায় বলে—সঙ্কীর্ণ জায়গাই হীনচেতা মানুষদের কাছে মস্ত বড়। আমার মনে হয় গোটা পৃথিবীতে এই নীচু পাহাড় অঞ্চলের মত কদর্য্য স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাবুলে শীত খুবই প্রবল। শীতকালে অবিরাম তুষারপাত হয়। কিন্তু এখানে জ্বালানি কাঠ প্রচুর মেলে এবং কাছাকাছিই পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা এক দিনের মধ্যেই কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে আসতে পারে। ম্যাস্‌টিক, ওক, তেতো বাদাম এবং কারকেন্দ গাছ সাধারণতঃ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে সব চেয়ে ভাল হচ্ছে ম্যাস্‌টিক। এই কাঠ খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং একটা সুন্দর গন্ধও পাওয়া যায়। এই কাঠের আগুনের তাপ অনেকক্ষণ থাকে, আর কাঁচা থাকলেও জ্বালানোর কোনও অসুবিধা হয় না। ওকও চমৎকার জ্বালানি কাঠ, কিন্তু আগুনের আভাটা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। তবু এ কাঠের

উত্তাপ খুব বেশী, আর আলোও মন্দ হয় না। এই কাঠের অঙ্গার অনেকক্ষণ জ্বলে এবং তা থেকে সুন্দর গন্ধও বের হয়। এই গাছের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি এর সবুজ শাখায় ও পাতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তাবলে একটা থরথর শব্দ করে, এর তলা থেকে ওপর পর্য্যন্ত দপ করে জ্বলে ওঠে আর সমস্ত গাছটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। এই গাছ জ্বলে ওঠার দৃশ্যট খুবই মনোরম। তেতো বাদামের গাছ এখানে অজস্র। এই গাছই সাধারণতঃ জ্বালানি হিসাবে বেশী চলতি। কিন্তু, এর আগুন বেশীক্ষণ থাকে না। কারকেন্দ্ এক রকম কণ্টকময় ঝুপসি লতাগুল্ম। কাঁচা অথবা শুকনো অবস্থায় সমান জ্বলে। গজনিবাসীদের এইটাই একমাত্র জ্বালানি।

আমার কাবুল অধিকার করার পর এই দেশটা, যে সব আমির বা বেগ আমার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যেই ভাগ করে দিলাম। গজনি আর তার অধীন প্রদেশগুলি জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে দিই। এই একবার মাত্র নয়—যেখানে আমি এইরকম ব্যবস্থা করেছি। যখনই পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান আল্লা আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করে আমাকে সমৃদ্ধিদান করেছেন তখনই যে সব বেগ্ ও সৈন্যরা যারা আগে আমার অপরিচিত ছিল এবং পরে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরই—আমার সতত অনুগামী বাবরপন্থী অনুচরদের এবং আন্দেজানবাসীদের চেয়েও বেশী অনুগ্রহ বিতরণ করেছি। এ সত্ত্বেও আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমি বাবরপন্থী ও আন্দেজানবাসী ছাড়া আর কাউকে অনুগ্রহ করি এই অপবাদ আমার কপালে বরাবর জুটেছে। একটি চলতি কবিতা আছে—

'শত্রুতে কি না বলে,
স্বপনে কি না চলে,
তাই না কি ?
নগর দুয়ার বন্ধ কর
ইচ্ছামত।
শত্রুর মুখ বন্ধ করছ ?
সাধ্যাতীত।
ঠিক না কি ?

কাবুল, গজনি ও তার অধীন প্রদেশগুলি থেকে ত্রিশ হাজার বস্তা খাদ্যশস্য আদায় করার কথা স্থির হলো। আমি তখনও কাবুলের রাজস্ব ঠিক কত, আর তার সঙ্গতিও বা কতখানি সে সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারি নি। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্পিত শস্য আদায়ের পরিমাণ খুবই বেশী হয়েছিল এবং অত্যধিক চাপে দেশটিকে খুবই ভুগতে হয়েছিল।

এই সময় আমি একটা নতুন লিপি উদ্ভাবন করি—যার নাম দিই বাবর লিপি।

হাজারাসবাসীদের করস্বরূপ অনেকগুলি ঘোড়া ও ভেড়া দেওয়ার জন্য আদেশ দিই। সেগুলি আদায় করার জন্য লোকও পাঠাই। কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারি যে তারা দিতে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। গজনির রাস্তাগুলির ওপর তাদের লুটতরাজের অভিযোগ কিছুদিন আগেই শুনেছি। এই কারণে আমি তাদের ওপর হঠাৎ চড়াও হব এই ভেবে সৈন্য নিয়ে রওনা হই। মিদানের পথে অগ্রসর হয়ে আমরা পার্বত্য পথ রাত্রেই অতিক্রম করে সকালের নমাজের সময় হাজারাসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাদের মনের সুখে পিটিয়ে সায়েস্তা করতে সক্ষম হই। সেখান থেকে ফিরবার সময় জাহাঙ্গীর মির্জ্জা বিদায় নিয়ে গজনির দিকে গেলেন, আর আমি কাবুলে ফিরে এলাম।

হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিলাষ

পরামর্শ সভায় স্থির হয় যে হিন্দুস্থান সহসা আক্রমণ করতে হবে। শাবান মাসে—যখন সূর্য্য মীন রাশিতে—আমি কাবুলে থেকে হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা করি। ছয়বার নিয়মিত সৈন্য চালনা করে আদিনাপুরে পৌঁছে যাই। এর আগে আমি কখনও গরম ঋতুর দেশ দেখিনি—হিন্দুস্থানের কোনও দেশও জানি না। এই সব জায়গায় পৌঁছিয়ে মনে হলো যেন নতুন জগৎ দেখছি। এখানকার তৃণ আলাদা, গাছ আলাদা, বন্য জন্তুরাও অন্য রকমের, পাখীগুলির পালকও বিচিত্র ধরণের, আর যাযাবর জাতিগুলির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও ভিন্ন রকমের। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। অবশ্য বিস্ময় বোধ করার কারণও ছিল।

আরও কিছুদূর এগিয়ে খাইবার অতিক্রম করি। তারপর কোহাটের দিকে রওনা হই। দুপুর নাগাদ কোহাটে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট সুরু করে দেওয়া হয়। অনেক ষাঁড় আর মহিষ আমাদের হাতে এসে পড়ে। অনেক আফগানও আমাদের হাতে বন্দী হয়। তবে সকল বন্দীকেই আমি খুঁজে বের করি এবং পরে তাদের মুক্তি দান করি। তাদের বাড়িতে প্রচুর খাদ্য শস্য মজুত আছে দেখা গেল। আমার লুঠেরার দলগুলি সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তার তীরে রাত কাটাই। পরদিন তারা ফিরে এসে আবার আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু আমার সৈন্যরা এমন কিছু ধন সম্পত্তি পেল না—যার কথা বাকি বেগ বার বার এতদিন আমাদের শুনিয়েছে।

দুইদিন দুই রাত্রি কোহাটে অপেক্ষা করে এবং লুটেরার দলগুলিকে একত্রিত করে আমরা পরামর্শ করতে লাগলাম আমাদের যাত্রাপথ এখন কোন দিকে হবে। ঠিক হলো—আমরা 'বাসু' আক্রমণ করে সেখানকার আফগানদের পর্য্যুদস্ত করে ফিরে আসবো। কামারি আমাদের পথপ্রদর্শক হলো—কারণ সে আফগানিস্থানের সকল জায়গার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে বল্লো—কিছুদূর এগিয়েই রাস্তার ডান পাশে একটা পাহাড় পাওয়া যায়। যদি আফগানরা উঁচু পর্ব্বত থেকে নেমে এসে এই ছোট পাহাড়ে জমায়েৎ হয়, তাহ'লে তাদের আমরা চারদিক্ থেকে ঘেরাও করে বন্দী করতে পারব—কারণ উঁচু পর্ব্বত থেকে ছোট পাহাড়টা বিচ্ছিন্ন।

সর্ব্বশক্তিমান আল্লা আমাদের ইচ্ছা পূরণ করলেন। আফগানরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পর্ব্বত ছেড়ে বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে

জমায়েৎ হলো। আমার এক সৈন্যদলকে পর্বত এবং ছোট পাহাড়ের মধ্যে যে ভূমিখণ্ড আছে সেইটা দখল করতে আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিলাম। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে পাহাড়ে আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে আফগানদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম।

আমার সৈন্যরা এগিয়ে যেতেই আফগানরা প্রমাদ গণলো। তারা যে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না এটা বেশ বুঝতে পারলো। তড়িৎগতিতে সৈন্যরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একশ কি দেড়শ' জনকে ধরাশায়ী করে ফেল্‌লো। এদের মধ্যে কয়েকজনকে জীবন্তই আমার কাছে ধরে নিয়ে এল, কিন্তু বেশীর ভাগেই তাদের কাটা মুণ্ডু আমার সামনে হাজির করা হলো। আফগানরা যুদ্ধে পরাস্ত হলে তাদের বিজয়ী শত্রুর সামনে দাঁতে তৃণ নিয়ে বলতে স্বীকার করে। বোধ হয় তারা বলতে চায় যে আমি তোমার আশ্রিত ষাঁড়। আফগানদের এই রীতি আমি প্রথম দেখলাম। আফগানরা যখন দেখলো যে আর সঙ্ঘর্ষ চালানো সম্ভব হবে না—তখন তারা দাঁতে ঘাস নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। যে সব আফগানকে জীবন্ত ধরে আনা হয় তাদের শিরচ্ছেদ করার আদেশ দিলাম। আমাদের পরবর্তী বিশ্রামের জায়গায় ঐ সব ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে একটা চুড়া করা হলো।

পরদিন সকালে এগিয়ে গিয়ে জাঙ্গুতে শিবির ফেলে। সেদিককার আফগানরা একটা পাহাড়কে সুরক্ষিত করে একটা 'সাঙ্গরে' রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আমি কাবুলে এসেই প্রথমে এই 'সাঙ্গর' কথাটা শুনি। একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়কে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য যদি সুরক্ষিত করা হয়—সেটিকেই সাঙ্গর বলে। আমার সৈন্যরা এই 'সাঙ্গরের' কাছে আসবামাত্র আক্রমণ চালায়। সাঙ্গরটিকে বিধ্বস্ত করে সেটাকে অধিকার করবার পর তারা শ'দুয়েক অবাধ্য আফগানকে ধরে এনে তাদের শিরচ্ছেদ করে। এখানেও নরমুণ্ডের আর একটি চূড়া তৈরী করা হয়।

বান্নু প্রদেশে অবতরণ করে সংবাদ পাওয়া গেল যে সমতলবাসী উপজাতিরা উত্তর দিকের পাহাড়গুলিতে সাঙ্গর গড়ে তুলেছে। জাহাঙ্গীর মির্জ্জার অধীনে একদল সৈন্য সেই দিকে পাঠাই। যে 'সাঙ্গরে'র বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালান সেটা 'কি ভি' উপজাতীয়দের। মুহূর্ত্তের মধ্যে ওটা অধিকার করা হলো। তারপর সুরু হলো হত্যাকাণ্ড। অনেকগুলি কাটামুণ্ডু আমার শিবিরে নিয়ে এলো। সৈন্যগণ এই অভিযানে নানা রকমের অনেক বস্ত্র লুঠ করে নেয়। বান্নুতে মাথার খুলি স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়। 'সাঙ্গর' অধিকার করার পর, এখানকার একজন দলনেতা দাঁতে তৃণ নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়ে আমার বশ্যতা স্বীকার করে। তাকে মার্জ্জনা করলাম। যে সব লোককে জীবন্তে বন্দী করে আনা হয়েছিল তাদেরও তার সঙ্গে ফিরিয়ে দিলাম।

কোহাট বিধ্বস্ত করবার পরে স্থির হয়েছিল যে বান্নুর আফগানদের লুটপাট করে আমরা কাবুলে ফিরে যাব। বান্নু বিধ্বস্ত হবার পর কিন্তু এ দিকের পথঘাট সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল তারা বল্‌লো যে 'দেস্ত' এখান থেকে বেশী দূর নয়, সেখানকার অধিবাসীরাও বেশ ধনী এবং ও দিকের রাস্তাও না কি ভাল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে এখান থেকে না ফিরে 'দেস্ত' প্রদেশ লুণ্ঠন করে ঐ দিককার রাস্তা ধরেই কাবুলে ফিরে যাওয়া হবে।

সেই রাত্রেই 'ইসাখেলে'র আফগানরা অতর্কিত আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি বিশেষ সতর্ক থাকায় তাদের মতলব সিদ্ধ হলোনা। আমার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধসজ্জায় তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল ডাইনে ও বাঁয়ে—সামনে ও পিছনে ব্যূহবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত ছিল তারা। শিবির থেকে অল্প দূরে পদাতিক সৈন্যরাও চারদিকে নজর রাখছিল। এই ভাবেই সারারাত কেটে গেল। প্রতি রাতেই এই ভাবে সৈন্য সাজিয়ে রাখা হতো এবং আমার তিন চার জন বিশ্বাসী সেনাপতি মশাল নিয়ে সৈন্য শিবিরগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতো। আমিও এক একবার নিজে ঘুরে দেখে আসতাম। যে সব সৈন্য তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতো না, তাদের নাক বিঁধিয়ে দেওয়া হতো এবং সেই অবস্থায় শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হ'তো।

গোমাল নদীর তীরে ইদের নমাজ পড়া হলো। এ বছর নওরোজের উৎসব ইদলফেতরের কাছাকাছি পড়েছিল। এই উৎসবের মাঝে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। এই উপলক্ষে আমি পারসী ভাষায় এই কবিতা রচনা করি।

'(শুনি) দ্বিতীয়ার চাঁদ আর
প্রিয়ার আনন
যে দেখে এক সাথে
অতি ভাগ্যবান।
(কিন্তু) আমার প্রিয়ার মুখ
আর জোড়া ভুরু
দেখে কেন কাঁপে বুক
হই ম্রিয়মান?

'হে বাবর।
তোমার প্রিয়ার মুখ
আর নয়া চাঁদে
আছে কি প্রভেদ?
প্রিয়া দরশনে
মনে কি হয় তব
নওরোজ উৎসব কলা?
এ কলা কি জাগে তব মনে
শত নওরোজের আনন্দেরও বাড়া
ঘটে গেল একদিনে
প্রিয়া দরশনে?

গোমাল নদীর তীর ছেড়ে আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলাম এবং পর্ব্বতের ধারে ধারে চলতে লাগলাম। আমরা দুই এক মাইল অগ্রসর হতেই পর্ব্বত সংলগ্ন উঁচু টিলার ওপর মৃত্যুভয়হীন একদল আফগানকে

দেখতে পেলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলাম। ওদের বেশীর ভাগই পালিয়ে গেল। অল্প কয়েকজন পর্ব্বতসংলগ্ন কয়েকটি টিলার উপর থেকে নির্বোধের মত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো। একজন আফগান একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের ওপর প্রতিরোধের জন্ম দাঁড়িয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে এই যে পাহাড়টার তিন দিকেই এমন খাড়াই যে পালানোর আর পথ ছিল না। যেদিকে পথ সেই দিকেই আমরা এসে পড়েছি। সুলতান আলি সেই পথ দিয়ে উপরে উঠে গেল এবং আফগানটিকে পরাস্ত করে তাকে ধরে নিয়ে এল। তার এই বীরত্ব—যেটা আমার সম্মুখেই সে দেখিয়েছিল—সেটা তার ভবিষ্যতে উন্নতি ও আমার অনুগ্রহ লাভের কারণ হয়েছিল। আর একটা পাহাড়ের ঢালুতে কুতলুক আর একজন আফগানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় তারা দুই-জনই পঁচিশ ফুট নীচে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যায়। শেষে যাহোক, কুতলুক সেই আফগানের শিরচ্ছেদ করে আমার কাছে নিয়ে আসে। কোপেক বেগ একটা খাড়া টিলার ওপর আর একজন আফগানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করার সময় দুই যোদ্ধাই টিলার ঢালু গা বেয়ে ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে আসে। আফগানের মাথাটা কিন্তু তার মধ্যেই কাটা গিয়াছে। এই সময় অনেক আফগানই আমার হাতে বন্দী হয় কিন্তু আমি সকলকেই মুক্তি দিই।

'দেস্ত' থেকে ফিরে আবার আমরা সিন্ধু-নদের তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই দিককার সমস্ত লোক প্রাণ ভয়ে অপর পারে চলে গিয়েছে। নদীর দুই তীরের মাঝে একটা চড়া। সেই চড়া ডিঙিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছিয়ে কয়েকজন লোক আমার লোকদের দিকে অপমান-সূচক অঙ্গভঙ্গি করে তরবারি আস্ফালন করতে থাকে। তাদের ভাবখানা এই যে চড়াটার এদিককার নদী যখন এত বেশী চওড়া, তখন আমাদের লোক বিনা নৌকায় কিছুতেই ওপারে যেতে পারবে না। এই চড়াটায় আমার দলের যে কয়েকজন লোক এসেছিল—তার মধ্যে কুল বেদিদ একজন। সে একাই একটা নিরাভরণ ঘোড়ায় চড়ে জলে নেমেগেল। তারপর ঘোড়া সমেত ভেসে চললো অপর পারে—শত্রুর দিকে। চড়াটার চেয়ে ও পারের নদীর বিস্তার দ্বিগুণ। ঘোড়ার ওপর কিছুদূর ভেসে যাওয়ার পর যখন সে নদীর পাড়ের ওপর দাঁড়ানো শত্রুর তীরের পাল্লার মধ্যে প্রায় পৌঁচেছে—তখন তার ঘোড়ার পা জলের তলায় মাটি স্পর্শ করলো। জল কিন্তু তখনও ঘোড়ার পিঠ পর্য্যন্ত—আগুনে দুধ ফুটতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে যখন দেখলো যে তার সাহায্যকারী পেছনে কেউ নেই, তখন মন স্থির করে নদীর তীরে দাঁড়ানো শত্রুর দিকে ছুটে চললো। শত্রুপক্ষ দুই তিনটা তীর ছুঁড়লো বটে, কিন্তু সাহস করে সেখানে অপেক্ষা করার কথা তাদের মনে হলোনা। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

একা সরঞ্জামহীন ঘোড়ার পিঠে কিছুমাত্র সাহায্যের প্রত্যাশা না করে সিন্ধু নদের মত বিশাল নদী সাঁতরিয়ে শত্রুদলকে হঠে যেতে বাধ্য করা ও তাদের ঘাঁটি অধিকার করা একটা বিশেষ দুরূহ বীরত্বপূর্ণ কাজ। শত্রুরা পালিয়ে যেতে আমার সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে নদী পেরিয়ে এলো। শত্রুর ফেলে যাওয়া বস্ত্র, পশু এবং আরও অনেক রকমের জিনিষ তারা লুঠ করলো। পূর্বে আমি অনেকবার বীরত্বের জন্ম সেখ বেসিদকে অনুগ্রহ দেখিয়েছি এবং তাকে রসুই করার কাজ থেকে খাস্ত পরীক্ষকের কাজে উন্নীত করেছি। তার এখনকার এই অসীম-সাহসিক বীরত্বের কাজ দেখে আমি এমন মুগ্ধ হলাম যে সময় মত তাকে যথাযথ পুরস্কৃত করার সঙ্কল্প তখনই করে ফেলি এবং সেই সঙ্কল্প অনুসারে তাকে যে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করি—সেকথা পরে উল্লেখ করছি। সত্যি বলতে কি—সে প্রভূত অনুগ্রহ এবং সম্মানলাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

সিন্ধুনদের ভাটির দিকে তার বরাবর দুইবার সৈন্য চালিয়ে এগিয়ে যাই। সৈন্যরা দলবদ্ধ হয়ে লুঠতরাজের দিকে ঝোঁক দেওয়ায় ঘোড়া-গুলি কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা কোনও উল্লেখযোগ্য লুঠের মাল আনতে পারেনি—লুঠের মালের বেশীর ভাগই বলদ। সিন্ধুনদের তীরে যাওয়ার সময় এটা অবশ্য লক্ষ্য করা গেল যে—একটা নগণ্য সেনাও তিন চারশ' বলদ এবং গরু সংগ্রহ করে ফেলেছে।

সিন্ধুনদের ধারে ধারে তিনবার সৈন্যচালনার পর আমরা সে পথ ছেড়ে ডেরাগাজি খানের সমাধি মন্দিরের দিকে ধাওয়া করি এবং সেখা-সেই খামি সমাধির কয়েকজন কর্ম্মচারীকে আমার কয়েকজন সৈন্য আহত করায় তাদের একজনকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। হিন্দুস্থানে এই সমাধির সম্মান অত্যন্ত বেশী।

এখান থেকে আবার মার্চ সুরু করে যেখানে থামি সেখান থেকে একদল সৈন্যকে—যাদের ঘোড়ার তখনও চলার শক্তি ছিল তাদের—কাছাকাছি জায়গায় আফগানদের আক্রমণ করে লুঠতরাজ করবার জন্য জাহাঙ্গীর মির্জ্জাকে দলপতি করে পাঠিয়ে দিই। এই সময়টা সৈন্যদলের ঘোড়াগুলোর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে দিনে দুই তিনশ' ঘোড়াকে পেছনে ফেলে রেখে আসতে হয়। তিনবার সেনা চালনা করে জাহাঙ্গির মির্জ্জা একদল পাঠানকে লুণ্ঠন করে কয়েকটি ভেড়া নিয়ে আসেন।

আবার দুই একটা মার্চের পর আমরা 'আব—ইস্তাদে' পৌঁছাই—সেখানে আমাদের চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠলো। জল আর জল। অপর দিকের তীর ভূমি চোখে পড়ে না। মনে হলো—জল যেন আকাশে মিলেছে। আরও দূরের পাহাড় পর্ব্বত। মনে হলো যেন উল্টে গিয়েছে—যেমন মরীচিকার ওপারের পাহাড় পর্ব্বত দেখলে মনে হয়। কাছের পাহাড়গুলো দেখে মনে হলো যেন আকাশ আর মাটির মাঝখানে ঝুলছে। 'আব—ইস্তাদের' এক মাইলের মধ্যে যখন এসে পৌঁছাই তখন আর একটা দৃশ্য চোখে পড়লো। সময় সময় মনে হচ্ছিল যেন আকাশ আর জলের মাঝখানে একটা লাল রংয়ের আস্তরণ ভেসে উঠছে, আবার ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা কাছাকাছি এলাম এই দৃশ্য দেখতে পেলাম। কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল যে এ আর কিছুই নয়—বুনো ফ্লেমিংগোর পাখীর



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বারাণসী

ফটো : বংশী ঘারাল



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ মৃৎ-পাত্র ফটো : পুলিনবিহারী চক্রবর্তী

একটা বিরাট ঝাঁকে। এক এক ঝাঁক বিশ হাজারের নয়—অগণিত সংখ্যায় তার গণনা হয় না। এদের ওড়বার সময়—যখন তাদের লাল ডানা বিস্তার করে, তখন দেখা যায় লাল—আবার ডানা সঙ্কুচিত করলে আর লাল রং দেখা যায় না। শুধু ফ্লেমিংগোই নয়, নানা জাতের অসংখ্য পাখী এই জলধারার তীরে বাস করে। তীরের কিনারে এইসব অসংখ্য পাখী ডিম পাড়ে।

'সির্দের' জলাশয় অতিক্রম করে আমরা গজ্‌নি পৌঁছাই। জাহাঙ্গির মিজা আমাদের সেখানে আপ্যায়িত করে নানা খাদ্য দ্রব্য উপহার দেন। আমরা দুই একদিন সম্মানিত অতিথি হিসাবে সেখানে কাটাই। জেল-হজ্জ মাসে আমরা কাবুলে পৌঁছে যাই।

খসরু সা আজের থেকে পালিয়ে খোরাসানের দিকে এগোতে থাকে।

থামূজে সুলতান আমু নদীর তীরে তীরে সেরাই পর্য্যন্ত এগিয়ে সেখানে থেকে তার ছেলেদের ও বেগ্‌মের অধিনায়কত্বে কুন্দোজ সৈন্য পাঠায়। তারা সেখানে পৌঁছিয়েই যুদ্ধ শুরু করে দেয়। খসরু সা সে যুদ্ধে পরাজিত হয়। তার ঘৃণ্য দেহ নিয়ে সে পালাতেও পারে না। তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বন্দী করা হয়। তাকে কুন্দোজে আনবার পর তার শিরচ্ছেদ করা হয়। যে মুহূর্ত্তে আমি এই সংবাদ শুনি, আগুনে জল পড়লে যেমন হয় তেমনি আমার মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

বিদেশীর চক্ষে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সিংহ ছোটে, মাঝে মাঝে দাঁড়ায় থমকে—পিছনে তাকায়—সব পথটা সমগ্রভাবে দেখতে গেলে আবশ্যক সিংহাবলোকন জীবনটা বর্ত্তমানকে ঘিরে। ভবিষ্যত মাত্র পরিণতি অতীতের।

কী দেখেছি আর আজ দেখছি কি ?

আমি বিগত সাতাশ বছর কাজের মাঝে ছুটি পেলে, ছুটে বেড়াই বিদেশে। ভারতবর্ষ দেশ—তার বাহিরের ভূখণ্ড বিদেশ। দেশের বিভিন্ন স্থলে ঘুরেছি। প্রথম যখন গেলাম বর্মা, পেনাং, মালাক্কা, শিঙ্গাপুর, ইংরাজি তেত্রিশ সালে। বুঝলাম ইংরাজ আমায় যা ভাবে ভাবুক ; দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতে আমি একজন বড় ঘরের ছেলে। আমার সম্ভ্রান্ততা স্পষ্ট দেশের বাহিরে। বিদেশে আমি প্রাচীন সভ্যতা-পুষ্ট। জাহাজে যারা সঙ্গে যেতো, তাদের মধ্যে প্রায় গঙ্গাসাগর অবধি, ইংরাজ সহ-যাত্রী একটু দূরে সরবার চেষ্টা করত। তারপর মার্কিনী ওলন্দাজ আধা বর্ম্মী প্রভৃতি সঙ্গীকে তারাও সহ্য করত। আমি পরাধীন জাতির একজন লোক তো। সাগরের দোলায় তারা মুখোস বন্ধুত্ব করত, হাত দেখাতো, আমার তাসের বাজি দেখতো। যত গণ্ডগোল ছিল দেশে। সেথায় ইংরাজ দেখলে কাষ্ঠহাসি হেসে ছাড়তে হত। পথ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতাম—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়।

স্বাধীনতা এলো। হাঁক ছাড়লাম। দেশ ভ্রমণের বাতিক বাড়লো বই কম্‌লো না। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় আরো বার কতক ঘুরলাম। ইজ্জত অনেক বেড়েছে। সেই সব দেশ আমাকে আরও মুগ্ধ করলে। তারাও স্বাধীন হয়েছে। উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করি তাদের গতি-বিধি অন্তর্নিহিত ভাবধারা। তারাও আনন্দ পায় ভারতের গল্প শুনতে।

লঙ্কার ভাষা গড়গড়ে। এক মন্দির হতে পথে আসছি। হতভাগ্য খোঁড়া ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে, চেঁচিয়ে কী বলছে—মন্ত্র পন্থ—তার মাঝে স্পষ্ট দুটা কথা—দান, মহাপুণ্য। হঠাৎ যেন চোখ গেল খুলে। আসছি বুদ্ধ-মন্দির হ'তে। আরে তিনি যে বুদ্ধ ভগবান—শাক্যসিংহ ভারতের রাজপুত্র গৌতম। তাঁকেইতো মন্দিরের পূজা পাঠ—সবই ভারতীয়—ভাষাও পালি। পাশের বন্ধুর চমক ভাঙলো। বল্লে—বলীসিং বড় ভালবাসে এই মন্দির। বলীসিংহ অনাগারিক ধর্ম্মপালের হাতে-গড়া শিষ্য।—ভারতীয় নাম। ডাক্তার মলসশেখর কথা বলছে, আদর করে দেশ দেখাচ্ছে—এদের ও তো নাম ভারতীয়। বন্ধুবর সিলোন সিভিল

সার্ভিসের এক শ্রেষ্ঠ লোক।' কী আত্মীয়তা, কী আতিথেয়তা, সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মপত্নী—নিজেদের মোটরে সারা সিংহল ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেন—তাঁদেরও নাম কেন, আচার-ব্যবহার সবই আমাদের মতো। মুনিসিংহ নাম।

আর সিংহলের যত মন্দির, শিল্পকলার বিকাশ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তার মূলে আছে ভারতীয় প্রভাব ও প্রেরণা। এরাও তো আমাদেরই এক ভাগ। পাঞ্জাবীর ভাষা বুঝিনা। বুঝিনা কানাড়ী, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম ভাষা। কিন্তু সে ভাষা কয় যারা—তারা তো আমাদের ভাই। দক্ষিণ ভারতের মন্দির হিন্দুকলাবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে কেন বুঝিনা—সিংহলের লোকের সাথে যে কৃষ্টি-গত সম্বন্ধ তাকে বাড়ানো—ভারতের এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্ট বিকাশ। সত্যই তো পাণ্ডিত নেহেরু বিজ্ঞ—যখন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাণী উদ্ধৃত করে এসিয়ার সবার সঙ্গে ভ্রাতৃ-ভাব পোষণ করবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্র বুঝিয়েছিলেন যে ভারতকে জানতে গেলে ভ্রমণ করতে হয় সেই যুগে—যখন ভারত চিনেছিল তার আত্মাকে। সেদিন ভারত তার পরিখার সীমা লঙ্ঘন করেছিল। সেদিন প্রকাশ করেছিল ভারত তার মহত্বের রশ্মি—যার উজ্জ্বল ঝলক বিস্ময়ে মুগ্ধ করেছিল পূর্ব গগন। বাহিরের জগৎ সে দিন সাড়া দিয়েছিল জাগরণের আহ্বানে।

সে আহ্বান ছিল ভীষণ। আজিও তার প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া জুড়ে।

তিব্বতী সভ্যতা—বাঙলার হিমাচলঘিরে। তার শিল্প ও সাধনা ভারতের। ভাষা বিভিন্ন, পোষাক বিভিন্ন, খোরাকও বিভিন্ন। কিন্তু অন্তর্নিহিত জীবনের সত্যের বাণী ও প্রেরণার মূল ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম, তন্ত্রের প্রকৃতি-পূজা।

বহুবার গেছি ব্রহ্মদেশ। পোষাক, ভাষা, নাম, আহার্য্য বিভিন্ন। কিন্তু সবার প্রাণ মন্দিরের দিকে। প্যাগোডা দেখি, তার মাঝে মূর্ত্তি দর্শন করি। পূজা করে নরনারী নতজানু হয়ে, বেদীতে অর্ঘ দেয় পুষ্প, জ্বেলে দেয় ধূপ ও বাতি। বিদেশে দেখি নিজের দেশ। স্তবের সুর কানে আসে—একটু বিকৃত উচ্চারণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামিকে বলে হয়তো কেহ গস্থামি—তেমন তো ভারতের বিভিন্ন সব দেশের উচ্চারণ ভেদ।

সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, থাইল্যাণ্ডে কতবার শুনেছি—সে দেশের ভিক্ষুর মুখে বুদ্ধ-মন্দিরে—

ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্খন্তু সব্ব দেবতা
সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তুমে।

আরও পূর্বে যাই। আজ চীন ধর্ম্ম মানেনা, কিন্তু বহু চীনা ধর্ম্ম মানে—ভারতের ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

থাইল্যাণ্ড, আঙ্কর, কম্বোদীয় সব বক্ষে ধারণ করছে ভারত-মৈত্রীর নিদর্শন—গৃহে, জীবনে ও ভাবধারায়।

জাপান এক নূতন জীবন স্রোতের মাঝে। তার সভ্যতার বহিরাবরণ পাশ্চাত্য। সহরের আশেপাশে কল-কারখানা—আমেরিকার প্রভাব। ব্যবসা বাণিজ্য জগৎ জুড়ে—ইংলণ্ড ও মার্কিনী অর্থনীতি এবং ব্যবসায়-নীতি আয়ত্ত করেছে জাপান। টোকিয়োর পথে পুরুষ দেখি বিলাতী সাজে, স্ত্রীলোক দেখি পাশ্চাত্য পোষাক স্কার্ট পরিহিতা। কিন্তু যখন পাই আমন্ত্রণ জাপানী বন্ধুর গৃহে—তখন ঘরে ঢুকতে হয় জুতা খুলে, ভোজনে বসতে হয় মাটিতে—আর দেখি তার স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, মাতা সবাই কিমোনো সজ্জিতা। ভাবভঙ্গী মনে পাড়িয়ে দেয় ঘরের কথা বিদেশীকে। মন্দিরের তো কথা নাই। পূজা, আরতি সব দেশীভাব। আর তার মাঝে ভারতবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা—প্রাচীন ঐতিহ্য মেলে।

থাইল্যাণ্ডের ইন্দ্রর চিত্র ঘরে ঘরে। আর দেখি দেবতার মাথায় টোপর—যার অনুরূপ বাংলাদেশে দেখি বরের মাথায় বিবাহ বাসরে। ডাকঘরের ওপর গরুড়ের মূর্ত্তি—আকাশ পথে আজ ওড়ে চিঠি। হাওয়াই জাহাজ তো মানুষ-গড়া যন্ত্র। তার প্রাণ-তো গরুড়ের শক্তি-সম্পন্ন। তাই ডাকঘরে বিরাজিত-বিষ্ণুর বাহন। এদেশ আমাকে আদর করেছে বার বার যখন সেথায় গেছি।

বালির তো কথা নাই। সে হিন্দুর দেশ। বরবুদর প্রসিদ্ধ মন্দির হিন্দু ও বৌদ্ধ স্মৃতি বহন করে আছে প্রতি অঙ্গে। শিঙ্গাপুরের বাগানে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কথা মূর্ত্তিতে যদিও রাম রাবণের নাম চীনা ভাষায়।

আমি একথা বলছি দেশ-বিদেশের কথার উল্লেখ করবার জন্য। কেবল আমার দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সে বিস্তার এবং নিজস্বকরণ ভারতের ধর্ম্ম, কৃষ্টি এবং কৃতিত্ব। ভারতের মাঝে—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে আসে কোথা হ'তে সমুদ্রে হয় হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক্ হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

স্বাধীনতার পর দেশ-নায়কেরা এই নীতির জন্য কত না উপদেশ দিয়েছেন ভারতবাসীকে। নাম বৌদ্ধ দর্শন হতে গৃহীত হলেও রাজনীতির পঞ্চ-শীল অতি উদার নীতি বিশ্ব-শান্তির।

দেখেছি এই দেশেই মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত ও দেশ-ভক্ত তিলক। আজ যারা নায়ক, তাদেরও শ্রীমুখে সাম্যের বাণী। পরমহংসদেব, রামমোহন, বিবেকানন্দ—আর এ যুগের বহু কৃতী সন্তানের নাম বিদেশ জানে।

এ সব দেখেছি। মাত্র রাজনীতিক্ষেত্রের কথা বলছি। আর আজ কি দেখছি ঐ রাজনীতি ক্ষেত্রে?

সে কথা বলতেও নিজের উপর ঘৃণা হয়। কারণ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি সমষ্টির অংশ। আজ আমি যা' দেখছি, যা শুনছি, তার ফলে মনে হয়, মাথায় থাক বিদেশ—এখন নিজের দেশ সম্বন্ধে যদি কেহ বই লেখে, বেচারা উড়রফের আত্মাও চোট খাবে। আজ তাঁর প্রশ্ন "Is India Civilised?"

এর যে উত্তর মুখে আসছে তা বলতে চাহিনা।

দেশে আমাদের যা প্রতিষ্ঠা, বিদেশে আমাদের যা' যশ, মান, সম্পদ—সব কি জলাঞ্জলি দিলে আমরা মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাবার ভরসা রাখব?

জীবন ছন্দ। জীবন সুরের বিকাশ।

হিন্দু মহাপূজার দিনে সজল নয়নে বিশ্ব-মাতাকে ডেকে বলবে না কি—

মা, আজ সে ছন্দ-হারা কেন তোমার সন্তান? কেন জীবনের সুর পশুর রবে পরিণত হয়েছে?

তুমি যে মা—সবার মঙ্গলকারিণী মঙ্গলময়ী। শিবে তুমি সকল অর্থসাধিকে। তুমি ত্রিকালদর্শিনী গৌরি, তুমি যে নারায়ণী।

কিন্তু এ অপবিত্র সন্তানের কি স্পর্দ্ধা আছে বলবার কামাখ্যা দেবীকে—নমস্তুতে।

আজ কী দেখছি? কী শুনছি? আকাশ, বাতাস আজ কোন বেসুরো ছন্দহীন পাশব ধ্বনিতে শঙ্কিত? পাশের ঘরের বিভীষিকা। মাত্র ভাবছি—কী বলবে তারা—বাহিরে যখন সংবাদ পৌছবে—হিন্দু হিন্দুর রক্তপাত করছে, ভারতীয় কাটছে ভারতবাসীকে—নির্যাতন, ব্যভিচার—নৃশংস হিংস্রক পশু প্রবৃত্তির বশে।

একেবারে ঘরের কথা—ঘরের বাহিরে চলবার পথের নির্দয় কাহিনী—শ্রীচৈতন্যের দেশের, বুদ্ধদেবের দেশের, মাত্র সে-দিনকার গান্ধীজীর দেশের। মহিলাটি আর্জিনটাইনের—বেশ ইংরাজি বলে, বিবেকানন্দের নামে উল্লসিত হয়। আমি বিদেশী স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুরের ঘর দেখলে, খাট দেখলে, তার পর ভাব এলো। মূর্চ্ছা। স্বামী লজ্জিত হল। আমি বললাম—ডেকোনা ওকে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ধ্যান ভাঙ্গল। মাপ চাহিল। আমি আদর করলাম। হেসে বল্লে—পারলাম না—ট্রান্স হল; মনে হ'ল যেন পরমহংসকে দেখছি।

"বেশ হ'ল। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। মেরী মা প্রভু যীশু—তোমার চিত্ত করুন পবিত্র। পরমহংসদেব তোমার ভক্তি বাড়াবেন।

সেই মেয়ে একদিন বল্লে—আঙ্কেল একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? মাপ করবেন?

"দুষ্ট মেয়ে। লজ্জা কী? গালা গালি দেবে?"

"সত্যি আঙ্কেল। দোষ নিওনা। ফুটপাথের ওপর রুগ্ন জীর্ণবাসে ধুলা মেখে যারা পড়ে থাকে—তাদের উদ্ধার করবার কেন ধৈর্য্য নাই সরকারের বা সমাজের, সমাজ-তান্ত্রিক দেশে? স্বামী লজ্জিত। ব'ল্লে—ওদের মাঝে। পেশাদার ভিক্ষুক আছে। আমি শুনেছি।

রেচেল একটিকে দেখিয়ে বল্লে—এ তো তোমার মত কারখানা চালাতে পারেনা। ছিঃ আঙ্কেল। এর বুঝি ভোট নেই? থাকলে নিশ্চয় তোমরা ওর তোয়াজ করতে।

মাথা হেঁট হ'ল। জবাব দেব কি?

বদমায়েস তাকে পথে শুয়ে তাকে ধরে নিয়ে কাজ করালে—দুদিনে কলকাতা ছাড়ে পালায় অন্যত্র।

আর প্রকৃত পঙ্গু? সে পড়ে থাকে, মেডিকেল কলেজ চিকিৎসাগারের দেওয়ালের ধারে, ইশলামীয়া হাঁস-পাতালের বাহিরে বারান্দার নিচে। সংক্রামক রোগের বীজের সে আকর। দরিদ্র নাগরিক নিরাশ্রয়। তাকে রাজ-পুরুষ ভি-আই-পি দেখে নাক শিট্‌কায় যখন সে নাগরিকের কর হ'তে কেনা মোটরে চড়ে জয়যাত্রা করে।

ছি:। কত মিথ্যা কথা বলি দেশের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য—বিদেশীর কাছে যখন গাড়ি থামলেই চাকার তলা থেকে ভিখারিণী বাহির হয়; কোলে ধার-করা ভাড়া-করা নগ্নশিশু নিয়ে অভিনয় ক'রে অনাহারিণীর।

পাঁচ-শালা দশ-শালার বন্দোবস্ততো ওপর-চাওয়া। কে দেখে নিচের দিকে? সাম্যের কথা বলি—তাহা মিথ্যা—যদিও আমাদের জাতীয় প্রতীক—সত্যমেব জয়তে।

এক যুগের ওপর হল আমাদের ইংরাজ হ'তে মুক্তি। কিন্তু ধীরে ধীরে ঘিরছে আমাদের—মিথ্যা, স্বজনপোষণ, তোষণ, লুটতরাজ, সঙ্কীর্ণতা। প্রাদেশিকতা তাও কি স্থিত? যারা বলছে—বাঙাল খেদা, তারা আগার লুঠের ধনের ভাগাভাগি নিয়ে কামড়া কামড়ি করছে, ভাগাড়ের গলিত মাংস নিয়ে করে যেমন দু'টা শুকানি।

মাথার ওপর আছেন যাঁরা, তাঁদের একাজ কেবল বিদেশে ভারতের নাম উজ্জল করতে ব্যস্ত। শাক দিয়ে ঢাকা যায় না বিধবার চুবড়ির মাছ। সত্যমেব জয়তে—সত্যই সত্যি কথা—ক্যাসানের মুখের বুলি নয়। বিদেশী এতো বোকা নয়।

জগা খুড়োর মুখের আঁট নেই। সে বল্লে—ও পাঁচ-শালা দশ-শালার আদর দেখেই বোধ হয় চটকে বলেছিল—এবার মরে দাদার শালা হ'য়ে জন্মাব, আদর পাব।

নিশ্চয়ই এ-সব ছোট কথা। কিন্তু যারা নিরন্ন বুভুক্ষু বৃত্তিহীন তাদের প্রতি দৃষ্টি—কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে।

দেশ যদি যায় উৎসন্ন—বিদেশীর দরবারে মিথ্যা ছবি দেখানো—অধর্ম্ম।

অধর্ম্ম? দূর ছাই। আবার ভুলে যাচ্ছি যে ভারত-ধর্ম্ম ছাড়া সেকুলার গণ—তন্ত্র।

শুভক্ষণে "ভারতবর্ষ" কার্ত্তিকমাসে শুনেছে—বনমানুষের খেদ।

আত্ম-নিবেদন

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

উপেক্ষার কঠিন কঠোরতায়
গুঁড়িয়ে দিতে চাও কি আমার সকল আশা?
উড়িয়ে দিতে চাও কি আমার
ভালবাসার ছোট্ট নতুন ঘরখানি?
কখনও ভাবি তোমার ঔদাসীন্যের
আমিও জবাব দেব নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায়,
প্রতিঘাত হানব তোমার ঐ উপেক্ষার আঘাতকে
নিদারুণ প্রত্যাঘাতে।
কিন্তু ভেসে যায় আমার সব শপথ।
তোমার সৌম্য সরল মুখের দিকে চেয়ে।
স্মরণ করিয়ে দেয় সেদিনের
শুচিশুভ্র পরশে তোমার,
বিশীর্ণ বিবর্ণ মনে মোর
সঞ্চারিত নতুন প্রাণের কথা।
সুধাশস্য সম্ভাবনার বিচিত্র বিস্তৃতি
কল্পিত-বিচ্ছেদের সকল ব্যথা
এমনি করে মুছে ফেলে
উদ্বেলিত চিত্তে মোর নিয়ে আসে
শ্রদ্ধানম্র বিমল অনুভূতি।
আসন্ন ব্যবধানের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা
দিগন্ত দেয়াল-ঘেরা নিভৃতির অন্তঃপুরে
(আবার) পরিণতি লাভ করে পূর্ণ আত্মনিবেদনে।



অদৃষ্ট

শ্রীবার্ণিক

ডাক্তার ঘোষ আসিয়া বলিতে থাকিলেন সুমথনাথকে, 'আর ইস্যু হ'লে ফিউচারে ভয়ংকর মুশকিল হ'বে। পসেণ্টের রক্ততো একরকম নেই বল্লেই হয়, তাছাড়া ওঁর ইউট্রাসেও গণ্ডগোল রয়েছে। এ বাচ্চাটাকে অনেক কষ্টে বাঁচান হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আর হ'লে বোধ মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড নিয়েই প্রব্লেম হ'বে।"

সুমথনাথ দুঃখমিশ্রিত সংকোচের সহিত ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাল। যেন শিশু বালক, যেন পর-নির্ভরশীল অসহায় শিশু। একরাশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, কাতরভাবে বলিল সে, "কোনই কি উপায় নেই ডাক্তার-বাবু? এই নিয়ে পর পর পাঁচটা মেয়ে হল। কিন্তু ছেলে যে একটাও নেই, তাহলে যে নির্ব্বংশ হ'য়ে যাবো!"

সুমথনাথের কথার মধ্যে এমন একটা মর্ম্মস্পর্শী আবেদন ছিলো যে ডাক্তারবাবুর হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল। সুমথনাথ তাঁহার অপরিচিত এবং অনাত্মীয় হইলেও, তাহাকে যেন তিনি আপন আত্মীয় বলিয়াই ভাবিয়া লইলেন। নিছক রক্তের সম্বন্ধ দিয়াই যে মানুষের আত্মীয়তার বন্ধন—তাহা নহে। রক্ত অপেক্ষাও হৃদয়ের আকর্ষণ অনেক বড়! রক্তের বন্ধন দিয়া যে আত্মীয়তা এবং ভালোবাসা, তাহার গণ্ডি সীমাবদ্ধ; কিন্তু হৃদয়ের বন্ধনে—আকর্ষণে যে আত্মীয়তার সঞ্চার হয় তাহার কোন গণ্ডি নাই—তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তাহার ব্যাপ্তি অসীম! যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ চিন্তাবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—ডাক্তারবাবু "টাকা খরচ করতে পারবেন?"

"টাকার জন্তে কোন চিন্তা করবেন না। যতো লাগে! আপনি খালি দেখুন যাতে অন্ততঃ একটা ছেলে আমার হয়।" আকুতি প্রকাশ করিয়া উঠিল সুমথনাথ।

সুমথনাথের কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন—আবার দুঃখিতও হইলেন। সমাবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মানে—পরের ইস্যু যদি দরকার হয় তো সিজা-রিয়ান করে বার কোরবো। এ্যাণ্ড ছাট উহিল রিকয়ার হেভী এ্যামাউণ্ট! তাই বলছিলাম—টাকা খরচা করতে পারবেন কি না।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুমথনাথ বলিয়া উঠিল, "দু'চার হাজার খরচ করতে হলে আমার কোন অসুবিধে হ'বে না। তার বেশী হ'লে অবশ্য একটু ভাবতে হ'বে।"

"না না, অত দরকার হ'বে না। সে থাক্‌গে—এখোন থেকে আপনার স্ত্রীর নিয়মিত চিকিৎসা করতে হ'বে। আর যে ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি, ওগুলো আজই কিনে হাসপাতালে দিয়ে যাবেন। তাছাড়া—হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাবার পরও নিয়মিত কতগুলো ওষুধ খাইয়ে যেতে হবে। তারপরে সময়মত আমাকে এক-বার পেসেণ্ট দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। দেখুন, এসবগুলো যদি সব ঠিকমত ক্যারেড আউট না হয়—তাহলে যে প্রব্লেম সেই প্রব্লেমই কিন্তু থেকে যাবে।" বিশেষ গুরুত্ব দিয়াই ডাক্তারবাবু তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখিয়া সুমথনাথ নিতান্ত বালকের ন্যায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ক্যারেড আউট হ'বে না মানে—নিশ্চয়ই হ'বে। এর মধ্যে আবার কিন্তু আছে নাকি!"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দেখবেন, সেটাই এখন সবচেয়ে বেশী দরকার।"

আজ অপর্ণার ছুটি হইয়া গেল। হাসপাতালে তাহার আর থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। এখন বাড়ী গেলেই চলিবে। তবে, ডাক্তারবাবু তাহাকে বলিয়াছেন, "খুব সাবধানে থাকবেন। ক'দিন যেন নিয়মিত ডিম-

মাংস খা'ন ! আর এই টনিকটা আর ওষুধ ক'টা বাড়ী গিয়ে আনিয়ে নেবেন। বোঝেন তো কাঁচা শরীর, তারপরে আপনার শরীরের যা অবস্থা। ওগুলো খাওয়া দরকার !" বলিয়াই সবেগে একটি প্রেসক্রিপসান লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন।

ম্লান হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "আগে বাঁচি, তারপরে তো ওষুধ !"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "সে কি কথা। মরবার কি হল ? ছেলেপেলে হ'চ্ছে বলে কি কেউ মরে ? শরীর খারাপ লাগে, সে জন্যে তো আমরাই আছি। মিছে ঘাবড়াচ্ছেন। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ডাক্তারবাবুর কথা অপর্ণা যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। ইন্দ্রশংকর ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হইলেও অপর্ণার নিকট তাঁহার কোনই মূল্য ছিল না। তাহার যে আবার শরীর সারিয়া উঠিতে পারে—এ কথা তাহার নিকট একান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। তাই, ডাক্তারবাবুর মুখে 'সব ঠিক হ'য়ে যাবে' শুনিয়া অপর্ণার অবিশ্বাস আরো বাড়িল বই কমিল না। গ্রাম্য অশিক্ষিতা মেয়ে সে। রূপের জোরেই ধনী সন্তানের সহিত বিবাহ হওয়ায় সহরে আসিয়াছে। বিজ্ঞানের শক্তি সম্বন্ধে তাহার আদৌ কোন ধারণা ছিল না। সে জানিত না যে ডাক্তারবাবুরা ইচ্ছা করিলেই তাহার সন্তান হইবার সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাই রুগ্ন শরীরের জীর্ণ হাত দুইখানা ঈষৎ নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল অপর্ণা, "আর ঠিক হয়েছে ! ঠিক হবার জো কি আর আছে ?"

সুমথনাথ স্ত্রীর পাশেই দাঁড়াইয়াছিলো। কিঞ্চিৎ অপরাধীর ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহার হাবভাবে। স্ত্রীর নিকটে আসিয়া এবারে ফিসফিস করিয়া বলিল সে, "চলো, বাড়ী চলো।"

ডাক্তারবাবু ততক্ষণ ওখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

স্বামীর দিকে বিরক্তিজনিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপর্ণা বলিল, "বাড়ী গিয়ে আর হবেটা কি ! ক'দিন বাদেই তো আবার এখানে আসতে হবে, তার চেয়ে এখানেই থেকে যাই। তোমাদের আর কি, শরীরের যে কতো ক্ষয় হয়—তা যদি বুঝতে !"

নরম সুরে আকুতি-ভরা কণ্ঠে সুমথনাথ বলিল, "এটা হাসপাতাল। এখানে রাগ কোরো না। যা বলতে হয়, বাড়ী গিয়ে বোলো। সবই তো জানো—একটা ছেলের জন্যেই তো…।"

অপর্ণার কেন জানি মেজাজ আরো চড়িয়া গেল। রাগতঃ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা বলে কি ফি বছর আমায় পোয়াতি হ'তে হবে ? তোমার বংশ রক্ষা করতে হয় তো তুমি আর একটা বিয়ে করো ; আমাকে রেহাই দাও।"

"এই ! লক্ষ্মীটি ওরকম কোরোনা, চলো, জগু গাড়ী নিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছে।"

"না, আমি যাবো না।"

"কেন ওরকম কোরছো ? হাসপাতালের মধ্যে ওরকম করলে লোকে কি বলবে বলতো !"

"তা বলুক গিয়ে। বাড়ী আমি যাবো না—যাবো না, যাবো না !"

"কেন, কেন যাবে না ?"

"না, গেলেই আবার সেই হাসপাতালে আসতে হবে। যদি কথা দাও যে আর হবে না ছেলে-পেলে—তবে যাবো।"

সুমথনাথ কেমন যেন বোকার মত হাসিয়া, অপর্ণার হাত ধরিয়া আবেগভরে নিচের দিকে টানিতে টানিতে বলিল, "কী যে বলো।"

হাসপাতালের দু'একজন নার্স যাইতে যাইতে ঘটনা লক্ষ্য করিয়া—ঈষৎ হাসিয়া উঠিল মাত্র।

যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত নবজাতাকে নিজের কোলে লইয়া, স্ত্রী-সহ বাড়ী ফিরিয়া আসিল সুমথনাথ।

কন্যার জন্ম সংবাদ বাড়ীতে পূর্ব্বেই সকলে পাইয়াছিলেন। নবজাতাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিতেই সুমথনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি সরোজবাবু বিশেষ পরিহাসের সুরে সুমথনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, আসুন মহাপাতকনাশিনী !"

সুমথনাথ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিল।

সরোজবাবু আবার বলিয়া উঠিলেন, "কি হে শ্রীমান, কি করলে হে ! রোজ সকালে সকলে যে তোমার ঘরের চিন্তা করে উঠবে—সেটা কি ভাল হল ?"

এইবারে বাক্য ফুটিল সুমথনাথের মুখে। সে বলিল, :কন, কেন, জামাইবাবু ?"

শ্যালকের পৃষ্ঠে স্নেহসূচক আঘাত করিয়া বলিলেন রোজবাবু, "ব্রাভো! ব্রাভো ভাই! জানো না, পঞ্চকন্যা :রেন্নিত্যং মহাপাতকনাশিনী!"

সুমথনাথ এবারে অর্থ বুঝিল। শুধু বুঝিল না—হৃদয়ঙ্গম রিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নবজাতা তখনও সুমথনাথের কোলে। তাহাকে ইয়াই সুমথনাথ এবারে গুটি গুটি তাহার শয়ন কক্ষের :কে অগ্রসর হইতে থাকিল। পথিমধ্যে তাহার চার-াচ এবং ছয় বৎসরের তিন কন্যা তাহার পথরোধ করিয়া :জ্ঞাসা করিতে থাকিল, "কি হয়েছে বাবা? ভাই, ভাই য়েছে?" ইতিমধ্যে বাড়ীর অপরাপর ব্যক্তিরাও সুমথ-াথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল কন্যার মুখ দেখিবে বলিয়া।

অপর্ণা অদূরেই দাঁড়াইয়াছিল। কন্যাদের মুখের থা শুনিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিল। ওদিকে মথনাথও কন্যাদের প্রশ্নের জবাবে এক বিশেষ ভঙ্গিমা রিয়া বলিয়া উঠিল, "হয়নি। হবে! হবে!"

সুমথনাথের মাতার মানসিক অবস্থা বিশেষ আনন্দের র্য্যায়ে ছিলো না। পর পর চারিটি নাতিনীর মুখ :খিবার পর—এইবারে বিশেষ আশা করিয়াছিলেন যে াতির মুখ দেখিবেন। তাই, আশাহত হওয়ায় দুঃখিতই ইয়াছিলেন। ওদিকে বাড়ীর অন্যান্য বালক-বালিকার ন চীৎকার করিয়া বলিতে থাকিল, "বোন হয়েছে! ান হয়েছে!"

সুমথনাথও ফাঁক বুঝিয়া লজ্জায় বাড়ী হইতে সরিয়া ড়িল।

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর অপর্ণা শ্চিন্ত হইলেও সুমথনাথের দুশ্চিন্তার অভাব ছিলো না। র স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনা হইতে পুত্রের পিতা হইবার :কাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে সদাসর্বদাই জাগ্রত ছিল। ইহার ান দিকেই তাহার সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিলো না।

যথাসময়ে স্ত্রীকে আবার ইন্দ্রশংকরবাবুকে দেখাইল :।

অপর্ণাকে ভালভাবে পরীক্ষা করিবার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কতগুলো ওষুধ লিখে দিচ্চি—এগুলো তো খাবেনই, তা ছাড়া এই ইঞ্জেকসনটা রোজ একটা করে একমাস চালিয়ে যান। দেখবেন ভাল ফল পাবেন।"

সুমথনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "শরীরের ইমপ্রুভমেন্ট কিছু দেখছেন কি?"

"নিশ্চয়ই। এ্যানিমিয়া নেই, প্রেসার নর্ম্মাল—তা অন্যান্য লক্ষণও তো সব ভালই।"

"তা হলে এখন ক্যারি করলে ওর শরীরের কোন ক্ষতি হবে না তো?" সলজ্জভাবেই প্রশ্ন করিল সুমথনাথ।

দেখা গেল, অপর্ণার চোখ-মুখ লজ্জায় একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হইয়াই জবাব দিলেন, "না, ক্ষতি কিছু হবে না। তাহলেও, আরো দুটো মাস অপেক্ষা করাই সেফার।"

মনের আনন্দ লইয়াই সেদিন ডাক্তারবাবুর ওখান হইতে ফিরিল সুমথনাথ। পথে ওষুধ কিনিতে টাকার অংক দুই শতের ঘর অতিক্রম করিয়া গেলেও, তাহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। অপর্ণাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া তুলিয়া একটি পুত্রের জনক হওয়াই তখন তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো—তাহার জন্য যত টাকাই লাগুক—তাহাতে তাহার কার্পণ্য ছিল না।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। অপর্ণার স্বাস্থ্যও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এমন কি ডাক্তারবাবুও সুমথনাথকে বলিয়া দিয়াছেন, "সি ইজ নাউ কমপ্লিটলি ফিট টু ক্যারি!" ফলে পুত্রাকাঙ্ক্ষায় খুবই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলো সুমথনাথ।

সুমথনাথের পুত্র কামনার আধিক্য দেখিয়া আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই তাহাকে বলিল, "চাইলেই কি হয়, যখন হবার তখন ঠিকই হবে! ব্যস্ত হলে কি হ'বে!"

কিন্তু সুমথনাথের তর সহে না। নির্ভরশীল এক বন্ধুর নিকটে প্রাণ খুলিয়া কহিল সে, "হ্যাঁরে কি করলে সিওর ছেলে হবে বলতে পারিস?"

বন্ধু হাসিয়া বলিল "মাদুলি নে!"

অবিশ্বাসের সুরে সুমথনাথ বলিল, "দূর! ওসব বুজরুকি!"

"বুজরুকি কিরে! তারকেশ্বরে মানত কর্, আর সেই সঙ্গে কোন বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষীর কাছ থেকে একটা ভাল মাদুলি নে, দেখ্‌বি সিওর সাক্‌সেস!" জবাব দিল বন্ধু।

"তুই কি ঠাট্টা করছিস?" একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল সুমথনাথ।

বন্ধু বুঝিল যে সুমথনাথ অসন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে আন্তরিকভাবেই সুমথনাথকে মাদুলি নিতে বলিয়াছিল। তাই, এবারে আরো গুরুত্ব আরোপ করিয়া কহিল, "তুই বিশ্বাস কর্—আমি জানি যে মাদুলি নিয়ে আর তারকেশ্বরে মানত করে ফল হয়েছিল একজনের। তাই বল্‌ছি।"

"আমি কি পাগল? ওসব মাদুলি দেবতা আমি বিশ্বেস করিনি। বৈজ্ঞানিক কোন পথ যদি জানিস তো বল্! ওসব মাদুলি-কাদুলি ছেড়ে দে!"

বন্ধু পরিহাস করিয়া হাসিল, না দুঃখ করিয়া হাসিল—তাহা ঠিক বোঝা গেল না। তবু, হাসিল সে। হাসিয়া সুমথনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বিগলিতকণ্ঠে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "বৈজ্ঞানিক পথ? এর বৈজ্ঞানিক কোন পথ আছে বলে আমার জানা নেই। যদিও আমি কেমিষ্ট্রিতে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট—তবুও আমার বলতে হচ্ছে এ সম্বন্ধে আমার, ওই ৺ভগবানের আশীর্ব্বাদ ছাড়া, আর কোন পথ জানা নেই। জানিনা, আর কেউ যদি বলতে পারি।"

নাস্তিক সুমথনাথ আস্তিক হইবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টমনে বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বন্ধুকে কহিল, "তুই যা, কিছুদিন রাঁচির কাঁকে রোডে কাটিয়ে আয়।"

বন্ধু কেবল ঠোঁট উল্টাইল।

কিন্তু ঘটনার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটিল না। কয়েক দিন পরে সুমথনাথের এক নিকট-আত্মীয়ও সুমথনাথকে বলিল, "শোন, দক্ষিণেশ্বরে ৺মা কালির কাছে মানত করো, আর হাওড়ায় একজন সাধু আছেন—তাঁর কাছ থেকে মাদুলি এনে অপর্ণাকে পরাও।"

আবার আর একদিন, তাহার আপন পিসতুতো ভাই তাহাকে বলিল, "বর্দ্ধমানে একজন লোক আছেন, যিনি মন্ত্রপূত গাছড়া দেন। তাঁর কাছে গিয়ে সেই গাছড়া এনে বৌকে খাওয়া—দেখবি কাজ হয় কিনা!"

মহা সমস্যায় পড়িল সুমথনাথ। দিন ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে, অথচ সন্তান কামনা করিয়াও সে সন্তান পাইতেছে না। স্বাভাবিক পন্থায় সন্তান আগমন ঘটাইতে না পারিয়া, বিকল্প পদ্ধতিই সে অবলম্বন করিবে বলিয়া স্থির করিল। বার বার সাধু-সন্ন্যাসী আর দক্ষিণেশ্বর-তারকেশ্বরের কথা শুনিয়া মনে মনে সংকল্প করিল সে, "দেখাই যাক্ না—কি হয়। লাগে তো লাগলো—না লাগলে তো অন্য পথ আছেই!"

এবারে সত্যসত্যই তারকেশ্বরে এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মানত করিল সুমথনাথ। বর্দ্ধমান, হাওড়া এবং ধর্ম্মতলা হইতে মাদুলি গাছড়া ইত্যাদিও সংগ্রহ করিল। বিশ্বাস হউক না হউক, সন্তান-আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে সে কোন-রকম পন্থাই বাদ দিতে চাহিল না। ফলে, কিছু কিছু লোক তাহার সুযোগ লইয়া সুমথনাথের অর্থদণ্ডও ঘটাইল।

কিছুদিন পরের ঘটনা। মাদুলি এবং মানতের কথা সুমথনাথ প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর ভোলা হইল না। ঘটনাটা ঘটিয়াছিল মাদুলি ধারণ এবং গাছড়া খাইবার প্রায় ছ'মাস পরে। মাদুলি, মানতের জন্যেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক অপর্ণা সন্তানসম্ভবা হইল। সংবাদ শুনিয়া সুমথনাথ যে কেবল উল্লসিতই হইল তাহা নহে—বিস্মিতও হইল। অবিশ্বাসীর মনে ধর্ম্ম বিশ্বাস জন্মাইল। নাস্তিক হইতে চলিল আস্তিক। জীবনে এই বোধহয় সে প্রথম ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। এই বোধহয় প্রথম বলিল, আস্তিক। জীবনে এই বোধহয় সে প্রথম ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। এই বোধহয় সে প্রথম বলিল, "হে ঠাকুর তোমার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।" সুমথনাথের অন্তরে এক নতুন সুরের উপলব্ধি হইল। সুমথনাথ হাসিল—প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করিল।

যাহারা তাহাকে এই মাদুলি মানতের বুদ্ধি দিয়াছিল, তাহারা শুভ সংবাদ পাইয়া সুমথনাথকে বলিল, "কী! বলিনি। এবারে ত্যাখো না—কেমন সুন্দর ছেলে হ'বে!"

মথনাথ কোন কথা বলিল না। অভিভূত হইয়া কেবল তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা তখন চার মাসের গর্ভবতী। সুমথনাথ এক-দিন সময়মত ইন্দ্রশঙ্করের নিকট অপর্ণাকে লইয়া গিয়া দেখাইল।

ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিয়া সানন্দে বলিলেন, "চাইল্ডের কণ্ডিসন খুবই ভালো। নাঃ, আপনাকে প্রশংসা না করে পারছি না। ওষুধগুলো সব ঠিক মত খাইয়েছেন দেখছি।

এবার সুমথনাথের জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচ বোধ হইলেও, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াই ফেলিল সে—"একটা কথা জিগ্‌গেস করছিলুম।"

"কি—বলুন না! ডাক্তারবাবু বলিলেন।"

"বলছিলুম—ওর কি হ'বে বলে মনে হয়? ছেলে না মেয়ে?"

"ও: হো:!" ডাক্তারবাবু হাসিয়া উঠিলেন, "যেরকম ছেলে ছেলে করছেন, শেষে যদি ছেলে না-ই হয়। ও ব্যাপারে আমাদের হাত যে একেবারেই নেই।" বলিলেন তিনি।

"তবু, জানতে ইচ্ছে ক'রে!"

"দেখুন—ডেফিনিট তো কিছু বলা যায় না। তবে কতগুলো টেষ্টিং আছে, সেগুলো করালে একটা আইডিয়া পাওয়া যায়—এই পর্য্যন্ত। ঠিক যে হয় না, তাও নয়—আবার ভুলও যে হয় না, তাও নয়; তবে—সেও তো বেশ খরচ-সাপেক্ষ।"

"হোক্ খরচ। আপনি সেই এ্যারেঞ্জমেণ্টই করুন, আমি খরচা কোরবো।"

ডাক্তারবাবু আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "ঠিক আছে, কি ভাবে কি করতে হবে, কোথায় টেষ্ট করাতে যেতে হবে—কাগজে সব লিখে দিচ্ছি। হয়ে গেলে সব রিপোর্ট নিয়ে এসে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

সেদিনের মত ওখানেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটিল। বিদায় লইয়া সস্ত্রীক বাহির হইয়া আসিল সুমথনাথ।

বেশ কিছু দিন বাদে সমস্ত রিপোর্ট লইয়া সুমথনাথ ইন্দ্রশংকরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

চেম্বারের নিরিবিলি পরিবেশে সেদিন আগন্তুক বলিতে একা সুমথনাথই উপস্থিত ছিল।

যাহা হউক, রিপোর্টটা হাতে লইয়া বেশ মনোযোগের সহিতই ডাক্তারবাবু তাহা দেখিলেন। তারপরে ধীরে ধীরে আনন্দোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, "মোষ্ট স্যাটিস্‌ফ্যাক্টরি রিপোর্ট। যা দেখলাম তাতে ছেলে হবে বলেই মনে হয়। এর বেশী কিছু বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব-পর নয়।"

তাহাতেই সুমথনাথের মন ভরিল। হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মাদুলির কথা, মানতের কথা, বন্ধু-আত্মীয়দের কথা—সকলই তখন তাহার মনে পড়িল। বিনীত কণ্ঠস্বরে এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল সে, "আমার মনও কিন্তু ছেলে হ'বে বলেই বলছে।"

"দেখুন কি হয়!" বলিলেন ডাক্তারবাবু।

গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকেই প্রথমে সংবাদটা জানাইল সুমথনাথ। এক ঝলক হাসি দিয়া, সোহাগভরা আবেগে অপর্ণাকে বলিল সে, "হ্যাঁগো, আগে আমায় কি দেবে বলো।"

"কী আবার দেবো! আমার ভাল লাগে না বাপু। তখন বলেছিলাম না—যে হাসপাতালেই থাকি। কি দরকার ছিলো বাড়ী আনবার? এবারে আর আমি বাড়ী আসবো না"—নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলো অর্পণা।

সুমথনাথ কিন্তু তাহাতে দমিল না। অপর্ণার হাত ধরিয়া হাস্যবিগলিত মুখে বলিল, "ডাক্তারবাবু বলেছেন এবারে তোমার ছেলে হবে!"

সহসা যেন কী একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল অপর্ণার মধ্যে। ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল সে, "সত্যি?"

সুমথনাথ বলিল, "সত্যি!"

দিনও যাইতে থাকিল, সুমথনাথের আশাও বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। কল্পনার ডানায় ভর করিয়া সে তাহার ভাবী পুত্রের রূপলালিত্যের নানান দিকই দেখিতে থাকিল। সেই সঙ্গে ৺ভগবানের প্রতিও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে থাকিল অকুণ্ঠচিত্তে। দেখিতে দেখিতে

গর্ভের দশ মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এদিকে ভাবী সন্তানের জন্যে সুমথনাথ প্রত্যহই নানান খেলনা সামগ্রী কিনিয়া একখানি ঘর একেবারে ভরিয়া তুলিল। গাড়ী, পুতুল, জামা, প্যান্টের ছড়াছড়ি হইল সে ঘরে।

সেদিন সকাল হইতেই অপর্ণার প্রসব বেদনা শুরু হইয়াছিল। সুমথনাথও আর কাল বিলম্ব না করিয়া, ডাক্তারবাবুর সহিত ফোনে কথা বলিয়া, অপর্ণাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছিল।

সমস্তটা দিনই সে উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তা লইয়া বসিয়া থাকিল হাসপাতালে। সারাদিন বিশ্রাম তো হয়ই নাই—এমন কি খাওয়াও হয় নাই। সঙ্গে যে দু'জন ছিলেন তাঁহারা অনেকবারই সুমথনাথকে বলিয়াছিলেন, "যাও, তুমি যা হয় চারটি মুখে দিয়ে এসো। আমরা তো রইলাম-ই।"

কিন্তু সুমথনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। সংবাদ শুনিবার আশায়, খাওয়া অপেক্ষা, প্রতীক্ষায় থাকাই তাহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

তখন রাত্রি বার ঘটিকার কম নহে। হাসপাতালও তখন নিরিবিলি, নির্জ্জন। ক্লান্ত অবসন্ন সুমথনাথ কেবলমাত্র কয়েক কাপ গরম চা গলাধঃকরণ করিয়া, তখনও ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সংবাদ শুনিবার আশায় বসিয়াছিলো। ইন্দ্রশঙ্করবাবু সেই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার এবং অপর্ণার প্রসব ভারও স্বয়ং তিনিই হাতে লইয়াছিলেন।

সময় তখন আরো আধঘন্টা পার হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে স্বয়ং ইন্দ্রশঙ্করবাবু আসিয়া সুমথনাথকে বলিলেন, "কেসটা বেশ ট্রাবল দিচ্ছে—সিজারিয়ানই করতে হ'বে। ইউজুয়াল ডেলিভারী করাতে গেলে চাইল্ড এ্যাফেক্‌টেড হতে পারে! আপনার কি মত?"

সুমথনাথের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকমে বলিল সে, "আমার আবার মত কি! আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হ'বে।"

ডাক্তারবাবু সুমথনাথের মুখ দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। সুমথনাথকে আশা দিয়া বলিলেন, "ভয় পাবার কিছুই হয়নি। সব দিক থেকে যাতে ভাল হয়—সেটাই করার চেষ্টা করছি। অন্যান্য লক্ষণ সবই খুব ভাল। এনি ওয়ে, বণ্ডে আপনার সই লাগবে কিন্তু!"

ম্লান হাসিয়া সুমথনাথ বলিল, "পাঠিয়ে দিন—এখুনি সই করে দিচ্ছি।" বলিয়াই একটু থামিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "কি বুঝছেন—ছেলে না মেয়ে!"

এবারে হাসিয়া ফেলিলেন ডাক্তারবাবু। হাতের ষ্টেথোস্কোপটা দোলাইতে দোলাইতে জবাব দিলেন, "সে আর একটু পরেই জানতে পারবেন!" বলিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া উঠিয়া গেলেন অপারেশন হলের দিকে।

সুমথনাথ কেবল একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ইন্দ্রশঙ্করবাবুর এ্যাসিষ্টাণ্ট আসিয়া সুমথনাথকে দিয়া বণ্ড সই করাইয়া লইয়া গেল।

সুমথনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অপারেশনই কি তা হলে করতে হবে?"

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট জবাব দিলো, "আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন হ'য়ে যাবে।"

সুমথনাথের সহিত অপেক্ষারত দুইজন আত্মীয় এ্যাসিষ্টাণ্টকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী সিরিয়াস কিছু বুঝছেন না কি?"

"না না, সে সব কিছু না। চাইল্ডের মাথাটা একটু বেশী বড় হয়েছে—এই যা।" বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেলেন এ্যাসিষ্টাণ্ট ডাক্তার।

তখন রাত্রি এক ঘটিকা বাজিয়া গিয়াছিল। হাসপাতালের দারোয়ান সুমথনাথদের অদূরে বসিয়া উচ্চ নাসিকা গর্জ্জন করিয়া ঘুমে ঢুলিতেছিল।

সুমথনাথেরও ঘুম আসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় স্বয়ং ইন্দ্রশঙ্করবাবু আসিয়া সুমথনাথকে ডাক দিলেন, "শুনছেন, একটু এদিকে আসুন!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল সুমথনাথের। না জানি, বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। খানিকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল সে।

ডাক্তারবাবু আবার ডাকিলেন, "একটু আসুন এদিকে।"

ধীরে ধীরে ডাক্তারবাবুর সহিত অগ্রসর হইল সুমথনাথ। যাইতে যাইতে রাজ্যের অমঙ্গল চিন্তা আসি

তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। বুকের ভিতরটা দুর্ভাবনায় তোলপাড়ও করিতে থাকিল। বারবারই ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকিল সে।

একটু নিভৃতে আসিয়া সুমথনাথের ঘাড়ে হাত রাখিয়া —সহানুভূতিসূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন ডাক্তারবাবু, "অল ফিনিশ্‌ড!"

"অ্যাঁ!" কাঁপিয়া উঠিল সুমথনাথ। নিমেষের মধ্যে চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া ৺ভগবানকে ধিক্কারও দিয়া ফেলিল সে ওই অল্প সময়ের ভিতরেই।

ডাক্তারবাবু আবার বলিলেন, "না না, ফিনিশড মানে ডেলিভারী হ্যাজ বিন ফিনিশড।" বলিয়াই ম্লান মুখ করিয়া কাতরকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু…।"

'কিন্তু' শুনিবার মত ধৈর্য্য ছিল না সুমথনাথের। ডাক্তারবাবুর মুখে ডেলিভারী হইয়া গিয়াছে শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যে মন দিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ৺ভগবানকে গালি দিয়াছিল, সেই মন দিয়াই আবার ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া, ডাক্তারবাবুকে উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সুমথনাথ, "কি হয়েছে ডাক্তারবাবু—ছেলে না মেয়ে?"

ম্লান হাসিয়া জবাব দিলেন ডাক্তারবাবু, "না', ছেলেই হয়েছে। ভেরী হেল্‌দি বয়!" বলিয়াই একরাশ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন তিনি, "কিন্তু ছেলের মা'কে বাঁচাতে পারলাম না। সি ইজ ডেড্‌!"

সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় আনন্দে সুমথনাথের মুখমণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যু সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্তই ফুৎকারে বিলীন হইয়া গেল। কোন কথা আর সে বলিতে পারিল না। স্তম্ভিত হইয়া সজল চক্ষে কিয়ৎক্ষণ রাত্রির কালো অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সহসা ডাক্তারবাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া ছেলে মানুষের ন্যায় কাঁদিতে থাকিল।

ধীরে ধীরে সুমথনাথের মস্তকে স্নেহের স্পর্শ দিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে সুমথনাথকে বলিতে লাগিলেন ডাক্তারবাবু, "কেঁদ না ভাই! তুমি আমার ভায়ের মত। আমি ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবু একটা সম্পর্ক আছে—সেটা হল এই ঘটনার সম্পর্ক। আজ থেকে পনের বছর আগেকার একটা ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। তখন আমার দুরন্ত প্র্যাকটিশ। আমার একমাত্র মেয়ের ডেলিভারীর ভার আমি নিজ হাতেই তুলে নিলাম। এই হাসপাতালেই, ওই অপারেশন টেবিলেই তাকে শোয়ালাম। চাইল্ডের পোজিশনের ডিফিকাল্‌টির জন্যে বাধ্য হয়েছিলাম সিজারিয়ান করতে। মনে আছে, অজ্ঞান করবার আগে আমাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটা ব্যথার যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—বাবা, আমি বাঁচবো তো? ছেলের মুখ দেখতে পারবো তো? বলেছিলাম, কোন ভয় নেই মা। এই তো, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই বলাই শেষ বলা আমার। ছেলে হয়েছিল। কিন্তু মেয়ে বাঁচেনি—অপারেশন টেবিলেই মারা গিয়েছিল। সেদিন আমার যে অহংকার ছিল ভাল ডাক্তার বলে—তা ভগবান চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তোমাকে বলতে পারি, এমন সান্ত্বনার ভাষা আমার নেই। তবু বলছি ভাই, মানুষের ক্ষমতা বড় সীমাবদ্ধ। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ছাড়া কোন কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি বড় পরীক্ষা করেন। যখন দান —তখন তিনি একহাতে দিলে মানুষ তা দু'হাতে নিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারে না; আবার যখন পরীক্ষা করেন, তখন তেমনি কঠোরভাবেই পরীক্ষা করেন। বার বার দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি করে নিতে চান। মনে কোরো—এও তাঁর একটা পরীক্ষা!" বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ডাক্তারবাবুর। না জানি, চোখের জলও ফেলিয়াছিলেন। এমন কি ভাবাতিশয্যে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে ক্ষণিকের জন্যে সুমথনাথ যেন আপন শোক ভুলিয়া গিয়াছিল। অব্যক্ত বেদনায় তাহার সমস্ত মন তখন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

কয়দিন পরে হাসপাতাল হইতে যখন সুমথনাথ ছেলে লইয়া বাড়ী আসিল, তখন তাহার মনে আনন্দের লেশমাত্র ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "সব পেয়েও কিছু পেলাম না।"

হাসপাতালের বিল পেমেণ্ট করিবার কালে, স্নেহ

হাজার টাকার বাণ্ডিলটা ক্যাশিয়ারবাবুর হাতে দিয়াই চোখ মুছিল সুমথনাথ।

পৃথিবীটা তাহার নিকট তখন বড়ই শূন্য মনে হইতে লাগিল।

বাড়ী আসিয়া শুনিল সে যে ছেলেটা 'ওঙ্গা! ওঙ্গা' করিয়া তাহার দিদিমার কোলে শুইয়া কাঁদিতেছে।

বুকটার ভিতর তাহার হুহু করিয়া উঠিল। জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, অসীম নীলাকাশের দিকে তাকাইয়া কেবল অপর্ণার কথা ভাবিতে লাগিল সুমথনাথ।

ছেলেটাও তখন আবার কাঁদিয়া উঠিল, 'ওঙ্গা! ওঙ্গা!'

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা, এরকম একটা আপ্তবাক্য চিরদিনই প্রচলিত আছে। কিন্তু এই ছাত্রত্বের সীমানার শেষ কোনখানে সে প্রশ্নের উত্তর আজও অলিখিত ইতিহাসের পাতায়—কারণ সত্যিকারের মানুষ যোগবাশিষ্ঠের কথায়—মননেন হি জীবতি। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন যাঁরা পঠনপাঠন অধ্যয়নকেই জীবনের যজনযাজন ও মহৎ ব্রত স্বরূপ নিয়েছেন। কর্মের কলরবে ক্লান্ত আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে অবসরের দিনেও তাঁদের এ বিষয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আলোচনা যজ্ঞাগ্নিশিখার মত প্রোজ্জ্বল। জ্ঞান-তপস্বী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় সেই বিরল মনীষিদের একজন। এর পূর্বে তাঁর পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস ও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) পড়ে তাঁর জ্ঞানৈষণা, পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তাঁর সমন্বয় সন্ধানী দৃষ্টি ও অখণ্ড অনুসন্ধিৎসার প্রচেষ্টা—যা ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য। সূত্রযুগ, ষড়দর্শন ও দার্শনিক প্রস্থানসমূহের উদ্ভব থেকে আজকের শ্রীঅরবিন্দের মানস সংবিদের কথা পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুষ্ঠু ও মনোরম-ভাবে শুধু ব্যক্ত হয় নাই, ব্যাখ্যাতও হয়েছে। বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব-মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শন যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি গৌড়পাদ, ভর্তৃহরি, শঙ্করাচার্য, ভাস্করাচার্য, যাদবপ্রকাশ, রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধুসূদনের মতও আলোচিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ শৈব-শাক্ত বৈষ্ণবদর্শনও। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন সম্বন্ধে আরো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তার সামান্য উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হতো না। অবশ্য তাতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা ত ছিলই, তাছাড়া লেখক নিজেই বলেছেন যে তিনি আরো নানা প্রসঙ্গ তৃতীয় খণ্ডে সংযুক্ত করবেন ইচ্ছা ছিল—হয়তো তাহা ঘটিয়া উঠিবে না। তবু বর্ষীয়ান লেখককে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা কামনা করছি যে তিনি—জীবেম শরদঃ শতং—হয়ে আমাদের জ্ঞানের ও শিক্ষার পরিধি আরো বিস্তৃত করে দিন।

সুপণ্ডিত লেখক এই সব মতবাদ শুধু ঐতিহাসিক পারম্পর্যে আলোচনাই করেননি, তার বিশ্লেষণও করেছেন এবং যদিও অনেক বিষয়েই তিনি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ দাশগুপ্তের মতাবলম্বন করেছেন, তবু তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তাও প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম খণ্ডে যেমন দেখি যে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাখ্যা করেছেন বা নবরূপায়ণে মহাকাব্যের যুগের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্য খুঁজেছেন—তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডে শঙ্করদর্শনের চতুঃসূত্রী জ্ঞানতত্ত্ব থেকে মায়াবাদী ভাষ্য পর্যন্ত এক বিরাট ঐতিহ্য ও সমন্বয়ের সন্ধান তিনি করেছেন। শঙ্করের মত এত বড় মনীষী বোধহয় জগতে বিরল বললেই হয়, শুধু দুএকজন ছাড়া। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—জীব ব্রহ্ম বই নয়, মিথ্যা মায়াময় জগৎ পরিহার করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই হল পরমপুরুষার্থ—শঙ্করকে আমরা অনেকটা এই-ভাবেই গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই যদি চরম তথ্য হয় তাহলে আমাদের জাগতিক জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার মূল্য যে কমে যায়। তাইতো শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে জ্ঞান যদি নিষ্ক্রিয়ই রইলো, তার তেজে যদি জগতের কিছু অন্ধকার দূর না হল বা দৈহিক জীবন আরো উন্নততর রূপ না নিল—তাহলে যে অন্তঃকরণ দ্বারা আমি শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন করছি এবং জ্ঞান লাভ করছি সেটাও অজ্ঞান ও মিথ্যা হ

ায়। শঙ্করের পূর্বে বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রেই উপনিষদের শুধু মৌলিকত্ব য়, তার তত্ত্ব নিরূপণেরও একটা সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করেছেন এবং এই হ্মসূত্র নিয়েই কতো টীকা, ভাষ্য চলেছে। মহাপ্রভু বলতেন

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন

ালোচ্য গ্রন্থে নানা বিতর্কবিষয়ের মধ্যে লেখক শঙ্কর দর্শনের একটা ষ্ঠু সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন এইটিই তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। শঙ্কর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদ গ্রহণ করেননি, প্রতীত্য-ামুৎপাদের "অবিদ্যা"ও তাঁর নয়। ব্রহ্মই জগতের ভিত্তি, কিন্তু সে ভিত্তি জগৎ হতে ভিন্ন নয়। ভ্রান্তির অপনোদনের সঙ্গে মায়িক সর্প লুপ্ত হয়ে যায় না, শুধু মতের পরিবর্তন ঘটে। কারণ এই ভ্রান্তি স্বরূপ-াত নয় logical এবং psychological, তাই জগৎ negated নয়, ূতন ভাবে ব্যাখ্যাত। ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান অনন্ত, তিনি নির্গুণ ও সগুণ, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াবান হন মায়া ও অবিদ্যার কল্পনায়। মায়াতে প্রতি-বিম্বিত জগত সৎও নয়, অসৎও নয়, শুধু অনির্বচনীয়। অবশ্য শঙ্করবেদান্ত সাধনলব্ধকোন স্থিতিকেই জ্ঞানস্থিতির সমান পর্যায়ে ফেলে না। লেখক শুদ্ধ-জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ত্রিতত্ত্ববাদী রামানুজ, কুণ্ডলিনীভক্ত শাক্ত, পরমেশ্বর ও তাঁর তটস্থ শক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদ বিশ্বাসী বৈষ্ণব, তান্ত্রিক সিদ্ধের প্রত্যভিজ্ঞান, শক্তির নিত্যত্ব, সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ, যোগদর্শনের কৈবল্য প্রভৃতি নানা দিগ্‌দর্শনের মধ্যে মূল সূত্রটিকে খুজতে চেয়েছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলতেন—ব্রহ্ম আর কালী, কালী আর ব্রহ্ম আমি দুটোই লই—তা না হলে ওজনে কম পড়ে। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দও একজন অনণুকরণীয় পথিকৃৎ। তিনি শুধু বাণী, আদর্শ বা দর্শন স্থাপন করেই ক্ষান্ত নন—মহত্তর চেতনার সন্ধান করেছেন অতিমানসের ক্ষেত্রে আগমের ভাষায় 'স্বরূপজ্যোতিরে'ব', যেখানে জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবে সর্বাঙ্গীণ সাধনায়, বিদ্যায়, ছন্দে, বীর্যে, শ্রীতে, সম্পদে, অমৃতে, অভয়ে।

লেখক বলছেন—শঙ্কর দর্শনে ব্রহ্মই আদি, অন্ত্য ও মধ্য। জীবনের ও জগতের মুক্তিই হচ্ছে লক্ষ্য—সে মুক্তির অর্থ করেছেন তিনি বৃহতের মধ্যে পরিণতি অর্থাৎ ব্রহ্মলাভে বিলুপ্তি। এই অর্থে শঙ্কর প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে প্রায় লীলাবাদীর সঙ্গে সামঞ্জস্যে এনে ফেলেছেন। ভক্তিবাদী চিনি খাইতে চাহেন, চিনি হইতে চাহেন না—প্রেম চাহে প্রেমাস্পদের সহিত এক হইতে—ব্যবধান প্রেম সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু শঙ্কর বলছেন, ভেদ অপগত হলেও আমি তোমারই থাকিব, তুমি আমার হইবে না—তরঙ্গ সমুদ্রের, সমুদ্র তরঙ্গের নয়। কিন্তু তরঙ্গ ও সমুদ্র যে অঙ্গাঙ্গী, শঙ্কর দর্শনে এই তথ্যের পুনরায় আবিষ্কার লেখকের কৃতিত্বের ও সমস্যা সন্ধানী মনের পরিচয় দেয়। আজ যখন আমরা কল্পনা করছি যে যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনিই বিশ্বাত্মক, তিনিই জীবভূত, তিনিই বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ, ভোক্তা মহেশ্বর—তাঁর ভোগ আর তাঁর ঐশ্বর্যই পরমা প্রকৃতি দেবী মায়া, তিনি বিশ্বের অন্তর্যামী, তিনি নিজেকে বিস্ফারিত করার তপস্যাতেই অতন্দ্র। নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁরই কর্ম করি আমরা—তিনি অক্ষোভ্যতায় ও যেমন নিস্তরঙ্গ, তেমনি অনাসক্তিতেও। বৃহতের বিভূতিরূপে নিজেকে জানা, জেনে তাঁকে ভালবাসা, ভালবেসে তাঁর শক্তির সরিক হওয়া আর সেই শক্তিতে তাঁর চিন্ময়কল্পকে জীবনে মূর্ত করে তোলা—ভারতীয় সাধনার এই দিব্য ইতিহাস। লেখক স্বচ্ছন্দা প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে রূপ ও স্বরূপের সেই সত্য দর্শনের নানা ধারাকে লোকের কাছে তুলে ধরেছেন। তারজন্য তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানাই।

প্রকাশক—ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—শ্রীতারকচন্দ্র রায়।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬। মূল্য—১২৲

নব্য সংস্কৃত নাটক

ডক্টর শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, যন্ত্র-সভ্যতার যুগে, বস্তুতন্ত্রের যুগে সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ কি, এ চিন্তাতেই অনেকে বর্তমানে ব্যাকুল। কিন্তু আমি আশাবাদী। আমাদের ভারতবর্ষের উত্থান ও পতনশীল ইতিহাস সামান্য মাত্র আলোচনা করলেও আমরা দেখবো যে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, বহু প্রবল রাজ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেও আমাদের পরম আদরণীয় সংস্কৃত-জননী চিরকালই তাঁর শাশ্বত মহিমা রক্ষা করে এসেছেন। সেজন্য, ভারতবর্ষে সংস্কৃত কোন দিন মৃত হতে পারে না। তারই কয়েকটি নিদর্শন সম্প্রতি পেয়ে আমি পরম আনন্দবোধ করেছি।

আমার অশেষ স্নেহভাজন পুত্রপ্রতিম ছাত্র ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পরিচয় আজ নূতন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল ধরে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত-প্রাণ মন, বিষয়-আশয় অকাতরে উৎসর্গ করে সংস্কৃত জননীর যে ভাবে সেবা করে চলেছেন, তার তুলনা বিরল। তারই ফলে, যতীন্দ্রবিমল এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী ব্রহ্মবাদিনী অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দির থেকে প্রকাশিত, যতীন্দ্রবিমল বিরচিত ১৩২টি অপূর্ব গবেষণাগ্রন্থ পেয়ে আমরা প্রভূত উপকৃত হয়েছি—যে[illegible]সংস্কৃত সাহিত্যে

নারীর দান (৭ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের দান (৫ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীদের দান (৩ খণ্ড), সংস্কৃত দূত কাব্য সংগ্রহ (৮ খণ্ড), সংস্কৃত কোষ কাব্য সংগ্রহ (৫ খণ্ড), সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য (৫ খণ্ড), সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রন্থমালা (২০৫ খণ্ড), মেঘদূত গ্রন্থমালা (২ খণ্ড), ধর্মগ্রন্থমালা (৫ খণ্ড), সংস্কৃত গীতিমালা (৭ খণ্ড) ইত্যাদি।

এ সকল গবেষণা মণি-মাণিক্য সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলবার নেই। কারণ, আজ দেশে ও বিদেশে এই সকল গ্রন্থের প্রভূত সমাদর ও মর্য্যাদা হয়েছে। আজ আমি কেবল যতীন্দ্রবিমলের বহু পূর্বে বিরচিত, কিন্তু সম্প্রতি দেবনাগরী অক্ষরে পুনরায় প্রকাশিত ২টি নূতন সংস্কৃত নাটকের বিষয় সামান্য কিছু উল্লেখ করবো।

এই দুইটি গ্রন্থ হলো (১) শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" এবং (২) মহাপ্রভুরই প্রাণপ্রিয় শিষ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত "মহাপ্রভু-হরিদাসম্।" এই দুটি গ্রন্থ ১৯৫৮ সালে বাংলা হরফে প্রকাশিত হয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় হরণ করেছিল। সম্প্রতি অবাঙ্গালীদের বিশেষ অনুরোধ ক্রমে ঐ গ্রন্থদ্বয় দেবনাগর অক্ষরে পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথম নাটক, "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্"। জননী বিষ্ণুপ্রিয়া এতদিন সত্যই ছিলেন "কাব্যের উপেক্ষিতা"। যতীন্দ্রবিমল আজীবন মাতৃ-পূজারী। তাই তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার পুণ্য জীবনী সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু অজ্ঞাত অথচ একান্ত সত্য ঘটনা এই নাটকে সন্নিবিষ্ট করে একই সঙ্গে গবেষকমণ্ডলী এবং কাব্যামোদী সকলেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই নাটক সাত অঙ্কে সমাপ্ত। এখানে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার মহাতিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত বহু ঘটনা ভক্তিরস সিক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক—"মহাপ্রভু-হরিদাসম্"। এই নাটকটিও সপ্তাঙ্ক। এ গ্রন্থেও বহু গবেষণামূলক তথ্য অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

সকলেই জানেন যে, যে কোনও গ্রন্থের উৎকর্ষ নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর—বিষয়-বস্তু ও ভাষা যতীন্দ্রবিমলের এই দুইটি নাটকে যেন চলেছে নিরন্তর পরস্পরের হাত ধরাধরি করে। সে জন্য নাটক দুটি ভাবের মহিমায় যেমন উজ্জ্বল, ভাষার সাবলীলতায়ও তেমনি উজ্জ্বল। এই উভয় নাটক ভক্তিতে প্রধান; এবং সেজন্য এই গ্রন্থদ্বয়ে ভক্তিভাবের অতি মনোহর স্ফুরণ ঘটেছে। অথচ সেই সঙ্গে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় রসও অতি জমাট হয়ে উঠেছে।

তারপর ভাষার কথা। আমরা সংস্কৃত-রসিকেরা চিরকাল এই কথাই শুনছি যে সংস্কৃত সাহিত্যে ভাবের যতই উৎকর্ষ থাকুক না কেন, ভাষায় কাঠিন্যের জন্য তা' কখনও জনপ্রিয় হবে না। সেই জন্যেই এই নাটক দুটির ভাষা সম্বন্ধে আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মতই বয়ে চলেছে এই সহজ সরল অতিপ্রাঞ্জল স্বচ্ছ সুমধুর সুললিত সংস্কৃত ভাষা—কোথাও কোনওভাবে ভাষা ব্যাহত হয়নি। যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষার কাঠিন্যের অজুহাতে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন না, তাঁদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন এই দুটি নাটক একটু কষ্ট করে পাঠ করেন। বিনা পরিশ্রমে, অনুবাদ ব্যতীত তাঁরা প্রতিটি কথা বুঝতে পারবেন, এবিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। এই নাটক দুটির আর এক বিশেষ গৌরব হচ্ছে অগণিত শ্লোক ও গান। এর প্রত্যেকটি ভাবগৌরবে ও ভাষামাধুর্যে পরম মধুময়। তাদের ছন্দোবৈচিত্র্যও লক্ষ্য করার বিষয়, যেমন "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" গ্রন্থে মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, শার্দুলবিক্রীড়িত, স্রগ্ধরা প্রভৃতি ১৯টি ছন্দে প্রায় ১০০ কবিতা এবং মহাপ্রভু-হরিদাসম্ গ্রন্থে ২১টি ছন্দে দেড়শত মনোরম শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সামান্য ২।১টি সঙ্গীত তুলে দিচ্ছি। অবশ্য কোনটাকে ছেড়ে কোনটা উদ্ধৃত করবো—সেটাই বিবেচ্য। তাহলেও "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" নাটকের বঙ্গজননী স্তুতি এবং হরিদাস নাটকের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

বঙ্গজননীস্তুতি: (বিষ্ণুপ্রিয়া থেকে)

"বঙ্গজননি মঙ্গলখনি সর্বধরণী বন্দ্যে
হরিতকান্তি-জনিতশান্তি-তনয়হৃদয়ানন্দ্যে॥"

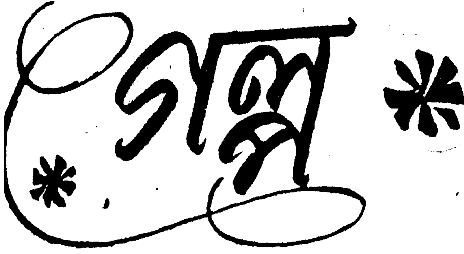
শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি: (হরিদাস গ্রন্থ থেকে)

"নবঘনশ্যামং নয়নারামং বন্দে নন্দ-নন্দনম্
পীতসুবসনং স্মিতসুশোভনং চারু-চন্দন-চর্চনম্।
বিশ্ববাঞ্ছনং বৎসলাঞ্ছনং বনমালাবিভূষণম
মণিমনোহরং মধুমঞ্জুং মঞ্জু-মুরলী-মোহনম্॥"

একাধারে গবেষক ও কবি পৃথিবীর সর্বত্রই বিরল। যতীন্দ্রবিমলের মধ্যে এই উভয় প্রতিভারই অপূর্ব পরিচয় পেয়ে আমরা সকলেই বিশেষ মুগ্ধ। ভরসা করি, তিনি এই উভয় দিকেই উত্তরোত্তর আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করবেন।

বর্তমানে সংস্কৃত সাহিত্যে মৌলিক রচনার সংখ্যা অত্যল্প। অক্লান্তকর্মী পরমোৎসাহী প্রতিভাবান যতীন্দ্রবিমল যে এই দিকে মনোনিবেশ করেছেন, তা পরম আশার কথা—নিঃসন্দেহ। তিনি কয়েক বৎসর পূর্বেই কয়েকটি গবেষণামূলক মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যেমন—তাঁর সংস্কৃত "বঙ্গীয় দূতকাব্যেতিহাসঃ", ঘটকর্পরটীকা "শাশ্বতী," এবং পদাঙ্কদূতটীকা "ভাস্বতী" এবং "শক্তি—সাধনম্" নামক কাব্য বিদ্বানসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তাঁর রচিত বহু সংস্কৃত সঙ্গীত ও বিশিষ্টতম গায়কগণ কর্তৃক গীত হয়ে ভারতের সর্বত্র অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট আদৃত হয়েছে। তাঁর বিরচিত বারটি সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্,' "মুক্তি-সারদম্," "প্রীতি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্," "দীনদাস রঘুনাথম্," "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্," "নিষ্কিঞ্চন-যশোধরম্," "স্বপ্ন-রঘুবংশম্," "মহিমময়-ভারতম্," "আনন্দরাধম্" প্রমুখ অভিনব সংস্কৃত নাটকগুলি সর্বত্র অভিনীত হয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয়গণের অশেষ স্নেহভাজন ও আশীর্বাদধন্য যতীন্দ্রবিমলের এই ভক্তি ও কাব্যের উৎস চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই প্রা ।



হিংসার পরিণাম

[জাতকের গল্প]

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে বারাণসীতে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তার নাম ছিল কলাবু। অত্যন্ত কুটিল আর নিষ্ঠুর ছিলেন ঐ রাজা। বিলাস-ব্যসনেই তিনি ব্যয় করতেন তাঁর অর্থ আর সময়। প্রজাদের সুখদুঃখের প্রতি তিনি কোনই নজর দিতেন না। প্রজারা অত্যন্ত দুঃখদারিদ্র্যে দিন কাটাত। কোন প্রতিবাদ করবার উপায় ছিল না।

সেই সময় একদিন বোধিসত্ব বারাণসীতে এসে পৌছলেন। দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের সেনাপতি। বোধিসত্ব ঐ সেনাপতির অনুরোধে রাজার বাগানে বাস করতে লাগলেন।

একদিন রাজা কলাবু তাঁর রাণীর সঙ্গে বাগানে ভ্রমণ করতে এলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর রাণী বোধিসত্বের কাছে ধর্মকথা শোনবার জন্যে চলে গেলেন। বোধিসত্ব তখন সকলকে ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন। অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিতে লাগলেন।

রাজার ঘুম ভাঙলে তিনি দেখলেন কেউ কোথাও নেই, তিনি একাকী বসে আছেন বাগানে। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে উঠল। তিনি উঠে বাগানের চারিদিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন বোধিসত্বকে। আর দেখলেন সেখানেই তাঁর রাণী আর সখীরা বসে আছেন।

রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন বোধিসত্বের কাছে। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন "কে তুই শয়তান?"

রাণী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু বোধিসত্বের মুখে দেখা দিল নির্মল হাসি, তিনি বললেন, "আমি একজন ভিক্ষু। ক্ষমা করাই আমার ধর্ম। হে রাজন্।"

"দাঁড়া শয়তান, ভাল করেই তোকে ক্ষমা করা শেখাচ্ছি"—রাজা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন।

রাজা তখন ঘাতকদের ডেকে বললেন—"এই লোকটা একটা শঠ প্রবঞ্চক, একটা গাছে বেঁধে ওকে দুশো ঘা বেত মার।"

ঘাতক তখনই বোধিসত্বকে একটা গাছে বেঁধে ফেলে চাবুক মারতে শুরু করল। বোধিসত্বের সারা দেহে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু সেই প্রশান্ত নির্মল হাসিটি লেগে রইল তার মুখে।

"এখনও তুই ক্ষমা করবি?"—রাজা প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ রাজন্ আপনাকে আমি ক্ষমা করলাম। আপনি দীর্ঘজীবী হউন্।" বোধিসত্ব উত্তর দিলেন।

"আরও ভাল শিক্ষা তোর প্রয়োজন।" এই বলে রাজা ঘাতককে ওর হাত পা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। ঘাতক সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্বের হাত পা কেটে ফেলল। ক্ষতস্থান হতে দর দর ধারে রক্ত নেমে এল। কিন্তু তখন তিনি বসে রইলেন। মুখে প্রশান্ত হাসি, যাতনার চিহ্ন মাত্র নাই।

"এখনও ক্ষমা করবি, ওরে দুরাত্মা?" রাজা প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ রাজন্। আপনি সুখী হউন।" বোধিসত্ব উত্তর দিলেন।

তখন রাজা কলাবু ঘাতককে ওর নাক আর কান কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। ঘাতক সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল।

কিন্তু তখনও সেই মহান পুরুষের মুখের হাসি মিলিয়ে

গেল না। তিনি বললেন, "হে রাজন্, আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।" কিন্তু এতেও সেই নিষ্ঠুর রাজার হৃদয় বিগলিত হল না। তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মহান পুরুষকে পদাঘাত করে চলে গেলেন।

তখন কাতর হয়ে সেনাপতি বোধিসত্বের পরিচর্য্যা শুরু করলেন।

বোধিসত্ব বললেন, "সব কিছুকেই ভাল বাসবে।" ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

দলে দলে লোক সেই মহান পুরুষের দেহ শ্মশান ঘাটে নিয়ে চলল। তার মরদেহ যখন ধীরে ধীরে আগুনে দগ্ধ হতে লাগল তখন সকলে কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। শেষকালে সকলে সেই চিতাভস্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে আপন গৃহে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সেই নিষ্ঠুর রাজা কলাবু শোচনীয় ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হলেন। তিনি প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার সময় হঠাৎ আকাশে বিদ্যুতের রেখা দেখা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হল তার মাথায়।

পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন সেই পাপী রাজা। রাজ্যের লোক নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে লাগল সেই ছাইয়ের উপর।

অতিথি সৎকার

শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়

(ভক্ত "দাদুর" জীবনের ঘটনা অবলম্বনে)

সাধু ফিরে যেতে ভজন কুটীরে হঠাৎ প্রবল ঝড়ে
গরীব মুচির দুয়ার প্রান্তে যান আশ্রয় তরে,
আঙিনার পাশে দাঁড়ায়ে দেখেন ভিতরে চর্ম্মকার
ক্ষীণ দীপালোকে তন্ময় হয়ে করিছে কর্ম্ম তার
জলের শব্দে মুখ তুলে মুচি সাধুকে দাঁড়ায়ে দেখি
বাহিরে আসিয়া করজোড়ে কহে—আমার ভাগ্য একি!
"সাধু দাঁড়াইয়া গরীবের দ্বারে এও কি সত্য প্রভু?
এমন ভাগ্য এ অন্ত্যজনের দেখেছে কি কেহ কভু?
ভিতরে আসুন কৃপা করি, মোর তীর্থ হউক ঘর,
চামড়ার এই টুক্‌রা পেতেছি বসুন ইহার পর;
রাত্রে আমার নিজের আহার সামান্য যাহা আছে
তাই সেবা করি এই দুর্য্যোগে থাকুন আমার কাছে।"
বসায়ে সাধুরে চর্ম্ম আসনে বিশেষ শ্রদ্ধা ভরে
মাটির পাত্রে আহার ও জল আনি নিবেদন করে
বলে "মহারাজ দীন সেবকের অপরাধ নিও নাক
গরীবের যাহা খুদ কুঁড়ো আছে তাহাতে তুষ্ট থাক।"
সাধু চুপচাপ হেঁট মস্তকে, কোন কথা নাহি বলে
শান্ত সৌম্য মুখখানি তাঁর ভাসে দু'চোখের জলে,
মুচি তাহা দেখি ভয়ে জড়সড় কহে জুড়ি দুই কর
না জানিয়া ব্যথা দিলাম তাই কি বিরূপ আমার পর?
অশুচি মুচির অর্ঘ্য গ্রহণে মনে কি জাগিছে ঘৃণা
অপরাধ মোর বুঝেছি, বাঁচিব কেমনে গো ক্ষমা বিনা?"
সাধু উঠে এসে মুচিরে জড়ায়ে ধরেন নিজের বুকে
বলেন "তোমারে অশুচি যে বলে ক্ষমা কোরো তুমি তাকে
তুমি যা শেখালে কোন দিন আমি ভুলিব না আর ভাই
আমার শিক্ষাগুরুর আসনে বসানু তোমারে তাই"
হতবাক মুচি বুঝিতে না পেরে চেয়ে রয় বিস্ময়ে
মন ভরে তার কি এক অজানা গ্লানি ও লজ্জা ভয়ে;
সাধু ক'ন "মোর হৃদি অঙ্গনে এই মত বার বার
প্রিয়তম মোর এসে দাঁড়ায়েছে খবর রাখিনি তার
কখনও নিজের খেলাধুলা ছেড়ে দেখিনি তাঁহার পানে
বলিনি ত 'প্রভু বাহিরে থেকনা এস বস এইখানে'
যা আছে আমার পারিনি ত দিতে নিঃশেষে তাঁরে ঢেলে
তুমি আজ ভাই সব অকপটে যেমন আমায় দিলে
তাই ত আমার প্রভু প্রিয়তম হৃদয় দুয়ার পরে
এসে সাড়া নাহি পেয়ে ফিরে গেছে ব্যথাতুর অন্তরে
তাইত আমার হৃদি মন্দির রহিল শূন্য পড়ি
তাইত বিরহ ব্যথার আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরি
তাইত আমার যাযাবর বেশে ঘোরা সার হ'ল শুধু
তাইত সারাটা হৃদয় শূন্য মরু সম করে ধু ধু
তাইত আমার চির প্রিয়তম না দিল আমায় ধরা
তাইত আমার ব্যর্থ জীবন মিছে বেঁচে থেকে মরা
রুদ্ধ আমার হৃদয় দুয়ার হতে বার বার ফিরে
অভিমানী সেই প্রেমের ভিখারী আর ধরা দিবে কিরে?
শুচিশ্রেষ্ঠ মুচি ভাই যেন তোমার আশীর্ব্বাদে
চিনে নিতে পারি সেই অতিথিরে যার তরে প্রাণ কাঁদে"
মুচি ছুটে যায় লুটাতে সাধুর চরণ পদ্ম পরে
সাধু তারে তুলে পরম আদরে বার বার বুকে ধরে
ভাবাবেগে বাক্‌রুদ্ধ সাধুর মুগ্ধ চর্ম্মকার!
সারা অন্তর নিঙাড়ি চক্ষে জল ঝরে দুজনার।



অভিজ্ঞতার কথা

উপানন্দ

মানসিক প্রফুল্লতা হৃদয়-কাননের চিরবসন্ত। এর ভেতর দিয়ে উৎসারিত হয় মনপ্রাণমুগ্ধকর সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন সুধাধারা। এটী উৎকৃষ্ট ভেষজতুল্য হিতকর। সঙ্কীর্ণ হৃদয় আপনাকেই দেখতে চায়, পারিপার্শ্বিক কাউকে সে দেখতে জানে না। পরিশ্রমই জীবন। কায়িক পরিশ্রম, আহার, নিদ্রা ইত্যাদির সমবায়ে জীবনীশক্তি উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। এই তিনটির মধ্যে যে কোনটীর একটু ব্যতিক্রম হোলেই শরীরের পক্ষে অমঙ্গল। স্বাস্থ্যই একান্ত দৈহিক সুখের ভিত্তি স্বরূপ। ক্ষণিক সুখের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করা অতি শোচনীয় নির্ব্বুদ্ধিতা। পীড়া কেবল স্ফূর্তিবাজ জীবনের করস্বরূপ। খুব মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ু, সহজ পরিশ্রম আর কিঞ্চিৎ সতর্কতা—এইগুলি দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যলাভের উৎকৃষ্ট উপকরণ। ডাক্তারের ঔষধ অপেক্ষা প্রকৃতির ওপর বেশী নির্ভরশীল হোলে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাবে। মৃত্যুই জীবনের কষ্টিপাথর। এর সন্নিধানে এলে পুণ্যাত্মা নিজের পবিত্র জীবনের মাহাত্ম্য সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন—আর যে ব্যক্তি আজীবন পাপাচরণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি, কপটতা দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, পরের ক্ষতি করেছে—আর শক্তির দম্ভে উচ্চ আসনে বসে অন্যায় অবিচার করে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, সে ব্যক্তি মৃত্যুসাগর তীরে এসে, কৃতকর্ম্মের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ঔরংজেব তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সৎস্বভাব ও সৎসাহস উভয়ই সম্মানের সোপান।

যে বায়ু জীবের জীবন, সে বায়ু নিজেই চঞ্চল। যে বায়ু যত অধিক চঞ্চল, সেই বায়ু তত অধিক জীবনীশক্তিপ্রদ। ভালো করে মুখব্যাদানপূর্ব্বক হাই তুলতে পারলে শরীর খুব ভালো থাকে। তোমরা যখন ঘরের বাইরে রৌদ্র ও নির্ম্মল বায়ু লাভ করো, তখন তোমাদের হজমশক্তি ঘরের ভেতরে থাকাকালীন অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। অনেকে মনে করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় রাত্রের হাওয়া দেহে প্রবেশ করলে শরীর খারাপ করে, এ ধারণা ভুল। দিনের হাওয়া অপেক্ষা রাত্রের হাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ঊনো ভাতে দুনো বল, অতি ভোজনে আয়ু হ্রাস হয়। মানুষের চতুর্দ্দিকের বায়ু তিন শত ডিগ্রী পর্য্যন্ত হোলেও মানুষের গায়ের স্বাভাবিক উত্তাপ সাতানব্বই থেকে একশত ডিগ্রীর বেশী হয় না।

কখন ঘর্ম্মাক্ত দেহে রোগীর কাছে যাবে না। খালি পেটে রোগী দেখতে যেতে নেই। কখন রোগীর ঘরে দরজা বা জানালার কাছে দাঁড়াতে নেই, ঘরে আগুন থাকলে তার উত্তাপ রোগের বীজ আকর্ষণ করে—রোগী আর আগুনের মধ্যস্থলে দাঁড়ালে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। রোগীর মাথার দিকে দাঁড়ানো বা উপবেশন করাই নিরাপদ। মানুষ তার জীবনের অন্য সকল সময় অপেক্ষা চল্লিশ বৎসর বয়সেই ওজনে অধিক ভারী হয়। জীবন রক্ষার জন্যে আহার, আহারের জন্যে জীবনধারণ নয়।

সর্দ্দি হোলে চার পাঁচবার অডিকলোনের ঘ্রাণ নেবে। একখানি রুমালে অডিকলোন ঢেলে মুখও নাসাপথের সাহায্যে দীর্ঘকাল ধরে শ্বাস টেনে নিলে গলদেশের প্রদাহ ও সর্দ্দি কফ দূর হবে।

পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল হোলে মধু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মধু যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক। পুরাতন যক্ষ্মায় এটী রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। এক গ্লাস জলের বা দুধের ভেতর মাঝারি চামচের দুই থেকে তিন চামচ মধু দিয়ে ভালো ভাবে নেড়ে পান করবে। সাধারণতঃ দিনে আর ভোরের দিকে একবার গ্রহণ করবে। সর্ব্ববিধ বুকের রোগে মধু অত্যন্ত উপকারী। প্রতি পাউণ্ডে এর তাপ-মূল্য ষোল শত ক্যালরি। মধু হার্ট ও লিভারের শ্রেষ্ঠ টনিক। সর্দ্দি ও নষ্ট করে।

নির্দ্দয় মানুষ পাখী শিকার করে বাহবা নিয়ে থাকে, সে জানে না

পাখী পৃথিবীর পক্ষে কত উপকারী। জগতে যদি পাখী না থাকতো, তাহোলে নয় বছরের ভেতর সমগ্র জগৎ পোকায় পরিপূর্ণ হয়ে যেতো—আর সেই সব কীট ধ্বংস হয়ে পৃথিবীতে এমি সব সাংঘাতিক বিষের উৎপত্তি হোতো যে, মানুষ বা অন্য জীবের এটা বাসের অযোগ্য হোতো। কিন্তু পৃথিবীতে এত পাখী, যে জীবন্ত অবস্থায় ঐসব কীটকে উদরস্থাৎ করে ফেলে। সৌন্দর্য্য মানুষের চোখে ধরা দেয়, কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করতে পারে। তুচ্ছের সংহতি উচ্চের গৌরব নষ্ট করতে পারে।

মিতব্যয়ই সৌভাগ্যের স্রষ্টা। যারা গরীব তাদের ব্যয় করবার অর্থের পরিমাণ কম হোতে পারে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কম নয়। গরীবদের মধ্যে মিতব্যয়ীর সংখ্যা কম, এজন্যেই দারিদ্র্য কষ্ট দূর হয় না। সামান্য চাকরাণী এমন জিনিষ কিনতে অনায়াসে সাহসী হয়—যেখানে তার প্রভু-পত্নী কখনও স্বপ্নে ও ভাবতে পারেন না। পরের সর্ব্বস্ব শোষণ করে আর পরের মনে কষ্ট দিয়ে কীর্ত্তির মন্দির গড়ে তোলা যায় না। বন্ধুতা মানুষের প্রকৃতিমূলক। প্রকৃত বন্ধু যেমন মহোপকারক, কপটবন্ধু তদ্রূপ মহানর্থের মূল। বর্ত্তমান সময়ে কপটবন্ধুর সংখ্যাই বেশী। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনই দুঃখজনক।

চরিত্রই দুঃখীর মূলধন। ভগবৎ বিশ্বাসই তার অবলম্বন। মন্দভাগ্য উচ্চ আশাকে ক্ষুণ্ণ করে। অধিক বাক্য প্রয়োগ বা একেবারেই মৌন-ব্রত শ্রেয়স্কর নয়। জিহ্বা পিছলানো অপেক্ষা পা পিছলানো ভালো অর্থাৎ কথার খেলাপ করা ভালো নয়। মানুষের মনুষ্যত্ব না থাকলে, ঐশ্বর্য্য আর পাণ্ডিত্য থাকলেও সে পশু। এই পশুতেই আমাদের দেশের সমাজ আজ পরিপূর্ণ। এদেশে এখন চলেছে বর্ব্বর যুগ। স্বল্পকাল-স্থায়ী দুঃখই সুখজনক। শত্রু মিত্র বুঝবার পক্ষে বিপদই একমাত্র উপায়। মানুষের মনে যতই ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হোতে থাকে, ততই সে নম্র আর বিনয়ী হয়ে ওঠে। যখন মানুষ কাজ দেখে ভয় পায়, তখন সে শক্তিহীন।

পতিত ব্যক্তিকে হাত ধরে তোলাই মহত্ত্ব। এদেশের লোক শিক্ষার গৌরব করে বটে কিন্তু যে শিক্ষা চরিত্র গঠন করতে পারে না, সে শিক্ষার কোন সার্থকতা বা গৌরব নেই। স্বাভাবিক বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধি। নরহত্যা যেমন মহাপাপ, বাকহত্যাও তেমনই মহাপাপ। আজকাল-কার লেখায় শব্দ বিশেষের অর্থ ওলোট পালোট করে বাহাদুরী বা বাহবা নেওয়ার রেওয়াজ দেখা যায়। শব্দের উপর অত্যাচার করলে, তার প্রাণ স্বরূপ অর্থ ও নষ্ট হয়ে যায়। আজকের দিনে বাক্ হত্যা করে করে ভাষা-জননীর অভিসম্পাত কুড়োচ্ছে দেশ। মানুষের প্রাণ যেমন অবধ্য, ভাষারও প্রাণ তেমনই অবধ্য। ভাষার অঙ্গহানি করে নূতনত্ব হয় না, ক্ষতসৃষ্টি হয়। চিন্তা এক হোলেও, প্রতিবার সে একটা নতুন পথে নতুনভাবধারা সঙ্গে নিয়ে আসে। যে সব চিন্তা মানুষ সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়, সেগুলো তার যন্ত্রপাতির সামিল।

যার ধর্ম্মের আবরণ নেই, সে যত বস্ত্রই পরিধান করুক না কেন, তবু সে দরিদ্র। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয় সাধনায় সিদ্ধিলাভের একমাত্র মূলমন্ত্র ঐকান্তিকতা। অলস আর অপব্যয়ী ব্যক্তি কখন বড় হোতে পারে না। সৌভাগ্য আর যশ অনায়াসসাধ্য নয়। যারা জীবনের একটা মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করেননি এরূপ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের ফলেই সমগ্র জগৎ চলে থাকে। যে সব দেশে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, সেই দেশেরই সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। বিলাসিতা জাতীয় অধঃপতনের কারণ, আর দুর্নীতির সহচর। ন্যায়পরতাই সমাজ রক্ষার মূল। এদেশে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির খুবই অভাব। আকাঙ্ক্ষাতেই অভাবের সৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা কমলেই অভাবও কমবে। তোমরা সব বিশ্বাস করতে পারো কিন্তু তোষামোদ প্রিয় হাম বড়া লোককে কদাচ সন্তুষ্ট করতে পারো, এটা বিশ্বাস করো না। এরূপ দাম্ভিক লোক হোতে সমস্ত নিরীহ লোকই দূরে থাকতে চায়, নচেৎ অপমানিত হয়ে পড়তে হয়। শিল্পে ঋণ পরিশোধ করে, কিন্তু হতাশা ঋণ বৃদ্ধি করে। তোমরা এই সব অনুধাবন করে ভাবী জীবনের পথে অগ্রসর হবে।

রবার্ট লুই ষ্টীভেনসন্

রচিত

দি বট্‌ল্ ইম্প

(বোতলের শয়তান)

সৌম্য গুপ্ত

(২)

পরের দিন ভোর হতেই কিয় ছুটলো লোপাকার সন্ধানে···খবর নিয়ে জানলো—লোপাকা তার পাল-তোলা জাহাজে চড়ে হনলুলু যাত্রা করেছে! কিয় তখনি যাত্রী-জাহাজে চড়ে পাড়ি দিল হনলুলুতে···সেখানে গিয়ে সংবাদ পেলো, কিয় পৌছুবার আগেই লোপাকা সে দেশ ছেড়ে অনেক দূরে অন্য কোথায় রওনা হয়ে গেছে···কবে ফিরবে, কেউ তা জানে না!···কিয়র মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো!···তাহলে, সেই বোতল? খবর পেলো—সে বোতল লোপাকা বেচে দিয়ে গিয়েছে!

কিন্তু, কাকে?···কাকে বেচেছে?···বহু তল্লাশ করে কিয় জানতে পারলো যে, হনলুলুর সামান্য এক ব্যবসাদার নাকি রাতারাতি হঠাৎ লক্ষপতি বনে গেছে! কিয় ছুটে গেল সেই ব্যবসাদারের কাছে···সেখানে গিয়ে শুনলো—ব্যবসাদার সে বোতল কিনেছিল, তবে সম্প্রতি অন্য লোককে বেচে দিয়েছে—যাকে বেচেছে, সে লোক থাকে সহরের প্রান্তে বেরেটানিয়া ষ্ট্রীটে!

কিয় তখনি ছুটলো বেরেটানিয়া ষ্ট্রীটে ; সে লোকটিকে ধরলো! লোকটি সে বোতল বেচবে বলে আকুল হয়ে ছিল…তার কাছ থেকে মাত্র দু'সেণ্ট দাম দিয়ে কিয় আবার সেই বোতলটা কিনলো। কেনবার সময় তার দারুণ দুশ্চিন্তা…এ বোতল বেচতে হবে দু'সেণ্টের কম দামে! অর্থাৎ, মাত্র এক সেণ্ট দামে এ বোতল বিক্রী করতে হবে!…যাকে বেচবে, সে এ বোতল বেচবে…তত…কত দামে? এক সেণ্টের চেয়ে কম দামের মুদ্রার চা চলন নেই এ মুল্লুকে!…তাহলে উপায়?…যে কাকে এক সেণ্ট দামে এ বোতল আবার বেচতে যাবে—বেচবার আগে তাকে এর সর্ত্ত বুঝিয়ে দিতে হবে…এক সেণ্টের কম দামে এ বোতল সে যখন বিক্রী করতে পারবে না, তখন কেন সে এ বোতল কিনবে?…এবং তা যদি না কেনে, তাহলে এ বোতল তাকেই রাখতে হবে—যতদিন না মৃত্যু ঘটে…এর উপর রয়েছে আবার নরক-যাতনা-ভোগের পালা!

কিয় পড়লো মহাসমস্যায়…লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো—এ বোতল কেন কিনেছিলেন, মশাই?…লোকটি বললে—তহবিল-তছরূপ আর জাল-জালিয়াতীর অপরাধে আমার জেল হতে বসেছিল—সেই জেল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য!

কিয়র মনে জাগলো কোকুয়ার কথা…কোকুয়ার সঙ্গে বিবাহ না হলে, জীবন মিথ্যা। তার চেয়ে বরং এই বোতলের দৌলতে যদি কোকুয়াকে পাশে পাই, তাহলে সে-সুখের দৌলতে অশান্তি আর নরক-যাতনা ভোগও অনেক ভালো!

কিয় কিনলো সে বোতল—দু'সেণ্ট দামে। শয়তানের সঙ্গে আবার সুরু হলো তার কারবার! কিয় মতলব আঁটলো—যে দেশে তামার মুদ্রা 'পেনীর' (Penny বা Pence) চলন আছে—এক সেণ্টের চেয়ে কম দামের পেনী—সেই মুল্লুকে গিয়ে এ বোতল বেচবে!

বোতল কিনে দু'দিন পরে কিয় ফিরলো বাড়ী…বোতলের শয়তানের দৌলতে সে হলো ব্যাধি-মুক্ত…তখন তার বিবাহে বাধা রইলো না—কিয় করলো কোকুয়াকে বিবাহ!

বিবাহ হয়ে যাবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত কিয়র মনের গ্লানি কিন্তু কাটলো না!…সব সময়ে, সর্ব্ব-সুখে কাঁটার মতো বুকে খচ্ খচ্ করছে অশান্তির যাতনা…শয়তানের কাছে নিজেকে বিকিয়েছে…কে জানে, কখন কি অনর্থ ঘটবে।…তখন?

কোকুয়া লক্ষ্য করে কিয়র বিমর্ষ ভাব…একদিন সে বললে কিয়কে—আমাকে বিয়ে করে সুখী হওনি? তাই এমন মলিন-বিমর্ষ থাকো?

কোকুয়ার দু'চোখ অশ্রু-সজল…দেখে কিয়র মন বিগলিত হলো! কোকুয়াকে বোঝালো—না, না, কোকুয়া…তোমাকে বিবাহ করে আমি কত সুখী, তা কি করে বুঝিয়ে বলবো! তোমাকে পেয়ে আমার পৃথিবীর সব কামনা পূর্ণ হয়েছে!

—তবে?

কিয় তখন কোকুয়াকে খুলে বললো সব বৃত্তান্ত…বোতলের নিদারুণ সর্ত্তের কথা! বললে—এ বোতল যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বেচতে পারবো, অশান্তির অন্ত হবে না!

কোকুয়া শুনলো সব কথা…শুনে বললে—তাহলে চলো, আমরা এ বোতল নিয়ে তাহিতি দ্বীপে যাই—সেখানে চলে 'সেণ্টিম্' (Centim) মুদ্রা—আমাদের দেশের এক সেণ্টে সেখানকার পাঁচ সেণ্টিম্—কাজেই কম দামে সেখানে অনায়াসে এ বোতল বিক্রী করতে পারবে!

তাই হলো…এক মাস পরে কিয় আর কোকুয়া দুজনে পৌছুলো তাহিতি দ্বীপে। তাহিতি দ্বীপ ফরাসীর অধিকারে…সেখানকার লোকজন ফরাসীভাষায় কথা কয়—কাজেই বোতলের সর্ত্ত আর গুণাগুণ তাদের বোঝাতে রীতিমত মুস্কিল বাধলো!

কোকুয়া পরামর্শ দিলে—এ বোতলের দৌলতে আমরা যদি—অনেক ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি দেখাতে পারি, তাহলে এখানকার লোকজনের কাছে বোতল বেচা শক্ত হবে না!

তখন কোকুয়ার পরামর্শমত কিয় ওখানকার বড়-বড় দালাল ধরলো…বললো—বিরাট প্রাসাদ কিনতে চাই—যত দাম লাগে, দেবো!

কেনা হলো প্রকাণ্ড বাড়ী-বাগান…সেখানে বাস

করে বড়মানুষীর নানা চাল দেখিয়েও বোতল বিক্রী করা সম্ভব হয় না! কিন্তু এখন প্রতিক্ষণ শয়তানের বিষ-জর্জ্জর প্রভাব উপলব্ধি করছে—খদ্দেরের সন্ধান চলেছে একাগ্রভাবে!

অবশেষে খদ্দের জুটলো···চার সেন্টিমে বোতল বিক্রী করবে কিন্তু—এ বোতলের দৌলতে আমার এত ধন-ঐশ্বর্য্য!

খদ্দের বললে—বিশ্বাস হয় না! এত যদি বোতলের গুণ, তাহলে অতি-তুচ্ছ চার সেন্টিমে এ বোতল বেচবার মানে?

কিন্তু সর্ত্তের কথা বললো। সর্ত্ত শুনে খদ্দেররা বলে—কামনা পূর্ণ করে বোতল বেচবার জন্য যদি খদ্দের না পাই? বাপরে, তাহলে নরকযাতনা সার হবে!···তাতে লাভ?

কাজেই বোতল আর বিক্রী হয় না! সারা তাহিতিতে রাষ্ট্র হলো—ঐ তরুণ-দম্পতী একটা কিম্ভূত সর্ব্বনেশে বোতল চায় বেচতে! বোতলের বৃত্তান্ত যে-লোক শোনে, সে-ই চমকে ওঠে! কিয়কে আর কোকুয়াকে পথে-ঘাটে দেখলে লোকজন ভয়ে বিশ হাত দূরে সরে যায়।

কোকুয়ার মনে শেষে দারুণ অশান্তির জ্বালা! তার জন্যই—তাকে পাবার জন্যই কিয় এ বোতল কিনে শয়তানের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে—কোকুয়াই এ অনর্থের মূল!

গভীর রাত্রি—কিয় আর কোকুয়া—দু'জনে দু'ঘরে শয়ন করে। বিছানায় শুয়ে আছে কোকুয়া—পাশের ঘরে কিয় গাঢ় ঘুমে অচেতন! কোকুয়ার চোখে ঘুম নেই—মনে শুধু চিন্তা—কি করে···কি করে এ বোতলটা কিয়র কাছ থেকে বিদায় করা যায়? হঠাৎ একটা কথা মনে হলো—

যেমন মনে হওয়া, বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে কোকুয়া বেরুলো বারান্দায়—বেরিয়ে নিঃশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করলো—তারপর সে চলে এলো নির্জ্জন পথে—অন্ধকার রাত্রে।

একা পথে বেরিয়ে কোকুয়া চলেছে···চলেছে। কোথায় চলেছে, জানে না—যেন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা!

খানিকদূর যাবার পর এক বৃদ্ধভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তাঁকে দেখে কোকুয়া বললে—আমি বড় বিপদে পড়েছি··· আমাকে যদি সাহায্য করেন?

বৃদ্ধ বললেন—কি তোমার বিপদ, বলো মা!

কাঁদতে কাঁদতে কোকুয়া বললে বোতলের কাহিনী··· বললে—দয়া করে সেটি যদি আপনি গিয়ে কিনে আনেন কিয়র কাছ থেকে···চার সেন্টিমে কিনবেন ··কিনে এখানে আসবেন···আমি তিন সেন্টিমে আবার সেটি কিনবো··· তাহলে আপনার কোনো দায় থাকবে না, আমার স্বামীও মুক্তি পাবেন। এই নিন, আমি দিচ্ছি তিন সেন্টিম—বোতলের দাম। আপনি যদি চান, ঐ বোতলের দৌলতে আপনার যে কামনা আছে তা পূর্ণ করতে পারবেন।

হেসে বৃদ্ধ বললেন—আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি এ বয়সে আমার কোনো কামনা নেই মা! তবে, তোমার যদি উপকার হয়—বেশ, দাও চার সেন্টিম···আমি তোমার বাড়ী গিয়ে তোমার স্বামীর কাছ থেকে সে বোতল কিনে এনে তোমাকে দেবো!

কোকুয়া যেন হাতে পেলো স্বর্গ! সে বললে—বেশ, আমি এখানে আপনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবো···আপনি বোতল নিয়ে এলে আমি আপনাকে তিন সেন্টিম দিয়ে সে বোতল আপনার কাছ থেকে কিনে নেবো। আপনার কোনো ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

বৃদ্ধ বললেন—বেশ মা, তুমি যখন এত করে বলছো· আমি বোতল কিনে আনবো!

বৃদ্ধ চলে গেলেন···কোকুয়ার অধীর প্রতীক্ষা··· বহুক্ষণ!···তারপর বৃদ্ধ ফিরলেন! কোকুয়া বললে—কি হলো?

বৃদ্ধ বললেন—তোমার স্বামী বোতল বেচেছেন···এ সে বোতল!

কোকুয়া বললো—আপনি কোনো কামনা জানান··· যে কোনো কামনা—বোতলের উদ্দেশে!···এখন এ বোতল আপনার···আপনি যে কামনা জানাবেন, সেই কামনাই পূর্ণ হবে!

হেসে বৃদ্ধ বললেন—বলেছি তো, এ বয়সে আমার কোনো কামনা নেই মা! আমি এ কাজ করেছি শুধু তোমার ভালো হবে···তুমি বিপদে মুক্তি পাবে বলছো তাই।

বোতল নিয়ে বৃদ্ধের হাতে কোকুয়া দিলে তিন সেন্টিম ...বোতলের মালিক এখন দু'সেন্টিমে সে এ বোতল বেচে র দায় থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবে !

বৃদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে কোকুয়া নিঃশব্দে ফিরে এলো াড়ীতে···সোজা নিজের ঘরে !

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



ম্যাজিকে অসাধ্য সাধন

যাদুকর—শ্রীএম রায়

ম্যাজিকের কৌশল বর্ণনা করার পূর্বে কয়েকটি কথা বলে নিচ্ছি। ম্যাজিকের খেলা সুন্দর হওয়া বা দর্শকের মনে তাক লাগানো সম্পূর্ণতাই নির্ভর করে প্রদর্শন-ভঙ্গীর উপর। নিপুণ হাতে খুব রসালো গল্প জুড়ে যে কোন ছোট খেলাই দেখানো যাক না কেন, তাহাই দর্শকবৃন্দের মন জয় করতে সমর্থ হয়। তাই ম্যাজিক শিখবার পূর্বে শিক্ষা করা প্রয়োজন—কি করে ম্যাজিক দেখানো যায়, মানে—কি পদ্ধতিতে দেখালে খেলাটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে। অনেকেই দেখেছি যে ম্যাজিকের কৌশলটা শিক্ষা করার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু কোথায় কি ভাবে দেখাতে হবে তা আর কেউ জানতে চায় না। যার ফলে খেলাটি নিপুণভাবে দেখানো যায় না, আর দর্শকদেরও তখন অপক্ক হাতের খেলা দেখবার আগ্রহ থাকে না—এমন কি অনেক ক্ষেত্রে খেলাটির কৌশলও ধরা পড়ে যায়। যেমন অভিনয় করতে হলে শুধু পাঠ (কথাগুলি) মুখস্ত করলেই হয় না, তার চাল চলন, উপযুক্ত পোষাক ও রীতিমত মহড়ার প্রয়োজন—তেমনি যাদুর খেলাও, অভ্যাসযোগ কৃতকার্য্যতার সোপান। অভ্যাসযোগের আরো গভীর অর্থ 'সাধন', যাকে ইংরাজীতে খুব সহজেই অনেকে আওড়ায় Practise and Practise. Practise makes many a man Perfect. And perfectness is the sign of success. অবশ্য যাদের প্রথম ম্যাজিকের প্রতি আকর্ষণ জন্মে এবং শিখবার আগ্রহ খুব প্রবল হয়, তাদের অনেকেই হয়তো এই কথাগুলি শুনতে বা বুঝতে চান না। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য—ম্যাজিকের কৌশলটুকু জানা। A, B, C, D, ইত্যাদি শিখলেই যেমন ইংরাজী বলা বা পড়া যায় না, তার জন্য প্রয়োজন আরো অধ্যয়ন। কি করে কার সঙ্গে কখন কিভাবে কোন শব্দ জুড়ে প্রয়োজনমত বাক্য তৈরী করা যায়। তেমনি মূল A, B, C, D,র মত শুধু কৌশলটা শিখলেই খেলাটি সময়মত সঠিক ভাবে দেখানো যায় না। যাক্ উপদেশ বা উদাহরণ আর দিতে চাই না। অবশ্য আমার ক্ষেত্রেও প্রথমে এই মনোভাব ছিল, যার ফলে পরবর্ত্তীকালে অগ্রগতির পথে আমাকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সময় অল্প,—শিখতে হবে বিস্তর—তাই শুধু উপদেশ পড়েই যদি সময় কেটে যায়, তবে শিখবো কখন—তাই না ?

এবার আসল ঘটনায় যাওয়া যাক্। বিদেশে একবার এক বিরাট জনসমাবেশের সম্মুখে—যাদুর কয়েকটি খেলা দেখাবার জন্য আমি আহুত হই। এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কয়েকটি খেলা দেখার পর আমায় নূতন কিছু দেখাতে অনুরোধ করেন। অনেক ভেবে চিন্তে তখন তাদেরকে বললাম—বেশ—এখন যা দেখাবো তা শুধু ম্যাজিক বলেই মনে করবেন না, রীতিমত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হলেই ইহা দেখানো সম্ভবপর। যদিও এখনো এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা কার্য্য চালাচ্ছি, আশা করি আরও অনেক বেশী আশ্চর্য্যজনক কিছু দেখাতে পারবো। তবে আজ যা দেখাচ্ছি সেটা হলো "অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণী"। তাই আজ যা হবে তার সত্যতা উপলব্ধি হবে সাতদিন পরে।

খেলাটি এইরূপ, এই একটুকরা কাগজে ৭দিন পর প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় (অবশ্য আপনারা যে পত্রিকার নাম করবেন) প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম "হেডলাইন" কি হবে তা লিখে ভাঁজ করে দিচ্ছি ; আর আপনারা আমার লিখিত এই ভাঁজকরা কাগজটি আপনাদের যে কোন খামে শীলমোহর দিয়ে সবাই তাতে স্বাক্ষর সহি করে যে কোন 'আয়রণ-চেষ্টে' বা আপনাদের মধ্যে একজনের নিকট রেখে দিন। পরে ৭দিন পর সর্ব-সমক্ষে উক্ত খাম হতে আমার লিখিত কাগজটি খুলে নির্দ্দিষ্ট পত্রিকার "হেডলাইনে"র সাথে মিলালে দেখতে পাবেন আমার লিখিত কাগজেও তাই লেখা আছে। যেমনি কথা, তেমনি কাজ। একটুকরা কাগজ, একটি খাম, গালা, দিয়াশলাই ও একটি মোমবাতী আনা হলো। সবাই মিলে একটি পত্রিকার নাম বললো। আমিও ঐ কাগজে "ভবিষ্যৎবাণী" লিখে ভাঁজ করে কাগজটি তাদের হাতে দিয়ে দিলাম। শীলমোহর ও সকলের সহি করা হয়ে গেল। এখন সবাই সন্দিগ্ধ মনে অপেক্ষা করতে লাগলো নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য, আর চললো আলোচনা। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে কেহ অবিশ্বাস্য মনে, কেহ বা পরিহাসচ্ছলে নানা রূপ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে এসে হাজির হলো নির্দ্দিষ্ট স্থানে। সবাই সমবেত হ'বার পর তাদের মধ্যেই একজন সেই খামের শীল-মোহর সবাইকে পরীক্ষা করিয়ে শীল ভাঙ্গালো, খোলা হলো খাম, ভিতরে ভাঁজকরা কাগজ দেখা যাচ্ছে। কম্পিত হস্তে লোকটি বের

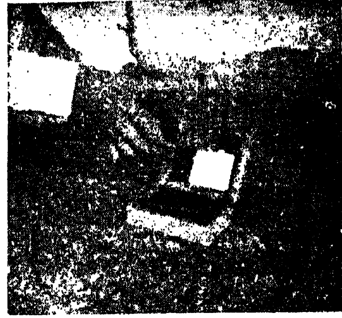
করলো কাগজটি, সবাই দেখলো, আনা হলো নির্দিষ্ট পত্রিকা। মিলানো হলো কাগজের লেখা পত্রিকার 'হেড লাইনে'র সাথে। সবার চোখ স্থির। 'এও কি সম্ভব'? শুধু এই একটি কথাই তখন সবার জিজ্ঞাস্য। হ্যাঁ এও সম্ভব। যেখানে সব কিছু হার মেনে যায় সেখানেই নিতে হয় ম্যাজিকের সাহায্য। তাই এই ভবিষ্যৎবাণী করতে হলে চাই ম্যাজিক কৌশলের সাহায্য।

এবার এর কৌশলটা বলছি—। ঘটনার বিবরণ (খেলাটির বর্ণনা) পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন শুধু কৌশলটির বর্ণনা দিয়ে কিছুটা চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এই খেলায় প্রয়োজন চিত্রানুযায়ী ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স—যা'তে আছে সামান্য একটু কৌশল। এই সামান্য কৌশল করা ছোট্ট বাক্সের সাহায্যেই অবিশ্বাস্য ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব। খেলাটী সুষ্ঠুভাবে দেখাতে হ'লে ঐ বাক্সটি ছাড়া আরো একটি জিনিষের প্রয়োজন—সেটি হ'লো "দৃঢ় মন বল।"

প্রথম দিনের কাজটুকু খুব সোজা। যে কাগজে ভবিষ্যৎবাণী। (৭দিন পরের নির্দিষ্ট করা পত্রিকায় কি 'হেড্‌লাইন' হবে) লিখে দর্শকদের হাতে ভাঁজ করে দেওয়া হ'লো খামে ভরে রাখার জন্যে। আসলে তাতে কোন ভবিষ্যৎবাণীই লেখা থাকবে না। ভবিষ্যৎবাণী লেখার ভাণ করে মিছিমিছি কিছু লিখে কাগজটি ভাঁজ করে দেওয়া হোলো। এখন দর্শকদের মতে ভবিষ্যৎবাণী লেখা ভাঁজ কাগজটি তাঁদের মধ্যে যে কেহ একজন একটি খামের মধ্যে রেখে আঠা দিয়ে খামটি ভাল করে জুড়ে দেবার পর ঐ খামে সবাই সহি ও সীলমোহর করে যে কোন একজন বিশ্বাসী দর্শকের নিকট সাতদিনের জন্য রেখে দিলে।

সাতদিন পর সবাই আবার জমায়েত হলো নির্দিষ্ট স্থানে। ঐ খামটা এবার বের করে ওর সহি ও সীলমোহর সবাই পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হবার পর—যে কেউ একজন দর্শক ঐ সীলমোহরগুলি ভেঙ্গে খাম ছিঁড়ে ওর ভিতর হ'তে ভবিষ্যৎবাণী লেখা ভাঁজ করা কাগজটি বের করলো। এখন দর্শকদের বলতে হবে "এই কাগজটি আমি স্পর্শ করবো না। আপনারা প্রথমে ওর ভাঁজ না খুলে আগে এই ছোট কাঠের বাক্সটিতে (বাক্সটি সবাইকে দেখিয়ে নিতে হবে যাতে করে কারো কোন সন্দেহ না থাকে) রাখুন।" বাক্সটিতে কাগজটি রাখা হলে উহার ডালাটি বন্ধ করে দেওয়া হ'লো। এখন সবাইকে বলতে হবে যে "পত্রিকার হেডলাইন কি আছে বলুন?" তখন তাদের মধ্যে একজন নির্দিষ্ট পত্রিকার 'হেড-লাইন' পড়ে সবাইকে শোনাবার পর বলতে হবে যে "আপনারা এখন ঐ বাক্স হতে আমার লেখা কাগজটি বের করে পড়ে দেখুন।" যেমনি বলা তেমনি কাজ। তাদের মধ্যে একজন ওটা বের করে পড়লে, সবাই অবাক! কি আশ্চর্য্য? সবার মুখে শুধু ঐ কথা।

আসল ব্যাপারটি হ'লো—বাক্সের ডালায়। বাক্সের তলার মাপে এক টুকরো পাতলা কাঠ আছে, (ছবি দ্রষ্টব্য) যার নীচে এবং ডালার মধ্যে লুকানো রয়েছে এক টুকরো কাগজ। এই কাগজে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট পত্রিকার "হেডলাইন" সকালে পত্রিকা দেখে লিখে নিতে হবে। আর ওদিকে সেই সীলমোহরকরা খামে যে ভাঁজ করা কাগজটি আছে তাতে রয়েছে শুধু বাজে কথা লেখা। এখন সকালে পত্রিকার "হেড-লাইন" দেখে লিখিত কাগজটি সেই খামে ভরে রাখা ভাঁজ করা কাগজটির মত ভাঁজ করে নিয়ে কাঠের বাক্সের ডালায় রাখতে হবে এবং (১নং চিত্রের ন্যায়) তার উপরে সেই নকল কাঠটি দিয়ে চাপা দিতে



'হেড্‌লাইন লেখা আসল কাগজটি ভাঁজ করে ডালায় রেখে নকল কাঠটি দিয়ে চাপা দেওয়া হচ্ছে—যাতে কিছু দেখা না যায়।

হবে। এখন এই খোলা অবস্থায় বাক্সটি সকলের সম্মুখে এমন ভাবে রাখতে হবে যেন কোন দর্শকের মনে কোন সন্দেহ না হয়। খাম হতে বের করা 'ভবিষ্যৎবাণীর নাম করে আজে-বাজে লেখা ভাঁজ করা কাগজটি দর্শকদের মধ্যে কে ঐ বাক্সটি রেখে দিবে এবং (চিত্র ২নং) ওর



দর্শকদের মধ্যে একজন এখন সেই খাম হতে বের করা কাগজ টিকে বাক্সের মধ্যে রাখছে। আর বাঁ হাত দিয়ে ধরে রাখা ডালাটির আড়ালেআছে 'হেডলাইন' লেখা কাগজটি।

ডালাটি বন্ধ করে দিলে নকল কাঠটি ডালা হ'তে বাক্সের তলার কাঠের উপর রক্ষিত ভাঁজ করা কাগজটির উপর পড়বে। ফলে আজে-বাজে

লেখা কাগজটি নকল কাঠের নীচে চাপা পড়বে আর সকালে পত্রিকা দেখে লিখে আনা "ভবিষ্যৎবাণী" কাগজটি (যা পূর্ব হতেই ডালা ও নকল কাঠের মাঝে লুকানো ছিল, ২নং চিত্র) নকল ডালার



নকল কাঠটি দিয়ে সকালে পত্রিকা দেখে "হেডলাইন" লেখা ভাঁজকরা কাগজটিকে চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

উপরে থাকবে এবং বাক্সটি খোলা মাত্র এই ভাঁজ করা কাগজটিই সবার নজরে পড়বে ও সবাই তখন এই কাগজটিই তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ে দেখার জন্য ব্যস্ত থাকবে। তখন আর কারোরই ঐ বাক্সের দিকে নজর থাকবে না। এই অবসর মুহূর্তেই বাক্সের কৌশল করা অংশটুকু মানে নকল কাঠটি আর নকল কাগজটি (আগে থাকে লেখা ভাঁজ করা কাগজটি যাহা বর্তমানে নকল কাঠের নীচে চাপা আছে) সরিয়ে ফেলতে হবে। ব্যাস্। তাক্ লাগিয়ে দিতে এটুকুই যথেষ্ট!

—

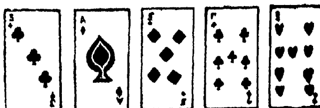
ধাঁধা ও হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

হেঁয়ালি-ছড়া :

১। দাঁড়াতে পারি না আমি—ক্ষীণ দেহ মোর!
হাড় নাহি পায়ে—তবু পায়ে খুব জোর!
সাথে নিয়ে চলো যদি, যাবো ঠিক সাথে—
যত দূর হোক পথ—শ্রান্ত নহি তাতে!

২। তাসের ধাঁধা :



উপরের ছবিতে দেখছো—এক সারিতে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যার পাঁচখানি তাস—টেক্কা, তিরি, পঞ্জা, সাতা আর নওলা! এই পাঁচখানি তাসের দু'খানি বাঁ-দিকে, দু'খানি ডান-দিকে এবং মাঝখানে একখানি—অর্থাৎ ছবিতে যেমন সাজানো রয়েছে, সেই ছাঁদে রেখে, নতুন ধরণে এ ক'খানি তাসের বিভিন্ন সংখ্যাগুলিকে এমন কি ভাবে সাজাতে পারো—যাতে ডান-দিকের তাস দু'খানির সংখ্যা দিয়ে বাঁ-দিকের তাস দু'খানিকে গুণ করে যে গুণফল হবে—সেই গুণফল থেকে মাঝের তাসের সংখ্যাটি বাদ দিলে যে বিয়োগফল যা হবে সেটি যেন উপ-রোক্ত পাঁচটি সংখ্যার যে কোনো একটিরই পুনরাবৃত্তি হয়! উদাহরণ হিসাবে যদি ধরি (৩১ × ৭৯) – ৫ = ২৪৪৪ —তাহলে জবাব ঠিক হবে না। কারণ, মোট সংখ্যার প্রথমেই যে ২ সংখ্যাটি রয়েছে, সেটি ৪ হওয়া চাই! যেভাবে বললুম, সেই ভাবে বিভিন্ন সংখ্যার এই পাঁচখানি তাসকে উল্টে-পাল্টে সাজাবার দু'টি মাত্র উপায় আছে···বলতে পারো, সে উপায় দু'টি কি?···

৩। কিশোর জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালির ছড়া :

মাথা নেই, পা নেই,
পেট ঝল ঝল করে,
সুযোগ পেলে সব সময়েই
আস্ত মানুষ গেলে!

রচনা : সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

অগ্রহায়ণ মাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির" উত্তর :

১। অঙ্কের ধাঁধার উত্তর :

৩৩টি বাড়ী থেকে আসে একটি করে ছেলে; ৩৪টি বাড়ী থেকে দুটি করে, এবং ৩৩টি বাড়ী থেকে তিনটি করে

ছেলে। এ ছাড়া এমনি ধরণের আরো নানা ভাবে এ ধাঁধার সমাধান হতে পারে।

২। হেঁয়ালি ছড়ার উত্তর ঃ

ঘড়ি।

অঙ্কের ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ—

১। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
২। কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)
৩। দেবাশীষ মৈত্র ও প্রভাতী দেবী (কলিকাতা)
৪। কানু, শিপ্রা ও চিনু (জয়নগর)
৫। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৬। বকুল মিত্র, গাজর, টুলু ও দীপু (কলিকাতা)
৭। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৮। মনোরঞ্জন মাহাত (শিলদা)
৯। ইন্দ্রনাথ সেন ও রঞ্জনা সেন (হায়দ্রাবাদ)
১০। তন্দ্রা, স্বপ্না, ছোটন, বাসুদেব ও মন্দিরা চৌধুরী (হাওড়া)
১১। অনীতা, অনুরাধা, অরূপ ও অঞ্জন সেন (আগড়পাড়া
১২। বাপি সেনগুপ্ত
১৩। মণি দে (সম্বলপুর)

হেঁয়ালি ছড়ার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ—

১। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
২। কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)
৩। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৪। দেবাশীষ মৈত্র ও প্রভাতী দেবী (কলিকাতা)
৫। বকুল মিত্র, গাজর, টুলু ও দীপু (কলিকাতা)
৬। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)'
৭। রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৮। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৯। শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পিতা বড়ুয়া (লক্ষ্ণৌ)
১০। ইন্দ্রনাথ সেন ও রঞ্জনা সেন (হায়দ্রাবাদ)
১১। মনোজিৎ, শুভ্রা, বাসন্তী, কুন্তল গুপ্ত (নিউ দিল্লী)
১২। অনীতা, অনুরাধা, অরূপ ও অঞ্জন সেন (আগড়পাড়া)

কে এলো

প্রভাকর মাঝি

পৌষালি দিনে কে এলো, কে এলো,
বনে, মাঠে, বাংলায়,
যেদিকে তাকাই দেখি সে চাদর
বিছিয়েছে কুয়াশায়।
ঘাসে ঘাসে ওকি টল্‌টল্ করে
শিশির, না হীরে কুঁচি ?
ছড়িয়ে দিয়েছে মাঠে মাঠে, আহা,
কনক ধানের গুঁছি !
ছুঁয়ে দিল যেই হাওয়াকে, তখুনি
বেরোল হাওয়ার দাঁত,—
হুহু করে উঠি, গেল বছরের
র‍্যাপারেতে দিই হাত।
গ্রাম-বাংলার কুটিরে কুটিরে
এলো,যে খুশির ঢেউ,
পিঠে পায়েশের মিষ্টি গন্ধ
তোমরা পাও না কেউ ?
কে এলো, কে এলো পলাশডাঙার
মাসিমার চিঠি হাতে,
চড়ুইভাতির সংবাদ নিয়ে
এই হিমে, কুয়াশাতে !

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

অক্-পাখী : এরা আরব্য-উপন্যাসের বিরাট 'রক্-পাখী' নয়… এ-পাখীর নাম 'অক্-পাখী'— দেখতে অনেকটা পেঙ্গুয়িন্-পাখীর মতো। এরা আকারে ময়না-বুলবুলের মতো… তবে হাঁসের মতো আকারের বড়-বড় অক্-পাখীও আগে দেখা যেতো স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ার সামুদ্রিক-অঞ্চলে, শীতকালে… সে-জাতের বড় অক্ কিন্তু এখন আর মেলে না— এদের বংশ লোপ পেয়েছে। তবে ছোট অক্-পাখী এখনও দেখা যায় শীতের সময় ইংলণ্ডের উপকূলে। এ সব পাখীদের আসল বাসা ইউরোপের হিম-শীতল উত্তরাঞ্চলে। মা-অক্পাখীরা অন্য পাখীদের মতো ডিমের উপর বসে তা দেয় না!





কুমীর-কাছিম : এটি এক বিচিত্র জীব… কুমীর নয়— জাতে কাছিম। কূর্ম্ম হলেও, কুমীরের মতো ল্যাজ আছে এবং ঐ কাঁটাওয়ালা লম্বা ল্যাজের ঝাপটায় অন্য জীবকে রীতিমত কাবু করে দেয়। তবে মুখ আর দেহ কাছিমের… শক্ত খোলার বর্ম্মে ঢাকা এবং আকারে বিরাট — ছোটখাট কুমীরের মতো। জলে বাস করে আর কুমীরের মতোই ডাঙায় উঠে রোদ পোহায়।

প্যাকা : এরা এক ধরণের বিচিত্র নিশাচর জীব… ইঁদুর, বিভর, কাঠবেড়াল, খরগোসের মতো তীক্ষ্ণ-ছেদন-দন্তওয়ালা (Rodent) প্রাণীর জাতভাই। আকারে দু-তিন ফুট লম্বা… গায়ে কাঠবেড়ালের মতো লোম আর গাঢ়-রঙের সেই লোমশ-দেহে থাকে হালকা-রঙের বিচিত্র ছাপ। এদের ল্যাজ ছোট এবং অপুষ্ট, মাথার গড়নও অদ্ভুত ধরণের… মুখের দু'পাশে থলির মতো গাল— তবে সে-থলি খাবার জমিয়ে রেখে রোমন্থন করতে পারে না। এরা নিরামিষভোজী জীব। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার বনে-জঙ্গলে এদের বসবাস। রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করতে এরা রীতিমত পটু।



হার্মোনিয়ম

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমার কয়েকটি সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে ধরেছেন হার্মোনিয়ম যন্ত্রের স্বপক্ষে কিছু লিখতে। শাস্ত্রে বলে, মানুষকে নানা ঋণের মর্যাদা দিতে হয়, যথা দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ ইত্যাদি। যার কাছেই কিছু পাই তার ঋণ সকৃতজ্ঞে স্বীকার না করায় প্রত্যবায় আছে। হার্মোনিয়মের কাছে আমি আজীবন ঋণী। আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে"তে লিখেছি—আমার এক মনস্বী বন্ধু চিকাগোয় আমাকে বলেছিলেন: "একটি মাত্র হার্মোনিয়ম নিয়ে আপনি আমেরিকায় দিগ্বিজয় ক'রে গেলেন কেই বা জানল?" আমি বলেছিলাম হেসে: "আপনি জানান না।" তিনি বলেছিলেন: "হার্মোনিয়ম না থাকলে কী করতেন?" আমি বলেছিলাম: "দিগ্বিজয় না ক'রেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতাম।"

এ হেন বন্ধুকে বীণাপাণির প্রদত্ত সঙ্গত ব'লেই আমি স্বীকার করি সকৃতজ্ঞে। তাই লিখব হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে দু'চারটি কথা—আরো এই জন্যে যে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে বহু সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক আছেন যাঁরা হার্মোনিয়মের অনুরাগী, যাঁদের গান হার্মোনিয়ম সঙ্গতে শুনে বহু শ্রোতা আনন্দ পান। এঁরা হার্মোনিয়মে গাইতে অভ্যস্ত ব'লে হার্মোনিয়ম বিনা গেয়ে আনন্দ পান না—কাউকে আনন্দ পরিবেশন করতেও বেগ পান।

হার্মোনিয়মের বিরুদ্ধে পরিচালকদের একটি প্রধান আপত্তি শুনি এই যে, এতে সূক্ষ্ম শ্রুতি নেই—যেমন বীণা, স্বরোদ, সারেঙ্গি, সেতারে আছে। মানি, কিন্তু বাঁশিতে কি তারের যন্ত্রের সূক্ষ্ম শ্রুতি বাজানো যায়? তবে! রেডিওতে বাঁশি "হরিজন" ব'লে বহিষ্কৃত হ'ল না, ওই হার্মোনিয়মই দোষ করল—যার সুর (ভালো হার্মোনিয়ম হ'লে) বাঁশির চেয়ে মধুর ও সমৃদ্ধ হ'তে পারে—বিশেষ ক'রে হার্মোনিয়মের স্বরগ্রামের range-এর দরুণ।

হার্মোনিয়মের যাঁরা বিরোধী তাঁদের সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই: যে গায়ক নিজে বাজিয়ে গাইতে চান, হার্মোনিয়ম ছাড়া আর কোন্ যন্ত্র তাঁর সহজে কাজে আসতে পারে? এস্রাজ দিলরুবার সুর না কী। সারঙ্গী মধুর, কিন্তু নিজে বাজিয়ে গাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া বাজাতে হয় নখের টিপে—নখ কেটে রক্তপাত হয় দেখতে দেখতে। কয়জন পারেন সইতে? বেহালা অত্যন্ত কঠিন যন্ত্র—সবাই জানে। টুং টুং যন্ত্র যথা সেতার, বীণা, স্বরোদ, গিটার, ম্যাণ্ডোলিনে গানের সঙ্গত ভালো হয় না—স্বরবিহীন যন্ত্রের সঙ্গতে গান জমে না। ওদিকে এস্রাজ, দিলরুবা, সারঙ্গী, বেহালায় কোন্ ওস্তাদ গায়ক নিজের তানকর্তবের সঙ্গত করতে পারেন আজকের দিনে? এক রইল সনাতন তানপুরার সা ও পা-র গুঞ্জন সঙ্গত—কিন্তু শুধু তানপুরা অদ্বৈত সঙ্গত হিসেবে রসাবেশ করতে পারে না। আমি যেখানে গাইছি কোমল-গান্ধার কড়ি-মধ্যম বা কোমল-রেখাব সেখানে তানপুরার ষড়ন পঞ্চমের একঘেয়ে গুঞ্জনের discord বেখাপ্পা লাগে না কি? তানপুরা কণ্ঠ-সাধনার বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যন্ত্রসঙ্গত হিসেবে এ যুগে অচল—বিশেষ হার্মোনিয়মের হ-ভ্যাগমের পরে—কেন না গায়ক সবদেশেই কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গত চান, এতে ক'রে শুধু গান সহজে জমে ব'লেই নয়—কণ্ঠ খানিকটা সাহায্য পায় ব'লেও বটে। যাঁরা শুদ্ধ শ্রুতির অজুহাতে হার্মোনিয়মকে বরখাস্ত করতে চান তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—শতকরা কজন গায়ক আল্লা বন্দে খাঁ, আবদুল করিম, ফৈয়স খাঁ বা নাসিরউদ্দীনের মতন নিখুঁৎ শ্রুতির প্রয়োগে কলাকুশলী? সাধারণত গানে আমরা বারোটি পর্দাই ব্যবহার ক'রে থাকি—স্বরলিপিতে এমন কি ওস্তাদপন্থী ভাতখণ্ডেও বারোটি পর্দাই চালু করেছেন: সা রে গা মা পা ধা নি, কোমল রে গা ধা নি ও কড়ি মধ্যম। ব্যস্। ঠুংরি, গজল, ধ্রুপদেও অতিকোমল পর্দা খুব কমই ব্যবহার হয়। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রেও বলে ("সঙ্গীত রত্নাকর"-এর টীকাকার "সঙ্গীত সময়সার" গ্রন্থ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন):

তে তু দ্বাবিংশতির্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ।
শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্।

অর্থাৎ সপ্তকের অন্তর্গত বাইশটি সূক্ষ্ম শ্রুতি কণ্ঠে গেয়ে দেখানো যেতে পারে না, শুধু বীণায়ই বাজিয়ে দেখানো সম্ভব। এ-কথা যে সত্য তা সঙ্গীতপণ্ডিতরা যদি নাও স্বীকার করেন, সঙ্গীতরসিক ও সাধকেরা স্বীকার করবেনই করবেন—আরো এই জন্যে যে সাড়ে পনর আনা গায়ক-গায়িকা ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরি টপ্পায়ও (অর্থাৎ কি না মার্গ সঙ্গীতেও) বারোটি সুরেই চলাফেরা করে থাকেন। এক-আধটি নাসিরউদ্দীন বা আবদুল করিমের কণ্ঠে আশ্চর্য শ্রুতির বাহার ফুটলেও সে কণ্ঠসাধনা সাড়ে পনর আনা সুগায়কের পক্ষেও অসম্ভব। তা ছাড়া একটা কথা ভুললে চলবে না যে, বারোটি পর্দায় যদি আমাদের কণ্ঠ তথা কান পূর্ণ তৃপ্তি পায়, তাহ'লে সে কেন বাইশটি শ্রুতির সাধনার প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে রাজি হবে? আমাকে এক্ষেত্রে ভুল বোঝা সম্ভব, তাই ফের বলি যে সূক্ষ্ম শ্রুতির মনোহারিত্ব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সে-মনোহারিত্বের সমজদার হওয়াও যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, তারকে কণ্ঠে স্বরিত করাও সাধারণ সুগায়কের পক্ষে তেমনি অসম্ভব। অপিচ, যদি বারোটি পর্দায় গান গেয়ে বা বাজিয়ে আমরা গভীর আনন্দ পাই, তাহ'লে বাইশটি শ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবধানের মর্মজ্ঞ হ'তে উঠে প'ড়ে লাগব আমরা কিসের তাগিদে? যাঁরা বলেন—"সূক্ষ্মতম রস আহরণ করবার তাগিদে," তাঁদের বলব—"বারোটা সুরে যে-রস আহরণ করছি তাতে যদি মন তৃপ্ত হয় তবে tweedle-dum and tweedle-deeর চুলচেরা বিভাগ নিয়ে মেতে উঠবই বা কেন?" ইংরাজিতে বলে the proof of the pudding lies in the eating thereof. অর্থাৎ কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরতে পারে তবে আসল বিড়ালের জায়গায় বাহাল করলে খরচও কমে, কাজও হাসিল হয়।

এ প্রগল্ভ পরিহাস নয়। নানা ওস্তাদ মহলে সূক্ষ্ম শ্রুতির ভাগ নিয়ে গলাবাজি করার দৃষ্টান্ত যিনিই দেখেছেন, তিনিই মানবেন যে এ-তর্কে ষোলো আনা না হোক, সাড়ে পনের আনাই কাণা। অর্থাৎ উচ্চসঙ্গীতের আনন্দ শ্রুতির উপর নির্ভর করে না, করে হৃদয়াবেগ, সুকণ্ঠ, সুরসৃষ্টি প্রতিভা, তানবৈপুণ্য, ছন্দজ্ঞান ইত্যাদি রকমারি সাঙ্গীতিক গুণের উপর। একথা যদি সত্য না হ'ত তাহ'লে হাল আমলে এমন কি আবদুল করিম, ফৈয়াস খাঁ, চন্দন চোবে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত গুণী গায়কও তাঁদের গানের সঙ্গত করাতেন হয় নিজে বাজিয়ে,না হয় কোনো-না-কোনো হার্মোনিয়ম বাদককে দিয়ে? সঙ্গীতজ্ঞরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে গ্রামোফোনে এঁদের গানে হারমোনিয়ম-সঙ্গত হওয়ার দরুণ তাঁদের গানের সুরের জৌলুষ কমে নি বরং বেড়েছে। এরি নাম—the proof of the pudding কে খোঁজা তালুর এক্তাহার।

একথা যদি মঞ্জুর হয় তা হ'লে হার্মোনিয়মের বিপক্ষে শ্রুতিধরদের বিরাগকে নামঞ্জুর না ক'রে উপায় কি?

কিন্তু হার্মোনিয়ম সঙ্গত করতে হ'লে দুটি কথা ভুললে চলবে না। এক: হার্মোনিয়মটি কর্কশ হ'লে চলবে না। দুই: হার্মোনিয়ম বাজাতে জানতে হবে, শিখতে হ'বে। কোনো কোনো গায়কের সঙ্গতকার যে ভাবে সিংহনাদী হার্মোনিয়ম বাজান, তাতে ক'রে কণ্ঠের সুর ঢাকা প'ড়ে যায়—যেমন যায় বেশি জোরে তবলা বাজালে। হার্মোনিয়ম মিষ্ট হ'বে, বাদক মৃদু সুরে বাজাবেন, আর সম্ভব হ'লে গায়ক নিজেই গানের সঙ্গত করবেন। কারণ তাহ'লেই সব চেয়ে ভালো সঙ্গত হয়, বিশেষ সেই সব গানে যাতে তানালাপ বেশি আছে ব'লে বা সম্পূর্ণ নতুন সুরের সৃষ্টি করা হয় ব'লে এমন কি আস্থায়ী অন্তরারও মূল সুরের বদল হয় ক্ষণে ক্ষণে। এরূপ ক্ষেত্রে গায়ক নিজে সহজেই নিজের গানের সুর হার্মোনিয়মে তুলতে পারেন, কিন্তু অন্য কোনো সঙ্গতকারের পক্ষে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি—বিশেষ যদি বেহালায় বা সারঙ্গীতে এসব গানের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফলাতে হয়। একত্রে যথাযথ পদ্ধতিতে অভ্যাস করলে তোলা যায় অবশ্য—যেমন বাইজিদের সঙ্গে সঙ্গতে তোলেন অভ্যস্ত সারঙ্গিয়ারা। কিন্তু কোনো গায়কের পক্ষে আজকের দিনে মাইনে দিয়ে সারঙ্গিয়া রাখা যে সম্ভব নয় একথা বলাই বেশি। তা ছাড়া যে-গায়ককে নানা যায়গায় গাইতে হয় সে কেমন ক'রে নিপুণ সারঙ্গিয়া জোগাড় করবে শুনি? কাজেই এসব ক্ষেত্রে সঙ্গতে শুধু তাই। হয় যা আজকের রেডিওতে শোনা যায় ওস্তাদি গানের সঙ্গতে—অর্থাৎ তানালাপে কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের পদে পদে

অমিল। এবিষয়ে রেডিও কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁরা হন না কারণ তাঁদেরও উর্ধ্বে যাঁরা আসীন তাঁরা হার্মোনিয়মের বিরোধী। হ'লেনই বা তাঁরা সঙ্গীতে অজ্ঞ, তাঁরাই তো সর্বেসর্বা, হর্তাকর্তা বিধাতা—তাই সঙ্গীতের ক খ না জেনেও তাঁরা সঙ্গীত পরিচালনায় নির্দেশ দিলে রেডিওর কর্তৃপক্ষ শিরোধার্য করেন সভয়ে। কিন্তু যে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই নির্দেশ দেবার অধিকারী সেসব বিষয়ে অবিশেষজ্ঞদের বিধান দেওয়া হাস্যকর নয় কি? ধরুন যদি কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীতে সে-দেশের রাষ্ট্রপতি বিধান দেন যে, এই এই ভাবেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হবে, তাহ'লে সে-বিধান যেমন হাস্যকর তার চেয়ে কি আমাদের আজকের রেডিওতে সঙ্গীতানভিজ্ঞ নিয়ন্তাদের বিধান একতিলও কম হাস্যকর? সঙ্গীত সম্বন্ধে বিধান দেবার অধিকারী কেবল সঙ্গীত-সাধক ও বিশেষজ্ঞরা —সঙ্গীতানভিজ্ঞ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নন যাঁদের নাম অফিশিয়াল। আর সঙ্গীত-সাধকেরা ভুক্তভোগী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন যে সাধারণত হার্মোনিয়ম বিনা গান জমানো ভারি কঠিন। একথাও মনে রাখতে হবে যে হার্মোনিয়ম নিজে বাজিয়ে গাইলে গান ঢের সহজেই শ্রুতিমধুর হ'য়ে ওঠে ব'লেই গায়ক সমাজে হার্মোনিয়মের আদর হয়েছে এবং যতদিন না হার্মোনিয়মের বদ্‌লি এমন কোনো সঙ্গীত-যন্ত্র আবিষ্কার করা না যায়, যা নিজে বাজিয়ে গাওয়া যায় ততদিন হার্মোনিয়মের আদর কমবে না—আরো এই জন্যে যে শিক্ষার্থীকে শেখানোর পক্ষেও হার্মোনিয়ম অত্যন্ত উপযোগী।

আর একদল উন্নাসিক ক্রিটিক আছেন যাঁরা বলেন হার্মোনিয়ম বিদেশীযন্ত্র, কাজেই এর ব্যবহারে আমাদের সনাতন সঙ্গীতের জাত যাবে। তাঁদের কথার উত্তরে শুধু একটি প্রশ্ন করি, তাঁরা রেল ষ্টীমার মোটর বিমান বর্জন ক'রে সনাতন গোযানে ভ্রমণ করারই পক্ষপাতী কি না ও সভাসমিতিতে মেয়েরা ব্লাউস-শেমিজ-বিহীনা শুধু সনাতন শাড়ীপরিহিতা হ'য়ে সঞ্চারিণী উল্লসিত হন কি না। আমাদের আজকের জীবনে প্রতি পদেই বৈদেশিক ছোঁয়াচ লাগছে, তাতে আপত্তি নেই—যত আপত্তি কেবল বেচারি অসুর হার্মোনিয়মের বেলা-?

হার্মোনিয়ম ছাড়া গান যে সহজে জমানো যায় না আজকের দিনে প্রায় প্রতি গায়ক-গায়িকাই জানেন। আমি এক সময়ে সত্যিই চেষ্টা করেছিলেম হার্মোনিয়ম সঙ্গত ত্যাগ করতে। ১৯২৭ সালে দ্বিতীয়বার বিলেত যাই শুধু এস্রাজ নিয়ে। কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা হ'ত—গান জমত না সহজে। তাই তৃতীয়বার যখন বিশ্বভ্রমণে গান গেয়ে দেশে দেশে উড়ন্ত হই তখন থিওরির খাতিরে সনাতনপন্থী হবার মূঢ়তা ছেড়ে হার্মোনিয়ম সঙ্গতে সর্বত্র সাঙ্গীতিকদের সাড়া পেয়েছিলাম। তাঁরা বহুক্ষেত্রেই গান শুনে বিহ্বল হয়েছিলেন ও পত্রিকাদিতেও লিখেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের অপরূপ মুগ্ধকরী শক্তির কথা।—আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে" গ্রন্থে সেসব বিবরণ দিয়েছি। হার্মোনিয়ম-বিরাগীদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি সত্যিই বলেন হার্মোনিয়ম না নিয়ে শুধু তানপুরায়ই গান গেয়ে আসা আমার উচিত ছিল? না বলবেন—এই ভাবে না জমিয়ে গান গাইলে আমাদের ভজন কীর্তনের শুদ্ধতর শ্রুতিতে বিদেশীরা মনে প্রাণে সাড়া দিতেন? আমরা আজকের দিনে রেড়িওতে বা অন্যত্র নানা সভায় যে-সব গায়কের গান শুনি তাদের একজনও নাসিরউদ্দীন বা আবদুল করিমের মতন শ্রুতিসিদ্ধ শ্রুতিধর নন। তাঁরা সবাই চলতি বারোটি সুরেরই পসারী। তাঁদের গান শুনে সর্বত্রই লোকে আনন্দ পাচ্ছে—শুধু রেডিও এমনই এক আশ্চর্য শুদ্ধ সনাতনী প্রতিষ্ঠান যে তাতে হার্মোনিয়ম ম্লেচ্ছ স্বরগ্রাম অশুদ্ধশ্রুতি ব'লে বর্জিত না করলে তার মানহানি হয়?

আর একটি কথাও এ সম্পর্কে মনে হয়। হার্মোনিয়মের কয়েকটি অসুবিধা থাকলেও (যথা এতে মিড় তোলা যায় না) বিশুদ্ধ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে যে সঙ্গীত-রসিককে গভীর আনন্দ পরিবেষণ করা যায় এ একটি অনস্বীকার্য সত্য। যাঁরা গয়ার সোনি, লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর নবাবলি, ইন্দোরের দেবীদাস, কলকাতার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষপ্রমুখ শিল্পীর আশ্চর্য হার্মোনিয়ম শুনেছেন তাঁরাই একথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গণপৎ রাও, শ্যামলাল ক্ষেত্রী প্রমুখ বিখ্যাত গুণীরা একসময়ে আমাদের চিত্তহরণ করতেন। আজও সুন্দর হার্মোনিয়ম বাজাতে পারেন এমন শিল্পীর দেখা [illegible]

এঁদের এ-বাজনাও রেডিওতে পরিবেষণ করা অবশ্য-কর্তব্য—ভারতীয় নানা কনসার্ট পার্টিতে পিয়ানো বাজানো হয় তাতে আপত্তি নেই, কেবল হার্মোনিয়মেই ভাগবত অশুদ্ধ? হয়েছে কি আজ অসাঙ্গীতিক হোমরা-চোমরাও সম্প্রদায়-সঙ্গীতের পলিসি-নির্মাতা, তাই তাঁরা জনসাধারণের চাহিদা মানেন না, দুঃখ বোঝেন না। এর নাম আর যাই হোক ডিমক্রাসি নয়।

শেষে বলি পুনরায় আমার বক্তব্যের সারমর্ম সংক্ষেপে :

(১) আজকের দিনে রেডিওতে হার্মোনিয়মের পুনঃ-প্রবর্তন হওয়া উচিত। যাঁরা হার্মোনিয়ম বিনা গাইতে চান তাঁরা শুধু তানপুরা নিয়েই গান না—কে আপত্তি করছে? কিন্তু যাঁরা হার্মোনিয়ম সঙ্গতে গাইতে অভ্যস্ত, তাঁদের বরখাস্ত করলে বহু সঙ্গীতরসিকই তাঁদের গান শুনতে পায় না—যেমন আজ পাচ্ছে না।

(২) প্রতি রেডিও ষ্টুডিয়োতে খুব ভালো folding bellow-র মৃদুস্বনী হার্মোনিয়ম থাকা উচিত—যাতে গায়করা প্রবল সুরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গানের আদ্যশ্রাদ্ধ না করতে পারেন। মৃদুস্বরে হার্মোনিয়ম বাজানোর রীতি সহজেই চালু করা যায়—যেমন গ্রামোফোনে গান গাইবার সময়ে করা হয়।

(৩) হার্মোনিয়মের বাজনা আলাদা একক বাদ্য হিসেবেও রেডিওতে পরিবেষিত হওয়া উচিত, কারণ ভালো বাজাতে জানলে একক হার্মোনিয়ম-বাজনা অতি উপভোগ্য হ'তে পারে ও হ'য়ে থাকে, এ হ'ল একটি অপ্রতিবাদ্য সত্য, কাজেই গায়ের জোরে অস্বীকার করলেও সে নামঞ্জুর হবে না কোনদিনই।

রেডিওর কথা বেশি ক'রে বললাম, কেন না বহু সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেই আমার আলোচনা হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে আমি মূলত একমত যে যেহেতু হার্মোনিয়মের মতন রেডিও-সঙ্গীতও has come to stay সেহেতু এ-দুয়ের মিতালি হওয়া সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। কেবল দুঃখ এই যে রেডিওর কর্তৃপক্ষ একবার যখন ধরেছেন হার্মোনিয়ম বর্জনীয় তখন তাঁদের সে-মতকে নাকচ করতে গেলে গায়কদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা। সমর্সেট মম তাঁর Strictly Personal ব'লে একটি স্মৃতিচারণে লিখেছেন একটি—লাখ কথার এক কথা :

"As we all know, one of the disadvantages of the democratic form of government is that when a man is comfortably encountered in a billet for which he is unfit, it is the devil's own job to get him out of it." তাই মনে হয় আজকের শুদ্ধাচারী রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে ম্লেচ্ছ হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে এ-জাতীয় বাস্তব যুক্তি পেশ করা খানিকটা অরণ্যে রোদনেরই সামিল হবে। তবু লিখলাম, কারণ আমার একাধিক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন এ-সম্পর্কে কিছু লিখতে। হয়ত একদিন কোনো শুভ লগ্নে ব্রাহ্ম মুহূর্তে রেডিওর পলিসি বদল হবে কোনো দুর-বগাহ কারণে। সেদিন সে অনাগতকালের হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ত হরিজন হার্মোনিয়মকে শ্রীগৌরাঙ্গ বা গান্ধিজির মতনই সানন্দে কোল দেবেন—কে বলতে পারে? কালো হ্যয়ং নিরবধি বিচিত্রা চ পৃথ্বী।

কিছুদিন আগে জেনেরল কারিয়াপ্পা বলেছিলেন, সব হারমোনিয়ম পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। অনেকে রবীন্দ্রনাথের হার্মোনিয়ম বিরূপের দৃষ্টান্ত দেন নজির হিসেবে। কারিয়াপ্পার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি যুদ্ধ করেন ভালো কথা, কিন্তু ভারতের শত্রুর আজ অভাব নেই, তাদের ছেড়ে মিত্র হার্মোনিয়মকে কেন নিশানা করা? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তিনি যখন নানা সভায় গান গাইতেন তখন নিজে বাজিয়েই গাইতেন—আমি স্বকর্ণেই শুনেছি সে-অনবদ্য সঙ্গতে তাঁর সুললিত কণ্ঠের মনোহর গান। ডোয়াকিন কোম্পানি আজও তাঁর হার্মোনিয়মের প্রশংসা সার্টিফিকেট হিসেবে পেশ করেন তাঁদের মধুর হার্মোনিয়মের বিজ্ঞাপনে।

পরিশেষে আমি 'ভারতবর্ষ' সম্পাদকের আনুকূল্য প্রার্থনা করছি—হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে তিনি আন্দোলন করুন তাঁর বহু-আদৃত পত্রিকায়। নৈলে কাজ এগুবে না।



বৈদেশিকী

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির শান্তিপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় গুণ; মানুষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পশু বা আদিম উপজাতিদের মতো মারামারি কাটাকাটিতে চির-মগ্ন থেকে Nature red in tooth and claw মন্তব্যের অংশীদার হবে, তা কখনও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র অন্য সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করুক, ভারতের এই শুভেচ্ছার নিন্দা করা অন্যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ শক্তিমানের শান্তিপ্রিয়তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও দুর্বল জাতি শান্তির বাণী উচ্চারণ করলে অবজ্ঞা বোধ করে। উড়তে না পেরে পোষমানা পাখীর আনুগত্যে যেমন কেউ আস্থা রাখে না, তেমনি সামরিক শক্তিহীন কোন জনগোষ্ঠীর মুখে শান্তিবাদ উচ্চারিত হলে ইউরামেরিকা করুণার হাসি হাসে। এই কারণেই ভারতের শান্তিপ্রিয়তার বিশ্বে কোন শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি, আশানুরূপ সাড়া জাগে নি।

তা ছাড়া, পররাষ্ট্রনীতি শান্তিবাদী রাখতে হলে স্বদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন দৃঢ় আর আত্মরক্ষায় সমর্থ থাকা দরকার, বহির্দেশীয় ব্যাপারেও তেমনি নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকা চাই, নিতান্ত জটিল আন্তর্জাতিক অবস্থা বা আত্মরক্ষার জরুরি প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্ত। মোটের ওপর, শক্তিমান্ না হলে শান্তিবাদ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব, আর পরের ব্যাপারে নাক যত কম গলানো যায়, ততই ভালো।

দুর্ভাগ্যবশত, ভারত কোরিয়াযুদ্ধ আর তিব্বত-পরিত্যাগের সমকালে তার বহুঘোষিত নিরপেক্ষতা-নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়; সম্প্রতি কঙ্গোর ব্যাপারে ভারত তার এ যাবৎ কাল অনুসৃত নির্লিপ্ততা-নীতিও পরিত্যাগ করেছে। কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান ভারতীয় পন্থায় কখনও হতে পারে না; এমন অবস্থায় ভারতের সেখানে জড়িয়ে না পড়াই ভালো ছিল। রুশরা আগে কঙ্গোর অখণ্ডতা আর লুমুম্বার সমর্থক থাকলেও ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে তারা কঙ্গো পরিত্যাগ করেছে। ভারতীয়দেরও অগোণে কঙ্গো থেকে সরে আসা উচিত; সেখানে ভারত শুধু যে হাস্যাস্পদ হচ্ছে তাই নয়, ঘৃণা ও লাঞ্ছনাও কুড়োচ্ছে। সারা আফ্রিকায় ভারতীয়রা ক্রমশ আফ্রিকানদের বিষদৃষ্টিতে পড়ছে। এই সেদিনও কেনিয়ায় জনৈক পাণ্ডাধারী আফ্রিকান এক ভারতীয় যুবকের স্ত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে। আমরা যতই আফ্রিকা-প্রেমে গদ্‌গদ হই না কেন, আফ্রো-এশীয় স্থায়ী ঐক্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। কঙ্গোতে ভারতীয় নারীরা নানা ভাবে বিপন্ন ও অপমানিত হচ্ছে। ভারত-সরকার যে—"প্রেষ্টিজ" হারাবার ভয়ে কঙ্গোত্যাগে নারাজ, কঙ্গোয় লিপ্ত হওয়ার নির্বুদ্ধিতায় সেই "প্রেষ্টিজ" একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নবোদিত আফ্রিকীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা এক ব্যাপার, আর তাদের গৃহযুদ্ধে জড়িত হয়ে বিবদমান পক্ষগুলির একটিকে অন্যদের বিরুদ্ধে সমর্থন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এর দ্বারা শান্তিস্থাপন না হয়ে অশান্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হচ্ছে।

আফ্রিকান রাষ্ট্র ও জাতিগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন এখন বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছে; সে-ব্যাপারে ভারতের আর কোন সাহায্যদানের প্রয়োজন নেই। বরং ভারত এখন নিজের ঘর সামলাবার চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে তাকে আফ্রিকা থেকে ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে হবে। সাধারণ আফ্রিকাবাসী ভারতকে প্রেমের চোখে নয়, ঈর্ষা ও সন্দেহের চোখে দেখে। আর একটা কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে রাখা দরকার। আফ্রিকাবাসীরা নেহাৎ ইংলিজানোআরও নয়, আবার গান্ধিবাদী কি বৈষ্ণবও নয়, তারা নিতান্ত বাস্তববাদী; ভগবানের প্রতি অহিংস ভক্তির চেয়ে মাংসভোজনের প্রতি তাদের সমধিক আকর্ষণ। এমন অবস্থায় ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় দীক্ষা গ্রহণের কোন সম্ভাবনা তাদের পক্ষে নেই। ভারতীয় ধরণের ঐক্যবোধও তাদের মধ্যে নেই।

যে কারণে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অফ্ ইউরোপ চার্চিলের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও গড়ে ওঠেনি—১৯২৭ সালে পথে প্রবাসে গ্রন্থে অন্নদাশঙ্করের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও নয় যে, তা আর বড় জোর পঞ্চাশ বছর—ঠিক যে কারণে ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ্ এশিয়া বা শরৎচন্দ্র বসু-প্রস্তাবিত এশীয় ফেডারেশন কিম্বা জাপানের সহসমৃদ্ধি এলাকা গঠন অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেই কারণেই ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ্ আফ্রিকা কখনও হতে পারবে না। তা হওয়া তো দূরের কথা, কঙ্গোও অখণ্ড থাকতে পারবে না। কার্যত এখনই তা কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রশাসনে পরিণত হয়েছে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই ভারতীয়রা "কঙ্গো কঙ্গোবাসীদের (Congo aux Congolais)"—এই ধ্বনির কাছে নতি স্বীকার করে পালিয়ে আসতে পথ পাবে না। অতএব আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসাই ভালো। নেহেরু দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া-ফেডারেশন গঠনের কথা ১৯৪৫-৪৬ সালে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন; তিনি তা করতে তো পারেন নি, উপরন্তু নিজ জন্মভূমি ভারত আর কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন; সুতরাং কঙ্গো ফেডারেশন থাকবে কি কনফেডারেশন হবে, লুমুম্বা ক্ষমতা বজায় রাখবেন কি কাসাভুবু ক্ষমতা পাবেন, সে-ব্যাপারে নাসিকা প্রবেশের প্রয়োজন বা যোগ্যতা, কোনটাই তাঁর নেই। মুষ্টিমেয় নাগা পাহাড়িদের যাঁরা বশ করতে পারেন নি, তাঁরা

আফ্রিকার দুর্ভেদ্যতম জঙ্গলে প্রবেশ করেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায়! রেখালানি পর্তালানি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ভূমিকা শেষে হ্যারোর টোলে-পড়া পণ্ডিতকেও নিতে হল!' তদা নাশংসে বিজয়ায়।

চীন বা আফ্রিকার সঙ্গে বেশি দহরম-মহরমের চেষ্টা না করে পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের সঙ্গে সম্প্রীতি বর্ধনের চেষ্টা করলেই ভারতের পক্ষে ঘরে-বাইরে শান্তি ও মানমর্যাদা রক্ষা করা সহজসাধ্য হবে। কিন্তু ভারত বিশ্বে আজ একই সঙ্গে ভিক্ষুক ও মাতব্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ; যে-গোষ্ঠীর সম্পর্ক এড়িয়ে চলাই তার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ, সে-গোষ্ঠীকে তোয়াজ করে পরক্ষণেই বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে দিতে তার লজ্জা নেই। এর প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র ভারতবাসীকে আগামী তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখনও আফ্রিকার ব্যাপার প্রধান স্থান অধিকার করে আছে; কঙ্গোতে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংগ্রাম যথাপূর্বং চলেছে; মরোক্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে মোরেতানিয়া রাজ্য গত ২৮শে নভেম্বর স্বাধীনতা পেয়েছে। এর আয়তন ৪১৫৯০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬২৪৫০০। অধিবাসীরা আরব ও নিগ্রোর মিশ্রণ; ধর্মে মুসলমান। তুনিসিয়া এ-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী; কিন্তু মরোক্কো এটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তবে, ভৌগোলিক বাধার জন্যে এখনই তা সম্ভবপর নয়। যদি স্পেনীয় সাহারা বা রিও-দে-অরো কোনদিন মরোক্কোর কবলভুক্ত হয়, তাহলে সেদিন মরোক্কোও মোরিটানিয়ার দুই দূর রাষ্ট্রের সম্মিলন হতে পারে।

এখন এটা যেন বোঝা যায় যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ না বাধলেও তার আগেই পশ্চিম ও মধ্য-আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভ করবে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আর পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের অপসারণ এখনও আয়াসসাধ্য। আর ডাচ-ব্রিটিশমিশ্র দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের রূপান্তর সুদূরপরাহত। সম্প্রতি ব্রিটিশ কমনওএল্‌থের এই স্বতন্ত্ররাষ্ট্র প্রজাতন্ত্ররূপে আত্মঘোষণা করেছে ভারত, পাকিস্থান, ঘানা প্রভৃতির মতো।

মার্কিন নির্বাচন আর জাপ-নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, দুই দেশেই রক্ষণশীলতা আর ঘর-সামলাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপানের নির্বাচনে এটা বোঝা যায় যে, জাপানে চীনের প্রভাব কার্যকরী হচ্ছে না; জাপান আগামী যুদ্ধে মার্কিন পক্ষে যোগ দেবেই, এ-কথা এখনও জোর করে বলা যায় না; কিন্তু জাপানি মতিগতি সেদিকেই। কেনেডির বিজয়ে এটা এখন স্পষ্ট যে, মাৎসু আর কেময় দ্বীপে চিআংকে এখন নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষা করতে হবে; মাত্র ঐ দ্বীপগুলির জন্যে আমেরিকা চীনের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে নারাজ। কেনেডি ভারতীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করায় আরো বোঝা যায় যে ভারতে কংগ্রেসি সরকার বজায় রাখতে ইঙ্গমার্কিন শক্তিগোষ্ঠী বদ্ধপরিকর; কংগ্রেসি সরকারও ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজনে এবং আত্মরক্ষায় তাগিদে ঐ শক্তিগোষ্ঠীর বশম্বদ হয়ে পড়তে বাধ্য হবেন।

মার্কিনদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলা ভারতীয়দের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে। কিন্তু মার্কিনি মিত্রতার একটি বিপদ আছে। সে-সম্বন্ধে সতর্ক না থাকলে ভারত-মার্কিন মৈত্রী ধনী-লম্পটের সঙ্গে তার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের অশুভ সম্পর্কে পরিণত হতে পারে। মার্কিনমিত্র সংখ্যার লি, প্রেসিডেন্ট দিএম্ প্রভৃতির অবস্থা ঐ রকমই দাঁড়িয়ে যায়।

দক্ষিণ ভিএত্‌নামে যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়ে গেল, তা থেকে বোঝা যায় যে, দিএম্-সরকারের শাসনে জনসাধারণ সন্তুষ্ট না হলেও বিনা যুদ্ধে বো-চি-মিন কখনও ভিএত্‌নাম গঠন করতে পারবেন না। সাধারণ অভ্যুত্থান দমন করার ক্ষমতা মার্কিনসাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিএত্‌নাম সরকারের আছে।

লাওসে নবগঠিত সরকার কমিউনিস্ট-বিরোধী হলেও মার্কিন-তাঁবেদার নয়। এই সরকার নিতান্ত দক্ষিণ পন্থীদের নিয়ে গড়া; এরা মার্কিনদের পক্ষপাতী না হলেও স্বদেশপ্রেমিক; সুতরাং আপাতত বহিরাগত আক্রমণ ছাড়া লাওস কমিউনিস্ট বা চীনা হাতে যাবার ভয় নেই। শান, কারেন, লাও আর থাইদের নিয়ে চারটি রাষ্ট্র সম্যক্‌ভাবে গঠিত না হলে ব্রহ্ম—শ্যাম, আর শ্যাম—ভিএত্‌নাম সীমান্ত শান্ত হবে না। পরে এ-বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য লোপ পায়; অস্ট্রিয়া রাজ্যের একটি জর্মনভাষী এলাকা "তিরোল" সে-সময় ইতালিকে দান করা হয়; বর্তমানে সেই তিরোলের আড়াই লক্ষ জর্মন অধিবাসী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি চেয়ে তীব্র আন্দোলন করছে। ফ্রান্স যেমন ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি জর্মনিকে "সার" ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ইতালিও তেমনি তিরোল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ইতিমধ্যে মিশ্র বিবাহের বিরুদ্ধে জর্মনদের বিরাগ আরো বেড়ে গেছে; তারা জর্মন-ইতালীয় বিবাহও বরদাস্ত করতে নারাজ। অথচ আমাদের দেশে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নাৎসি রাজ্যে বাসকালে নাৎসি নেতার উদ্যোগে নাৎসি শাসকদের কাছে রাজনৈতিক সুবিধা পাবার প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র বাঙালি হয়েও জর্মন মাদাম শেঙ্কলকে বিবাহ করেছিলেন। জর্মন মহিলাকে বিবাহ করলে হিটলারের রাজত্বে অ-জর্মনের সুবিধার বদলে বিরাগ পাবার সম্ভাবনা ষোল আনার উপর আঠারো আনা। সুতরাং মিশ্র বিবাহের দ্বারা Mein Kamph এ উল্লিখিত "Bastardization'-এর বিরোধী হিটলারের আমলে নেতাজি তাঁর ভূতপূর্ব জর্মন টাইপিস্টকে বিবাহ করতে পারেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ। মিশ্র-বিবাহ মানে অবশ্য অসবর্ণ বিবাহ নয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ।

সূর্য অস্ত যাবার পরও পশ্চিম দিগন্ত যেমন দীর্ঘকাল লোহিত রাগরঞ্জিত ভাস্বর আভায় উদ্ভাসিত থাকে, ১৯৪৫ সালের ১৮ই অগস্ট রাত্রে তাই-পে নগরে তথাকথিত মৃত্যুর পরও তেমনি বিগত দীর্ঘ পনেরো বছর "চন্দ্র বোস"-এর সম্পর্কে বিস্ময়কর রোমাঞ্চময় সংবাদ, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ও বেতারবার্তার গুজবে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া রহস্যগুঞ্জনে মুখরিত। এই গুঞ্জন যে-সব ভারতীয় দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই কর্ণগোচর হয়েছে। এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত অনুসন্ধানের ফল আগামী সংখ্যায় "উত্তর সুভাষচরিত" শিরোনামায় বৈদেশিকী পর্যায়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। মনে হয়, নেতাজি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও মিথ্যা প্রচারের মূলোচ্ছেদ হওয়া প্রয়োজন। গুরুতর আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের লোকদের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সমস্ত অলীক ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া দেশের কল্যাণে বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনোভাব—"মধুরে বহিবে বায়ু, ভেসে যাবো রঙ্গে!" কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। ১৯৬১-৭০ সালের মধ্যে আখের গুছিয়ে নিতে না পারলে ১৯৮০ সালেরপরবর্তী কালে ভৌগোলিক ভারতের অস্তিত্ব থাকলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তার বর্তমানে অকল্পনীয় এমন কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে। ভারতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ জগতের দ্রুতগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগোতে পারলে অবশ্যই ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা তা পারবেন, এমন মনে করার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

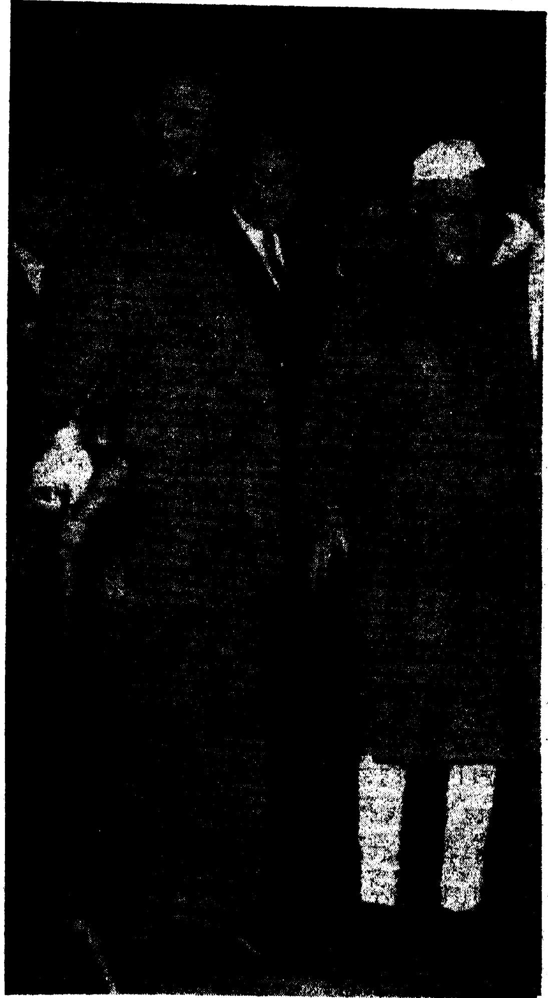
২।১২।৬০

কিউবা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি

চাণক্য

কিউবাকে নিয়ে গত একবছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জল কম ঘোলা হয় নি। মধ্য-আমেরিকার এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এখন দুনিয়ার মাথাব্যথা। অবশ্য পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এটা সবচেয়ে বড়ো; আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চিনি এখানে তৈরি হয়; গুণ ও পরিমাণে তামাক উৎপাদনেও এর স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু আয়তন মাত্র ৪৪,৪০০ বর্গমাইল ও দ্বীপ-বাসীদের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২১ হাজার ১৫৬ জন। কাজেই যাকে উকুনের মতো যেকোন সময় টিপে মারা যায়, তারই দাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর সেরা রাষ্ট্রেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অবশ্য হেতুটা ঠিক কিউবা নয়—উপলক্ষ মাত্র। সে এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘুঁটি। বৃহৎ শক্তি-গোষ্ঠীর দাবার ছক। হাঙ্গারীর পর ঠাণ্ডা-লড়াই-এর মোক্ষম হাতিয়ার।

রাশিয়া যে ঠিক তার শাসকদের হাত করেছে এমন নয়; বরং তার নয়া ভাগ্য-বিধাতারা রুশ সাহায্য ছাড়া নিজেদের অস্তিত্বসংকট বোধ করছেন। তবে অবস্থা এখনও কিছুটা ঘোলাটে হলেও রুশধাঁচে পশ্চিম গোলার্ধের বুকে এঁকে দিয়েছে সমাজতন্ত্রবাদের মার্কস-লেনিনীয় রূপ। আর মাঝে মাঝে রণহুঙ্কার ও সরোষ গর্জনে আকাশ বাতাস করছে ধূমায়িত ও বিষাক্ত। রকেট ক্ষেপণাস্ত্র ও পরমাণবিক অস্ত্রেরসংহার-মূর্তির কথা মাঝে মাঝেই শুনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে কাস্ত্রো রুশ-মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভাবী পরিণামের কথা, আর অন্য দিকে ক্রুশ্চফ মারণ-যন্ত্রের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ভয় ও আতংকের মহামারী চারদিকে। লড়াই বাধার



দুই প্রধান মন্ত্রী—শ্রীনেহেরু ও শ্রীকাস্ত্রো

লক্ষণও কেউ এতে দেখেছেন, কিন্তু আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই এখানে বেশি। এতে আর যাই হ'ক, মার্কিন কূটনীতির পরাজয় ঘটেছে দারুণ। তা'র পররাষ্ট্র দপ্তরের চাল বানচাল হয়েছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বলাই বাহুল্য, এ-প্রসঙ্গে তা'র মান খোয়া গিয়েছে—মুখে চুণকালি পড়েছে, আর সঙ্গে গিয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ।

* * * *

কিউবার বর্তমান পরিস্থিতি একদিনে নিশ্চয়ই ঘটে নি; কোন ঘটনার বহিঃপ্রকাশ মাত্রই দিনরাতের ব্যাপার নয়। বহুদিন-সঞ্চিত একাধিক হেতু—পর্বতপ্রমাণ হয়ে বহ্নিমান হয়। তার পর একদিন ছোটখাট বিষয়কে উপলক্ষ করে ফেটে চৌচির হয়। তা'তে ধনপ্রাণ যায়, উলুখড়রা জাহান্নামের পথে চলে। যা' রাজায় রাজায় বিবাদের যুক্তি-যুক্ত পরিণতি। কাজেই কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধের প্রত্যক্ষ হেতু জানার আগে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের পটভূমি বিষয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক।

* * * *

শ' খানেক বছরের ইতিহাসও নয়—তারো কম সময়। স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে কিউবার আবির্ভাব। অবশ্য তারও আগে দীর্ঘকাল ধরেই এই দ্বীপবাসীরা স্পেনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ১৮৯৫ সালে এই অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। বলা দরকার, আমেরিকার সঙ্গে তিন মাস ধরে স্পেনের যে-যুদ্ধ চলেছিল, তার তিন বছর আগে একটানা এক রক্তক্ষয়ী লড়াই চলেছিল। ১৮৯৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিস-চুক্তি স্বাক্ষরের সময় স্পেন কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের উপর তার দাবিদাওয়া ছেড়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিওনার্ড উডকে গভর্ণর-জেনারেল করে সারা দ্বীপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু সে মাটি আঁকড়ে থাকে নি। এই হেতু ভাবী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখানে সাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয় এবং নির্বাচনের আয়োজন হয়। এর ফলে ১৯০২ সালের ২০শে মে কিউবা-প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন আধিপত্যের শেষ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু কিউবার ঘরোয়া ব্যাপারে জরুরী অবস্থায় হস্তক্ষেপের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে; কিন্তু কচিৎ তা প্রয়োগ করা হলেও সাফল্যের সঙ্গে কখনও তা' পারে নি। অবশ্য ১৯৩৪ সালে এই অধিকারও সে ছেড়ে দেয়। এর পর থেকে শুরু হয় কিউবার অন্ত-নিরপেক্ষ স্বাধীন নীতির অনুসরণ। অন্য দশটা স্বাধীন দেশের মতো নিজের বৈষয়িক নীতিও স্বীয় স্বার্থানুযায়ী নূতন করে গড়বার প্রস্তুতি চলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজ দেশে উৎপন্ন চিনি রপ্তানীর ব্যাপারে শুল্ক-সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা করে নেয়। এর ফলে মার্কিন বাজারে বিপুল পরিমাণ কিউবার চিনি আমদানী হতে থাকে। কিউবার রপ্তানী-যোগ্য একমাত্র অর্থকরী ফসল আখ ও চিনির আয় আমেরিকার আনুকূল্যে মোটা অঙ্কে পৌছে। কিউবার জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ফেঁপে উঠ্‌তে থাকে। কাজেই কিউবার বৈষয়িক জীবনের উঠ্‌তি-পড়তি মার্কিন বাজারের চাহিদার সঙ্গে উঠানামা করতে থাকে; তার জীবন রস আহরণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় আমেরিকা। অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থানে এরূপ অবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কালক্রমে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ব্যবসা বাণিজ্যিক সম্পর্কহেতু মার্কিন শিল্প ও পুঁজিপতিরা কিউবার নানা শিল্পে বিপুল অর্থ-বিনিয়োগ করেন। এতে কিউবার বৈষয়িক বিবর্তন হয় দ্রুততর। একেই কেউ কেউ বলে থাকেন মার্কিন 'ডলার কূটনীতি' বা 'ডলার সাম্রাজ্য'। এতে সত্য কিছুটা হয়ত আছে; যেহেতু অনিবার্যভাবেই কিউবার প্রশাসন ও জীবনযাপনে ধন-পতিদের প্রভাব পড়া বিচিত্র ছিল না।

চ * * *

আগেই বলা হয়েছে, কিউবা মূলত কৃষিভিত্তিক এ কৃষিপণ্য, প্রধানত আখ ও তামাকের আয়ের উপর কমবেশি নির্ভরশীল। বিদেশের বাজারের আয় যার প্রাচুর্যের উৎস, সেখানে টান পড়লেই সমূহ বিপদ; সমগ্র জীবনযাত্রার পরতে-পরতে তার ঘুণ ধরে ক্ষয়ে যায়। ১৯২৭ সালে এমনি এক বিপর্যয় ঘটেছিল কিউবায়। তখন বিদেশে নানাদেশে কৃষি পণ্যের দরে দারুণ মন্দা দেখা দেয়; হু হু করে দাম কমে যায়। সংরক্ষিত মার্কিন বাজারেও তার প্রতিক্রিয়া হয় প্রবল। কিউবার চাষীর মাথায় হাত পড়ে, কারখানা মালিক শর্ষে ফুল দেখে, গেরস্থ হা-হুতাশ করে

ও অন্নপ্রত্যাশী চাকরিয়ার দল মরিয়া হয়ে উঠে। এর সামগ্রিক ও আশু প্রভাব তখনকার সরকারের ওপরও পড়ে। কিউবার শাসনদণ্ডধারী সে সময়ে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট জেরার্দো মাচাদোর নেতৃত্বে চালিত গবর্ণমেণ্ট। কালটা ১৯৩৩ সাল। অশান্তির শিখা যখন ঐ বছরে গ্রীষ্মে লেলিহান হয়ে প্রশাসকদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়, তখন মাচাদো দেশত্যাগী হলেন। হাভানায় তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করলেন ডঃ গ্রাউ সান মার্টিন।

মার্টিন-সরকারের অধিকাংশ সদস্যই ছিল ছাত্র। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন ফুলজেনসিও বাতিস্তা। তিনি ছিলেন কিউবার সেনাবিভাগের একজন সার্জেণ্ট। সশস্ত্র বাহিনীর নেতা হিসাবে ক্যাম্প কলম্বিয়ায় তিনি যাবতীয় অফিসারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেন। দেশের কোন কোন এলাকায় গণ-অভ্যুত্থানও ঘটে। এর চরম পরিণতি ঘটে বাতিস্তার পূর্ণ ক্ষমতালাভে। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবার পর ১৯৩৪ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যকাল অন্তে সান মার্টিন নির্বাচিত হন প্রেসিডেণ্ট; তারপর ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেণ্ট হলেন পাইও সোকারাস। মধ্যবর্তীকালে বাতিস্তা শুধু কাল গুণছিলেন।' ৫২ সালের জুনে তিনি ফের প্রেসিডেণ্ট পদ-প্রার্থী হলেন। কিন্তু দেখা গেল, জনমত তাঁর বিপক্ষে। কাজেই কালক্ষেপ না করে তিনি সেনাদলের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন, প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলেন; অর্থাৎ কার্যত হলেন সামরিক একনায়ক।

* * * *

মার্টিন ও সোকারাসের আমলে সরকারী টাকা চুরি ও অপচয় হয়েছে অঢেল। বাতিস্তার রেকর্ড তাঁদের সমান নয়, তবে তাঁর বান্ধব ও সহযোগীরা দুহাতে লুটেছিল। আর তখনকার বৈষয়িক অবস্থা ছিল এর অনুকূল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়—আর তার পরবর্তী ১৯৫৭ সাল অবধি চিনির বাজার চড়া, অঢেল অর্থের গড়াগড়ি, কিউবার সৈন্যরা যে মাইনে পেত, তা' পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, (Highest paid army in the world), ৪৯-৫৯ সালের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরী দ্বিগুণ; তবে এর প্রকৃত মূল্য মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ। এ সত্ত্বেও আখের বাগানে ও চিনি-কলে চাকরি সাময়িক, মরশুমী; কাজেই গোড়া কাঁচা। একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে অত্যন্ত দারিদ্র্য, ২৫ শতাংশ মজুর বেকার। গুটিকয়েক উচ্চশ্রেণীর লোকের হাতে টাকা পয়সা মজুত; তারা দরিদ্র-সাধারণের প্রতি উদাসীন। অবশ্য সমাজ সংস্কার মূলক আইন হয়েছিল। কিন্তু আইন পুঁথিগত মাত্র; কাজে লাগতো না কিছু। বরং একনায়কী শাসনে অস্বস্তি ও উদ্বেগ, অশান্তি। নিরুপদ্রব পরিবেশে সুস্থ মনে সাধারণের উন্নতির রাস্তা বন্ধ। কাজেই ধূমায়িত অসন্তোষ। এমন ধারা অবস্থায় ফিডেল কাস্ত্রো ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই প্রথম বিফল অভ্যুত্থানের নায়কত্ব করেন। ছোটখাট একটা দলের নেতারূপে বিপ্লব আন্দোলনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সেনা এতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বন্দী হয়। পরে অবশ্য এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর মেক্সিকোতে আর একটা সৈন্যবাহিনী তিনি গড়ে তোলেন এবং অজস্র অনেক লোককে কিউবার সিয়েরা মায়েস্ত্রায় নিয়ে আসেন—উদ্দেশ্য: গেরিলা লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

এ সময় কাস্ত্রোর রাজনীতিক কর্মসূচী অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, তবে বাতিস্তার একনায়কত্ব ও জবরদস্তির বিরোধিতা তাঁ'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য; পরোক্ষ লক্ষ্য ছিল: (৫৩ সালের অভ্যুত্থান থেকে) বেকারি ও কৃষি মজুরদের জন্য সামাজিক ন্যায়-প্রতিষ্ঠা, ধনবণ্টনের বৈষম্য বিলোপ, জমি বিলি, ভাড়া কমানো, শিল্পায়ন, পণ্যোৎপাদন বাড়ান, আর উৎকৃষ্টতর বণ্টনব্যবস্থা। এ সময়ে কিন্তু মার্কিন-বিরোধী কোন ইঙ্গিতই আকারে-প্রকারে প্রকাশ পায়নি তাঁ'র।

'৫৮ সালে অবস্থা ক্রমশ জটিল ও ঘোরালো হয়ে উঠে। প্রথমত, বাতিস্তার লোকপ্রিয়তা হ্রাস। কিউবার গরিষ্ঠাংশ তাঁর বিরোধী। দ্বিতীয়ত, ল্যাতিন আমেরিকার সমগ্র ক্যারিবিয়ান এলাকায় বাতিস্তা-বিরোধী বিপ্লবী দলের প্রতি ডেমোক্রাট নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন। ভেনিজুয়েলা, মধ্য-আমেরিকা আর মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নানা মহলের সাহায্য পেতে থাকেন কাস্ত্রো। তাঁর কাছে অর্থ ও অস্ত্র-সম্ভার চালান রোধ করার কিঞ্চিৎ চেষ্টা মার্কিন সরকার করেছিলেন; কিন্তু সুবিধা হয়নি। বতিস্তা-সরকার আমেরিকার কাছে কড়া প্রতিবাদ জানালো। বললো: কাস্ত্রোকে সাহায্য করে মিত্র-দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে

মার্কিন হস্তক্ষেপ চলেছে। কিন্তু কাস্ত্রো-সমর্থকরা উল্টো ধুয়ো তুললেন—কাস্ত্রোর সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে গণতন্ত্র-বিরোধী একনায়কবাদকেই মার্কিন সরকার সাহায্য করছে। আবার বাতিস্তাকে অস্ত্র-সরবরাহের অভিযোগও জোর গলায় করতে কশুর হলো না। অবশ্য এতে সত্য কিছু ছিল। তখনকার কিউবার সঙ্গে আমেরিকার যে সামরিক চুক্তি ছিল, তাতে করে ওয়াশিংটন বাতিস্তাকে কিছুটা পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ খয়রাত করতে বাধ্য এবং এ সরবরাহ আগেও করা হয়েছে। এ-অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের ডামাডোলে অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকাও কিছুটা হতভম্ব। এমনকি জনমতের চাপে দু-তরফা ব্যবস্থা তাকে করতে হয়, যেমন, বাতিস্তা সরকারকে কোনরূপ সাহায্য না দিতে চেষ্টা করা, আর সিয়েরা মায়েস্তায় বিদ্রোহীদের কাছে মার্কিন সমরোপকরণ ও টাকাকড়ি সরবরাহের স্রোত রোধ করা।

* * * *

কিউবার কম্যুনিস্টদের ভূমিকা এখানে বেশ মজার। যতোদিন বাতিস্তার সুদিন ছিল, ততোদিন সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ কম্যুনিষ্ট-চাঁইরা তাঁর প্রশাসন সমর্থন করেছিল। কিন্তু অবস্থার হেরফেরে তাদের মতিও বদলায়, অর্থাৎ বাতিস্তা-রোধী কাস্ত্রো-অভ্যুত্থানকারীদিগকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। '৫৮ সালের মাঝামাঝি তারা ভোল বদল করে, ফিডেল কাস্ত্রোকে সহায়তা করতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়। তা'র সংগঠনকে (বিশেষ করে হাভানায়) জোরদার করে ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকে।

কিন্তু এসত্বেও কাস্ত্রোর ভাগ্যে নিরঙ্কুশ সাফল্য লেখা ছিলনা। তাঁর ভরসা খুব বেশি ছিল সেনাদলের উপর। এদের সহায়তায় তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু তারাই আবার '৫৮ সালের শেষ নাগাদ বিগড়ে গেল। কিউবার সেনাদলের কেউ কেউ মত পাল্টালো, কেউ বা গেল বিরোধী পক্ষে; অফিসাররা চক্রান্তে লিপ্ত হলো। কাজেই বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটাতে দেরি কিছু হয়; তবে তা' শুধু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।

এসময়ই নবোদ্যমে বিদ্রোহের সূচনা। ত্রিমুখী অভিযান চলে হাভানার দিকে। কাস্ত্রো ও তাঁর ভাই রাউল ছিলেন ওরিয়েন্ট প্রদেশে। তাঁর সমর্থক অন্য কয়েকটি দলও রাজধানী-মুখো হয়। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। কাজেই '৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী বাতিস্তা প্রাণ নিয়ে পালান। সঙ্গে সঙ্গে এক আত্মগোপনকারী যুবদল আত্মপ্রকাশ করে, শাসনরজ্জু ধারণ করে লুঠতরাজ বন্ধ করে; থানা ও প্রাসাদ দখল করে। ২রা জানুয়ারীতে ('৫৯) 'চে' গুভারা অভ্যুত্থানকারী সেনাদলের নেতারূপে কিউবানাস দুর্গের ভার নেন। এতদিন কাস্ত্রো-বিরোধী কর্ণেল রামন বারকুইন বন্দী ছিলেন। ছাড়া পেয়ে তিনি সাময়িকভাবে কিউবা সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষরূপে কাস্ত্রোকে অবিলম্বে হাভানায় আসতে আহ্বান জানালেন। এটাই হলো কাস্ত্রোর জীবনের শুভলগ্ন।

* * *

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারী। সান্টিয়াগোতে কাস্ত্রো অস্থায়ী প্রেসিডেন্টরূপে প্রাক্তন বিচারপতি ম্যানুয়েল উরুতিয়া লিও-এর নেতৃত্বে সরকার গঠনের খবর ঘোষণা করেন। এদিকে উরুতিয়া পাল্টা করলেন কাস্ত্রোকে কিউবার সশস্ত্র বাহিনীর অধ্যক্ষ। আর নিম্নরূপ একদফা রাজনীতিক কার্যসূচী ঘোষণা করেন, যথা (ক) সংবিধানগত অধিকার রক্ষা করা হবে, (খ) সংবাদপত্র ও বেতার ব্যবহারের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে, (গ) নির্দিষ্ট সময়ে আথ কাটা হবে আর (ঘ) নয়া সরকার আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা মান্য করবে। স্বভাবতই এ জাতীয় ঘোষণায় সকলেরই মনোহরণ করে থাকে—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যাঁরা পক্ষপাতী, তাঁদের তো বটেই। কাজেই ৮ই জানুয়ারী সদলে কাস্ত্রো যখন রাজধানী হাভানার দিকে অভিযান সুরু করে, তখন গণতান্ত্রিক সাধারণ মানুষ ও লাতিন আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেলো। তারা ভাবলো: এটা অনিবার্যভাবেই গণতান্ত্রিক শক্তির জয়যাত্রা। এ যেন পশ্চিম গোলার্ধের স্বভাবগত ধর্ম। ১৯৪৫ সালে ব্রেজিলে একনায়কত্ববাদী শাসন-ব্যবস্থা পতনের সঙ্গে এর অগ্রগতি শুরু; মধ্য পথে আর্জেন্টিনার পেরন, ভেনেজুয়েলার পেরেজ জিমেনেজ ও কলম্বিয়ার রোজাস পিনিলার পতন; আর সাম্প্রতিক পর্বে বাতিস্তার অন্তর্ধান ও কাস্ত্রোর অভ্যুদয়। তাই কাস্ত্রোকে সানন্দ-অভিনন্দন জানিয়েই নয়, সক্রিয় সাহায্য করেন


দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডল' বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও কোমল, আরও সুন্দর, আরও লাবণ্যময়ী হয়···! সুবাস ভরা রেক্সোনার পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
Rexona
BLENDED WITH CADYL

কোস্টারিকার প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট রোমুলো বেতানকোর্ট। কিন্তু আশা ভঙ্গ হ'তে খুব বেশি দিন যায় নি এঁদের। মাসখানেকের ভেতরই দেখা গেলো, কাস্ত্রোর দলের লোকজন তীব্র মার্কিন-বিরোধী, আর উত্তরোত্তর এ মনোভাব তাদের বাড়তির দিকে। ফিডেল কাস্ত্রো ভেনেজুয়েলায় যখন গেলেন, তখন তাঁকে সে কী সমাদর! কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি হঠকারীর মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তীব্র ভাষায় গালমন্দ করলেন, আর পর্তুরিকোকে 'মুক্ত' করার সঙ্কল্প ঘোষণা করে বসেন। একদল কিউবাবাসী তো পানামায় নেমে পড়ার চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বামপন্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখালো। এ সবই পূর্বপরিকল্পিত নিশ্চয়।

* * *

দ্বিতীয় পর্বের শুরু মার্চে। কস্টারিকার প্রেসিডেণ্ট ফিগুরেস এলেন কিউবা সফরে। সেখানে এক জনসভায় তাঁর উপস্থিতিতে কাস্ত্রো আমেরিকাকে উদ্দেশ করে যে বচন প্রয়োগ করেন, তা' ফিগুরেসের কাছে শ্রুতিকটু ঠেকে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে যেই জবাব দিলেন, আর যায় কোথা। কাস্ত্রো তাঁকে নিয়ে পড়লেন; আর তাঁকেই শুধু নয়, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেণ্ট রোমুলো—যাঁরা তাঁর দুর্দিনের হিতকারী মিত্র—তাঁকেও রেহাই দিলেন না কাস্ত্রো।

তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার ফল ফলতেও দেরি হয় নি অবশ্য। এটা শত্রু-মিত্র চেনার পালা; মুখোস খোলার অধ্যায়। এতদিন যাঁরা ফিডেলকে গণতন্ত্রী বলে ভুল বুঝেছিলেন, তাঁরা হতাশ হলেন। সিয়েরা মায়েস্ত্রায় ফিডেলের সহযোগীরা হলেন দণ্ড ও দেশত্যাগী (মধ্য আমেরিকা)। পক্ষান্তরে লাতিন আমেরিকার সর্বত্র কম্যুনিষ্ট-সমর্থক, প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা একযোগে প্রায় একই সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট ও তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গারে ব্রতী হয়। তাদের অভিযোগ: এরা সব 'মার্কিন দালাল' (stooge)। অর্থাৎ খোদ আমেরিকায় সজ্ঘবদ্ধ কম্যুনিষ্ট প্রচার-অভিযান ও অন্তর্ঘাতী কাজের আকস্মিকতায় কেউ কেউ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে যায়। কাস্ত্রোর ক্ষমতা দখলের কোন কোন সহযোগা এপ্রিলে ('৫৯) অবস্থা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে কিউবার কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করাই কাস্ত্রোর নীতি। কিন্তু কাস্ত্রো তখন এ-কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

* * *

আমেরিকাও প্রথম দিকে অবস্থা সঠিক বুঝতে পারে নি; কাস্ত্রো '৫৯ সালের বসন্তকালে আমেরিকা সফরে আসেন। কিন্তু ওয়াশিংটনে তাঁর বক্তব্য কূটনীতিক চাল ও চলনে ঢাকা পড়লেও কিউবায় তাঁর সরকারী কার্যকলাপে বিপরীত আচরণ প্রকাশ পায়। ৩রা জুন ('৫৯) কিউবার কৃষি সংস্কার বিল পাশ হলো। কিন্তু তার বিভিন্ন ধারায় সেখানকার মার্কিন ভূস্বামীরা হলেন শঙ্কিত। ও নিয়ে উভয় সরকারে ভেতর কূটনৈতিক পর্যায়ে লেখালেখি চলে। তবে এতে সৌজন্যের অভাব কোন পক্ষের হয় নি। কিন্তু কাস্ত্রোর মার্কিন-বিরোধী জেহাদে অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায়। এদিকে ক্যারিবিয়ান উপকূল বরাবর এলাকায় সুবিন্যস্ত সোবিয়েৎ প্রচারণার জাল বোনা চলে। এখান থেকেই শুরু রুশ পদ্ধতিতে কার্যক্রম। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ফিডেল কাস্ত্রো নিজে কম্যুনিষ্ট দলের সভ্য নন, তাঁর গভর্ণমেণ্টেও অ-কম্যুনিষ্ট সদস্য আছেন। আর যে সব বৈষয়িক বা সামাজিক ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলো আমূল সংস্কারমুলক পর্যন্ত নয়—বৈপ্লবিক তো নয়ই। তবে একথাও ঠিক, নীতি উদ্ভাবন তখনও চলছিল। ঘরোয়া ও বৈদেশিক ঘ্যাপারে স্পষ্ট চেহারা তখনও ধরা পড়ে নি। তবে '৫৯ সালের মার্চে কাস্ত্রোর জনকয়েক সুযোগ্য সহযোগী বুঝতে পারেন যে স্বেচ্ছায় কিউবা কম্যুনিস্ট-যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুরূপে তাকে খাড়া করা হচ্ছে। যা হ'ক, ভোল বদলাতে খুব দেরি করেন নি কাস্ত্রো। যেহেতু, বছর না ঘুরতেই কিউবার ব্যাপারে রাশিয়ার নাসাগলানোর কাহিনী হালের ব্যাপার। সহকারী রুশ প্রধানমন্ত্রী মিকোয়ান সরকারী অতিথিরূপে কিউবা ঘুরে যান; খানাপিনা করেন, রুশ সহায়তার প্রতিশ্রুতিও জোর গলায় দিয়ে যান। আর মে মাসেই ('৬০) হঠাৎ রুশ-মহানায়ক ক্রুশ্চফ ঘোষণা করে বসলেন: মার্কিন আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি থেকে কিউবাকে রাশিয়া রক্ষা করবে। এর পর থেকে সব ব্যাপারই খোলাখুলি; আর ঢাক গুড়গুড় নেই। উভয় দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল ও প্রতিনিধি

বিনিময় চলেছে। জুলাই মাসে কাস্ত্রোর ভাই রাউল (কাস্ত্রো) চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলেন সমরোপকরণ কিনবার ব্যবস্থা করতে, আর রাশিয়ায় 'সম্মান' কুড়ুতে। আর এদিকে লাতিন আমেরিকার সর্বত্র কিউবার দূতাবাসগুলো মার্কিন-বিরোধী যাবতীয় কাজে লিপ্ত হয়, চক্রান্ত-কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিউবার চররাও নানাস্থানে শত্রুতামূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। আর সবার উপর টেক্কা দিয়ে ক্রুশ্চক সরবে জানান: আমেরিকার 'মনরো নীতি'র স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ওর পূতিগন্ধময় শবকে গোর দেওয়া দরকার! এ যেন পায়ে পা দিয়ে, গায়ে পড়ে বিবাদ বাধানো।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে মধুর সম্পর্ক এখন শত্রুতায় পর্যবসিত। কিউবা যেন নষ্টামি করবে বলেই বদ্ধপরিকর। অবশ্য একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, কিউবার দ্রুত ভূমি ও কৃষি সংস্কার অত্যাবশ্যক। সেখানকার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তার দরুণ সাধারণ কৃষক ও গেরস্থ জীবনে অস্থিরতা চিরস্থায়ী। আবার বাতিস্তাও তাঁর পূর্ববর্তী একনায়কী প্রশাসন ও শোষণে এবং শাসকগোষ্ঠীর সহযোগা উচ্চশ্রেণীর চক্রান্তে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল সকলে। কাজেই প্রশাসনিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। যাঁকে সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে সক্ষম বলে মনে হয়েছে, অথবা যিনি সাধারণের অভাব-অভিযোগ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অন্যান্য দেশের লোকের মতে কিউবা-বাসীরাও সেই ভাবেই ফিডেল কাস্ত্রোকে ক্ষমতার আসনে বসতে সাহায্য করে। কিন্তু তিনি ক্রমশ যে ভাবে কম্যুনিস্টপন্থী হয়ে পড়েছেন, কিউবাবাসীদের ধারণাতীত। তবে তাঁর তরফের কথা এই যে, মিশরের প্রেসিডেণ্ট আবদুল জামাল নাসের যেমন উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী, তেমনি তিনিও। নাসেরও জাতীয় প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, (সম্প্রতি বেলজিয়ম ব্যাঙ্ক ও অপর ক'টি সংস্থা করেছেন) তেমনি তিনি করেছেন কিউবার ৩৮২টি মার্কিন কোম্পানি, আড়াই হাজার মার্কিন বাড়ী ও একশত কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। এর ভেতর জীবনবীমা কোম্পানি ৩০, রাসায়নিক সংস্থা ১৭টি ও রেল কোম্পানি ২টি। (২৬শে অক্টোবর, '৬০)। অর্থাৎ তাঁর ভাষায় কিউবায় মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদ। কিন্তু নাসের জাতীয় প্রয়োজন আর সংযুক্ত-আরবপ্রজাতন্ত্রের পুনর্গঠন ও বিন্যাসের খাতিরে নিজেকে রাষ্ট্র-জোটের আওতার বাইরে রেখেছেন; তৃতীয় শক্তিরূপে এশীয়-আরব গোষ্ঠীর অন্যতম নায়করূপে হয়েছেন আবির্ভূত। পক্ষান্তরে ফিডেল কাস্ত্রোর ভূমিকা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নয়, বরং পশ্চিম গোলার্ধে তিনি কম্যুনিষ্ট শিবিরের অগ্রনায়ক। কিউবা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পুরোঘাটি। তাই ম্যালনোভস্কিদের এত হুহুঙ্কার। অর্থাৎ কিউবার বৈষয়িক ও কূটনৈতিক গাঁটছড়া এখন রাশিয়ার সঙ্গে বাঁধা। গত দু' বছরের তা'র প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি এখন প্রকট। নইলে কিউবার মতো একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ—যার ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈষয়িক স্বার্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কযুক্ত থাকতে ঐতিহাসিক কারণেই বাধ্য, সে কি না নিকট-প্রতিবেশী যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত টেক্কা দিতে চায়, তার নাগরিকদের বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, শিল্পসম্পদ দখল করে, আর প্রকাশ্যে রাশিয়া ও চীনের মিত্রতা কামনা করে। শুধু তাই নয়, রণহুঙ্কার দেয়—রুশ রকেটের ভয় দেখায়। আবার রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে কূটনৈতিক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'আক্রমণকারী'রূপে চিহ্নিত ক'রে অপদস্থ ও বিশ্ববাসীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। এ কী করে সম্ভব? আমেরিকার দোরগোড়ায় এমন একটা বিন্দুসদৃশ কৃষিপ্রধান দেশের এমন স্পর্ধা হয় কী করে? শক্তিমদগর্বী সোবিয়েৎ রাশিয়া পর্যন্ত অধিকাংশ বিষয়ে যার সমকক্ষ (এক মহাকাশ বিজ্ঞান ছাড়া) এখনও নয় বলে নিজেকে মনে করে, সেই অমিত শক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিনা তোয়াক্কা করে না কিউবা! উপরন্তু ভ্রূকুটিও দেখায় চোরাগোপ্তা কিল মারবার হুমকিও দিচ্ছে।

* * * *

শুধু পশ্চিম গোলার্ধ কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর যাবতীয় গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নায়ক। ইউরোপের সমস্ত প্রথম-শ্রেণীর রাষ্ট্র তার দেনদার, মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী রাশিরাশি ডলার ঢেলে বিধ্বস্তপ্রায়

য়ুরোপের পুনর্গঠনে সহায় হয়েছে। তার নজর বেশি য়ুরোপের দিকে—তারপর এশিয়া ও হালে আফ্রিকার দিকে। এশিয়ায় কম্যুনিজম রোধে সর্তযুক্ত সাহায্য, আর আফ্রিকায় এখন কঙ্গোকে কেন্দ্র করে কূটনীতির দাবা খেলা। এতে প্রথম চক্করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জয় আর রাশিয়ার পরাজয়। কিন্তু তার হার হয়েছে কিউবায়—তারই উপেক্ষিত অশ্রুত-প্রায় প্রতিবেশীর কাছে। এ দোষ তার নিজের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির। অর্থাৎ যেটুকু নজর দক্ষিণ আমেরিকার দিকে দেবার দরকার তার পক্ষে ছিল, সেটুকু সে দেয় নি এতকাল। গত ১৫ বছর তার দৃষ্টি য়ুরোপ-এশিয়ায় বেশি নিবদ্ধ। এখানে যদি বা বৈষয়িক সাহায্য করা হয়েছে, তবু তার পরিমাণ য়ুরোপের তুলনায় নগণ্য, আর দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি মূলত কৃষি-প্রধান, মধ্যযুগীয় রীতিনীতি সংস্কারের প্রাধান্য বেশি; শিল্পায়ন এখনও তাদের কাছে বহুদূরাগত স্বপ্ন। পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সদ্ভাব কম, রেষারেষি ও হানাহানি বেশি। সাধারণের দারিদ্র্য আমাদের দেশের মতো, আর একজাতের উচ্চশ্রেণীর মানুষ সমাজের মাথায় বসে নিঃশেষে শোষণ চালিয়ে স্ফীতোদর। কাজেই দৈন্য আর প্রাচুর্যের পাশাপাশি বাস। মার্কিন নাগরিক বা ব্যাঙ্ক এসব দেশে কিছুটা ডলার ঢেলেছেন কাঁচামালের বাণিজ্যে, আর কিছুটা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে। তাঁরা স্বভাবতই হাত মিলিয়েছেন স্বার্থবাহ এসব দেশের উচ্চশ্রেণীর বিত্তবানদের সঙ্গে। কাজেই সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। বিত্তবানরা ফুলে ফেঁপে ফানুস। এহেন অবস্থায় চির-অসন্তোষের রাজত্ব, বিপ্লবের বীজ এখানেই নিহিত। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদের কাছে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদে'র প্রতীক। কিউবার ব্যাপার এ-সত্য ঘটনারই উলঙ্গ প্রকাশমাত্র।

* * * *

এটা চিত্রের একদিক; ভিন্ন দিকও আছে। আগে বলা হয়েছে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি দরিদ্র, কিন্তু কাঁচামাল ও পণ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রশাসকরা সাধারণত চক্রান্তকারী, অসাধু, শোষক। তাই মাঝে মাঝেই এখানে জন-অভ্যুত্থান ঘটে থাকে—অনেকটা সাময়িক ও সংক্রামক ব্যাধির মতো। মরশুমী ফসলের মতো একনায়কবাদী শাসকের উত্থান ও পতন হামেশাই হয়। এক ব্রাজিল বাদে, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, পেরু, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি বা আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও হণ্ডুরাস বা কিউবা—সবখানেই একনায়ক শাসনের ছোবল রয়েছে। তবে বৈষয়িক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হর্ন অন্তরীপ থেকে মধ্য আমেরিকা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির বিস্তার শুরু ১৯৪৫ সাল থেকে। এসব দেশের সামগ্রিক লোক-সংখ্যা ১৮ কোটি বা ততোধিক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদপ্তরের কাছে এই বিপুল জনসংখ্যার ভালমন্দ এমন কোন মৌল সমস্যাই নয়—গতানুগতিক মামুলি কূট-নৈতিক সম্পর্কের অদল-বদল মাত্র। এটা প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে তার ঔদাসীন্যের পরিচায়ক।

* * * *

এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র য়ুরোপে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল। 'মনরো-নীতি' (১৮১৩-১৪) অনুযায়ী সে চলতো। পশ্চিম গোলার্ধের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত যেমন করতো না, নিজেও অনধিকার চর্চা করতো না য়ুরোপের ব্যাপারে। অবশ্য এটা নিজের স্বার্থেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রায় একশ বছর পর সে এসেছিলো মিত্রশক্তির সহায়তায়। কিন্তু যুদ্ধান্তে প্রথম রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম জনক হয়েও সে নেপথ্যে সরে গিয়েছিলো। এটা তা'র অন্যের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা না করার নীতির (doctrine of non-intervention) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উভয় আমেরিকার ব্যাপারেই তা'র এ-নীতির প্রয়োগে বাড়াবাড়ি দেখা যায়। ১৯৩২ সালের আগে যুক্তরাষ্ট্র কোন কোন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্যে নৌসেনা নিয়োগ করেছে, করেছে বৈষয়িক বেড়াজাল রচনা। কিন্তু লাতিন আমেরিকায় এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এ হেতু ১৯৩৪ সালে কিউবায় সঙ্গত কারণ সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেনি। এ নীতিরই চূড়ান্ত রূপায়ণ ঘটে ১৯৪৮ সালের বোগোটা সম্মেলনে। এ-বৈঠকে মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক নীতি স্থির হয়। তাতে অন্যান্য বিষয়ের ভেতর বলা হয় যে পশ্চিম গোলার্ধের প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ মেলামেশার, মত প্রকাশ আর ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতা আছে। এ-নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগে

আতিশয্য ঘটে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের। তা'রা একনায়ক শাসনের ব্যাপারেও স্থিতাবস্থা বজায়ের দিকেই নজর রাখে বেশি। ফলে স্বেচ্ছাচারী শাসনের সমর্থক বলে একে ভুল করে বসা লাতিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এ দোষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়। দোষ পররাষ্ট্র নীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের গাফিলতী বা গলদে।

* * *

আর একটা ব্যাপার তুচ্ছ নয়। লাতিন আমেরিকায় মুখ্যত (কিছুটা ভারতের মতো) বৈষয়িক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হয় না। দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে গ্রাহ্য নীতিই পরে বৈষয়িক রূপ লাভ করে। এ সত্ত্বেও জীবন-যাত্রা নির্বাহে আর্থিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই অপরিসীম ও অপরিমেয় এবং শেষ পর্যন্ত এর প্রভাবই সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়ায়। তাই কিউবায় যখন মার্কিন কলকারখানা গড়ে উঠে, মার্কিণ পুঁজি খাটান হতে থাকে, মার্কিন বাজারে কিউবার চিনি ও কাঁচা মাল অন্যের তুলনায় সুবিধাভোগী হয়, তখন তার ফলে লাভ হয়নি তেমন কিছু ইতর সাধারণ, মজুর বা মধ্যবিত্তের। অবশ্য উৎপাদন বেড়েছে, সাকুল্য সম্পদও বেড়েছে তেমনি। কিন্তু ধনবণ্টনে বৈষম্য থেকেই যায়। মার্কিন পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা হাভানায় তাঁদের দোসর গড়ে তোলেন। তাদের লাভের অংক বাড়ে, বিলাসব্যসন চরমে পৌছে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষের অতলান্ত দৈন্য ও দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। আর রক্ষক শাসকও হয় ভক্ষক।

তা'ছাড়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাহায্যে কিউবায় শিল্প, কারখানা ও বাণিজ্য গড়ে উঠলেও সেসব যেন শাঁখের করাত। একদিকে হয়েছে কিউবায় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি আর অপরিমেয় ধনাগম, অন্যদিকে হয়েছে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অপব্যবহার। একদিকে কিউবায় মার্কিণ পুঁজি ও শিল্পপতিদের মুষ্টিমেয় সহযাত্রী গড়ে উঠেছে, বিলাস বৈভবের লাভা-স্রোত বয়েছে, অন্যদিকে অসম ধন-বণ্টনে সাধারণ কিউবাবাসীর নিত্যভিক্ষা ও তনুরক্ষা। এ সবের সর্বাত্মক পরিণাম: কিউবার ফিডেল-শাসন। পশ্চিম গোলার্ধে পাশ্চাত্ত্যের সোবিয়েৎ শাসনের প্রতিভূস্থানীয়—মার্কিণ উদরের ঠিক নিচে গুপ্ত ঘাতকের শাণিত ছুরিকা। একদা 'মনরো নীতি'র দোহাই দিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র য়ুরোপীয় রাষ্ট্র-সমূহের হস্তক্ষেপ রোধ করে; আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হাজার দশেক পৃথিবীব্যাপী ঘাঁটি ফেঁদে রুশিয়াকে ঘেরাও করার ব্যবস্থা করেছিল—তারই দোরগোড়ায় ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই-এর মেজাজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস ও ইতিহাসের অমোঘ বিধানে হালে ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই-এর অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কিউবা। এই পটভূমিকায় ক্রুশ্চফের সকৌতুক দম্ভোক্তি—'মনরো নীতির গোর রচনা হয়েছে'—বিবেচ্য ও বিচার্য।

দার্শনিক

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(তাঁর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ৫ম খণ্ড পাঠান্তে)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কঠোর সাধনা চলিয়াছে দিবারাত,
হে ঋষি, জানাই বারবার প্রণিপাত।
ধরিয়া চলেছ এক অমৃত পথ—
জীবন মন্ত্র তব 'ওঁ তৎসৎ।'
সংসারী তুমি, কর কাব্য অন্ত—
বক্ষ তোমার নৈমিষারণ্য।

ভক্তির নাহি বহিঃপ্রকাশ তব,
গভীর নিবিড় কত যে কেমনে কব?
জ্ঞান-তপস্বী—কে বুঝে তোমার দর?
করেছে জগৎ কতটুকু সমাদর?
তুমি মহাপ্রাণ—নিখাদ স্বদেশপ্রেম—
আমি জানি তুমি জাম্বুনদের হেম।

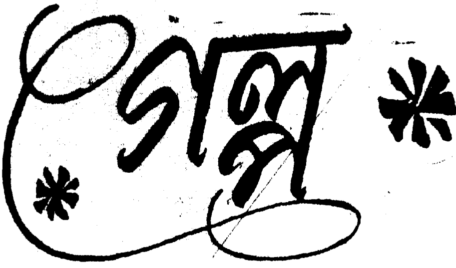
তত্ত্বান্বেষি' বৃথা দিন খোয়ালাম—
কৃতী মধুকর—তোমারে দিই প্রণাম।

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত !…



—আহাহা, করেন কি মশাই · জলে বে আত্মহত্যা !…
আপনার সংসার…আপনার স্ত্রী নেই ?
—সংসার !…স্ত্রী !!…দু'ইই আছে মশাই !…আর সেই
জন্তেই তো এই দুইয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার
জন্থই আজ…

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা



কুজ্ঝটি

শ্রীরমেন্দ্রলাল রায়

মেরিবং থেকে মিরিক। মিরিক থেকে সুখিয়াপোখরি। চড়াই থেকে উৎরাই, আবার চড়াই। বন নদী পাহাড়ের পথ। ঘুরে ঘুরে বছরের তিনটে ঋতু পার হয়ে গেল। কুসুমবং-এ এসে যখন বিছানা নামাল দেবরঞ্জন, তখন ডাকবাংলোর পশ্চিম সীমা বরাবর অরণ্যের পাতায় নতুন রঙ, লতায় আর ফুলে নতুন ঢঙ। অনেকগুলো পাখীর আওয়াজ পাওয়া গেল বিচিত্র সুরের। এখন বছরের চতুর্থ ঋতুর পদসঞ্চার সুরু হল। বাতাসে তার খবর আসছে। হিম-ছোঁয়া আর আবছা দিগন্তের খবর। যে দিগন্তে এখন ক'দিন লুকোচুরি খেলার মরশুম। মেঘের রাজ্যের কুমারী মেয়েরা উড়নী উড়িয়ে নেমে আসবে পাহাড়ের সঙ্গে প্রত্যুষা আর প্রদোষের খেলা খেলতে। অন্ধকারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে, এর পর আর কিছু দেখা যাবে না।

দেবরঞ্জনের সঙ্গী লোকটা পাহাড়ী। পথ থেকেই লোকটাকে সংগ্রহ করেছে। এখন বিকাল। সূর্য যদিও জলছে—তবু জলাটা যেন ক্লান্তির জলা। আর অল্প সময় পরেই সূর্য ঢলবে। বেলা শেষের ঝাপসা পরদা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

পাহাড়ী লোকটা একটা ছোট্ট গড়নের ডাক-বাংলোর সামনে থেমে পড়ল। ঘন জঙ্গলের মাঝে একটা ডাক-বাংলো। বিছানা আর কিডস্ ব্যাগটা নামাতে বলে—কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে বাংলোর বারান্দায় উঠে গেল দেবরঞ্জন। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের বারান্দা। বাংলোর গোটা শরীরটাই কাঠের, শুধু মাথার উপরে টিন। সে-ও রঙ করা, ঠিক কাঠের মতই দেখতে।

একান্ত নির্জন বাংলো বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী লোকটা হঠাৎ বলে উঠল—হিঁয়া রাতকো রহনা ঠিক হইন। আধা হিন্দী আধা পাহাড়ী ভাষায় সে বলল—রাতে এখানে থাকা ঠিক নয়।

অতএব? মনে মনে—হিসাব করতে লাগল দেবরঞ্জন। নির্মানব বাংলো বাড়ীটা চতুর্দিকের ঘন জটিল অরণ্যের থাবায় যেন কাঁপছে। গাছ-গাছালির নিবিড় আওতার রহস্য থমকে রয়েছে। মানুষের নজর সেখানে যেতে পারে না।

বাংলোটা আকারে খুবই ছোট এবং ঐ ছোট্ট আয়তনটুকুর জন্যই বাড়ীটার সৌন্দর্য বেড়েছে। ছবির মত মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করছে দেবরঞ্জন। কিন্তু নির্জন নিরালা আর নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থলীতে থর থর করে কাঁপা শশকের মত বাংলো বাড়ীটায় রাতের আশ্রয় নেওয়া উচিত হবে কি?

সঙ্গের পাহাড়ী লোকটা নেপালী। বেঁটে-খাটো মজবুত চেহারার মানুষ। প্রৌঢ় বয়স। মুখের দিকে চাইলে যেন বল আসে, ভরসা আসে। সেখানে অনেক অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এই লোকটা যেন উপস্থিত অনেক বিপদের আসান করে দিতে পারে।

পাহাড়ীটার মুখে প্রশ্ন।

দেবরঞ্জন নূতন জায়গার জন্যেই যেন একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। বলল—তবে?

লোকটা বলে উঠল—বাবুজি! হিয়াঁ ভি একজন বাঙ্গালী পোস্টমাস্টারবাবু আছেন। বাবুজিকে সাথ ফেমিলি ভী আছে। কোনু অসুবিধা হবে না। হামার সঙ্গে ও বাবুজির জানা চিনহা আছে। চলনস্।

দেবরঞ্জন ইতস্তত: করছে দেখে পাহাড়ীটা বলে উঠল—কোনু চিন্তা করবেন না বাবুজি। চলুন বাংগালীবাবু ফেমিলি নিয়ে থাকেন।

লোকটা বেশ স্ফূর্তিবাজ। মাঝে মাঝে গম্ভীর রেখাম্বিত মুখে বেশ সতেজ কৌতুক ঝলমল করে ওঠে।

বিছানা ব্যাগ উঠিয়ে পাহাড়ীটা ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে।

—এক রাতের জন্য—বিড় বিড় করতে করতে দেবরঞ্জনও অগত্যা চলতে আরম্ভ করেছে।

সূর্য এখনও ডোবেনি। গাছের মাথায় ডাল-পাতার ভিড়ে ঝটপটানি সুরু করেছে কি কতকগুলা পাখী। ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল দেবরঞ্জন। উত্তরের কোন পাহাড়-চূড়ায় আর পাহাড়ের ঢালে সারি সারি পাইনের গাছে শেষ বেলার রোদ মনোরম মোহ ছড়াচ্ছে।

পাহাড়ীটা হঠাৎ বলে উঠল—ওই ত পোস্টমাস্টার-বাবু। ডাকব?

কিন্তু ডাকতে আর হল না। বছর ত্রিশের মধ্যে বয়স। ফর্সা দীর্ঘ, পাতলা শরীর। মানুষটি এসে পড়ল দেবরঞ্জনের কাছাকাছি। বিছানা আর কিড্‌স ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু অবাক হওয়ার মত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—আপনারা?

দেবরঞ্জন বলল—রাতের জন্য ঐ বাংলো বাড়ীটায় থাকব বলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। গন্তব্যস্থল অনেক দূর—বেতাসও, কিন্তু বেলার আয়ু কমে এসেছে বলে থাকতে হল। কিন্তু মুশকিল হয়েছে বাংলো বাড়ীটাতে আজ রাত্রে থাকব বলায়—বাহাদুর ভয়ানক আপত্তি করছে।

পাহাড়ী লোকটা গম্ভীর মুখে জবাব দিল—জী হাঁ! হিঁয়া রাতকো রহনা একদম ঠিক ছই ন!

দেবরঞ্জন ঈষৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল—তবে ডাকবাংলো কিসের জন্য!

এবার পোস্টমাস্টার ভদ্রলোকই জবাব দিলেন—দেখুন, আপনি এখানে নতুন এসেছেন—তাই জানেন না। বাংলোটায় একা কেউ রাতে থাকতে সাহস করে না। বাংলোর একজন চৌকিদার আছে বটে—কিন্তু সে রাত্রে চলে যায় একটু তফাতে। লোকজনের মধ্যে থাকার জন্যই বেচারা অন্যত্র একটা ছোট্ট ডেরা করে নিয়েছে।

দেবরঞ্জন একটু হেসে বলে উঠল—একটু পরেই বেশ জ্যোৎস্না উঠবে। স্বচ্ছন্দে থাকা যেত বাংলোটায়। আমি কিন্তু এমন জ্যোৎস্নায় জঙ্গলের মধ্যে পথ হেঁটেছি।

ভদ্রলোক দেবরঞ্জনের কথায় এমনভাবে তাকালেন যে, মনে হল বুঝি বা দেবরঞ্জনের বুদ্ধিবিকার ঘটেছে। নতুবা এমন দুঃসাহসী গল্প কেউ করতে পারে না।

—বন্দুক আছে সঙ্গে? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

—হাঁ! দেবরঞ্জন এমন হেসে জবাব দিল, যা কেবল ছন্নছাড়া লোকেরাই পারে!

অর্থাৎ বন্দুকটা বাহুল্য উপকরণমাত্র।

পোস্টমাস্টার বললেন—আসুন, আপনাকে আর একটা ভালো বাংলোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

কোন কথা না বলেই দেবরঞ্জন চলতে আরম্ভ করল। পিছন পিছন বাহাদুর। পোস্টমাস্টার অনবরত কেবল তার চাকরি-জীবনের মর্মবেদনা ব্যক্ত করতে লাগলেন। একসময়ে পথটা এসে বাঁশ বাঁখারির বেড়ায় ঘেরা একটা ছোট্ট ফুল বাগানের সামনে থামল। তিন দিকে চওড়া তক্তার দেয়াল—আর মাঝখানে উঁচু একতলা সমান মোটা শালপাল্লার উপরে একটা কাঠের বাড়ী। জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের কিছু কিছু চোখে পড়ে।

—গরীবের আস্তানা—পোস্টমাস্টার বললেন।

বাগানের কাজ থেকে উঠে একটা চৌদ্দ পনের বছরের নেপালী কাঞ্চা এসে দাঁড়াল। পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক বললেন—বিছানা ব্যাগ ওপরে নিয়ে ওঠ। আসুন—বলে দেবরঞ্জনকে আহ্বান করলেন ভদ্রলোক।

এবার দেবরঞ্জন অবাক হয়ে বলল—আপনার বাড়ী? কিন্তু, অন্য কোথাও—

কথাটা শেষ করতে দিলেন না পোস্টমাস্টার—অন্য কোথাও নয়—এখানেই। জোর করে কথাটা বলেই বাহাদুরের হাতে একটা আধুলি দিয়ে দিলেন। বাহাদুর নমস্কার করে চলে গেল।

পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেবরঞ্জন যখন উপরে উঠে এসেছে—তখন সূর্যাস্তের রঙ পাপড়ি-খোলা ফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। যে মেয়েটি দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়েছিল—দেবরঞ্জনের এক লহমার দেখায় মনে পড়ল যেন চেনা মেয়েটি। মুখ থেকে হয়ত বেরিয়ে যেত নামটা—কিন্তু সামলে ফেলল দেবরঞ্জন। এখানে এই বনপাহাড়ের রাজ্যে যে মেয়েটি চেনা মনে হল—সে নিশ্চয় মলয়া নয়। কত মেয়েই ত চোখে পড়ে—যাদের মনে হবে চির-চেনা?

বার কয়েক চোখে চোখে নজর ছলকে উঠলেও, দেবরঞ্জন উদাস ছিল সারাক্ষণ।

পোস্টমাস্টার বললেন—আমার ঘরের একমাত্র প্রাণী। এ ভিন্ন অন্য কেউ নেই।

মেয়েটির ঠোঁটে টান পড়ল—তারপরে টানটা ধনুকের ছিলার মত বেঁকে গেল। কিন্তু মেয়েটি কিছু বলল না।

বুঝা গেল ভদ্রলোকের সংসারে শিশু এখনও আসে নি। দেবরঞ্জন হাত জোড় করে মেয়েটিকে নমস্কার করল না—শুধু হাসল। ওদিকে কিন্তু দুটি করপল্লব যোড় হল। হাতের জোড়ে, ঠোঁটের জোড়ে—কি একটা কথা ফুটতে না পারার ব্যথায় কেঁপে উঠল।

রাতের খাবারে মুরগি, আণ্ডা কিছুই বাদ ছিল না। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তানের মত ওগুলি উদরস্থ করে দেবরঞ্জন উঠল—তখন রাত অনেক। এবার নিদ্রা দেবার পালা।

উপরে সবে চারখানি ঘর। এরই একখানিতে দেবরঞ্জনের জন্য চৌকি বিছানা পড়ল। নেপালী কাঞ্চাটা রইল পাশের ঘরে। উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়িটা তুলে ফেলা হল উপরে। নীচের মাটিকে বিশ্বাস নেই।

জ্যোৎস্না উঠেছে। সারি সারি পাইন আর দূর-দিগন্তের পাহাড় দেখতে দেখতে ডায়েরীটার পাতা ভরে রাখছিল দেবরঞ্জন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। শিলিগুড়ি কলেজের দোতলায় যে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় দেব-রঞ্জনের, সেই মেয়েটির স্বপ্ন ছিল অতিমাত্রায় নাগরিক। শিলিগুড়ির পুরাতন স্টেশনের কাছে মেয়েটির বাড়ী, কিন্তু সে বেড়াতে যেতে চাইত নূতন স্টেশনে। কিন্তু যাওয়া হত না। অতখানি দূর পথ যেতে দেবরঞ্জন রাজি হত না। লুকোচুরি-খেলাতেও তার রথের চূড়ার মত মন রাজি হত না। তাই মলয়া আসত—রবারের মত ঠোঁট দুটি কখনো পাকা লঙ্কা, কখনো কমলা কোয়া হয়ে উঠত। কখনো টান, কখনো কুঞ্চিত, কখনো দাঁত-চাপা ভঙ্গি করে চুপ করে ভাবত। এই মেয়েটির নাম ছিল মলয়া, যে মেয়েটি সাধা-রণের দলে পড়ত না। ছবি আঁকা, দুরুহ অঙ্ক কষা, নূতন নূতন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, আবার ইংরাজি বাংলায় ভাল লেখা, এতগুলি বিষয়ে তার দক্ষতা ছিল। দেবরঞ্জন তাই একটু বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আসক্তি পুরাপুরি হওয়ার ঠিক পূর্বাহ্নে অবশেষে ঠিকানা বদল করে ফেলেছিল দেবরঞ্জন।

ডায়েরীটা আধ-খোলা—কলমটা ক্যাপ-খোলা, দেবরঞ্জন আর একটু ভেবে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কত রাত কে জানে? কপালের কাছে চুলের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগতেই চমকে জেগে উঠল। আধখোলা জানালাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মশারিটা ফেলে পাতলা একটা চাদর সারা গায়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথাটা ঠিক করে তুলে দিচ্ছে দু'খানি হাত। মৃদু মৃদু চুড়ির বাজনা।

—মলয়া?

—উ, মলয়া নয়, মলি। যে নামে আগে ডাকতে, তাই ডাকো।

মশারিটার ধার গুঁজে দিতে দিতে ত্রস্তে কথা বলছিল ও। এবারে একেবারে আধখানা শরীর মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেবরঞ্জনের চোখের উপরে চোখ রাখল। তার পরে বলল—চিনতে পেরেছ দেখছি। কথাকটি যেন দাঁত দিয়ে কাটতে কাটতে বলল।

চকিতের মধ্যে আবার মশারির ভিতর থেকে শরীরটা সরিয়ে নিয়ে গেল দরজার কাছে। লুকোচুরি খেলার মত করে দরজাটি বন্ধ করে চলে গেল।

একটু পরেই আবার এল। মশারিটা তুলে ঠাণ্ডা কি একটা গালে চেপে ধরতেই দেবরঞ্জন হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল।

—টর্চ—বালিশের নীচে রেখে দাও—গলাটা কেমন কাঁপা কাঁপা।

একটু দাঁড়িয়ে রইল ও। দেবরঞ্জন কিছু বলল না। জানালার কাছে গিয়ে একটা পাল্লা খুলে বাইরে চেয়ে রইল। দূরে, অনেক দূরে, সারি সারি পাইন জ্যোৎস্নার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। ঝাপসা কুয়াশার পরদায় ঢাকা পৃথিবীর দেহ ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে; রেখার তরঙ্গে প্রথম বয়সের উদ্দামতা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে হাল্কা আব-রণের নীচে।

দেবরঞ্জনের বোধহয় চোখ জড়িয়ে ঘুম নামছিল—

এমনি সময়ে ও আবার এসে আলতো ভাবে বসল দেবরঞ্জনের মাথার কাছে।

এবারে দেবরঞ্জন বলল—পোস্টমাস্টারবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন নিশ্চয় ?

ছোট্ট জবাব দিল ও—হ্যাঁ।

তারপরেই যেন কিছু একটা আরম্ভ করার সমস্যায় বলল—আচ্ছা…

দেবরঞ্জন বলল—বল।

—না থাক্। কি দরকার। আর তো এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আগের দিনগুলি ফেরান যাবে।

দেবরঞ্জন বলল—মেয়েদের যা পাওয়ার সবই তো পেয়েছ। আগের দিন ফিরে পাওয়ার সাধ তো তোমার থাকা উচিত নয়। সে সাধ আমার থাকা উচিত। কি বল ?

—আমারও।

—না, তোমার থাকা অন্যায়। অতএব এ প্রসঙ্গ থাক। এখন শুতে যাও।

—না, আমি এসেছি, তোমাকে প্রশ্ন করতে। জবাব দাও—আমি এমন নিঃসঙ্গ একার জীবন নিয়েই পড়ে থাকব এখানে ? আর তুমি দেশে দেশে মজা করে বেড়াবে ?

—আশ্চর্য প্রশ্ন। দেবরঞ্জন কৌতুকের সুরে বলল—এর জবাব আমি দিতে পারব না।

ও এবার মশারিটা একটানে উঠিয়ে ফেলল—তারপরে ঝুঁকে পড়ে বলল—বল, আমাকে তবে একদিন পাগল করে দিয়ে পালিয়ে ছিলে কেন ?

—আমি পালাই নি। আমার অভাবের জন্য নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে।

—না, তুমি আমারই ভয়ে পালিয়ে গেলে সেবার।

—বেশ, তাই, এবার তর্ক কালকের জন্যে তোলা রেখে কর্তার পাশে যাও। কর্তা জাগলে অবস্থা খুব প্রীতিকর হবে না নিশ্চয়।

—ভালই হবে। আমি মুক্তি চাই!

—মুক্তি চাও ? কিন্তু কেন ? ভদ্রলোক তোমায় ভালবাসেন না ?

—খুব ভালবাসেন। কিন্তু নিরুৎসব জীবনের ফাঁকা ভালবাসা আমার অসহ্য!

—উৎসব বলতে কি বোঝ ? কী তোমার উৎসব ?

—উঃ তুমি কি নিষ্ঠুর! বুকের মাঝখানটায় দেবরঞ্জন অনুভব করল একটা অপূর্ব শিহরণ। সেই পুরাতন মলয়া। দেবরঞ্জনের সংযমের বাঁধ কি ভেঙে যাবে ? ভাবল দেবরঞ্জন। না, না—কিন্তু, কিন্তু—

* * *

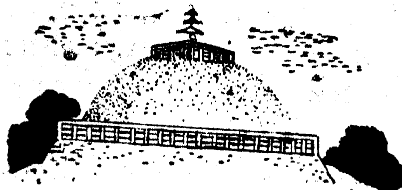
রাত্রি শেষ হল। ভোরের আলো ফুটল। দেবরঞ্জনও প্রস্তুত হল। আবার কোন চড়াইয়ের উদ্দেশে সে যাত্রা করবে। তখনও ওদের ঘরের দরজা বন্ধ। সেদিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা আর মায়ার মিশ্র অনুভূতি পাকিয়ে উঠতে লাগল।—

দেবরঞ্জন চলে যাচ্ছে পাহাড়ী পথের আঁকাবাঁকা ঢাল বেয়ে।—আরও দূরের এক পাহাড়ের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে জানল না—জানলার ওপারে দুটি জলভরা চোখ তারই দিকে অনিমেষে চেয়ে রইল,—আর বোধহয় প্রণাম জানাল তাকে ও অদৃশ্য কোনও শক্তিকে—এক ঝঞ্ঝারাতের কুজ্ঝটিকায় পথভ্রান্ত হওয়া থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য

কিন্তু ভোরের ঘন কুয়াটিও যে আরও ঘন হয়ে দূর পাহাড়-যাত্রী দেবরঞ্জনের সচল মূর্তিটাকে ঝাপসা করে দিল। মুছে দিল বুঝি চোখের আলো থেকে। কুয়াটিতে বুঝি হারিয়ে গেল মলয়ার কিশোর বয়স।

আরও ঘন হোক কুয়াশার পর্দা—অতীতকে যেমন মুছে দিল, বর্তমানকেও মুছে দিক না!

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মলয়া।



মেয়েদের কথা

শিশুদের প্রতি করণীয়

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

শিশু মাত্রেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। সেই জন্যে ফুলের পবিত্রতার সংগে শিশুরা তুলনীয়। শিশুরা যখন অন্ধকারের গহ্বর থেকে পৃথিবীর বুকে এসে আলো দেখে তখন তারা থাকে নিষ্পাপ, কিন্তু এই পৃথিবীর ক্লেদাক্ত পরিবেশ তাদের সেই পবিত্রতা নষ্ট করে।

জন্মগত সংস্কার এবং পরিবেশেই এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য্য এবং পরিবেশ শিশুর ওপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করে। ভাল পরিবেশ সত্ত্বেও যদি শিশু বিপথে যায়, সেটা তাদের জন্মগত সংস্কারের বশেই যায়। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশেই এরূপ হয়ে থাকে। তবুও পিতামাতা চেষ্টা করেন যাতে সন্তানকে ভাল মত মানুষ করতে পারা যায়।

শিশুকালে মা সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্ধু। সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠা নির্ভর করে মায়ের ওপর। অল্প বয়সে সন্তান যদি মায়ের সংগ না পায় তাহলে তাদের ভালবাসার বীজ উপ্ত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে এরা হয় আত্মকেন্দ্রিক, কিংবা অভিমানী, আবার লাজুক-স্বভাবও হতে পারে। যদিও ভালবাসা সহজাত, কিন্তু এর বনেদ নির্ভর করে মায়ের ওপর।

সন্তানকে স্নেহ করেন প্রত্যেক পিতামাতা, কিন্তু শুধু মাত্র স্নেহ করলে সকল কর্ত্তব্য করা হয় না। অতিরিক্ত আদরে তারা বাঁদর হয়, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার অধিক শাসনেও সন্তান মানুষ হয় না। অতিরিক্ত বিধি-নিষেধের চাপে তারা পরিণত বয়সে জড়ভাবাপন্ন নির্জীব স্বভাবের হয়। আবার কেউ বা অতিরিক্ত জেদী স্বভাবের হয়ে যায় অতিরিক্ত শাসনে।

পিতামাতা কামনা করেন সন্তান সকলের প্রশংসার পাত্র হোক। সন্তানের প্রশংসার কথা শুনলে মন তাঁদের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—কেউ যদি নিন্দা করে মনে ব্যথা পান। কিন্তু অনেক মা-বাবা আছেন—সন্তানের অন্যায় কাজ নিয়ে কেউ কিছু বললে তাঁরা সন্তানের পক্ষ নিয়ে তাদের সংগে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। এর জন্যে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ পেতে হয় তাঁদের। শিক্ষা দেওয়ার অনভিজ্ঞতার জন্যে সুসন্তান না হয়ে কুসন্তান হয়। পিতা ও মাতার শিক্ষা যদি বিভিন্ন মতের হয়, তবে সে বাড়ীতে সন্তান মানুষ হওয়া কঠিন।

মা একভাবে সন্তানকে চালিত করেন, আবার পিতার মতবাদ অন্যরূপ। এই দুই বিভিন্ন মতবাদের দুর্বিপাকে শিশুরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে বুঝে উঠতে পারে না—কোন মত অনুযায়ী তারা চলবে। হয়তো মা বলছেন, "বিকেলে ফাঁকা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে খেলবে। তাতে অংগ চালনা হবে, শরীর ভাল থাকবে।" অপর ক্ষেত্রে পিতা বলছেন, "ছুটোছুটি করে খেলতে বারণ করেছি, তবু কথা শোন না? কোন দিন হাত-পা ভাঙবে। ঘরে বসে বসে খেলা করো।"

এই যে মতভেদ, তাতে সন্তান মানুষ হয় না। এর জন্যে তারা প্রথম প্রথম বিভ্রান্ত হলেও পরে অনেকে দুর্দ্দান্ত হয়ে যায়। অনেক সময় এর জন্যে মিথ্যা বলতেও অভ্যস্ত হয়, লুকোচুরি করতে শেখে।

এই ধরণের সন্তানের মাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়: "এত বলি, এত শেখাই—তবু শেখে না, কথা শোনে না।"

কেন যে তারা শেখে না সেটুকু তলিয়ে দেখবার মত ধৈর্য্য খুব কম মায়ের আছে।

যাঁরা অধিক সন্তানের জননী তাঁরা, "আর পারি না বাপু" বলে ছেলে-মেয়েদের একেবারে বাঁধন ছাড়া করে রাখেন। এর ফলে ছেলে-মেয়েরা হয় বহির্মুখী। ঘর

সংসার তাদের ভাল লাগে না, এমন কি বাড়ীর লোকের সংগও পছন্দ হয় না।

শাসন বা শিক্ষা ছেলে-মেয়ে দু-জনকেই সমান ভাবে দেওয়া উচিত। পক্ষপাতশূন্য শিক্ষা মংগলজনক, কিন্তু পক্ষপাতপূর্ণ শাসন ও শিক্ষা বিশেষ ক্ষতিকারক। এর জন্যে ছোট থেকেই মনে বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য জমা হয়।

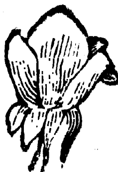
অনেক মা আছেন, ছেলে-মেয়ে অন্যায় করলে ছেলের দোষকে উপেক্ষা করে মেয়েকেই শাসন করেন। তাঁদের মতে ছেলেকে যা সাজে, মেয়েকে তা শোভা পায় না। এই পার্থক্যের জন্যে ছেলেরা ছোট থেকেই মেয়েদের প্রতি অশ্রদ্ধা করতে শেখে। বড় হয়েও এই স্বভাব বদলায় না, তার প্রমাণ আমরা পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্ব্বত্রই পাচ্ছি।

ছেলে-মেয়েরা অন্যায় করলে বাইরের কারুর কাছে ছেলে-মেয়ের সামনেই তা বলা উচিত নয়। তাতে তাদের মনে অভিমান হয়, পরে সেটা রাগে রূপান্তরিত হওয়া বিচিত্র নয়। তাদের সামনে দোষ ত্রুটি বললে তারা ক্রমশঃ বেপরোয়া এবং অবাধ্য হয়ে যায়।

ছেলে-মেয়ে অন্যায় করলে তা নিয়ে কেউ যদি অভিযোগ করতে আসেন, তাহলে সন্তানের পক্ষ নিয়ে পিতা-মাতা তাদের সংগে ঝগড়া করতে অগ্রসর হন এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

কাজেই সন্তানের দোষ-ত্রুটি নিয়ে তাদের সামনে কারুকে বলা এবং সন্তানের পক্ষ নিয়ে অপরের সংগে ঝগড়া করা এই দু'টি স্বভাবই পরিত্যাগ করা উচিত।

ছেলে-মেয়েকে যথার্থ ভালভাবে মানুষ করতে হলে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সংযত, ধৈর্য্যশীল, পক্ষপাতশূন্য ও সুবিবেচক হওয়া প্রয়োজন।





হাতের কাজ

কাঠের মালার কারু-শিল্প

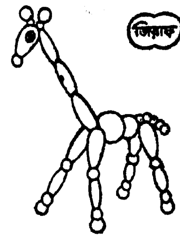
রুচিরা দেবী

আজ একটি বিচিত্র-অভিনব কারু-শিল্পের কথা বলছি। এ ধরণের শিল্প-কাজে বেশী পরিশ্রম করতে হবে না, অথচ ঘরে বসে অল্প-আয়াসেই ঘর-সাজানোর কিম্বা প্রিয়জনকে উপহার দেবার উপযোগী নানা রকম সুন্দর ও মনোহারী সামগ্রী তৈরী করতে পারবেন। তাছাড়া, এ সব শিল্প-সামগ্রী বানানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম যা প্রয়োজন, সেগুলিও নিতান্ত সাধারণ জিনিষ...এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য নয়। তবে, বলা বাহুল্য, এ ধরণের শিল্প-কাজে যাঁরা হাত দেবেন, তাঁদের অন্ততঃ কিছু সূক্ষ্ম শিল্প-রুচি আর কারু-কলা-নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন! ইংরাজীতে এ শিল্পটির নাম হলো—Bead Weaving Craft অর্থাৎ 'কাঠের মালার কারুকার্য্য'!

অভিনব এই কারু-শিল্পের কাজ করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জামের দরকার, গোড়াতেই সেগুলির কথা জানিয়ে রাখি। আমাদের দেশে মা-দিদিমা, মাসিমা-পিসিমারা যে ধরণের কাঠের তৈরী তুলসীর মালা নিয়ে জপ-তপ করেন, ঠিক সেই ধরণের ছোট-বড়-মাঝারি আকারের কতকগুলি কাঠের মালা বা Beads সংগ্রহ করে, সেগুলিকে বেশ মজবুত অথচ সরু তার বা সুতো দিয়ে একত্রে গেঁথে নানা ছাঁদের সৌখিন পুতুল, কারুকার্য্যমণ্ডিত ঘর-সাজানোর সামগ্রী (Curios) তৈরী করা যায়। তবে, শিল্প-কাজের জন্য এ মালা চাই—ছোট, বড়, মাঝারি নানা সাইজের এবং লাল, কালো, শাদা, হলদে, সবুজ, নীল, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের! নানা আকারের ও বর্ণের এই সব কাঠের

'মালা' বা 'Beads' সংগ্রহ হবার পর, জোগাড় করে নিতে হবে—বেশ মজবুত অথচ সরু-ধরণের খানিকটা লোহা,তামা পিতল কিম্বা শিশার তৈরী 'তার' (Wire)—নয়তো 'টোয়াইন' (Twine) কিম্বা শক্ত 'শনের' (Sann Hemp) তৈরী পাকানো সুতোর গুলি। তবে সুতোর চেয়ে তারের সাহায্যে এ সব শিল্প-সামগ্রীর কাজ করাই ভালো—কারণ, সুতোর চেয়ে তার ঢের বেশী দীর্ঘস্থায়ী এবং মজবুত। তাছাড়া, কাঠের মালা গেঁথে যে সব পুতুল বা সৌখিন শিল্প-সামগ্রী (Curios) বানানো হবে, সেগুলিকে যদি মেঝের উপর, কুলুঙ্গীতে কিম্বা 'সেল্‌ফে' (Shelf) অথবা খেলান-জানলার কার্ণিশে খাড়াভাবে সাজিয়ে রাখার প্রয়োজন ঘটে তো, সেক্ষেত্রে সুতোয় গাঁথা সামগ্রীর চেয়ে তারে-গাঁথা সামগ্রাই অনেক বেশী পাকা ও কার্য্য-করী হবে। সুতরাং, আমাদের মতে, এ ধরণের শিল্প-কাজে, সুতোর চেয়ে তার দিয়ে কাঠের মালাগুলিকে গেঁথে নেওয়াই ভালো মনে হয়। তবে, আজকাল অনেকে যেমন তাঁদের সেডান-বডি (Seden Motor Car) মোটর গাড়ীর পিছনের কাঁচের সামনে নানা ধরণের যে সব বিচিত্র-সৌখিন পুতুল প্রভৃতি ঝুলিয়ে সুসজ্জিত রাখেন সে-ধরণের পুতুল বাঁনাতে হলে অবশ্য শক্ত (Rigid) তারের চেয়ে নরম (Fiexible) সুতোর সাহায্যে কাঠের মালাগুলিকে গেঁথে নেওয়াই ভালো। যাই হোক, এ বিষয়ে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়মের বালাই নেই, প্রয়োজন অনুসারে কাঠের মালাগুলিকে ব্যক্তিগত অভিরুচিমত সুতো কিম্বা তার দিয়ে গেঁথে নিলেই চলবে। তবে এ-কাজে তার ব্যবহার করবার সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, সে তার যেন খুব মোটা বা শক্ত ধরণের না হয়…কাজের সময় আঙুলের চাপে যে তার ইচ্ছামত বাঁকানো বা নোয়ানো যায়, এমন তার ব্যবহার করতে হবে। খুব বেশী সরু কিম্বা পল্‌কা-ধরণের তার ব্যবহার করাও সমীচীন নয়—কারণ, তাতে কাজেরও ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিল্প-সামগ্রীটিও তেমন মজবুত-গড়নের হয়ে উঠবে না। এ সব সরঞ্জাম ছাড়াও, কাজের সময় সর্ব্বদা সঙ্গে রাখতে হবে—ভালো একটী তার-কাটবার 'কাঁচি' অথবা 'প্লায়ার্স' (Pliers), ছোট-বড় কয়েকটি কাঠের টুকরো, ধারালো একটী ছুরি, কাঠের বুকে ফুটো-রচনা করার একটি যন্ত্র এবং লাল, নীল, সবুজ, হলদে, শাদা, কালো প্রভৃতি ছোট ছোট কৌটোয় রাখা কয়েকটি তেল-রঙ (Liquid Oil Paints) অথবা একটি সাধারণ জল-রঙের বাক্স (Water Colour Box)!

সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, যে শিল্প-সামগ্রীটি তৈরী করবেন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি খশ্‌ড়া ছকে নেওয়া ভালো—তাতে কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি এবং ভুলচুক ঘটবারও আশঙ্কা থাকবে কম। পাশের

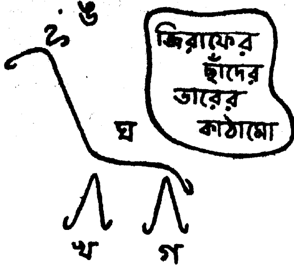


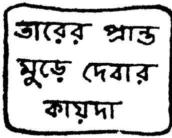
ছবিতে, ছোট-বড়-মাঝারি এবং লম্বা-গোল প্রভৃতি নানা আকারের কাঠের 'Beads' বা মালা সাজিয়েগাঁথা কয়েকটি বিচিত্র পুতুল ও সৌখীন-সামগ্রীর (Curios) নক্সা দেওয়া হলো—এগুলি দেখলেই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন অভিনব এই কারু-শিল্পটির আসল মর্ম্ম!

এবারে বলি, এ সব বিচিত্র শিল্প-সামগ্রী তৈরী করার কথা। উপরের চিত্রে কাঠের মালা গেঁথে জিরাফের যে বিচিত্র রূপ-দান করা হয়েছে, গোড়াতেই সেটির বিষয় জানাই।

উপরের নক্সানুযায়ী জিরাফ বানাতে হলে—প্রথমেই তার থেকে টুকরো কেটে নিয়ে, সেটিকে হাতের আঙুলের চাপে মুড়ে বেঁকিয়ে হুবহু এই পাশের ছবিতে দেখানো নক্সার ছাঁদে জন্তুর কাঠামোটিকে রচনা করতে হবে। কাঠামো তৈরীর সময়, গোড়াতেই সুরু করবেন জিরাফের সামনের পা অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত অংশ থেকে। সমান-মাপের লম্বা এক টুকরো তার কেটে নিয়ে সেই তারের একদিকের মুখ মুড়ে নিন উপরের নক্সায় দেখানো ঐ 'খ' চিহ্নিত অংশের ছাঁদে। তারের প্রান্তটি এভাবে মুড়ে দেবার কারণ—পায়ের পাশের দিকে যে কাঠের মালা (Bead) থাকবে, সেটি খশে বেরিয়ে যাবে না, তাদের সঙ্গে অটুট ও পাকাপাকিভাবে গাঁথা থাকবে বরাবর।

তারের প্রান্ত মুড়ে দেবার পর, ঐ তারের মধ্য দিয়ে প্রথমে গেঁথে দেবেন গোল-আকারের সব চেয়ে বড় একটি কাঠের

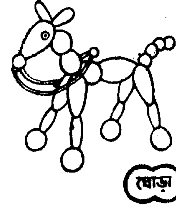






মালা বা Bead, তারপর উপরের ঐ নক্সার ছাঁদ-অনুসারে ফুলের মালা গাঁথার ধরণে, পর-পর গেঁথে যাবেন ছোট-বড় কাঠের মালাগুলিকে। এমনিভাবে তারের অর্দ্ধেক অবধি মালা (Bead) গাঁথা হলে, তারটিকে ইংরাজী 'V' অক্ষরের ছাঁদে মুড়ে বাঁকিয়ে নিতে হবে। তারপর আবার ঐ আগের মতো ধরণে কাঠের মালা বা 'Beads' পরিয়ে সামনের পায়ের বাকী অংশটুকু গেঁথে নিয়ে পূর্ব্ব-প্রথানুসারে তারের প্রান্তটুকু মুড়ে দেবেন—তাহলেই তৈরী হবে জিরাফের সামনের দুটি পা। এবারে ঠিক অনুরূপ ভঙ্গীতে সমান মাপের আরেক টুকরো লম্বা তার নিয়ে তাইতে কাঠের মালাগুলি গেঁথে বানাবেন জিরাফের পিছন দিকের পা দুটি—অর্থাৎ উপরের নক্সার ঐ 'গ' চিহ্নিত অংশটি! তারপর সুরু করবেন, জিরাফের দেহের উপরাংশ অর্থাৎ উপরোক্ত নক্সার 'ঘ' চিহ্নিত অংশটুকু। এবারেও আগের প্রথায় জিরাফের দেহের উপরাংশ রচনার জন্য আরো এক টুকরো লম্বা তার নিয়ে, সেটিকে উপরের নক্সার মতো ছাঁদে বাঁকিয়ে তাইতে ছোট-বড় সাইজের কাঠের মালা গেঁথে দিলেই তৈরী হবে জানোয়ারের মুখ, মাথা, ঘাড়, দেহ আর ল্যাজ। এ কাজের সময়েও তারের শেষ প্রান্ত দুটিকে দুমড়ে মুড়ে দিতে হবে—যেমন দিয়েছিলেন জিরাফের পায়ের অংশ দুটি রচনা-কালে, না হলে নাকের ও ল্যাজের প্রান্ত থেকে কাঠের মালাগুলি খসে বেরিয়ে যাবে। এভাবে দেহের উপরাংশ তৈরী হয়ে যাবার পর বানাতে হবে জিরাফের কাণ দুটি—অর্থাৎ উপরের নক্সার 'ঙ' চিহ্নিত অংশ। কাণ দুটি তৈরী করবার জন্ত ছোট আরেক টুকরো লম্বা তার নিয়ে, সেটিকে নক্সার 'ঙ' চিহ্নিত অংশের মতো ছাঁদে বাঁকিয়ে তাইতে কাঠের মালা (Beads) গেঁথে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথায় তারের শেষ প্রান্ত দুটিকে মুড়ে নেবেন।

এমনিভাবে জিরাফের চারটি অংশ—অর্থাৎ কাণ, দেহ, সামনের ও পিছনের দুই জোড়া পা আলাদা-আলাদা তৈরী করে নিয়ে, সেগুলিকে যথাস্থানে খুব সরু তার দিয়ে শক্ত করে এঁটে একত্রে জুড়ে দিলেই চমৎকার একটি শিল্প-সামগ্রী (Curio-doll) বানানো যাবে। কাঠের মালাগুলি যদি রঙীণ না হয়, তাহলে সংগৃহীত সরঞ্জামের মধ্যে যে বিবিধ বর্ণের তেলের (Oil Paints) অথবা জল-রঙের (Water-Colours) কথা গোড়াতেই বলেছি, সেই রঙে রঙিয়ে অভিনব শিল্প-সামগ্রীকে মনোরম করে তুলবেন।



এ প্রসঙ্গে আরো বলে রাখি, উপরে কাঠের মালা (Beads) গেঁথে তৈরী ঘোড়ার যে নক্সাটি দেওয়া হয়েছে, সেটি বানাতে হলে—ঠিক ঐ জিরাফের ছাঁদ রচনার পদ্ধতিতেই কাজ করবেন। আপাততঃ কাঠের মালা (Beads) গেঁথে এই দুই ছাঁদের কারু-শিল্পের কথাই জানালুম···পরের বারে আরো কয়েকটি অভিনব নক্সা-রচনার বিষয় আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

শীতের পোষাক

রমলা মুখোপাধ্যায়

আজকাল ঘরে-ঘরে বাড়ীর মেয়েরা অনেকেই নিজেদের হাতে পশম দিয়ে বোনা নানা ছাঁদের মোজা, মাফ্লার,

স্কার্ফ, টুপী, জাম্পার, সোয়েটার, ব্লাউশ, পুলওভার প্রভৃতি শীতের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করছেন। মেহনৎ করে নিজেদের হাতে-তৈরী করা এ সব পোষাক-পরিচ্ছদের শ্রী-ছাঁদ যাতে সুন্দর এবং পরিপাটি হয়, সকলেই তাই চান। এবারে সেজন্য সুশ্রী অথচ সাধাসিধা-ছাঁদের একটি 'হাত-কাটা' অর্থাৎ 'স্লিভলেশ পুল-ওভারের (Sleeveless' Pull-over) বিষয় জানাচ্ছি···পশম দিয়ে এ পোষাকটি তৈরী করা খুব পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। এমন কি শিক্ষার্থীদের পক্ষেও, এ কাজ নিতান্ত দুরূহ ঠেকবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।



উপরের ছবিতে আলোচ্য 'স্লিভলেশ্ পুল-ওভারটির প্যাটার্ন দেখিয়ে দেওয়া হলো। এই হাতকাটা পুল-ওভারটির বানাতে পশম বা 'উল' (Wool) লাগবে ১২ আউন্স। তবে ভালো পশম ব্যবহার করবেন এবং পশম কেনবার সময় '৬-প্লাই অর্থাৎ 6-Ply Wool' কিন-বেন—বিশেষ করে উপরোক্ত ঐ হাতকাটা পুলওভারটি বানানোর জন্য। নিজের পছন্দমত শাদা কিম্বা অন্য যে কোনো রঙের পশম দিয়ে এ পুল-ওভার বুনতে পারেন। এ পুল-ওভার বোনবার জন্য ব্যবহার করবেন—ভালো এবং মজবুত ধরণের একজোড়া ৭ নম্বর বোনার কাঠি বা কাঁটা (Knitting Needle No. 7) এবং একটি গোল-ছাঁদের বাঁকা কাঠি। এই বাঁকা-কাঠিটিও হওয়া চাই—৭ নম্বরের।

এবারে বলি, উপরের ঐ নক্সার ছাঁদে হাতকাটা পুল-ওভার বোনার পদ্ধতির কথা। ধরুন, যে পুলওভারটি বানাতে হবে, সেটির মাপ হলো :—

ঝুল—২৩" ইঞ্চি। ছাতি—৪২" ইঞ্চি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি—বোঝাবার সুবিধার জন্য আমরা এই মাপের উল্লেখ করলুম। সুতরাং, এই হিসাবে নিজেদের প্রয়োজনমত পুল-ওভারের মাপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে ইচ্ছানু-যায়ী আপনারা সহজেই বোনবার কাজ করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। পত্রিকায় স্থানাভাবের কারণে, পশম বোনবার পদ্ধতি বোঝানোর সময় আমরা বাধ্য হয়ে বিশেষ একটি সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক পরিভাষা ব্যবহার করছি। অর্থাৎ, সোজা বোনবার ধরণটিকে বলবো—সোঃ; উল্টোকে—উঃ; সব সোজাকে—সঃ সোঃ; পুনরানুবৃত্তি অর্থাৎ Repeatকে—রিঃ; ঘর কমানোকে—ঘঃ কঃ, ইত্যাদি।

পশম আর বোনার কাঠি দুটি দিয়ে প্রথমে পিঠের অংশের কাজ সুরু করুন। গোড়াতেই ৭ নম্বর কাঠিতে ৯৬ টি ঘর বুনে তুলুন। তারপর তিন ইঞ্চি—১টা উঃ ছাঁদে বোনবার পর আসল প্যাটার্নটিকে আরম্ভ করবেন।

প্রথম লাইনঃ—২টি সোঃ, * ২টি উঃ, ৬টি সোঃ। এবারে * (চিহ্ন দেওয়া) থেকে অবশিষ্ট ঘরগুলি রিঃ করে যাবেন। তবে কোণের ঘর চারটি—২টি উঃ, ২টি সোঃ, ছাঁদে বুনতে হবে।

দ্বিতীয় লাইনঃ—আগাগোড়া সবটুকু উঃ বুনে যেতে হবে। এবারে এই দু'লাইন আরো দু'বার বুনে রিঃ করে নিন।

সপ্তম লাইনঃ—সব ঘরগুলিই উঃ বুনতে হবে।

অষ্টম লাইনঃ—লাইনটিকে আগাগোড়া সোঃ বুনতে হবে।

এইভাবে বোনবার পর দেখবেন, উপরের নক্সাটি এই আটটি লাইনে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এবারে এই আট লাইনের প্যাটার্নটিকে আগাগোড়া পুনরানুবৃত্তি অর্থাৎ রিঃ করে বুনে যেতে হবে। এমনিভাবে বোনার পর, যখন


DALDA

দেখবেন যে মোট ১৪" ইঞ্চি (অর্থাৎ আগেকার বোনা ৩" ইঞ্চি + এখনকার বোনা ১১" ইঞ্চি) বোনা হয়েছে, তখন সুরু করবেন 'হাতের ফাঁদ' (Sleeve-opening) !

এবার থেকে প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ও শেষে একটি করে ঘর কমিয়ে বুনে চলুন। এভাবে বুনে যখন কাঁটার ঘরের সংখ্যা ৬৬টিতে এসে দাঁড়াবে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত গোড়ার ও শেষের ঘর কমিয়ে প্রতি লাইন বুনে যেতে হবে। এ কাজের সময় খেয়াল রাখা দরকার—আগাগোড়া হিসাবমত এই ভাবে যেন ঐ আট লাইনের ঘর কমানো হয় এবং প্যাটার্নের হেরফের না ঘটে এতটুকু। এর পর, আর ঘর না কমিয়ে যথাপূর্ব্বনিয়মানুসারে বুনে যেতে হবে। এমনিভাবে বুনে গিয়ে যখন দেখবেন, যে জায়গা থেকে সর্ব্বপ্রথম ঘর কমানো সুরু করেছিলেন, সেখান থেকে সবশুদ্ধ ৯" ইঞ্চি (অর্থাৎ পুল-ওভারের ১১" ইঞ্চি অংশ) বোনা হয়েছে, তখন আবার ঘর কমাতে আরম্ভ করবেন—এ ঘর-কমানো প্রয়োজন, পুল-ওভারের কাঁধের অংশটুকু প্যাটার্ন অনুযায়ী বানানোর জন্য !

এ প্যাটার্নটি বুনতে হবে—প্রত্যেক লাইনের গোড়াতে ৫টি করে ঘঃ কঃ অর্থাৎ ঘর কমিয়ে। এভাবে বুনে, আট লাইনের প্যাটার্নটির রচনা-কার্য্য যখন চুকবে, তখন দেখবেন—কাঠিতে আরো ২৬টি ঘর বাকী রয়েছে। এবারে এই ২৬টি ঘরও পশম দিয়ে বুনে ফেলতে হবে। তবেই শেষ হবে পুলওভারের পিঠের অংশটুকু বোনার কাজ !

এবারে আরম্ভ করুন—পুল-ওভারের সামনের দিক বোনার কাজ। এদিকের কাজও হবে অবিকল ঐ পিঠের অংশ বোনার পদ্ধতিতে। এ দিকটিতেও পিঠের অংশের মতো ধরণেই 'হাতের ফাঁদ' রচনার জন্য ঘর-কমিয়ে বুনতে হবে। এভাবে বুনে যাবার পর যখন দেখবেন, কাঠিতে ৬৬টি ঘর বাকী রয়েছে, তখন আরো এক লাইন বুনে, আরম্ভ করবেন পুল-ওভারের 'গলার ফাঁদ' (Neck-opening) রচনার কাজ। এ কাজের জন্য—২৩টি ঘর প্যাটার্নের নিয়মমত বুনে যেতে হবে। তারপর ১৮টি ঘর ভরাট করে দিতে হবে। এবারে বাকী ২৪টি ঘর পুনরায় প্রথম লাইন বোনবার পদ্ধতি-অনুসারে বুনতে হবে। এ কাজের সময় দু'পাশের ২৪টি ঘরই এক নিয়মে বুনতে হবে। তবে প্রত্যেকটি লাইন বোনবার সময় গলার দিকে একটি করে ঘর কমিয়ে কাজ করতে হবে এবং এ নিয়মটি দু'দিকের জন্যই প্রযোজ্য—এ কথা বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার, না হলে বোনার হিসাবের গরমিল ঘটবে এবং পরিশ্রম পণ্ড হবে। এভাবে বোনার পর, কাঠিতে যখন ২০টি ঘর বাকী থাকবে, তখন আর ঘর না কমিয়ে, যথানিয়মে প্যাটার্ন বুনে চলবেন। এমনিভাবে কাজে এগিয়ে চলে যখন দেখবেন, পিঠের অংশের পুট-হাতার ঝুলের সঙ্গে সামনের অংশের ঝুল বরাবর সমান (অর্থাৎ এটিও মোট ২১" ইঞ্চি) হয়েছে, তখন জামার কাঁধটি বুনতে সুরু করবেন।

পুলওভারের কাঁধের অংশ বোনার সময়, প্রত্যেক লাইনের গোড়াতে হাতের দিকে ৫টি করে ঘর কমিয়ে কাজ করবেন। এভাবে সব ঘরগুলিই আগাগোড়া ভরাট করে বোনা যাবে।

এরপর পুল-ওভারের 'গলা' (Neck-Opening) রচনার কাজ। এবারে পুল-ওভারের দুটি দিক—অর্থাৎ সামনের ও পিছনের অংশ একত্রিত করে, জামার ভিতরের দিকে কাঁধ দুটি পারিপাটিভাবে সেলাই করে জুড়ে নিন। তারপর জামাটিকে সোজা করে নিয়ে, ৭ নম্বরের গোল-ছাঁদের বাঁকা কাঠিটি দিয়ে, গলা থেকে ১৬৬টি ঘর তুলে নিন। এবারে ১টা সোঃ, ১টা উঃ ছাঁদে সাত লাইন (অর্থাৎ সাতবার) বুনে যেতে হবে। তবে প্রতিবারই পিঠের অংশে দু'কাঁধের কাছে এবং সামনের অংশে গলার দু'পাশে একটি করে ঘর কমিয়ে যাবেন। এমনিভাবে সাতবার বুনে গিয়ে, তারপর ১টি সোঃ, ১টি উঃ বুনলেই সব ঘর ভরাট হয়ে যাবে।

পুলওভারের 'হাতের ফাঁদ' (Sleeve-opening) বানানোর জন্য, পূর্ব্বোক্ত ঐ ৭ নম্বর গোল-ছাঁদের বাঁকা কাঠিটি দিয়ে জামার হাতের ঘের থেকে ১৩০টি ঘর-তুলে নিতে হবে। এই ঘর-তোলার জন্য ছয়টি লাইন বুনে যেতে হবে—প্রত্যেকটি লাইনে থাকবে ১টি সোঃ, ১টি উঃ ছাঁদের ঘর-বোনা। তারপর ১টি সোঃ, ১টি উঃ বোনা দিয়েই ঘর ভরাট করে দিতে হবে।

এবারে পুল-ওভারটিকে অল্প-ভিজে কাপড়ের তলায় রেখে ভালোভাবে ইস্ত্রি করে নিয়ে, জামার দু'পাশের ও পিছনের অংশ দুটিকে পরিপাটিরূপে সেলাই করে নিন। তাহলেই তৈরী হয়ে গেল পশমের হাতকাটা পুল-ওভার।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দোকান বেশ জমেছিল অভয়ের।

হিসেবের কড়িতে কতখানি ব্যবসা জমে উঠল, সে হিসেব দেখবার অবসর রইল না। খরিদ্দার মেলাই। বেচা-কেনা চলল ভাল। দোকানের ভিড় সহজে কাটে না। লেনাদেনায় পয়সাটা অনবরত হাতে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে হয়। দ্রব্যগুণ বলে একটা কথা আছে। নতুন একটা ছন্দ যেন বেজে উঠল। মশগুল্ হ'য়ে রইল অভয়।

সুরীন একটি লেখা এনে টাঙিয়ে দিয়েছে দোকানে, 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।' অভয় বলল, হ্যাঁ সব দোকানেই ওগুলোন লটকানো থাকে দেখেছি। দোকান করতে গেলে ওগুলোন টাঙাতে হয়, না?

সুরীন বলল, আলবৎ! তা' নইলে পারবে কেন? যে সে এসে লুটে পুটে খাবে। অভয় কী বুঝল, কে জানে। সে বলে উঠল, আসুক না কেউ একবার লুটে-পুটে খেতে। দেখি একবার তার কেরামতি খানা।

সুরীনের মুখে তেমন তারিফ করার লক্ষণ দেখা গেল না।

মালীপাড়ার ভিতরে এতদিন কোনো দোকান ছিল না। সবাইকেই বড় রাস্তায় যেতে হত। না হয় তো বাজারে। এখন সকলেই আসে অভয়ের দোকানে। বড় রাস্তায় কিংবা বাজারে মেয়েদের যাতায়াতের অসুবিধে ছিল। বারোবাসরের মেয়েদের নয়—গৃহস্থদেরই। দৈনন্দিন জীবনধারণের টানে না গিয়ে উপায় ছিল না।

এখন পাড়ার মুখে একটি দোকান পেয়ে সব বেজায় খুশি। কেউ আসে নিমির বরের দোকানে। কেউ শৈলীর জামায়ের দোকানে।

সকালের প্রথম খদ্দেরদের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড়ই বেশি। নাকে পোঁটা, উসকো-খুসকো চুল, বগলে তেলের শিশিওয়ালাদের হাঁকে ডাকেই সকালবেলাটা জমে। তেল মশলার চেয়েও বাড়তি আধ পয়সার গুলি-লজেন্সের তাগাদাই বেশি। তার সঙ্গে রাংতা অথবা সাবানের ছবির কাউটাও কম নয়। এদের মধ্যে যারা দু' একজন চুপচাপ, বুঝতে হবে, তা'দের ধারে নিতে পাঠানো হয়েছে। ভাগ্য তাদের প্রসন্ন থাকে সেদিনই, যেদিন ভামিনী অথবা গিনি দোকানে না থাকে। তা হলে, এক কথায় সওদা মেলে। অভয় বলে, তোর মা'কে বলিস, পয়সাটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে। নইলে দোকান চলবে না।

কিন্তু তার অভিভাবক সুরীনকাকার নির্দেশ দেওয়া আছে ভামিনীকে, একলা অভয় সব পেরে ওঠে না। কে কোন্খান দিয়ে কোন্ জিনিষটা টেনে তুলে নেবে। তুমি না হয় গিনি, যখনই সময় পাবে, মাঝে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে।

ভামিনী খুড়ি সেটা প্রায় কড়ায় গণ্ডায় মেনে চলবার চেষ্টা করে। ছেলে কোলে নিয়ে হয় ভামিনী নিজে, না হয় গিনি প্রায় সদাজাগ্রত প্রহরীর মত দোকানে উপস্থিত থাকে। তখন আর এক কথায় নয়। অভয় দু'কথা বলে। ধমকায়, রোজ ধার চলবে না। এ কি দানছত্তর খুলে বসেছি? কত পাওনা হয়েছে জানিস? আরে বাবা! সাড়ে পনর আনা? আর তো দেওয়া যাবে না।

ভামিনী থাকলে বলে, তাই বা দিয়েছ কেন? এই যে সেদিনে শুনলুম ওর ছ' আনা বাকী, আর ধার দেবে না। এর মধ্যে সাড়ে পনর আনা হল কি করে?

অভয় মুখ বিকৃত করে বলে, এরা লোক বড় খারাপ দেখছি। দেব দেব করে দেয় না। যদি বড় রাস্তার দোকানে যেতে হত, তা হলে?

কিন্তু ততক্ষণে জিনিষ দেওয়া তার সুরু হয়ে যায়। বলে, আজ দিলুম, এই শেষ। এর পরে শোধ না হলে, আর পাই পয়সার কুটোগাছটিও পাবে না।

তখন আর অভয় কোনোদিকে ফিরে তাকায় না। আর একজনকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে। ভামিনী থাকলে বলে, তবেই তোমার দ্বারা ব্যবসা হয়েছে। এ ঝাড়কে তো চেন না। দুদিনে লাটে উঠিয়ে ছাড়বে।

অভয় বলে, ওঠালই হল আর কি। বাড়িতে গিয়ে হামলা করব না?

কিন্তু ভামিনী তাতে একটুও আশ্বস্ত হয় না। চোখে মুখে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। আর গিনি থাকলে সরাসরি রেগে ওঠে। বলে, সেই ধার দিলে অভয় দা?

চোখ পাকিয়ে তাকায় গিনি ধারের খদ্দেরের দিকে। বলে, তাকিয়ে দেখছিস কি রে মুখপোড়া? রোজ রোজ ধার নিতে আসতে লজ্জা করে না? যা ভাগ্।

ভাগে, কিন্তু জিনিষ নিয়ে। অভয় বলে, এবার দিলুম, আর দেব না, দেখে নিও।

গিনি বলে, আমি গিয়ে তোমার খুড়িকে বলে দেব।

অভয় ঘাবড়ে উঠে বলে, দোহাই গিনি, খুড়িকে আর বল না।

তখন গিনি টিপে টিপে হাসে।

এর পরেই আসে বড়রা। অভয়ের মতে, সব শাশুড়ি-ননদের দল। পাড়ার গেজেট এখন অভয়ের দোকানেই বসে। পাড়া এবং ঘরের সব সংবাদ এখন এখানেই পাওয়া যায়। গল্প বেশি ওরাই বলে, যাদের ধারে কাটতে হয়। কোন-খান দিয়ে, কী আলোচনার মধ্যে যে এক সময় ধার দেওয়া হয়ে যায়, অভয় নিজেই টের পায় না। ব্যাপারটা প্রায় একটা স্নায়ু যুদ্ধের মত। একজন ভাবে, কোনো-রকমেই ধার দেব না। আর একজন ভাবে, যেমন করে হোক, নিতেই হবে। নইলে চলবে না। রক্ষে এই যে, চোর কেউ নয়। অভয়ও পুলিশ নয়। এ একটা খেলা যেন।

শেষ বিচারে দেখা যায়, তারই জয়, যে বলেছে ছেলেটা আসবে এখুনি কারখানা ঠেঙিয়ে, বউটা ডাল ফুটিয়ে বসে আছে। এক ফোঁটা তেল নেই, একটি লঙ্কা মশলা নেই যে একটু ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে দেবে। আজকের দিন-টাও দাও জামাই।

অবশ্য, ভামিনী কিংবা গিনি থাকলে ঘরের অভাবের কথা কেউ বড় একটা তোলে না—জাদু জানে তারা, যারা ভামিনী আর গিনির কঠিন প্রহরী হৃদয়ও জয় ক'রে চলে যায়।

সন্ধ্যার দিকটা প্রায় নিরঙ্কুশ পুরুষদের আসর। অভয়ের প্রায়ই রাত্রিটা ছুটি থাকে। সে কোনোদিন যায় ইউনিয়ন অফিসে। কোনোদিন দোকানেই থেকে যায়। সুরীন থাকে দোকান বন্ধ পর্যন্ত। সেজন্যেই সন্ধ্যাবেলাটা ধারে বিক্রী একবারে বন্ধ।

সন্ধ্যাবেলা ছুটি মানেই গানের আসর। আর সেটা ইউনিয়ন অফিসেই। কিন্তু জেল থেকে ফেরার পর মাস তিনেকের মত সবাই যেন অভয়কে ভুলেছিল। দোকান খোলার পরেই গানের টানাটানি বাড়ল চারদিকে। খেয়াল নেই যে, টানাটানি ছিলই। তার নিজেরই সাড়া ছিল না। এখন তার নিজের বিশ্বাস, পেটের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। দানা যোগাবার জন্যে দোকানটি একটি অক্ষয় যন্ত্র হিসেবে পাওয়া গেছে। ভাবল, যন্ত্রটা একবার যখন চলেছে, ওটার আর মৃত্যু নেই। সে তার নিজের স্রোতে ভাসল।

শুধু নিজের আড্ডার নয়। ডাক এল তার দূর দূরান্ত থেকে। গঙ্গার এপারে ওপারে, কল কারখানার তল্লাটে তার গানের আসর প্রায় প্রত্যহ। সর্বত্রই কবি গান নয়। একক গানের আসরও বসে।

কোথাও কোথাও তার গান শ্লোগান হ'য়ে উঠল মজুরদের।

ওরে ভাই শোন্‌রে মজুরদল।
ঐক্যবদ্ধ হও, নয় তো যাবে রসাতল।

গানের চেয়েও এ ধরণের কলি, গানের মধ্যে, হাত তালি দিয়ে ছড়া হিসেবেই বেশি বলে অভয়। সমসাময়িক ঘটনা, বর্তমান অবস্থার উপরে সে গান বাঁধল। তার উর্দ্ধে নয়। সবাই গরম তেলেভাজার মত লুফে নিতে লাগল তাকে। খবরের কাগজকে কেন্দ্র করে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছড়া কেটে বেড়াতে লাগল সে। সরকারি কেলেঙ্কারির

:কানো সংবাদ পেলে তো কথাই নেই। যেদিন যেটা পায়, সেদিন সেইটিই তার গানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

তাতে একটি জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যায়। বিক্ষোভ সর্বত্র। ঘৃণা এবং বিদ্রূপ সকলের বুকে ও মনে। পৌরাণিক উপাখ্যানের চেয়ে সমসাময়িক বিষয়ে লোকে বেশি মেতে ওঠে। অভয়ের কথা ও গানে তাদের নিজস্ব অভিব্যক্তির রূপ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে যেখানে যায়, সেখানেই তার জয়।

এই প্রত্যহের পাঁচালীর মধ্যে, একটি বিষয় অভয় কখনো ভুলতে পারে না। যে আন্দোলনে সে জেলে গিয়েছিল, সেই আন্দোলনের ভিতরের দুর্বলতা তাকে ভাবায়। সে দুর্বলতা হল, মানুষের ভয়। ভয়, কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। ঐক্যবদ্ধ নয়, কারণ তাদের অনেক সংশয় অবিশ্বাস। সংশয় এবং অবিশ্বাসের কারণ, তারা ব্যর্থ হয়েছে অনেকবার।

কারণগুলি সব একটার সঙ্গে আর একটা জড়ানো। তাদের আলাদা করা যায় না। শেষ পর্যন্ত সব তর্কের ওপরে থাকে ঐক্য। একতা। তাই সব গানের শেষেই সেই পুরণো উপকথাটা তার উপসংহার। 'বুড়ো বাপ বলে, তোরা একত্র থাক্। এই ছাখ্, একটা লাঠি ভাঙে, কিন্তু চার লাঠি একত্র করলে ভাঙে না।' ভাষার চেয়ে ভাবের জোয়ার বেশি অভয়ের। কথা সুন্দর করার থেকে, বলাটা সারতে চায় আগে। বলে,

ও ভাই কথা শোনো
ছাড় দু' দু' মনো,
চেয়ে ছাখ না আপন বল
ভাই গোছা বেঁধে চল্।

সেই গত আন্দোলনের মত যেন একটা উচ্ছ্বাসের জোয়ার এল। বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সময়টা আর নিজের বলে রইলো না অভয়ের। অথচ সামনে কোনো আন্দোলনের প্রস্তুতি নেই। আপনি আপনি যেন একটি তরঙ্গ কোনো অদৃশ্য থেকে ফেনিলোচ্ছল হয়ে উঠতে লাগল।

অভয় নাচ আরম্ভ করল আসরে। অভিনয় করতে সুরু করল একলা একলা। যেন আপন রঙ্গে আত্মভোলা অভয়। যেন এ এক বিচিত্র আত্মসম্মোহন, কীর্তনের আসরের ভাবোল্লাসে মত্ততা।

সকালবেলার দিকে দোকানের কেনাবেচা সারে নম নম করে। কিন্তু ভাবখানা করে যেন, ব্যবসাকে সে একটু এদিক ওদিক হতে দেবে না। তবে, সুরীন কিংবা ভামিনী দোকানের কথা তুললেই সে আর দশটা কথার তালে তালে এড়িয়ে যায়। বলে, আরে দোকানের কথা কি বলছ খুড়ি। ও দোকানকে কত বড় ক'রে ফাঁদা, তুমি জান না।

কিন্তু শান্তি ছিল না অভয়ের মনে। যারা তার সবচেয়ে আপন, যারা তাকে একদিন দশজনের সামনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অনাথ গণেশবাবুরা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটি কথা শুনে অভয় থম্‌কে যায়। কারা নাকি বলছে, গুছিয়ে নিচ্ছে অভয়। চারদিকে কবি বলে নাম করেছে। জেলে গিয়ে দেশসেবক হয়েছে। বাজার যখন গরম, তখন সে বসেছে দোকান খুলে। ওসব চালাকি বুঝতে লোকের নাকি বেশিদিন লাগে না।

তাই নাকি? কে বলে ভাই—এ কথাগুলো?

কেন, অনাথই বলে। গণেশবাবু বলেন।

অথচ সামনে দাঁড়িয়ে কোনোদিন এ অভিযোগ কেউ করে না। বুকের মধ্যে রাগ ফুঁসতে থাকে। টনটনিয়ে ওঠে। গণেশবাবু নামটা সম্প্রতি একটা অশুভ ছায়ার মত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনাথ-খুড়ো? সে কেন এড়িয়ে চলে? সে কেমন ক'রে ওসব কথা বলে? আগের মত তেমন অন্তরঙ্গভাবে মেশে না অনাথ-খুড়ো। হাসে না। কিন্তু সামনাসামনি বকে-ঝকে গাল দিয়ে, কোনো অভিযোগও করে না।

এমনি কি এ সংসারটার নিয়ম? সোজা পথে কি সে কখনো চলে না? কেন? এত জটিল কুটিল সর্পিল কেন প্রতি পায়ে পায়ে।

তখন আর প্রত্যহের পাঁচালী গাইতে ভাল লাগে না। শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে ছড়া কেটে নাচতে ইচ্ছা করে না। অনৈক্য তার আপন ঘরে। অনাথখুড়োকে নিয়ে সেটি তার প্রাণেরই ঘর। ঐক্যের কথা সে কাকে বলবে?

তবু সে নীরব থাকতে পারে না। অবহেলা করতে

পারে না আর দশজনকে। নিজের জীবনের কথা ভাবলে মনে হয়, সময়ের প্রতীক্ষা করতে হবে। সময় তার চাকার ঘা'য়ে, একটা নিষ্ঠুর বেগে, এই বদ্ধ অবোধ দরজা ভাঙবে। সব জটিলতার নিরসন করবে।

এমনি সময় হঠাৎ এল কলকাতার চিঠি। পশ্চিম-বঙ্গের সকল মানুষ তার কবিগান শুনবে। আরো লোক আসবে দেশ-বিদেশ থেকে। সারা দেশ থেকে আসবে অনেক কবিয়াল। পশ্চিমবঙ্গ লোক-শিল্প সম্মেলন তাকে নিমন্ত্রণ করেছে। চিঠি এসেছে ইংরেজীতে।

চিঠিটি নিয়ে অভয় প্রথম গেল গণেশের কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করল, কী করা উচিত?

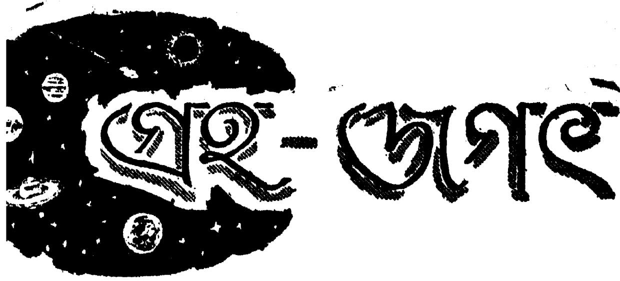
গণেশ গম্ভীর গলায় বলল, এতে আমাদের কোনো লাভ নেই। আপনি ইচ্ছে করলে যেতে পারেন। ভাল গাইলে আপনার নাম হবে, এ পর্যন্ত। তবে এসব হচ্ছে কলকাতার কিছু বড়লোকের ফ্যাসান, কোন লাভ নেই।

কিন্তু অভয় স্থির করল, সে যাবে।

ক্রমশঃ



শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার দত্ত (কাসুন্দিয়া, হাওড়া) কর্তৃক মাত্র আট ঘণ্টা সময়ে সম্পূর্ণরূপে টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত মহাত্মা রামমোহন রায়ের চিত্রের প্রতিলিপি ।



রাশিচক্র বিচারে অভিজ্ঞতার কথা

উপাধ্যায়

নৈসর্গিক পাপগ্রহ মঙ্গল শনি ও রাহু লগ্ন থেকে তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং একাদশ স্থানে শুভফলদাতা এবং নৈসর্গিক শুভগ্রহ বৃহস্পতি, শুক্র, শুক্লপক্ষের চন্দ্র এবং শুভসংযুক্ত বুধ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, পঞ্চম ও নবম স্থানে থাকলে আয়ু ও সৌভাগ্য প্রদান করে। দশমস্থানে রবি ও মঙ্গলের সহাবস্থানের বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশ প্রাচীন আচার্য্য বলেছেন—দশমে রবি বা মঙ্গল না থাকলে রাশিচক্র উত্তম হয় না। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যেন এই গ্রহরা ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশাধিপতি না হয়। তারা যেন লগ্ন চতুর্থ, পঞ্চম, নবম এবং দশম স্থানের অধিপতি হয়। কেন্দ্র চতুষ্টয়ের মধ্যে দশম স্থানই সর্ব্বোত্তম। দশমে গ্রহরা মাধ্যাহ্নিক ও শীর্ষস্থানে অবস্থিত থাকে। গ্রহরা উত্তম ভাবাধিপতি হয়ে দশমস্থানে অবস্থান করলে জাতকের বহু কল্যাণ করে, এমন কি শনি স্বক্ষেত্রে অথবা তুঙ্গস্থ হয়ে অথবা শুভভাবের অধিপতি হ'য়ে দশমস্থানে থাকলে উত্তম ফল দেয়। দশমে রাহু উত্তম। পাশ্চাত্যবাসী বা মুসলমানের দাক্ষিণ্যে কর্ম্মোন্নতি—কিন্তু এখানে অবস্থিতি পার্থিব কল্যাণের পক্ষে অনুকূল নয়। লগ্নের নবমে, দশমে অথবা একাদশে যদি রাহু থাকে আর সেই স্থানের অধিপতি সবল ও শুভভাবে থাকে, তাহোলে তার দশায় জাতকের উন্নতিও সৌভাগ্য বৃদ্ধি অবশ্যই হবে। বলবান বৃহস্পতি বা শুক্র লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে এবং দশমে যদি থাকে তাহোলে তারা জাতকের পক্ষে শুভপ্রদ হবে। অবশ্য লগ্নে বৃহস্পতি দিগ্বল হওয়ার দরুণ এরূপ অবস্থার আবশ্যক হয় না। লগ্ন ব্যতীত উপরোক্ত স্থানগুলি তার উচ্চস্থান বা স্বক্ষেত্র হওয়া আবশ্যক। অন্যথা শুভফলদাতা হয় না। কেন্দ্রাধিপতি হয়ে বৃহস্পতি পঞ্চম বা নবমে থাকলে কেন্দ্রাধিপত্য হেতু দোষযুক্ত বলে গণ্য হয় না, এই দুটী স্থানে উত্তম ফলপ্রদান করে। মিথুন লগ্নের পক্ষে সপ্তমাধিপতি ও দশমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থান কর্কটে তুঙ্গস্থ হয়ে দশমে পূর্ণ দৃষ্টি করেও বিশেষ শুভফল দেয় না, এটা অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে। মিথুন লগ্নের পঞ্চমে ও নবমে বৃহস্পতি শুভফল দান করে। লগ্নে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী কিন্তু চতুর্থে বা দশমে উত্তম ফলদাতা। লগ্নাধিপতির সঙ্গে এই সব স্থানে থাকলে খুব শুভ ফল দেয়। শুক্র লগ্নে ও চতুর্থে উত্তম ফল দেয়। চতুর্থে বিশেষ শুভ ফলদাতা—কেননা এখানে যে দিগ্বলী এবং দশম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়াতে সৌভাগ্য বর্দ্ধক হয়েছে। লগ্নাধিপতি, বৃহস্পতি অথবা শুক্র কেন্দ্রে থাকলে জাতক দীর্ঘজীবী, ধনী ও রাজানুগ্রহ লাভ করে। মেষ, কর্কট ও সিংহ লগ্ন জাতকের পক্ষে লগ্নাধিপতি এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে সহাবস্থান করলে উত্তম ফল দান করে। শনি ভীষণ নৈসর্গিক অশুভ গ্রহ এবং বৃহস্পতি অতীব নৈসর্গিক শুভ গ্রহ। শনি দারিদ্র্য ও দুঃখ দাতা। বৃহস্পতি ধনৈশ্বর্য্য, মানসিক শান্তি—আর সুখস্বাচ্ছন্দ্য দায়ক। সাধারণতঃ শনি ভীতিপ্রদ গ্রহ। শুক্র ধন, সাফল্য, বিলাসিতা ও সুখ দায়ক গ্রহ। কিন্তু তুলা লগ্নের শনি চতুর্থ ও পঞ্চমপতি, বৃষলগ্নের নবম ও দশমপতি, এজন্য অতীব শুভ রাজ-যোগকারক হয়েছে। অপর পক্ষে নৈসর্গিক শুভগ্রহ বৃহস্পতি বা শুক্র তৃতীয় ও ষষ্ঠাধিপতি বা তৃতীয় ও অষ্টমাধিপতি হোলে ধ্বংসকারক ও অশুভপ্রদ হয়। শনি তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে শুভ ফল দান করে কিন্তু ষষ্ঠস্থান দুঃস্থান হওয়ায় এখানে শনিকে বিশেষ ভালো করতে দেখা যায় না এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে জানা গেছে। তৃতীয় ও একাদশ স্থান উপচয় বলে শনি এই দুই জায়গায় উত্তম ফলদান করে বিশেষতঃ একাদশ স্থানে শনি অতীব শুভদায়ক। গ্রহরা শুভ বা অশুভই হোক্ একাদশ স্থানে শুভ ফল দান করে। যে কোন গ্রহ এমন কি অষ্টমাধিপতি পর্য্যন্ত তৃতীয়ে অবস্থান করলে ও শুভ ফল দাতা। যদি কোন ভাবাধিপতি দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে এবং একদেশে থাকে আর সেই স্থানের অধিপতি বলবান হয় তা হোলে ভাবের সমৃদ্ধিদান করে। উপচয়স্থ শনি দীর্ঘ জীবন দান করে। চতুর্থে মঙ্গল অশুভ ফল দেয়, কিন্তু দশমে উত্তম ফল দান করে। সপ্তমে শনি মন্দের ভালো, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে নয়, তবে উচ্চস্থ অথবা স্বক্ষেত্রগত হোলে অশুভ দাতা হয়। বৃহস্পতি কেন্দ্রে আর শনি উপচয়ে থাকলে জাতকের জীবনে দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব হয়।

মেষলগ্নের বৃহস্পতি শুভ হোলেও দ্বাদশাধিপতি অর্থাৎ দুঃস্থানাধিপতি হেতু দোষযুক্ত। বৃশ্চিক লগ্নের পক্ষে বৃহস্পতি দ্বিতীয়াধিপতি ও পঞ্চমপতি হওয়ায় দোষহীন এবং অতীব উত্তম। কোন ভাবে যদি ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশের অধিপতি থাকে তা হোলে সে ভাবের হানি হয়ে থাকে। যখন কোন ভাব বিচারে শুভ ও অশুভ দুরকম ফল সূচিত হয় তখন মনে করতে হবে যে জাতকের জীবনে একই সময়ে হোক্ অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়েই হোক সেই ভাব সম্বন্ধে ভাল ও মন্দ দুইই ফল অভিব্যক্ত হবে। ভাল ও মন্দ কাটাকাটি হয়ে গিয়ে মাঝামাঝি ফল দাঁড়াবে না। যে জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে ধনবত্তা ও দারিদ্র্য এ দুয়ের যোগই পাওয়া যায়, তার জীবনে এক সময়ে দারিদ্র্য ভোগ করতেই হবে।

কলি যুগে শনির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এজন্য জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে শনি দুর্ব্বল হোলে মানুষকে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ বর্ষে কলিযুগ আরম্ভ হয়। এটীকে লৌহযুগ বলে। কলিযুগ আরম্ভ সময়ে শনি মেষ০রাশিতে ছিল। এখানে শনি বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ এবং চন্দ্র এই সাতটী গ্রহের সম্মেলন হয়েছিল কলিযুগের প্রথম জন্ম দিনে। মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নের জাত ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে থাকে। পঞ্চমে রবি এবং একাদশে চন্দ্র থাকলে বন্ধন বা কারাগার যোগ হয়। লগ্ন বা চন্দ্র থেকে শুক্র দশমে থাকলে অথবা লগ্ন চন্দ্র বা রবি থেকে দশমস্থানের অধিপতি নবাংশে থাকে এবং শুক্র যে স্থানের অধিপতি হয় তা হোলে জাতক স্ত্রীর কাছ থেকে ধন সম্পত্তি লাভ করে।

লগ্নাধিপতি তৃতীয় বা ষষ্ঠস্থান থাক্‌লে জাতক সাহসী এবং সিংহতুল্য বিক্রমী হয়। তার অর্থের প্রাচুর্য্য ঘটে, সে ঐশ্বর্য্যশালী হয়। তার বহুগুণ প্রকাশ পায়, সকলে তাকে সম্মান করে। তার দ্বিভার্য্য যোগ। লগ্নাধিপতি অষ্টমে বা দ্বাদশে থাক্‌লে জাতক জুয়াড়ী, চৌর্য্যস্বভাব ও পরস্ত্রীসম্ভোগী হয়। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। চন্দ্র তৃতীয়স্থান অপেক্ষা চতুর্থস্থানে বলশালী ও উত্তম। অষ্টমে বৃহস্পতি থাক্‌লে জাতক শত্রুহীন ও দীর্ঘজীবী হয়। চন্দ্র ও রবি পরস্পর ক্ষেত্র বিনিময় করলে জাতক যক্ষ্মারোগী হয়। কর্কট কিম্বা সিংহে রবি চন্দ্র একত্র থাক্‌লে যক্ষ্মারোগ আক্রমণ করে। শনি এবং মঙ্গল উভয়ে কেন্দ্র কোণাধিপতি হয়ে সহাবস্থান করলে উত্তম ফল দান করে। একাদশাধিপতি অষ্টমে থাক্‌লে বন্ধুবিয়োগ, বন্ধুদের কাছ থেকে উপঢৌকন বা দান সূত্রে সম্পত্তি লাভ। অষ্টমাধিপতি অষ্টমস্থানে থাক্‌লে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যাধিপতি অষ্টমস্থানে থাকলে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অপরাধ জনিত দণ্ডাজ্ঞার দ্বারা নির্য্যাতন ভোগ। দীর্ঘ ভ্রমণের দ্বারা লাভ। একাদশাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি একত্রে থাক্‌লে অথবা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলে শুভ হয়। একাদশাধিপতি তৃতীয় স্থানে বা দ্বাদশস্থানে থাক্‌লে ও ফল শুভ প্রদ হয়। চরলগ্নের পক্ষে আয়স্থান বাধকস্থান। সুতরাং এর আয়াধিপতি দশা ও অন্তর্দ্দশা কালে অশুভ ফল দান করে। নবমাধিপতি পিতৃভাবাধিপতি এবং রবি পিতৃকারক গ্রহ এখানে রবি থাক্‌লে নবম স্থান দুর্ব্বল ও পীড়িত হয়। পরপর দুতিনটী পুত্রের রাহুর দশা উপস্থিত হোলে, পিতার মৃত্যু এই দশাতেই ঘটে। ধনাধিপতি দ্বাদশে এবং দ্বাদশাধিপতি দ্বিতীয়ে থাক্‌লে দারিদ্র্য যোগ হয়। কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করতে হোলে লগ্ন, পঞ্চম, নবম এবং দশম স্থানের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। নবমস্থানে থেকে চিত্তশুদ্ধি, মনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিচার করতে হয়। যে ভাব সম্বন্ধে বিচার করতে হবে সেই ভাব থেকে যদি তার ত্রিকোণে, দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, সপ্তমে ও দশমে শুভ-গ্রহ অথবা ভাবাধিপতি থাকে ও পাপদৃষ্ট না হয় তবে শুভ, অন্যথা অশুভ হয়। যে কোন ভাবাধিপতি লগ্ন থেকে অষ্টমে থাক্‌লে সে ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণীনক্ষত্রাশ্রিত জাতকের পক্ষে ফল নিকৃষ্ট। অশ্বিনী ও কৃত্তিকা জাতকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। এইরাশি জাতগণের পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ, কর্ম্মে সাফল্য, সুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান (বিশেষতঃ সন্তানসন্ততির জন্মগ্রহণ হেতু) সৌভাগ্য, মোটামুটি ভাবে নানাদিক থেকে আয়বৃদ্ধি, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ প্রভৃতি যেমন শুভঘটনার সংযোগ আছে, অপরপক্ষে কলহ বিবাদ, মন কষাকষি বা মনোমালিন্য, বন্ধুস্বজন বিরোধ, পদমর্য্যাদার ক্ষুন্নতা, অবমাননা, বিষাদ খিন্নতা, সর্ব্বপ্রকার নবোদ্যমে কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শত্রুতা, মামলায় পরাজয়, শত্রু কর্তৃক উৎপীড়ন প্রভৃতি অশুভ ফলের প্রাবল্য আছে। স্বাস্থ্যহানি হবে না কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতার ও অপনোদন হবে না। ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের চাপ বৃদ্ধি প্রভৃ ব্যক্তিদের অসাবধনতা তাদের বিপত্তির কারণ হোতে পারে, এজন্যে পূর্ব্বেই সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি আবশ্যক। পারিবারিক অস্বচ্ছন্দতা, বিশৃঙ্খলতা বা অশান্তি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাবে না। বাহিরে সামাজিক ক্ষেত্রেও কোন গোলযোগের আশঙ্কা নেই। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উৎসবাদি ও আমোদপ্রমোদের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক অবস্থা অনুকূল। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে হিসাব নিকাশ নিয়ে কলহ বা মনোমালিন্য যোগ আছে। এতদ্ব্যতীত আয়বৃদ্ধি ও নানা প্রকারে অর্থোপার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টায় সাফল্য, বন্ধুদের সাহায্য, আয়ের নূতন পথের বহিঃপ্রকাশ, আয়কর বিভাগের কর্তৃপক্ষের নেক নজর প্রভৃতি দেখা যায়। এমাসে সাহিত্য সংক্রান্ত অথবা অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ ও বিক্রয়ে বেশ লাভ হবে। বৈদেশিক পণ্য ব্যবসায়ে বা বৈদেশিকদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের যোগাযোগে লিপ্ত

ঋত্বিজদের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌বে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি প্রস্ত যোগ নেই, তবে লাভ খুব বেশী হবে না। রেসখেলায় লাভ হ'বে। বাড়ীওয়ালা কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী ব্যর্থযুক্ত। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কুপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই চাকুরীতে কোন প্রকার উন্নতি সূচিত হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটা শুভ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়, স্মৃতি শক্তির হ্রাস হেতু পরীক্ষায় সাফল্যের অভাব ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়। অবৈধ প্রণয়িনীদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক সামাজিক, ও প্রণয়ের ব্যাপারে নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বর্জ্জনীয়। পিকনিক, পার্টি, ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্যে না যাওয়াই ভালো। ব্যয়বৃদ্ধি, স্বামীর সঙ্গে মনান্তর, বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্ভব।

বৃষ রাশি

এমাসে গ্রহদের শুভ প্রভাব নেই বল্‌লেই চলে। কৃত্তিকাজাত গণের পক্ষে কষ্টভোগ তেমন হ'বেনা, রোহিণী জাতগণকে বহু কষ্ট ভোগ আছে। মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে মধ্যম। মানসিক অস্বচ্ছন্দতা দৈহিক কষ্ট ও পীড়া, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বজনবন্ধু বিরোধ, অপ্রীতিকর সংসর্গ, শত্রু কর্ত্তৃক পীড়ন, অপমান, নানাভাবে প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। জ্ঞান বৃদ্ধি, অধ্যয়নের দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ লাভ। স্বাস্থ্যের অবনতি। উদর ও গুহ্য পীড়া, প্রস্রাবের বেদনা ও মূত্রাশয়ে পীড়া, জ্বর, রক্তের চাপবৃদ্ধি, পিত্ত বায়ু প্রকোপ, ভ্রমণে বিপত্তি বা দুর্ঘটনা। স্বজন বিরোধের প্রাবল্য হেতু পারিবারিক অশান্তি চরমে উঠ্‌বে। গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি অশুভ ঘটবার যোগ আছে। আর্থিকোন্নতি আশা করা যায় না। অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টা সাফল্য পূর্ণ হবে না, শেষ পর্য্যন্ত অর্থক্ষতি হবে। প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতি হেতু ক্ষতি। নূতন লোকের সংস্পর্শে কোন প্রকার আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপারে আসা অনুচিত। স্পেকুলেশনে ভীষণ ক্ষতি, রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ। নানা ব্যাপারে চাকুরিজীবীর উপরওয়ালার কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে বিশেষ অশুভ বিপন্নতার সম্ভাবনা। কোন প্রকার দুর্নীতিমূলক কাজ করলে ধরা পড়ার যোগ আছে। সরকারী কর্ম্মচারীর ভাগ্যবিপর্য্যয় যোগ। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হোতে হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে ফল নৈরাশ্যজনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে অশুভ। অবৈধ প্রণয় বিরতি আবশ্যক। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করবে। যে সব মহিলা চাকুরিজীবী তাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ভোগ। কোন কোন ক্ষেত্রে উপরওয়ালার লাম্পট্য হেতু ভয়ের কারণ আছে। দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার বাইরে কোন প্রকার ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া অনুচিত। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে নানা দুর্ভোগ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট, পুনর্ব্বসুনক্ষত্রগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে ফল পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের মত। প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুজয়, সুখ ও মানসিক শান্তি লাভ, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে হস্তক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হবে, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, বিলাস ব্যসন, সম্মান বা খেতাব লাভ, বন্ধুমিলন, যশ প্রভৃতি শুভ ফল। ছোটখাটো ভ্রমণ যোগ আছে। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অধ্যাত্মপথের যাত্রীগণের সাধনায় সুবিধা ও উন্নতি লাভ। শারীরিক অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যের অবনতি। রক্তদুষ্টি, পিত্তপ্রকোপ, উত্তাপ, শ্লেষ্মা ও শ্বাসনালীর ঝিল্লিপ্রদাহ জনিত পীড়াদি সম্ভাবনা, এজন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া উদর ও গুহ্যদেশে নানাপ্রকার উপসর্গ, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি হোতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শান্তিও সুখস্বচ্ছন্দতা সত্বেও মধ্যে মধ্যে সামান্য কলহাদি ঘটতে পারে, অবশ্য তা উল্লেখযোগ্য হবে না। আর্থিক অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি। অতিরিক্ত ব্যয়, কিছু কিছু আর্থিক ক্ষতি বা লোকসান হোতে পারে চুরির জন্যে অথবা প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা বা গুপ্ত শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের জন্যে। এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। স্পেকুলেশনে কিছু লাভ আশা করা যায়। রেসখেলায় হার হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মাঝামাঝিভাবে যাবে। স্ত্রীলোকের আনুকূল্যে ভূমিলাভ বা স্থাবর সম্পত্তি লাভ, গৃহনির্ম্মাণ, গৃহসংস্কার প্রভৃতি সূচিত হয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ নয়, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি শুভ। আইন ব্যবসায়ীরা বিশেষ সুফল লাভ করবেন। ব্যবসায়ে যাঁরা অংশীদার হয়ে আছেন, তাঁরা উত্তম ফল লাভ করবেন। প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে কার্য্যকলাপ, আচার ও আচরণ প্রশংসার্হ হবে। মানসিক স্বচ্ছন্দতা, চিত্তের ঔদার্য্য, কথাবার্ত্তায় আনন্দ উপভোগ, সঙ্গীত, কলা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে অবসর বিনোদন ও তজ্জনিত মানসিক উৎকর্ষ লাভ হবে। নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তনের দিকে ঝোঁক। অল্পবিস্তর উদ্বেগ, হয়রাণ হওয়া ও কথাবার্ত্তায় অপরের বিরক্তি উৎপাদন করা প্রভৃতি সম্ভব। বেশী চিঠিপত্র লেখা বর্জ্জনীয়, পরিণাম ভেবে কাজ করা আবশ্যক। চাকুরির ক্ষেত্রে সহকর্ম্মী ও নিয়োগ কর্ত্তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা বর্জ্জনীয়। প্রতিবেশী, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয় স্বজন ও ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতার যোগ নেই। অবৈধ প্রণয়িনীদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক, প্রণয়ীর বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটি ভালো নয়।

কৰ্কট রাশি

পুষ্যাজাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে মধ্যম, পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মাসটি মিশ্রফলদাতা। শত্রুদের উৎপীড়নজনিত মনস্তাপ, উদ্বেগ, কলহ, ক্ষতিকর অসমসাহসিক কার্য্য, অসৎসঙ্গ, স্ত্রীলোকের প্রলোভনে অশুভ সংঘটন প্রভৃতি অপ্রত্যাশিত মন্দ ফলের আশঙ্কা আছে, শেষার্দ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুজয়, লাভ, সৌভাগ্যসুখ, জনপ্রিয়তা, খ্যাতি এবং মানসিক শান্তি লাভ। উত্তম স্বাস্থ্য এমাসে আদৌ আশা করা যায় না। নিজের ও সন্তানবর্গের শারীরিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, পিত্তপ্রকোপ, চক্ষুপীড়া, স্ত্রীর সহিত কলহ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং পারিবারিক অশান্তি। বাহিরে কুটুম্বাদির সহিত বিরোধ ঘটবে। আর্থিক অবস্থা শেষের দিকে ভালো হবে। নূতন রকমের ব্যাপারে ব্যয়, নগদ টাকার টান, এজন্যে সাময়িক ঋণ সম্ভব। চিকিৎসার জন্যে ব্যয়াধিক্য যোগ আছে। স্পেকুলেশনে অর্থ ক্ষতি, রেসখেলায় হার হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। নিয়োগ কর্ত্তা ও কর্ম্মীর মধ্যে অসদ্ভাব ঘটবে। কর্ম্মচারীর কাছে টাকা আদায়ের জন্যে ভার দেওয়া থাকলে বা তহবিল থাকলে তা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ হওয়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। হিসাবের গরমিল হেতু নিয়োগ কর্ত্তা ও কর্ম্মীর মধ্যে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধে উত্তম বলা যায় না, আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না, শেষার্দ্ধে পূর্ণ হবে। অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ বা প্রেমে পড়বার চেষ্টা, এমন কি বিবাহাদির কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করতে হবে। অন্যথায় অশুভ পরিণতির আশঙ্কা আছে। মাসের শেষার্দ্ধটি কর্ম্মমহিলাদের পক্ষে উত্তম, গৃহিণীরা নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবেন। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মাসটি মিশ্রফলদাতা। সংসারের জিনিষপত্র কেনা, স্বর্ণের অলঙ্কার লাভ প্রভৃতি শেষার্দ্ধে ঘটবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

সিংহ রাশি

মঘা ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম সময়। মাসের শেষ সপ্তাহ বিশেষ খারাপ। স্বজনবন্ধুগণের সহিত দ্বন্দ্ব কলহ, শত্রু পীড়া, দুঃখ কষ্টভোগ, ব্যর্থ উদ্যম, পদমর্য্যাদার হানি, অসম্মান, মামলা মোকর্দ্দমা, বন্ধুদের সংসর্গে তিক্তভাবোধ, প্রভৃতি অশুভ ঘটনার আশঙ্কা। উপরওয়ালা ও গুরুজনবর্গের অনুগ্রহলাভ, কর্ম্মে সাফল্য, শত্রুজয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, নূতন বিষয় অধ্যয়নে জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি সূচিত হয়। প্রথমার্দ্ধে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা অলৌকিক দর্শনের সুযোগ পাবেন। শারীরিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। গুরুতর পীড়া না হোলেও শরীর মোটেই ভালো যাবে না। রক্তস্রাব বা রক্তঘটিত পীড়া, সন্তানাদির নানাপ্রকার ব্যাধিজনিত উদ্বেগ ও ব্যয়। এমাসে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা আশানুরূপ হবে না, শেষার্দ্ধে কিছু লাভ হোতে পারে। ধনীর সংসর্গে সৌভাগ্য বৃদ্ধিলাভের সুযোগ, স্পেকুলেশনে কিছুলাভ হোলেও ক্ষতির ভাগ বেশী। রেস খেলায় প্রাপ্তিযোগ আছে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির পক্ষে মাসটী সন্তোষজনক। চাকুরিজীবীদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধে শুভ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভ নয়। উপরওয়ালার অনুগ্রহলাভ, পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম সময়। সৈন্য ও নৌবিভাগের সঙ্গে যে সব ব্যবসায়ীর যোগাযোগ আছে তাদের পক্ষে বিশেষ শুভ। মহিলাদের পক্ষে মিশ্র ফল। সামাজিকক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণের সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ ও সুখ সমৃদ্ধি। রেসে কিঞ্চিৎলাভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কন্যা রাশি

উত্তর ফল্গুনীজাত ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তম সময়। চিত্রার পক্ষে মধ্যম কিন্তু হস্তানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তম স্বাস্থ্য, সাফল্য, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজয়, উত্তম বন্ধুত্ব, বিশেষ সম্মান, লাভ, সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ। স্বজনবিয়োগ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মিথ্যা অপবাদ, স্বজনের বিরোধিতা, শত্রুদের উৎপীড়ন, নবপ্রচেষ্টায় অসাফল্য প্রভৃতি সূচিত হয়। মাসটী মিশ্রফলদাতা। স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন বা শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকলেও মারাত্মক ক্ষতি ঘটবে না। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় ভ্রমণ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পীড়াদিযোগ নেই। পারিবারিক শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দতা। পারিবারিক কারণে অল্পবিস্তর ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, এজন্যে ভ্রমণ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। আর্থিকক্ষেত্র উত্তম হবে। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁরা বৃত্তি অবলম্বন করেছেন তাঁদের সাফল্য অধিকতর ভাবে ঘটবে আর আয়বৃদ্ধিও হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের যাঁরা অংশীদার তাঁরা ও অনেকখানি লাভবান হবেন, তাঁদের যথোচিত গুণাবধারণ দেখা যায়। স্পেকুলেশনে বেশ লাভ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। ঝড়, বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক উপদ্রব হেতু কৃষিজীবীদের অল্প বিস্তর ক্ষতি হবে। চাকুরির ক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী অপেক্ষাকৃত ভালো। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। নানাপ্রকার অশান্তি, অসুবিধা, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ ভোগ করতে হবে। পুরুষের প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতা ও অসাধুতার জন্যে দারুণ মনোকষ্ট। কোনপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে, ধর্ম্ম মন্দিরে বা দাতব্য আশ্রমে যাতায়াত বা এসব সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া বিপজ্জনক হোতে পারে। প্রণয় ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা ভোগ। অবৈধ প্রণয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় লাভ হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

তুলা রাশি

স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম, চিত্রাজাতগণের পক্ষে অধম ফল। মাসটী মিশ্রফলদাতা। উদ্বেগ, আশঙ্কা, স্বজনবন্ধুবর্গের সঙ্গে কলহ, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, শত্রুপীড়ন ক্ষতি ও অপবাদ যোগ

আছে। প্রমোদজনক ভ্রমণ, শুভ সংবাদলাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি শুভফলের আশা করা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে শুভ ফলগুলি প্রকাশ পাবে। জীবনীশক্তি হ্রাস বা শারীরিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য পীড়া ঘটবে না। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে শরীর ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা। ক্লান্তিকর ভ্রমণ। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা, পরিবারের বাহিরে স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য।, সারা মাস ধরেই অর্থকৃচ্ছ তার জন্য দুশ্চিন্তা ও অসুবিধাভোগ। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোনপ্রকার নব প্রচেষ্টা ও স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে হার হবে গ্রন্থ প্রকাশে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশায় আর সাগরপারের কর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষতি হবে। ভ্রমণ, পিকনিক এবং স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে চুরির সম্ভাবনা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। পার্থিব পদার্থ, খনি, কৃষি, ইট-তৈয়ারী, আবাদীকার্য্য ও কোম্পানীর শেয়ারের কাজে বিশেষলাভ হবে। পিতামাতা, উত্তরাধিকার ও লগ্নী কারবার সূত্রে ও লাভের যোগ আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। কর্ম্মক্ষতি, অস্থায়ী পদচ্যুতি ও অসম্মান প্রভৃতি সম্ভব। উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী চলনসই। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। সকল বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নয়। স্নেহ ভালোবাসার ক্ষেত্রে আতিশয্য প্রকাশ বিপত্তির কারণ হোতে পারে। অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে আশাভঙ্গ মনস্তাপ সূচিত হয়। ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি, উনুন, ধারালো অস্ত্রাদি ব্যবহারে সতর্কতা প্রয়োজন। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধানক্ষত্রাশ্রিতজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠাজাতগণের পক্ষে মধ্যম আর বিশাখা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। বিলাস ব্যসনদ্রব্যাদি প্রাপ্তি, অর্থ, সম্মান, শত্রুজয়, প্রভাবপত্তির বৃদ্ধি, আমোদজনক ভ্রমণ, নূতন পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভ ফলের সম্ভাবনা। মর্য্যাদাহানি, স্বাস্থ্যহানি, নবপ্রচেষ্টায় বাধা, বিলম্ব ক্লান্তিকর ভ্রমণ, উদ্বিগ্নতা, অর্থক্ষতি, স্বজন ও বন্ধুবিরোধ, মতলববাজ ব্যক্তির পরামর্শে কষ্টভোগ, অহেতুক অপবাদ প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃৎশূল, উদরের গণ্ডগোল, চক্ষু পীড়া, জ্বর, আঘাতজনিত দুর্ঘটনা, রক্তের হ্রাস, এমন কি রক্তদুষ্টির সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ, শান্তি সুখ ও স্বচ্ছন্দতাপূর্ণ। আর্থিকক্ষেত্রও শুভজনক। নানাভাবে অর্থাগম। অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় লাভ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী ভালো যাবে। গৃহ সম্পত্তি, ক্রয় বিক্রয়ের দালালরা বিশেষ লাভবান হবে। এমাসে সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভের আশা আছে। চাকুরির ক্ষেত্র একভাবেই যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি উল্লেখযোগ্য নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। বহিঃক্ষেত্রে বিশেষ সংযত হয়ে চলা আবশ্যক। পুরুষের সংস্রবে সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ও মনোমালিন্যযোগ আছে। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কোনপ্রকার সংস্রবে আসা অনুচিত, তাতে বিপত্তির কারণ আছে।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। দুঃখ কষ্টভোগ, উদ্বেগ ও অশান্তি, স্বাস্থ্যহানি, বন্ধুবর্গের সহিত কলহ, ক্ষতি, কর্ম্মোদ্যমে বাধা প্রাপ্তি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা কষ্টভোগ, মতলব-বাজ ব্যক্তিদের পরামর্শের ফলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতি, ব্যয়বৃদ্ধি, স্বজনবিয়োগ প্রভৃতির সম্ভাবনা। কিছু লাভ ও সুখ স্বচ্ছন্দতার যোগ আছে। নানাভাবে শারীরিক অবনতির কারণ ঘট্‌বে। সাধারণতঃ জ্বর, রক্তের চাপবৃদ্ধি, হৃৎকষ্ট, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, শ্বাসযন্ত্রের ব্যাঘাত, চক্ষু পীড়া, উদরঘটিত পীড়াদি যোগ। পারিবারিক অশান্তি ও স্বজনবিরোধ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। ভ্রমণের সময় চুরি, প্রতারণা বা মতলববাজ লোকদের চতুরতার জন্য ক্ষতি। কোনপ্রকার টাকার লেন দেন ব্যাপার অগ্রসর না হওয়াই ভালো। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে হার হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। টাকা লেন দেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। চাকুরির ক্ষেত্রে কোন প্রকার উন্নতির যোগ দেখা যায় না, বরং শত্রুবৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে বাধা, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, পৌনঃপুনিক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। ভিতরে চাপা উত্তেজনা বহন করতে হবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার সুবিধার যোগ নেই। অবৈধ প্রণয়ে শোচনীয় পরিণতি। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, শ্রবণাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসের প্রথমার্দ্ধটি বিশেষ শুভ। সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভ, সুখ, লাভ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, বিত্তোপার্জ্জনে সাফল্য লাভ, দান গ্রহণ, উপঢৌকন ও উপহার প্রাপ্তি, উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রু জয়, মামলা মোকর্দ্দমার আকস্মিক নিষ্পত্তি। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, তবে সর্দ্দি জ্বর মধ্যে একটু হোতে পারে। ভ্রমণে কিছু অসুবিধাভোগ। মাসটীতে সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধি। পিক্‌নিক, শিকার প্রভৃতি বিষয়ে আনন্দলাভ। আর্থিক স্বচ্ছলতা। কিন্তু ব্যয়াধিক্যযোগ আছে। স্পেকুলেশনে লাভ হবে না, রেসে ক্ষতিযোগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। ক্রয়, লগ্নী, কোম্পানীর শেয়ার, খনি ও কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ। নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপনার যোগ আছে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে

কিছু গোলোযোগ ঘটতে পারে, এজন্তে মামলা-মোকর্দ্দমা করা যুক্তিযুক্ত নয়। চাকুরীজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম, পদোন্নতিযোগ আছে, শত্রুও প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরাজিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী অতীব উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি,উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি লাভ যোগ। ভ্রমণ, পিক্‌নিক, প্রভৃতিতে আনন্দ লাভ। অবিবাহিতাগণের বিবাহের কথাবার্ত্তা, বিবাহিতার সন্তান লাভ। মহিলা শিল্পীদের পক্ষে উত্তম সময়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র অতীব শুভ, অবৈধ প্রণয়ে ও বিশেষ সাফল্য, সম্ভোগ, এবং সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ ও সুবিধা লাভ হবে। বিদ্যার্থীর পক্ষে বিশেষ শুভ।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম সময়, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শতভিষা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন ফল লাভ। মঙ্গল একমাত্র অশুভ। অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা। সাফল্য, সমাজের উচ্চপদমর্য্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের বন্ধুতা ও অনুগ্রহ লাভ, বিলাস ব্যসনে প্রীতি, লাভ, শত্রুজয়, সুখ সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জনে সাফল্য, সম্মান ও সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ। পঞ্চমে মঙ্গলের অবস্থান হেতু শত্রুও প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যে কষ্টভোগ, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত কলহ, চুরির জন্য ক্ষতি এবং কিছু মানসিক দুর্ভোগ। নিজের সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ হোলেও সন্তানদের পীড়াদি যোগ আছে, বিশেষতঃ মারীপীড়াদি ও হোতে পারে। এছাড়া আর কোনপ্রকার দুশ্চিন্তা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রের বহির্ভাগে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত সামান্য বিষয় নিয়ে কলহ ও মনান্তর। অর্থলাভের প্রাচুর্য্য। স্পেকুলেশনে অসাফল্য। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় আশাতীত সুযোগ-সুবিধা। আকস্মিক ভাবে সৌভাগ্যোদয় যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটি উত্তম। গৃহনির্ম্মাণ বা কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে নব নব পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্যযুক্ত হবে। চাকুরি জীবীদের পক্ষে উত্তম সময়। নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, সম্মান ও পদোন্নতির পথ পরিষ্কার হবে, এই মাসে বহু চাকুরিজীবীর পক্ষে এই ফলগুলি ঘটতে পারে। যারা অস্থায়ী পদে নিযুক্ত, তারা স্থায়ী পদ লাভ করবে। বেকার ব্যক্তিদের কর্ম্মপ্রাপ্তি যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। চাকুরিজীবী মহিলারা উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ করবে, পদোন্নতি ও সম্মানবৃদ্ধি ঘটবে। অধ্যাত্মসাধনায় রত মহিলারা বিশেষ উন্নতি লাভ করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের আধিপত্য বিস্তৃতি। অবৈধ প্রণয়েও অপ্রত্যাশিতভাবে সাফল্য। অভিনেত্রীদের প্রশংসা অর্জ্জন। ভ্রমণে লাভ, পিকনিক, পার্টি, কোর্টসিপ প্রভৃতিতে আনন্দলাভ। লেখিকাদের খ্যাতি ও পসার বৃদ্ধি, বিদ্যার্থীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে সময়টী উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসের প্রথমে কিছু বাধাবিপত্তি থাকলেও ক্রমে ক্রমে সেগুলি অপসারিত হয়ে শুভ ফলদাতা হবে। স্বজনবর্গের দ্বারা কষ্টভোগ, মতলববাজ ব্যক্তিদের প্রলোভনে পড়ে নানা দুর্ভোগ, বন্ধুদের প্রতারণা, কর্ম্মোদ্যমে বাধা, এজন্তে বিষণ্ণতা, মর্য্যাদাহানি, অপ্রিয় পরিবর্ত্তন। বন্ধু ও অর্থলাভ, বিলাসিতা, সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি। উদরাময়, আমাশয়, প্রভৃতির জন্য কষ্টভোগ। পারিবারিক ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মতভেদ হেতু অশান্তিভোগ। নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ। আর্থিক ক্ষেত্রে লাভ লোকসান দুই-ই ঘটবে। টাকা লেন দেন ব্যাপারে ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় হার। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ নয়। মেসের শেষার্দ্ধে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ ও আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা—জনপ্রিয়তালাভ। সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন ও সুনাম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ও নৃত্য চর্চ্চায় সাফল্য লাভ। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। সাহিত্যে ও কাব্য সাধনায় রত মহিলারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে। পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। অবৈধ প্রণয়িণীরা আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করবে আর মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ও অর্থলাভ করবে। কোর্টসিপে প্রীতিলাভ। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা যারা আকাঙ্ক্ষা করে তাদের পক্ষে মাসটি বিশেষ অনুকূল। কর্ম্মক্ষেত্রে মহিলা কর্ম্মীদের উন্নতিযোগ। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক কষ্ট। আয় বৃদ্ধি। স্ত্রী লাভ। ভগ্নীর শারীরিক অসুস্থতা বা পীড়া। সম্বন্ধ লাভ। সন্তানের পীড়া। স্বজন বিরোধ। কলহ বিবাদ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি। ব্যয়াধিক্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

বৃষলগ্ন

দেহভাব শুভ, ধন হানি, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা, অপবাদ, ব্যয়বৃদ্ধি, আশাভঙ্গ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা অশান্তি ও উদ্বেগ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়।

মিথুনলগ্ন

দৈহিক ও মানসিক কষ্ট, কর্ম্ম লাভ বা পদোন্নতি, গৃহাদি নির্মাণ বা সংস্কার, আয় বৃদ্ধি, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ, স্ত্রীলোকের পক্ষে আর্থিক অস্বচ্ছন্দতা, স্বামীর পীড়া ও প্রণয় ভঙ্গ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

কর্কটলগ্ন

দেহভাব শুভ, মানসিক নিগ্রহভোগ, অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য, আর্থিকোন্নতি, সন্তানের পীড়া, গৃহ সংস্কার, কর্ম্মস্থলে শত্রু বৃদ্ধি, বাধা ও অপবাদ প্রাপ্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। উদ্বিগ্নতা, আশাভঙ্গ ও শত্রুবৃদ্ধি, মিত্রাদির সাহায্যে অর্থলাভের আশা। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির জন্য অর্থব্যয়, সন্তানাদির সম্বন্ধে কিছু শুভ ফলের আশা করা যায়, সৌভাগ্যোদয়ে বাধা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণ শুভ বলা যায় না, কিছু বাধাবিঘ্ন যোগ আছে।

কন্যালগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ব্যয় বৃদ্ধি, গৃহ ও সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা, এজন্য চিত্তের উদ্বেগ, শত্রুহানি, স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, সন্তানভাব শুভ, কর্ম্ম ক্ষেত্রে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট ফলদাতা। বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলালগ্ন

দেহভাব শুভ, ধনাগম যোগ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, আঘাত প্রাপ্তি, সন্তান পীড়া, বিদ্যাস্থানে বিঘ্ন, শত্রু বৃদ্ধি, সুখভাব উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না।

বৃশ্চিকলগ্ন

দেহভাব শুভ নয়, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, আয় বৃদ্ধি, কর্ম্মভাব শুভ, পত্নীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকাশয়ের দোষ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

ধনুলগ্ন

শারীরিক সুখহানি না হোলেও মধ্যে মধ্যে অস্বচ্ছন্দতা ও হজমের দোষ হেতু দেহাভ্যন্তরে নানাবিধ উপসর্গ, আর্থিক অবস্থা শুভ, সহোদরাদির পীড়া, ব্যয় বৃদ্ধি, যশঃ সৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ ফল, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

মকরলগ্ন

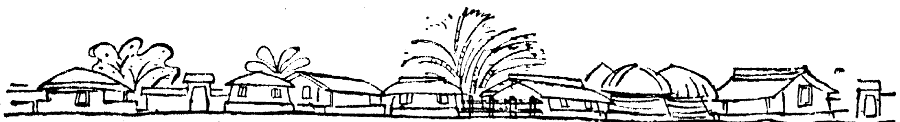
দেহভাব অশুভ না হোলেও মধ্যে মধ্যে সামান্য পীড়াদি সূচিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিরোধ, মুখে কোন পীড়া, পত্নীর পীড়াদি, বিদেশ গমন, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যম।

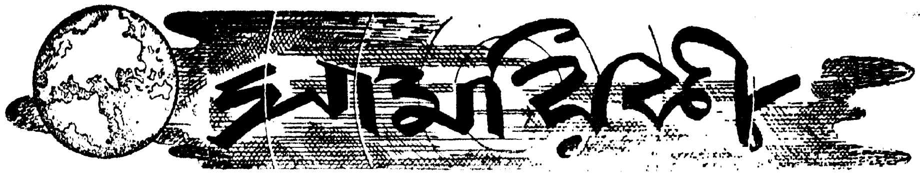
কুম্ভলগ্ন

উদ্বিগ্নচিত্ত, বায়ু প্রকোপ, শারীরিক কৃশতা, ধর্মভাব, শত্রুবৃদ্ধি, জ্ঞাতি বিরোধ, সন্তানের পীড়া, সন্তবতঃ সন্তানহানি, পুত্রকন্যা, স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধব হোতে অশান্তি, চাকুরির স্থান শুভ, স্ত্রীর কুবুদ্ধি ও উন্মত্তবৎ অবস্থা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি উত্তম নয়, বুদ্ধিভ্রংশতার জন্য নানা প্রকার দুঃখ কষ্টভোগ, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

মীনলগ্ন

নেত্র পীড়া, গৃহাদি ও যানবাহনাদি হোতে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা, শারীরিক ক্লেশ, বন্ধু বান্ধবের দ্বারা ক্ষতি, ম্লেচ্ছ সাহচর্য্যে অর্থলাভ, ব্যয় বৃদ্ধি, অর্থ কৃচ্ছ্রতা, প্রণয়ভঙ্গ, কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা, সন্তানাদির পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মধ্যম, বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ বলা যায়না।





ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার সুবোধ মিত্র নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই পরীক্ষা-কেন্দ্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহা বন্ধ করার উপায় নির্ণয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। সে জন্য গত ২রা নভেম্বর বুধবার তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে কলিকাতা ও সহরতলীর কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের সহিত এক সভায় মিলিত হইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমণীমোহন রায়, মুরলীধর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। কলেজের বাহিরে একদল লোক ছাত্রদিগকে পরীক্ষায় পাশ করার সহজ উপায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করায় ছাত্রগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে না —তাহার ফলে পরীক্ষা-কেন্দ্রে যাইয়া তাহারা হতাশ হইয়া যায় ও উচ্ছৃঙ্খলতা করা ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় থাকে না। ঐ সভায় কলেজগুলির অন্যান্য সমস্যার কথাও আলোচিত হইয়াছিল এবং নূতন উপাধ্যক্ষ ডাক্তার মিত্র সমস্যা সমাধানে কলেজের অধ্যক্ষদের সর্বপ্রকারে সাহায্য-দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ডাক্তার মিত্রের চেষ্টায় কলেজ-শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

যন্ত্র শিল্প, না কুটীর-শিল্প ?—

গত ২০শে নভেম্বর বর্দ্ধমান জেলায় জেলা-সহর হইতে ১২ মাইল দূরে কলানবগ্রাম শিক্ষানিকেতনে শিল্প-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিতর্ক শুনা গিয়াছে—বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প, না ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটীর-শিল্প—কোন পদ্ধতি এ দেশের কাম্য। শিক্ষা-নিকেতনের কর্ম্ম-সচিব প্রবীণশিক্ষাব্রতী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন—তিনি আজীবন মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত ও শিষ্য এবং গান্ধীজি যন্ত্র-শিল্প অপেক্ষা যে কুটীর শিল্প অধিক পছন্দ করিতেন, তাহা বলাই বিজয়বাবুর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ভাষণের সময় তাঁহার পাশে ২জন গান্ধীভক্ত শিক্ষা-ব্রতী উপস্থিত ছিলেন—শ্রীঅনাথনাথ বসু ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক ও গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবীর ঐ সভাতেই বিজয়বাবুর কথার প্রতিবাদ করিয়া দেশে অধিক সংখ্যায় বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত করেন। একই সভায় উভয়বিধ অভিমত ব্যক্ত হওয়ায় উপস্থিত জনগণ ক্ষুব্ধ হন। আমাদের দেশে সর্বত্র এই সমস্যার আলোচনা দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও তাঁহা-দিগকে নিজস্ব মতামত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীমতী বাণী রায়—

খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় ১৯৬০ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার "নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ" গ্রন্থখানি এ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি "লীলা-পুরস্কার" ও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খ্যাতিমান বীমা পরিচালক শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়ের কন্যা।

শ্রীঅশোককুমার সরকার—

আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ'এর সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার ৬ সপ্তাহ কাল পশ্চিম জার্মাণী ও ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া গত ২১শে নভেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহযাত্রী হিন্দুস্থান-ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বার্তা-সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও ঐ সঙ্গে ফিরিয়াছেন। নন্দাঘুন্টি অভিযাত্রী দলকে আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সাহায্যদান করিয়া অশোককুমার বর্তমান যুগে এক

অভিনব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই অভিযাত্রী দলের সহিত মিলিত হইয়া ভাব-বিনিময় করিয়াছেন।

কলিকাতায় কুমারী অনীতা বসু—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা বসু ১৮ বৎসর বয়সে গত ১১ই ডিসেম্বর বিকালে একাকী তাঁহার পিতৃভূমি দর্শনের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে অবস্থানকালে তাঁহার মাতাকে (জার্মান



কুমারী অনীতা বসু

মহিলা) বিবাহ করিয়াছিলেন—তাহার পর সুভাষচন্দ্র জাপান চলিয়া যান—কন্যা বা স্ত্রীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ভিয়েনায় যাইয়া অনীতা ও তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। অনীতা কলিকাতায় আসিয়া শরৎচন্দ্রের গৃহে (১নং উডবার্ণ পার্ক) বাস করিতেছেন—তিনি তিনমাসকাল ভারতে থাকিয়া সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দর্শন করিবেন। তিনি দিল্লীতে যাইয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর অতিথি হইয়াছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তিনি ভিয়েনায় স্কুলের পড়া শেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার মা একাকী ভিয়েনায় বাস করিতেছেন—তিনি কাজ করিয়া নিজের জীবিকার্জন করেন এবং কন্যাকেও প্রতিপালন করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বসু, ডাক্তার শিশির বসু, ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ললিতা বসু, সুভাষচন্দ্রের মাতুল শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি দমদম বিমানঘাটিতে যাইয়া অনীতাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিয়াছেন। অনীতা প্রথমে তাঁহার পিতার পৈতৃক বাসভূমি নেতাজী ভবনে যাইয়া পরে শরৎচন্দ্রের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দমদমে ও কলিকাতার পথে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। আমরা সুভাষচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী অনীতাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি এবং কামনা করি, তিনি ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করুন। তাঁহাকে শাড়ী পরিয়া বিমান হইতে নামিতে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইয়াছেন এবং ভারতে আসিয়া তিনি ভারতীয়ের মতই প্রণাম, নমস্কারাদি করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। নেতাজী-পরিবারে বাস করিয়া তিনি অবশ্যই সেই পরিবারের ঐতিহ্য গ্রহণ ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবেন।

গঙ্গাসাগর তীর্থে নূতন আশ্রম—

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ পশ্চিমবঙ্গে একটি সর্বভারতীয় তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়া সারা ভারতের অধিবাসীদের কাছে পশ্চিম বাংলার সম্মান বর্দ্ধিত করার জন্য গঙ্গাসাগর তীর্থে একটি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে স্বর্গত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তিনি জানাইয়া দেন, গঙ্গাসাগর তীর্থ শুধু পৌষ সংক্রান্তির দিন পুণ্যতীর্থ নহে, তথায় ১২ মাস পূজাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। সীতারামদাস গঙ্গাসাগর দ্বীপে এক খণ্ড জমি নির্বাচন করিয়া আপাততঃ ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় আশ্রম

নির্মাণ করাইতেছেন। এঞ্জিনিয়ার শ্রীশুভ্রাংশু মজুমদার, সীতারামদাস-সেবক কিঙ্কর দেবানন্দ, ডাক্তার রাসগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সীতারামদাসের অভিপ্রায় মত একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সীতারামদাস তথায় গমন করিয়া ২ মাস কাল সেখানে বাস করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর স্থায়ী তীর্থে পরিণত হইলে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

উত্তরপ্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্বামী সম্পূর্ণানন্দ কিছুদিন যাবৎ ঠিক ভাবে মন্ত্রিসভা পরিচালন করিতে না পারায় সম্প্রতি শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ও ক্রমে বিধান সভার সদস্যগণের অধিক ভোট পাইয়া কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। ফলে সম্পূর্ণানন্দ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং গত ৭ই ডিসেম্বর রাজ্যপাল শ্রীরামকৃষ্ণ রাও-এর আহ্বানে শ্রীগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হইয়া উত্তর প্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানীকে অন্যতম মন্ত্রিপদে গ্রহণ করিয়াছেন। আপাতত শ্রীগুপ্ত ছাড়া ৩ জন মন্ত্রী, ৫জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ৪ জন উপমন্ত্রী ঐ দিন শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দলের মধ্যে বিবাদ বহুদিন ধরিয়া চলিতেছিল—শ্রীজহরলাল নেহরু, শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতির চেষ্টায় এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমতী কৃপালনী কয়েকদিন পরে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন। বর্তমানে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদকরূপে দিল্লীতে কাজ করিতেছেন।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ২৮শে নভেম্বর বর্দ্ধমান সহরে গোলাপবাগে নবপ্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইংরাজি, বাংলা, ইতিহাস, গণিত, অর্থনীতি ও সংস্কৃত—আপাতত এই ৬টি বিষয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস ও হাইকোর্টের জজ) অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি নূতন ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণকে নূতন প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিতে আবেদন জানান। ঐ দিন ছাত্রদের জন্য একটি এবং ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ছাত্রাবাস গৃহেরও উদ্বোধন করা হইয়াছে। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইল—(১) কলিকাতা (২) যাদবপুর (৩) বিশ্বভারতী—শান্তিনিকেতন (৪) বর্দ্ধমান ও (৫) কল্যাণী।

পরলোকে ডাঃ ডি, এম, গুপ্ত—

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ধ্রুবমোহন গুপ্ত এম-ডি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে পাটনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত, এম-এ। ১৯৩১ সালে ডাঃ গুপ্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্ররূপে যোগদান করেন এবং তাঁর কলেজ জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। তিনি বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং বাংলা সরকারের বৃত্তিলাভ করেন। ফাইনাল এম-বি



পরলোকে ডাঃ ডি, এম, গুপ্ত

পরীক্ষায় মেডিসিনে "অনার্স" সহ তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি রিসার্চ আরম্ভ করেন এবং প্রথমে পেটের পীড়া সম্বন্ধে রিসার্চ করেন। ১৯৪২ সালের দুর্বিপাকের সময় তিনি দরিদ্র রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে দেশের ও দশের প্রভূত উপকার সাধন করেন। এরপর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন এবং Pathology-র কিউরেটর নিযুক্ত হন। চিকিৎসক ও কার্ডিওলজিষ্ট রূপে জাতির সেবায় তাঁর দান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক রূপে যোগদান করিবেন এমন সময় মৃত্যু এসে এই কৃতী সন্তানকে দেশের বুক থেকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। আমরা ডাঃ গুপ্তর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।



এখানে ওখানে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একটু বাদেই অনুরাধা নীচে নেমে এলেন। তিনি নিজেই তাঁর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তিকাটি নিয়ে এসেছেন। হাত বাড়িয়ে বইটি উৎপলের হাতে তিনি তুলে দিয়ে বললেন, 'এই নিন। এতে বোধ হয় আপনার মোটামুটি কাজ চলে যাবে। মানে একটা কাঠামো আপনি পাবেন। বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলিও এতে আছে। তবু আমি যা চাই এর মধ্যে তার কিছুই নেই। এ নিতান্তই একটি কাঠামো। একটি কঙ্কাল। এর ওপর আপনাকে রক্ত-মাংসের প্রলেপ দিতে হবে।'

উৎপল স্মিত মুখে চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল—কত সহজে অনুরাধা তাঁর স্বামীর প্রসঙ্গে কঙ্কাল আর রক্ত-মাংসের কথা তুলতে পারলেন। স্বামীর জন্যে শোকের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু নানাভাবে স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান। শুধু চোখের জলে হাহাকারে বেদনার আর্ততায় যদি তাঁর শোক শেষ হয়ে যেত তাহলে উৎপলের আর এখানে আসবার প্রয়োজন হতনা। সাধারণ স্বল্পবিত্ত মানুষের তাই হয়। বড়জোর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান পর্যন্ত শোকের ধারাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। জীবন তারপর মৃত্যু আর মৃত্যুশোককে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। এইই নিয়ম। ভুলে যাওয়াই নিয়ম। অতীতকে না ভুলে গেলে ভবিষ্যতের দিকে এগোন যায় না। স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করে অনুরাধা কি ভুলতে চাইছেন, না এগোতে চাইছেন ?

উৎপল পুস্তিকাটি একটু উল্টে পাল্টে দেখে বলল, 'এটি কি আমি নিয়ে যেতে পারি ?'

অনুরাধা একটু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আপনার আরো যে সব বই পত্র দরকার হয় আপনি নেবেন বই কি। শুধু কাজ হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিলেই হল।'

উৎপল বলল, 'তা দেব। যদি না দিই আপনি লোকলস্কর পাঠিয়ে আপনার সম্পত্তি উদ্ধার করে আনতে পারবেন।' অনুরাধা বললেন, 'কিন্তু আপনার বন্ধুত্ব তো আর উদ্ধার করা যাবে না। তা চিরকালের মতই যাবে।'

বন্ধুত্বের কথায় উৎপল একটু বিস্মিত হল, খুসিও হল। এতক্ষণ সে যেন ছিল বেতনভুক কর্মচারী। মিসেস রায়ের চোখে এর চেয়ে বড় মর্যাদা যেন তার ছিল না। তিনি তাকে যা লিখতে বলবেন উৎপল তাই লিখবে। মোটামুটি এই সর্তে রাজি হওয়ার জন্যেই তিনি ভদ্রভাবে তার ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু বন্ধুত্বের কথা তোলায় একটু যেন আশ্বস্ত হল উৎপল। খানিকটা উঁচু স্তরে সে বোধ হয় এবার উন্নীত হয়েছে। এখন আর শুধু হুকুম তালিমের সম্পর্ক নয়, পরামর্শ আলাপ আলোচনাও চলতে পারবে। উৎপল ভাবল, যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এই

বন্ধু শব্দটির প্রয়োগ চলে—আমরা সাধারণ পরিচিত কি অফিসের সহকর্মীকেও বলবার সময় বন্ধু বলি, তবু ধ্বনি-গত একটু মূল্য আছে। এ শব্দে আলাপ পরিচয়ের খানিকটা অন্তরঙ্গতার সূচনা নিশ্চয়ই হয়।

হঠাৎ বন্ধুত্ব কথাটি ব্যবহার করে অনুরাধা নিজেও যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন। সেইটুকু কাটিয়ে উঠবার জন্যই যেন তিনি বললেন, 'আপনি হয়তো কী ভাবছেন। কিন্তু সত্যিই বন্ধুত্ব এতে নষ্ট হয়। আমার যে কত বইপত্র, টুকটাক জিনিস আর টাকা পয়সার তো কথাই নেই—বিশ পঁচিশ থেকে শুরু করে একশো দুশো পাঁচশ অবধি কতজনে নিয়েছে আর ফেরৎ দেয়নি। ফলে সেই জিনিসও গেছে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও নষ্ট হয়েছে। উনি বলতেন যা দিতে পারো একেবারে ধরে দিয়ো; ফিরে পাওয়ার আশা না রেখে দিয়ো, তা যদি না পারো মুখের সামনে সরাসরি 'না' করে দিয়ো, সেও বরং ভালো। কিন্তু দেবে—ফেরৎ চাইবে আর পাবে না—সে বড় যন্ত্রণা। তাতে দুপক্ষের মধ্যেই এক নীতিবাচক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।'

উৎপল বলল, 'সে তো আসলে গড়া নয়—ভাঙা। তবে আমাকে যা দেবেন সম্প্রদান করে দিতে হবে না। ধোপাকে যেমন কাপড় দেন সেইভাবে দিলেই চলবে।' অনুরাধা বললেন, 'মানে আপনি সব ধুয়ে মুছে শুভ্রসুন্দর করে আনবেন এইতো? সেই প্রতিশ্রুতি, সেই আশ্বাসই তো চাই আপনার কাছে।'

হঠাৎ অনুরাধা থেমে গেলেন। এতখানি বলে ফেলবার যেন তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

উৎপলও ভাবল, 'তাহলে সতীশঙ্করের জীবনে সত্যিই ধোয়ামোছার অনেককিছু আছে। সেই সব মালিন্যের কথা যদি না জানি তাহলে ধোব কী করে, মুছব কী ক'রে!' কিন্তু সরাসরি এ সব কথা অনুরাধা নিশ্চয়ই বলবেন না। একটি অনিচ্ছুক মহিলার কাছ থেকে কৌশলে খুঁটে খুঁটে তাঁদের জীবনের সব গোপন কথা বের করে নেওয়াও অসঙ্গত। তবু সতীশঙ্কর 'কী কী অশোভন, অসামাজিক,' নীতিবিরুদ্ধ, এমন কি নিষ্ঠুর কাজ করেছিলেন সেই সব জানবার জন্যেই উৎপল কৌতূহল বোধ করল। সৎ কাজ, মহৎ কাজ যদিও পৃথিবীতে বিরল, তবু সে সব বিবরণ জানবার জন্যে মানুষের তেমন স্বাভাবিক কৌতূহল নেই। তার সমস্ত ঔৎসুক্য আগ্রহ অন্যদিকে। এদিক থেকে সে চিরশিশু। মা-ঠাকুরমার কোলে শুয়ে 'হাঁউ-মাউ-কাউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ'—সেই রাক্ষস খোক্কসের গল্প শুনতে ভালোবাসে। নিরাপদ অভ্যস্ত সুশৃঙ্খল পারিবারিক সামাজিক জীবনের মধ্যে বাস করে পড়তে চায় দুঃসাহসিক গোয়েন্দা-কাহিনী, দুর্গম অরণ্যে জন্তু জানোয়ার শিকার, বিদ্রোহ বিপ্লব, যুদ্ধ বিগ্রহের উপাখ্যান, পাপ বিশৃঙ্খলা, নৃশংসতা, বিরংসার আখ্যান-বস্তুই তার উপভোগ্য। মানুষ সাহিত্য শিল্পে এই দুঃখ দুর্যোগ অশান্তিকে উপভোগ করে। একই জন্মে দুই জীবনের স্বাদ পায়। মানুষ জানে মনগড়া যে সাপ বাঘ—তা তাকে সত্যি সত্যি কামড়াবে না, অথচ দংশনজ্বালার স্বাদ সে পাবে, মরে না গিয়েও মৃত্যু যে কী তা সে অনুভব করতে পারবে। মানুষের সত্যিকারের রসনায় মধু ছাড়া আর সব বিস্বাদ। কিন্তু বিষেও যে রস আছে, স্বাদ আছে, তা সে কাল্পনিক বিষাক্ত জগতে প্রবেশ করে টের পায়।

নিজের অসঙ্গত কৌতূহলকে তত্ত্বের আশ্রয় দিল উৎপল, তাকে সার্বজনীনতায় পৌঁছে দিয়ে আত্মসমর্থনের সুযোগ নিল।

দুজনেই চুপ করে বসে আছে। কিছু একটা প্রসঙ্গ না তুললে আর কথা শুরু হবে না। কিন্তু এখানে এখন সতীশঙ্কর ছাড়া আর সব প্রসঙ্গই তো অবান্তর। উৎপল তাই তাঁর কথা তুলেই ফের আলাপ শুরু করল, 'ওঁর জন্মসন দেখছি ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। একেবারে এই শতাব্দীর প্রথম বছরে শুরু। আর পঞ্চান্ন বছর ধরে ওঁর জীবিত-কাল।' অনুরাধা বললেন, 'পুরো পঞ্চান্ন হয়নি। মাস-তিনেক বাকি ছিল। ভেবেছিলাম খুবই ঘটা করে ওঁর নতুন জন্মদিন আমরা পালন করব। ওঁর বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ করব। কিন্তু সব অন্যরকম হয়ে গেল। জন্ম-দিনের তিনমাস আগে সেই দুর্ঘটনা ঘটল। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।'

উৎপল বলল, 'এই বুকলেটে অবশ্য তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ নেই।'

অনুরাধা বললেন, 'তা কী ক'রে থাকবে? ওটা অনেক আগেকার লেখা। সেই ফার্স্ট ইলেকসন—

নাইটিন ফিফটি টু—তারও কয়েকমাস আগে ওঁর ওই লাইফ-স্কেচ আমরা তৈরি করি। তখনো জানিনে আর মাত্র তিনবছর তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা জল্পনা কল্পনা—সব এক নিষ্ঠুর নির্মম—।'

বলতে বলতে অনুরাধা হঠাৎ থেমে গেলেন। যেন একটা গর্ত্তের ভিতরে পা ফেলতে যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে পিছনে সরে গেলেন।

উৎপল সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি মিসেস রায়। সাধারণ অসুখ বিসুখে ওঁর মৃত্যু হয়নি, ন্যাচারাল ডেথ হয়নি ওঁর। এক দুর্বৃত্তের হাতে ওঁর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। He was stabbed. ভাবতে অবাক লাগে। একটি মানুষের স্বাস্থ্য শক্তি উদ্যম, কাজ করবার ক্ষমতা সব আছে—অথচ হঠাৎ তাঁকে নিমেষের মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হল।'

অনুরাধা চাপা আর্তনাদের সুরে বললেন, 'আ! থামুন আপনি। চুপ করুন, চুপ করুন।'

তারপর অনুরাধা নিজেই বিবর্ণ মুখে মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

উৎপলের মনে হল সে যেন নিজেই আততায়ী। সে নিজেই ছোরা বসিয়ে দিয়েছে সতীশঙ্করের বুকে, আর অনুরাধাকেও সেই একই ছুরিকায় বিদ্ধ করেছে। নিহত যে সে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, আর যে আহত সে তীরবিদ্ধ পাখীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

উৎপল বলল, 'আমাকে মাফ করুন মিসেস রায়, আমি না জেনে ওসব কথা তুলে আপনাকে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি ইচ্ছে করে—আমি কক্ষণো আর এ প্রসঙ্গ তুলব না। আমাকে ক্ষমা করুন।'

অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন। যেন তার আন্তরিকতা যাচাই করে নিতে চাইছেন। মুখের কথা আর চোখের দৃষ্টি একাই অর্থ বহন করে কিনা দেখতে চাইছেন।

উৎপলের দিকে চেয়ে অনুরাধা মৃদু কোমল-করুণ সুরে বললেন, 'আপনার কী দোষ। আপনি যা শুনেছেন তাই বলেছেন, আর ঘটনা তো সত্যিই। কিন্তু ওসব কথা শুনলে আমার বুকের ভিতরটা এখনো কেমন করে ওঠে। আমি স্থির থাকতে পারিনে। আজ কতদিন হয়ে গেল। পাঁচ বছর হল। কিন্তু সেই বীভৎস দৃশ্য যেন আমি আজও চোখের সামনে দেখতে পাই।'

উৎপল বলল, 'আমার—অন্যায় হয়েছে মিসেস রায়।'

অনুরাধা বললেন, 'না না, আপনার কী দোষ! দোষ আমার ভাগ্যের। আগে ভাগ্য অদৃষ্ট কিছুই মানতাম না, এখন মানি। আপনি বসুন। আমি আসছি। চা খাবেন একটু? চা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার জন্যে।'

উৎপল বলল, 'না না চা থাক। এই অসময়ে চা কেন। মিসেস রায় শুনুন—'

কিন্তু অনুরাধা শুনলেন না, উৎপলের কথার কোন জবাবও দিলেন না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উৎপল ভাবল, এরই নাম কি মহৎ প্রতিশোধ? আঘাতের বদলে আহার্য পেয় দিয়ে আপ্যায়ন? সত্যি এত তাড়াতাড়ি সতীশঙ্করের অপঘাত মৃত্যুর কথাটা তুলে উৎপল ভালো করেনি। কে জানে হয়তো এই মৃত্যুর মধ্যেই কোন রহস্য আছে। হয়তো এই মৃত্যু শুভ্র শান্ত সহজ মহৎ নয়। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই নয়। অন্তত একজনের বিদ্বেষ বিষে কলুষিত। সেই বিষধর ব্যক্তিটি সতীশঙ্করের আততায়ী। সে কি কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী? কোন অর্থলোভী গুণ্ডা? না কি ব্যক্তিগত আরো কোন আক্রোশ, হিংসার বদলে প্রতিহিংসা, অন্যায়ের প্রতিকার—সে এই রক্তপাতের ভিতর দিয়ে মিটিয়ে গেছে? এ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী শুনেছে উৎপল। কেউ কেউ বলেছেন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। দলীয় কি উপদলীয় বৈরিতার বলি হয়েছেন সতীশঙ্কর। কেউ বা বলেন ব্যাপারটা বিষয় সম্পত্তি ঘটিত। যে গ্লাসফ্যাক্টরি সতীশঙ্কর গড়ে নিয়েছিলেন, কারো মতে অন্য একজনের গড়া জিনিস কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই ফ্যাক্টরিরই কোন একজন বঞ্চিত অপমানিত নির্যাতিত কর্মীর এই অপকীর্তি। কেউ বা বলেন রহস্য আরো নিগূঢ়। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোন গুপ্ত প্রণয়ের উপাখ্যান প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কারণ সতীশঙ্করের নারী-ঘটিত দুর্বলতাও নাকি কিছু কিছু ছিল। অনেক সবল সমর্থ সম্ভোগী পুরুষ এই দুর্বলতাকে সারাজীবন বহন করে

চলেন। কে কোন্ উদ্দেশ্যে সতীশঙ্করকে হত্যা করেছে তা আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। পুলিশ আততায়ীকে সনাক্ত করতে পারেনি। সন্দেহক্রমে যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল আদালতে তারা সবাই মুক্তি পেয়েছে। সত্যিকারের যে খুনী সে দেশের সীমান্ত পার হয়ে পালিয়ে গেছে, না হয় ছদ্মবেশে এই দেশেই রয়েছে। কে জানে সে হয়তো বন্ধুর বেশে এ বাড়ীতে এখনো যাতায়াত করে। ভাবতে গা শির শির করে উঠল উৎপলের। কে খুন করেছে তা জানা যায়নি, কোন্ উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে তাও অজ্ঞাত। তাই সতীশঙ্করের হত্যাকাণ্ড নিয়ে নানারকমের গালগল্প জল্পনা কল্পনা ছড়িয়ে পড়েছিল উৎপলের বেশ মনে আছে। তারপর আস্তে আস্তে সব গল্প থেমে গেছে। লোকে সব ভুলে গেছে, ভুলে যাচ্ছে। মানুষের স্মৃতির সড়ক এই কলকাতা শহরেরই বড় রাস্তার মত। ঝাড়ুদার এক আবর্জনার রাশ ঝাঁট দিয়ে নিতে না নিতে আর এক আবর্জনার স্তূপ জমে ওঠে। মানুষ সব ভুলে যায়, সৎকথাও ভোলে, অসৎ কথাও ভোলে। এই যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যাপক দেশত্যাগ—এও তো মানুষ ভুলে যাচ্ছে। 'দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার।' দ্বিখণ্ডিত—শুধু দ্বিখণ্ডিত কেন শতখণ্ডিত হৃদয় আবার জুড়ে এক হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্মৃতিপট থেকে সব মুছে যায়। শুধু ইতিহাস সব ধরে রাখে। আর কাব্য সাহিত্য সব নয়, শুধু একেকটি মুহূর্তকে অমর করে বুকে করে রাখে।

সতীশঙ্করের মৃত্যু সম্বন্ধে জনশ্রুতি এখন প্রায় নীরব হয়ে এসেছে, এই পাঁচবছরেই বিস্মৃতির যবনিকা নেমেছে মানুষের মনে। অনুরাধা হয়তো ভেবেছেন এই পট-ভূমিতে শুভ্র সুন্দর স্মৃতি সৌধ গড়ে তুলবেন। কিন্তু এই সৌধ যদি শুধু ইট কাঠ লোহা আর পাথরের হত, সে শুধু মূক সৌধই হয়ে থাকত আর কোন কথা বলত না। কিন্তু অনুরাধা যে ভাষা আর চরিত্র দিয়ে সৌধ গড়তে চাইছেন, কোন কোন অর্থে তা কংক্রীটের চেয়েও শক্ত আর স্থায়ী। কিন্তু সেই সৌধ তো চুপ করে থাকবে না। কথা বলবে। যদি পদে পদে মিথ্যা পদাবলী তৈরী হয় তাহলে যে শুনবে সেই হাসবে—আর পদকর্তাকে ধিকার দেবে।

সতীশঙ্করের মৃত্যু এক রহস্যাবৃত হয়তো কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়। যে রহস্য গোয়েন্দা পুলিশ ভেদ করতে পারেনি, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পারেনি, উৎপল সেন কি সেই রহস্যভেদের চেষ্টা করবে? তার কি আর কোন কাজ নেই? জীবনের অন্য সব আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা চেষ্টা সব বন্ধ রেখে শুধু আর একজনের মৃত্যুর কারণ খুঁড়ে বের করাই কি তার একমাত্র কৃত্য? সতীশঙ্করের আহত রক্তাক্ত দেহ, পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে। আর তাঁর মৃত্যুর হেতুকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। হয়তো কারো কোন উদ্দেশ্য এর পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে থাকতে পারে, আবার নাও পারে। উৎপলের কী দরকার সেই কবর খুঁড়বার। মানুষের মৃত্যু সোজা বাঁকা নানা পথে আসে। জানিয়ে আসে, অতর্কিতে আসে। কখনো বা নিজের দেহগত রোগব্যাধির সাহায্য নেয়, কখনো বা দেহ বহির্ভূত দৈব দুর্ঘটনার হাত ধরে। শহরে যারা থাকে তাদের জন্ত জানোয়ারের ভয় নেই, কিন্তু যানবাহনের চাকা আছে, যানে যানে সংঘর্ষ আছে, জীর্ণ বাড়ি কি ব্রীজের নীচে এক সঙ্গে সুন্দর সুস্থ সবল দেহ মাংসস্তূপ হয়ে থাকে। মৃত্যুর আরো কত বিকৃত রূপ, বীভৎস চেহারা আছে। মরণ কদাচিৎ নয়ন মনোহর। এই জন্যেই মৃত্যুর প্রতীক যম। দণ্ডধর বিকটদর্শন যার রূপ। রাধিকা অভিমান করে মরণকে যতই শ্যাম সমান বলুন না কেন, ব্যক্তি মানুষের কাছে মৃত্যু চিরকালই করাল, ভয়ঙ্কর। তাছাড়া সৎ মানুষেরও তো অসুন্দর অপঘাত মৃত্যু হয়, যেমন যীশু খৃষ্টের হয়েছিল, যেমন গান্ধীজীর হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনে এই মৃত্যুতো পায়ে পায়ে হাঁটে। মানুষ কী ভাবে মরেছে তা জেনে কী হবে, দীর্ঘকাল ধরে কী ভাবে সে বাঁচল, তার সেই বিচিত্র বক্তব্যকে জানবার বুঝবার চেষ্টা করাই ভালো। সেই জিজ্ঞাসাই জীবন-জিজ্ঞাসা। মৃত্যু আকস্মিক। কিন্তু জীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, সচেতন চিন্তা চেষ্টা কার্য-কারণ শৃংখলায় নিয়ন্ত্রিত। তবু সেই জীবনে বিস্ময়ের অবধি নেই। সতীশঙ্করের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে তাঁর জন্ম, বাল্যে কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে বিস্তৃত তাঁর যে কর্মময় জীবন সেই জীবনের অনুসরণ করা অনেক ভালো।

অনুরাধা নিজেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে

ঢুকলেন। উৎপল বিস্মিত হয়ে বলল, 'এ কী মিসেস রায়! এই অসময়ে কেন এসব করছেন। কোন দরকার ছিল না কিন্তু।'

অনুরাধা মৃদু হেসে বললেন, 'না হয় আজ একটু অদরকারেই খেলেন। শুনেছি চায়ের সময় অসময় বলে কিছু নেই। All time is teatime. উনিও যখন তখন চা খেতেন।'

উৎপল দেখে খুসি হল অনুরাধা সামলে নিয়েছেন। একটু আগে যে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উৎপল তুলেছিল চোখ মুখ ধুয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাধা যেন তার সবই মুছে ফেলেছেন।

উৎপল বলল, 'আপনি যখন একান্তই ছাড়বেন না, দিন।' চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে সে বলল, 'সতীশঙ্করবাবুও খুব চা খেতেন বুঝি?'

অনুরাধা বললেন, 'খুব। কিন্তু ইচ্ছা করলে না খেয়েও থাকতে পারতেন। নিজের কাজে যখন মগ্ন হয়ে থাকতেন তখন চা তো ভালো—কোনরকম ক্ষিদে তেষ্টাই যেন তাঁর থাকত না। শুনেছি প্রথম জীবন থেকেই নানারকম কষ্ট তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সেই অভ্যাস তিনি ছাড়েননি। শারীরিক কষ্টকে তিনি কষ্ট মনে করতেন না, শরীরের যন্ত্রণা তাঁর সহ্য করবার শক্তি ছিল। ওঁর ছবি, ওঁর স্ট্যাচু দেখে বুঝতে পেরেছেন ওঁর দেহ ওঁর নিজের হাতে গড়া ছিল। স্কুলে আর কলেজে—দুবছর কলেজে পড়েছিলেন—সেরা ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু সেরা জিমন্যাষ্ট ছিলেন। দলের এই নিয়ম ছিল তখন। শরীর গড়তে হবে। শক্ত দলের জন্যে শক্ত দেহ চাই, শক্ত মানুষ চাই। আর যাই হোন, তিনি দুর্বল পুরুষ ছিলেন না, উৎপলবাবু।'

উৎপল চুপ করে রইল।

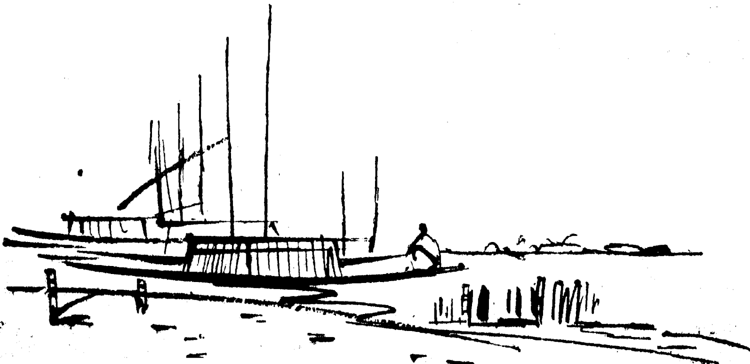
অনুরাধা বললেন, 'আপনি চা খান, বিশ্রাম করুন। কিছু যদি নোট নিতে হয় নিন। আমি এখন যাই। আমি না গেলে পদ্মা আবার কিছুতেই খেতে বসবে না। আচ্ছা মেয়ে হয়েছে যা হোক।'

উৎপল বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনারও বোধহয় এতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া হয়নি। দেখুন তো কী অন্যায়। আমিই বোধহয় আপনাকে এতক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি।' অনুরাধা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি কেন নিজেকে এরজন্যে দায়ী করছেন। আপনার কোন দোষ নেই, দায়ও নেই, দায়িত্ব যা আছে তা শুধু লেখা সম্বন্ধে। এক হিসেবে আপনারা খুব সুখী। আপনাদের নানাদিকে টান নেই। তাই অনিয়ম অশান্তিও কম। আমাদের তো আর তা নয়।'

অনুরাধা আর একবার বিদায় নিলেন।

উৎপল ভাবতে লাগল এই বহুবচনে কাদের বোঝাতে চাইছেন অনুরাধা? নিশ্চয়ই নিজেকে আর নিজের মৃত স্বামীকে। সতীশঙ্কর তো এখন সমস্ত আকর্ষণ বিকর্ষণের অতীত। কিন্তু অনুরাধা নিজে?

উৎপল অন্যমনস্কভাবে সতীশঙ্করের সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রথম দিকের পাতাগুলি উলটাতে লাগল। সেখানে অবশ্য অনুরাধার নাম ছিল না। ক্রমশঃ



পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

খবরাখবর ঃ

রামানন্দ সাগর কর্তৃক প্রযোজিত ও পরিচালিত জেমিনীর বহু প্রতীক্ষিত বিরাট চিত্র 'ঘুংঘট' কলিকাতার এবং ভারতের অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে সাড়ম্বরে মুক্তিলাভ করল। আলোচ্য ছবিটির কাহিনী গড়ে উঠেছে মানুষের জীবনে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস নিয়ে। হিন্দী চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ তারকাবৃন্দকে একত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। তাঁহাদের মধ্যে বীণা রায়, আশা পারেখ, প্রদীপ কুমার, ভারতভূষণ, আগা, মিনু মমতাজ, লীলা চিটনীস, এস ব্যানার্জী, প্রতিমা দেবী, হেলেন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * * *

প্রযোজক-পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার তাঁর 'কঠিন মায়া' চিত্রের কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য দলবলসহ কৃষ্ণনগর রওনা হয়েছেন। ছবিটির নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়ও গেছেন সঙ্গে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন রবীন মজুমদার, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, নৃপতি ও অজিত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, আভা মণ্ডল এবং নবাগতা গৌরী মজুমদার।

* * *

'অগ্রদূত' গোষ্ঠী পরিচালিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের 'অগ্নিসংস্কার' প্রায় সমাপ্তির পথে। খ্যাতিমান চিত্রনাট্য রচয়িতা শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন এর কাহিনী। চরিত্র চিত্রণে আছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী প্রভৃতি। সুরারোপে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

"শশীবাবুর সংসার" ও "শেষ পর্য্যন্ত" চিত্র দু'টির পর প্রযোজক শ্রীআর, ডি, বনসল 'রাজপুত্র' প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আলোচ্য চিত্রে শ্রীবনসল বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন প্রতিভাধরদের সমাবেশ করেছেন। চিত্রটির কাহিনী রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা



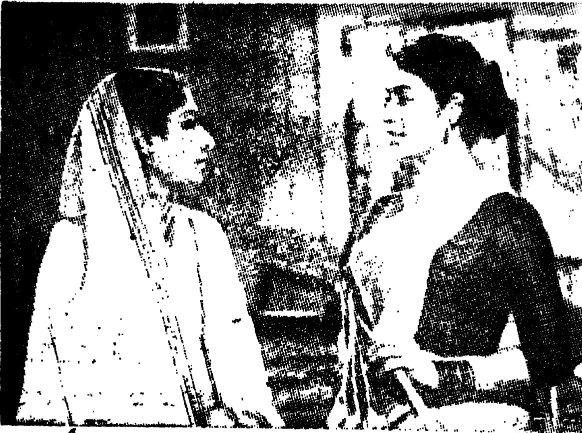
উত্তমকুমার প্রযোজিত তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' চিত্রের একটি আকর্ষণীয় দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস ও সুচিত্রা সেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর।

করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গা গড়ার ধাপে ধাপে যে জীবন বেদনার সৃষ্টি হয় তারই রূপ দেবে বাংলার প্রিয় নায়ক উত্তমকুমার। পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ পরিচালক অর্ধেন্দু সেনকে।

* * * *

দেবী প্রোডাকসন্সের 'ডাইনী' চিত্রের বহির্দৃশ্য হালি-শহরে সাতদিন ধরে গ্রহণের পর পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য্য কয়েকদিন পূর্বে ফিরে এসেছেন। তিনি সুদূর গ্রাম-প্রান্তরের আরও কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য আবার যাবেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন গীতা দে, ছবি বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, তমাল লাহিড়া প্রভৃতি।

* * *



নারায়ণ পিকচার্স পরিবেশিত 'শুন বরনারী' চিত্রে সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

বোম্বাই চিত্র-সাংবাদিক সংঘ গত বৎসর মুক্তি প্রাপ্ত সমস্ত হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিকে 'সবশ্রেষ্ঠ' বলে নির্বাচিত করেছেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র—সুজাতা। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রাজকাপুর (আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—নুতন (সুজাতা)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক—বিমল রায় (সুজাতা)। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা—মানমোহন কৃষ্ণ (ধুলকা ফুল)। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেত্রী—ললিতা পাওয়ার (আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার—সুবোধ ঘোষ (সুজাতা)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচয়িতা—ইন্দর রাজ আনন্দ (আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠ গীতিকার—শৈলেন্দ্র ও হজরৎ (আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা—বসন্ত দেশাই (গুঞ্জে উঠে সানাই)। শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক্ করেছেন—তালাত মাহুদ (জলতে হ্যায় জিসকে লিয়ে—সুজাতা) এবং লতামুংগেশকর (তারা জানা—আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার—ভি, কে মূর্তি (কাগজ কা ফুল)। শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী—ই, এম, সুরাটওয়ালা (সুজাতা)। শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পরিচালক—শ্যাম (নবরঙ্গ)। শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক—এম, আর আছেরেকর (কাগজ কা ফুল)। শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্পাদক—হৃষিকেশ মুখার্জী (আনাড়ী)। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র—লাইম্ লাইট। বম্বের মেয়র ভি, পি দেশাইয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপরিল্লিখিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়।

* * *

'অল ইণ্ডিয়া সাইন্ টেক্‌নিসিয়ান্‌স'দের পঞ্চম অধি-বেশন অনুষ্ঠিত হবে কোলকাতায় আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে। এই সম্পর্কে সুশীল মজুমদারের সভাপতিত্বে উক্ত সংস্থার কার্য্যকরী সমিতির একটি সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীতে। উক্ত সভায় সাধারণ সম্পাদক ভি, বি কুলকার্নি, সভাপতি এন, কৃষ্ণস্বামী (দক্ষিণ ভারত) সহ সভাপতি তপন সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সুশীল মজুমদারকে সভাপতি, ভূপেন ঘোষকে সংযোগরক্ষকারী এবং সত্য রায়কে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। আগামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য বম্বে ও মাদ্রাজ হইতে বহু প্রতিনিধি আসবেন আশা করা যাচ্ছে। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য চলছে দ্রুত প্রস্তুতি।

বিদেশী খবর ঃ

সেন্সরের কাঁচিকে এড়ানোর জন্যে বৃটেনের সোহো অঞ্চলে 'কম্পটন্' নামে একটি সিনেমা গৃহ নির্ম্মিত হয়েছে। এই দুইশত আসনযুক্ত সিনেমা গৃহটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে সেন্সর না করা চলচ্চিত্রগুলিও দেখান চলবে। সেন্সরের সার্টিফিকেট্ যে সমস্ত ছবি পাইনি বা যেসব ছবির কিছু কিছু অংশ সেন্সরের কাঁচিতে বাদ পড়েছে, সে গুলিকে সম্পূর্ণ 'অরিজিনাল' অবস্থাতেই দেখান হবে, কোন অংশ বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু এরকম ব্যবস্থা সম্ভব হল কি করে? সম্ভব হল এই জন্যে যে এই সিনেমা গৃহটি 'শুধু সভ্যদের জন্য' এইরূপ একটি ক্লাব রূপে গণ্য হবে; অর্থাৎ এই ক্লাবের যাঁরা সভ্য হবেন শুধু তাঁরাই এখানে টিকিট কেটে ছবি দেখতে পাবেন। সিনেমা ক্লাব লণ্ডনে আরও আছে এবং সেখানে সেন্সর কর্তৃক পাব্লিক্ সিনেমায় দেখান নিষিদ্ধ ছবিও দেখান হয় ক্লাবের সভ্যদের জন্যে। এই সব ক্লাবে দেখান হয়েছে—Marlon Brando অভিনীত মার্কিণ চিত্র "The Wild One" ফরাসী ছবি "I spit on Your Graves" ও "Les Impures", জাপানী চিত্র "Joyhouse of Yokohama", "Juvenile Jungle", "Street of Shame" প্রভৃতি।

* * * *

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মৃত হলিউডের বিশ্ববিখ্যাত সুদর্শন অভিনেতা Rudolph Valentino তাঁর মৃত্যুর এতদিন পরেও আবার নতুন করে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করছেন। টেলিভিসনে ভ্যালেন্টিনোর নির্ব্বাক যুগের নাম করা ছবি "Son of the Sheikh" প্রদর্শিত হয়ে মার্কিণ মহিলাদের ভাবাবেগে এমন চঞ্চল করে তুলেছে যে নির্ব্বাক ভ্যালেন্টিনো চিত্রের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং টেলিভিসন্ প্রযোজকেরা ভ্যালেন্টিনো চিত্র দেখাবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। একটি "Rudolph Valentino Fans Club"ও গঠিত হয়েছে। রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনো ছিলেন ইতালীয়ান্ এবং তাঁর পুরো নাম ছিল—Rudolph Alphonso Guglielmo di Valentino d' Antongueita. ১৯২৬সালে ভ্যালেন্টিনো মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে মারা যান তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চিত্রের অনুরাগী মেয়েরা তাঁর স্মরণে বহু সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন এবং বহুদিন ধরে তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরেও সংবাদ পত্রে তাঁর মৃত্যু দিনে তাঁর স্মরণে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু দীর্ঘ দুই যুগ পরেও সেই নির্ব্বাক যুগের ঐ সুদর্শন নায়কের এইরূপ জনপ্রিয়তা সত্যই আশ্চর্যকর!



ভোলানাথ রায় প্রযোজিত ব্যয়বহুল 'ঝিন্দের বন্দী' চিত্রে উত্তমকুমার, রাধামোহন ও মিহির ভট্টাচার্য।

* * * *

Carroll Righter নামের ভদ্রলোকটি হলিউডের একজন নামজাদা ব্যক্তি। কিন্তু সিনেমার সহিত তিনি

সংশ্লিষ্ট নন, তবে নামকরা চিত্র তারকারা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট! Carroll Righter হচ্ছেন একজন ভবিষ্যদ্বক্তা গণৎকার। Marlene Dietrich, Adolph Menju, Susan Hayward, Robert Cummings, Arlene Dahl, Peter Lawford, Rhonda Fleming প্রভৃতি চিত্র-তারকারা তাঁর মক্কেল। ক্যারল্ যা বলেন Adolph' Menju তাই করেন! হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না,—এতই বিশ্বাস! কারণ অ্যাডলফ্ একবার কোনও কাজ সামনে নেই দেখে ছুটি উপভোগ করতে যাবেন কিনা ক্যারল্‌কে জিগেস করেন। ক্যারল্ বলেন—না, শীঘ্রই একটা বড় পার্টে অভিনয়ের ডাক পড়বে। আর পড়লও মাত্র দু'দিন পরেই। পিটার লফোর্ড-এরও সেই রকম অভিজ্ঞতা। তাঁর কর্মজীবনের প্রধান মুহূর্ত্তগুলি ক্যারল্ রাইটার পূর্বেই বলে দিয়েছেন। রবার্ট কামিংস রাইটারকে জিগেস না করে কখনও চুক্তিপত্রে সহি করেন না। পরলোকগতা অভিনেত্রী Maria Montez-কে নাকি ক্যারল্ রাইটার বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বর মাসটি তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক মাস এবং ঐ মাসে যেন তিনি অত্যধিক গরম জলে স্নান না করেন, যা তিনি করতেন রোগা হবার জন্যে। কিন্তু মারিয়া মণ্টেজ্ বোধহয় ক্যারলের কথার অন্যথা করেছিলেন। কারণ একদা এক ৭ই সেপ্টেম্বরে মৃতা অবস্থায় তাঁকে দেখা গিয়েছিল বাথ্‌রুমের মধ্যে! মার্লিন্ ডিয়েট্রিচের কন্যা Maria Riva একবার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর ডাক্তারের সঙ্গে বাজী ধরেন কবে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে বলে। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ডাক্তারেরাই ঠিক বলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে ডাক্তার হেরে যান, কারণ মারিয়া রিভাকে দিন বলে দিয়েছিলেন ক্যারল্ রাইটার।

শিল্পীর কথা

যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে…

কুমারেশ ভট্টাচার্য

'শিল্পীর কথা' পর্যায়ে এযাবৎ আমরা বাঙলাদেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করে এসেছি। এবার এমন একজন উদীয়মান তরুণ শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা অতি দুঃখের সংগে প্রকাশ করছি, যার ছিল অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মাত্র তেইশ বছর বয়সের মধ্যে সে সেতার বাজে দেখিয়েছিল অসামান্য পারদর্শিতা; কিন্তু নিয়তির কঠিন নির্দেশে গত ৯ই নভেম্বর '৬০ সে ইহলোকের সমস্ত সুরের মায়া কাটিয়ে যাত্রা করেছে অমৃতলোকে—একাত্ম হয়ে মিশে গেছে সুরব্রহ্মের সংগে আপন সুর ও সত্তা নিয়ে। আজ তারই কথা কিছু বলব।

অভিজাত অঞ্চল বালীগঞ্জ। এই অঞ্চলে রাসবিহারী এভিনিউয়ের ওপর মার্জিত রুচির ও আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'অনুকুল ভবন'। গৃহস্বামী শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ শুধু সুশিক্ষিত ও বহু সদগুণের অধিকারীই নন, তিনি এমন একটি বংশের সন্তান, যে বংশের ঐতিহ্য ও গৌরবেও তিনি গৌরবান্বিত। বংগবিশ্রুত শিক্ষাব্রতী ও প্রকৃত দেশ-সেবক স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষের পৌত্র ইনি।

২৩ বৎসর পূর্বের কথা। ১৯শে সেপ্টেম্বর—১৯৩৭



অশোক ঘোষ

সাল। সারাবাড়ীতে বয়ে গেল আনন্দের হিল্লোল খুসীর জোয়ার। হেমবাবু লাভ করলেন দেবশিশুর মত অতি সুন্দর একটি পুত্র সন্তান। নাম রাখা হোল অশোক। সংসারে আর্থিক কোন অনটন নেই। পিতামাতার এক-মাত্র নয়নের মণি অশোক বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হতে লাগল।

হেমবাবু একজন প্রকৃত সংগীতানুরাগী। তাঁর বাড়ীর মধ্যে প্রশস্ত একটি হলঘরে প্রায়ই বসত গানের আসর। সে আসরে বিভিন্ন সময়ে যোগ দিতেন ভারত বিখ্যাত বহু কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পী। ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদ মুস্তাক্ আলি খাঁ সাহেব পরমাত্মীয়ের মত প্রায়ই আসতেন এবং

এখনও আসেন এই বাড়ীতে। দু-তিন বছরের শিশু অশোক বাবার কাছে এসে বসত এই গানের আসরে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত গান ও বাজনা। মুস্তাক আলি খাঁ সাহেব স্নেহভরে শিশুটিকে আদর করে তার কাছে এগিয়ে ধরতেন তাঁর সেতারটি। শিশু তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার ডানহাতের ছোট্ট আঙুলগুলো সেতারের উপর রেখে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত। মনে হয়, তখন থেকেই বুঝি শিশুটি খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

স্কুলে পড়াশোনার সংগে সংগে আট বছর বয়স থেকে অশোকের নিয়মিত সেতার বাজনা শিক্ষা শুরু হয় ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের কাছে। ওস্তাদজীও তাঁর এই প্রিয়তম কিশোর ছাত্রটিকে আপন সন্তানের মতই মনে করে অতি যত্নের সংগেই শিক্ষা দিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিভাবান ছাত্রটি সেতার বাজনায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।

দশবছর বয়সের সময় অশোক মা-বাবার সংগে একবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যায়। প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ্ শ্রীজ্ঞান প্রকাশ ঘোষও ছিলেন এঁদের সহযাত্রী। বহু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে তাঁরা এলেন বিখ্যাত রামেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ কি ভাবে জানতে পেরে বিশেষ অনুরোধ করেন কিশোর শিল্পীর সেতার বাজনা শুনবার জন্য। পিতামাতার আদেশে বালক তখন শুরু করে সেতার বাজনা। সংগে সংগত করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। দেবমন্দিরের প্রশস্ত অংগনে সমবেত নরনারী সেদিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন দশমবর্ষীয় সুদর্শন বালকের দেড়-ঘণ্টাব্যাপী প্রাণ মাতানো সেতার বাজনা। শ্রোতৃবৃন্দের সমবেতউচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সেদিন উৎসাহিত হোল কিশোর শিল্পী এবং পরম প্রীতি লাভ করলেন তার পিতামাতা।

১৯৫০ সাল। কোলকাতায় নিখিল বংগ সংগীত প্রতিযোগিতায় সেতার বাজনায় সমস্ত গ্রুপের ভেতর প্রথম স্থান অধিকার করে অশোক। এই ত্রয়োদশ বর্ষীয় তরুণ শিল্পীর সেতার বাজনা শুনে উপস্থিত সকলে তার বিশেষ তারিফ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন তার উজ্জ্বলভবিষ্যৎ সম্পর্কে।



রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাত থেকে অশোককে পুরস্কার নিতে দেখা যাচ্ছে।

দুবছর পরের কথা। ১৯৫২ সাল। মাঘ মাস। অশোক তার মা-বাবার সংগে ছিল কাশীতে। সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে কাশীধামের সংগীতমণ্ডলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকণ্ঠে মহারাজের বাড়ীতে বসে একটি সংগীতের আসর। বেনারসের বহু বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ উপস্থিত হন সেখানে। এদিকে পঞ্চদশবর্ষীয় তরুণ শিল্পী অশোকেরও আমন্ত্রণ আসে সেখানে সেতার বাদনের জন্য। অশোক সেতার বাজায়, সংগে সংগত করেন পণ্ডিত কিষণ মহারাজ। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন তার অপূর্ব সেতার বাজনা শুনে।

সেখানকার প্রখ্যাত হিন্দি দৈনিক 'আজ' পত্রিকায় ২৩শে জানুয়ারীর সংখ্যায় তার সেতার বাজনার উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

শুধু গান-বাজনার দিকেই নয়, লেখা পড়াতেও অশোক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র। ১৯৫৪ সালে বালীগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এ পড়তে শুরু করে।

শ্রীমান অশোক যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন 'ইণ্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশনে, ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত সংগীত প্রতি-যোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় 'ইনষ্ট্রুমেণ্টাল মেলোডি গ্রুপে' অশোক দ্বিতীয় স্থান অধিকার কোরে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট থেকে লাভ করে পারিতোষিক। ঐ একই বৎসরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'ইউথ ফেষ্টিভ্যালে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যোগদান কোরে অশোক সেতার বাজনায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯৫৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় 'অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স।' সেখানে সেতার বাজাবার জন্যে আমন্ত্রিত হয় অশোক। তার সেতার বাজনা শেষ হলে প্রখ্যাত ওস্তাদ স্বর্গত ডি, ভি, পালুসকরজী আনন্দ-বিহ্বল হয়ে এই তরুণ শিল্পীকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান এবং আশীর্বাদ করেন। কোলকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৩১শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় অশোকের বাজনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন...'Sri Ashoke Ghose, a deciple of ostad Mustak Ali Khan, attracked the audience with his superb Setar playing—Raga Adarana.'

অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন লোকপ্রিয় শিল্পী ছিল অশোক ঘোষ। বেতারে তার সেতার বাজনা বহু শ্রোতার কর্ণকুহরে করেছে অমৃত বর্ষণ। সেতার বাজনা শিখে নাম-যশ ও অর্থ লাভ করব, এ আশা অশোকের মনে কোন দিনই জাগে নি। প্রকৃত সুর-সাধনা করাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবও তাকে অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সংগে প্রকৃত শিক্ষাই দিয়েছেন—ব্যবসায়িক শিক্ষা নয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে প্রথম বিভাগে আই এ, এবং ১৯৫৮ সালে ঐ কলেজ থেকেই ভূগোলে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে ল'কলেজে ভর্তি হয়েছিল অশোক।

ধনীর একমাত্র দুলাল অশোকের চরিত্রের ছিল এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা মাধুর্য যা সচরাচর দেখা যায় না। তার মাতা জ্যোতি দেবী ব্রহ্মদেশের স্বনাম ধন্য এ্যাডভোকেট এবং তথাকার আইনসভার সদস্য, সুসাহিত্যিক পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ দাসের (বি, এন, দাসের) বিদুষী কন্যা। তার প্রপিতামহ সর্বজন-পরিচিত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ। সুতরাং পিতৃ এবং মাতৃকুল উভয় দিক দিয়েই অশোকের গর্ব কোরবার মত অনেক কিছুই ছিল। উচ্চ শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আভিজাত্যের পারিবেশে এই অভিজাত বংশের সন্তানের জীবন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অশোকের কোন কথায়, কাজে, আচার-ব্যবহারে কোনদিন এতটুকু গর্বের লেশ ছিলনা।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে পিতামাতা তাঁদের এক-মাত্র সন্তান অশোকের বিয়ে দিয়ে পরমানন্দে দিন কাটা-চ্ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যকে তো এড়িয়ে চলা যায় না। হঠাৎ অভাবিতভাবে অশোক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়! বাড়ীতে রেখেই তাকে চিকিৎসা করান হচ্ছিল। কিন্তু সে এসেছিল স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর মত। বিপুল ঐশ্বর্যের আকর্ষণ, পিতামাতার স্নেহডোর, নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রীতি ও ভালবাসা তাকে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারলে না। সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে সুরসাধক অশোক মাত্র ২৩ বছর বয়সে প্রকৃত সুরলোকে চলে গেছে গত ৯ই নভেম্বর। তার অকাল মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের যথেষ্ট ক্ষতি হল বলেই মনে করি। অকালে যদি এই ফুল ঝরে না যেত, পরিণত অবস্থা যদি পেত, তাহলে এই প্রতিভার বিকাশে সঙ্গীত জগৎ আমোদিত হয়ে উঠত। ভগবানের কাছে কামনা করি তার আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ও পরম শান্তি।







সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত-পাকিস্তান টেষ্ট

ভারত ও পাকিস্থানের টেষ্ট খেলা শুরু হয়ে গেছে। বোম্বাইতে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে প্রথম টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বোম্বাইয়ের উইকেটে খেলা অমীমাংসিত হবে এরূপ সম্ভাবনা করা গেছিল। কিন্তু কানপুরের গ্রীণ পার্কে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হবে বলে আশা ছিল। গত কয়েক বৎসর ধরে এই কানপুরে টেষ্ট খেলায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে এসেছে। গত বৎসর ভারত বিশ্ববিজয়ী অষ্ট্রেলিয়া দলকে এখানে পরাজিত করেছে। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতের গত বৎসরের বিজয় গৌরবের পুনরাবৃত্তি অনেক গোঁড়া সমর্থক আশা করেছিলেন। কিন্তু কি ভারতীয় কি পাকিস্থান, কোন দলের মধ্যেই জেতবার আগ্রহ দেখা গেল না। পরাজয় বাঁচানো, সে যেমন করেই হ'ক, এই হয়েছে এখন মূল উদ্দেশ্য। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় দলের পাকিস্থান সফরে ৫টি টেষ্টই অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এবারও কি তাই হবে ? অন্ততঃ উভয় দলের মতি-গতি দেখে তো ভরসা হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিস্‌বেনে একটি টেষ্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর আমাদের এখানেও একটি টেষ্ট হয়েছে। কিন্তু দু'টি টেষ্টের কতই না পার্থক্য। ব্রিস্‌বেন টেষ্টে একদিনের রান সংখ্যা হচ্ছে ৩৫৯ আর কানপুর টেষ্টে একদিনের রান সংখ্যা হচ্ছে ১৫০। কানপুর টেষ্টের মত নীরস টেষ্ট এর আগে বোধহয় কখনও দেখা যায় নি। আমরা আশা করি কল্‌কাতা টেষ্টে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। উভয় দলই ভিন্ন মনোভাব নিয়ে খেলবেন।

বোম্বাইয়ে প্রথম টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হবার পর ভারতীয় দল গঠনে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। এই দলে বাংলার পঙ্কজ রায়, উইকেট-কিপার যোশী এবং স্বস্তিকে বাদ দেওয়া হয়, এবং এঁদের বদলে জয়সীমা, তামানে ও মুদিয়াকে দলে নেওয়া হয়। প্রথম টেষ্টে পঙ্কজ রায় ব্যাট খারাপ করেন নি, কিন্তু তাঁর ফিল্ডিং খারাপ এই অজুহাতে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। পঙ্কজ রায় আজ নূতন টেষ্ট খেলছেন না। আর বোম্বাইতেও এর আগে বহুবার টেষ্ট খেলেছেন। কিন্তু এবার টেষ্টে গোড়া থেকে বোম্বাইয়ের দর্শকবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে যে 'ব্যারাকিং' করেছেন তা মোটেই খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচায়ক নয়। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ফিল্ডিং-এ উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এতদিন পরে এই খেলোয়াড়টির ফিল্ডিং-এর ত্রুটি কি এতই প্রকট হয়ে উঠলো! তরুণ খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ দানের প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু তামানের নির্ব্বাচনের যৌক্তিকতা ঠিক বোঝা গেল না। কানপুরে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যাসু প্যাটেলের সাফল্য এই মাঠে অফ্‌স্পিন্‌ বোলারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সমগ্র ভারতবর্ষে মুদিয়ার চেয়ে ভাল 'অফ্‌ব্রেক্‌' বোলার খুঁজে পেলেন না।



বম্বেতে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্টে নরী কণ্ট্র্যাক্টর ও পঙ্কজ রায় ব্যাট্ করতে নামছেন।

এবার বোম্বাইতে প্রথম টেষ্টের সবচেয়ে উল্লেখজনক ঘটনা হলো ভারতীয় দলের নবম উইকেটে দেশাই ও যোশীর ব্যাটিং। মাত্র ৫ রানের জন্য এঁরা নবম উইকেটে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হন নি। ১৮৯৪-৯৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ার জে, ম্যাক্ ব্ল্যাকহাম এবং এস্, গ্রেগরী নবম উইকেটে ১৫৪ রান করেন। যোশী ও দেশাই জুটি করেন ১৪৯ রান। দেশাই দলের সবচেয়ে বেশী ৮৫ রান করেন আর যোশী করেন ৫২ রান। আব্বাস আলি বেগ্ বোম্বাই ও কানপুর উভয় টেষ্টেই সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন। কানপুর টেষ্টে জয়সীমার ব্যাটিং সাফল্য উল্লেখ-যোগ্য। তিনি ৯৯ রান করে দুর্ভাগ্যবশতঃ রান আউট হয়েছেন। কিন্তু এই ৯৯ রান করতে তিনি সময় নেন তিন দিন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধেও জয়সিমা তিন দিন ধরে 'ব্যাট' করেন। কানপুরে তৃতীয় দিনের খেলার শেষে রান সংখ্যা ওঠে ৯০০ মিনিটে মাত্র ৪৯৪। এই টেষ্টের শেষ দিনে উম্‌রিগড় সেঞ্চুরী করেছেন।

পাকিস্থান দলের বর্ত্তমান সফরে প্রথম দু'টি টেষ্টের জন্য ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয় নরি কণ্ট্র্যাক্টরকে। অবশিষ্ট তিনটি টেষ্টেও তাঁকেই অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। অধিনায়ক হিসাবে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব অর্পিতহলে তাঁর 'ব্যাটিং' নৈপুণ্যের হানি হতে পারে এই আশঙ্কা যে অমূলক তা তিনি প্রমাণিত করেছেন।

কল্‌কাতা টেষ্টের জন্য ১৪ জন খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হয়েছে। গত বৎসর অমরনাথের নেতৃত্বে যে ভারতীয় দলটি পাকিস্থানে কয়েকটি ম্যাচ খেলে তাতে মিল্‌খা সিং খুবই কৃতিত্বে পরিচয় দেন। কলকাতায় এই তরুণ খেলোয়াড়টিকে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে আশা করা যায়। উইকেট রক্ষক হিসাবে ইন্দ্রজিৎ সিং নাম করেছেন। বোম্বাই এবং কানপুর টেষ্টে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে তাঁকে নেওয়া হয়। কলকাতা টেষ্টেও তাঁর নাম দলে আছে। কিন্তু খেলায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য তাঁর হবে কিনা বলা শক্ত। কলকাতায় নিম্ন-লিখিত খেলোয়াড়গণ পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

নরি কণ্ট্র্যাক্টর (অধিনায়ক)
পলি উমড়িগড়
বিজয় মঞ্জরেকার
সুভাষ গুপ্তে
চান্দু বোর্দে
বাপু নাদকার্ণী
আব্বাস আলি বেগ্
এম, জয়সীমা

মিলখা সিং
সুরেন্দ্রনাথ
এন, জামানে
আর, দেশাই
ইন্দ্রজিৎ সিং
কৃপী মূর্ত্তি

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ৪৫৩ (জি সোবার্স ১৩২, ওরেল ৬৫, সলোমন ৬৫, আলেকজণ্ডার ৬০, হল ৫০। ডিভিডসন ১৩৫ রাণে ৫ এবং ক্লিন ৫২ রাণে ৩ উইকেট পান।) ও ২৮৪ (ওরেল ৬৫, কানহাই ৫৪। ডেভিসন ৮৭ রানে ৬ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫০৫ (নর্ম্যান ও' নীল ১৮১, আর সিম্পসন ৯২, সি ম্যাকডোনাল্ড ৫৭। হল ১৪০ রানে ৪ উইকেট এবং সোবার্স ১১৫ রানে ২ উইকেট পান।

এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলা উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক রান হওয়ার দরুণ ড্র গেছে। সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই খেলাটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যর ডন ব্র্যাডম্যান এই খেলাকে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ টেষ্ট খেলা হিসাবে অভিনন্দিত করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের বর্ত্তমান অধিনায়ক রিচি বেনো বলেছেন 'ক্রিকেট খেলা যদি খেলতেই হয় তবে সে খেলা এই রকমই হওয়া উচিত'। এম. সি সি-র সম্পাদক বলেছেন, 'ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই টেষ্ট খেলাটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে'।

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম সরকারী টেষ্ট খেলা সুরু হয় ১৮৭৬-৭৭ সালে। এই খেলাই পৃথিবীর প্রথম সরকারী টেষ্ট ম্যাচ। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান এই সাতটি দেশের মধ্যেই কেবল সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলা সীমাবদ্ধ। এই দেশগুলির মধ্যে এ পর্য্যন্ত বহু সরকারী টেষ্ট খেলা হয়ে গেছে এবং নানা ধরণের রেকর্ডও সৃষ্টি হয়েছে ; কেবল একটি রেকর্ডের অভাব ছিল—খেলায় দুই দলের সমান সংখ্যক রান। সে রেকর্ডের সৃষ্টি হ'ল অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেষ্ট খেলায়।

ব্রিসবনের প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ওরেল টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং নেয়। প্রথম দিনের খেলায় ৭টা উইকেট পড়ে ৩৫৯ রান উঠে। দলের ৬৫ রানে ৩টে উইকেট পড়ে যায়। এই ভাঙ্গনের মুখে ৪র্থ উইকেটে সোবার্স এবং অধিনায়ক ওরেল জুটি বেঁধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। ৪র্থ উইকেটে জুটিতে ১৭৪ রান ওঠে। সোবার্স সেঞ্চুরী (১৩২) করেন।

২য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৪৫৩ রানে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শেষ দিকের খেলোয়াড় আলেকজেণ্ডার এবং বোলার হল ৯ম উইকেটে জুটি বেঁধে তাঁদের ৬৯ মিনিটের খেলায় ৮৬ রান তুলে দেন। অষ্ট্রেলিয়া এইদিন ৪ঘণ্টা ২৫ মিনিট খেলে ১৯৬ রান করে ৩টে উইকেট হারিয়ে। ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৫০৫ রানে শেষ হ'লে অষ্ট্রেলিয়া ৫২ রানে এগিয়ে থাকে। ও'নীল সেঞ্চুরী (১৮১) করেন। তিনি ৬ঘণ্টা ৪১ মিনিট ব্যাট ক'রে ২২টা বাউণ্ডারী করেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের শেষ পাঁচজন খেলোয়াড় মাত্র ৩৬ রান করে। এঁদের মধ্যে ৪ জন হলের বলে আউট হন। খেলার উপযোগী আলোর অভাব হেতু ২য় দিনের খেলা ৩৫ মিনিট আগে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট হারায় না, রানও কিছু হয় না।

৪র্থ দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৯টা উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান করে। অষ্ট্রেলিয়ার ফাষ্ট বোলার ডেভিডসন ৭০ রানে ৫টা উইকেট পান। চা-পানের বিরতির পরের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৫৫ রানে ৫টা উইকেট হারায়।

৫ম দিনের অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

দলের ২য় ইনিংস ২৮৪ রানে শেষ হয়। ১০ম উইকেটের জুটিতে দুই বোলার হল এবং ভ্যালেনটাইন ৪১ মিনিটের খেলায় মূল্যবান ৩১ রান যোগ করেন। হাতে খেলার সময় ৫ ঘণ্টা ১২ মিনিট। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের জন্য ২৩৩ রান দরকার। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই রান করা এমন কিছুই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ক্রিকেট খেলা অনিশ্চিত ফলাফলের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। এক্ষেত্রে তাই হ'ল। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের সূচনা খুবই খারাপ হ'ল। দলের মাত্র ১ রানে সিম্পসন আউট হ'লেন। অষ্ট্রেলিয়ার ৫টা উইকেট পড়ে গেল দলের ৫৭ রানে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বোলার হল উইকেটে আগুন ধরিয়ে দেন—১২ ওভার বল ক'রে অষ্ট্রেলিয়াকে মাত্র ৩৮ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান।

৫টা উইকেট পড়ে যখন অষ্ট্রেলিয়ার ৫৭ রান উঠেছে তখনও জয় লাভের লক্ষ্য স্থলে পৌঁছতে অষ্ট্রেলিয়ার ১৭৬ রান প্রয়োজন ছিল। খেলার এই অবস্থায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে জয়লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসের মতই ডেভিডসন এবং অধিনায়ক বেনো ৭ম উইকেটে জুটি বেঁধে খেলার চেহারাটা বদলে দিলেন। দলের ৯২ রানে ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে। তাঁরা দুজনে ৭ম উইকেটের জুটিতে ১৩৪ রান ক'রে দলের রাণ সংখ্যা দাঁড় করালেন ২২৬। ডেভিডসন ৮০ রাণ করেন এবং মরিয়া হয়ে রান নিতে গিয়ে তিনি রান আউট হন। দলের রান তখন ২৬৬—হাতে তখনও ৩টে উইকেট—জয়লাভের জন্যে মাত্র ৭ রান দরকার—এদিকে খেলা শেষ হ'তে মাত্র ৬ মিনিট বাকি। ৮ম উইকেটে জুটি বেঁধেছেন স্বয়ং অধিনায়ক রীচি বেনো এবং গ্রাউট। অপর দিকে হলের মারমুখী বল অপেক্ষা করছে। ক্রিকেট খেলায় এরকম উত্তেজনা ও উদ্দীপনা মিশ্রিত পরিস্থিতি আর কখনও দেখা যায়নি।

দলের ২২৬ রানের সঙ্গে আরও ২ রান যোগ হয়ে দাঁড়াল ২২৮ রান। এই রানের মাথায় হলের বাম্পার বল হুক করতে গিয়ে বেনো ক্যাচ তুলে আলেকজেণ্ডারের হাতে ধরা দিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার হাতে তখন ২টো উইকেট—জয়লাভের জন্যে তখনও ৫ রান বাকি—খেলা ভাঙতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। দলের ২২৮ রানের সঙ্গে গ্রাউট এবং ম্যাক্‌কিফ ১টা ক'রে রান যোগ করলেন—মোট রান দাঁড়াল ২৩০। দলের এই ২৩০ রানের মাথায় ম্যাক্‌কিফ হলের একটা বল জোরসে পিটালেন—মনে হল ৪রান হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হাণ্ট বলের পেছনে তীরের মত ছুটে বলটা ধরে আলেকজেণ্ডারকে ছুঁড়ে দিলেন। এদিকে ২ রান উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৩২ রান; ৩য় রান অর্থাৎ জয়সূচক রানটি পূর্ণ করতে গিয়ে গ্রাউট রান আউট হ'লেন—বিপদের কথা বুঝতে পেরে নিজের সমস্ত দেহকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে ফেলেও তিনি সীমানা রেখার নাগাল পেলেন না। ২৩২ রানের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটসম্যান ক্লিন বলটা মেরেই মরিয়া হয়ে ছুট্ দিলেন; কিন্তু ম্যাক্‌কীফ উইকেট-কীপারের দিকের উইকেটে পৌঁছবার আগেই সলোমন উইকেট ভেঙে দিয়ে ম্যাক্‌কীফকে রান আউট করলেন। টেষ্ট খেলার সমস্ত উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা এক নিমেষে নিবে গেল। মাত্র একটা রান না করতে পারার অক্ষমতা যেমন অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বেদনাদায়ক ঘটনা হয়ে রইলো, তেমনি একটা রান অষ্ট্রেলিয়াকে করতে না দেওয়ার গৌরব ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে অক্ষয় হয়ে রইলো।

আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৫-০ খেলায় রেলওয়ে দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি আটবার 'বার্ণা বেলাক' কাপ জয় লাভের গৌরব লাভ করেছে।

মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে রেলওয়ে দল ৩-০ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত ক'রে 'জয়লক্ষ্মী কাপ' জয়ী হয়েছে। জুনিয়ার দলগত বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩-০ খেলায় মহীশূরকে পরাজিত ক'রে 'রামানুজম ট্রফি' জয়লাভ করেছে।

জাতীয় টেবল টেনিস ফাইনাল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস: সুধীর থ্যাকার্সে (বোম্বাই) ২১-১৮, ২১-১৬, ২১-১৫ পয়েণ্টে পি পি হুসেনকারকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিসেস প্রিসকা রোজারিও

(বোম্বাই) ১৫-২১, ২২-২০, ১২-২১, ২১-১৭ পয়েণ্টে মীনা পরাণ্ডেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : সুধীর থ্যাকার্সে এবং এফ আর খোদাইজী (বোম্বাই) ২১-১২, ২১-১৫, ১৮-২১, ৮-২১, ২১-১৮ পয়েণ্টে গৌতম দেওয়ান এবং ডি পি সম্পতকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : মীনা পরাণ্ডে এবং রাসেল জন (রেলওয়ে) ২১-১৬, ২১-১৯, ২১-১৮ পয়েণ্টে জয় ডি'সুজা এবং মিসেস প্রিমকা রোজারিওকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : শৈকুমার (মহীশূর) ২১-৮, ২১-১০, ২০-৮ পয়েণ্টে ভি ডি মাদনানিকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস : এন রত্নায়ক (সিংহল) সুনন্দ কোরগুিকরকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : সুধার থ্যাকার্সে (বোম্বাই) এবং মীনা পরাণ্ডে (রেলওয়ে) ২১-১৬, ২১-১৭, ২১-১৮ পয়েণ্টে এফ আর খোদাইজী এবং ইন্দিরা আয়েঙ্গারকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা :

জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল :

পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ফাইনালে গতবারের বিজয়ী সার্ভিসেস দল ৮০-৬৬ পয়েণ্টে মহীশূরকে পরাজিত করে।

মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ফাইনালে মহীশূর ৪২-২৭ পয়েণ্টে পশ্চিম বাংলাকে পরাজিত করে উপর্যুপরি সাত বার জয়ী হয়েছে।

বালকদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ : ফাইনালে মহীশূর ৬৪-৪৮ পয়েণ্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

১৯৬০ সালের আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৩-২ খেলায় রেলদলকে (গত বারের রানার্স-আপ) পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি ৩ বার স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা কাপ জয়ী হয়েছে।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলস : নান্দু নাটেকার (বোম্বাই) ১৫-১, ১৫-৩ পয়েণ্টে ত্রিলোকনাথ শেঠকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস মীনা সা ১১-৮ ও ১১-৪ পয়েণ্টে শ্রীমতী প্রেম পরাশরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নান্দু নাটেকার এবং সি এ দেওরাজ ১৫-৪, ১৫-৭ পয়েণ্টে এ এল দিওয়ান এবং দীপু ঘোষকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী প্রেম পরাশর এবং শ্রীমতী এস কেলকার (বোম্বাই) ১৫-৭, ১৫-১২ পয়েণ্টে মিস মীনা সা এবং মিস ভি আদেরী (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : অশোক সৈয়দা (মধ্য ভারত) ১৫-৭, ১৮-১৪ পয়েণ্টে সতীশ ভাটিয়াকে (ইউ পি) পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ ফাইনাল :

১৯৬০ সালের রোভার্স কাপ ফুটবল খেলার ফাইনালের ২য় দিনে অন্ধ্র পুলিশ ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। প্রথম দিন খেলাটি গোল শূন্য অবস্থায় ড্র যায়। গত ১০ বৎসরের মধ্যে অন্ধ্র পুলিস (পূর্ব্ব নাম হায়দ্রাবাদ পুলিশ) ৭বার রোভার্স কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

অন্ধ্র পুলিশ সেমি-ফাইনালে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। প্রথম দিন খেলাটি ১-১ গোলে ড্র যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-২ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত করে। খেলাটি ২-২ গোলে ড্র যাচ্ছিল ; জার্নেল সিংয়ের সেম-সাইড গোলের জন্যে ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়। শেষ মিনিটে মোহনবাগান দলের জার্নেল সিং হেড করতে গিয়ে নিজ গোলে বলটি ঢুকিয়ে দেন।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

মিলনের পথে ২-৫০ মায়ের ডাক ২৲

অনুরূপা দেবী

গরীবের মেয়ে ৪-৫০ বিবর্তন ৪৲

রামগড় ৪-৫০ বাগ্‌দত্তা ৫৲

পোষ্যপুত্র ৪-৫০ পথের সাথী ৩৲

হারানো খাতা ৩৲ মন্ত্রশক্তি ৪-৫০

পূর্বাপর ৪৲

নিরুপমা দেবী

দিদি ৫৲ পরের ছেলে ৩৲

পুষ্পলতা দেবী

মরু-তৃষা ৩-৫০

নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় লেখিকাকে জানাইয়াছেন—

"* * ভরসা করি আপনার পুস্তকগুলি যথা সম্ভব সমাদৃত হইবে।"

শক্তিপদ রাজগুরু

মণিবেগম ৬৲

কেউ ফেরে নাই ৭-৫০

কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪-৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মনের অগোচরে ২৲

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অচল প্রেম ৪৲

ভাস্কর

[illegible] ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

উদাসীর মাঠ ২৲ পরাজয় ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

[illegible] ২-৫০

কানাই বসু

পয়লা এপ্রিল ২৲

রঙচুট ১-৭৫

ননীমাধব চৌধুরী

[illegible] ৪৲

প্রফুল্ল রায়

নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

উত্তরণ ২-৫০

গিরিবালা দেবী

খণ্ড-মেঘ ২৲

পঞ্চানন ঘোষাল

দুই পক্ষ ২-৫০

মুণ্ডহীন দেহ ৩-২৫

অন্ধকারের দেশে ৩-৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০

অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲

মুস্কিল আসান ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲

সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲

ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিবস্ত্র মানব ৪৲ কার্‌টুন ২-৫০

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

আশালতা সিংহ

মধুচন্দ্রিকা ২-৫০ ক্রন্দসী ১-৫০

লগন ব'য়ে যায় ১-৭৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

নিষ্কণ্টক ১-৫০ ভুলের ফসল ২৲

খেয়ালের খেসারৎ ২৲

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

লক্ষ্মীর বিবাহ ১-৫০

ভোলা সেন

উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

সুধীন্দ্রকুমার দেব

বিচ্ছেদ ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ

পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲

দক্ষিণের বিল ১ম ৪৲ ২য় ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়

কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের মন্দিরা ৩-৫০ কালকূট ৩৲

কানু কহে রাই ২-৫০

কাঁচামিঠে ৩৲ আদিম রিপু ৩৲

পথ বেঁধে দিল ২-৫০ গৌড়মল্লার ৪৲

বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ কানামাছি ২-৫০

পঞ্চভূত ২-৫০ ঝিন্দের বন্দী ৪-৫০

শাদা পৃথিবী ৩৲ ছায়াপথিক ৩৲

বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ বিষকন্যা ৩৲

দুর্গরহস্য ৩-৫০ চুয়াচন্দন ৩৲

ব্যোমকেশের গল্প ২-৫০

ব্যোমকেশের কাহিনী ২-৫০

ব্যোমকেশের ডায়েরী ২-৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল

নবীন যুবক ২-৫০ কলরব ২৲

প্রিয় বান্ধবী ৪৲ তরুণী-সঙ্ঘ ২৲

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲

দুই আর দু'য়ে চার ২-৫০

অশোককুমার মিত্র

দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পদ্মরাজ ৩৲

পদসঞ্চার ৫৲

উপনিবেশ

১—৩ পর্ব। প্রতি পর্ব—২-৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বহ্নুৎসব ১-৫০ ফণ-বসন্ত ১-৫০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল

পিতামহ ৬৲ নবমঞ্জরী ২-৫০

নঞ্‌তৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার

অনেক দিন ৩-৫০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

গহনার বাক্স ১-৫০

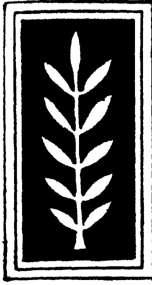
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাক জ্যোৎস্না ৩৲

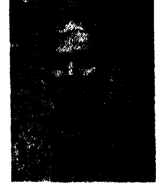


॥ ম হা শ্বে তা ॥

শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত





মাঘ—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর

অধ্যাপক অলোক রায়

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ। গত শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মানস তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র। সাহিত্য-প্রকরণেও উনবিংশ শতাব্দার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিণতির আভাস তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। যদি আদৌ রেনেসাঁস এসে থাকে, তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রই রেনেসাঁসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিধারার বিচিত্র প্রবাহে নবযুগের বাণী ধ্বনিত হয়েছে শতমুখে।

অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু 'জিজ্ঞাসা' থেকে সুরু করে কর্ম-কথা, চরিত-কথা, শব্দ-কথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ-কথা, জগৎ কথা প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তকগুলির রচনা কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ। রামেন্দ্রসুন্দরের মননেও তাই উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দর, কেউই যুগমানসের নিশ্চিত চিহ্ন অস্বীকার করেননি এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই তাঁদের চিন্তার জগৎ স্ববৈশিষ্ট্যে এবং দেশ-কালের পটভূমিকায় বিচার করা এত সহজ।

বঙ্কিমচন্দ্র আসলে ছিলেন কথাসাহিত্যিক—কল্পনা-নির্ভর জগতে তাঁর ছিল অতি সহজ বিচরণ। অনুভূতির আলোকে তাঁর দৃষ্টিতে বস্তুর স্বরূপ পালটে যেত। সৌন্দর্য-অভীপ্সা এবং কবি-মন থাকার ফলেই তাঁর প্রবন্ধ এত বেশি সাহিত্যিক গুণান্বিত এবং সুখপাঠ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে কলাবিদ্, রামেন্দ্রসুন্দর সেখানে

ছিলেন বিজ্ঞানবিদ্। বিজ্ঞানের অধ্যাপকও ছিলেন তিনি। অনেকগুলি প্রবন্ধতেই রামেন্দ্রসুন্দর আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন্ কোন্ মহলের দরজা খুলেছে এবং কোন্ প্রাসাদের রাজকন্যারা জেগে উঠছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাঙছে, সেই বিচিত্র কাহিনী বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য ত্রিবেদীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই খণ্ডের বিবিধ প্রবন্ধের রচনাসূচি লক্ষ্য করলে দেখবো, সেখানে একাধারে সাহিত্য-সমালোচনা, ঐতিহাসিক গবেষণা, দার্শনিক ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সমাজ সমস্যার সমাধান, রাজনৈতিক মর্মবেদনা সব কিছুর সমাবেশ ঘটেছে। মনোযোগী পাঠক একটু অবধান করলেই বুঝতে পারবেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের নবজাগৃতির ইতিহাস এই বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যেই বিধৃত আছে। বাঙালীর সুগভীর আবেগধর্মী দেশপ্রেম, আর্যত্ব এবং বাঙালী গরিমা, অতীত ভারতবর্ষ এবং প্রাচীনের প্রতি ভক্তিবিগলিত শ্রদ্ধা, সমাজ সমস্যার সাধ্যমত যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার, পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং দর্শনের প্রতি আগ্রহ, ইতিহাস চেতনা, এবং সর্বোপরি নবমানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই এই তথাকথিত রেনেসাঁস যুগটি চিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যেও তাই টেম্পেস্টের সঙ্গে তুলনায় শকুন্তলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, বাংলার কলঙ্ক অপসরণের জন্য দৃপ্ত প্রয়াস, বাঙালীর বাহু-বলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বঙ্গদেশের কৃষকের দুঃখে অশ্রু বিসর্জন, মনুষ্যত্ব অথবা জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা, 'বাঙ্গালা শাসনের কলে' রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ইত্যাদি আমরা পাচ্ছি। যদিচ মননশীল বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তির কষ্টি পাথরে পরীক্ষা না করে সাধারণত কোনো ঐতিহাসিক বা দার্শনিক কিংবা সাহিত্যিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করেন নি, তথাপি সমগ্রত বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন নব জাগরণের আবেগ-বন্যার হাত থেকে উদ্ধার পাননি এবং যদি বলি বিবিধ প্রবন্ধের মূল সুর বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মশ্লাঘা, আত্ম-সমালোচনা এবং আত্মপ্রসারের মধ্যেই নিহিত, তাহলে খুব সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না। বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার যে প্রবল প্রকাশ সহস্রধারায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিমানসেও সেই নবোন্মেষের ধাক্কা এসে লাগে এবং তাই বাঙালীর অতীত মহিমার জয়গান, বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা এবং অবনতির জন্য ধিক্কার-বোধ এবং ভবিষ্যৎ সুদিনের কল্পনায় রঙীণ স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ অবস্থায় তাঁর দৃষ্টি সর্বদা স্বচ্ছ থাকেনি—মন থাকেনি নৈর্ব্যক্তিক, চেতনা থাকেনি বিজ্ঞান-নির্ভর। ইতিহাসের ফাঁক তিনি ভরিয়েছেন কল্পনা দিয়ে, সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করেছেন ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের নির্দেশে, সমাজ সমস্যার দিয়েছেন অবাস্তব সমাধান এবং বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন অযৌক্তিক বিধান।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাপদ্ধতি এবং সমসাময়িক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে এখন সহজেই তাঁর প্রবন্ধের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা সম্ভব। প্রবন্ধের জন্য যে প্রকৃষ্ট বন্ধনের প্রয়োজন হয় তা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় ছিল—এই বন্ধন কখনো যুক্তির, কখনো কল্পনা বা অনুভূতির, কখনো তথ্যের, কখনো উপলব্ধির। কিন্তু প্রবন্ধের লেখক যেখানে সত্যানুসন্ধান অপেক্ষা সত্য প্রতিষ্ঠাতেই অধিকতর ব্যাকুল, সেখানে প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে নিজের আবেগ সঞ্চারিত করেছেন তিনি। আর তাই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মতো objective তথ্য আলোচনা করতে গিয়েও লেখেন—'যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র—বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'

বলা বাহুল্য কারো কথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য তার মাথায় বজ্রাঘাত বর্ষণ কামনা আমাদের মনে কৌতুকের সঞ্চার করে—সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই উত্তেজনা আমরা বর্তমানে প্রয়োজন বিবেচনা করি না।

এইখানেই বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর আসল মানস পার্থক্য। বিংশ শতাব্দীর মননে নিরাসক্ত জ্ঞান পিপাসাই প্রবল। সত্য প্রতিষ্ঠার আগ্রহ বহুলাংশেই নেই বললে চলে—আসলে সত্যানু-সন্ধানেই প্রবল অভীপ্সা। লক্ষ্য একটা আছে হয়তো, কিন্তু উত্তর মেঘের চেয়ে পূর্ব মেঘই প্রিয়তর। কেবলই পরীক্ষা, যুক্তিই একমাত্র গ্রাহ্য; দুঃসহ সত্যেরও সম্মুখীন হওয়ার সাহস।

অথচ রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বটে, কিন্তু ধর্ম-নির্ভর দার্শনিক নন, বিজ্ঞান-নির্ভর দার্শনিক। ভারতীয় শাস্ত্রে পূর্ব মীমাংসার প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ব মীমাংসার প্রথম সূত্র 'অথাতো সত্য জিজ্ঞাসা।' তাই গ্রন্থের সূচনাতেই শুনি—'জীবনদাতা, পিপাসা মাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্তি-ভেদ।'

আসলে আমাদের মূল বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীধারণ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি মিশন। তৎকালীন বাঙালী সমাজ-মানসের কামনা-বাসনা, অনীহা-অভীপ্সার সমাহারে কতকগুলি সাময়িক সত্য প্রতিপাদন করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সাধ এবং সাধ্য। তা ছাড়া বঙ্কিম-চন্দ্র নিজেও ছিলেন মূলতঃ কল্পনা-নির্ভর কথাসাহিত্যিক। কাজেই তাঁর প্রবন্ধ তথ্য এবং তত্ত্ব, আবেগ এবং কল্পনা, যুক্তি এবং উপলব্ধির সংযোগে এত স্বাদু এবং মনোহর হয়েছে।

জানি না কেবলমাত্র বুদ্ধিকে আশ্রয় করে, কেবলমাত্র যুক্তিমার্গে বিচরণ করে চিরন্তন সত্যকে লাভ করা যায় কিনা। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বঙ্কিমচন্দ্র অন্ততঃ এই পথে বিশ্বাসী ছিলেন না। (দ্রঃ দেবী চৌধুরাণী)। কিন্তু আগেই বলেছি বিংশ শতাব্দী একান্তভাবেই বস্তুবাদী—তাই তার পক্ষে সত্যলাভ সহজ না হলেও, তার পথ-পরিক্রমা অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য। রামেন্দ্রসুন্দর বিংশ শতাব্দীর মানস সন্তান।

বিজ্ঞানবিদ্ রামেন্দ্রসুন্দর যাত্রা সুরু করেছিলেন পদার্থ-বিদ্যাকে আশ্রয় করে (যদিও তিনি নিজে ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক)। অতি-প্রাকৃত, মাধ্যাকর্ষণ, বর্ণতত্ত্ব, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, নিয়মের রাজত্ব, বিজ্ঞানের পুতুল পূজা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। যদিও যতদূরসাধ্য সহজ করে লেখা, সরল এবং সুখপাঠ্য—তবু এগুলিকে Popular Science-এর নিদর্শন মনে করলে ভুল করবো। প্রায় অজ্ঞ সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখবার সময়ও রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধগুলিকে সরল করবার লোভে তরল করেননি—অর্থাৎ কল্পনা কিংবা আবেগের জল মিশিয়ে তাকে মনোহর করার চেষ্টা করেন নি কখনো।

কিন্তু বিংশ-শতাব্দী একদিকে যেমন বুদ্ধিবাদী, অন্য-দিকে তেমনি—অথবা সেই জন্যই তেমনি সংশয়বাদী। বিজ্ঞানের অজস্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিকরা আরও বেশি চঞ্চল এবং অস্থির হয়ে উঠছেন। এই অস্থিরতা কিসের জন্য? আসলে চরম সত্যকে জানা যাচ্ছে না। আর তাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ আইনস্টাইনের মানস পরিণতি লক্ষ্য করি দর্শন-জিজ্ঞাসায়। এই দার্শনিকতা পুঁথিগত তার্কিকতায় নয়, এর প্রকৃত স্বরূপ জীবন জিজ্ঞাসায়। আর তাই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সাহিত্যের একটা বড়ো অংশের বিষয় দর্শনশাস্ত্র। জগতের অস্তিত্ব, সুখ না দুঃখ, সত্য, সৃষ্টি, এক না দুই, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-দর্শন আলোচনায় দেখবো যে তিনি প্রধানতঃ হিন্দু ধর্ম-দর্শনে কোঁৎ, বেন্থাম, মিল্, স্পেন্সারের আলোকে যুগোচিত বর্ণনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের প্রয়োজনমত তিনি প্রচুর সংযোজন-বিয়োজন করেছেন—এবং চিরন্তন সত্য অপেক্ষা আপেক্ষিক সত্য আবিষ্কারেই তাঁর প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে রামেন্দ্র-সুন্দরের বৈজ্ঞানিক চিত্তে দর্শনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা বহু সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত এবং সত্যের আভাস আবিষ্কার করেছে। মায়াবাদ, নীটসে-সোপেনহাওয়ারের ভাববাদী দর্শন, রবীন্দ্রনাথের 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রভাব রামেন্দ্রসুন্দরের মননে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু মূলতঃ রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন নিরাসক্ত জ্ঞানবাদী। বিংশ শতাব্দীর সব দার্শনিকই হয়তো এমন নন—কিন্তু এই-ই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সাধনা।

এ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সত্তার যে আলোচনা হোলো তা থেকে এমন মনে হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, রামেন্দ্রসুন্দর বুঝি একান্তভাবে যুক্তিবাদী নৈয়ায়িকের মত রসহীন নিরাসক্ত বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শন-জিজ্ঞাসু। কিন্তু প্রকৃত তা নয়। রামেন্দ্রসুন্দর আসলে ছিলেন সম্পূর্ণতার (perfection) পূজারী। যদিও কল্পনা-নির্ভর কাব্য বা কথাসাহিত্য রচনায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়নি, তবু তাঁর প্রবন্ধ পড়লেই দেখি, তার মধ্যে আশ্চর্য এক রুচিবান বিদগ্ধ শিল্পী-চিত্ত সদাপ্রকাশিত। তাই

তাঁর উজ্জ্বল গদ্য রচনা, সরল সহজ বাক্‌ভঙ্গী, অনুচ্ছেদের সুসামঞ্জস গঠন, রচনাশৈলীর সজীবতা আজও আমাদের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। 'তাঁর আলোচনায় শুধু পাণ্ডিত্যের অথবা নিরর্থ বাচালতার আভাস মাত্র নেই। সে আলোচনা স্বাধীন চিন্তার আলোয় দীপ্ত এবং সাহিত্য রসে অভিষিক্ত।'

তবু গদ্য-শিল্পী হিসেবে কিংবা সাধারণভাবে সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের তুলনা করলে, শেষোক্তের প্রতি অবিচার হওয়ারই সম্ভাবনা। বঙ্কিমচন্দ্র যুগ-প্রবর্তক সাহিত্যিক—তাঁর লেখনীর প্রতিযোগী হওয়ার দুঃসাহস রামেন্দ্রসুন্দর কখনো করেন নি। কিন্তু নিছক প্রাবন্ধিক হিসেবে বিচার করলে দেখবো যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি অতি উচ্চ আসন অবধার্য। কারণ প্রবন্ধ লেখাটা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মাসিক পত্রিকার তাগিদ পূরণ এবং সাময়িক উত্তেজনার নিবৃত্তি। ফলে মনোযোগী পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে প্রচুর তথ্যগত ভ্রান্তি এবং তত্ত্বগত অপূর্ণতা এবং স্ববিরোধ চোখে পড়বেই। 'বিবিধ প্রবন্ধ' বঙ্কিমচন্দ্রের অসতর্ক সৃষ্টি। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর কর্মে এবং মর্মে সর্বদা গভীর এবং গম্ভীর—ফলে অনেক অধ্যয়ন, প্রচুর চিন্তা এবং সতর্ক প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধগুলিকে এক আশ্চর্য সম্পূর্ণতা দিয়েছে। বিষয়বস্তুর অপরিচিতি এবং কিছুটা অনুৎসাহের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর বহু-পঠিত লেখক নন—কিন্তু উৎসাহী এবং মনোযোগী পাঠক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধাবলীর মধ্যেও রত্নগর্ভ খনি আবিষ্কার করতে সক্ষম।

দ্বিজেন্দ্রলাল

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুনি-ঋষির পরশ-উজল এ-দেশ যখন ঘুমের ঘোরে
লুপ্ত-চেতন—রাত্রিশেষের ভয়ালতম সেই প্রহরে
মন্দ্র-গভীর কণ্ঠে তুমি আত্মভোলা গানে গানে
সুপ্তি ভেঙে দিলে জাতির।—জাগরণের সে-আহ্বানে
একে একে মেলল নয়ন দেশের মানুষ ঘরে ঘরে :
হাসলে তুমি দেয়ান-তলে—হাসল তারা পুলক ভরে!
যে-নদীয়ার পথে পথে প্রেমের ঠাকুর রসের প্রসাদ
দিয়েছিলেন, সে-পথ বেয়েই চলল, রসিক, তোমার অবাধ
রসের মিছিল : দেশের হাওয়া, দেশের মাটি উঠল হেসে,
হাসল মানুষ : তুমি তাদের টেনে নিলে প্রেমাশ্লেষে!
বিস্মরণের দারুণ শাপে আত্মহারা জাতির মনে
তুমিই আবার দিলে দিশা : পুরাণ, গীতা, রামায়ণে
যাদের অতীত জীবন-গাথা অমর আজো, যাদের ঘরে
যুগে যুগে নারায়ণের জন্ম হল, তাদের তরে
দাসত্ব আর পদলেহন? তাদের তরে গ্লানির বিধান?
অমঙ্গলের পঙ্ক থেকে তাদের কি হায় মিলবে না ত্রাণ?
হে উদাসী, তোমার বাঁশী স্বদেশ-প্রেমের দীপক-রাগে
বাজল : নাটক, কাব্যে, গানে—মন্ত্র জ্বেলে চললে আগে
যুগান্তরের দুর্নিরীক্ষ দীপ্তি চেয়ে, চেয়ে আজাদ :
রেখে গেলে অনাগত যুগের তরে আনন্দ-স্বাদ!
তোমার চলা পথের পানে তাকিয়ে থাকি সবিস্ময়ে
চিরন্তনের হে বীর চারণ, হাজার পতন অভ্যুদয়ে
তোমার দেওয়া অগণিত বিভব যেন স্মরণ ক'রে
আমরা জাগি নতুন থেকে নতুনতর যুগের ভোরে!





বোবা ঢেউ

হরেন ঘোষ

বই খুলে সবে পড়তে বসেছে হেমন্ত, দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করে বাইরে এল।

—ও, আপনি! কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। সামনে দাঁড়িয়ে বলাকা রায়।

এতদিন হল এসেছে, আলাপ হয়নি বিশেষ কারো সঙ্গে। শুধু যাতায়াতের পথে দেখা হয়। মুখ চেনা। সরু গলিটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার ডানহাতি দরজায় হেমন্ত আর বাঁহাতিতে বলাকা, প্রায়ই একসঙ্গে ঢুকেছে। অথচ কথা হয়নি কেউ কারো সঙ্গে। মুখ তুলে তাকিয়েছে, চোখ নামিয়ে নিয়েছে এই পর্যন্ত। জানে সে তারই লাগোয়া পাশের ঘরে থাকে ও। কখনো-কখনো বই পড়ার মৃদু গুঞ্জন কানে এসেছে।

কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল হেমন্ত।

—আপনাকে বিরক্ত করলুম বোধহয়। অপরাধীর ভঙ্গিতে বললো বলাকা। যদি দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার পোয়েট্রি বইখানা দেন। আর বলতে হল না। চটি চটপটিয়ে ভেতরে এসে সদ্য পড়তে বসার জন্যে খোলা বইখানা বন্ধ করে হাতে নিয়ে বাইরে এসেই বুঝলো অশিষ্টতা হয়ে গেছে; আনছি বা অপেক্ষা করুন গোছের কিছু একটা বলা উচিত ছিল তার।

—ধন্যবাদ। বইটা হাতে নিয়ে হাসিমুখে বললো বলাকা, হঠাৎ কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিনা বইটা। ইচ্ছে করেই কৈফিয়ৎটুকু দিল। ভদ্রতা। হাসি হাসি মুখ নিয়েই পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল বলাকা। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে হেমন্ত দেখল, কাঁধের ওপর ভেঙ্গে-পড়া খোঁপা ক্রমশঃ হারিয়ে গেল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে এল হেমন্ত। পড়া যাক অন্য কোন বই।

গলির মুখেই দেখা হল। হাসলো হেমন্ত—এই ফিরছেন?

ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে ম্লান হাসল বলাকা। বাঁহাত উঁচিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়া খোঁপাটা ঠিক করতে করতে বলল—যা গরম। কথার শেষে ভেঙ্গে পড়ল একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ।

কথা না বলে একসঙ্গে গলি অতিক্রম করে দু-পাশের দরজায় ঢুকল দুজন। হঠাৎ পেছন ফিরল হেমন্ত। ঘামে ভিজে জবজব করছে বলাকার পিঠের ব্লাউজ। যেটুকু চোখে পড়ে।

স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে বেরোবার জন্যে তৈরি হল হেমন্ত। অনেকদিন ছোটমাসির কাছে যাওয়া হয়নি। কাঁধে বুকে পাউডার ঢালল, রুমালে সেন্ট—যা বিশ্রী ঘামের গন্ধ হয়!

ফিরতি মুখে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল। বারবার ঘড়ি দেখল। দেরি হয়ে গেছে। আরো আগে ফেরা উচিত ছিল, ভাবল মনে মনে। দাদার অবশ্য ফিরতে ঢের দেরি। তবু রেগুলারিটি রাখা উচিত। একটা বাস এল। এগিয়ে গিয়ে রড্ ধরবার আগেই একটি মেয়ে প্রায় দৌড়ে এসে পাশ কাটিয়ে ফুটবোর্ডে পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাস ছাড়ল। লাফিয়ে উঠল হেমন্ত। টাল সামলাতে না পেরে মেয়েটার গায়ে ধাক্কা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি ওপরের রড ধরে নিজেকে সামলে নিল—মাপ করবেন। অস্ফুট স্বরে বলল।

ফিরে তাকাল মেয়েটি। বলাকা রায়। ও আপনি!

মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল হেমন্তর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

—তাই বুঝি মাপ করবেন কথা উইথড্র করতে চান? মৃদুস্বরে বলল বলাকা। ওর দিকে তাকিয়ে লেডিস সীট দখলী ভদ্রলোক দুজন বিরক্তি সূচক মুখভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালেন।

—আসুন! হেমন্তর দিকে তাকিয়ে বলল বলাকা। এগিয়ে গেল ভিড় কাটিয়ে। কথা না বাড়িয়ে পাশে বসল হেমন্ত। দুজনের ভাড়াই তার দেওয়া উচিত ভেবে পকেটে হাত দিল হেমন্ত। সে পয়সা বার করবার আগেই একটা সিকি এগিয়ে দিল বলাকা—দু-খানা গোল পার্ক।

—ফিরে তাকাল হেমন্ত, ভাবল কি বলা উচিত হবে? শেষে মুখে কিছু না বলে মনে মনে বারবার উচ্চারণ করল, ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়।

—কোথায় গেছলেন? একেবারে চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকাটা ভারি অস্বস্তিকর, ভাবল হেমন্ত। অনেকটা সহজ হতে পেরেছে এতক্ষণে।

—ট্যুশনি। ফ্যাকাশে হাসি হাসল বলাকা। আমার কি বিনা কাজে বেড়িয়ে বেড়াবার অবস্থা!

ভাবল হেমন্ত, হয়ত জিজ্ঞেস করাটা উচিত হয়নি। কিন্তু সে-তো কোন কিছু ভেবে জিজ্ঞেস করেনি। সাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতা বোধে—তার ভাবনা থেমে গেল বলাকার কথায়।

—সেই ভোর পাঁচটায় উঠি। দশটা পর্যন্ত মর্নিং স্কুলে কাজ করি। ফিরে এসেই ঝিয়ের রান্না গিলে ছুটি কলেজে। বিকেলে ফিরেই বা কতটুকুর সময় পাই। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। এই ট্যুশনি সেরে যাচ্ছি। এখন গিয়ে রান্না করতে হবে। এবেলায় নিজেই রাঁধি। তারপর পড়াশুনো। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল বলাকা। ভাবছি এ বছরটা ড্রপ করবো। কিছুই তৈরি হয়নি।

চুপ করে রইল হেমন্ত। এত স্বল্প পরিচয়ে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্য ও অন্তরঙ্গ কথা এমনিভাবে কেউ বলতে পারে, ভাবেনি সে। সহানুভূতি ও সমবেদনায় মন ভরে গেল তার। মনে পড়ল তার, যখন সে শুয়ে পড়ে, তখনো গুনগুন পড়ার শব্দ কানে আসে। কোন কথাই বললো না সে, বলতে পারল না।

বাস থেকে নেমে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এল ওরা। কথাবার্তা হল না বিশেষ। গলির মুখে বছর সাত আটের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসিমুখে ছুটে এসে হাত ধরল বলাকার—মা, আমার 'ইয়ো-ইয়ো' এনেছ?

—হাঁ বাবা। হাতের ব্যাগটা ফাঁক করে বার করল বলাকা, এই নাও। ভেঙ্গো না যেন।

'ইয়ো-ইয়ো' হাতে নিয়ে আবার ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

—আপনার ছেলে? বিস্মিত প্রশ্ন বেরিয়ে এল হেমন্তর মুখ থেকে।

—হ্যাঁ। হাসল বলাকা, দেখে বোঝা যায় না বুঝি?

—আমার তো মনে হয়েছিল এই সবে আপনার বিয়ে হয়েছে। ওর সূক্ষ্ম সিঁথির ম্লান সিঁদুরের দিকে চেয়ে বলল হেমন্ত।

—সবাই তাই ভাবে। হাসল বলাকা। ছেলের বয়েস আট বছর, তার দুবছর আগে বিয়ে হয়েছে। এখন আমার ছাব্বিশ। হিসেবটা যেন মুখস্থ আছে ওর।

—ছাব্বিশ? চোখ বড় বড় করল হেমন্ত, একদম বোঝা যায় না তো। আমি ভেবেছিলাম—

—উনিশ! ওকে থামিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল বলাকা।

—না, আরো কম! হেসে বলল হেমন্ত। দুপাশের দরজায় ঢুকল দুজন।

—দেখুন, শেকসপীয়রটা যদি কনসার্ট করে পড়া যায়, দুজনেরই সুবিধে হয়। বড্ড কঠিন লাগে।

—বেশতো, বলাকার কথা লুফে নিল হেমন্ত, আমিও ভাবছিলাম—

—সাহস হচ্ছিল না বুঝি? হাসল বলাকা। রোজ কিন্তু নয়, সোম-বুধ-শুকুকুর, ঐ তিনদিন, আমি তাড়াতাড়ি ফিরি।

—আচ্ছা। আপনি তো ওদিকে যাবেন। গলির মুখে এসে দুজন দুপথে পা বাড়ালো।

বই খুলে পড়তে বসেছে অথচ মাথায় ঢুকছে না কিছু। অনেক প্রশ্নের পোকা কিলবিল করছে মাথায়। অদম্য কৌতূহল। কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে।

...র জিজ্ঞেস করাটাও বোধহয় ঠিক হবে না। অগত্যা ...নের প্রশ্ন মনে চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই ...কান।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সচকিত হল হেমন্ত। ...ড়ি দেখল। এর মধ্যে আটটা বেজে গেল! এতক্ষণ ...ময় কেটে গেছে! ভাবছিল সে, আর পাঁচজন মেয়ের ...ত নয়। বেশ সরল। তাছাড়া মেয়েরা তো বয়েস ...মিয়েই বলতে চায়, এ দেখি ঠিক তার উল্টো।

—আসুন। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল সে।

বইখাতা হাতে ভেতরে ঢুকলো বলাকা। দুটো ...চয়ারে মুখোমুখি বসল দুজন। খোলা বই সামনে রেখে ...কে পড়ে পড়তে আরম্ভ করল হেমন্ত। দুচার লাইন ...ড়ে মুখ তুললো। বলাকা বুঝিয়ে দিল হাত নেড়ে।—...ড়ে যান।

পাতা কয়েক পড়বার পর খেয়াল হল হেমন্তর, বলা-...কার কথাগুলো কেমন জড়িয়ে আসছে। ঘন ঘন হাই ...ুলছে, হাতের আড়াল দিয়ে। চোখ দুটো কেমন ...লু ঢুলু।

—আজ এই পর্যন্ত থাক। আপনার ঘুম পেয়েছে ...নে হচ্ছে। শব্দ করে বই বন্ধ করল হেমন্ত।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বলাকা। আবার ...াই তুললো।—সত্যি এত টায়ার্ড লাগে। নিঃশব্দে বই-খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার চাকরের উদ্দেশে হাঁক দিল হেমন্ত—মহেন্দ্র, ...খেতে দে। দাদা এখনো ফেরেন নি।

—যদি আপত্তি না থাকে, অপরাধ নেবেন না, আমতা আমতা করে হেমন্ত, বড় জানতে ইচ্ছে করে আপনার কথা। এতদিন হল আলাপ পরিচয়—

—না, না, মনে করবো আবার কি! হাসলো বলাকা। তবে একটা অনুরোধ আছে, আমি জানতে পেরেছি আপনি গল্প লেখেন, আমার কথা আবার লিখ-বেন :না যেন। যদিও তেমন কিছু নয়। গতানুগতিক সাধারণ, উপন্যাসে এমন অনেক পড়েছেন। আবার হাসলো বলাকা।

—না না, আমি তো বানিয়ে লিখি, যত সব ছাইভস্ম। আর যদি কখনো লিখি আপনার কথা, নামধাম পালটে দোব।

—তবে তো পড়া হবে না আজ।

—না হোক কাল মেকাপ করা যাবে। হঠাৎ ওর বই শুদ্ধ দুহাত চেপে ধরলো হেমন্ত, নিন আরম্ভ করুন। মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল ওর হাত। ছিঃ ছিঃ বড় অন্যায় হয়ে গেল,' ভাবলো মনে মনে। এতটা আগ্রহ বা কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। খিল খিল করে হেসে উঠলো বলাকা।

—যদি আপনার কষ্ট হয়—সংশোধন করতে চাইলে হেমন্ত।

—না না, মাথা ঝাঁকালো বলাকা। সাপের মত বেণী দুটো এ পাশ থেকে ও পাশে গেল। দুচোখ মেলে ওর মুখে সোজাসুজি তাকালো। উৎকর্ণ হয়ে রইল হেমন্ত।

বাবা অল্প বয়সে বিয়ে দিলেন। ভালো ঘর, বড়লোক, একমাত্র ছেলে। তবে ছেলে কিছু করে না। মানে করতে হয় না। আমার তখন কতই বা বয়েস। কতটুকু জানি পৃথিবীর। চোখে নতুনত্ব আর না-জানার মোহ। লেখাপড়া যা শিখেছি ঘরে বসে। কদিন পরই জানলাম আমার পতিদেবতা শুধু বেকার বা মূর্খই নন, আরো অনেকগুলো মহৎগুণের অধিকারী। ফ্লাশ খেলা তার নিয়মিত অভ্যেস। রঙীণ পানীয় তার সঙ্গী, আর কপালও ঘোড়ার পায়ে বাঁধা। চরিত্রশোধনের জন্যে বিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমারই মত একটি রঙিণ জীবনের স্বপ্ন দেখা মেয়ে তার বলি। আগে ছিলেন মা, প্রয়োজনের সময় পয়সা জোগাতেন, আদর অত্যাচার সহ্য করতেন। এখন স্ত্রী। আমি ভয় পেতাম খুব। যখন যা বলেছে শুনেছি, অবাধ্য হইনি। যা চেয়েছে দিয়েছি। একে একে নানা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমার গয়না নিত। চোরের ভয়, ব্যাঙ্কে রাখা ভালো ইত্যাদি। শাশুড়ি আমায় উপদেশ দিতেন, শক্ত হতে বলতেন। চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার মিষ্টি কথা, ছলছল চোখ আমার সব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়ে দিত, দৃঢ়তা ভেঙ্গে দিত। শেষে যেদিন আমার গলার হার, যেটি আমার মা দিয়েছিলেন, সেটি চাইলে, সেই প্রথম বিদ্রোহ করলাম—সব তো দিয়েছি, এটা মায়ের

স্মৃতিচিহ্ন। তা ছাড়া নতুন বৌ, একেবারে খালি গলায় থাকা উচিত নয়। সবাই জানতে চাইবে।

প্রথমে কাতর অনুনয় বিনয়, তারপর স্বরূপ প্রকাশ পেল। হুঙ্কার ছাড়ল এবার, নিজের স্বামীর চাইতে অন্যের কথা হল বড় ?

ভয় পেলাম তার চেহারা দেখে। কোন কথা না বলে, বেরিয়ে গেলাম। রাত্রে অন্যদিনের চাইতে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়ল। বললাম—খাবে না ?

—বিরক্ত করো না। শরীর খারাপ।

আমিও পেড়াপেড়ি করলাম না। শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ গলায় যন্ত্রণা পেয়ে চিৎকার করে উঠে বসলাম বিছানায়। গলায় হাত দিলাম, হার নেই। পাশে তাকালাম, সে নেই।

চেঁচামেচি করা ভুল হবে। তখনো কাঠের সিঁড়িতে তার জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়নি। চাকর জেগে উঠবে, সে এক কেলেঙ্কারী। ওদিকে কোণের ঘরে শাশুড়ি, তাঁর ঘুম ভাঙেনি। দু-হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম। বালিশ ভিজে গেল। সে রাতে আর ঘুমুতে পারলাম না। না, হারের দুঃখে নয়। তার আর এক পরিচয় পেলাম বলে।

পরদিন আর কিছু গোপন রইল না। সব রাগ আমারই ওপর। দোষ যেন আমারই। যখন চেয়েছিল, দিইনি কেন। তাহলে ত এমন হোত না। নিজের ঘরে এসে কাজে মন দিলাম। ছোট্ট একটুকরো কাগজ চোখে পড়লো। তুলে নিয়ে দেখলাম। হাসি পেল। একটা ঠাট্টা মত ছোট্ট একটা কথা—অবাধ্য স্ত্রীর শাস্তি। একটা হার না থাকাই যেন আমার বড় শাস্তি। ঠিকই—এর চাইতে আর কি বেশি লিখতে পারত, আর কি বেশি চিন্তা করতে পারে ওর মত শিক্ষিত লোক।

সব খুলে বাবাকে চিঠি লিখলাম। কেই বা আর আছে আমার ? বাবা গেলেন। তাঁকেও আমার জন্যে কটু কথা শুনতে হোল। মনের রাগ তিনি মনে চেপে রাখলেন। কোন কথা বললেন না। আমারি জন্যে নাকি ঘর ছেড়ে গিয়েছে তাঁর ছেলে, শাশুড়ি এ কথাটাও বাবাকে শোনাতে ভুললেন না। বাবা আমায় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে বললেন। শাশুড়ি অমত করলেন না। বললেন চিঠি দিতে। তখন আমি মা হতে যাচ্ছি! পবিত্র এখানেই হয়েছে।

—এতদিন তার কোন খোঁজ নেই আর ? এতক্ষণে কথা বললো হেমন্ত !

—উঁহু, একবার এসেছিল এখানে। বছর দুয়েক পর। বাবার হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলো। আমার কাছে অনেক চোখের জল ফেললো। বললো—চাকরি পেয়েছে, আমায় নিয়ে যাবে। বাবা বিশ্বাস করলেন না। ওর বিদ্যে বুদ্ধির দৌড় তাঁর অজানা নয়।

আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, যাব না। তখন থেকেই নতুন করে পড়াশুনো আরম্ভ করলাম। শ্বশুরবাড়ি থেকেও আর খোঁজ খবর করে'নি। বাবা ভয়ঙ্কর জেদী ও বদরাগী। তিনি বললেন—একটা ভুল করে ফেলেছি, আর নয়। লেখা-পড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়া। হাই তুললো বলাকা, হাত আড়াল করে।

—আপনার ঘুম পেয়ে গেছে, তবে না হয় আজ এই পর্যন্ত থাক, বললো হেমন্ত ওর দিকে চেয়ে।

—আর তো শুনবার কিছু নেই। হাসলো বলাকা। কাহিনী তো শেষ হয়ে গেল। বই খাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো—চলি আজ।

কোন কথা বললো না হেমন্ত। মন ভার হয়ে গেছে তার। অন্য কিছু ভাবতে পারছে না সে। সামান্য একটা ভুলের জন্যে একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এই ভাবে! সহানুভূতিতে করুণায় ভরে গেল ওর মন। ইকনমিকস্ বইটা খুলে চোখের সামনে মেললো। একটি অক্ষরও ঢুকছে না মাথায়। চাকরকে খাবার দেবার কথা বলতেও ভুলে গেল।

তিন চারদিন দেখা নেই বলাকার। ভাবলো, অসুস্থ হয়ে পড়েছে হয়ত। বিচিত্র নয়। যা খাটুনি, শরীরের দোষ কি ? কিন্তু খোঁজ নেওয়া যায় কি ভাবে ?

অন্য মনে পড়তে বসলো সন্ধ্যের সময়। কিছুক্ষণ পরই কানে এলো, পাশের ঘরে কে যেন কাকে উচ্চকণ্ঠে ধমক দিচ্ছে। কান খাড়া করলো হেমন্ত। চাপা নারীকণ্ঠও কানে আসছে। উঠে জানলায় গেলো।

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, চেঁচিয়ো না। পাশের ঘরের ভদ্রলোক শুনতে পাবেন যে। তাছাড়া ওঁর পড়ারও অসুবিধে হবে। কেঁপে উঠলো হেমন্ত। এ তার অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর।

—খুব যে দরদ দেখছি। পিরীত জমে উঠেছে বেশ! ও বিকৃতস্বর কানে এলো। কান লাল হয়ে উঠলো হেমন্তর। মনে হল আর দাঁড়িয়ে শুনে লাভ নেই। তবু নড়তে পারলো না।

—যা তা বোলো না। এবার দৃঢ় কণ্ঠস্বর বলাকার। এ ঘর থেকে যাও এখন। পড়ছি আমি।

—আহা! আমি ওর হুকুমের চাকর! এক চড়ে দাঁত ভেঙ্গে দেব। সশব্দে একটা চড় পড়লো। বিদ্রোহ করে উঠলো হেমন্তর দেহমন। ভাবলো একছুটে গিয়ে ঐ পশুর কণ্ঠরোধ করে দেবে। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করলো। আমি কে? কি অধিকার আমার? মিছি-মিছি পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাওয়া উচিত নয়।

এবার ফুঁসে উঠলো বলাকা—এতো বড় সাহস তোমার? আমার বাড়িতে আমার গায়ে হাত! এরপর রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ কানে এলো তার। ঘরের জিনিষপত্র পড়ার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি জানলাটা বন্ধ করে দিল হেমন্ত।

পরদিন সকালেই চোখাচোখি হোল। কথা না বললেই ভালো, তবু সামনাসামনি পড়তেই জিজ্ঞেস করলো, দেখি না যে কয়েকদিন। শরীর খারাপ নাকি?

ম্লান হাসি হাসলো বলাকা। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখের নীচটা ঢাকবার আগেই চোখে পড়লো হেমন্তর, নীল দাগ। রক্ত জমে গেছে মনে হয়।—হঠাৎ ও এসে হাজির। বললাম, সামনে পরীক্ষা—বিরক্ত কোরো না। কে শোনে কার কথা! যখন তখন যা ইচ্ছে হুকুম। কদিন ধরে স্কুল কলেজ সব বন্ধ। এমন করলে চাকরি থাকবে না।

পাশাপাশি হাঁটলে ওরা। ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো বলাকা—পুরুষগুলো ভারি ইয়ে।

ফাগ ছড়িয়ে পড়লো ওর মুখেচোখে। মাথা নীচু করলো হেমন্ত। আর কোন কথা হোল না। বলাকার বাস এসে গেল। ওরদিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়লো। অর্থাৎ চলি এখন।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হেমন্ত। সন্ধ্যে হয়েছে কিছু আগে। কান খাড়া করলো, যদি শোনা যায় কিছু। হ্যাঁ ফিসফিস কথা কানে আসছে। বোঝা যায় না কিছু। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। না, সেই একই চাপা কথাবার্তা। জানলা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে এসে বসলো। আকাশ পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলো।

বেরোবার জন্যে তৈরি হয়েছে সবে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোলো। বাইরে এলো হেমন্ত। মুখোমুখি হতেই চমকে উঠলো। এ রূপ তো দেখেনি আগে! মাথায় ঘোমটা টানা, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর রেখা, হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে বলাকা। নববধূর সলাজ ভঙ্গি। এখনো সেই রক্তজমা নীল দাগটা মিলিয়ে যায় নি। রক্ত-লাল শাড়ি পরেছে।

—চললুম ভাই। হেমন্তর মুখে চোখ রেখে বললো বলাকা।

চমকে উঠলো হেমন্ত। জোর করে সহজ ভাব ফোটালো মুখে—কোথায়? পবিত্র এসে দাঁড়ালো পাশে। হাত ধরলো ওর—চলো মা। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। —ও বলেছে চাকরি পেয়েছে। বাবাও বললেন, ও নাকি অনুতপ্ত। এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। যাই, দেখি। হাসি হাসি মুখেও দীর্ঘশ্বাস আটকাতে পরলো না।

—পরীক্ষা দেবেন না? ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে হেমন্ত।

—এ বার আর হোলো কই! স্কুলে রেজিগ্‌নেশন লেটার পাঠিয়েছি, কলেজে না গেলেই নাম কেটে দেবে। যাই, ও স্টেশনে চলে গেছে আগে। চোখ নামিয়ে নিলো বলাকা।

হাত ধরে টানলো পবিত্র—চলো মা। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

—আসুন। হাত জোড় করলো হেমন্ত। হাসতে চেষ্টা করলো।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলাকা—অনড় অচল হেমন্ত একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইল। ভাবতে চেষ্টা করলো আনুপূর্বিক ঘটনা। সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। একি হোলো? কেমন করে সম্ভব হোলো? অন্যায় অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদ যে একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে দিবারাত্র এমন পরিশ্রম করছিলো, সে কিনা আজ আবার এমনি ভাবে হাসিমুখে সব ফেলেছেড়ে পরম বিশ্বাসে এগিয়ে যাচ্ছে! মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়েই এতক্ষণে সশব্দে হেসে উঠলো হেমন্ত।

নালন্দা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

॥ ১ ॥

পাটনার পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন মাইল দক্ষিণ পূর্বে রাজগীরের সন্নিকটে বড়গাঁও ; প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ এইখানেই পাওয়া গিয়াছে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে ব্রিটিশ আমলে যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা স্থগিত থাকে ; যুদ্ধের শেষাশেষি লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি' নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পীঠস্থান খনন করিবার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ড. স্পূনার ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে খনন-কার্য আরম্ভ করেন।[১] বিশ বছর ধরিয়া অবিরাম খননের ফলে স্তূপ, মঠ, মন্দির, সংঘারাম, বিহার প্রভৃতির আবিষ্কার ব্যতীত বহু ও ভাস্কর্যের অনুপম শিল্পকলা ও শিলালিপি প্রকটিত হওয়ায় উত্তর ভারতের ইতিহাস ও পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কথিত আছে নালন্দা শ্রীবুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্রের জন্ম ও মৃত্যু ভূমি ; এখানে মহারাজ অশোক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় অনেক পরে গুপ্তযুগে, আনুমানিক ৪৫০ খৃষ্টাব্দে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় দশ বছর ধরিয়া (আনুঃ ৪০০-৪১১ খৃঃ অঃ) ভারত ভ্রমণ করেন ; তিনি ভারত সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত অথচ কৌতূহলপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে সেই সময়ে হীন-যানী বৌদ্ধ ধর্মই প্রবল ছিল, মহাযান-পন্থীরা সামান্য মাথা চাড়া দিতে-ছিল। ইহার দুই শতাব্দী পরে ধর্মগুরু হিউয়েন-সাঙের (যুয়ানচুয়াঙ) পরিভ্রমণ কাল পর্যন্ত যে ইতিহাস তাহার উপর কোন আলোক সংপাত হয় নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ফা-হিয়েনের পরিদর্শন কালে নালন্দায় কোন শিক্ষায়তন ছিল না ; কয়েকজন গুপ্ত সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দার গুরুত্ব বর্ধিত হয়। গুপ্ত রাজারা বেশীর ভাগই ছিলেন হিন্দু, কিন্তু এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি, আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বিবিধ বৃত্তির বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য তাঁহাদের অন্য-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শক্রাদিত্য [প্রথম কুমারগুপ্ত] যাঁহার রাজত্বকাল ৪১৪ খৃঃ অঃ হইতে ৪৫৫ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ছিল, তিনিই সর্বপ্রথম নালন্দায় একটি সংঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার পরবর্তী তথাগতগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য) ও বুধগুপ্ত (বৌদ্ধগুপ্ত) প্রত্যেকেই এক একটি সংঘারামের প্রতিষ্ঠাতা।

হিউয়েন-সাঙ-এর মতে নরসিংহগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের একজন উঁচুদরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নরসিংহগুপ্ত ও হুনরাজ মিহিরগুলজয়ী মগধরাজ বালাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি ; কারণ নরসিংহগুপ্তের আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি 'বালাদিত্য' এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডঃ রায়চৌধুরী হিউয়েন-সাঙ-বর্ণিত বালাদিত্যকে ভানুগুপ্ত বলিতেছেন।[২] হিউয়েন-সাঙ আরও লিখিয়াছেন যে হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র পরিব্রাজকদের জন্য পান্থ-নিবাস ব্যতীত অসংখ্য স্তূপ ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছেন। নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত মঠটি জগদ্বিখ্যাত ছিল ; ইহা আগাগোড়া পিতলের পাতে ঢাকা এবং উচ্চতায় একশত ফুটের কম নয়। বালাদিত্যের উত্তরাধিকারী বজ্র (পরিচয় অজ্ঞাত) ও মধ্যভারতের এক অজ্ঞাত রাজা প্রত্যেকেই এক একটি সংঘারামের প্রতিষ্ঠাতা।

উক্ত ছয়টি সংঘারাম ও তৎসম্পর্কিত সৌধমালাকে বেষ্টন করিয়া এক অত্যুচ্চ ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর ছিল। খনন কার্য হইতে বুঝা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে আধ মাইল ব্যাপিয়া ছিল ; স্তূপ, বিহারাদি বিশিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন পংক্তিতে বিন্যস্ত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথবা বিশৃংখলভাবে নির্মিত হয় নাই। কেন্দ্রস্থ অট্টালিকাটিতে আটটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ বা হলঘর এবং অধ্যাপনার জন্য ব্যবহৃত তিন শত নাতিবৃহৎ ঘর ছিল ; সকল সৌধই উচ্চে কয়েক তল-বিশিষ্ট ও সুরম্য। মহাবিদ্যা-লয়ের প্রধান সৌধে প্রবেশ করিবার একটি তোরণ ; সংঘারামের সৌধ-গুলি নয়নরঞ্জন, স্তম্ভ অপূর্ব কারুকার্যময় ও মনোরম গম্বুজগুলি মেঘস্পর্শী। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা—ধৃত একটি শ্লোকে সৌধগুলি সম্বন্ধে উপমা আছে—

যস্যামম্বুধরাবলেহি শিখরশ্রেণী বিহারাবলী।
মালেবোর্ধ্ববিরাজিনী বিরচিতা ধাত্রা মনোজ্ঞা ভুবঃ ॥[৩]

—যেখানে মেঘস্পর্শী শিখর শ্রেণীযুক্ত বিহারসমূহ বিধাতা কর্তৃক বিরচিত পৃথিবীর চারু কণ্ঠহারের ন্যায় ঊর্ধ্বে বিলম্বিত হইয়া আছে।

হিউয়েন সাঙ এর শিষ্য ও জীবনী লেখক হুই-লি[৩] নালন্দার প্রাংগন (Campus) সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

গভীর ও স্বচ্ছতোয়া তড়াগসমূহ নীলপদ্মশোভিত, তীরে রক্তরাঙা কনকপুষ্পের স্তবক ও মধ্যে মধ্যে ছায়া শীতল ঘনহরিৎ আম্রকুঞ্জ চারি-দিকে শ্যাম শোভা বিকীরণ করিতেছে।…

বিদ্যার কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার খ্যাতি যে শুধু ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ, ই-সীং নামক চৈনিক-পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা নয়, আরও অনেকে নালন্দায় আগমন করিয়া বিদ্যাচর্চায় বহুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন। হিউয়েন-সাঙ ও ই-সীঙ এর অন্তর্বর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে সুদূর চীন, কোরিয়া, তিব্বত হইতে আগমন করেন—থং-সি, হিউয়েন-চিউ, তাও-হি, হুই-নিয়ে, আর্যবর্মণ, বুদ্ধধর্ম, তাও-সিঙ, তাঙ এবং হুই-লু।[৪]

খনন কার্যের ফলে তেরটি মঠের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ভু-

…স্থানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া বুঝা যায় যে সে সময়ে অধিকতর মঠের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল না। শ্রমণ ও ভিক্ষু ছাত্রেরা থাকিত মঠে। কম-পক্ষে মঠগুলি দ্বি-তলবিশিষ্ট ; প্রকোষ্ঠগুলির কয়েকটি একজন ছাত্রের ও কয়েকটি দুইজন ছাত্রের বাসোপযোগী ছিল। প্রতি ঘরে একটি বা দুইটি শিলা নির্মিত বেঞ্চি থাকিত, বোধ হয় শয়নের জন্য ; কয়েকটি কুলুঙ্গী থাকিত, তাহাতে প্রদীপ ও পুস্তকাদি রাখা চলিত। প্রতিটি মঠের প্রাংগণ-কোণে ছিল একটি করিয়া কূপ। ভোজনশালা সংক্রান্ত কোন কিছু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। দুইশত সমৃদ্ধ গ্রাম বৃত্তিস্বরূপে (endowment) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল, যাহার আয় হইতে বহুসংখ্যক ছাত্রের আহারাদি ও পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান হইত। নালন্দার পৃষ্ঠ-পোষকগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু, এজন্য হিন্দু ছাত্রেরাই উক্ত খাওয়া-পরা নি-খরচায় উপভোগ করিতে পাইত।

ই-সীঙ্ এর নালন্দায় অবস্থানকালে (আনুঃ ৬৭৫ খৃঃ অঃ) সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিতে তিন হাজার শ্রমণ-ভিক্ষু বাস করিত। হিউয়েন-সাঙ্ এর জীবনী লেখক হুই-লি বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়-পাদে নালন্দার ছাত্র সংখ্যা দশ সহস্র দাঁড়াইয়াছিল। নালন্দার গ্রন্থাগার তিনটি বিভিন্ন অট্টালিকায় বিভক্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। উহাদের নাম—রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক। ইহাদের মধ্যে রত্নদধি নয়তলবিশিষ্ট এবং প্রজ্ঞাপারমিতা ও যাবতীয় তান্ত্রিকগ্রন্থে পূর্ণ। এই ত্রিরত্নবিশিষ্ট গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা ও বিতর্ক এই চার প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইত।

॥ ২ ॥

এ হেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রবেশ দ্বারে দ্বাররক্ষক অজিপেডার স্ফিংসের মতই কতকগুলি হেঁয়ালি-পূর্ণ কঠিন প্রশ্ন করিত, উত্তর না দিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িত, উত্তরে ত্রুটি থাকিলে প্রবেশাধিকার মিলিত না। হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্রদের ভর্তির পূর্বে পরীক্ষা দিতে হইত ও কতকগুলি সর্ত বা নিয়ম পালন করিতে হইত। এতৎ সত্ত্বেও ভর্তি-প্রয়াসী ছাত্রদের ভিড় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিত।

মঠাধ্যক্ষই সাধারণ পরিচালনায় প্রধান কর্মকর্তা। দুইটি সংসদ ইহাকে পরিচালনা কার্যে সহায়তা করিত ; প্রথম, শিক্ষা-সংসদ (academic council) ও দ্বিতীয়, পরিচালনা-সংসদ (executive council)। শিক্ষা-সংসদ ছাত্র ভর্তি, পাঠ্যতালিকা নির্বাচন, অধ্যাপকদের কর্মনির্দেশ, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য নিয়ন্ত্রণ করিত। মঠাধ্যক্ষ যাবতীয় আভ্যন্তরীণ কার্য পরিচালনায় সর্বেসর্বা ছিলেন ; যেমন, শিক্ষণ-ব্যাপার, গ্রন্থাগার পরিদর্শন, নিয়মানুবর্তিতা-সংরক্ষণ প্রভৃতি ; এতদ্ভিন্ন, তিনি বোর্ডিং গৃহগুলির পরিদর্শন, খাদ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা, ছাত্রসংখ্যা ও 'সীট' নির্বাচন, মেসের জন্য সেবক ভৃত্যাদি নিয়োগ সম্পন্ন করিতেন। দশ হাজার ছাত্রের খাদ্যযোগান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা অর্থ ও শ্রমসাপেক্ষ ; এইজন্য এই বিরাট প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য পৃষ্ঠপোষক রাজা-মহারাজাদের অনেকগুলি গ্রামের (পূর্বেই বলিয়াছি দুইশত) আয় বরাদ্দ ছিল। অনেকগুলি গ্রামের সীলমোহর খনন হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ রূপে গণ্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীর কোন একটি শিলালেখে উৎকীর্ণ আছে যে ভারতে নালন্দার ন্যায় এরূপ কোন শহর-নগরাদি ছিল না যেখানে কী নানাবিধ শাস্ত্রে, কী নানাবিধ দর্শনে এত বহুমুখী বিদ্যাবিশারদ ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম যেরূপ ব্যাপক, সেইরূপ উদার-নৈতিক ছিল। প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ মহাযানীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলেও প্রতিদ্বন্দ্বী হীনযানী সম্প্রদায়ের মতবাদও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য পালিভাষা শিক্ষণ অপরিহার্য অংগরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। হীনযানী শাস্ত্রমাত্রেই পালিভাষায় রচিত। পালি অপেক্ষা সংস্কৃতই রচনা, আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যম ভাষা ছিল। Rhys David বলিতেছেন :

"At the time when Yuan-Chwang travelled in India, not only all the famous Buddhist preachers, but all the teachers of the school of thought especially favoured by the famous pilgrim, the school of Vasubandhu, wrote in Sanskrit. But Pali was still understood…"

বিখ্যাত মহাযানী পণ্ডিত নাগার্জুন, বসুবন্ধু, অসংগ ও ধর্মকীর্তি-রচিত গ্রন্থগুলি বিশেষ পাঠ্য রূপে গণ্য ছিল। হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি অবহেলিত হওয়ায় মনে করা সমীচীন হইবে না যে উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছিল। প্রথমেই ধরা যাউক,—ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র (হেতুবিদ্যা) এবং সাহিত্য। উহারা কী বৌদ্ধ কী হিন্দু উভয় ধর্মীরই অংগীভূত বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব এরূপ পরস্পর অন্তরংগভাবে সংযুক্ত যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোন তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি অথবা কোন সত্যান্বেষীর পক্ষে একটিকে পরিহার করিয়া অপরটিকে আয়ত্ত করিতে যাওয়া কার্যতঃ অসম্ভব। হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতির সহিত পঠিত হইত—ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস-পুরাণ, জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র ; এমন কি ধর্মবহির্ভূত (secular) বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইত ; যথা, সংগীত, বিবিধ মলম-প্রস্তুত প্রণালী, সর্প-সংমোহন-বিদ্যা প্রভৃতি।

প্রাচীন ভারতে চারিবেদ, ষড়াংগ, দশগ্রন্থ, চৌদ্দবিদ্যা, অষ্টাদশ শিল্প ও চৌষট্টি কলার কথা শুনা যায়। চৌদ্দ বিদ্যা এইগুলি—(১-৪) চারি-বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব), (৫-১০) ষড়াংগ [শিক্ষা (উচ্চারণ-বিধি), কল্প (আচারপরায়ণতা-বিধি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (ভাষাবিজ্ঞান, philology), ছন্দঃ (ছন্দপ্রকরণ, prosody) এবং জ্যোতিষ], (১১) ধর্মশাস্ত্র (আইন কানুন), (১২) পুরাণ, (১৩) মীমাংসা ও (১৪) তর্ক। অপর কেহ কেহ অষ্টাদশ বিদ্যার কথা বলিয়া থাকেন। উপরি লিখিত তালিকায় যদি ধনুর্বিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, অর্থশাস্ত্র ও শিল্পবিজ্ঞান সংযুক্ত করি তবে অষ্টাদশবিদ্যাই হয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭।২—

নারদ-সনৎকুমার সংবাদ)। কালিদাসের রঘুবংশে বরতন্তু-কৌৎস সংবাদে কিন্তু চৌদ্দবিদ্যার কথাই আছে (রঘু ৫.২১)।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সমসাময়িক শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য মিলিয়াছে। সংক্ষেপে সেই কথাই বলিব। ধর্মগুরু হিউয়েন-সাঙ-এর মতে সপ্তমবর্ষের পূর্বে 'দ্বাদশ অধ্যায়ী' শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইবে। উহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক Watters[৭] বলেন—এই 'দ্বাদশ অধ্যায়' হইল একখানি সংস্কৃতের প্রাথমিক পাঠ। তৎপরে, সপ্তমবর্ষ হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইত,—(১) শব্দ ও ব্যাকরণ, (২) কলা ও শিল্প, (৩) চিকিৎসা, (৪) তর্ক-বিদ্যা, (৫) আত্মবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান। হিউয়েন-শাঙএর সময়ে 'ব্যাকরণ' বলিতে পাণিনিসূত্র বুঝাইত। ধর্মগুরুর পরবর্তী পরিব্রাজক ই-সীঙ যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা স্পষ্টতর ও সম্পূর্ণ বোধ হওয়ায় উহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। ছয় বৎসর বয়সে 'সিদ্ধিরস্তু' নামক বাক্যগঠন-প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে। অষ্টমবর্ষ বয়সে পাণিনিসূত্র ও ধাতুপাঠ শেষ করিতে হইবে। দশমবর্ষে তিনটি 'খিল' আরম্ভ করিয়া তিন বছরে উহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইবে; যথা (১) বিশেষ্যের বিভক্তি, বচন প্রভৃতি লইয়া অষ্টধাতু ও ক্রিয়াপদের রূপ ও উহার শেষাংশ প্রত্যয়, (২) মণ্ড (মুণ্ড) এবং (৩) উণাদি, যাহাতে ক্রিয়াধাতুর শব্দান্তে প্রত্যয় [Suffix] যোগ করিতে হয়। পঞ্চদশ বয়সে পাণিনির 'কাশিকাবৃত্তি' আরম্ভ করিয়া পাঁচ বছরের মধ্যে উহা শেষ করিতে হইবে। ব্যাকরণের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে আরও চারিটি গ্রন্থ শ্রমণ অ-শ্রমণ নির্বিশেষে আবশ্যিক ছিল। যথা—(১) চূর্ণী, (পতঞ্জলির মহাভাষ্য), (২) চূর্ণীর উপর ভর্তৃহরির টীকা, (৩) তাঁহার গ্রন্থ 'বাক্যপদীয়' ও (৪) তাঁহার গ্রন্থ 'পেয়ি-ন'। কাশিকাবৃত্তি শেষ হইলে—ই-সীঙের মতে—ছাত্রগণ হেতুবিদ্যা ও অভিধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। সংক্ষেপে, তাঁহার মতে, সপ্তম শতাব্দীতে ব্যাকরণ ছিল পাঠ্যতালিকার মূল বিষয়। ঐ সময়ে 'নালন্দা' ও কাঠিয়াবারের 'বলভী' বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল; বিশেষতঃ—ধর্মগুরুর মতে—নালন্দায় অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ব্যতীত, বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ববিদ্যা ও সাংখ্যের জ্ঞানলাভ অপরিহার্য ছিল[৮]।

উপরে যে পাঠক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ প্রভৃতি উন্নততর বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কৃষি ও বাণিজ্য শ্রেণীর ছাত্র বা বৈশ্যদিগের পক্ষে[৯], রত্ন, মুক্তা, প্রবাল, বিবিধ ধাতু, বস্ত্র, সুগন্ধি, রান্নার মশলা, বীজবপন প্রণালী, কৃষিজমির (মাটির) বৈশিষ্ট্য, ওজন ও পরিমাপ, বিবিধ বাণিজ্যে সম্ভাব্য লাভ ও ক্ষতি, গো-পালন, দাসদের মজুরি, বিভিন্ন চলতি ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ আবশ্যিক ছিল। 'দিব্যাবদান' একটি বৌদ্ধদের গল্পের সংগ্রহ পুস্তক, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত। ইহার দুইটি গল্পে সে যুগের ধনী সওদাগর পুত্রেরা কি কি বিষয় শিক্ষালাভ করিত তাহা বর্ণিত আছে। নিম্নলিখিত বিষয়ের জ্ঞান তাহাদের অর্জন করিতে হইত;—হস্তলিপি, পাটীগণিত, মুদ্রা, ঋণ, জমা, রত্নপরীক্ষা, গৃহপরীক্ষা, হস্তী ও অশ্ব, তরুণ ও তরুণী, ইত্যাদি। কিন্তু গুপ্তযুগে এসব বিষয়ে বণিকপুত্রেরা প্রকৃত শিক্ষিত হইত কিনা জানিবার উপায় নাই।

॥ ৩ ॥

শুধু বৌদ্ধ মঠ নয়, বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র। হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধরা শত্রুভাবাপন্ন ছিল না, নালন্দায় শুধু নয় বিক্রমশিলা ও পাটলিপুত্রে উভয় পন্থীর মৈত্রীভাবে সহস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। এখন নালন্দার কয়েকজন বিখ্যাত আচার্য ও অধ্যক্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

বসুবন্ধু (পঞ্চম খৃষ্টাব্দ) গান্ধারের অধিবাসী ছিলেন; তিনি কাশ্মীরে যাইয়া সংঘভদ্রের নিকট বৈভাষিক (হীনযানী) ধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন, পরে 'অভিধর্মকোশ' ও উহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া বিভাষা-সম্প্রদায়ের সারধর্ম সংকলন করেন। এখানে দ্রষ্টব্য যে কাশ্মীর ও গান্ধার-ভুক্তির সর্বাস্তিবাদীদের 'বৈভাষিক' বলা হইত, কারণ উহারা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত কাত্যায়নীপুত্র প্রণীত 'জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রের' বিভাষার (ভাষ্য) মত অংগীকার করেন। এই জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র সর্বাস্তিবাদীদের প্রধান অভিধর্ম-সূত্র। বৈভাষিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য ছিলেন ধর্মোত্তর, ধর্মত্রাত, ঘোষক, বসুমিত্র, বুদ্ধদেব। তিব্বতী লেখক তারানাথের মতে ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ছিল। কী হীনযানী কী মহাযানী উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমণ-ভিক্ষু উক্ত 'কোশ' ও উহার 'ভাষ্য' অধ্যয়ন করিতেন। এই গ্রন্থ দুইটির প্রতিপত্তি এতাধিক ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে বৈভাষিক মতবাদ প্রচারের জন্য চীন জাপানে বহু শিক্ষায়তন সৃষ্ট হয় ও তথায় উহা পঠিত হয়। ভিক্ষু পরমার্থ ইহার অনুবাদ করেন চীন ভাষায় ৫৬৩-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং হিউয়েন-সাঙ করেন ৬৫১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। পরমার্থ বলভীর (কাঠিয়াবার) ও হিউয়েন-সাঙ নালন্দার ছাত্র ছিলেন।

বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন সর্বাস্তিবাদী। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অসঙ্গ তাঁহাকে যোগাচার (মহাযান) মতে দীক্ষিত করেন। ধর্মান্তর গ্রহণান্তর বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদ (যোগাচার) সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন; তৎপ্রণীত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' বিজ্ঞানবাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। বহু বৎসর ধরিয়া বসুবন্ধু নালন্দার মাননীয় মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। গুণমতি, স্থিরমতি, দিঙ্নাগ, সংঘদাস, ধর্মদাস, ধর্মপাল, বিমুক্ত সেন ইঁহারা তাঁহার স্বনামধন্য শিষ্য। গুণমতি ছিলেন বলভীর অধিবাসী; তিনি নালন্দায় আসিয়া এক সম্মানিত উপাধ্যায় হন। স্থিরমতি দণ্ডকারণ্য হইতে আসিয়া গুরু বসুবন্ধুর কাছে হীনযান-মহাযান উভয় মতবাদই শিক্ষা করিয়া বসুবন্ধু-কৃত অভিধর্মকোশ, অভিধর্মসমুচ্চয় ও অন্যান্য গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ধর্মপাল কাঞ্চির অধিবাসী ছিলেন; তিনি বহু হীনযানী আচার্যকে তর্কে পরাস্ত করিয়া নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হন ও যোগাচার দর্শনের কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্মকীর্তি তাঁহারই শিষ্য। ধর্মপালের পর তদীয় শিষ্য শীলভদ্র মঠাধ্যক্ষ হন। ধর্মগুরু ইঁহার কাছে যোগাচার

ও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শীলভদ্র সমতটের (পূর্ব-বংগ) ব্রাহ্মণবংশীয় রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র মহাতার্কিক; দাক্ষিণাত্যের বহু আচার্যকে তিনি তর্কে পরাস্ত করিয়া কোন গ্রামের আয় তিনি পুরস্কার স্বরূপ লাভ করেন এবং তাহাতে নালন্দায় সংঘারাম নির্মাণ করেন। ইনিই নালন্দায় শেষ বিজ্ঞানবাদী মঠাধ্যক্ষ। ইঁহার বহুবছর পরে অবশ্য পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবাদী গ্রন্থকার হরিভদ্র নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শীলভদ্র ও হরিভদ্রের অন্তর্বর্তীকালে কয়জন বিজ্ঞানবাদী ছিলেন তাহা নির্ণীত হয় নাই।

বসুবন্ধুর আর একটি প্রখ্যাত ছাত্র হইলেন দিঙ্নাগ। কাঞ্চিতর (কঞ্জীবেরম্) ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম; পূর্বে বাৎসীপুত্রীয় (=সম্মিতীয়) সম্প্রদায়ের শ্রমণভুক্ত হন, পরে বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর তিনি বিজ্ঞানবাদী হন। তাঁহার জীবিতকাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শংকরস্বামী ও ধর্মপাল বিখ্যাত। ধর্মপাল খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমে নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হন। ইঁহার কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শংকর-স্বামী দাক্ষিণাত্যের লোক; তাঁহার প্রণীত "ন্যায়-প্রবেশ তর্কশাস্ত্র" হিউয়েন-সাঙ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন (৬৪৭ খৃঃ অঃ)। দিঙ্নাগের শিষ্য ঈশ্বরসেন; ইনি ধর্মকীর্তিকে দিঙ্নাগের 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' শাস্ত্র শিক্ষা দেন; ধর্মকীর্তি হইলেন কুমারিল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র। তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অবদান গুরু দিঙ্নাগের দানাপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ 'ন্যায়বিন্দু' ও ন্যায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রমাণবর্তিক।' স্থিরমতির বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন বারেন্দ্র ভূমির যশ্রগোমিন; ইনি ব্যাকরণ ও সাহিত্যে গ্রন্থ রচনা করেন। স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্মপিটক ও অন্যান্য আচার্যের কাছে মন্ত্র ও তন্ত্রের শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ইনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পূজক ছিলেন।

মাধ্যমিক (মহযানী) দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক, তিনি 'মূলমধ্যমকারিকা' প্রণয়ন করেন। নাগার্জুনের আওতাধাটি তাঁহার শিষ্য আর্যদেবের স্কন্ধে পড়ে, অর্থাৎ, তিনিই পরবর্তী মাধ্যমিক দর্শনের পুরোধা হন। ভারতবিখ্যাত চার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন—কুমারলব্ধ, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও আর্যদেব। কুমারলব্ধ ছিলেন তক্ষশিলার অধিবাসী; ইনি সৌত্রান্তিক (হীনযানী) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; এই সম্প্রদায় বৈভাষিকগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। পূর্বোল্লিখিত 'জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রে'র ইনি সংস্কৃত অনুবাদ করেন। আর্যদেব বহু বৎসর নালন্দায় অতিবাহিত করিয়া কাঞ্চিতে গমন করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী)। তাঁহার শিষ্য উত্তর-দেশীয় ব্রাহ্মণ মাতৃচেত (কাল), ইনি বেদ, বেদাংগ, তন্ত্র, মন্ত্রে দিগগজ পণ্ডিত ছিলেন; মহেশ্বরের কীর্তনসূচক বহু স্তোত্রের রচয়িতা তিনি। শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। তর্কে-বিতর্কে অসাধারণ পারদর্শী বলিয়া তাঁহাকে লোকে "দুর্দ্ধর্ষকাল" বলিত। আর্যদেব কর্তৃক বিজিত ও ধর্মান্তরিত হওয়ায় তিনি বৌদ্ধ আচার্য হন এবং হীনযান মহাযান উভয় পন্থীর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আর্যদেবের শিষ্য রাহুলভদ্র পরবর্তী নালন্দার মঠাধ্যক্ষ। তিনি নালন্দায় ১৪টি গন্ধকুটি [মন্দির] এবং ১৪টি সংঘারাম নির্মাণ করান। মাধ্যমিক দর্শনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ছিলেন যশকীর্তি। সংস্কৃতে রচিত 'মূলমধ্যমক' গ্রন্থের ভাষ্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি পরে নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হন। পূর্ববর্ণিত মহাযানী যোগাচার দর্শনে যশগামিনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া যশকীর্তি উঁহাকে এক উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। খৃষ্টীয় ৬৩৫ অব্দে, যশকীর্তির পর যোগাচারী ধর্মপাল নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হন এবং তারপরই জয়দেব উক্ত পদে বরিত হন। সৌরাষ্ট্রের রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া শান্তিদেব [শান্তিবর্মন] নালন্দায় আসিয়া জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যশকীর্তির পর শান্তিদেবই মাধ্যমিক দর্শনের বিখ্যাত আচার্য। তারপর, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সর্বজ্ঞমিত্র নামে কাশ্মীররাজের এক ভ্রাতুষ্পুত্র নালন্দার প্রধান আচার্য হইয়াছিলেন।

॥ ৪ ॥

তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে রাহুলভদ্রের মঠাধ্যক্ষতার অবসান ঘটলে বৌদ্ধ সংঘের একদা দুঃসময় উপস্থিত হয়। জনৈক তুরুস্করাজ মগধকে বিধ্বস্ত করে, তাহাতে বহুসংখ্যক সংঘারাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নালন্দার ভিক্ষুবর্গ বিভিন্ন দিকে পলাইয়া যান। মগধরাজ, বিজেতা তুরুস্করাজের করদ সামন্তে পরিণত হন, এজন্য বৌদ্ধ সংঘ তাঁহার সক্রিয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। পরবর্তী কোন রাজা—যাঁহার প্রকৃত নাম আজও অজ্ঞাত—কিন্তু উপনাম "বুদ্ধপক্ষ", তিনি বৌদ্ধদের মিত্র থাকায় চীনরাজের সংগে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন। বৌদ্ধ গুপ্তচরদের [emissaries] সাহায্যে তিনি চীনরাজের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া পারস্য আক্রমণকারীকে হত্যা করেন (ও স্বাধীনতা অর্জন করেন [১০]; তারপর, তিনি নালন্দার মঠ ও বিহারগুলি পুনর্নির্মাণ করেন।

'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' উক্ত বৈদেশিক আক্রমণকারীকে "গোমি" বলা হইয়াছে। উত্তরদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরের মধ্যদিয়া গোমি বহুসংখ্যক সংঘারাম ধ্বংস করে ও বহুসংখ্যক শ্রমণকে হত্যা করে। রাজা "বুদ্ধপক্ষ" শ্রীবুদ্ধের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন; তিনি ঐ সকল স্তূপ ও মঠ পুনর্নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার পুত্র গম্ভীরযক্ষও কয়েকটি স্তূপ ও বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুষ্করিণী ও কূপ খনন করেন। যেহেতু ফা-হিয়েন এই বৈদেশিক আক্রমণের কথা কিছু বলেন নাই, অতএব উক্ত নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। হিউয়েন-সাঙ এর মতে এই নির্যাতনকারী হইলেন হুনরাজ মিহিরগুল, যিনি সম্রাট বালাদিত্য কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। মিহিরগুল যখন ভারতের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন মালবের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনানায়ক তাঁহার প্রতিরোধ করেন; ইনিই যশোধর্মন। মিহিরগুল পরাস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি

লোপ পাইল না ; যশোধর্মনের পতনের পর তিনি পুনরায় পুরোভাবে দর্শন দিলেন। এই সময় মগধের সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য। যশোধর্মনের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে বালাদিত্য সাময়িকভাবে বিমূঢ় হইয়া যান, এজন্য মিহিরগুল শক্তিসংচয় করিবার সুযোগ পান এবং নরসিংহ গুপ্তও মিহিরগুলকে করপ্রদান করিতে বাধ্য হন। কিরূপে বালাদিত্য বৌদ্ধনির্যাতক শক্তিমান মিহিরগুলকে জব্দ করিয়াছিলেন তাহা হিউয়েন-সাঙ তাঁহার বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার বিষয়ে নালন্দার আচার্যরা উদ্যোগী হন ; এজন্য নালন্দায় তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববর্ণিত বৌদ্ধ ভিক্ষু চন্দ্রগামিন্ এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। তাঁহার বহুগ্রন্থ পালি হইতে তিব্বতীভাষার অনূদিত হইল। তিব্বতরাজ খি স্রি দেন্-সন্ আচার্য শান্তরক্ষিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। তাঁহার আজ্ঞায় তিব্বতে সংঘারামের প্রতিষ্ঠা হইলে শান্তরক্ষিত মঠাধ্যক্ষ হইলেন। তিনি আমরণ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। প্রচারকার্যে শান্তরক্ষিত নালন্দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কাশ্মীরী ভিক্ষু পদ্মসম্ভবের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন।১১

ইহার পর পালরাজাদের সময় নালন্দা অনেক পরিমাণে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বোধ করে, কারণ নবস্থাপিত বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়টি তাঁহাদের অত্যধিক সাহায্যপুষ্ট হইতে থাকে, তাহার ফলে নালন্দার উচ্চ হর্ম্যচূড়া ভাংগিয়া পড়ে। ইহার পরবর্তী কালে, খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধমানসে তান্ত্রিক প্রভাব সংক্রামিত হওয়ায় উচ্চস্তরের চিন্তাধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধতন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এগুলি তান্ত্রিক কতকগুলি আচার ও পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক কোন সময়ে কোন্ তান্ত্রিক আচারটি উদ্ভূত হয় তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে১২ পালযুগে আর্যেতর আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারার সহিত মহাযানী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা এবং বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ত্রিধারা সমন্বয়ে উদ্ভূত হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, অর্থাৎ মন্ত্রযান—বজ্রযান কালচক্রযান এবং পরিশেষে সহজযান—বৌদ্ধধর্ম। বজ্রযানীদের মূর্তি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মত এই যে, চতুর্থ শতাব্দীতে অসংগ যে বৌদ্ধতন্ত্রযানের শাখা বজ্রযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন তাহা হইতে বৌদ্ধ দেবত্রগোষ্ঠীর ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে (১৩)। শ্রীবিনয় ঘোষ বলিতেছেন,—খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি যখন নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে হিউয়েন-সাঙ যোগাচার দর্শন শিক্ষা করিতেছিলেন তখন তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। 'কিন্তু অষ্টম শতক থেকে নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিদ্যায়তনের বৌদ্ধ আচার্যদের হাতে যে বৌদ্ধদর্শন নতুন রূপ নিয়ে সমস্ত পূর্বভারতে ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করল, তা এক অভিনব বৌদ্ধদর্শন এবং তাকেই 'তন্ত্রযান' বলা যায়।' (১৪)

এই অত্যাশ্চর্য প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সংঘটিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার খিলিজির মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা। 'তবকট-ই-নসেরি' হইতে অবগত হওয়া যায় যে নালন্দার অপরূপ সৌন্দর্যময় সৌধগুলি পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয় ও শ্রমণ-ভিক্ষু প্রভৃতিকে তরবারী সাহায্যে হত্যা করা হয়! এইরূপে একদল নৃশংস গোঁড়া বিধর্মীর হাতে সে যুগের এক বিরাট সভ্যতার প্রতীক অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

নজিরের নির্ঘণ্ট

(১) The Vedic Age (George Allen & Unwin Ltd.), পৃ. ৬৯

(২) Ray Chaudhury : *Political History of Ancient India*, পৃঃ ৫৯৬-৭.

(৩) *Epigraphia Indica*, XX. পৃঃ ৪৩

(৪) Life of Hiuen-Tsang by S. Hwni-Li. Translated by S. Beal (1911).

(৫) Dr. A. S. Altekar: *Education in Ancient India*, পৃঃ ১২১

(৬) Dr. B. G. Gokhale : *Ancient India History and Culture*, পৃঃ ১৪৮

(৭) Thomas Watters (London, Royal Asiatic Society) – *On Yuan Chwang's Travels in India* (2 vols.) 1904

(৮) Bharatiya Vidya Bhavan : *The Classical Age*, পৃঃ ৫৮২

(৯) মনুসংহিতা, ৯,৩২৯-৩২

(১০) Bharatiya Vidya Bhavan : *The Classical Age*, পৃঃ ৩৮৯

(১১) Dr. A. S. Altekar : *Education in Ancient India*, পৃঃ ১২৪

(১২) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল-গান, পৃঃ ১৮৬

(১৩) B. Bhattacharya : *Nispannayogabali*, Introduction, পৃঃ ১৫

(১৪) বিনয় ঘোষ : পশ্চিম বংগ সংস্কৃতি, পৃঃ ১৭০



ভারতের গৃহসমস্যা ও পরিকল্পনা

অধ্যাপক সন্তোষ দত্ত

সভ্য সমাজে মানুষের প্রয়োজন আজ সীমাহীন। রুচিবোধ ও আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে তাল রেখে এ প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। প্রাক্-সভ্যতা যুগ থেকে মানুষের যে মূল প্রয়োজন তা আজও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে, এই প্রয়োজন হ'ল তিনটি—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। খাদ্যবস্তুর গুণাগুণের উপরে মানুষের স্বাস্থ্য নির্ভর করে—পোষাক পরিচ্ছদের উপরে তার লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ থেকে শরীর রক্ষা—আর বাসস্থানের উপরে তার বিশ্রাম উপভোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য। রুচি ও সামর্থ্য ভেদে এই বাসস্থান বিভিন্ন লোকের ভিন্নতর হয়—কিন্তু মূল প্রয়োজন কার্য্যতঃ এক। আগে মানুষ এই বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাত গাছের তলায় বা পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে—আর এখন সে বাসস্থান তৈরী করে নেয় নিজের প্রয়োজন মত। প্রত্যেক মানুষই চায় মাথা গুঁজবার মত একটু ঠাঁই, যেখানে ঝড়-বাদল রোদ থেকে সে আত্মরক্ষা করে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করতে পারে কর্মক্লান্ত দিনের শেষে।

ভারতের গৃহসমস্যা নতুন নয়। তবে বিগত কয়েক বছরে এর তীব্রতা বেড়েছে। এই সমস্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যে হারে দেশের লোক-সংখ্যা বেড়ে চলেছে সে হারে বাসস্থান নির্ম্মাণ এগোচ্ছে না। এই মূল কারণ ছাড়াও আর একটি কারণ হ'ল ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন। এর ফলে দেখা দিয়েছে আঞ্চলিক গৃহ-সমস্যা। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে শহরের সংখ্যা। বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে মানুষ জড় হতে লাগল বিশেষ বিশেষ জায়গায়। কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্ম্মরত শ্রমিকরা উহার কাছাকাছি খুঁজতে লাগল বাসস্থান। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাসস্থান যা তৈরী হয় তাতে কয়েকজনের স্থান সঙ্কুলন হয় মাত্র, ঐ অঞ্চলে অন্যান্য পেশারত লোকের সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা তখন অন্য রূপ নেয়। শুধু বাসস্থান তৈরীই নয়। ঐ অঞ্চলের উপযুক্ত স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কলিকাতা, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বস্তি সমস্যার মূলও এখানে। এছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকানুসন্ধী একদল লোক এসে ভিড় করতে থাকে শহরে, গ্রামগুলো হয় উপেক্ষিত। শহরে ভিড় বাড়তে থাকে। বাসস্থানের সমস্যা গ্রামাঞ্চলে নেই বলা যায় না। তবে শহর ও গ্রামের বাসস্থানের সমস্যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বাসস্থানের জন্যে প্রয়োজন জমি ও নির্ম্মাণ কার্য্যের মালমশলা, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। জমির সমস্যা পল্লী অঞ্চলে তেমন নয়। শহর অঞ্চলেই জমির সমস্যা প্রকট। সাজ সরঞ্জামের দিক থেকে দেখতে গেলেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ ভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী একটা ঘর দাঁড় করাতে পারলেই হ'ল। কিন্তু পৌর-সভা অঞ্চলে—বিশেষ করে বড় বড় নগরে—উপযুক্ত পরিকল্পনানুযায়ী গৃহ নির্ম্মাণ হওয়া দরকার। তাছাড়া সেখানে রয়েছে পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে স্থানাধিক্য এবং অতিরিক্ত উন্মুক্ত জায়গা থাকায় আলোবাতাস ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়গুলির প্রতি তেমন নজর দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। পাড়াগাঁয়ে স্থায়িত্বের দিক থেকে সমস্যা হ'ল এই যে সকলের পক্ষে পাকা বাড়ী তৈরী সম্ভব হয় না। তাই বন্যা ইত্যাদিতে ভীষণ ক্ষতিসাধন হয় বাসস্থানের।

শহর ও গ্রামের ঐ মত পার্থক্যের ভিত্তিতেই উভয়ের বাসস্থান সমস্যা পৃথকভাবে বিচার বিবেচনা করা দরকার। ডাঃ এস, ডি, পুনাকারের মতে খাদ্য সমস্যার পরেই ভারতে বাসস্থান সমস্যার স্থান। দুই সমস্যার কারণ কিছুটা এক ধরণের। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদির জন্য দুটি সমস্যাই বেড়েছে, দেশের শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ হয় বটে, কিন্তু অন্যদিকে গৃহসমস্যা বেড়ে চলে।

১৯৫১ সালে হিসাব করে দেখা গেছে যে ভারতে মোট ২৫ লক্ষ অতিরিক্ত গৃহের দরকার। কিন্তু ১৯৬১ সালে দেখা যাবে যে অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন প্রায় ৯০ লক্ষ। ১৯৬১ সালের লোকগণনা না হলেও অনুমান করা যায় যে ভারতে ১৯৫১-৬১ এই দশ বছরে প্রায় ৩৩ শতাংশ লোক বাড়বে। তার জন্য বাড়তি বাড়ী দরকার ৪৪ লক্ষ। পুরাতন বাড়ীর জায়গায় নূতন বাড়ীনির্ম্মাণ, বস্তী উচ্ছেদ ইত্যাদির জন্য আরও ২০ লক্ষ বাড়ী দরকার। কিন্তু ভারত সরকারের বর্ত্তমান কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ৩০ লক্ষ বাড়ী তৈরী হতে পারে মনে হয়।

গৃহাভাবের মোট হিসাব তা'হলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়।—

১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত ঘাটতি—	২৫ লক্ষ বাড়ী
১৯৫১-৬১ সালের বাড়তি লোকের জন্য দরকার	৪৪ „ „
পুরাতন বাড়ীর অপসারণ ও বস্তী উচ্ছেদের জন্য	২০ „ „
মোট প্রয়োজন	৮৯ লক্ষ বাড়ী
১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত তৈরী হতে পারে	৩০ „ „
১৯৬১ সালে ঘাটতি দাঁড়াবে	৫৯ লক্ষ বাড়ী

এই প্রায় ৬০ লক্ষ বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, মালমশলা ও শ্রমিক যোগাড় করা কম কথা নয়। সমস্যার এই গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। এ পর্য্যন্ত গৃহনির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

(১) প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যোগে বাড়ী তৈরীর ব্যবস্থা,

(২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে বাড়ী তৈরী,

(৩) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ী তৈরীর জন্য অর্থ দান,

(৪) বস্তী অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ী তৈরী পরিকল্পনা,

(৫) স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য বাড়ী তৈরী ঋণ প্রদান,

(৬) জীবনবীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাড়ী তৈরী ঋণদান পরিকল্পনা,

(৭) আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা,

(৮) শিল্পাঞ্চলে সাহায্যকৃত গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনা,

(৯) আবাদী শ্রমিকদের জন্যে বাড়ী তৈরী পরিকল্পনা।

(১) সরকারী উদ্যোগে সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসস্থানের জন্য অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে। চাকুরী কালে সেখানে কর্ম্মচারীরা বাস করতে পারে কিন্তু চাকুরী শেষে তাহাদের বাসস্থান সমস্যা দেখা দেয়। শহর পরিকল্পনায় সরকার কর্ত্তৃক যে সব বাড়ী তৈরী হয়েছে সেখানে বহু লোক বসবাস করে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন ও রুচিভেদে বাড়ীগুলি বিভিন্ন হয়নি। তবুও সরকারী উদ্যোগে বাড়ী তৈরীর প্রচেষ্টা গৃহ-সমস্যা দুরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছে। এ মত আরও বাড়ী তৈরী হ'লে বাসগৃহ সমস্যা সমাধানের পথে এগোন সম্ভব হবে, অন্ততঃ চাকুরীকালে অনেকে এ সমস্যা থেকে রেহাই পাবে।

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগে নির্ম্মিত বাড়ী।

বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাহাদের কর্ম্মী এবং শ্রমিকদের জন্য বাড়ী তৈরী করে থাকে, কিন্তু সেখানেও সমস্যা হ'ল চাকুরী শেষে ঐ সব লোকের নিজস্ব বাড়ী তৈরী করা দরকার। আজকাল সরকার ঐ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে গৃহনির্ম্মাণ ঋণ দিয়ে বাধ্যবাধকতা সহকারে প্রত্যেক কর্ম্মীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তা হলে শিল্পাঞ্চলের গৃহসমস্যার কিছুটা লাঘব হয়।

(৩) ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামর্থ্য অনুযায়ী জনসাধারণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে থাকেন। এভাবেই বেশীরভাগ বাসস্থান তৈরী হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ী তৈরীর পথে অনেক বাধা। এ উদ্দেশ্যে শুধু অর্থের সমস্যাই নয়, আইনগত, প্রশাসনগত এবং মালমশলা সংগ্রহে যে সব বাধা রয়েছে তা অপসারণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

বস্তী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণ :

(৪) বস্তী উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রথম গ্রহণ করা হয় ১৯৫৫ সালের মে মাসে। গত ডিসেম্বর ('৫৯) পর্য্যন্ত প্রায় ১০'১১ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৪৫টি ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ হাজারের উপর বাড়ী তৈরী হয়েছে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বস্তী অপসারণের জন্য ৪৬কোটি টাকা ব্যয় করা হবে ঠিক হয়েছে।

(৫) স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য বাড়ী তৈরীর যে পরিকল্পনা রয়েছে তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। মোট ব্যয়ের একের চার অংশ সংগ্রহ না করতে পারলে এ ঋণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সুদও বেশী। এর পরে রয়েছে প্রশাসনিক বিলম্ব। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত রাজ্যসরকারগুলিকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। জুলাই ১৯৫৯ পর্য্যন্ত ৭১৪০০ বাড়ীর মধ্যে ৪২৬৬০টি। বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে।

(৬) জীবনবীমা কর্পোরেশন সম্প্রতি তিন রকমের গৃহনির্মাণ ঋণ দিবার ব্যবস্থা করেছে।

(ক) শীর্ষ গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতিগুলিকে।

(খ) পলিসি হোল্ডারদিগকে।

(গ) কোনও যৌথকোম্পানীর কর্মীদের সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকে।

সুদের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। শতকরা ৫-৭ টাকা হারে এই সুদ নেওয়া হ'বে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সামান্য লোকই উপকৃত হতে পারবে মনে হয়, তবুও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। মোট ৭'৪৪ কোটি টাকা এ উদ্দেশ্যে ধরা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকে ইতিমধ্যে ৩'৫৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

(৭) আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ২ হাজার গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এ উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারগুলি ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং ২১ লক্ষ টাকা ঋণদান করেছেন। এ পর্য্যন্ত ৮৫০খানি বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং আরও ১০০০ বাড়ীতে নির্ম্মাণ কার্য চলেছে।

(৮) শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করারও একটি পরিকল্পনা আছে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৩৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। পরিকল্পিত ১০৯৬০০ বাড়ীর মধ্যে ৮৫৮০০ বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে।

(৯) আবাদী শ্রমিকদের জন্য বাড়ী তৈরীর যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই এক্ষেত্রে তেমন কাজ হয়নি। ১৯৫৬—৫৯ এই সময়ে মোট ৯৭ লক্ষ টাকা ২৪১টি বাড়ীর জন্যে মঞ্জুর করা হয়েছে। তার মধ্যে ২১৩ খানি বাড়ী তৈরী হয়েছে জানা গেছে।

এই সব পরিকল্পনা ছাড়াও দেশের গৃহ-সমস্যা সমাধানের জন্য ৬টি গবেষণাযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই সব কেন্দ্রে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে বাড়ী তৈরীর মালমশলাও কায়দাকরণের উপরে গবেষণা করা হচ্ছে। মাঝামাঝি ধরণের আয়-বিশিষ্ট লোকদের জন্য গৃহ-

নির্মাণ পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ উদ্দেশ্যে ঋণ দানও সুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে গৃহনির্ম্মাণের জন্য মোট ... কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাত্র ৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মোট ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে ধরা হয়েছে। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে শুধু টাকার সংস্থান করলেই গৃহনির্ম্মাণ সমস্যার সমাধান হবে না। গৃহনির্ম্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা অপসারণ করে এ উদ্দেশ্যে কার্যকরী সাহায্য করার জন্য গৃহনির্ম্মাণ কর্পোরেশন স্থাপনও দরকার।

এই কর্পোরেশন শুধু অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাই করবেন। ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগে গৃহনির্ম্মাণের সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য প্রতিষ্ঠান সাহায্য করার ব্যবস্থা করবে। জমি ক্রয়, বাড়ীর প্লান তৈরী, ঋণ সংগ্রহ, বাড়ী তৈরীর মালমশলা সংগ্রহ—এ সবের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী সাহায্য পেলে দেশে নূতন গৃহের নির্মাণ আরও বেড়ে যাবে।

গৃহনির্ম্মাণের আর একটি দিক হল এই যে, দেশে যত বেশী নূতন গৃহ তৈরী হবে তত নূতন চাকুরীর সংস্থান হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দিকটি উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই সর্ব দিক বিবেচনা করে ভারতের নূতন গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীযমুনাস্তুতি-গীতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিতা

বিলুলিত-পত্র-শৈশিরকণে কদম্বকলিকাপ্রসার-রমণে
দনুজনিপাতপূতহসনে পলাশিদল-শোভি-পীতবসনে।
বিহগ-নিনাদ-ধন্য-বিপিনে বিলোল-হরিণী-
দৃশাতিকমনে
মধুরিপুবাসহৃষ্ট-সদনে বিলাসমনিশং তনুষে যমুনে॥

মধুবনভূষণ-গোকুলতোষণ-মোচনকারণ-দেবনুতে
মুনিগণহর্ষণ-কালিয়রক্ষণ-মাধবরাধন-ভানুসুতে।
জগদঘনাশন-বৃন্দাবনধন-গঙ্গাসুমিলন-হর্ষযুতে
জয় যমুনে জয় হৃতধরণীভয়-কৃতশোকক্ষয়-গুণপূতে॥

কলিন্দ-নন্দিনি শিখরিশিরোমণি-গিরিবরশোভিনি
শান্তিভৃতে
কলকলহাসিনি নূপুরনাদিনি ভবভয়তারিণি ভূরিকৃতে।
নটরাজনটিত-নর্ত্তনবিলসিত-তরঙ্গদোলিত-পুণ্যসৃতে
জয় যমুনে জয় কৃষ্ণপ্রিয়াশ্রয়-নীলকমলচয়-কান্তিবৃতে॥

বঙ্গানুবাদ অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

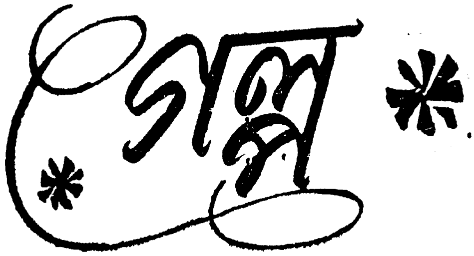
হে যমুনে! তুমি দিন রাত নিজের আনন্দবিহারে রত রয়েছ। তোমার তীরে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত, যা'তে পক্ষিসমূহ নিরন্তর কূজন করছে। ঐ বনের চঞ্চল পত্রসমূহে শিশিরকণা করছে ঝলমল; কদম্বপুষ্পের কলিকা ধীরে ধীরে উঠছে ফুটে। (বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি) দানবসমূহের নিধন হেতু শ্রীবৃন্দাবন হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; এখানে প্রত্যেক বৃক্ষে নীলাম্বরের পীতবসন শোভা পাচ্ছে। চঞ্চল হরিণীনয়না সুন্দরীরা এই বনে নিত্য করে বিহার। (অন্য কথা কি?) স্বয়ং মুরারি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐখানেই করেন বাস॥১

হে যমুনা তোমার জয় হোক। মধুবন তোমার অলঙ্কার; সমস্ত গোকুলে তুমিই আনন্দের কারণ; মুক্তির কারণও তুমি, (তাই) দেবতাগণ তোমাকে স্তুতি করেন।

যমুনে! তুমিই ঋষিগণের আনন্দের নিদান; কালিয় সর্পের আশ্রয়দাত্রী তুমি; শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির কারণও তুমি। তুমি জগতের (সমস্ত) পাপ নাশ কর; বৃন্দাবনের সর্বস্বই তুমি। গঙ্গার সঙ্গে মিলন হেতু তোমার আনন্দ অনবদ্য। সমস্ত পৃথিবীর ভয় তুমি হরণ কর; শোকক্ষয়ের কারণও তুমি—অনন্ত গুণে তুমি বিভূষিত॥২

হে কলিন্দকন্যে যমুনে, পর্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্ধন তোমার শোভা বর্দ্ধন করছে; সমস্ত শান্তির আকর তুমি। কলকল হাসিতে নূপুর বাজিয়ে—সংসারের সমস্ত ভয় হরণ সম্পাদন করে—অজস্র মহৎ কৃত্য তুমি করছ। তোমার তরঙ্গের দোলায় দোলায় পুণ্যপ্রবাহ—তার সঙ্গে দোলিত হবেই শিবের নাট্য ও নৃত্যবিলাস। শ্রীরাধিকার অতিপ্রিয় নীলপদ্মসমূহের বর্ণে ও ঔজ্জ্বল্যে তুমি প্রোদ্ভাসিত।

হে যমুনে! তোমার জয় হোক॥



শূন্য কুম্ভ

ডাঃ নবগোপাল দাস

হাসছ ? ভাবছ মিথ্যা আমার এই ভয় প্রদর্শন ? আমি যে তোমাদের সঙ্গে পরিহাস করছি না—তা বুঝতে পারবে কাল ভোরবেলায়, যখন খবরের কাগজে বড় বড় হেড লাইনে দেখবে, বালিগঞ্জ অঞ্চলে চাঞ্চল্যকর খুন—খুনীর নির্ভীক স্বীকারোক্তি !

অথচ সবচেয়ে হাসির কথা এই যে শীলাকে আমি খুন করতে চাইনি !' আমার টার্গেটে ছিল শীলার স্বামী, প্রতাপ মজুমদার। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, প্রেমঘটিত ব্যাপারই এটা।

আমি জানি আমার বয়স অল্প। তোমাদের মতে, প্রেমের সত্তা অনুধাবন করবার মত অভিজ্ঞতা আমার জন্মায়নি। কিন্তু অভিজ্ঞতাই কি প্রেমের একমাত্র বাহন ? আমাদের দেশে একটি ছেলের আঠারো বছর বয়স কি এতই কম ? বসন্তের আবাহনে তার বুকে কি শিহরণ জাগে না ? বিশেষ ক'রে বসন্তের সৌরভ যদি বয়ে নিয়ে আসে শীলার মত মেয়ে ?

অভিজ্ঞতার দোহাই তোমরা দাও, কিন্তু ভুলে যাও—যে অভিজ্ঞ, সেও এককালে নিতান্তই অনভিজ্ঞ ছিল। অজ্ঞানতার সিঁড়ি অতিক্রম করেই ত জ্ঞানের কোঠায় পৌছানো যায় !

তা'ছাড়া, ভালবাসার জগতে অভিজ্ঞতা কি নিতান্তই অপরিহার্য্য ? অভিজ্ঞ লোকের ভালবাসার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের আবেগ কতটুকু দেখতে পাও সেখানে ? জুলিয়েট যখন রোমিওর প্রেমে পড়েছিল কতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তার ?

তোমরা বলবে, আমার লজিক মেয়েদের সম্পর্কে হয়ত খাটে, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে খাটে না। আমি মানি না। বর্ণার্ড শ'র ইউজিন্ কি ছেলে ছিল না ?

এসব তর্কের শেষ নেই। তা ছাড়া গত কালের ঘটনার পর আমার তর্ক করবার ক্ষমতা কমে এসেছে। বিশ্বাস যদি তোমাদের না আসে তা হ'লে তর্ক করে আমার কথা বোঝাতে পারব না। তাই তোমাদের খুলে বলছি শীলাকে কেন খুন করতে চাই।

শীলারা আমাদের পাশের ফ্ল্যাটএ থাকে। শীলা এবং তার প্রৌঢ় স্বামী প্রতাপ মজুমদার। প্রকাণ্ড বড় ম্যানসন্, তার মধ্যে অন্ততঃ গোটা কুড়ি ফ্ল্যাট আছে, পরিবার হয়ত থাকে গোটা ত্রিশ। কলকাতার বাড়ী সমস্যার কথা তোমাদের অজানা নেই, তা'ছাড়া যা' দিনকাল—তাতে প্রত্যেক গৃহস্বামীই চেষ্টা করেন অতিরিক্ত দুটো পয়সা উপার্জ্জন করতে। তাই নিজেরা কষ্ট ক'রে দু'খানা বা একখানা ঘরে থেকেও বাড়ন্ত ঘরগুলো ভাড়া দেন সদাশিবন বা সমীর মুখার্জ্জীকে।

ঐ ম্যান্সনে শীলারা এবং আমরা ছিলাম সেই গোষ্ঠীতে, যারা বাইরের কাউকে ঘর ভাড়া দেবার কথা ভাবতেই পারে না। আমাদের অবশ্য যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমাদের সংসারে সাতজন প্রাণী, নিজেদেরই জায়গা হয় না, আবার একখানা ঘর ভাড়া দেবার কথা ভাবব কি ক'রে ?

শীলাদের অবশ্য এরকম কোন কারণ ছিল না, কারণ প্রাণী মাত্র তারা দু'জন, সে আর তার স্বামী। রান্না এবং ঘরের কাজে সাহায্য করবার জন্য ভোরবেলায় আসত একটি মধ্যবয়সী মেয়েছেলে—রাঁধুনী এবং ঝিএর সমন্বয়। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যার একটু পরে সে চলে যেত। প্রতাপবাবুও ঐ সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসতেন।

রাশভারি লোক প্রতাপ মজুমদার। চীনাবাজারে বাপ-দাদার আমলের একটা পাইকারি দোকান ছিল,

উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা এসেছিল তাঁর হাতে। টাকার অভাব ছিল না। পরে শীলার মুখেই শুনেছিলাম, টাকার জোরেই নাকি তিনি শীলাকে কিনে নিয়েছিলেন তাঁর দুঃস্থ বাবা-মার কাছ থেকে।

তাকে বিয়ে করে তিনি যে তার পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করেছেন সেটা মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিতেন, বিশেষ ক'রে বিদ্রোহের আভাস যখন শীলার মুখে ফুটে উঠত। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, শীলার শাড়ী-গয়না এবং প্রসাধনের নানা উপকরণ জোগাতে প্রতাপবাবু এতটুকু কার্পণ্য করেন নি।

আমার জীবনে শীলার আবির্ভাব হয়ত আদৌ হ'ত না, যদি প্রতাপবাবুর একটা প্রধান বদ্‌খেয়াল মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে না যেত। তরল পদার্থের আকর্ষণ প্রতাপবাবুকে পেয়ে বসেছিল।

তবু, যাকে মাতলামি বলা বলে তা' তিনি কখনও করেননি, অন্ততঃ আমার চোখে পড়েনি। হুইস্কি, জিন্ আর ব্র্যাণ্ডির বোতল বাড়ীতেই থাকত, সন্ধ্যার পর ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে, তিনি তাঁর শোবার কামরায় একটা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বস্‌তেন এবং নিজেই বোতল গ্লাস জোগাড় ক'রে কাছে একটা টিপয়ের উপর সেগুলো রাখতেন। তারপর রাত ন'টা সাড়ে ন'টা অবধি আপন মনে চুমুক দিয়ে যেতেন গ্লাসের পর গ্লাস, আর পড়তেন পেপারব্যাক্ সংস্করণের সস্তা ডিটেকটিভ নভেল।

এই সময়টায় শীলা সাধারণতঃ থাকত তার রান্না অথবা ভাঁড়ার ঘরে। সে জানত স্বামীর তাকে প্রয়োজন হবে ঐ সাড়ে ন'টার পরে, প্রথমে রাত্রির আহার, তারপর শয্যার সাহচর্য্য।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এই রুটিন অনুযায়ী চলছিল শীলার জীবন এবং এটা তার গা-সওয়াও হয়ে গিয়েছিল। তবু দু'এক সময় বিদ্রোহের একটা ঝিলিক দেখা দিত তার কথায় এবং ব্যবহারে, বিশেষ করে প্রতাপবাবু যখন তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিতে চেষ্টা করতেন তাঁর নিজস্ব টেক্‌নিকে।

নিয়ম ছিল, ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজতেই শীলা স্বামীকে ডাকবে খেতে—সব আহার্য্য সাজিয়ে। খাওয়া শেষ হলে মন্থর গতিতে একটা চুরুট ধরিয়ে প্রতাপবাবু বারান্দায় গিয়ে বসতেন এবং এদিকে শীলা চুকিয়ে নিত তার নিজের খাওয়া-দাওয়ার পাট। রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর মোটামুটি গুছিয়ে রেখে কাপড় বদলে সে শুতে আসত রাত সাড়ে এগারোটা বারোটায়।

সেদিন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, তবু শীলার কোন সাড়াশব্দ নেই। প্রতাপবাবু, হয়ত ঘড়িটার দিকে তাকালেন। ব্যাপার কি? দোকানে দিনটা ভাল যায়নি', মেজাজও আগে থেকেই একটু চড়া ছিল। যখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে তখন তিনি উঠতে বাধ্য হ'লেন। উঁকি মেরে দেখলেন, টেবিলের একপাশে বসে তন্ময় হয়ে শীলা কি লিখছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন দু'এক মিনিট। কি বিস্ময়কর এই তন্ময়তা, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই শীলার, যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য জগতে চলে গেছে সে!

শীলা চম্‌কে উঠল যখন সে দেখল তার পেছন থেকে একটা ছায়া এসে পড়েছে সামনের কাগজগুলোর উপর। শশব্যস্তে সে গুটিয়ে নিল সেগুলো, তারপর তাকাল দেয়ালের ঘড়িটার দিকে। তাই ত, প্রায় দশটা বাজে, এত দেরী হয়ে গেছে!

লজ্জিত অনুতপ্ত মুখে সে বলল, খাবার সব তৈরী আছে, আমি দু'মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আস্‌ছি।

বাধা দিলেন প্রতাপবাবু। বললেন, সময় যখন পেরিয়েই গেছে তখন আর একটু দেরী হ'লে কোন ক্ষতি হবে না। ...আমি জানতে চাই, ওসব কি লেখা হচ্ছিল? কাকে?

থতমত ভাবে শীলা জবাব দিল, একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম—কাউকে নয়।

—প্রবন্ধ? দেখি। প্রতাপবাবু এগিয়ে এলেন।

কাগজগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে শীলা জবাব দিল, আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমি দেখাতে পারব না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রতাপবাবু। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই তীব্র কণ্ঠে বললেন, দেখাতে পারবে না? প্রবন্ধের মধ্যে এমন কি গোপনীয় কথা থাকতে পারে যা' স্বামীকে দেখানো যায় না?...আমি বলছি, ওটা প্রবন্ধ নয়, তুমি কারো কাছে চিঠি লিখছিলে।

—বিশ্বাস করো, চিঠি নয়।...দৃঢ়ভাবে জবাব দিল শীলা।

—তাহ'লে দেখতে দাও।...আদেশের সুরে বল্লেন প্রতাপবাবু।

—আমি আগেই বলেছি, দেখাতে পারব না।

সম্বিৎ হারিয়ে ফেল্লেন প্রতাপবাবু। আরো কাছে এগিয়ে এসে পাগলের মত শীলাকে আক্রমণ করলেন তিনি, চেষ্টা করলেন শীলার হাতের মুঠো থেকে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিতে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শীলা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে, আর কাগজগুলো দু'তিন টুকরো হয়ে খানিকটা ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর, খানিকটা এল প্রতাপবাবুর হাতে, কিন্তু বেশীর ভাগটা রইল শীলার হাতের মুঠোর মধ্যে।

আমি সে সময় আমাদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসেছিলাম, একা। সেখান থেকে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম এই দৃশ্যের খানিকটা অংশ এবং শুনলাম শীলার কাতর আর্ত্তনাদ—মা গো!

তারপর কি হ'ল জানি না। প্রতাপবাবুর বোধ হয় নজর পড়ল আমার দিকে, তিনি দরজাটা বেশ একটু জোরেই বন্ধ করে দিলেন।

পরে শুনেছিলাম, শীলা সেদিন লিখছিল, প্রবন্ধ নয়, চিঠিও নয়, অনেকটা নিজের জীবনকে অবলম্বন করে একখানা গল্প। দুটো কারণে প্রতাপবাবুকে সত্যি কথা সে বলতে পারেনি। এক, লেখার প্রয়াস এই তার প্রথম, নতুন লেখিকার স্বাভাবিক লজ্জা সে অতিক্রম করে কি করে? দ্বিতীয়, যে গল্প তার নিজের জীবনেরই ছায়া এবং যার মধ্যে প্রতাপবাবুর ছবিও এসে পড়েছে তা সে তাঁকে দেখায় কোন দুঃসাহসে?

পরের দিন কলেজে আমার ক্লাশ ছিল মাত্র একটা। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম, আদৌ কলেজে যাব না। সংকল্পটা দৃঢ়ীভূত হ'ল যখন দেখলাম শীলাদের ফ্ল্যাটএর এই সীনটা। এই লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা বঙ্গবধূকে রক্ষা করতেই হবে!

তোমরা বল্বে, একি অনধিকার চর্চ্চা! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ, তা'ও এমন কিছু বাড়াবাড়ি হয়নি। তুমি কে যে এর মধ্যে মাথা গলাতে চাও?

তোমরা ভুলে যাচ্ছ আমার বয়স, ভুলে যাচ্ছ আমার ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড। বয়স আমার আঠারো, ইংরেজী সাহিত্যে বি-এ পড়ছি, শিভাল্‌রির কাহিনী আমার মনকে ক'রে রেখেছে অহেতুকী সাহসী। তাছাড়া আমি ছেলেবেলায় নিজের চোখে দেখেছি আমারই আপন দিদির বহু অত্যাচারিত জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। মরে গিয়ে তিনি বেঁচেছেন, কিন্তু আমাকে রেখে গিয়েছেন নিষ্ফল আক্রোশের বিদ্রোহী।

আমি লক্ষ্য করলাম প্রতাপবাবু অন্যান্য দিনের মত বেলা দশটায় বেরিয়ে গেলেন। ওঁদের ঝিটাও বেরিয়ে গেল একটু পরে, একটা বাজারের থলি হাতে করে।

আমি এই সুযোগের অপেক্ষাই করছিলাম! আমাদের ফ্ল্যাটএও বাবা-দাদা অফিসে চলে গেছেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে, মা ঘরের কাজে ব্যস্ত। আমি সুট করে বেরিয়ে এসে শীলাদের ফ্ল্যাটএর বেলটা টিপলাম।

দরজাটা একটু খুলে উঁকি মারল শীলা। বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল সে।

—আমি আপনাদের পাশের ফ্ল্যাট-এ থাকি। আমার নাম সুবীর।...ভেতরে আসতে পারি?

একটু ইতস্ততঃ করছিল শীলা। কিন্তু আমার মুখখানা দেখে তার বোধহয় ভয়ের চেয়ে স্নেহই জেগেছিল বেশী। বল্ল, এসো।

ভেতরে ঢুকলাম আমি। লক্ষ্য করলাম, থুতনির নীচে খানিকটা জায়গা দু'টুকরো ইলাষ্টোপ্লাষ্টএ ঢাকা।

জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল শীলা। ততক্ষণে আমার সাহস অনেকখানি উবে গেছে। সত্যি ত, কি বলব?

ঘেমে উঠছিলাম আমি। অবশেষে মরিয়া হয়ে বললাম, কাল রাতে আমাদের বারান্দা থেকে সব দেখতে পেয়েছি।

এক ঝলক রক্তের ঢেউ চলে গেল শীলার মুখের উপর দিয়ে। মৃদুকণ্ঠে সে বল্ল, তা' নিয়ে তোমার ভাবনা কেন ভাই?

শীলার এই সম্বোধনে আমি যেন একটু ভরসা পেলাম। বল্লাম, আমার এক দিদি ছিলেন, তাঁর কথা মনে পড়ে। যদি আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি, আমাকে জানাবেন।

শীলা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর গম্ভীরভাবে বল্ল, খুবই ঠিক সময়ে তুমি এসেছ সুবীর। ঝিটাকে

ল্তে ভুলে গিয়েছি—আমাকে একটা সিবাজল পাউডার এনে দিতে পারবে ?

বলবার সময় মুখ টিপে শীলা হেসেছিল কি ?

আমার কিন্তু এসব লক্ষ্য করবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলাম ওষুধটা নিয়ে আস্‌তে।

এইভাবে শীলার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। খুব বেশী যে ওর কাছে যাওয়া-আসা কর্‌তাম তা' নয়, কারণ প্রতিবন্ধক অনেক ছিল। প্রথম, প্রতাপবাবু যে সময়টা উপস্থিত থাকতেন সে সময়টা বাদ দিয়ে আমাকে যেতে হ'ত। তার মানে সন্ধ্যার পর অথবা ছুটির দিনে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়, আমি যে মাঝে মাঝে পাশের ফ্ল্যাটএ যাই সেটা আমার বাবা-মা-দাদাকে জানতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলাম না, যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একদিন না একদিন তাঁরা জানতে পারবেনই। তৃতীয়, আমি চেষ্টা করতাম সেই সময়টায় যেতে—যখন তাদের ঝিও সাধারণতঃ বাইরে থাকত। যদিও এটা সব সময় সম্ভব হয়নি, তবু আমি অনুধাবন করে দেখেছিলাম যে সকাল সওয়া দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা এবং বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টাই ছিল সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। ঝিটা ছিল শীলার খুবই অনুগত, শীলার অলক্ষ্যে তার সম্বন্ধে কোন প্রকার গল্প করতে, বিশেষ করে প্রতাপবাবুর কাছে, তার নৈতিক মর্য্যাদায় বাধত।

আমি যে সাহিত্যের ছাত্র, শীলা তা' শীগ্‌গীরই জানল। আমারই পীড়াপীড়িতে সে আমাকে দেখাতে রাজী হ'ল তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার দু' একটি নিদর্শন। কিন্তু যে গল্প লেখা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার সংঘাত সেটা আমি কোন দিনই দেখিনি। যদি দেখতাম তবে আমাদের জীবনের ধারা হয়ত সম্পূর্ণ অন্যদিকে বয়ে যেত।

সপ্তাহে গড়পড়তা দু' তিন দিন আমাদের দেখা হ'ত—সব সময়ই শীলাদের ফ্ল্যাটএ। এই সামান্য সময়টুকুতে (আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার বেশী নয়) আমার পিপাসা মোটেই মিট্‌ত না, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

শীলার জীবনের খানিকটা ইতিবৃত্ত জানলাম। তিন বছর আগে তার বিয়ে হয়, তখন তার বয়স একুশ। মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল, তাই বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন যখন প্রতাপ মজুমদার নিজেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। একদিন এক উৎসবে শীলাকে দেখে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, তা ছাড়া তিনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে চল্লিশের কাছাকাছি যে পাত্রের বয়স—বাংলা দেশের সমাজেও তার পক্ষে সুন্দরী তরুণী স্ত্রী পাওয়া সহজ নয়, টাকা যতই থাকুক না কেন।

তোমরা বুঝতেই পারছ, এই বিয়েতে শীলার মতামত নেবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অভিমানাহত শীলাও বিয়ের পর বাবা-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক এক রকম বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

প্রতাপবাবুর সঙ্গে শীলার কোনদিক দিয়েই মিল হয়নি। বয়সের ব্যবধান ত ছিলই, তা ছাড়া বড় ব্যবধান ছিল দু'জনের মনের। প্রতাপবাবু মনে করতেন টাকা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বশ করা যায়, অথচ শীলার কাছে টাকার দাম ছিল অত্যন্ত অল্প। তাছাড়া, শীলা সম্বন্ধে তাঁর ছিল একটা নিদারুণ সন্দেহ, শীলা যে তাঁকে ভালবাসতে পারেনি এই অনুভূতি তাঁকে করে তুলেছিল সন্ত্রস্ত, কুটিল, নিষ্ঠুর।

এই অবস্থায় আমি হয়ে দাঁড়ালাম শীলার একটা বড় এস্‌কেপ। যদিও প্রথমে সে আমাকে ছেলেমানুষ ছাড়া আর কোন স্বীকৃতিই দিতে রাজী হয়নি, তবু আমি জোর করে তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলাম খানিকটা অন্য রকমের প্রতিষ্ঠা। তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতাম সাহিত্যের, বিশেষ করে প্রেমের সাহিত্যের। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে যদিও আমার বয়স আঠারো—তবু আমি বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক বড়, শুধু তার চেয়ে কেন, প্রতাপবাবুর চেয়েও।

শীলা মাঝে মাঝে বল্‌ত, কিন্তু সংসারের কতটুকু তুমি জানো, সুবীর ?

বিরক্ত হয়ে আমি পাল্‌টা জবাব দিতাম, আর তুমিই কতটুকু জানো, শীলা ? মাত্র ছয় বছরের বড় তুমি, সেই অহঙ্কারেই অজ্ঞান।

তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, শীলাকে আমি শীলাদি' বা ঐ জাতীয় কোন সম্বোধন করতে রাজী হইনি। ও যখন নির্ব্বিচারে আমাকে নাম ধরে ডাকতে সুরু করল তখন আমিই বা কেন করব না ? ছয় বছরের পার্থক্য কি এমনই প্রকাণ্ড একটা পার্থক্য ?

শীলা বলত, মেয়েদের কথা আলাদা, তারা কুড়িতে বুড়ী হয়, তাদের বুদ্ধি ফোটে ছেলেদের অনেক আগে।

আমি বলতাম, মেয়েলি বুদ্ধি বলেই এভাবে তর্ক করছ। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ী হয় শরীরে, মনে নয়। আর তাদের যে অকালপক্ক বুদ্ধি ফোটে সেটা হচ্ছে শুধু ঘর-কন্না আর স্বামীর পরিচর্য্যাকে উপলক্ষ করে, আর কোন বিষয়ে নয়।

শীলাদের এখানে একবার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোকের নাম নীরেন্দ্রসদয় বসু, প্রতাপবাবুরই বন্ধু।

সামনের দরজাটা সেদিন ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না, হাতলটা ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল, আমি ঢুকে পড়লাম। দেখি, সোফায় বসে শীলা কথা বলছে একজনের সঙ্গে।

পরিচয় করিয়ে দিল শীলা, আমার স্বামীর বন্ধু, নীরেন্দ্রসদয় বসু। আর এ হচ্ছে আমার ছোটভাইএর কলেজের বন্ধু, সুবীর।

ছোটভাইএর কলেজের বন্ধু? আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শীলার চোখের দিকে নজর পড়তেই চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, স্বামীর বন্ধুকে আমার সম্পূর্ণ পরিচিতি দিতে চায় না।

দুটো কথা বলে বিদায় নিলাম সেদিনের মত। নীরেন্দ্রসদয়বাবু বেশ সরল লোক, শীলার এই নির্দ্দোষ মিথ্যাভাষণটুকু ধরতে পেরেছেন ব'লে মনে হ'ল না।

পরে শীলার মুখে শুনলাম, বন্ধুদের মধ্যে নীরেন্দ্রসদয়-বাবুই একমাত্র লোক যাঁকে প্রতাপবাবু খানিকটা পছন্দ এবং বিশ্বাস করেন, তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে আসায় কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না।

একটা সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। প্রতাপবাবু বলে পাঠিয়েছেন তাঁর ফিরতে দেরী হবে, বাইরে কি একটা সান্ধ্য-পার্টি আছে, সেটা সেরে রাত সাড়ে নটা দশটায় ফিরবেন। খাবেন অবশ্য বাড়ীতেই।

আমি পাঁচটার একটু পরে এসেছিলাম। এসেই শুনলাম এই খবর। বেশ খুসী হয়ে উঠলাম। মনে হ'ল শীলাও খুসী হয়েছে।

বলল, আজ তাহ'লে এখানে কিছু খেয়ে যাবে। বাড়ীতে খোঁজ পড়বে না ত?

বললাম, না।

সময় মত অর্থাৎ আন্দাজ সাড়ে সাতটায় ঝিটাও চলে গেল। যাবার আগে দাদাবাবুকে নমস্কারও ক'রে গেল। ফ্ল্যাটএ রইলাম শুধু শীলা আর আমি—একা।

গা'টা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করছিল। ঘরে বাতি যদিও একটা ছিল তবু যেন মনে হচ্ছিল আমরা বসে আছি আলোবিহীন একটা নির্জ্জন দ্বীপে—সমস্ত পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র।

—কি ভাবছ?···শীলা প্রশ্ন করল।

—তুমি আমার কোন কথাই সিরিয়াস্‌ভাবে নেও না, তোমাকে ব'লে লাভ কি?···অভিমানাহতসুরে আমি জবাব দিলাম।

—ওরে, বাবা, সুবীরবাবুর রাগ হয়েছে!···তা' বলোই না, দেখি সীরিয়াস্ ভাবে নেওয়া যায় কিনা!

গাঢ়স্বরে আমি বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি, শীলা!

তরল হাসিতে ঘরটা আলো করে শীলা বলল, ওঃ, এই? এত আমি জানি! এ আর নতুন কথা কি?

—জানো? অথচ এতদিন ত বলোনি'!···একটু বিরক্তিই বোধ করলাম আমি।

—এর মধ্যে বলাবলির কি আছে?···তুমি ছেলে-মানুষ হ'তে পার, আমার ছেলেমানুষ হওয়া সাজে না!

মরিয়া হয়ে উঠলাম আমি। শীলার একটা হাত ধরে তাকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার ভালবাসা ছেলেমানুষি নয়, শীলা। তোমাকেই আমি প্রথম ভালবেসেছি-এবং এই আমার শেষ ভালবাসা। বিশ্বাস ক'রো।

—ঐজন্যই ত তোমাকে ছেলেমানুষ বলছি।···পরি-হাসের সুরে বলল শীলা।···আমাকে প্রথম ভালবেসেছ, একথা মানছি, কিন্তু ব'লোনা এই তোমার শেষ ভাল-বাসা! হাসি পায়।

কথাটা পাল্‌টে আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি আমাকে খানিকটা অন্ততঃ ভালবাস, শীলা, নয় কি?

গম্ভীর হয়ে গেল সে। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, জানি না।

এরই কিছুকাল পরে ঘটল একটা ঘটনা, যার ফলে

আমি স্থির ক'রে ফেল্‌লাম যে প্রতাপ মজুমদারকে খুন করতেই হ'বে, যদি শীলাকে বাঁচাতে হয়।

প্রতাপবাবু বোধহয় কোনপ্রকারে জান্‌তে পেরেছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটএ আমার যাতায়াতের কথা, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না আঠারো বছরের একটি ছেলেকে কি ক'রে অভিযুক্ত করা যায়—তার চেয়ে ছয় বছরের বড় একটি বিবাহিতা মহিলার প্রতি আসক্তির অপরাধে। প্রমাণ জুটে গেল আমারই অবিমৃষ্যকারিতায়।

শীলার জন্মদিন উপলক্ষে আমি তাকে ইংরেজি একটি প্রেমের কবিতাগুচ্ছের বই উপহার দিয়েছিলাম। ভেতরে শুধু লিখেছিলাম, শীলাকে, সু।

প্রতাপবাবুর নজরে পড়েছিল বইখানা। প্রশ্ন করলেন, এই লেখার মানে কি?

—মানে সবই সোজা, আমাকে বইটা উপহার দিয়েছে।

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু প্রেমের কবিতা কেন আর "সু"টিই বা কে?

কোন জবাব দিল না শীলা।

ক্ষেপে গেলেন প্রতাপবাবু। চেঁচিয়ে বললেন, তুমি ভাব আমি কিছুই জানি না, বুঝতে পারি না? পাশের ফ্ল্যাটের ছোকরার সঙ্গে ঢলাঢলি আজ কতদিন ধরে চলছে শুনি? জবাব দিতেই হবে তোমাকে!

এবার শীলা জবাব দিল, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত।

—ছিঃ, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

—বেলেল্লাপনা করবে তুমি, আর লজ্জা হওয়া উচিত আমার? আজ তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবে না!

বলে টেবিলের উপর থেকে পেন্সিল কাটবার খোলা ছুরিটা তুলে নিলেন প্রতাপ মজুমদার এবং শীলার কপালের একদিকে কোণাকুণিভাবে টেনে দিলেন রক্তাক্ত রেখা। নিতান্ত দৈবগুণে বেঁচে গেল তার চোখটা।

আমি সেদিন বাড়ীতে ছিলাম না, তাই এসব ঘটনার কিছুই তখন জান্‌তে পারিনি।

পরের দিন শীলার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, চম্‌কে উঠলাম তার কপালের উপর প্রকাণ্ড এক ব্যাণ্ডেজ দেখে। বিছানায় শুয়ে ছিল সে, একা। ঝি ঘরের কাজকর্ম করছিল। বলা বাহুল্য, প্রতাপবাবু তাঁর সময়মত দোকানে চলে গিয়েছিল।

সব কথা শুন্‌লাম। শীলার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, একটু জ্বরও হয়েছে। বল্‌লাম, ডাক্তার ডাকা বোধহয় উচিত হবে শীলা।

শীলা বল্‌ল, আজকের দিনটা যাক্। তাছাড়া নীরেন্দ্র-সদয়বাবুর আস্‌বার কথা আছে—উনি ত ডাক্তার, উনি যা' হয় ব্যবস্থা করবেন।

নীরেন্দ্রসদয়বাবুর সঙ্গে একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল। উনি যে ডাক্তার তখন শুনিনি'। আমি চুপ করে রইলাম।

—কিচ্ছু ভেবো না, সুবীর। দু'দিনে সেরে যাবে। তবে দাগটা বোধ হয় আমাকে বইতে হবে চিরকাল।... তা মন্দ কি?

আবেগকম্পিত কণ্ঠে আমি বললাম, আমারই জন্য তোমাকে এসব সহ্য করতে হ'ল, শীলা, এর প্রতিশোধ আমি নেবই!

ম্লান হাসি হেসে সে বল্‌ল, আবার ছেলেমানুষি করছ, সুবীর!

শীলা আমাকে ছেলেমানুষ মনে করতে পারে, কিন্তু আমি ছেলেমানুষ নই। শীলা বুঝ্‌তে পারছে না, এভাবে সারাজীবন কাটানো সম্ভবপর নয়। আজ না হয় কপালের উপর শুধু একটা দাগ বইতে হচ্ছে, কিন্তু এর পর তার স্বামী যে তাকে খুন ক'রে ফেলবে না তা সে জোর করে বল্‌তে পারে কি?...না, না, শীলাকে বাঁচাতেই হবে।

কি ক'রে প্রতাপবাবুকে খুন করতে হবে তা আমি ভেবে রেখেছিলাম। তিনি রোজ সন্ধ্যায় নিয়ে বসেন হুইস্কি আর সোডার বোতল। হুইস্কির বোতলটা ওঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে, ওঁরই দেরাজে, এসব খবর আমি আগেই নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ দেরাজের ডুপ্লিকেট চাবি আমি জোগাড় করব, তারপর শীলার অজ্ঞানতে বোতলে ঢেলে দেব পটাসিয়াম সায়ানাইড্‌এর গুঁড়ো।...একচুমুক খেলেই সব শেষ হয়ে যাবে!

কিন্তু প্রতাপ মজুমদারের ভাগ্য ভাল, এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। ওঁর প্রাণ নিয়ে কি লাভ হবে আমার?

প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তা'হলে নিতে হবে শীলার উপর, কারণ তার প্রতারণার তুলনা হয় না!

আরও খুলে বল্‌তে হবে তোমাদের? এখনও বুঝতে পারছ না, কি প্রতারণার কথা বল্‌ছি?

তবে শোন। সেদিনও সাম্‌নের দরজাটা ভেতর থেকে খোলা ছিল। শীলার কপালের কাটাটা সম্পূর্ণ সারেনি, সে তার বিছানায় শুয়ে ছিল। ফ্ল্যাটএ আর কেউ ছিল না।

আমি শীলার নাম ধরে ডাক্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু থম্‌কে গেলাম। শোবার ঘরে একজন পুরুষমানুষের গলা শুন্‌তে পেলাম যেন। প্রতাপবাবু সকাল সকাল দোকান থেকে ফিরে এসেছেন নাকি?

তারপরই বুঝ্‌লাম, প্রতাপবাবু নন্‌, কথা বল্‌ছেন নীরেন্দ্রসদয়বাবু। খুব চাপাস্বরে বল্‌ছেন, কান পেতে শুন্‌তে হয়।

—মৌরাণী, আর ত আমাদের লুকিয়ে থাকা চল্‌বে না। তোমার কোন আপত্তি আমি শুন্‌ব না, তোমাকে আমার সঙ্গে চলে আস্‌তেই হ'বে।

মৌরাণী? শীলা নীরেন্দ্রসদয়বাবুর মৌরাণী?

মৌরাণী জবাব দিল, আমি বড্ড ক্লান্ত। তুমি যা ভাল বোঝ, ক'রো।...আঃ কি ছেলেমানুষি কর্‌ছ?

এবারকার ছেলেমানুষিটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যধরণের। এতদূর থেকেও আমি অনুভব কর্‌লাম তাদের চুম্বন-আলিঙ্গনের সৌরভ, শুন্‌তে পেলাম শীলার অস্ফুট স্বীকৃতি।

ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি। কান ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছিল, হাত পা থর্‌ থর্‌ কাঁপ্‌ছিল।

আমার শুভ্র ভালবাসা শীলার কাছে ছেলেমানুষি, আর নীরেন্দ্রসদয়বাবুর কদর্য্য উপচার সানন্দে গ্রহণের বস্তু! শীলা আমাকে ভালবাসতে পারে নি বুঝ্‌লাম, কিন্তু নীরেন্দ্রসদয়বাবুর মধ্যে কি ঐশ্বর্য্য দেখতে পেল সে? আর যদি বা তাকে ভালবেসেই ছিল—সে কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌বার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

শীলা হুইস্কি খায় না, তাই ভাব্‌ছি অনেক কষ্টে জোগাড় করা এই পটাসিয়াম সায়ানাইডের গুঁড়ো কি ক'রে ওর পানীয়ের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায়!

শিক্ষা সমস্যা

ডাঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

গণতন্ত্রে ভবিষ্য পৌরজন গঠন এক মহা সমস্যা; সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের ভবিষ্যতের আশার স্থল—তরুণতরুণীদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই ভাবেই রচিত করিতে হইবে। তাঁহাদের দেশহিতে আত্মহিতবুদ্ধি যাহাতে জাগে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমবায় ও সততা এবং স্বাবলম্বনের প্রবণতা ও স্বাধীনচিন্তা ও কর্ম্ম প্রণালীর শক্তির যাহাতে উন্মেষ ও বিকাশ হয়, তাহারই ব্যবস্থা গোড়া হইতে করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শিক্ষাদান বিষয়ে অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় প্রধানতঃ চিন্তা প্রণালীর বিকাশের কথাই কিছু বলিব।

আমাদের শিক্ষাদানে চিন্তাপ্রণালীর তাদৃশ স্ফূর্ত্তি ঘটে না কেন? এ বিষয়ে ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান অন্ততঃ প্রথম প্রয়োজন। সার আশুতোষ ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলা পাঠ্যে স্বাধীন রচনার অবকাশ দিয়াছিলেন বলিয়া আজ বাংলার লেখক-লেখিকার এত আনন্দ সমাবেশ। ইংরাজীতেও রচনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেও চিন্তার স্ফূর্ত্তি ভাষার আড়ালে ঘটিতে পারে নাই সেরকম। নর্ম্মাল ট্রেনিং এর সঙ্গে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকায় আমার ধারণা হয় যে মাতৃভাষায় ভূগোল, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালীতে ট্রেনিং এর ছাত্রদের বিভীষিকা অনেকটা কমিয়া যায়। এখন বি, টি শিক্ষণও বাংলায় হওয়াতে পাশের হার শতকরা ৯০।৯২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহাতে শিক্ষা সস্তা হইয়া গেল মনে করিয়া বিজ্ঞগণের ভয় পাওয়ার কারণ

নাই। ইহা জাতীয় শিক্ষার প্রগতি পথের অভ্রান্ত সন্ধান দিতেছে মাত্র। তবে ইহার সঙ্গে বি, টি শিক্ষণের আর একদিকের কথাও ভাবিবার আছে; তাহা হইতেছে—হোম-ওয়ার্ক ও কলেজ-অধ্যাপকের অধীনে শ্রেণীপড়ান। মৌলিক রচনা ও হাতের কাজের জন্য ন্যস্ত বেশ কিছুটা নম্বর। এই প্রথায় পরীক্ষকের টরপেডোয় কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল বা মাঝারি ছেলের একেবারে নৌকাডুবির ভয় থাকে না এবং খুব ভাল ছেলেরও তাহার প্রাপ্য নম্বর লিখিত বিষয়ে না পাইলেও মোটের উপর পোষাইয়া যায়। আমরা অনেক সময় ভয়ে বা অভ্যাসের বশে বেশী নম্বর দেই না। সাধারণ 'স্কুল-কলেজের' ছাত্রদের বেলায়ও হোম-ওয়ার্ক বা হাতের বা মৌলিক কাজের জন্য কিছুটা নম্বর শিক্ষালয়-কর্তৃপক্ষের হাতে দিয়া রাখিলে নৌকাডুবির ভয় (পৌষের অপ্রত্যাশিত ক্ষতির কথা না হয় বাদই দিলাম) হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। আমি কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে থাকাকালীন মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা ছাত্রগণসহ পরিদর্শনান্তে ওপরে লাইব্রেরীতে সংশ্লিষ্ট পুস্তকের সাহায্য লইয়া অঙ্কন ও আলোচনার পর ছাত্রদের দ্বারা বাংলার পশুপক্ষী বিষয়ে দুখানি হস্তলিখিত চিত্রিত পুস্তক লেখাইয়া শিক্ষাসপ্তাহ প্রদর্শনীতে দেখাইয়া ছিলাম। আমার বিলাতে আউণ্ডেল স্কুল পরিদর্শনকালে শিক্ষকের অধীনে পরিক্রমা করিয়া সংগৃহীত তথ্য ও ছবি প্রভৃতির সহায়তায় ছাত্রগণের লিখিত—আউণ্ডেলের ইতিহাস দেখিয়াছিলাম। ব্রুসেলস্ ডিক্রোলি কলেজেও ঐ প্রণালীতে লিখিত সহরের চিত্রিত ইতিহাস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। পরিক্রমা প্রণালীতে মৌলিক ভৌগোলিক রচনা ম্যাপ-অঙ্কনসহ করা যাইতে পারে। এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ে মিষ্টার আলেকজেণ্ডার ফার্কার্সনের অধীনে ক্যাম্পে থাকিয়া এই ভাবে ভূগোললেখার কাজ শিখিবার সুবিধা পাইয়া ছিলাম। সেদেশে এরূপ কাজের জন্য শেষ পরীক্ষাতে কিছুটা নম্বর রাখা হয়। আমাদেরও এ দিকে কি কতটুকু করা সম্ভব হইতে পারে ভাবিয়া দেখিলে ভালই হয় মনে হয়।

মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থায় শেষে মত-প্রকাশেও স্বাবলম্বন আসে। শিক্ষকের উচিত কোন মূল বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে আলোচনা প্রণালীতে পড়াইয়া যাওয়া, কখনও বা তিনি সে সময়ে স্থান বিশেষে ঢোক গিলিবেন—যেন জানেন না এই ভাব দেখাইয়া। তখন ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে আগাইয়া আসিবে—শিক্ষককে প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করিতে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি "জ্ঞান-বোকা" সাজিবেন। ঠিক এইরূপ প্রণালী ছিল স্যার জাহাঙ্গীরজী কয়েজীর। ছাপার হরফে যাহা লেখা আছে তাহাই একমাত্র বেদ বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা আমাদের শিক্ষক ও পরীক্ষকদের একটি স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সব জিনিসই যাচাই করিয়া লইতে হইবে। সকল সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত যে একই হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বিলাতের শিক্ষালয়ে যে কোন যুক্তিযুক্ত উত্তরকে মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানে কিন্তু এক ছাঁচে ঢালা উত্তর না পাইলে "পান থেকে চুণ খসিয়া পড়ে।" ঠিকমত পড়ার জিনিসটাকে তাহার স্বাভাবিক পরিবেশে ফেলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতা সহকারে পড়িবার উপায় খুব কম; পড়াতে আনন্দরস সম্ভোগও সেজন্য অন্তর্হিত। পরের মুখে ঝাল খাইতে অভ্যাস করিয়া পড়াইতে বসিয়া সেই পথই ধরিয়া বসি, কারণ সে অবস্থায় অন্য রাস্তার কথা মাথায় ঢোকে না, অধীতব্য বিষয়কে পারিপার্শ্বিকে প্রতিফলিত করিয়া পড়াইতে আলস্য বা সময় সংক্ষেপ অথবা পাঠ্যের বোঝার ভূত সামনে আসিয়া বাধা দেয়। সুতরাং পারিপার্শ্বিকগত প্রতিফলন, অধ্যয়ন ও হাতের কাজে আলাদা নম্বর রাখাই উচিত।

পঠিতব্য বিষয়ের স্থানবিশেষে—ধীরগতি বাঞ্ছনীয় হইলেও গোরুর গাড়ীর মত গতি কোন অবস্থাতেই সুবিধাজনক নহে; শিক্ষক ও শ্রেণীর সম্মিলিত শক্তির তাদৃশ উদ্বোধনের জন্য কতকটা দ্রুতগতি বাঞ্ছনীয়। লক্ষ্যবস্তুর দিকে মানসিক ক্রিয়ার একটি উজ্জ্বল প্রগতি তাপকেন্দ্র মনের আগ্নেয়োন্মেষের সাহায্য করে—গোরুর গাড়ীর গতিতে তাহা মিলাইয়া যায়। গুঁজ গুঁজ করিয়া বা বৌদির মত ঘোমটা টানিয়া পড়ানর কোন অর্থ হয় না; শিক্ষককে একজন উৎসাহী সেনানীর ন্যায় সব মনকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া লক্ষ্য বস্তুর দিকে ধাবিত হইতে হইবে। সর্ব অন্তঃকরণ ও শক্তি তাঁহার সেই কাজে ঢালিয়া দিতে হইবে; মাঝে মাঝে থামিতে হইবে, বিষয় বিকশিত করিতে সহযোগে চিন্তা করিতে হইবে, বিষয় ধরিয়া একাধিক গ্রন্থকারের মতামত

সেই জ্ঞাতব্য বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে চিন্তা ও যুক্তি বিকাশের সুযোগ বেশী ঘটে এবং প্রশ্নের সমাধানে আত্মবিশ্বাসের আলোয় মনঃপ্রাণ আনন্দরসঘন হইবে। প্রশ্ন যে ভাবেই যে দিক দিয়াই আসুক না কেন, ছাত্রছাত্রী-গণ সকল দিক থেকেই তাহাকে বম্বার্ড (ঘায়েল) করিয়া সেখানে নিজ যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে। উচ্চশিক্ষার বেলায় পাঠ্যের বোঝা ততটা ভেতব্য নহে। যেহেতু সেখানে যোগ্য অধ্যাপকেরা বোঝা নিঙড়াইয়া সার-সংগ্রহ করিয়া পরিবেশন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে গোটা কতক মূল প্রশ্নের উপরই এক একখানি গুরুভার বইএর মূল্য দেওয়া উচিত; তাহার বিস্তারকে গলাধঃকরণ করান নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য নহে। আমার অধ্যাপক জ্যাকারিয়া সাহেবেরও এই মত ছিল। তিনি এই প্রণালীতে পড়িয়াই অক্‌সফোর্ডে ১৮টি আল্‌ফা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সম্মান (যাহার থেকে বেশী আর কেহ তখন সেখানে পান নাই) পাইয়াছিলেন। এ কথা সেখানে ট্যাবলেটে লেখা আছে দেখিয়াছিলাম। নিম্ন-স্তরে, আমার মনে হয়, সংক্ষিপ্ত পাঠ্য তালিকায় প্রগাঢ় (intense) অধ্যয়নের প্রয়োজন। তবে আমরা উপরের দিকে তাদৃশ অধ্যাপনার অভাবে অর্থহীনভাবে কতকগুলি বইএর বোঝা চাপানর পক্ষপাতী নহি। তাহা ব্যতীত পরীক্ষক বা প্রশ্নকর্ত্তাদের "পেলে খাই" ভাবের সামনে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় মাতৃভাষা-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, উচ্চ শিক্ষাতেও পাঠ্য তালিকা সংক্ষেপ খানিকটা অভিপ্রেত। ইংরাজীর অত্যধিক চাপের কথা তো আগেই ভাবিতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় অবস্থার যত শীঘ্র অবসান হ ততই ভাল। এ কথা যদি সত্য হয় তো কাজ সঙ্গে সং আরম্ভ হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র একজন বুড়ার কথা হইলে ইহা "অমৃতংবালভাষিতং।"

আমাদের দেশের জলবায়ু ও পরিবেশ সকল সময়ে তাদৃশ অনুকূল নহে বলিয়া আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে—পাঠ যাহাতে যান্ত্রিক না হইয়া মাঝে মাঝে জীব পরিবেশ সংস্পর্শে কিছুটা সজীব থাকে।

আর শিক্ষায় ত্রিধারার অনুসরণে ছাত্রছাত্রীদে তাহাদের উপযুক্তপথে শিক্ষা লাভ করিতে দিলে শিক্ষা চিন্তা, স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের পথ অনেকটা সহজ সর হয়। আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, তখন রবীন্দ্রনা প্রায়ই তাদৃশ শিক্ষকের অভাব বলিয়া দুঃখ করিতেন ইউরোপে—বিশেষতঃ স্কটল্যাণ্ডে দেখিয়াছি—অন্যা কাজের ন্যায় শিক্ষকতাতেও আন্তরিকতা কত বেশী সাদাসিধে বেশ একজন পি এইচ-ডি শিক্ষক এক পানের ডিবার মত কৌটা হইতে আমায় ডিমের স্যাণ্ড উইচ করা তিন টুকরো পাঁউরুটি হইতে একটুকরা এব কাপ চায়ের সঙ্গে দিয়া আপ্যায়িত করিতেন—আ তখন তাঁহাদের স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। মনে হ আমাদের এখানে জেলা-শাসক স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়ে সরকারী অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে নিমন্ত্রণ ব্যাপা শিক্ষকদের প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরাইলেই ভাল হয়—এই ভাবে তাঁহাদের মর্য্যাদা দান জাতীয় শিক্ষার দিক থেকে খুবই বাঞ্ছিত। মুদলিয়র কমিশনেও মনে হয় এই কথা উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।



বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৫০৫ সালের ঘটনাবলী

মুহরম মাসে আমার মা নিগার খানুম জ্বরে আক্রান্ত হন। শরীর থেকে কিছু রক্ত বের করে দিলেও কোনও উপকার হলো না। খোরাসানের একজন হেকিম তাঁর চিকিৎসা করেন। পথ্য হিসাবে তরমুজের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে আসছিল। ছয়দিন অসুখে ভুগবার পর তিনি আল্লার দরবারে চলে গেলেন।

এই সময়টায় এমন ভূমিকম্প হয় যে দুর্গের অনেক অংশ, পাহাড়ের চূড়া, পল্লীর ও সহরের অনেক বাড়ী প্রবল ঝাঁকুনিতে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক লোক ঘরবাড়ী চাপা পড়ে মারা যায়। 'পেমগান' গ্রামের সমস্ত ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সত্তর আশিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ঘর চাপা পড়ে মরে যায়। একটা পাথর ছুঁড়লে যতটা যায় চওড়ায় সেই রকম, আর তীর ছুঁড়লে যতটা যায় লম্বায় ততটা ঘন পরিমাণ জায়গা ভূগর্ভে বিলীন হয়ে একটা জলের ফোয়ারা মাটি ফুঁড়ে ওঠে এবং তার ফলে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ত্রিশ মাইল ব্যাপী জায়গা এমন জীর্ণ ও ভাঙ্গাচোরা হয়ে যায় যে কোনও জায়গা আগের সমতল অবস্থার চেয়ে এক হাত উঁচু, আবার কোনও জায়গা একহাত পরিমাণ নীচু হয়ে যায়। কোনও কোনও জায়গায় মাটি এমন ফাঁক হয়ে যায় যে সেই ফাঁকে যে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। ভূমিকম্পের সময়টায় পর্ব্বতশীর্ষ থেকে ধূলোর মেঘ উঠতে দেখা যায়।

বীণা-বাদক নুরউল্লা তখন আমার সামনে বসে সারেঙ্গে ঝঙ্কার তুলছিল। আর একটা বাদ্যযন্ত্র তার পাশেই ছিল। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি আরম্ভ হতেই সে দুইটি যন্ত্র দুই হাতে তুলে নেয়। কিন্তু তার নিজের দেহ আয়ত্তে রাখা কঠিন হওয়ায় তার দুই হাতে ধরা দুইটি বাদ্যযন্ত্রে ঠোকাঠুকি লাগতে থাকে। জাহাঙ্গির মির্জ্জা প্রাসাদের ওপর-তলার বারান্দায় ছিলেন। ভূমিকম্প আরম্ভ হতেই তিনি বারান্দা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়েন। তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি। তাঁর একজন খানসামারও ঐ অবস্থা হয়। ওপরকার অলিন্দ ভেঙ্গে তার ওপর পড়ে যায়। কিন্তু আল্লা তাকে রক্ষা করেন। সে একটুও আঘাত পায়নি।

সেই একই দিনে তেত্রিশবার ভূকম্পন হয়। তারপর একমাস ধরে দিন রাতে দুই তিনবার করে কম্পন হতে থাকে।

বেগ আর সৈন্যদের দুর্গ এবং অন্য সুরক্ষিত জায়গার ভাঙ্গাচোরাগুলো মেরামত করবার আদেশ দেওয়া হয়। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর প্রায় একমাসের মধ্যে সমস্ত ভাঙ্গা অংশগুলো মেরামত করে ফেলা হয়।

আমু নদীর তীরে বাকি আমাদের দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে তার মত সম্মান ও কর্তৃত্ব আমি আর কাউকেই দিইনি। কাবুলের রাজস্বের একটা অংশ ষ্ট্যাম্পট্যাক্স থেকে ওঠে। এই করের টাকাটা আমি তাকেই দিই এবং তাকে কাবুলের দারোগা নিযুক্ত করি। এই রকম নানা অনুগ্রহ পেয়েও সে কোনও দিনই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ ছিল না, বরং আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তাব সুবিধে পেলেই করেছে। আমি তার ছলনা বুঝতে পেরেও আমাকে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছি এবং তাকে আমার কাছে থাকতেই অনুরোধ করেছি।

দুই একদিন পর পরই সে তাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে থাকে। তার ছলনা আর তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনবরত আবদার শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করলো। তার এই আচরণে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে আমি আমার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। সে আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে—তার সঙ্গে আমার এই চুক্তি আছে যে সে নয়টা অপরাধ আমার কাছে করলে তবে তার কৈফিয়ৎ তলব করতে পারবো। আমি তার কাছে এগারো দফা অপরাধের তালিকা পাঠিয়ে দিলাম। সে এই অপরাধগুলোর সত্যতা একের পর একটা করে স্বীকার করতে বাধ্য হলো। সে আমার শরণাপন্ন হলো। তারপর আমার কাছ থেকে ছুটি পেয়ে তার পরিবারবর্গ এবং মালপত্র নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওনা হলো।

এই সময় দরিয়া খাঁর দল ডাকাতি এবং লুণ্ঠনে দেশটাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বাকি ঐ দিকে আসছে খবর পেয়ে এই দস্যুদল রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। বাকি সদলবলে আসতেই তারা তাকে আর তার সঙ্গী লোকজনকে বন্দী করে। বাকিকে তারা মেরে ফেলে এবং দরিয়া খাঁ তার স্ত্রীকে দখল করে। বাকিকে তারই প্রার্থনামত পদচ্যুত করেছিলাম বটে, কিন্তু তার কোনও ক্ষতি করিনি। কিন্তু সে তার নিজের পাপে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। সেই পাপের ফলে তাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হলো।

'যে তোমার ক্ষতি করে, তাকে
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে যদি দাও,
ভাগ্য তোমার অনুগত হয়ে
প্রতিশোধ নেবে জানিও নিশ্চয়।'

আমার কাবুলে পৌঁছানোর সময় থেকেই তুর্কোমান হাজারাসরা অসংখ্য-

বার অপমানসূচক কাজ ও লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হয়েছে। তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার সঙ্কল্প করি। একদিন প্রভাতে সৈন্য চালনা করে যেখানে হাজারাসরা শীত-কালীন ঘাঁটি করেছে সেই দিকে এগোতে লাগলাম। প্রথম প্রহরের শেষাশেষি সময় আমার অগ্রগামী দলের একজন ফিরে এসে জানালো যে হাজারাসরা একটা ছোট নদী যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায় সেখানে গাছের ডালপালা পুঁতে জায়গাটা সুরক্ষিত করে রেখেছে এবং আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে আমরা চলার গতি বাড়িয়ে দিই। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই যেখানে হাজারাসরা বাধার সৃষ্টি করে তুমুল সজ্ঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে তার কাছা-কাছি পৌঁছে যাই।

সেই শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয়েছিল। এইজন্য চলতি সাধারণ পথ ছাড়া অন্য পথে যাওয়া বিপদজনক হয়ে উঠে ছিল। যেখানে হেঁটে নদী পার হওয়া চলে—তার পাড়দু টোই বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অথচ এই পথ ছাড়া অন্য পথে নদী পার হওয়ার উপায় ছিল না। হাজারা-সরা অপর পারের ঘাটটা গাছের ডাল দিয়ে এমন সুরক্ষিত করে রেখেছিল যাতে ওটা অতিক্রম করা সম্ভব না হয়। তাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা নদীগর্ভে এবং নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা খুব তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়ার জন্য আমাদের অনেকেরই বর্ম্ম পরে আসার সময় হয়ে ওঠেনি। দুই একটা তীর সাঁ সাঁ করে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কিন্তু আমাদের গায়ে লাগেনি।

আমেদ ইউসুফ বেগ খুব ভয় পেয়ে বলে ওঠে—আপনার বর্ম্ম না পরে চলে আসা ঠিক হয়নি, আপনাকে ফিরতে হবে। দুই তিনটা তীর আপনার মাথা ঘেঁষে চলে গেল আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

আমি উত্তর দিলাম—সাহস কর। অনেক সময়েই আমার মাথা ঘেঁষে অজস্র তীর চলে গেছে।

এই সময় আমাদের দক্ষিণ পাশে কাশিম বেগ আর তার দলবল একটা জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছে—যেখানে এই সরু নদীটা পার হওয়া যেতে পারে। সেইখান দিয়েই আমরা নদীর অপর পারে পৌঁছে যাই। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে হাজারাসদের আক্রমণ করতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের দলের যারা ওদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা ওদের পেছনে ধাওয়া করে' তাদের অনেককে ঘোড়া থেকে নামিয়ে কচুকাটা করে।

সুলতান কুলি তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল, কিন্তু বরফে মাটি এমন গভীর ভাবে ঢাকা পড়েছিল যে রাস্তা ছেড়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমিও অনুসরণকারীদের সঙ্গেই এগিয়ে যাই। হাজারাসদের শীতকালের আবাসের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে তাদের ঘোড়া আর ভেড়ার পালের ওপর হানা দিই। আমার নিজের হিস্যায় চার পাঁচশো ভেড়া আর বিশ পঁচিশটা ঘোড়া পেয়ে যাই। সুলতান কুলি এবং আরও দুই তিন জন যারা কাছাকাছি ছিল তারাও লুঠের মালের ভাগ পায়।

আমি লুঠেরার দলের সঙ্গে দুই দুইবার গিয়েছি। এইটে হলো প্রথমবার। আর একবারও যাই এই হাজারাসদের বিরুদ্ধেই যখন খোরাসান থেকে ফিরবার পথে লুঠের মতলবে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ঘোড়া আর ভেড়া লুঠ হয়।

হাজারাসদের স্ত্রী এবং শিশু সন্তানরা বরফে ঢাকা পাহাড়ে পালিয়ে যায় এবং সেখানেই অপেক্ষা করে। তাদের অনুসরণ করা আমাদের সম্ভব হয় না। দিনেরও অনেকটা কেটে গিয়েছে। সুতরাং আমরা হাজারাসদের কুটিরের দিকে যাই এবং সেখানেই বিশ্রাম করি।

বরফ পুরু হয়ে জমেছে। রাস্তা থেকে দূরে এই জায়গায় বরফে ঘোড়ার হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। রাত্রিতে ক্যাম্পের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য যে বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয় তারা এই বরফের দরুণ সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

পরদিন সকালে আবার আমরা চলা সুরু করি এবং রাত্রে হাজারাসদের পরিত্যক্ত কুটীরেই কাটাই। সেখান থেকে আবার এগিয়ে আমরা জেলিংকে গিয়ে থামি। ইয়েক তাথাই এবং আরও কয়েকজন কিছু পেছনে থাকায় তাদের নির্দ্দেশ দিই যে তারা যেন সেই সব হাজারাসদের আক্রমণ করে বন্দী করে—যারা সেখ দরবেশকে তীর বিদ্ধ করেছে। এই দুর্বৃত্তরা রক্তপাতের বিভীষিকায় হতবুদ্ধি হয়ে তখনও একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আমার লোকেরা সেই গুহার কাছে হাজির হয়ে গুহার মুখে আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে। তারপর সত্তর আশি জন হাজারাসকে বন্দী করে তাদের মধ্যে অনেককেই তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে হত্যা করে।

এই সময়, রমজান মাসের তেরো তারিখে আমি এমন কটি-বাতে আক্রান্ত হই যে চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত আমার নড়বার ক্ষমতা ছিল না। এ পাশ ও পাশ করতে হলে কোনও লোকের সাহায্য ছাড়া উপায় ছিল না। বাতের যন্ত্রণায় আমার চলার কোনও উপায় না থাকায় আমার লোক-জনরা বহন করার জন্য একটা ডুলি তৈরী করে বারান নদীর তীর থেকে কাবুল নগরে নিয়ে আসে। এখানে এসে আমি পেস্তান সেরাতে উঠি। শীতকালের অনেকটা সময় আমি এইখানেই বাস করি। আমার অসুখ তখনও চলছে—কিন্তু আর এক উপদ্রব আরম্ভ হলো। আমার ডান গালে ফোড়া হলো। ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করে আবার জোলাপও খেতে হলো।

জাহাঙ্গির মির্জ্জা আমাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এখানে এসে-ছিলেন। ইউসুফ আর বেলোন যেদিন থেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়—সেইদিন থেকেই তাঁকে বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য প্ররো-চনা দেয়। এবার তাঁকে দেখে মনে হলো—তিনি যেন আগের মানুষ নন। কয়েকদিন পরই তিনি বর্ম্ম পরিধান করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর আবাস থেকে তাড়াতাড়ি গজনির দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আল্লা জানেন—আমার কাছ থেকে অথবা আমার পরিজনদের কাছ থেকে কথায় বা কাজে এমন কোনও রকম অসন্তোষজনক ব্যবহার পান নি—যার জন্য তাঁর এই রকম উগ্রপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। অবশেষে আমি

়নেছিলাম কি কারণে তিনি এইরকম অসঙ্গত ব্যবহার করেছিলেন। ারণটা হচ্ছে—যেদিন জাহাঙ্গির মির্জ্জা গজনি থেকে এখানে আসেন সেইদিন কাসেম বেগ ও আরও কয়েকজন বেগ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার ন্য এগিয়ে যায়। সেই সময় মির্জ্জা একটা বটের পাখী ধরবার জন্য ্কটা শিকারি বাজকে তার দিকে ছুঁড়ে দেন। বাজপাখীটা বটেরকে ার থাবার মধ্যে পুরতে যাওয়ার সময় ওটা বাজের থাবা এড়িয়ে সজোরে াটিতে এসে পড়ে। তখন একটা চীৎকার হয়—'বাজ কি ওটাকে রতে পেরেছে?' কাসেম বেগ তখন বলে—'যখন বাজটা শত্রুকে াগালের মধ্যে পেয়ে এই দুরবস্থায় ফেলেছে, তখন কি আর ছেড়ে েবে? কখনই ছাড়বে না।'

এই কথার ভঙ্গি মির্জ্জার মনে খট্‌কা লাগিয়ে দেয় এবং সে তার কদর্থ ়ে। মির্জ্জার পলায়নের এটি একটি কারণ। আরও দুই একটা াপারের কথাও এই পলায়নের হেতু বলে বলা হয়—কিন্তু সেগুলো াোকার ব্যাপারটির চেয়েও বাজে ও অর্থহীন।

এই সময় সুলতান হোসেন মির্জ্জা সেবানি খাঁর অগ্রগতি রোধ করার ন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর সমস্ত পুত্রকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য াদেশ দেন। তিনি সৈয়দ আফজলকে আমার কাছে পাঠান আমাকে ার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার মনে হলো যে খোরাসানে াওয়াই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে নানাকারণে। তার ধ্যে একটা হচ্ছে—একজন পরাক্রমশালী রাজা যিনি তাইমুরের সিংহাসন লঙ্কৃত করেছেন এবং যখন তিনি তাঁর ছেলেদের এবং চারিধারের ামিরদের আহ্বান করে পরাক্রান্ত শত্রু সেবানি খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান ালাতে স্থির সঙ্কল্প করেছেন—তখন অন্যে যদি পায়ে হেঁটে যায় তাহলে ামার উচিত মাথা দিয়ে হেঁটে তাদের সঙ্গে যাওয়া। যদি আর সকলে াঠি হাতে করে যায় তাহলে আমার উচিত হবে পাথর নিয়ে যাওয়া। ার একটা বিবেচনার বিষয় ছিল—জাহাঙ্গির মির্জ্জা যখন শত্রুতার মনো-াব দেখিয়েছেন তখন তাঁর মন থেকে সেভাব দূর করতে হবে, অথবা ার আক্রমণোদ্যোগকে প্রতিহত করতে হবে।

এই বছরের শেষের দিকে যখন সুলতান হোসেন সেবানি খাঁর বিরুদ্ধে দ্ধ করে' তাকে শায়েস্তা করবার জন্য বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন সেই সময়েই আল্লা তাঁকে কাছে টেনে নিলেন।

সুলতান হোসেনের চোখ দুটি পটল-চেরা না হলেও টানাটানা ছিল। ার দেহের গঠন ছিল মজবুত এবং বলিষ্ঠ। তাঁর শরীরের উপরের ংশ অপেক্ষা কোমর থেকে নীচু পর্য্যন্ত অনুপাতে কৃশ ছিল। যদিও ার বয়স অনেক হয়েছিল এবং দাড়িও সব পেকে গিয়েছিল—কিন্তু তাঁর পাষাকে রংএর বাহার ছিল। তিনি লাল ও সবুজ রংএর পশমি পাষাক পরতেন। কখনও সাধারণতঃ তিনি কালো ভেড়ার চামড়ার টুপি ারতেন। কখনও উৎসবের সময় তিন ভাঁজের জমকালো বড় পাগড়ি ারতেন। পাগড়ির ওপরে একটা পাখীর পালক অনবরত নড়তে াকতো। এই ভাবেই তিনি নমাজ পড়তে যেতেন।

তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত, হাসিখুসি মানুষ। তাঁর মেজাজ মাঝে মাঝে রুক্ষ হয়ে উঠতো, আর এই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে বাক্যবাণও ছুটতো। অনেক সময়েই তাঁর ধর্ম্মের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ পেত। তাঁর কোনও এক পুত্র কোনও লোককে হত্যা করলে তিনি এইরূপ আদেশ দেন যে সেই আততায়ী। পুত্রকে রক্তের বদলে রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনি তাঁকে ঘাতকের হাতে সমর্পণ করে বলে দেন যে বিচারাসনের সামনে তাকে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

তিনি তরবারি দিয়ে লড়াই করতে পছন্দ করতেন। তবে মাঝে মাঝে হাতে হাতে লড়াইয়েও তিনি তাঁর শক্তি দেখিয়েছেন। তরবারির ব্যবহার-কৌশল তাইমুর বংশের আর কেউই তাঁর মত দেখাতে পারে নি।

কবিতা লেখার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কবি হিসাবে তাঁর নাম ছিল—হুসেনি। তাঁর অনেক কবিতাকেই মন্দের ভাল বলা চলে। মোটের উপর তাঁর সব কবিতাই একই ধরণের মাঝারি গোছের অর্থাৎ খুব ভালও নয় আবার খারাপও নয়। যদিও তিনি মহিমময় রাজা ছিলেন, বয়সের দিক দিয়েও বটে আবার রাজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়েও বটে—কিন্তু তিনি শিশুর মত লড়াইয়ে-ভেড়া পুষতে ভালবাসতেন। পায়রা ওড়ানো আর মুরগীর লড়াই দেখতেও তাঁর আমোদ ছিল প্রচুর।

তিনি মৃত্যুর সময় চোদ্দটি পুত্র আর এগারোটি কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর পুত্র মহম্মদ হোসেন প্রচলিত ধর্ম্মমত-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নিপুণ তীরন্দাজ ছিলেন। লক্ষ্য তাঁর অভ্রান্ত ছিল। তাঁর দুই জ্যাযুক্ত ধনুকের দুই ধার এক করতে হলে প্রায় সাড়ে তিন মণের ভার চাপাতে হতো। তাঁর প্রথমা স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাজি ছিলেন। তাঁর জালাতনে তিনি অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠতেন। পোষা বাজপাখী তাঁর অত্যন্ত ভালবাসার জিনিষ ছিল। যদি কখনও তিনি শুনতেন যে তাঁর কোনও বাজপাখী মরেছে—কিংবা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তাঁর কোনও পুত্রকে ডেকে এনে বলতেন যে যদি তিনি তার মৃত্যু কিংবা ঘাড় ভাঙ্গার সংবাদ শুনতেন, তা'হলেও তিনি কিছু-মাত্র বিচলিত হতেন না—যেমন হয়েছেন তাঁর বাজ-পাখীর মৃত্যুতে অথবা হারিয়ে যাওয়ায়।

সুলতান হোসেনের আর এক পুত্রের কাব্যিক নাম ছিল 'ক্যানোপাস্'। তিনি এক ধরণের পদ্য লিখতেন—যার কথাগুলো ও ভাবার্থ ভয়ঙ্কর, যেন একটি অন্যের সঙ্গে পাল্লা রেখে চলেছে। তাঁর একটি কবিতা এই রকম—

'রাতের দুঃখের পারাবারে
নিঃশ্বাসের যে ঝড় ওঠে বুক থেকে
তাহার দাপটে সমগ্র আকাশ
স্থান চ্যুত হয়ে, পড়ে খসে।
আমার চোখের জলে
যে ড্রাগন জন্ম নেয়,

পৃথিবীর ভিত্তিমূল,
তারা উপাড়িয়া ফেলে।'

এটা অনেকেই জানেন যে একবার এই কবিতাটি মৌলানা আব্দুলের কাছে আবৃত্তি করলে মোল্লা বলেছিলেন—তুমি কি কবিতা আবৃত্তি করছো—না লোককে ভয় দেখাচ্ছ?

সুলতান হোসেনের যুগটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল। কারণ, এই যুগে বিখ্যাত লোকের অভাব ছিল না। তার মধ্যে একজন ছিলেন মৌলানা আবদুল। তাঁর সুন্দর কবিতাগুলির কথা কে না জানে। মোল্লার গুণাবলী এমনি মহান যে আমার মত লোকের সেগুলির বর্ণনা দেওয়া এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমার এই নগণ্য লেখার মধ্যে তাঁর নামের এবং শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করতে আমি খুবই উৎসুক।

মোল্লা ওসমানও একজন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী। তিনিই একবার বলেছিলেন যে মানুষ যেটা শোনে তা আবার কি করে ভুলে যেতে পারে? তাঁর স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বারংবার উপবাস করায় 'সাধু' আখ্যা পেয়েছিলেন। দাবা খেলা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি দাবা খেলায় এমন উৎসাহী ছিলেন যে যদি দুইজন লোক দাবা খেলা জানে বলে তিনি টের পেতেন, তা'হলে তাদের এক জনের সঙ্গে তিনি তৎক্ষণাৎ খেলতে বসে যেতেন এবং আর একজনের জামার এক ধার হাত দিয়ে ধরে রাখতেন—যাতে সে চলে না যেতে পারে। তিনি পারশি ভাষায় একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন যা খুবই সুন্দর। কিন্তু তাঁর একটা দোষ ছিল যে কোনও দৃষ্টান্ত দিতে গেলে তাঁর নিজের কবিতারই উল্লেখ করে বলেছেন যে এই দৃষ্টান্ত আমার অমুক বইয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।

চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বেজাদ। চিত্রাঙ্কনে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্মশ্রুহীন কচিমুখ ভাল আঁকতে পারতেন না, গলাটা অত্যন্ত লম্বা করে ফেলতেন। দাড়িওয়ালা মুখ আঁকতে কিন্তু তিনি ওস্তাদ ছিলেন।

গীতবাদ্যকারদের মধ্যে সুসেন উদি খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। তিনি এক একবার এক একটি তারের ওপর সুরের ঝঙ্কার তুলতেন। যখন তিনি বাজাতে আরম্ভ করতেন তখন নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী দেখানো তাঁর একটা বিশেষ দোষ ছিল। একবার সেবানি খাঁ তাঁর বাজনা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। নানা রকমের ভঙ্গী করে কিন্তু তিনি খুবই খারাপ বাজনা বাজালেন, কারণ তাঁর নিজের যন্ত্রটি তিনি সঙ্গে আনেন নি। যেটা বাজালেন সেটা অত্যন্ত বাজে ছিল। সেবানি খাঁ বিরক্ত হয়ে হুকুম দেয় যে তাঁর ঘাড়ে গোটা কয়েক ঘুঁসি মেরে বিদায় করা হোক। সেবানি খাঁ বোধ হয় তার জীবনে এই একটি সৎকাজই করেছিল।

আর একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন—'হেরি'র অধিবাসী বিনাই। প্রথম দিকে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনও জ্ঞান ছিল না। আলি-সের-বেগ প্রায়ই তাঁর অজ্ঞতার জন্য টিটকারি দিতেন। কিন্তু এক বছর শীত কালটা 'মাভে'তে কাটিয়ে এবং সঙ্গীত চর্চ্চা করে তিনি এমন উন্নতি করলেন যে গরম কালের আগেই তিনি কয়েকটা সঙ্গীত রচনা করে ফেলেন। আলি সের-বেগের তিনি সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর রসিকতা এবং মুখের ওপর যথোচিত জবাব দেওয়া সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। তার মধ্যে একটার কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে। একদিন দাবা খেলার সময় আলি-সের-বেগ তাঁর পা ছড়িয়ে দেওয়ার সময় বিনাইয়ের পেছন দিকে তাঁর পা লেগে যায়। অমনি তিনি ঠাট্টার সুরে বলে ওঠেন—পা ছড়াতে গেলেই কবির পেছনে লেগে যায়, 'হেরি'তে দেখছি এটা একটা ভারি নোংরা ব্যাপার।

বিনাই তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—পাটা কবির পিঠেই লেগে থাক, ওটাকে আর কবির পেছনের ছোঁয়াচ থেকে সরিয়ে নিও না যেন।

যাই হোক, নানা বিদ্রূপে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে বিনাই 'হেরি' ছেড়ে সমরকন্দে চলে আসেন।

আলি সের-বেগ অনেক প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের উৎসাহদাতা ছিলেন। যে কেউ কোনও নতুন শিল্পকলা বা নতুন কোনও জিনিষ আবিষ্কার করতো সে সেগুলির মূল্য বাড়ানোর জন্য কিংবা প্রচারের সুবিধার জন্য তার নাম দিতো—'আলি সেরি।' আলি সেরকে নকল করার ঝোঁক তখন এমন প্রবল হয়েছিল যে একবার তাঁর কানে ব্যথার জন্য একটা রুমালে মাথা ও কান বেঁধে রাখায়—সেই ভাবের রুমাল বাঁধার চলন হয়ে গেল—যাকে বলা হতো—আলি সেরি ফ্যাশান। বিনাই 'হেরি' ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় তাঁর ঘোড়ার পিঠে বসবার জন্য একরকম নতুন ধরণের গদি তৈরী করান—আর ঠাট্টা করে সেই গদীর নাম রাখলেন—আলি সেরি।

১৫০৬ সালের ঘটনাবলী

মহরম মাসে উজবেগদের আক্রমণ প্রতিহত করতে খোরাসানের দিকে রওনা হই। জাহাঙ্গির মির্জ্জা গজনি থেকে পালাবার পর আমি বিবেচনা করে ঠিক করি যে আমার পক্ষে আইমাকদের বিদ্রোহ দমন এবং যারা মনে অসন্তোষ পুষে রেখেছে তাদেরও শান্ত করা দরকার—যাতে তারাও বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে। তাছাড়া, আমার দলের লোকদেরও যাতে অসন্তোষের ছোঁয়াচ না লাগে সেজন্য তাদের পৃথক করে কাজে লাগানো উচিত। এইজন্য বিপুল সেনা আর হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে মনে করলাম।

এই সময় দূতরাও আমাকে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে এলো। কিছু পরেই বেরেন্দাক বিরলাসও এসে পড়লো। মির্জ্জাদের সঙ্গে দেখা করতে আর আমার বাধা কোথায়। আমি সেই উদ্দেশ্যে দুইশ মাইল অতিক্রম করে এলাম। মহম্মদ বেগের সঙ্গে আমি এগোতে লাগলাম। এই সময় মির্জ্জারাও মুর্খাব পর্য্যন্ত এগিয়ে শিবির স্থাপন করেছে। জেমিদা-উল-আখির মাসের আট তারিখ সোমবার মির্জ্জাদের সঙ্গে আমার দেখা হলো। আবুল মহসিন মির্জ্জা আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক মাইল এগিয়ে এলেন। যখন আমরা পরস্পর মুখোমুখি হলাম তখন আমি ঘোড়া থেকে নামলাম এক পাশ দিয়ে—আর তিনিও

...মলেন অন্য পাশ দিয়ে। আমরা পরস্পর এগিয়ে এসে আলিঙ্গনাবদ্ধ ...লাম। তারপর আবার আমরা ঘোড়ায় চড়লাম।

কিছুদূর যেতেই প্রায় শিবিরের কাছাকাছি মুজাফফর মির্জ্জা ও ইবন ...হোসেন মির্জ্জার সঙ্গে দেখা হলো। আবুল মহসিন্ মির্জ্জার চেয়ে তাঁরা ...সে ছোট। সুতরাং আমাকে অভ্যর্থনা করতে তিনি যতটা এগিয়ে ...য়েছিলেন তার চেয়েও আগে গিয়ে এদের আমাকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাদের এই বিলম্বের কারণ হচ্ছে গতরাত্রে অতিরিক্ত সুরাপান—ঠিক অহঙ্কারের জন্য নয়। গতরাত্রে আমোদ-প্রমোদজনিত অবসাদ দূর না হওয়ার জন্যই এ বিলম্ব—আমাকে ইচ্ছাকৃত অপমান করার জন্য নয়। মুজাফফর মির্জ্জা আমাকে অভ্যর্থনা জানালে আমরা ঘোড়ার পিঠে বসেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। তারপর একই ভাবে ইবন হোসেন মির্জ্জাকে আলিঙ্গন করে আমরা দরবার তাঁবুর কাছে পৌঁছিয়ে ঘোড়া থেকে নামলাম। স্থির হলো যে আমি দরবার কক্ষে পৌঁছিয়েই মাথা নুইয়ে সেলাম জানাব এবং সঙ্গে সঙ্গে বদিয়া-এজ-জমান উঁচু প্ল্যাটফরমের উপর আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার কিনারে এসে দাঁড়াবেন এবং সেখানে আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হব।

দরবার কক্ষে প্রবেশ করেই কুর্ণিশ করে বদিয়া এজ-জমানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। তিনিও দাঁড়িয়ে উঠে ধীরে ধীরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসতে থাকেন। কাশিম বেগের আমার সম্মানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমার ব্যাপারটা সে সর্ব্বদাই নিজের ব্যাপার বলেই মনে করতো।—সে আমাকে তাড়াতাড়ি এগুতে দেখে আমার কটিবন্ধ ধরে টান দেয়। আমি তৎক্ষণাৎ তার মনের ভাষা বুঝে ফেলি। তখন ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে বদিয়া-এজ-জেমানের সাথে ঠিক নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হয়ে আলিঙ্গন করলাম।

এই বড় দরবারি তাঁবুতে চার জায়গায় গালিচা বিছানো ছিল। এটা সুরাপান উৎসব ছিল না বটে, তবুও মাংসের সঙ্গে মদও দেওয়া হয়। খাদ্যের পাশেই সোনা ও রূপার পাত্রে পানীয় সুরা রাখা হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষরা এবং পরিবারের লোকজন নিষ্ঠার সঙ্গে চেনগিজ খাঁয়ের নিয়ম কানুন মেনে আসছে। তাঁদের সভা সমিতিতে, বিচারালয়ে, তাঁদের উৎসব এবং অভ্যর্থনাদির ব্যাপারে, তাঁদের বসা বা উঠে দাঁড়ানোর আদব কায়দায় কোনও দিন চেনগিজ প্রবর্তিত নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি। চেনগিজখাঁর রীতি নীতি অবশ্য এমন কোনও দৈবনির্দ্দেশের মত ছিল না যে সেগুলো না মানলে অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবুও প্রত্যেক মানুষ যারা সৎ আচরণ বিধিতে আস্থাবান, তিনি তাঁর প্রবর্ত্তিত আচার আচরণ বিধিগুলি মেনে আসছেন—যদিও বাপ কোনও খারাপ কাজ করে থাকলে ছেলের সেটা নিশ্চয়ই সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

আহারের পর আমরা ঘোড়ায় চড়ে শিবিরে ফিরে আসি। আমার সৈন্যদের শিবির থেকে মির্জ্জাদের সৈন্য শিবিরের দূরত্ব ছিল দুই মাইল।

দ্বিতীয়বার যখন আমি বদিয়া-এজ-জেমানের কাছে আসি তখন আর তিনি আমাকে প্রথম বারের মত সম্মান দেখালেন না। আমি তখন জুলনুন্ বেগকে ডেকে এনে বলে দিলাম যে, সে মির্জ্জাকে যেন এই কথা জানিয়ে দেয় যে আমি বয়সে ছোট হলেও আমার জন্ম উচ্চবংশে। আমি দুই দুইবার আমার পৈত্রিক রাজ্য সমরকন্দ জয় করেছিলাম। যখন আমি এই মহান বংশের সন্তান হয়ে বংশের গৌরব রক্ষার জন্য বিদেশী শত্রুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তির মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি, তখন আমাকে যথাযোগ্য সম্মান না দেখানো কি উচিত হচ্ছে? আমার এই কথাগুলো তাঁকে জানালে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর আচরণ পরিবর্ত্তন করে আমার প্রতি যথোচিত সম্মান, সম্ভ্রম ও সদিচ্ছার ভাব দেখাতে লাগলেন।

আর একবার যখন আমি বদিয়া-এজ-জেমানের সঙ্গে দুপুরের নামাজের সময় দেখা করতে যাই, তখন সেখানে সুরাপান চলছিল। আমি তখন মদ স্পর্শ করতাম না। আপ্যায়নটা খুব সুন্দর হয়েছিল। ট্রের ওপর নানারকমের ভাল ভাল খাদ্য সাজানো ছিল। মুরগী ও হাঁসের মাংসের কাবাব—সঙ্গে আরও সুখাদ্য জিনিষ। বদিয়া-এজ-জেমানের দেওয়া এই ভোজ-উৎসব খুব জাঁকালো রকমের হয়েছিল। সকলেই স্বাধীন, সহজ ও দ্বিধাহীন ভাবে এই উৎসবে মেতে উঠেছিল। যখন আমি মুরখাবের নদী তীরে ছিলাম—তখনও দুই তিনবার পানোৎসবে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ওরা যখন জানলে যে আমি মদ খাই না—তখন আর ওরা আমাকে মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। আমি একবার মুজাফ্ফর মির্জ্জার পার্টিতেও উপস্থিত ছিলাম। মদের নেশা যেই ধরেছে, মির বেদর অমনি নাচতে সুরু করে দিল। তবে সে নাচলো খুব ভাল। নাচের পদ্ধতিটাও তারই আবিষ্কার।

মির্জ্জারা সামাজিক ব্যাপারে সংস্কৃতিবান, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাতেও তারা নিপুণ। তাঁদের কথাবার্ত্তা, আলাপ আপ্যায়নেও মাধুর্য্য ও প্রতিভা প্রকাশ পায়। কিন্তু যুদ্ধোদ্যমে কিংবা যুদ্ধ অভিযানে তাঁদের কোনও জ্ঞান নাই। যুদ্ধ চালাতে হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তার কোনও অভিজ্ঞতা তাঁদের দেখা যায় না। সৈনিক জীবন যাপনে যে সাহসিকতার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা তাঁদের নেই।

যখন আমরা মারখাবে—সংবাদ এলো যে হক্ নজর তার শ'চার-পাঁচ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে এবং চিচিক্টু প্রদেশে লুণ্ঠন সুরু করেছে। কয়েকজন মির্জ্জা মিলিত হয়ে শলা পরামর্শ করলেন বটে, কিন্তু এই লুণ্ঠনকারীদের বাধা দিতে একটা ছোট দলও খাড়া করতে পারলেন না। মারখাব থেকে চিচিক্টুর দূরত্ব চল্লিশ মাইল। আমি অনুমতি চাইলাম যাতে আমি এই অভিযানটা চালাতে পারি। কিন্তু তাঁদের মর্য্যাদায় আঘাত লাগতে পারে ভেবে তাঁরা আমাকে নড়বার অনুমতি দিলেন না।

কয়েকদিন পর মুজাফ্ফর মির্জ্জার নিমন্ত্রণ পেলাম—তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য। তিনি খেত উদ্যানে ছিলেন। প্রাসাদটি এই বাগানের মাঝখানে। বাড়ীটি ছোট দোতালা—কিন্তু খুব সুন্দর। ওপর তলাটা খুব নিপুণতার সঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। চার কোণায় চারটি কক্ষ এবং মাঝখানে প্রশস্ত হলঘর। চার কক্ষের সংলগ্ন বড় বারান্দা। হলের

প্রত্যেকটি অংশে নানা চিত্র আঁকা আছে। এই প্রাসাদ অবশ্য বাবের মির্জ্জা তৈরী করেছিলেন, কিন্তু চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল সুলতান আবু সৈয়দ মির্জ্জার নির্দ্দেশ মত। এগুলি তাঁরই যুদ্ধ-সম্পর্কিত চিত্র।

উত্তর দিকের বারান্দায় দুইটি গালিচা মুখোমুখি পাতা। একটায় মুজাফ্‌ফর মির্জ্জা আর আমি বসলাম, আর একটিতে সুলতান মামুদ মির্জ্জা আর জাহাঙ্গির মির্জ্জা। মুজাফ্‌ফর মির্জ্জার বাড়ীতে আমি অতিথি, সুতরাং তিনি আমাকে খুব সম্মান দেখালেন। আমার স্বাস্থ্যপানের উদ্দেশ্যে একটি পাত্র পূর্ণ করে সুরা পান করলেন। পরিবেশকরা অপেক্ষা করছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে এক এক পাত্র খাঁটি সুরা প্রত্যেককে পরিবেশন করতে লাগলো। তাঁরাও ঢক ঢক করে পান করতে লাগলেন। দেখে মনে হচ্ছিল—যেন প্রাণদায়িনী শীতল জল পান করছেন—উগ্র মদিরা নয়। দলটি ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠলো। মদ তাদের মাথায় চড়ে বসলো। আমাকেও সুরা পানে প্রবৃত্ত করার চিন্তাটাও তাদের মাথায় খেলতে লাগলো—যাতে আমি তাদের দলে ভিড়তে পারি।

আমি এতদিন পর্য্যন্ত সুরা পান দোষে দোষী নই। পান দোষ না থাকায় মদে কি রকম অনুভূতি হয় তারও কোনও ধারণা আমার ছিল না। এখন আমার মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হলো যে একবার পান করে মজাটা কি হয় দেখাই যাক না। গলা দিয়ে সুরাটা নামতে থাকলে কি রকম ব্যাপারটা হয় দেখবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হলো।

বাল্যকালে সুরার কথা মনেই হতো না। এর আনন্দই বা কি—আর বেদনাটাই বা কতটা—কিছুই জানতাম না। আমার বাবা অনেক সময় সুরা পান করতে বলতেন। আমি অক্ষমতা জানিয়ে চলে আসতাম। বাবার মৃত্যুর পর খাজা কাজির উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে থাকার জন্য আমি সৎ এবং নির্ম্মল চরিত্র ছিলাম। আমি কোনও নিষিদ্ধ খাদ্য খাইনি। তাই কি করে আমি মদ খেতে পারি? পরে যখন যুবজনোচিত কল্পনায় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার সুরা পানের ইচ্ছা হতো—তখন আমার কাছে এমন কেউই থাকতো না—যাকে আমার ইচ্ছা পূরণ করানোর কথা বলতে পারি। এমন কোনও লোকও ছিল না যার মনে এমন কোনও সন্দেহ উঠতে পারে যে আমি সুরাপানের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করছি। সুতরাং ইচ্ছা হলেও তা মুখ ফুটে বলার ক্ষমতা না থাকায় কেউ সন্দেহ করতে পারতো না যে—আমার মনে সুরাপানের অসংযত ইচ্ছাটা গুপ্ত হয়ে আছে।

এখন আমার মাথায় এলো—এঁরা যখন এত করে অনুরোধ করছেন, আর তাছাড়া 'হেরি'র মত সুসভ্য নগরে যখন আমি এসেছি যেখানে আনন্দ উপভোগ করার কোনও উপাদানেরই অভাব নাই, সব রকমের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাই যেখানে মজুদ, আর এই সব ভোগ বিলাসের আহ্বান যখন স্বতঃই এসে পড়েছে—তখন এ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে? যদি এখন আমি এঁদের অনুরোধ রক্ষা না করি তাহলে এমন মুহূর্ত্ত আর কখনই আসবে না। এই সব চিন্তা করে আমি সুরাপান করাই মনস্থ করলাম। কিন্তু তখন আমার এই কথাটা মনে হলো যে বড় ভাই বদিয়া-এজ-জমান মির্জ্জার হাত থেকে যখন সুরা গ্রহণ করতে প্রথমে অসম্মত হয়েছি—তখন ছোট ভাইদের হাত থেকে সেটা নিলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমার এই দ্বিধা ও অসুবিধার কথা জানালাম। আমার যুক্তি এঁরা মেনে নিলেন। এর পর সুরাপানের জন্য এই অনুষ্ঠানে আর কেউ পীড়াপীড়ি করলেন না। স্থির হলো যে যখন আবার বদিয়া-এজ-জমান মির্জ্জার বাড়ীতে দেখা হবে তখন মির্জ্জাদের অনুরোধে আমি সুরা পান করবো।

এই অনুষ্ঠানে গায়কদের মধ্যে হাফেজ হাজি ছিলেন। তিনি খুব ভাল গান করলেন। 'হেরি'র গায়করা মৃদু, নরম সুরে এবং স্থির প্রশান্ত ভাবে গান করে থাকেন। জাহাঙ্গির মির্জ্জার সঙ্গে মিরজান নামে একজন গায়ক ছিল। সে উচ্চগ্রামে কর্কশ বেসুরো সুরে গান করতো। জাহাঙ্গির মির্জ্জা মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেছিলেন এজন্য প্রস্তাব করলেন যে মিরজানের গান হোক। সে গান আরম্ভ করলো তার অভ্যাসমত মারাত্মক উঁচু গলায় কর্কশ বেসুরো সুরে। খোরাসানের বাসিন্দারা তাদের শিষ্টাচারের নীতিকে অত্যন্ত মূল্য দেয়। অনেকে অবশ্য মুখ ঘুরিয়ে নিল, কেউ বা ভ্রূ কোঁচকালো, কিন্তু মির্জ্জার খাতিরে কেউ তাকে গান থামাতে বল্‌লো না।

সন্ধ্যার নমাজের পর আমরা মুজাফ্‌ফর মির্জ্জার তৈরী তাঁর নতুন শীতকালীন প্রাসাদে এলাম। আমরা সেখানে এলে ইউসুফ আলি গোকুলতাস অতিরিক্ত সুরাপানে মত্ত হয়ে নাচ সুরু করে দিল। সে সঙ্গীতজ্ঞ, তাল মান জানা লোক। সুতরাং সে নাচলো ভালই। এই প্রাসাদে এসে দলটি খুবই স্ফূর্ত্তিবাজ ও অমায়িক হয়ে উঠলো। মুজাফ্‌ফর মির্জ্জা আমাকে একটি তরবারি, কোমরবন্ধ, বর্ম্ম এবং একটি সাদা ঘোড়া উপহার দিলেন।

জানিক একটি তুর্কি সঙ্গীত গাইলো। উৎসবে যখন সবাই সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন তাদের কতকগুলো হীন কুশ্রী তামাসা করতে দেখা গেল। উৎসব অনেক রাত পর্য্যন্ত গড়িয়ে চল্‌লো। যখন শেষ হলো—তখন রাত্রি শেষের আর বেশী বাকি নাই। আমি সে রাত্রিটা এই প্রাসাদেই কাটাই।

কাশিম বেগ যখন শুনলো যে আমাকে মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়েছে তখন তারা মির্জ্জাদের ওপর দোষারোপ করে খুব ভর্ৎসনা করলো। ব্যাপার দেখে তাঁরা আর আমাকে মদ খাওয়া সম্বন্ধে অনুরোধ করবেন না স্থির করলেন।

বদিয়া-এজ-জেমান মির্জ্জা, মুজাফ্‌ফর মির্জ্জার উৎসবের কথা শোনার পর আবার একটা ভোজের ব্যবস্থা করে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমার অনেক তরুণ আমির ও সেনাধ্যক্ষও বাদ গেল না। আমার সভাসদরা আমার সম্মানের জন্য সুরাপান করতো না। যদি বা কখনও মাসে কিংবা চল্লিশ দিনে একএকবার তাদের ইচ্ছা হতো, তখন তারা কোনও ঘরের দরজা বন্ধ করে—পাছে আমি টের পাই সেইজন্য—ভয়ে ভয়ে মদ্যপান করতো। এমনই ধরণের লোকদেরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল এই আসরে, যখনই তারা মনে করছিল যে আমার দৃষ্টি অন্যদিকে তখনই তাদের সুরাপাত্র হাত দিয়ে আড়াল করে এক এক চুমুক

...ছিল অত্যন্ত সচকিত ভাবে। সত্যি, এরকম সাবধানতায় কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, কোনও উৎসবে সাধারণ চল্‌তি নীতি অনুসরণ করতে, আমি তাদের অনুমতি দিয়েই রেখেছি। তাছাড়া, ...নান উৎসবটা তো আমার বাবা কিংবা দাদা দিচ্ছেন এই রকমই ...মি মনে করেছি।

ওরা উৎসব স্থানে কচি শাখাযুক্ত উইলো গাছ নিয়ে এল। জানি না ...ভাবিক ভাবে এ গাছগুলো ঐ রকম ধরণের, না কৃত্রিম শাখা তৈরী ...রে গাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গাছের ছোট ছোট শাখা ...কের জ্যার মত মনে হচ্ছিল। গাছগুলো কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ভোজ চলার সময় একটা আস্ত হাঁসের রোষ্ট আমার সামনে রাখা হয়। কিন্তু কিভাবে ওটা কাটতে এবং টুকরো করতে হয় জানা না থাকায় ওটা সামনেই পড়ে রইলো। বদিয়-এজ-জেমান বল্লেন যে আমি হাঁসের রোষ্ট পছন্দ করি কিনা। তাঁকে খোলাখুলিই বল্লাম—ওটা কিভাবে কাটতে হয় আমি জানি না। মির্জ্জা তৎক্ষণাৎ ভাজা মাংসটা কেটে টুকরো টুকরো করে আমার সামনে রাখলেন। এই রকম ভদ্রতায় বদিয়-এজ-জেমান অতুলনীয় ছিলেন। উৎসব শেষে তিনি আমাকে রত্নখচিত ছোরা, স্বর্ণখচিত রুমাল এবং একটি ঘোড়া উপহার দেন।

ক্রমশঃ

সুরেন্দ্রনাথের নবজীবনের সূচনা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম, এ

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচ্যুতিতে জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীই খুব বিক্ষুব্ধ হল। এতকালের শ্বেতাঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত সিভিলিয়ানী চাকুরীতে একজন কৃষ্ণকায় ভারতবাসী কর্ত্তৃক অংশগ্রহণ সুরেন্দ্রনাথের প্রধান অপরাধ এবং তাঁর লাঞ্ছনার কারণ বলেই দেশবাসীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। দেশবাসীর এই বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না তারও সত্যতা পরে জানা গিয়েছিল। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এড্‌ওয়ার্ড বেকার একদা মহামতি গোখ্‌লের সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খুব দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তারা খুবই অবিচার করেছে, কিন্তু মহানুভব সুরেন্দ্রনাথ তৎসত্ত্বেও তাদের প্রতি কখনও কোন বিদ্বেষ প্রসূত মনোভাব পোষণ করেননি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক মিঃ হিউমের ১৮৯৩ সালে "ইণ্ডিয়ায়" লিখিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। তিনি সেই প্রবন্ধের অংশবিশেষে বলেছেন,"......কমিশনের মতে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে তখনই চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।......যদি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেও নেওয়া যায়, তাহলেও এক বছরের জন্য তাঁর পদোন্নতি বন্ধ করে দিলেই তাঁকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হত। এমন কি কমিশনের বিচারকদের ভিতরেও একজন অকপটে একথা স্বীকার করে গেছেন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম্মচ্যুতিতে—লঘুপাপে তাঁর প্রতি এই গুরুদণ্ডে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে কমিশনের বিচারকমণ্ডলীও কম আশ্চর্য্যান্বিত হন নি। এই অপরাধে কাহারও কর্ম্মচ্যুতির কথা তাঁরা ধারণাই করতে পারেন নি।.........বৃটিশ আমলাতন্ত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত সিভিলিয়ানী চাকুরীতে কোন কৃষ্ণকায় ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ যে আদৌ পছন্দ করত না, সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম্মচ্যুতি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। হাজার হাজার দেশবাসীর মত তিনিও (সুরেন্দ্রনাথ) আবেদন করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন শাসক শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের জন্য, কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল।" মিঃ হিউম ঐ প্রবন্ধে তুলনামূলক ভাবে আরও দেখিয়েছেন যে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে বহুগুণ দোষে দোষী একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান, যার বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, বিচারের সময় শুধু সাময়িক কর্ম্মচ্যুতি ব্যতীত কোন শাস্তিই ভোগ করেনি। তছরুপের টাকা ফেরৎ দেবার পর তাকে অধিকতর দায়িত্বশীল উন্নততর পদে নিয়োজিত

করা হয়েছিল। এই বিচার প্রহসন প্রসঙ্গে তিনি ঐ প্রবন্ধের একাংশে দ্বিধাহীন ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন,—"ইহাতেই প্রকাশ পায় যে বৃটিশ আমলাতন্ত্র কি ভাবে গত পঁচিশ বছর ধরে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এক বিভেদ মূলক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে আসছে।"

প্রসঙ্গত: বৃটিশ শাসকবর্গ যদি সুরেন্দ্রনাথকে সত্যিকারের দোষী বলেই জানত, তাহলে শাস্তির আট বছর পরে আবার তাঁকে কলকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা "জাষ্টিস্ অফ দি পীস্" নিযুক্ত করে তাঁর উপর দুবছর কারাদণ্ড বিধানের এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের ক্ষমতা অর্পণ করা হত না। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখযোগ্য যে ১৯১১ সালে বিলাতে পার্লামেন্টের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ নির্ব্বাচনের প্রবর্ত্তিত নিয়ম ও নির্দ্দেশানুসারে সুরেন্দ্রনাথ কর্মচ্যুত সিভিলিয়ান হওয়ার দরুণ নির্ব্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাংলা সরকার এবং পরে ভারত সরকারও সুরেন্দ্রনাথের উপর হ'তে সেই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার বাধানিষেধ সমূহ অপসারণ করে। এই ঘটনা উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা এই কারণে যে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সত্যিকারের কোন গুরুতর দোষ প্রমাণিত হওয়ার দরুণই যে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয় নাই—তাঁর চাকুরী হারাবার অন্যতম কারণ সাম্রাজ্যবাদীর বর্ণবৈষম্যনীতি, ভারতবাসীর এই আশঙ্কার সত্যতাই উক্ত ঘটনা প্রমাণ করে।

ভারতবাসীর পক্ষে সেই সময়ে সিভিলিয়ানী চাকুরী খুবই লোভনীয় ও আকর্ষণীয় ছিল। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সেই লোভনীয় চাকুরীর যোগ্যতা অর্জ্জন করা সত্বেও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ যখন লঘুপাপে গুরুদণ্ডের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে সেই চাকুরী হারাতে হল, তিনি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ধীরচিত্তে মেনে নিলেন এই বিধানকে বিধাতার অভিপ্রেত বলে। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মত নৈরাশ্যে ভেঙ্গে না পড়ে তিনি স্বাধীন আইন-ব্যবসা গ্রহণ করবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন এবং তদনুসারে "মিডল্ টেম্পল"-এ যোগদান করেন। অবশ্য তিনি পূর্ব্ব হতেই মিড্ল টেম্পলে ব্যারিষ্টারী পড়ছিলেন এবং তাঁর আটটি term ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র চারটি term শেষ করতে পারলেই তিনি পুরাদস্তুর ব্যারিষ্টার হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। তখন ১৮৭৫ সালের এপ্রিল কি মে মাস। সুরেন্দ্রনাথের ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন কাল সম্পূর্ণপ্রায়। শেষ termও নিঃশেষিত প্রায়। এমন সময় কোন এক বিশেষ মহল হ'তে সুরেন্দ্রনাথের ব্যারিষ্টার হওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হল। সিভিলিয়ানী চাকুরী হতে বরখাস্তের জের এখানেও তাঁকে টানতে হল। কর্ম্মচ্যুত সিভিলিয়ানের পক্ষে ব্যারিষ্টার হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা আছে এই আপত্তি তোলা হল। "মিড্ল্ টেম্পল"-এর বেঞ্চারগণও এই আপত্তি গ্রাহ্য করলেন। সুরেন্দ্রনাথের আশাদীপ্ত জীবনের এক অধ্যায়ের উপর এমনি করে ব্যর্থতার কাল যবনিকা নেমে এল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ কক্রেন্ (Mr Cochrane) বয়সে বৃদ্ধ হলেও তরুণের উৎসাহ ও তেজ নিয়ে যথাসাধ্য সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবনের এই অধ্যায়ের উপরে যবনিকাপাত সূচিত করেছিল দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী সুরেন্দ্রনাথের এক অনাগত বৃহত্তর জীবন। সেই জীবনের কথাই এবার বলবার চেষ্টা করব।

বিলাত গমন এবং তথায় অধ্যয়নের বাবদ যখন সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কপর্দ্দক নিঃশেষিত প্রায়, সেই সময় এই প্রকার বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অভাবিত আশাভঙ্গের মনস্তাপে যখন হতাশায় ভেঙে পড়াই ছিল খুব স্বাভাবিক, দৃঢ়মনা সুরেন্দ্রনাথ তখন ভগ্নোৎসাহ হওয়া ত দূরের কথা—ধীর চিত্তে স্থির করে ফেললেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। তিনি শুনতে পেলেন সমগ্র জাতির প্রতি বিদেশী শাসকশ্রেণীর অবিচারের বিরুদ্ধে দেশমাতৃকার সংগ্রামের আহ্বান। সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধব যখন প্রত্যেকেই সুরেন্দ্রনাথের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতপ্রায়, এমন কি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের মত লোকও যখন অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং তখন তাঁর কোন বিশিষ্ট বন্ধু হাইকোর্টের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার তাঁকে

ষ্ট্রেলিয়া গিয়ে নাম পরিবর্ত্তন করে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোনও ব্যবস্থা করে নেবার জন্য পরামর্শ দিচ্ছিলেন, সেই নৈরাশ্যজনক পরিবেশে সুরেন্দ্রনাথ মুষড়ে না পড়ে দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেছে নিলেন নিজ পথ। তিনি নিজের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বা লাঞ্ছনা বলে মেনে নিলেন না। তীব্রভাবে তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর এই দুর্গতির, এই লাঞ্ছনার কারণ আর কিছুই নয়—কারণ তিনি একজন কৃষ্ণকায় ভারতীয়—যে ভারতীয়ের মধ্যে গড়ে ওঠেনি কোনও সুস্থ ও সবল জনমত, সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি কোন জাতীয়তাবোধ এবং দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনায় তখনও তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি কোন অধিকার। সমস্ত জাতির এই অসহায় দুর্ব্বল অবস্থার কথা উপলব্ধি করেই তিনি এর প্রতিবিধানের জন্য আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ় হলেন। এক নতুন আশার আলো দেখতে পেলেন তিনি, তার দৃপ্ত আভায় তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হল এক বিদ্যুৎ প্রবাহ। দেশবাসীর অন্তরেও সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করবার জন্য, মৃতকল্প দুর্ব্বল অসহায় দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করবার প্রতিশ্রুতি নিলেন তিনি। ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৭৫ সালের মে মাস অবধি অর্থাৎ এই তেরমাস বিলাত অবস্থান কালে তিনি দেশজননীর ডাকে সাড়া দিয়ে যে মহৎ ব্রতে ব্রতী হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের সহায়ক উপযোগী গ্রন্থাদি পাঠে আত্মনিয়োগ করলেন। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেই সকল গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতেন—যে সমস্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে অভীপ্সিত দেশসেবার মনোভাব গঠনের সহায়ক হয়—অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা আসে। সাময়িক অবসাদের অবসান করে দিয়ে তাঁর এই পাঠ ও প্রস্তুতি তাঁর মধ্যে এনে দিল এক নতুন জীবন এবং ইহাই তাঁহার জীবনে এনে দিল এক বেগবান গতিপথ যার স্রোতস্বিনী ধারায় জাতির জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল এক নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ, দেশ শাসনে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করবার এক নতুন চেতনা। সুরেন্দ্রনাথের এই নবজীবনের আলোচনা জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের আলোচনারই সমতুল্য। সুরেন্দ্রনাথের এই নবজীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁর সহধর্ম্মিণীর কথা এসে পড়ে, যিনি তাঁর স্বামীকে শত দুঃখকষ্টের ভিতরেও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন ১৮৭৫ সালের জুন মাসে বিলাত থেকে দেশে ফিরে এলেন দেশসেবার নতুন ব্রত গ্রহণ করে, জীবিকা অর্জ্জনের কোন সংস্থানই না করে, সেদিন কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণী সর্ব্বদা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে হাসিমুখে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে। তাঁর সমগোত্রীয় ও সমপর্য্যায়ের মেয়েদের আজকাল যেরকম লেখাপড়া শেখার সুযোগ ও সুবিধা আছে, তিনি সেইপ্রকার কোন সুযোগ ও সুবিধা পাননি। কিন্তু তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার। তার সঙ্গে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল সাহস ও ভারতীয় ললনার স্বাভাবিক স্নেহ ও মমতার। স্বামীর দুর্দ্দিনে তিনি কোনদিন তাঁকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করে উৎসাহিত করা থেকে বিরত থাকেননি। একদিনের তরেও সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সহধর্ম্মিণীর চোখে অতীতের প্রতি দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিপাত করতে দেখেননি। সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই যখন সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, সকলেই যখন সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পোষণ করতেন হতাশাব্যঞ্জক একটা মনোভাব. তখন ঐ মহীয়সী রমণী সর্ব্বদা স্বামীর পাশে দণ্ডায়মান থেকে তাঁকে সাহস ও উৎসাহ দিতেন, সম্মুখে তুলে ধরতেন ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল দৃশ্যপট। দুর্দ্দিনে সহধর্ম্মিণীর সেই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সুরেন্দ্রনাথের নতুন জীবন গঠনের পথে সুরেন্দ্রনাথের নিজের তথা সমগ্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল একথা অনস্বীকার্য্য।

১৮৭৫ সালের জুন মাসে সুরেন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর কাছে জীবিকার্জ্জনের প্রায় সমস্ত দরজাই রুদ্ধ ছিল। তাতে তিনি বিন্দুমাত্রও নিরাশ হন নাই। তিনি জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প নিয়ে কর্ম্মজীবন সুরু করলেন। যোগাযোগও ঘটে গেল অপূর্ব্ব। এ যেন বিধাতার নির্দ্দেশেই ঘটল। মাদকতা নিবারণ আন্দোলন তখন খুব জোর চলছিল। আন্দোলনের ভিতর

ছিল একটা গতি ও উচ্ছল জীবনবেগ—যার জন্য জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করবার জন্য সাধারণ মানুষ সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এল। পুণ্যাত্মা প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন তখন জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তাদের মনে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। কারণ তারা প্রত্যক্ষ করেছিল দেশের অনেক কৃতী সন্তানকে মদ্যপানের নেশায় নিজেদের জীবন এবং ভবিষ্যৎকে বলি দিতে। এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই উদ্যোক্তাগণ এই আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে তুলবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজ-এর বক্তৃতা গৃহে এক জনসভার আয়োজন করেন। দেশের তৎকালীন অনেক গণ্যমান্য সু-প্রতিষ্ঠিত কৃতী সন্তান সেই সভায় যোগদান করেন। আন্দোলনের স্বপক্ষে তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। জনসাধারণের সঙ্গে ছাত্রসমাজও সেই সভায় দলে দলে যোগদান করে। পূর্ণ সভাগৃহে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। সেই মহতী জনসভায় সুরেন্দ্রনাথকে বক্তৃতা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি সেই মাদকতা নিবারণী বৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা করে জনসাধারণের মনে বিশেষ করে ছাত্রসমাজের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। জনসভায় সেই ছিল সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা। কিন্তু তাঁর এই প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করেছিলেন। ভোরের অরুণোদয় যেমন উজ্জ্বল দিনের সূচনা করে, তেমনি সেদিনের সুরেন্দ্রনাথের সেই প্রথম বক্তৃতাই সূচনা করেছিল ভারতের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বাগ্মী রাষ্ট্রগুরুর, মেডিকেল কলেজের প্রথম বক্তৃতাই সুরেন্দ্রনাথ তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তাগণের সঙ্গে নিজের আসন সু-প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তাঁর জীবিকার্জ্জনের একটা পথও খুলে গেল। এই জীবিকার্জ্জনের পথ তাঁর নিকট তাঁর সমাজসেবা ও দেশ সেবার পথকে রুদ্ধ ত করলই না, পরন্তু অধিকতর উন্মুক্ত করে দিল—গণ-সংযোগের বিশেষ করে যুবক সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অধিকতর সুযোগ এনে দিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করতে তিনি সানন্দচিত্তে সেই পদ গ্রহণ করেন ঈশ্বরের দান মনে করে, তাঁর মাসিক বেতন স্থিরীকৃত হয় মাত্র দুশ টাকা। এমনি করে সুরু হল সুরেন্দ্রনাথের নবজীবন।

বাঁচতে চাই

শ্রীঅভয়কুমার রায়

মৃত্তিকার শিখণ্ডীতে ঢাকা
পৃথিবীটা যেন আজ বন্ধ্যা।
মানুষ ফলাবে ফসল তবু
এই আজ শাশ্বত কামনা॥

* * * * *

ক্ষুধার সংগ্রামে তারা জীবন সৈনিক,
পথ হোক যত বন্ধুর শুনবে না
প্রথম রোদে যারা বেরিয়েছে—
থামবে না, যতক্ষণ নামবে না সন্ধ্যা॥

* * * *

কিন্তু কান্নার স্বাদ নিয়ে যারা জন্মেছে
তারা কি পারবে বইতে আনন্দের পসরা,
তারা কি চোখের জলকে ভুলে, হবে কি করে ও
খুশীর উচ্ছ্বাসে স্বয়ম্বরা॥

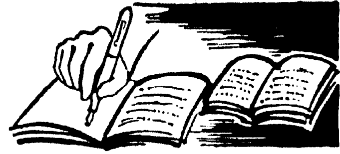
* * * ৪

তবুও জীর্ণ শীর্ণ দেহ নিয়ে এগিয়ে যাবেই
আবার রক্তের স্রোত ছুটবে শিরায়,
পৃথিবী যতই বলুক ওরা দুর্বল—কাপুরুষ
ওরা একটি কথাই বলবে—'বাঁচতে চাই'॥

* * * *

অসাম্যের টুঁটি-টিপে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করবে
ওরাই।
একদিন সন্ধি বশে—থেমে যাবে বাঁচার লড়াই॥

অনুবাদসাহিত্য



একটি প্রেমের গল্প

লেখক — লিন্ উ টাং

অনুবাদ—শ্রীমণি গঙ্গোপাধ্যায়

সতের বছর বয়সে ওয়াং চু'র বাবা মারা গেলেন। সংসারে আর কেউ নেই, তবে তার জন্য বিশেষ ভাবনাও নেই। সাংসারিক অভিজ্ঞতা তার অল্প নয় এবং শরীর আর মন দুই তার যথেষ্ট মজবুত। তাই নিজের ব্যবস্থা সে সহজেই ক'রে নিতে পারত। কিন্তু বাবা শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে ব'লে গেছেন, সে যেন দক্ষিণ প্রদেশে তার পিসীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর শুধু আশ্রয়ই বা কেন, সেখানে যাওয়ার তার অন্য প্রয়োজনও আছে। পিসীর ষোড়শী কন্যাটি যে তারই ভাবী বধূ—এও বাবা বলতে ভোলেন নি। অবশ্য সে অনেকদিনের কথা, প্রথম সন্তান লাভের আনন্দে ভাই আর বোনের মধ্যে মৌখিক চুক্তি হয়েছিল। ষোড়শী কন্যা আজও অবিবাহিতা আছে কি না সন্দেহ। সে যাই হোক, স্বর্গীয় পিতার আদেশ আর ভাবী বধূর সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ দুয়ের প্রেরণায় চু তার সামান্য সম্পত্তি বেচে বেরিয়ে পড়ল পথে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, অনেক নদী আর নালা পেরিয়ে পিসীর বাড়ী। একমাস স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে গেল—ভাবী বধূর স্বপ্ন। দীর্ঘ দশ বছর তাদের ছড়াছাড়ি। কেমন দেখতে হয়েছে সে এখন? সেই ছোট্ট হাসিখুশী মেয়েটি, যে দিনের অধিকাংশ সময় তার পাশে পাশে থাকত, সে কি এখনও মনে রেখেছে তার বাল্যের সঙ্গীকে?

পিসীর বাড়ী দক্ষিণ প্রদেশের এক পার্বত্য সহরে। পিসেমশায়ের সদাগম্ভীর মুখ দেখে আর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শুনে সে ভয় পেত। তখন সবে তিনি ছোট একটা ওষুধের দোকান করেছেন। কি ঝড় কি বৃষ্টি—সকাল না হতেই তিনি গিয়ে দোকান খুলতেন। একদিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি, একদিনও কেউ তাঁকে দোকানে অনুপস্থিত দেখেনি। এই নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের ফল এতদিনে ফলেছে। আজ তিনি এক ফলাও পাইকারি কারবারের মালিক। সহরে সুন্দর বাড়ী করেছেন, সম্পত্তিও করেছেন প্রচুর। কিন্তু স্বভাব বোধহয় বদলায়নি। অন্তত: চু'র তাই মনে হ'ল যখন তাকে দেখেই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন "তুমি আবার এখানে কি মনে ক'রে?"

চু তার পিসেমশাইকে ভালভাবেই চিনত। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং ভীতু-প্রকৃতির। তাঁর একমাত্র চেষ্টা কিছুতে যেন তাঁর সুনামের হানি না হয়, কেউ যেন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। কিন্তু তাঁর এই সব দুর্বলতা তিনি ঢাকতে চাইতেন গম্ভীর মুখের মুখোসে, বাজখাঁই আওয়াজের আবরণে। তাই সে ঘাবড়ে না গিয়ে জানালে যে—সে এসেছে আশ্রয়ের আশায়।

দোকানের এক কর্ম্মচারী তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। পিসী বাইরে গেছেন, তাঁর আসার অপেক্ষায় সে বসে রইল বাইরের ঘরে। একটু পরেই পর্দা সরিয়ে ঘরে এল ফিকে নীল রঙের পোষাক পরা একটি তন্বী তরুণী। পিসতুতো বোন চিয়েনকে দেখে তার চিনতে ভুল হল না। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে চিয়েন! মুগ্ধ বিস্ময়ে সে চেয়ে রইল তরুণীর ফুটন্ত পদ্মের মত মুখের দিকে। ঘরে অপরিচিত আগন্তুককে দেখে পেছন ফিরতে গিয়ে তরুণী দাঁড়িয়ে পড়ল—আর তারপরেই আনন্দে ফেটে পড়ল তার কণ্ঠ স্বর, "চু, তুমি এখানে?"

"চেন, তুমি!"

উল্লাসে, উত্তেজনায় তরুণীর চোখ জ্বলে উঠেছে, এখুনি বুঝি সে কেঁদে ফেলবে। মনে কথার ভিড় কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু বার হ'ল "উঃ! তুমি কত বড় হয়েছ!"

"আর তুমি!"

অভিভূত চু এর বেশী আর কি বলবে! বাবার শেষ কথা মনে পড়েছে, মনে হচ্ছে এই সুন্দরী, হাস্যময়ী তরুণী শুধু তার পিসতুতো বোন নয়, তার ভাবী বধূও। ততক্ষণে চিয়েন এসে তার পাশে ব'সে পড়েছে। একটু পরেই এই তরুণ-তরুণী ভেসে গেল কথার স্রোতে, হারিয়ে গেল বাল্য-স্মৃতির স্বপ্নরাজ্যে। একটু পরেই এসে যোগ দিল ছোট ভাই। চু তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবুও তাদের পরস্পর অন্তরঙ্গ হ'তে দেরী হ'ল না।

পিসী বাড়ী ঢুকেই পিতৃহারা ভাইপোকে আদর ক'রে বুকে টেনে নিলেন। চু দেখল পিসীর বয়স বেড়েছে, কিন্তু আর কিছু বিশেষ বদলায় নি। সেই উন্নত সুঠাম দেহ, ডিমের খোলার মত মসৃণ ত্বক, সেই ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঠিকই আছে, শুধু চুলের মাঝে মাঝে পড়েছে রূপোলি রেখা। অনেক কথা হ'ল পিসীর সঙ্গে। চু জান'লে যে জেলা-স্কুলের পড়া সে শেষ ক'রে এসেছে, তবে এইবার কি করবে তা এখনও ঠিক করেনি। পিসী বললেন, "তোমার পিসেমশায়ের ব্যবসা এখন বেশ ভালই চলছে।"

চু একটু হেসে উত্তর দিল, "তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ব্যবসা ভাল না চললে কি এমন সুন্দর বাড়ী হয়!"

"বাড়ীর কথা আর ব'লোনা। বাড়ী তো হ'ল, কিন্তু উনি কিছুতেই গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করবেন না। শেষে আমরা সকলে জোর তাগিদ দিতে তবে নতুন বাড়ীতে আসা হল। ওঁর দুঃখ অবশ্য আজও যায়নি, এখনও প্রায়ই শুনিয়ে শুনিয়ে হিসেব করেন—এই বাড়ী ভাড়া দিলে কেমন মোটা মাসিক আয় হ'ত। সে যাই হোক, এখানে যখন থাকবে, তখন কাজকর্ম একটা কিছু করতে হবে বৈকি। আমি ওঁকে বলবো, দোকানের একটা কাজে তোমায় লাগিয়ে দিতে। ওঁর ধমকানি খেয়ে যেন ঘাবড়ে যেয়ো না। মন দিয়ে কাজ করে যাবে, দেখবে উন্নতি হতে দেরী হবে না।"

সেদিন রাত্রে পিসেমশায় বাড়া ফেরার পর সকলে খাবার টেবিলে একত্র হ'ল। সাধারণতঃ বাড়ীর সকলেই পিসেমশাইকে ভয় করত। পিসী অবশ্য ভয় করতেন না। তিনি জানতেন যে সর্বত্র কর্তার ভারিক্কি চাল বজায় রাখা তাঁর স্বামীর একটা বাতিক। খাবার টেবিলেও স্বামীর মেঘের মত থম্‌থমে মুখ দেখে তাঁর মজাই লাগত। তবুও এই নীরব ভোজনে তিনি কোনোদিন বাধা দেননি। সেদিন কিন্তু তিনি হঠাৎ দোকানে চাকরীর কথাটা পাড়লেন। পিসেমশাই বিশেষ আমলই দিলেন না। এমন একটা ভাব দেখালেন যার অর্থ—দরিদ্র আত্মীয়কে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এই যথেষ্ট, তার আরামের ব্যবস্থার জন্য অত মাথাব্যথার দরকার নেই। বুদ্ধিমতী পিসী আর কথা বাড়ালেন না। নীরবে ভোজন শেষ হল। চু অবশ্যই একটু ব্যথিত হ'ল, কিন্তু নিরাশ হ'ল না। সংসারের উপর পিসীর কর্তৃত্ব তার অবিদিত ছিল না। স্বামীর ব্যবসা থেকে কন্যার শিক্ষা সব কিছুর উপরই ছিল তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। সুতরাং চাকরীর ব্যাপারেও তাঁর চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে না তা চু ভালভাবেই জানত।

চু ভুল করেনি। চাকরী তার হল এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই সে পিসীর সংসারের একজন হয়ে উঠল। চিয়েন যে তারই বাগদত্তা বধূ, এমন একটা আভাস অবশ্য পিসীর ব্যবহারে পাওয়া গেল না। চু কিন্তু সেটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বাবার সঙ্গে পিসীর কথা হয়ে থাকুক বা না থাকুক, চিয়েনকে দেখার পর সে তার ভবিষ্যৎ ঠিক ক'রে ফেলেছে। চিয়েনকে পাশে না পেলে তার জীবন অর্থহীন হবে। চিয়েনও এই শান্ত সুন্দর তরুণটিকে যতই দেখছে ততই স্থিরনিশ্চয় হচ্ছে যে এই তার মনের মানুষ।

কন্যার এই পরিবর্তন মায়ের চোখ এড়াল না। প্রথম প্রেমের মধুর স্পর্শ পড়েছে চিয়েনের চলা-বলায় কাজে-কর্মে। আগেও সে মাঝে মাঝে দু'একটা রান্না নিজের হাতে করেছে। কিন্তু তখন সে কি জানতো এই সামান্য রান্নার মাঝেই লুকিয়ে আছে এক নূতন রসের উৎস! তার হাতের রান্না প্রিয়তম চু'র পাতে সাজিয়ে দেওয়া হবে, খেয়ে খুসী হবে চু—এইসব কথা ভাবতেই সত্তা আচ্ছন্ন হয় এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ-শিহরণে। ধীরে ধীরে চু'র প্রয়োজনীয় সব কাজ সে তুলে নেয় নিজের

...তে। বাড়ীতে দাস-দাসীর অভাব নেই। তবু চু'র ...র পরিষ্কার, তার বিছানা পাত', জামার বোতাম লাগানো —এই সব সামান্য কাজও অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তি ...য় না। এমন কি ছোট ভাই চু'র টেবিল নোংরা করলে ...র কেমন বিরক্ত লাগে। নিজের এইসব অনুভূতিতে নিজেই সে এক এক সময় বিস্মিত হয়।

মা-ও কম বিস্মিত হন না। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন চিয়েন তরকারিতে নুন একটু বেশী দিতে আরম্ভ করেছে। একদিন বাধ্য হয়েই বললেন, "আজকাল তোমার নুনের ...ত এত দরাজ হচ্ছে কেন চিয়েন"? মেয়ের মুখ লজ্জায় ...ল হয়ে উঠল, কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। উত্তর দেবেই বা কি! সে কেমন ক'রে বলবে যে চু একটু বেশী নুন পছন্দ করে!

চু'র দিনগুলোও আনন্দের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে ...য়; পিশেমশায়ের ধমকানি সে গায়েই মাখে না। ...ব দুঃখের শেষে তার পরম সান্ত্বনা—চিয়েন তার কাছে আছে, পাশে আছে। চিয়েনকে ভালবাসে ব'লেই তার জীবনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে সকলকে মনে হয় একান্ত আপনজন। পিসীর মধ্যে সে খুঁজে পায় তার মাকে, চিয়েনের ছোট ভাই তার নিজের ছোট ভাই হ'য়ে যায়। পিসেমশায়ের সঙ্গে রাতে ভোজের টেবিলে একবার ...ত্র দেখা হয়। তাঁর বাইরে নিমন্ত্রণ থাকলে তাও হয় না। তবু এই গম্ভীর প্রকৃতি নিঃসঙ্গ মানুষটির প্রতি কেমন একটা ক্ষীণ মায়ার অনুভূতি তার অন্তরে অঙ্কুরিত হয়।

নতুন জায়গার জল-হাওয়া চুর জানা ছিল না। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে শয্যাশায়ী হ'ল। দুদিন বাদেই জ্বর ছাড়ল, কিন্তু এক নূতন অভিজ্ঞতার অপূর্ব অনুরণন আর ছেড়ে যায় না। কে জানতো যে প্রিয়তমার হাতের সেবার মধ্যে লুকিয়ে আছে এত মধু! অসুখ না করলে পাওয়া যেত না এই অমৃতের আস্বাদ। সেই অমৃতের লোভে আরও ...দিন সে শুয়ে রইল। শেষে চিয়েনই তাড়া দিলে, "এইবার তোমার কাজে যাওয়া উচিত; আরও ছুটি নিলে বাবা হয়তো রাগ করবেন।" বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে চু'কে আবার ধরতে হ'ল দোকানের পথ।

পথ পার হল যেন স্বপ্নের ঘোরে। তখনও তার কানে বাজছে ঠিক বার হবার আগে চিয়েনের অনুরোধ "আজও বেশ ঠাণ্ডা আছে, গরম জামা পরতে যেন ভুল না হয়। আবার অসুখ করলে দেখবে কি করি।"

চু জানত চিয়েনের অনুরোধ তার কাছে আদেশ। তবুও সে চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে ফিক্ ক'রে হেসে বললে, "অসুখ করলে মজা তো কম নয়।"

"তবে রে দুষ্টু" ব'লে চিয়েন এল তেড়ে, আর সে একটা গরম জামা টেনে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়।

দিন বেশ যাচ্ছিল। এমন সময় পিসেমশায়ের বৌদি এলেন দিনকয়েক বেড়িয়ে যেতে। ভদ্রমহিলার স্বামী যে একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি, তা তাঁর হালচাল দেখলেই বোঝা যায়। পিসেমশায় তাঁর বৌদিকে শ্রদ্ধা যত করতেন, ভয় করতেন তার বেশি। দাদার স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর মজ্জাগত এবং তিনি ভিতু হওয়ার দরুণ তার অভিব্যক্তিটা প্রকট। আর ভয় করতেন কারণ তখনও দাদার মোটা টাকা তাঁর ব্যবসায় খাটছে। সুতরাং ভদ্রমহিলাকে প্রায় রাণীর আদরে রাখবার ব্যবস্থা হ'ল। সকলেই তাঁকে খুশী করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। এমন কি রাতের ভোজ সভায় পিসেমশায় পর্যন্ত কথার ফোয়ারা ছোটালেন।

এত আদরের প্রতিদান দিতেই হয়, এই সংসারের একটা কিছু উপকার না করলেই নয়! ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আর সুযোগ অচিরেই এল। এক রাত্রে সহরের সেরা ধনী সিয়াংদের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফিরেই তিনি পিসীকে ডেকে বললেন, "চিয়েনের বয়স তো হ'ল। সিয়াংদের মেজ ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা আজ পেড়ে এলাম। সিয়াংরা যত বড়লোকই হোক, চিয়েনের মতো সুন্দরী মেয়ে ওরা পাবে কোথায়!"

পিসী মৃদু কিন্তু দৃঢ় উত্তর দিলেন "আমার ভাইপোর সঙ্গে চিয়েনের বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে আছে।"

ভদ্রমহিলা এমন একটা ভাব দেখালেন, যেন সামনে ভূত দেখছেন। তারপর বললেন, "তোমার ভাইপো, মানে ওই যে ছেলেটা এখানে রয়েছে? তোমার ভাই তো মারা গেছে শুনেছি।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে।"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। হাসির ফুৎ-

কারে ভালবাসার মতো একটা তুচ্ছ কথাকে উড়িয়ে দিয়েছেন ভেবে বেশ ভারিক্কি চালে এবার বললেন, "তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে। ও ছেলেটার আছে কি শুনি? কোথায় সিয়াংদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ, আর তার পাশে কি না একটা চালচুলো নেই……"।

একধারে বসে চিয়েন শুনছিল সব কাথাবার্তা। এই পর্যন্ত শুনে তার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল। ধীরপায়ে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সেইদিকে চেয়ে ভদ্রমহিলা আরো উত্তেজিত হ'য়ে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলেন "তোমাদের সকলেরই দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে। মেয়েটা পর্য্যন্ত বুঝছে না যে কি সৌভাগ্য ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। সিয়াংদের বাড়ী দেখলে তবে তোমরা বুঝতে, কেন আমি এই বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। কি বিরাট ধনী ওরা, ওদের মেয়েদের গায়ে জড়োয়া গয়নার কি জৌলুস। তুমি মা, তুমি একটু শক্ত হও। এই বিয়ে যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"

মেয়ের এই নীরব প্রতিবাদ মা লক্ষ্য করলেন। ভদ্রতার খাতিরে তিনি আর কথা বাড়ালেন না। অতিথির অপমান হবে এমন কিছু বলা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। অতিথি কিন্তু তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হ'লেন না। কল্পনা করলেন সিয়াংদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে কি বিরাট উৎসবই না হবে, কতদিন ধরে চলবে পান-ভোজন, নাচ-গান। তাঁর কৃতিত্বের মুকুটে আবার একটা নতুন পালক গোঁজা হবে। আর এই পালক গোঁজবার তাগিদেই, বাড়ীর গিন্নীকে অবহেলা ক'রে, মেয়ের মন উপেক্ষা ক'রে তিনি ধ'রে বসলেন স্বয়ং কর্তাকে। প্রস্তাব শুনে, শুনে কেন শোনবার আগেই কর্তা হাতে স্বর্গ পেলেন। পয়সা তিনি কিছু ক'রেছেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিক কৌলীন্যের কুল তখনও তাঁর নাগালের বাইরে। এই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা তিনি সিয়াংদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যখনই গেছেন তখনই বিশেষ ভাবে হয়েছে। সহরের সেরা ধনী সিয়াং পরিবার—এ কথা পথে ঘাটে শুনেছে আর ঈর্ষায় তাঁর বুক জলে উঠেছে। বৌদির প্রস্তাব শুনে তিনি শুধু সম্মত হ'লেন না, অচিরে বিয়ের কথা পাকা ক'রে ফেললেন। সিয়াংদের সঙ্গে আত্মীয়তার সুযোগ ছাড়বেন এত মূর্খ তিনি নন। স্ত্রী যদি বোকার মত প্রতিবাদ করে, মেয়ে যদি খাওয়া দাওয়া বন্ধ ক'রে শয্যা নেয়, তিনি তার কি করতে পারেন? তিনি জানেন জীবনে সুযোগ একবারই আসে।

"তা ব'লে মেয়ের কথা তুমি ভেবে দেখবে না! তার জীবনটা তুমি ব্যর্থ ক'রে দেবে? অর্থ, সম্মান এ সব নিয়ে কি হবে যদি পরিণামে মেয়ে না সুখী হয়?" শেষ প্রতিবাদ জানালেন মা। কোনও ফল হ'ল না। মেয়ের বিনিদ্র রাত্রি কাটে চোখের জল ফেলে, দেখে মায়ের বুক ফেটে যায়। কিন্তু তিনি অসহায়।

অসহায় তরুণ প্রেমিক চু-ও। বিয়ের তোড়-জোড় সুরু হ'তেই বেচারি সবার অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল দূরের পার্বত্য প্রদেশে। ফিরে এল তিন সপ্তাহ পরে। তাকে দেখেই পিসী কেঁদে ফেললেন। চিয়েন বুঝি আর বাঁচবে না। সে বাড়ী ছেড়ে যাবার পরদিনই মেয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে যায়। অনেক চেষ্টায় জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু হারিয়ে গেল তার স্মৃতিশক্তি। তারপর থেকে মেয়ে শয্যাশায়ী। বাবা, মা, ভাই, আত্মীয় স্বজন কাউকে সে চিনতে পারে না। শরীরে না আছে জ্বর, না যন্ত্রণা। তবুও সে কিছু খায় না, শুধু আকাশের দিকে উদাস নয়নে চেয়ে থাকে—আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে প্রলাপ বকে। তার ভাবলেশহীন চোখের দিকে চাইলেই মনে হয়, তার আত্মা হঠাৎ অন্তর্ধান হয়েছে, পড়ে আছে পরিচালকহীন দেহযন্ত্রটা। সহরের সেরা ডাক্তাররা দেখেছেন। সকলের মুখে একই কথা—এমন রোগের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই।

কথা শুনতে শুনতে চু এসে দাঁড়াল রোগিনীর ঘরে। শয্যার সঙ্গে মিশে প'ড়ে আছে চিয়েনের সাদা চাদরে ঢাকা দেহ। রক্তলেশহীন মুখে মৃত্যুর ছায়া, ভাবলেশহীন চোখে স্থির ঔদাসীন্য। চু তার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে ধীরে ধীরে ডাকল, "চিয়েন, চিয়েন!" উদ্বেগাকুল চোখে মা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। মেয়ের চোখের তারা যেন একটু ন'ড়ে উঠল, গাছের পাতা প'ড়ে যেমন ক্ষণিক ন'ড়ে ওঠে, স্থির দীঘির গভীর কালো জল।

আবার একটু জোরে ডাকলে চু, "চিয়েন, চিয়েন!" ন'ড়ে উঠল রোগিনীর দেহ, বন্ধ রক্তের স্রোত যেন হঠাৎ

ছাড়া পেয়ে ছড়িয়ে পড়লো শিরায় শিরায়। পাংশু মুখে পড়ল প্রাণের স্পর্শ, চোখের তারায় জলে উঠল হীরকের দ্যুতি। যেন দীর্ঘ নিদ্রার শেষে জেগে উঠল চিয়েন, পাশ ফিরতেই মুখে তার ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের দীপ্তি। শোনা গেল তার ক্ষীণ স্বর, "তুমি এসেছো ?"

আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল মা, "চিয়েন, কাঠির ছোঁয়ায় তুই আবার জেগে উঠেছিস, ওরে চিয়েন! চেয়ে দেখ, আমি তোর মা। আমায় তুই চিনতে পারছিস্ না ?"

"কেন পারবো না, মা। কি হয়েছে আমার ? তুমি অমন ক'রে কাঁদছো কেন ?"

দিন সাতেকের মধ্যে চিয়েন সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠল। তার যে অসুখ করেছিল, সে যে তার মা-কে বাবা-কে চিনতে পারেনি, এ কথা কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় মা তার সব বানিয়ে বলছেন।

ঠিক ওই একই কথা তার বাবার মনে হ'ল—যখন স্ত্রীর কাছে চু'র ফিরে আসা, তার ডাকে চিয়েনের ভাবান্তর ইত্যাদি ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা শুনলেন। মেয়ের অসুখের ব্যাপারে তিনি বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সে সেরে উঠতেই ক্ষণিক দুর্বলতা দু'হাতে সরিয়ে তিনি আবার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন তাঁর ভারিক্কি চালের গদীতে। তাই স্ত্রীর কথা শুনে গম্ভীর হ'য়ে মন্তব্য করলেন, "যত সব আজগুবি গল্প। সত্যিকারের রোগ হ'লে ডাক্তাররা ঠিকই ধরতে পারতেন।"

"এ রোগ দেহের নয়—মনের। ডাক্তারদের কাছে এর ওষুধ নেই—আছে তোমার কাছে। সিয়াংদের ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা বন্ধ কর।"

"পাকা কথা হয়ে গেছে, এখন আর ওসব চলবে না। তা ছাড়া তুমি কি মনে কর তোমার আজগুবি গল্প শুনে আমি এমন সম্বন্ধ হাতছাড়া করবো ? আর তারাই বা এ সব মন-গড়া রোগের কথা বিশ্বাস করবে কেন ?"

কথা হচ্ছে, এমন সময় বৌদি এলেন। তিনি তখনও যান নি, ইচ্ছে বিয়ে না দিয়ে যাবেন না। কর্তার শেষ কথার জের টেনেই যেন বললেন, "আমার বয়সে বাপু এমন রোগের কথা কখনও শুনিনি। মেয়ে নিজের বাবা-মাকে চিনতে পারে না—ঢং, সবই ঢং।"

আবার নূতন উদ্যমে সুরু হ'ল বিয়ের ব্যবস্থা। চু হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। এই অবস্থায় তার কিছুই করবার নেই অথচ সামনে দিয়ে চিয়েন চ'লে যাবে অন্যের ঘরণী হ'য়ে, এ দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যু ভাল। মন স্থির ক'রে সে পিসেমশায়কে বললে, "আমি ভাবছি সহরে গিয়ে চাকরীর সন্ধান করবো।"

শুনে পিসেমশায় যেন একটু বেশী খুশী হ'লেন। স্বভাব বিরুদ্ধ হ'লেন, হেসে বললেন, "বেশ তো, সে তো বেশ ভাল কথা।"

সেদিন রাত্রে ভোজের টেবিলে চিয়েন এল না। শুনল তার শরীর খারাপ তাই শুয়ে আছে। পরের দিন সকালেই চু চ'লে যাবে। উপস্থিত সকলে তাকে অনেক উৎসাহ দিলেন, জানালেন আন্তরিক কল্যাণ-কামনা। চু নীরবে খাওয়া শেষ ক'রে চলে গেল নিজের ঘরে।

সকালে বিদায়ের আগে পিসী তাকে চিয়েনের ঘরে নিয়ে গেলেন। চিয়েনের এখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তার তপ্ত কপালে হাত রেখে ধীর স্বরে চু বললে, "আমি যাচ্ছি চিয়েন।"

"আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে, আর তুমি চ'লে যাবার পর মৃত্যুতেই আমার শান্তি। কিন্তু চু, তুমি যেথানেই থাকো, জানবে আমি সব সময়েই তোমার পাশে পাশে আছি।" ক্লান্ত করুণ স্বরে এই কথাগুলি ব'লে চিয়েন চোখ বুজলো। দু'চোখের কোণে তার টলটল ক'রে উঠল মুক্তার মত দু বিন্দু অশ্রু। মাথা নীচু ক'রে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল চু, তার চোখেও জল।

সন্ধ্যায় চু'র নৌকা একটা ঘাটে বাঁধা হয়েছে। রাত্রে বিশ্রামের পর সকালে আবার পাড়ি সুরু হবে। নৌকার মধ্যে অন্ধকারে একা শুয়েছিল চু। রাত বাড়ছে কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। নৌকা অনেক বেলায় ছেড়ে পিসীর বাড়ী থেকে বেশী দূর যেতে পারেনি। শুয়ে শুয়ে পিসীর বাড়ীর সঙ্গে জড়ানো অসংখ্য স্মৃতি নিয়ে মগ্ন ছিল তার মন। এমন সময় তার নাম ধরে মৃদুস্বরে কে ডাকলে। ঠিক যেন চিয়েনের ডাক। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে ভেবে নিজের মনেই সে হেসে উঠল। অনেক দূরে জ্বরাচ্ছন্ন চিয়েন এখন হয়তো ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার এল সেই ডাক। এবার খুব কাছে,

ঠিক যেন হাতকয়েক দূরে তীরে দাঁড়িয়ে চিয়েন তাকে ডাকছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই তার সারা দেহে ছড়িয়ে গেল বিদ্যুৎ শিহরণ। একটু দূরে তীরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে চিয়েনের ক্ষীণ দেহ। পাগলের মত ছুটে বার হল চু, নিমেষের মধ্যে লাফিয়ে তীরে নেমে চিয়েনকে তুলে নিল তার বুকে।

"আমি পালিয়ে এসেছি" অস্পষ্ট স্বরে এই ক'টি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চিয়েন সংজ্ঞাহীন হ'ল। যেন এই কথা ক'টি বলবার জন্যই সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে সংহত রেখেছিল। নৌকার মধ্যে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে চু তখনই তার দেহ গরম কম্বলে ঢাকা দিল। আশ্চর্য হ'য়ে দেখল যে এই দীর্ঘ পথ সে নগ্নপদে ছুটে এসেছে। ক্ষত-বিক্ষত কোমল পায়ে রক্তের ধারা বইছে। রক্ত মুছিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে দিল। একটু পরেই চিয়েন চোখ মেলল। তারপর সারা রাত এই দু'টি মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর কেটে গেল আদরে আর আলাপনে। কথা যত তা চু একাই বলেছে। আবেশাচ্ছন্ন চিয়েনের মুখ থেকে শুধু মাঝে মাঝে বার হয়েছে, " কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

নৌকায় দীর্ঘপথ অতিক্রম 'ক'রে তারা এক ছোট্ট সহরে এল। আনন্দে উল্লাসে স্বপ্নরঙীণ ক'টি দিন পার হ'য়ে এল দুই প্রেমবিহ্বল তরুণ-তরুণী। মাঝে মাঝে শুধু মা-র মুখ মনে প'ড়ে বিমনা হয়েছে চিয়েন। আহা! তার এই ঘর ছেড়ে আসায় কত কষ্টই না পাচ্ছেন স্নেহময়ী মা।

সহরে চু সামান্য একটা কাজ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সহরের প্রান্তে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দু'জনে সংসার পাতল। সামান্য আয়, কিন্তু তাতে দু'জনের কেউই দুঃখিত নয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে চু রোজ আপিসে যায়। অবসর সময় নিজে হাতে চেয়ার, টেবিল, খাট বানিয়ে যথাসাধ্য সাজিয়ে তোলে তাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়। সস্তা কাঠের আসবাবেই ঘরে যেন স্বর্গের শোভা নেমে আসে। চিয়েন সংসারের যাবতীয় কাজ হাসিমুখে ক'রে যায়। দু'টি পরিতৃপ্ত প্রাণীর প্রাণের খুসীতে সদাই ভ'রে থাকে তাদের সামান্য সংসার। একতলায় তাদের ঘর, বাড়ীর মালিক থাকেন দোতলায়। বাড়ীর সামনে ছোট্ট একটি বাগানও আছে। ছুটির দিন দুটিতে বাগানের টুকিটাকি কাজে বাড়ীর মালিককে সাহায্য করে। তিনিও তাদের ব্যবহারে খুব খুসী। প্রায়ই এটা ওটা উপহার পাঠান।

শীতকালে চিয়েনের কোল আলো করে এল একটি শিশু। তাদের সংসারে সুখ যেন উথলে উঠল। মাস-কয়েক যেতেই শিশুপুত্রকে নিয়ে অনভিজ্ঞা চিয়েন দিশে-হারা হ'য়ে পড়ে। সংসার দেখবে না দামাল ছেলেকে সামলাবে। ধনীর কন্যা চিয়েনের এই কঠোর পরিশ্রম চু'কে বিব্রত করে। ভয়ে ভয়ে সে বলে, "একটা ঠিকে ঝি রাখলে হয়।"

চিয়েন প্রথমটা অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে থাকে; তারপর হেসে স্বামীর মাথাটা টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলে, "আমি তো স্বেচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে তোমার কাছে এসেছি।"

ছেলের বয়স বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে চু আর চিয়নের বিস্ময়। তারা কি জানতো এই ছোট্ট একটি শিশুর মাঝে লুকিয়ে আছে এত রহস্য! শিশু হামাগুড়ি দেয়, হাসে, খেলা করে আর তাকে নিয়ে চলে দু'জনের মধুর প্রতি-যোগিতা। কে তাকে হাসাতে পারে, কে পারে তাকে আগে কথা বলাতে। একদিন সত্যিই আধো আধো ডাক শোনা গেল "মাম্মা।" দু'জনের সে কি উল্লাস! মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন বাড়ীর মালিক আর তাঁর স্ত্রী। এই নিঃসন্তান দম্পতি শিশুটিকে স্নেহ করেন, চিয়েনকে যথাসাধ্য সাহায্যে ত্রুটি করেন না। হেসে খেলে দিন কেটে যায়।

নীল আলো ঝল্‌মল্ আকাশে মাঝে মাঝে এক টুকরো মেঘ দেখা যায়। চিয়েন কিছুতেই ভুলতে পারে না তার মা আর ভায়ের কথা। এক এক সময় সে বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়ে। এই ক্ষণিক পরিবর্তন চুর চোখ এড়ায় না। এক-দিন সে বললে, "আমি জানি, মায়ের কথা ভেবে তোমার মন কেমন করে। চল তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাই। আমাদের বিয়ে হয়েছে, সুতরাং এখন ভয়ের কিছুই নেই। তোমাকে কাছে পেলে মা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।"

"সেই ভাল। আমার কথা ভেবে মা বেচারি পাগল না হলে বাঁচি! আর এমন নাতি কোলে পেলে বাবা মা দুজনেই আগের কথা সব ভুলে যাবেন।"

এক মাস পরে তাদের নৌকা বাড়ীর ঘাটে এসে

লাগল। চিয়েন বললে, "তুমিই আগে যাও, তারপর আমার জন্যে পাল্কী পাঠিয়ে দিও।" তারপর চু'র হাতে একটা সোনার আংটি দিয়ে যোগ করলে, "যদি সকলে এখনও রেগে থাকে, তোমাকে ঢুকতে না দেয়, তোমার কথা অবিশ্বাস করে, তাহলে এইটা দেখিও।"

বাড়ী ঢুকেই পিসেমশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেখানে পিসীমাও ছিলেন। এই অল্পদিনেই পিসীমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেশ রোগা হয়ে গেছেন, চুলও অনেক পেকেছে। তাকে দেখেই তাঁর বিষণ্ণ মুখে হাসির রেখা ফুটল। চু কর্তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল, বলল তাঁদের কন্যাকে সে আবার ফিরিয়ে এনেছে। অনুমতি পেলেই নৌকা ছেড়ে চিয়েন বাড়ীতে আসবে। "চিয়েন? আমার মেয়ে! কি বলছো তুমি?" প্রায় চীৎকার করে উঠলেন কর্তা, "আমার মেয়ে অসুস্থ, এক বছরের ওপর হলো সে শয্যাশায়ী।

এই সময় পিসীমা এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রাখলেন। সে মুখ তুলে চাইতেই বললেন, "তুমি যাবার পর থেকেই চিয়েন শয্যা নিয়েছে। তারপর থেকে সমানে যমে-মানুষে যুদ্ধ চলেছে! মাঝে মাঝে অসুখ এত বাড়ে যে মনে হয় আর বুঝি আশা নেই। এ আমাদের অন্যায়ের ফল ভেবে আমি তার সামনে বার বার সিয়াংদের ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু কে শুনবে আমার কথা! মেয়েকে দেখলে মনে হয় আত্মাহীন নিষ্প্রাণ একটা দেহ যেন প'ড়ে আছে। আমি তোমার আসার পথ চেয়েই ব'সে আছি বাবা।"

"আপনারা কেন বিশ্বাস করছেন না যে সম্পূর্ণ সুস্থ চিয়েন নৌকায় অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে।" এই বলে সে পিসীর সামনে এগিয়ে ধরল চিয়েনের দেওয়া আংটি।

বিস্ময়-বিমূঢ় মা চেয়ে রইলেন সেই আংটির পানে। এগিয়ে এসে দেখে বাবাও থমকে দাঁড়ালেন। স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে চু আবার জোর দিয়ে বললে, "আমি বলছি চিয়েন নৌকায় ব'সে আছে। আমার সঙ্গে লোক দিয়ে পাল্কী পাঠিয়ে দিন, আমি এখুনই তাকে নিয়ে আসছি।"

শেষ পর্য্যন্ত প্রায় জোর করে সঙ্গে লোক আর পাল্কী নিয়ে চু ঘাটে পৌছল।

বাড়ীর পুরণো চাকর চিয়েনকে দেখেই চিনতে পারলে, চিয়েনও তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বাবা-মা'র খবর নিলে। চাকর জানালে তাঁরা ভালই আছেন।

"কর্তা আর গিন্নী স্থানুবৎ ব'সে অপেক্ষা করছেন পাল্কী ফিরে আসবার আশায়। এই অবসরে চিয়েনের পরিচারিকা আংটিটি তুলে নিয়ে এল রোগিনীর ঘরে। চু ফিরে এসেছে শুনেই রোগিণী চোখ মেলে চাইল, মৃদু হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল তার পাণ্ডুর মুখে। আরও আশ্চর্য, আংটিটা দেখেই সে হাত বাড়িয়ে নিয়ে আঙ্গুলে পরতে পরতে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আংটিটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

পরিচারিকা বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোগিণী স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘর ছেড়ে সবার অলক্ষ্যে পেছনের দরজা দিয়ে চ'লে এল রাস্তায়। একটু পরেই হাসিমুখে এসে দাঁড়াল নদীর ঘাটে। চিয়েন তখন পাল্কীর সামনে দাঁড়িয়ে, পেছনে ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চু। চোখ তুলতেই চু দেখলে উঁচু পাড় থেকে নেমে সেই নারী মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে এল। কাছে, আরও কাছে—তারপর তার দেহ চিয়েনের দেহে মিশে গেল।

রোগিণীর অন্তর্ধানের সংবাদে বাড়ীর সকলে প্রথমটা কি করবে ভেবেই পেলে না। কর্তা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল পাল্কী, বার হ'য়ে এল হাস্যমুখী চিয়েন, কোলে তার মোমের পুতুলের মত একটি শিশু। বাবা আর মা দু'জনেই দিশেহারা হ'য়ে পড়লেন। সব কিছুই কেমন যেন খেই হারিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একটার পর একটা অলৌকিক ঘটনার তাঁরা শুধু নির্বাক দর্শকমাত্র। বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটতে তাঁরা জামাই, মেয়ে, নাতিকে সাদরে কাছে টেনে নিলেন। ধীরে ধীরে রহস্যের জাল অপসারিত হ'ল। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রেরণায় প্রকৃত চিয়েন গিয়ে মিলিত হয়েছিল তার প্রিয় চু'র সঙ্গে। ঘরের শয্যায় পড়েছিল তার সত্তার ছায়াটুকু, আত্মাহীন অস্তিত্বটুকু।



গান

দিশারী আলোর রেখা
ক্রমে স্পষ্ট জ্যোতি লেখা,
পরিপূর্ণ ইঙ্গিতের দীপ্তি সমুজ্জ্বল।
সুমস্ত ধূলির মাঝে
তব জাগরণী যাচে
সেই মহা জীবনের
সেই দিব্য দীপনের
সেই নব সৃজনের
বিকশিত পূর্ণ শতদল ॥

কথা : শ্রীগোবিন্দলাল গোস্বামী (নবদ্বীপ) সুর ও স্বরলিপি : তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা ঋা মা | মা গমা -পদা I পমা পা -া | -া পা দা I
দি শা রী আ লো০ ০র্ রে০ খা ০ ০ ক্র মে

I মা -দা দা | ণা র্সা -র্ঋা I র্সণা র্সা -া | -া -া -া I
স্প ০ ষ্ট জ্যো তি ০ লে০ খা ০ ০ ০ ০

I র্সা র্ঋা র্জ্ঞা | -র্জ্ঞর্ঋা র্সা -ণা I ণা -পা ণা | দা পা -া I
প রি পূ র্ ণ ০ ই ০ ঙ্গি তে র ০

I জ্ঞা -া মপা | -দণা ণদা পমা I জ্ঞরা মজ্ঞা -া | -া -া -ঋসা I
দী প্‌ তি০ ০০ স মু জ্জ্ব০ ০ ০ ০ ০ ০ল্‌

I সা ঋা মা | মা গমা -পদা I পমা পা -া | -া -া -া II
দি শা রী আ লো০ ০র্‌ রে০ খা ০ ০ ০ ০

II সা জ্ঞা -া | জ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা -া রা | জ্ঞা -া -া I
ঘু ম ন্‌ ত ০ ধূ লি র্‌ মা ঝে ০ ০

I জ্ঞা মা জ্ঞা | মা পা দা I পমা পা -া | -া পা -া I
ত ব জা গ র ণী যা০ চে ০ ০ সে ই

I মা দা -া | দা -া পা I দা -া -া | -া দা -ণা I
ম হা ০ জী ০ ব নে ০ ০ র্‌ সে ই

I ণা -র্সা র্সা | র্সা -ঋ্র্আ ণা I র্সা -া -া | -া র্সা -ণা I
দি ০ ব্য দী ০ প নে ০ ০ র্‌ সে ই

I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা -র্মা -া I
ন ব সৃ জ নে র্‌ বি ক শি ত ০ ০

I র্জ্ঞা -র্মা র্জ্ঞর্ঋা | -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা র্ঋা I র্সা -া -া | -া র্সা -ণা I
পূ র্‌ ণ০ ০ শ ত দ ০ ০ ল্‌ সে ই

I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | মর্জ্ঞা -া -া I
ন ব সৃ জ নে র্‌ বি ক শি ত ০ ০

I দা -া ণা | -র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা I র্সা -া -া | -া -া -া I
পূ র্‌ ণ ০ শ০ ত দ ০ ০ ০ ০ ল্‌

I র্সা র্ঋা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -ণা I ণা -পা ণা | দা পা -া I
প রি পূ র্‌ ণ ০ ই ০ ঙ্গি তে র ০

I জ্ঞা -া মপা | -দণা ণদা পমা I জ্ঞরা মজ্ঞা -া | -া -া -ঋসা I
দী প্‌ তি০ ০০ স মু জ্জ্ব০ ০ ০ ০ ০ ০ল্‌

I সা ঋা মা | মা গমা -পদা I পমা পা -া | -া -া -া IIII
দি শা রী আ লো০ ০র্‌ রে০ খা ০ ০ ০ ০

ভক্ত-মাহাত্ম্য

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ত্রেতায় অকালবোধন, দ্বাপরে দুর্গোৎসব, কলিতেও দুর্গোৎসব। দ্বাপর, কলি রামরাজার প্রজা, রাজ-ভক্ত। রাজার অক্ষয় কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিমান হইয়া আমরা শারদীয় দুর্গোৎসব করি। উৎসবে বিপুল আনন্দ সহকারে আমোদ প্রমোদ করি নানা কারণউপকরণে। যথা, দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া, মঙ্গল ঘট বসাইয়া, কলা বৌ সাজাইয়া প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি, চক্ষু দান করি মন্ত্র পড়িয়া। তন্ত্রধারক ও মন্ত্রপাঠক দুই জন ব্রাহ্মণ মিলিয়া পূজা করিয়া ভোগ আরতি দ্বারা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, অতিবাহিত করেন, সেই সঙ্গে নৃত্য গীত উপকরণ প্রধান উপকরণের মধ্যে ভগবান রামচন্দ্রের কীর্ত্তিতে রামায়ণ এবং রাম যাত্রা বাঁধা-ধরা নিয়মে হইত, ব্যতিক্রম হইত না। কিংবদন্তী নহে সত্য, বর্ত্তমানে থিয়েটার ব্যতীত দুর্গোৎসব হইবে না, হইতে পারে না, কারণ কলিতে উৎসব মাত্রই অষ্টবিধ উৎসব। দুর্গোৎসবের পরাংগতি পরিবেশ, পরিবেশন করিতে প্রাণের উৎকণ্ঠা। পুরাকালে বাঙ্গলাদেশে পল্লীগ্রামে জমিদারগণ বাস করিতেন। তাঁহারা দোল দুর্গোৎসব করিতেন আপন বাস্তুভিটায়। বাস্তুভিটাকে উর্ব্বর করে বারো মাসে তেরো পপালার্ব্বণে, এজন্য জমিদারের পুত্র জমিদার হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতেন, শত শত দৈবজ্ঞ ছুটিতেন নবজাতকে আশীর্ব্বাদ করিতে। সেই অবকাশে জাতকের কোষ্ঠী লেখা হইত শত শত।

লেখক এক জমিদার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, সেই জমিদার প্রজাপালন কল্পে নিত্য যজ্ঞ করিতেন, যদ্বারা প্রজাবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। "যদি দুঃখ আসে, সে দুঃখকে আমি সমাদর করিব"—এই হইল জমিদার মহোদয়ের মনোগত ভাব।

মনোমত ভাব-পবিত্র মানসী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং পরম সুখী হইলেন পতিপত্নী উভয়েই পুত্র মুখ দর্শন করিয়া। এই বিশ্ব-বিমোহিত বৃত্তান্তে প্রজাবর্গ জমিদার অপেক্ষাও সুখী এবং এ বৎসর সকল উৎসবই অভিনব।

এক্ষণে দুর্গোৎসব প্রায় উপস্থিত, প্রতিমা গঠন হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে লোক গিয়াছে ভাল যাত্রার সন্ধানে। তিন দিকের তিন জন ভাল যাত্রার সন্ধান দিতে পারিল না, এক দিকের একজন সংবাদ দিল, "ছকু, বকুকে পাইয়াছি, রাম যাত্রায় মহিমান্বিত, ভগবান রামচন্দ্র তাঁহাদের হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠিত; বুক চিরিয়া দেখাইতে পারে না—এই মাত্র তফাৎ।" ছকু, বকু যমজ ভাই, জাতিতে মুসলমান, কিন্তু আহার বিহারে সাধন চতুষ্টয়কে চরিতার্থ করিয়াছে। একাহারী, স্বহস্তে পাক-করতঃ ভগবান রামচন্দ্রকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পান, এমন কি ভগবান রামচন্দ্র দর্শন দিয়া আজ্ঞা করেন, "তোমরা রামযাত্রা কর, রহিম তুষ্ট হইবেন। জানো তো, রাম, রহিম নাম জুদা, কিন্তু আত্মা একার্ণবে ডুব দিয়াছে, অর্থাৎ আত্মা এক, দুই অনাত্মা। এই ছকু, বকু রামযাত্রায় অদ্বিতীয়। তাৎপর্য্য, উহাঁদের কণ্ঠে ভগবান রাম বচনে আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং গাহিতেন, এজন্য ছকু, বকুর রামযাত্রার তুলনা নাই, অতুলনীয়।

জমিদারের চণ্ডী-মণ্ডপে ছকু, বকুর রামযাত্রা হইবে, পুরোহিত মহাশয়ের যখন কর্ণগোচর হইল, তখন আর পুরোহিত রহিলেন না, পুরের অহিতকারী হইলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "তোমার বংশ থাকবে না, যদি মুসলমানের যাত্রা দুর্গোৎসবে হয়। নিশ্চয় আমি অভিশাপ দিব, যাহার ফলে এক মাসের মধ্যে বংশলোপ হবেই।" এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া জমিদার ভীত হইলেন, জমিদার-গৃহিণী পুরোহিত মহাশয়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনি সন্তুষ্ট হউন, এই গ্রহণ করুন প্রণামী, একশত স্বর্ণ মুদ্রা।" তখন পুরোহিতের স্বর কোমল হইল, মৃদু মৃদু বাক্যে বলিল, "দেখ, এক কাজ কর, চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে রামযাত্রার ব্যবস্থা কর, সম্মুখে কিন্তু হবে না"। জমিদার এবং তৎপত্নী, "যে আজ্ঞা" বলিয়া আপন আপন কার্য্যে তৎপর হইলেন।

এদিকে পুরোহিতের গর্ব্ব চূড়ান্ত পর্য্যায়ে উঠিল, প্যাঁচ কসিতে কসিতে বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাক দিল, এক ডাকে সাড়া পাওয়া গেল না, তখন হাঁক দিল, তথাপি ব্রাহ্মণীর সাড়া শব্দ না পাইয়া, ব্রাহ্মণ ৺চণ্ডী-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য নহে, যাঁহাদের ভগবানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ভগবতী তাঁহাদের মাতা। মাতা-পুত্রীর কথোপকথন হইতেছে, ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইল দূর হইতে দুইটি রমণীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু নিকটে যাইবামাত্র ৺ভগবতী চণ্ডিকা দেবী অন্তর্দ্ধান, অথচ ৺চণ্ডীমূর্ত্তি তখনো দুলিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষণিকের মত চেতন হারাইল বটে, পরক্ষণে চেতনা পাইয়া বলিল, "আমার চক্ষু ক্লান্ত হইয়াছে, বয়স বৃদ্ধিতে কর্ণেও শুনিতে পাই না" এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া, গর্ব্বের মহিমায় দুনিয়াকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ব্রাহ্মণীকে সবিস্তারে সকল কথা বলিল। ব্রাহ্মণী নয় দিন উপবাসী থাকিয়া, মৌন হইয়া ভগবতী চণ্ডীদেবীর আরাধনা করেন, কেবল স্বামীর বাক্য শুনিলেন এবং কাঁদিলেন। ব্রাহ্মণীর কান্না, মায়া-কান্না বলিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মা চণ্ডীর ধ্যানে সকল দুঃখ কষ্ট, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া গেলেন। আনন্দ, আনন্দ, কেবল আনন্দ।

এদিকে যাত্রার একদিন পূর্ব্বে ছকু, বকু জমিদার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার মহোদয় উহাদের আগমন পথ চাহিয়া

গিয়াছিলেন, আসিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া ভদ্রোচিত সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দর্শন মাত্রই মুহুর্মুহু শিহরণ, মনে হয় সনাতন সংস্কৃতি ধমনীতে নিদ্রিত ছিল, ছকু, বকুকে দেখিবামাত্র জাগ্রত হইল। ছকু বকুও জমিদার মহোদয়কে অপলক নেত্রে আপাদ-মস্তক দেখিতে লাগিলেন এবং ক্ষণিকের মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জমিদার মহোদয় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা আপন কক্ষে প্রবেশ করিলে জমিদার মহোদয় নিজের বিস্ময়কর অবস্থার কথা চিন্তা করিতে করিতে টলিতে টলিতে অন্দর মহলে আসিয়া পত্নীকে যথাযথ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন এবং স্থির করিলেন—অদ্য নিশা-যোগে ছকু, বকুর কার্য্যকলাপ দেখিতে হইবে তদনুসারে গভীর রাত্রে পতিপত্নী উভয়েই অতি গোপনে ছকু, বকুর নির্দ্দিষ্ট কক্ষের বিপরীত দ্বার অর্গল মুক্ত করিয়া কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা অতীব বিস্ময়-জনক। ছকু, বকু কালী-পূজা করিতেছেন। অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত কালী দীর্ঘে বিঘৎ প্রমাণ, সর্ব্বদাই বাক্স মধ্যে বহনযোগ্য। ছকু, বকুর কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে গাঢ় রক্তচন্দন, পুষ্পপাত্রে রাশি রাশি রক্তজবা ও বিল্বদল। ছকু, বকু পূজার মাহাত্ম্যে বাহ্যচেতনা হারাইয়া ধ্যান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে জমিদার এবং তৎপত্নী উপবিষ্ট হইয়া পূজা দেখিতে লাগিলেন। ছকু, বকুর যখন বহির্চেতনা ফিরিয়া আসে তখন "মা, মা, কালী, ব্রহ্মময়ী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করেন এবং পুনরায় ধ্যানমগ্ন হন। সহসা তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "মাগো, তুই কোথায় নিয়ে এলি, জমিদারের নাম জানিলে এখানে আসিতাম না, এখন রক্ষা করিস্ মা, আমরা শরণাপন্ন, তোর চরণে সব সমর্পণ করিলাম।" তন্মুহূর্ত্তে জমিদার এবং তৎপত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমরাও আপনাদের শরণাপন্ন, আপনাদের চরণে সব সমর্পণ করিলাম, আমরা অদীক্ষিত।" অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া ছকু, বকু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই অবকাশে জমিদার এবং তৎপত্নী দুইজনে দুই-জনের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া মায়ের চরণামৃত মুখে দিতে লাগিলেন এবং কর্ণে শুনাইতে লাগিলেন, 'মা, মা, কালী, ব্রহ্মময়ী'। এই মহামন্ত্র শুনিতে শুনিতে ছকু, বকু উভয়েই বলিলেন "তোমরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে উহাই তোমাদের দীক্ষামন্ত্র।" এই বলিয়া দুইজনে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং নয়নে উঁহাদের কি কথা হইল উঁহারাই জানেন, বস্তুতঃ চারিজনেরই প্রসন্ন আনন। ছকু, বকুর ইঙ্গিতে জমিদার এবং তৎপত্নী যেমন গোপনে আসিয়াছিলেন তেমন গোপনেই চলিয়া গেলেন।

অদ্য যাত্রা আরম্ভ হইবে, অধিক বিলম্ব নাই। ছকু, বকুর রাম যাত্রা এই দেশে এই প্রথম। দশ হাজার শ্রোতা, একটি মশা মাছির শব্দ নাই, সর্ব্বত্র উন্মুখ স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। অকস্মাৎ মড় মড় শব্দ শুনিয়া জনলোক ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিল। সকলে দেখিল প্রতিমা ঘুরিয়াছে পিছন দিকে, যেদিকে রাম যাত্রা হইতেছিল। শ্রোতৃবর্গ এক্ষণে দর্শক হইয়া ধন্য, তাঁহাদের নির্ব্বাণ কৈলাসে।

এদিকে পুরোহিত এবং তৎপত্নী প্রতিষ্ঠিত ৺চণ্ডী দেবীর ধ্যানে বসিল। ব্রাহ্মণ-পত্নী ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধ্যানে মন বসে না। ধ্যানমগ্না ব্রাহ্মণী দেখিতেছেন—চণ্ডী আর কেহ নহেন তিনিই। তাঁহার বাম হস্তে ত্রিশূল, সিংহবাহন, অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের বুকে ত্রিশূল আঘাত করিয়া বলিলেন, "রে দুষ্ট, মহাপাতক ব্রাহ্মণ, তুই ভক্তের অবমাননা করিয়াছিস্, ছকু, বকু আমার পরম ভক্ত, তোর নিজ-কৃত কর্ম্মফল অনুসারে কসাই হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণের বক্ষে অজস্র ধারায় রক্তের প্লাবন, পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সময় ব্রাহ্মণ বিকট শব্দ করিল। প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমাতা আমাদের ব্রাহ্মণ মাতাকে আকর্ষণ করিয়া আপনাতে লীন করিলেন এবং অট্টহাসি হাসিলেন।

এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে জমিদার বাটীতে পৌছিল, কিন্তু রামযাত্রার মহিমায় জমিদার বাটি এখন মর্ত্ত্যের অযোধ্যা এবং বিষ্ণুলোকে গোলক। কাজেই পুরোহিতের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সংবাদ কাহারও কর্ণ গোচর হইল না। আহা, ভক্তির কি অদ্ভুত শক্তি এবং ভক্তের কি অলৌকিক মাহাত্ম্য, কাহারও বহির্চেতন ছিল না, সকলেই অন্তর্চেতনায় ভরপুর। নিয়মিত নিয়মে রাম যাত্রা শেষ হইল, বহুক্ষণ শ্রোতৃবর্গ যে যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানেই ধ্যানস্থ হইয়া রাত্রি শেষ করিলেন।

ইতিমধ্যে ৺চণ্ডীমন্দিরে বিকট শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণের প্রতিবেশিগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-পত্নীর শবদেহ দেখিতে পাইলেন। বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা শবদেহ সৎ-কারে উদ্যোগী হইলেন। প্রভাতে শবদাহ শেষে শবযাত্রিগণ যখন ফিরিয়াছেন তখন জমিদার মহোদয়ের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসায় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই পুরোহিতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত অপুত্রক ছিলেন, কাজেই পুরোহিতের যাবতীয় সম্পত্তি চণ্ডী-মাতার সেবায় লিখিত ভাবে অর্পণ করিয়া জমিদার মহোদয় স্বয়ং পূজার তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিলেন।

সে বৎসর আর রামযাত্রা হইল না, ছকু, বকু এক বৎসর মৌন ব্রত অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন। সকলের কি আনন্দ, এক বৎসর ব্যাপী আনন্দ। ছকু, বকু এক বৎসর পরে জমিদার মহোদয়ের বাটীতে পদার্পণ করিবেন।

আমরা কি সে আনন্দের ছিটে কোঁটাও পাই? বাজার দেনা, গহনার দেনা, বেনারসী সাড়ীর দেনা, ছেলে মেয়ের কাপড়, জামা, জুতার দেনা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু দেনার অধীশ্বর হইয়া লেকচার দিতে আরম্ভ করি, সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? এ সকল বাহিরের বৃত্তান্ত, গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে মুহুর্মুহু হৃদ্‌কম্প, কে জানে গৃহিণীর মতি গতি আজ কেমন? 'সারাদিন লেকচার দিয়াছি, পাওনাদারের ভয়ে বাটীতে প্রবেশ করিতে পারি নাই, আমি বাটীতে না থাকায় গৃহিণীকে সমস্ত পাওনাদারদিগকে স্তুতি মিনতি করিয়া বিদায় দিতে হইয়াছে, অতএব গৃহিণীর অপরাধই বা কি? অবশ্য বারোয়ারীর মাতব্বর হইয়া থিয়েটার ইত্যাদির চাঁদা আমাকেই বেশী দিতে হইয়াছে, টাকার যোগাড় হইয়াছে অফিস হইতে কর্জ্জ সূত্রে। প্রতি মাসের বেতন হইতে উক্ত ঋণ বাবদ যখন টাকা উশুল হইতে থাকিবে, তখনকার

অবস্থা ভাবিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হই, আবার সংসারের মায়া বাঁধিয়া মারে। কলিযুগের দুর্গোৎসবে থিয়েটার অবশ্যই চাই, নতুবা মহোৎসব হইবেই না। ধন্য যুগধর্ম্ম, আমার মত দুরবস্থা লক্ষ লক্ষ লোকের। এই দেখুন না আমারই দাদা, তাঁহার দুইটি কন্যা চাকরী করে, পুত্র এবং পুত্রবধূ সিনেমার নায়ক নায়িকা, যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, এতদ্ব্যতীত দাদা নিজে বেশ বড় অঙ্কের পেনসন পান, তথাপি আমা অপেক্ষাও তাঁহার দুরবস্থা, এ যুগটাই যেন কেমনতর।

দ্বাপরে জমিদারগণ দুর্গোৎসবে নব রাত্রি আখ্যা দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা প্রতিমার নিকট নয় দিন রামযাত্রা কিম্বা রামায়ণ পাঠ বসাইতেন। প্রতিবেশী এবং প্রজাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা জমিদার বাটিতে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন প্রসাদ পাইতেন এবং দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সিদ্ধি প্রসাদ গ্রহণ করতঃ আলিঙ্গনে বিজয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়া বাটী ফিরিতেন। প্রাচীন কালে জমিদারদের জমিদারীর যাবতীয় আয় কোষাগারে কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা থাকিত। উক্ত আয় বাবদ সঞ্চিত ধন প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হইত, তন্মধ্যে দুর্গোৎসব প্রধান। এজন্য দুর্গোৎসব কালে প্রজাবর্গের এবং প্রতিবেশীদিগের সমস্ত ব্যয় ভার জমিদার গ্রহণ করিতেন, কাজেই উঁহাদের বাজার দেনা সাজা পাইতে হইত না, সকলেই পুনরায় বৎসরান্তে দুর্গোৎসবের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেন। অতএব বলা বাহুল্য, দ্বাপরের প্রজাবর্গ সারা বৎসরই দুর্গোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেন। কলিতে জড়-বিজ্ঞান, চৈতন্য-বিজ্ঞানের ধার ধারে না, যদি কেহ জড় বিজ্ঞান এবং চৈতন্য বিজ্ঞান সমন্বয় সুধা পান করেন, তিনি মহাপুরুষ আখ্যায় বিশ্ব বিমোহিত করেন। ঐ দেখুন, ছকু, বকু জড়-বিজ্ঞান এবং চৈতন্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সুধা পান করিয়া আত্মবরেণ্য, একম্ সত্যম্ অনুপমম্।

সূক্তি দশক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

মহামানবেরা চপলার মত নয়ন ধাঁধিয়া চলিয়া যায়,
রেখে যায় শুধু গুরু গম্ভীর বাণী।
নিদ্রামগ্ন দিগ্ দিগন্ত যুগযুগান্ত জাগিয়া তায়
অসীম তৃষায় উর্দ্ধে বাড়ায় পাণি।

(২)

একটি কণাও শিশিরের বারি ব্যর্থ নয়,
তারা—কিছু না পারুক ফুটায় কুসুম কলি।
তুচ্ছ হউক তৃণ—পুষ্পও ব্যর্থ নয়,
ভরে—যতটুকু, হোক সৃষ্টির অঞ্জলি।

(৩)

ধার্ম্মিক নয় সেই সকলের চেয়ে
ধর্ম্ম ধর্ম্ম চীৎকার করে যেবা,
মন্দির চূড়ে বসি ডাকে সারাদিন
পুণ্য পক্ষী কাকেরে বলেছে কেবা?

(৪)

পৃথিবীর অশ্রুকণা রূপ ধরে মাণিক্য রতনে,
অন্তর্গূঢ় দুঃখ তার রূপ ধরে তাম্র লৌহ হেমে,
আনন্দ তাহার জাগে ফল পুষ্পে তৃণশস্য ধনে,
সমস্ত শ্যামাঙ্গ তার রোমাঞ্চিয়া করুণা ও প্রেমে।

(৫)

বনে ফুটে ফুল আপনিই ঝরে এই তার শেষ গতি,
এ নয় মৃত্যু ইহাই তাহার জীবনের পরিণতি।
ছিঁড়িয়া সবলে দেব-মানবের ভোগে যদি দাও স্থান,
তাহাই মৃত্যু, তাহাই হত্যা, তাই তার বলিদান।

(৬)

চাহিবে না কৈফেয়ৎ মৌনী রও, হও যদি
কথায় বখিল।
কথা যদি কও তবে চাহিবেই যুক্তি সবে
চাহিবে দলিল।

(৭)

শাসন করিবে যদি কর হয়ে অনুদ্ধত
তাহাতেও লাগিবে বিনয়
নতুবা হারাবে মান ব্যর্থ হয় তিরস্কার
যদি তা-না হয় স্নেহময়।

(৮)

মাধুরী হইয়া যাহা জাগে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে
আবেশ হইয়া তাহা চায় রূপ কবিদের চিতে।
আবেগ হইয়া তাই রূপ পায় বর্ণে ছন্দে গানে।
আনন্দ হইয়া তাই উচ্ছলিত নিখিলের প্রাণে।

(৯)

সাহিত্য ব্যথার সৃষ্টি, করে চিত্তে আকুল উদাস
আচ্ছন্ন করে তা মেঘে সুনির্ম্মল চিত্তের আকাশ।
দুঃখ যাতে বেড়ে যায় দুঃখী জন কি করিবে তায়?
সাহিত্য সুখীরই জন্য এর মাঝে বৈচিত্র্য সে পায়।
সুখের প্রাচুর্য্য যার সেই কিছু করিয়া বর্জ্জন
সাহিত্যে করিতে পারে বেদনার মাধুর্য্য অর্জ্জন।

(১০)

অনিষ্ট করার শক্তি যত পার করিবে অর্জ্জন
অনিষ্ট করোনা কারো, মাঝে মাঝে করিও গর্জ্জন।
কর বা না কর ইষ্ট, বশীভূত হবে সব লোক
মানিবে সকলে তোমা ভয়ে হোক ভরসায় হোক।
ইষ্ট যদি কর কারো—দুইদিনে যাবে সেত ভুলে,
পাছে ক্ষতি কর ভয়ে চিরদিন র'বে পদমূলে।

দ্বীপান্তরে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এবার আন্দামান-প্রবাসী বাঙালী ভাইবোনেরা বাঙালাদেশের সাহিত্যসেবীগণকে তাঁদের ওই দ্বীপান্তর-তীর্থে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করলেন তাঁরা ওঁদের ওই ঐতিহাসিক দ্বীপটিতে। ওই সাগর-মেখলা বনরাজী-নীলা গিরিদরিপরিবেষ্টিত দ্বীপটি যে এত অপূর্ব সুন্দর তা কে জানতো? ইংরেজ শাসনের আমলে হিংস্র খুনী আসামী আর অমার্জনীয় গুরু অপরাধে দোষী সাব্যস্ত যত দুরন্ত নরনারীদের দীর্ঘকাল ধ'রে কালাপানি পার করে এই দ্বীপপুঞ্জেও চালান দেওয়া হ'ত। কাজেই বঙ্গোপসাগর বক্ষের এই আন্দামান দ্বীপ ছিল ভারতবাসীদের কাছে নির্বাসিতগণের এক আতঙ্কময় পুরি!

কিন্তু, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ যখন দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবী বাঙালী যুবকদের এই দ্বীপে যাবজ্জীবন নির্বাসন দিতে শুরু করলেন, আন্দামান হয়ে উঠলো দেশভক্ত বাঙালীদের কাছে এক পরম তীর্থ স্বরূপ। বিশেষ করে আদর্শ বাঙালী বীর-নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যপদস্পর্শে পবিত্র হ'য়ে ওঠা এই দ্বীপের বুকে যেদিন তিনি স্বাধীন ভারতের জয়-পতাকা প্রথম প্রোথিত করলেন, আন্দামান হ'য়ে উঠলো ভারতের এক গৌরবময় পুণ্যপীঠ, বাঙালীর মুক্তি সাধনার তীর্থক্ষেত্র। কবিরা সেদিন এর স্তবগান রচনা করলেন:

> আন্দামান! আন্দামান!
> বক্ষে তোমার উদীয়মান
> নব জীবনের দীপ্ত তপন,
> জাগালো সুপ্তিমগ্ন প্রাণ
> তোমার হস্তে কৌমী নিশান
> নেতাজী সুভাষ করিল দান,
> আন্দামান! আন্দামান!
>
> (ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্তের 'মন্দিরের চাবী')

আন্দামানের ডাকে তাই আমরা সাহিত্যসেবীর দল



আন্দামান জাহাজের 'আপার ডেকে' সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিগণ

ফটো: কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী



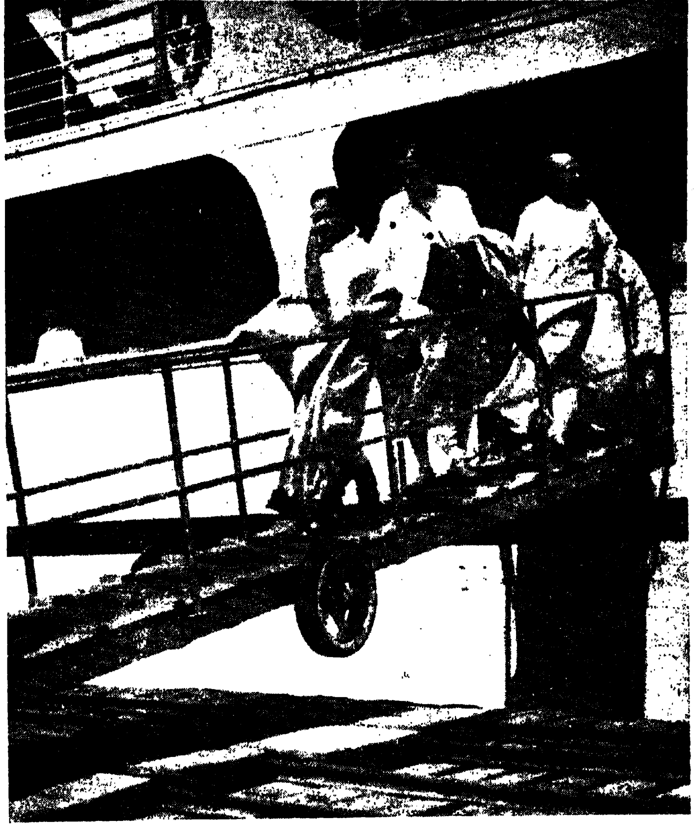
সমুদ্রতীরে 'চ্যাথমি বন্দর' দেখা যাচ্ছে। জাহাজ বন্দরের দিকে চলেছে

ফটো : কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী

সানন্দে সাড়া দিলুম। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সুযোগ্য সহ-সভাপতি শ্রীসুরেন নিয়োগীর সুব্যবস্থায় প্রায় ষাটজন প্রতিনিধি চলে এলেন বাংলা দেশ থেকে আন্দামান। খিদিরপুর পোতাশ্রয় থেকে ১৪ই নভেম্বর জাহাজ ছাড়লো। তখন সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। বেলা পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হবে। জাহাজের নামও "এম-ভি-আন্দামান"। চাররাত্রি চারদিন জাহাজেই কাটলো। সারারাত ভাগীরথীবক্ষে ভেসে ভেসে মাঝরাত্রে সাগরে এসে পৌছলো আমাদের জাহাজ। ভোরে উঠে কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে দেখি জল জল। চারিদিকে জল! দৃষ্টিসীমার পরিধি পর্যন্ত দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি! যেন এর শেষ নেই! এই সাগর জলে ভাসতে ভাসতে ১৮ই নভেম্বর পূর্বাহ্নে আমরা যখন প্রথম সবুজ ডাঙা দিকচক্র-রেখার একদিকে দেখতে পেলুম, কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো উল্লাসে সকলে চিৎকার করে উঠলেন। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই প্রথম সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা! যাক্ শেষ পর্যন্ত সকলে নিরাপদে সুস্থ দেহে আন্দামানে এসে পৌছলাম? সমুদ্র এত শান্ত ছিল যে আমাদের মধ্যে অনেকেই হতাশ হয়ে বলতে লাগলেন, আরে! এযেন পুকুরে ভেসে এলুম। এর নাম কি সমুদ্র? রামঃ চন্দ্র!

সমুদ্র শান্ত থাকলেও বঙ্গোপসাগরের গভীর অনন্ত-বিস্তৃত ঘন নীল জলরাশিকে ঠিক 'কালাপানি' বলেই মনে হয় বটে! কিন্তু, যদি কেউ ধৈর্য্য ধরে বঙ্গোপসাগরের এই দিগন্ত প্রসারিত জলরাশির দিকে প্রতিদিন লক্ষ্য রেখে এসে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন সাগর জল প্রায়ই মাঝে মাঝে তার রং ও রূপ বদলাচ্ছে। কখনো ঘন নীল, কখনো ফিকে সবুজ, কখনো মেটে রং, কখনো বা ধূসর বর্ণ। মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার সঙ্গে সমুদ্রের রূপ ক্ষণে ক্ষণে ছায়া আলোয় বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। আবার অবিরাম ধারা-বর্ষণের মধ্যে তার আর এক অভিনব অতিবড় রূপ। ছোটবড় ঢেউগুলি কতরকমের কারিকুরি করে যেন জলে আলপনা এঁকে চলেছে।

রৌদ্র ঝলমল প্রভাতে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ জাহাজের ঢেউ খেয়ে ভয় পেয়ে দল বেঁধে দূরে উড়ে গিয়ে পড়ছে—শুভ্রোজ্জ্বল অরুণ আলোয় তাদের খণ্ড খণ্ড-রূপালী তনুগুলি ক্ষণ-চপলার ক্ষণিক চমকের মতো ঝিকমিক ক'রে উঠছে! মনে হয় যেন আকাশের গুচ্ছ গুচ্ছ শুকতারা দল বেঁধে নেমে এসে সমুদ্রের বুকে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সামুদ্রিক জীব কেউ কেউ জলের উপর ঘাই মেরে উঠে তলিয়ে যায়। কেউ দেখে সেটি হাঙ্গর, কেউ



জাহাজ থেকে প্রতিনিধিদের আন্দামান দ্বীপে অবতরণ

ফটো : কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী

দেখে সেটি 'শার্ক' কেউ বা দেখে শুধু এক 'শুশুক' মাত্র!

ঢেউয়ের পরে ঢেউ চলেছে। ছোট বড় মাঝারি। তরঙ্গ মৃদু মন্থর হ'লেও তার গতির মধ্যে নৃত্যভঙ্গী আছে। ফুলের মতো ফেনপুঞ্জ সারাটা সাগর বুকে অবিশ্রান্ত ফুলঝুরি কেটে চলেছে। কখনো কখনো মনে হয় সাগর যেন আমাদের আকুলতা দেখে হেসে ফেলছে! ওতো, সাগর তরঙ্গের ফেনা নয়, ও যেন সাগরিকার দন্তরুচি কৌমুদী! আমাদের মনের সকল তিমির ঘোর হরণ করছে।

জাহাজ থেকে এইবার নামতে হবে। সমুদ্র যদিও ফুরোয়নি, সমুদ্র যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে এল। জাহাজ ভিড়লো এসে আন্দামান দ্বীপের 'চাথাম' বন্দরে। যাত্রীরা সকলেই তখন তীরস্থ হবার জন্ত ব্যস্ত। নীচের ডেক উপরের ডেক দুই বারান্দার বেড়ার ধারে ঝুঁকে পড়েছে সবাই একদিকে। গ্যাংওয়েটা জেটিতে একবার লাগলে হয়! কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি নয়, কে আগে নেমে গিয়ে প্রথম এই দ্বীপের তীর্থ ভূমির পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শে পুলকিত ও গর্বিত হবে, তারই জন্ত সকলের সাগ্রহ ব্যাকুলতা!

বাংলাদেশ থেকে সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রেমিক শিল্পী ও সাংবাদিক এবং এর কোনও শ্রেণীর মধ্যেই পড়েন না এমন অনধিকারী অনেকেও আন্দামান বেড়িয়ে আসবার লোভে নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। কাজেই, সংখ্যা তাঁদের প্রায় ষাটের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। বয়সও তাঁদের অনেকের কাট পেরিয়েছে, তবে সংখ্যায় তাঁরা বেশি নন। তরুণ তরুণীরাই

দলে ভারী ছিলেন। কাজেই চারদিন চাররাত্রি সাগর বুকে জাহাজের উপর কেটেছিল আমাদের খুব আনন্দে। সহযাত্রী দু'জন সৌখীন আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীকিশোর চট্টোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায় হরদম ছবি তুলছিলেন। আমাদের সহযাত্রিণী দু' একটি মেয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারতেন মন্দ নয়। তাঁদের কলকণ্ঠে প্রীত হয়—অথবা ভীত হয়ে—জানি না, সাগর যেন শান্ত হ'য়ে শুনতো সে গান। আমরাও শুনতুম। চলতো, কাব্যপাঠ, আবৃত্তি, খোসগল্প, বক্তৃতা, হাসি-তামাসার অনেক রগড়। জাহাজবাস তাই মধুময় হয়েছিল। অংশ্য সকলের পক্ষে নয়। অনেকেরই অনভ্যাসের ফলে জাহাজে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। তবে সর্বংসহা বসুন্ধরার মতো তাঁরা সে সবই সয়ে নিয়ে বিষপানে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ভোজনে শয়নে বিচরণে তাঁদের যে বিঘ্ন হয়েছিল তা গ্রাহ্য করেন নি।

১৮ই নভেম্বরের একটি স্মরণীয় পূর্বাহ্ণ। সঘন জয়ধ্বনি, শঙ্খনাদ ও অসংখ্য আনন্দ করতালির সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিরা একে একে জাহাজ থেকে বন্দরে অবতরণ করতে শুরু করলেন। আন্দামানের 'চ্যাথাম' বন্দর সেদিন সকালে একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। আন্দামান দ্বীপের বাঙালী, অবাঙালী সকল শ্রেণীর নরনারীরা প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সকাল থেকেই জাহাজঘাটে ভীড় করছিলেন। আন্দামানবাসীর ও 'অতুল স্মৃতি সমিতি'র পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী স্মৃতিকণা শাণ্ডেল সদস্যগণের সঙ্গে বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সহকর্মীরা সকলে ব্যস্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে করে বন্দরের বাইরে নিয়ে এলেন। এই দলের মধ্যে আমাদের একটি পুরাতন বন্ধুর হাসিমুখ দেখতে পেলুম। তিনি হলেন কলিকাতা পুলিশের 'রকৃবাজ' ডেপুটি-কমিশনার রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এই ভূতপর্ব আসামী-উপনিবেশে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এখন একেবারে তথায় প্রবেশ করেছেন। এখানে তিনি নানা বড় বড় সংকল্পের লোভনীয় পরিকল্পনা মুদ্রিত করে এনে আমাদের দেখাতেন এবং আন্দামানে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন। আমরাও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতুম, নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু, তাঁর দিক থেকে এ ব্যাপারে আর বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় না পাওয়ায় আমাদেরও আন্দামানে যাবার তেমন কিছু চাড় হয়নি। 'এবার কিন্তু সেই প্রভু জগন্নাথদেব বা বাবাবিশ্বনাথ টানবার মতো আন্দামান আমাদের সাহিত্যের টোপ-আঁটা বঁড়শীতে গিঁথে অতি সহজেই টেনে নিয়ে এলো।

শুনেছিলুম এখানকার বাঙালী অধিবাসীরা সকলেই সমাগত প্রতিনিধিদের কিছু কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে সামর্থ্য অনুসারে ভাগাভাগি করে নিয়ে স্ব স্ব গৃহে অতিথি-রূপে স্থান দেবেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তা হয়নি। মাত্র চারজন প্রতিনিধিকে স্টেট ব্যাঙ্কের আন্দামান শাখার শাখাপতি শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র গুপ্ত তার গৃহে নিয়ে গেলেন। ইনি এই সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে অন্যতম। বাকী ছাপ্পান্ন জনকে শ্রীমতী স্মৃতিকণা ও শ্রীযুক্ত মিহির শাণ্ডেল এবং তাঁদের নিকটতম প্রতিবেশী সরকারী ট্রেজারির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সাধন রাহা মহাশয় তাঁদের নিজেদের পাশাপাশি দুই প্রশস্ত দ্বিতল সৌধে নিয়ে গিয়ে স্থান দিলেন। সুতরাং সাহিত্য সম্মেলনের সকল প্রতিনিধি-রাই প্রায় একত্রেই রইলেন। কেবলমাত্র চারটি মানুষের জন্য ভিন্ন গোয়াল হ'ল কেন—এর উত্তরে শোনা গেল ওঁরা গুপ্তভায়ারপরিচিত বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে ওঁদের ওঁর ওখানেই স্থান হয়েছে। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর নাকি ওঁর ঘরেই ওঠবার কথা ছিল। কারণ আমরাও ওঁর বিশেষ পরিচিত। কিন্তু, নির্বাচিত সভাপতির দলকে একত্র রাখবার সংকল্প হওয়ায় আমাদের আর নৃসিংহ-বধের সুযোগ হল না।

আমরা সংখ্যা-গুরুর দল যাঁদের বসত বাড়ী দুখানি দখল করলুম—সেই শাণ্ডেল দম্পতি ও কৌমারব্রতী শ্রীসাধন রাহার সঙ্গে আমাদের কোনও পূর্ব পরিচয় ছিল না। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই এঁদের সঙ্গে আমাদের এমন এক নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠলো যেন আমরা ওঁদের বহুদিনের পরিচিত আপনজন। এটা সম্ভব হয়েছিল আমাদের নিজেদের কোনও গুণের জন্য নয়, তাঁদেরই উদার হৃদয়ের অকৃপণ আতিথেয়তার গুণে। সাধন ভায়া তো তাঁর বাড়ীখানি সম্পূর্ণ নির্ব্যূঢ় সত্বে প্রতিনিধিবৃন্দের বসবাসের জন্য ছেড়ে দিয়ে শাণ্ডেল দম্পতির বাড়ীর

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শেষ দিনের অধিবেশনে

ফটো : কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী



বারান্দায় এসে আশ্রয় নিলেন। শাণ্ডেল ভবনের দ্বিতলের একখানি ঘর মহিলা প্রতিনিধিরা দখল করলেন। তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। প্রায় 'নব নারী কুঞ্জর' আমাদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। আর একখানি ঘর দখল করলেন কাজী ওদুদ সাহেব, শৈলজানন্দ ভায়া, আর আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীজ্ঞান সরকার। আর একখানি দখল করলুম আমরা দুই দেব-দেবী। আর একখানি ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে রইলেন শাণ্ডেল পরিবার, অর্থাৎ ওঁরা চারজন। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র স্বস্তিক ও কন্যা গৌরীমা। মাঝের প্রশস্ত হলঘরটির একদিক অধিকার করলেন 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীমান মহেন্দ্র চক্রবর্তী ও আশ্রয় ভায়া। এই হলঘরের আর একদিকে আমাদের প্রভাতী চা, বাল্যভোগ, মধ্যাহ্ন ভোজন, বৈকালিক জলযোগ ও সায়মাস চলতো সুবৃহৎ ডাইনিং টেবিল খানি ঘিরে বসে। নানা হাসি গল্পের মধ্যে। এই হলঘরের প্রান্তসীমায় যে অপরিসর বারান্দাটি ছিল, প্রতিনিধিগণের দ্বারা বিতাড়িত বাস্তহারা শ্রীমান সাধন ভায়া তাঁদের সকলকে খাইয়ে দাইয়ে পরিতৃপ্ত ক'রে নানা সরস গল্প কথায় আনন্দ দিয়ে প্রায় মধ্যরাত্রে এসে একটু গড়িয়ে নিতেন।

ওদিকে একতলার একখানি বড় ঘর সম্মেলনের সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক এবং স্বামী অসীমানন্দ ও কুমারেশ খ্যাত শ্রীরাধারমণ, এঁদের সঙ্গে শূলপানি শম্ভুও ছিলেন। সর্বদা এঁর হাতে একগাছি লাঠি থাকে। ইনিও সাহিত্য যজ্ঞের হোতা শ্রীসুরেন নিয়োগীর একজন সহকারী ঋত্বিক—এঁরাই সদলে দখল করে ছিলেন। উপরের হলঘরের ঠিক নীচের লম্বা টানা ঘরটি প্রতিনিধি-বৃন্দের ভোজন স্থান রূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাশের আর একটি লম্বা ঘরে ছিল আমাদের আশ্রয়দাতা শ্রীমিহির শাণ্ডেলের সখের মিউজিয়ম। এখানে ছিল তাঁর পনেরো ষোল বৎসরে সংগৃহীত ও সঞ্চিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নানা বস্তু, মানচিত্র, নক্সা, শিল্পকলা ও আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত বিবিধ তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, কৌপীন, লাঙ্গুল এবং পাশাপাশি একাধিক দ্বীপবাসি আদিম নর-নারীদের নানা আলোক চিত্র। এছাড়া, রত্নাকর সাগরগর্ভের নানা বিচিত্র



আন্দামানের নিবিড় নারিকেল কুঞ্জ

ফটো : কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী

কড়ি, শামুক, গেঁড়ি, শঙ্খ, প্রবাল প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত শাণ্ডেলের এই সংগ্রহশালাটি মনোনিবেশ সহ দেখলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সর্বাত্মক জ্ঞান লাভ করতে পারা যায়। মিউজিয়ামটি দেখে আমরা তাই খুব উপকৃত হয়েছি। মিহির ভায়াকে ধন্যবাদ জানাই।

এই শাণ্ডেল-যুগলের গৃহে সপ্তাহকাল একত্র বাসের ফলে এদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশার সুযোগ হয়েছিল তাতে এঁদের দুজনের শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও রুচিবান মনের এবং সৎ মানবোচিত নানা গুণের সংস্পর্শে এসে এই আদর্শ দম্পতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরেছি।

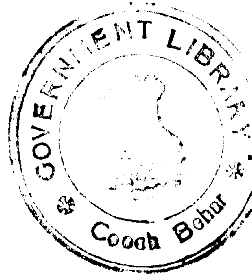
কত অজানারে জানাইলে তুমি কতঘরে দিলে ঠাঁই।

শ্রীযুক্ত মিহির শাণ্ডেলের সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এখনও এমন সুচরিত্র, বিনয়ী, উদারহৃদয় ভদ্র বাঙালী আছে জেনে স্বাজাত্য গৌরবে গর্ববোধ করছি। মিহির ভায়া সত্যই নানা গুণালঙ্কৃত মানুষ। সৎ সাহিত্যের ইনি গভীর অনুরাগী। এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত রয়েছে দেখলুম। হৃদয় মনে ধনী এই মানুষটিকে ভগবান দীর্ঘায়ু করুন।

প্রথমেই বলি-জাহাজ থেকে চ্যাথাম বন্দরে নেমে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীর আয়োজিত মোটরে ও বাসে আমরা যখন পোর্টব্লেয়ার নগরে প্রবেশ করলুম শহরটি দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। পাহাড়ের বুক চিরে চলেছে পরিচ্ছন্ন পাথুরে পথ, কোথাও উঁচু-নীচু, কখন ঢালু, কখন খাড়াই! দুপাশে বাগান বাগিচায় ঘেরা সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ীগুলি সব যেন ছবির মতো দেখতে। সাগর জল ঘুরে ফিরে অনেকেরই উদ্যানবাটী স্পর্শ করে চলেছে। দূরে দূরে মেঘবর্ণ ছোটবড় পাহাড়-চূড়া উঁকি দিচ্ছে। অগণিত নারিকেল গুবাক ও তাল তমাল কুঞ্জ চারিদিক থেকে শহরটাকে যেন উৎসববেশে সাজিয়ে রেখেছে। যেতে যেতে আমাদের কেবলই মনে হচ্ছিল যেন সুদূর সাগর পারের কোনো কন্টিনেন্টের প্রাকৃতিক শ্রীমণ্ডিত দ্বীপভূমিতে পদার্পণ করেছি। সমস্ত মনটি আনন্দের আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল।

শাণ্ডেল ভবনে যখন আমাদের মোটর এসে প্রবেশ করলো, মনে হল আমরা যেন কোন এক অলকাপুরীতে এসে পৌঁছে গেছি। তোরণ দ্বার থেকেই শুরু হয়েছে বিবিধ তরুলতা ফুলফল ও পাতা-বাহারী গাছের সুবিন্যস্ত সারি। মধ্যে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ল্যন। ল্যনের মধ্যে গার্ডেন চেয়ার ও সেণ্টার টেবিল চক্রাকারে সাজানো। গাড়ীবারান্দার সামনে এসে আমরা মোটরথেকে নেমেই দেখি সামনে টেবল-টেনিসের বিশাল একখানি টেবিল পাতা। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে দেখা গেল বাড়ীখানির আপাদমস্তক সৌখীন শিল্প-সামগ্রী ও বিবিধ সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সাজানো। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো এই একথাটি বুঝে যে আমরা এখানে একজন আধুনিক রুচি সম্পন্ন এযুগের প্রগতিশীল মানুষের গৃহে আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এখানে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। অসংকোচে বলতে পারি আজ, আমরা এখানে এসে আশার অতীত যত্ন-আদরে দিন যাপন করেছি। আমাদের প্রবাস-বাসকে নানাভাবে মধুময় ও উপভোগ্য করে তুলেছিলেন এঁরা আমাদের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে। তাই প্রারম্ভেই এই আদর্শ শাণ্ডেল-দম্পতি ও চিরকুমার সাধন রাহা মহাশয়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করে রাখলুম। আর কন্যাদায়গ্রস্তদের জানিয়ে রাখলুম শ্রীমান একটি রূপবান গুণবান ধনবান ও সুপাত্র। বয়স তিরিশের মধ্যেই।

বহু শহীদের আত্মদানে তীর্থে রূপান্তরিত আন্দামান দ্বীপের পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করলুম আমরা ১৮ই নভেম্বর পূর্বাহ্নে। শাণ্ডেল ভবনে গিয়ে ওঠবার পরই গৃহকর্ত্রী শ্রীমতীস্মৃতিকণা আমাদের মিষ্টিমুখ করালেন। আন্দামানের অতিকায় সুমিষ্ট পেঁপে এবং ততোধিক সুমিষ্ট ডাবের জল খাইয়ে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক পড়লো। ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করতে যাওয়া হল। ঐদিনই অপরাহ্নে আন্দামানের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'অতুল স্মৃতিসমিতি'র সাগর চুম্বিত সুরমা ভবনের সবুজ প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত পরিবেশে সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি সমাগত অতিথিবৃন্দের সংবর্ধনার জন্য একটি মনোরম মিলন সভার আয়োজন করেছিলেন।





নিকোবরের নারিকেল রাণী

ফটো কিশোরী চ্যাটার্জী ও অশোক চ্যাটার্জী

এখানে বহিরাগতদের সঙ্গে দ্বীপবাসী বহু বাঙালা ও অবাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। সকলকেই চা ও প্রচুর জলযোগে পরিতৃপ্ত করলেন তাঁরা।

পরদিন ১৯শে তারিখে বিকলে চারেটয় 'অতুল স্মৃতি সমিতি' ভবনে কার্যসূচী ছিল—পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষ-রোপণ এবং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের 'রবীন্দ্র শত বার্ষিকী' অনুষ্ঠানের ষষ্ঠ অধিবেশন। কিন্তু, পূর্বাহ্নে ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাহিত্য বর্জিত একটি সুন্দর কার্যসূচী ছিল। সেটি হল প্রতিনিধিদের আন্দামানের 'ম্যারীন ডকইয়ার্ড, বা নৌ-বন্দর দেখে আসা। শ্রীযুক্ত শাণ্ডেল হ'লেন আন্দামানের প্রধান ম্যারীন ইঞ্জিনীয়ার। এই সময় আবার 'হারবার মাস্টার' আন্দামানে উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত শাণ্ডেল তারও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সুতরাং তাঁকেই সে সময় অস্থায়ী 'বন্দর নায়ক' বা 'পোত-পতি' বলা যেতে পারতো। যাই হোক, এ'কথা কবুল করতে লজ্জা নেই যে এই শাণ্ডেল দম্পতি বহু চেষ্টা করেও দ্বীপান্তরাগত প্রতিনিধি-দলকে কিছুতেই নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে পারেন নি।

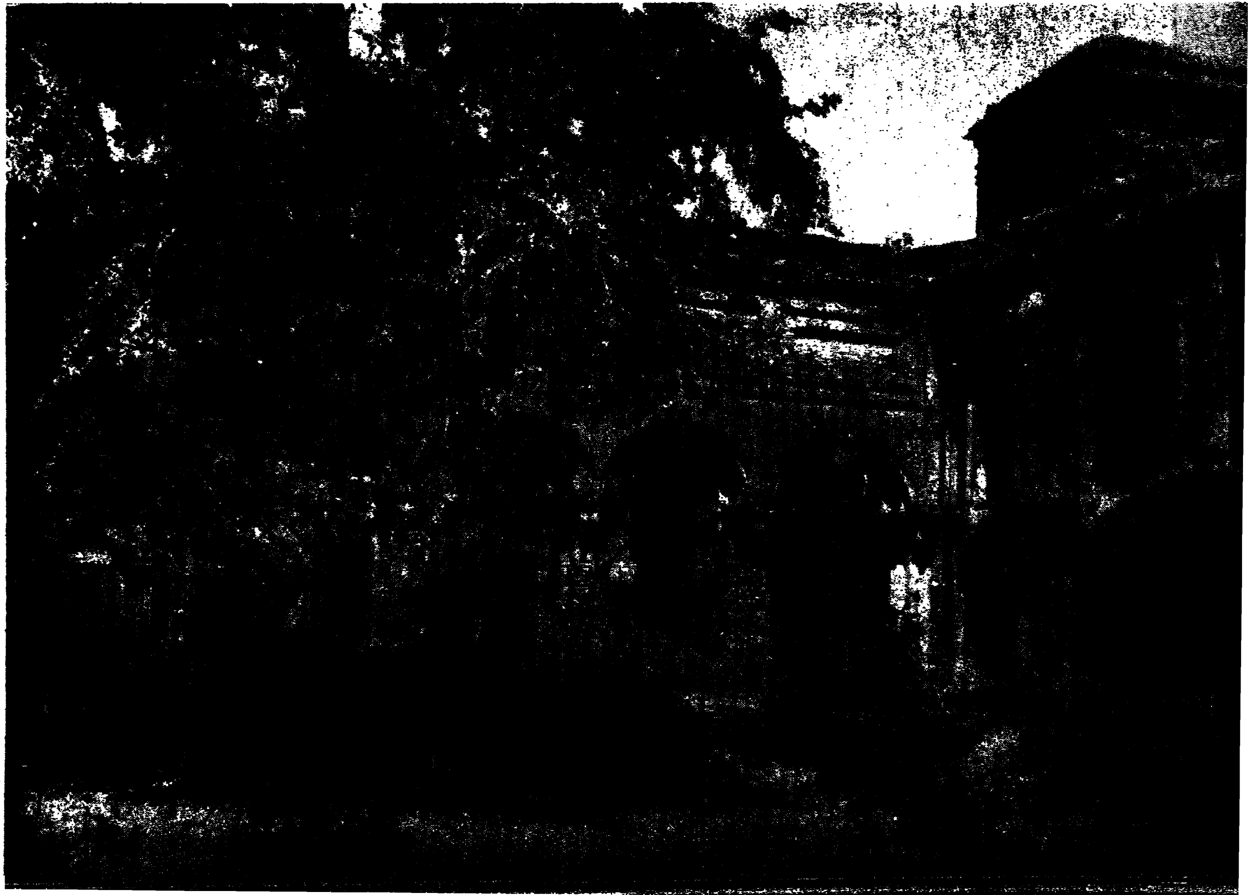
সকালে ৮টার মধ্যে ওঁরা সকলকে প্রাতরাশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করলেন: অনুগ্রহ করে ৯টার মধ্যে সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। 'বন্দর' দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু, নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে বাংলাদেশ তা জানে না। কাজেই বেলা ৯টার মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থা-মতো যান-বাহন সব এসে হাজির। মোটরকার ও মোটরবাস-গুলি দ্বারে এসে শৃঙ্গধ্বনি করলেও প্রতিনিধিদের বেরুবার চাড় নেই। তাঁরা ধীরে সুস্থে গদাই লস্কর মহাশয়ের চালে তৈরী হ'য়ে বেরুলেন বেলা ১০টা নাগাদ। কাজেই সব দেখা শোনা সেরে ফিরতে আমাদের অনেক বেলা হয়ে গেল।

স্নানাহার সেরে মধ্যাহ্ন-বিশ্রামেই বেলা গড়িয়ে এল। শাণ্ডেল দম্পতি বেলা তিনটে থেকেই তাগিদ দিতে শুরু করলেন, তৈরী হয়ে নিন। ঠিক চারটের সময় পতাকা উত্তোলন, চারটে দশে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পদ্ধতিতে বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং সাড়ে চারটেয় 'অতুল স্মৃতি ভবনে' বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। কিন্তু ওঁরা তাড়া দিলে কি হবে? প্রতিনিধিরা প্রস্তুত হয়ে বেরুতে আধঘণ্টার উপর দেরী করে ফেললেন। কাজেই কার্যসূচীর সব কিছুই নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আধঘণ্টা পিছিয়ে গেল। অবশ্য অনেকের দীর্ঘ বক্তৃতাও এজন্য কিছুটা দায়ী।

আন্দামানের চীফ কমিশনারের পত্নী শ্রীমতী রাজওয়াড়ে অতুল-স্মৃতি-ভবনের প্রাঙ্গণে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন করলেন সঘন শঙ্খনাদ ও জয়ধ্বনির মধ্যে। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি কবিশেখর ডাঃ কালীকিংকর সেনগুপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি আবেগ-পূর্ণ ও তথ্যমূলক ভাষণ দিয়ে সম্মেলনের নীতি, উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলকে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে বললেন। বলা বাহুল্য যে বক্তৃতাটি তাঁকে ইংরাজিতেই দিতে হয়েছিল। কারণ, সমবেত নর-নারীদের মধ্যে বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীর সংখ্যাই ছিল বেশি। এরপর বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু হল। বাংলা দেশ থেকে একটি বটবৃক্ষ ও একটি সপ্তপর্ণীর চারা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কয়েকজন সুসজ্জিতা তরুণী সঙ্গিনী সহ শ্রীমতী রাধারাণী দেবী রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পটভূমিকায় শুভ শঙ্খনাদের সঙ্গে বৃক্ষ দুটি সযত্নে রোপণ করলেন এবং এই বৃক্ষ রোপণের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি একটি সুগম্ভীর ভাষণও দিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির মধ্যে বরণডালা পুষ্পমাল্য ধূপ ও দীপ এবং মঙ্গলঝারি সহ নবরোপিত তরু দুটিকে মেয়েরা সপ্তবার প্রদক্ষিণ ও করধৃত ভৃঙ্গার ঝারি থেকে বারি সিঞ্চন করলেন এবং বনলক্ষ্মীকে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে বৃক্ষ রোপণ উৎসব উদ্‌যাপন করলেন।

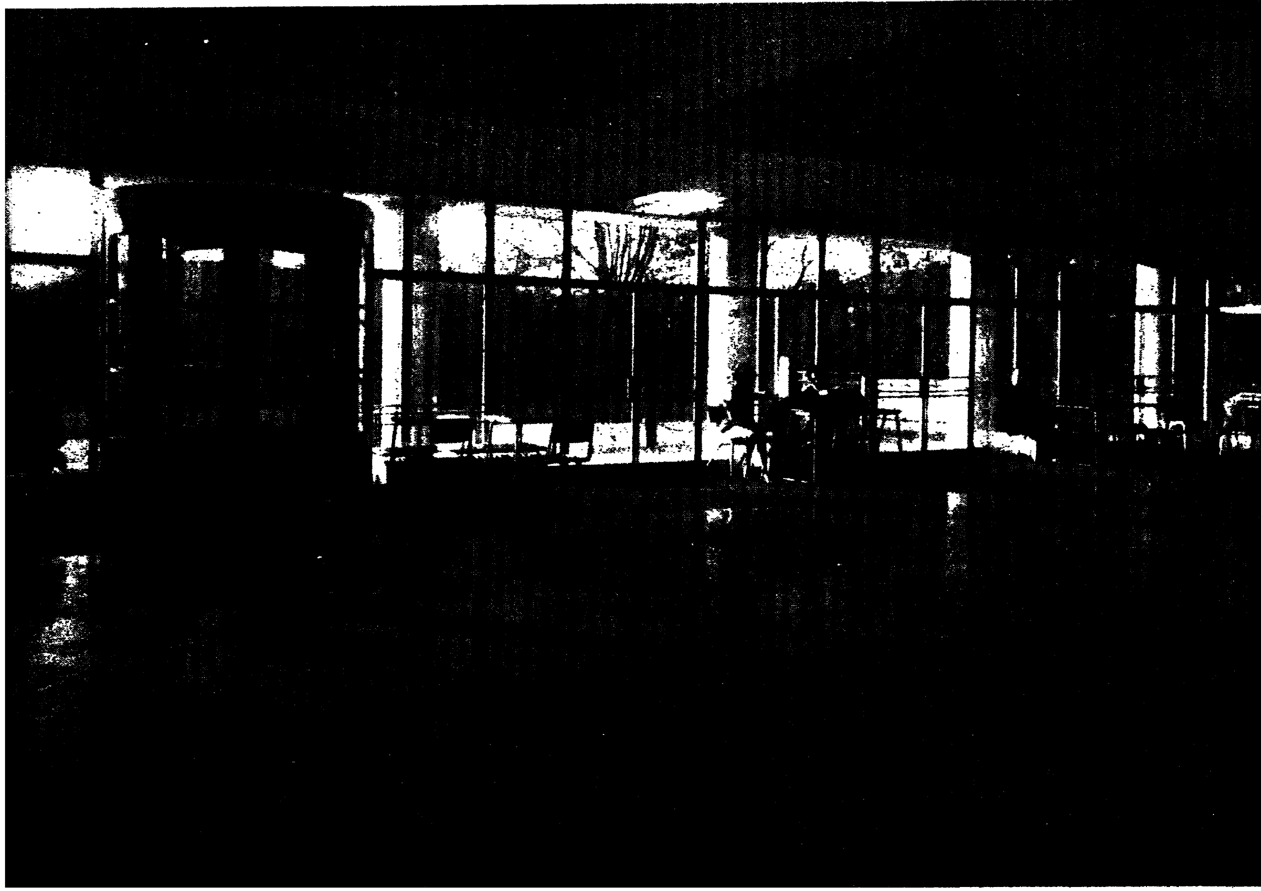
তারপর সুরু হ'ল অতুল স্মৃতি সমিতির সুসজ্জিত হলে প্রথম দিনের সাহিত্য সম্মেলন। এই সঙ্গে অতুল স্মৃতি সমিতির একটি প্রশান্ত কক্ষে বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকার প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। সম্মেলন শুরু হল তখন প্রায় ৬টা বাজে। পত্র পুষ্প পল্লবে সুসজ্জিতও বিজলী বাতিতে সমুজ্জ্বল হলটি। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মঙ্গলাচরণের দ্বারা সভার উদ্বোধন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভা-নেত্রী শ্রীমতী স্মৃতিকণা শাণ্ডেল একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে এই ঐতিহাসিক দ্বীপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেদিনের সভার সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। তৎপূর্বে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায়, দক্ষিণ ভারতের রাজ-নীতিবিদ নেতা শ্রীরাজা গোপালাচারী, চন্দননগরের প্রবীণ সুধী শ্রীহরিহর শেঠ, বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা পড়ে শোনানো হ'ল। স্থানীয় সাহিত্য সেবিদের মধ্য ছ'জন সুধী তাঁদের রচনা পড়ে শোনালেন। বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা-সংসদের পরিচালক মহাশয়ের প্রবন্ধটি বেশ ভাল লাগলো। অতঃপর সভান্তে মঞ্চের উপর অতি উপভোগ্য এক বিচিত্র অনুষ্ঠান হ'ল। আন্দামান-বাসিনী বাঙালী মেয়েদের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনী নৃত্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারতের ভারতীয় নৃত্য—'ভরত নাট্যম' ব্রহ্মদেশীয় 'পোয়ে নৃত্য', আসামের প্রবাসী শিল্পী বড় ঠাকুরের দু'টি নিজস্ব উদ্ভাবিত নৃত্য, একটি পাশির নারিকেল পাড়া ও রোজার ভূত ছাড়ানো—সর্বশেষে নট-পূজার মনোজ্ঞ নাট্যাভিনয়। সবকিছু মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি সত্যই বিচিত্র ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠান শেষ হ'তে প্রায় নটা বাজলো। এই অভিনয়ে সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, নৃত্য-গীত ও বাচন এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল যে বারবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

রাত্রে আন্দামানের আকাশ ছেয়ে কাজল কালো মেঘ দেখা দিল। মধ্য রাত্রি থেকে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। ভয় হ'ল বুঝি সম্মেলন মাটি হয়। শাণ্ডেল দম্পতি অভয় দিয়ে বললেন এ দেশের মেঘে শুধু ক্ষণ বর্ষণ, অষ্টপ্রহর ধারাপাত হয়না—কিন্তু আট মাস ধরেই বর্ষা এ দ্বীপকে অভিসিঞ্চিত করে। চারিদিকে নোনা-জলের অফুরন্ত প্রসার, কিন্তু তৃষ্ণায় পান করবার মিঠা পানি নেই। আমরা বৃষ্টির জলে তৃষ্ণা নিবারণ করি। জলদ বর্ষিত বারি ধারাকে সঞ্চয় করে রাখা হয় সুবৃহৎ জলাশয়ে। সেই জল এখান-



পরিত্যক্ত

ফটো : রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা



পরিচ্ছন্ন

ফটো : অজয়কুমার দে

কার 'কর্পোরেশন' পাইপের সাহায্যে লোকের বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করেন সকালে ও বিকালে। উৎসবাদির ব্যাপারে অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হলে কর্পোরেশনকে আবেদন করে তা পাবার ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁরা পেট্রল সরবরাহের ট্যাঙ্কের ন্যায় ট্যাঙ্ক সংযুক্ত মোটর লরীতে জল এনে আবেদনকারীর বাড়ীর জলের ট্যাঙ্ক ভরে দিয়ে যান। সেজন্য জলের ট্যাক্স ছাড়া গ্যালন পিছু আলাদা দাম দিতে হয়। শাণ্ডেল বাড়ীতে আমাদের অবস্থান-কালে দেখেছি প্রতিদিন কর্পোরেশন থেকে জলের ট্যাঙ্কের গাড়ী এসে প্রচুর অতিরিক্ত জল সরবরাহ করে যাচ্ছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা প্রায় ৬০জন অতিথি স্নানে, পানে ও শৌচে যে কতটাকার জল বরবাদ ক'রে এসেছি কেউ তার হিসাব রাখিনি।

সকালের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও বর্ষণের বেগ ছিল না। ২০শে তারিখে আমাদের প্রভাতী কর্মসূচী ছিল ভোর ৬টার সময় অদূরবর্তী সমুদ্রতীরে 'কর্বিন-কোভ' নামে সাগর-স্নানের ঘাটে সমুদ্রাবগাহন স্নান। কিন্তু আজও তাড়া দিয়ে আমাদের বার করতে শাণ্ডেল দম্পতির সাতটা বেজে গেল। বাসে ও মোটরে উঠে দীর্ঘপথ বেয়ে আমরা স্নানঘাটে এসে পৌছলুম। এখানে সমুদ্র ও তার আশে-পাশের দৃশ্য বড় নয়নাভিরাম। আকাশ মেঘলা থাকা সত্বেও প্রতিনিধিদের মধ্যে মেয়েপুরুষ অনেকেই মহানন্দে সমুদ্র স্নানে নেমে পড়লেন। প্রায় একঘণ্টা ধরে শ্মশ্রুবাহন জয়দেব ভায়া আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন। রামায়ণের রামভক্ত মহাবীর যেমন সাগর ডিঙিয়ে লঙ্কাদ্বীপে পৌচেছিলেন, আমাদের কেশবহুল দুঃসাহসী তরুণ প্রতিনিধি জয়দেব তেমনি সাগর পার হবার চেষ্টা করে 'স্নেক-আইল্যাণ্ড' বা ভুজঙ্গ দ্বীপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। সকলে সমস্বরে চিৎকার ক'রে তাঁকে ফেরানো হ'ল। সকলেই আশঙ্কা করছিলেন, আর বেশি দূর গেলেই ওকে হাঙ্গরে ধরবে। সাগরের ঢেউয়ে তীরে ফিরে আসবে শুধু হাঙ্গরের অখাদ্য জয়দেবের কালোদাড়ি!

স্নানান্তে গরম চা, পাঁউরুটির টোস্ট, বিস্কুট, কলা প্রভৃতির সাহায্যে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া হল আন্দামানের গ্রামাঞ্চল দেখতে। বিগত দু'দিন আমরা পোর্টব্লেয়ার শহরের আশে পাশেই ঘুরে বেড়িয়েছি। এবার চললুম পাহাড়ী পথে অরণ্য ভেদ করে দ্বীপের ভিতরের দিকে যে সব বাংলার বাস্তুহারাদের গ্রামের পত্তন হয়েছে সেগুলি দেখতে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা এসে যেখানে বাসা বেঁধেছে সেই হার্বাটাবাদে বেড়াতে। আমাদের সহযাত্রী-দের মধ্যে কয়েকজন অরণ্যে হরিণ শিকার করতে যাবেন বলায় শ্রীযুক্ত শাণ্ডেল সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁদের জন্য একখানি ষ্টীমলঞ্চ ও একজন সুদক্ষ শিকারী বন্ধুকে তাঁদের সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে গ্রামের পথে না গিয়ে বনের পথে চলে গেলেন। ক্রমশঃ

জলধর-স্মরণে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

(শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে)

অর্জিত যশ বর্জিত মান অজাতশত্রু ঋষি
উদারচিত্ত নিত্য সহায় অনেক মনস্বীর।
শিশুর স্বভাব সন্তোষ ভাব বিনয় নম্রশির
যাঁর যশোভার 'ভারতবর্ষ' বর্ষিছে দশদিশি॥
অশীতিবর্ষ ধরি সহর্ষ-মূরতি অহনিশি
অন্তরে ভরা স্নেহ রস ঝরা জলধর সুনিবিড়।

সার্থক নাম জানাই প্রণাম তাঁরে আজি বাঙালীর
উৎসাহবান অমায়িক প্রাণ মিশাইতে চায় মিশি॥
আত্মীয়ে করে পরমাত্মীয় ঘরে পরে ভেদহীন
কলহ মিটায়ে আনিয়া মিলায় গৃহকন্দল নাশি।
যাঁহার প্রেক্ষা করে প্রতীক্ষা প্রতিভার নিশিদিন
বালক সুলভ দেব দুর্লভ সরল স্নিগ্ধ হাসি।

যাঁর প্রশস্তি স্বস্তি বচন গুণিগণ মনলোভা।
তাঁহার স্মরণে স্মৃতির গগনে সূর্যোদয়ের শোভা॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত মৈত্রী

শ্রীজয়দেব রায়

সঙ্গীত সৃষ্টির একটি পরিবেশ কবি চিরদিনই লাভ করিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে সঙ্গীতের একটা আবহাওয়া বিরাজ করিত। পিতা দেবেন্দ্রনাথ, ভ্রাতৃবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সকলেরই সঙ্গীতে বিশেষ উৎসাহ ছিল। বাড়ীতে সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রমুখ। যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদের হিন্দী গানের সুর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ বাল্য বয়স হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে শুরু করেন। এই ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহারই পদাঙ্ক কবি এই ক্ষেত্রে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষির গান ছিল কুকভ, আড়াঠেকায়—

কেন ভোল, ভোল চির সুহৃদে? ভুল না চির সুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁ হতে, এমন সুহৃদে কেন ভোল?
থেক না, থেক না, তাঁ হতে অন্তর;
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল?
চিরজীবন-সখা চির সহায়ে, করুণা-নিলয়ে কেন ভোল?

পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্য বহুভাবে পাইয়াছিলেন। যে পরিবেশে তিনি জীবন কাটাইয়াছিলেন—সঙ্গীত সৃষ্টির পক্ষে চিরকালই তাহা ছিল আদর্শ।

রাধিকা গোস্বামীর পরে বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার শেষ ধারাবাহক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কবির বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা উভয়েই কবির অনেক গানের স্বরলিপিও করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে যাইতাম ও রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গানও শুনাইতাম। তিনি আমার হিন্দি গান শুনিয়া সেই গানগুলির অনুকরণে বহু বাংলা গান রচনা করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বিস্তর বাংলা গান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর হিন্দি গানের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। তবে স্বরচিত কতকগুলি গানে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুরদান করেন।"

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহার ভ্রাতারাও সকলেই ঐ একই সঙ্গীত-পরিবেশ লাভ করিয়াছিলেন, ঐ একই পদ্ধতিতে গান রচনা করিয়া গাহিয়াছেন; বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন এই সুরযজ্ঞের প্রধান হোতা।—কবি সে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি উৎসবে-আমোদে সকাল সন্ধ্যায় উপাসনামন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গানচর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাঙলা ভাষায়।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্র নাথ সব দাদাই ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, প্রত্যেকেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অল্প বিস্তর দক্ষ ছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত-বংশের ভ্রাতারাও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতেন। মাঘোৎসব, নববর্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট উৎসব গুলিতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই সে গানগুলি গাহিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথকেও সেই সকল গান গাহিতে হইয়াছে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গই একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

উপরোক্ত গানটি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাহার-একতালায় রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত—

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে,
কি ভয় সংসারে শোক ঘোর বিপদ-শাসনে!
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব, তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হৃদয় বীত শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে॥

এই সকল ব্রহ্মসঙ্গীতের সুরই সব রচয়িতাদের প্রদত্ত নয়, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, যদুভট্ট, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র রায়, কাঙ্গালীচরণ সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের গায়কেরা অধিকাংশ গানের যোজনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ রীতিমত গীতচর্চা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বরলিপির একটি নূতন পদ্ধতির সূত্রাবিষ্কা করিয়াছিলেন, পরে তাহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রযত্নে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে পরিণত হয়। সঙ্গীত প্রকাশিকা বীণাবাদিনী প্রভৃতি সঙ্গীতমাসিকপত্রের প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। গৃহে নূতন সঙ্গীতযন্ত্র হারমোনিয়ম ও অর্গান বাজনা আসিলে, রবীন্দ্রনাথের দাদারা প্রায় সকলেই বাজাইতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতানুশীলনের সকল ক্ষেত্রেরই পথিপ্রদর্শক। তাঁহারই পিয়ানো বাজনার সৃষ্ট সুরে কথা বসাইয়া

রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র গানগুলি। তিনিই বলিয়াছেন—"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমন একটি সুর রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন।"

ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় (সৌদামিনী দেবীর স্বামী) সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। জোয়ালাপ্রসাদ নামক একজন ওস্তাদের কাছে তিনি সেতার শিখিয়াছিলেন। ধ্রুপদ গানেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের তিনি ছিলেন একজন অনুরাগী উৎসাহদাতা।

বাড়ীর কন্যারাও পিছাইয়া ছিলেন না, সেদিনকার রক্ষণশীল সমাজের মেয়ে হইয়াও তাঁহারা গীতবাদ্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী সঙ্গীতনিপুণা ছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীর নিকট তিনি ও ইন্দিরা দেবী তালিম লইতেন। রামপ্রসাদ মিশ্র তাঁহাদের সেতার শিখাইতেন।

প্রতিভা দেবী বলিয়াছেন—"তখনকার দিনে মেয়েদের গান-বাজনা করিবার প্রথা ছিল না। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিতেন, শিখাইতেন। সেদিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়ীর গায়ক, তাঁহার নিকট ছোট খেয়াল শিখতাম।"

প্রমথ চৌধুরী তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তিনি ছিলেন একরকম হাফ-ওস্তাদ। নিত্য গান অভ্যাস করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বেশীর ভাগ গাইতেন হিন্দি গান। তিনি পিয়ানোর সঙ্গে গান অভ্যাস করেছিলেন, তাই তাঁর গাবার ঢঙ ছিল একটু কাটাকাটা।"

সরলা ও ইন্দিরা দেবী ছিলেন কবির আবাল্য গীতিসঙ্গিনী। ইন্দিরা দেবী দেশী ও বিলাতী উভয় সঙ্গীতেই নিপুণা ছিলেন। স্লেটারের নিকট পিয়ানো ও মনজাটোর নিকট তিনি যেমন বেহালা শিখিয়াছিলেন, বদ্রীদাস সুকুল ও ছেদিব্রতীয়ার কাছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরও চর্চা করেন।

সরলা দেবীর গান সংগ্রহের বাতিক ছিল। তিনি বহুস্থল হইতে নানা ঢঙের সুর সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ সকল সুর অবলম্বনে বাংলা গান রচনা করেন। ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—

"সরলা দিদিরা সপরিবারে এক সময়ে মহর্ষির কাছে চুঁচুড়ায় ছিলেন, সেখানে গঙ্গায় বোটের মাঝিদের কাছে কত সুন্দর সুন্দর বাউলজাতীয় গান শিখে এসেছিলেন, যার অনেকগুলির সুরে পরে স্বদেশী যুগে গান বাঁধা বা ভাঙা হয়, যথা—মন মাঝি সামাল সামাল' থেকে, 'এবার তোর মরা গাঙে।' মহীশূর থেকেও কত নতুন ধরণের দক্ষিণী সুর সংগ্রহ করে আনেন যার মধ্যে 'আনন্দলোকে'র সুর খুব প্রচলিত ও প্রিয়।

ইন্দিরা দেবীর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সঙ্গীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিদেশী হার্মনি সম্পর্কে তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। তিনি বলিয়াছেন—"সংসারের বিচিত্র জটিল বেদনা ও সৌন্দর্যের উপযুক্ত চিত্রাঙ্কন হার্মনির দ্বারাই সম্ভব এবং আমি উচ্চ অঙ্গের হার্মনির সঙ্গীতে তাহাই পাইয়া থাকি।"

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। কবি দিনেন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"চিরজীবন সে অন্যকেই প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। আমার সৃষ্টিকে নিয়েই সে আপনার সৃষ্টির আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি তার স্বকীয় রচনা চর্চার বাধাই ছিলাম আমি। কিন্তু তাতে আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, সে কথা তার অক্লান্ত অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়।"

রবীন্দ্রনাথের গান লইয়াই দিনেন্দ্রনাথ সারাজীবন অতিবাহিত করেন; রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি ব্যতীত তাঁহার গান সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য আলোচনার সূত্রপাতও তিনি করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, কবি তাঁহার নিজের গানে একমাত্র দিনেন্দ্রনাথকেই সুর বসাইবার অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন—"দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোনদিন তার নিজের গান শুনিনি। কখনো কখনো কোন কবিতায় তাকে সুর বসাতে অনুরোধ করেছি, কথাটাকে একেবারেই অসাধ্য ব'লে সে উড়িয়ে দিয়েছে।"

ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীত সংস্কৃতির শেষ ধারাবাহক দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিও কবির কাছেই গান শিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহার দান অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ সৌম্যেন্দ্রনাথের অনুরোধেও বহু সময়ে গান লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কবিগুরুর গানের কৌলীন্যরক্ষার গুরুদায়িত্ব তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথকেই অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ অনেকবার আমাকে বলেছিলেন তাঁর গানগুলোর প্রচারের ভার নিতে। আমি তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি।"

সৌম্যেন্দ্রনাথও ঠাকুরবাড়ীর সেই বিলুপ্ত সঙ্গীত সংস্কৃতির মানুষ। জোড়াসাঁকো সংস্কৃতির শেষ উত্তরাধিকারী সৌম্যেন্দ্রনাথ সেই যুগের কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"এককালে রবীন্দ্রনাথের গানের বায়ুমণ্ডলে আমার প্রাণ সুরের নিশ্বাস নিয়েছে। প্রকৃতির আলো বাতাসের মতোই রবীন্দ্রনাথের গান সহজভাবে আমার জীবনকে ঘিরে ছিল সেদিন। গানের পর গান শুনেছি, গানের পর গান শিখেছি। শিখেছি গান রবীন্দ্রনাথের কাছে, শিখেছি দিনেন্দ্রনাথের কাছে।"



মহা-ভারতের পথে পথে

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

শেষের হেমন্তের শেষ রাত। গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টপ্‌টপ্‌ করে হিম পড়ছে। পণ্ডিচেরীর পথঘাট নিস্তব্ধ নিঝুম। ছায়া-ছায়া আলোয় আঁকা বাঁকা পথ ধরে শুধু রিক্‌সাওয়ালা ছুটে যাচ্ছিল। হিমেল নৈঃশব্দের মধ্যে রিক্‌সার সেই চলমান আওয়াজটা কেমন যেন ছন্দহীন বেমানান, ছমছমেও বটে। হিম-ঝরা ভোরে ভেজা মনে ভাবনার জাল ছড়িয়ে অজানার টানে টানে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে জেনেছিলাম, সকাল পাঁচটায় একখানা বাস ছাড়ে, টানা চিদাম্বরম যায়. কাদ্দালোর পৌঁছে বাস বদল করতে হয় না। সেইভাবে তৈরী হয়ে বেরিয়েছিলাম। বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে সব আয়োজন পণ্ড হ'ল। নতুন কিছু ব্যবস্থা করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল।

বাসখানা একটু আগেই ছেড়ে চলে গেছে।

এরপর আমার সকল প্রশ্ন আর রকমারি প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ভাষার কারণে বারেবারে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসতে লাগল।

সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাসের প্রশস্ত ললাটে শুধু তামিল ভাষায় গন্তব্যস্থানের নির্দেশলিপি। ড্রাইভার কণ্ডাকটর থেকে শুরু করে সেই শীতালি সকাল বেলায় ষ্ট্যাণ্ডে যে স্বল্প-সংখ্যক যাত্রী এসে কলকল করছিল তারাও সবাই শ্রুতি ও কথনের ব্যাপারে ঘোরতর স্বনিষ্ঠ। একেবারে 'একমেবাদ্বিতীয়ম'—ভাব!

অভিধানে আর লোকমুখে 'নিঃসঙ্গ' কথাটার সঙ্গে বহুকাল পরিচিত ছিলাম,কিন্তু সময়কালে ওই তিনটি মাত্র শব্দ বুকে-পাঁজরায় শ্বাসে-প্রশ্বাসে যে কী ভয়াল হাহাকারের ঝড় তুলতে পারে, বোবা দৃষ্টিতে আর একবার চারদিকে চেয়ে সেই ব্যাপারটা এতকাল পরে মর্মমূলে উপলব্ধি করলাম। ভারততীর্থের ঘর-ভোলানো আকর্ষণে নিশি-পাওয়ার মতো নিঃসঙ্গে ঘর ছেড়ে রূপময় ভারতের মন্দিরে গিরি চূড়ায় অরণ্যতলায় এমনি কতবারই তো ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, বসুন্ধরার মতো বিশাল ভারতবর্ষের মহা-মানবতার সঙ্গমে বারে বারে অবগাহনও করেছি, কিন্তু এমন অসহায়ভাব বোধ হয় আর কোনদিন বোধ করিনি।

ঘোর-লাগা অবস্থায় সাত-পাঁচ চিন্তা করছি, রিকসাওয়ালা সহসা হাত-পা নেড়ে ইসারা ইংগিতে বলে উঠল—'কাড্ডালোর, বাবু, কাড্ডালোর।' পরক্ষণেই একটা বাসের মাথায় হোল্ড অলখানা তুলে দিয়ে বাসের মধ্যে সুটকেশটা চাপিয়ে দিতে দিতে আমার দিকে চেয়ে একগাল সরল হাসিতে আবার ওই একটি কথারই প্রতিধ্বনি তুললে—'কাড্ডালোর,কাড্ডালোর।'

ইংগিত উপলব্ধি হল। এই বাসে চেপে কাদ্দালোর তো যাওয়া যাক. তারপরে নেমে, তখন চিদাম্বরম যাবার উপায় খোঁজা যাবে। সেই ব্যবস্থাই সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসও ছেড়ে দিল।

সহযাত্রীর দল স্থানীয়। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। পোষাকের বালাই নেই। সকালের কনকনে হাওয়ার জন্যে কানে-মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে, খালি গায়ে তোয়ালে জড়িয়েছে। অবোধ্য ভাষায় কেরামতউল্লার তবলার মতো চৌদুনে লহরা তুলে চলেছে।

মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছিলাম। শীতের শিহরণে কিংবা চলন্ত গাড়ীর গানে চোখে বুঝি একটু ঘুম নেমেছিল। সহসা কার ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেল।

'বাবু, ফরাসী পুলিশ, সামান চেক করেগা।'

তা-ও তো বটে! ভারত স্বাধীন হলে কি হবে, দুঃসহ 'আব'-এর মতো বিদেশী লেজুড়গুলো এখনো ভারতের আশপাশে মৌরসী নিয়ে বসে আছে। অতএব খাস ভারতের তালুক হয়েও এটা ফরাসীর দেশ, আর এখানের তৈরী কোনো জিনিষ যদি সঙ্গে আনি তো 'ফরাসী সামান' আনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ভারতের গোয়া অঞ্চল সম্বন্ধে যেমন পর্তুগীজরা বলে ওটা তাদের কলোনী নয়, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের তাদের খাস মুলুকের অঙ্গীভূত একটি প্রদেশমাত্র! বীর্য যে দেশ থেকে চিরদিনের জন্যে লোপাট হয়ে গেছে, আস্ফালন আর আড়ম্বর যে দেশে নতুন সংস্কৃতিরূপে পরিচয় পেয়েছে, সেখানে বাক্স প্যাঁটরা খুলে দেখানো আর ওই ধরণের নির্লজ্জ যুক্তিগুলো নির্বিবাদে হজম করা ছাড়া আন্তর্জাতিক শান্তি-পুরস্কারকামীর দেশের লোকের আর কী উপায় আছে!

'সামান' চেকিংয়ের ব্যাপার একসময়ে শেষ হল। চেক-পোষ্ট থেকে বাসও ছুটল। আকাশেও দেখা গেল সূর্যের অরুণাভা। চেকিংয়ের রাহুগ্রাস থেকে ছাড়া পেয়ে সূর্যের স্বাদে মনটি ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কাদ্দালোর এসে পৌঁছালাম যখন তখন ঘড়িতে পৌনে ছ'টা।

কণ্ডাক্টরকে ইংগিতে প্রশ্ন করলাম—'চিদাম্বরম বাস'।

ইংগিত সে বুঝতে পারল। বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আরেক পাশে দাঁড়ানো অন্য একটি বাস দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠল— চিদাম্বরম। আর...'

তামিল ভাষায় 'আর' মানে ছয়। কদিন ঘুরতে-ঘুরতে তামিলী সংখ্যা-তত্ত্ব কিছু আয়ত্ত করেছিলাম। কণ্ডাক্টরের সংকেতে বুঝলাম, ওটা চিদাম্বরমের বাস, ছ'টায় ছাড়বে এখান থেকে! অতএব হাতে এখনো পনেরো মিনিট সময় আছে।

কাদ্দালোর থেকে রেলপথে পণ্ডিচেরীর দূরত্ব তেপান্ন মাইল, ভেলুপুরম জংশন হয়ে আসতে হয়। বাসে সোজা রাস্তা। ভাড়াও অনেক কম। তাই বাসে পণ্ডিচেরী থেকে মাত্র দশ আনা ভাড়ায়

... সময়ের মধ্যে কান্দালোর এসে পৌঁচেছিলাম। কান্দালোর থেকে চিদাম্বরম রেলপথের দূরত্ব তেইশ মাইল, বাসের পথের ব্যবধান অবশ্য ... বেশী নয়। কিন্তু ট্রেণ ছাড়বে ছ'টা উনত্রিশ মিনিটে আর চিদাম্বরম পৌঁছবে সাতটা বিয়াল্লিশ মিনিটে। সে জায়গায় বাস পৌঁছবে ছ'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। কান্দালোর বাস-ষ্টাণ্ড থেকে ষ্টেশনও বেশ খানিকটা দূরে। সবদিক বিবেচনা করে চিদাম্বরম-এর বাসে গিয়ে চাপলাম। খানিকপরে কণ্ডাক্টর এসে পোনেরো আনার একখানা টিকেট দিয়ে গেল।

স্থানীয় কণ্ডাক্টররা ইংরেজি বা হিন্দী জানে না, কিন্তু একটা জিনিষ সকৌতুকে লক্ষ্য করলাম, আমাদের দেশে বাস ছাড়ার সময় যেমন কণ্ডাক্টররা ঘণ্টি দিয়ে ইংগিত করে 'ঠিক-হ্যায়'—এরাও তেমনি বলে 'রাইটস্'। 'রাইট'-এর এই নিদারুণ বহুবচনী প্রয়োগ এ অঞ্চলের আরো অনেক কণ্ডাক্টরকে করতে দেখেছি।

অতএব এমনি এক 'রাইটস্'-এর বজ্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চিদাম্বরমের বাস ছেড়ে দিল।

বাস চলাচলের রাস্তা বেশ ভালো। পিচঢালা। খুবই চওড়া। দুপাশে তেঁতুল তাল আর নারকেল গাছের সারি। রাস্তার লাগোয়া মাঠে মাঝে-মধ্যে 'সার্বি' গাছের জটলা। দেখতে সরু সরু ঝাউগাছের মতো। এগুলো দিয়ে এদেশে চালাঘরের খুঁটি আর কোড়ার কাজ চলে। জ্বালানিও হয়।

পল্লী অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটেছে। নারকেল আর কলা-বাগানের অন্ত নেই যেন। আর আছে দিগন্তজোড়া ধানের ক্ষেত। সবুজের বিপুল সমারোহ। তেফলা ধান গাছ হাওয়ায়-হাওয়ায় দুলছে। কৌপীন-সম্বল চাষী ক্ষেতের মধ্যে হাল দেওয়া শুরু করেছে।

বাস একটা ষ্টপেজে এসে দাঁড়াল। এদিকের বাস ষ্টপেজের ব্যাপারটা লক্ষ্য করার মতো। আগের একটা ষ্টপেজেও এই ধরণটা দেখেছি। মূল রাস্তা ছেড়ে খানিকটা ভেতরের দিকে ষ্টাণ্ডের ধরণে প্রশস্ত ঘেরা জায়গা, এটাই ষ্টপেজ, প্রতিটি বাস কোথাও না থেমে মূল রাস্তা দিয়ে বেঁকে একেবারে এই ষ্টপেজে এসে থামে।

ষ্টপেজের মধ্যে পান-বিড়ির একটা ষ্টল, কফির দোকানও রয়েছে, দোকানে সারবন্দী পাকা কলার কাঁদি। একজন যাত্রী আস্ত একটা কাঁদি নিয়ে গাড়িতে উঠল।

তারপরে আবার সেই বিখ্যাত নির্দেশনামা : রাইট্স্।

পাশে এসে বসলেন নতুন এক যাত্রী। ছিমছাম চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছদ, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, পা অবশ্য এদিকের রীতি অনুযায়ী খালি। সাহস করে আলাপ করতে গেলাম। আমার অনুমানে ভুল হয়নি। ভদ্রলোক ভালো ইংরেজি জানেন। আলাপী, মিষ্টভাষী। নাম—চিদাম্বরম। চলেছেনও চিদাম্বরমে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

আমার গন্তব্যস্থানগুলোর সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলাম। শ্রীযুক্ত চিদাম্বরমের পড়াশোনা গভীর। প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্যের তিনি একজন শ্রদ্ধাশীল অনুসারী। দ্রাবিড় সভ্যতার অনেক কাহিনী তাঁর কাছে জানা গেল। ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গীটি যেমন ভালো, তাঁর বক্তব্যবিষয়গুলোও তেমনি আকর্ষণীয়।

ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা খুবই প্রাচীন। আর্যদের অনেক আগে দ্রাবিড় জাতিই ভারতের প্রথম পথিক। শিক্ষা-দীক্ষায় শিল্প-সংস্কৃতিতে আর্যদের মতোই অনেকাংশেই উন্নত। আর এই দ্রাবিড় সভ্যতার পথিকৃৎ বা দাক্ষিণাত্যের বিরাট সত্বারূপে যিনি বিশেষভাবে আদৃত তিনি হচ্ছেন মহর্ষি অগস্ত্য বা দক্ষিণীদের সর্বজনকথিত তামির মুনি। তামির মুনি বা অগস্ত্য দ্রাবিড়জাতির গুরুও বটে।

অগস্ত্য যেমন বীর্যবান তেমনি পণ্ডিত—আর আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যায় ততোধিক শক্তিশালী। অগস্ত্যের জন্ম আর বিবাহ কাহিনী কিন্তু ভারি অদ্ভুত।

আদিত্যদেব একবার যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছেন। আদিত্য পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অধিপতি। পিতৃলোকেরও অধিপতি। যজ্ঞে অনেকেই উপস্থিত। পরমসখা বরুণদেবও সেখানে আসন নিয়েছেন। মিত্র আদিত্যের মতো বরুণও সমুদ্র আর পশ্চিমদিকের অধিপতি দেবতা। যজ্ঞস্থলে হঠাৎ রূপশ্রেষ্ঠা উর্বশীকে দেখে দুইসখা তীব্রভাবে কামোদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। যজ্ঞকুণ্ডে এসে পড়ল তাঁদের সেই দুর্নিবার কামনার রেতোপুঞ্জ। কুণ্ডে জন্ম নিলেন অগস্ত্য আর বশিষ্ঠ দুই মহামুনি।

দিন যায়। আর্যাবর্তে আশ্রম-কুটিরে তপশ্চরণে অগস্ত্য ঋষির দিন কাটে। নিঃসঙ্গ একক জীবনে ঋষি একদিন পত্নীর অভাব গভীরভাবে অনুভব করলেন। নিজেই সৃষ্টি করলেন এক রমণীরত্ন। নাম দিলেন লোপামুদ্রা; বিদর্ভরাজের কাছে পালিত হতে থাকল লোপা। তারপরে লোপা লাবণ্যময়ী যুবতী হয়ে উঠলে বিবাহ করলেন। কর্মবহুল জীবন অগস্ত্যের। দানব দৈত্যের অত্যাচার তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। দেবতারা কিছুতেই তাদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। মুনিদেরও তপস্যায় বিঘ্ন ঘটছে। ইন্দ্র যদি বৃত্রাসুরকে বধ করলেন তো—তার অনুচর কালকেয় সমুদ্রে আশ্রয় নিয়ে মাঝে মাঝে রাত্রে উঠে এসে উৎপাত শুরু করে দিল। দেবগণ নিরুপায়—অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য এক গণ্ডূষে সমুদ্রের জল নিঃশেষে উদরে ধারণ করলে দেবগণ তখন সুরলোকের সাময়িক বনবাসী অর্জুনের সাহায্যে সমুদ্রের তল থেকে কালকেয়-দানবকে নিহত করলেন। শুধু কি তাই! কত দানব তখন বিভিন্নরূপ ধরে মুনি ঋষিদের উপর অত্যাচার করত। দৈত্যরাজ ইল্বল আর ছোট ভাই বাতাপি ছিল—যাকে বলে একেবারে অত্যাচার-চূড়ামণি। বাতাপি মেষরূপ ধারণ করে মুনিদের আশ্রমের কাছে ঘুরঘুর করে বেড়াত। মুনিরা সেই মেষ মাংস খাবার পরে ইল্বলের ডাকে আবার বাতাপি মুনিদের পেট চিরে বেরিয়ে আসত। অনেক মুনি তাদের এই মায়ার খেলায় দেহ রাখলে খবরটা অগস্ত্যমুনির কাছে পৌঁছল। অগস্ত্য তখন মেষরূপী বাতাপিকে ধরে উদরে রেখে তাকে একেবারে চিরকালের জন্যে হজম করে ফেললেন। ইল্বলের ডাকে সে আর কিছুতেই পুনর্জন্ম পেল না। ইল্বল তখন ভয়ে-তরাসে অগস্ত্যের কাছে প্রচুর ধন-রত্ন নিয়ে

উপস্থিত হলে লোপামুদ্রার অনুরোধে অগস্ত্য সেগুলো গ্রহণ করে ইল্বলকে ছেড়ে দেন। আশ্চর্য শক্তিমান এই অগস্ত্য মহামুনি। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ তখন মহর্ষি চ্যবনের বরে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর। মোহের বশে একদিন তিনি ইন্দ্রের শচীর কাছে কামনা জানালেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ নিয়ে শচী খবর পাঠালেন নহুষের কাছে, ঋষিরা কাঁধে নিয়ে বইবে এমন কোনো দোলায় চড়ে যদি নহুষ তাঁর কাছে উপস্থিত হন তবেই তিনি তাঁর কামনা পূর্ণ করবেন। নহুষ সেই মতো ব্যবস্থা করলেন। শিবিকার অন্যতম বাহক ছিলেন অগস্ত্য ঋষি। শিবিকায় বসে নহুষ অধৈর্য হয়ে অগস্ত্যের মাথায় পায়ের ঠোকর মেরে তাড়াতাড়ি চলার জন্যে আদেশ করলেন। ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে অগস্ত্য তৎক্ষণাৎ চরম অভিশাপ দিলেন। নহুষ সঙ্গে সঙ্গে সর্পের রূপ পেল, আর বাস করতে লাগল দ্বৈত-বনে।

মহর্ষি অগস্ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বিন্ধ্যগিরির অবনমন। শক্তির চেয়ে এখানে তাঁর বিচক্ষণতা আর কূটনীতির পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়।

বিন্ধ্যগিরি। আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্তী পর্বতকুলের রাজা। বিন্ধ্য একদিন সূর্যদেবকে বললেন, সুমেরু পর্বতের মতো আমাকেও তোমায় প্রদক্ষিণ করতে হবে। সূর্য প্রত্যাখ্যান করলেন সেই অন্যায় আবদার। বিন্ধ্য তখন ক্রোধে আপন শিখরকে আরো উত্তুঙ্গ করে সূর্যের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করলেন।

প্রমাদ গণলেন সূর্য। বিন্ধ্যবন্দনার অপমান অসহ্য। এদিকে অগ্রসর হতে গেলে পর্বতরাজের পাষাণ-শিলার সঙ্গে ঠোকাঠুকি—তাতে হয়তো নগরাজের কয়েকটি চূড়া ভেঙে পড়তে পারে কিন্তু তাঁর সহস্রকোটি সৌরকরোজ্জ্বল নিষ্প্রভ হওয়ার আশঙ্কা। গতিপথের পরিবর্তনেও বিভিন্ন নীহারিকাপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষের আভাস। তাছাড়া অনভ্যস্ত পথ চলায় আলোক ও উত্তাপের ভারসাম্য রাখতে না পারলে নভোতলচারী জীবকুলের ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হতে পারে।

সূর্য দেবগণের শরণাপন্ন হলেন। দেবতারাও অনন্যোপায় হয়ে মহর্ষি অগস্ত্যকে এর একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। সূর্য যেমন বিন্ধ্যকে লঙ্ঘন করে যেতে পারছেন না, বিন্ধ্যও তেমনি তাঁর গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে পারবেন না এটাই ছিল দেবগণের আশা।

অগস্ত্য দেবতাদের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু শিষ্যের নিকট দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতে তিনি ইচ্ছা করলেন না। শিষ্যের বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে দৈহিক শক্তিতে অবদমন করাও রীতি বিরুদ্ধ।

মহর্ষি লোপামুদ্রার কাছে বললেন, 'লোপা, আমি বিশেষ কাজে দক্ষিণভারতে যাচ্ছি। যতদিন না ফিরি তুমি আশ্রম চালিয়ো, আর পুত্র ইধ্মবাহকে দেখো।'

তারপরে বিন্ধ্যগিরির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কেমন করে তাকে জয় করবেন তা তিনি আগেই ভেবে নিয়েছিলেন।

গুরুকে সম্মুখে দেখে বিন্ধ্য সসম্ভ্রমে আনত হয়ে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অগস্ত্যমুনি তাঁকে আদেশ করলেন, 'বৎস, আমি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করছি, যতদিন না ফিরে আসি ততদিন তুমি এইভাবে থেকো।'

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করামাত্র ওদিকে বাধা অপসারিত হতে দেখে সূর্য কালবিলম্ব না করে আপন কক্ষপথে ধাবিত হয়ে গেলেন। সূর্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে অগস্ত্য আর কোনোদিন আর্যাবর্তে ফেরেন নি।

ভাদ্রের প্রথম দিনে অগস্ত্য দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন।

অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে এসে বহু অনার্য রাক্ষসকে নিধন করে এদেশকে স্থানীয় অধিবাসীদের বাসযোগ্য করে তুললেন। দেশটিও তাঁর ভালো লাগল। সুন্দর নিসর্গশোভা। ঝর্ণা নদী গিরির বহুল সমাবেশ। বিচিত্র বনফুলের আর সুমিষ্ট ফল শস্যের ব্যাপক সমারোহ। ঋষি একটি মনোরম তপোবন বেছে নিয়ে সেখানে নিজের জন্যে আশ্রম-কুটির তুললেন। তারপরে মানুষগুলির দিকে নজর পড়ল। যেমন নৈষ্ঠিক ধর্মপরায়ণ তেমনি আচারনিষ্ঠ। একটি বলিষ্ঠ জাতির সর্ববিধ লক্ষণ দেখতে পেয়ে খুশী হলেন তিনি। বনবাসের সময় শ্রীরাম-লক্ষ্মণ অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে তিনি নিজে তো তাঁদের বহু অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েছিলেনই, উপরন্তু এই বলিষ্ঠ দ্রাবিড় জাতিকে তাঁদের লঙ্কা বিজয় ও সীতার উদ্ধারের কাজে সহায়করূপে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতার প্রবর্তক। তিনি দেখলেন এ জাতি বলিষ্ঠ মনীষার অধিকারী, এদের ভাষা আছে কিন্তু কথনযোগ্য সাহিত্য-সামর্থ্য নেই। তখন তিনিই সর্বপ্রথম তামিল ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে উদ্যোগী হলেন। গড়ে তুললেন একদল উপযুক্ত শিষ্য। নানাভাবে তামিল জাতি আর তাদের ভাষাকে এরা সমৃদ্ধ করে তুলতে আত্মনিয়োগ করল।

বহুকাল ধরে বহুবিধ প্রচেষ্টায় দ্রাবিড় সভ্যতাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে কেন যেন একদিন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁর প্রিয় দ্রাবিড় ভূমি ছেড়ে নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররূপে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নভোতল থেকে কোটি কোটি যোজন দূরে চলে গেলেও কিন্তু তাঁর দ্রাবিড়দের প্রতি মমত্ব ছিল। নভোমণ্ডলের আর সকল দিক বর্জন করে আকাশের দক্ষিণদিকটাই বুঝি তাই তিনি এদের কথা মনে করে নিজের থাকার জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতি বছরে ভাদ্র মাসের সতের-আঠারো তারিখে নভোমণ্ডলে উদিত হয়ে দক্ষিণীদের ওপর তাঁর শুভ মঙ্গলময় কিরণকণাও তিনি বিতরণ করে থাকেন।

হঠাৎ কিসের একটা ঝাঁকুনিতে বুঝি বাসখানা একবার কেঁপে উঠল।

চমকে উঠে সামনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি সমস্ত যাত্রীর দৃষ্টি আমাদের দুজনকে ছেঁকে ধরেছে। দ্রাবিড়ী প্রেটে দুজনে এমন সমান টানে কুল-কুল করে গেছি যে তার প্রগাঢ় প্রবাহে ভাষা ও আঞ্চলিকতার কূলে কূলে ধ্বস্ নেমে গেছে। জোড়া-জোড়া গ্রামীণ বিস্ময় বুঝি তাই এই বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার দেখে !

হাতে হাত মিলিয়ে শ্রীচিদাম্বরম বলে উঠলেন, 'ভালো লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। তামির মুনির অনেক কথাই আপনি জানেন দেখছি।'

হাসি মুখে প্রত্যুত্তর করলাম, 'যেটুকু অজানা রয়েছিল, আপনার সঙ্গে আলাপনে তার প্রস্ফুটন হল। আঞ্চলিকতার গণ্ডী ভুলতে পারলে মানুষ আর সমাজ কতই না মহনীয় হয়ে উঠতে পারে! ভাষাটা খুব একটা বাধা নয় সব সময়ে!'

'তা বটে। আর এই সত্যটাই আপনারা প্রথমে তুলে ধরেছেন ভারতে—বিশ্বে। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত আপন জন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবও দক্ষিণ ভারতে অসামান্য।'

'আমরাও শ্রীশঙ্করাচার্যকে ভুলিনি, শ্রীযুক্ত চিদাম্বরম। ভুলিনি আপনাদের কবি শ্রীসুব্রহ্মণ্য ভারতীকে। আর এযুগের 'সর্বপল্লী' তো আমাদেরও পল্লীর বাসিন্দা।'

একটু থেমে তিনি মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে কী দেখে নিয়ে বলে উঠলেন, 'এবার বোধ হয় আমাদের নামতে হবে। এসে গেছি।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, এইখানে নেমে পড়লে আপনার পক্ষে সুবিধা হবে মন্দির যাওয়ার। আমি আরো একটু যাবো এই বাসে। দাঁড়ান, আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বাস-কণ্ডাকটরকে ব'লে কয়েক মিনিটের জন্যে বাস থামিয়ে তিনি আমার সঙ্গে নেমে পড়লেন। তারপরে একটা সাইকেল-রিকসা-ওয়ালাকে ডেকে স্থানীয় ভাষায় তাকে সমস্ত বলে বুঝিয়ে আমাকে তুলে দিয়ে তিনি আবার বাসে গিয়ে উঠলেন। করজোড়ে বিদায় নিলাম দুজনে। সত্যি, 'যা দেখলাম, যা পেলাম, তুলনা তার নেই।'

ধর্মশালার এদেশীয় নাম 'চোল্‌ট্রি'। চলতে চলতে রিক্সাওয়ালাকে জিগগেস করলাম, 'মন্দিরের কাছাকাছি কোন চোল্‌ট্রি আছে কি?'

রিক্সাওয়ালা শহরে গাড়ি টানে। শহরে নানারকম যাত্রী হরেক দেশের মানুষ আনাগোনা করে বলে বোধ হয় তাদের সংস্পর্শে এসে সে অল্প-স্বল্প হিন্দী শুনে-শিখে থাকবে। ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে সে জবাব দিলে, 'হাঁ বাবু। একেবারে মন্দিরের সামনেই একটা চোল্‌ট্রি। তার মালিক পাণ্ডা বা পূজার অধিকারী যাই বলুন না কেন মানুষটা খুবই ভালো। নাম তাঁর কৈলাস দণ্ডপাণিস্বামী দীক্ষিত। তাঁর ওখানে উঠবেন নাকি?'

'হ্যাঁ। তাই চল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে থাকব। আচ্ছা দীক্ষিত পাণ্ডার ঐ চোল্‌ট্রির রাস্তাটির কোনো নাম আছে নাকি?'

'তা আছে। রাস্তার নাম ইষ্টকার ষ্ট্রীট। আর চোলট্রির নম্বর হচ্ছে অষ্ট আশি।'

বুঝলাম, চোলট্রির খুব নামডাক আছে। আর এই লোকটা নিশ্চয়ই হামেশা যাত্রী ধরে নিয়ে যায় ওখানে। কিছু বন্দোবস্ত থাকাও আশ্চর্য নয়। ঠিকানা নাম-নম্বর সেজন্যেই বোধ হয় ওর ঠোঁটস্থ।

ছোট বড় বিভিন্ন রাজপথ হয়ে রিক্সা চলেছে। মধ্যে মধ্যে ছোট-খাটো দু'একটা মন্দির পড়ছে। সাবেকী ঢঙের বহু পুরোন বাড়িও দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আর্কট জেলার মধ্যে চিদাম্বরম। অনেক কালের প্রাচীন শহর। কাগজে-পত্রে জানা যায়, শৈবধর্মের পীঠভূমি হলেও এখানে নটরাজ ও গোবিন্দরাজের মন্দির পাশাপাশি। হরি ও হর সমভাবে পূজিত হচ্ছেন এখানে। পল্লব, চোল, পাণ্ড্য আর নায়ক রাজারা এখানে রাজত্ব করেছেন। প্রধানত তাঁদের দানে পৃষ্ঠপোষকতায় চিদাম্বরম শহর আর তার আশেপাশে মন্দির স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে উঠেছে। নন্দন্নার, তিরুনীলকাণ্ডার, মৈকণ্ড থেবর প্রমুখ সন্ত এবং মানিক ব্যাসগর, সেক্কীলার, অরুণমলি থেবর ও নাম্বিয়ান্দার নাম্বি প্রমুখ কবিগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় চিদাম্বরম বিভিন্ন ধর্মমত ও সংস্কৃতির প্রসারের অনুকূল পীঠভূমিরূপে প্রসারিত হয়েছে। শৈব আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাই এখানে কোনো বিরোধ বাধে নি।

চোলট্রির সামনে এসে রিক্সা দাঁড়াল। রিক্সাওয়ালা হোল্ডঅল আর সুটকেশ নিয়ে ভেতরে যেতেই দীক্ষিত মহারাজ আপ্যায়নের ভঙ্গীতে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—'আসুন।'

রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে পরিবেশটা এক চমকে পর্যবেক্ষণ করলাম। মোটামুটি মাঝারি ধরণের ধর্মশালা। ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরগুলো ছোট ছোট। তবে বেশ পরিষ্কার। বললাম, 'মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে থাকব। স্নান সেরে দেব দর্শন করতে যাব। তারপরে যা হয় কিছু মুখে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হব মনে করছি। আপনি আমাকে একটা ঘর দিন আর কী দিতে হবে বলুন।'

পাণ্ডাজীর মুখে হাসি লেগেছিল। ফর্সা গোলগাল চেহারা। বাঙালীর মতো। ত্রিকচ্ছ করে কাপড় পরা। খালি গায়ে শুভ্র যজ্ঞোপবীত। মুণ্ডিত মস্তকে পুষ্ট শিখা। ধীর স্থির ভাব। দেখলেই মহাশয় বলে সম্ভ্রম জাগে। মধুর ভাষণে উত্তর দিলেন—'সে যা হয় দিবেন তখন। আপনাদের কলকাতার বাঙালীবাবুরা এদিকে এলে এইখানেই ওঠেন। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। ওদিকের মহলে আপনি কুয়োটুয়ো সবই পাবেন। আসুন, আপনার ঘর খুলে দি।'

ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে আর একবার বিষয়টা পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করলাম। 'আপনার ব্যবস্থাপনায় যে কোনো কিছু অসামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে না এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, পাণ্ডাজী। শুধু যাবার সময় একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে বলে টাকার ব্যাপারটা আগেভাগে জেনে নিতে চাইছিলাম। আপনিও তো যাত্রী আর পূজো নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন।'

'তা বটে। তা একটা টাকা না হয় দিবেন আপনি।'

পাণ্ডাজী চলে গেলেন। স্নান সেরে মন্দিরের দিকে চললাম।

মন্দিরের প্রবেশ মুখে আকাশভেদী গোপুরম। গোপুরম যেন অনেকটা তোরণদ্বারের মতো। গোপুরমের চূড়া দেখতে গেলে ঘাড়ে ব্যথা লাগে। ভেতরে বিশাল মন্দির। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

সুসজ্জিত গ্রানাইট পাথর দিয়ে মন্দির, দেয়াল আর মন্দিরের কারুকলাকৃতি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরের চারদিকে চারটে গোপুরম। দুটি গোপুরমে কারুকলার অপূর্ব সুষমা। নাট্যশাস্ত্র ও নৃত্যভঙ্গিমার একশো আটটি ভঙ্গী বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়েছে পাথরের

দেয়ালে। গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের বিশাল চত্বরে প্রবেশ করলে পাঁচটি সুন্দর সুবিস্তৃত সভাগৃহ নজরে পড়ে। পাথরের বঙ্কিম বিচিত্র কারুকলা এই সভাপ্রাঙ্গণগুলোর বৈশিষ্ট্য। রাজসভা, দেবসভা, চিৎসভা, কনকসভা আর নৃত্যসভা—এই পঞ্চ সভাভবন পাণ্ড্য ও চোল বংশের সাক্ষ্য বহন করছে। রাজসভা ভবন দৈর্ঘ্যে তিনশো চল্লিশ ফিট, প্রস্থে একশো নব্বই ফিট—এক হাজার স্তম্ভের ওপরে ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। এই সুপ্রশস্ত সভাচত্বরে পাণ্ড্য আর চোল রাজগণ জয়োৎসব করেছিলেন। চিৎসভার আকাশলিঙ্গ আর কনকসভায় অভিনব নৃত্যরত নটরাজ শিবমূর্তি। নৃত্যসভা একাধারে ভাস্কর্য আর পাথরের খোদাই-কাজের এক অপূর্ব নিদর্শন। সমগ্র ভবনটি সুদৃশ্য রথের আকারে গঠিত, রথচক্র ও অশ্ব খোদাই করে তৈরী হয়েছে। সমস্ত সভাভবন আর দেয়াল যেদিকে তাকাই সজীব খোদাই নাচের মূর্তি নজরে পড়ে।

হর-পার্বতীর লীলানিকেতন দেখে বিষ্ণু বা বালাজী মন্দিরের দিকে গেলাম। পাশেই মন্দির। বিজয়নগর রাজাদের আমলে এই মন্দির খুবই প্রাধান্যলাভ করেছিল। এটিও আয়তনে কম বিশাল নয়। মন্দির-গাত্রে নানান খোদাই নৈপুণ্য চিদাম্বরম-মন্দিরের মতো। চারদিক ঘুরে দেখে মূল মন্দিরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরোহিত তুলসী চরণামৃত দিলেন। ভেতরে সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি, মাথার ওপরে ছত্রের আকারে শোভিত চক্রফণাযুক্ত বিশাল সর্প।

বিষ্ণুমন্দির দেখে চিদাম্বরম-মন্দির পরিক্রমা করলাম।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে এসে দেখি, দেবী পার্বতীর যাত্রা উদ্যোগ চলেছে। দেবী দেবদর্শনে আসবেন। ওদিকে সর্বতীর্থ পুষ্করিণী থেকে স্নান সেরে যাত্রীরা দলে দলে দেবীর শুভযাত্রা দেখতে আসছে। সুন্দর দেবী মূর্তি, বিচিত্র স্বর্ণাভরণে দেহ আচ্ছাদিত। দেবীকে দোলায় বসিয়ে পূজা আরতি শুরু হল। শুরু হয়ে গেল ডিমি-ডিমি বাজনা, রিমঝিমিয়ে উঠল সানাই। বাহকের দল দোলা তুললেন কাঁধে। যাত্রা হল শুরু। প্রথমে পথ করে এগিয়ে চলল রূপোর আসাসোঁটা হাতে পাইক-বরকন্দাজ। তারপরে বাদক যন্ত্রীদল। তারপরে দেবীর দোলা। বাহক ব্রাহ্মণ। খালি গায়ে শুভ্র যজ্ঞোপবীত। কোমরে উত্তরীয় বাঁধা। দোলার পেছনে শত শত ভক্ত।

দেব দর্শনপর্ব শেষ হলে দেব চিদাম্বরম দর্শন করতে গেলাম।

এদিক ওদিকে ভক্তের দল হোমপূজায় বসেছে। মাদ্রাজী পুরোহিতের উচ্চনাদের মন্ত্রোচ্চারণে চারদিক গমগম করছে। মন্দিরে উঁচু বারেন্দায় উঠে নটরাজ দর্শন করতে গেলাম। নটরাজ চিদাম্বরমের স্নানের আয়োজন চলছিল। তীর্থ জল, গোলাপজল, ডাবের জল আর দুধ দিয়ে স্নান হবে। ডাবের জল বার করার এক অভিনব ব্যবস্থা দেখলাম। চারদিক ঘেরা একটা পাথরের চত্বরের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা। এক একটা ডাব সবেগে সেই লৌহশূলে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। শূলে আটকে ডাবের ফুটো দিয়ে জল গিয়ে পাথরের চত্বরে পড়ছে, তার পরে নালিমুখ দিয়ে সেই জল পাত্রে ধরে এনে ঠাকুরের স্নান করানো হচ্ছে। প্রথমে প্রতীক মূর্তি স্নান করানো হল। তারপরে পূজা, অন্নভোগ। নৃত্যরত নটরাজ। কর্পূরের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

তারপরে আসল নটরাজ। ছোট্ট অষ্টধাতুর তৈরী মূর্তি। দৈর্ঘ্যে বোধ হয় ইঞ্চি ছয়েক হবেন। পুজোর সময় ছাড়া বাক্সে বন্দী থাকেন। প্রতীক মূর্তির মতো এঁর স্নান-পূজা সেইভাবে সমাধা হল। কলা চটকিয়ে সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দেওয়া হল। তারপরে গোলাপজলে স্নান প্রসাধন করিয়ে পূজা শেষে অন্নভোগে বসানো হল। পর্দা খুলতে দেখা গেল, ছোট্ট নটরাজ মূর্তি অন্নে ঢাকা পড়ে গেছেন।

নটরাজের প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

জয়তু নটরাজ চিদাম্বরম ধ্বনিতে তখন সমগ্র পরিমণ্ডল গম্‌গম্‌ করছে।

তবু বলে যাব

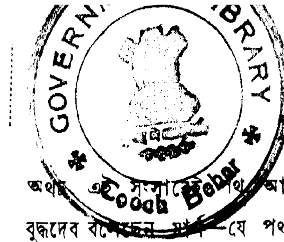
শান্তশীল দাশ

তবু বলে যাব, এই অন্ধকার শেষ সত্য নয়:
চিরন্তন আলো আছে, একদিন হবে তার জয়।
অনেক চোখের জলে সে-আলোর চলেছে সাধনা,
অনেক হৃদয় মাঝে নীরবে নিঃশব্দে আরাধনা
চলে তার যুগে যুগে। পূত শুদ্ধ অনেক জীবন
তপস্যায় মগ্ন আজো। আঁধার সমুদ্র সন্তরণ
করে যেতে হবে সেই নিরঞ্জন আলোকের তীরে:
এ মানুষ একদিন পৌঁছিবে সে আলোর মন্দিরে।

এই সত্য বার বার কানে শুনি; যতই আঁধার
দিগন্ত আচ্ছন্ন করে আসে, ঘিরে ফেলে চারিধার
হতাশার পুঞ্জীভূত কালো মেঘে। তবু এ প্রত্যয়
মনের গভীরে জাগে—এ আঁধার শেষ সত্য নয়।
আছে, আছে রাত্রি শেষে প্রভাতের স্নিগ্ধ আশীর্বাদ,
এ জীবন ধন্য হবে লভি সেই শাশ্বত প্রসাদ
চিরন্তন আলোকের; ঘুচে যাবে সর্ব অকল্যাণ।
নবারুণ দ্যুতি নিয়ে দেখা দেবে দীপ্ত বিবস্বান।

জ্ঞানের বিংশতি রূপ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত



জ্ঞান মানে জানা। প্রকৃত জ্ঞান কি? তার সাধনাই বা কেমন? জানাই মানুষের বিশেষত্ব। মনুষ্য, জীব বা পদার্থ সম্বন্ধে বাহিরের জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান তো নয়। যা দেখি, যা শুনি, যা স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি বা যার রসাস্বাদন করি—তা জীব ও পদার্থকে জানিয়ে দেয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু জানায় বাহিরের রূপ, বহিরাবরণ। অন্তরে তার এমন কোনো শক্তি আছে—যার প্রতিফলন মাত্র উপলব্ধি হয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানে। সে শক্তির সন্ধান ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঊর্দ্ধে মানুষ লাভ করে তার নিজের বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তায় মাত্র। কিন্তু রূপের একটা পিপাসা জন্মে মনে যার তাগিদে সে প্রবেশ করতে চায় ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধিও অন্তরের ভাবের উৎস মুখে। এই অনুসন্ধানের ঔৎসুক্য মানব চিত্তের বিশেষত্ব। অতি-বুদ্ধিমান এবং অতি-মূঢ় ব্যক্তির অন্তরে অবস্থিত যে 'অন্তরাত্মা', তার ভাবের সংসার আছে যেটা সংসারের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। যে অন্তর-দেবতা, সহজাত মানুষের সত্তায় সে বিদ্যমান। সে অন্তর-দেবতা প্রকৃত আত্মবোধ, সত্যের সন্ধানী, অভিব্যক্তির ঊর্দ্ধপথের সহায়ক। সে জ্ঞান আত্মা ঘিরে। তাই তাকে আমাদের শাস্ত্র বলেছে—অধ্যাত্ম—আত্মাকে অধিকার করা যায় যে জ্ঞানে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বহু বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন অর্জ্জুনকে—যা ব্যাসের কৃপায় জগৎ শুনেছে এবং চিরদিন শুনবে। তার মোট কথা—প্রতি অণু পরমাণু, প্রতি ধূলিকণা ও বিশাল নক্ষত্র, দীনস্য দীন কীটপতঙ্গ হ'তে অতিজ্ঞানী ঋষি-মুনি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত এক আত্মা। তিনি জ্ঞেয়। তাঁর সম্যক উপলব্ধি হলে ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হয়—তখন মোক্ষ।

এই মোক্ষ কী—এ বিষয়ে মতামত আছে। কিন্তু সম্যকজ্ঞান যে সংসারের কঠোর বন্ধনমুক্তির কারণ—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। আলেয়ার পিছনে ছোটার নামই সংসার। কেহ সক্ষম নয় সহজে সংসার পথ এড়াতে। সে পথ বাঁধে পথিককে একের পর এক বাঁধনে। অথচ এই সংসারেই পথ আছে যা প্রকৃষ্ট পথ—যাকে বুদ্ধদেব বলেছেন মার্গ—যে পথ ধরতে পারলে শান্তি ও আনন্দ ধামে পৌছান যায়। কর্ম্মজীবনে সে পথ জ্ঞানের পথ, ভক্তির পথ।

শ্রীকৃষ্ণ জীবনের সকল ভাব আলোচনা করে নানা উপদেশ দিয়েছেন সংসারী যোদ্ধাকে। গুণাতীত হবার পন্থা দেখিয়েছেন, অসুরবৃত্তির বর্ণনা দিয়ে দেব-শক্তির দ্বারা সে প্রবৃত্তি অতিক্রম করবার উপায় দেখিয়েছেন। কর্ম্ম যখন করতেই হ'বে, তখন শুভাশুভ ফলের আশা-নিরাশার প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে কাজ করতে হবে, সে শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে দিয়েছেন ভগবান। ভক্তিকে সকল কাজের শীর্ষে রেখে শরণ নেবার উচ্চ উপদেশ দিয়েছেন। জ্ঞানকে স্থান দিয়েছেন জীবন যুদ্ধের তে-রঙ্গা পতাকার এক অংশ জুড়ে।

নানাভাবে জ্ঞানের তথ্য বিবৃত ক'রে তিনি জ্ঞান কী সে কথা বলেছেন ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। কুড়িটি ভাব উল্লেখ করেছেন চরিত্রের—যা দিয়ে চরিত্র গড়লে মানুষ প্রকৃষ্টরূপ অধ্যাত্ম জ্ঞানের তত্ত্ব আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটিকে নিয়ে বিচার আলোচনা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি হবে তাদের অন্তর-নিহিত তত্ত্ব। তখন প্রতীয়মান হবে যে পূর্ব্বের বিষদ উপদেশ প্রত্যেকটির সার এই চরিত্র-গড়ার উপকরণের মাঝে নিহিত। পূর্ব্বে তিনি বলেছেন—যে আমাকে সবার মাঝে দেখে এবং সকলকে আমার মাঝে দেখে আমি সে লোকের দৃষ্টির অন্তরালে যাই না এবং সে ভক্তও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকে না। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন সকল কর্ম্ম তাঁকে সমর্পণ করতে। অনন্ত বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন, যার মাঝে মাত্র জীব নয়—ইন্দ্রাদি দেবতা বিরাজিত। তিনি চরিত্র গড়বার বহু উপকরণ নির্দ্দেশ করেছেন যার ফলে নিঃসংশয়ে সাধক প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হতে পারে জীবন সম্বন্ধে।

প্রকৃত পক্ষে রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য পবিত্র ধর্ম্ম উপদেশে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যক্ত করেছেন। যেমন সর্ব্বত্র গমন-

শীল বায়ু নিত্য আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্তই পরমেশ্বরে অবস্থিত। এই শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হলে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানের রূপ হবে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। তিনি যখন জগতের পিতা মাতা ধাতা,—

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম—

তখন আর ভেদাভেদের অবকাশ কোথায়—জীবে জীবে। তিনি স্পষ্ট উপায়ও বলেছেন—যা কিছু কর, যা কিছু ভোগ কর, যে ভাবে হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর—সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।

ধীর ভাবে বিবেচনা করলে কী প্রকৃত জ্ঞান আত্ম-প্রকাশ করে না যে—আমিত্বের উচ্ছেদের ব্যবস্থাই প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনা?

আর একটা কথা বলি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে বিশ্বরূপ দর্শনের পর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া—গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ, সেই রূপ দর্শনের'পর, যে জ্ঞান কথিত হয়, সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা।" এইবার আলোচনা করা যাক—চরিত্রের কোন বিশিষ্টতা অর্জ্জন করার নাম জ্ঞান। তিনি বল্লেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বম হিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এবচ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু
নিত্যংচ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এ তজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২

জ্ঞানের এই উপকরণগুলি, একে একে আলোচনা করলে বোঝা যাবে তাৎপর্য্য, কেন ভগবান এগুলিকে বল্লেন জ্ঞান এবং কেন বল্লেন এদের বিপরীত গুণগুলি অজ্ঞান।

প্রথম অমানিত্ব।—আত্মশ্লাঘার অভাব। মানীর ভাবের অভাব। বলছেন না—তেমন কাজ হতে বিরত হতে যাতে মনুষ্য-সমাজে লাভ করা যায় সম্মান। কারণ যত বাড়বে বিদ্যা, তত হিত-সাধন করতে পারা যাবে জগজ্জনের। তার ফলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের উপকরণ সংগ্রহ হবে। তেজ, পৌরুষ, সাহস, বীরতা এবং বিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা মানুষ লাভ করে মান, কিন্তু সেই মানের মাত্রাকে নিজের কৃতিত্বের মাত্রা ভেবে আপনাকে মানী ভাবা মূর্খতা। অমানিত্বই জ্ঞান। অর্থাৎ জানাতে হবে যে মান আমার নয়—আমার কর্ম্মের সাফল্যের। সে কর্ম্ম আমি নিষ্কাম ভাবে করেছি। কারণ যৎকরোমি প্রভৃতি উপদেশে—কর্ম্ম তো আমি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছি। সকল কর্ম্ম তাঁর। মনে পড়ে সাধকের গান—তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি। মনে পড়ে—আমি মা তোর পোষা পাখি, যা শেখাও মা তাই শিখি। তাই তারা তারা বলার মত সাধু ভাব অর্জ্জনেও মান পাবার উপযুক্ত আমি নই। সেই অমানিত্ব ভাব নিজস্ব করলে অর্জ্জিত হয় প্রকৃত মাধুরী।—সে ভাব কী প্রকৃত জ্ঞান নয়? আমি মানী এ ভাব সত্যই মত্ততা। নিউটন বলেছিলেন—সাগরবেলায় যত বালি আছে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে আমি মাত্র তার একটির সন্ধান পেয়েছি।

তার পর দাম্ভিকত্ব। দম্ভের মত নীচ প্রকৃতি সকলেই নিন্দা করে সব দেশে। আমি এই ভীষণ কাজ করেছি সুতরাং আমি মস্ত বড়—এ ভাবকে ইংরাজিতি বলে ভাল্‌গার। বাংলায় চলিত কথায় বলে—আমি কী হনুরে। হনু মানে হলাম এবং হনুমান। যার দম্ভ নাই সেই জ্ঞানী। কারণ—"নিজেরে করিতে গৌরবদান নিজেরে কেবলি করি অপমান, আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।"

তৃতীয় অহিংসা। আমি আছি জগৎ ঘিরে সর্ব্বত্র। সুতরাং হিংসা—পরের অনিষ্ট মূর্খতা। অহিংসা জ্ঞান। সমস্ত জগৎ যে মায়ের খেলা। তিনি সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে—এ জ্ঞান উপলব্ধি হয় অহিংসায়, ভারতের কৃষ্টি—অহিংসা। বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রভৃতি ভগবানেরা যুগে যুগে এসে, সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করেছেন মানব-চেতনায়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

তার পর ক্ষান্তি। পরের অপরাধে অবিচল থাকা। এতে মহাজ্ঞান উপস্থিত হয়। পরে দোষ করলে, ক্ষান্ত ভাব বুঝিয়ে দেয় যে—অসুর শক্তির তাড়নায় আমরা প্রতি-মুহূর্তে দেহের কর্ম্মে না হক, মানসিক ভাবেও কত সময় পরের প্রতি অবিচার করছি। সুতরাং ক্ষান্তি আয়ত্ত না করলে নিজের কী দশা হয়। ক্ষান্তি জ্ঞান। এ জ্ঞান লাভ করলে জীবন-পাহাড়ে উচ্চে ওঠা যায়। আমি ক্ষান্তি না হলে পরপক্ষ আবার অন্যায় করবে। তাতে বৈরিতা বাড়বে—ক্রোধ হতে মোহ বুদ্ধিনাশ প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে তিনি বলেছেন। সুতরাং অহিংসা, ক্ষান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলির ভাব অফুরন্ত মঙ্গলময়।

আর্জ্জব—ঋজুতা, সরলতা, অবক্রত্ব। সোজা সরল আচরণ সত্যই পরকে ও আপনাকে মুগ্ধ করে। বাঁকা কথা, বক্রগতি হেয়। তাই আর্জ্জব, সরলতা জ্ঞান। এ জ্ঞান চরিত্র গড়ে সাধু ভাবে। সরলতা সত্যকথা, সত্য ভাব, সত্য প্রকৃতির পরিচায়ক। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

আচার্য্যোপাসনা জ্ঞান। গুরুসেবা, বাপ, মা, শিক্ষা-গুরু দীক্ষা গুরু সকলকে সুশ্রূষাদি প্রয়োগে সেবা করা কি জ্ঞান নয়? নিশ্চয়। একটি কথার মাঝে লুকানো আছে বিনয়, নম্রতা, পরসেবা, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, ভক্তি সকল কথা। মনে পড়ে পরমহংসদেবের গল্প। তিনি তো সেবা নিতেন না। কিন্তু সেবার উদ্দেশ্যে তাঁর সান্নিধ্যও জ্ঞান-সাগরে মনকে স্নান করানো। শ্রীমা, শ্রীগৌরীমা প্রভৃতি ধন্য হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়—যার ফলে তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন।

শৌচ—জ্ঞান। কেবল দেহের ময়লা দূর করা শুচিতা নয়। দেহ পবিত্র হ'লে স্বাস্থ্য লাভ হয়। দেহ-দৌর্ব্বল্য মনকে দুর্ব্বল করে। তাই শুনি শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্ম-সাধনং। শুদ্ধ দেহের উদ্দেশ্য মনের শুচিতা লাভে সহায়তা। শুদ্ধ মনে তো হিংসা, দ্বেষ, পরের উৎসাদন-চিন্তা, পরনিন্দা, প্রতিপক্ষ ভাবনা রাগাদি মল জন্মিতে, বর্দ্ধিত হতে এবং সাধককে বিনষ্ট করতে পারে না। তাই শুচিতা—জ্ঞান স্থৈর্য—স্থিরতা। অজ্ঞানী অস্থির। মন-স্থির না হ'লে কোনো কাজ হয় না। তাই যোগ—চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এই একটি ভাব আয়ত্ত করবার পরামর্শ দিয়ে চতুর শ্রীকৃষ্ণ—জ্ঞানের এক প্রধান উপকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

তার পর অষ্টম জ্ঞান আত্মবিনিগ্রহ—নিজেকে নিশ্চিত রূপে সংযত করা, আয়ত্ত করা। ইন্দ্রিয়-ঘোড়ার লাগাম টানা অত্যাবশ্যক। মন তো সদাই ছুটছে। তাকে টেনে ধরে আসল পথে না চালালে জীবন-শকট পড়বে পঙ্কিল গর্ত্তে। :আত্মসংযম চরিত্রগঠনের মূল। এ জ্ঞান জীবনের সকল পথে সহায়তা করে মানুষকে। আত্মজয়ই জগজ্জয়। সুতরাং এ জ্ঞান অর্জ্জন না করলে জীবন হয় উন্মার্গ, বিপথ-গামী।

নবম জ্ঞান—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে বিরাগ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ক্ষণেক সুখ। প্রকৃত তৃপ্তি আসবে কোথায়—যেথায় তৃষ্ণা চিরন্তন। ইন্দ্রিয় লাভ করেছে মানুষ—তার দ্বারা জগতের নানা ভাব এবং বিষয় সমূহ জানবার জন্য, জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান—মাত্র সেবক, সংগ্রাহক। তাদের সহায়তায় যা জানা যায়, সে জ্ঞান অন্য সিদ্ধান্তকে পরিপুষ্ট করবার মাধ্যম মাত্র। তাই তার বিষয়ে আসক্তি—অজ্ঞান। ফুলের রূপ গন্ধ, পেলব স্পর্শ মাত্র প্রকাশ করে বাহ্যগুণ। তাইতে আসক্তি মাত্র রাখলে তার অন্তরের রহস্য তো বোঝা যায় না। ফুল হতে ফল হয়, ফল হ'তে বীজ হয়, বীজ হতে জন্মে নূতন গাছ। এ সব তথ্য আর বোধগম্য হয় না তার—যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ চরম আনন্দ বলে ভ্রম হয়। তুচ্ছ লাভে বিরাগ প্রকৃত জ্ঞান যা সহায়ক প্রকৃত পরম জ্ঞেয়র—অনুসন্ধানের সহায়ক। ইন্দ্রিয় বিসর্জ্জন দিতে বলেন নি ভগবান তার তুচ্ছ অর্থে বৈরাগ্য জ্ঞান কবি বলেছেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বাররুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

তার পর অনহংকার। অহঙ্কার অজ্ঞান, কারণ অহঙ্কারী আত্মঘাতী। কবি সত্যই বলেছেন—নিজেরে করিতে গৌরবদান নিজেরে কেবলি করি অপমান।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শন—জ্ঞান। দেহের প্রতি মায়া সাধারণ সংস্কার। সকল আমিত্ব, অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প প্রভৃতির আগার দেহ-ঘেরা আমিত্ব। সত্যই তো এ অজ্ঞান। তবে জ্ঞান কি এ বিষয়ে? এমন উপায়ের

সন্ধান এবং সেই সত্যমত জীবন পালন যাতে পুনর্জ্জন্ম না হয়। তাই জ্ঞান। প্রথমতঃ স্পষ্ট করে দেখা যে জীবনের প্রথম আর্য্য সত্য দুঃখ। এই বোধই জ্ঞান। এ জ্ঞান জাগলে মানুষ আর দেহ ঘেরা এ জীবনের গৌরবে আত্মহারা হতে পারে না। কারণ জীবনের সকল অবস্থা দুঃখময় অস্তিমে। তখন পুনর্জ্জন্ম কিসে না হয় সে চেষ্টা, হয় নিষ্ঠা। সে জ্ঞান হলে দুঃখ অতিক্রম করবার কৌশল আয়ত্ত করা যায়। কারণ দুঃখ যেমন আর্য্য সত্য—দুঃখ অতিক্রম করবার সাধ্য ওক্ষমতাও তেমনি জীবনের মূল সত্য।

এ জ্ঞান লাভ করতে গেলে অনুদর্শন করতে হবে দুঃখের সব উপকরণ। জন্ম সত্যই দুঃখের কারণ হয়—যদি ভ্রান্ত পথে চলে জীব। আদর্শ পথে ক'জন পারে চলতে? এ ধারণাই জ্ঞান। মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ কথা। সে জন্মের দোসর এবং দুঃখের বাহক। জরা, ব্যাধি সকলই কষ্টময়। এ দর্শন জ্ঞান মানুষের সম্পত্তি হলে চলবার পথ হয় মঙ্গলময়। চারটি আর্য্যসত্য দুঃখ সম্বন্ধে, ভগবান বুদ্ধ উপলব্ধ দর্শনের মূল।

> দুক্‌খং দুক্‌খ সমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স য অতিক্কমং
> অরিয়ং চট্‌ঠাঙ্গিকা মগ্‌গং দুক্‌খূপসমগামিনং

চারটি আর্য্যসত্য—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ শান্তকারী আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ।

অবশ্য এর বিশেষ আলোচনা বিভিন্ন প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বুদ্ধদেব ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন দুঃখকে জীবনের মূল সত্য বলেছেন, তেমনি তার অবসান ও তার উপায়কেও আর্য্যসত্য মানতে শিখিয়েছেন। এই জন্ম-মৃত্যু-দুঃখের অবসানের উপায় গীতার একটি শ্লোকের উল্লেখ এখানে সমীচীন হবে—

> জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে
> তে ব্রহ্ম তদবিদ্বঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্মবাখিলম।

জরামরণ মোক্ষ হেতু যে আমাকে আশ্রয় পূর্ব্বক সাধনা করে, তাহারা ব্রহ্ম এবং সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় এবং সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্ব বোঝেন। এমন সাধনায় তাঁকে পাওয়া যায়; এবং তাঁকে লাভ করলে এই অশাশ্বত দুঃখালয়ে পুনর্জন্ম লাভ হয় না।

অসক্তিরণভিষ্বঙ্গ পুত্রদার গৃহাদিষু—পুত্র, স্ত্রী গৃহাদিতে অসক্তি এবং অনভিষঙ্গ। এই জ্ঞান। এ জ্ঞান উপার্জ্জন করলে এমন হবে না যে স্ত্রী, পুত্র, সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে—দূর ছাই বলে এবং তাঁদের সুখ দুঃখে তাদের যা হয় হ'ক—তার সুখের পোষণ করা বা দুঃখ মোচন করবার কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উদাসীন হওয়া। গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলি—"জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—এই তিন মার্গ পরস্পর বিরোধী নহে, কর্ম্ম-মার্গে জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে ভক্তি-লব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাহারই আদিষ্ট কর্ম্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা। আমি এ বিষয় অন্যান্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি এবং সংসার সংগ্রামে জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হবার হিতার্থে তে-রঙ্গা পতাকার কথা বলেছি।

সুতরাং পুত্রদারগৃহকে অবহেলা ক'রে, তাদের হিত-সাধন নিষ্কামভাবে না করে পলায়ন—আলস্য বা অকর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম নয়। যে শাস্ত্রের শিক্ষা—জীবন উৎসর্গ করতে হবে জগদ্ধিতায়, সে শাস্ত্র সকলকে সংসারকে উপেক্ষা করতে শেখায় নি। বিশেষ যেখানে ভক্তির লক্ষণ সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—যার সঙ্গে উপমিত তার আকর্ষণ হৃদয়ঙ্গম না করলে তেমন ভক্তি জাগবে কী প্রকারে। এমন কী দাসের সেবার গভীরতা জানলে তবে মানুষ শ্রীভগবানের সেবার আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবে।

শ্লোক বলছে—অসক্তির কথা। আসক্ত হবে না—এই জ্ঞান। কর্ত্তব্য করবে কিন্তু হরির দয়ার শরণ নেবে, বুঝবে সংসারটা মাত্র নিজের স্ত্রী পুত্রে অধিকৃত নয়। প্রেম বিশ্ব-ব্যাপী করতে হবে—স্ত্রীপুত্রের বা নিজের সুখ দুঃখের ফলকামী হ'লে অজ্ঞতা জয়ী হবে—জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করবে না। প্রীতিমাত্রের অভাব অসক্তি। সম্প্রসারণ উন্নতি। মাত্র নিজের জনের চিন্তা সঙ্কীর্ণতা।

অনভিষঙ্গ—অভিষঙ্গের অভাব। অভিষঙ্গ শক্তি-বিশেষ। অনন্য ভাবনার লক্ষ। পুত্রই আমি—তার সুখে আমার সুখ, না হলে কী প্রমাদ ঘটবে—এই অনন্যভাব ঘোর স্বার্থ-পরতা। স্বার্থপর ভাব পরিবর্জ্জনীয়। সুতরাং—পুত্রদারাদির সহিত অনন্য সঙ্গ হওয়ার যে লঘুভাব সে অজ্ঞান। তার সুখে দুঃখে আমি সুখী দুঃখী—তার জীবন

মরণ আমার জীবন মরণ—মাত্র এই ভাবের অভাবই জ্ঞান। কর্ত্তব্য তাদের হিতসাধন। কিন্তু মাত্র নিজের সংসারে মজে থাকা অজ্ঞান।

শঙ্কর ভাষ্য—পুত্রদার গৃহাদি শব্দের আদি দাসবর্গাদি বুঝিয়েছে। দাসকেও যত্ন করবে, তার হিত করবে, তার সেবায় মহত্ত্ববোধ করবে। কিন্তু অভিষঙ্গ বর্জ্জন করতে হবে। দাসকে না বুঝলে সেবার মাহাত্ম্য বোঝা যায় না। সেই শিক্ষা ভগবান-সেবায়, সুতরাং জনসেবায় নিয়োগ করলে—তবে অর্জ্জিত হবে জ্ঞান। মোট কথা—

প্রেয়সীর প্রেমে
মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এসো নেমে।
সকল সংসার বন্ধে বন্ধন বিহীন
তোমার মহান মুক্তি থাক্ রাত্রিদিন।

ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তম্—জ্ঞান। অর্থাৎ ইষ্টই লাভ হ'ক, অনিষ্টই লাভ হ'ক, সর্ব্বদা অন্তঃকরণের সমভাব। বলা বাহুল্য—এ শিক্ষা গীতার অন্যতম মূল শিক্ষা কর্ম্মযোগের। লাভ-অলাভে, জয়ে-পরাজয়ে আনন্দ বা বিষাদ পরিত্যাগ করাই কর্ম্মের কৌশল। জ্ঞান যোগ করলে কর্ম্মে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে কর্ম্মের ফল ভেবে অভিভূত হওয়া অজ্ঞান, কর্ম্মের স্বভাব দেখে কোনো কর্ম্ম করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয় স্থির করতে হয়।

কিন্তু সে বিচারও শেষ সিদ্ধান্ত নয় কর্ম্ম সম্বন্ধে। ঈশ্বরের শরণাগত হ'য়ে যা করি, যা খাই, যেমন ভজনা করি, সব তাঁর নামে আরম্ভ ক'রে তাঁকে কর্ম্মফল সমর্পণ করবার শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের। তাই তিনি অন্য জ্ঞানের কথা বললেন—

ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—জ্ঞান। কাজেই অভক্তি—অজ্ঞান। অনন্য যোগ বা ব্যভিচারিণী ভক্তিও অজ্ঞান।

এ বিষয়ে অন্যান্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। মোট কথা বলি—ভগবানকে ভক্তি করতে হবে—পূর্ণভাবে। ভক্তি হবে ঐকান্তিক। বৈষ্ণব শিক্ষাধন্য বাংলাদেশ ভক্তি-যোগের শিক্ষা পেয়েছে স্বয়ং মহাপ্রভুর মুখে। সকল কবি, ভক্ত, গায়ক, আউল, বাউলের গীতিছন্দে। শ্যামা সঙ্গীত এদেশে প্রেম বিলিয়েছে সুতরাং রামপ্রসাদ প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব কবি—যদি ভক্তি বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ হয়। পরমহংসদেব ভক্তিরসের স্রোত বহিয়েছেন দেশে—ব্যাকুলতা ও শরণের বাস্তবরূপ প্রকটিত করে। রবীন্দ্র-কবিতা ভক্তি-রসের মাধুরী বিস্তার করেছে। এখানে আমি শ্রীঅরবিন্দের একটা কথা পাঠকের গোচর করছি। তিনি বলেছেন—"ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পন্থা। ইহাকে আত্ম-সমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভার শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী।"

দুর্য্যোধন বলেছিলেন—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

দ্রুপদরাজ বলেছিলেন—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
যক্ষঃ পিশাচমনুজেষ্বপি যত্র যত্র
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
তস্যেব ভক্তি রচনাঽব্যভিচারিণী চ।

কর্ম্মফলে নানা জীবরূপে জন্ম সম্ভব। দ্রুপদরাজ বল্লেন—তাহোক। যে ভাবেই জন্মাই—যেন তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।

মহাকবি, মহাপণ্ডিত, মহাভক্ত, মহা-প্রেমিক মহাপ্রভু স্বয়ং বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

ধন, জন, সুন্দরী কবিতা এমন কি চাহি না মোক্ষ (পুনর্জ্জন্ম না হওয়া)। চাই জন্মে জন্মে পুনর্জ্জন্মে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি।

এই তো পরমানন্দ যা প্রকৃত হরিপ্রেমে লব্ধ। তাই মীরা বলেছিলেন—

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

একটা কথা নিবেদন করি। বহুবার বলেছি আবার বলি। জ্ঞান এবং ভক্তির মাঝে কোনো প্রাচীর নাই।

এ কথা স্পষ্ট বোঝালেন এ শ্লোকে জ্ঞানের উপকরণে অনন্ত-ভক্তির উল্লেখ করেছে। ভক্তের একান্ত মনোনিবেশে জ্ঞানলাভ হয়, কারণ ঈশ্বর ব্যতীত তো কিছু নাই। ভক্তিতে তাকে হৃদয়ে ধারণ করলে সকল অজ্ঞান দূর হয়। একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন। ধরুন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবং সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

বহুজন্মের অন্তে জ্ঞানবান আমাকে পায়। জ্ঞান প্রকৃত হ'লে তাঁর দর্শন হয়। কিন্তু মাত্র জ্ঞানে লাভ করতে পারা যায়—তাঁর দর্শন। কি জ্ঞান কী হয়? বাসুদেব সর্ব্বমিতি। সমস্তই বাসুদেব। এতো ভক্তিমার্গের সিদ্ধি। জ্ঞানেরও সিদ্ধি; সে সিদ্ধি যে লাভ করে সে মহাত্মা। সে সুদুর্ল্লভ।

এমন সব শ্লোক গীতার বহুস্থলে। তাই সংশ্লেষণ ক'রে তিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জ্ঞান বল্লেন। সুদুরাচার ভক্ত ও সাধু (৯।৩০)। তাঁর ভক্তের বিনাশ নাই ইত্যাদি বহু বাণী শুনি তাঁর শ্রীমুখে। অতঃপর—বিবিক্ত দেশসেবিত্ব—জ্ঞান। ব্যাঘ্র-সঙ্কুল স্থানে বসে মানুষ কোনো কর্ম্ম করতে পারে না। তেমনি পারে না—সাপের ভয়ে, চোরের ভয়ে, দুষ্টলোকের কোলাহল পরিপূর্ণ স্থানে। সুতরাং যে জ্ঞানী সে এমন স্থান বাসোপযুক্ত মনে করবে—যেথায় সে অপ্রতিহতভাবে পরমার্থ চিন্তা করতে পারবে, জীবন রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে বাধা পাবে না। সকল শক্তি যদি অপচয় হয় গণ্ডগোলে—তো মানুষ উঠবে কেমন করে। ঋষিদের আশ্রম ছিল শান্তিময়। ঘোর সংসারী যখন নিরালায় পুকুরপাড়ে, নদীর ধারে, সাগর সৈকতে বা বনের মাঝে বসে, কী না তার আনন্দ। অবশ্য জ্ঞানী আত্মসংযম করে বলতে পারে

সব কোলাহলে যেন দিনমান
শুনি অনাদি অনন্ত গান,
সবার সঙ্গ যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।

কিন্তু সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট। তাই এটা জানা আবশ্যক যে জনসংসদের অর্থহীন বৃথা চিৎকার ঘটায় অজ্ঞান। তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

অরতির্জনসংসদি—জ্ঞান। জনকে অবহেলা করতে তিনি শেখাননি। জনসংসদকে উপেক্ষা করতে, হেয় জ্ঞান করতে তিনি উপদেশ দেননি। তিনি আসক্তি রাখতে মানা করেছেন—জনসভায়। তাদের শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য—যা যৌবনে কানা প্রভৃত হইতে নিত্যানন্দ প্রভু পালন করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ, প্রভু যীশু, মহাপ্রভু প্রভৃতি জনসংসদকে দীক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা যখন হুজুকের জন্য জনসভার গণ্ডগোলে যোগদান করি—তখন প্রকাশ পায় মূর্খতা! তাই সেথায় রতি বা আসক্তি থাকা অজ্ঞান—অরতি জ্ঞান।

এই দুটি জ্ঞানকে সেবা, ভক্তি ও প্রেমের রূপ দিয়েই যেন কবি গেয়েছেন প্রকৃত বিভক্ত দেশ সম্বন্ধে—

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

আর

তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে
কর্ম্ম পারাবার পারে হে
নিখিল জগত-জনের-মাঝারে
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে

জনসংসদির মাঝে তাঁকে দেখা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—সংসদির প্রতি অরতি।

সকল জ্ঞান আত্মাকে ঘিরে। আত্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান। আত্মা কি? কী তার তত্ত্ব? সে তত্ত্বদর্শন—এই হ'ল জ্ঞান। শ্রীহরি বল্লেন—

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্ব—মাত্র জ্ঞান নয়—নিষ্ঠা অপসরণ হবে না—নিত্য থাকবে জ্ঞান আত্মা ঘিরে। মনের জ্ঞান নয়, শ্লোক উদ্ধার নয়, তর্কের জন্য পাণ্ডিত্য নয়। নিজস্ব করা জ্ঞান—

তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ দর্শনের জন্য—যশের জন্য নয়, পাণ্ডিত্যাভিমানের জন্য নয়।

এ বিষয় মনে রাখতে হবে কঠোপনিষদের শিক্ষা তবে বোঝা যাবে। আত্মা-বিষয়ক জ্ঞান—অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং তার তত্ত্বদর্শন কী?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনূংস্বাম্।



ইতিহাসের কথা

উপানন্দ

বাংলা দেশ খণ্ডিত। এখানে তোমরা জন্মেছ। এটা তোমাদের ন্মভূমি। এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলেছে, কোন সঠিক দ্ধান্ত এখনও আসা সম্ভব হয় নি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যা বলেন, তাই নরুক্তি করা হয়, পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়। তাঁদের মতে বাংলা দেশটার ৎপত্তি হয়েছে হিমালয়ের ধোয়াটে সমুদ্র মজে। শীতের শেষে ষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের বুক থেকে বরফ গলে, আর বর্ষাকালে মালয়ের গা বেয়ে জলধারা নেমে এসে বালির ওপর দিয়ে চলতে চলতে ষ্টি করেছে নদী। হিমালয়ের গাত্রধৌত মৃত্তিকা থেকে উদ্ভব হয়েছে এই স্তীর্ণ দেশ। এজন্যেই এটা সমতল—পর্ব্বতাদি পরিশূন্য। তাঁদের রণা প্রাচীন বাঙলাদেশ শবর বা সাঁওতাল জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। রুণ বর্ষার জলধারা যখন ভূধর গাত্র থেকে সমতল ক্ষেত্রে নামতো তখন, লস্রোতে পর্ব্বত গাত্র হোতে ভেসে আসতো বড় বড় শাল সেগুন গাছ ৎপাটিত হয়ে ; ওরা বেগে চালিত হোতো নদীর ওপর দিয়ে। সেইসব ছের ওপর চড়ে করতালি দিতে দিতে আর গান করতে করতে সমতালে সে উপনিবেশ স্থাপন করতো। আদিশূরের পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশ ছিল—ার আর্য্যরা বাস করতে পারেন, এরূপ ধারণা আমাদের ভেতর নেকেরই নেই।

ভূতত্ত্বের হিসেবে বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হোতে পারে ন্তু তাই বলে দুএক হাজার বছর আগে এই জায়গায় বিশাল সমুদ্র স্তৃত ছিল না। আর্য্যরাও দেড় হাজার দু হাজার বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে সে বাস করেন নি। কোন্ স্মরণাতীত যুগে বাঙ্গলায় আর্য্যরা এসেছেন সপ্রমাণ করা কঠিন। কেউ কেউ বলেন, বেদের সংহিতা ভাগে অঙ্গ প্রভৃতি দেশের নাম নেই। অতএব ধারণা করে নিতে পারা যায়, দি এর অস্তিত্ব থেকে থাকে, তা হোলেও বাঙলাদেশ আর্য্যদের অপরিাত ছিল।

ঋগ্‌বেদে কীকট দেশের নাম আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন, এটাই বর্ত্তমান বেহার। কীকট বর্ত্তমান কালের দিনাজপুর জেলার উত্তর পর্য্যন্ত প্রসৃত ছিল। অথর্ব্ব বেদে বগধ নামে একটি দেশের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন বগধ থেকে মগধ হয়েছে। কোথাও ঐসব দেশের চতুঃসীমা নির্দ্ধারিত নেই। এসব অঞ্চলে যে আর্য্যরা বাস করতেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ সংশয় আছে। অথর্ব্ব বেদে অঙ্গদেশের নাম আছে। অঙ্গ বৈদ্যনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অঙ্গদেশের নাম থেকে বঙ্গ দেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে, অতিপ্রাচীন কালে পূর্ব্ব ভারতে গঙ্গাতীরে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পাঁচপুত্র অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ। তিনি নিজ রাজ্য পাঁচ-পুত্রকে ভাগ করে দিয়ে যান পাঁচটি দেশে—এদের নামেই নামকরণ হয়েছে পাঁচটি দেশের।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরাব্দ প্র›লিত হয়। যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর অতীত হোলে বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত সংবৎ প্রচলিত হয়। এখন ২০১৮ সংবৎ অর্থাৎ ৫০৬২ যুধিষ্ঠিরাব্দ। এইটি কলিগতাব্দ নামে পরিচিত। সুতরাং পাঁচহাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, আর মহাভারত রচিত হয়েছিল অল্পকাল পরেই। মহাভারতও পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থে বাংলার নাম আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অঙ্গদেশের নাম সর্ব্বজনবিদিত ছিল। কর্ণ ছিলেন অঙ্গদেশের অধিপতি। ভীমসেন বঙ্গ ও সুহ্ম দেশ জয় করেছিলেন।

মহাভারত প্রণীত হবার অন্ততঃ পাঁচ ছয়শত বৎসর আগে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্মদেশের নামকরণ হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। তাহোলে এটা অস্বীকার যায় না যে, অন্ততঃ সাড়েপাঁচহাজার বছর আগে বাংলা দেশে মানুষের বাস ছিল। চরণব্যূহ ভাষ্যে লিখিত আছে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের ব্রাহ্মণেরা বাজসনেয়ী সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখা-

ভুক্ত। বেদব্যাসের রচিত ও চারিবেদের বিবরণ শাস্ত্রকে চরণব্যূহ বলে। এটি বেদের অন্তর্গত। এ'তে বুঝা যায়, অন্ততঃ সাড়ে চারি হাজার পূর্ব্বে আর্য্যরা বাঙ্গলা দেশে বসবাস করছিলেন। তবে বাঙ্গলাদেশের অনেক জায়গাতে চণ্ডাল, পোদ প্রভৃতি জাতি বাস করতো। এরা আর্য্যবংশ সম্ভূত, ব্রাহ্মণের রক্ত এদের ধমনীতে প্রবাহিত—একথা মহাভারতাদিতে উক্ত আছে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে—ভীম সেন বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাংলার রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। রামায়ণে বাংলার কথা উল্লেখ আছে। এটি রাজা দশরথের অধীন ছিল। অতএব তখন যে এদেশে আর্য্যদের গতিবিধি ছিল না, এটা সম্ভব হতে পারে না। তবে এদেশে বন, জঙ্গল, ও জলাকীর্ণ ভূমি প্রচুর ছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় পাওরা যায়। উল্লিখিত প্রমাণের সাহায্যে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, বাঙ্গলা অতি প্রাচীন দেশ। এর কোন কোন জায়গা জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাকীর্ণ থাকলেও দেশটি একেবারে মনুষ্যবাসের অযোগ্য বা আর্য্যগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন স্মৃতিতে বাংলায় তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা আছে। রামায়ণের যুগ থেকে বাংলায় হিন্দুর তীর্থ ছিল। এটি অস্বীকার করবার উপায় নাই।

অবশ্যই সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল। পরবর্ত্তীকালে প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা ডিঙা নিয়ে পৃথিবীর নানাদেশের বন্দরে বন্দরে উপস্থিত হয়েছে—নানা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, জয় করেছে সিংহল প্রভৃতি দেশকে। বাঙ্গলাদেশ অতি প্রাচীন—আর এর অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম্মে আচার ও আচরণে আর্য্য-দ্রাবিড় সভ্যতার সংমিশ্রণে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও কীর্ত্তি অবলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ বৌদ্ধ বিপ্লব। একদা বৌদ্ধধর্ম্ম মগধ থেকে বেরিয়ে নানাদেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, বৌদ্ধরা আর্য্যসভ্যতার বহু নিদর্শন নষ্ট করে দেয়। সমগ্রবঙ্গ বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আদিশূরের পূর্ব্বে বোধ হয় এদেশে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল। সে সময়ে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষরা এদেশে আনীত হয়েছিলেন। তারপর আদিশূরের পর থেকে এদেশে ব্রাহ্মণধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। এরপর থেকে বৌদ্ধদের ওপর ঘোর নির্য্যাতন হোতে থাকে। শূন্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই নির্য্যাতনের ফলে এদেশের অধিবাসীরা সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে যায়—তারা উত্তরকালে নিরক্ষর ও অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষিত হয়। সুতরাং এদের ইতিহাস কেউই যত্ন করে রাখেনি। এখনও স্থানে স্থানে ইতর জাতির মধ্যে ধর্ম্মপূজা সেই নির্য্যাতন-পীড়িত বৌদ্ধদের ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষা করছে। কম্বোজাদি দেশে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত বিস্তার হয়েছে, বাংলাদেশেও আদিশূরের পূর্ব্বে প্রায় সেইরূপ হয়ে ছিল। তাই সেই বিপ্লবের তরঙ্গে অতীত গৌরবকাহিনী বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে।

বর্ত্তমান যুগের সতর্ক অনুসন্ধানেও ঐ সব লুপ্ত তথ্যের অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। স্বল্প-গভীর স্থির জলে আলোক সম্পাত করে সময়ে সময়ে তার তলদেশের চাকচিক্যশালী পদার্থের উপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে সেই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্তি ঘটে থাকে। জলের গভীরতা যত অধিক হয়, ততই স্বরূপ নির্ণয় অধিকতর কষ্টসাধ্য ও ভ্রম সঙ্কুল হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্য যতই কালস্রোতে ডুবে যায় ততই তার যাথার্থ নির্ণয় একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে জন্যেই এদেশের অতীত ইতিহাসকে বিস্তৃত সাগর হোতে উদ্ধৃত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়েছে। প্রাচীন ভারতেরও বিশ্বাস যোগ্য কোন ইতিহাস বর্ত্তমানে নেই।

বর্ত্তমানে ভূখননের দ্বারা অতীতের ইতিহাস কিছু কিছু উদঘাটিত হচ্ছে সত্য, কিন্তু ইতিহাসের যোগসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকায় ঐতিহাসিক ও গবেষককে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, বেদ ইতিহাস প্রভৃতি যুগান্তে বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। মহর্ষিরা ব্রহ্মার আদেশে তপস্যা দ্বারা ওর উদ্ধার সাধন করেন। ধর্ম্ম বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লবে নানাশাস্ত্র ইতিহাস ও কীর্ত্তি কাহিনী কত যে বিলুপ্ত হয়েছে, তা চিন্তা করেও শেষ সিদ্ধান্ত আসা যায় না। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ও বহু দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তা ছাড়া হিন্দু ধর্ম্মকে বহু অত্যাচার ও বিপ্লব সহ্য করতে হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মই এর ওপর শেষ প্রবল আঘাত করেছে। এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মকে কতদূর সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল, তার ঠিক অনুমান এখন অসম্ভব।

দুইজন চীন-পর্য্যটক ও একজন প্রবাসী গ্রীকের সাক্ষ্য-বাক্যে নির্ভর করে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সমীচিন নয়। তবে এটাও সত্য যে, অন্য প্রমাণের অভাবে, এঁদের প্রমাণ বলবৎ বলে মান্‌তে হয়। মানলেও তা'তে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বিশেষতঃ এঁদের লিখিত গ্রন্থে সব সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়নি। হিন্দু ধর্ম্মের পুরোহিত ব্রাহ্মণরা নিরতিশয়যত্নে ও অতি সন্তর্পণে নিজেদের নিতান্ত আবশ্যক ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি রক্ষা করেছিলেন, ইতিহাস ও কাব্যাদি রক্ষা করতে পারেননি। বিশেষতঃ ইতিহাসগুলি রাজাদের ঘরেই রক্ষিত হোতো। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরও হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ভারতীয় জন সমাজকে আমূল আলোড়িত করেছিল এরপর কত বিপ্লব যে, হিন্দু সমাজের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা করা কঠিন। এত বিপ্লব সহ্য করে ও যা ছিল মুসলমানদের আক্রমণ জনিত রাষ্ট্র বিপ্লবে তা ধ্বংস হয়ে গেছে। কেবল বৌদ্ধযুগের কতকগুলি কীর্ত্তিমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। হিন্দুদের সময়ের ভাস্কর-কার্য্য ও স্থপতি কার্য্যের চিহ্নমাত্রই নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—যেটুকু আছে তা আমরা পাই দেব দেউলের দেশ দক্ষিণ ভারতে। জরাসন্ধের কারাগারের ভগ্নাবশেষের কয়েক খণ্ড প্রস্তর মাত্র ক্ষীণকণ্ঠে প্রাচীন হিন্দুদের শিল্পকীর্ত্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছে। ইংরাজের আবির্ভাবের পরও খৃষ্টান পাদ্রীরা ও অনেক ক্ষতি করে গেছেন। বহু পুঁথি ও প্রাচীন নিদর্শন আমাদের যা অমূল্য সম্পদ—সাগর পারে চলে গেছে। এই সব কারণে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক গবেষণা করতে গিয়ে বহু অসুবিধা পড়তে হয়েছে।

তোমরা এই প্রাচীন দেশের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হবে, এই আশাতেই প্রবন্ধটী তোমাদের কাছে উপস্থিত করা গেল। আশা করি স্বাধীন ভারতের প্রত্যেকটি সন্তান এদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করবে। দেখ্‌ছ তো, বাঙালী আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে!

রবার্ট লুই ষ্টীভেনসন্

রচিত

দি বট্‌ল্ ইম্প

(বোতলের শয়তান)

সৌম্য গুপ্ত

(৩)

তারপর সকাল হলো···কিয় কোকুয়াকে জানালো—ভালো খবর আছে! কাল গভীর রাত্রে এক বৃদ্ধ এসে চার সেণ্টিম দাম দিয়ে বোতলটা কিনে নিয়ে গেছে! সে চলে যেতেই তোমায় খবর দিতে এলুম কিন্তু তোমার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তোমায় আর ডাকিনি!

কোকুয়া রাত্রির কাহিনী জানালো না···শুধু বললো—দমকা বাতাসে দরজাটা ভেজানো থাকছিল না, তাই খিল এঁটে দিয়েছিলুম! যাক্, তুমি এখন বোতলের দায় থেকে নিস্তার পেয়েছো তো!

কিয় বললে—হ্যাঁ, বাঁচলুম! চলো, আজ সারাদিন হৈ-হৈ করে কাটাই···তারপর যত শীঘ্র পারি, এখান থেকে হাওয়াই-দ্বীপে ফিরি!

কোকুয়া শিউরে উঠলো···হাওয়াইয়ে ফিরে গেলে এ বোতল বিক্রী করা অসম্ভব—সেখানে এক সেণ্টের চেয়ে কম দামের মুদ্রা নেই! তাহিতিতে এক সেণ্টিমে বেচবার সম্ভাবনা আছে! সে বললে—তুমি যাও, ঘুরে এসো··· আমি বাড়ীতেই থাকবো।

সহরে বিরাট মেলা চলেছে···সেখানে এক জুয়ার আসরে কিয়র পরিচিত এক জাহাজী-মাল্লা তাকে পাকড়াও করলে। জুয়ায় সে মাল্লা তার সব টাকা খুইয়েছে···কিয়কে সে কিছুতেই ছাড়বে না! মাঝরাত্রে কিয় বাড়ী ফিরবে, জুয়াড়ী-মাল্লা নিলে তার সঙ্গ···বললে—শুনেছি, তোমার কাছে মজার বোতল আছে—সে বোতলের কাছে যা চাও, তাই পাও। সেই বোতল থেকে আমায় মোটা টাকা পাইয়ে দিতে হবে!

কিয় বললে—সে বোতল আমার কাছে নেই···বেচে দিয়েছি।···এসো, আমি বাড়ী থেকে তোমায় বরং কিছু টাকা দিচ্ছি!

নিশুতি-রাতে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে সেই জাহাজী-মাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে কিয় ফিরলো বাড়ী! মাল্লাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে কিয় ঘরে ঢুকেই দেখে—বিমর্ষ-মলিন মুখে কোকুয়া একলাটি জেগে বসে রয়েছে—কি যেন গভীর দুশ্চিন্তায় মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে!

কোকুয়ার বিষণ্ণভাব দেখে কিয় বিচলিত হয়ে উঠলো ···বোতলের ক্ষুদে শয়তানের ছায়া তাহলে এখনও বিষ-বাষ্পের মতো সারা বাড়ী ছেয়ে রয়েছে! কিয়র মনে হলো—কোকুয়া নিশ্চয় সেই বোতলের শয়তানের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে···নাহলে বোতল বিদায় হলেও, কোকুয়ার মনে এমন অশান্তি-ভাবনা কিসের জন্য?··· তখন কোকুয়াকে নানা প্রশ্ন করে কিয় জানালো আসল বৃত্তান্ত।

সব শুনে কিয় ভেবে দেখলে যে, কোকুয়াকে এ যাতনা থেকে উদ্ধার করবার একটিমাত্র উপায় আছে!···কোকুয়াকে কিছু না বলেই কিয় এলো সদরে!···তাকে দেখে মাল্লা-বন্ধু বললে—টাকা পেলে?···

কিয় বললে—না!···এই বলে সে মাল্লাকে বাড়ী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জানালো—শোনো, সে বোতল বাড়ীতেই আছে···আমার স্ত্রীর কাছে! সেটি তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করবার একটিমাত্র উপায় আছে। তুমি সে বোতল যদি চাও তো তাহলে, তোমাকে এই দুটি সেণ্টিম দিচ্ছি···এ সেণ্টিম দিয়ে তুমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সেই বোতলটি কিনে নাও।···কিন্তু খবর্দ্দার—তাঁকে যেন বলো না যে আমি তোমাকে ও বোতল কিনতে পাঠিয়েছি। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি: বোতল নিয়ে তুমি আমার কাছে এসো—আমি তোমার কাছ থেকে এক সেণ্টিম দামে সে বোতল আবার কিনে নেবো। নরক-যন্ত্রণার দুর্ভোগ থেকে তুমি রেহাই পাবে!

সেণ্টিম দু'টি হাতে নিয়ে মাল্লা গেল কিয়র বাড়ীতে···

অধীর-আগ্রহে কিয় দাঁড়িয়ে রইলো পথে—বোতলের প্রতীক্ষায়।…কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেলো…মাল্লার আর ফেরবার নামটি নেই। কিয় অস্থির হয়ে উঠলো…এমন কি বিভ্রাট ঘটলো, যে বোতল নিয়ে মাল্লা এখনও ফিরে আসছে না?…কোকুয়া কি তাহলে…

হঠাৎ নিশুতি-রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে দূর থেকে ভেসে এলো সেই জাহাজী-মাল্লার কণ্ঠস্বর…মদের নেশায় চুর হয়ে এলোমেলো বেসুরোভাবে গানের কলি গাইতে গাইতে সে পথে এগিয়ে আসছে। কিয় ছুটে গেল তার দিকে…দেখে মাল্লা আকণ্ঠ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে টলছে…এক হাতে মোটা একটা ডাণ্ডা, আর এক হাতে সেই উদ্ভুটে-বোতল। কিয়কে দেখেই মাল্লা বললে—বোতল পেয়েই বোতলের শয়তানকে ফরমাশ করলুম পেট ভরে মদ খাওয়াও।…অমনি মদের বন্যা!…ভাখো, কেমন আনন্দ করছি!…

কিয় ধমকে বললে—মাতলামো রাখো!…এখন বোতলটি আমায় দাও!…এই নাও, এক সেন্টিম—বোতলের দাম!

মাতাল মাল্লা ডাণ্ডা বাগিয়ে বললে—ভাগো!…এ বোতল আমি দেবো না! বেশী ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করো তো এই ডাণ্ডার ঘায়ে মাথাটি চুর করে দেবো তোমার!

কিয় বললে—জানো…ও বোতল রাখলে তোমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

—হোক্! যা হবার, আমার হবে…তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন?…বোতল এখন আমার…কাকেও দেবো না আমি এ বোতল—লক্ষ টাকা পেলেও না!…

এই কথা বলে সে টলতে টলতে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল! কিয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, নিশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরলো!

তারপর…

বোতলের শয়তানের প্রভাব থেকে চির-মুক্ত হয়ে কিয় আর কোকুয়ার জীবন হলো শান্তিময় আর সুখময়!…সে মাতাল-মাল্লার কি হলো, সে খবর আজ পর্য্যন্ত জানা যায়নি!

—

চোর-জামাই

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

ব্রজেনবাবু দোকান হতে বেরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—'আরে আমার সাইকেল; এখানে রেখেছিলাম, কোথায় গেল?' চীৎকার শুনে দোকানের মালিক পরাশরবাবু আর বাড়ী হতে তাঁর ছেলেমেয়েরা সন্তু, পন্টু সব বেরিয়ে আসে। ব্রজেনবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করেন—'তুমি কি সাইকেলটা নিয়ে গেছ নাকি?' সন্তু ঘাড় নাড়ে, 'কই নাতো! আমরা ত আজ সকাল থেকে বাড়ীর বার হইনি। সকাল থেকে জামাইবাবুর কাছে ছিলাম। এখন তিনি দোকানে গেলেন, তাই বেরুলাম। আপনি কোথায় সাইকেল রেখেছিলেন জানি না তো।' ব্রজেনবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন—কোথায় গেল তবে সাইকেলটা। কেউ চুরি করে নিয়ে গেল নাকি? এতদিন এরকমভাবে সাইকেল রাখছেন কেউ নিল না, আর আজ কিনা সাইকেলটা গেল।

চিন্তিত হবারই কথা। চল্লিশ টাকা মাইনের সরকারী-গিরি করেন তিনি পরাশরবাবুর দোকানে। চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করতে এসে একশ' পঞ্চাশ টাকা দামের সাইকেল যদি খোয়াতে হয় তাহলে কার ভাল লাগে বলুন। তাও নিজের হলে কথা ছিল—কিন্তু এ যে পরের সাইকেল। খুব ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক খোঁজাখুজি করতে থাকেন তিনি। এদিকে তাঁর চেঁচামেচিতে সেখানে বেশ একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। সব শুনে কেউ ধমকায়—'বেশ হয়েছে, গেছে। আজকালকার দিনে কখনও বাইরে সাইকেল রাখতে আছে? বলে বাড়ীর ভিতরে রাখা সাইকেল তালা ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে, তায় আবার রাস্তার উপর রাখা সাইকেল!' কেউ শুধায়—'মশাই নতুন না পুরাতন?' কেউ বলে—'কতর উপর দিয়ে গেল মশাই?' ও পাড়ার ঘেণ্টু মন্তব্য না করে পারে না—'তালা দেওয়া ছিল, না খোলা?'

ব্রজেনবাবুর সব কথা জবাব দেওয়ার সময় নেই। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করেন। কেউ আবার পরামর্শ দেয়, 'মশাই, বৃথা খুঁজছেন। যান বাড়ী গিয়ে খেয়ে-দেয়ে

ঘুমোন গে।' মনে মনে খুব বিরক্ত হন ব্রজেনবাবু; কিন্তু কিছু বলেন না এই ভেবে যে, 'বাঙালী উপকারে নেই; সমালোচনায় আছে।' কে একজন উপদেশ ছোঁড়ে, 'মশাই, দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক করে আর কি হবে? যান থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী করে আসুন।' অন্য একজন টিপ্পনী কাটে, 'ডায়েরী করতে গিয়ে যা দিয়ে আসবেন, তা দিয়ে বোধ হয় আরেকটা সাইকেল কেনা হয়ে যাবে। দারোগাগুলি তো অগ্নিতে কথা কানেই তোলেন না।' থানার দারোগা সম্বন্ধে পরিচয় ইতিপূর্ব্বে সে বোধ হয় ভাল করেই পেয়েছে।

কিন্তু এসব উক্তি শোনার মত মানসিক অবস্থাও ব্রজেনবাবুর নয়। কথাগুলো শুনেও যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। এমন সময় সন্তু জিজ্ঞেস করে—'আজ কোন সাইকেলটা এনেছিলেন কাকাবাবু?' ব্রজেনবাবুকে কাকাবাবু বলেই ডাকে সন্তু, পণ্টুরা। ব্রজেনবাবু সন্তুকে সাইকেলের একটা বর্ণনা দিয়ে দেন। 'আচ্ছা! আমি হাবুলদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি থানায় ডায়েরী করার জন্য'—বলে হাবুলদার বাড়ী দৌড়য় সন্তু।

হাবুলদা হল এ পাড়ার একজন নামকরা গুণ্ডা। ওকে ভয় খায় না, এমন লোক এ পাড়ায় খুব কমই আছে। সব শুনে, হাবুলদা শূন্যে ঘুঁষিটা মেরে বলে ওঠে, 'ব্যাটাকে যদি একবার ধরতে পারি তো তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দোব। তুমি বাড়ী যাও সন্তু। দেখি আমি কি করতে পারি। হ্যাঁ, আমায় বল ত সাইকেলটা কি রকম দেখতে আর কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কিনা?'

সন্তু একনিঃশ্বাসে গাড়ীর একটা বর্ণনা দেয়। বলতে ভোলে না যে গাড়ীর ডান দিকের প্যাডেলটা কাঠের।

হাবুলদা একটা সাইকেল নিয়ে থানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যায় সে, যদি ঐ ধরণের একটা সাইকেল চোখে পড়ে তার। এ রকম তো কত সাইকেলই চোর সমেত ধরেছে সে। নাঃ! আজ বোধহয় তার সে সুনাম ডুবলো। ও ধরণের একটি সাইকেলও তো চোখে পড়ছে না তার। অনেকটা হতাশ হয়ে ডায়েরীটা লিখিয়ে আসে হাবুলদা।

থানা থেকে ফিরবার পথে ভাবে—মাঠের রাস্তাটা দিয়েই ঘুরে যাওয়া যাক্। যেমনি ভাবা অমি কাজ। মাঠের রাস্তা দিয়েই ফিরতে শুরু করে দেয় হাবুলদা। খানিকটা যাওয়ার পর চেন পড়ে যাওয়ায় সে নামে। চেন পরাচ্ছে এমন সময় দেখল একটা সাইকেল-চালক তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সাইকেলটার দিকে লক্ষ্য করে চমকে ওঠে হাবুলদা। আরে! সন্তু যেমন বলেছিল, গাড়ীটার মাডগার্ডে তেমনি লাল রং দেওয়া রয়েছে যেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চেন লাগিয়ে গাড়ীটার পিছু ধাওয়া করে সে। প্রায় হাত পনের ব্যবধান রেখে গাড়ীটা নিরীক্ষণ করতে করতে চলে সে। সন্তুর বর্ণনা মত এ গাড়ীটার হ্যাণ্ডেলটা যে একটু বাঁকা। সামনের চাকার ব্রেকও নেই। আরে! এ গাড়ীটার ডান প্যাডেলটা যে কাঠের! তবে নিশ্চয়ই এ গাড়ীটা ব্রজেনবাবুর। আরো জোরে চালিয়ে সামনের গাড়ীটাকে ধরে হাবুলদা।

'ও মশাই, বলি এ গাড়ীটা পেলেন কোথায়? নিজের না অন্য কারোর?'—চোর ধরার গর্ব্বে খানিকটা ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করে হাবুলদা।

'না, মানে, ইয়ে—হয়েছে কি বাজার'···ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্য শেষ করার আগেই হাবুলদার বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি চড় ঠাঁই করে পড়ে তার গালের উপর। ভদ্রলোক সাইকেল থেকে পড়ে যান। কিন্তু পড়লে হবে কি? হাবুলদা জামার কলার ধরে তাকে টেনে তুলে বলতে থাকেন—'শালা, ভদ্রলোকের পোষাক পরে মনে করছ আমি ভদ্রলোক বনে গেছি। আজ কার হাতে পড়েছ জান না? এই হাবুলের হাতে তোমার মত কত সাইকেল চোরের দাঁতকপাটি উড়ে গেছে সে খোঁজ রাখ?'—বলে গর্ব্বের হাসি হাসেন হাবুলদা। 'দেখুন আমি ঠিক চুরি করিনি'—বলতে চেষ্টা করেন ভদ্রলোক। 'না—আপনা-আপনি সাইকেলটা তোমার কাছে উড়ে এসে গেল নয়?' ভেঙচি কাটে হাবুলদা। সেই সঙ্গে আরেকটি চড় মারতে ভোলে না। এবার ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে বলতে থাকেন—'আপনি না ধরলেও আমি সাইকেল দিতেই যাচ্ছিলাম। পরাশরবাবুর আত্মীয় আমি।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাবুলদা গর্জ্জন করে ওঠে—'ব্যাটা! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ধরা পড়লে সব শালাই ওরকম বলে। মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ না করে আমার সাথে শান্তশিষ্টের মত চল ত বাবা। তারপর দেখা

যাবে কে কার আত্মীয়। বলে হিড়হিড় করে সত্তদের বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চলে হাবুলদা।

এদিকে ব্রজেনবাবু গেছেন এদিক ওদিক খুঁজতে। কৌতুহলী জনতার ভিড় সরে গেছে বটে, কিন্তু ব্রজেনবাবুর সাইকেল চুরির খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে চারিদিকে। এমন সময় হাবুলদাকে একজন লোকের কলারধরে নিয়ে আসতে দেখে সকলে সেই দিকে দৌড়ল। কাছে গিয়ে যখন জানল এই লোকটাই 'চোর' তখন তাদের উৎসাহ দেখে কে? তাদের সম্মিলিত কিল, চড়, ঘুঁষি পড়তে লাগল সেই ব্যক্তির উপর। জামাটা মুহূর্ত্তে গা থেকে উড়ে গেল। গেঞ্জিটাও উড়ব উড়ব করছে। কপাল কেটে আর নাক দিয়ে রক্ত পড়ে গেঞ্জিটা লাল হয়ে গেছে।

পরাশরবাবু দোকান ছেড়ে বাড়ী গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। হাবুলদার চেঁচামেচি শুনে ঘরের ভিতর থেকে বলতে থাকেন তিনি চীৎকার করে: 'ব্যাটাকে ছেড়ো না। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। আমার দোকানের সুনাম নষ্ট করছিল ব্যাটা। গিয়ে একেবারে পুঁতে ফেলব।'

হাবুলদা আবার তাকে খোঁচা দেয়—'কি হে? তোমার আত্মীয়ই যে তোমাকে পুঁতে ফেলব বলছে।' হাবুলদার রসাল মন্তব্য শুনে হাসির রোল ওঠে জনতার মধ্যে। তারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে ধোলাই দিতে থাকে লোকটিকে। আর লোকটির অবস্থা না বলাই ভাল।

ইতিমধ্যে বাড়ী থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে আসেন পরাশরবাবু। ভিড় ঠেলে চোরের কলার ধরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি। মুখ চোখ যদিও রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দাঁতকখানা যদিও উড়ে গেছে, কোথায় তবু তাঁর চিনতে কষ্ট হল না লোকটাকে।

যারা এতক্ষণ লোকটিকে মারছিল তারা পরাশরবাবুকে মারার পরিবর্ত্তে থমকে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে যায়। হাবুলদা বুক ফুলিয়ে পরাশর বাবুর সামনে এসে বলে—'দেখুন কাকাবাবু, চোরকে ঠিক পাকড়ে এনেছি। ব্যাটা আবার বলে কিনা 'আমি পরাশরবাবুর আত্মীয়'—বলে আরেকটা চড় মারে হাবুলদা লোকটার রক্তভেজা গালে। পরাশরবাবু খপ করে হাবুলের হাতটা চেপে ধরে খিঁচিয়ে ওঠেন—'থাক্'—একটা নিরীহ লোককে ধরে খুব বাহাদুরী করেছ। কেন মেরেছ এঁকে?'

'চোর ধরে আনলাম, কোথায় মিষ্টি খাওয়াবে না উল্টে খিঁচুনি'—মনে মনে গজরাতে থাকে হাবুলদা।

এদিকে চেঁচামেচি শুনে পরাশরবাবুর স্ত্রী বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠেন—'ওমা—আমার জামাইয়ের এ অবস্থা কে করলে গো?'

যারা এতক্ষণ মনের সুখে লোকটাকে মারছিল তারা বেগতিক দেখে পিঠটান দিল। দাঁড়িয়ে রইল কেবল হাবুলদা। চোরধরার কৃতিত্বটা তার কিনা।

ইতিমধ্যে ব্রজেনবাবু কোত্থেকে এসে সাইকেলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'এই তো আমার সাইকেল। চলুন বেটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক্।' মন্তব্য করেন ব্রজেনবাবু।

'থাক, অত কষ্ট না করে দয়া করে একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আসুন। হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে।' বলে ওঠেন পরাশরবাবু। ব্রজেনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে রিক্সা ডাকতে চলে যান। এই সুযোগে হাবুলদা কাটোয়া দেয়।

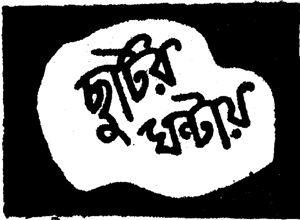
পরাশরবাবু জামাইকে ধরে ধরে বাড়ী নিয়ে আসেন। গিন্নী রক্ত মুছতে থাকেন আর কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, 'ওমা, কি হবেগো? জামাই, জামাইষষ্ঠী করতে এল একদিনের জন্যে, আর তার একি অবস্থা হোলো গো।'

জামাই কিঞ্চিৎ সুস্থ হলে পর পরাশরবাবু জিজ্ঞেস করেন—'তুমি তো সাইকেল নিয়ে দোকান যাচ্ছি বল্লে। এরকম কেন হোল?'

জামাই কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল—কি 'করে জানব। আমায় পল্টু বললে, দরজার গোড়ায় সাইকেল রেখে এসেছি, আপনি বাইরে যদি যান তো নিয়ে যাবেন আমি সত্তর কথামত দরজার সামনে থেকে সাইকেলটা নিয়ে যাই। তারপর মাঠের ধারে ঐ বণ্ডামার্কা লোকটা বলে কিনা আমি সাইকেল চুরি করে নিয়ে এসেছি। আমি যত বলি—পরাশরবাবুর আত্মীয় আমি ওদের বাড়ীতেই যাচ্ছি। ততই আমার উপর পড়তে থাকে কিল চড়, ইত্যাদি—আর বর্ষণ হতে থাকে কটু মন্তব্য। তারপরের অবস্থা তো আমার চেহারায় দেখছেন।'

পল্টু বাইরের বাগানের দিকের দরজা থেকে ঘুরে এসে বলে—ওমা আমাদের সাইকেলটা তো তেমনিই ঠেসান রয়েছে!

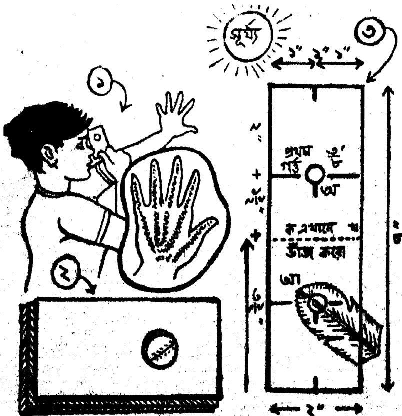
ব্যাপারটা বুঝতে আর কারো বাকী থাকে না। তাঁরা হাসবেন কি কাঁদবেন—ঠিক করতে পারেন না। জামাই-বাবু জামাইষষ্ঠী করতে এসে এক সপ্তাহ হাসপাতালের ঝোলভাত খেয়ে বাড়ী ফিরলেন। ফেরবার সময় তিনি নাকি শাশুড়ীর সামনে নাক কান মুলে বলে গিয়েছিলেন, 'জামাইষষ্ঠীর দিন আর কখনো শ্বশুর বাড়ী আসবো না।' তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীও আর নিমন্ত্রণ করতে সাহস পাননি।



চিত্রগুপ্ত বিরচিত

আজ তোমাদের আরো একটি মজার খেলার কথা বলি।

ঘরে তৈরী 'এক্স-রে' (X-Ray) ঃ



উপরের ছবিটি দেখে ঠিক ঐ-ধরণে একখানি পাতলা কার্ডবোর্ড কেটে নাও—ছবিতে যে মাপ দেওয়া হয়েছে, সেই মাপে—যথাযথভাবে। কার্ডবোর্ডটিকে মাপ মতন ছাঁদে কেটে নেবার পর, উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে— তেমনিভাবে পেন্সিলের দাগ কেটে কার্ডবোর্ডের বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করে নাও। ছবিতে দেখছো —'অ' আর 'আ' চিহ্নিত-করা দুটি গোল-আকারের ছোট গর্ত বানানোর 'নক্সা' দেওয়া রয়েছে···এবারে ঐ কার্ডবোর্ডের উপরে হুবহু ঐ ধরণের দুটি গোল গর্ত কেটে নিতে হবে···ছুরির ডগা কিম্বা খুব ছুঁচোলো-করে-কাটা পেন্সিলের শীষ্ অথবা তোমাদের জ্যামিতির 'ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট-বক্সের' (Geometrical Instrument Box) 'কম্পাস্-ডিভাইডার্', (Compus or Divider) যন্ত্রের সতর্ক ছোঁয়ায় এ গর্ত দুটিকে সহজেই রচনা করা চলবে।

এবারে উপরের ঐ ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, সেইভাবে 'ক' থেকে 'খ' পর্যন্ত চিহ্নিত অংশে ফুটকি-ফুটকি দাগ বরাবর পরিপাটিভাবে কার্ডবোর্ডখানি দু' ভাঁজ করে নাও। এভাবে দু'ভাঁজ হলে, কার্ডবোর্ডের 'অ' চিহ্নিত গর্তের ঠিক ওদিকে থাকবে 'আ' চিহ্নিত গর্তটি···এবং এ দুটি গর্তই, কার্ডবোর্ডটিকে দু'ভাঁজ করলে, পরস্পর মুখোমুখি সমান হয়ে বসবে। গর্ত দুটি কেটে নেবার পর, কার্ডবোর্ডখানি আবার সিধা (Straighten) করে নিয়ে—সারা কার্ড-বোর্ডের গায়ে ভালোভাবে আঠা (Gum বা Glue) লাগাও—তারপর পায়রা, হাঁস বা মুরগীর একটা মিহি-পাতলা পালখ নিয়ে, সে-পালখটিকে উপরের নক্সার ছাঁদে 'আ' চিহ্নিত গর্তের ভিতরে বসিয়ে আঠা-মাখানো কার্ডবোর্ড-খানিকে আবার দুভাঁজ করে মুড়ে—'আ' চিহ্নিত গর্তের মুখোমুখি 'অ' চিহ্নিত গর্তটিকে মিলিয়ে রেখে পাকাপাকি জুড়ে, মজবুতভাবে সেঁটে দাও। এভাবে জুড়ে নেবার পর, দু'ভাঁজ-করা কার্ডবোর্ডখানিকে ছায়া-শীতল কোনো জায়গায় রেখে খোলা-বাতাসে বেশ করে শুকিয়ে নাও। ব্যস্···তাহলেই তৈরী হলো তোমার 'ঘরে-বানানো এক্স-রে যন্ত্র'!

এবারে বলি—এ যন্ত্র কি ভাবে ব্যবহার করবে—সেই কথা।

গর্তের-মুখে পালখ-আঁটা দু'ভাঁজ-করা কার্ডবোর্ডখানি শুকিয়ে নেবার পর, বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, উঠানে, বাগানে কিম্বা খোলা জানলার ধারে এসে উপরের ঐ

ছবির ভঙ্গীতে তোমার ডানহাতে সেটিকে ধরে একটি চোখের সামনে ধরো—অন্য চোখ বুজে। তারপর উপরের ছবির ধরণে, সূর্য কিম্বা কোনো প্রখর-উজ্জ্বল ইলেকট্রিক ল্যাম্প (Electric Lamp) কিম্বা তেল-বাতির আলোর দিকে বাঁ-হাত প্রসারিত করে ধরো। এবারে তোমার ডান হাতের ঐ পালখ-বসানো কার্ডবোর্ডখানির গর্তের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে সামনের সূর্য কিম্বা উজ্জ্বল বাতির আলোর দিকে এগিয়ে-রাখা বাঁ-হাতের দিকে লক্ষ্য করলেই—তোমার বাঁ-হাতের আঙুলগুলির ভিতর যে অস্থিগুলি রয়েছে, সেগুলি বেশ সুস্পষ্ট দেখতে পাবে।

এই হলো 'ঘরে-বানানো এক্স-রে যন্ত্রের' মোটামুটি মর্ম। এখন তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দেখো মজার এই খেলাটি। বারান্তরে, আরো বিচিত্র কয়েকটি মজার খেলার পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইলো।

মহাভারতের গল্প

শ্রীজয়দেব রায়

মন্বন্তরের সময়ে দেশে অনাবৃষ্টির জন্ম দারুণ দুর্ভিক্ষ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার তপোবনে একটিও ফল বা একমুষ্টি অন্নও না পাইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া নগরে আসিলেন। কিন্তু নগরেও কোথাও অন্ন পাইলেন না। ক্রমে তিনি নগরের প্রান্তে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

দরিদ্র চণ্ডালপল্লীতে খাদ্যের আরও বেশী অভাব, সর্বত্র মৃতদেহ, কুকুর-শেয়ালের গলিত শব, জীবজন্তুর অস্থি জড়ানো আছে। বহু অন্বেষণ করিয়াও তিনি খাদ্যদ্রব্য পাইলেন না। চণ্ডালপল্লী প্রায় জনশূন্য।

এক চণ্ডাল শিকার করিয়া একটি বন্য কুকুরের মাংস আনিল। ক্ষুধায় কাতর বিশ্বামিত্র গৃহের বাহির হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন—'জীবন রক্ষার জন্য তো চুরি করলে দোষ হয়না। এই মাংস চুরি করা যাক্।'

রাত্রিবেলায় তিনি মাংস চুরি করিতে চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু চুরি করিবার সময়ে চণ্ডালের হাতে ধরা পড়িয়া গেলেন!

চণ্ডাল তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—'ওহে, আমি ঋষি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধার জ্বালায় তোমার মাংস চুরি করতে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করো।'

চণ্ডাল তাঁহার পরিচয় পাইয়া সসম্মানে বলিল—'আপনাকে চিনতে পারিনি, অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি কেনই বা আমার ঘর থেকে নিষিদ্ধ অপবিত্র মাংস হরণ করলেন?'

বিশ্বামিত্র বলিলেন—'ক্ষুধার জ্বালায় তোমার মাংস চুরি করেছি আমাকে তা নিয়ে মানে মানে চলে যেতে দাও।'

চণ্ডাল বলল—"আপনি পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ মহর্ষি, আপনাকে এই অভক্ষ্য মাংস খেতে দিতে পারি না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমার কাছে এখন সকল মাংসই সমান যে খাদ্য আমি পেয়েছি তাই খাব, কুকুরের মাংস এখন আমার কাছে অমৃত তুল্য।"

চণ্ডাল বলিল—"তবে আপনার সঙ্গে আমার আর কি তফাৎ রইল? ক্ষুধার তাড়না দমন করতে না পারলে আর আপনার ঋষিত্ব কোথায়?'

বিশ্বামিত্র বলিলেন—'তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ সত্যিই কিছু নেই। তোমার মত আমারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই প্রবল, তুমি যদি কুকুরের মাংস খেতে পার, আমিও অসঙ্কোচে তা খেতে পারব না কেন তবে আমি চুরি ক'রে তোমার কষ্টে আহৃত খাদ্য নিয়ে যাচ্ছি—সেজন্য তোমার মার্জনা ভিক্ষা করছি।'

—এই বলিয়া চণ্ডালকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বিশ্বামিত্র সেই কুকুরের মাংস রন্ধন করিয়া নিজে খাইবার পূর্বে দেবগণকে যজ্ঞ করিয়া অর্পণ করিলেন।

দেবতারা বিশ্বামিত্রের তপোবলে বাধ্য হইয়া চণ্ডাল গৃহে উপস্থিত হইয়া সেই কুকুরের মাংস গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন মন্ত্রবলে সেই নিষিদ্ধ মাংসকে অমৃতে পরিণত করিলেন।

বিশ্বামিত্র কিন্তু সদর্পে বলিলেন—'তোমরা আর আমি কেবল অমৃত খাবো, আর সমস্ত জীব অনাহারে মারা যাবে, তা চলবে না। আগে সকল জীবের খাদ্যাভাব দূর কর, পরে ঐ অমৃত ভোজন করতে পাবে!'

ইন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি সত্বরই অন্নাভাব দূর করিবেন তখন বিশ্বামিত্র সেই অমৃতে পরিণত কুকুরের মাংস দেবতাগণকে নিবেদন করিয়া নিজে ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

[গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাগণের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

—ভাঃ সঃ]

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

শ্রীমদনগোপাল দত্ত

কবি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে—দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? কবিতা কবির কীর্ত্তি তাহাত' আমাদের হাতে আছে পড়িলেই বুঝিব, কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—কিগুণে কি প্রকারে ইহা রাখিয়া গেলেন-তাহাই বুঝিতে হইবে।"

শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসে ইংরাজি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চোরবাগান ৯নং শ্রীনাথ রায় লেনস্থ ভবনে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল আমাদের মধ্যে আবির্ভুত হন। এখন তাঁহার জন্মভিটার কোন চিহ্নই নাই। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর গর্ভে তাহা বিলীন হইয়াছে। পিতার নাম কালীচরণ, মাতা রাণীবালা। তাঁহাদের আদিনিবাস ছিল চন্দননগরে। জোড়াসাঁকোর হালওয়াসিয়া রোড নিবাসী নন্দ নন্দীর কন্যা সৌদামিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যে হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু পাঠস্পৃহা ও পাঠানুরাগ তাঁহার শিক্ষাকে পূর্ণতর করিয়াছিল এবং পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তাহা ছিল। বাল্যে তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিকট যাতায়াত সুরু করেন। সেই সময়ে ঐ স্থানে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের স্বজাতীয় সুকবি ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেনের সান্নিধ্যে আসেন। ইঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন "এই সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার দ্বারাই আমি একজন এমন বন্ধুকে পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ-অনুকূল আলোকের মতন আমার কাব্য রচনার বিকাশ, চেষ্টার প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। 'ভগ্ন হৃদয়' পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন—'সান্ধ্যসঙ্গীতে' তাহার মন জিতিয়া লইলাম। সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি, তাঁহার বন্ধুত্ব যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে এই সুযোগটি যদি না পাইতাম—তবে প্রথম বয়সের চাষ আষাঢ়ে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তা বলা শক্ত।"

১৭ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি বিহারীলালের কবিশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভাই, তথাপি তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা একটু বেশী বিহারীলাল। বিহারীলালের ভাবা-ভঙ্গী ও ভাব অক্ষয়কুমারেই সর্বাধিক পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকাংশে গুরুর অনুগামী হইলেও আনন্দ-তন্ময়তা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হইল ভাব সংযম, বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা। ভগবৎভক্তি ও স্বাদেশিকতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—যখন তিনি আলাদিনের 'আশ্চর্য্য প্রদীপ' লইয়া আমাদের সম্মুখে আসেন। তাঁহার স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি আহিরীটোলা পাড়ার নেতা হিসাবে ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং রাখীবন্ধনের দিন বাড়ীতে অরন্ধনের প্রচলন করেন। তখন তিনি নিমু গোস্বামী লেনে ভাড়াবাড়ীতে থাকিতেন। পাড়ার সমস্ত যুবকদের লইয়া বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করেন। যুবকরা তাঁহার এরূপ অনুগত ছিল যে—সকলেই তাঁহাকে দাদা বলিত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মান্য করিত।

তিনি যখন কবিরূপে পরিচিত হন, তখন আমাদের অন্য একজন স্বজাতীয় কবি অক্ষয়কুমার সেন জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে মাণিকতলা



অক্ষয়কুমার বড়াল

স্ট্রীট হইতে কবিবর রসময় লাহার নেতৃত্বাধীনে "সুবোধিনী" নামে একখানি সপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। তাহাতে এই দুই অক্ষয়কুমারেরই কবিতা দেখা যায়। অক্ষয়-কুমারের কবিতা বলিলে পাছে গণ্ডগোল হয় সেইজন্য সাহিত্যজগতের লোকেরা সেন কবির ও বড়াল-কবির কবিতা বলিয়া প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা নামে অভিহিত করিত।

কবি হেয়ারস্কুল ত্যাগ করিয়া দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কে চাকুরী গ্রহণ করেন। বহুদিন কার্য্য করিবার পর ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেন। পরে North British Assurance কোম্পানীর অফিসে প্রধান কর্ম্মচারীরূপে যোগদান করেন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিসাবে সিদ্ধহস্ত বলিয়া তাঁহার উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। ৫৭ বৎসর বয়সে ১৯শে মাঘ ১৯১৩ সালে

তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহাপ্রস্থান করেন। ক্ষয়রোগে ১৯শে জুন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৬ সালে তাঁহার তিরোধান ঘটে। মৃত্যুকালে দুই পুত্র অময়কুমার ও অজয়কুমার এবং তিন কন্যা রাখিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অময়কুমারকে শান্তি নিকেতনে লইয়া যান।

মৃত্যুর প্রায় ১ বৎসর পূর্বে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গ-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁহাকে "কবি-তিলক" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহার, সৌজন্য অমায়িকতা সর্বোপরি সুললিত কবিত্ব প্রভা তাঁহাকে বিশ্বের দরবারে সু-উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল এবং,তিনি সে আসনের মর্য্যাদা আত্মশক্তি বলে চিরদিন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিমণ্ডিত ছিল। স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস যখন বিপন্ন হইয়া পত্র লেখেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দরিদ্র কবি ভ্রাতার দুঃখে বিগলিত হইয়া অকুণ্ঠ সাহায্য করেন। এই ভাবেই তিনি প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বহু ব্যক্তিকে সাহায্য করিতেন। 'কল্পনা' সম্পাদক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলে-তিনি হরিদাসবাবুর শিশু-পুত্র ও বিধবা পত্নীকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয় কবিরই উপযুক্ত মহৎ অন্তঃকরণের নিদর্শন।

পাঠক বা সমালোচকের মুখ চাহিয়া তিনি কবিতা রচনা করেন নাই তাই তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়—

'কবি নহে চিত্রকর, ঘুটে ঘুটে নানা রং, ধরিবে তোমার আঁখিপরে।
চাবে তব মুখপানে, ভিক্ষার সজল নেত্রে, কি হয়েছে জানিবার তরে॥'

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন 'অক্ষয় নকল-নবিসী করিতে আসে নাই—নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে জানিত না।'

বাংলার কাব্যকুঞ্জের মনোমদ পিকবর প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন ১২৮৯ সালে। তাঁহার রচিত পুন-র্মিলন প্রকাশিত হয় 'ভারতীর' আষাঢ় সংখ্যায়।' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 'কর্ত্তৃক প্রকাশিত বড়াল-কবির গ্রন্থাবলীতে আছে 'রজনীর মৃত্যু' তাঁহার প্রকাশিত প্রথম কবিতা, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় 'বঙ্গ-দর্শনের' অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কবির :জন্মশতবার্ষিকী পালন করিয়াছেন শতবর্ষ পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই—ইহার কারণ বুঝিলাম না।

প্রথম কবিতা-পুস্তক 'প্রদীপ' ১২৯০ সালে চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। পরে যথাক্রমে ১২৯২ সালের আশ্বিনে 'কনকাঞ্জলি'—১২৯৪ সালে 'ভুল'-১৩১৭ সালের আশ্বিনে 'শঙ্খ' ও ১৩১৯ সালের শ্রাবণে 'এষার' আবির্ভাব। 'এষা'ই তাঁহার প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। তিনি '[illegible]' নামে একখানি নাটকের রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহা অপ্রকাশিত।

আমাদের 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যায় তাঁহার 'আজ' কবিতা প্রকাশ করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছে।

মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার শেষ কবিতা 'স্বজাতি সম্ভাষণ বঙ্গীয় সুবর্ণ বণিক সম্মিলনী'র' চতুর্থ অধিবেশনে আবৃত্তি করেন সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস মল্লিক মহোদয়। এই সম্মিলন ১৩২৫ সালে ১০ই ও ১১ই পৌষ চুঁচুড়া নগরীতে হয়। মানসিক অসুস্থতা সত্ত্বে তিনি স্বজাতিকে সম্ভাষণ না জানাইয়া থাকিতে পারেন নাই। সম্মিলনে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যোগদান করেন ও মুদ্রিত প্রতিলিপি সভায় বিতরণ করেন।

ইহারই কিছুদিন পরে তিনি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হ'ন ও ৪ মাস পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরী গমন করেন। কিন্তু দু মাসের মধ্যেও অবস্থার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতির পথে অগ্রসর হওয়ায় মৃত্যুর চারিদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনা হয়।

আজিকার এই শতবার্ষিকী জয়ন্তী সভায়-মহামতি গোকুলচন্দ্র বড়ালের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'এর শোক সভায় প্রদত্ত ভাষণের পুনরা বৃত্তি করিয়া বলিব—আমাদের কর্ত্তব্য তাঁর স্মৃতি জাগাইয়া রাখা—স্মৃতি সম্মান রক্ষা করা—স্মৃতি সৌধ রক্ষা করা। না করিলে আমাদের নামে কলঙ্ক পড়িবে—সমাজে ঘৃণ্য হইব। তিনি ছিলেন দশের ও দেশের কবি—দশ ও দেশ মিলিত হইয়া কবির স্মৃতিরক্ষা করুন—স্মৃতি রক্ষা করিলে কবি বড় হইবেন না—যাঁহারা করিবেন—তাঁহারাই হইবেন-সর্ব্বজন মান্য হইবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় যে সম্মান দিতে পারি নাই-প্রায়শ্চিত্তের কড়ি স্বরূপ সেই সম্মান আজ দিতে হইবে। শুধু বলিতে চাই—

সে অক্ষয়কুমার নাই, আছে চিরস্মৃতি তাঁর,সে স্মৃতির করগো সম্মান।
এ নয় করুণা ভিক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত কড়ি ইহা, হে ধীমান বুঝে কর দান॥"

যদিও গোকুলবাবু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাংলার বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও ধনীদের কাছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এর মাধ্যমে মিনতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু আজ অবধি কেহ তাঁহার স্মৃতির সম্মান দিবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসেন নি। অবশ্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য দুইখানি করিয়া রৌপ্যপদক প্রদান করিয়া থাকেন। যে ভাণ্ডার হইতে এই পদক প্রদান করা হয় সেই ভাণ্ডারের জন্য আমাদের এই সমাজ হইতে দুই শত ও আমাদের স্বজাতীয়দের প্রতিষ্ঠান 'ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন' হইতে দুই শত টাকা তাঁহার শোক সভায় সভাপতির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা অনেকের স্মৃতি সম্মিলনীতে বা জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় চাঁদা দিই, অথচ এ স্বজাতীয় কবির জন্য কি করিয়াছি? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন 'বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে দেখিবে কে।"

তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

জ্বালায়ে 'প্রদীপ', হলে উপনীত, বাণীরে দিতে 'কনকাঞ্জলি'।
'ভুল' রচি শেষে বাজালে 'শঙ্খ', 'এষার' ডাকেতে গেলে দূরে চলি॥

স্বাভাবিক

শ্রীশঙ্কর গুপ্ত

ট্রামে উঠবার মুখেই এক কাবুলিওয়াল গোছের যাত্রী দরজা প্রায় জুড়ে দাঁড়িয়ে। বিরাট দেহ, যেমন সচরাচর দেখা যায়। ছোট ছেলে কাবুলিওয়ালা কেউ দেখেছেন কি না জানা নেই। কলকাতার পথে কখন গুটগুট করে হেঁটে যাচ্ছে বড় কাবুলিওয়ালার সঙ্গে ছোট কাবুলিওয়ালা এমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। যদি শৈশব বলে তাদের কিছু থাকত, তবে হয়ত কোন ছোট কাবুলিওয়ালার পক্ষে ট্রামে ওঠার মুখে দরজা জুড়ে দাঁড়াবার শক্তির অভাব হত। প্রমাণ মাপের যে কোন কাবুল বা আফগানিস্থানবাসীর পক্ষে সামান্য একটা ট্রামের সামান্য এক প্রবেশ-পথ রোধ করা বিনা অস্ত্রে কেবলমাত্র দেহায়তনের সাহায্যে অবহেলায় সাধ্য। গাড়ীতে ভিড় কম অর্থাৎ ভিতরে দাঁড়াবার স্থান আছে। পথরোধের ভঙ্গিটা অবরোহণো-ন্মুখ। ভুল ভাঙলো সম্ভাব্য মুহূর্তেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামলেন না দেখে। কলকাতা শহরে ট্রামবাসে যাদের চড়তে হয়—সামান্য চলতি গাড়ীতে ওঠানামা ত এখন মহিলারাও করেন—চলন্ত গাড়ীতে ওঠানামা একটা নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা সে কারণে প্রচুর ঘটা সত্ত্বেও। তাই গাড়ি ছাড়তেই হাতল ধরে হাঁটতে হাঁটতে মিনতি জানাতে হল হিন্দীভাষায়, যার বঙ্গানুবাদ—মশাই একটু ভেতরে যান, পা টা অন্তত সরান, নিজের পা একটা রাখার মত জায়গা পেলেও চলবে, রাখি। দেখা গেল মাদৃশ বঙ্গবাসীই শুধু নয়—আরো বহু দেশবাসী মোটেই হিন্দীনবীশ নয়। আমার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে টলান গেল না। তখন মরিয়া হয়ে মাতৃভাষায় বলতে হল, আফগান সরো। মন্ত্রের মত কাজ হল, দেখলাম তার শরীরটা বিচলিত হল, কারণ সে ডান পা একটু তুলল (না আমার জন্য নয়) এবং নিজের গোড়ালী চুলকে নিল। অবিলম্বে মদীয় একটি পদ ঐ শূন্যস্থানে পূরণ করে হাতল ধরে ঝুলে পড়া গেল। গাড়ির গতি তখন বেশ অর্থাৎ পড়লে মরার মত।

ভিড়ের সময় আপিশ যাত্রীদের নানা ভঙ্গিমায় ট্রামবাসে চড়তে হয়। এমনও দেখা গেছে—পা রাখার জায়গা নেই, ধরবার কোন অবলম্বন নেই, নারকেল গাছে চড়ার ভঙ্গিতে কোন যাত্রী দুহাতে সম্মুখস্থ দণ্ডায়মান ব্যক্তির কোমর জড়িয়ে ধরেছেন এবং দ্বিতীয় এক ব্যক্তির পায়ের উপর ডান পা ও তৃতীয়ের পায়ে বাঁ পা রেখে ট্রাম গাড়ির অংশমাত্র স্পর্শ না করে আপিশ যাচ্ছেন দশটায় পৌঁছবার চেষ্টায়। ন্যায়ত এ অবস্থায় ট্রাম কোম্পানীর কোন ভাড়া প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়। তবু কণ্ডাক্টার দুজনের মাথা ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিরালম্ব ব্যক্তির কাছে টিকিট চেয়েছেন। তিনি তখন মুখ বন্ধ অবস্থায় হুঁম হুঁম করেছেন এবং চতুর্থ কোন ব্যক্তি এঁর মুখে ধরে থাকা দুয়ানীটা কণ্ডাক্টারের হাতে দিয়ে টিকিট নিয়েছেন এবং টিকিটখানা মুখে ও বাকী পয়সা বুক-পকেটে সই করে ফেলে দিয়েছেন। যেখানে এমনভাবে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়, সেই শহরে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাঁচজনকে বলে বেড়ানর মত কিছু নয়। আর আসলে আরম্ভের ঘটনাটি মার কাছে মাসীর বাড়ীর গল্প করার ইচ্ছায় উল্লেখ করা হয় নি, হয়েছে নিজের মাতৃভাষায় পরের স্বদেশের উল্লেখে যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেছিল তার সঙ্গে গোড়ালি চুলকে ওঠার কোন কার্যকারণ যোগ আছে কি না তার জিজ্ঞাসায়।

বিনা চেষ্টায় মাতৃভাষা আয়ত্তে আসে। অন্ততঃ অন্য যে কোন ভাষা শিক্ষা করার চেয়ে অনেক সহজে মানুষ মাতৃভাষা শেখে। একবার এক মফঃস্বল শহরে জমি-জায়গা সম্পর্কে কাগজপত্র নিতে গেছে জনৈক ব্যক্তি। সে কাছেই একগ্রামে থাকে, অন্যগ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়ী আছে, মাঝ পথে জমিজায়গা সম্পর্কে কাগজপত্র পাবার আপিশ। সঙ্গে তার ছেলে আছে, ছোট, বয়স দশের কম। সম্ভাব্য সময়ের চেয়ে একটু দেরীই হচ্ছে ; ছেলেটা বায়না ধরছে খিদে পেয়েছে বলে। কয়েকবার এটা ওটা

বলে তাকে থামিয়েছে, কিন্তু শেষটায় কোমরের কসি থেকে একটা বিড়ি বার করে ছেলেটাকে দিয়ে বাপ বললে —নে, ততক্ষণ এটা খা; এই কাগজ পেলেই মামার বাড়ী গিয়ে খাবি। অতটুকু ছেলেকে বিড়ি দিতে দেখে একজন বিস্মিত কর্মচারী বললেন—ওকি, ঐটুকু ছেলেকে বিড়ি? লোকটি লজ্জার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস মিশিয়ে উত্তর দিল—কি জানেন হুজুর, ঐটাই আমাদের মাতৃভাষা। পেট থেকে পড়েই বিড়ি খাবার স্বায়ত্ত অভ্যাসের কথাটি হয়ত উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে বোঝান যায়, কিন্তু মাতৃভাষা বলায় যেমন মর্মগ্রাহী হয়েছে আর কিছুতেই অতখানি হত না।

'আ মরি বাঙলাভাষা' গানটি বাঙালী কবির রচিত। কোন দক্ষিণ-ভারতীয় কবির রচিত 'আ মরি তেলুগুভাষা' ইত্যাদি কোন গান থাকতে পারে, তা আমাদের জানা নেই, যেমন নাকি হোম—সুইট হোমের কথাটা জানা আছে। মাতৃভাষা এবং স্বদেশের প্রীতি প্রত্যেকেরই এমন সহজাত যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক জায়গায় বলেছেন, দেশভক্তি হল অন্যান্য দেশকে ঘৃণার নামান্তর। স্বদেশপ্রীতি পরদ্বেষ হতে পারে; কিন্তু বাপের বাড়ীর কাকও ভাল। আগেকার দিনের একটি গৃহবধূ পাঁচিলের উপর একটা ঠোঁটকাটা কাকের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েছিল দেখে একজন জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউ, অত অবাক হয়ে দেখছ কি? বৌটি আত্মস্থ হয়ে জবাব দিলে, বাপের বাড়ী অমনি একটা ঠোঁটকাটা কাক এসে পাঁচিলে বসত। শুনে সবাই আর হেসে বাঁচেনি—বলেছে, শোন গো বৌয়ের কথা শোন, কাক আবার নাকি বাপের বাড়ীর! বৌ-মানুষ তার মনোভাব গোপনে অপারগ বলে সে উপহাসের পাত্র হল, নয়ত একজন কবি যখন স্বদেশী আমলে বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে তুলে নিতে বলেছিলেন তখন তাঁর সে কবিতা পড়ে দেশে একটা মহা-হাততালি পড়ে গিয়েছিল।

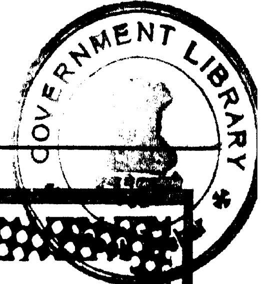
স্বদেশবাসীর সঙ্গে বিদেশে পথে, রেলগাড়ীতে, জাহাজে মানুষের যে স্বদেশীয় প্রীতি প্রকাশ পায় তার অন্যতম প্রধান কারণ মাতৃভাষার যোগাযোগ, আপনার অন্যান্য যত ভাষাই জানা থাক এবং যতই জানা থাক, মাতৃভাষায় কথা বলতে পারলে ব্যাপারটা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের মত অনায়াস সাধ্য হয়ে ওঠে, তেমনি হাঁফ ধরে অন্য ভাষায় অধিক্ষণ বা ক্রমাগত আলাপ চালাতে। রোগযন্ত্রণায় 'মাগো' বলে মাতৃভাষায় মাকে ডাকা হয়। বহু ভাষাবিদ্ জনৈক আগন্তুকের মাতৃভাষা নির্ণয়কল্পে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিদূষক গোপাল তাকে রাতের অন্ধকারে ধাক্কা মেরেছিল। সে জানত আচমক ধাক্কা খেলে মানুষের মুখ থেকে মাতৃভাষা বেরোয়।

সারা দেহে ব্যাপ্ত স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র মস্তিষ্কে। স্নায়ুকেন্দ্র টেলিগ্রাফ হেড-আপিসের মত সমস্ত দেহের সংবাদ স্নায়ুতন্ত্র মারফত আদান-প্রদান করে থাকে; এ কথা আমাদের মত সাধারণ মানুষ জানে। কিছুদিন আগে স্নায়ুযন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনৈক ভদ্রলোকের কাছে জানা গেল যে পক্ষাঘাতে মানুষের দক্ষিণ বা বাম অঙ্গ অবশ হওয়ার পিছনে স্নায়ুকেন্দ্রের বাম বা ডান দিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জড়িত। বাম অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের ডান দিক এবং স্নায়ুকেন্দ্রের ডান দিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের বাম অংশ অবশ হয় ও সেই সঙ্গে ঐ দিকেই বাকশক্তির উৎস থাকায় বাকশক্তিহীন হয়। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির বাক্‌শক্তি লোপ পায়, পক্ষান্তরে ডান অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বচনক্ষম। দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের সাজাহানকে তাই দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলেও কথা বলতে পারেন দেখা যায়। বাম অঙ্গ পঙ্গু হলে পারতেন না।

সেদিনের স্নায়ুতন্ত্রে অভিজ্ঞ ভদ্রলোককে যদি আবার পাওয়া যেত, তাহলে তাঁর কাছে জেনে নেওয়া যেত, স্বদেশ বা মাতৃভাষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার কাজ যে স্নায়ুর, ডান পায়ের গোড়ালী চুলকান কাজও সেই স্নায়ুর কি না। নয়ত বাম অঙ্গ অবশ হলে যেমন একই সঙ্গে মানুষ বাক্যহীন হয়, 'আফগান, সরো' কথাটা শোনামাত্র তেমনি তার ডান পায়ের গোড়ালি চুলকে উঠবে কেন। সেই প্রবেশ পথরোধী বিরাটদেহী ট্রামযাত্রীর কথা বলছি। আমাকে যদিও সে অবস্থায় কথাটা মাতৃভাষায় ব'ল্‌তেই হয়েছিল এবং লোকটির দেশ হতে পারে আফগানিস্তান—সেক্ষেত্রে আফগান কথাটির সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড়। কথাটি কানে যাবামাত্র কোন উষর প্রান্তরের কথা তার মনে জেগে উঠে তাকে বিচলিত করে থাকবে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অতি আত্মকেন্দ্রিক এবং বিশেষ বিবেচনার সময় ছিল না, তাই তাকে বিচলিত করে পদরক্ষা করতে পেরেই ভেবেছিলাম ঢের হল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে স্নায়বিক ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে স্নায়ু যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ঠিক নয়। কেন না লোকটি

ধরা যাক পেশোয়ারের। গাড়ওয়ালের লোককে তাই বললেও কোন বাঙালীকে গাড়োল বললে তিনি সেটি গালাগালি বলে মনে করেন এবং গালাগালি দিলে অনেককে ঘুঁসি মারেন, খুব জোরেই মারেন। তেমনি ধরা যাক পেশোয়ারবাসী আফগান শব্দটিকে আদরার্থে গ্রহণ করেন না (সত্যি বলতে কি গোড়ালি চুলকোবার আগে তাকে পা তুলতে দেখে আমারও কেমন মনে হয়েছিল)। এমতাবস্থায় যে কোন ভদ্রলোকের পরের অবস্থা কল্পনা করতেও অনিচ্ছা হয়।

তবে অন্ধকারে আচমকা ধাক্কা খেয়ে নয়, যে কোন বিপদের খড়কুটো অর্থাৎ প্রাণপণ শেষ চেষ্টা মাতৃভাষা। ইংরেজী শেখার জন্য আমরা কি হেনস্থাই না হই; সেই ইংরেজী ইংরেজের পাশের দেশে কোন কাজে লাগে না। জনৈক বন্ধু সেদিন গল্প করছিলেন—পারীতে পথ ভুলে আর কাউকে বোঝাতে পারছেন না কোন অঞ্চলে তাঁর বেড়াতে গিয়ে ওঠা হোটেলটা। তিনি কুল্যে ছটা ফরাসী শব্দ জানতেন—তাতে পথ হারানোর কথা বলতে চাইলে কান্নার মত শোনায়। গলদঘর্ম হয়ে বন্ধু সোজা বাংলায় বিপদের কথা বলেন। আশ্চর্য, একজন ফরাসী ভদ্রলোক যাহোক আন্দাজ করে ট্যাক্সি চালককে একটি রাস্তার কথা বুঝিয়ে দেন। বলা বাহুল্য সেখানে হোটেল খুঁজে পাওয়া যায়! বলা বাহুল্য ট্যাক্সিটা বন্ধু দাঁড় করিয়ে মালপত্র উঠিয়ে সোজা এক বইয়ের দোকান; সেখান থেকে একখানি ইঙ্গফরাসী অভিধান কিনে সোজা স্টেশন।



মেয়েদের কথা

ভারতরমণীর বিস্মৃত ইতিহাস

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালার রমণীগণ পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবে এই ঐতিহাসিক কথা এখন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা বিলুপ্তপ্রায় ব্রত-কথায়, পল্লীগীতিকায়, প্রাচীন সাহিত্যে, শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। সে নিদর্শনগুলি এখনও প্রাণহীন, লাবণ্যহীন, অযত্ন-বিন্যস্ত অস্থিপঞ্জর মাত্র! তাহাতে এখনও শৃঙ্খলা ও পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব থাকিয়া বঙ্গরমণীর সেই গৌরবময় কাহিনীর ধারা-বাহিক পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সভ্যজগতের সম্মুখে সাহসে, অকুতোভয়তায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এবং আত্মত্যাগে বাঙ্গালার রমণীগণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীনকালে এদেশের পুরনারীগণও যে অশ্বারূঢ়া হইয়া পোলো খেলিতেন একথা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি-বেন না, কিন্তু নবাবিষ্কৃত এক জীর্ণ প্রাসাদের অলিন্দের এক অংশে ভারতীয় রমণীগণ পোলোখেলায় ব্যাপৃত আছেন, অঙ্কিত রহিয়াছে। এক এক দলে অশ্বপৃষ্ঠারূঢ়া পাঁচটি রমণী পোলোখেলার যষ্টি লইয়া পোলো বল মারিতে উদ্যতা। এই চিত্র হইতে বুঝা যায় যে পুরনারীগণের মধ্যে এই খেলার প্রচলন তখনও ছিল এবং তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইত না (১)। মোগলযুগেও যে এদেশের রমণীগণ অশ্বারোহণে পদাতিক সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিতেন তাহার পরিচয় অন্য একখানি চিত্র হইতে অবগত হওয়া যায় (২)। সেকালে "বাদশাহদিগের স্ত্রী ও প্রিয় দাসীদিগকে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ঘোড়াচড়া এবং তীর ও বন্দুক ছোঁড়া শেখান হইত" (৩)। বাণগড়ের ধ্বংস স্তূপ খননকালে অশ্বারোহী রমণীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আজিও "দোলায় আসি, ঘোড়ায় যাই" ছড়াতে বঙ্গরমণীর অশ্বারোহিণী মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রমণীর অশ্বারোহিণীমূর্ত্তি এখন কল্পনার সামগ্রী বলিয়া মনে হইলেও যুগধর্ম্মের প্রভাবে যে উহা সমাজের সর্ব্বস্তরের রমণী-সমাজেই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেকালে রাজা ও রাজপরিবারের কাহিনী প্রজাসাধারণের আলোচনার সামগ্রী ছিল, লোকমতের উপরই মহারাজ-চক্রবর্ত্তীদিগের রাজত্ব নির্ভর করিত (৪)। রাজকোষ তখন শুধু রাজা ও রাজপরিবারের জন্য ছিল না;—উহা ছিল প্রজাসাধারণের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত। তখন রাজমন্ত্রী মনে করিতেন, তিনি যে বেতন রাজকোষ হইতে লইয়া থাকেন, সেই জন্যই প্রজাসাধারণ "অপহৃত বিত্ত" ও "যাচক" হইয়া পড়িতেছে (৫)। রাজসভার উপর সেকালে লোকসভার এরূপ প্রভাব দেখিয়া মনে হয় যে, রাজান্তঃপুরে প্রচলিত শিক্ষাদীক্ষা সেখানে জনসমাজেও সুপ্রচলিত ছিল। 'পবনদূতকাব্যে' নারীদের জলক্রীড়া ও উদ্যান রচনার উল্লেখ আছে; এই দুইটিই বোধহয় ছিল তাঁহাদের অন্যতম শারীর ক্রিয়া। কিন্তু তাঁহারা যে শিকারও করিতেন পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তর এবং পোড়ামাটির ফলকে তাহার উল্লেখ আছে। নৌকা-চালনা বা পাটনীর কাজ তো রমণীগণের একটি পেশা বলিয়াই "চর্য্যাগীতি"তে উল্লিখিত আছে।

"ভবিষ্যপুরাণ" এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে দাবা বা "চতুরঙ্গক্রীড়া" প্রাচীন রমণীদিগের সমরস্পৃহা হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এককালে

অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী এবং পদাতিক এই চতুঃ-শক্তি লইয়াই চতুরঙ্গক্রীড়া সম্পাদিত হইত। বাঙ্গালার নৌশক্তির প্রতীকরূপে রথের পরিবর্তে নৌবাহিনী চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল (৬)। "দাবা খেলার প্রচলন যে বাঙ্গালা দেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চর্য্যাগীতিতে 'ঠাকুর' (অর্থাৎ রাজা), 'মন্ত্রী', 'গজবর' এবং 'বড়ে' এই চারি গুটি, খেলার 'দান' এবং ছকের চৌষট্টি কোঠার বা ঘরের উল্লেখ এমন সহজ ভাবে পাইতেছি যে মনে হয়, দশম-একাদশ শতকের আগেই এই খেলা বাংলা দেশে সুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল" (৭)। "মোগল-পাঠান"—ক্রীড়াও সামরিকক্রীড়া। বাঙ্গালার শাসনাধিকার লইয়া মোগল ও পাঠান সেনার অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় বঙ্গরমণী কর্তৃক ইহা কল্পিত হইয়াছিল (৮)। এই সকল বিবরণ দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, সেকালে রমণী সমাজে যুদ্ধ-বিদ্যার বিশেষরূপ প্রচলন ছিল—নতুবা বঙ্গরমণীর কল্পনায় এইরূপ সামরিক ক্রীড়ার স্থান হইত না।

প্রাচীন ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালে এদেশের রমণীগণ সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবার্চ্চনা, জ্ঞানবিজ্ঞান, রাজনীতি, শাসনকার্য্য এবং রণকৌশলে পারদর্শিনী ছিলেন—দেশের প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারেই অংশ গ্রহণ করিতেন (৯)। প্রাচীনকালে রমণীদিগের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা ছিল এবং তাঁহাদিগকে করও দিতে হইত (১০)। জাতকের গল্প হইতে জানা যায় যে কুলরমণীগণও সাধারণ সভা ও সমিতিগুলির সদস্যা হইয়া প্রকাশ্যভাবে উহাতে যোগদান করিতে পারিতেন (১১)। অথর্ব্ববেদের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশসূক্তে অবগত হওয়া যায় যে সভা ও সমিতি রমণী কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১২)। নিরুক্তকার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের তৃতীয় ঋকের "নারী" শব্দ নেত্রী অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কার্যবিশেষ পরিচালনে যেমন পুরুষের বিশেষত্ব ছিল, নারী জাতিরও তেমনি বিশেষত্ব ছিল। পরিবারে যে কার্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চালাইবার জন্য স্ত্রীজাতি নারী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন—সে কার্য্যের পরিচয় 'পুরংধি' কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণ' (৫, ২-১) এবং 'বৃহদারণ্যক' (১, ৪, ১৭) হইতে জানা যায় যে "অর্দ্ধবিগল" বা ঝিনুকের ন্যায় স্ত্রী তাহার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রীপুরুষের সংযোগেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বিকাশ হইত। সেকালে স্ত্রীছিলেন সর্ব্বপ্রকারেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী বা 'পত্নী,' বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনীর মতে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, "পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে" অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর যজ্ঞসহকারিণী, ধর্ম্মসঙ্গিনী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান স্বরূপা। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে সহধর্ম্মিণীর সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। স্বামী অপরের প্রতি আসক্ত হইলেও স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান বা দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না। উপরন্তু সহধর্ম্মিণীর অনুমতি পাইলে তবেই স্বামীর পুনর্ব্বিবাহ সম্ভব হইত" (১৩)। অশ্রকপুরে প্রাপ্ত দেবখড়্গের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে সেকালে "মহিলাগণও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতেন" (১৪)। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় দেখা যায় সেকালে বঙ্গ কুমারীগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারা স্বামী নির্ব্বাচনের ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন (*)।

গ্রীক রাজদূত মিগাস্থিনীসের প্রদত্ত বিবরণী ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' হইতে অবগত হওয়া যায় যে মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে রমণী পরিচালিত শুশ্রূষা বিভাগ বর্ত্তমান ছিল। প্রতি সৈন্যদলের সহিত আহতগণের সেবা করিবার জন্য শুশ্রূষাকারিণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন ("চিকিৎসকাঃ শস্ত্র-যন্ত্রাগদস্নেহবস্ত্রাহস্তা স্ত্রিয়শ্চান্ন পানরক্ষিণ্যঃ পুরুষাণাং মুদ্ধর্ষনীয়াঃ পৃষ্ঠতাস্তিষ্ঠেযু") ইহাদের বিবরণী হইতে দেশে নারী সৈন্যের অস্তিত্বের কথাও অবগত হওয়া যায় (১৫)। বলবর্ম্মদেবের তাম্র-শাসন হইতে জানা গিয়াছে সেকালে উত্তরবঙ্গে "মহল্লক প্রৌঢ়িকা" নাম্নী নারী সৈন্য ছিল (১৬)। পূজা উপলক্ষে বা মৃগয়াকালে রাজা প্রাসাদ হইতে বাহির হইলে স্ত্রীসৈন্যগণ তাঁহার উভয় পার্শ্ব বেষ্টন পূর্ব্বক অশ্ব বা গজারোহণে অগ্রসর হইতেন; অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কেহ কেহ বা রথেও আরোহণ করিতেন (১৭)। বাঙ্গালী নাট্যকার বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষসের" তৃতীয় ও পঞ্চম খণ্ডে শোনোত্তরা ও বিজয়া নাম্নী রাজার দুইজন দেহরক্ষিকার পরিচয় জানিতে পারা যায় (১৮)। সুতরাং প্রাচীন যুগেও যে এদেশে স্ত্রী সৈন্য ছিল তাহা নিশ্চিত রূপেই বলা যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কোচবিহার রাজ্যে অসিধারিণী অন্তঃপুর রক্ষিকাদের অবস্থিতির কথা জানিতে পারা যায় (১৯)। পরবর্ত্তীকালে এই প্রথা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা যে এদেশের রমণী-সমাজের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীর স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঋষি বাৎস্যায়নের "কামসূত্রম্" নামীয় গ্রন্থের নাম অনেকেরই পরিচিত। কিন্তু এই গ্রন্থে যে রমণীর বীর বিক্রমের পারচয় বর্ণিত আছে তাহা হয়ত খুব কম লোকেই জানেন। কামসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুঃষষ্ঠিকলার বর্ণণা আছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে সেকালে এদেশের রমণীগণকেও চতুঃষষ্ঠিকলা বা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। এই চতুঃষষ্ঠিকলার বৈনয়িকী, বৈজয়িকী ও বৈয়ামিকী নামক সর্ব্বশেষ তিনটি বিদ্যা সেকালের রমণী-সমাজের হস্তী নিয়ন্ত্রণ নৈপুণ্য, অশ্বারোহণে কৃতিত্ব এবং ব্যায়ামে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু ব্যাকরণ সহ সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান ব্যতীত কামসূত্র পাঠ করা অসুবিধা বিবেচনায় রমণীগণকে কার্য্যকরীভাবে (হাতে-কলমে) চতুঃষষ্ঠিকলা শিক্ষা দিবার বিধানও বাৎস্যায়ন দিয়াছিলেন (২০)। ধাত্রীকন্যা, সখী, সমবয়স্কা মাতৃস্বসা, বিশ্বস্ত বৃদ্ধা দাসী, সুপরিচিতা ভিক্ষুণী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণের নিকট সেকালে রমণীগণকে চতুঃষষ্ঠিকলা শিক্ষা করিতে হইত। সেকালে বহু গণিকা, বহু রাজকন্যা এবং মহামাত্যদুহিতা কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে ও চতুঃষষ্ঠিকলায় অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (২১)। উপরোক্ত বিবরণী হইতে সেকালের রাজান্তঃপুরিকা হইতে গৃহস্থবধূ পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বস্তরের রমণীগণই যে তৎকাল-প্রচলিত' চতুঃষষ্ঠিকলা এবং তদন্তর্গত বৈনয়িকী (হস্তী নিয়ন্ত্রণ), বৈজয়িকী (অশ্বারোহণে নৈপুণ্য) এবং বৈয়ামিকী (শরীর চর্চ্চা) বিদ্যায় সম্যক পারদর্শিনী ছিলেন ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে "কৌটিল্য ও গ্রীক ঐতিহাসিকবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া য়ুয়ান্‌চোয়াঙ পর্য্যন্ত সকলেই প্রাচ্যদেশকে হস্তীর লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কৌটিল্য ত হস্তী-চিকিৎসার কথাও বলিয়াছেন" (২২)। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের সমসাময়িক সময়ে সঙ্কলিত অপভ্রংশ ছন্দোনিবদ্ধ "প্রাকৃত-পৈঙ্গল" নামক পুঁথিতে বাঙ্গালীর বীরত্বের প্রশংসাকালে হস্তীযুদ্ধের বর্ণনা আছে—

"রে গোড় থক্কন্তি তে হত্থি-জুহাই।
পল্লট্টি জুজ্ঝাহি পাইক-বুহাই।"

[রে গৌড়, তোর হস্তিযুথ থাকুক; পালটিয়া পাইক-ব্যূহের সঙ্গে যোঝ।] (২৩)। মহাভারতের যুদ্ধ দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে একাধিকবার বঙ্গদেশীয় হস্তীর উল্লেখ আছে। কাজেই এদেশের রমণী সমাজে হস্তী-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যার প্রচলন হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ইতিহাসে আরও অবগত হওয়া যায় যে সেকালে রমণীগণ যোগ্যতার সহিত গুপ্তচরের কার্য্যও সম্পাদন করিতেন (২৪)। মুসলমান রাজত্বকালেও "সিন্দুকী" নাম্নী একশ্রেণীর নারীগুপ্তচর ছিল (২৫); সেকালে "স্ত্রীলোকদের পর্য্যবেক্ষণের জন্য মহিলা পরিদর্শিকাগন নিযুক্ত ছিল। রাজান্তঃপুরের পর্য্যবেক্ষণের জন্যও মহিলা পদাধিকারিণীরা ছিল—তাদের নাম 'সৌবিদা' (২৬)। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবের সহিত কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে রঘুদেবের সঙ্গে তাঁহার ছয়কুড়ি (১২০ জন) স্ত্রী যোদ্ধার বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন (২৭)। এই সকল বিবরণ হইতে প্রমাণ হয় যে শৌর্য্য, বীর্য্য এবং শিল্পকৌশল ইত্যাদি কোন শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেকালের প্রায় প্রত্যেক কুল-বধূ-শিল্পীও বস্ত্রকুশলী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইয়া যশস্বিনী হইতেন। বাঙ্গালার প্রাচীন পট্টোলী সমূহে মহিষীর নাম যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে "রাজকীয় মহিমা ও মর্য্যাদার সীমার ভিতরে মহিষীরও একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল সন্দেহ নাই।" কিন্তু "কি হিসাবে যে ইঁহারা রাজপুরুষ ছিলেন, কি ইঁহাদের দায় ও অধিকার ছিল" তাহা সুস্পষ্ট রূপে আজিও জানিতে পারা যায় নাই। তবে মাতৃপ্রধান অথবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্মৃতি এই সকল পট্টোলীতে পাওয়া যাইতেছে ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে (২৮)।

"কথাসরিৎসাগরে" প্রাচীন ভারতের যন্ত্রশিল্পের যে বিবরণী পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বৌদ্ধযুগে ভারতের রমণী সমাজেও যন্ত্রশিল্পের বিশেষরূপ প্রচলন ছিল এবং তাঁহারা উহার যথারীতি অনুশীলন

করিতেন। উহার মদনমঞ্জুকালম্বকে ময়দুহিতা সোমপ্রভা রাজকুমারী কলিঙ্গসেনার নিকট কতকগুলি কাষ্ঠময় যন্ত্র প্রদর্শন করেন এরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল যন্ত্রমধ্যে "জলযন্ত্র", "তেজোময় যন্ত্র", "বাতযন্ত্র" প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রের ও উহার কার্য্যকারিতার যেরূপ উল্লেখ আছে (২৯) তাহাতে ঐ সকল যন্ত্র পরিচালনা করিতে হইলে বিশেষ কৃতিত্বেরই প্রয়োজন হইত এবং সোমপ্রভা ঐ যন্ত্রগুলির পরিচালনা করিতে পারিতেন। এজন্য সেকালের রমণীগণও যে তৎকালপ্রচলিত প্রসিদ্ধ যন্ত্রাদি ব্যবহারে সম্যক পারদর্শিনী ছিলেন ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। এই সকল যন্ত্রের কোনটির কি কার্য্যকারিতা ছিল তাহা এখন সঠিক বলা কঠিন, কিন্তু সোমপ্রভার কথিত "আকাশ-সম্ভব যান" যে আধুনিক কালের বিমানজাতীয় যন্ত্র তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের কালে এবং তৎপরবর্ত্তীকালেও যে এদেশে বিমান ছিল তাহা "বাঙ্গালীর বলের" শ্রদ্ধেয় লেখক সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন (৩০)। সেকালে রমণীগণও যে আকাশ-যান চালনা করিতে পারিতেন, সোমপ্রভার কাহিনীই তাহার প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন রামায়ণের রচনাকালেও যে "রক্তউষ্ণীষধারিণী হোক পরিচারিকাগণ" আকাশ-যানে এবং উহার কারখানায় কর্ম্মে নিরত থাকিত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় (৩১)। বৌদ্ধযুগে পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, পান্থাগার প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য গ্রামের জনসাধারণই সম্পাদন করিত এবং স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ভালবাসিত (৩২) বলিয়া অবগত হওয়া যায়। স্থান, কাল, পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া মতভেদ ও বিচার-বিতর্ক হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্গ রমণী একদা শৌর্য্যে বীর্য্যে গৌরবান্বিতা এবং নানাবিধ যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন—একথা শুনিলে এখন আমরা বিশ্বাস করিতে সাহস করি না; ইহা আমাদের বহুশতবর্ষের সঞ্চিত দুর্ব্বলতা মাত্র! চক্ষুকর্ণগোচর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই সকল সময়ে রমণী বীরত্বের প্রাচীন কাহিনীগুলিকে অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে। যাহা আজ বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না—কালে তাহাই বিশ্বাস করিতে গৌরববোধ হয় নেতাজির "ঝান্সীর রাণীবাহিনী" তাহা প্রমাণ করিয়াছে এবং অধুনা জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মহিলা সেনাবাহিনী তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বঙ্গ-রমণীর সামরিক ইতিহাস কোন একচ্ছত্রাধীন জাতির ইতিহাস নহে, উহা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণী-বিশেষের মিলিত ইতিহাস। কত বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কত সম্প্রদায় উৎখাত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাহারা দেশের উপর যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদাদি সংগৃহীত হইলে বঙ্গরমণীর শৌর্য্য কাহিনীর সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হইতে পারে। সেই ইতিহাস যেদিন রচিত হইবে সেদিন বঙ্গ রমণীর গৌরবগাথায় চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিবে। বহুকালের পরাধীন বাঙ্গালীর নিকট এখন একথা কবিকল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা কল্পনা নহে, কাহিনীও নহে,—প্রাণ স্পন্দনের ন্যায় তীব্র সত্য!

পাদটীকা

১। দেশ—১ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা—৪৮ পৃঃ, ভারতবর্ষ—১৩১৮আশ্বিন, —৬০৫ পৃঃ

২। প্রবাসী—১৩২৬, বৈশাখ—৪৯ পৃঃ

৩। বাদশাহী গল্প—৺যদুনাথ সরকার—প্রবাসী—১৩১৮ কার্ত্তিক, —৬০৫ পৃঃ।

৪। বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—২য় সংস্করণ—৭৫-৭৭ পৃঃ।

৫। গৌড়লেখমালা—৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৭৪ পৃঃ।

৬। "The game 'chaturanga owes its invention to the Hindu Women, who beguiled her lord with manners and tactics in a mock, battle upon the chess board—Calcutta Review—No—95, pp. 65-66.

৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদি পর্ব্ব—৫৪২ পৃঃ।

৮। "It may not be out of place to mention here that the game of Mogal-Patan is another military pastime, which has been invented by the women of Bengal to kill their enemis"......Calcutta Review—No—95, p.66,

৯। "They (women) took a share in sacrifices

and duties, attended assemblies, openly frequented public thoroughfares, distinguished themselves in learning, wisdom, administration, politics and battle prowess"—Hindu History—A. K. Majumdar. —p. 481.

১০। Corporate Life in Ancient India—Dr. R.C, Majumdar—p. 61.

১১। Jataka—Vol. I. p. 197.

১২। Corporate Life in Ancient India—Dr. R.C. Majumdar—p. 47.

১৩। প্রবাসী—১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ—১১৮-২১ পৃঃ

১৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদি পর্ব্ব—২৫০ পৃঃ

*। বৃহৎবঙ্গ—১ম খণ্ড—৫৯০ পৃঃ

১৫। Early History of Bengal—J. F, Monahan—pages 24 and 182.

১৬। "মহল্লক প্রৌঢ়িকা—রাজার অন্তঃপুর রক্ষণে নিযুক্তা প্রৌঢ় বয়স্কা স্ত্রীলোক"—কামরূপ শাসনাবলী—পদ্মনাথ বিদ্যাভূষণ—৮৬ পৃঃ ; ডাঃ হোর্ণলীর মতে Grand Lady—J.A.S.B—1897—p, 296 ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৭, ১২৬ পৃঃ।

১৭। Merindle's Ancient India—p. 58.

১৮। Mudrarakshasha—Edited by Prof. S. Roy. —Cantos III & V. Sl. 21, Prabuddha Bharat—1925, Novembar—466.

১৯। কোচবিহারের ইতিহাস—১ম খণ্ড—১৮৬ পৃঃ

২০। "প্রয়োগ গ্রহণং স্বাসাম্ প্রয়োগ্য চ শাস্ত্রপূর্ব্বকত্বাদিতি বাৎস্যায়ন"—কামসূত্রম্—৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত—৬০ পৃঃ।

২১। "সন্তপি খলু শাস্ত্রে প্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্রী মহামাত্র-দুহিতরশ্চ"—কামসূত্রম্—৺পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত—৬০ পৃঃ।

২২। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদি পর্ব্ব—৬৮৯ পৃঃ

২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—ডাঃ সুকুমার সেন—১ম খণ্ড—৩৬, ৪০ পৃঃ।

২৪। Interstate Relations in Ancient India—Dr. N. N. Law—Part-I. p. 56.

২৫। বৃহৎবঙ্গ—৺দীনেশচন্দ্র সেন—১ম খণ্ড—৪৫৭ পৃঃ।

২৬। বিচিত্রা—১৩৪২, আশ্বিন—৩১৯ পৃঃ।

২৭। কোচবিহারের ইতিহাস—১ম খণ্ড—১২১ পৃঃ।

২৮। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—আদি পর্ব্ব—৫১৮ পৃঃ।

২৯। "আকার স্তোম যন্ত্রোমঃ সজীব ইব দৃশ্যতে।
তেজোময়স্তু যন্ত্রাত্রং তজ্জানা পরিমুক্তি।
বাতযন্ত্রং চ কুরুতে চেষ্টা গত্যাগমাদিকা ঃ
বক্তী করোতি চালাপং যন্ত্রমাকাশ সম্ভবম্"—
কথাসরিৎসাগর—মদনমঞ্চুকালম্বকম্—৩য় তরঙ্গ।

৩০। বাঙ্গালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—২য় সংস্করণ—১৭-১৯ পৃঃ।

৩১। প্রবাসী—১৩৩২, আষাঢ়—৩৫০ পৃঃ।

৩২। ভারতবর্ষ—১৩৩৬, মাঘ—১৮১ পৃঃ।



পশমের ব্লাউশ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

শীতের মরশুমে ঘরে-ঘরে বাড়ীর মেয়েরা আজকাল নিজেদের হাতে উল্ (Wool) বা পশম বুনে নানা ছাঁদের জাম্পার, পুলোভার, সোয়েটার, রম্পার, স্কার্ফ, মাফলার মোজা, ব্লাউশ প্রভৃতি বহু ধরণের পোশাক-আশাক তৈরী করেন। ঘরকন্নার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পশম দিয়ে এ সব রকমারি হাতের কাজ করে তাঁরা যে শুধু সংসারের সাশ্রয় ঘটান তাই নয়, নিজেরাও আনন্দ পান অনেক-খানি। তাছাড়া সৌখিন মহলেও, মিলের তৈরী পশমের পোশাক-আশাকের চেয়ে মেয়েদের হাতে-বোনা ঘরোয় এই সব পশমী-কাজের কদর খুব বেশী। আজ তাই পশম দিয়ে বোনা বিচিত্র ছাঁদের একটি ব্লাউশ-রচনার কথা বলছি।

নিম্নে পশম দিয়ে বোনা যে জালিদার-ছাঁদের বিচিত্র ব্লাউশটির নক্সা দেওয়া হলো—সেটি লেশ-ষ্টিচ প্যাটার্নের (Lace-Stitch Pattern)। ব্লাউশটি, দেখতে জটিল ছাঁদের হলেও, এটি বোনবার পদ্ধতি খুবই সহজ।



ব্লাউশটি বুনতে হলে ৬ আউন্স ভালো-জাতের রঙীণ '4-Ply wool' অর্থাৎ '৪-প্লাই' পশম এবং সেই সঙ্গে একজোড়া ১২নং ও একজোড়া ৯নং পশম-বোনা কাঠি বা Knitting-needles চাই। এছাড়া আরো প্রয়োজন—১২নং ক্রুশের কাঁটা (Crochet-needle) এবং এক-জোড়া কাঠের পুঁতি বা Wooden Beads।

উপরের নক্সা-অনুসারে ধরে নেওয়া যাক, ব্লাউশটির ঝুল—১৮" ইঞ্চি, ছাতি—৩১" ইঞ্চি এবং হাতার ঝুল—৫৷৹" ইঞ্চি। তবে বলা বাহুল্য, প্রয়োজনমত ছোট-বড় অন্য মাপে এ ধরণের ব্লাউশ বানাতে হলে, যাঁর জন্য এ পোশাক তৈরী হবে তাঁর দেহের যথাযথ মাপ-অনুসারে জামাটিকে আগাগোড়া রচনা করতে হবে। যাঁদের এতখানি লম্বা ঝুলের 'হাতা' পছন্দ নয়, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত মাপে 'হাতার' ঝুল কমিয়ে নিতে পারেন।

এবারে বলি, উপরের নক্সার ছাঁদে পশম দিয়ে এ ব্লাউশটিকে বোনবার পদ্ধতি। তবে সে আলোচনার আগে, প্রসঙ্গক্রমে দরকারী একটি কথা বলে রাখি। পত্রিকার স্থানাভাবের দরুণ, গতমাসের আলোচনায় যেমন সংক্ষিপ্ত-পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে,এবারেও সেই ধরণটি বজায় রাখা হলো, অর্থাৎ—সোজা=সোঃ ; উল্টো=উঃ ; ঘর কমানো=ঘঃ কঃ ; 'রিপিট' বা পুনরাবৃত্তি=রিঃ ; ধারি :বাড়ানো=ধঃ বাঃ ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও, এবারের আলোচনায় আরো কয়েকটি নূতন সংক্ষিপ্ত-পরিভাষা ব্যবহার করা হলো, যেমন—ছুটি ঘর একসঙ্গে নিয়ে একটি ঘর তোলা=এঃ সঃ ; ঘরটি না বুনে তুলে নেওয়া ঘঃ তুঃ নেঃ ; না-বোনা ঘরের মাঝখান দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরটিকে তুলে নেওয়া=নাঃ ঘঃ তুঃ ; পশম সামনে দিয়ে একটা ঘরের জায়গায় ছুটো ঘর তুলে নেওয়া=পঃ সাঃ ; 'ডবল ক্রুশ' অর্থাৎ ক্রুশ-কাঠিতে একটি ঘরের জায়-গায় ছুটি ঘর তুলে নেওয়া=ডিঃ শিঃ ইত্যাদি। পশম দিয়ে নক্সার ছাঁদে বোনার সময়ে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত-পরিভাষার দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার···এ বিষয়ে এতটুকু ভুল-চুক ঘটলেই মাপের হিসাবে গণ্ডগোল বাধবে এবং পরিশ্রমটুকু হয়ে দাঁড়াবে পণ্ডশ্রম! সুতরাং এ সম্বন্ধে সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন—বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে।

গোড়াতেই বলি, জালিদার-ছাঁদের ব্লাউশের সামনের দিক অর্থাৎ 'Front-Side' বোনার পদ্ধতি। প্রথমে ১২নং বোনার-কাঠিতে (Knitting-needle) ৮৬টি ঘর তুলবেন। ৩" ইঞ্চি অংশ—১টি সোঃ, ১টি উঃ—এই ধরণে বুনে যাবেন। তারপর ৯নং বোনার কাঠির সাহায্যে আসল প্যাটার্নটিকে বুনতে শুরু করবেন। প্রথম লাইনে—১টি সোঃ, * ১টি উঃ সাঃ, ১টি ঘঃ তুঃ নেঃ, ২টি ঘর এঃ সঃ, এবারে এ ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ নিতে হবে, ১টি উঃ সাঃ, ৩টি সোঃ! তারপর * থেকে লাইনের শেষ সীমা পর্যন্ত রিঃ করে যেতে হবে। শেষ প্রান্তের ১টি ঘর সোঃ করতে হবে। দ্বিতীয় লাইনে···আগাগোড়া উঃ করবেন। তৃতীয় লাইনে—১টি সোঃ, * ৩টি সোঃ, ১টি উঃ সাঃ, ১টি ঘঃ তুঃ নেঃ, ২টি ঘর এঃ সঃ, এবারে এ ঘরটি নাঃ ঘঃ তুঃ, ১টি উঃ সাঃ। * থেকে রিঃ করে যাবেন। শেষ ঘরটি ১টি সোঃ করতে হবে। চতুর্থ লাইনে—সব ঘরই উঃ বুনতে হবে।

এমনিভাবে বুনে গিয়ে চারটি লাইনে এ প্যাটার্ন শেষ করতে হবে। বরাবর এই চার লাইনের প্যাটার্নটি রিঃ করে যেতে হবে। এ নিয়মে এগিয়ে যখন ১১" ইঞ্চি বোনা হয়ে যাবে, তখন ব্লাউশের 'হাতা' ছুটির জন্য ঘর বাড়াতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে জানিয়ে রাখি যে এ ছাঁদের ব্লাউশ-বোনার সময় জামার 'হাতা' ছুটিকে আলাদাভাবে রচনা করার প্রয়োজন নেই—একসঙ্গেই বুনে যেতে হয়।

এবারে পরবর্তী আট লাইন বোনবার সময়, গোড়াতেই ৬টি করে ঘঃ বাঃ হবে এবং আগাগোড়া এমনি ধরণে, নূতন ঘরগুলি সমেত, সবটুকুই নির্দিষ্ট ছাঁদে বুনে গিয়ে, কাঠিতে ১৩৪টি ঘর তুলতে হবে। এরপর যথানিয়মে কাজ করে গিয়ে জামার 'হাতাটি' যখন ৪" ইঞ্চি বোনা হয়ে যাবে, তখন প্যাটার্নের তৃতীয় লাইনটি পর্যন্ত বুনে, চতুর্থ লাইনটিকে রচনা করতে হবে,—৪৬টি ঘর উঃ, ৪২টি ঘর বন্ধ করে ফেলে, ৪৬টি ঘর উঃ। তারপর দু'দিকের এই ৪৬টি করে ঘর বাড়তি দুটি বোনার-কাঠিতে (Knitting needle) সযত্নে রেখে দিতে হবে।

এমনিভাবে ব্লাউশের সামনের দিকের কাজ শেষ করে, পিঠের অংশ (Back-side) বোনার কাজে হাত দিতে হবে। ব্লাউশের পিঠের দিকটিও বুনতে হবে অবিকল ঐ সামনের দিকের পদ্ধতি-অনুসারে। পিঠের অংশটিকে আগাগোড়া বুনে তোলার পর, শেষের যে ৪৬টি করে ঘর থাকবে দু'পাশে, সেগুলিও দুটি বোনার-কাঠিতে সযত্নে তুলে রাখতে হবে। তারপর সামনের এক পাশের ঘরগুলিকে, পিঠের অংশের ঠিক সেই পাশেরই মুখোমুখি ঘরগুলির সঙ্গে একত্রে বুনে মিলিয়ে অর্থাৎ একসঙ্গে সেঁটে বেমালুম জুড়ে দিতে হবে। ব্লাউশের সামনের ও পিঠের অংশ দুটিকে এভাবে জোড়া দেবার সময়, এদিকের কাঠি থেকে ১টি করে ঘর নিতে হবে এবং ওকের কাঠি থেকেও ১টি করে ঘর নিতে হবে···এমনিভাবে দু' কাঠি থেকে দুটি করে ঘর নিয়ে ১২ নং বোনার-কাঠির (Knitting-needle) সাহায্যে দুটি ঘর এঃ সঃ বুনে মিলিয়ে দেওয়া চাই। তারপর দু'দিকের ঘর দুটিকে একত্রে বন্ধ করে জামার কাঁধ দুটি জোড়া দিয়ে, 'হাতার' ঘের থেকে ৭২টি ঘর তুলে—১টি সোঃ, ১টি উঃ ছাঁদে এক ইঞ্চি অংশ বুনতে হবে। এভাবে বোনবার পর ঘরগুলি বন্ধ করে দেওয়া চাই—তাহলেই পশমের ব্লাউশের দুদিকের কাঁধ ও হাতার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

এবারে ব্লাউশের দু'দিকের দুটি পাশ একত্রে জুড়ে দিতে হবে। তারপর ক্রুশ-কাঠির (Crochet-needle) সাহায্যে ব্লাউশের গলার অংশে ৪ লাইন ডিঃ শিঃ করতে হবে। এ কাজের পর, পশমী-সুতোটিকে দু'হালিতে ভাগ করে নিয়ে ক্রুশ-কাঠি দিয়ে প্রায় ১।।০ গজ লম্বা সরু একটি ফিতার মালা বা 'Chain' বুনে দিতে হবে। এবারে ঐ ফিতার মালাটিকে ব্লাউশের গলার-অংশের চারিদিকে ঘিরে পরিয়ে দিন। মালাটি পরাবার সময় এমনভাবে কায়দা করে বসাবেন, যাতে ফিতার দু' প্রান্তের দুটি মুখ টানলেই ব্লাউশের গলার অংশে সুন্দর কোঁচ পড়ে যায়। ফিতার এই কোঁচ-রচনার উদ্দেশ্য হলো—ব্লাউশের উন্মুক্ত গলার অংশ বন্ধ করা এবং পোশাকের শ্রী-সৌন্দর্য বাড়ানো। এবারে ঐ ফিতাটি যাতে খসে না যায় ও কোঁচটিও পরিপাটি দেখায়, সেজন্য ফিতার দু'প্রান্তের দুটি মুখে একজোড়া রঙীণ কাঠের পুঁতি (Wooden Beads) পরিয়ে পরিপাটিভাবে দুটি গিট বেঁধে দিন। তাহলেই তৈরী হলো পশমের বোনা বিচিত্র এই ব্লাউশটি।

ছোট মেয়েদের স্কার্ট বা ফ্রকের এবং মহিলাদের শাড়ীর সঙ্গে এ ধরণের ঢিলা-ছাঁদের জালিদার পশমী ব্লাউশ ভারী সুন্দর মানায় ও শীতের দিনের সৌখিন পোশাক হিসাবেও এগুলি সুরুচিসম্মত ও বেশ আরামদায়ক হয়।

সিমন্তিনী

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে রেখায়িত সীমান্ত তোমার
আমার অস্তিত্বখানি প্রতিদিন করছো ঘোষণা ;
তোমার প্রাণের মূলে আমার যে মর্মের চেতনা,
লাল হয়ে রূপ ধরে তোমারি সিঁথিতে বারবার।
আমারি দেওয়া এ দাগ, রক্তরাগ চির কামনার,
আমারি দেওয়া এ-রূপ, অন্তরের যৌবন-চারণা,
আমার হাতের থেকে টেনে নিয়ে প্রাণের প্রেরণা,
সবারে দেখায়ে আজ স্নিগ্ধতাই করেছ বিস্তার!
মনের দিগন্ত জুড়ে তোমার আলোর উপস্থিতি,
আমার জীবনপ্রীতি তোমার ও-সীমন্ত সীমায় ;
অন্তরের স্নিগ্ধ প্রেম গায় সেই যৌবনের গীতি,
সে নিয়েছে স্থির ছন্দ ললাটের লাবণ্য-রেখায়।
তাই আমি দেখি চেয়ে—দুজনের মিলনের স্মৃতি
সীমন্তের তটে জেগে সীমন্তিনী করেছে তোমায়।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

কুমারেশ ভট্টাচার্য

ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ভারতে আগমনের দিন সমাগত। ইংলণ্ডের রাণী ও পৃথিবীর অন্যতম পুরাতন রাজবংশের কর্ণধাররূপেই অনেকে তাঁকে জানেন; কিন্তু তাঁর আরও পরিচয় আছে, আজ সেকথা কিছু বলব।

পৃথিবীর একজন অতি কর্মব্যস্ত মানুষ বোলে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের খ্যাতি আছে। বহু রকমের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ-কর্মে, সাধারণের নানা অনুষ্ঠানে, পারিবারিক বহু কর্তব্য কার্যে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কাটে ব্যস্ততার মধ্যে। কিন্তু তবুও বিদেশ ভ্রমণ কোরতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ইতিপুর্বে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের আর কেউই রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মত কখনও এত ব্যাপকভাবে বহু দেশ সফর করেন নি। রাণী হবার পুর্বে এবং পরে তিনি পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অব্ এডিনবরা, যখন পুর্ব-আফ্রিকা ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় রাণী তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ শুধু যুক্তরাজ্য এবং তার অধীন দেশগুলিরই রাণী নন, তিনি কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশেরও রাণী। আবার কমনওয়েলথের রিপাবলিকগুলি তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছে কমনওয়েলথের জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে।

১৯২৬ সালের ২১শে এপ্রিল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইয়র্কের ডিউক ও ডাচেসের প্রথম সন্তান। জন্মের পাঁচ সপ্তাহ্ পরে বাকিংহাম প্রাসাদের গীর্জায় নামকরণ হয় এই শিশুর। নাম রাখা হয় তাঁর

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ





বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও তাঁর স্বামী ডিউক্ অব্ এডিনবরা

এলিজাবেথ আলেকজেণ্ড্রা মেরী। তাঁর শৈশবের দিনগুলি উচ্ছল আনন্দে অতিবাহিত হয় ১৪৫ পিকাডিলিতে, রিচমণ্ড পার্কের হোয়াইট লজে এবং তাঁর পিতামহ রাজা পঞ্চম জর্জের গ্রামের বাড়ীতে। ছ'বছর বয়সের সময় তিনি চলে আসেন উইণ্ডসর গ্রেট পার্কের রয়েল লজে—তাঁর পিতামাতার বাড়ীতে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্ স্কটস্ গভর্ণেস্ কুমারী মারিয়ন ক্রফোর্ডের কাছে বালিকা এলিজাবেথের ও তাঁর চার বছরের কনিষ্ঠা ভগ্নী মার্গারেটের শিক্ষালাভ শুরু হয়। পিতা রাজা ষষ্ঠ জর্জ হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ কোরলে রাজকুমারী এলিজাবেথ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ও আইন শিক্ষা করতে থাকেন নিয়মিতভাবে মিঃ হেনরী মার্টেনের কাছে।

বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে রাজকুমারী সরকারী কাজেও অংশ গ্রহণ কোরতে থাকেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে বৃটেন ও কমনওয়েলথের শিশুদের উদ্দেশে তিনি বেতারযোগে প্রচার করেন এক মনোজ্ঞ বাণী। তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর। ১৯৪২ সালে তিনি গ্রেনেডিয়ার গার্ডসের কর্নেল নিযুক্ত হন।

শৈশব থেকেই গান-বাজনার দিকে তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জেস্ চ্যাপেলের অর্গান-বাদকের কাছে তিনি পল্লীগীতি ও কুমারী ম্যাবেল্ ল্যাণ্ডারের কাছে পিয়ানো বাজনা শিক্ষা করেন খুব অল্প বয়স থেকেই। শুধু গান-বাজনা নয়, নানারূপ খেলাধুলা বিষয়েও বরাবরই তাঁর প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটাতেও তিনি বিশেষ পটু। ১৩ বছর বয়সে তিনি বাথ্ ক্লাবে চিল্‌ড্রেনস্ চ্যালেঞ্জ শীল্ড লাভ করেন। তরুণ বয়সে তাঁর কাছে অভিনয় করা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে উইণ্ডসরে অভিনীত বিভিন্ন নাটকে তিনি বহুবার অংশ গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য মেয়েদের মতই রাজকুমারী এলিজাবেথ যুব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি গার্লগাইড নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে ১নং বাকিংহাম প্যালেস গাইড কোম্পানীর পেট্রল লীডার এবং পরে সী-রেঞ্জার হন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি রয়েল কলেজ অব্ মিউজিকের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

জাতির সেবায় অংশ গ্রহণের জন্যে রাজকুমারী এলিজাবেথ বিশেষ চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং পিতার অনুমতি লাভ করে এ,টি,এস-য়ে যোগদান করেন। ১নং মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ট্রেনিং সেণ্টারের একটি কোর্সে শিক্ষালাভ কোরে তিনি হয়ে ওঠেন একজন সুদক্ষ ড্রাইভার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি উন্নীত হন জুনিয়র



স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত বালমোরাল দুর্গের সম্মুখ প্রাংগণে রাণীকে তাঁর স্বামী ও পুত্রকন্যাসহ ছুটির আনন্দ উপভোগ কোরতে দেখা যাচ্ছে

কম্যাণ্ডারের পদে। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গঠিত হয় উইমেন্স রয়েল আর্মি কোর। রাজকুমারী এলিজাবেথ প্রথমে এই সংস্থার অনারারী সিনিয়র কণ্ট্রোলার এবং পরে অনারারী বিগ্রেডিয়ারের পদ অলংকৃত করেন। রাণী হবার পর অবশ্য এই পদ তিনি ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে রাজকুমারী এলিজাবেথ স্কটল্যাণ্ডে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপকভাবে সফর করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পিতামাতার সংগে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করেন ভ্যানগার্ড জাহাজে—যে যুদ্ধ-জাহাজখানা তিন বৎসর পূর্বে তিনি নিজে জলে ভাসিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

১৯৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর রাজকুমারী এলিজাবেথ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন লেফটেন্যাণ্ট ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের সংগে। বিবাহের পূর্বে তাঁর স্বামীকে 'ডিউক অব্ এডিনবরা' পদবী দ্বারা ভূষিত করা হয়। ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেনের পিতার নাম ছিল প্রিন্স এণ্ড্রু এবং এ সময় তাঁর নিজের নাম ছিল প্রিন্স ফিলিপ অব্ গ্রীস।

প্রিন্স ফিলিপের প্রপিতামহ ছিলেন ডেনমার্কের রাজা একাদশ ক্রীষ্টীয়ান। মায়ের সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রিন্স ফিলিপ হোলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্রীর পুত্র। প্রিন্স ফিলিপ অব্ গ্রীস। কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজের পদবী ত্যাগ করে বৃটিশ প্রজা হন এবং বৃটেনেই শিক্ষালাভ কোরতে থাকেন।

১৯৫৩ সালের ২রা জুন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবীতে অনুষ্ঠিত হয় রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বৃটিশ কমনওয়েলথের ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের প্রতিনিধিগণ। সর্বপ্রথম এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয় টেলিভিশন মারফৎ। বহু লোক ঘরে বসে টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ কোরেছিলেন এই রাজ্যাভিষেক।

আধুনিক বিশ্বে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এক বিশেষ সম্মানের ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতা। তাঁর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের। রাণীর যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তিনি সে সমস্ত গুণেরই অধিকারিণী। সরকারী ও নানা আনুষ্ঠানিক কাজ-কর্মে একটা সৌম্য-শান্ত ভাব, একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি যেমন তাঁর সুন্দর মুখখানাকে আরও সুন্দরতর কোরে তোলে, তেমনি সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের সংগে যখন তিনি মিলিত হন, তখন তিনি হোয়ে ওঠেন প্রাণ-চঞ্চল, হাসি-ঠাট্টা-আনন্দে উচ্ছল। কখনও তিনি ধীর-স্থির-অচঞ্চলা, কখনও বা তিনি লাস্য ও হাস্যময়ী। চরিত্রের এই দুটি দিকের অপূর্ব সমন্বয় এলিজাবেথকে কোরে তুলেছে আরও মহিমান্বিতা—অপরূপা।

আদর্শের দিক থেকেও তিনি পুরাতনপন্থী নন। তাঁর পিতার অগ্রজ ডিউক্ অব উইণ্ডসরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী রাজকুমারী মার্গারেটের রাজ-রক্তের সম্পর্ক-শূন্য সাধারণ মানুষ আর্মষ্ট্রং জোন্স্‌কে বিয়ের ব্যাপারে তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর মহৎ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাণী এবং তাঁর স্বামী তাঁদের সন্তানদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে বিশেষ সচেষ্ট। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স চার্লসের বয়স বর্তমানে ১২ বৎসর। বার্কশায়ারের অন্তর্গত চীমের



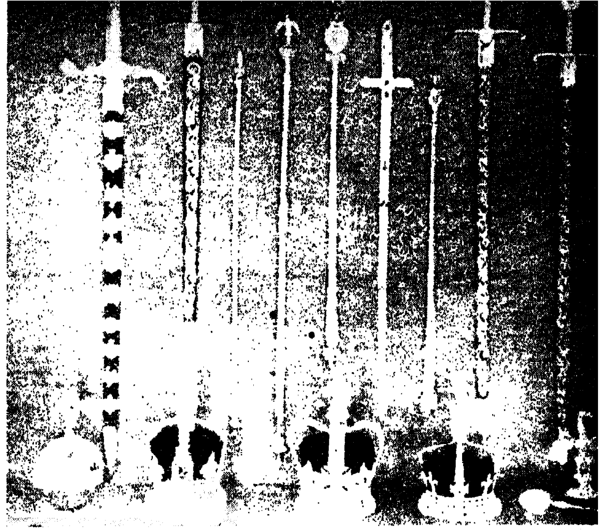
রাজকুমারী মার্গারেট ও তাঁর স্বামী আর্মষ্ট্রং জোন্সকে বিবাহের পরে বাকিংহাম প্রাসাদের অলিন্দে দেখা যাচ্ছে

একটি প্রিপারেটরী বোর্ডিং স্কুলে পড়াশুনা চলছে তাঁর। রাজকুমারী অ্যানের বর্তমান বয়স ১০ বছর। বাড়ীতে—বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁর গভর্ণেস কুমারী পীবলর্সের কাছে লেখাপড়া করছেন তিনি। সর্বকনিষ্ঠ প্রিন্স এ্যাণ্ড্রু জন্ম-গ্রহণ করে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তার দিন-গুলি খুব আরামে কাটছে নার্সারীতে। রাণী এবং ডিউক তাঁদের সন্তানদের রাজপরিবারের আভিজাত্যের গণ্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না—তাঁরা চান না স্বতন্ত্রভাবে তাদের মানুষ কোরতে। আর দশজন সমবয়সী এবং সহপাঠীদের সংগে তারাও মেলামেশার সুযোগ লাভ করুক, এটাই তাঁদের ইচ্ছা। রাণী এবং ডিউক উভয়েই অত্যন্ত সন্তান-বৎসল। সন্তানেরা তাঁদের সান্নিধ্য যাতে অধিক পরিমাণে লাভ করে সেদিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। কারণ, তাঁরা জানেন, সন্তান সবচেয়ে বেশী শিক্ষা লাভ করে পিতামাতার কাছ থেকে। রাণী একবার তাঁর এক গৃহ-কর্মচারীকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। কারণ, যদি সে সৎ মানুষ না হয় তবে সৎ রাজা হবে কিরূপে?

কোন ছুটির দিনেও রাণীর কাজের অন্ত থাকে না—কিন্তু তিনি বোধ করেন না কোন ক্লান্তি বা অবসাদ। তাঁর একটা ছুটির দিনের কথাই ধরা যাক। খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ কোরে স্বামীর সংগে তিনি প্রাতঃকালীন আহার সমাধা করেন। তারপর রাণী তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়েন। তারপর রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর নিজের দেশ ও অধীন অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে নানা প্রকারের সরকারী সিদ্ধান্ত, কাজ-কর্ম ও নিয়োগ অনুমোদন করে থাকেন। তারপর সরকারী কাগজ-পত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকারের আবেদন-পত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রাতঃকালে এসে উপস্থিত হন রাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রতিদিন অসংখ্য পত্রের জবাব দিতে হয় রাণীকে। কোন শিশুর পেন্‌সিলে লেখা আঁকা-বাঁকা চিঠিরও তিনি জবাব দেন সানন্দে। কারও বিবাহের হীরক জুবিলী অনুষ্ঠানের জন্যে, কোথায়ও বা কোন প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে রাণী পাঠান অভিনন্দন-টেলিগ্রাম। প্রতি বৎসরে তাঁকে এ সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার টেলিগ্রাম পাঠাতে হয়।

এ সমস্ত কাজ সমাধা কোরে রাণী এবার দৃষ্টি দেন সাংসারিক কাজকর্মের দিকে। প্রতিদিনের 'মেনু' বা ভোজ্যতালিকা তাঁর কাছে পেশ করা হয় এবং রাণী তা ভালভাবে দেখে অনুমোদন করেন, হয়তো বা কোনও দিন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করেন কিছু কিছু।

রাণীর ক্ষমতার প্রতীক-চিহ্ন মণিমাণিক্যখচিত মুকুট ও অস্ত্রশস্ত্রাদি



ভোজনের জন্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা অনুমোদন এবং আবশ্যকবোধে মাস্টার অব দি হাউসহোল্ডসের সংগে দেখা সাক্ষাৎও তিনি করেন। মাননীয় অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থা এবং সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় সম্পর্কেও কখন কখনও প্যালেস হাউস-কীপারের সংগে তাঁকে আলোচনা কোরতে হয়।

তারপর তাঁর কাছে আসে লাল চামড়ায় মোড়া লাল বাক্স। ঐ বাক্সের উপরে সোনালী রঙে লেখা আছে 'দি কুইন'। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাগজপত্র, পররাষ্ট্র দপ্তরের বহু টেলিগ্রাম (যেগুলি প্রাইভেট সেক্রেটারীরা বেছে বেছে পাঠিয়ে দেন) প্রভৃতি রাণী দেখেন বিশেষ মনোযোগের সংগে। রাণীর স্বাক্ষরের জন্যে লাল বাক্সে বহু দরকারী দলিল-পত্রও থাকে। তিনি সেগুলিতে স্বাক্ষর করেন—সম্মতি জানান।

দপ্তরের কাজ-কর্ম সেরে তিনি ঘণ্টা দুইয়ের জন্যে বসেন শিল্পীর সামনে—ছবি আঁকাবার জন্যে। তারপর পোশাক নির্মাতারাও তাঁর দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করে তাঁর পোশাকের মাপ নেবার জন্যে অথবা যেগুলি তৈরী কোরছে তারা, সেগুলি ঠিক মাপসই হচ্ছে কিনা তা জানবার জন্যে।

বিকালে চা পানের পর আর নৈশভোজ পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। রাণী যখন বিদেশে যান সফরে—তখনও কিছু কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে কোরতেই হয়।

রাজা বা রাণী অভিষিক্ত হন একবার। কিন্তু পার্লামেন্টের উদ্বোধন হয় বহুবার। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান অতি প্রাচীন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৎসরে সাধারণত একবার পার্লামেন্টের উদ্বোধন উপলক্ষে রাণী পরিধান করেন রাষ্ট্রীয় মুকুট ও সান্ধ্যকালীন পোশাকের উপর লাল ভেলভেটের রাষ্ট্রীয় পোশাক।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ হচ্ছেন কমনওয়েলথের বন্ধনস্বরূপ। তাঁকে স্বীকার করে বিভিন্ন দেশ আজ কমনওয়েলথের শক্তি রক্ষা করে চলেছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যাতে ঐক্য বজায় থাকে সেজন্যে রাণী কাজ করছেন আন্তরিকভাবে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি সফর করবার মূলেও রাণীর আছে এই একই উদ্দেশ্য।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারতে আসছেন সফরে। তিনি কামনা করেন ভারতের সংগে, ভারতবাসীর সংগে ঐক্য ও মৈত্রীর বন্ধন আরও সুদৃঢ় হোক।

আমরাও কামনা করি রাণীর আগমন হোক ফলপ্রসূ—হোক নির্বিঘ্ন। তাঁকে জানাই স্বাগত।

উত্তর সুভাষচরিত

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৪১ সালের ১৬ই জানুআরি পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনী সুপরিচিত ; ১৭ই জানুআরি থেকে ১৯৪৫ সালের ১৭ই অগষ্ট পর্যন্ত কাহিনীও মোটা-মুটি পাওয়া যায় ; ১৮ই অগষ্ট থেকে নেতাজির সন্ধান সাধারণে বিশেষ কিছু পায় না। এই রচনায় ১৯৪১ সালের জানুআরি থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ বছর দু মাসের ইতিহাস "আজাদ হিন্দ" প্রসঙ্গ বাদে সংক্ষেপে দেওয়া হবে ; আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারের কাহিনী একাধিক বড় বইএ পাওয়া যায় ; ১৯৪৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের কাহিনী পরবর্তী কোন রচনায় অনুকূল সময়ে প্রকাশ করা হবে।

অনশনের পর সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডে স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থায় আটক রাখা হয় আড়াই শো জন পুলিশ কর্মচারীর অতন্দ্র প্রহরায়। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে নাটকীয়ভাবে তাঁর অন্তর্ধান সাধারণ্যে প্রচারিত হয় তিনি ভারত-আফগান সীমান্ত লঙ্ঘন করে নিরাপদ এলাকায় উপস্থিত হবার দশ দিন পরে। ১৯৪৫ সালেও তাঁর তথাকথিত মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে সে-বার্তা ঘোষিত হয়। দুই ক্ষেত্রেই এক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল—তাঁকে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে চলে যেতে দেওয়া।

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে নানারকম শ্রুতিরোচক গবেষণা হয়েছিল যেমন ১৯৪৫ সালের অগষ্ট মাসে তাঁর আর এক নিরুদ্দেশের সংবাদে অনেকে করেছিলেন এবং সম্ভবত এখনও করেন। এখনকার অনুরূপ গবেষণা আর অলীক ধারণার সঙ্গে তখনকার অনুমানের কি অদ্ভুত মিল, তা দেখাবার জন্যে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৯৪১ সালের রচনা থেকে একটু তুলে দেওয়া হল :—

"শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচেরি যাইবার আগে তাঁহার জীবনের গতি যে দিকে ছিল, পরে তাহা অন্য দিকে গিয়াছে। সুভাষবাবুরও জীবনের গতির পরিবর্তন অসম্ভব নহে। তিনি বৎসর দুই আগে My Strange Illness শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার আভাসও ছিল। এক নিঃশ্বাসে শিবাজির ও সুভাষবাবুর নাম করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত বটে।"

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র জিআউদ্দিন ছদ্মনামে কাবুলে উত্তমচাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় রুশিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কি মনোভাব ছিল, তা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। উত্তম চাঁদের রচনা থেকে তা উদ্ধৃত হল :—

"আলোচনা প্রসঙ্গে একবার আমি বোসবাবুকে তাঁর মস্কো যাবার প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেছিলেন :—

"রুশ-জর্মন অনাক্রমণ-চুক্তি সদ্য নিষ্পন্ন হয়েছে। জর্মনি ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধরত। রুশিয়া ব্রিটেনের শত্রু। মস্কোয় যাবার এই হল উপযুক্ত সময় ভারতের স্বাধীনতার তরফে প্রচারকার্যের জন্যে। এমন হতে পারে যে রুশ-জর্মন মৈত্রী স্থায়ী হবে না এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। কিন্তু এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি হতে পারে, তা আমরা জানি না। কেউ কখনো কল্পনা করেনি যে, রুশ-জর্মন মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু ঘটনার গতি সেইদিকেই মোড় নিয়েছে। রুশ আর জর্মনের মধ্যে অন্তঃসলিলা শত্রুভাব থাকলেও ব্রিটেনও রুশের বন্ধু নয়। আমি নিঃসন্দেহ যে, রুশরা আমাকে ব্রিটিশবিরোধী প্রচার চালাতে দেবে। রুশ যাতে আমাদের সাহায্য করে, আমি সেই চেষ্টা করতে চাই। আজ রুশিয়া একমাত্র দেশ যা ভারতকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি মস্কো ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চাই না।"

অব্যবস্থার দোষে ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুভাষচন্দ্র সরাসরি রুশ-সাহায্য পাননি। ১৭ই মার্চ সিনোরা কারোনির সাহায্যে তিনি ইতালীয় দূতাবাসের আশ্রয় পান। এর পর জর্মন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সংবাদ এই :—

"১৯৪১ সালের বসন্তকালে সুভাষচন্দ্র বোস একজন জর্মন সড়ক ইঞ্জিনিঅরের সাহায্যে আফগান-রুশ সীমান্ত অতিক্রম করেন। তাঁর মস্কোতে অবস্থিতি সুখকর করার সব রকম চেষ্টাই রুশরা করেছিল।"

রুশ-জর্মন যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় রুশরা তখন সুভাষচন্দ্রকে কোন সাহায্য দিতে পারে নি। কিন্তু তখনই তিনি তাদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করেন যা ১৯৪৪ সালের শেষার্ধে নবীকৃত হয়। ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তরুণ ঐতিহাসিক প্রবর হরিদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থে মনস্বীপ্রবর বিনয়কুমার সরকার বলেন :—

"হয় তো ইংরেজ ও মার্কিন পল্টন জার্মান পল্টনের সাহায্যে রুশিয়া-কে লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে পারে। চরম অবস্থায় অর্থাৎ সন্ধির সময়

ইংরেজরা জার্মানদের বন্ধু থাকবে। জাপানিদেরকেও ইংরেজরা বন্ধু করে নেবে। রুশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আত্মরক্ষার জন্য জার্মানি ও জাপানের সাহায্য নিতে বাধ্য থাকবে। হয় তো রুশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিণ ইংরেজ-জার্মান এক সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে। এই সব হচ্ছে তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের তোড়জোড় মাত্র। তার জন্যে পেশাদা রাষ্ট্রবীরেরা আজই তৈয়ের আছে। দুনিয়ার আহাম্মুকরা তা বুঝবে না।"

১৯৪১ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, রুশিয়া তখন সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করতে পারবে না; ২৮শে মার্চ বার্লিনে উপস্থিত হলেও তিনি প্রথমে ইতালিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং হিটলারের সঙ্গে তাঁর কোন বন্দোবস্ত তখনও হয়নি। সুভাষচন্দ্র কয়েক মাস ইতালিতে থেকে রোম বেতারের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। The Springing Tiger গ্রন্থে উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল থেকে জানা যায় যে, মুসোলিনি আর ইতালীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সুপারিশে অনেক বিতর্ক, আলোচনা ও হিসেব-নিকেশের পর জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর নেতাজিকে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন আর বেতার-প্রচারের সুব্যবস্থা করে দেন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি বার্লিন বেতারে বক্তৃতা সুরু করেন। যে সব কূটনৈতিক কারণে সুভাষচন্দ্রকে যুদ্ধের সময়েও ইতালিতে "অর্লান্দো মাৎজোত্তা" এবং জার্মানিতে শ্রীযুক্ত এক্স ছদ্ম নামে প্রায় এক বছর থাকতে হয়েছিল, সেগুলো মনে রাখলে আমাদের দেশের সেই পণ্ডিতেরা উপকৃত হবেন যাঁরা বিজ্ঞভাবে বলেন, বেঁচে থাকলে নেতাজির আত্মগোপনের কারণ নেই। ইংরেজের দুই পরম শত্রু রাষ্ট্রে থাকার সময়েও যুদ্ধকালেও যাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল, তিনি বর্তমানে অনিশ্চিত স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে কোথাও ছদ্ম নামে থাকবেন, এর মধ্যে তত্ত্বত কোন অবাস্তবতা নেই।

১৯৪২ সাল থেকে নেতাজি অক্ষশক্তি-অধিকৃত ইউরোপে স্বনামে এবং স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরার সুযোগ পান। যুদ্ধপূর্বকালে আইরিশ নায়ক ডি ভ্যালেরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হন। ১৯৪১ সালে মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং ১৯৪২ সালে হিটলারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালে তোজোর সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর, তাঁর যে ১৯৪৪ সালে রুশ নায়কদের সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে লাল চীনের জননায়কদের সঙ্গে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে বিস্ময়ের খোরাক থাকলেও অসম্ভাব্যতা কিছুই নেই। হিটলারের শ্রদ্ধা এবং রুশের সম্বর্ধনা, দুটিই তিনি পেয়েছিলেন, সে প্রমাণের অভাব নেই।

মাত্র ২২ মাস অক্ষশক্তির আওতায় ইউরোপে থাকার পর ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেতাজি যে ভাবে সাবমেরিনে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে জাপানে এসে উপস্থিত হন, তাতে ইংরেজ পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ Madcap Adventurer আখ্যা দেয়। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কিচেনার সাবমেরিনে সামান্য ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে যমের অজ্ঞাত দক্ষিণ দুয়ারে পৌঁছে যান। তুলনায় নেতাজির কৃতিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়; আজ পর্যন্ত আর কোন রাষ্ট্রনায়ক এ-অসাধ্য সাধন করেন নি।

জাপানের সহায়তায় নেতাজি রাজসম্মান লাভ করেন; কিন্তু জাপানের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রশক্তি অসাধ্য সাধনের ব্রত যথাসম্ভব উদ্‌যাপন করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক অবস্থা উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র তোকিওর রুশ প্রতিনিধি ইআকব মালিকের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-বিরচিত পুস্তিকা "নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য" অবশ্যপাঠ্য। যে তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় এই ছোট বইটিতে আছে, তার তুলনা মেলে না। ১৯৪০ সাল বা তারো আগে থেকে নেতাজির রুশিয়ার সঙ্গে যোগ ছিল, এ কথা মাস্টার তারা সিং প্রমাণ করেছেন। ১৯৪১ সালে নেতাজি-রুশ সংযোগের বিবরণ পাই উত্তমচাঁদ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায়। ১৯৪৪ সালের যোগাযোগের বিস্তৃত পরিচয় সাক্ষ্যপ্রমাণসমেত নিপুণভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনায় দেওয়া আছে। প্রবন্ধলেখকের নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও কিছু প্রমাণ দেওয়া যাবে। ১৯৪৫ সালের সুভাষ সোভিএট যোগাযোগের সরকারি স্বীকৃতির পরিচয় শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁর বিবরণীতে দিয়েছেন। প্রথমে মাষ্টার তারা সিং এর মাসিকপত্র "সন্ত্ সিপাহী"-তে প্রকাশিত বিবরণ দেখা যাক:—

"সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালে অন্তর্ধানের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তখন তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে অসুস্থতার জন্যে মুক্তি লাভের পর নেতাজি কলিকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিবের কাছে রুশিয়া যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সর্দার তালিব নেতাজিকে বলেন যে, কমিউনিষ্ট নেতা আছর সিং চীনা এর ব্যবস্থা করতে পারেন। আছর সিং চীনা তখন ফতেওয়াল হত্যা মামলা সম্পর্কে পলাতক ছিলেন। এর পর বসু-তালিব-চীনা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। স্থির হয় যে, কমিউনিষ্টরা সুভাষচন্দ্রকে রুশিয়ায়পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নি। কিন্তু ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হন কাবুলে এসে তিনি সোভিএট সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সোভিএট কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে, তাঁরা এখন তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন না। কারণ রুশ-জর্মন চুক্তি ভেঙে যাবারমতো হয়েছে এবং সোভিএট সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আলাপ-আলোচনা চলছে। তাই সোভিএট সরকার ব্রিটিশকে আর বিরক্ত করতে চান না। ঐ সময় এক জন জর্মন জানতে পারেন যে, সুভাষচন্দ্র কাবুল ত্যাগ করতে চান। তিনি তখনই বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তার পর রুশিয়ার পথে বিমানে তাঁকে বার্লিন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়।" (লাহোর, জানুআরি, ১৯৪৬।)

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজি রুশিয়া পরিদর্শনে যান। সেই সময় আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার ঘোষণা করা হয় যে, ছ সপ্তাহের জন্যে আজাদ হিন্দ সরকার পরিচালনার ভার অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে দিয়ে নেতাজি রুশদেশ পরিদর্শনে গিয়েছেন। ঐ বেতার-সংবাদগুলি শোনার সৌভাগ্য লেখকের হয়। রুশিয়ায়

তাঁর সমাদর লাভের বর্ণনা তাঁর দেহরক্ষী বি, আর, রামচন্দ্র ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গালোর শহরে এক বক্তৃতায় দিয়েছিলেন। "আজাদ হিন্দ" নামে যে সংবাদপত্র দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তাতে প্রকাশিত হয় যে, তিনি ৬ সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সময় রুশিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি স্বয়ং তাঁর অফিসারদের সম্বোধন করে বক্তৃতা করেন এবং তাঁর রুশিয়া যাবার কথা সমর্থন করেন। ইআকব মালিকের মারফৎ স্তালিনের আমন্ত্রণে তিনি সোভিএট ইউনিঅন পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, এই মর্মের সংবাদ ১৯৪৫ সালের জানুআরি মাসেও আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে। রুশদেশ পরিভ্রমণ শেষ করে নেতাজি তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রমণ্ডলীর কাছে রুশিয়ার উন্নতির প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর বেতারে পর পর অনেকগুলি বাংলা বক্তৃতা করেন। প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "জয়তু নেতাজি" গ্রন্থে সে-সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ আলোচনা করেছেন। ঐ বক্তৃতাগুলি লেখকের স্বকর্ণে শোনার সৌভাগ্য হয়। একটি বক্তৃতায় নেতাজি বলেন :—

"পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, "আমি যদি বিদেশি সাহায্য নিয়ে ভারতে অভিযান করি, তাহলে তিনি আমাকে যথাশক্তি বাধা দেবেন। পণ্ডিত নেহরু জেনে রাখুন, যত দিন আমার হাতে একটিও সেপাই বা একটিও বন্দুক থাকবে, তত দিন আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করায় বিরত হবো না।" তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকমিশ্রিত হাসির ধ্বনি বেতারেও শোনা গেল : "পণ্ডিত নেহরু যদি আমাকে ভারতীয় বাহিনী নিয়ে ভারত-প্রবেশে বাধা দেন, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ইতস্তত করব না।" এই কথা ঘোষণা করার পর নেহরু-সরকারের আমলে নেতাজির পক্ষে ভারতে ফিরে আসা সম্ভব পর নয়, তা সবাই বুঝতে পারেন।

ঐ সময় আর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন : "যদি এই যুদ্ধে জাপান হেরেও যায়, তাহলেও আমি উদ্বিগ্ন নই ; কারণ, আমি তখন রুশিয়ার সাহায্য পাবো।"

নেতাজি বার্লিন থেকে ক্রিপ্‌স্ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন ; সিঙ্গাপুর থেকে তিনি ওয়েভেল-পরিকল্পনারও তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে প্রথম বার ভিশি বেতারকেন্দ্র থেকে, ১৯৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসে অষ্ট্রেলিয়ার একটা পত্রিকায় দ্বিতীয়বার এবং ১৯৪৫ সালের অগষ্ট মাসে তৃতীয় বার জাপানের দোমেই সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে একই ধরনের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়। প্রথম বার ফ্রান্সের ভিশি থেকে বলা হয়, বার্লিন থেকে বিমানযোগে তোকিও যাত্রাপথে দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে ; ইংরেজরা যখন দেখ্‌ল, সুভাষচন্দ্র জর্মনির সহায়তা পেয়ে গেছেন এবং তিনি ক্রিপ্‌স্-পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন, তখন ভারতে তাঁর প্রভাব নষ্ট করার জন্যে তারা ব্যাকুলভাবে তাঁকে মৃত প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়বার নেতাজি রুশিয়ার সাহায্য পেতে চলেছেন শুনে অষ্ট্রেলিয়া পত্রিকায় বলা হয়, ১৯৪৫ সালের ১৭ই ফেব্রুআরি এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে ; আগের খবরের মতো এটিও অচিরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে বারবার এক ধরনের মৃত্যুসংবাদ প্রচার লক্ষণীয়। তৃতীয় বার ১৯৪৫ সালের ২৩শে অগষ্ট দোমেই সংবাদসংস্থা ১৮ই তারিখে তাঁর মৃত্যুর যে-খবর দেয়, তারও অলীকতার এত প্রমাণ লেখকের কাছে সংগৃহীত আছে যে, সেগুলির সাহায্যে একটি বড় বই অনায়াসে লেখা যায় ; উৎসুক পাঠকেরা পর্যায়ক্রমে (১) নেতাজি রহস্য সন্ধানে—সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামী (২) Liu Po Cheng or Netaji —শিবপ্রসাদ নাগ (৩) Netaji Enquiry Committee Report —Govt. of India Publication (৪) Dissentient Report—সুরেশচন্দ্র বসু এবং (৫) নেতাজির অন্তর্ধান-রহস্য—দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই পাঁচখানি বই পড়লে সর্বসংশয়মুক্ত হতে পারবেন। শেষ ভারত-সরকারের বিবরণীটি মন দিয়ে পড়লেই যে কোন পাঠক বুঝতে পারবেন যে, তৃতীয় সংবাদটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আলোচ্য প্রবন্ধে মাত্র তিনটি প্রমাণের উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী জীবনকাহিনী বর্ণনা করলেই বিমান দুর্ঘটনার অলীকতা স্বতঃ প্রমাণিত হবে।

(১) তথাকথিত দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর পাঁচ দিন পরে ২৪শে অগষ্ট জাপ সংবাদ প্রতিষ্ঠান একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে অত্যন্ত দায়সারা ভাবে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে। ঐ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর সারা বিশ্বে প্রচারিত হত, যেমন ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুআরি রাসবিহারী বসুর এবং ১৯৬০ সালে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হয়। ঐ পাঁচ দিনের অবকাশে নেতাজি নিরাপদে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। মাত্র এটিই যথেষ্ট প্রমাণ বলে ধরা যায়।

(২) নেতাজির মৃত্যু বা অন্তিম শয্যার কোন চিত্র নেই অথচ চিতাভস্মপেটিকা নিয়ে রহমানের চিত্র আছে। সমারোহ-সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অভ্যস্ত জাপানি চরিত্রে নেতাজির ছবি না নেওয়ার মতো অস্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না।

(৩) নেতাজির কফিন বিমানে না ধরায় তাঁর দেহ সাইগন বা তোকিও বা অন্যত্র ভারতীয়বহুল জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এ রকম বাজে কথা যারা বিশ্বাস করতে বলে, তারা অবশ্যই ধূর্ত ; কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা নির্বোধ।

অসৎ ব্যক্তি না হলে যে কোন লোক সমস্ত প্রমাণ পরীক্ষার পর স্বীকার করতে বাধ্য যে, নেতাজি ১৯৪৫ সালের ১৮ই অগষ্ট বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান নি। তাহলে, তারপর কি ?

নেতাজির মৃত্যুর ব্যাপারে প্রথম থেকেই নেহরুর মনে একটা অশোভন আগ্রহ দেখা গেলেও পাঠককে মনে রাখতে হবে যে, সেসময়ে নেহরু, সরকারের কেউ ছিলেন না। মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গমার্কিন গোয়েন্দাদের রায়ই চরম। এ-ব্যাপারে তারা যা বলেছে তারপর

বিনা প্রমাণে নেহরুর এ বিষয়ে কিছু বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। ইঙ্গমার্কিন কর্তৃপক্ষ কোন সময়েই সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুকাহিনী বিশ্বাস করেন নি। যুদ্ধাপরাধী-তালিকায় তাঁর নাম তোলা হয়। নিউ ইয়র্কের এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্ণর ডিউই ঘোষণা করেন যে, "আমরা সুভাষ-চন্দ্রকে পেলে ফাঁসি দেবো, তিনি অনেক আমেরিকান মেরেছেন।" ১৯৫৮ সালের ২৮শে এপ্রিল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের মার্কিন তালিকা বাহ্যত বাতিল হলেও কার্যত বহাল আছে, ইউগোশ্লাভ আর্তুকোভিচের মামলা তার প্রমাণ। ইংরেজের তালিকায় নেতাজির নাম আজও আছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং ভারতের কেন্দ্রীয় বিধানসভায় অরবিন্দ ঘোষাল মহাশয়দের উক্তি এবং প্রশ্ন প্রসঙ্গত স্মরণীয়। নেতাজির নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় আছে কি না, এই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর আজ পর্যন্ত ভারত সরকার কেন দিতে পারেন নি, সেটা ভেবে দেখার বিষয়।

কৌতুকের ব্যাপার এই যে, অনেকে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বিশ্বাস না করলেও মনে করেন যে, পনেরো বছরের মধ্যেও যখন তিনি আসেন নি, তখন তিনি অন্যভাবে মারা গেছেন বা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। ১৯৪১ সালে তাঁর নিরুদ্দেশ-যাত্রার সময় সর্দার শার্দুল সিং কবিশের বলেন: "I think he has become a Sadhu and gone to some place in South India!" ১৯৪৭ সালে তিনিই আবার ঘোষণা করেন যে, মাঞ্চুরিয়া-সাইবেরিয়া সীমান্ত লঙ্ঘনের সময় রুশ প্রহরী নেতাজিকে ভুল করে গুলি ছুঁড়ে মেরে ফেলে। ম্যাকআর্থার গোপনে নেতাজিকে হত্যা করান, ধনলোভে নেতাজিকে ইন্দোজাপ ষড়যন্ত্রীরা খুন করায়, এ-সব কথাও শোনা গেছে।

এই সব মৌলিক গবেষণার উত্তর এই যে, সত্য বা মিথ্যা যাই হোক বিমানদুর্ঘটনার সম্বন্ধে তবু একটা সরকারি ইশ্‌তাহার আছে, কিন্তু অন্যান্য খবরের তরফে কোন প্রমাণ নেই বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। এই কারণে নেহরু-সরকার চেষ্টা করেন যাতে ১৯৫৬ সালের নেতাজি তদন্ত সমিতি ঐ দুর্ঘটনাকেই শেষ কথা বলে ধরেন। কিন্তু তদন্ত সমিতির পূর্ণাঙ্গ কার্যবিবরণী তাঁরা সাধারণ্যে একত্র প্রকাশ করেননি কিম্বা সুরেশবাবুর বিবরণীটুকু যখন স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হল তখন তার কোন সরকারি প্রতিবাদ জানানো হয়নি। বরং অধ্যাপক নির্মল বসু যুগান্তর পত্রিকায় ঘোষণা করেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু যে হয়নি, এটুকু সুরেশবাবু নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পেরেছেন। অতএব, যুক্তিসম্মতভাবে একথা এখন বলা যায় যে, বিমান দুর্ঘটনায় যখন তিনি মারা যাননি তখন তিনিই বেঁচে আছেন আর রাজনৈতিক জগতে সক্রিয় হয়েই আছেন; বিশেষত, অন্তর্ধানের পূর্ব মুহূর্তে তিনি সক্রিয় থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন এবং ১৯৪১ সাল থেকে কখনও তিনি সন্ন্যাসের ধার ঘেঁসেও যাননি। সুদূর কৈশোরে একবার গৃহত্যাগ করলেও গুহাপন্থী তপস্বী তিনি কোনদিন ছিলেন না এমন-কি ছাত্র-জীবন থেকে পরবর্তী কালে অধ্যাত্মপথের পথিকও ছিলেন না। "রজোগুণের double dose"-এর ভক্ত তাঁর কাছে সন্ন্যাস কদাচিৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়ে থাকতে পারে, উদ্দেশ্য কখনই নয়। "ভারত পথিক"-এ তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মপীড়নের অনুপযোগিতা উদ্‌ঘাটন করেছেন। ১৯৩৫-৪০ সালে বহু জায়গায় তিনি গুরুবাদ ও আশ্রমবাসের কঠোর নিন্দা করেছেন। অন্যান্য প্রমাণ থেকেও বলা যায় যে, ১৯৪৫ সালের অগস্টের পরও তিনি পূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক জীবন যাপন করে চলেছেন।

১৯৪৫ সালের অগস্ট মাস থেকে সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র কার্যকলাপের নানা বিবরণ পৃথিবীর নানা দেশের নানা ভাষার পত্রিকায় প্রকাশিত হতে সুরু হয়। আজ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত আছে। এই পনেরো বছরের বেশি সময় এক রকম লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সুভাষচন্দ্র সমস্ত দূরপ্রাচ্যে যে অদ্ভুত খ্যাতি অর্জন করে চলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

এবার ১৯৪৫ সালের অগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুআরি পর্যন্ত সময়ে নেতাজির কার্যকলাপের প্রমাণসহ বিবরণ দিয়ে বক্তব্য স্থগিত করা যাক।

১৯৪৫ সালের ১৭ই অগস্ট নেতাজি তাঁর নিজস্ব বিমানে সাইগন থেকে মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। রুশ ও চৈনিক ভাষাবিৎ জাপ সেনানী শিদেইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাঞ্চুরিয়ায় আগত রুশ লালফৌজের অধ্যক্ষের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে মাঞ্চুরিয়ায় পাঠিয়ে রুশদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া যে জাপানিদের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল, এ-কথা ১৯৫৬ সালে জাপ ও ভারত উভয় সরকার স্বীকার করেন। সুতরাং বিমান-দুর্ঘটনায় মারা না গেলে নেতাজি যে মাঞ্চুরিয়ায় উপস্থিত হবেন, তা স্বতঃসিদ্ধ। হিউ টয়ের মতো স্থূলবুদ্ধি অসাধু ইংরেজ সাংবাদিক লিখেছেন তাঁর The Springing Tiger এ যে, এত জায়গা থাকতে নেতাজি কিনা রুশিয়ায় যাবেন! তাঁর জানা থাকা উচিত ছিল যে, "My colleagues accepted as correct that after the Japanese had surrendered, it was their joint and agreed plan that Netaji would finally move to Russian territory and that the Japanese Government were accordingly removing him to Manchuria and taking him out of the clutches of the victorious Anglo-Americans." (Dissentient Report by S. C. Bose).

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ভারতে আজাদহিন্দ আন্দোলন প্রবলভাবে সুরু হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুআরি পর্যন্ত চার মাসে ঐ আন্দোলন চরমে ওঠে। নেতাজি তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে সে-সব খবর পেয়ে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯শে মাঞ্চুরিয়া এলাকা থেকে এক বেতারবাণী প্রচার করেন। এর সত্যতা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। প্রথমে নেতাজির বাণীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি তুলে দেওয়া গেল:—

"The Third World War may come in ten years or even earlier.

"We are under the shelter of one of the great powers of the world. We should not be disappointed. This first round of the battle is a failure. The battle of freedom is not easy. America won her independence after seven years' fighting. Ireland won her freedom after four year's fighting. We are sure to be successful within two years.

"I will go to India on the crest of a Third World War and sit in judgment upon those who are trying my officers and my men at Red Fort."

১৯৫৫ সালের ২৩শে জানুআরি অমৃতবাজার পত্রিকায় বিখ্যাত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর মহাশয়ের এক প্রবন্ধে এই বেতারবাণী আংশিকভাবে উদ্ধৃত হয় এবং তিনি মন্তব্য করেন যে, ""He may challenge Nehru or Ike to a duel." ঐ বেতারবার্তা অখণ্ড বাংলার গভর্ণর আর, জি, কেসির লাটপ্রাসাদের একজন রেডিও মনিটার শ্রীযুক্ত পি, সি, কর বেতারযন্ত্র মারফৎ শুনে প্রচারের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি এ-কথা প্রকাশ করে প্রবন্ধ লেখেন। তার অনেক আগে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে এই সংবাদগুলি প্রকাশিত হয় :—

"নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত। বর্তমানে মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানের সংবাদ। কলিকাতায় আগত জনৈক চীনার উক্তি। লাহোরের সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেটে কলিকাতাস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি বর্তমানে মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় আগত জনৈক চীনা ভদ্রলোক এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে আরো বলা হইয়াছে যে, গত ১৯শে ডিসেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মাঞ্চুরিয়া হইতে বেতারযোগে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।"

"নেত্রকোণা, ৩রা এপ্রিল—গত রবিবার এক বিরাট জনসভায় ক্যাপ্টেন সুলতান বলেন, বর্তমানে নেতাজি সৈন্যসহ রুশিয়ায় অবস্থান করিতেছেন এবং ভারতকে মুক্ত করিবার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। নেতাজি দুই এক মাসের মধ্যেই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং কাশ্মীরের মধ্য দিয়া ফৌজসহ ভারতে প্রবেশ করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।"

"মাদ্রাজ, ৪ঠা এপ্রিল—আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার সম্পাদক এবং আজাদ হিন্দ প্রেসের ডিরেক্টর মিঃ কে, ই, গণপতি বলেন, সুভাষচন্দ্র বসু মাঞ্চুরিয়াতে আছেন।"

"মালয়ে মালাই ভাষায় প্রকাশিত সেবিকা সংবাদপত্রে লণ্ডন হইতে ২৭।৩।৪৬ তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বেতারে সুভাষচন্দ্রের মাঞ্চুরিয়া হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা শোনা গিয়াছে।"

"লাহোর, ৪ঠা এপ্রিল—পাতিয়ালার এক জনসভার ডাক্তার এক্রাম হোসেন নথিপত্র হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন। বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইবার পর তিনি নেতাজির ব্যক্তিগত উপদেষ্টার নিকট হইতে এই মর্মে এক তারবার্তা পান যে, সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন এবং কোন নিরাপদ স্থানে গমন করিয়াছেন।"

১৯৪৬ সালের জানুআরি ও ফেব্রুআরি মাসে নেতাজি আরো দুটি বাণী প্রেরণ করেন। এ পর্যন্ত কোন পত্রিকায় এ-দুটি ছাপা হয়নি। জানুআরি মাসের বার্তার এক জায়গায় নেতাজি বলেন :—

"I am giving a very short speech about the Indian National Week to India for my brothers and sisters in India.

"We must get freedom within two years. The British Imperialism is broken down and it must concede independence to India. India will not be free by means of "Non-violence." But I am quite respectful to Mr. M. K. Gandhi.

"The battle of freedom is not easy. But I can assure you that we will get freedom of India very soon. I know that many Indians are waiting for me. I am quite sure to be successful within two years.

"I have been informed against the news of the police firing at Calcutta. Many students are dead. My eyes were full of tears when I heard it. I know that man is mortal and the most glorious death is one when a person dies to save his own country. The Indians who shed their blood for freedom could not die.

"My first order to my revolutionary friends in India is that they will hold a great meeting to commemorate the martyrs on the 25th inst."

ফেব্রুআরি মাসের বক্তৃতাটি যেমন সুলিখিত তেমনি ইঙ্গিতগর্ভ। যে আসন্ন আপোষের দিকে কংগ্রেসের লুব্ধ দক্ষিণপন্থী নেতারা অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার সম্বন্ধে নেতাজি আরো একবার এবং সম্ভবত শেষবার সতর্ক করে দেন। তাঁর ঐ বক্তৃতাটি পুরো তুলে দেওয়া গেল। পাঠকেরা বিচার করুন এ কার বাণী :—

NETAJI'S MESSAGE

"This is Subhash Chandra Bose speaking, Jai Hind. It is for the third time I am addressing my Indian brothers and sisters after Japan's surrender

The Prime Minister of England is going to send Mr. Pethick Lawrence and two oher ministers from London with no object in view other than let the British Imperialism have a permanent settlement for all means to suck the total blood of India. Now, among these three Londoners, one had to go back from India with a baffled heart only a few years ago.

It is as a sort of precaution, I am advising Indians not to pay any heed to these imposters. I am sure that Mr, Pethick Lawrence will have to submit an adequate explanation for all the mishaps and distresses of India by this time. The underlying intention of this endeavour by the three is nothing but to set a new trap of dependence in which India may fall very soon. So my earnest appeal to the Indians is that they should in no case hear them but continue revolution against what is contrary to achieve freedom. I think many other viceroys and ministers will embark on India with the same motto for keeping us in the dark doom of depen-dence. But my Indians should never hear them.

Again I am announcing that within a short period of two years India will have the dawn of Independence. We will have complete freedom by that time and I will also come back in the year 1947.

Many of the Indians have declared me as the "Netaji" of India but I am telling them that I am nothing but an humble son like others of "Bharat Mata" and am not at all worthy of being the same.

The British Imperialism will have its utter destruction and it is now commenced. You see they have come down to utter shame by killing our children only for having their imperialism still above."

তিনটি বক্তৃতাই ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯শে তারিখে প্রচারিত হয়। তৃতীয় বাণীটির পর নেতাজি মাঞ্চুরিয়া থেকে আর কোন বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান নি। যুদ্ধাবসানের পর আগের সর্ত অনুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুশ সরকার চিআং-সরকারকে চীনের একমাত্র বৈধ কেন্দ্রীয় সরকার বলে মেনে নিতে বাধ্য হন। চিআং-সরকার মাঞ্চুরিয়ার দখল দাবি করেন। নেতাজি সাময়িকভাবে তাঁর বাহিনী-সমেত সরে যান। তারপর ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের ঘরে-বাইরে ঘটনার স্রোতে এমন এক পরিবর্ত্তন আসে যাতে নেতাজি বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে বিপ্লবের বাণী ও কার্যসূচী পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না।

দুটি সংবাদের দিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা গেল :—

"ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে উল্লিখিত আছে যে, নেহরু নেতাজির কাছ থেকে এই মর্মে এক চিঠি পান যে,নেতাজি রুশিয়ায় আছেন এবং তিনি ভারতে চলে আসতে চান। তিনি চিত্রলের পথে আসবেন। সম্ভবত যে সময় তাঁর চিঠি এসেছিল, সেই সময়ে গান্ধী তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণা প্রচার করেন।" (Head Quarters Main File 273|INA, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

"London, February 18, 1946.- In their talk with the Prime Minister at 10, Downing Street, some emphasis was placed by the Parliamentary delegates on the degree with which both Congress and the Muslim League are being dominated by the I. N. A. movement. Another point pressed home was that the Indian situation is such that before long the initiative could pass out of the hands of Gandhi into those who believe in Bose's doctrine."

১৯৪৬ সালের ১৪ই মার্চ গান্ধি বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে যে বিরোধী কথাই বলো না কেন, আমি এখনও আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিশ্বাস করি যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেঁচে আছেন।"

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর সাড়ে ছ মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কর্মধারার আর একটু পরিচয় দেওয়া যাক যা থেকে আজকের এশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোঝা যাবে :—

"চিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ও মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার মিঃ আলফ্রেড ওয়াগ বলেন," আমি নিম্নোক্ত বিবরণ সংগ্রহ করেছি :—

"১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে কোন চীনা সেনাপতির অতিথি হিসেবে সুভাষ দক্ষিণ চীনে উপস্থিত হন। এখান থেকে তিনি হ্যানয়ের আনামি সরকারের কয়েকজন বামপন্থীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এই ঘটনাগুলো থেকে একটা বিস্ময়কর ঘটনার সূত্র ধরা পড়ে। জাপানের আত্মসমর্পণের (২।৯।৪৫) চারদিন আগে বসুকে সাইগনে দেখা যায়। জাভা থেকে ডঃ সুকর্ণ আর ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য নায়কেরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বসুর সরকার স্বাধীনতার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ ছিল বলে আনামি সরকারের পক্ষে কেবল আজাদ হিন্দ ফৌজ কেন, অন্য যে কোন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে ইন্দোচীনের আনামি-নিয়ন্ত্রিত অংশে আশ্রয় দেওয়া সহজ ছিল। আমাকে

বন্ধুর কাছে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানালে তাঁরা অস্বীকার করেন। তবে একজন আনামি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি বন্ধুর শেষ নির্দেশ-নামার নকল আমাকে দেন ; তাতে সুভাষ বলেছেন, ব্রহ্মদেশে পরাজয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় মাত্র ; আরো অনেক পর্যায় ভবিষ্যতে চালাতে হবে। এই ঘোষণার অর্থ কি ?"

বর্তমানে ঐ আনামি সরকারের নাম হো চি মিনের উত্তর ভিএত্‌নাম সরকার। হো চি মিন ও নেতাজি সম্পর্কে পরে অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। নেতাজির সঙ্গে চীনা যোগাযোগের কথা যখন মার্কিন গোয়েন্দা ওয়াগ প্রচার করেন, তখনও শিবপ্রসাদ নাগ-কথিত লিউ পো চেং নামটি শোনা যায়নি। সুতরাং চীনা সেনাপতিদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক মাত্র নাগ মহাশয়ের অমূলক কল্পনাবিলাস নয়।

১৯৪৩ সালে যখন ভারতব্রহ্ম রণাঙ্গনে ইন্দোজাপ বাহিনীর আক্রমণে ইঙ্গমার্কিন বাহিনী পর্যুদস্ত হয়, তখন ইঙ্গমার্কিনদের সহায়তার জন্যে পরবর্তী যুদ্ধস্তরে চিআং মার্কিন সেনাপতি স্টিলওএলের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ হাজার চীনা সৈন্য পাঠিয়ে দেন। পার্বত্য যুদ্ধে অতি দক্ষ এই বাহিনীর কাছে আজাদহিন্দ বাহিনী পরাজিত হয়। তখনই নেতাজি চিআংকে আত্যন্তিকভাবে বিরাগের চোখে দেখতে থাকেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে জুন তিনি সিঙ্গাপুর বেতারে বলেন, "যতদিন মার্কিন আধিপত্য চুংকিং-এ থাকবে, ততদিন চীন কখনও এক রাষ্ট্র হতে পারবে না। চীন এবং ভারত স্বাধীন না হলে এশিয়ার দাসত্ব ঘুচবে না।" ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে কারামুক্ত হয়েই এক জনসভায় শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেন, চীনের প্রকৃত নেতা মাও সে তুং, চু এন লাই এবং চু তে, চিআং নন। নেহরু এই সময় চিআংকে সমর্থন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে অপদস্থ হন।

১৯৪৬ সালের ২৭শে এপ্রিলের এক খবরে জানা যায় :—

"নেতাজি যে জীবিত আছেন এবং নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করছেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। কমিউনিষ্ট চীন, ইন্দোচীন ও মালয়ের বহু দায়িত্বশীল লোক তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি একবার একটি রুশ সাবমেরিন-যোগে ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।"

উত্তর সুভাষচরিতের উত্তর ভাগে পরবর্তী কাহিনী বলা যাবে।

(২৫।১২।৬০)

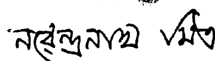
নেপথ্যে

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী

যবে খর শীতে জীব ধরণীতে জড়ের জীবন যাপে,
জগদ্দলন-শিলার মতন বুকে তার ভার চাপে,
মনে হয়, হায় ! নাহিক উপায়, নাহি কূল, নাহি দিশা,
নাহি কাটে বুঝি শীত সাথে যুঝি' এ ঘোর দুঃখ-নিশা,
তখন কোথায় গহন গুহায় জাগিছে দখিনা বায়ু—
অট্ট-হাসিতে পলকে নাশিতে শীতের দীর্ঘ আয়ু !
প্রখর খরায় যবে রবি, হায় ! ছড়ায় অগ্নি-রাশি,
নয়নের আগে মরুভূমি জাগে, রূপ-রস সব নাশি',
জনমে প্রতীতি, নাহি নিষ্কৃতি ধরার রুদ্র-রোষে—
ফুল-মধুকোষ হ'তে তাঁরি রোষ—সাগর অবধি শোষে।
তখন কোথারে কাতারে কাতারে জমিছে মেঘের দল—
ঊষর ধরায় করিতে ত্বরায় সরস, সুশ্যামল !

যখন ভাদরে বারি ঝরঝরে বরিষয়ে অবিরাম,
ঘন আঁধিয়ার, জলে একাকার পথ-মাঠ-ঘাট-গ্রাম,
মনে হয় যবে, আর নাহি হবে এই দুর্যোগ শেষ,
দেখিব না আর মোহিনী ধরায় আলো-ঝলমল বেশ,
তখন গোপনে করিছে স্বপনে শেফালি যে ফুটি-ফুটি,
হিরণ-বরণী জগজ্জননী-চরণে পড়িতে লুটি' !
যবে ভাবি, হায় ! গভীর ব্যথায়, বৃথাই কাটিল বেলা,
কাজের ধরায় হেলায় ফেলায় করি' শুধু ছেলেখেলা,
মিটিল না ক্ষুধা, মিলিল না সুধা-মান-যশ-বৈভব,
মোর ক্ষীণ স্বর ডুবায় মুখর গুণীদের কলরব —
তখন নীরবে শোভা-সৌরভে, মধুভারে উঠে ভরি',
হৃৎকলি মম শতদলসম ধীরে তিল তিল করি' !

পতনে উত্থানে



নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনুরাধা বলে গেলেন বটে—'ওই সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যেই সব পাবেন।' কিন্তু উৎপল দেখল কয়েকটি তথ্য ছাড়া এই পুস্তিকা থেকে তার প্রায় কিছুই গ্রহণ করবার নেই। এতে সতীশঙ্করের বাল্য কি কৈশোর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। পূর্ববঙ্গের একটি অখ্যাত শহরের মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করতেন সতীশঙ্করের বাবা সত্যপ্রসন্ন রায়। এ ছাড়া তাঁর আর কোন পিতৃপরিচয় দেওয়া নাই। মা শুধু নামে উল্লিখিতা হয়ে রয়েছেন সুধারাণী। আরও তিনটি ভাইবোনের উল্লেখ আছে। কিন্তু সতীশঙ্করের মত কেউ তাঁরা কৃতী নন বলেই বোধ হয় তাঁদের একেবারে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ ছেলেবেলার এই পারিবারিক জীবন নিয়ে, ভাইবোনদের সঙ্গে সতীশঙ্করের সম্পর্ক, খেলাধুলার কথা নিয়ে সুন্দর একটি কি দুটি অধ্যায় রচনা করা যায়। রচনা করতেই হবে। অনুরাধা হয়তো চাইবেন সেই শিশু কি বালক বয়স থেকেই সতীশঙ্করকে অদ্ভুত প্রতিভাবান—কি ভারতমুক্তির স্বপ্নপাগলরূপে দেখাতে। নকল গড় বানিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ খেলা ছাড়া সতীশঙ্করের আর কোন খেলা ছিল না এ কথাও হয়তো লেখা যায়। আসলে হয়তো আরও পাঁচটি সাধারণ ছেলের মতই সতীশঙ্করেরও শৈশব আর বাল্যকাল কেটেছে। তিনিও আর পাঁচটি বাঙালী ছেলের মতই মাছ, ভাত খেয়ে, মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-বাপের পিঠে-কাঁধে চড়ে, ভাইবোন সঙ্গী সাথীদের নিয়ে খেলা-ধুলো হাতাহাতি গলাগলির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন। হয়তো তখন থেকেই তাঁর মধ্যে কোন অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু জীবনীকারেরা তা করেন না। তাঁরা ছোটবড় মাঝারি যাঁর জীবনীই লিখতে যান, প্রথম থেকেই—সেই শিশুর হাত-পা ছোঁড়ার সময় থেকেই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলতে চান। যাঁরা মহাপুরুষ, ধর্মপ্রচারক কি ধর্মগুরু তাঁদের জন্ম থেকেই অলৌকিকতা শুরু হয়। শৈশবে বাল্যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা অনন্যসাধারণ হয়ে থাকেন। আজকাল অবশ্য এই লোকোত্তরতা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয় না, তবে যে গাছ বট পাকুড় বা শালতমালে পরিণত হয়েছে সে যে আম জাম কি কামরাঙা গাছের অঙ্কুর ছিল না—তা গোড়া থেকেই বলে দেওয়ার চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এইটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। জ্যোতিষী জাতকের জন্মলগ্নে রাশি নক্ষত্রের সমাবেশ দেখে তার ভাবীজীবনী রচনা করেন। আর ঐতিহাসিক জীবনীকার বর্তমান থেকে অতীতের দিকে মুখ করে এগোতে থাকেন। তাঁর নায়ক কেন অমন হলেন, কেন

অন্য কারো মত হলেন না—তার কার্যকারণ সূত্র জিজ্ঞাসাই তাঁর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। তিনি নায়কের জন্মের মধ্যে, তাঁর বাপমায়ের স্বভাবচরিত্র বৃত্তিপ্রবৃত্তির মধ্যে, পারিবারিক পরিবেশ, বিদ্যালয়ের আবহাওয়া, নায়কের উপর তাঁর সঙ্গী-সুহৃদের প্রভাব, যে সব বই তিনি পড়েছেন, প্রধান অপ্রধান যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, যাদের ভালোবেসেছেন, যাদের ঘৃণা করেছেন, হিংসা করেছেন, যাদের কাছ থেকে পেয়েছেন অথচ কিছুই দেননি, যাদের প্রচুর দিয়েছেন, অথচ বিনিময়ে পেয়েছেন সামান্য, আবার দান-প্রতিদানে যে সব সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকের মধ্যে, সব কিছুর মধ্যেই আধুনিক জীবনীকার তাঁর নায়কের জীবন-রহস্যের সন্ধান করে ফেরেন। একই কার্যকারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কারে তাঁর আনন্দ। তিনি দেশের মাটিতে, কালের আবহাওয়ায় সমগ্র জাতির চিন্তাধারায় তার উদ্যমে আগ্রহে, আশা আকাঙ্ক্ষায়, সাফল্য ব্যর্থতার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাঁর নায়ককে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই একজন হয়ে ওঠে বহুজনের প্রতীক।

কিন্তু উৎপল সেন যাঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত, তিনি কি অত বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী? তিনি কি তাঁর দেশের কালের প্রতিনিধিস্থানীয় কেউ? সেইভাবে তাঁকে আঁকতে পারলে অনুরাধা অবশ্য খুসি হবেন। কিন্তু তাতে সতীশঙ্করের প্রতিরূপ ধরা পড়বে—না সেই বিগ্রহ হবে অন্য কোন ব্যক্তির, অন্য কোন পুরুষের। সতীশঙ্করের পেণ্টার বন্ধু, স্কালপটার বন্ধু যদি সতীশঙ্করের পরিবর্তে আর কারো মূর্তি এঁকে দিতেন কি গড়ে দিতেন, তা যত বলবান আর রূপবান পুরুষের প্রতিমূর্তিই হোক—স্বামীর পোর্ট্রেট কি স্ট্যাচু বলে অনুরাধা কিছুতেই স্বীকার করতে পারতেন না। আকৃতির অবৈকল্য তিনি অবশ্যই দাবি করতেন। কিন্তু লেখককে তিনি স্বাধীনতা দিতে চাইছেন। আকৃতি ঠিক রেখে প্রকৃতির কিছু অদল বদল উৎপল করতে পারে। সেই পরিবর্তন উৎপলের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কল্পনার অনুসরণে নয়, অনুরাধার অনুরোধে। এ স্বাধীনতা এক হিসেবে বড়রকমের পরাধীনতা।

তাছাড়া উৎপল যতই চেষ্টা করুক সতীশঙ্করের মত একজন সাধারণ কর্মীকে অসাধারণ দেশনেতা বানিয়ে তুলতে পারবে না। তাঁর জীবনের যেটুকু ইতিবৃত্ত সে পেয়েছে উৎপলের কল্পনায় ডানা ছেঁটে দেওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সতীশঙ্করের জীবন বৃত্তান্তে আছে—ছাত্র হিসাবেও সাধারণ স্তরের ছেলে ছিলেন তিনি। ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করে কলেজে ঢুকে ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন, তারপর আর ধরা-বাঁধা পড়াশুনো হয়নি। হয়তো জেলে বসে অনেক রকমের বই পড়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে তখনকার অনেক নেতারই সংস্পর্শে এসেছেন। সুবিধা অনুযায়ী সহিংস অহিংস দুই পক্ষেই বিচরণ করেছেন, জেল খেটেছেন, কিন্তু কোন বড় আন্দোলন করেছেন এমন প্রশস্তি তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারেও উৎপলের চোখে পড়ল না। এমন কর্মীকে সে নেতৃপদে বসাবে কোন্ কল্পনার জোরে?

বরং তাঁর জীবনের শেষ দশক কর্মতৎপরতায় সমৃদ্ধ। এই সময়েই ন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাকটরির সংস্পর্শে আসেন। সাধারণ কর্মী হিসাবে চাকরি নেন, অংশীদার হন, পরে সব চেয়ে বেশি অংশের অধিকারী হয়ে, পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। জীবনের এই অংশেই ছেলেদের জন্যে স্কুল, মেয়েদের জন্যে শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদ্যম, নির্ভীকতা. উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাঁর সংগঠনের কাজ—সৎকর্মের তালিকায় সতীশঙ্করের জীবনের এই অংশটাই ভারি। হয়তো অনেক অসত্য অন্যায় অবিবেচনার ইতিবৃত্তও এরই মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। প্রথম জীবনে কি মধ্যজীবনে হয়তো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই, কাজ নেই সতীশঙ্করের। থাকলে এই পুস্তিকায় তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করা হত। উৎপলের মনে হল এই পুস্তিকাটি যখন লেখা হয় তখন খানিকটা ইতিহাসকে অনুসরণ করেই এগোন হয়েছে। তখনো অনুরাধা জানেন না সতীশঙ্কর এমন অসময়ে, এমন আকস্মিক ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবেন। তাই এখন হয়তো তাঁর সাধ হয়েছে অসাধ্য সাধন করতে। যে সতীশঙ্কর শুধু বৈষয়িক ব্যবসায়িক জীবনে সফল, কি খানিকটা সংগঠনে নিপুণ, তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও কর্মবীর চিন্তানায়ক একথাও হয়তো তাঁর সহধর্মিণী স্বামীর জীবনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ দেখতে চান। যা জীবনে ছিল না, তাও জীবনীতে থাকুক। কিন্তু কী

দরকার? জীবনব্যাপী মহত্ব প্রমাণের ব্যর্থ প্রয়াসের কী প্রয়োজন? কোন কোন মুহূর্তে মানুষ মহৎ, শৌর্যে আর হৃদয়বত্তায় কোন কোন মুহূর্তে সে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে যায়, এই কি তার বড় পরিচয় নয়? 'A crowded hour of glory is worth an age without a name.' এখন কি যুগব্যাপী অপবাদ অপকীর্তি সত্ত্বেও সেই যশোদীপ্ত প্রহরের মাহাত্ম্য ম্লান হয় না। উৎপল যদি সতীশঙ্করের জীবনের এই শেষ দশকের ইতিহাস লেখে, ক্ষতি কি? এক দশক ধরে একটি মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, তার অন্তরে বাহিরে ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত, তার দৈনন্দিন জীবনে মুহূর্তে মুহূর্তে জয়-পরাজয় পতন-উত্থানের কাহিনী বিবৃত করা সহজসাধ্য নয়।

খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করে অনুরাধা আরও কিছুক্ষণ পরে নিচে নামলেন। এসে বসলেন তাঁর নিজের চেয়ারটায়। হেসে বললেন, 'কই দেখি, কতখানি লিখেছেন?'

উৎপলের প্রথম পাতাটিতে একটি লাইনও লেখা পড়েনি, শুধু সরল বক্র নানা রেখায় পাতার খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। লজ্জিত ভাবে উৎপল তার সেই অপকীর্তিটুকু লুকোবার চেষ্টা করে বলল, 'কিছুই লিখিনি। কিছুই হয়নি এখনো।'

অনুরাধার মুখখানা একটু যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হেসে বললেন, 'এতক্ষণ ধরে তাহলে যা হচ্ছিল, তা বুঝি শুধু রেখা-চিত্র?'

উৎপল চুপ করে রইল।

অনুরাধা তেমনি স্মিতমুখে বললেন, 'আপনি মনে মনে হয়তো ভাবছেন ভদ্রমহিলার কী গরজ। তিনি যেন মিস্ত্রী-মজুর খাটাচ্ছেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে মেপে যাচ্ছেন কতখানি কাজ এগোল, কতখানি দেয়াল গাঁথা হল। আমাকে তাই ভাবছেন না?'

উৎপলের মন এতক্ষণ এক নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সারাটি দুপুর সত্যিই তার প্রায় বৃথাই কেটেছে। একটি পাতাও যে লিখতে পারেনি সে ক্ষতি অনুরাধার নয়, সব চেয়ে বড় ক্ষতি তার নিজের। এই ফরমায়েসী কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে তো তার চলবে না। তার অনেক কাজ পড়ে আছে। দুজন পাবলিশারের সঙ্গে দুখানা উপন্যাসের কথাবার্তা হয়েছে। পেলেই তারা ছাপে। কিন্তু সতীশঙ্করকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে কি তার কোন একটিতেই হাত দিতে পারবে? তার সমসাময়িক লেখক-বন্ধু শ্যামল চক্রবর্তী কি ভবেন্দু দত্ত যা পারে, উৎপলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এক সঙ্গে একাধিক বই লিখতে পারে ওরা। দ্রুত কলম চালাতে পারে। কিন্তু উৎপলের পক্ষে তা দুঃসাধ্য। তা' পরধর্ম। ফরমায়েসি লেখাই হোক, আর বিনা ফরমায়েসের লেখাই হোক—উৎপল একটির বেশিকে তার নির্মাণ শালায় স্থান দিতে পারে না। এক একটি রচনা তাকে যেন প্রায় নিঃশেষ করে দিয়ে যায়। মনেই হয় না ফের কোনদিন সে কলম ধরতে পারবে। তার পাত্র যেন শূন্য হয়ে যায়। যতক্ষণ না তা ফের উৎসাহ উদ্যম আর আগ্রহে ভরে ওঠে, ততক্ষণ কিছুই তার পক্ষে লেখা সম্ভব হয় না। একবার তার লেখার বিষয়—সতীশঙ্করের জীবন বৃত্তান্তের কথা, আর একবার নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা ভেবে অবসাদ বোধ করছিল উৎপল। অনুরাধার অন্তরঙ্গ সুরে হঠাৎ যেন নতুন স্বাদ পেল। তাঁর কথার জবাবে একটু হেসে বলল, 'তা কেন ভাবব। শিল্প-সাহিত্য যে কী বস্তু তা' তো আপনি না জানেন তা নয়। অবশ্য মিস্ত্রী-মজুরের কাজের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে। শিক্ষায় অভ্যস্ততায় যে দক্ষতা আসে সেই সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বোধ হয় সবখানি নয়। অমিলও আছে।'

অনুরাধা বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। সে বোধ যে আমাদের একেবারে নেই তা মনে করবেন না। আমরা নিজেরা সৃষ্টি করতে না পারি কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে ক্রাফট্স্-ম্যানসিপের তফাৎ যে কোথায় তা জানি। ব্যাখ্যা করে বলতে পারিনে কিন্তু বুঝতে পারি।'

উৎপল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তবে কার কথা শুনছিলাম? আপনার কথা শুনতে শুনতে আমি আমার পূর্ববর্তীদের সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলাম।'

অনুরাধা একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, 'কিসের সৌভাগ্য?'

উৎপল বলল, 'তাঁরা নিজেদের নিবিষ্টতা দিয়ে আপনাকে মুগ্ধ করেছেন, সৃষ্টি-নৈপুণ্য দিয়ে আপনাকে আনন্দ দিয়েছেন, আমার কি সেই পুণ্যবল আছে?'

অনুরাধা হেসে উঠলেন, 'ওঃ, সেই কথা। তাঁরা কিন্তু কেউ আপনার মত এত কথা বলতে পারতেন না। একজন ছিলেন প্রায় বোবা। তিনি মুখ বুজে কাজ করতেন। আর একজন ছিলেন তোৎলা। তাঁর কথা বলতে কষ্ট হত, লজ্জাও হত। তাই তিনি প্রায় বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকতেন।'

অনুরাধা অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। বোধ হয় সেই তোৎলা শিল্পীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে।

পাতলা রক্তাভ দুটি ঠোঁটের সেই চাপা হাসি। উৎপল চুপ করে রইল। ভাবল অনুরাধার কথার মধ্যে কি কোন দ্ব্যর্থতা আছে? কোনটা সৃষ্টি, কোনটা কারিগরী, তা তিনি জানেন বলেই কি এমন তাগিদ দিতে এসেছেন? তিনি বোধ হয় জানেন—ধরা-বাঁধা ফরমায়েস মেনে চুক্তি করে উৎপল যা লিখতে এসেছে তা সৃষ্টির পর্যায়ে পৌছবে না, কারিগরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সাহিত্যে চারুকলায় অনেক প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার কিছু কিছু কাজ কারিগরী-মাত্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁদের অগৌরব নেই। তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান সব ব্যর্থতা অপূর্ণতার উর্ধ্বে চির-উপাস্য পেয়েছে। সাধারণ শিল্পীদের সেই সৌভাগ্য হয় না। যে সব সৃষ্টি তাদের দুর্বল পঙ্গু, সেইগুলিই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্রষ্টার নাম পরিচয় বয়ে বেড়ায়।

অনুরাধা বললেন, 'আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দেখতে সত্যিই আমার বড় ভালো লাগে। নিজে এক অক্ষরও লিখতে পারিনে, একটি লাইনও সোজা করে টানতে পারিনে বলেই বোধ হয় আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ মানুষের এত আগ্রহ, এত কৌতূহল। যাঁরা আমার স্বামীর পোর্ট্রেট এঁকেছেন, স্ট্যাচু তৈরী করেছেন, ঠিক এই কৌতূহল নিয়েই আমি দিনের পর দিন তাঁদের কাজ দেখেছি। তাঁদের ডিষ্টার্ব না করে তাঁদের পাশে কি পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাঁদের ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করেছি। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ প্রবন্ধে পড়েছিলাম বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তিনি শিল্পীদের কথা বলেননি। শিল্পীরা কখন সুন্দর জানেন? তাঁরা যখন সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তন্ময়।'

অনুরাধার মুখে এই শিল্পীবন্দনা শুনে উৎপল খুব খুসি হল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ঈর্ষ্যার খোঁচাও খেতে হল তাকে। অনুরাধা তাহলে সেই অজ্ঞাতের দুই শিল্পী—সেই চিত্রকর আর ভাস্করকেও এমনি মুগ্ধ চোখে দেখেছেন? শুধু কি দেখেই নিবৃত্ত হয়েছেন, নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এমনি আলাপ করেছেন কথা বলেছেন? সব কথা কি শুধু শিল্পতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে? না কি শিল্পকে ছাড়িয়ে তা আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা জীবনকেও স্পর্শ করেছে? উৎপলের সঙ্গে অনুরাধার পরিচয় মাত্র দুদিনের। কিন্তু সেই শিল্পীদের সঙ্গে তো আর তা নয়। তাঁরা দিনের পর দিন এখানে এসেছেন। হয়তো কাজের জন্যে অনেক রাত অবধি কাটিয়ে গেছেন। আর অনুরাধা তাঁদের সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ হয়েছেন। হয়তো ক্রমে ক্রমে স্বামীর প্রতিকৃতি আঁকানো স্বামীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে গেছে; প্রধান হয়ে উঠেছে শিল্পীদের সান্নিধ্য-সুখ।

বেশ একটি ছোট গল্পের থীম। উৎপল মনে মনে নোট করে নিল। একজন উচ্চশিক্ষিতা রূপবতী বিধবা মহিলা স্বামীর পোর্ট্রেট আঁকাবার জন্যে একজন পেণ্টারকে ডেকে আনলেন। দিনের পর দিন সেই আর্টিস্টকে উৎসাহ দিলেন, প্রেরণা যোগালেন। তারপর আর্টিস্টের ক্যানভাসে স্বামীর মূর্তি যত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল তাঁর নিজের মানসপটে সেই মূর্তি তত অস্পষ্ট হয়ে এল। একটি জীবন্ত মুখ বার বার একটি মৃত মুখকে আড়াল করতে লাগল। তারপর? তারপর?

ছি ছি ছি, এসব কী ভাবছে উৎপল? এসব কি অসম্ভব কল্পনা করছে? তবে লিখতে পারলে সত্যিই একটি চমৎকার সুন্দর ছোট গল্প হয় কিন্তু।

অনুরাধা তার অন্যমনস্কতা ধরে ফেললেন। কথা থামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী ভাবছেন বলুন তো?'

উৎপল যা ভাবছিল তাতো আর মুখে বলা যায় না। কী সৌভাগ্য যে সবাই টেলিপ্যাথি জানে না, একজনের মনের ভাবনা আর একজন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিতে পারে না। পারলে মুহূর্তে মুহূর্তে কী যে প্রলয়কাণ্ড ঘটত তা বলা যায় না। 'কী ভাবছিলেন? আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনছিলেন না?'

অনুরাধা ফের জিজ্ঞাসা করলেন।

আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে উৎপল উপভোগ করতে লাগল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে অনুরাধা ফের কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, 'আপনি আমাদের ওই বুকলেটটা পড়েছেন ?'

উৎপল বলল, 'হ্যাঁ পড়লাম।'

অনুরাধা বললেন, 'তবে আর কি। কাঠামোটা তো মোটামুটি পেয়েই গেছেন। এখন একেই ডেভেলপ করে যাওয়া। আপনার কি মনে হয়না যে অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে তাই রাখা যেতে পারে ? আপনি অবশ্য আপনার ভাষায় লিখবেন। আলাদা আলাদা চ্যাপটারে ভাগ করবেন। প্রত্যেকটি চ্যাপটার নিশ্চয়ই অনেক অনেক তথ্য খুঁটিনাটি, আর লেখকের মন্তব্যে ভরে উঠবে। আচ্ছা আপনি কি ফুটনোট ব্যবহার করবেন—না বইয়ের শেষে গ্লাসারী থাকবে ?'

উৎপল হঠাৎ নিজের মনোভাব প্রকাশ করে ফেলল ওসব যদি কিছুই না থাকে ? আমি যদি সতীশঙ্করবাবুর জীবনের শেষ কয়েক বছরের কথা শুধু লিখি ?'

ভারি হতাশ হলেন অনুরাধা, বললেন, 'শুধু শেষ কয়েক বছর ? না না না। তা করবেন না। শুধু শেষ কয়েক বছরের মধ্যে তাঁকে কতটুকুই বা পাবেন ? তিনি তখন গ্লাস ফ্যাক্টরি চালান। দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁর মজুর খাটিয়ে কাটে। আর ম্যানুফ্যাকচারড্ গুডস্ কোথায় পাঠাবেন, কোথায় বিক্রি করলে দু'পয়সা বেশি লাভ হবে সেই সব খোঁজ খবর তাঁকে রাখতে হয়, ভাবতে হয়। অবশ্য এ কাজ যে খারাপ তা বলছিনে, কি এ কাজের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই তাও আমার বলবার কথা নয়। যে ফ্যাক্টরি শত শত লোকের অন্ন সংস্থান করেছে, আমায় আর আমার ছেলেকেও খেতে পরতে দিচ্ছে, তাকে অবহেলা করব আমি কোন মুখে ? তাছাড়া দেশের রাজনীতির সঙ্গে তখনও তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। এমন কোন দিন যায়নি যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার, কি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের, কি দলের ওয়ার্কারদের সঙ্গে তাঁর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক না হয়েছে। অন্য সব ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টের মত তিনি রাজনীতি ভুলে গিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করেন নি। রাজনীতির ওপর তাঁর চিরদিনের প্রাণের টান ছিল। এখন যাঁরা বড় বড় পদ নিয়ে আছেন তাঁদের সবাইর সঙ্গেই শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ রেখেছেন। জানেন বোধ হয়, একবার ক্যাবিনেটেও তাঁর যাওয়ার কথা হয়েছিল। না গিয়ে ভালোই করেছেন। গেলে সরকার পক্ষের সমালোচনা তিনি করতে পারতেন না, বামপন্থী কয়েকজন নেতার সঙ্গেও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রাখতে পারতেন না।

উৎপল বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ কয়েক বছরই তাঁর জীবনের সব চেয়ে ফলবান সময়। যদি সেই শেষ কয়েক বছর দিয়েই তাঁকে আমি পাঠকদের চিনিয়ে দিতে পারি তাহলে ক্ষতি কি ? আসলে চিনিয়ে দিতেই তো আমরা চাই।'

অনুরাধা বললেন, 'তাই চাই বই কি। কিন্তু কয়েক বছর তো ভালো—আপনি একদিনের একটি ইন্‌সিডেণ্ট নিয়ে গল্প লিখেও তাঁকে চেনাতে পারেন। ফটোগ্রাফার যেমন একটি স্নাপশট তুলে নেয় এও তেমনি। আমার অ্যালবামে ওঁর নানা বয়সের ছবি রয়েছে। আপনাকে একদিন দেখাব। কিন্তু সব ছবি জড়ো করলেও তাঁর পুরো জীবন-কাহিনী হয় না। যিনি পোর্ট্রেট এঁকেছেন তিনি একখানি ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হয়েছেন, যিনি মূর্তি গড়েছেন, তিনি একটি মূর্তিতেই তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে এর চেয়ে বেশি দাবি কেউ করবে না, আমিও করিনি। আপনার মিডিয়াম অন্য রকমের। পুরো একটি মানুষকে ধরতে হলে তার গোটা জীবনের ক্যানভাসই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। কম করতে গেলে আপনি তাঁকেও খাটো করবেন, নিজেকেও খাটো করবেন।'

উৎপল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার কথা আমি ভেবে দেখব মিসেস রায়। একটি পঁচিশ ত্রিশ কি পঞ্চাশ ফর্মার বই লিখেও তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবন-কালের প্রতিটি দিনের ঘটনা, তাঁর মনের চিন্তা-ভাবনা স্বপ্ন-কল্পনার সব বর্ণনা আমি দিতে পারব না। প্রতীকের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে। সেই প্রতীক একটি দিনের একটি ইন্‌সিডেণ্টই বা হবে'না কেন ?'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'কয়েকটি বছর থেকে আপনি

একেবারে একটি দিনে নেমে এলেন? একটি দিন দিয়ে একটি ছোট গল্প হতে পারে, এমন কি আপনাদের আধুনিক উপন্যাসও হতে পারে—কিন্তু জীবনী হবে না। বুঝতে পেরেছি উৎপলবাবু, আপনি খাটতে চান না। আপনি আসলে পরিশ্রম করতে কাতর।'

এই আকস্মিক তিরস্কারে উৎপল বিস্মিত হল। সে প্রতিবাদ করতে গেল, 'না না ঠিক তা নয়।' অনুরাধার গলার স্বরে যে সৌম্য যে সৌহৃদ্যের উত্তাপ এতক্ষণ ছিল তা যেন আর নেই। তিনি নিরুত্তেজ, কিন্তু কঠিন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ঠিক তাই। আপনারা হাতের কাছে যা পান তাই নিয়ে লেখেন, চোখের সামনে যা দেখেন তাই নিয়ে লেখেন। আপনাদের চোখ শুধু বর্তমান কয়েকটি মুহূর্তকে দেখে। তা না যায় অতীতে, না যায় ভবিষ্যতে। অথচ যে কোন সাধারণ মানুষই ত্রিকালবিহারী। তার অতীতের ইতিহাস আছে, বর্তমানের দিনযাপন আছে, আবার ভবিষ্যতের আশা ভরসা স্বপ্ন আর কল্পনাও আছে। তার মনে বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতি যেমন থাকে, তেমনি থাকে পুত্র-পৌত্রের জন্যে কিছু রেখে যাবার সাধ। এদিক থেকে প্রত্যেকেই ত্রিকালদর্শী, ত্রিকালস্পর্শী। কিন্তু আপনারাই শুধু একাল বলতে আজকাল বোঝেন। খবরের কাগজের আজকালের কথা ছাড়া কিছু লিখতে চান না। তাই আপনাদের আজকের কথা কালই বাসি হয়ে যায়। কালকের কথা পরশু পর্যন্ত পৌঁছায় না।'

উৎপল বলল, 'নাও যদি পৌঁছায় তবু উপায় নেই মিসেস রায়। অধিকার-ভেদ আমরা মানি। বেদব্যাস মহাভারত লিখেছেন বলে আমরা তাঁর নকল করতে যাইনে। অবশ্য কেউ কেউ যে সে চেষ্টা না করেন তা নয়। কিন্তু আমি আমার সাধ্যের সীমার বাইরে যাইনে। আমার রুচি প্রবৃত্তি সখ সাধ-আহ্লাদ দিয়ে আমি তৈরী। আমার ফিল্ম সেই আমারই প্রতিবিম্ব। তার বাইরে কী করে আমি যাব? পঞ্চাশ বিঘে জমি নিয়ে আমি যদি বিরাট এক নার্শারি নাই করতে পারি, আমার উঠোনের টবে ফুল ফোটানো কেন বন্ধ রাখব?'

এতো যুক্তি নয়, অভিমানের কথা। অনুরাধা একথার কোন জবাব দিলেন না।

তিনি অন্যকথা পাড়তে যাচ্ছিলেন, পদ্মা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। সে খালি হাতে আসেনি। সাদা একখানি প্লেটে করে ফল কেটে নিয়ে এসেছে। কলা, কমলালেবু, ন্যাসপাতির কুচি।

উৎপল বলল, 'একি, এসব কেন?'

পদ্মা মৃদু হেসে বলল, 'খান। সেই কখন তো খেয়ে বেরিয়েছেন।'

এই সৌজন্যটুকু ভারি ভালো লাগল উৎপলের। অনুরাধার আশ্রিতা এই মেয়েটির মধ্যে বুদ্ধির প্রাখর্য নেই, নিশ্চয়ই অনুরাধার মত শিল্পসাহিত্য রাজনীতি নিয়ে অত পড়াশুনো করেনি, চিন্তা করেনি, তর্ক করতেও জানে না। তবু বিকালের নরম আলোয় সেবা-স্নিগ্ধা এই মেয়েটিকে দেখে উৎপলের মন যেন জুড়িয়ে গেল। মনে হল এই শান্ত কোমল স্নিগ্ধতা অনুরাধার মধ্যে নেই। হয়তো থাকা সম্ভবও নয়।

উৎপল বলল, 'আমি একটি লাইনও লিখতে পারিনি, আর আপনি একরাশ খাবার নিয়ে এলেন।'

পদ্মা বলল, 'আপনার লেখার সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক আছে?'

অনুরাধা বললেন, 'পদ্মা, আমাদের আর দুকাপ চা এনে দে।'

পদ্মা বলল, 'যাই অনুদি। বিশু কিন্তু বড় মাতলামি আরম্ভ করেছে। ও আজ না বেরিয়েই ছাড়বে না। ওর জামাটা নাকি আজ আনবার কথা আছে।'

অনুরাধা বললেন, 'হ্যাঁ আমি আজ বেরোব। অন্য দুএকটা কাজও সেরে আসব এই সঙ্গে। পদ্মা, দারোয়ানকে বলতো একটা ট্যাকসি ডেকে দেবে। গাড়িটা সেই কারখানায় পড়ে আছে তো পড়েই আছে। কবে যে আসবে।'

অনুরাধা বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে ওপরে চলে গেলেন। ফিরে যখন এলেন উৎপলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

অনুরাধা একটু হেসে বললেন, 'আজকে খুব তর্ক করলাম আপনার সঙ্গে। এত বকবক শিগগির আর করিনি। উৎপলবাবু, আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। আপনি যেখানে নামতে চাইবেন নামিয়ে দিয়ে যাব।'

উৎপলের অরাজী হওয়ার কিছু নেই।

অনুরাধা বিশুকে নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। উৎপল তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

ছেলেকে নিয়ে মার্কেটিংএ বেরোচ্ছেন অনুরাধা। উৎপল তাঁর সঙ্গী।

এই মুহূর্তে কোনকিছু লেখার ভাবনা আর তার নেই। শিল্পতত্ত্ব আর রাজনীতির মত গুরুতর সব বিষয় বিদায় নিয়েছে। এখন ট্যাক্সিতে অনুরাধা ওসব প্রসঙ্গ হয়তো আর নাও তুলতে পারেন। হয়তো অতি তুচ্ছ, সাধারণ কথাবার্তায় তাদের এই সময়টুকু কাটবে।

এটা ওটা নিয়ে নিতান্তই তুচ্ছ সব কথা—যে সব কথা কোনদিন কোন জীবন-চরিতে স্থান পায় না, অথচ যে সব তুচ্ছতা আছে বলেই জীবন এত মধুর।

বড় রাস্তার মোড় থেকে দারোয়ান একজন ট্যাক্সি-ওয়ালাকে এতক্ষণে পাকড়াও করে এনেছে। গাড়িটা এসে সশব্দে গেটের সামনে দাঁড়াল।

অনুরাধা উৎপলের দিকে চেয়ে বললেন, 'চলুন।' বিশ্বরূপ সবচেয়ে আগে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

ক্রমশ

সূর্য্য-স্তুতি

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বদিকে দৃষ্টিকারী সূর্য্য তব বিপুল জ্যোতি,
সবার চোখে আনন্দকর দীপ্তিতর উজল অতি।
সেই মূরতি ওঠে যখন উর্দ্ধলোকে সুদূর নভে
সুস্থ দেহে নিত্য যেন পাইগো দেখা আমরা সবে।

(ঋগ্বেদ ১০।৩৭।৮)

মহি জ্যোতির্বিভ্রতং ত্বা বিচক্ষণ
ভাস্বন্তং চক্ষুষে চক্ষুষে ময়ঃ।
আরোহন্তং বৃহতঃ পাজসস্পরি
বয়ং জীবা প্রতিপশ্যেম সূর্য্য॥

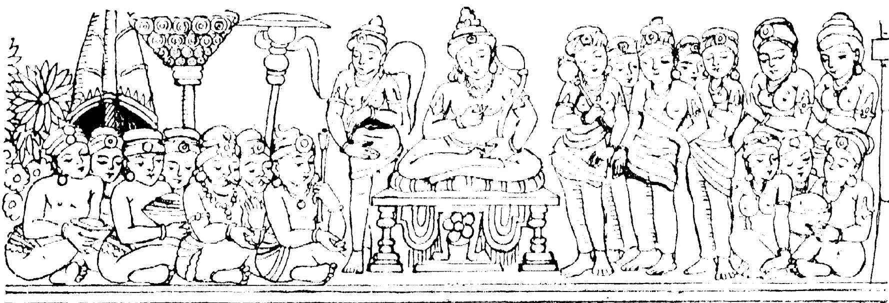
ঋগ্বেদ—১০।৩৭.৮

যে পতাকার সঙ্গে তোমার নিখিল ধরা দীপ্তি পায়,
রাত্রি এলে লুকায় সে যে, রয় যে ঢাকা তমিস্রায়।
পিঙ্গল-কেশ সূর্য্য, তুমি সঙ্গে ল'য়ে সেই ধ্বজায়,
রাঙা আলোর আলিম্পনা নিত্য আঁকো পূর্ব্বাশায়।
সারা ভুবন উঠুক ভ'রে দিব্য তব রশ্মি-ভায়,
সর্ব্বদোষে মুক্ত হ'য়ে আমরা দেখি নিত্য তায়।

ঋগ্বেদ—১০।৩৭।৯

যস্য তে বিশ্বাভুবনানি কেতুনা
প্রচেরতে নি চবিশন্তে অক্তুভিঃ।
অনাগাস্ত্বেন হরিকেশ সূর্য্যাহ্নাহ্না
নো বস্যসা বস্যসোদিহি॥

ঋগ্বেদ—১০।৩৭.৯





১৯৬১ খৃষ্টাব্দের বিশ্বরাষ্ট্রের ভাগ্য গণনা

উপাধ্যায়

আফ্রিকা, টেহেরান এবং মেক্সিকো অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আগষ্ট মাসে এ্যালেজেরিয়াতে ভূকম্পন হবে। ইটালী, জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক বিপর্যায় ঘটবে। ইংলণ্ডের দক্ষিণে বর্ষের শেষের দিকে হিমবায়ু প্রবাহ পরিলক্ষিত হবে। আমেরিকায় ভীষণ শীত ও তুষার পাত হবে। মকরের অয়নান্ত বৃত্ত মধ্যস্থিত প্রদেশ গুলির আবহাওয়া অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়বে—অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও ঝটিকাময় হবে। সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে, দক্ষিণ জাপানে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড ঝড়, ঘূর্ণীবায়ু ও ঝঞ্ঝাবর্ত্তের জন্ম বিভিন্ন অঞ্চল বিধ্বস্ত হবে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ প্রকৃতির রুদ্র-অভিযানের পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ত্তাবহ। সুতরাং এই খৃষ্টাব্দ থেকে তার প্রস্তুতি সুরু হবে। অদূরদর্শী রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের মতিভ্রংশ ও আত্মকেন্দ্রিকতা হেতু সমগ্র পৃথিবীব্যাপী গ্রহগণের তাণ্ডব নৃত্য লক্ষ্য করা যাবে। এর ফলে যাঁরা বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর জনকল্যাণের বাণী শোনাচ্ছেন, তাঁদের স্বরূপপ্রকাশ পাওয়াতে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীরা চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং বিপ্লব, ধর্ম্মঘট, শস্যহানি, সম্পত্তির ধ্বংস, প্রাকৃতিক বিপর্যায়, যেমন আগ্নেয়গিরি হোতে অবিশ্রান্ত অগ্ন্যুৎপাত, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার রুদ্র অভিযান, ঘূর্ণাবর্ত্ত, প্রলয়ঙ্করী অগ্নিকাণ্ড, ভূকম্পন এবং অস্বাভাবিক ধরণের দুরন্ত ঝড়ের চাপে মনুষ্য সমাজের জীবন বিপন্ন হবে। সর্ব্বাপেক্ষা ভেদ্যস্থান হবে ওয়াশিংটন, কায়রো, ইস্তাম্বুল, ব্যাঙ্কক, উত্তর-ইটালী, ফরমোজা, কঙ্গো, পিকিং, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও লস্ এঞ্জেলস্।

ভারতবর্ষে নামবে ভীষণ বর্ষা, বহু অঞ্চল হয়ে যাবে প্লাবিত। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে উঠবে হাহাকার। এর ওপর থাকবে দুরন্ত ঝটিকা, প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত, শিলাবৃষ্টি ও প্রবল বাত্যা। সমুদ্র ও পর্ব্বতের দিকে বৃষ্টির প্রকোপ বেশী। ভারতের অধিকাংশ নদী রুদ্ররূপ ধারণ করবে। গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, পদ্মা প্রভৃতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। বহু মানুষ ও গরু-বাছুর, ধনসম্পত্তি এরই ফলে নষ্ট হবে। আগষ্ট, অক্টোবর, ও নবেম্বর মাসে ভীষণ বৃষ্টিধারা সমতল ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে তুলবে। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাল্‌বৈশাখীর করালমূর্ত্তি আর চতুর্দ্দিকে মহামারীর প্রকোপে বিপর্য্যয় ঘটবে, বহু লোকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তুলা ও সোনার দর চড়ে যাবে। জুন জুলাইয়ের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাজনীতি-বিশারদের মৃত্যু ঘটবে। অপরাধের বৃদ্ধি, ধর্ম্মঘট, শান্তি-শৃঙ্খলার বাধা বিপত্তি, মহামারীর প্রকোপ, দিনে রাহাজানিও ডাকাতি এবং অত্যধিক ঝড় হোতে থাকবে। খাদ্য দ্রব্যের অভাবও অপরাধ বৃদ্ধি ১৩ই জুন থেকে সুরু হবে। দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ১৩ই জুলাই থেকে ১২ই আগষ্টের মধ্যে এরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে যার ফলে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের লোকেরা নানা দিকে সাহায্য ও খাদ্যান্বেষণের আশায় যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করবে। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল সাংঘাতিক ভাবে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হবে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্যশস্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধিহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার উঠবে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, ধর্ম্মঘট, বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্যকর নীতি এবং রাষ্ট্রের দুর্নীতি প্রকাশ পাওয়াতে লোকক্ষয় হবে। এর ওপর আছে মহামারী এবং রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে জনতার ব্যাপক সংঘর্ষ। বহু চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান বা সিনেমা হাউসে অগ্নিকাণ্ড হবে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, অন্নের হাহাকার, শস্যহানি, জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্য ও জীবনযাত্রার অস্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়ে ১৯৬১ সাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরই ১৯৬২ সালের প্রারম্ভে গ্রহগণের বিশ্ব-বিধ্বংসী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উত্তরোত্তর দ্রুতভাবে কার্য্যে পরিণত হোতে সুরু হবে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালে গ্রহগণের অষ্টবক্র সম্মেলন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৬১ সাল ভারতের পক্ষে সঙ্কট দুর্য্যোগময় এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে বিমান সংঘর্ষের ফলে অন্ততঃ একজন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন অবসান হবে। নভেম্বরও ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেন্টের রাষ্ট্রিক ও

বৈদেশিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ হেতু গোল-যোগের সৃষ্টি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় শীর্ষ কয়েকজন ব্যক্তিকে অপসারিত করে নূতনভাবে মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। সরকারের ঋণ করার অভ্যাসটী আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে। পরোক্ষভাবে কর আদায়ের ব্যবস্থা চল্‌বে। মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠ্‌বে, সম্পত্তির মুল্য বৃদ্ধি পাবে। হত্যাকাণ্ড, দুর্ঘটনা ও বহ্ন্যুৎসব দিকে দিকে প্রকাশিত হবে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে চলবে পাশবিক সংঘর্ষ ও বর্ব্বর আচরণ। আমেরিকার আর্থিক সাহায্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পাবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আভ্যন্তরীণ গলদগুলি লোকচক্ষুর সম্মুখীন হওয়ার ফলে বেকার-সমস্যাকে জটিল করে তুলবে। ভারতীয় রাষ্ট্র নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও মনস্তাপের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত কর্‌বে। ভূমিসংস্কার এ বৎসর কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না—প্লানিং কমিশন আলেয়ার পিছু ছুট্‌বে শুধু। বৈদেশিক নীতি পার্লামেন্টের মধ্যে তুমুল আন্দোলন ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করে রাষ্ট্র-চালনার গতিকে মন্থর করে তুল্‌বে। চৈনিক শ্যেন দৃষ্টির কবলে পড়ে ভারতবর্ষের অবস্থা জটিল হবে। কোন বৃহৎ পুঁজিবাদী ও শিল্পপতির অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারী ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে। জুয়াচোর, প্রতারক, পকেটমার, প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দিন দুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতির আশঙ্কা করা যায়। রেলের ভাড়া আবার বৃদ্ধি পাবে। রাজ-নৈতিক উত্তেজনার মাত্রাধিক্য দেখা যাবে। বাংলার সঙ্গে কেন্দ্রের প্রীতি সম্পর্ক অনেকখানি শিথিল হ'বে।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আজ্‌কের দিনের মতই থাকবে। অনিশ্চয়তা ও উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে দিনগুলি কেটে যাবে। সর্ব্বদাই শঙ্কা থাকবে, কাশ্মীরকে পাকিস্তান ভুল্‌বে না। চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী সংস্থাপন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। ভারতে পঞ্চম বাহিনী দল বৃদ্ধি পাবে, গোপনে দেশঘাতী পদ্ধতি অবলম্বন করবে—ঘরোয়া বিভীষণেরা এতে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌বে। কোন সমস্যার সমাধান হবে না। গোয়া সমস্যা, সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশিকদের সমস্যা, আকালি সমস্যা, নিগ্রো সমস্যা ও ভারত-চৈনিক সমস্যাগুলি থেকে যাবে। কমিউনিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি বিশেষ সক্রিয় হোতে পারবে না। স্বতন্ত্র পার্টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চালু হবে। দু একটি গুরুতর রেলওয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

চীনের উপর সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ভারতের অভ্যন্তরে চৈনিক প্রবেশ প্রতিহত করার জন্য সর্ব্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন না কর্‌লে এরপর সঙ্কটাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পঞ্চমবাহিনী ঘরোয়া বিভীষণদের শায়েস্তা করা দরকার। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভালো বলা যায় না। বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা, লুঠতরাজ এবং ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট জাতীয় নেতা ওপথিকৃতের মহাপ্রস্থান গুরুত্বব্যঞ্জক। পাকিস্তানের ও দুর্ব্বৎসর। বর্ত্তমান পাকিস্তানী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির দণ্ডায়মান হওয়ার যোগ আছে, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে রাজনৈতিক ওলোটপালোট ঘটবে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক মধুর হবে না। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সঙ্গে রাজনৈতিক সঙ্কটাবর্ত্তে পড়ে পাকিস্তান বিপদের সম্মুখীন ও হোতে পারে। নেপালের আভ্যন্তরীণ অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। বৎসরের মাঝামাঝি সময় কৈরলা সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধ আশঙ্কাপূর্ণ। ঐ সময়ে রাজার স্বাস্থ্য ও দেহ সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। সিংহলের অবস্থা সমস্যাজনক। নেতৃত্বের পরিবর্ত্তন অথবা মন্ত্রীমণ্ডলের পুনর্গঠন হোতে পারে। বর্ম্মার ভাগ্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। ভারতের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক তিক্ত হবে না। কমিউনিষ্ট চীনের ফরমোজা আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে ভাবিয়ে তুল্‌বে। ছোট-খাটো যুদ্ধ হোতে পারে ফরমোজা নিয়ে। স্বদেশে নিগ্রোদের অবস্থা অনেকটা ভালো, যদিও জাতি বিদ্বেষের প্রাবল্য আগষ্টমাসে দেখা যাবে। প্লাবন ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে বৎসরের প্রথম দিকটায় এদের পক্ষে চিন্তার কারণ আছে।

প্রশান্ত সাগরকূলে বিশেষতঃ কালি-ফোর্ণিয়ায় ভীষণ ঝড় ও ভূকম্পন হবে। দূর প্রাচ্য ও আফ্রিকা নিয়ে আমেরিকা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবে, কিন্তু কোন প্রকারেই কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিটমাট করবে না।

নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও ক্রুশ্চেভের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবে, মে জুনের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা উভয় পক্ষ গ্রহণ কর্‌বেন কিন্তু কার্য্যে পরিণত হবেনা। কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, পাপের বীজাণু সারা পৃথিবীর মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁর ইচ্ছা পৃথিবীতে কিছু সংহার করা। ক্রুশ্চেভ শান্তিবাদের পক্ষপাতী হবেন। শক্তি পরীক্ষার আসন্ন সংঘর্ষে তাঁর জয়ের আশা নেই। প্রাচ্য-ইউরোপ রাশিয়া সাংঘাতিক অবস্থার সম্মুখীন হবে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালোই থাক্‌বে।

কিন্তু চীনের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রীতিজনক নয়। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। মূল উদ্দেশ্য থাক্‌বে অপরিবর্ত্তন-শীল। চৈনিক নেতৃবৃন্দের সামরিক প্রসঙ্গ এবং ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানের পরিবর্ত্তে অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব। চিন্তার কারণ উপস্থিত করে তুলবে। চীনের অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ ও বিদ্রোহ দেখা দেবে। চৈনিক মন্ত্রীমণ্ডলের কতিপয় সভ্যকে অপসারিত করা হবে। চীনের প্রতি মার্কিন মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটবে না। জাপান সম্রাটের স্বাস্থ্যহানি হবে। রাজনৈতিকবৃন্দকে হত্যা বা অত্যাচার করার দিকে কুচক্রীদের ঝোঁক হবে। আগষ্টমাসে গ্রহণের পর ভূমিকম্প, ঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি জাপানকে বিপন্ন কর্‌বে। শ্রমশিল্পে জাপান উন্নতিশীল হবে। পশ্চিমের শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে থাকবে তার সক্রিয় সংযোগ। ভারতের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট হবে। জাপানে মজদুরদেয় মধ্যে অসন্তোষ, ধর্ম্মঘট ও সৈন্য-বিভাগের মধ্যে কষ্ট দেখা দেবে।

ইংলণ্ডের রাণীকে দুর্য্যোগ পূর্ণ বৎসরের সম্মুখীন হোতে হবে। তাঁর স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে সতর্কতার প্রয়োজন। ইংলণ্ডের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ও মন্ত্রীমণ্ডলের পরিবর্ত্তন হবে। মার্কিণ আণবিক অস্ত্রাদির আর্বিভাব হবে ব্রিটেনের মাটিতে, ফলে সৃষ্টি হবে চাঞ্চল্য ও বিপন্নতা, ঘরোয়া আন্দোলনের সম্মুখীন হোতে হবে ম্যাকমিলন গভর্ণমেণ্টকে। ম্যাক-

মিলন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিপন্নতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না,—পতনের সম্ভাবনা দেখা দেবে। ইংলণ্ডে বহু অপরাধমূলক ও পাপজনক কার্য্য চলবে। মজদুরদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এই বৎসর ব্রিটেনের সঙ্কটপূর্ণ। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি সঙ্কট দুর্য্যোগে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। ইংলণ্ড সংযতভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকবে, সহজে বিশেষ অংশ নিয়ে বিশ্বরাজনৈতিক মল্লক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে না। গুরুতর জাতীয় ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি একে ভাবিয়ে তুলবে। জাহাজ দুর্ঘটনা, দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখ্‌বার চেষ্টা এবং পরিবহন ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হবে।

ফ্রান্সের মন্ত্রী মণ্ডলীর পরিবর্তন ও রাজনৈতিক গোলযোগ ঘটবে। জেনারেল দ্য গলের অশুভ সময়, কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাতান্ত্রিক একনায়কত্ব-শক্তি খর্ব্ব হবে না। এ্যালজেরিয়ার ব্যাপারে আংশিক ভাবে তিনি সমস্যার সমাধান করবেন, শান্তি ফিরে আস্‌বে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রাশিয়ার প্রকোপে পড়ে বৎসরের মধ্যসময়ে বার্লিন প্রসঙ্গ গুরুতর হয়ে উঠ্‌বে। কিছু গোলাগুলি বর্ষণ চলবে। রাশিয়ার যুদ্ধ কর্‌বার মেজাজ ও প্রস্তুতি না থাকাতে বিশেষ কোন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই।

১৯৬১ সাল ইটালীর পক্ষে দুর্ব্বৎসর। প্রকৃতির রুদ্র কোপে পড়ে এর বিপর্য্যয় ঘট্‌বে। রোম ও জেনিভাতে চরমপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের যোগ আছে, এজন্যে শাসন পরিষদের পরিবর্তন হোতে পারে। তুরস্কের কোন রূপ অগ্রগতি হবে না—যথাপূর্ব্বং তথাপরং। বৈদেশিকনীতিও থাক্‌বে অপরিবর্তনশীল। কেবল বর্তমান সামরিক শাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির পদচ্যুতি হবে। ইরাণের শাহর পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গল সূচক বর্ষ। তাঁর জীবন সংহারের চেষ্টা হোতে পারে। কর্ণেল নাসের আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হয়ে গঠনমূলক অংশ গ্রহণ করবেন। ১৯৬১ সালে আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতালব্ধ অঞ্চল গুলিতে ঘরোয়া যুদ্ধ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, আইন ও শৃঙ্খলার অভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও নৈরাশ্য সমধিক ভাবে প্রকাশ করবে। কঙ্গো নেতৃবৃন্দের সর্ব্বপ্রকার ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আর্জেন্টিনার ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি ইউনাইটেড ষ্টেটসের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাক্‌বে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রভাব হ্রাস পাবে। জাতিপুঞ্জের প্রহসন পৃথিবীকে চমক লাগাবে। বাইরে দেখানো হবে প্রেম। জুলাই থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে পৃথিবীর নানা ভাগে এরূপ রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হবে যাতে বুঝা যাবে বিশ্বযুদ্ধের দিন আগত প্রায়,চতুর্দ্দিকে চলবে নেপথ্যে রণসজ্জা। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মিউনিকের যে অবস্থা হয়েছিল, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সারা বিশ্বে সেইরূপ অবস্থার পুনরাবর্তন হবে।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণীনক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী অশ্বিনী অথবা কৃত্তিকা জাত অপেক্ষা উত্তম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। লাভ, সুখ, উদ্যমে সাফল্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, নুতন পদমর্য্যাদা, আয় বৃদ্ধি, আশা আকাঙ্ক্ষার পুর্ণতাপ্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে। মধ্যে অবমাননা, শত্রু বৃদ্ধি, নৈরাশ্য, বাধা আর ক্লান্তিকর ভ্রমণ। যে সব ব্যক্তি রোগে ভুগছে, এ মাসে তারা আরোগ্যলাভ করবে। নানাভাবে মনোকষ্ট ঘটতে পারে। গৃহে আনন্দ সুখ এবং ঐক্যলাভ। বিলাসব্যসন দ্রব্য উপভোগ। আর্থিক স্বচ্ছলতা, মধ্যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। আয় বৃদ্ধি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। দ্রব্যাদি ক্রয়ের পক্ষে লাভজনক। উত্তরাধিকার সূত্রে, উইল বা দানের আনুকূল্যে সম্পত্তিলাভের যোগ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ। উপরওয়ালার অনুগ্রহ, পদোন্নতি, সম্মান বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সাফল্য ও উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে বহুবিধ সুবিধা ও সুযোগ লাভ, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগ, অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য। কোর্টসিপ ও প্রেমের মাধ্যমে বিবাহ। গৃহিণীদের হাতে বেশ দুপয়সা জমবে। ধর্ম্মপ্রাণ নারীর আধ্যাত্মিক উন্নতি। বিদ্যার্থীদের পরীক্ষায় সুনিশ্চিত সাফল্যলাভ। অধ্যয়নে উন্নতি। রেসে অর্থাগম।

বৃষ রাশি

রোহিণীজাতগণের পক্ষে বহুলাংশে ভালো, মৃগশিরার সময়টী মধ্যম এবং কৃত্তিকাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। অসৎসংসর্গ, বন্ধুর সহিত কলহ বা বিচ্ছেদ, বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে শত্রুতা, উপরওয়ালা বা গুরুজন ব্যক্তির বিরাগভাজন, পদমর্য্যাদাহানি, অপবাদ ও অপমান, পরিবারের সহিত বিচ্ছিন্নতা, সর্ব্বকার্য্যে বাধা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, মামলা মকর্দ্দমা পরাজয় প্রভৃতি সূচিত হয়। রক্তের চাপবৃদ্ধি, পিত্ত, বায়ুপ্রকোপ, ভগ্নস্বাস্থ্য। ভ্রমণকালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিকক্ষেত্রে মোটের উপর ভালোই যাবে। বহিঃক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের সহিত মনোমালিন্য। অর্থ কৃচ্ছ্রতা, অপরিমিত ব্যয়, ভ্রমণে ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি যোগ আছে। আর্থিক অসুবিধা ভোগ থাক্‌বেই। স্পেকুলেশনে ও রেস খেলায় ক্ষতি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। টাকাকড়ির লেন-দেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক, চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। উপরওয়ালার ভৎসর্না ও অপ্রিয় ধারণা মানসিক কষ্ট এনে দেবে, অপমান, পদমর্য্যাদার ক্ষুন্নতা, ক্ষমতার হ্রাস, অযথা দোষারোপ দ্বারা বিব্রত করার অপপ্রচেষ্টা চলবে চাকুরির ক্ষেত্রে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী-

দের পক্ষে মাসটী খারাপ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অশুভ, পারিবারিকক্ষেত্রে কলহ, বিবাদ, সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদাহানি, শত্রুবৃদ্ধি, এবং সর্ব্বকার্য্যে বাধাপ্রাপ্তি ; প্রণয়ের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যভোগ দেখা যায়। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত স্ত্রীলোকের বিপত্তির কারণ আছে। যারা সম্প্রতি প্রেমে পড়েছে, তাদের প্রণয়ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যের অবনতি। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও মাসটী অশুভ, এমন কি ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্যার্থীর পক্ষে পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য ঘটবে না। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম এবং আর্দ্রার পক্ষে অধম। মানসিক বিকৃতি বা মনস্তাপ, উদ্বেগ, অপমান, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, কর্ম্মে বাধা, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে পৃথক হওয়া, মামলায় পরাজয় প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ। লাভ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান,সাফল্য, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি শুভফলের সম্ভাবনা আছে। উদর ও হজমশক্তির বিশৃঙ্খলা, জ্বর, রক্তের চাপবৃদ্ধি, বায়ুভুজনালী প্রদাহ, জীবনীশক্তির হ্রাস, ইত্যাদি হোতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য, পারিবারিক অশান্তি, আর্থিকক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। অর্থপ্রাপ্তির যোগাযোগ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হবে না। টাকা-কড়িয় লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অত্যন্ত অসুবিধা, প্রতারণা ও চুরির জন্য ক্ষতি ভোগ। স্পেকুলেশনে সাংঘাতিক ক্ষতি, রেসে পরাজয়, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। চাকুরির ক্ষেত্রে উপরওয়ালার নিজস্ব কর্ম্মীর চক্রান্তে কষ্টভোগ, উপরওয়ালা নিরপেক্ষ থাকলেও তাঁর নিজস্ব কর্ম্মীর কুপরামর্শহেতু পদে পদে লাঞ্ছনা বা বাধাপ্রাপ্তি। চাকুরীজীবীরা নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করবেন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, কোন রকমে চলে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভাশুভ ফলদাতা। সামাজিক মেয়েরা কর্ম্মগুণে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করবে। অধ্যাত্মসাধিকারা উন্নতি লাভ করবে, ভক্তিমার্গের মেয়েরা ঈশ্বরানুগ্রহ, এমন কি ঈশ্বর দর্শন পর্য্যন্ত করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি ভোগ, প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে বিদ্যার্জ্জনে বাধা, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটবে।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম, পুষ্যার পক্ষে অধম ফল। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই যাবে, কিন্তু পিত্ত প্রকোপ ঘটবে। গুহ্য প্রদেশেও মূত্রাশয়ে পীড়া, চক্ষু পীড়া প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। তবে এগুলি মারাত্মক হবে না, পারিবারিক কলহ, মনোমালিন্য, এবং মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে। সুখ স্বচ্ছন্দতার অভাব। কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, মধ্যে অর্থক্ষতি ও অত্যধিক ব্যয়, ডাক্তারি খরচ বেশী হবে। চুরির জন্য ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেস খেলায় পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। ব্যবসায়ে অংশীদার গ্রহণ বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্র মন্দ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে পারিবারিক,সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা লাভ ঘটবে না, বরং নানাভাবে বাধা বিপত্তি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয় ঘটবে। অবৈধ-প্রণয়ে বিপত্তির কারণ আছে। ভ্রমণ যোগ, উদ্বেগ, অশান্তি ও ব্যয় ছাত্রমহলে লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষায় সাফল্য। বিদ্যার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে উত্তম, মঘা ও উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে মধ্যম। শত্রু ও প্রতিযোগীদের দ্বারা কিছু লাঞ্ছনাভোগ, মনস্তাপ ও মানসিক চাঞ্চল্য, বিবাদ, স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি ও অসৎসংসর্গ। কিন্তু সাধারণ সাফল্য, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়, লাভ, বিলাস-ব্যসন ভোগ। সৌভাগ্য ও জনপ্রিয়তা, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সন্তানাদির ভগ্ন স্বাস্থ্য বা পীড়া ভোগ। দুর্ঘটনার আশঙ্কা, পারিবারিক শান্তি, ঐক্য এবং আনন্দ উপভোগ, বহিঃক্ষেত্রে স্বজনকুটুম্বাদির সহিত কলহ বিবাদ। আর্থিক লাভ, সর্ব্বপ্রচেষ্টায় সাফল্য, খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ী, শস্য ব্যবসায়ী এবং দালালদের পক্ষে এ মাসটী ধনলাভের অনুকূল। ভ্রমণ হবে, ভ্রমণে শুধু আনন্দ নয়, লাভ ও ঘটবে। ধৈর্য্য ও উৎসাহ বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল, অনাদায়ী বাড়ীভাড়া, সম্পত্তি-সংক্রান্ত টাকা বা শস্য প্রাপ্তি ঘটবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা প্রীতিসূত্রে সহযোগী হবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। কর্ম্মক্ষেত্রে উপরওয়ালার কৃপা লাভ। নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা আশা করা যায়। প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে জয়লাভ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা নানাপ্রকার লাভবান হবে। এদের আয়বৃদ্ধি যোগ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা-ভালো মন্দ দুইই দেখা যায়। প্রথমে নানা দুঃখকষ্ট, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। শত্রুতা, হিংসা দ্বেষ, কর্ম্মে বাধা বিপত্তি ও নৈরাশ্য প্রথম দিকে প্রকাশ পেলেও শেষে সর্ব্বপ্রকারে শুভ। পারিবারিক ও সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ, সম্মান, প্রীতি ও আনন্দ উপভোগ। অবৈধ প্রণয় ও কোর্টসিপে বিপত্তি, খাদ্যাদি ব্যাপারে ব্যয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতালাভ, তাড়াতাড়ি লিখলে নম্বর কম পাবে।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে অধম। দুঃখ, বাধা বিপত্তি, স্বজনবর্গের সহিত কলহ বিবাদ, অস্বচ্ছন্দতা ও ভগ্নস্বাস্থ্য, শত্রুপীড়া, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, ক্ষতি, মর্য্যাদাহানি, আত্মীয় বিয়োগ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুর্ঘটনা এবং মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয় প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্য। পুরাতন ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা পুনরায় পীড়াগ্র

হোতে পারে। স্ত্রীর শরীর মোটেই ভালো বলা যায় না। পারিবারিক কলহ। স্বজনবিয়োগজনিত শোক, অর্থোপার্জ্জন এমাসে আশানুরূপ হবে না। কর্ম্মে উৎসাহ বৃদ্ধি, ব্যয়াধিক্য, ক্ষতি এবং অপর ব্যক্তির অর্থ নেবার জন্যে নানা ফন্দিফিকির ও জুলুম, পাওনাদারের তাগাদার চাপ। নূতন কোন প্রচেষ্টা করলে অসাফল্য, চুরি ও প্রতারণার আশঙ্কা, শত্রুদের কুচক্রান্ত, কারো জন্য জামিন হওয়া বিপজ্জনক, এসব দিকে সতর্কতা আবশ্যক। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কোনমতে চালিয়ে যাওয়াই ভালো। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থব্যয় হবে কিন্তু লাভের আশা কম, তা ছাড়া নানা বাধারও সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা বিপত্তি ও তজ্জনিত আশা-ভঙ্গ ও মনস্তাপের আশঙ্কা আছে। উপরওয়ালার জন্য যে পরিবর্ত্তন আসবে, সে পরিবর্ত্তনে নিজের কোন সুবিধা হবে না বরং গোলযোগও মানসিক পীড়ার উদ্ভব হবে। এই পরিবর্ত্তন সময়ে কোন ব্যস্ততা বা হিসাবের ভুলে নিজের উন্নতির ক্ষতি হোতে পারে। রেসখেলায় হার হবে, স্ত্রীলোকেরা নানাভাবে উৎপীড়িত হবে। অনেকের কাছে অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে দুঃখভোগ করবে। নিজেদের ব্যয়ের জন্যে পরিবারবর্গের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, ফলে অশান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ভ্রমণ ও পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশা বর্জ্জনীয়। কোর্টসিপ ও ভালোবাসার পক্ষে মাসটী অসুবিধাজনক, বিপত্তির কারণ হোতে পারে, অবৈধ প্রণয় এমাসে প্রতিকূলগতিতে সক্রিয় হবে। সামান্য ব্যাপার থেকে তুমুল কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, পারিবারিক কাজকর্ম্ম নিয়ে কালাতিপাত করাই ভালো। অফিসে চাকরী করলে খুব সাবধানে থেকে দৈনন্দিন কাজগুলি করা বাঞ্ছনীয়। বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অশুভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, পরীক্ষার্থীর সাফল্য যোগ।

তুলা রাশি

বিশাখানক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, চিত্রার পক্ষে মধ্যম এবং স্বাতীর পক্ষে অধম। সাধারণ সাফল্য, উত্তম পদমর্য্যাদা ও সঙ্গ সুখ, শুভ ঘটনার সমাবেশ, প্রিয়জনের সমাগম, লাভ, প্রভাব প্রতিপত্তি, শত্রুজয়, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি শুভফলের আশা করা যায়। ক্লান্তি-কর ভ্রমণ, স্বজন বিয়োগ, দুঃখ, মামলা মোকর্দ্দমা, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, অপবাদ ও অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি অশুভ ফলেরও আশঙ্কা আছে। সারা মাসই স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা গেলেও পীড়ার যোগ নেই। তবে ধারালো অস্ত্র বা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারি-বারিক অশান্তির প্রাবল্য। প্রথমে উত্তম লাভ বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় ও বৈদেশিক মালপত্র বেচাকেনায় শেষে ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জনীয়, রেসে অর্থাগম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম যাবে না। অপ্রত্যাশিতভাবে মামলা মোকর্দ্দমা ঘটবে। এমন কি সম্পত্তি হানি পর্য্যন্ত সূচিত হয়, ভাড়া অনাদায়ী হবে স্থান বিশেষে, কৃষিকার্য্য বাধাগ্রস্ত হবে, টাকা লেনদেন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, চাকুরিজীবির পক্ষে অশুভ, মিথ্যা অপবাদ, মর্য্যাদা হানি, এমন কি চাকুরি পর্য্যন্ত যাবার আশঙ্কা আছে, অথ্যাতিও নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ সহ্য করতে হবে। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হ'তে হবে, প্রথমে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি, সঙ্গীত ও খেলাধূলায় সুনাম—নিজের গণ্ডীর মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করবার সুযোগ লাভ, কিন্তু শেষ দিকে নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ ও অপবাদ। পারিবারিক ও প্রণয় ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। অবৈধ প্রণয়ে বিশৃঙ্খলতা। পুরুষের দ্বারা প্রতারণা, বাড়ীতে অতিথির সমাগম। দূর থেকে দুঃসংবাদ প্রাপ্তি, বিদ্যার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ এবং ভ্রমণযোগ।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা এবং জ্যেষ্ঠাজাতগণ অপেক্ষা বিশাখানক্ষত্রাশ্রিতগণের সময়টী অপেক্ষাকৃত উত্তম। জ্যেষ্ঠাজাতগণ অনুরাধা অপেক্ষা ভালো সময় পাবে। মাসটি মিশ্রফলদাতা, উন্নতি ও অবনতি দুই-ই হোতে পারে, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় অসাফল্য, মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ, স্বজন বন্ধু বিরোধ, ক্ষতি, অপবাদ, অন্যায় ভাবে নিন্দা, সম্মান হানি প্রভৃতি দেখা যাবে। শেষে লাভ, সাফল্য, পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যোন্নতি, পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি সূচিত হয়। ভ্রমণ বিশেষতঃ দীর্ঘ ভ্রমণ অনুচিত দুর্ঘটনার আশঙ্কা, কোন গুরুতর পীড়া হবে না, দুর্ঘটনায় রক্তপাতাদির সম্ভাবনা, পারিবারিক শান্তিশৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকবে—যদিও মধ্যে মধ্যে সামান্য কলহাদি ও মনান্তর ঘটবে বহির্ভাগে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে।

আর্থিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আশা করা যায়। স্পেকুলেশনে বিশেষ লাভ, রেসে জয়, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম, জমি কেনাবেচায় লাভ, বাড়ী পরিবর্ত্তন করে স্থানান্তরে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করলে বিপন্নতা, কর্ম্ম বা কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের গোলযোগ ঘটবে, চাকুরির ক্ষেত্রে যে সব উপরওয়ালার অভদ্রোচিত ব্যবহার, তাদের বদলি হবার যোগ আছে। এই রাশির লোকদের বিরুদ্ধাচরণকারী উপর-ওয়ালাদেরও এমাসে ক্ষতি হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম।

স্ত্রীলোকেরপক্ষে মাসটী অতীব শুভ। আমোদ প্রমোদ, অভিনয়, নৃত্য-গীত, পার্টি এবং নানা উৎসবে যোগদান করে সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ। অবৈধ প্রণয়ে জড়িত হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ আসবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তৃত হবে। কোর্টসিপ আশাতীত সাফল্য লাভ করবে, অবিবাহিতাদের বিবাহ হবার সম্ভাবনা—যারা পূর্ব্ব হোতে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত সেইসব নারীর নানাপ্রকার উপঢৌকন, অর্থও অলঙ্কার লাভ করবে। কর্ম্মী মহিলার পদোন্নতি যোগ, পরীক্ষার্থীর পক্ষে অসাফল্যের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নে অমনোযোগী হবে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে, আর পড়াশুনায় বিশেষ এগোতে পারবে না।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, মূলাও উত্তরাষাঢ়াগণের পক্ষে মধ্যম,

শারীরিক কষ্ট, উদ্দেশ্যহীন ক্লান্তিকর ভ্রমণ, নানা প্রচেষ্টায় পৌনঃপুনিক বাধা, সম্মান ও মর্য্যাদা হানি, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনান্তর ও কলহ বিবাদ, অর্থ ক্ষতি, অসৎসংসর্গ, প্রতিযোগীর আবির্ভাব, ব্যয়াধিক্য প্রভৃতি এমাসের অশুভ ফল। কোন শুভ সংবাদ, আনন্দজনক ভ্রমণ, আমোদপ্রমোদ, সাফল্য ও সুখৈশ্বর্য্য ভোগ প্রভৃতি এমাসের শুভ-ঘটনার সমাবেশ। একাধিকবার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। উদর, ফুসফুস এবং হৃদয়ে রোগাধিকার। রক্তের চাপবৃদ্ধিহেতু হৃদ্‌কষ্ট ও বক্ষশূল। পুরাতন হাঁপানী রোগীর পক্ষে অবস্থা সাংঘাতিক হবে। পারিবারিক শান্তির অভাব। স্বজন বিরোধ ঘরে বাইরে। অর্থের দিক দিয়ে মাসটী খারাপ নয়। সুন্দরভাবে প্রচুর আয়, সর্ব্বপ্রকার আর্থিক প্রচেষ্টায় অসাধারণ সাফল্য। আশাতীত উপার্জ্জন ও ধনাগম সত্বেও ব্যয় বৃদ্ধি-হেতু সঞ্চয়ের দিকে মুদ্রাসংখ্যা আশানুরূপ হবে না। স্পেকুলেশনে লাভ ক্ষতি দুই-ই ঘটবে। সুতরাং স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে লাভ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তরোত্তর দুঃসময়। অকারণ কলহবিবাদ, শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা, সুযোগবাদীদের চক্রান্তে উপরওয়ালার হীন ধারণা, প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফল্য লাভ, প্রভৃতি ঘটনাগুলি চাকুরিজীবীর চিত্তের স্থৈর্য্য হারিয়ে যাবে। প্রত্যাশিত পদোন্নতিও ঘটনাচক্রে ব্যাহত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকের উত্তেজনা সংযত করা আবশ্যক। অন্যথা বিপদের কারণ আছে। নিজের মনোভাব অপরের কাছে ব্যক্ত করলে ফল ভালো হবে না। বড়লোক, কর্তৃপক্ষ, কর্তৃত্বের অধিকারী এবং মনিবের সংস্রব হোতে দূরে থাকা আবশ্যক, তাছাড়া পরপুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো—বিশেষতঃ যারা মেয়েমহলে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। সমস্ত ব্যাপারেই বিভ্রান্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, অতএব কাজকর্ম্ম নিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া ভালো। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি হবে। অবৈধ প্রণয়ে সমূহ বিপদ। পূর্ব্ব হোতে এরূপ প্রণয়ে লিপ্ত থাকলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, অপ্রীতিকর গুজব রটবে যা সম্ভ্রম হানিকর। ছাত্রদের লেখা-পড়ায় মন বসবে না, ঘুরে বেড়ানো আর রোমান্সের দিকে ঝোঁক। বিদ্যার্জ্জনে ঔদাসীন্য ও পরীক্ষায় অসাফল্য।

মকর রাশি

শ্রবণাজাত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তম সময়, এর পর ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। উদ্বেগও দুঃখ, সম্ভ্রমহানি, স্বাস্থ্যের অবনতি, প্রচেষ্টায় বাধাপ্রাপ্তি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, কলহ, ক্ষতি, শত্রুদের দ্বারা নিগ্রহভোগ মামলামোকর্দ্দমা ও পরাজয়, স্বজন বিয়োগ প্রভৃতি সম্ভব। কিছু সুখ-সমৃদ্ধি সৌভাগ্য ও সাফল্য যোগ আছে। কোনরূপ বিশেষ পীড়া না হোলেও শরীর ভালো যাবে না। উদর, ফুসফুস এবং হৃদ্‌কষ্ট ভোগ। আহারাদি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা দরকার। রক্তের চাপবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অশান্তি থাকবে। আর্থিক-ক্ষেত্র নৈরাশ্যজনক। উপার্জ্জনের গতিমন্দ হবে, তাছাড়া থাকবে ব্যয়াধিক্য। কোন নূতন উদ্যম বা প্রচেষ্টায় ক্ষতি। দৈনন্দিন কাজে টাকাকড়ি সম্পর্কে হুঁসিয়ার হওয়া আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমা বর্জ্জনীয়। রেসে হার, চাকুরিজীবী পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর পক্ষে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি ব্যবহার ভালো না হোলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের উন্নতি ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ। এমাসে রোমান্স, কোর্টসিপ, অবৈধ প্রণয় ও আমোদপ্রমোদ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সন্দেহজনক পরপুরুষের সংস্রবে আসা অনুচিত, তা'তে শোচনীয় পরিণতি ঘটতে পারে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দিনগুলি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে। বালক বালিকাদের মাসটী অশুভ। বিদ্যার্থীদের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নহে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটী উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং শতভিষাজাতগণের পক্ষে অধম। মোটামুটিভাবে সাফল্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, লাভ, উত্তম বন্ধু, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জনে পরীক্ষায় সাফল্য, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন, শেষের দিকে পরি-বর্ত্তন ঘটবে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয়। শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা অল্প বিস্তর থাকলেও পীড়াদির কোন সম্ভাবনা নেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন গোলযোগ বা অশান্তি ঘটবে না। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে কিন্তু শেষের দিকে হ্রাস পাবে। পরপ্রদত্ত উপহার-প্রাপ্তি, দানগ্রহণ ইত্যাদি সম্ভব। শেষের দিকে আয়ের হ্রাস, সামান্য ক্ষতি, চুরি, প্রতিদ্বন্দ্বীর অপকৌশল প্রয়োগ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম, নানাপ্রকার উন্নতি ও লাভযোগ আছে। অংশীদার গ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ, বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ, পদোন্নতি, সাফল্য ও সুযোগ দেখা যায়। শেষ দিকে নিম্নপদস্থ ব্যক্তিদের জন্যে দুর্ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ শুভ। মহিলাদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে শুভ। পর-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বিপত্তির কারণ ঘটাতে পারে। অবিবাহিতাদের বিবাহ হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র মোটামুটি ভালো বলা যায়। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় অর্থাগম, গর্ভবতী রমণীর পক্ষে ভয়ের কারণ আছে। বালক-বালিকাদের পক্ষে শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের সাফল্যলাভ।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম এবং উত্তর-ভাদ্রপদজাতগণের পক্ষে অধম। সাফল্যলাভ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব, লাভ, আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতালাভ, বিলাস-

ব্যসন সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নূতন মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা, শত্রুজয়, প্রতিযোগীর পরাজয়, সৌভাগ্য সুখ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, বিবাহাদি অনুষ্ঠান, সন্তানলাভ, সমাজের উপরতলার ব্যক্তিদের আনুকূল্যলাভ প্রভৃতি শুভ ঘটনার সংযোগ হবে। পারিবারিক কলহ ও মনোমালিন্য, অপবাদ, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, অর্থক্ষয়, স্বজনবন্ধুবিয়োগজনিত শোক, বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ হোতে পারে। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলোরিয়ায় কষ্টভোগ। পরিবারের বহিঃক্ষেত্রস্থ আত্মীয় কুটুম্বাদির সঙ্গে কলহ বিবাদ। আর্থিকক্ষেত্র অতীব শুভ, বিশেষভাবে অর্থোপার্জ্জন। অংশীদার গ্রহণে ক্ষতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে লাভ, বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মোটামুটি সময় মন্দ যাবে না। চাকুরিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। পদোন্নতি, মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। উপার্জ্জন হোলেও কিছু অর্থ নষ্ট হবে।

মহিলাদের পক্ষে অতীব উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ, অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ সফলতা। অবিবাহিতাগণের বিবাহ হোতে পারে। এ মাসে স্ত্রীলোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীরোগের সম্ভাবনা। জ্বর হবার যোগ আছে, ইলেকট্রিকের বস্তু ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক দরকার, ছাত্রগণ অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করবে কষ্টের সঙ্গে, অবিবাহিত ছেলেদের বিবাহযোগ। অনেক ছেলে রোমান্সের দিকে ঝুঁকবে এবং প্রেমে পড়বে।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শারীরিক সুস্থতা, মানসিক স্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মে সাফল্য, সন্তানদের পীড়া, পারিবারিক অশান্তি, আয়বৃদ্ধি, লাভের আশা আছে, বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ, পদোন্নতি যোগ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, ভ্রমণ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়।

বৃষলগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না, শিরঃপীড়া, সাময়িক ভাবে ঋণ, সন্তানের বিবাহ যোগ, ব্যয় বৃদ্ধি, মনস্তাপ, গুরুজন বিয়োগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ ও অপবাদ, বিদ্যার্থীর পক্ষে বাধা ও পরীক্ষার ফল নৈরাশ্যজনক।

মিথুনলগ্ন

মস্তিষ্ক রোগ, স্বাস্থ্যের অবনতি, পীড়াদি কষ্ট, দ্রব্যাদি লাভ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, কর্ম্মক্ষতি, শত্রু বৃদ্ধি, মোকর্দ্দমায় পরাজয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থীর পক্ষে ব্যাঘাত ও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা।

কর্কটলগ্ন

ব্যয় বাহুল্য, দেহপীড়া, সন্তানের স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, পত্নীর বিশেষ পীড়া, ধর্ম্মকার্য্যে বাধা, সৌভাগ্য বৃদ্ধির অন্তরায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়, হঠাৎ ভ্রমণ, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম, পরীক্ষায় সাফল্য।

সিংহলগ্ন

ধনাগম, সহোদর প্রীতি, তীর্থ পর্য্যটন, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা উত্তম নয়, মিত্রলাভ, শত্রুবৃদ্ধি, উত্তম আয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম ও পরীক্ষায় সাফল্য লাভ।

কন্যালগ্ন

ব্যয় বৃদ্ধি ও বিপন্নতা, সন্তানের পীড়া, অর্থাগম, সম্পত্তি লাভ, ভাগ্যোন্নতি, ক্ষতি, আয় বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, বিদ্যার্থীর সাফল্য-লাভ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য।

তুলালগ্ন

ধর্ম্মানুষ্ঠান, শারীরিক অসুস্থতা, শত্রু বৃদ্ধি, সন্তানের উন্নতি, অসম্মান ও অপবাদ। সৌভাগ্য সূচনা, অপ্রত্যাশিত অপ্রীতিকর দুঃসংবাদ, ভ্রমণ, গৃহে অতিথির আগমন, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর উন্নতি ও সাফল্য।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক অবস্থার উন্নতি, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, ভাগ্যোন্নতি শেষ দিকে, ভয় ও বিপদ, দেশান্তর গমন, পদে পদে বাধাবিপত্তিজনিত কর্ম্মক্ষেত্রে বহু অসুবিধা ভোগ, স্থান পরিবর্ত্তন, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, পরীক্ষায় অসাফল্য।

ধনুলগ্ন

আর্থিকোন্নতি, শারীরিক অসুস্থতা, দুঃখ ভোগ, দুর্ঘটনার ভয়, লাভ ও অর্থাগম। উত্তম বন্ধুলাভ, স্বজনবিরোধী, সঞ্চয়ে ব্যাঘাত, অপ্রত্যাশিতভাবে স্বজন বন্ধুর শত্রুতা, অপ্রীতিকর গুজব, এজন্য মনশ্চাঞ্চল্য মাতার স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, বিদ্যার্থীর অধ্যয়নে অবহেলা, পরীক্ষার্থীর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

মকরলগ্ন

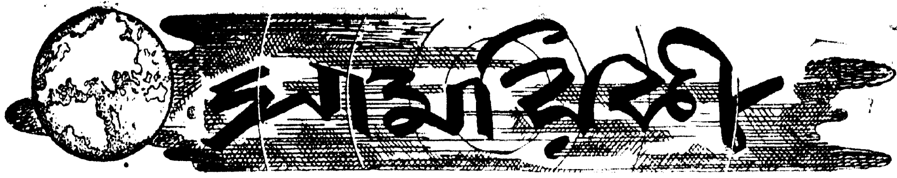
শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, অর্থাগম, ব্যয়াধিক্য, সদ্‌বন্ধুলাভ ভ্রাতার সহিত অসদ্ভাব। স্ত্রীর জীবন সংশয়, সন্তানের কষ্ট, ধনবৃদ্ধি স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, বিদ্যার্থীদের বিদ্যার্জ্জনে ও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় কোনরূপে সাফল্য লাভের আশা দেখা যায় না। উত্তম ছাত্র নিম্নস্তরে নেমে আসবে।

কুম্ভলগ্ন

ব্যয়বৃদ্ধি, দুশ্চিন্তা, শারীরিক অসুস্থতা, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, কলহ বিবাদ যশোহানি, দূর স্থান থেকে শুভ সংবাদপ্রাপ্তি। অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন অবস্থা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থীর উত্তম বিদ্যালাভ ও পরীক্ষার্থীর সাফল্য।

মীনলগ্ন

পাকযন্ত্রের পীড়া, শ্লেষ্মাপ্রকোপ, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, কর্ম্মস্থানে দায়িত্ব ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি, দাম্পত্য সুখ, আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তি, ধনভাবে ফল উত্তম নয়, আত্মীয়ের পীড়া, স্বজন বা বন্ধু বিয়োগ, সাময়িক ঋণযোগ অবিবাহিতগণের বিবাহ, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, কষ্টের সহিত পরীক্ষার্থীর সাফল্য, বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জ্জন শুভ।



কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ—

৬ই জানুয়ারী সৌরাষ্ট্র রাজ্যের ভবনগরের নিকট সর্দারনগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৬ তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে শ্রীনীলম্ সঞ্জীব রেড্ডি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কংগ্রেস নেতার ১০ বৎসরের অধিক সময় শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকা উচিত নহে। ১০ বৎসর মন্ত্রিত্ব করার পর প্রত্যেকের সে কাজ ছাড়িয়া দিয়া কংগ্রেস ও দেশের গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। অবশ্য শ্রীজহরলাল নেহরুর মত বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে এ আইন প্রযুক্ত হইতে পারে না। মন্ত্রীত্ব করিয়া কংগ্রেসকর্মীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন তাহা গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত হইলে দেশ উন্নতির পথে সত্বর অগ্রসর হইবে। ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কাজ করিতেছেন—আমাদের বিশ্বাস, শ্রীরেড্ডি চেষ্টা করিলে সর্বত্র আগামী নির্বাচনে নূতনের দলকে মনোনয়ন দান করিয়া পুরাতন দলকে অন্য কাজে লাগাইয়া দিতে পারেন। নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত করিতে সমর্থ হইবেন।

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—

ভবনগর কংগ্রেসের পর কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীনীলম্ সঞ্জীব রেড্ডী নিম্নলিখিত ১০ জনকে নূতন ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—(১) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (২) শ্রীমোরারজী দেশাই (৩) শ্রীইউ-এন-ধেবর (৪) এস-কে-পাতিল (৫) শ্রীজগজীবন রাম (৬) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম (৭) শ্রীকামরাজ নাদার (৮) এস-নিজলিঙ্গাপ্পা (৯) শ্রীমতী আভা মাইতি ও (১০) রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখদিয়া। শ্রীসুখা-দিয়া ছাড়া আর সকলেই পুরাতন সদস্য। শ্রীরেড্ডী আর তিনজনের নাম পরে ঘোষণা করিবেন। পুরাতন নিম্নলিখিত ৪ জন বাদ গিয়াছেন—(১) শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী (২) শ্রীআবদুল আন্সারী (৩) শ্রীভকতলাল জৈন ও (৪) শ্রীসি-কে-গোবিন্দম্ নরী। নিম্নলিখিত ৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (২) শ্রীওয়াই-বি-চ্যবন (৩) শ্রীসাদিক আলি (৪) শ্রীজি-রাজা-গোপাল (৫) সর্দার দরবারা সিং (৬) শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ও (৭) ডাঃ রামসুভগ সিং। শ্রীসাদিক আলি, শ্রীরাজাগোপাল ও শ্রীমতী আভা মাইতি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীএস-কে-পাতিল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষের কাজ করিবেন। তাঁহারা ঐ পদে পূর্বেও কাজ করি-তেছিলেন।

কংগ্রেসে কলিকাতা-প্রসঙ্গ—

৫ই জানুয়ারী ভবনগর—সর্দার নগর কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচন সমিতির সভায় বিহারের শ্রীমিশ্র কলিকাতার বিশেষ সমস্যার প্রতি সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া বলেন—কলিকাতা বস্তি-সমস্যা, শিক্ষিত-বেকার সমস্যা ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ও পর্যুদস্ত। কলিকাতার বিরাট সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নহে, পরন্তু সর্ব্ব-ভারতীয় সমস্যারূপে নেতাদের দেখা উচিত ও উহার মীমাংসার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীমিশ্রের উক্তি সমর্থন করিয়া ঐ সভায় এক জোরালো বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ দিন তৃতীয় যোজনা সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনার সময় শ্রীশৈল-কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—বিগত নির্বাচনে সহরাঞ্চলে কংগ্রেস বেশী ভোট পায় নাই—তাই আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে সহরগুলির উন্নতির জন্য কংগ্রেস সরকারের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয় যোজনা বা কংগ্রেস-ইস্তাহার সংক্রান্ত কোন প্রস্তাবেই এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় শ্রীমুখোপাধ্যায় ঐ কথা বলেন। কলিকাতা সহরের কথা কোন প্রস্তাবে গৃহীত হয় নাই।

কলিকাতায় কৃষি-মেলা—

গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা বেহালার নিকট তারাতলা রোডে প্রথম জাতীয় কৃষি-মেলার উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি তথায় একটি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন —তাহা হইল—ক্ষুধা হইতে মুক্তিলাভই সকল মুক্তির ভিত্তি; ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেই অন্যান্য সকল মুক্তির পথ খুলিয়া যায়। ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক এখনও কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত—তথাপি ভারত কেন এখনও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই—ইহা দেশের সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা। তারাতলায় ১০০ বিঘা জমীর উপর যে বিরাট কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, তথায় আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম-জার্মানী প্রভৃতি দেশের আধুনিকতম কৃষি ব্যবস্থা দেখানো হইয়াছে। দেশের স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণকে এই প্রদর্শনী দেখাইলে তাহাদের মনে কৃষি কার্য্যের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। সকল স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করা প্রয়োজন।

অর্দ্ধেক অপুষ্ট বা অর্দ্ধপুষ্ট—রাষ্ট্রপুঞ্জ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিসংখ্যান বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ পি-কে-সুখাতম্ গত ৯ই জানুয়ারী দিল্লীতে এক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন—ভারতীয় জনসাধারণের অন্তত অর্দ্ধেক অপুষ্ট বা অর্দ্ধপুষ্ট। ভারতের জনগণ যে খাদ্যগ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের দেহে উপযুক্ত তাপ উৎপন্ন হয় না, সে জন্য তাহাদের শক্তি ও শ্রম-ক্ষমতা কম। দারিদ্র্যের জন্য তাহারা কম খাদ্য গ্রহণ করে এবং অব্যবস্থার জন্য তাহারা অসমঞ্জস খাদ্য খাইতে বাধ্য হয়। শুধু খাদ্য উৎপাদন বাড়াইলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না—সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-ব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা উহার সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ নেতা শ্রীমন্ নারায়ণ ঐ বৈঠকে সভাপতি ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীমন্ নারায়ণ শুধু পরিকল্পনা কমিশনে নহে, সর্বত্র এই বিষয়টি প্রচার করিয়া ইহার প্রতীকারে যত্নবান হইবেন।

৪ হাজার তিব্বতী নিহত—

৫ হাজার তিব্বতী প্রায় এক বৎসর পূর্বে লাসা ত্যাগ করিয়া ভারতের সীমান্তের দিকে পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চীনা সৈন্যরা পথে তাহাদের মধ্যে ৪ হাজার লোককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া গত ১০ই জানুয়ারী জাম্মু হইতে খবর আসিয়াছে। তিন শত মাত্র তিব্বতী পলায়ন করিয়া লাদাকে আসিয়াছে। আর ও এক শত তিব্বতী ডেজচক ও চুমুলের পথে লাডাকের দিকে আসিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত ১০ হাজার পশু লাদাকে আসায় তথায় পশুখাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়াছে। চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের পর তথায় বর্তমানে যে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা প্রায় অজ্ঞাত। যে সকল তিব্বতী চীনের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহারা অধিকাংশই অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতেছে। ইউ-এন-ও এ বিষয় নীরব কেন?

পরলোকে প্রভাতকিরণ বসু—

সুকবি ও খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক প্রভাতকিরণ বসু গত ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁহার ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসুর এক মাত্র পুত্র ও খ্যাতনামা ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া ভারতবর্ষপ্রমুখ সকল বাংলা সাময়িক পত্রকে তিনি সমৃদ্ধ করিতেন। কিছুকাল তিনি ভাই-বোন নামক শিশু মাসিকের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও এক দত্তক পুত্র বর্তমান।

নরসিংহদাস কুঠারী কল্যাণ আশ্রম—

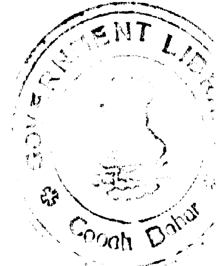
গত ৭ই জানুয়ারী ২৪পরগণা বাণাপুরে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নরসিংহদাস কুঠারী কল্যাণ আশ্রমের উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঐ আশ্রম নির্মিত হইয়াছে ও তথায় ৭৫০জন অনাথ বালককে রাখা হইবে। ডাক্তার রায় বলেন—পশ্চিমবঙ্গে ঐরূপ ৮১টি আশ্রম আছে—তন্মধ্যে ৮টি মাত্র সরকার পরিচালনা করেন। বাকী সবগুলিই বেসরকারী পরিচালনার অধীন। তবে প্রায় সবগুলিই সরকারী সাহায্য লাভ করে। মেদিনীপুরে ৪০০ বয়স্ক লোকের জন্য ঐরূপ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্গত আছে। তিনি সকল দেশহিতব্রতীকে ঐরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ৮ই জানুয়ারী সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে—ঐ দিন ৪৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে উপাধি দান করা হয়—তন্মধ্যে ১০ জন বিজ্ঞানে ডি-ফিল, ৫ জন এঞ্জিনিয়ারিং, ৪৭ জন বিজ্ঞান ও ১১৩ জন কলাবিভাগে স্নাতকোত্তর—৪০ জন বিজ্ঞান, ১৫ জন কলা ও ২২৯ জন এঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। এই বৎসর প্রথম সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর উপাধি দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালবের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার ভাষণে বলেন—শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকিলে কোন বিদ্যায়তনই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়, তাহা দূর করিবার জন্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয় সম্প্রদায় একান্তভাবে চেষ্টা না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলকে চিন্তান্বিত হইতে হইবে। এই বিষয়টির প্রতি মুখ্যমন্ত্রী যে সতর্ক-বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য সর্বত্র চেষ্টার প্রয়োজন।

পরলোকে নিধিরাজ হালদার—

কলিকাতা কালীঘাট পল্লীর বিশিষ্ট সমাজসেবক কর্মী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক নিধিরাজ হালদার ৫৫ বৎসর বয়সে গত ২৪শে ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। স্থানীয় সমাজ সেবার কাজ ছাড়াও কালীঘাট মন্দির সুপরিচালনা ব্যাপারে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও ভ্রাতা ভগিনী বিদ্যমান। রবিবাসর ও সাময়িক-পত্র-সংঘের পরিচালনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন।



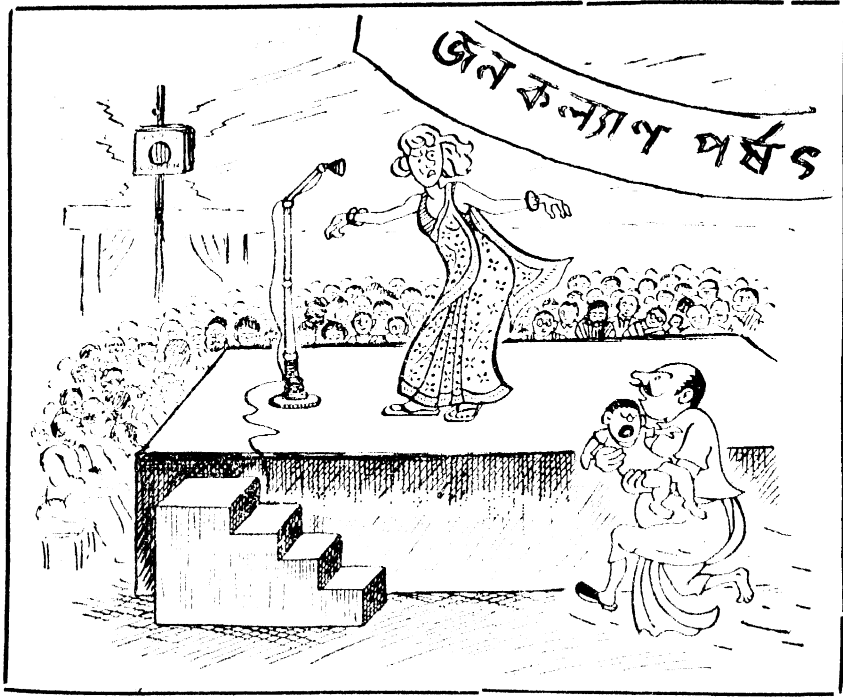
নীল পাহাড়ের মেয়ে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

নীল পাহাড়ের সারি নীল আকাশের গান গায়
বুকে তার বনানী সবুজ,
পাগলা ঝোরার তানে আঁকা-বাঁকা পথে নিতি ধায়
পাহাড়িয়া মেয়েটি অবুঝ!
হেলে দুলে চলে পথ কালো চুল উড়ে দখিনায়
রাঙা ঠোঁটে উদাসী পবন,
কূলে কূলে ঢেউ জাগে আনমনে ফিরে শুধু চায়
ছুটে চলে কোথা অনুখন!

নিশুতি রাতের চাঁদ,—দূরে কোন পাপিয়ার গান,
সরলের বনে সুর তোলে,
যউবন মদিরা নেশায় খেয়াল খুশীর প্রাণ
দোদুল দোলায় মিছে দোলে,
উতরাই পথে যবে বাঁশী শুনে উতলা বিভল,
অজানায় ছুটে পথ ধীরে,
মেঘের ভেলায় আসে স্বপনের সুধা পরিমল
জীবনের গান জাগে নীড়ে!
নিঝুম নিরালা রাতে নীলাকাশে লুকোচুরি খেলা
ভেসে আসে অজানার তান।

হরিৎ মাঠের বুকে অচেতন সবুজের মেলা
জেগে ওঠে শিশিরের গান,
ফুলের সুবাস মাখা ঘুম-পুরী যায় কোথা ভেসে,
ডাকে যেন কারে অজানায়,
ফিরে কারে পেতে চায় স্বপনের কোন দূরদেশে
মিলনের নিবিড় ছায়ায়!



জন-কল্যাণ আদর্শ

স্ত্রী— ··· সবার আগে নজর দিতে হবে আমাদের সন্তানদের উপর··· দেশের শিশুদের কল্যাণের দিকে !···আগে সন্তানপালন··· তাদের স্বাস্থ্য, তাদের শিক্ষাদীক্ষা···তাতে এতটুকু অবহেলা চলবে না···তারাই জাতির ভবিষ্যৎ···

স্বামী— বলি, বক্তৃতা দিচ্ছো তো খুব··· রান্নাবান্না নেই, সারা দিন না খেতে পেয়ে ছেলেটার যে প্রাণ যায় এদিকে—নাও, এখন সামলাও দেখি নিজের সন্তানকে, তারপর দেশের সন্তানদের দেখো !···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা







সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আর একটি অমীমাংসিত টেষ্ট

ভারত-পকিস্থান টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় 'ড্র'-এর অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই দুটি দেশের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৩টি টেষ্ট খেলা হয়েছে, তারমধ্যে মাত্র ৩টি টেষ্টে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে, আর বাকি ১০টি টেষ্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিত ভাবে। অমীমাংসিত টেষ্টের আধিক্যে ক্রিকেট খেলার অনুরাগীবৃন্দ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দু'দলের অধিনায়কের নিকট আর টেষ্ট যাতে অমীমাংসিত না হয় সেই চেষ্টা করার জন্য বহু ক্রীড়ানুরাগী পত্র পর্য্যন্ত দিয়াছেন। কিন্তু 'ড্র'-এর পালা শেষ হবার নয়। কলকাতা টেষ্টের পর মাদ্রাজ টেষ্টের পরিণামও হলো সেই 'ড্র'। আর দিল্লীর উইকেটে খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে হবে না তা বোধ হয় হলপ্ করে বলা চলে।

দু'দলের অধিনায়কই অচল অটল। ঝুঁকি নিতে তারা রাজি নন। পাকিস্থান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ফজল মামুদ টেষ্ট ক্রিকেটের সায়াহ্নে এসে পৌচেছেন। খুব সম্ভব এই বোধ হয় তাঁর টেষ্ট ক্রিকেটে শেষ আবির্ভাব। হয়তো সেই জন্যই তিনি ঝুঁকি নিতে নারাজ। পরাজয় বাঁচানই তাঁর লক্ষ্য। আগেকার দিনের সেই ছিপছিপে ফজল মামুদ আর নেই। তাঁর বলের উৎকর্ষতাও অনেক কমে গেছে। বল্ করার সময় তাঁর দৌড়াবার পরিচিত সেই পুরানো ভঙ্গিরও যেন কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে মনে হলো। অপর পক্ষে নরি কণ্ট্রাক্টর ভারতীয় দলের নূতন অধিনায়ক। খেলোয়াড় নির্ব্বাচক কমিটির খামখেয়ালির কথা তাঁর অবিদিত নেই। আজ রাজা কাল ফকির। এবার তিনি অধিনায়ক, আসছে বার হয়তো দল থেকে বাদই পড়ে যাবেন। এ' নজিরের অভাব নেই। কাজেই তাঁকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। ফলে তিনিও ঝুঁকি নিতে নারাজ। অধিনায়ক হিসাবে নরি কণ্ট্রাক্টরের অভিজ্ঞতা অল্প। তিনি একরকম করে কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। তবে এক কথায় অধিনায়ক হিসাবে তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন। একটি আন্তর্জাতিক দলকে পরিচালনের জন্য যে চাতুর্য্য, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তার অভাব তাঁর অধিনায়কত্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী বৎসর এম, সি, সি দলের ভারত সফরে ভারতের অধিনায়ক নির্ব্বাচনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাকেই অধিনায়ক করা হ'ক, ডি, কে, গায়কোয়াড়কে অধিনায়ক হিসাবে আমরা আর দেখতে চাই না। উড়ে এসে জুড়ে বসায় তাঁর বেশ নাম আছে। সেইটেই ভয়ের কারণ।

কলকাতা টেষ্টে পাকিস্থান দলের 'খুদে ওস্তাদ' হানিফ মহম্মদ উভয় ইনিংসে পঞ্চাশের ওপর রান করলেও তাঁর ব্যাটিং আমাদের নিরাশ করেছে। বিশ্ব পর্য্যায়ের খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম যা শোনা গেছিলো তার কোন ছাপই তাঁর উভয় ইনিংসের খেলায় দেখা যায় নি। প্রথম ইনিংসে ব্যাট্ করার সময় সর্ব্বক্ষণ তাঁর অস্বচ্ছন্দ ভাব লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে যখন তিনি সুরেন্দ্রনাথের বল্ খেলছিলেন। পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার শেষ দিনে তাঁর এবং বার্কির খেলা দর্শকদের আনন্দ দান



পলি উম্‌রিগড় মামুদ হোসেনের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে আউট হয়েছেন। ইম্‌তিয়াজ আমেদ ও মামুদ হোসেনকে আম্পায়ারের নিকট আবেদন করতে দেখা যাচ্ছে।

ভারত-পাকিস্থান

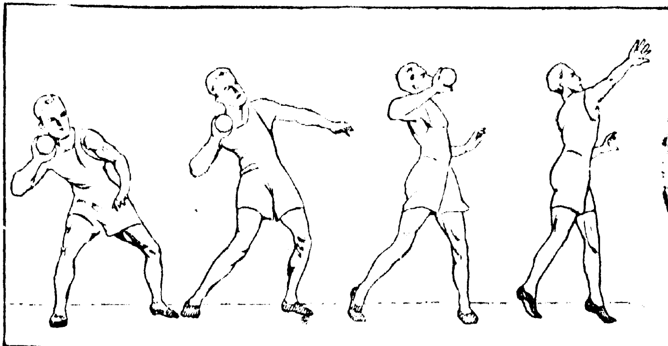
তৃতীয় টেস্ট

হানিফ মহম্মদ ও সৈয়দ আমেদ পাকিস্থানের হয়ে ব্যাট্ করতে নামছেন।

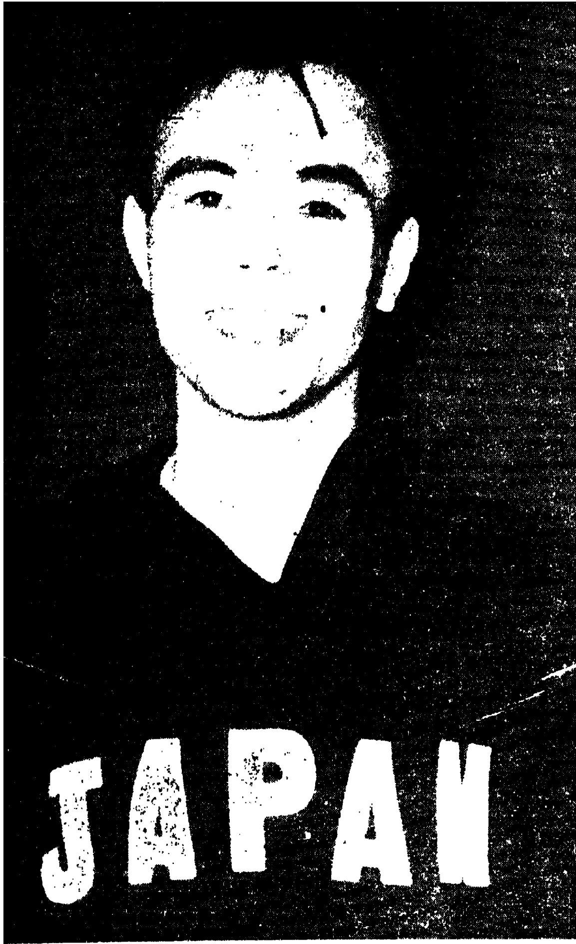


করে। সুন্দর নিখুঁত প্লেসিং-এর সাহায্যে তিনি যে 'সর্ট-রান'গুলি নিচ্ছিলেন তাতে তাঁর ব্যাটিং দক্ষতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাকিস্থান দলের মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-'ব্লু' জাভেদ বার্কির ব্যাটিং সবচেয়ে চোখে পড়ে। উভয় ইনিংসেই তিনি আস্থার সঙ্গে ব্যাট করেন। বার্কির 'ফিল্ডিং'ও উচ্চস্তরের। পাকিস্থান দলের অপর ব্যাট্‌সম্যান সৈয়দ আমেদের খেলাও উপভোগ্য হয়। পাকিস্থান দলের ফিল্ডিং-এ সবচেয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন নাসিমুল ঘানি। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি জয়সিমার যে ক্যাচটি ধরেন তা খুবই দর্শনীয় হয়। ভারতীয় দলে বোর্দে ও মঞ্জরেকার আস্থার সঙ্গে ব্যাট করেন। আব্বাস আলি বেগ্‌ প্রথম ইনিংসে শুরু ভালই করেছিলেন কিন্তু দিনের শেষ বল স্বল্প আলোতে মারতে গিয়ে আউট হন। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। মাদ্রাজ টেষ্টে তাঁকে দলভুক্ত না করে নির্ব্বাচক কমিটি ভালই করেছেন। ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতার ফলে তাঁর নিজের প্রতি আস্থা কমে গেছে, অন্ততঃ তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের আউট হওয়া দেখে তাই প্রতীয়মান হয়। এই সময় তাঁকে দলভুক্ত করলে ফল খারাপ বই ভাল হতো না। কিন্তু আব্বাস আলি বেগের স্থলে একজন তরুণ খেলোয়াড় স্থান পাবেন আশা করা গেছিল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন ডি, কে, গায়কোয়াড। নূতন খেলোয়াড় তৈরী করতে হবে, তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করতে হবে, সব মাথায় উঠলো। তবে পঙ্কজ রায় কি দোষ করলেন। গায়কোয়াডের বদলে তাঁকে দলভুক্ত করলে ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে দল অনেক শক্তিশালী হতো। বোর্দে সম্বন্ধে নির্ব্বাচক কমিটির আস্থা খুবই কম দেখা যাচ্ছে। ইডেন গার্ডেনে তিনি দলে পড়েন নি। নেহাৎ মিল্‌খা সিং অসুস্থ হওয়ার জন্য তিনি দলে আসেন। কিন্তু ভারতীয় দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে আস্থার সঙ্গে এবং স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে ব্যাট করেন এবং বলও ভাল করেন, সুভাষ গুপ্তের চেয়ে অনেক ভাল। তার ওপর আছে তাঁর সুন্দর ফিল্ডিং। তবুও তিনি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। মাদ্রাজ টেষ্টে সুভাষ গুপ্তের ভাই বালু গুপ্তেকে দলে নেওয়া হয়েছে। বোর্দে লেগ্‌ ব্রেক্‌ বল করেন। বালুও তাই। অথচ ভাল অফ্‌ স্পিনার দলে একজনও নেই। উমড়িগড়কে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বালুর বদলে তরুণ অফ্‌ স্পিনার দিওয়াদকরকে স্বচ্ছন্দেই দলভুক্ত করতে পারা যেতো। কিন্তু নির্ব্বাচক কমিটির মর্জ্জি বোঝা ভার। কলকাতায় ঐরকম নৈরাশ্যজনক উইকেট-কিপিং-এর পরও কি ভাবতে পারা গেছিলো যে তামানের নাম মাদ্রাজ টেষ্টে নির্ব্বাচিতদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। কুন্দরাম যে তামানের চেয়ে অনেক ভাল উইকেট-রক্ষক মাদ্রাজে তা তিনি প্রমাণিত করেছেন। অথচ পর পর তিনটি টেষ্টের একটিতেও এতদিন তিনি স্থান পাননি।

নির্ব্বাচক মণ্ডলী যতদিন না এই নিজ নিজ প্রিয় খেলোয়াড় তোষণ বর্জ্জন করছেন ততদিন ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি সম্ভব নয়। পাকিস্থানের সঙ্গে দু'টি সফরে পরপর দশটি টেষ্ট ড্র হ'তে চলেছে। এ'দিক দিয়ে এই বিশ্ব রেকর্ডের কি কিছু মূল্য আছে? ভারতীয় ক্রিকেটের অধিকর্ত্তারাই এর উত্তর জানেন।







ইচিরো ওগিমুরা ফটো—রণেন ঘোষ

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম এশিয় টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রাক্তন বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়ন ইচিরো ওগিমুরা (জাপান) ত্রি-মুকুট জয়ের গৌরব অর্জ্জন করেন। ওগিমুরা পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে কোরিয়ার লী ডাল্ জুন্‌কে ৩-১ গেমে পরাজিত করেন। মিক্সড ডাবল্‌সে ওগিমুরা এবং কে মাৎসুজাকি ৩-২ গেমে টি, মুরাকামি ও কে, ইয়ামাইজুমির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। পুরুষদের ডাবল্‌সে তিনি ও টি, মুরাকামি বিজয়ী হন। এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্ববিষয়ে জাপানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

খেলা-ধুলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট

ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৪৮ (ম্যাক্‌কে ৭৪, মার্টিন ৫৫, ফ্যাভেল ৫১। হল ৫১ রাণে ৪ উইকেট ও ৭০ (৩ উইকেটে। হল ৩ রাণে ২ উইকেট পান)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১৮১ (কানহাই ৮৪, নার্স ৭০। ডেভিডসন ৫৩ রানে ৬ উইকেট) ও ২৩৩ (হাণ্ট ১১০, আলেকজাণ্ডার ৭২। ডেভিডসন ৫১ রানে ২, মার্টিন ৫৬ রানে ৩, বেনো ৪৯ রান ২ উইকেট পান।

মেলবোর্ণে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত ক'রে ১ম টেষ্ট খেলাটি ড্র যাওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে। পাঁচ দিনের খেলা চতুর্থ দিনেই সমাপ্ত হয়। খেলার ৩য় দিনের শেষে খেলার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়া অতি সহজেই জয়ী হবে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়াকে শেষ পর্য্যন্ত জয় লাভ করতে বেশ লড়তে হয়েছিল।

৩০শে ডিসেম্বর খেলা আরম্ভ হয়। টসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে। প্রথম দিনেই খেলা ভাঙ্গার কয়েক মিনিট আগে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৪৮ রানে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পেস বোলার, ওয়েসলি হল ৫১ রানে ৪টে উইকেট পান। হল অষ্ট্রেলিয়ার 'কালা-পাহাড়' হয়ে দাঁড়ান। দলের ২৫১ রানে ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে ম্যাক্‌কে এবং নবাগত জনি মার্টিন জুটি বেঁধে ৭৪ রান তুলে দেন; তাঁদের খেলাতেই অষ্ট্রেলিয়ার রান সংখ্যা অনেকটা ভদ্রস্থ হ'ল। খেলা ভাঙ্গতে পাঁচ মিনিট থাকতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এক উইকেট হারিয়ে মাত্র ১ রান করে।

৩১শে ডিসেম্বর খেলার ২য় দিনে বৃষ্টির দরুণ লাঞ্চের পর আর খেলা হয়নি। ২ উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১০৮ রান দাঁড়ায়। উইকেটে নট আউট থাকেন কানহাই (৭০) এবং নার্স (৩৫)। ২রা জানুয়ারী, খেলার ৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ১৮১ রানে শেষ হ'লে তারা 'ফলো-অন' ক'রে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে তাদের ৫টা উইকেট পড়ে ১২৯ রান দাঁড়ায়। এই দিন ২০২ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১৩ টা উইকেট পড়ে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিদের অবস্থা খুবই শোচনীয় দাঁড়ায়—অর্দ্ধেক উইকেট পড়ে গেছে, ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে ছাড়ান পেতে তখনও ৩৮ রান দরকার। উইকেটে আছেন হাণ্ট (৭৪) এবং আলেকজাণ্ডার (১৯)।

৩রা জানুয়ারী খেলার ৪র্থ দিনে পূর্ব্বদিনের অপরাজেয় খেলোয়াড়দ্বয় হাণ্ট এবং আলেকজাণ্ডার দলের রান অনেকটা বাড়ালেন। তাঁরা ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৮৭ রান তুলে দেন। বাস্তবিক পক্ষে হাণ্টের আউট হওয়ার পরই দলের শেষ আশা-ভরসা মনে থেকে দূর হয়ে গেল। আলেকজাণ্ডাকে সাহায্য করতে কেউ রইলো না। আলেকজাণ্ডার সব শেষে আউট হন।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৬৭ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিটের খেলায় ৩টে উইকেট ৭০ রান তুলে হারিয়ে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের গোড়ার দিকের খেলায় দারুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দলের ২৭ রানে ১ম ও ২য় এবং ৩০ রানে ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ওয়েসলী হল ৩২ রানে ২ টো উইকেট পান। হল এক ওভারে তিনটে বাম্পার বল ছাড়েন।

খেলার এই অবস্থায় ১৯৫৫-৫৬ সালের ঘটনার ভয়াবহ দৃশ্য দর্শক সাধারণের চোখে ভেসে ওঠে। এই মেলবোর্ণ মাঠেই ইংলণ্ডের টাইসন ভয়াবহ বহু রূপ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার ৭জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র ২৭ রানে। ২৭ সংখ্যাটা অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে একটা আতঙ্কের কারণ। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে দলের সেই ২৭ রানেই ২টো উইকেট পড়ে যায়। যাক্, এই অশুভ ২৭ রানের আতঙ্ক থেকে অষ্ট্রেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাদের সমর্থকদের রক্ষা করেছেন খেলায় জয়ী হয়ে।

মেলবোর্ণের দর্শকসাধারণ বর্ণবৈষম্যের স্পর্শ কাতর থেকে যে মুক্ত তারই একটি দৃষ্টান্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের খেলায় পাওয়া গেছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক বেনোর একটা বল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সলোমন পিছিয়ে খেলতে গেলে তাঁর মাথার টুপিটা অতর্কিতে উইকেটের উপর পড়ে বেল ফেলে দেয়। বেনো 'হিট উইকেট'-এর জন্য আম্পায়ারের কাছে আবেদন জানান। আম্পায়ার আবেদন মঞ্জুর করেন। বেনোর আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে মেলবোর্ণের ৬৫,৩৭২ হাজার দর্শক বেনোকে অবজ্ঞাসূচক 'বু' শব্দ দ্বারা লাঞ্ছিত করেন। এই খানেই শেষ হয় না। বেনো যতবারই বল দিতে গেছেন এবং যতবার মাঠে বল ধরতে গেছেন, দর্শক সাধারণ তত বারই তাঁকে অবজ্ঞাসূচক শব্দ দ্বারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বেনোর বলে যখনই রান উঠেছে তখনই দর্শকসাধারণ আনন্দে হাততালি দিয়ে ব্যাটস-ম্যানকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, এ রকমের বিক্ষোভ প্রদর্শন মেলবোর্ণ মাঠে এর আগে কখনও হয় নি।

ডেভিস কাপ ঃ

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় ইটালীকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দ্বিতীয় বার ডেভিস কাপ জয়ী

হ'ল। উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়লাভ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই বারই নতুন নয়। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ১৭ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে এবং এর মধ্যে উপর্যুপরি জয়লাভ করেছে ৪ বার (১৯৫০-৫৩) এবং ৩ বার (১৯৫৫-৫৭)। ১৯০০ সালে ডেভিস কাপের খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। যুদ্ধের দরুণ ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৮ এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত মোট ১০ বছর ডেভিস কাপের খেলা হয় নি।

এ পর্য্যন্ত মাত্র চারটি দেশ ডেভিস কাপ পেয়েছে—আমেরিকা ১৯ বার (একবার ওয়াকওভার), অষ্ট্রেলিয়া ১৭ বার (একবার ওয়কওভার এবং ৭ বার নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে একত্র হয়ে 'অষ্ট্রেলেশিয়া নামে), বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই একবার ১৯২১ সালে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার গৌরব লাভ করেছে। এ ছাড়া জাপান দু বার (১৯২৬ এবং ১৯২৭) ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলে ফ্রান্সের কাছে হেরেছিল।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে (১৯৪০-৪৫ পর্য্যন্ত খেলা বন্ধ) অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা মাত্র এই দুটি দেশই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে আসছিল। ১৯৬০ সালের প্রতিযোগিতায় তার ব্যতিক্রম হ'ল। ইণ্টার-জোন ফাইনালে ইটালী ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে মিলিত হয়। ডেভিস কাপের পাঁচটি খেলার (৪টি সিঙ্গলস এবং একটি ডাবলস) মধ্যে প্রথম দিনের ২টি সিঙ্গলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়। ২য় দিনের ডাবলস খেলায় অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হ'লে ৩-০ খেলায় ডেভিস কাপ পেয়ে যায়। ৩য় দিনের বাকি দুটি সিঙ্গলস খেলার ফলাফল অষ্ট্রেলিয়া এবং ইটালীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। ফলে অষ্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় জয়ী হয়।

ভারত সফরে রাশিয়ান ভলিবল দল ঃ

বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে তিনটি টেষ্ট খেলাতেই জয়লাভ করেছে। দিল্লীর ১ম টেষ্টে রাশিয়া ১৭-১৫, ১৬-১৪, ১৬-১৪ পয়েণ্টে জয়ী হয়।

এলাহাবাদের ২য় টেষ্ট খেলায় রাশিয়া ১৫-৫, ১৫-৩, ১৫-৯পয়েণ্টে জয়ী হয়। ক'লকাতার ৩য় টেষ্ট খেলায় রাশিয়া ১৫-৭, ৬-১৫, ১৫-৪, ১৬-১৮, ১৫-১২ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

এশিয়ান টেবল টেনিস ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ৫ম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জাপান প্রতিটি বিভাগে জয়লাভ করেছে। জাপান পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে জাপানের প্রতিনিধিরাই জয়লাভ করেছে। পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে জাপানের সঙ্গে কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বাকি পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনাল খেলাগুলি জাপানের প্রতিনিধিদের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এই থেকে প্রতিযোগিতায় জাপানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছে।

দু'বারের ভূতপূর্ব্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ইচিরো ওগীমুরা ৫ম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে জয়লাভ ক'রে 'ত্রিমুকুট' লাভের গৌরব লাভ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় ইতিহাসে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন। কোরিয়ার প্রতিনিধি লী দাল জোন প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরুষদের দলগত বিভাগে জোন জাপানের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ইচিরো ওগীমুরাকে পরাজিত করেছিলেন। প্রতিযোগিতার বাছাই খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় তিনি কোন স্থানই পাননি। জাপানের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হো সীনোকে পরাজিত ক'রে তিনি প্রথম বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। সেমি-ফাইনালে তিনি প্রতিযোগিতার ৭ম বাছাই খেলোয়াড় জাপানের মুরাকামীকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠেন।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র পুরুষদের ডাবলসের জুটী (থ্যাকার্সি এবং খোদাজী) সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিলেন ; বাকিরা বিভিন্ন বিভাগের কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলাতেই বিদায় নিয়েছিলেন।

সাহিত্য সংবাদ

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রবেশিকা ঃ দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যামিনীনাথ ডক্টর আর মিউজিক; সঙ্গীত শাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি তাঁহার গুরু সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও মিঞা খান সেনজীর দৌহিত্র বংশীয় ভারতপ্রসিদ্ধ বীণকার ওস্তাদ দবীর খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বহু ছাত্র ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করায় গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পাঠ্য তালিকা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়াছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা প্রণালীকে সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে বহু খেয়াল: রাগের গান, আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে দেড় শতের অধিক রাগের শাস্ত্রীয় বিবরণ লিখিত আছে।

বিভাষ, দুর্গা, পূরবী, পরজ, পূরিয়া ধানেশ্রী, বসন্ত, কাফি, ভীমপলশ্রী, রাগেশ্রী, পিলু, বাহার, আড়ানা, সিন্ধুড়া, বিন্দ্রাবণী সারং, তোড়ী, মুলতানী, ভৈরবী, মালকোষ, ভূপাল, আশাবরী, বিলাসখানি তোড়ী, সারক, পুরিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন রাগের ত্রিতাল প্রভৃতির উদাহরণ স্বরূপ পৃথক পৃথক স্বরলিপি দিয়া গ্রন্থ খানিকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী ও সরল করা হইয়াছে।

'বিভাষ' রাগের সঙ্গীতের পরিচয় দান কালে লেখক লিখিয়াছেন—বিভাষ উত্তরাঙ্গ প্রধান শান্ত প্রকৃতির মধুর রাগ। পঞ্চম ন্যাস স্বর ও গান্ধার পঞ্চম স্বরসম্পতি অতিশয় শ্রুতি মধুর।

পুস্তকের শেষে তিনি বহু রাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সারগম সম্বলিত তান দেখাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলোচনা কমিয়া যাইতেছে। হালকা গানের প্রাচুর্য্য হেতু সাধারণ সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার মন দেয় না। তাহা যেমন সময়-সাপেক্ষ তেমনই শ্রমসাধ্য। এই নূতন ধরণের গ্রন্থখানি সাধারণকে সে বিষয়ে আকৃষ্ট করিলে দেশ উপকৃত হইবে।

মূল্য ৪ টাকা ২৫ নয়া পয়সা। প্রাপ্তিস্থান—সঙ্গীত—শাস্ত্রপীঠ, ১০ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

•

গভীর গাড্ডা ঃ অখিল নিয়োগী

আলোচ্য গ্রন্থটী গ্রন্থকারের স্বরচিত ব্যঙ্গ কৌতুক রসাশ্রিত উনিশটি গল্পের সঙ্কলন। বড়দের পাঠোপযোগী গল্পগুলিতে নানাধরণের খণ্ড খণ্ড কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, বহুবর্ণচোরার মুখোসও খুলে পড়েছে অনেকগুলি রসাঢ্য চিত্রে।

গল্পগুলিতে গ্রন্থকারের রস:কৌতুক প্রসন্ন শিল্প সৃষ্টির বিশিষ্টত আমাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। এতগুলি হাসির গল্পের ভেতর 'বলের নাচের খেল' গল্পটীর পরিণতি বড় করুণ, বেশ কিছুক্ষণ মন উদাস হয়ে যায়, 'অঘটন' গল্পে রোমাঞ্চকর রাত্রির কাহিনী হাসি কান্নার হীরা পান্নায় মিশে আছে।

প্রথিত যশা শিল্পীদ্বয় ধীরেন বল ও রেবতীভূষণের চিত্রাঙ্কণ গ্রন্থখানির প্রসাধন সজ্জাকে আকর্ষনীয় করেছে।

[প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২ মূল্য—সাড়ে তিন টাকা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বন্দরের কাল ঃ বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

'বন্দরের কাল' লেখকের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপের জড়তা ও দীনতা তাঁর নেই। নায়ক সুব্রত ঘোষাল খিদিরপুর ডকে কাজ নিয়ে এল। চারবছর পরে কর্মত্যাগ করে চলে গেল। এই কয়বছরের, স্মৃতি তার আত্মভাষণের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে। কর্মসূত্রে ফুটে উঠেছে পোতাশ্রয়ের ব্যস্ত জীবনের স্পন্দিত ছবি, ব্যস্ত মানুষগুলির স্পন্দমান চরিত্র। আর সেই চরিত্রের সুতো ধরে ক্ষণে ক্ষণে ঘরোয়া পরিবেশে সরে আসা, অথবা মনের গভীরে ডুব দেওয়া।

একটি একটি করে ছবি সাজিয়ে সাজিয়ে লেখক একটি সমগ্র ছবি আঁকতে চেয়েছেন। সে প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হয়েছে। তবু মনে হয়। কয়েকটি যেন অত্যন্ত দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত; আরও একটু বড়ো হলে ভালো হত। ভাষার ক্ষেত্রেও মাঝেমাঝে চেষ্টাকৃত জটিলতার আবর্ত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু এ-ত্রুটি বিস্মরণীয়।

[প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশভবন। ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দাম—চার টাকা।]

গুরুদাস ভট্টাচার্য

নতুন ডাক ঃ নিখিল সুর।

খ্যাতনামা লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত এই শিশু সাহিত্য কিশোর মনকে নতুন তথ্যের দিকে আকর্ষণ করে। বনের জীব জন্তুদের জীবনের কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটা বৃহত্তর ভাবনার দিকে কিশোর মনকে চালিত করার এই প্রচেষ্টা অভিনব। লেখকের কৃতিত্ব এইখানে। বাংলাদেশে কিশোর মনের উপযোগী সাহিত্যের সংখ্যা অল্প। লেখক এ অভাব কিছু মিটিয়েছেন।

[প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা—৬, ডি, এম, লাইব্রেরী ও প্রতিমা বুক-ষ্টল, কলিকাতা ৬। দাম ১'৫০ নয়া পয়সা]

উপানন্দ

বাংলার বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার :

শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস

বেকার সমস্যা বাঙ্‌লার বুকের উপর জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসে আছে। সে-সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, জটিলতর হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলি তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। এ সময়ে তার প্রতিকারের কথা যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের কাছে এ পুস্তকখানির আদর হবে, আশা করা যায়।

[প্রকাশিকা—শ্রীমঞ্জুশ্রী দাস। ৯৯, এ চড়কডাঙ্গা রোড কলিকাতা—১০। মূল্য—১'৫০ নয়া পয়সা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীলকণ্ঠ" (৬ষ্ঠ সং)—৩'৫০

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক "মীরকাশিম মমতাময়ী হাসপাতাল-রঘু-ডাকাত" (৭ম সং)—৩্

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত "কুমার-সম্ভব" (৬ষ্ঠ সং)—৪'৫০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার-পতন" (২১শ সং)—২'৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "প্রতাপ-আদিত্য" (১৮শ সং)—২'৭৫

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঘরের মানুষ যারা"—২'৫০

সুষমা সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ঈশ্বরের মৃত্যু"—১'৫০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "তিমির রাত্রি"—৩্

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য কাব্যগ্রন্থ "কাজলা বিলেন সাপলা"—০'৭৫

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



॥ শীতের সন্ধ্যা ॥



ফাল্গুন—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে গীতার ইঙ্গিত

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের হিন্দুধর্মগ্রন্থে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা নাই। আমরা অধিকাংশ হিন্দু অদৃষ্টবাদী। আমাদের মোটামুটি ধারণা এই প্রকার—আমরা, যে কারণেই হউক, যখন যে কর্ম করি, তাহা সকলই আমাদের পুরুষকার এবং সেই সকল সৎ ও অসৎ কর্মের ফলরূপ সুখ ও দুঃখ আমাদিগকে ভুগিতেই হইবে। কারণ ভগবান কর্মফল ভোগের নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘন করিতে পারেননা। আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, এই জন্মের জন্য অদৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। সেই অদৃষ্ট অনুসারে, আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য এবং কতকগুলি অদৃষ্টানুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য। আবার সেই অদৃষ্টবশে আমরা এই জন্মে যে সকল কর্ম করিয়াছি, করিতেছি বা করিব, উহাই আমাদের এই জন্মের পুরুষকার এবং তাহাদের দ্বারা আমাদের পরজন্মের অদৃষ্ট সৃষ্টি হইবে। এইভাবে আমাদের পুরুষকার হইতে অদৃষ্ট, জন্ম-জন্মান্তর হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। সুতরাং আমাদের স্বাধীন পুরুষকার বলিয়া কিছুই নাই। সমস্তই পূর্ব হইতে, ঈশ্বর আমাদের জন্য অপরিবর্তনীয়ভাবে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাঁহার হাতের পুতুলনাচ-খেলার পুতুল মাত্র। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমাদের স্বাধীন পুরুষকার করিবার ক্ষমতা আছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আমাদের উপরোক্ত প্রকার ধারণার পক্ষে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে, অনেক শাস্ত্রীয় বাক্য ও যুক্তি আছে।

১। গীতায় আছে—

(১) যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি ॥১৮।৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেনকর্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥১৮।৬০
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১

—অর্থাৎ, হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তোমার প্রকৃতি তোমাকে এই যুদ্ধ করাইবেই। ঈশ্বর সর্বভূতের ও তোমার হৃদয়ে থাকিয়া, তাঁহার মায়াশক্তির সাহায্যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পুতুলনাচের পুতুলের ন্যায় ঘুরাইতেছেন।

(২) তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব জিত্বা শত্রূন
ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥
১১।৩৩

—অর্থাৎ, এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই, আমি তোমার শত্রুগণের বিনাশ স্থির করিয়া রাখিয়াছি; তাহারা তোমার হাতে মরিবেই ইহা অবধারিত আছে। এখন, তুমি তাহাদিগকে মারিয়া, তাহাদের মৃত্যুর নিমিত্ত কারণমাত্র হও।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুরুষকার সম্বন্ধে একবার একটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—একটী গরুকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া দাড়টী একটী খুঁটিতে বাঁধিয়া দিলে, গরুটি ঐ দড়ির সীমা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইবার ও ঘাস খাইবার অধিকার পায়, কিন্তু ঐ দড়ির সীমার বাহিরে সে যাইতে পারেনা। সেইরূপ, আমাদের পুরুষকার সীমাবদ্ধ, নিজ নিজ সীমার বাহিরে, আমাদের পুরুষকার ব্যবহারের কোন ক্ষমতা নাই।

৩। জ্যোতিষ শাস্ত্রও বাহ্যদৃষ্টিতে পুরুষকারের শক্তিহীনতার কতক পরিমাণে সমর্থন করে। একটি সন্তান জন্মাইল। একজন জ্যোতিষী আসিয়া, তাহার জন্ম সময় জানিয়া লইয়া তাহা হইতে তাহার রাশিচক্র প্রস্তুত করিলেন। অন্য একজন জ্যোতিষী আসিয়া ঐ সন্তানের হস্তরেখা পরীক্ষা দ্বারা তাহার করকোষ্ঠী প্রস্তুত করিলেন। যদি তাঁহারা পারদর্শী জ্যোতিষী হন তাহা হইলে—উভয়েই ঐ ভাবে গণনা করিয়া, সন্তানটীর ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত কর্ম ও সুখদুঃখের কথা বলিয়া দিতে পারেন।

এই সকল শাস্ত্রবাক্য, উপদেশ ও গণনা হইতে এই প্রকার ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ই নির্দ্ধারিত আছে, আমাদের কোনও স্বাধীন পুরুষকারের শক্তি নাই।

কিন্তু উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বাক্য প্রভৃতি একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে এবং শাস্ত্রীয় বাক্যের আক্ষরিক উক্তির পশ্চাতে তাহার প্রকৃত অর্থ জানিবার চেষ্টা করিলে, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে—

(১) অদৃষ্ট খুবই প্রবল বটে, কিন্তু উহা পুরুষকারের দ্বারা পরিবর্ত্তনীয়,

(২) কর্মফল খণ্ডন করা কঠিন বটে, কিন্তু উহা অখণ্ডনীয় নহে। যথোপযুক্ত পুরুষকারের দ্বারা কর্মফল খণ্ডন করা যায়।

(৩) স্বাধীন পুরুষকারের একটি প্রবল শক্তি আছে এবং আমরা প্রত্যেকেই সেই বিরাট শক্তির অধিকারী, এবং—

(৪) আমাদের সকল কর্মই পুরুষকার পদবাচ্য নহে। যে কর্মগুলি আমাদের প্রকৃতিতে করায়, সেগুলি পুরুষকার নহে। যে কর্মগুলি, আমাদের ভিতরের "পুরুষ", অর্থাৎ জীবাত্মা, প্রকৃতির শক্তিকে দমন করিয়া, কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, কিংবা কোন বাঞ্ছিত বিষয় লাভ করিবার জন্য সম্পন্ন করে বা করিবার চেষ্টা করে, কেবল সেই কর্মগুলিই প্রকৃতপক্ষে পুরুষকার। "পুরুষ" ঐ কর্মগুলি করে বলিয়া উহারা "পুরুষকার"।

পুরুষকারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ মতে, মানুষের সৃষ্টির উপাদানগুলি জানা আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষের ভিতর দুইটী মূল উপাদান আছে—একটীর নাম পুরুষ, অপরটীর নাম প্রকৃতি। পুরুষ বলিতে জীবাত্মা বুঝিতে হইবে। উহা ঈশ্বরের একটী স্বরূপ অংশ। তাঁহার

অব্যয়, উহা অপরিবর্তনীয়, অমর, সর্বশক্তিসম্পন্ন, চৈতন্য-পূর্ণ জীব। প্রকৃতি বলিতে বুঝিতে হইবে—মায়াশক্তিজড়িত সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ নামক তিনটি শক্তির বিভিন্ন পরিমাণে সংমিশ্রণ। জগতের যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, জন্তু ও মানুষে ঐ শক্তিগুলি উপাদান-কারণ। আমাদের দেহ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ঐ প্রকৃতিজাত শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত শক্তিস্বরূপা বলিয়া, আমাদের দেহ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াশক্তি আছে। তাহারা আমাদের জীবাত্মার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু আমাদের জীবাত্মার শক্তির চেষ্টা ব্যতীতও, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কর্ম করিতে পারে ও করিয়া থাকে। সেই সকল কর্ম-বিষয়ে আমাদের জীবাত্মা দ্রষ্টা মাত্র হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু, মায়ার অধীনতার জন্য, জীবাত্মা শুধু দ্রষ্টা নহে, প্রকৃতির কর্মের ফলস্বরূপ, সে সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হইতে পারে এবং হয়। এই বিষয়ে গীতা বলিয়াছে :—

কার্য্য কারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥১৩।২০

—অর্থাৎ, আমাদের প্রকৃতি-জাত, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতির শক্তিতে বলীয়ান থাকায়, তাহারা জীবাত্মার ক্রিয়া-শক্তির সাহায্য না লইয়াও স্বাধীনভাবে কর্ম-করিতে পারে এবং আমাদের জীবাত্মা, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় এবং মায়াশক্তির অধীন থাকায়, সেই সকল কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সর্বদা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিতে পারে। তাহারা তাহাদের নিজ নিজ অনুকূল বৃত্তি অনুসারে সেই সকল বস্তু ভোগ করিতে চেষ্টা করে। সেইভাবে প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে কর্ম করি, তাহা আমরা একপ্রকার যন্ত্রবৎ করিয়া থাকি; তাহাতে আমাদের জীবাত্মার সক্রিয় শক্তি ব্যবহার হয় না। ঐ প্রকার প্রকৃতি-প্রণোদিত যন্ত্রবৎকার্য্য "পুরুষকার" পদবাচ্য নহে। উপরোক্ত ১৮।৫৯-৬০ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিলেন যে, অর্জুন, তাহার প্রকৃতি শক্তির দ্বারা বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিবেই। সুতরাং সেই যন্ত্রচালিতভাবে যুদ্ধকার্য্যও পুরুষকার নহে। তিনি অর্জুনকে তাহার জীবাত্মার শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া নিষ্কাম কর্মরূপ পুরুষকার প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন।

উপরোক্ত ১৩।২০ শ্লোক হইতে এই ধারণা হইতে পারে যে, আমাদের জীবাত্মার কোন কর্মশক্তি নাই এবং কেবলমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্রষ্টা ও ফলভোক্তা হওয়াই জীবাত্মার ভাগ্য। কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। জীবাত্মার অসীম কর্মশক্তি আছে এবং সেই শক্তি আছে বলিয়াই ভগবান অর্জ্জুনকে, সেই শক্তির প্রয়োগ করিয়া,নিষ্কামভাবে ঐ যুদ্ধকর্ম করিতে, অর্থাৎ পুরুষকার ব্যবহার করিতে আহ্বান করিলেন। যদি অর্জ্জুন তাহার প্রকৃতির শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করা অপেক্ষা অন্য কোন উচ্চ আদর্শে কর্ম করিতে না পারিত, অর্থাৎ যদি তাহার জীবাত্মা প্রকৃতির শক্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুরুষকার ব্যবহার করিতে সক্ষম না হইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার উপদেশ দিতেন না. এবং দিলেও সে উপদেশ নিষ্ফল হইত। তিনি অন্যান্য মানবের ন্যায় অর্জ্জুনের ভিতর তাঁহার নিজের অংশস্বরূপ জীবাত্মা দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাহাকে যে মায়া শক্তির দ্বারা আবরিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন এবং কি ভাবে সেই দুস্তর মায়া অতিক্রম করা যায়, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

দৈবী হ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ ৭।১৪

অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্গত মায়াশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু একান্ত শরণাগত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করিলে মায়াশক্তির হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কি ভাবে শরণাগত হওয়া যায়, তাহা বহু শ্লোকে গীতায় বলা হইয়াছে।

একটি কথা মনে হইতে পারে, মানুষ অর্থাৎ জীবাত্মা কর্ম করিতে গেলে তাহার জন্য যন্ত্রের আবশ্যক। গীতায় তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্মকুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

অর্থাৎ, জীবাত্মা, দেহ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিবে। প্রকৃতির শক্তি ঐ দেহ-মন বুদ্ধির দ্বারা জীবাত্মাকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য কর্মে প্রণোদিত করিবে। জীবাত্মার কর্ত্তব্য, তাহার শক্তির দ্বারা সেই দেহ মন প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া, প্রকৃতির মায়া প্রভৃতি শক্তির হাত হইতে মুক্ত হওয়া। জীবাত্মার এই কর্মই প্রধান পুরুষকার। এই মায়ামুক্তির চেষ্টাই হিন্দু ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, গীতার মতে মানুষের কর্মের দুটী উৎস আছে, একটি তাহার জীবাত্মা, অপরটি তাহার প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা গঠিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সমষ্টি। আরও দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মার কর্মশক্তি আছে এবং সে দেহ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা যে কর্ম করে, তাহা তাহার প্রকৃতি-প্রণোদিত কর্ম হইতে পৃথক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুরুষকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তবে আমরা মায়া ও ত্রিগুণের অধীন জীব বলিয়া আমাদের পুরুষকারকে তিনি সীমাবদ্ধ বলিয়াছেন। ইহা গীতার মতের বিরুদ্ধ নহে।

জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যৎ কর্ম ও ভাগ্য গণনা করিয়া দেন ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, উপযুক্ত ক্রিয়ার দ্বারা (অর্থাৎ পুরুষকারের দ্বারা), অদৃষ্ট খণ্ডিত হইতে পারে।

ভগবান কর্মফল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু যিনি নিয়ম সৃষ্টি করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই নিয়ম ভাঙ্গিতেও পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কর্মফল মুছিয়াও দিতে পারেন। যদি তিনি তাহা না পারিতেন বা না করিতেন, তাহা হইলে জগাই মাধাই উদ্ধার হইল কেমন করিয়া, রত্নাকর দস্যু বাল্মিকী হইলেন কেমন করিয়া এবং এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে একই জবাফুল গাছে একটী রাঙ্গাজবা ও আর একটি সাদাজবা ফুটিল কেমন করিয়া? যদি তিনি কর্মফল মুছিয়া দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অগণ্য মানব তাঁহার নিকট সহস্র সহস্র বৎসর প্রার্থনা করিত না এবং তন্মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি প্রার্থনার ফলও পাইত না। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অসীম ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির সীমা খুঁজিতে যাওয়া অত্যন্ত ভুল।

সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবাত্মার নিজস্ব ক্রিয়াই পুরুষকার এবং আমাদের দেহ, মন প্রভৃতির প্রকৃতি প্রণোদিত ক্রিয়া পুরুষকার নহে। পুরুষকার দুইপ্রকার— পার্থিব বিষয়ক ও অপার্থিব বিষয়ক। পার্থিব বিষয়ক পুরুষকারের দ্বারা, মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে ও করিতেছে। অপার্থিব বিষয়ক পুরুষকারের দ্বারা মানুষ মনকে সংযত করিয়া, ত্রিগুণের ও মায়ার অধীনতা হইতে মুক্ত হয় এবং ভগবানের কৃপায়, তাঁহাকে লাভ করে।

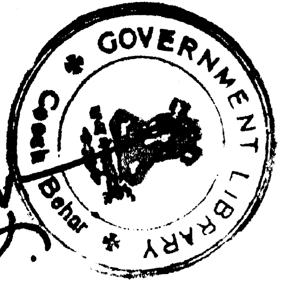
একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কি জীবাত্মার কর্মে, বা কি প্রকৃতির কর্মে ঈশ্বরের ইচ্ছা সার্ব্বভৌম। তাঁহার কৃপা না হইলে, কোন কর্মে সফলতা লাভ হয় না! পুরুষকারের সফলতার জন্যও তাঁহার কৃপা আবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্য পুরুষকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে, মায়া ও ত্রিগুণের অধীনতা হইতে আংশিক বা পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পুরুষকার অবলম্বন করা এবং তদ্বারা অদৃষ্টকে আংশিক বা পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়া, কর্মফল আংশিক বা পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলিয়া। একদিকে সাংসারিক সফলতা ও শান্তি লাভের চেষ্টা করা এবং অন্যদিকে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করা এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা সর্বদা প্রার্থনা করা। আমরা অনেকেই বহু সহস্র বৎসর অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, পুরুষকারকে বিসর্জন দিয়া, আলস্যের আশ্রয় লইয়া আসিতেছি। এক্ষণে ঐ ভাব সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের গীতায় প্রদত্ত উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া, দৃঢ় চিত্তে পুরুষকারের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা আমরা পৃথিবীর অন্যান্য পুরুষকার-অবলম্বনকারী জাতিসমূহের পশ্চাতে পড়িয়া রহিব।



ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু



(পূর্বানুবৃত্তি)

পশ্চিমবঙ্গ লোক-শিল্প সম্মেলনে যাওয়া স্থির করেও অভয়ের মনটা আড়ষ্ট হয়েই রইল। আসলে, গণেশ আপত্তি করেছে, তৎক্ষণাৎ সে বিপরীত করণীয়টাই স্থির করেছে। কারণ গণেশকে সে আর বিশ্বাস করে না। গণেশ তাকে অকারণ বিদ্রূপ করেছে। হয় তো জেলে তার ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু ঘটেছে। গণেশ তাকে ক্ষমা করতে পারেনি। নিষ্ঠুর উপহাস করেছে তার সারল্যকে। কিছু বোঝাবার চেয়ে, সমালোচনা করেছে বেশী। সেটা যে গণেশের বোঝাবার অক্ষমতা, এটা অনুভব করেছে অভয়। কেন যেন বারে বারে তার মনে হয়েছে, গণেশের ভিতরে কোথায় একটি দুর্বল নীচ মনের মানুষ আছে। কিন্তু চুল চিরে তার ব্যাখ্যা করতে পারে না অভয়। তাই মুখ ফুটে কিছু বলবার অধিকার সে কখনোই অর্জন করতে পারে না। অথচ গণেশকে সে শ্রদ্ধা করেছে। তার অনুগত থাকতে চেয়েছে সব সময়। কারণ গণেশ তার নেতা। সে বিদ্বান, বুদ্ধিমান। কিন্তু গণেশ যেন অভয়কে তার সমকক্ষ ভেবেছে। তাই ভালোবাসা থেকে অভয় বঞ্চিত।

বন্ধুত্ব যেখানে সহযোদ্ধার বন্ধন, সেখানে কি ভালো-বাসার দাম নেই? কিন্তু ভালোবাসা যেখানে নেই, অভয়ের বিচারে, সেখানে বন্ধুত্ব অচল। শামুক-বন্দী মনের সঙ্গে জীবনের বাইরের কারবার চলে। ভিতরের লেন দেন অসম্ভব।

গণেশের কথাগুলি যেন লেবার-অফিসারের মত। কোম্পানীর লাভ থাক না থাক, আইন নেই যে সে একজন লোককে কোনো একটা নিজের অনিচ্ছার বিষয়ে আটক রাখতে পারে। তাই সম্মেলনে যাবার অনুমতি দিয়েছে। উপায় থাকলে কখনোই দিত না।

প্রাণ-খোলা কথা বলেনি গণেশ। রাগ চেপে বলেছে, সম্মেলনটা শুধু কলকাতার বড়লোকের খেয়াল। কিন্তু অভয় কলকাতার কয়েকজন বড়লোকের খেয়াল মেটাতে যেতে চায় না। মন-স্থির করেও তাই থমকে গেল সে। কী করবে ভেবে পেল না। অনাথ খুড়োকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। গণেশ যা বলেছে, সে তাই বলবে।

সংবাদ শুনে ইউনিয়নের মিস্তিরি বন্ধুরা সকলেই খুশি। বলল, 'আমাদের মান রাখা চাই অভয়।' কিন্তু দাবীর চেয়ে বিশ্বাস তাদের বেশী। তারা নিঃসন্দেহ, অভয় ফিরবে নতুন দিগ্বিজয় করে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা তবু একবার অনাথকে না বলে পারল না। জানে অনাথ নিজে যেচে বলবে না কিছু। যদিও সে খবর পেয়েছে নিশ্চয়। সুরীন তো ইতিমধ্যে কোথাও জানাতে বাকী রাখেনি। তবে অভয়ের নিজের থেকে একবার এমনিতেও বলা উচিত।

জায়গার অভাব বলে ইউনিয়ন অফিস একাধারে শ্রমিকদের ক্লাব ও প্রাত্যহিক আলোচনার আসর। এক-দিকে যখন দরখাস্ত লেখা হতে থাকে, অন্যদিকে তখন গানের আসরও বসে যায়। সম্প্রত আর একজন জুটেছে। এক বিহারী মুসলমান তাঁতী। সেও কবিয়াল। সে একা-একাই মুসেয়ারা-র আসর বসায়। অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে তার আদর বেশী। বিশেষ করে উর্দু জানা লোকের কাছে সে রীতিমত সম্মানিত। কিন্তু তাকে প্রথম শুঁড়িখানা থেকে আবিষ্কার করেছিল অনাথ খুড়ো।

নাম তার ইদ্রিস। শুঁড়িখানাই ছিল ইদ্রিসের গানের আসর। তখন সে ছিল অবিশ্বাসী, বিবাগী মানুষ।

অনাথের কাছেই শুনেছে অভয়, ইদ্রিস বিশ্বাস করত তিনটি জিনিষ। ঘৃণ্য একটা তাঁতীর নোকরি—কারণ, পেটটা চালাতেই হবে। আর বিলাসপুরি কামিন—যেমন তেমন মেয়ে নয় তারা। দেহের এবং হাসির স্পর্দ্ধায় যারা চটকল বাজারের অনুরাগের রক্ত কেনা-বেচা করে। যারা নেজেরা মাতে এবং মাতায়। মধ্য-ভারতের মাটি থেকে ওপড়ানো জীবনের শিকড়ের সঙ্গে যাদের মাটির তৃষ্ণা হয়েছে মরীচিকা। সারাটি দেহ নিয়ে প্রবাসের প্রত্যহ বেঁচে থাকা ছাড়া সব বিশ্বাস যাদের ছিন্ন হয়েছে। কাজ, ভোগ এবং মৃত্যুর সারল্যে যারা কুন্তির মত সূর্য-উপাসনা ব্যতীতই, এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে চলে যায় পরিচয়হীন সন্তান ফেলে। মায়ের নয়, শুধুমাত্র জীবনের অনুমতিতেই যারা পঞ্চ-স্বামীর সহবাসে লিপ্ত। ইদ্রিস যে সেই মেয়েদের গোলাম, এটা তার তখনকার গানেই প্রচারিত। আর দারু। সরাব্! যার আর এক নাম হারাম্। ঘুরে ফিরে সেই কাজ, ভোগ এবং মৃত্যু। এর মধ্যে অবিশ্বাস্য যেটা, সেটা ইদ্রিসের সৃষ্টির ক্ষমতা। ওটা স্বতোৎসারিত অপ্রতিরোধ্য।

ঝাকড়া-চুলো রোগা লম্বা হাড়-চওড়া এই ইদ্রিসকে একদিন অনাথ মাতাল অবস্থায় নর্দমা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তার ডেরায়। সেই সুরু। জাহান্নাম ছাড়া যার বুলি ছিল না, দোজাখ্ বিনা যে গন্তব্য চিনত না, এখন সে বলে, 'অয় দোস্ত! চল্ বেহেস্ত, লড় লে বেহেস্ত্।' স্বর্গ আছে এবং সেটা লড়ে নেবার জায়গা, এটা এখন তার বিশ্বাস। আর সে স্বর্গ যে সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠা, লড়াই যে একটা চেতনা এবং সাহসের সাধনা, এটাই তার বচন।

এখানে ইদ্রিসের সংসার নেই। দেশে আছে বাপ মা ভাই বোন। এখন সে দেশে কিছু টাকা পাঠায়। যদিও হারাম সরাবটা পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি। এখনো মাঝে মাঝে বিলাসপুরি কামিনের পিছু পিছু উধাও হয়ে যায়। কিন্তু পরিবর্তন লক্ষণীয়। সরাব খাবার সময় পাওয়া দায়, কারণ একলা হবার অবসর নেই। শূন্যতার আক্রমণ চেপে ধরতে পারে না। সোনিয়া নামে যে বিলাসপুরী মেয়েটি কিছুদিন আগে নিজে থেকে এসে ইউনিয়নের মেম্বার হয়েছে, ইদ্রিসের উধাও হবার দরজাগুলি সব আড়া পড়েছে তার হাতে।

তবে ইউনিয়নের ইজ্জৎ আগে। দশ রকম কথা বলে ইউনিয়নের দুর্নাম দেবার লোকের অভাব নেই। অনাথের ভয় ছিল তাই সোনিয়াকে নিয়ে। সোনিয়ার কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে ইদ্রিসের পিছনে পিছনে সে ইউনিয়নে এসে উঠেছে। সে যদি রোজ একলা আসতে আরম্ভ করত, তা হলে রক্ষে ছিল না। রটে যেত অনাথদের ইউনিয়নটা অওরৎ নিয়ে ফুর্তি করবার আসর হয়ে উঠেছে। তাই নির্দেশ ছিল, মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া সোনিয়া একলা কোনদিন আসবে না। এমন কি, ইদ্রিসকে ডাকতেও নয়।

সোনিয়া সে নির্দেশ মেনে নিয়েছে। তাতে একটি বিষয় প্রমাণ হতে চলেছে। কাজ ভোগ মৃত্যুর উর্দ্ধে নতুন বিশ্বাসের আশ্বাস। ইদ্রিসের জীবনে শৃঙ্খলা এবং জীবন-যাপনের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের আবির্ভাব।

এই ইদ্রিসের সঙ্গে অভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। কিন্তু একটু রেষারেষিও আছে। কিংবা সেটা রেষারেষি নয়, সৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বোঝা যায়, তাদের ভাষা যদি এক হত, তবে কবির লড়াই রোজ এখানেই জমত।

এই জন্যেই অনাথ খুড়ো বড়। সে ইদ্রিসের আবিষ্কর্তা। এই জন্যেই অনাথ নেতা। গণেশের সঙ্গে এইখানে অনাথের তফাৎ। এই অনাথ খুড়োকে কখনো ছোট ভাবতে পারবে না অভয়। তার বুকের মধ্যে মোচড়ায়, যখন সে দেখে, অনাথ তার সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলছে। রাগে তার হাত-পা শক্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, দু' হাত দিয়ে অনাথের সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে নাড়িয়ে, একটা নোংরা মন্ত্রের আচ্ছন্নতা থেকে আসল মানুষটিকে বার করে নেয়। অনাথ বলুক, কী অপরাধ অভয়ের। যেন কী এক অকথিত গোপন অপরাধের বেড়াজালে অভয়কে সে বন্দী করে রেখেছে। অথচ অনাথ তার কোনো কারণ দেখাতে পারে না। ব্যাখ্যা করতে পারে না। পরের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করছে। সেটা আরো অসহনীয়। গণেশের কেতাবি বিদ্যার কাছে দুর্বোধ্য বুদ্ধি ধার করে আজ অভয়কে বিচার করছে সে। অভয় অপরাধ করলে যার চুলের মুঠি ধরে শাসন করবার অধিকার রয়েছে, সে

ভালোবাসাটুকু কোথায় গেল? কেন যাবে, কী অপরাধে?

আজও ইদ্রিসের গানের আসর বসেছে। প্রকাণ্ড ঘরটায় একটি মাত্র হ্যারিকেন। নড়বড়ে টেবিলের ওপর, ফাটা চিমনী, কাঁপা শিখা, কালি ছড়ানো হ্যারিকেনটা এর ওর ধাক্কায় অনবরতই দোলে। সুদীর্ঘ গুহার মত জানালা-হীন ঘরটার কাঁচা মেঝেয় চাটাই পাতা। বিড়ির ধোঁয়ায়, খৈনির ঝাঁজে বাতাস ভারী আর ঝাঁজালো।

লেখাপড়া-জানা বাঙালি কর্মী, নিরীহ রোগা মানুষ সকলের 'বিজয়দাদার' উসকো-খুসকো মাথাটি প্রায় হ্যারিকেনের সামনেই ঝুঁকে থাকে। সন্ধ্যে থেকে তার দরখাস্ত লেখা কাজ। সম্মিলিত এবং ব্যক্তির, যার যত রকম অভাব অভিযোগ তাকে দিয়ে ইংরেজিতে লিখিয়ে নেওয়া হয়।

তার পাশেই বসেছিল অনাথ। অভয়কে দেখে কয়েক-জন হৈ হৈ করে উঠল। ইদ্রিসও ডাকল, গান গাইবার জন্যে।

কিন্তু অভয় গিয়ে দাঁড়াল অনাথের কাছে। অনাথ তাকিয়েছিল অভয়ের দিকেই। চোখে চোখ পড়তে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অভয় বলল, খুড়ো একটা কথা ছিল।

অনাথ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, বল।

অভয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত সে কথা বলতে পারল না। ভাবল, বলবে কি না। তারপরে বলল, একটু বাইরে চল, কথা বলি।

যেন অনিচ্ছায় উঠল অনাথ। অভয়ের সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। অভয় সবে উচ্চারণ করেছে, কলকাতায়—

অনাথ বলে উঠল, শুনেছি, মস্ত নাম-করা জায়গায় তোমার ডাক পড়েছে।

রাগে এবং দুঃখে অভয়ের ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। সে তাকাল অনাথের চোখে। অনাথ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। যেন বিব্রত হয়ে উঠল সে। অস্বস্তির ছায়া তার চোখে। সবটাই যেন জোর করে করছে সে।

অভয় বলল, যাব?

অনাথ বলল, না যাবার কী আছে। তোমার আরও নাম-ডাক হবে।

—সেটা কি দোষের?

—দোষ কেন হবে।

—তবে?

—তবে কী?

—তুমি আমার সঙ্গে এ রকম করছ কেন? এই মন ছাড়া-ছাড়া কথা, গুম্ খেয়ে যাওয়া। আমি কী করেছি?

সামনা সামনি, এমন স্পষ্ট করে আর কোনোদিন এ কথা জিজ্ঞেস করেনি। অস্বস্তিতে অনাথ হেসে ফেলল। হাসিটা তেমনি করুণ, সেই পুরণো কাছের মানুষটার মত। বলল, কী আবার করবে।

অভয় বলল, তোমার ভাব দেখে মনে হয় যেন কোনো দোষ করেছি।

অনাথ আবার গম্ভীর হল। বলল, কই, দোষের কথা কিছু বলিনি তো। আর দোষ যদি কিছু হয়, তবে তা চিরদিন ঢাকা থাকবে না। জানাজানি হবেই।

অভয়ের মস্তিষ্কের উত্তাপ বাড়ল। বলল, তা' হলে অপরাধ কিছু করেছি বল?

—বললাম তো, অপরাধ করলে একদিন সবাই বলবে।

—কিন্তু, তোমার ভাব দেখে তো মনে হয়, যেন আমি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি। তোমাকে বলতে হবে কী হয়েছে।

অনাথ তাকাল একবার অভয়ের দিকে। অভয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। চোখে তার রক্ত দেখা দিয়েছে।

অনাথের মত মানুষের এ ক্ষেত্রে রেগে ওঠাই উচিত ছিল। কিন্তু সে যেন কেমন নির্জীবের মত বলল, আজ থাক্, যদি কিছু বলবার হয়, আর একদিন বলব।

অভয় বলে উঠল, তোমার ভাব দেখে আমার বেন্না করছে। গালে হাত দিয়ে বসে বসে মিছে কথা সাজাবে ভাবছ। তা সাজিও।

—কী বললি?

অনাথ মাথা তুলল। কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ।

অভয় তার শেষ সীমায় পৌঁচেছে। ঘৃণায় এবং বিদ্রূপে সে দপদপিয়ে উঠল। বলল, তোমার মত বাঁকা কথা তো

বলিনি যে বুঝতে পারছ না। ন্যাকা নাকি? বলছি, তুমি ভয় পাচ্ছ সত্যি কথা বলতে।

—ভয় পাচ্ছি ?

—হাঁা, তাই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়। আমি দোকান করেছি, আখের গুছিয়ে নিচ্ছি, গান করে আর জেল খাটার দৌলতে, এ কথা তুমি বল নি লোকের কাছে ?

অনাথ যেন সহসা কথা খুঁজে পেল না। কেমন একটা সঙ্কোচ তাকে নিভিয়ে দিতে লাগল। সে বলল, আমি বলিনি।

—তবে গণেশবাবু বলেছে ?

—জানি না। তবে লোকেরা বলে।

—কোন্ লোকেরা ?

—তোমারই বন্ধু-বান্ধব।

বোধহয় অনাথ বলেই, অভয়ের উত্তেজনা হাতে পায়ে রুদ্র হয়ে উঠছে না। সে চাপা গলায় গর্জে উঠল, বন্ধু নয়, যারা বলে, তাদের আমি শালা বলি। বুঝলে ?

অনাথ তৎক্ষণে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে।

অভয় আবার বলে উঠল, যারা বলে, মানুষের রক্ত তাদের গায়ে নেই। তাদের বলি আমি—শোরের বাচ্ছা!

অনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কাকে গাল দিচ্ছিস ?

অভয় এগিয়ে বলল, সেই কুত্তাদের, যারা মিছে দুর্নাম দেয়।

গলার স্বর আর নীচু রইল না। ইতিমধ্যেই কয়েক-জন বেরিয়ে এসে ভিড় করেছে। কৌতূহলীরা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সকলেই।

কিন্তু অভয় আর দাঁড়াল না। সে সন্ধ্যাবেলার পথের ভিড়ে মিশিয়ে দিল নিজেকে। লোকের কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইল সে। রাগের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যায় বোধটা তাকে রেহাই দিচ্ছিল না। যতই অসহায় রাগ বাড়ছিল, ততই নিজের অন্যায় বোধের ধিক্কার তীব্র হয়ে উঠছিল। তাই না পালিয়ে তার উপায় ছিল না। সে বুঝতে পারছিল, গালাগালগুলি সে অনাথ-খুড়োকেই দিয়েছে। তার অতিপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়, পরম-বন্ধুকে।

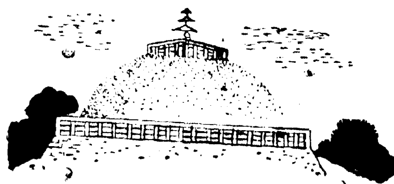
কিন্তু সেই বন্ধুর এ কেমন নিষ্ঠুরতা যে, সে তার নালিশ সরাসরি আনবে না। একদিকে সে গম্ভীর নির্বিকার। বিচারকের সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসু চোখে অভিযুক্ত করবে। অন্যদিকে অসহায় নির্জীব সঙ্কুচিত বিব্রত। কেন? এ ক্ষেত্রে, সময়ের প্রতীক্ষা ছাড়া বুঝি কোনো উপায় নেই। সময়ের ওষুধ ছাড়া এ রোগের আরোগ্য নেই। হয় তো অনাথের কথাই সত্যি, অপরাধ করলে একদিন সবাই বলবে। কিন্তু মন মানে না। অভয়ের নিজস্ব একটি চরিত্র, একটি মন আছে। তার পক্ষে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না আর।

নির্জন গঙ্গার ধারে এসে, মুহূর্ত দাঁড়াল অভয়। তরল আলকাতরার মত চকচকে অন্ধকার গঙ্গা। কিন্তু ভাল লাগল না। আবার ফিরে গেল। নির্জনতা তার ভাল লাগছে না। সহ্য হচ্ছে না। সে বন্ধু চায়। সঙ্গ চায়। কাউকে সে বলতে চায় তার কথা। তার গান শোনবার এত লোক আছে সংসারে। কিন্তু তার ভিতরের বয়সহীন মানুষটির হাসি-কান্না-যন্ত্রণার কথা শোনবার একটি লোক নেই। সেই কথাগুলি দিয়ে হয় তো গান হয়। কিন্তু সে কথাগুলি আসলে গানের চেয়ে বড়। কারণ, গানের চেয়ে জীবন বড়।

আর অভয়ের যেটা জীবন চর্চা, সেখানেই শেল বিঁধিয়ে রেখেছে অনাথ। তার সহজ বিকাশের মাঝে একটা অদৃশ্য অজানিত খোঁচার মত খটকা হেনে রেখেছে তার সকল মান্যের, সব গণ্যের যে প্রধান, সেই অনাথ।

আবার সে রাস্তায়, লোকের ভিড়ে ফিরে এল।

ক্রমশঃ



ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা

শ্রীপ্রফুল্ল বসু

সমস্যা-জড়িত ভারতের জনসংখ্যাও একটি সমস্যা। ইউরোপীয় দেশগুলিতে জনসংখ্যা বর্ধিত হওয়া দেশের সম্পদ উন্নত হওয়া, কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার বিপরীত। ভারতের জনসংখ্যা অনুমান ৪৩০.৮ মিলিয়ন। আগামী ১লা জুন ১৯৬১ সালে এবং ১লা জুন ১৯৬৬ সালে অনুমান করা যায় উহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪৫০.৮ এবং ৪৭৯.৬ হইবে। ভারতে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বাড়িতেছে, অবশ্য মৃত্যুহার কম হওয়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষণ। ভারতে ৯৪৭ টি মহিলা প্রতি ১০০০ জন পুরুষ। ভারতের বিবাহের অনুপাত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানে শতকরা ৯৪ জন স্ত্রীলোক বিবাহিতা এবং অন্যান্য দেশের হিসাব নিচে দেওয়া হইল।

যুক্তরাজ্য	শতকরা	৬৩.৮	জন	মহিলা	বিবাহিতা
যুক্তরাষ্ট্র	"	৭৪.২	"	"	"
পশ্চিম জার্মানী	"	৫১.০	"	"	"
ফ্রান্স	"	৬৭.০	"	"	"

খাদ্য : পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারতের জনস্বাস্থ্য অবহেলিত। দারিদ্র্য ও ভেজালমিশ্রিত খাদ্য ভারতের জনস্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানিতেছে। ইহা ছাড়া নানারূপ সমাজ সংঘাত আমাদের দেশে লাগিয়াই আছে। ১৯৫০ সালে ভারতে খাদ্যের উৎপাদন মাত্র ৫৮ মিলিয়ন টন হইয়াছিল, সেজন্য ভারতসরকারকে জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য ২.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য ভারতের প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছিল। আশা করা যায় যদি ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ১১০ মিলিয়ন টন হয় তাহা হইলে হয়ত ভারতকে আর বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হইবে না।

জীবনধারণের জন্য খাদ্যের মান ক্যালারীর দ্বারা হিসাব করা হয়। ভারতে বিভিন্ন বয়সের তারতম্যে গড়ে কতটা করিয়া ক্যালারী প্রয়োজন তাহা নিচে দেওয়া হইল।

	ক্যালারীর পরিমাণ
১৪ বৎসরের উপর পুরুষ ও মহিলার জন্য	২৬০০ এবং ২১০০
১২ হইতে ১৩ বৎসর শিশুর জন্য	২০০০
১০ হইতে ১১ বৎসর শিশুর জন্য	১৮০০
৮ হইতে ৯ বৎসর শিশুর জন্য	১৬০০
৬ হইতে ৭ বৎসর শিশুর জন্য	১৩০০
৪ হইতে ৫ বৎসর শিশুর জন্য	১০০০

বর্তমান অবস্থায় ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্যালারী সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা সংস্থা (Nutrition Advisory Committee) জীবন ধারণক্ষম দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়াছেন।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিনের	আউন্সের হিসাব
গম, ধান, যব, ভুট্টা, বার্লি, ময়দা জাতীয় খাদ্য	—১৪.০
ডাল জাতীয় খাদ্য	— ৩.০
শাকসব্জী জাতীয় খাদ্য	—১০.৪
ফলমূল	— ৩.০
দুধ	—১০.৩
শর্করা জাতীয় পদার্থ	— ২.০
চর্বি	— ২০
মাছ, মাংস	— ৩.০
ডিম	একটি

নিরামিষভোজীদের পক্ষে মাছ, মাংস, ডিমের পরিবর্তে অন্ততঃ ৪ আউন্স দুধ খাওয়া প্রয়োজন। খাদ্যের সুষম ব্যবস্থার অভাবে ভারতের গড়পড়তা আয়ু মাত্র ৩৫ বৎসর এবং ১৯১১-২০ সালে ইহা ২০ বৎসর, এবং ১৯২১-৩০ সালে ইহা ২৭ বৎসর এবং ১৯৪১-৬০ সালে মাত্র ৩৩ বৎসর ছিল। অন্যান্য কয়েকটি দেশের গড়পড়তা আয়ুর হিসাব নিচের চিত্র হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

সিংহল	—	৫৪	বৎসর	অস্ট্রেলিয়া	—	৭১	বৎসর
মালয়	—	৫৯	"	যুক্তরাজ্য	—	৭১	"
জাপান	—	৬৬	"	যুক্তরাষ্ট্র	—	৭১	"
				ফ্রান্স	—	৬৮	"

কর্ম-সংস্থান সমস্যা : জনসংখ্যা বেশী বাড়িলেই তাহাদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা না হইলে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে। ভারতের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন। নানাধরণের বড় বড় কলকারখানা, দুর্গাপুরের কোক চুল্লী এবং বহুবিধ পরিকল্পনার দ্বারা বেকার সমস্যাবহুল পরিমাণে সমাধান হইতেছে। প্রতি বৎসরই ভারতে প্রায় ২ মিলিয়ন লোক বেকার হইতেছে। আস্তে আস্তে ভারতের সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বেকার সমস্যা হয়ত আরও প্রকট হইবে।

জীবনমান : ভারতের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ছাড়া ইহা সম্ভব নয়। জাতীয় আয়ও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। সন্তান উৎপাদন কম না হইলে জীবনমান পরিবর্ত্তন করা একরূপ অসম্ভব। অবশ্য ভারতের জাতীয় আয় যে কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা নিচের ছবি হইতে উপলব্ধি করা যাইবে।

	জাতীয় আয় [কোটী টাকার হিসাব]	জনপ্রতি আয় [টাকার হিসাব]
১৯৪৮-৪৯ সাল	৪৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০ "	৪৮২০	২৪৮.৬
১৯৫৫-৫৬ "	১০৪৮০	২৭৩ ৬
১৯৫৬ ৫৭ " [অনুমান]	১১০১০	২৮৪.০

১৯৪৯ সালের তুলনামূলক অন্যান্য দেশের ব্যক্তিগত আয়ের হিসাব, আমেরিকা ১৪৫৩ ডলার, কানাডা ৮৭০ ডলার, ইংলণ্ড ৭৭৩ ডলার, রাশিয়া ৩০৮, ভারতবর্ষ ৫৭ ডলার, পাকিস্থান ৫১ ডলার।

স্বাস্থ্য : জনস্বাস্থ্য আরম্ভ করিবার সাথে সাথেই চিকিৎসকের কথা মনে আসে। সুচিকিৎসার অভাবে এখনও আমাদের দেশে বহুলোক প্রাণ হারাইতেছে। মূর্খ জনসাধারণের একটা অংশ এখনও রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নয়। সেজন্য নতুন নতুন ইনজেকসন ও টিকা ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যেমন ভাল ফল দর্শাইতেছে আমাদের সেরূপ ফল দিতেছে না। ভারতে হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প—তাহা নিচের চিত্র হইতে অনুধাবন করা যাইবে।

	হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারী	রোগীর সংখ্যা
১৯৪৭ সাল	৩৮২৫	৪৩,০১৯,৭৭২
১৯৪৮ "	৪১৮৩	৫৪,৭৬৮,১২৩
১৯৫৪ "	৯৮০৬	১১৩,৪৭০,৪৯৪
১৯৫৫ "	৯৮৩৩	১২৬,৭৬০,৩২০

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এক হাজার অধিবাসীর জন্য যথাক্রমে ৭.১৪ এবং ১০.৪৮ টি হাসপাতালের বেড আছে। ভারতে শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৬ হাজার অধিবাসীর জন্য মাত্র একজন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রতি ১২০০ এবং ৭৫০ জন অধিবাসীর জন্য একজন চিকিৎসক। এদেশে প্রায় প্রতি ৪২ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন নার্স এবং ইংলণ্ডে প্রতি লোকের জন্য একজন নার্স। ভারতের জনস্বাস্থ্য উন্নতি কল্পে বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এদেশে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছে এবং এদেশে কমপক্ষে ৩.৪ লক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন।

ভারতে নানারূপ রোগের আক্রমণে প্রায় ৬৫ লক্ষের উপর লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যক্ষ্মারোগে এখানে প্রায় ২ লক্ষের মত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অবশ্য অধিক মৃত্যুর প্রধান কারণ হাসপাতালে বেডের অভাব। অল্পপুষ্টি খাদ্য খাওয়ার জন্যও যক্ষ্মারোগ হয়। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্যরোগেও ভুগিয়া বহুলোক শীর্ণ হইতেছে। ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষের মত এবং তন্মধ্যে ২॥ লক্ষ লোকেরই রোগ সংক্রামক শ্রেণী। ইহা ছাড়া কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগেও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

জন্মমৃত্যু : ভারতের কয়েক বৎসরের জন্ম মৃত্যুর হার নিচে দেওয়া হইল।

	জন্মহার [প্রতি হাজার]	মৃত্যুহার [প্রতি হাজার]	শিশুমৃত্যু
১৯৪৯ সাল	২৫.৯	১৬.৪	১২৩
১৯৫০ "	২৪.৫	১৬.০	১২৭
১৯৫৪ "	২৫.৪	১২.৫	১১৫
১৯৫৫ "	২৭.০	১১.৭	১০০

তুলনামূলক বিচারের জন্য অন্যান্য কয়েকটি দেশের হিসাব দেওয়া হইল।

		জন্মহার [প্রতি	মৃত্যুহার হাজারের	শিশুমৃত্যুহার হিসাব]
জাপান	—	১৯.২	৮.০	৪১.৭
চীন	—	৩৭.০	১৭.০	—
অষ্ট্রেলিয়া	—	২২.৫	৯.০	২২.১
যুক্তরাজ্য	—	১৫.৭	১২.২	২৫.৬
যুক্তরাষ্ট্র	—	২৪.৮	১১.৬	২৫.৪
ফ্রান্স	—	১৮.৬	১২.২	৩৮.৫

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার প্রভূত উন্নত হইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতি অল্প বয়সে নারীদের গর্ভধারণ করিতে হয় বলিয়াই শিশুমৃত্যু বেশী।

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার শতকরা হিসাব নিচে দেওয়া হইল।

	জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিক [শতকরা হিসাব	
ভারতবর্ষ	১.৩	১.২
জাপান	১.১	১.১
চীন	২.২	২.০
মালয়	৩.০	৩.০
অষ্ট্রেলিয়া	২.৪	২.৪
ফ্রান্স	০.৮	০.৬
যুক্তরাজ্য	০.৪	০.৪
যুক্তরাষ্ট্র	১.৭	১.৬

জন্মনিয়ন্ত্রণ : পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সন্তান উৎপাদন কমাইতে জনসাধারণ বিশেষ চিন্তিত। সেজন্য অনেক পুরুষ ও মহিলা স্বাবলম্বী না হইয়া বিবাহ করিতে রাজী হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অধিক বয়সে নারীদের বিবাহ হইতেছে। উপরন্তু সহরে অধিকাংশ মহিলাই চাকরী করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত বিবাহ করে। গ্রামে অবশ্য অনেকেরই এখনও ধারণা আছে যে সন্তান ভগবানের আশীর্বাদ, ইহার উপর মানুষের কোন হাত নাই। ১৪।১৫ বৎসর হইতে নারীরা সন্তান

দিতে আরম্ভ করে এবং সাধারণভাবে দেখা যায় ৪৫ বৎসর হইতেই নারীদের গর্ভধারণ শক্তি রহিত হইয়া যায়। গ্রামে ৪৫ বৎসর বয়সের মহিলা গড়ে ৭টি সন্তানের জননী হইয়া থাকে এবং সহরে নারীরা ৫.৬টি সন্তানের জননী হইয়া থাকে। ভারতের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অনুসন্ধানে আরও দেখা গিয়াছে যে সাধারণভাবে মহিলারা তিন-চারটির অধিক সন্তান পছন্দ করেন না।

সরকার এ সম্পর্কে ওয়াকিব-হাল। দেশের নানা স্থানে হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন করিবার জন্যও সরকার চেষ্টিত। চীন, ভারত এবং জাপান পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা রহিত করিবার জন্য নানা হাসপাতালে বিনা খরচায় অপারেশন করিবার জন্য ভারত সরকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত সরকার পরিবার-নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে যথাক্রমে ২৫ লক্ষ এবং ৪৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ যেমন প্রয়োজন তেমনি সন্তানদিগকে ভালভাবে লালন-পালন করা প্রত্যেক মাতাপিতার কর্তব্য। সন্তান কখনই অবহেলিত নয়, হয়তো বা মাতাপিতার নিকট অবহেলিত, কিন্তু দেশের পক্ষে সম্পদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু জনসংখ্যা বর্ধিত হওয়ার জন্য চিন্তিত নন। সুস্থ ও সবল লোকসংখ্যা দেশের গর্বের বস্তু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও উচ্চকাঙ্ক্ষা করেন ভারতের সমস্ত খনিজ ও কৃষিজ সম্পদ ব্যবহৃত হইলে ভারত বর্তমান লোকসংখ্যার দ্বিগুণ লোকের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নই জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারে।

গ্যেটের ধ্যানধারণা ঃ সংস্কৃতির স্বরূপ

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

লেখকের রচনাবলী আগুনে পোড়ালেই কী লেখকের রচনার ধ্বংস হয়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর স্বদেশেই গ্যেটের রচনাবলীর বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল। এর প্রধান হোতা ছিলেন নাৎসী জার্মানীর পুরোধাগণ। অবশ্য গ্যেটের বাণী বহ্ন্যুৎসবে নিঃশেষ হয় নি। যিনি বিশ্বমানব তিনি ত অমর। তাঁর সোচ্চার সুর আজও ধ্বনিত। যখন লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর স্বদেশেই এইরূপভাবে রচনাবলী নিগৃহীত হয় তখন বুঝতে হবে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে তামসিক ভাব এসেছে, অবক্ষয়মূলক প্রবণতা মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। তাই এই স্মৃতি তর্পণের দিনে শুধু মনে হয় অবক্ষয়ও ত সব নয়। বিশ্ব যতদিন থাকবে চিন্তার উৎসও অব্যাহত থাকবে। চিন্তার উৎসে মন দ্রবীভূত হয়। এই সৎ-চিন্তার উৎস গ্যেটের রচনাবলীতে ব্যাপ্ত। তিনি ত বিশ্বমানবের প্রতিভূ। গ্যেটে যে-সময় জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন জার্মানীর না ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি, না ছিল ভাষার ওজস্বিনী ভাব। জার্মানীতে তখনও লোকে রোমক জীবন-যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল। ফরাসী ভাষার সমাদর ছিল। ফরাসী কৃষ্টির প্রতি লোকে শ্রদ্ধাশীল ছিল। জাতীয় স্পৃহা ছিল না। জাতীয় জীবনবোধের উত্তরণ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী পুরুষ, তারপর জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ভেঙে তিনি বিশ্বমানবের প্রতিভূ হয়েছিলেন —কৃষ্টির-ক্ষেত্রে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সংস্কৃতির স্বরূপ বিষয়ে গ্যেটের মতামত দেওয়া হল। প্রত্যেক মানুষের সৃজনী শক্তি আছে কারণ প্রত্যেক মানুষই হল এক একটি চিন্তার উৎস। চিন্তার রাজ্য কোন বিশিষ্ট মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ নয়। তাই মানুষ নিজের প্রেরণায় কাজ করে। মানুষের একটি সৎ চিন্তা সমগ্র দেশকে, জগতকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। একটি সৎ চিন্তা বিরাট প্লাবন আনে। এই চিন্তা মানব সমাজকে গড়ে তোলে; সমাজকে বেঁধে রাখে। মানুষ চিন্তা করে—কারণ নিজেকে সে ভালবাসে। তবু মানুষ বিপথে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক যুগে ধর্ম, নীতি, শিক্ষা ও সমাজ বিকৃত হয়ে থাকে। এই সব বিকৃতি কৃষ্টির অভাবে ঘটে। আর কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অভাব হলে কোন বিকৃতিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব না। বিকাশের জন্য বিকৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় আর বোধশক্তি মানুষের আছে। ইন্দ্রিয় সেবা আর জৈববোধ নিয়ে থাকলে মানুষের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই মানুষ জীবনের উৎকর্ষ খোঁজে, কারণ তখন মানুষ বোঝে জীবনে সাধনার প্রয়োজন আছে, শক্তির প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয়সেবা আর জৈব প্রয়োজন বোধের অভাব যখন মেটে, তখনই মানুষ সুন্দরের যথার্থ রূপ বুঝতে পারে। ইন্দ্রিয়জ বাসনা ও জৈববোধ যে অগভীর এ ভাব মানুষ অভিজ্ঞতা মারফৎ অর্জন করে। তখন মানুষের জ্ঞান আসে। আর এই জ্ঞানই ত মানব-জীবনের প্রধান অবলম্বন, এই জ্ঞানই ত সত্য। জ্ঞান আহরণ কর এবং জ্ঞানার্জনের জন্য সব কিছু সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি কর—এই হল জ্ঞানীর, প্রেমীর কথা।

একদিন না একদিন প্রত্যেক মানুষের জীবনের মূল্যায়ন হবে। সুতরাং

নিজেদের উৎকর্ষ সাধনে আমরা ব্রতী হব এবং অপরের প্রতি সদাচার প্রদর্শন করব। পূর্বে বলা হয়েছে জীবনের মূল্যায়ন হবে, যতই আমরা অধিক পরিমাণে জানব ততই আমাদের প্রতিবেশীদের মূল্যায়নে সমর্থ হব। প্রতিবেশীদের জানতে পারলে বিশ্বকেও জানা যাবে।

অপরিণত লোকেরা নিজেদের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই সন্তুষ্ট। অপরের কোন কিছুতেই তার চিন্তা নাই। তবে মানুষের মন সংস্কৃত—এই সংস্কৃত ভাব সকলের আছে। ক্ষুদ্রতার গণ্ডী একদিন যদি ভাঙে তবে সেই ক্ষুদ্রমনা পৃথিবীর কোন কিছু ভাব বা বস্তুকে অনুভব করবেই। তবে যারা কৃষ্টিবান তারা এই অনুভূতির মাঝে বৃহৎ জগতকে প্রতিফলিত করে। এই অনুভূতির মধ্যেই মানুষের শিল্পবোধ জড়িয়ে আছে। কর্ষণা মারফৎ প্রত্যেক মানুষের শিল্পবোধ পরিশীলিত হয়। এই মহৎ কর্ষণা সকল প্রতিভাবানদের মধ্যে প্রতি যুগে পরিব্যাপ্ত। মন পরিশীলিত হয় শিল্প, কাব্যে ও সঙ্গীতে। এই সবে মানুষের মন রস পায়। মানুষের কাজে ও কথায় তখন মধু ঝরে, এই জন্য একটি সুকুমার শিল্প মানুষের অবশ্য শিক্ষণীয়। এই কর্ষণার মধ্যে থাকে আত্মিক ও বাহ্যিক পুষ্টি। কর্ষণা ও সাধনার মধ্যে এই পুষ্টির ব্যাপ্তি—ফলে মানুষের মহৎ বোধগুলি আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবু আমাদের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তা আমরা প্রত্যহ প্রয়োগে অসমর্থ, এই জন্য আমাদের বোধশক্তিগুলির শক্তি হ্রাস পায়, পুষ্টিও কমে। এই কারণে সর্বদা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সকলের উচিত নিজ নিজ ভাবকে, বোধকে উন্নতমার্গে পরিচালিত করা, তা হলেই মানুষ নিজের ভারসাম্য আরও সুষ্ঠভাবে যথাযথভাবে রাখতে সক্ষম হবে। স্বভাব সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠের সুর মধুর। সন্দেহ নাই যে সে কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য। অনেক সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠস্বর স্বভাব-সঙ্গীতজ্ঞের মত সুশ্রাব্যও নয়, পূর্ণও নয়, তবে অবিরত প্রচেষ্টার ফলে সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠস্বর স্বভাব-সঙ্গীতজ্ঞের মত হয়ে ওঠে, তাতে পূর্ণতাও আসে।

তবে সংস্কৃতজগতে ভারসাম্য রাখাই দুরূহ, যারা সংস্কৃতবোধে বিশ্বাসী তারা জানে নিজের মধ্যে একটা অসন্তুষ্ট ভাব আছে এবং তারা আরও জানে যে অপরলোকের অসন্তুষ্ট ভাবের মধ্যে থেকে কীভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তবে সংস্কৃত মনের জন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। অপর লোকের তুলনায় কতখানি বোধ সেই সংস্কৃত ব্যক্তির আছে এ-কথাও ভাবতে হয়। অনেক সময় পথভ্রষ্ট হতে হয়। ব্যক্তি ও সমাজের কাছে সে যে কত ঋণী—এ-কথা মাঝে মাঝে সংস্কৃতবানগণ ভুলে যান। দুঃখও পেতে হয়, কারণ কোন ব্যক্তির ত্রুটি কোনকালে কেউ ক্ষমা করে না। এই অপরাধের জন্য অপরের ভর্ৎসনা সইতে হয়। এর প্রধান কারণ, ব্যক্তি নিজের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে অসমর্থ হয়েছিল।

ভারসাম্য আর একভাবেও নষ্ট হয়। মানুষের ভারসাম্য প্রকৃতিও নষ্ট করে। প্রকৃতির দুটি রূপ আছে। প্রকৃতির মোহিনীর রূপ সহজেই মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে। আর একটি হল প্রকৃতির চৈতন্যরূপিনী রূপ। এটি প্রাজ্ঞ মানুষের কাছে ধরা পড়ে। এই দুটি রূপেই আপন নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতি যখন সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চলে তখন প্রতিভাবানের আর সহ্য হয় না। প্রকৃতির প্রগতির অনুশাসনকে সেই মানুষ ক্ষমা করতে চায় না এই ভেবে—যে সে সংস্কৃত হয়েছে। তখন ভাবটি এই যে পূর্ণতা শুধু আপন অন্তরে আছে—বাইরের প্রকৃতি দেবীর মধ্যেও সেটি নাই। এর ফলে কৃষ্টিবান প্রগতিবিরোধী হয়ে পড়ে। তবে এ-রকম লোকের সংখ্যা খুব কম—তবে একথা ঠিক যে এ-রকম লোক আছে। ভারসাম্য সব সময় মানুষের থাকে না। তবে আদর্শের পূর্ণতা এই পৃথিবীতে থাকে এবং আছে। এই জন্য মানুষ প্রতিবিম্বকে বা প্রতিকৃতিকে অনুসরণ করে না। কারণ চিন্তার উৎস মানুষ চিরকালই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় এবং আদর্শই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে থাকে।

অবশ্য নীতির কঠোরতা বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই শুনি। প্রকৃতির মাঝে আমরা আছি। প্রকৃতিই পালয়িত্রী। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাই। আর বিকৃত সমাজের প্রতিনিধিরা বলে, প্রকৃতির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। এই কী সুসভ্য সংস্কৃতি। একে করুণা প্রদর্শন করা উচিত। এসব কথা যারা বলে, তারা আমাদের লক্ষ্য পথের শেষ সীমানায় নিয়ে যেতে চায় একেবারে। এইখানে তাদের ভ্রান্তি—কারণ পথের যে-চৈতন্য আছে, আনন্দ আছে, তার কথা তারা বলে না—লক্ষ্য পথের জন্য পথকে ভুলতে হবে এই শিক্ষা আমরা পাই।

তবে সব কিছুর সারবত্তা ব্যবহার করে বোঝা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে সব কিছুর বোধ আসে। তারাই কৃষ্টিবান—যারা অধীত বিদ্যাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। প্রয়োগের সার্থকতা যথার্থ বিদ্যা। যারা যথার্থ শিক্ষা পেয়েছে তারা গুরুর আসনের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। অবশ্য এর জন্য শক্তির প্রয়োজন। সমস্ত শক্তি নিয়ে আমরা এই পৃথিবী তৈরি করেছি। তবে এর মধ্যেও বিরোধ আছে—পার্থক্য আছে। কারণ শক্তির উপাদান অপর শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্য সচেষ্ট। ফলে প্রকৃতির গ্রন্থিবন্ধনও দৃঢ় হয়ে থাকে। তারপর বহুর মধ্যে প্রকৃতি নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। পাশব স্তর থেকে সৌন্দর্যের শেষবিন্দু পর্যন্ত—পৃথিবীর সব কিছুতেই মানুষের উপস্থিতি বর্তমান। সব কিছুর স্বীকৃতির জন্য। এই স্বীকৃতিই মানুষের একটি পরম অবদান।

পৃথিবীতে কেউ একা যদি সব সুন্দরকে নিতে চায়, আর কেউ একা যদি সব প্রয়োজনীয়কে নিতে চায় তা হলে সৃষ্টির জন্য তারা একস্থানে এসে পৌছাবেই। যার প্রয়োজন তার প্রসারতা আছে—একে কেউ পরিত্যাগ করতে চাইবে না। আবার সুন্দরেরও প্রয়োজন আছে। সুন্দরের দাবীও আছে প্রয়োজনের মত।

এই থেকে বোঝা যায় একটা নেওয়া ও দেওয়ার পালা আছে। তার ফলে উৎকর্ষ আসে, শক্তি জাগে। একটি শক্তি অন্য শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হলে উৎকর্ষ কারও হয় না। তাই দানের একটি রূপ আছে—এই দান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নেওয়া ও দেওয়ার মধ্যে। এই নেওয়া ও দেওয়ার মধ্যেই সংস্কৃতির সার্থকতা।

সীতা

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'-নাটক রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের রাম কর্তৃক সীতা নির্বাসনের কাহিনী লইয়া রচিত। নাট্যকার মহাকবি কালিদাসের ধারা আলোচনা করিয়া রাম-চরিত্রকে মানবীয় রূপ দ্বারা নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই রাম এখানে দেবতা অপেক্ষা আমাদের ঘরের মানুষ হিসাবে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু চরিত্র-বিশ্লেষণে নহে, রচনার আঙ্গিক, ভাষা ভাবের দিক হইতেও 'সীতা' নাটক মধ্যযুগের নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তাঁহার পাষাণী, ভীষ্ম ও সীতা—এই তিনখানি পৌরাণিক নাটকের ভিতর সীতাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা আগ্নো-পান্ত নূতনভাবে রচিত।

নাট্যকার ভূমিকায় যাহাই কৈফিয়ৎ দিন না কেন, তিনি উত্তর রামচরিত অথবা বাল্মীকির রামায়ণ কোনটি-কেই সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন নাই, তিনি বর্জন ও গ্রহণ নীতির দ্বারা রাম চরিত্রকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠন করিয়াছেন। তাই তাঁহার রাম ব্যক্তিত্বহীন বশিষ্ঠের হস্ত-পুত্তলিকা মাত্র। সীতা বিসর্জনের জন্য তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠকে যে পরিমাণে দায়ী করিয়াছেন, সেই পরিমাণে সীতার অপবাদকারী অযোধ্যার অধিবাসীদিগকে দায়ী করেন নাই। সীতার বনবাস সম্বন্ধে তিনি ভরতকে বলিয়াছেন "ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ।" তাঁহার এই দুর্বলতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অনেকখানি খর্ব করিয়াছে। সকলেই রামচন্দ্রকে সীতা বর্জন করিতে নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু বশিষ্ঠের আদেশের নিকট সে অনুরোধ-উপরোধ কার্যকরী হয় নাই। তারপর কৌশল্যা যখন সীতাকে বন-বাস পাঠাইতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন—

"দেখ সীতা লাগি
মাতা তোর আমি আজ ভিক্ষা মাগি
দিবি নে ?"

তখন রামচন্দ্র মায়ের আদেশের নিকট বশিষ্ঠের আদেশকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছেন—

"তুমি ভিক্ষা মাগ, আমি দিব না তা ?
হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ মাতা।"

এই একবার রাম বশিষ্ঠের প্রভাবমুক্ত হইয়া আপন বিবেকানুমোদিত কর্তব্য করিয়াছেন।

শূদ্রকের প্রাণ দণ্ড বিধানের দৃশ্যেও সেই বশিষ্ঠের আদেশের প্রাধান্য। শূদ্রকের প্রাণদণ্ডও যেন রাজার বিচার অপেক্ষা বশিষ্ঠের আদেশ পালনের ভাবটিই বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজার যেমন বিচার করিবার অধি-কার আছে, তেমনি তাহার ক্ষমা করিবারও অধিকার আছে ; কিন্তু সে ক্ষমা শূদ্রক পায় নাই—কারণ এ প্রাণ-দণ্ড বিধান বশিষ্ঠের আজ্ঞা। লক্ষ্মণ বলিয়াছে—

"ক্ষমা কর মহারাজ! বৃদ্ধ ঋষিবরে নরোত্তম,"

কিন্তু রামচন্দ্র উত্তরে বলিয়াছেন—

"বশিষ্ঠের বিধি অলঙ্ঘ্য। কি করিব।" এখানে রাম যেন অসহায়—তাঁহার নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। সর্বত্রই যেন রাম বশিষ্ঠের ছায়ামাত্র। বশিষ্ঠের যুক্তি ও উপদেশ রামচন্দ্রের নিকট অভ্রান্ত সত্য।

রামচন্দ্রের উপর কর্তব্যের এক মোহজাল বিস্তার করিয়া বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের অন্তরের সকল অনুভূতি, দয়া, মায়া, প্রেম ভালবাসাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কর্তব্যকে প্রেমের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়াই রাম-চন্দ্রের জীবন দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হইয়াছে। কিন্তু বশিষ্ঠের মতও যে ভ্রান্ত হইতে পারে তাহা তিনি কোন সময় চিন্তা করেন নাই। কখনও কখনও তিনি বশিষ্ঠের সঙ্গে তর্ক করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার যুক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ যে অভ্রান্ত নন, তাহা বাল্মীকি প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন—

"প্রেম পথ দেখায়; কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি',
প্রেম, প্রভু; কর্তব্য, তাহার ভৃত্য।"

এই কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠকে বাল্মীকির কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাই নাটকে বাল্মীকির চরিত্রও বশিষ্ঠের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। বাল্মীকি প্রেমিক। তিনি রত্নাকর দস্যু হইতে একদিন ঋষিতে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই ঋষিত্ব প্রাপ্তির মূলে ছিল অন্তরের অপার্থিব প্রেমের অপরিমেয় শক্তির উপলব্ধি বোধ। নিহত ক্রৌঞ্চের শোকার্ত হৃদয়ের বেদনার বিক্ষোভ দর্শনে, প্রেমের প্রভাবেই তাঁহার কণ্ঠে "মা নিষাদ···" প্রথম শ্লোক উচ্চারিত হইয়াছিল। প্রেমের প্রভাব যে কত শক্তিশালী তাহা তাঁহার জীবনে পরীক্ষিত। তাই তিনি প্রেমকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। বশিষ্ঠের সহিত বাল্মীকির মূল পার্থক্য এই-খানে। প্রেমহীন কর্তব্য মানুষের জীবনকে নীরস ও বিষময় করিয়া তুলে। মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য—সমাজের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য, সে কর্তব্যবোধ জাগরিত হইতে পারে না, যদি না তাহাদের মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হয়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার প্রতি কর্তব্যবোধ জাগরিত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

কিন্তু বশিষ্ঠ চরিত্র কর্তব্যের কঠোরতায় রুক্ষ—তাই কিছুটা নির্মম ও নিষ্ঠুর। তাঁহার জীবনে কর্তব্যের শ্যামল ক্ষেত্র হইতে প্রেমের সরিৎ ধারাটি যেন অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লেখকের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্যের সহিত বশিষ্ঠের কিছুটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আত্রেয়ীকে হারাইয়া চাণক্য প্রেমহীন কঠোর কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন; কিন্তু আত্রেয়ীকে ফিরিয়া পাওয়ার মুহূর্তে তাঁহার ভিতর প্রেমের পেলব মধুর স্পর্শ এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনিয়াছিল। বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি যে চাণক্যেরই দ্বৈত রূপ।

আবার লব কুশ দুই ভাইই বাল্মীকির নিকট শিক্ষা-লাভ করিলেও লবের চিন্তা ধারা বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছে এবং কুশের চিন্তাধারা বশিষ্ঠকে অনুসরণ করিয়াছে। বনবাস-জীবনে রামচন্দ্রের যে তেজ, যে বীরত্ব তাঁহাকে রাবণ-বিজয়ী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই তেজ ও বীরত্বদীপ্ত রাবণ-বিজয়ী মূর্তিই লবের ভিতর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কুশ যেন বশিষ্ঠ নিয়ন্ত্রিত রামচন্দ্রের প্রতিরূপ, তাই কুশের চরিত্রে যে নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় তাহা লবের চরিত্রে নাই।

লব রামচন্দ্রের যজ্ঞ অশ্ব ধরিয়া রামচন্দ্রকে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাইয়াছে। সে রাজপুত্র, রাজপুত্র ব্যতীত অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করাকে সে অমর্যাদা জ্ঞান করে। রামচন্দ্রের অভাবে সে শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্বে জানিয়া লইয়াছে, সে রাজপুত্র কি না। এমনই তাহার আত্মমর্যাদা বোধ। যেমন তাহার অসীম তেজ, তেমনই তাহার অপরিমেয় বীরত্ব।

মাতার নিকট লব যেদিন শুনিয়াছে যে সে রাজ-পুত্র, সেইদিন হইতে সে রাজপুত্র বলিয়া একটা গর্ব বোধ করিত। রাজপুত্রের ন্যায় সে ক্ষত্রিয়োচিত অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কুশ যখন তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিয়াছে, তখন উত্তরে সে সীতাকে বলিয়াছে—

"আমি বলিয়াছি
বিনা যুদ্ধে দিব না এ অশ্বে, মরি বাঁচি,
ভঙ্গ হবে ক্ষত্র বাক্য? তুমি কি তা চাও মাতা?"

সীতা রামচন্দ্রের নির্বাসিতা স্ত্রী এবং রামের জীবনে সীতাই যত অনর্থের মূল জানিয়া লবের মায়ের প্রতি ভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সে বলিয়াছে—

"মা পূর্বে অন্তরে রাখিতাম, আজি হ'তে তোরে
শিরে তুলি রাখিব মা।"

সে অন্তরে বুঝিয়াছিল কাহার অপরাধে সীতা নির্বাসিতা—কাহার অন্যায়ের জন্য তাহারা আজ পিতৃপরিচয় হইতে বঞ্চিত। তাই বাল্মীকি যখন লবকে পিতাকে প্রণাম করিতে বলিয়াছেন, তখন লব দীপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়াছে—

"মহর্ষি। কৈশোরে, ছায়াসম,
যে পত্নী, সাম্রাজ্য ছাড়ি, রামানুবর্তিনী বনবাসে,
লঙ্কায় যে তার জন্য করে নাই, সুদীর্ঘ প্রবাসে,
অশ্রুপাত বিনা; লোক নিন্দা ভয়ে তারে অনায়াসে,
দেয় নির্বাসন দণ্ড যেই রাম—ক্ষমা কর দাসে—
ভগবান, সেই রামে প্রণাম না করে লব।"

কুশ উত্তরকালের রামের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও ব্যক্তিত্ব-হীন। কুশ লবকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছে—মাতার নির্বাসনের কাহিনী শুনিয়া সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কাহার অন্যায়ের জন্য মাতা নির্বাসিতা, সে সম্বন্ধে সে কোন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নাই। বাল্মীকির আদেশে সে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া নিজেকে রামচন্দ্রের পিতৃত্বে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছে।

লবের ভিতর গোড়া হইতে যেমন রামচন্দ্রের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়, কুশের ভিতর গোড়া হইতে তেমনি রামচন্দ্রের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ভক্তির ভাব বিদ্যমান দেখা যায়।

লব ছিল বীর্যবান, ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন, স্পষ্টভাষী, মাতার দুঃখে সমব্যথী; কিন্তু কুশের নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা তাহার চরিত্র বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে।

লব ও কুশ একই বৃন্তে দুইটি পুষ্প—একই মাটির রসে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত; কিন্তু তাহারা বর্ণে ও গন্ধে এতই পৃথক যে একজনকে অপরের বিপরীত-ধর্মী বলিলেও ভুল বলা হয় না।

চীনের কথা

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র

লোকসংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে চীনের জনসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশী—প্রায় ৬০ কোটি। এই বৃহৎ সংখ্যার মধ্যে ৪৫ কোটি নাগরিক চীন-ভাষায় কথা বলে এবং অবশিষ্ট লোকের কথ্যভাষা তিব্বতী, কোরিয়ান্ ও তুর্কি ইত্যাদি। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের কথা বাদ দিলে চীন সভ্যতার ইতিহাস খৃঃ পূঃ দু' হাজার বছরেরও বেশী। খৃঃ পূঃ দু' হাজার বছর আগে চীন সভ্যতায় ঘর-বাড়ী ও শিল্প কলার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায় এবং খৃঃ পূঃ দেড়হাজার শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির প্রচলন ও উন্নতির একটা পুরোপুরি বিকাশ চীন-সভ্যতার ইতিহাসে মেলে।

চীন-সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে সহজেই বৈশিষ্ট্য মানুষের চোখে পড়ে। একটি হলো, সে দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ। ঠিক এ ধরণের সভ্যতার বিকাশ ভারত বা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে হয়নি বলা যায়। চীনের এই একান্ত স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির ফলেই বোধ হয় যে ভিন্ন জাতির সঙ্গে তার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত যোগ থাকলেও তা চীনের নিজস্ব ধারায় রূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে চীনা হরফের সুপ্রাচীন রূপটির বিষয়েও ওই একই কথা খাটে। সেই কারণেই একটি সুপ্রাচীন চীনা হরফের পরিচয় ও অর্থ আজকের দিনের চীনভাষাবিদের কাছে সহজ ও সুবোধ্য। ভারতবর্ষ কিন্তু এ ব্যাপারে পুরোপুরি অন্য ধারার। প্রাচীন যুগে ত নয়ই, এমন কি মধ্যযুগেও ভারতের ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল না। ফল কিন্তু তাতে মন্দ হয়নি। কেন না, নানা জাতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানে ভারত-সভ্যতার মান অধিকতর ব্যাপক ও বিস্তৃত হবার সুযোগ লাভ করেছে।

অতীত চীনের পরিপূর্ণতা মুখ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে আশ্রয় করে। তাই চীনের সারা দেশময় ছোটবড় অসংখ্য বৌদ্ধবিহার ও মন্দির গড়ে উঠেছিল। মধ্য-চীনে হান্‌চৌতে রয়েছে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার। তাই হান্‌চৌকে অনেকে চীনের কাশী বলে থাকেন। নানা শিল্পসম্ভার ও রেশমের কাপড়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচি-শিল্পের বিচিত্র কারুকার্য্যের জন্যও এ জায়গা বিখ্যাত। চীন জাতির অসাধারণ ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির ফলেই এ বিহারগুলির একটা ধারাবাহিক ইতিহাসও সেখানে সংরক্ষিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সকল বিহারের ও সেগুলির রক্ষকের প্রায় উনিশ-শো বছরেরর ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 'পাইমা-সিসজ' বিহার তারই অন্যতম উদাহরণ। ভারতের অজন্তা, ইলোরার মত

'লোইয়াঙ' পর্ব্বত গাত্রে ও অন্যত্র রয়েছে প্রচুর বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। তুন্‌হুয়ান্ গুহাটি ভারতের ইলোরার চেয়ে তিন-চার গুণ বড়। পাহাড় কেটে গুহার গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের কাজগুলি আশ্চর্য্য সুন্দর। লোইয়াঙ পর্ব্বত গাত্রে বিরাট বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তিগুলি যেন মৈত্রী ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি। বারশো থেকে পনেরশো বছর আগে এই সব স্থাপত্যশিল্পের জন্ম।

চীন-ভারত ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত যোগ অতীতে প্রথম কখন সূচনা হয়েছিল সে কথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে আশ্রয় করেই ভারত-চীন মৈত্রী-যোগ অতীতে একদিন গড়ে উঠছিল সে কথা ইতিহাস সম্মত। ঐতিহাসিক ভিত্তির কথা বাদ দিলে চীন-ভারতের প্রথম সম্বন্ধ-যোগের নানা কাহিনী শোনা যায়। কথিত আছে খৃঃ পূঃ ২১৭ শতকে ভারত থেকে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ প্রথম চীনে পদার্পণ করেন। চীনদেশের শাসনভার তখন সিন্-ডাইনেষ্টির হাতে। অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ১২১ শতকে একজন চীনা সামরিক অধি-নায়ক হুন্ থেকে সুবর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি চীনে প্রথম নিয়ে আসেন। সে যাই হক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের আগেই ভারত-চীনের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত-যোগের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাস আমরা পাই। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রথম চীনদেশে পদার্পণ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায় যে হান্ বংশের মিন্‌রাজা স্বপ্নে একদিন এক সুবর্ণ মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন। পারিষদবর্গের কাছ থেকে রাজা পরে জানিতে পারে, যে এই সুবর্ণ মহাপুরুষই ভগবান বুদ্ধ। তখন তিনি তাঁর প্রতি-নিধিদের পাঠালেন ভারতে—বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকদের চীনে আমন্ত্রণের জন্য এবং খৃষ্টীয় ৬৫ অব্দে ধর্ম্মরক্ষক ও কশ্যপমাতঙ্গ নামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দু-জন ভারতবাসী চীনদেশে পদার্পণ করেন। এঁরা সঙ্গে একটি শ্বেত অশ্ব ও বহু বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাদি এনেছিলেন। এই শ্বেত অশ্বের স্মরণ চিহ্ন হিসাবে চীনদেশে রাজ আজ্ঞায় ও প্রচেষ্টায় প্রথম বৌদ্ধ-বিহার গড়ে উঠেছিল। এই বিহারই 'পাইমমিসজ' বিহার নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মরক্ষক কশ্যপমাতঙ্গ চীন ভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থাদি রচনা ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারদ্বারা তাঁদের জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি চীনদেশেই কাটিয়ে ছিলেন। প্রায় বারশো বছর ধরে চীন-ভারত মৈত্রী যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। তারপর তুর্কি আক্রমণের ফলে দেশে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য সে যোগ ভেঙ্গে পড়ে। গণিত, শাস্ত্র, রসায়ন ও চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতির জ্ঞান চীন ভারতের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল। সে কথার উল্লেখ চীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত বহু বিষয়ে চীন ভারতের কাছে ঋণী থাকলেও, চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে রূপ পেয়েছে। চীনের সভ্যতা, ধর্ম্ম, শিল্প—সব কিছুই নিছক অনুকরণ প্রচেষ্টায় পুষ্ট নয়। তাই চীনের সব কিছুই সে দেশের অধিবাসীরা তাঁদের একান্ত নিজস্ব বলে দাবী করে থাকেন।

ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত। তাই তার ধারাবাহিক সংরক্ষিত ইতিহাস নেই। কিন্তু এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে ভারতও চীন-জাতির নিকট তাহাদের সংস্কৃতির আদান-প্রদানে ঋণী। এ সব বিষয় আজ গবেষণা সাপেক্ষ। সেই কারণেই ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সাম্প্রতিক চীন-পরিভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন যে তাঁর অনুমানে কালিদাসের সাহিত্য রচনা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অন্ততঃ পরোক্ষভাবে চীন সংস্কৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত।

যদিও প্রাচীন চীনের গৌরব ও ঐতিহ্য ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত, কিন্তু নব্য-চীনের অভ্যুত্থানে তার প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক নয় যে ধর্ম্মের সঙ্গে আজ সে দেশের অধিবাসীর যোগ ছিন্ন হয়েছে। কারণ চীনের সাধারণ অধিবাসী তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আজও ধর্ম্ম পালন করে থাকেন এবং তার বিপক্ষে রাষ্ট্রের কোন বাধ্যতামূলক কড়া শাসন-পদ্ধতিও নেই। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য, ধর্ম্মকে একান্তভাবে আশ্রয় করে প্রাচীন চীনের যে গরিমা অতীতে পরিপূর্ণতালাভ করেছিল—তার প্রভাব আজ সে দেশে নেই। এই দৃষ্টি ভঙ্গির—পরি-প্রেক্ষিতেই চীনের প্রাচীন বিহার ও মন্দিরগুলি আজকের দিনে ম্লান বলিয়া মনে হয়। আজকের দিনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা পরিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতে ও অন্যান্য দেশেও মানুষের ধর্ম্মবোধ ও চেতনা নূতনরূপে রূপায়িত। কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ আজও মনে করেন যে ধর্ম্মকে

আশ্রয় না করে যে কোন সমাজের বা মানুষের কল্যাণ ও পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। এই কারণের জন্যই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ভারতে ধর্ম্মের মর্য্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ। চীন জাতির সঙ্গে ভারতবাসীর নানা বৈষম্য থাকা সত্বেও একটা আত্মিক ঐক্য চিরদিনই আছে। তাই সে দেশে ধর্ম্মের মর্য্যাদা কি হিসাবে লোপ পাওয়া সম্ভব সে কথা ঠিক বোঝা যায় না। সে যাই হ'ক, জাতি হিসাবে চীন অধিকতর উন্নত হ'ক এবং জগতের কল্যাণ সাধন করুক—এটাই সকলে কামনা করে।



বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

ঐ আসছে বর্ষা। সে কি আসছে ভীরু-চঞ্চল পদের মৃদুমন্দ সঞ্চরণে, না ছন্দিত চরণের শিঞ্জিনী ঝংকারে! সে তো আর চপলা বালিকা কিংবা চঞ্চলা কিশোরী নয়। সে যে নবযৌবনা উদ্‌বেল 'উন্মদ বরষা'। প্রবল প্রতাপে ভীম উল্লাসে আসছে মহিমান্বিতা। কবিকণ্ঠে ঐ ধ্বনিত হচ্ছে তার আগমন বার্তা—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

কার আগমনে আজ দিকে দিকে পড়েছে সাড়া, শালের বন উঠেছে মেতে, তালের পাতায় পাতায় লেগেছে নাচের নেশা—

আকাশ হতে আকাশে
কার ছুটাছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া।

শুধু কি শাল আর তালের বনই উঠেছে মেতে! বর্ষার আবির্ভাবে কবির হৃদয়ও বিচিত্র সব ভাবের আবেগে হয়ে উঠেছে উচ্ছ্বসিত। উল্লসিত মন-ময়ূর আনন্দে শুরু করেছে নৃত্য—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো
নাচেরে।
শতবরণের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে।

পৃথিবীতে আজ শ্যামলের হরিতের অভিষেক-উৎসব। গম্ভীর রবে আকাশে বেজে উঠেছে মেঘের ভেরি। ওতো সেই অভিষেক-উৎসবেরই ঘোষণা। কবি পেয়েছেন সেই মহোৎসবের আমন্ত্রণ—

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরি রবে।
পূর্ব বায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে।

সেই রুদ্র নৃত্যের তালে তালে ঝরে পড়ুক যত শুষ্ক জীর্ণ প্রাণহীন পত্রের কঙ্কাল—

ওরে ঝড় নেবে আয় আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে
এই বরষার নব শ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দ হারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে।

বর্ষা এসেছে 'বজ্রমাণিক'-দিয়ে-গাঁথামালা প'রে—'গুরু গুরু মেঘের মাদল' বাজিয়ে। এক হাতে তার সবুজসুধার পাত্র আর অন্য হাতে—

মর মর পাতায় পাতায় ঝর ঝর বারির রবে
গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী বন্যা মরণ ঢালা।

ওই সুধার স্পর্শে মাঠে মাঠে জেগে ওঠে সবুজ তৃণ। ওতো সবুজ ঘাস নয়, পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন সবুজ মেঘ। নিয়ে এসেছে প্রাণের বন্যা। ওরা যে মরুজয়ের সৈনিক—

কখন বাদল-ছোঁয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে।
*　*　*　*
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো এল প্রাণের বেগে।
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।

বর্ষণ-ক্লান্ত বেদনা বিধুর আকাশের মনের কথা জানতে পারেন কবি। সারা প্রহর তাঁর মনকে ব্যথিয়ে তোলে আকাশের ব্যথা। বাদল-ঝরা আকাশের সঙ্গে তাই গড়ে ওঠে তাঁর আত্মীয়তা। চলে কানে কানে মর্মবেদনার গোপন কথা—

আজ আকাশের মনের কথা ঝর ঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

* * * *

আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।

শ্রাবণের আকাশে জড়ো হয়েছে যতো পথিক মেঘের দল। এবার শুরু হবে তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। কবির মনেও জেগেছে অস্থির চঞ্চলতা। ঘরের কোণের 'শাসন-সীমা' মেনে নিয়ে সে আর থাকবে না বন্দী হয়ে। ঝড়কে পথের বাহন করে অজানার উদ্দেশে কবির মনও আজ আকাশে উধাও হবে মেঘেদের মতো—

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন-অঙ্গনে।
শোন্ শোন্‌রে, মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গনে।
দিক হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।

অবিরল-বর্ষণ বিরহ-কাতর ভাদ্র-রাত্রির অসীম রোদন কবির হৃদয়কে তোলে আকুল করে—

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি।

শালের বনে উঠেছে ঝড়। আকাশ ভেঙে পড়ছে বৃষ্টির আকুল ধারা। বাইরের আকাশে আজ ঝড়ের মাতামাতি। কি বিপুল তার কলরোল। কবির হৃদয়-সমুদ্রেও লেগেছে সেই ঝড়ের দোলা। উদ্দাম হয়ে উঠেছে তার উত্তাল তরঙ্গমালা—

অন্তরে আজ কী কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।

বারি-ঝরা মুখর বাদল-দিনে উতলা হয়ে উঠেছে কবির মন। কোন কাজেই আর থাকতে চাইছে না আবদ্ধ হয়ে। সে যেন সদ্য-পিঞ্জরমুক্ত চঞ্চল-পক্ষ বিহঙ্গ। সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়ে উঠেছে উন্মুখ—

এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে
উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ঐ বলাকার পথখানি নিতে চিনে।

কবির হৃদয় কি যথার্থই ভুলতে পারে মাটির বন্ধন! বাদল-মেঘের সঙ্গী হয়ে সত্যিই কি সে আশ্রয় নেয় 'সুদূর তেপান্তরের শেষে অসম্ভবের দেশে!' সে কি—

বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে,
যায় সে বাদল-মেঘের কোলে রে
কোন সে অসম্ভবের দেশে।
সেথায় বিজন সাগর কূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমাল গাছে
নূপুর শুনে ময়ূর নাচেরে।
সুদূর তেপান্তরের শেষে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির ভোলা মনকে টেনে নিতে পারে না 'অসম্ভবের দেশের' হাতছানি। করতে পারে না তাকে দিকহারা। মাটির সঙ্গে রয়েছে যে তাঁর প্রাণের নিবিড় যোগ। তাই বর্ষা-দিনের ঘর-ছাড়া কবি মন প্রাণের টানেই 'না-জানা-পথের' মায়া কাটিয়ে ফিরে আসে আপন আলয়ে, ফিরে আসে মাটির পানে। 'উধাও হাওয়ার পাগলামীতে' সত্যিই এখন আর মেতে ওঠে না মন-বলাকার পাখা—

কোন পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে,
ভাবনা ভাসে পুব-বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে।

'সকল আকাশ ঘুরে ঘুরে' এবার পথ-হারানো কবি-মন নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। তাই বর্ষারাতের শেষে যখন বেণুবনের মাথায় মাথায় এসে পড়ল অরুণ আলো—আর পাতায়পাতায় লাগল রঙের ছোঁয়া, তখন পৃথিবীর এই অপরূপ রূপের ধারায় কবি-হৃদয় হল স্নাত, স্নিগ্ধ, তৃপ্ত। মাটির প্রেমে কবির দেহের অণুতে অণুতে জাগল পুলক-শিহরণ—

এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন একতালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে।

আকাশচারী কবি-মন কল্পনার জগৎ ছেড়ে নেমে এসেছে ধূলির ধরণীতে, বাস্তবের রাজ্যে। নূতন করে জড়িয়ে পড়ে মাটির মায়ার বন্ধনে। কবি হয়ে ওঠেন বস্তুনিষ্ঠ। প্রতিবেশ আর প্রতিবেশী সম্বন্ধে হয়ে ওঠেন সজাগ, সচেতন। ভয়-ভাবনা ও উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরপুর বাত্যাহত দুঃখ-প্লাবিত এই জাগতিক জীবনের মধ্যেও তিনি খুঁজে পান শান্তি, সান্ত্বনা ও সার্থকতা। সকল মানুষ তাঁর আপন জন, আত্মীয়। মানুষের সহচর জীবকুলের প্রতিও তাঁর সমান মমতা। তাদের সুখদুঃখের সমান অংশীদার তিনি। তাদের বিপদের, অমঙ্গলের সামান্যতম সম্ভাবনাতেও তাঁর কি গভীর আর্তি, কি বিপুল ব্যাকুলতা!

ঘন কাল মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। আঁধার হয়ে আসছে চারিদিক। কবির আর উদ্‌বেগের অন্ত নেই। সকলকে ডেকে কবি কাতরকণ্ঠে বলছেন যে—আজ আর কারুরই ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই। আর এই দুর্যোগের মধ্যে যারা রয়েছে বাইরে তাদের কথা ভেবে আকুল হয়েছেন তিনি। শুধু খেয়া-না-পাওয়া শেষ যাত্রীটি কিংবা রাখাল

বালকই নয়, ধবলী নামক গাভীটির জন্যেও কবির কি ভয়-ব্যাকুল তার উদ্বেগ-কাতর উৎকণ্ঠা—

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে,
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি,
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখাল বালক কি জানি কোথায়,
সারাদিন আছি খোয়ালে।
ওগো আজ তোরা যাসনে গো তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে।

প্রাবৃটের প্রথম আবির্ভাব কবির মনকে করেছিল স্বপ্নাচ্ছন্ন, তাঁর নয়নে এঁকে দিয়েছিল মোহাঞ্জন। মাটির বন্ধন অস্বীকার করে তিনি সৃজন করেছেন নিজের জগৎ। তাঁর সেই স্বপ্নের জগতে তিনি ছিলেন একক, অনন্য। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে কবির। মোহমুক্ত মনে স্বীকার করলেন মাটির অচ্ছেদ্য বন্ধন। একান্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। দৃষ্টিতে এসেছে স্বচ্ছ ঋজুতা। তিনি তো নিঃসঙ্গ 'পথিকহীন' পথের বিচ্ছিন্ন পথিক নন। তিনি যে এই বিরাট বিশ্বের বিপুল প্রাণ প্রবাহেরই একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। তাঁর চারিদিক ঘিরে রয়েছে অসীম প্রাণের ভীড়। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে প্রত্যাবৃত্ত কবির চিত্তলোকেও ঘটে গেছে এক বিপ্লব। এই বিশাল প্রাণজগতের ভাবনা-উপলব্ধির সঙ্গে তিনি একীভূত করলেন তাঁর ব্যক্তি-মানসের স্বতন্ত্র অনুভবকে। ব্যষ্টি নয় সমষ্টির, খণ্ড নয় অখণ্ড জীবনের আনন্দ-বেদনাকে কবি দিলেন মুখরতা। বর্ষা আসছে তার দাক্ষিণ্য, বৈচিত্র্য আর বৈভবের অফুরন্ত সম্ভার নিয়ে। সমগ্র প্রাণ-জগৎ কাতর তারই আগমন প্রতীক্ষায়। সেই ব্যগ্র কামনা, আকুল-আকাঙ্ক্ষা কবির সংযত সংহত ছন্দময় কণ্ঠে লাভ করেছে চরম অভিব্যক্তি—

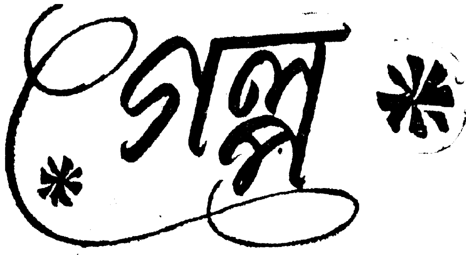
এসো হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কানন ভূমি,
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে।
ব্যথিয়া ওঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে।
উছলি ওঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়-ভরা
এসো হে এসো পিপাসা-হরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা ঘনায়ে এসো মনে।

অর্থমনর্থম্

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সকাল সন্ধ্যা খুঁজে মরি শুধু—কোথায় টাকা!
হায় ভগবান! তাই তো তোমারে হয় না ডাকা!
সাপের বিবরে, বাঘের বাসায়
যেতে পারি দুটো টাকার আশায়;—
লাঞ্ছনাভরা এ জীবন-গাথা অশ্রুমাথা।
স্নেহ-মায়া-প্রেম কিছু নাহি—আছে
কেবল টাকা—
কৃপণ ধনীর সিন্ধুকে যাহা র'য়েছে ঢাকা।
'টাকা' 'টাকা' ক'রে মরি তাই ঘুরে,
যতো ছুটি পিছে ততো যায় দূরে,
যাযাবর পাখী—সে যে যায় উড়ে বিথারি' পাখা!
পারি সব কিছু করিবারে—যদি পাইরে টাকা—
পেলেও অকা যাইরে মক্কা—দিল্লী—ঢাকা!

কেউটের গায়ে দিতে পারি হাত,
সহি অপমান ঘাড় ক'রে কাৎ,
বাঁকারে পারিগো বলিবারে সোজা—সোজারে বাঁকা!
কোথায় সুনীতি! কোথায় সুরুচি!—শুধুই টাকা,
টাকা রোজগার করিবার তরে এ প্রাণ রাখা!
এই বেঁচে থাকা—তাহার অর্থ—
দুই হাতে শুধু কুড়াও অর্থ—
আম্র কুড়ায়ে ফিরে যথা শিশু ভরিয়া ঝাঁকা!
চির-উপাস্য, তোমারি দাস্য করি হে টাকা,
তোমার বিহনে অচল আমার জীবন-চাকা।
তুমি না থাকিলে সংসারে কেবা
মহা মূর্খের করিত গো সেবা?
ছাড়ো যদি মোরে, কোন্ প্রয়োজনে বাঁচিয়া থাকা!



পূর্ব্ব পরিচয়

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

বম্বের "নাজ" সিনেমায় রবিবার সকাল দশটার "শো"তে "ব্রতচারিণী" দেখিতে গিয়াছিলাম।

একাই গিয়াছিলাম!

ইলেকট্রিক ট্রেণে "গ্রান্ট রোড" ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখনই দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সিনেমায় পৌঁছিতে আরও দশ মিনিট দেরী হইয়া গেল। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। গেট-কিপারের টর্চের আলোয় অন্য দর্শকদের বিব্রত করিয়া নিজের নির্ধারিত স্থান খুঁজিয়া নেওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়।

লজ্জাই হ'ল একটু। যা'দের বিরক্ত করিলাম, তাদের কাছে মাপ চাহিলাম।

দেরী হইবার একটু কৈফিয়ৎ ছিল। ইলেকট্রিক ট্রেণটি পথে বিগড়াইয়া না গেলে দেরী আমার হইত না। কিন্তু আমি তো নিমন্ত্রিত নই এই প্রেক্ষাগৃহে। আমার কৈফিয়ৎ শোনাবার শ্রোতা তাই এখানে নাই। নিষ্প্রয়োজনও বটে।

তন্ময় হইয়া ছবিখানি দেখিলাম।

ছবি শেষে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

আশ্চর্য হইয়া দেখি আমার ঠিক পাশেই আমার বহু-পুরাণো বন্ধু শৈবাল সেন! সস্ত্রীক! শৈবাল আমার সঙ্গে করমর্দন করিয়া বলিল—প্রশান্তবাবু যে! কি খবর?

আমি শৈবালের স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিলাম—এ কি, আপনি কাঁদছিলেন বুঝি?

লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন তিনি—"কৈ না তো!" চশমাটি খুলিয়া, ছোট্ট সিল্কের রুমালে তিনি তাঁর সজল চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

শৈবাল ঠাট্টা করিয়া মন্তব্য করিল—

"পয়সা খরচ করে কেন যে কাঁদতে আসো, বুঝি না আমি।"

আমাকে উদ্দেশ করিয়া শৈবাল বলিতে লাগিল—"আমি বলেছিলাম, "ব্রতচারিণী" না দেখতে আসার কথা। কিন্তু না, বাংলা ছবি হলেই হল। দেখতেই হবে ওই প্যানপ্যানানি! এসব আজকাল অচল। বলুন, একটু entertainment না হলে চলে আজকালকার এই ব্যস্ত জীবন?"

আমার মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই শৈবাল দরজার দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল—

চলুন গাড়ীতে গল্প হবে। ওঃ এ ভীড়ে কি কথা বলা চলে! কোথায় থাকেন?

—শৈবালের কথাই ভাবিতেছিলাম। চমকাইয়া বলিলাম—"আন্ধেরী"।

—"ঠিক আছে। আমরা থাকি জুহু বিচে। বেশীদূর পড়বে না।"

প্রেক্ষাগৃহের জনতার সঙ্গে আমরাও ধীরে ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম।

শৈবালের সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের কথাই ভাবিতেছিলাম তখন।

শৈবাল ও আমি একসঙ্গে I. Sc. ও B. Sc. পড়িয়াছিলাম একই ক্লাসে, একই কলেজে। শৈবাল ছিল ধনী, আমি ছিলাম তা'র চোখে কৃতী। আমি তা'র টিউটার ছিলাম বলা চলে। তাই বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাস করিয়া প্রবাসী হইয়া সে মস্ত ব্যবসাদার হইয়াছিল, শুনিয়াছিলাম। তাহার যথাযথ প্রমাণ পাইলাম তার সাজসজ্জায়, কথাবার্তায়, চলনে-বলনে-ধরণে।

আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ এখন অনেক। এই ভাবে শৈবালের সঙ্গে, তাও সস্ত্রীক দেখা হইয়া যাইবে

কল্পনাও করিতে পারি নাই। কেমন যেন বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। ধন্যও মনে করিতেছিলাম নিজেকে! হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম।

গেটকিপার আগাইয়া আসিয়া আমার ডানহাতটি তাহার দুইহাতে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

—"কি রে প্রশান্ত, চিন্‌তে পারিস্? ওঃ কতকাল পরে দেখা বল্‌তো?"

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। শৈবাল ও তাহার স্ত্রী আমাদের আশ্চর্য হইয়া দেখিতেছে।

আমি থতমত খাইয়া বলিয়া বসিলাম—"একটু ভুল কর্‌ছেন!"

গেটকিপারের মুখটি কেমন যেন হইয়া গেল। আশ্চর্য হইয়া আমাকে বলিল— "ভুল! ওঃ মাফ করবেন।" ভিড় ঠেলিয়া কোন রকমে বাহিরে আসিলাম। ঝক্‌ঝকে মস্ত বুইক্ মোটরে আমরা উঠিয়া বসিতেই গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল। শৈবাল ও তা'র স্ত্রী গেটকিপারের আশ্চর্য আচরণে তখনও হাসিতেছে।

আর আমি?

আমি ভাবছিলাম, • গেটকিপার কাঙ্গালীচরণের পূর্ব-পরিচয়ের কথা—আমাদের গ্রামের স্কুলে একই ক্লাসে যা'র সঙ্গে দিনের পর দিন পাশাপাশি বসিয়া পাঠ নিয়াছি, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলাম দুই জনে।…ওই বোধহয় অন্ধকারে আমার পথপ্রদর্শক হইয়া আমাকে আমার যথাস্থানে বসাইয়া দিয়াছে আজ।

আরমেনিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ*

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

স্মরণাতীত যুগ হতে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে—আরমেনিয়ার অধিবাসিদের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল। ভারতের মসলা, বস্ত্রশিল্প, বিশেষতঃ মসলিন এবং মূল্যবান রত্নাদির লাভজনক ব্যবসার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে আরমেনিয়ানগণ তাহাদের তুষার মণ্ডিত জন্মভূমি থেকে সুদূর ভারতবর্ষে আসত এবং তথাকার দ্রব্যাদি—আফগানিস্তান, পারস্য ও টেব্রিজানের পথে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করত। এই উপলক্ষে বহু আরমেনিয়ান ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় ১০ম শতকে মুসলমানদের ভারত অভিযানের সময় ভারতের প্রত্যেক বাণিজ্য কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজধানীতে আরমেনিয়ানদের দেখা যেত, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের সহিত আরমেনিয়ার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আরমেনিয়ায় খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পুঁথি ইত্যাদি তথাকার নানা ধর্ম মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সেণ্ট গ্রেগরী আরমেনিয়ার রাজা টিরিডেটস্‌কে (Tiridates) খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং রাজার আদেশে সকল প্রজা ঐ ধর্ম গ্রহণ করে। তৎপর সেণ্ট-গ্রেগরীর আদেশে নানা মন্দিরে রক্ষিত মূল্যবান গ্রন্থ সকল ধ্বংস করা হয়।

সেণ্ট গ্রেগরীর অন্যতম প্রথম শিষ্য সিরিয়াবাসী জেনব অথবা জেনোবিয়াস (Zenob or Zenobias) গুরুর নির্দ্দেশমত আরমেনিয়ার একটি প্রধান প্রদেশ তরোনের (Taron) ইতিহাস সিরীয় ভাষায় রচনা করেন এবং পরে তাহা আরমেনিয়ার ভাষায় অনুবাদ করেন। আরমেনিয়ার ভাষায় অনূদিত তরোনের ইতিহাস ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে—মেখিথারিষ্ট ফাদারগণ (Mekhitharist Fathers) কর্ত্তৃক—ভেনিস নগরে মুদ্রিত হয়। উক্ত ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসরব্যাপী আরমেনিয়ায় হিন্দু উপনিবেশের কাহিনী এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্দুদের সঙ্গে পৌত্তলিক আরমেনিয়ার প্রথম খৃষ্টান-প্রচারকদের যে ধর্ম্ম যুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু উপনিবেশের কাহিনীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

---

* পরলোকগত অধ্যাপক মেসরব জ্যাকব শেঠ (Mesrovb Jacob Seth) ১৯২৬ সালে Historical Records Commission এর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে "আরমেনিয়ায় হিন্দু" (Hindoos in Armenia) নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

হিন্দু উপনিবেশের বিবরণ

কান্যকুব্জের (কনৌজ) দিনাক্ষপালের (Dinaskspall) গিশানে (Gissaneh—কৃষ্ণ) এবং ডিমিটার (Demeter—জগন্নাথ অথবা গণেশ) নামক হিন্দু রাজকুমারদ্বয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাক্রমে উক্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ায় রাজকুমারদ্বয় রাজরোষজনিত সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা পাওয়ার মানসে দেশত্যাগ করে পলায়ন করেন—এবং ক্রমে সুদূর আরমেনিয়াতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা আরসাসিডি (Arsacidæ) বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বালারসেসিস (Valarsaces) কর্তৃক খৃঃ পূঃ ১৪৯ সনে সাদরে অভ্যর্থিত হয়ে আশ্রয় পান এবং রাজোচিত পদ মর্যাদা লাভ করেন।

আরমেনিয়ার রাজা হিন্দু বাস্তুহারাদের প্রতি প্রীত হয়ে তাহাদিগকে তরোন প্রদেশ অর্পণ করেন। হিন্দু রাজপুত্রদ্বয় উক্ত প্রদেশে একটি অতি সুন্দর নগর নির্মাণ করেন এবং তাহাদের তক্ষক বংশের (Takshak House) স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত নগরের নাম বিসাপ (Veeshap ; বিসর্প) রাখেন। তৎপর তাঁহারা পৌত্তলিক আরমেনিয়ার দেব দেবীর মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ অষ্টিসট (Ashtishat) নগরে গমন করে তথায় তাঁহাদের দেশের (ভারতের) উপাস্য দেব দেবীর মন্দির স্থাপন করেন।

দীর্ঘকাল নিরুপদ্রব শান্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে ছিল না, কারণ কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা আরমেনিয়ায় আগমনের ১৫ বৎসর পরেই রাজা কর্তৃক নিহত হন। ইহার কোন কারণ ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন অথবা তাঁহারা রাজার আতিথেয়তার অবমাননা করেছিলেন।

রাজকুমারদ্বয়ের সঙ্গে বহুসংখ্যক বংশধর ও অনুচর ছিল। উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদিগকে দেবতারূপে (deified) পূজা করতে লাগলেন।

ঐতিহাসিক জেনবের মতে কুমারদ্বয়, কুয়ারস (Kuars), মেঘটেস (Meghtes) এবং হরিয়েন (Horean) তিন পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। আরমেনিয়ার রাজা তাঁহাদিগকে তরোন প্রদেশের উপনিবেশ পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। উঁহারা তিনজন পৃথক পৃথক তিনটি নগর স্থাপন করে তাঁহাদের নামানুসারে নগরগুলির নাম যথাক্রমে—কুয়ার (Kuar), মেঘটি (Meghti) এবং হরিয়েনস্ (Horeans) রাখেন।

উপরোক্ত নগরগুলিতে কিছুদিন বাস করার পর তাঁহাদের প্রথম নির্বাচিত স্থানগুলি পছন্দ না হওয়ায় তাঁহারা নূতন স্থান সন্ধানে খড়ক (kharkh) পাহাড় অঞ্চলে গমন করেন। স্থানটি সুন্দর, স্বাস্থ্যকরও শীতল এবং শিকার, তৃণ ও বন সম্পদে সমৃদ্ধ দেখে তাঁহারা মনোনীত করেন এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে ৪৫০ বৎসর ব্যাপী (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হ'তে খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত) রাজত্ব করেন। তাঁহারা সেখানে মন্দির নির্মাণ করে তাঁহাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে গিসানে ও ডিমিটার নামক দুইটি দেবমূর্তি স্থাপন করেন। মূর্তি দুইটি ধাতুতে নির্মিত। প্রথম মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ১২ হাত ও দ্বিতীয় মূর্তির দৈর্ঘ্য ১৫ হাত ছিল। মন্দিরের পুরোহিতগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। হিন্দুরা তৎকালীন আরমেনিয়ার পৌত্তলিক গভর্ণমেন্টের বিশেষ প্রিয়ভাজন হন এবং তাহাদের আনুকূল্যে হিন্দু উপনিবেশ দীর্ঘকাল উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে ; কিন্তু ৩০১ খৃষ্টাব্দে পৌত্তলিক আরমেনিয়ায় প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি রাজার অনুগ্রহ অতি দ্রুত মন্দা হয়ে আসে এবং আরমেনিয়ার জাতীয় দেবদেবীর মূর্তির সহিত হিন্দুর মন্দির দুইটি ও তন্মধ্যে স্থিত মূর্তিদ্বয় নির্মম মূর্তিধ্বংসকারী সেন্ট গ্রেগরী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। যে সকল পুরোহিত বাধা দিয়েছিল তাহাদিগকে সেখানেই হত্যা করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের স্থানে গ্রেগরী একটি মঠ (monastery) নির্মাণ করে তথায় তৎকর্তৃক সিসেরিয়া (Ceaseria) থেকে আনীত সেন্ট জন ও সহীদ আথানাগিনের (Athanagineh) স্মৃতি চিহ্ন রক্ষা করেন। উক্ত পবিত্র মঠ যাহা ৩০১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল—তাহা মুসের সেন্ট ক্যারাপিয়েট (St. Carapiet of Moosh) নামে পরিচিত হয়ে অদ্যাপি বর্তমান আছে এবং পৃথিবীর যাবতীয় আরমেনিয়ানদের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

হিন্দু মন্দিরের পুরোহিতগণ তাঁহাদের জাতীয় মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস হচ্ছে দেখে সাশ্রুলোচনে তাঁহাদের ভূতপূর্ব পৌত্তলিক আরমেনিয়ান ভ্রাতাদের নিকট অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে তাঁহাদের মহান দেবতা গিমানের মূর্তি ধ্বংস না করে বেন তৎপরিবর্তে তাঁহাদিগকে হত্যা করা হয়। এই প্রতিরোধের জন্য ৬ জন হিন্দু পুরোহিতকে সেই স্থানেই হত্যা করা হয়।

আরমেনিয়ান ও হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপন হওয়ার পর সিউনেস বংশের (the house of Siunies) আরমেনিয়ান রাজপুত্র হিন্দুদের গ্রাম কুয়ারস গমন করেন এবং তথাকার অধিবাসিগণকে পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত করেন। তাহাদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং আইজাসান (Ayzasan) উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেন্ট গ্রেগরী কর্তৃকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী জেনবের মতে নবসরদের (Navasard—প্রাচীন আরমেনিয়ার নববর্ষে) প্রথম দিনে ৫০৫০ হিন্দু পুরুষ ও বালকগণকে দীক্ষিত করা হয়। পরে অন্য এক নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেন্ট গ্রেগরীর পিতার ন্যায় আচরণ ও অনুরোধ সত্বেও ধর্মান্তরিত কতক হিন্দু তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের পৌত্তলিক আচার ব্যবহার আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। তাহারা শুধু ইহাতেই ক্ষান্ত না হয়ে আরমেনিয়ার রাজকুমারগণকে বিদ্রূপ করে বলেছিল যে যদি তাহারা জীবিত থাকে তাহলে তাহারা এই কঠোর ব্যবহারের জন্য প্রতিশোধ নেবে এবং যদি তাহাদের মৃত্যু হয় তা হলে দেবতাগণ তাদের পক্ষ হয়ে আরমেনিয়ানদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করবে। ইহাতে অনবেঘের (Angegh)

রাজকুমার ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুদিগকে ফইটাকরণ (Phaita-kran) নগরীতে নিয়ে গিয়ে অন্তরীণ করতে আদেশ দেন। তদনুসারে ৪০০ হিন্দুকে উক্ত নগরীতে নিয়ে গিয়ে অবরুদ্ধ করা হয় এবং অপমান ও অধোগতির চিহ্ন স্বরূপ তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত করা হয়।

জেনবের বিবরণ হতে জানা যায় যে খৃঃ পূঃ ১৫০ সনে উপনিবেশ স্থাপনের পর হতে ৩০১ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসরের মধ্যে হিন্দুদের প্রভূত পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হয় এবং তাহারা উর্ব্বর তারোন প্রদেশে একটি বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ গড়ে তোলে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পূর্ব পর্য্যন্ত হিন্দুরা আরমেনিয়ার একটি বিশিষ্ট ও পৃথক জাতি হিসাবে পরিগণিত ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থানীয় খৃষ্টান জনগণের অঙ্গীভূত হয়েছে। এখন আর তাহাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই।

হিন্দুরা বিনা প্রতিরোধে ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি। তাহারা নব-খৃষ্টধর্মাবলম্বী আরমেনিয়ানদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক জেনব হিন্দুদিগকে প্রথম দেখেন। তিনি বলেন, হিন্দুরা লম্বা চুল এবং তাহাদের চেহারা অপ্রিয়-দর্শন ও বর্ণ কালো ছিল। তাহাদের দেবতা গিমানের লম্বা তরঙ্গায়িত চুল ছিল এবং এই কারণে তাহারাও দীর্ঘ কেশ রাখত।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমি 'হেরি'তে কুড়িদিন ছিলাম। সেই সময় আমি ঘোড়ায় চড়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। যে সব দ্রষ্টব্য স্থান আগে আমার দেখা হয় নি সেগুলো এবার দেখেছি। এই সব দেখার ব্যাপারে ইউসুফ আলি রাকুলতাস আমার গাইডের মত ছিল। সে আগে থেকেই আমার দ্রষ্টব্য স্থানের কাছে এমন নিশানা রাখতো যা দেখে সেখানেই আমি থামতাম। এই কুড়ি দিনে আমি সুলতান হোসেন মির্জ্জার মঠ ছাড়া আর সব দ্রষ্টব্য স্থানই সম্ভবতঃ দেখেছি। দেখেছি—ধবল মাঠ, খালিসেরের উদ্যান, কাগজ তৈরীর কারখানা, রাজ সিংহাসন, কা'র সেতু, ধবল মাঠের ধারে ছায়াশীতল মনোরম পথ, সাফের প্রাসাদ, নবাই-এর সিংহাসন, বারকারের সিংহাসন, সেখ উমের ও সেখ জৈনুদ্দিনের সিংহাসন, আবদুল রহমানের সমাধিক্ষেত্র, মাছ ভরা পুকুর, মির্জ্জাদের শিক্ষাভবন ও কবরস্থান, সাহবেগমের শিক্ষাভবন ও তাঁর তৈরী জমকালো মসজিদ। আরও দেখেছি—কাক বাগান, নতুন বাগান, জাবিদার বাগান, সুলতান আবু সৈয়দের তৈরী শ্বেত প্রাসাদ, সৈনিকের আসন, মালানের সেতু, খাজার অলিন্দ, আর শ্বেত উদ্যান, প্রমোদ আবাস, সন্তোষ প্রাসাদ, কমল প্রাসাদ, দ্বাদশ গম্বুজ, বিরাট জলাধার, আর তার চার ধারে চারটি ইমারত, নগর প্রাচীরের পাঁচটি ফটক—রাজা ফটক, ইরাক ফটক, পিরোজাবাদ ফটক, খুস্ ফটক আর কিপচাক ফটক। দেখেছি—রাজার বাজার, সাধারণের বড় বাজার, সেখ উল ইসলামের শিক্ষা ভবন, রাজাদের বৃহৎ মসজিদ, নগর উদ্যান, আন্জিল নদীর তীরে তৈরী বদিয়া এজ জেমানের বিদ্যায়তন। আরও দেখেছি—আলি সের বেগের আবাস বাটী—যাকে লোকে বলে—আরাম প্রাসাদ, তাঁর কবরখানা এবং বড় মসজিদ—যাকে বলে পবিত্র মসজিদ, তাঁর শিক্ষা ভবন ও মঠ—যাকে বলে সাধু মঠ, তাঁর স্নানাগার এবং দাতব্য চিকিৎসালয়—যাকে লোকে বলে স্বাস্থ্যকর ও মালিনী রোধক। সমস্তই আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে দেখেছি।—

শীত ঋতু এসে পড়েছে। যে পর্ব্বত শ্রেণী আমার রাজ্যকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেখানে তুষারপাত আরম্ভ হয়েছে। কাবুলের এখন কি অবস্থা জানবার জন্য আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। শেষে, প্রয়োজনের তাড়নায় অথচ আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তার ব্যাখ্যা করতে না পেরে আমি শীত-আবাসে যাচ্ছি—এই ছলনা করে বেরিয়ে পড়লাম।

যখন আমরা 'হেরি' ছেড়ে চলে আসি তখন থেকেই ক্রমাগত তুষার-পাত হচ্ছিল। দুই তিন দিন পর দেখা গেল রাস্তায় পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। ঘোড়ার জিনের রেকাব পর্য্যন্ত বরফ উঠেছে। এমন কি অনেক জায়গায় ঘোড়ার পা বরফ ভেদ করে মাটি পর্য্যন্ত পৌঁচচ্ছিল না। বিসাই নামে আমাদের একজন 'গাইড' ছিল।—জানি না তার বার্দ্ধক্যের জন্যই হোক, বা তার হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতার জন্যই হোক, বা অস্বাভাবিক তুষার পাতের জন্যই হোক তার সব গুলিয়ে গিয়েছিল। সে পথের নিশানা একবার হারিয়ে ফেলার পর আর কিছুতেই ঠিক করতে পারলো না যে কোনদিকে পথ। সে আর তার ছেলেরা তাদের যশ রক্ষা করার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে বরফ সরিয়ে একটা রাস্তা বের করলো। সেই পথে আমরা এগিয়ে চললাম। পরদিন এত বরফ পড়লো যে আর রাস্তার কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না যদিও এর জন্য অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করা গেল। বাধ্য হয়ে আমাদের সম্পূর্ণ নেমে যেতে হলো। আর কোনও উপায় না দেখে আমরা যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরে একটা জায়গায় থামলাম যেখানে প্রচুর জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। ষাট সত্তর জন বাছাই করা লোককে যে রাস্তায় আমরা ফিরলাম সেই রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে গিয়ে কোনও উঁচু জমি দেখা যায় কিনা এবং

সেখানে হাজরাসরা বা অন্য কোনও লোকেরা শীতকালীন আবাস নির্মাণ করে বাস করছে কিনা দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। তা ছাড়া, পথের নিশানা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া যায় কিনা তাও দেখবার জন্য বলে দিলাম।

আমরা এই জায়গায় তিন চার দিন অপেক্ষা করলাম লোকগুলোর ফিরে আসার পথ চেয়ে। তারা অবশ্য ফিরে এলো কিন্তু তারা কোনও গাইডের সন্ধান পায় নি। তারপর ভগবানের ওপর ভরসা করে আমরা আবার যে রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে এখানে নেমেছিলাম সেই রাস্তা দিয়েই আবার এগোতে লাগলাম—বিসাইকে আগে আগে যেতে বলে। পরবর্ত্তী কয়েক দিন আমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট ও নানা অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছিল। বাস্তবিক এ রকম দুঃখ কষ্ট আমার জীবনে অল্পই ভোগ করেছি। এই সময়ে আমি এই কবিতাটি রচনা করি—

'কোন্ ভাগ্য বিড়ম্বনা,
অদৃষ্টের পরিহাস
করে নাই আমাকে দহন?
কোনও দুঃখ আছে নাকি বাকি
যার মুখোমুখি
হয় নাই আমার জীবন?'

প্রায় সপ্তাহ খানেক গভীর বরফ মাড়িয়ে আমরা দুই তিন মাইলের বেশী অগ্রসর হতে পারিনি। আমরা দশ পনরো জন, কাশিম বেগ, তার দুই ছেলে আর দুই তিন জন ভৃত্য ঘোড়া থেকে নেমে বরফ গুঁড়ো করে পথ পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলাম। প্রথমে যে এই কাজে লাগলো সে কয়েক পা এগিয়ে হাঁফিয়ে পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল এবং আর একজন তার জায়গায় গিয়ে কাজ সুরু করলো। দশ পনরো বিশ জন এই ভাবে বরফ চূর্ণ করে পথ পরিষ্কার করার পর এক একটা ঘোড়াকে সওয়ার ছাড়াই সেই পথ টুকু এগিয়ে নিয়ে আসা হলো। প্রথম ঘোড়াটি দশ পনরো পা এগিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাকে তখন এক পাশে রেখে আবার আর একটাকে আনা হলো। আমরা দশবিশ জন বরফ গুঁড়িয়ে রাস্তা করে আমাদের সমস্ত ঘোড়াকেই নিয়ে এলাম। আমাদের অবশিষ্ট সেনা, ভাল ভাল লোকজন এমন কি অনেক 'বেগ' উপাধিধারীরাও ঘোড়ার পিঠে বসেই চূর্ণ বরফের ওপর দিয়ে মাথা হেট করে এগিয়ে এলো। এরকম ব্যাপার দেখেও কর্ত্তৃত্ব জাহির করে তাদের কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না। যাদের তেজ আছে ও প্রতিযোগিতায় নামতে ইচ্ছা আছে তাদের অবশ্য এ সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়াই উচিত। আমরা বরফ চূর্ণ করা রাস্তা ধরে চলতে চলতে 'আনুজুকান' নামে একটা জায়গায় পৌঁছোই। তারপর আবার তিন-চারদিন ধরে চলে জিরিন গিরি সঙ্কটের নীচে একটা গুহার কাছে এসে গেলাম।

সেদিন ভীষণ জোরে বেয়াড়া হাওয়া বচ্ছিল। এত বেশী বরফ পড়ছিল যে মনে হলো আমরা সবাই এক সঙ্গে মারা যাব। আমরা গুহার মুখে থেমে গেলাম। বরফ এমন পুরু হয়ে পড়েছিল আর রাস্তাটা এত সরু ছিল যে একজন ছাড়া যাওয়া চলে না। ঘোড়াগুলো [illegible] বরফের ওপর দিয়ে অতি কষ্টে এসে গেল।

শীত কালের দিনগুলো খুবই ছোট। প্রথম দল সৈন্য দিনের আলো থাকতে থাকতেই এসে পৌঁছায়। রাত্রি হয়ে গেলে অন্যান্য সৈন্য আর এসে পৌঁছাতে পারেনি। তারা যে যেখানে পৌঁছে ছিল সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষা করছিল। কেউ কেউ বা রাত্রিতে ঘোড়ার পিঠে বসে ছিল।

গুহাটি ছোট। আমি একটা কোদাল দিয়ে গুহার মুখের কাছে বরফ সরিয়ে নমাজের জন্য যেটুকু গালিচার আসন লাগে ততটুকু ছোট জায়গা বিশ্রামের জন্য পরিষ্কার করি। বরফে আমার বুক পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছিল তবুও পা মাটিতে ঠেকেনি। যাই হোক এই গর্ত্তটা আমাকে বাতাসের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করেছিল। বরফের দেওয়াল ঘেরা একটু খানি জায়গায় আমি বসেছিলাম। কেউ কেউ আমাকে বলেছিল গুহার ভেতরে যেতে। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার মনে হয়েছিল যখন আমার লোকজন বাইরে তুষার পাত সহ্য করে বরফের মধ্যে কাটাবে তখন আমি গুহার মধ্যে গরম আবহাওয়ার আরামে ঘুমোবো—তা' কখনও হতে পারে না। যারা আমার সঙ্গী তাদের চরম দুঃখ ও বিপদের মধ্যে ফেলে, তাদের দুঃখ কষ্টের অংশ ভাগী না হয়ে নিজের সুখের চিন্তা করার মত দায়িত্বজ্ঞান হীন মনোভাব আমি কখনও দেখাতে পারি না। এটা ঠিক তারা যে দুঃখ কষ্ট এবং অসুবিধাগুলো আমার জন্য ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে সেই দুঃখ কষ্ট অসুবিধার ভাগও আমাকে গ্রহণ করতে হবে। ফার্সিতে একটি কথা আছে—বন্ধু বান্ধবদের সান্নিধ্যে মরণও একটা উৎসবের মত। আমি সেই তুষার পাতের মধ্যে সেই ছোট গর্ত্তটির মত জায়গায় বসে রইলাম রাত্রির নমাজের সময় পর্য্যন্ত।—আমার পা জড়ো করে বসেছিলাম। তখন এমন জোরে বরফ পড়তে লাগলো যে আমার মাথায়, ঠোঁটে, কানে চার ইঞ্চি পরিমাণ বরফ জমে গেল। সেই রাতেই আমার কান ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা করতে লাগলো। রাত্রের নমাজের পর একদল লোক গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো যে গুহাটি বেশ প্রশস্ত। সেখানে এমন বিস্তৃত জায়গা রয়েছে যে আমাদের দলের সকলেই গুহার মধ্যে অনায়াসে থাকতে পারে। এই কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ও মুখের ওপর জমা বরফ ঝেড়ে ফেলে গুহার মধ্যে চলে এলাম। যারা কাছাকাছি ছিল তাদের সকলকেই গুহার মধ্যে চলে আসতে বললাম। পঞ্চাশ ষাট জন লোকের থাকার মত জায়গা গুহার মধ্যে পাওয়া গেল। আমাদের সঙ্গে যে সব খাবার—যেমন ঝলসানো মাংস এবং আর যা কিছু — সঙ্গে ছিল সেগুলো বের করা হলো। এই ভাবে আমরা তুষারপাত, বরফ ও শীতল হাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে নিরাপদ, গরম, আরামদায়ক আস্তানায় নব জীবন লাভ করলাম।

পরদিন সকালে তুষার পাত ও ঝড় থেমে গেল। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আবার সেই আগেকার মত বরফ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ করে চলা সুরু হলো। গিরি সঙ্কটের তলায় আসার আগেই

ভারতবর্ষ

কুয়াশা



স্রষ্টা : মদনগোপাল পাল

আঁকাবাঁকা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শেষ হয়ে এলো। আমরা পাহাড়ের মধ্যে এক সমতলক্ষেত্রে এসে পৌঁছে গেলাম।

সেদিন রাত্রে অসহ্য ঠাণ্ডায় আমাদের খুবই কষ্ট পেতে হলো। অনেকের হাত পা শীতের প্রকোপে অকেজো হয়ে গেল। কোপেকের ও সুলুকের হাত দুটো ও আখির পা একেবারে জখম হয়ে গেল ঠাণ্ডায়। পরদিন ভোরে আমরা ঢালু পথ দিয়ে নামতে লাগলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ঠিক রাস্তা দিয়ে আমরা চলছি না—তবুও আল্লার ওপর আস্থা রেখে আমরা চলতে লাগলাম। ধীরে ধীরে এই দুরূহ পথ ধরে নীচে নামতে সুরু করলাম। সন্ধ্যার নমাজের সময় আমরা সেই পথ পার হয়ে এলাম। অতি বৃদ্ধলোকও স্মরণ করতে পারে না যে এই রকম বরফ ভেঙ্গে কেউ কোনও কালে এই গিরি-সঙ্কট দিয়ে নেমে এসেছে। এই ঋতুতে কেউ এই পথ অতিক্রম করতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। যদিও আমরা এই কয়দিন অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছি—তবু একথা বলতে হবে যে গভীর বরফপাতের জন্যই আমরা এই পথে যাত্রা শেষ করতে পেরেছি। যদি এই ভাবে বরফ না জমে থাকতো তা হলে কি করে আমরা খাড়াই পথ এবং পাহাড়ে' নদীগুলি অতিক্রম করতাম? বরফ জমে থাকার জন্যই আমরা তার ওপর দিয়ে চলে আসতে পেরেছি। বরফের প্রাচুর্য্য না থাকলে আমাদের ঘোড়া আর উট গভীর আবর্ত্তে পড়েই ডুবে যেত।

ভাল মন্দ দুইটাই
ভগবান-আশীর্ব্বাদ।
এটা যদি বুঝে থাক
ঘটিবে না পরমাদ।'

রাতের নমাজের সময় আমরা আউলিংএ পৌঁছাই। এখানকার অধিবাসীরা যখন শুনলো যে আমরা পাহাড় থেকে নেমে এসেছি তখন আমাদের তারা তাদের উষ্ণ কুটিরে নিয়ে এলো। আমাদের জন্য চর্ব্বি-ওয়ালা ভেড়া, ঘোড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘাস আর দানা, আর আগুন জ্বালানোর জন্য শুক্‌নো ঘঁসি নিয়ে এল। বরফের রাজ্য অতিক্রম করে এই গরম আস্তানায় আসা, অনাহারের কষ্ট দূর হয়ে এমন চর্ব্বিওয়ালা মাংস এবং ভাল রুটি খেতে পাওয়া যে কি আনন্দের বস্তু—তা আমাদের মত দুর্ভোগ যারা ভুগেছে তারাই বুঝতে পারে।—

একদিন আউলিংএ অবস্থান করে আমার সঙ্গীদের মনোবল ও দেহের শক্তি ফিরিয়ে আনি। তারপর আবার রওনা হয়ে আট মাইল অতিক্রম করে থামি। পরদিন সকালেই রমজান উৎসব। আমরা যে রাস্তায় যাচ্ছিলাম তুর্কোমান হাজারাসদের শীতকালের আস্তানা সেই পথের ধারেই ছিল। তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং মালপত্র নিয়ে এ দিকেই বাস করছিল। আমাদের আসার কথা একটুও জানতে পারে নি। পরদিন সকালে আমরা এগিয়ে যেতেই তাদের কুটীর ও ভেড়ার খোঁয়াড়গুলোর মধ্যে এসে পড়ি। দুই তিন জায়গায় লুঠতরাজও করা হলো। হাজারাসরা ভয় পেয়ে তাদের কুটীর ও সম্পত্তি ফেলে রেখে তাদের ছেলে পেলে নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আমাদের অগ্রবর্ত্তী দলের কাছ থেকে সংবাদ এলো যে হাজারাসদের কয়েকজন আমাদের যাওয়ার পথের ওপর জমায়েত হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে আমার লোকজনদের থামিয়ে তীর দিয়ে আক্রমণ করে তাদের এগোবার পথ বন্ধ করেছে। এই সংবাদ পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। এসে দেখি যে জায়গাটা কোনও গিরিপথ নয়। তবে হাজারাসরা একটা ঢালু পাহাড়ের গায়ে তাদের আসবাব পত্র জমা করে রেখে আমার লোকদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছে।

(তুর্কিতে) শত্রুর পাল দেখা গেল দূরে
জমাট কালো মেঘের মত
আমার সেনা দাঁড়িয়ে গেল
আতঙ্কে হয়ে অভিভূত।
বল্লাম তাদের—'কিসের ভয়?
সাহস করে রুখে দাঁড়াও,
ভীরুতার সময় এটাতো নয়।
আমি চাই—তারা সাহস ভরে
ঝাঁপিয়ে পড়ুক শত্রুর ঘাড়ে।
লোকজনদের এগিয়ে দিয়ে,
রইলাম আমি সব পিছনে।
কিন্তু যতই আমি তাড়া লাগাই,
আমার আদেশ তোলে না কানে।
আমার গায়ে ছিল না বর্ম্ম।
অশ্বপৃষ্ঠও বর্ম্ম শূন্য,
অস্ত্র সম্ভার অতি নগণ্য,
সম্বল শুধু ধনুক তীর।
যখনই আমি দাঁড়িয়ে যাই
অনুচররাও ঠিক করে তাই।
নিশ্চল ঠিক পাথরের মত
যেন শত্রুর হাতে, হয়েছে হত।
ভৃত্যের বল কিবা প্রয়োজন
যদি না বিপদে সহায় হয়।
প্রভু যদি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে
এগুলো কি তার উচিত নয়?
চুপ করে থাকা এ কোন্ নীতি
মানব যেখানে হাবুডুবু খায়।
বিশ্বাসী নোকর সেই তো হবে।
কাজে কর্ম্মে যে ফাঁকি না দেবে।

* * * *

অবশেষে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে
শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলাম,
সামনে শত্রু তাড়িয়ে দিয়ে,

পাহাড়ের পরে' উঠে যে এলাম।
আমার লোকেরা ব্যাপার দেখে
সাহসে তখন বাঁধিয়ে বুক,
ধেয়ে চলে আসে আমার পেছনে
ভয় নাই তাদের এত্‌তোটুক।
শক্রর তীর তুচ্ছ করে
পাহাড়ের গায়ে উঠতে থাকি।
ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বাধা দিতে চায়
বাধা মানার লোক আমরা নাকি ?
ঘোড়া থেকে নেমে কখনও বা চড়ে।
সাহসী যোদ্ধা চলে আসে উঠে।
তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে হয়রাণ হয়ে
শত্রুরা তখন পালায় ছুটে।
দুর্জ্জয় মোদের সাহস দেখে
তারা কি কখনও দাঁড়াতে পারে ?

* * *

পাহাড় শীর্ষ জয় করে নিয়ে,
হরিণের মত লাফ-ঝাঁপ দিয়ে,
তুচ্ছ করে গুহা, চড়াই, উৎরাই
হাজারাসদের পিছু পিছু ধাই।
গলা কেটে ফেলে পশুদের মত,
লুঠ করে তাদের মালপত্র যত।
ভাগ করে দিই লুঠের মাল।
হাজারাস যেন ভেড়ার পাল।
যারা চলে গেছে অনেক দূরে
তাদের পেছনে ধেয়ে চলে যাই,
বন্দী করে সব স্ত্রী ও পুরুষ
ছোট ছেলে মেয়েও বাদ যায় নাই।

এই কবিতার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই :—আমার অগ্রবর্ত্তী সেনাদের হাজারাসরা রাস্তার মাঝে নামিয়ে দিলে তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় আমি একা এগিয়ে আসি। যারা পালাচ্ছিল তাদের হাঁক দিয়ে বলি—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তাদের মনের বল ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে ? শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তাদের কোনও চেষ্টাই নাই। তারা নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। যদিও আমার শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম্ম কিংবা কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, কেবল মাত্র তীর ধনুক সম্বল, তবুও সাহস ভরে ওদের ডাক দিয়ে বল্লাম,—ভৃত্য রাখার দরকার এই জন্যই যে তারা কাজের উপযোগী হবে এবং প্রয়োজনের সময় প্রভুর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ দেবে। প্রভু শত্রুর দিকে এগিয়ে যাবে, আর ভৃত্যরা তাই দাঁড়িয়ে দেখবে—এই জন্য কেউ ভৃত্য রাখে না। এই কথা বলেই আমি দ্রুত ঘোড়া ছুটাই। যখন আমার লোকেরা দেখলো যে, আমি শত্রুর দিকে ছুটছি তখন তারাও আমাকে অনুসরণ করলো। যে পাহাড়ের ওপর হাজারাসরা জড়ো হয়েছে তার কাছে পৌঁছিয়ে আমার সৈন্যরা পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করলো। ওপর থেকে অনবরত শরবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা ঘোড়ার পিঠে কিংবা পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে লাগলো। শত্রুরা যখন দেখলো যে আমার লোকজন বেপরোয়া, তখন আর তারা মাটি আঁকড়ে থাকতে ভরসা পেল না। পালাতে শুরু করলো। আমার লোকেরা পাহাড়ের ওপর তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে বন্ধ পশুর মত শিকার করতে লাগলো। শত্রুপক্ষের মাল-পত্র যা চোখে পড়ল সে সব লুঠ করলো এবং তাদের আর তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এল। কতকগুলো ভেড়া আটক করে সেগুলো ইয়ারেকের হেফাজতে রেখে আমরা সম্মুখের দিকে এগিয়ে চল্লাম।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশের উঁচুনীচু সব জায়গা অতিক্রম করে হাজারাসদের ঘোড়া আর ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে লেঙ্গারে চলে এলাম এবং সেখানেই শিবির স্থাপন করলাম। চোদ্দ পনরো জন কুখ্যাত বিদ্রোহী নেতা ও ডাকাতের সর্দার আমাদের হাতে বন্দী হলো। আমার ইচ্ছা ছিল যে তাদের শরীরে নানা কষ্ট দিয়ে হত্যা করে এমনএকটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা— যাতে এই রকম শাস্তি দেখে অন্য সব বিদ্রোহী আর দস্যুরা ভয়ে সাবধান হয়ে যায়। কিন্তু কাসিম বেগের অন্তরে এমন অহেতুক করুণার উদয় হলো যে সে তাদের মুক্তি দান করলো।

'মন্দজনের ভাল করা
(আর) ভাল লোকের মন্দ করা
একই ভাষা।
নোনা মাটিতে শস্য বোনা,
শীষ হবে না একটি কণা।
বৃথাই আশা।'

এই রকম করুণাই আর সকল বন্দীর প্রতি দেখানো হলো। তারা সকলেই মুক্তি পেল।

তুর্কোমান হাজারাসদের শায়েস্তা করার জন্য যে সময়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় খবর পেলাম যে মহম্মদ হোসেন আর বিরলাস—যে সব মোগলকে আমরা কাবুলে রেখে এসেছিলাম—তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য দলে টেনে নিয়ে খান মির্জ্জাকে কাবুলের রাজা বলে ঘোষণা করে কাবুল অবরোধ করেছে। অবশ্য কাবুল দুর্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ওদের দলে না গিয়ে দুর্গ সুরক্ষিত করে সেটা রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

লেঙ্গার তাইমুর বেগ থেকে আমি কাবুলের সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাওদের চিঠি লিখে জানাই যে আমি এখানে এসে পৌঁচেছি। সেই চিঠি কাসিম বেগের একজন ভৃত্য মহম্মদ আন্দেজানির হাত দিয়ে পাঠাই। তাদের গোপনে জানিয়ে দিলাম যে খুরকেন্দ গিরি সঙ্কট দিয়ে নেমে এসে আচমকা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমার পৌঁছানোর সঙ্কেত স্বরূপ মিনার পাহাড় অতিক্রম করেই একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাব, আর তাই দেখে ওরা যেন দুর্গের ওপরে উন্মুক্ত মণ্ডপে যেখানে খাজাঞ্চিখানার কাজ

হয়—সেখানে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালায়—যা দেখে আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারি যে তারা আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছে। যখন আমরা বাইরে থেকে শত্রুদের আক্রমণ করবো, তারা যেন তখন দুর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—যাতে দুর্গ অবরোধকারীরা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়। এই রকম উপদেশই আমি মহম্মদ আন্দেজানি মারফৎ তাদের কাছে পাঠাই।

পরদিন সকালে লেঙ্গার ত্যাগ করে উসটার—সেহারের বিপরীত দিকে থামি। দুপুরের আগেই আবার ঘোড়ায় চড়ে রাত্রি নাগাদ গিরি-সঙ্কট পার হয়ে সির-ই-পুলে আসি। সেখানে ঘোড়াদের স্নান করিয়ে, দানা জল খাইয়ে তাদের চাঙ্গা করে নিয়ে দুপুরের নমাজের সময় আবার বেরিয়ে পড়ি। তুতকা ওয়েন পর্যন্ত পথে কোনও বরফ ছিল না। সেই জায়গা অতিক্রম করে যতই এগোতে লাগলাম ততই বরফ গভীর হচ্ছে দেখা গেল। শীত এমন তীব্র বোধ হচ্ছিল যে আমার জীবনে এমন ঠাণ্ডা বোধহয় কমই ভোগ করেছি। পাহাড়ের প্রান্তে ঘোড়া থেকে নেমে তীব্র শীতে অস্থির হয়ে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করতে লাগলাম। এটা কিন্তু সে জায়গা নয় যেখানে আগুন জ্বালিয়ে সঙ্কেত জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তীব্র শীত সহ্য করতে না পেরে আমরা আগুন জ্বালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। সকাল হতে না হতেই পাহাড়ের প্রান্ত থেকে আমরা রওনা হই। বরফ ঘোড়াগুলোর উরু পর্য্যন্ত উঠেছিল। সমস্ত রাস্তাটাই বরফের মধ্যে উঠে নেমে অতিক্রম করেছিলাম। এই ভাবেই আমরা কারও চোখে না পড়েই কাবুলে পৌঁছে যাই।

বিবি—মা—রুই পৌঁছানোর পূর্ব্বেই দুর্গের ওপর আগুন জ্বলছে দেখতে পেলাম। আগুন দেখে বুঝতে পারলাম যে ওরা সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা যখন সেতুর কাছে এলাম তখন দক্ষিণ পাশের সেনাদের এগিয়ে যেতে বল্লাম। মাঝের ও বাঁ পাশের সেনাদের নিয়ে বাবালুনির পথে অগ্রসর হতে লাগলাম। খান মির্জ্জার প্রাসাদ এ জায়গায় ছিল। মোল্লা বাবার উদ্যানের কাছে যে কবরখানা আছে সেখানে পৌঁছতেই কয়েকজন আহত লোককে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে এখানে আনা হয়েছে দেখা গেল। এরাই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে খান মির্জ্জার বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। তারা ছিল সংখ্যায় চারজন। খান মির্জ্জা যে প্রাসাদে ছিল তারা সেখানে প্রবেশ করতেই গোলমাল চেঁচামেচি সুরু হয়ে যায়। সেই সময়েই খান মির্জ্জা জোরেঘোড়া ছুটিয়ে দূরে পালিয়ে যায়। মোহম্মদ হোসেন কোর বেগির ভাই যে খান মির্জ্জার অধীনে কাজ করতো সেই ঐ চার জনের মধ্যে একজন অর্থাৎ শির কুলিকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। তার প্রতিদ্বন্দী তার মাথা কেটে ফেলার চেষ্টা করবার সময় কোনও রকমে সে পালিয়ে আসে। এই চার জন যারা তরবারি ও শরাঘাতে বিক্ষত হয়েছে, তাদেরই আমার কাছে আনা হয়েছে যা আগেই বলেছি।

রাস্তাটা অত্যন্ত সরু। আমার ঘোড়-সওয়াররা এই সরু রাস্তার ওপর ভিড় করছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আর হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের কয়েকজন এই ভিড়ের মধ্যেই এক সঙ্গে জড়ো হয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল। আমার সৈন্যরা তখন এগোতেও পারে না, পেছুতেও পারে না। আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম যে আমার দলের যে কয়েকজন লোক আমার কাছে আছে তারা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর ওপর তীর নিক্ষেপ করুক। নির্দ্দেশ মত কয়েকজন তাই করে। শত্রুপক্ষ তখন সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাতে সুরু করলো।

আমরা সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ধারণা ছিল যে দুর্গ থেকে আমাদের লোক নেমে এসে আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু তারা কেউ এলো না। শত্রুরা পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে তবে তারা দুই একজন করে আসতে লাগলো। খান মির্জ্জা পালিয়েছে দেখে আমরা ঐ জায়গা ছেড়ে এলাম।

আমেদ ইউসেফ আমার পেছনে ছিল। চারবাগ ফটক দিয়ে যখন আমি বেরিয়ে আসছিলাম তখন একটা লোক—যাকে আমি তার সাহসের জন্য কাবুলে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছি এবং যাকে নগর-কোটালের পদে নিয়োগ করেছি—সেই লোকটা খোলা তরবারি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখতে পেলাম। আমার গায়ে শুধু মাত্র একটা হাত কাটা পুরু কোর্ত্তা, গায়ে কোনও বর্ম্মও নাই। তা ছাড়া শিরস্ত্রাণ পরতেও ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে অবশ্য 'ওহে দোস্ত। ওহে দোস্ত' বলে সম্বোধন করে তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলাম এবং আমার পেছন থেকে আমেদ ইউসেফও চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যই হোক, আর অতিরিক্ত বরফ পাতের জন্য হ'ক তার মতিভ্রমই হোক কিংবা যুদ্ধের হট্টগোল আর চেঁচা-মেচিতে তার বুদ্ধিভ্রংশই হোক—সে আমাকে চিনতে পারলো না। সে দ্রুত এগিয়ে এসে আমার বাহুতে তরবারির আঘাত করে বসলো। কিন্তু আল্লার আশ্চর্য্য করুণা সুস্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো। তরবারির আঘাতে আমার এক গাছি চুলেরও কোনও ক্ষতি হলো না।

'মানুষের তরবারি
যত আঘাতই হানুক না,
ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা
একটি শিরাও কাটবে না।'

বারংবার আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এসেছি - যার বলে সর্ব্ব-শক্তিমান আল্লা আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবার যে উন্মুক্ত বিপদের সম্মুখে পড়েছিলাম—তাও আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি।

আমার প্রার্থনাটি এইরূপ :—'হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। তুমি এক। তুমি ছাড়া আর কোনও ভগবান নাই। তোমার উপরই আমার সমস্ত নির্ভরতা, অকুণ্ঠ বিশ্বাস। তুমি জগতের একমাত্র প্রভু। হে আল্লা, তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই ঘটবে। তুমি যা ইচ্ছা কর না—তা কখনও ঘটতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোনও ক্ষমতা বা বিভূতি

নাই যা মহিমময় তোমার কাছ থেকে আসে নি। সকল সত্যের চেয়ে বড় সত্য এই যে তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তোমার জ্ঞান দ্বারা সব কিছুই বুঝতে এবং সব কিছুরই সঠিক হিসাব রাখতে পার।'

'হে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমার প্রতি আমার অকুণ্ঠ বিশ্বাস। আমার অন্তরে পাপের এবং কোনও দুষ্কার্য্যের প্রেরণার উদয় হলে তুমি তাকে আঘাত করে নিঃশেষ কর এবং বাইরে থেকেও আমার কোনও বিপদ যদি ঘনিয়ে আসে তাও তুমি দূর করে দাও। যদি কোনও মানুষের হাত থেকে কিংবা অন্য কোনও প্রাণী থেকে আমার কোনও অনিষ্ট ঘটার কারণ হয়, তবে অশেষ করুণায় সে বিপদ থেকে আমাকে দূরে রাখ। সত্য বলতে তুমিই একমাত্র বিধাতা, জগৎ সিংহাসনের তুমিই একমাত্র প্রভু।'

সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে মহম্মদ হোসেনের বাগানে গেলাম—কিন্তু সেখানে সে নাই। পালিয়ে গিয়ে কোথায়ও সে গা ঢাকা দিয়েছে। বাগানের একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের মধ্যে সাত আটজন তীরন্দাজ ঘাঁটি রক্ষা করছিল। তাদের দিকে আমি জোরে ঘোড়া চালিয়ে ছুটলাম। তারা আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করলো না—দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল। একজনকে ধরে ফেলে তাকে আঘাত করলাম। সে এমনভাবে ঘুরতে ঘুরতে গড়িয়ে গেল যেন তার মাথাটা কাটা পড়েছে। যে লোকটাকে আঘাত করি তার নাম—গোকুল তাস। তার বাহুতে আঘাত করেছিলাম। মহম্মদ হোসেনের বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়ে দেখা গেল যে একজন মোগল অলিন্দের ওপর বসে আছে। সে লোকটাকে আমি চিনলাম। সে আমারই চাকুরিতে ছিল। সে ধনুকে তীর লাগিয়ে আমার দিকেই তাক করছিল। চারদিক থেকে সোরগোল উঠলো—আরে, করছো কি, করছো কি! উনি যে রাজা। সে তীরের লক্ষ্য ঘুরিয়ে নিয়ে তীরটা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল। তীর ছুঁড়ে আর কি হবে—যখন মির্জ্জা আর তার কর্ম্মচারীরা হয় পালিয়েছে না হয় বন্দী হয়েছে।

আমি প্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার পর গলায় দড়ি বেঁধে মাটির ওপর দিয়ে টানতে টানতে সুলতান বিরলাসকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো। তাকে আমি অনেক অনুগ্রহ দেখিয়েছিলাম এবং তাকে নান্‌গেনহার পরগণাটা দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সে আমার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। সে উত্তেজিত হয়ে বলতে বলতে আসছিল—কি দোষ আমি করেছি?

—কি দোষ করেছ? তোমার মত নাম-করা লোকের পক্ষে বিপক্ষে যোগ দিয়ে তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা—এর চেয়ে বেশী অপরাধ আর কি হতে পারে?

আমার মানার মা সা'বেগম ছিল বিরলাসের বোনের মেয়ে। সেই জন্য তাকে অপমানকর ভাবে টেনে হিঁচড়ে আনতে নিষেধ করলাম। তা ছাড়া তাকে প্রাণেও মারিনি বা অন্য কোন ক্ষতিও করিনি।

দুর্গের একজন প্রধান কর্ম্মচারী আমেদ কাসিম কুবেরকে নির্দ্দেশ দিলাম যে একদল সৈন্য নিয়ে খান মির্জ্জার খোঁজে বের হোক।

স্বর্গোদ্যানের কাছাকাছি সা'বেগম আর রাজপুত্রীরা থাকতেন তাঁদের নিজেদের নির্ম্মিত অট্টালিকায়। প্রাসাদ ত্যাগ করে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

নগরের দুষ্ট লোকেরা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে দাঙ্গা সুরু করে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল যে কোনাকানছিতে লোকজনদের ধরে তাদের জিনিষপত্র লুঠ করে নিয়ে নিজেদের লাভ করে নেওয়া। এই খবর শুনে জায়গায় জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে দিলাম যাতে তারা দুর্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে।

সা'বেগম রাজকুমারীদের সঙ্গে একই কক্ষে বসেছিলেন। আমি ঘোড়া থেকে যে জায়গায় নামি সেখানেই নেমে উপরে উঠে গিয়ে তাঁদের আগেও যেভাবে সম্মান দেখিয়ে এসেছি—এবারও সেই ভাবেই সেলাম করলাম। সা'বেগম আর রাজকুমারীরা ভীত, বুদ্ধিভ্রষ্ট, লজ্জিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দোষ স্খালনের জন্য তাঁদের মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। তা ছাড়া আমার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করার মত শালীনতা দেখানোরও তাঁদের তখন ক্ষমতা ছিল না। এটা আমার মোটেই ইচ্ছা নয় যে তাঁরা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। কিন্তু একথাও ঠিক যে এই সঙ্ঘর্ষ ঘটানোর জন্য যারা দোষী—তারা সব এমন দলের লোক যারা কখনও সা'বেগম ও রাজপুত্রীদের কথা ঠেলতে পারে না। খান মির্জ্জা সা'বেগমের নাতি। সে দিনরাত্রি বেগমদের কাছেই থাকতো। যদি সে তাঁদের পরামর্শ না শুনতো তাহলেও তাঁদের এমন ক্ষমতা ছিল যাতে তাকে দূরে যেতে না দিয়ে কাছেই তাঁদের চোখের সামনে রাখতে পারতেন।

বহুবার বিপদজনক অবস্থা এবং দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়ে আমার দেশ, রাজসিংহাসন, ভৃত্য, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালিয়ে যখন এঁদের কাছে আশ্রয়ের জন্য গিয়েছি এবং আমার মাও গিয়েছেন তখন কিন্তু এঁদের কাছ থেকে কোনরকম অনুগ্রহ বা ভরসার কথা শুনতে পাইনি। খান মির্জ্জা সম্বন্ধে আমার ভাই এবং তার মাও সে সময়ে সম্পদশালী দেশের মালিক ছিলেন। কিন্তু আমার কিম্বা আমার মায়ের একটা গ্রাম তো দূরের কথা একটা মুর্গী পর্য্যন্ত ছিল না। আমার মা ইউনিস খাঁয়ের কন্যা, আর আমি তাঁর দৌহিত্র। কিন্তু এঁরা আমাদের আত্মীয় বলে স্বীকার করুন আর নাই করুন—এঁদের মধ্যে যাঁরাই আমার কাছে এসেছেন তাঁরাই আমার কাছে উপকার পেয়েছেন। আমি, তাঁদের আত্মীয় কিংবা ভাই বলেই গ্রহণ করেছি।

সা' বেগম যখন আমার কাছে এলেন—তাঁকে আমি 'পেমখান' উপঢৌকন স্বরূপ দিই—যে জায়গাটা কাবুলের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রতি কোনও রকমের ত্রুটিই আমার পক্ষ থেকে হয়নি।

সুলতান সৈয়দ খান ছিন্ন পরিচ্ছদ পাঁচ ছয়জন অনুচর নিয়ে পায়ে হেঁটে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁদের নিজের ভাই বলে গ্রহণ করি। তাঁকে মানত্রার প্রদেশের তুমান জায়গাটাও দিয়েছি।

যখন সা ইসমাইল মার্ভেতে সিবাক খানকে পরাজিত করে

...া করে এবং যখন আমি কুন্দেজে চলে আসি তখন আন্দেজানের লোকদের আমার দিকে দৃষ্টি পড়ে। তারা ওখানকার কয়েকটি শহরের দারোগাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই আমার নামে সহরগুলো অধিকার করে নেয় এবং আমাকে সেই সংবাদ জানায়। তখন আমি সুলতান সৈয়দ খাঁকে আমার বিশ্বস্ত অনুচর এবং কিছু সৈন্য সঙ্গে দিয়ে আমার নিজের দেশ আন্দেজানের শাসনকর্তা করে পাঠাই। তাঁকে খাঁ পদবী দিয়েও ভূষিত করি। এই সময় পর্যন্ত ঐ পরিবারের প্রতিটি মানুষকে যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সঙ্গে, আমার পিতৃবংশীয় আত্মীয়দের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করে থাকি সেই একই রকম ব্যবহার করেছি।

এই লেখার মধ্যে আমি কারও ওপর কোনও কটাক্ষ করতে চাইনি। কিন্তু যা আমি বলছি তা একেবারে সরল সত্য কথা। নিজেকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে, আমি এসব কথার উল্লেখ করছি না—যা ঘটেছে সেই কথাই বলে যাচ্ছি। যেমন যেমন ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোই যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে লিখছি। সে জন্য ভাল কিংবা মন্দ যে কাজই হোক, অথবা আমার বাবা কিংবা বড় ভাই, বন্ধু কিংবা অপরিচিত যার কথাই হোক আমি নিরপেক্ষভাবে দোষগুণ বিচার করে লিখে গিয়েছি। সেইজন্য পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন এবং কঠোরভাব নিয়ে যেন আমার বিচার না করেন।

সা' বেগমদের কাছ থেকে চলে এসে আমি খান মির্জ্জা যে প্রাসাদে থাকতো সেইখানে উপস্থিত হই। সেখানে এসে আমি এই দেশের নানা জায়গার সম্ভ্রান্ত লোকেদের, আইমার ও যাযাবর জাতের সর্দ্দারদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিই আমার জয়ের কথা। তারপর ঘোড়ায় চড়ে আমি কাবুল দুর্গে চলে আসি।

মহম্মদ হোসেন পালিয়ে এসে প্রাণভয়ে রাজকুমারীদের পোষাকের আলমারিতে গালিচার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। দুর্গ থেকে মিরাম দিওয়ানা এবং আরও কয়েকজনকে ঐ বাড়ী তল্লাসি করে তাকে খুঁজে বের করতে আদেশ দিই। রাজকুমারীদের প্রাসাদ-ফটকে এসে তারা কর্কশ এবং অশিষ্ট ভাষায় চেঁচাতে থাকে। যাহোক, তারা গালিচার মধ্য থেকে মহম্মদ হোসেনকে আবিষ্কার করে দুর্গের ভেতর নিয়ে আসে।

আমি তার সঙ্গে যথোচিত সম্মানজনক ব্যবহার করি। সে এলেই আমি উঠে দাঁড়াই। তার সঙ্গে উগ্রব্যবহারের কোনও চিহ্নই দেখাই না। মহম্মদ হোসেন এমন অপরাধ ও পাপকাজের জন্য দায়ী এবং সে এমন বিদ্রোহের ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছে যে যদি তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো অথবা অন্য কোনও নৃশংসভাবে হত্যা করা হতো তাহলেও সেইটাই তার উচিত প্রাপ্য হ'তো। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কিছুটা আত্মীয়তা থাকার কারণ আমার মায়ের ভগ্নীর গর্ভে তার কয়েকটি পুত্র ও কন্যা সন্তান হওয়ায়—আমি নানাদিক বিবেচনা করে তাকে মুক্তি দিয়ে খোরাসানে চলে যাওয়ায় সম্মতি দিই।

কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ—যাকে আমি এমনভাবে ক্ষমা করেছি এবং প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছি—সে আমার উপকার ও সদাশয়তা একদম বিস্মৃত হয়ে আমার আচরণ সম্বন্ধে কুৎসিত ভাষায় সেবাক খাঁকে নানা কথা বলেছে এবং আমাকে গালাগালি করেছে। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সেবাক খাঁ তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে আমার হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে।

যে তোমার করে ক্ষতি
নিয়তির হাতে তাকে কর সমর্পণ।
নিয়তি তোমার হয়ে
যথোচিত শাস্তি তার করিবে বিধান।

যে দল খান মির্জ্জার সন্ধানে গিয়েছিল তারা তাকে পাহাড়ের মধ্যেই ধরে ফেলে। সে পালাতেও পারেনি, আর তার এমন শক্তি বা সাহসও ছিল না যে যুদ্ধও করতে পারে। তাকে বন্দী করে নিয়ে এলো। আমি পুরাতন দরবার কক্ষে বসেছিলাম। সেখানেই আমার সামনে তাকে হাজির করা হলো।

তাকে বল্লাম—এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি কর।

তখন তার এমন উত্তেজিত সন্ত্রস্ত অবস্থা যে আমার কাছে আসতেই দুইবার আছাড় খেলো। তারপর আমার সামনে এসে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালো। পরস্পর আলিঙ্গন করে ও সেলাম দিয়ে তাকে আমার পাশে নিয়ে বসাই এবং তাহাকে সাহস ও ভরসা দিয়ে কথা বলতে থাকি।

সরবত নিয়ে এলে আমি প্রথমে কিছুটা পান করে তার বিশ্বাস জন্মিয়ে সেই পানপাত্র তার হাতে তুলে দিই। আমার সৈন্য দলের কতক অংশের, এ দেশের কতক লোকের এবং মোগলদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর না হওয়ায়, খান মির্জ্জাকে নজরবন্দী করে রাখবার জন্য তার বোনদের প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। আদেশ দিলাম—সে যেন বিনা হুকুমে ঐ জায়গা ত্যাগ না করে। কিন্তু যখন বুঝলাম ষড়যন্ত্র এবং চাপা আন্দোলন থামছে না তখন তাঁহার কাবুলে থাকাটা মোটেই সুবিধের মনে হলো না। নানা কথা চিন্তা করে তাকে খোরাসানে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

সে চলে যাওয়ার পর আমি বাগানের চার পাশে ঘুরে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ি। বসন্তকালে বাগানের আশে পাশের জায়গাগুলো মনোরম হয়ে ওঠে। কাবুলের যে কোনও স্থানের চেয়ে এর সবুজ শোভা অতুলনীয়। এখানে নানা ধরণের টিউলিপ অপর্য্যাপ্ত। কত রকমের টিউলিপ আছে জানবার ইচ্ছা হওয়ায় আমার অনুচররা চৌত্রিশ রকমের ফুল নিয়ে আসে। সত্যিই বসন্তকালে এমন নয়নাভিরাম স্থান এবং শিকারী পাখী নিয়ে আমোদের জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

ক্রমশঃ

দ্বীপান্তরে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হার্বাটাবাদের বাস্তুহারা বাঙ্গালী উপনিবেশে হবে স্থির ছিল। হার্বাটাবাদ পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় ৩২ মাইল দূরে। তিরিশ মাইল পর্যন্ত মোটর বা বাসে যাওয়া যায়। বাকী দুমাইল হয় পদব্রজে, নয়ত পার্শ্ববর্তী খাল দিয়ে জলপথে নৌকায় যাওয়া যায়। যাবার পথে আমরা এখানকার আরও দু'-একটি জনপদ ঘুরে দেখে গেলুম। প্রথম মণ্ডলুটনের শ্রীযুক্ত চৌধুরীর রবার প্লান্টেশানে ও পরে কল্যাণপুর স্কুল। এখানে শিক্ষক ও স্কুলের ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে 'বঙ্গ সাহিত্যের জয়' 'বাংলাভাষায় জয়' ইত্যাদি ধ্বনি দিচ্ছিলেন। উভয়স্থানেই আমাদের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন হয়েছিল। হার্বাটাবাদ যাবার সময় আমরা একটি ব্রহ্মপ্রবাসীদের বসতি ও আন্দামানের খৃষ্টান অধিবাসীদের বাসস্থান দেখে গেলুম। তাদের ঘরবাড়ী পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তারা যে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন তা কিন্তু মনে হলনা। তবে শুনলুম তাদেরমধ্যে কেউ বেকার নেই। নেয়, আনে, খায়। এদেশে একটিও ভিখারী চখে পড়েনি। শাণ্ডেল বললেন, এখানে নাকি কারুর বাড়ী চুরি হয় না। আমাদের কাছে এ সংবাদ খুবই বিস্ময়কর মনে হল। আন্দামান তো বহুকাল ছিল একটি ক্রিমিন্যাল কলোনি, অপরাধীদের বাসভূমি। তাদের বংশধরেরা এত সাধু হয় কি করে? আমরা তো স্বদেশে অসংখ্য বেকার চোর, ডাকাত, পকেটমার, চোরাকারবারি আর রকমারি ভিখারী নিয়ে ঘর করি। এরা আন্দামানিদের মতো শোধরাবে কবে? সেদিন কি আসবে না?

হার্বাটাবাদের পথে তিরিশ মাইলের মাথায় পৌঁছে দেখি, স্কুলের ছেলেরা স্কাউটের বেশে পথের দু'ধারে সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন শঙ্খনাদের সঙ্গে ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম ও জয়হিন্দ' ধ্বনি দিতে লাগলেন। আনন্দে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আমরাও হাততুলে তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ও 'জয়হিন্দ' ধ্বনির প্রতিধ্বনি করতে করতে অগ্রসর হলুম। অল্পবয়সী নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিরা এখান থেকে শ্রীমতী স্মৃতিকণার পরিচালনায় পদব্রজে অগ্রসর হলেন। আমরা কয়েকজন অশক্ত বৃদ্ধ ও দুটি পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত কিশোর ছেলে এবং একজন অসুস্থ মহিলাকে নিয়ে খালের পথে নৌকা চড়ে অগ্রসর হলুম।



আন্দামানে সেলুলার জেলের ওয়াচ টাওয়ারে

ফটো: শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

দুইতীরের অজস্র শ্যাম সমারোহের ভেতর দিয়ে এই নৌ বিহারে দাঁড় টেনে যেতে যে কী ভালই লাগছিল বলা যায় না। আমরা সেখানে পৌছে দেখি—পদযাত্রীরা আমাদের আগেই সেখানে এসে পৌচেছেন। তখন বেলাপ্রায় দু'টো। মহাসমারোহের ব্যবস্থা। প্রবাসী বাঙ্গালী ভাই-বোনেরা সেথানে এক বিরাট প্যাণ্ডেল খাড়া করেছেন। এখানেও এঁরা চারিদিক ফুল ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছেন। মংলুটান বিশেষ করে কচি নারিকেল পাতা থেকে কতরকম মালা, ফুল, ময়ুর ও টিয়াপাখা রচনা করে সভাক্ষেত্র সাজিয়ে ছিলেন। মহিলা প্রতিনিধি সহ আরও অনেকেই এই নারিকেল পাতায় বোনা অদ্ভুত কারুকার্যের পরিচায়ক ফুল, লতাপাতা, মালা, ময়ুর, টিয়াপাখী, পুতুল, চাঁদ, তারা ইত্যাদি যে যা পারলেন কতক বলে, কতক বানা-ব'লে আন্দামানের 'স্যুভেনীর' হিসাবে প্রায় লুট করে নিলেন, মায় তোরণ দ্বারের দুপাশে ঝোলানো কাঁচা কচি সুপারী গুবকের ঝুমকোগুলি পর্যন্ত বাদ দিলেন না। যেন স্বর্ণ-লংকায় রাঘব-বন্ধুদের উৎপাত।

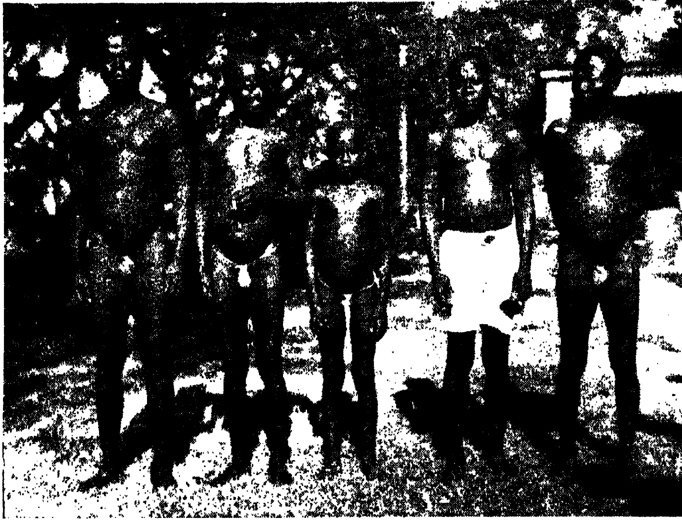
সে যাই হোক, হার্বাটাবাদ যাবার পথের দুধারের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। আমরা খালের জলে নৌকা বেয়ে যখন চলেছি, তখন সেই খালের দু'ধারের অপূর্ব শোভাও আমাদের চিত্তকে যেন অভিভূত করে ফেলছিল, বার বার মনে হচ্ছিল 'কি শোভা কি মায়া গো, কি স্নেহ কি ছায়া গো!' কতরকমের পুষ্পোজ্জ্বল বাহারী অর্কিড যে খালের দু'ধারের গাছগুলির ডালে ডালে আশ্রয় পেয়ে বিকশিত হয়েছে—দেখে দেখে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। সবুজ ও সোনালী ধানের ক্ষেতগুলি পর্য্যন্ত অজস্র ফসল নিয়ে যেন গর্বে ফুলে ফুলে উঠছে। তাদের নবীনধানের মঞ্জরিগুলি যেন আরতির চামরের মতো দুলিয়ে দুলিয়ে ওরা আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল।

গ্রামের পথে যেতে যেতে আজ প্রথম আমাদের কয়েকটা মোষ, দু চারটে গরু, ছাগল, কিছু হাঁস, মুর্গী চখে পড়লো। দু'ধারে গভীর জঙ্গল আর শ্রেণীবদ্ধ পাগড়। কিন্তু, কোনও হিংস্র বন্যজন্তু বাস করেনা। সাপ আছে বিস্তর কিন্তু, শোনা গেল তারা নির্বিষ! পোর্টব্লেয়ার অঞ্চলের পর মধ্য-আন্দামান এবং তারপরের অংশটিকে বলা হয় নর্থ আন্দামান। শ্রীযুক্ত শাণ্ডেলের নিজস্ব যাদুঘরের বৃহৎ



হার্বাটাবাদ গ্রামে সম্মেলনের মণ্ডপে
ফটো: শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

একখানি টেবিলের উপর সমগ্র আন্দামান দ্বীপমালার এক খানি মানচিত্র নয়, মৃত্তিকা ও বালুকায় নির্মিত একটি বিরাট 'রিলিফ' প্রতিকৃতি গড়া আছে। তাই থেকে সমগ্র আন্দামানের পরিচয় আমরা একনজরে পাই। স্টীমারে সমগ্র আন্দামান ঘুরে আসতে প্রায় ছ'ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। আন্দামানের কর্ম-চঞ্চলতা দেখা যায় শুধু সরকারী বনবিভাগের কর্মচারীদের। আগে এঁরা ইংরেজ শাসনের অধীনে কাজ করতেন। এখন স্বাধীন ভারত সরকারের অরণ্য সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এখানে আগে যা কিছু কায়িক পরিশ্রমের কাজ, তা' নির্বাসিত কয়েদীদের দ্বারাই করিয়ে নেওয়া হত। এখন আর সে প্রথার প্রচলন নেই। কারণ, নির্বাসন দণ্ডে এখন দ্বীপান্তর হয় না। দেশে কোনও জেলখানার মধ্যে যাবজ্জীবন বন্দী অর্থাৎ চৌদ্দবছর আবদ্ধ থাকতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর সুযোগ রয়েছে এখানে। কিন্তু বাঙালী ব্যবসাবিমুখ। কাজেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা অবাঙালীদের হাতে চলে গেছে। এখন যে সব বাঙালী এখানে এসে ব্যবসার পত্তন করেছেন ভারত সরকারের বর্তমান অবাঙালী প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছেন না। একজন বাঙালী কাঠের ব্যবসায়ীকে আমি জানি, যিনি ভূতপূর্ব বাঙালী এ্যাডমিনিস্টেটরের কাছে বন বিভাগ থেকে কাঠের সরবরাহ পাবার অনুমতি পেয়েছিলেন এবং বেশ ভালই কাজ করেছিলেন। কিন্তু, কিছুদিন থেকে অবাঙালী



আন্দামানের আদিম অধিবাসী অঙ্গী জাতীয় পাঁচ জন

ফটো : শ্রীঅশোক সরকার

আমাদের আনন্দবর্ধন করেছেন। আন্দামান পার্বত্য দ্বীপ হলেও এর মাটিতে সোনা ফলে। এখানকার ঋতু পরিচয় বর্ষা প্রধান হলেও আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। যদিও আন্দামানের সর্বোচ্চ চূড়া সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু। বড় আন্দামান ও ছোট আন্দামান মিলিয়ে এ দ্বীপের আয়তন হবে মোট ২২৬০ বর্গমাইল। বড় আন্দামান বলতে বোঝায় তিনটি বড় বড় দ্বীপের সংযুক্ত একটি অঞ্চল। পোর্টব্লেয়ার এই অঞ্চলেরই প্রধান শহর। এরই দক্ষিণে ছোট আন্দামান। অরণ্য সম্পদে প্রচুর ধনী এ দ্বীপ।

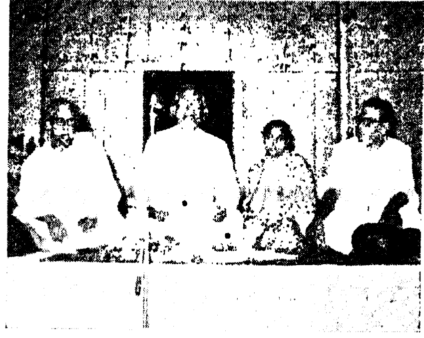
আন্দামানের নিকটতম প্রতিবেশী হল 'নিকোবর দ্বীপ। নিকোবর অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও এও তিনটি দ্বীপাংশের সংযোগ সৃষ্টি, কারনিকোবর, গ্রেট নিকোবর ও ক্ষুদে নিকবর নামকুম্। সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এই নিকটস্থ নিকোবর দ্বীপে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে তাঁদের নিকোবর দ্বীপে যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিকোবর দ্বীপের সহকারী এ্যাডমিনিস্ট্রেটর চার পাঁচজনের বেশি লোককে নিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ যানবাহনের অভাব। সরকারী যাত্রীবাহী 'বাস' দুখানিই ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে আছে। সম্বল একখানি মাত্র জিপ গাড়ী। তাতে ওর বেশি আর যাত্রী নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে শুধু অসংখ্য নারিকেল ও সুপারির বন। একজন সুরাটী মুসলমান ইয়াকুব্জীর এই দ্বীপে ব্যবসা বাণিজ্যে একচেটে অধিকার। বর্তমানে তিনি

পরিচালক এ দ্বীপের কর্মকর্তা নিযুক্ত হওয়ার ফলে বন বিভাগ থেকে তাঁর কাঠ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জানি না এটা উক্ত ব্যবসায়ীর কোনও অন্যায় সুযোগ নেওয়ার শাস্তি, না সরকারী পক্ষপাতিত্ব। এ নিয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লিখালিখি করছেন। আন্দামানের পুরুষ বিধাতা এই 'এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদাধিকারী ব্যক্তিটি। এঁর অনুমতি ব্যতীত কোনও লোকের আন্দামান প্রবেশের অধিকার নেই। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের পারমিট না দেখালে জাহাজ কোম্পানী টিকিট দেবেন না।

বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে প্রাগৈতিহাস যুগে নাকি আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয় সমস্তটাই এক বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ভারত সমুদ্র বহুভূমি গ্রাস করে নিজেকে বিশাল ভাবে সম্প্রসারিত করে নিয়েছে। কালক্রমে সেই সাগর সমাধি থেকে নাকি সুন্দরী উর্বশীর উদ্ভবের মতো রূপসী আন্দামানের উৎপত্তি হয়েছিল। সে যাই হোক, আমাদের অত প্রবীণ ইতিকথায় কাজ নেই। দেখলাম দ্বীপটি মনোরম। ভাল লাগলো খুব। এইতেই আমরা খুশী। এই দ্বীপের কূলে কূলে রাশি রাশি প্রবাল পুঞ্জ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার মতো প্রবাল প্রাচীর রচনা করে চলেছে সেও সৃষ্টির এক বিচিত্র লীলা। শ্রীযুক্ত শ্যামল আমাদের অনেকরকম বিচিত্র প্রবাল উপহার দিয়ে

...ড়পতি হয়ে উঠেছেন শুধু নারিকেল সুপারি নয়, আরও ...না কারবার, দোকান, বাজার—ইনি আন্দামান বুট ...নিয়েছেন। লোকে এঁকে বলে "কিং অফ্ নিকোবর।" ...ই ইয়াকুজীদের একজন প্রধানের সঙ্গে দৈবৎ ফেরার পথে ...হাজে অল্প পরিচয় হয়েছিল। অতি সদাশয় ভদ্রলোক। এঁর ...ম হাজীদাদা ইয়াকুজী। আমাদের সকলকে প্রচুর নিকো-...রের ডাব, নারিকেল ও পান-সুপারী খাওয়াতে খাওয়াতে ...হাজ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের নিজেদেরই সাত ...টখানি ছোট জাহাজ ও মোটর বোট এবং স্টীমলঞ্চ ...াছে। স্টেশান-ওয়াগন, লরী, মোটর গাড়ীও নাকি অনেক। অমোদের যানবাহনের অভাবে নিকোবরে ...াওয়া হল না শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—একবার ...ামাদের একটা তার করে জানালেন না কেন? আমরা আপনাদের নিকোবর দেখাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারতুম। যখন চীফ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি ছিল তখন আপনাদের নিকোবরে নামবার ব্যাপারে যানবাহনের জন্য কিছু আটকাতো না। আমাদের একাধিক লরী, জিপ ও মোটর গাড়ী রয়েছে। একথা শুনে তখন "হায়! হায়!" করা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। কারণ জাহাজ তখন নিকোবর ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন 'আপনারা সদলবলে অন্য এক সময়ে আসুন। আপনাদের কলকাতা থেকে নিকোবর আনিবার জন্য আমাদের নিজেদের জাহাজ পাঠিয়ে দেব।' এখানে বলে রাখি অধিকাংশ প্রতিনিধিই জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে সর্বপ্রথম পোর্টব্লেয়ারে এসেছিলেন এদেরই একখানি বড় স্টীমারে চড়ে। কারণ, ষাটজন প্রতিনিধিকে বহন করে আনবার উপযোগী মোটরগাড়ী বা বাস অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সেদিন সকালে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরে অবশ্য তাঁরা সকলের জন্যই সরকারী যানবাহন প্রয়োজন-মতো সংগ্রহ করেছিলেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক দিন আমরা যে স্টীমারে উঠে ঘুরেছি সেগুলি এই ইয়াকুজীদেরই দেওয়া স্টীমার। গত মহাযুদ্ধের ধাক্কায় এঁদের সামান্য কিছু ক্ষতি হ'লেও তা চারগুণ পূর্ণ হয়ে গেছে এরই মধ্যেই।

আন্দামানের কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে নিকোবর



সম্মেলনের শেষদিনে নেতাজী হলের সভামঞ্চে (বামদিক থেকে) শৈলজানন্দ, আবদুল ওয়াদুদ, শ্রীমতী স্মৃতিকণা ও লেখক

ফটো : শ্রীআনন্দশংকর

প্রসঙ্গে চলে এসেছিলুম। আবার আন্দামানে ফেরা যাক। দ্বিতীয় দিন আমরা এসে নেমেছি হার্বাটাবাদের বাঙালী ভাই বোনেদের কাছে। এঁরা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এই দ্বীপান্তরে এসে নূতন করে বন কেটে বাস শুরু করেছেন। সরকার এঁদের বিনামূল্যে জমি দিয়েছেন, চাষবাসের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছেন, এবং আয় না-হওয়া পর্যন্ত যাতে চলতে পারে তদুপযুক্ত অর্থ সাহায্যও করছেন। অবশ্য সর্ত আছে—এ টাকা তাঁদের ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে। না দিলে সরকার নিলাম ক'রে সম্পত্তি বেচে দিয়ে টাকা তুলে নেবেন। বাস্তুহারা যাঁরা সাহস করে এই দ্বীপান্তরে এসে নূতন করে বসতি পত্তন করেছেন ভগবান তাঁদের প্রতি প্রসন্নমুখ তুলে চেয়েছেন। এখানে এসে কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁদের সকলেরই বেশ সচ্ছল অবস্থা। আরও বাঙালী উদ্বাস্তু যাতে এখানে আসেন সেজন্য আমাদের ওঁরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। শেয়ালদহ স্টেশনের পথের ধারে ও রেফিউজী ক্যাম্পে মান হারিয়ে অনাথ ভিখারীর মতো ঘৃণিত জীবন যাপন করার চেয়ে তাঁরা এখানে এসে স্বাধীন ভাবে নিজেদের গৃহ রচনা করতে পারবেন। কার-বারও ফাঁদতে পারবেন। সুযোগের অভাব নেই।

হার্বাটাবাদের এই উদ্বাস্তু উপনিবেশে এসে মনে হল যেন বাংলাদেশেই কোনও পল্লীতে এসে পড়েছি। সেই খড় ছিটে বেড়ার মাটির ঘর। সেই গোয়ালে গরু, খামারে ধান,

গোবর লেপা মাটির দাওয়ায় আল্পনা দেওয়া। বাউলের গান ও কীর্তনের খোল করতাল কাণে আসছে। পাঠশালায় ছেলেরা মাঠের ধারে খেলা করছে। বউঝীয়েরা ঘরের কাজ কর্ম করছে। পুরুষেরা জমিতে খাটতে যায়। আজ আর কেউ যাননি। আজকে তাঁদের জীবনে একটা মস্ত স্মরণীয় দিন। স্বদেশের সাহিত্যসেবীদের তাঁরা তাঁদের ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন তাঁদের এই নবগঠিত পল্লীতে আহ্বান করে এনেছেন। আমন্ত্রণ করেছেন প্রতিনিধিদের সকলকে এইখানেই আজ মধ্যাহ্ন-ভোজন করতে হবে। সেই রকম ব্যবস্থা ও হয়েছে।

বিরাট এক সভামণ্ডপ নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা এখানকার নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল-বাড়ীর প্রাঙ্গণে। আমরা সেখানে পৌঁছবামাত্র ডাবের জলে তাঁরা আমাদের তৃষ্ণা ও পথক্লান্তি দূর করলেন। দুশো আড়াইশো লোকের আহারের বিপুল আয়োজন তখনও শেষ হয়নি ব'লে আগেই সভার কাজ আরম্ভ করা হল। এইদিনের সম্মেলনে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। স্থানীয় শিক্ষক শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও তাঁর পত্নী নীলিমা দেবীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর উদ্বাস্ত বাঙালী অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাওজান, নীলিমা দেবী, আন্দামান উপদেষ্টা কমিটির সদস্য শ্রীরজনীরঞ্জন সরকার এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রবীণ উদ্বাস্ত-নেতা শ্রীবিনয় ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁদের আন্দামানে বসবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ ইতিহাস এবং তাঁদের এখানে থাকার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে অনেক কথাই প্রতিনিধিদের কাছে নিবেদন করলেন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত আবদুল ওদুদ সাহেব, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এই সভায় অতি সুন্দর ভাষণ দিলেন। সর্বশেষে সভানেত্রী মহোদয়া গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে উদ্বাস্ত ভাই বোনেদের আপন আপন শক্তির উপর নির্ভর করে সুদৃঢ় কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে উপদেশ দিলেন।

সভান্তে সকলকে তাঁরা ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করলেন। উৎকৃষ্ট চালের ভাত, তরি তরকারি, মাছ মাংস, চাটনি, দই পায়স ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ চর্বচষ্যলেহ্যপেয় পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়ে সকলেই সবিশেষ তুষ্ট হলেন। সে এক মহা যজ্ঞ বললেই হয়। আমরা ষাটজন প্রতিনিধি এবং পোর্টব্লেয়ারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্মচারী সপরিবারে এবং বিভিন্ন উদ্বাস্ত বাঙালী পল্লীর বহু অধিবাসী আজ আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে মহানন্দে মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন। তারপর শুরু হল এঁদের সযত্নে প্রস্তুত বিচিত্র অনুষ্ঠান। লোকসঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি কতরকমে না তাঁরা আমাদের চিত্তবিনোদনের আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা ভাই বোনেদের সঙ্গে এই প্রবাসী বাঙালী ভাই বোনেদের মিলন এমন আন্তরিক ও হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল যে বহুদিন এ আনন্দ-স্মৃতি অনেকের স্মরণে থাকবে। রাত্রি সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ সভার কাজ শেষ করে শহরে ফেরা হল। আবার আমরা বিভক্ত হ'লুম। একদল পদব্রজে স্থলপথে অগ্রসর হ'লেন। আমরা প্রাচীনের জলপথে নৌকা বেয়ে অগ্রসর হলুম। তখন প্রবল জোয়ারের জল ঢুকে সরুখালটি হ'য়ে উঠেছে যেন কুলছাপা পদ্মানদীর সহোদরা।

কৃষ্ণপক্ষের ঘোর তিমিরাবৃত অন্ধকার রাত্রি। চোখ মেলে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে একটি হাজাক্ ডে-লাইট দিয়েছিলেন ওঁরা। সেই ভরসা করে আমরা অতিসন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছিলুম। দাঁড়ি মাঝী সবাই সৌখীন। কেউ ওস্তাদ নেয়ে নয়। ম্যারীন ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত শাণ্ডেল সাহেব আমাদের অবস্থা বুঝে স্বেচ্ছায় আমাদের কাণ্ডারী হয়েছিলেন, তাই, কোনওরকমে সে যাত্রায় ঘাটে এসে পৌঁছতে পারা গেল। নইলে, কী যে হত তা বলা যায় না। কারণ, সেই হাজাকটি যার হাতে ছিল তাঁর অসতর্কতায় একটি গাছের ডালের ধাক্কা লেগে সেটি ভেঙে গিয়ে নিভে গেল। তখন একেবারে সূচিভেদ্য অন্ধকার: সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ধাক্কা খেয়ে ভাঙা হাজাকের পেট্রল ছড়িয়ে পড়েছে সকলের গায়ে। একটা দেয়াশলাই জ্বাললেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হবে। তখন এগিয়ে এসে হাল ধরলেন স্বয়ং শাণ্ডেল সাহেব। সে ঘন অন্ধকার ভেদ করে জোয়ারের বিরুদ্ধে বিপুল জল স্রোত ঠেলে কোনও রকমে আমাদের তিনি ঘাটে এনে ভিড়িয়ে দিলেন। ফিরতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা এবং আমাদের সঙ্গী পদযাত্রীরা অনেকক্ষণ এ

অপেক্ষা করছিলেন। ফিরতে আমাদের অসম্ভব বিলম্ব হতে দেখে তাঁরা দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলকে ফিরতে দেখে তাঁরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমরাও প্রাণ ভয়ে এতক্ষণ ইষ্টনাম জপ করছিলুম। আমাদেরও বিবর্ণ মুখে। এবার হাসি ফুটলো। সব ভাল যার শেষ ভাল। এখান থেকে যে যার বাস ও মোটর ধরে অনেক রাত্রে পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে এলুম। শ্রীমতী স্মৃতিকণার স্বামী ও একমাত্র পুত্র স্বস্তিক ও কন্যা গৌরী আমাদের নৌকায় ছিলেন। তিনি এসেছিলেন পদযাত্রীদের সঙ্গে। তাঁর উৎকণ্ঠা সব চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু স্বামীর যোগ্যতার উপর তাঁর অটল নির্ভরতা থাকায় তিনি নাকি স্থির ও শান্ত ছিলেন।

২১শে তারিখে সকালে আমাদের কার্যক্রম ছিল সাগর-বক্ষে ষ্টীম ল্যাঞ্চে করে আন্দামানের আশে পাশের দ্বীপগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে আসা, বন্দরে বন্দরে বেড়িয়ে আসা, বাঙালীদের প্লাইউড কাঠের কারখানা দেখতে 'বেম্বুফ্ল্যাট' দ্বীপে যাওয়া, রসদ্বীপে বেড়িয়ে আসা এবং উইমকোর দেয়াশলাই কারখানা প্রস্তুত দেখা। এইসব নানা দ্রষ্টব্য-স্থান দেখে অনেক বেলায় আমরা স্ব স্ব আস্তানায় ফিরে এলুম। আজ প্রভাতে সাগর বক্ষে এই তরী-বিহার বড় আনন্দজনক হয়েছিল। আমাদের সহযাত্রিণীরা তাঁদের সুমধুর কণ্ঠে বারংবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে সমুদ্রকে উদ্বেল করে তুলছিলেন। শ্রীমান স্বস্তিক, শ্রীশাণ্ডেলের একমাত্র কিশোর পুত্র তাঁর সুকণ্ঠে দু'টি ইংরাজী গান গেয়ে আমাদের এই সমুদ্র বিহারে একটি অভিনব আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

বাড়ী ফিরে এসে শোনা গেল যাঁরা পূর্বরাত্রে মৃগয়ায় গেছলেন তাঁরা অরণ্যচারী তিন তিনটি সুবৃহৎ হরিণ শিকার করে ফিরেছেন। আজ আমাদের হরিণ মাংসের ভোজ—প্রতিনিধি ক্যাম্পে একটা উল্লাসের রোল উঠে সমুদ্র কল্লোলকে চাপা দিয়ে দিলে। আগের দিন এঁরাই এনে-ছিলেন একটি পাঁচ-সাত সের ওজনের সুবৃহৎ মৎস্য ধ'রে।

সেদিন অপরাহ্ণে দু'টি অনুষ্ঠান ছিল। বেলা সাড়ে তিনটেয় আন্দামানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আন্দামান পৌর-প্রতিষ্ঠান সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সমবেত-ভাবে একটি প্রকাশ্য নাগরিক সংবর্ধনা জানাবেন আবাডিন



বৃক্ষ-রোপণ

বাজারে 'নেতাজী হলে'। এইটিই এখানকার টাউন হল। কিন্তু যথা নিয়মে আমরা গিয়ে হাজির হলুম এক ঘণ্টা পরে, প্রায় সাড়ে চারটেয়। শ্রীযুক্ত শাণ্ডেল দু'দিন আমাদের নিয়ে ঘর করেই বুঝে নিয়েছিলেন আমাদের কি শিথিল রীতি প্রকৃতি; তাই তিনি পূর্বাহ্ণেই টেলিফোনে কর্মকর্তাদের খবর দিয়েছিলেন যে এঁদের যেতে আধঘণ্টা বিলম্ব হবে। যাই হোক, আমরা সেখানে গিয়ে প্রচুর আনন্দ পেলুম। কারণ সেই সাজানো হলে কোনও সাজানো সভা হয়নি, তাই শোভা হয়েছিল বেশি। আন্দামানের চীফ-কমিশনার বা এডমিনিস্ট্রেটর শ্রীযুক্ত রাজওয়াড়েরই প্রথম প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি তখনও দিল্লী থেকে ফিরতে পারেননি বলে শ্রীমতী রাজওয়াড়েরই স্কন্ধে সে ভার পড়ে। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করলেন আন্দামানের মেয়র বা পৌরপ্রধান এবং আন্দামান কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত গনেশন। এঁরা নাকি দু'তিন পুরুষ ধরে এখানে বাস করছেন।

চায়ের সঙ্গে জলযোগের প্রচুর আয়োজন করেছিলেন এঁরা। তারই আস্বাদন নিতে নিতে ভাল ভাল কথা শোনা গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আন্দামান অধিকার করে এই আবার্ডিন বাজারেই প্রথম ব্রিটিশ শাসন মুক্ত ভারতের স্বাধীন জনগণের সম্মুখে মুক্তির

বারতা প্রচার করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে আন্দামানের সকল শ্রেণীর অধিবাসীরাই এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। মোসলেম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ডাঃ সৌকৎ আলী একটি সুদীর্ঘ সম্ভাষণ পাঠ করেন। আমাদের সভাপতি ডাঃ সেনগুপ্ত সংবর্ধনার উত্তরে একটি সুন্দর প্রতিভাষণ দিলেন।

আবার্ডিনের নেতাজী হল থেকে বেরিয়ে প্রায় ৬টা নাগাদ হ্যাডোর সুভাষদ্বীপ হলে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়া হ'ল। এখানে সভা পরিচালনার ভার আমার উপর পড়েছিল। এই বিশেষ অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল, ভারতের অনেকগুলি প্রধান প্রধান ভাষায় বিবিধ প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, মালয়লাম প্রভৃতি ভাষাভাষীরা যোগ দান করে তাঁদের ভাষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়গান করে গেলেন। এই অধিবেশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নৃসিংহপ্রসাদ গুপ্ত। শ্রীগুপ্তের কন্যা কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীমতী গুপ্ত তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে একটি সঙ্গীত উপহার দিয়ে সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সভাপতির ভাষণে আমি 'রবীন্দ্র দর্শনে দুঃখের স্বরূপ' সম্বন্ধে আলোচনা করি। তার পর বিবিধ বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। সভা শেষ হ'তে প্রায় রাত্রি ৯টা বাজে।

শ্রীমতী গুপ্ত একদিন আমাদের প্রভাতী "চা"য়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। সেদিনও তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি।

পরদিন ২২শে তারিখে সকালের কার্যসূচী ছিল, 'সেলুলার জেল' দেখতে যাওয়া, শহীদ স্তম্ভে মাল্যদান, প্রবাসী বাঙালীদের স্থাপিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির দর্শন এবং কুটীর-শিল্প-ভাণ্ডার দেখা। সর্বপ্রথম আমরা গেলুম বন্দীশালা সেলুলার জেল দেখতে—এই সেই দ্বীপান্তরের পবিত্র কারাগার তীর্থ, যেখানে স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক ভারতীয় বীর যোদ্ধারা নির্বাসিত হয়ে এসে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে দুঃসহ দীর্ঘ দিন যাপন করেছিলেন। আন্দামানের এই সেলুলার জেলের সকরুণ সুদীর্ঘ ইতিহাস বারবার আমাদের মনকে উতলা ক'রে তুলছিল। এখানকার সর্বপ্রথম নির্বাসিত বন্দী ব্রহ্মদেশের রাজা 'থিবো'। ইংরেজ তাঁর রাজ্য ও রাজসিংহাসন কেড়ে নিয়ে তাঁকে এই আন্দামানে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহু স্বাধীনতার যোদ্ধা ব্রহ্মীকেও বন্দী করে এখানে আনা হয়েছিল। তাঁদেরই তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে আন্দামানের আকাশ বাতাস সর্বপ্রথম রাঙা হয়ে ওঠে। আন্দামানে বর্মী অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই এদের বংশধর। তারপর এখানে নির্বাসিত হয়ে আসেন মণিপুরের ইংরাজ-বিদ্রোহী শূরচন্দ্র ও তাঁর অনুচর সহবিপ্লবীগণ। তাঁদের অপরাধ তাঁরা বিদেশীদের আক্রমণ থেকে জন্ম-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর আসেন মারাঠার দু'ই বিপ্লবী বীর সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯০৮ সালে আসেন আলিপুর বোমার মামলারইংরাজ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর বীর বাঙালী যুবকেরা এখানে নির্বাসিত হয়ে।

ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে স্বাধীনতার সৈনিকেরা রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হ'য়ে আসতে থাকেন। যেমন—নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার অপরাধীরা, খুলনা গ্যাঙ্গ কেসের ছেলেরা, লাহোর সিডিশান কেসের দণ্ডিত বীরেরা, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার দুঃসাহসীরা, প্রয়াগপুরের রাজনৈতিক বিপ্লবীরা, ব্রহ্মদেশের ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা, শিবপুরের রাজনৈতিক ডাকাতি ও বরিশালের ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বীরেরা, মালদহের বিপ্লবী যুবকদল এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দুঃসাহসীরা এখানে নির্বাসিত হয়ে আসেন।

'সেলুলার জেলে' খুব সম্ভব ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দ্বীপান্তরে নির্বাসিত কয়েকজন মাত্র দেশ প্রেমিকের নামের তালিকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই তালিকায় ১৯০৯ সাল থেকে যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই নাম লেখা আছে। তাও অসম্পূর্ণ। বারীণ ঘোষ, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যো, হেম কানুনগো প্রভৃতির নাম নেই। সম্ভবতঃ এঁরা ১৯০৮ সালের নির্বাসিত অপরাধী বলে তাঁদের নাম তালিকায় স্থান পায়নি। বারীন্দ্রনাথের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থে এখানে নির্বাসিত বন্দীদের করুণ অবস্থার অনেক কথাই জানা যায়। সেলুলার জেলের তালিকায় বহু বীরেরই নাম নেই।

আন্দামানের নির্বাসিত দেশপ্রেমিক বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বীরগণের সংখ্যা প্রায় শতাবধি হবে। সকলের নাম এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। কয়েকজন মাত্র বীরের নাম উল্লেখ করছি। শ্রীগণেশ দামোদর সভারকর, বিনায়ক দামোদর সভারকর, পুলিন বিহারী দাস, বালেশ্বর যুদ্ধের জ্যোতিশচন্দ্র পাল, লাহোরের ভাই পরমানন্দ, কৃপাল সিং, উধম সিং, ইন্দ্রজিৎ গুরুমুখ সিং, কাপুর সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, লালা রামশরণ, বাংলার মদন মোহন ভৌমিক, ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, খগেন চৌধুরী, মহম্মদ মুস্তাফা আলি, নিকুঞ্জ পাল, গোবিন্দ কর, সুরেশ সেন, লোকনাথ বল প্রভৃতি। পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে। নামাবলী এখানেই শেষ করা যাক।

স্বাধীনতা লাভের পর আন্দামানের বাঙালী অধিবাসীরা চাঁদা তুলে এই সেলুলার জেলের বহিপ্রাঙ্গণে একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মাণ করে রেখেছেন। তাঁদের কাছে ধন্যবাদের সঙ্গে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। কারাগারের অভ্যন্তরস্থ ফাঁসীর মঞ্চ ও বেত্রাঘাতের বেদী দেখে এই বন্দীশালার মাটি মাথায় ঠেকিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মন্দির দর্শন করতে। এই বন্দীশালার এক অংশে বর্তমানে আন্দামানের সরকারি হাসপাতাল স্থান পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মন্দির আন্দামান-প্রবাসী বাঙালীদের আর একটি মহান কীর্তি। বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে এঁরা এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। চারিদিকে বাগান। সামনে নাট-মন্দিরের চত্বর। ভিতরে প্রশান্ত গর্ভ-মন্দির। এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজী কৃষ্ণ মূর্তি দেখে বিস্মিত হলুম। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—ভূতপূর্ব এক মান্দ্রাজী চীফ কমিশনারের শাসন কালে তাঁর হস্ত-ক্ষেপের ফলে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে বিষ্ণুকাঞ্চীর কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জানি না এই চীফ কমিশনারদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আছে কিনা?

মন্দিরের অল্প দূরে শাণ্ডেল দম্পতির নবনির্মিত গৃহের ভিত্তি গঠন দেখে এলুম। কাজ সবে শুরু হয়েছে? এখানে আমরা এক একটি জালার মতো প্রকাণ্ড আন্দামানী ডাবের জল ও রুটির মতো পুরু ডাবের শাঁসে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করলুম। ফেরার পথে এখানকার কুটীর শিল্প ভাণ্ডার এবং



'অতুল-স্মৃতি সমিতি ভবন'

একটি কাঠের আসবাবের কারখানা দেখে এলুম। এরা আমাদের প্রচুর ফল, মিষ্টান্ন ও চা পানে পরিতৃপ্ত করলেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এখানেও উপস্থিত ছিলেন।

আন্দামানের স্থায়ী অধিবাসীরা অধিকাংশই এই দ্বীপান্তরের নির্বাসিত নর-নারীর বংশধর। তিন চার পুরুষ পার হয়ে গেছে। এঁদের রক্তে আর অপরাধ-প্রবণতার লেশমাত্র নেই। এই দ্বীপের যারা আদিম অরণ্য-অধিবাসী ছিল তারা প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। এঁরা অত্যন্ত স্বল্পায়ু। এদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই আর অবশিষ্ট আছে। আদিম আন্দামানীরা ও নিকোবরীরা অধিকাংশই নেগ্রিটো শাখার মানুষ। কালো কালো বেঁটে বেঁটে চেহারা। চুল কোঁকড়া। এদের মধ্যে আবার তিনটি বিভিন্ন শ্রেণী আছে। 'জারোয়া' শ্রেণীর আদিম মানুষেরা সভ্যতার আলোক থেকে আজও মুখ ফিরিয়ে আছে। কাপড় চোপড় পরে না। ভীষণ হিংস্র এরা। পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে। সভ্যমানুষ দেখলেই বিষাক্ত তীর মেরে হত্যা করে। কিন্তু 'অঙ্গী' শ্রেণীর আদিমেরা কিছুটা সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। এরা হিংস্র নয়। কাপড় পেলে পরে। না পেলে পরে না। কিন্তু নিকোবরীরা আশ্চর্য রকম সভ্য হয়ে উঠেছে। এক পাদ্রী সাহেবের চেষ্টায় তারা সদলে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে লেখাপড়া শিখে এখন রীতিমতো সাহেব বনে গেছে। এই পাদ্রী সাহেবের

এরা এত ভক্ত যে এঁর কথায় তারা প্রাণ দিতে পারে। টাকা পয়সা নোট এ সবের কোন ধার ধারত না এরা। আগে দ্রব্য বিনিময়ে এরা সুপারি নারিকেল বেচতো। আজকাল পয়সা চিনেছে। এদের প্রধান খাদ্য নারিকেল ও শূকরের মাংস। প্রত্যেকেই শূকর পোষে। হাঁস মুর্গিও রাখে। সমুদ্রের মাছ খুব সস্তা একটাকা পাঁচসিকে সের—কিন্তু আর সব কিছুই খুব আক্রা। চাল, ডাল, তেল, তরি-তরকারি, ডিম সবই কলকাতার দ্বিগুণ দাম। দুধ প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশন বসেছিল সেই আবার্ডিন বাজারের নেতাজী হলে। এ দিন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। বক্তৃতা দেন হুগলীর ইতিহাস লেখক সুধীর মিত্র, শিল্পী যোগেশ চন্দ্র রায়, কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সর্বোদয়ের শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এবং স্থানীয় সুধীগণের মধ্যে রাজেন্দ্র সা, জি এস্ পাণ্ডে, শ্রীগনেশন ও দৌকৎ আলি সাহেব। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন তরুণ কবি শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ মিষ্টান্ন-রসিক শ্রীজীবন তারা হালদার ও সাহিত্য-প্রেমিকা যূথিকা দাস। সভাপতি মহাশয় দ্বিভাষিক ভাষণ দেন। কতক উর্দুতে ও বাকী ইংরাজীতে। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী স্মৃতিকণা শাণ্ডেল আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রতিনিধিদের বিদায় সম্ভাষণ জানান। ডাঃ কালীকিংকর সেন সম্মেলনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন হয় এবং 'জনগণ মন-অধিনায়ক' সঙ্গীতে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।

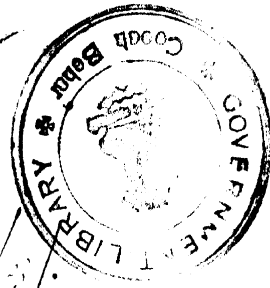
২৩শে তারিখে বেলা চারটের মধ্যে আন্দামান ছেড়ে জাহাজে ওঠা হবে। সকালের দিকে অনেকেই বেরিয়ে বাজার হাট ঘুরে কিছু কিছু আন্দামানের তৈরি জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। যাবার বেলাও আন্দামানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাদের বিদায় দেবার জন্য জাহাজ-ঘাটে সমবেত হয়েছিলেন। অনেকেই আলোকচিত্র নিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতিবৃন্দকে মাল্যদানে সম্মানিত করা হল। দিন শেষের ম্লান রৌদ্রের মতো সকলের মন করুণ হয়ে উঠলো। যাবার ঘণ্টা বাজলো। বিদায়-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ্বীপান্তর-বাস ছেড়ে আমরা জাহাজে এসে উঠলুম। যতক্ষণ দেখা গেল হাত নেড়ে রুমাল উড়িয়ে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে অন্তরের নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করা হল। জাহাজ চললো এবার বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে মাদ্রাজের পথে। কারণ মাত্র দুখানি জাহাজ 'এম, ভি, আন্দামান' এবং 'এম, ভি, নিকোবর পালা করে যাতায়াত করে একবার কলকাতা থেকে আন্দামান, একবার মাদ্রাজ থেকে আন্দামান। ফেরেও তেমনি একবার আন্দামান থেকে মাদ্রাজে, একবার আন্দামান থেকে কলিকাতা। আন্দামান থেকে সোজা কলিকাতা যাবার জাহাজ ছাড়বে শোনা গেল ৮ই জানুয়ারী অর্থাৎ আরও ১৫দিন পরে। কাজেই আমরা মাদ্রাজ নেমে ট্রেণে কলকাতায় পৌছতে পারবো মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে। সুতরাং মাদ্রাজের পথেই আসা স্থির হল। শাণ্ডেল দম্পতি আমাদের অনেক করে অনুরোধ করলেন—আরও কদিন থেকে যান। লোভ দেখালেন, সামনে শুক্লঃপক্ষ, চাঁদের আলোয় আন্দামানের রূপ অপরূপ হ'য়ে উঠবে। এ সময় মাদ্রাজের দিকে সমুদ্র বড় দুরন্ত হয়ে ওঠে। হয়ত আপনাদের অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু, আমরা এই নবলব্ধ দুই হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শ না শুনে একগুঁয়ের মতোই চলে এলুম। ফলে, মাদ্রাজ পৌছুবার দেড়দিন আগে মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলো। সারা রাত সারাদিন সে কি প্রলয় নাচন। ক্ষিপ্ত সাগরের জলোচ্ছ্বাস আমাদের জাহাজের দ্বিতল কেবিনের কাচের জানালার উপর উঠে এসে আছাড় খেতে লাগল। ডেকের উপর বেরিয়ে দাঁড়ায় কার সাধ্য। জলের ঝাপটায় ও ঝোড়ো-হাওয়ার প্রচণ্ড বেগে যেনউড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। জাহাজ দুলতে লাগলো নাগরদোলার মতো। ৬০জন প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ৫০জন সমুদ্র পীড়ায় শয্যা নিলেন। মাদ্রাজ পৌছবার আগের দিন শেষ রাত থেকে সমুদ্র শান্ত হ'ল। আমরা এতক্ষণ সকলেই ভয়বিহ্বল চিত্তে ইষ্টনাম স্মরণ করছিলুম। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মুখেও হাসি ফুটলো। করুণাময় ভগবান এ যাত্রা তবে রক্ষা করলেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের মাদ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীঅমল কান্তি ঘোষ মাদ্রাজ বন্দর থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন তাঁর গৃহে। সেখানে প্রচুর আহার ও রাত্রি-বাস করে পরদিন মাদ্রাজমেল ধরে কলকাতার পথে পাড়ি দিলাম। অমল ও অমল-পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রীতি দেবী বহু যত্নে দু'দিন ধরে অতিথি পরিচর্যা করলেন। তাঁদের যত্ন আদরের কথা ভুলবোনা। মাদ্রাজ পৌছবার দিন বিকেলে ওখানকার দুজন বিশিষ্ট কবি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় মাদ্রাজের তামিল লেখক সমিতি, আমাদের নিয়ে গিয়ে ক্যাস্লটন হলে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ট্রেনে দুরাত্রি মহানন্দে কাটিয়ে আমরা ৩০শে সকালে কলকাতায় ফিরে এসে যে যার বাড়ির দিকে ছুটলুম।

সংকেত

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়





ভারি পর্দা, তবু এ পাশে কান পাতলে ও দিকের কথা শোনা যায়। দীপা এ পাশে এসে দাঁড়াল। কান রাখল পর্দায়। প্রায় নিশ্বাস রোধ করে।

একটা যন্ত্রণা। বুক থেকে সুরু হয়ে স্নায়ু আর শিরায় ছড়িয়ে পড়ল। আগ্নেয় অনুভূতি। তীব্র একটা দাহে মনের সুকুমার বৃত্তি যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গোটামানুষ বিবর্ণ, নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে।

তবু দীপা কান পাতে। ও দিকের ঘরে চাপা আস্ফালন। ষড়যন্ত্রের আভাস। শুনতে শুনতে দুর্বার এক প্রতিজ্ঞায় নিজেকে কঠিন করে তোলে। মনে হয় এ সম্পদ একটা শৃঙ্খল। তার ব্যক্তিসত্তাকে বন্দী করে রেখেছে। পর্দার ওপারের প্রাচীন, আভিজাত্য-সর্বস্ব জগতটাকে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কিছুই করে না। পর্দায় কান পেতে চুপচাপ শোনে।

তুমি কি চোখ বুজিয়েই থাকবে? নারীকণ্ঠ শাণিত তরবারির মতন ঝলসে ওঠে।

পুরুষ কণ্ঠ অনেকটা নির্জীব। খুব মৃদু স্বরে কেবল বলে, কেন, হল কি? কার কথা বলছ?

হবার আর বাকিটা কি আছে? দীপা, দীপার কথা বলছি।

কি করল দীপা? দীপার মনে হ'ল মানুষটার কণ্ঠ যেমন নির্জীব, দুটি চোখও বুঝি নিমীলিত।

সরোজের সঙ্গে মেলামেশার মাত্রা যে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। দিনে বার দুয়েক টেলিফোন। রোজ বিকেলে মেয়ে সেজেগুজে বেরোচ্ছে।

এই কথার পর আর দীপা কৌতূহল দমন করতে পারে নি। পর্দাটা একটু ফাঁক করে মার মুখটা দেখে নিয়েছে। দীপা যেন একটা সর্বনাশ করতে বসেছে, গোটা সংসার-টাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সর্বনাশের পথে, দীপার মার মুখে তারই ছায়া।

মাকে দীপা যাও বা বোঝে, বাবাকে তার আরও আশ্চর্য লাগে।

মক্কেলের সামনে রুদ্রমূর্তি, পিতৃবন্ধুদের কাছেও শুনেছে জেরার হুঙ্কারে সাক্ষীরা তটস্থ, হাকিম পর্যন্ত সমীহ করেন, কিন্তু সেই লোকটাই মায়ের সামনে কেমন ম্রিয়মাণ। ঘাড় হেঁট করে সব কথা শোনে, সব কথায় সায় দেয়।

শুধু আজ বলে নয়। দীপার বিষয়েই নয়। আগেও অনেকবার এমন ব্যাপার ঘটেছে।

দীপার দাদা জয়ন্ত। পাশ করে দ্বিধায় পড়েছে। বাপের ইচ্ছা এখানেই কোন একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ুক। হাতের কাছে গোটা দুই প্রস্তাব রয়েছে। শুধু তার গ্রহণের অপেক্ষা। কিন্তু মা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। না, জার্মাণী তাকে যেতেই হবে। যে সব চাকরি এখন এসে জয়ন্তর প্রতিভার বন্দরে ভীড় করেছে, সেগুলো তো তুচ্ছ জেলে-ডিঙ্গি। একটুতেই টলমল করবে। আচমকা বিপর্যয়ের জলের ধাক্কায় কাত হয়ে যাবে। সে সবের মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে। বিদেশী ডিগ্রির মুকুট পরে এলে, জয়ন্তকে আগ্রহে আবাহন জানাবে জাঁদরেল কোম্পানীর ডিরেক্টররা। গোটা কারখানা ছেড়ে দেবে তার হাতে. মেশিনের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তর ভাগ্যচক্রও ঘুরে যাবে।

জয়ন্তর মতটা অবান্তর। তাকে কোন কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করে নি। জার্মাণী তাকে যেতে হয়েছিল, মার নির্দেশে। বাপের মৌনতাকে সে মায়ের প্রস্তাবের অনু-মোদনই ভেবে নিয়েছিল।

জয়ন্ত এখনও জার্মাণীতে। আর ফিরবে এমন আশা কম। এক নীল-নয়নার মোহে সেখানেই ঘর বেঁধেছে।

কিন্তু সরোজ তো দেখতে শুনতে ভালই।

ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে দীপা টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ বাড়ীর প্রাচুর্যের নোনা আবহাওয়ায় তিল তিল করে যে মেরুদণ্ড নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, হঠাৎ যেন তার মজ্জায় মজ্জায় শক্তির স্রোত সঞ্চারিত হল। এমন একটা কথা বাবার মুখ থেকে বেরিয়েছে ভাবতেও দীপা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

প্রবল একটা ঘূর্ণি। মুঠো মুঠো ধুলো উড়িয়ে চারদিক অন্ধকার করে দিল। ঠিক তেমনই উদ্দামবেগে ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে মা উত্তর দিল।

তোমার মাথা খারাপ হবার আর দেরী নেই। শুধু ফর্সা রং দেখেই গলে গেলে? আর কি পদার্থ আছে ছেলেটার মধ্যে? কোন গুণ?

কি একটা করে না? বাপের কণ্ঠস্বরে ভয়ার্ত মাঝির নৌকা সামলানোর ব্যাকুলতা।

হাঁ করে, এক বেসরকারি কলেজের বাংলার মাস্টার, আর কবিতা লেখে।

কবিতা লেখে, সব ভুলে দীপার বাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, মানে, এতো সবাই পারে না। শক্তি আছে স্বীকার করতে হবে।

ছি, ছি, এমন মানুষের সঙ্গে আবার কেউ কথা বলতে আসে। সোফা থেকে মা উঠে দাঁড়াল। এমন লোকের সান্নিধ্যে থাকাও মূঢ়তা। কবিতা লেখার জন্য আবার শক্তির প্রয়োজন নাকি? লম্বা চুল আর সুরেলা নারী-জনোচিত কণ্ঠ থাকলে ওটা নাকি আপনিই আসে। তা ছাড়া, কবিতা লেখার ব্যবহারিক মূল্যটা কি? কতটুকু? কটা সনেট লিখলে একটা ডজ কিংসওয়ে কেনা যায়, ক ভরি জড়োয়া গহনা কেনার রসদ হয়?

এতক্ষণ পরে দীপার বাবা নিজেকে সামলে নিল। বোঝা গেল দীপা সরোজের সঙ্গে মেলামেশা করবে এটা তার স্ত্রীর ইচ্ছা নয়। কাজেই এটা তার ইচ্ছা হওয়াও

উচিত নয়। অন্তত কোনদিন এ বাড়ীতে তা হয় নি। এ বাড়ীতে একটা হলঘরের মতন ঘর করার ইচ্ছাও একটা—আর সে ইচ্ছা দীপার মার।

সরোজকে তো বারণ করে দিলেই হয়। এ বাড়ীতে যেন না আসে।

দীপার বাবা শোফায় ভাল হয়ে বসল। নিজের কথার প্রতিক্রিয়া তার স্ত্রীর মুখে যে খুশীর আমেজ ছড়াল সেটা লক্ষ্য করল।

দীপা মুখ তুলে চাইল। বাইরের জানলার পাশে শীর্ণ ঝোগেনভিলার ডালে শেষ পাতাটা মাঘের হাওয়ায় তির তির করে কাঁপছে। পাতা নয়, ওটা যেন দীপার মন। অমনি ভীরু, অমনি সন্ত্রস্ত।

তা কি আমি করি নি ভেবেছ, মার কথায় দীপা আবার চমকে উঠল। একদিন দীপা ছিল না, সরোজ এসেছিল। আমি তাকে ওপরের ঘরে ডেকে এনে বলেছি। বলেছি, এ বাড়ীতে তার আসা যাওয়া আমরা পছন্দ করি না। তুমিও না, আমিও নয়। তা ছাড়া যে জন্য সে এখানে আসছে, তার কোন আশা নেই। দীপার পাশে ওর মতন ছেলেকে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। স্বপ্নেও নয়।

ব্যস, তা হলে তো হয়েই গেছে সব। আনন্দে দীপার বাবা নড়ে চড়ে বসল।

কি হয়ে গেছে। আজকালকার ছেলেদের তুমি অমনি সহজ সরল ভাব? বিশেষ করে কবিদের? আসে না বটে, কিন্তু যোগাযোগ ঠিক রেখেছে। ফোনে খবর নিচ্ছে। বাইরে দেখাশোনা হচ্ছে। সরোজ আসছে না, কিন্তু দীপা যাচ্ছে।

দীপার বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দাও। রায় দেবার ভঙ্গীতে দীপার বাবা বলল। ব্যাপারটার চরম নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

দীপার বাবা সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

তা কি হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়েকে বাড়ীতে বন্দী করে কখনও রাখা যায়? কলেজে যাবে না মেয়ে, এদিক ওদিক ফাংশনে যাবে না? সে সব বন্ধ করে দিলে সমাজে আমাদের বদনাম হয়ে যাবে যে?

তবে? আবার চোখে অন্ধকার দেখল দীপার বাবা। ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। দীপা যে এমন সমস্যা হয়ে উঠবে, তা ভাবাই যায়নি। সেদিন যেন মেয়েটা দোলায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ত, বড় হয়ে সেই হাত-পা মা-বাপের দিকে ছুঁড়বে তা কে ভেবেছিল! সেদিনের অঙ্গ-সঞ্চালনের উৎস ছিল আনন্দ, আর আজ বিক্ষোভ।

কি করা যায় বল তো? দিকহারা, কুলহারা নাবিকের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে দীপার বাবা স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখল।

সত্যেন ফিরতে আর কত দেরী?

সত্যেন? কোন সত্যেন?

ব্যারিস্টার রাহার ছেলে। সে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে বিলেত গেছে? কিন্তু ওরা তো রাহা, তিক্ত একটা ওষুধ সবে গলায় পড়েছে, দীপার বাবা সেইভাবে মুখ-চোখ কোঁচকাল, ওদের সঙ্গে তো আমাদের কাজ হয় না।

খুব হয়। কাজ করলেই হয়। আগেকার বর্ণাশ্রম ভুলে যাও। জাতের চেয়ে টাকা অনেক বড়। পদবীর কৌলীন্যের চেয়ে মর্যাদার দাম অনেক বেশী। তা ছাড়া—

তা ছাড়া? জিরাফের মতন দীপার বাবা গলাটা প্রসারিত করল।

তা ছাড়া সত্যেন দীপাকে পছন্দও করে। দীপাই আমল দেয় না।

আর নয়, আর দীপা শুনতে পারছে না। দু হাতে কান চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে সরে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল, এই জন্য, এই জন্য সরোজ এ বাড়ীতে আসে না। দীপা আমন্ত্রণ জানালেও ছল-ছুতো করে এড়িয়ে যায়।

গ্যারেজের দিকে কয়েক পা এগিয়েই দীপা ঘুরে দাঁড়াল। না, দরকার নেই। মোটর নিয়ে যাওয়া মানেই এ বাড়ীর মিথ্যা আভিজাত্যটাকে সঙ্গে নেওয়া। বাসেই যাবে। আজ থেকে নতুন জীবন শুরু হবে দীপার। এ বাড়ীর মানুষদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে, ভুয়ো মর্যাদাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নতুন পথের সন্ধান করবে।

বাসে উঠেই মনে পড়ল। বছর তিনেক আগে এ বাড়ীতে হৃষ্টপুষ্ট-নন্দগোপাল প্যাটার্নের যে মানুষটা কারণে-অকারণে যাওয়া আসা করত, তারই নাম সত্যেন রাহা। মানুষটার পাকে পাকে দম্ভের বেড় দেওয়া। মাথা থেকে

পা পর্যন্ত ঠাসা অহমিকার বারুদে। এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নয়, সত্যেন রাহা যে শূন্যলোকে বিচরণ করত, সে লোকের নাগাল দীপা পায়নি। অবশ্য সে লোকে পৌছবার বিন্দু-মাত্র স্পৃহাও তার ছিল না।

পার্কের পাশেই সরোজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু হাত পাঞ্জাবির পকেটে দিয়ে ইতস্তত পদচারণা করছে। দীপার কথা ভাবছে, কি কবিতার পাদপূরণ করার চিন্তায় মগ্ন বোঝা গেল না।

দীপা এগিয়ে যেতেই আবাহনের ভঙ্গীতে দু-হাত বাড়িয়ে বলল, ওঁ, আয়াহি বরদে দেবি!'

আরক্ত দীপা দু-চোখে ভর্ৎসনার বিদ্যুৎ হানল—কি হচ্ছে, এটা রাস্তা সে খেয়াল আছে?

দরিদ্র হওয়ার ওই একটা বড় সুবিধা। অন্দর আর বাহির এক হয়ে যায়। তা ছাড়া আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। বৈষ্ণব কবিদের ভাষায়, ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।

একটা জ্বালা, একটা তাপ দীপাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছিল, বলয়ের মতন, এ সব লঘু পরিহাসে সে জ্বালার তীব্রতা, সে তাপের দাহ, একটু কমল না।

থমথমে মুখে দীপা বলল—চল্ল, কোথাও বসি।

পাশেই পরিতোষ-কেবিন। মধ্যবিত্ত ভোজনাগার। বিবর্ণ পর্দা, ভাঙা কাচ, নড়বড়ে চেয়ার টেবিলে হীনতার না হ'লেও দীনতার ছাপ। খদ্দেরের সংখ্যাও পরিমিত।

একেবারে কোণের কেবিনে বসে সরোজ দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিল, তারপর দীপার দিকে ফিরে বলল, আর কি খাবে বল?

তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ? দীপার কঠিন প্রশ্ন একটা থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি করল।

তবু সরোজের কণ্ঠে পরিহাসের লঘুমেঘ, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে নিজের বিষয়ে আর কিছু ভাবি না। তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।

চালাকি রাখ, দীপা টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মারল। অ্যাসট্রে কাঁপিয়ে।

আর একটা কলেজে চেষ্টা করছি। দেখি যদি লেগে যায়। সরোজ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল।

না, না, ডোনাট ঘুরিয়ে দীপা বলল, ওসব কলেজ-টলেজে হবে না। মাইনে বড় কম। বরং কোন অফিসে চেষ্টা কর। ভাল কোন অফিসে, সম্ভ্রান্ত মাইনে।

সরোজ হাসল। পাণ্ডুর, বিশীর্ণ হাসি।

তোমার তো অনেক জানাশোনা। দাও না একটা জুটিয়ে।

এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল দীপা। অন্য কোণ থেকে তীর ছুঁড়ল।

তুমি আর যাও না কেন আমাদের বাড়ী?

এই তো দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে। নিস্তেজ গলায় ডাঁটি-ভাঙা চায়ের কাপটা ছুঁতে ছুঁতে সরোজ উত্তর দিল।

মা তোমায় বারণ করেছে যেতে? তাই না? চোখ তুলতে গিয়েই দীপা চোখ নামিয়ে ফেলল। হাত দিয়ে মুছে নিল দুটো চোখ। তবু একটা শান্তি। শোক দু-ফোঁটা, তাতেই যেন বুকের দাহটা অনেক প্রশমিত হ'ল।

সরোজ কোন কথা বলল না। নিঃশেষে ঘন পাটকিলে রংয়ের গরম জলটা গলায় ঢেলে দিল। মুখে একটা তৃপ্তির শব্দও করল।

তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো কোথাও? সে সাহস আছে? দীপা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সব সাহসের তারিফ করা যায় না দীপা, সরোজ হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল ঠোঁটের দু প্রান্তে। তার চেয়ে—ক্লাসে ছেলেদের যেন রবীন্দ্র কাব্যের দুরূহ একটা বিশ্লেষণ করছে, এইভাবে বলল, তার চেয়ে তোমার মা-বাপের কাছে আমাদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত কর। বোঝাও তাদের, আমরা কিছু অন্যায় করি নি। কোন অনাচার নয়। তোমার মাকে একথাও বল, আমিও সেদিন বলে এসে-ছিলাম, আমার লক্ষ্য তুমি, তোমাদের ঐশ্বর্য নয়, সম্পদ নয়, আভিজাত্যের রোশনাই নয়।

তুমি বলেছ এ কথা? চোখের জল মুছেছে দীপা, কিন্তু দু'চোখের দীপ্তি অটুট। নিষ্প্রভ নক্ষত্রের জ্যোতির মতন, জমাট অন্ধকার হয়তো দূর করে না, কিন্তু তৃপ্তি দেয়, শান্তি আনে।

বলেছি। না বলে পারি নি। তোমার মার কেমন একটা ধারণা যে তোমার মনের ওপর আমার যেটুকু লোভ, তার চেয়েও বেশী লোভ তোমাদের তিনতলা ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ীটার ওপর।

জানে দীপা, খুব জানে, তার মার অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিমাপ শূন্য, তাই বুঝি বাইরের সম্পদ দিয়ে সে দীনতা ঢাকতে হয়। মানুষের বিচার করে—তার অর্থের প্রাচুর্য দিয়ে। যে বিচারে সত্যেন রাহা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে অনেক বড়।

প্রেমকে প্রতিষ্ঠা!

মায়ের কথা মনে হ'লেই দীপার শ্বেতপাথরের সোপানের কথা মনে হয়। নিষ্করুণ, শুষ্ক পাথরের কসরৎ। মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তপাত হলেও সে সোপানের বুকে একটু শ্যামলতার আভাস দেখা দেবে না। প্রসন্নতার মেদুরতা।

মায়ের মনের নিক্তিতে ওজন হয়ে গেছে সরোজ। সেখানে তার দাম কানাকড়িও নয়।

কিন্তু এ ভাবে কি করে চলবে? একবার মুখ ঠেকিয়েই চায়ের পেয়ালাটা দীপা সরিয়ে রাখল। বিস্বাদ লাগছে, চা-টুকুই নয়, সব কিছু। পৃথিবীর এই রুক্ষতার আবরণ, তার নিস্তরঙ্গ জীবন, সামনে বসা এই নিরীহ নির্জীব মানুষটাকেও। নিভে যাওয়া খ-ধূপের শলাকার মতন হৃততেজ, নিরুত্তাপ।

একদিন ওদের মন গলবে। ওরা বুঝবে এ ভাবে পথরোধ করে দাঁড়ান যায় না। একদিন আসে যখন—স্রোতকে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

এ কথা যদি ওরা কোনদিন না বোঝে!

বুঝবে। আর নাই যদি বোঝে, তবে চিরদিন চলবে আমাদের এই তপস্যা, এই কৃচ্ছ সাধন।

চলে এসেছে দীপা। আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে, যেন হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়েছে, এইভাবে কেবিনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। ধূলিধূসর পথে।

দীপা নিরুপায়। বার বার এই মানুষটার কাছে ফিরে আসতে হবে—হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে যাকে উষ্ণ করা যায় না। বার বার ফিরে যেতে হবে নিজের সংসারে, যেখানে দীপার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। অদ্ভুত সব বিধি-নিষেধের চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই দোটানার মধ্যে দীপার নিজেকে তাঁতের মাকুর মতন মনে হ'ল। একটু এগিয়ে যাওয়া আবার গুটিয়ে নেওয়া। শামুকের মতন নিজের খোলে নিজেকে গোপন করা।

এই টানা-পোড়েনের মধ্যে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সত্যেন রাহা ফিরে এল বিলেত থেকে। শুধু বড় রকমের একটা ডিগ্রী নিয়েই নয়, ভারিক্কি পদের একটা চাকরিও করায়ত্ত করে।

শকুনের মত ওৎ পেতেছিল দীপার মা, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক বিকেলে নিমন্ত্রণও হয়ে গেল।

কড়া পাহারা বসল দীপার ওপর। প্রায় অন্তরীণের সগোত্র।

ঈশ্বর করুণাময়। ছেলে বাড়ী ফিরবার মাসখানেকের মধ্যে ব্যারিস্টার রাহা চোখ বুজলেন ছেলেকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক করে। দীপার মা আরও তৎপর হল। এমন সুযোগ কোন রকমে ছাড়া উচিত নয়। খামখেয়ালী মেয়ের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এমন সম্বন্ধ ছেড়ে দেওয়া অপমৃত্যুর সামিল।

সত্যেন এল। ভাল আবহাওয়ায় আরও স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছে। নন্দগোপাল থেকে নাড়ু গোপাল। মিনিট দশেকের মধ্যে দীপাকে বুঝিয়ে দিল—বিলাতে পা দেওয়া মাত্র অভিজাত সমাজে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। সকলেই দর্শনের জন্য লালায়িত। মহিলারাই বেশী। তারপর নিমন্ত্রণের পালা। শেষে এমন অবস্থা হ'ল, পড়াশোনা প্রায় বন্ধ। শহরতলীতে পালিয়ে গিয়ে সত্যেনকে আত্মরক্ষা করতে হ'ত।

দীপার মা বিগলিত। বার বার চোখ ফেরাল দীপার দিকে। উদ্দেশ্য চোখে যে কাজল পরেছে মেয়ে, সে কাজল নিঃশেষে মুছে ফেলুক। দেখুক ভাল করে। তুলনা করুক আর একজনের সঙ্গে। যার সম্বল শুধু ঝাঁকড়া চুল, আর ফ্যাকাশে রং।

একঘণ্টা ছিল সত্যেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীপার মাথা ধরে উঠল। নিতান্ত মার ঈগলচক্ষু না থাকলে, সে সরে পড়ত। এমন একটা লোকের সঙ্গে সারাটা জীবন কাটাতে হবে ভাবতেই তার হৃদকম্প হবার উপক্রম। কেন বোঝে না এ বাড়ীর লোক যে—অর্থই সব নয়, অর্থ দিয়ে একটা মানুষের মন বাঁধা যায় না। একটা দম্ভ, একটা অহঙ্কারকে নিয়ে সংসার করা যায় না।

দীপা যে পরিমাণে নিরুৎসাহ হল সত্যেনের সম্বন্ধে, সত্যেন কিন্তু সেই পরিমাণে আগ্রহশীল হ'য়ে উঠল।

একদিন অবস্থা চরমে উঠল।

সত্যেনকে পাশ কাটিয়ে দীপা বেরিয়ে গেল। তাকে আটকাবার কেউ ছিল না। সত্যেন ঢুকতেই দীপার মা আত্মীয়ের বাড়ী যাবার ছুতো করে বেরিয়ে পড়েছিল—স্বামীকে নিয়ে।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করল, বেরোচ্ছেন নাকি?

তার দিকে চোখ না ফিরিয়ে দীপা বলল, হ্যাঁ।

কোথায় জানতে পারি?

পলকে দীপা টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। শরীরে একটা কাঠিন্য এনে বলল, এ প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নেই। দু বছরের ওপর বাইরে কাটিয়ে এ বোধটুকু আপনার থাকা উচিত ছিল। যাক, শুনুন, আমি যাচ্ছি একটি বন্ধুর বাড়ী।

বন্ধু মানে—

সত্যেনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দীপা অবিচল কণ্ঠে বলল, বন্ধু মানে পুরুষ বন্ধু। নামটা মার কাছে জেনে নেবেন।

মার কাছে জানতে হ'ল না, দীপার মা ফিরে এসে সত্যেনকে একলা দেখে অবাক।

আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হ'ল না। দীপার মা শুধু মনস্থির নয়, দিনস্থিরও করে ফেলল। সত্যেনকে বোঝাল, মেয়ে রসিকতা করেছে তার সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

দীপার বাইরে বেরোনো বন্ধ হ'ল। তার মার দুচোখ সতর্ক প্রহরীর কাজ শুরু করল। এমন কি বাগানে নামাও নিষেধ। টেলিফোনের ঘরে চাবি পড়ল। কি করে মেয়ে শায়েস্তা করতে হয় দীপার মার খুব জানা।

দীপার অবস্থা কাহিল। খাঁচার গরাদে গরাদে মাথা ঠোকা সার। ঠোঁট কেটে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল, তবু খাঁচার দরজা এতটুকু ফাঁক হ'ল না। লুকিয়ে সরোজকে চিঠি লেখার চেষ্টা করত দীপা, কিন্তু সে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলার লোক পাওয়া গেল না। ঝি-চাকর মনিবানীর রক্তচক্ষুর ভয়ে উৎকোচের লোভ জয় করল।

সরোজ নির্বিকার। রূপকথার রাজপুত্রের মতন পাষাণপুরীর বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল না। তার একমাত্র বাণী, প্রেমকে প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রেমিকার সমাধি আসন্ন, সে কথা একবারও ভাবল না।

পৌরুষহীন এই পুরুষকে ভালবেসে দীপার দুর্গতির অন্ত নেই। কেন জ্বলে উঠতে পারে না সরোজ। কেন বুক ফুলিয়ে দাবী জানাতে পারে না?

কত উদাহরণ দিয়েছে দীপা। সরোজকে উত্তেজিত করার অনেক চেষ্টা করেছে। সুভদ্রাহরণের কাহিনী মনে করিয়ে দিয়েছে। বলেছে পৃথ্বিরাজ-সংযুক্তার কথা। সরোজ শুধু হেসেছে, সে সময়ে পুলিশের সুব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া যেখানে ভক্ষকই রক্ষক, সেখানে অঢেল সুবিধা।

কিন্তু, দীপা সাময়িকভাবে জ্বলে উঠেছে, আমি তো সাবালিকা। স্বেচ্ছায় যদি ঘর ছাড়ি তো কি করতে পারে পুলিশ?

কিছু করতে পারে না। বাইরের পুলিশ ছুঁতে পারবে না তোমাকে, কিন্তু মনের পুলিশ অনবরত খোঁচা দেবে। প্রাচুর্য থেকে নিঃস্বতায় নেমে এসে তুমি সুখী হবে না। দূর থেকে যে জীবন মহীয়ান মনে করেছিলে, প্রতিদিনের ঘসাঘসিতে তার রূপ ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। আদর্শবাদ অমূল্য, কিন্তু তার আগুনে প্রত্যহের রুটি সেঁকা যায় না।

তর্ক করে নি দীপা—বুঝেছে এমন একটা মানুষের সঙ্গে তর্ক করে তার লাভ নেই। নির্বিচারে নিজেকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সত্যেনকে অনুনয় ক'রেও ফল হবে না। সত্যেন নিয়তির চেয়েও দুর্বার।

বসে বসে দীপা দেখেছে, এ বাড়ীতে স্বর্ণকারদের আনাগোনা, কাপড়ের দোকানের লোকদের কাপড়-জামার বোঝা নিয়ে আসা। দূর দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের অকারণ কোলাহল।

দীপার মা মেয়ের সামনে গহনার বাক্সের গোছা রেখেছে, দামী কাপড়ের বাণ্ডিল, প্রসাধন সামগ্রীর নানা উপকরণ। এগুলো তাকে আটকাবার এক একটি গ্রন্থি, এটুকু বুঝতে দীপার একটুও অসুবিধা হয় নি।

আর দু দিন। দীপা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, হীনবল। আর কোন পথ নেই, কোন উপায় নয়। নিরন্ধ্র

অন্ধকারের স্রোতে তাকে তলিয়ে যেতে হবে। এমন সংসারে গিয়ে উঠতে হবে যেখানে পদে পদে তার ব্যক্তি-সত্তা অপমানিত হবে।

হঠাৎ মাঝরাতে দীপা চমকে উঠল। পাশের বস্তিতে দারুণ গোলমাল। নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দও পাওয়া গেল।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। গয়লানী মতিয়ার চীৎকার। তার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কান্নার সুরে সুরে সর্বনাশের স্বরূপটাও বোঝা গেল। পঙ্গু স্বামী। পঙ্গু হ'লে হবে কি, তার লালসার স্রোত আজও উদ্দাম। তাই কয়েক মাস আগে তরুণী রামধনী এসে জুটেছিল। মেয়েটাকে মতিয়াই এনেছিল স্বামীর পরিচর্যা করার জন্য, কারণ তাকে ব্যবসার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়। হাট থেকে গরু কিনে ফিরতে রাত হয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই চমকে উঠেছে মতিয়া। স্বামী আর রামধনী দুজনেই উধাও। পড়শীদের জেরা করে শুনল—পঙ্গু স্বামীকে কোলে করে রামধনী সরে পড়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার অছিলায়। আশ্চর্য কাণ্ড! মাথার কাছে ক্যাসবাক্স ছিল। খোলা অবস্থায়। সে বাক্স কেউ ছোঁয় নি। খাটিয়ার তলায় বাসনপত্র ছিল, বাঁশের আলনায় জামাকাপড়। সব ঠিক আছে। বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশী মেয়েটার লোভ শুধু মতিয়ার স্বামীর ওপরই।

মজা দেখতে দীপার বাড়ীর সবাই বাইরে এসে দাঁড়াল। দু একজন দরজা খুলে রাস্তায়ও নেমে পড়ল।

দীপা সরে এল বারান্দা থেকে। রামধনী যা পেরেছে, দীপা তা পারবে না কেন? সরোজ আর মতিয়ার পঙ্গু স্বামীতে প্রভেদ কোথায়!' একজনের পঙ্গুতা শরীরে, আর একজন সমাজিক ভয়, নৈতিক চেতনায় অবশ। ঠিক অমনিভাবে তাকেও তুলে নিতে হবে পাঁজাকোলা করে। সরোজ যা পারে নি, দীপাকে তাই করতে হবে।

মনে মনে দীপা একবার সরোজের মেস-বাড়ীর নম্বরটা আউড়ে নিল। আঁচল দিয়ে চেপে খিড়কির খিল খুলল। খুব সাবধানে দরজা ভেজিয়ে বাইরে পা দিল।

সকলের নজর মতিয়ার দিকে, রামধনীর দিকে চোখ দেবার আজ আর কারও অবসর নেই।

একটু পরে এবাড়ীতেও হয় তো মতিয়ার কান্নার প্রতিধ্বনি উঠবে। কিন্তু কে বোঝাবে, যে রামধনীরা অর্থ আর তৈজসপত্রের লোভ পার হয়ে যেতে পারে, তারা আর ফেরে না। যাদের ঝোঁক শুধু মানুষটার ওপর, তারা সব প্রলোভন অতিক্রম করে। সব বাধা।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধশিক্ষার ধারা

উষা বিশ্বাস এম্-এ, বি-টি

যদিও ভারতেই বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তি, তবুও আজ বৌদ্ধধর্ম এখান থেকে অবলুপ্ত। ভারতে শুধু বৌদ্ধধর্মের জন্মই নয়, সুদীর্ঘ পনেরো শত বৎসরেরও অধিক কাল ধরে এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এখানে প্রভূত প্রভাবও বিস্তার করেছিল। সেই সময় ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল কতো বৌদ্ধ বিহার—জ্ঞান ও ধর্মের পীঠস্থান। আজ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস স্তূপমাত্রেই পরিণত হয়েছে। তার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব এখন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের কাহিনী হয়েই রয়েছে। অথচ একদিন এই নালন্দার খ্যাতি সুদূর চীনদেশেও পৌঁচেছিল, যার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই ফা-হায়েন প্রমুখ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ বিভিন্ন সময়ে ভারত পর্যটন করেছিলেন। নিজেদের জীবনকে অশেষ বিপন্ন করে, দুস্তর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে এই জ্ঞানধর্ম-পিপাসু বিদেশী পর্যটকগণ সেদিন ভগবান তথাগতের পুণ্য জন্মভূমিতে এসেছিলেন। তারপর পরবর্তীকালে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পেলো, তখন বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটিও ক্রমে ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হলো।

প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ভারতে অনেক বছর ধরে বৈদিক শিক্ষার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করলেও অনেকাংশে সেই শিক্ষার দ্বারাই প্রভাবিত। বৈদিক

শিক্ষার সংগে বৌদ্ধ শিক্ষার কতকগুলি মূলগত পার্থক্য থাকলেও উভয় শিক্ষার মধ্যে কিছু কিছু মিলও দেখা যায়। উভয় শিক্ষার মূলই ধর্মের মধ্যে নিহিত ছিল। যেমন বেদ শিক্ষা দেওয়াই ছিল বৈদিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, তেমনি বৌদ্ধ-ধর্মের সার নীতি শিক্ষা দেওয়াও বৌদ্ধ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদেরই শিক্ষাদানের একচেটিয়া অধিকার ছিল। শিক্ষার্থীদেরও নেওয়া হতো দ্বিজ বা উচ্চতর তিন বর্ণ থেকেই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে বেদের অভ্রান্ততা স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধ শিক্ষায় ব্রাহ্মণেতর জাতিগণেরও শিক্ষক বা আচার্যের পদের অধিকারী হতে কোনও বাধা ছিল না। শিক্ষালাভের অধিকারটিও শুধু দ্বিজ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। সেদিনকার বৌদ্ধ শিক্ষায় জাতি নির্বিশেষে সর্বমানবের শিক্ষার দাবীটি মেনে নেওয়া হয়েছিল।

ঐহিক ভোগসুখবর্জিত সন্ন্যাস জীবনের উন্নত সংযত আদর্শই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার আদর্শ। বৌদ্ধশিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর সন্ন্যাস জীবনকে বরণ করতে হত। তাই বৌদ্ধ মঠ বা বিহারগুলিই হয়ে উঠলো বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র—যেখানে যুগপৎ জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা হতো। বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশেচ্ছুরও কয়েকটি বিশেষ গুণ নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাকে অঋণী ও কয়েকটি বিশেষ ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে হতো। কোনও ক্রীতদাসের বা রাজকর্মচারীরও সংঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রবেশপ্রার্থীকে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করতে হতো। বিনয়-পিটকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রবেশার্থীকে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হতো। তাকে কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, যথারীতি পীতবাস পরিধান করে এক স্কন্ধ উত্তরীয়াবৃত করতে হতো। তারপর ভিক্ষুদের পদধূলি মস্তকে নিয়ে, আসন পিঁড়ি হয়েউপবেশন করে, যুক্ত করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হতো—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

তারপর সংঘে প্রবেশ করবার পরে চলতো তার শিক্ষানবিশি। শিক্ষানবিশের নূনতম বয়স নির্ধারিত ছিল—আট। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তাকে শিক্ষানবিশ হয়েই থাকতে হতো। তাকে দারিদ্র্য, ভোগনিবৃত্তি, চরিত্রের শুচিতা ও অশন-বসনঘটিত কয়েকটি কঠোর নিয়ম পালন করতে হতো। নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করবার সাধারণ নীতিগুলিও তাকে মেনে চলতে হতো। কিন্তু তাকে আজ্ঞানুবর্তিতার কোনও শপথ গ্রহণ করতে হতো না। বড়োদের সম্মান প্রদর্শন করাও তার একটি কর্তব্য ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষানবিশকে ভিক্ষান্নেই জীবন ধারণ করতে হতো। তাঁরা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বার থেকে দ্বারান্তরে যেতেন। ধনী শ্রেষ্ঠিগণও কখনও কখনও তাঁদের নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করে পরম আপ্যায়নে খাওয়াতেন বা কোনও বিশেষ উপলক্ষেও তাঁদের জন্যে মঠে আহার্যাদি পাঠাতেন। সংঘারামের শিক্ষানবিশদেরই পরিচারকদের যাবতীয় কাজ করতে হতো। সংঘের প্রবীণ ভিক্ষুগণ ধ্যান ধারণায়, জপতপে, বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং ধর্মপ্রচারেই কালাতিপাত করতেন। বর্ষাকালটা তাঁরা মঠেই কাটাতেন। বৎসরের অবশিষ্ট সময়ে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে ও শিক্ষা দিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। এই জন্যে সংঘারামের ভিক্ষুদের প্রায়ই অদল-বদল হতো।

প্রত্যেক শিক্ষানবিশকেই একজন ভিক্ষুকে আচার্য পদে বরণ করতে হতো। বৌদ্ধ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটি অনেকটা বৈদিক যুগের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধেরই অনুরূপ এবং সেই আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আচার্য শিষ্যের পিতার স্থানটিই অধিকার করতেন। শিষ্যও তাঁকে পিতার মতোই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। এই রকম করে উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্পর্কই গড়ে উঠতো। তাঁদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আচরণ ও কর্তব্য সম্বন্ধেও বিনয়পিটকে সবিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। আচার্য নির্বাচন কালেও ভাবী শিষ্যকে এক স্কন্ধ উত্তরীয়াবৃত করে মনোনীত ভিক্ষুর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে, তাঁর সম্মুখে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে, করজোড়ে তিনবার নিবেদন করতে হতো—"প্রভু, আমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" আচার্য কথায় বা ভংগীতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেই তাঁদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হতো। গুরুর সেবা ও পরিচর্যা করাই ছিল শিষ্যের প্রধান কর্তব্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার কর্তব্যগুলিও সুনির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, নগ্নপদে, যথারীতি এক স্কন্ধ উত্তরীয়ের দ্বারা আবৃত করে শিষ্যকে গুরুর মুখ ধোবার ও দুধ পান করবার ব্যবস্থাদি করতে হতো। পানান্তে আবার পাত্রটি পরিষ্কার করে মেজে, স্থানটি ঝাঁট দিয়ে সব জিনিসপত্র যথাস্থানে রেখে, তাকে গুরুর অনুমতিক্রমে তাঁকে ভিক্ষায় অনুগমন করতে হতো। ভিক্ষায় বেরুবার আগে তাকে গুরুকে পোশাক পরিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্রটিও ঠিক করে দিতে হতো। আবার ভিক্ষান্তে শিষ্যকেই গুরুর আগে মঠে ফিরে এসে তাঁর পা ধোবার জল, চৌকি ইত্যাদি ঠিক করে রাখতে হতো। গুরু ভিক্ষা থেকে ফিরে এলে শিষ্য তাঁর হাত থেকে ভিক্ষাপাত্রটি নিয়ে, তাঁর পোশাক খুলে দিয়ে, পানীয় জলাদি এনে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতো। তাঁর আহারের পরে আবার সে ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করে মেজে তুলে রাখতো, এবং অন্যান্য জিনিসগুলি যথাস্থানে রেখে দিতো। গুরু স্নান করতে গেলে শিষ্যকে তাঁর সঙ্গে স্নানের জায়গায় যেতে হতো এবং তাঁর স্নানের জন্যে ঠাণ্ডা বা গরম জলেরও ব্যবস্থা করতে হতো। স্নানের পরে সে তাঁকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করতো। শিক্ষানবিশকে মঠের সব ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হতো। পানীয় জল, মুখ ধোবার জল ইত্যাদি পরিষ্কার আছে কিনা, ভোজ্য দ্রব্যাদি ঠিক আছে কিনা তাও দেখতে হতো। তার উপরে আর একটি দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল। গুরু তাঁর ধর্মবিশ্বাসে অটল, অচল আছেন কিনা তা দেখাও তার কর্তব্য ছিল। তিনি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলে তাঁর অসন্তোষের কারণগুলি দূর করে শিষ্য তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করতো। তাঁর মনে কোনও দ্বিধা সংশয় উপস্থিত হলে, অথবা তিনি কোনও মিথ্যা মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলে শিষ্য তাঁকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতো। গুরু কোনও অপরাধ করলে শিষ্যকে দেখতে হতো সংঘ যেন তাঁর সমুচিত শাস্তিবিধান করে, এবং যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্তের পরে তিনি যেন সংঘে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। সংঘ তাঁকে

গুরুদণ্ড দিতে উদ্যত হলে শিষ্যকে সেই শাস্তির গুরুত্ব লাঘব করাতে বা দণ্ড মার্জনা করাতেও চেষ্টা করতে হতো। গুরুর পোশাক পরিষ্কার আছে কিনা, সেটি রঙ করা দরকার কিনা—তাও শিষ্যকে দেখতে হতো। সে গুরুর অনুমতি বিনা কারুর কাছ থেকে কোনও উপহারাদি নিতে বা কাউকে কোনও উপহারাদি দিতেও পারতো না—সে অপর কারও পরিচর্যা করতে বা বাইরে যেতেও পারতো না। গুরু অসুস্থ হলে শিষ্যকেই তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে হতো। এইরূপে প্রতিদিনকার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলির মাধ্যমে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো এবং তার নৈতিক চরিত্রও গঠিত হতো। সে সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা শিখতো এবং তার শিক্ষাও প্রাত্যহিক জীবনের সংগে সম্বন্ধরহিত হতো না।

শিষ্যের প্রতি গুরুরও কতকগুলি অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। শিক্ষানবিশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেই তিনি বিশেষ ভাবে দায়ী ছিলেন। তিনি প্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করে তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশ নির্দেশও দিতেন। শিষ্যের পোশাক, ভিক্ষাপাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসাদি আছে কিনা সেদিকে তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হতো। তার অসুখ করলে তার পরিচর্যার ভারটিও তাঁর উপরে পড়তো। তার পোশাক পরিষ্কার আছে কিনা তাও তাঁকে দেখতে হতো। পোশাক পরিষ্কার করতে ও রঙ করতেও তিনি তাকে শেখাতেন। ক্ষেত্র বিশেষে গুরু শিষ্যকে গুরুতর অপরাধের জন্যে সংঘারাম থেকে বহিষ্কৃত করতেও পারতেন। অন্ততঃ দশ বৎসর কাল ভিক্ষু হয়ে না থাকলে কেউ আচার্য পদে বৃত হতে পারতেন না। আচার্য হবার মতো তাঁর জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকাও প্রয়োজন হতো। শিষ্যকেও অন্তত দশ বৎসর কাল কোনও ভিক্ষুর অধীনে শিক্ষানবিশ থাকতে হতো। এইরূপে ভাবী ভিক্ষুজীবনের জন্যে চলতো তার প্রস্তুতি এবং সে ক্রমে শ্রমণের সুসংযত ও সুনিয়মিত জীবনে অভ্যস্ত হতো। এইখানেও বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে বৌদ্ধ শিক্ষার মিল দেখা যায়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাতেও ছাত্রদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেই বিদ্যাভ্যাস করতে হতো।

দেশ ভেদে এবং কালভেদে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রকার ভেদ হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেওয়াই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ও সাধারণ জ্ঞানানুশীলন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং সাধারণ জ্ঞানচর্চা বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পরি-পন্থীই-ছিল। কিন্তু তবুও কিরূপে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে সাধারণ জ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হয় তা সঠিক জানা যায় না। শিক্ষার্থীকে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে তার নৈতিক ও মানসিক উন্নতিও অত্যাবশ্যক ছিল। কতকটা সেই জন্যেও তাকে জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হতে হতো। এই প্রকার ধর্ম-বহির্ভূত সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয়ন করাও যে প্রয়োজন এই ধারণাটিও বোধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বৈদিক শিক্ষা থেকেই পেয়েছিলেন।

বিগত পঞ্চম ও সপ্তম খৃষ্টাব্দে ফা-হায়েন প্রমুখ যে সব চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারত পরিদর্শন করেন তাঁদের লিখিত বিবরণী থেকেই আমরা তখনকার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তাঁরা এখানে এসে বৌদ্ধ মঠগুলিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করে পালি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, এবং বৌদ্ধ ধর্মপুস্তকগুলি নকল করে নিজেদের দেশে নিয়ে গেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় বৌদ্ধ বিহারগুলির খ্যাতি তখন কেমন ভারতের বাইরেও দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ৩৯৯ থেকে ৪১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রখ্যাত চৈনিক পর্যটক ফা-হায়েন ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর লিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তেই তদানীন্তন বৌদ্ধ বিহারগুলির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখেছেন তখন পাটলিপুত্রে একটি মহাযান ও একটি হীনযান বৌদ্ধ মঠ ছিল। সেখানে ছয় সাত শত বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন। ভারতের নানা স্থান থেকে সমাগত ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকেই খুব ধার্মিক ও পূতচরিত্র ছিলেন। তাঁদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে দূর দূরান্তর থেকে তত্ত্বান্বেষী ছাত্রেরা এই মঠ দুটিতে আসতেন। ফা-হায়েন তিন বৎসর কাল পাটলিপুত্রে থেকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মশাস্ত্রের পুঁথিগুলি নকল করে চীন দেশে নিয়ে যান। তিনি তাম্রলিপ্ত এবং অন্যান্য স্থানেও কিছুকাল ছিলেন। তিনি বলেন—তখন পাঞ্জাবে মৌখিক শিক্ষা দেবার রীতিই প্রচলিত ছিল এবং পূর্বাঞ্চলে লেখার প্রচলনই অধিক ছিল। তখনও নালন্দা একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় নি। এর প্রায় দুই শত বৎসর পরে হুয়েন সাঙ যখন ভারতে আসেন তখনও এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অপ্রতিহতই ছিল। তিনি নালন্দা ছাড়াও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারের নামোল্লেখ করেন। তিনি বলেন সেই সময়ে গংগাতীরস্থ হিরণ্য পর্বতে দশটি মঠ অবস্থিত ছিল। সেখানে প্রায় চার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন। তাম্রলিপ্ত মঠেও তখন এক হাজার ভিক্ষু থাকতেন। নালন্দার একুশ মাইল দূরে তিলোদকেও একটি বৌদ্ধ-বিহার ছিল। সেখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বিদ্বজ্জনের ও বিদ্যান্বেষী ছাত্রের সমাগম হতো। এক সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত থাকতেন। সেই সময়ে নালন্দাতেই সবচেয়ে বড়ো এবং বিখ্যাত বৌদ্ধশিক্ষা-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। মগধের রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায় কালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। হুয়েন সাঙ বলেন, এখানে সহস্র সহস্র খ্যাতিমান, প্রতিভাশালী এবং শুদ্ধ-চরিত্র মনীষী ছিলেন। এই বৌদ্ধ বিহারের অতি কঠোর নিয়ম কানুন-গুলি প্রত্যেক পুরোহিতেরই অবশ্যপালনীয় ছিল। নবীন ও প্রবীণ ভিক্ষুগণ নানা তর্ক ও আলোচনায় নিযুক্ত থাকতেন। যাঁরা ত্রিপিটক সম্বন্ধীয় কোনও প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হতেন তাঁদের লজ্জার সীমা থাকতো না। দেশ বিদেশ থেকে বিদ্যানুরাগী পণ্ডিতগণ এখানে আপন-আপন সংশয় নিরসনের জন্যে আসতেন এবং আলোচনাদিতে যোগ দিতেন। হুয়েন সাঙের অল্প কিছু দিন পরেই ইৎ সিঙ নামক আর একজন চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। নালন্দা তখনও বৌদ্ধ শিক্ষার একটি সুবৃহৎ কেন্দ্র ছিল। ইৎ সিঙ দশ বৎসর কাল এখানে অবস্থান করেন। তিনিও এখানকার কঠোর নিয়মগুলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা তিন সহস্রেরও অধিক ছিল

এবং এর গৃহটিতে একটি সুপ্রশস্ত হল ঘর ও তিনশত কক্ষ ছিল। দুই শত গ্রাম ব্যাপী বহু বিস্তৃত একটি বৃহৎ ভূমিখণ্ডের উপরেই বিভিন্নকালের বহু রাজন্যবর্গের দানপুষ্ট এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় গৃহটি অবস্থিত ছিল। ইৎ সিউ-এর লিখিত বিবরণী থেকে নালন্দার তখনকার শিক্ষাব্যবস্থারও একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, শিষ্য যথারীতি গুরুর পরিচর্যা করে ত্রিপিটকের বিস্তরংশ পাঠ করে অধীত বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করতো। এইরূপে সে প্রতিদিন কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ন করে মাসের পর মাস অধীত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে রত হতো। প্রচলিত শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধে ইৎ সিউ বলেন—ছাত্রদের পাণিনি এবং অন্যান্য ব্যাকরণশাস্ত্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করতে হতো। শিক্ষার প্রথম স্তরে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো এবং ব্যাকরণ জ্ঞানকেই শিক্ষার প্রথম সোপান বলে ধরে নেওয়া হতো। ছাত্রেরা ছয় বৎসর বয়স থেকে ব্যাকরণ শিক্ষা শুরু করে কুড়ি বৎসর বয়সকালে সেই শিক্ষা সমাপ্ত করতো। নালন্দায় ভর্তি হবার আগেও তাদের কিছু কিছু ব্যাকরণ শিখতে হতো। ব্যাকরণ শিখে তারা গদ্যে ও পদ্যে রচনা লিখতেও শিখতো। কেউ কেউ গানও লিখতো। বিনয়-পিটক ও জাতকের গল্পগুলি পড়ে তারা কিছু সাহিত্য রসাস্বাদনও করতো। তাদের ধারণা শক্তিও বাড়তো। বৈদিক শিক্ষাতেও ব্যাকরণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হতো। এখানেও বৌদ্ধ শিক্ষার উপরে বৈদিক শিক্ষার প্রভাব লক্ষিত হয়। নালন্দায় ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার পরে ছাত্রদের হেতুবিদ্যা (logic) এবং অভিধর্মকোষ (philosophy) শিক্ষা দেওয়া হতো। ন্যায়দ্বার তর্কশাস্ত্র পাঠ দ্বারা তারা যথাযথ ভাবে অনুমান বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে শিখতো এবং তাদের যুক্তি ও বিচার শক্তির উন্মেষ সাধিত হতো। ইৎ সিউ বলেন—ছাত্রদের প্রধানত মৌখিক শিক্ষাই দেওয়া হতো। তারা বড়ো বড়ো গ্রন্থাদিও মুখস্থ করতো। বৌদ্ধ শিক্ষায় বিতর্ক ও আলোচনারও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রতি-পক্ষকে তর্কে পরাস্ত করবার ক্ষমতাও একটি বিশেষ গুণ বলে পরিগণিত হতো। নালন্দায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছাত্র ও শিক্ষকগণ সমাগত বিদ্বন্মণ্ডলীর সংগে তর্কে ও আলোচনায় যোগদান করে নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতেন। এই প্রকারে তাঁরা অশেষ খ্যাতিও অর্জন করতেন। শেষদিকে যখন নালন্দার খ্যাতি ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হতে লাগলো, তখন এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রাবল্য দেখা যায়। নালন্দার পরে আরও দুটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র—ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা—বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ দুটি বৌদ্ধ বিহারই অষ্টম খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল এবং দুটিতেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো। এ দুটির মধ্যে বিক্রমশিলাই সমধিক প্রসিদ্ধ। অষ্টম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহারাজ ধর্মপাল কর্তৃক বিক্রমশিলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এখানে ১০৮ জন বৌদ্ধ শ্রমণ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীদের ভরণপোষণের জন্যে প্রভূত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন। বিক্রমশিলার অধীনে ১০৭টি বৌদ্ধ মন্দির ও ছয়টি কলেজ ছিল। একজন বিদ্বান ও ধার্মিক ভিক্ষুই মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। এখানে ব্যাকরণ, হেতুবিদ্যা ও দর্শন ছাড়াও ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। চরিত্র মাহাত্ম্য ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ পণ্ডিত ছাত্রদের মূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহ প্রাচীরে উৎকীর্ণ হতো। রাজা স্বয়ং তাঁদের 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

বৌদ্ধশিক্ষায় চিকিৎসাশাস্ত্র সাধারণ পাঠ্যক্রমভুক্ত না হলেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্মে আত্ম-নিগ্রহ ও দৈহিক কৃচ্ছ্র সাধনই আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বার স্বরূপ বলে বিবেচিত হতো না। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও পাটলিপুত্রে অবস্থিত কয়েকটি চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ভ্রমণকেই স্বাস্থ্যলাভের ও ব্যায়াম চর্চার একটি সুষ্ঠু উপায় বলে মনে করা হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধ যুগের পাঠ্যক্রমান্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। ইৎ সিউ-এর লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইচ্ছা করলেই যে কোনও সময়ে সংঘ থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে যেতে পারতেন। এইরূপ দৃষ্টান্তও আদৌ বিরল নয়। যাঁরা ভবিষ্যতে শ্রমণ হবার উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, তাঁদের বলা হতো "মানব" এবং যাঁরা সংসার ধর্মকে বর্জন না করেও সাধারণ জ্ঞান আহরণে আত্মনিয়োগ করতেন তাঁরা "ব্রহ্মচারী" নামেই অভিহিত হতেন। এই দুই শ্রেণীর ছাত্রেরাই মঠে বাস করলেও নিজেরা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করতেন। বৈদিক শিক্ষাতেও কেবল ভাবী পুরোহিতদেরই শিক্ষা দেওয়া হতো না। শিক্ষা লাভের পথটি উচ্চ তিন বর্ণের ছাত্রদের জন্যেও উন্মুক্ত ছিল।

বৌদ্ধ বিহারগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করতে বিশেষ সাহায্য করেনি। বৌদ্ধযুগে নারী শিক্ষারও বিশেষ প্রসার হয়নি। স্ত্রীজাতির প্রতি বৌদ্ধদের ঔদাসীন্যই দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ প্রিয়শিষ্য আনন্দের একান্ত অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেই মহাপ্রজাবতী গোতমীকে ভিক্ষুণীসংঘ গঠন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনি বলেছিলেন, এর জন্যে তাঁর ধর্মের আয়ু অন্তত এক হাজার বছর কমে যাবে। ভিক্ষুণীসংঘগুলি সংখ্যায়ও অতি অল্পই ছিল। এগুলিতে লিখন পঠন ও বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দেওয়া হতো না।

বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বিলুপ্ত হলেও বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতি ভারতের দর্শন, ধর্মাদর্শ ও চিন্তাধারার উপরে একটি সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। ব্রাহ্মণেতর জাতিরও শিক্ষার অধিকারটি মেনে নিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষা ভারতের জনগণের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথটিও সুগম করেছিল। ন্যায়শাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চা ও উৎকর্ষ সাধনও বৌদ্ধ শিক্ষার একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

অশান্ত কঙ্গো ঃ অশান্তি রাষ্ট্রপুঞ্জে

—অনাদিনাথ পাল—

যা'কে বলে জন্ম লগ্নের দোষ। ঠিক তাই ঘটেছে কঙ্গোতে। ভূতপূর্ব বেলজিয়ান কঙ্গো—'Congo Belge', Etat Independent du Congo, যা'র স্থিতিকাল অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর সীমানার বিস্তার মাত্র মাস ছ'সাত; অথচ এরই ভেতর কঙ্গো অশান্ত; তা'র ঘরে আগুন,—নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি মারামারি। আর অশান্তি রাষ্ট্রপুঞ্জে। এখানে কঙ্গো উপলক্ষ্য—লক্ষ্য অন্যত্র অর্থাৎ রাজায় রাজায় ঝগড়া; এখন উলুখড় কঙ্গোর প্রাণ যায়। তা'র না আছে ঐক্য, না জোরাল সংগঠন, না পোড়খাওয়া পুষ্ট নেতৃত্ব,—শুধু সম্বল গুটি কয় প্রাণোচ্ছল মানুষের অটল প্রত্যয় ও পরম নিষ্ঠা,—যা' পাহাড়ও নড়ায়। সত্যি নড়িয়েছিলেনও তাঁ'রা। দেশ ছাড়ার ঠিক আগে বেলজিয়ামকে ধাক্কা দিয়েছিলেন মোক্ষম। দেশময় আগুন জ্বালিয়েছিলেন, দেশবাসীর প্রাণেও তা'র ছোঁয়া লেগেছিল। বেলজিয়ামের ধনিক ও বণিককুলের একচেটিয়া শোষণের,—দেশের ধনদৌলত ও কাঁচা মাল লুঠের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক প্রতিরোধের আওয়াজ তোলা হয়েছিল, তারই রেশ একদা পাহাড়ে পর্বতে, অরণ্যে কন্দরে প্রান্তরে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল। কঙ্গোর আদিবাসীরা তীর ধনুক লাঠি সড়কি ঢাল তলোয়ার নিয়ে আদিম উন্মত্ততায় বেলজিয়ান ধন সম্পত্তি আর প্রাণ নাশ করেছিল। বদলে নিজেরাও অগুনতি দিয়েছিল প্রাণ—দিয়ে আত্মবলি অজান্তে শহীদ হয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়ানী শ্বেতাঙ্গ বুটের চরম নৃশংসতায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও কঙ্গোর আত্মা অজেয়। তাই এ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলশ্রুতি স্বাধীন কঙ্গো—সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে কঙ্গোর আবির্ভাব। ইতিহাসের রোজনামচায় এর কাল-চিহ্ন ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন।

* * *

দেশটা বেলজিয়ানরা ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছিল সত্য, তবে বাধ্য হয়ে। কিন্তু মনটা পড়ে ছিল ওই বুনো অসভ্য দেশে, ও দেশের মণিমাণিক্য, সোনা, হীরে, জহরত, রূপো, টিন, কোবাল্ট ও লোহার মায়ায়, আর ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ও আরো অনেক তালিকাহীন গোপন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর আকর্ষণে; বিচিত্র রংদার পশুপাখা, হাতীর দাঁত, দামী কাঠ, জলপাই তৈল, তুলা, কফি, চা, মশলা, রবার, ফল ও গমের রপ্তানীজাত অপরিমেয় ধনের লোভে; কাসাই ও কাতাঙ্গা প্রদেশের খনি-গর্ভে লুকানো অমূল্য মনি ও রত্ন আহরণের আশায়। আর এমন দেশটি খুঁজে তারা কোথায় পাবে? একাধারে আত্মপ্রসার ও শোষণের



প্যাট্রিশ লুমুম্বা

এমন সোনার সুযোগ কোথায় আছে? অথচ সেখানকার এলাকা শুধু বিশাল নয়—যা'র ভেতর গোটা আশি বেলজিয়াম ধরতে পারে (২৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩২ কিলো বর্গ মাইল যার বিস্তার), আর যার অরণ্য ও ভূগর্ভের সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আহরণ করলেও নিঃশেষ হবার নয়। কাজেই অপরিমেয় এর সম্ভাবনা। ভৌগোলিক দিক থেকে এ দেশটা মধ্য আফ্রিকার নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত;

তবে সারা আফ্রিকায় এত বড় একটানা রাষ্ট্রিক ভূখণ্ড আর দুটি নেই—যদিও ফরাসী, ইংরেজ বা পর্তুগীজ-শাসিত এলাকা এমন কিছু ফেলনার নয়। আবার এর আয়তনের তুলনায় লোক সংখ্যা তেমন কিছু নয় অর্থাৎ সাকুল্য ১ কোটি ৩৬লক্ষ ৫২ হাজার ৯৪১ জন [এদের ভেতর নিগ্রো, পিগ্‌মি (বামন) ও হ্যামাইট ইত্যাদির সমবায়ে গঠিত আদিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১৮২ জন মাত্র, বাদ বাকি ১১২,৭৫৭ জন য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গ—১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের হিসাবে]। বলা বাহুল্য, বিদেশীদের ভেতর বেলজিয়ানরা শাসক জাতি রূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৮,৯১৩ জন); পর্যায়ক্রমে পর্তুগীজ, ইতালীয়, গ্রীক, ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিন ও ওলন্দাজের সংখ্যা চারের কোঠায় (কা'রও ৫ হাজারের বেশি নয়); আর ৮টি শ্বেতাঙ্গ জাতির সংখ্যা তিনের কোঠায়। সারা দেশ ৬টি প্রদেশে বিভক্ত, যথা (১) কাতাঙ্গা (রাঃ এলিজাবেথভিল), (২) লিওপোল্ডভিল (রাঃ—ঐ), (৩) ইকুয়েটর (রাঃ ইকুইহাভিল), (৪) কাসাই (রাঃ—লুলাম্বো, (৫) কিভু (রাঃ—কণ্টারম্যান্সভিল), (৬) ওরিয়েণ্টাল (রাঃ—স্টানলেভিল)। আবার লিওপোল্ডভিল (২১,৫৬৮), এলিজাবেথভিল (১৩,৮৬৩) ও স্ট্যানলেভিলে (৫০৪৫)—এই তিনটি প্রাদেশিক রাজধানীতে শ্বেতাঙ্গদের সমষ্টিবদ্ধবাস। কাজেই রহস্যময় অসভ্য 'কালো মহাদেশের' সেবায় উৎসৃষ্ট (!) শ্বেতাঙ্গ জাতি, তথা বেলজিয়ানরা বিধিদত্ত ক্ষমতায় যে-দেশ শাসন করছিল, সে-দেশ ছেড়ে যেতে বললেই তা'রা যাবে কেন! যেই লুমুম্বা ও কাসাভুবুর নেতৃত্বে কঙ্গোলীদের সঙ্গে তারা চুক্তি করে পর্যায়ক্রমে দেশ ছাড়বার ব্যবস্থা করলো, অম্‌নি রন্ধ্রপথে শনি হয়ে ফিরে আসার পাকা উপায়ও মনে মনে ছকে নিয়েছিলো: একদিকে যাবে, অন্যদিকে ফিরবে। হঠাৎ দেশ ছেড়ে যাবে, প্রশাসন-দক্ষতাহীন কঙ্গোয় ছড়িয়ে যাবে উচ্ছৃঙ্খলতা অরাজকতা,—নয়া সরকার হবে বানচাল, বিপর্যস্ত।

*   *   *   *

এদিকে লক্ষ্য রেখেই তা'রা দুটো কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়, যথা (১) ২ বছরের ভেতর কঙ্গো থেকে বেলজিয়ান সেনা সরানো হবে—তবে ধাপে ধাপে—এরূপ চুক্তি হলেও অসামরিক বেশে ও কাজের অছিলায় অনেক সামরিক লোক দেশটা ছেয়ে ফেলার মতলব করে, (২) ৬টা প্রদেশের মধ্যে দুটোর প্রশাসক গোষ্ঠীকে এরা হাত করে নেয়, মোটা ঘুষ ও অর্থের প্রলোভনে বশ করে। এদের একটা কাতঙ্গা, অন্যটা কাসাই। দুটোই তাম হীরে, রূপো ও সোনার খনি-ভরা সমৃদ্ধ খনিজ ও শি এলাকা। দুটোতেই ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান পুঁজি। কাসাই এর গবর্নর কালোঞ্জি ও কাতাঙ্গার গবর্নর ময়েজ ৎ-শোমে ব্যবসায়ীরূপে এককালে বেলজিয়ানদের কাছে দুষম ছিলেন; দুর্নীতি ও অর্থাপহরণের দায়ে হয়েছিলে অভিযুক্ত, বিশেষ করে ৎ-শেসাম্বে। ছলচাতুরী করে বেল জিয়ান কোম্পানির এক কোটি ফ্রাঁ আত্মসাতের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হয়। তবে নয়া পরি স্থিতিতে বেলজিয়ান প্রশাসকরাই তাঁকে বেকসুর খালা দিয়ে good character সার্টিফিকেট দিয়ে যান! এ পর থেকেই নির্বিচারে তিনি ব্রিটিশ ও বেলজিয়ান পুঁজি সমর্থক। আর উভয় প্রদেশের ধনদৌলত বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা উভয় পক্ষে থাকাও আশ্চর্য নয় আদৌ। কাজে এবার মহাসুযোগ; সুবিধা বুঝেই এদের দলে শ্রেণীস্বার্থে টানে ভিড়েছেন তিনি, তবে একটা ছলছুতায়। নীতি বাগীশ ৎ-শোম্বে প্রাদেশিক স্বাধিকারের পক্ষে, অর্থা কঙ্গোতে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। এটা অব মুখরক্ষা; ভেতরের খবর অন্যতর। তিনি ভালোই জানে কারিগরী জ্ঞান, ব্যবসায়িক ও শিল্পসংগঠনের অভিজ্ঞত অর্জনে আফ্রিকার আদিবাসীদের বহু যুগ লাগবে। অতএ বিদেশী পুঁজির ভাগীদার হওয়া বেশি লাভের। এহে অবস্থায় এ দুটো প্রদেশে ফিরে এসে ঘাটি গাড়ার পাক পোক্ত ব্যবস্থা করতে বেলজিয়ানদের আদৌ অসুবি হয়নি। অর্থাৎ সুপরিচিত সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে এ ঢিলে তারা দু'পাখি মেরেছে, যথা—(ক) কঙ্গোয় বহা তবিয়তে থেকে সম্পদ শোষণের অংশীদার করে নেয় বিশিষ্ট কঙ্গোবাসীদের, (খ) আর কঙ্গোর নয়া প্রশাসক শ্রেণীর ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে,—গৃহযুদ্ধের বীজ বুনে। এ কৌশল ধরে ফেলতে দেরি হয়নি প্যাট্রিশ লুমুম্বার—নবজাত কঙ্গো রাষ্ট্রের কর্ণধার তেজী একরোখা তরুণ (৪০) প্রধান মন্ত্রীর। তাই দশদিন যেতে না যেতেই তিনি দাবী

করে বসলেন: চুক্তি সত্ত্বেও বেলজিয়ান সৈন্যদের দেশত্যাগ করতে হবে। কারণ অতি গুরুতর; নতুন প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। [উভয় দেশের চুক্তিতে ছিলো: কাতাঙ্গার কামিনা ও লিওপোল্ডভিলের কিতোনায় বেলজিয়ান সৈন্যের ঘাটি থাকবে। সেগুলো ধাপে ধাপে করা হবে অপসারণ।] কিন্তু অবস্থা এমন অসহ হয়ে দাঁড়ায় যে স্বাধীনতা লাভের ৮ দিনের দিন ('ই জুলাই) কঙ্গোলী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, শ্বেতাঙ্গদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। সেনাদলের বেলজিয়ান অফিসার সরানো ও মাইনে বাড়াবার দাবী তারা জানায়। এর আগের দিন তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভনে ও সংসদ ঘেরাও করে একই দাবি করেছিলো। তখন লুমুম্বা এক বেতার ঘোষণায় (৬ই জুলাই) বলেছিলেন যে এ-গোলযোগের মূল শ্বেতাঙ্গ অফিসার ও নন কমিশণ্ড অফিসাররা; তদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি অভিযোগ করেন যে বেলজিয়ান সেনাপতিদের উস্কানিতেই কঙ্গোলী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়েছে। তথ্যসরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী কাশামুরাও বেতারে বলেন—কঙ্গোর স্বাধীনতার বৈরীরাই সবখানে গোল বাধিয়েছে। তবে এসবের পিছনে যে কূটবুদ্ধি ও পাকা মাথা কাজ করছে—সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কঙ্গোকে নাস্তানাবুদ করার ফিকির খোঁজা হচ্ছে, তা' অরাজকতার প্রথম ধাক্কায় তেমন বুঝা যায় নি। প্রথমে বাইরের জগতে খবর ছড়ানো হলো যে, অসহায় শ্বেতাঙ্গদের উপর মিছিমিছি দলবদ্ধ কঙ্গোলীরা হানা দিচ্ছে; কাজেই তাদের ধন প্রাণ মান বাঁচানোর প্রাথমিক দায়িত্ব প্রাক্‌প্রভু বেলজিয়াম ও তাদের মিত্রদের। অন্তত সেভাবেই সবকিছু সাজানো হয়। হেন অবস্থায় যে অল্প-কিছু সৈন্য প্রথমদিকে বেলজিয়ামে ফিরে গিয়েছিল, তারা তো শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তার অজুহাতে এলোই, বহু গুণ বেশি এলো অসামরিক বেশে—আরও অসংখ্য এলো ছত্রী সৈন্য। শেষের এরা আবার কঙ্গোর বহু শহরে পর্যন্ত ছেয়ে ফেলল, দখলও করে নিলো অনেক ক'টি। বহু বিমানঘাটি, পরিবহন কেন্দ্র ও সেতু তাদের অধিকারে চলে গেলো। আর সমানে চল্‌তে লাগ্‌লো বেলজিয়াম সৈন্যদলের অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে প্রজাতন্ত্রী সার্বভৌম কঙ্গো রাষ্ট্র শুধু নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে,—কার্যত এর অস্তিত্বই লোপ পায়। এটা চিত্রের এক দিক। ভয়াবহ ও ত্রাসসঞ্চারী দিক ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডার দিকটা। তবে অন্যদিকের চেহারায় জঙ্গী জবরদস্তীর দাঁতখিঁচুনী নেই। আছে অখণ্ড রাষ্ট্রের সংহতি লোপের সূক্ষ্ম কারুকলা, অর্থাৎ দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার কুশাগ্র বুদ্ধির প্রয়োগ। এখানে তাদের ভেদ করে (divide et

impera) শাসনের নীতি ; পুরাণো মামুলি কূটনীতির জয়জয়কার। এর বীভৎস নগ্ন প্রকাশ ১১ই জুলাইতে। ঐদিন কাতাঙ্গা প্রদেশের গবর্নর বিচ্ছেদকামী ময়েজ ৎসোম্বে কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর উত্তর রোডেশিয়ার কাছে সৈন্য সাহায্য চান। বাইরের আঘাত রুখবার জন্যে যখন সব চেয়ে দরকার জাতীয় সংহতির তখনই এহেন দুঃসময় ; অতএব কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের উভয় সংকট। তাঁরা প্রচার করছিলেন, কঠোর হবার হুমকি দিচ্ছিলেন। শেষে মরিয়া হয়ে রাশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হবেন বলেও লুমুম্বা তারস্বরে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন। কা কস্য পরিবেদনা। কিন্তু চরমে যেতেও তিনি সাহসী হলেন না। বরং ১১ই জুলাই কঙ্গো মন্ত্রিসভা কঙ্গোয় দ্রুত মার্কিন সৈন্য পাঠাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই অনুরোধ জানালেন। তবে মার্কিন সরকার একতরফা এখানে সেনা পাঠাতে ভরসা করে নি ; পরোক্ষ ভয় রাশিয়ার—যদি দ্বিতীয় কোরিয়ার অবস্থা হয়। কাজেই তার কাছে পাঠানো আর্জি রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে পেশ করা হলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ১৪ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ কঙ্গোর সহায়তায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী পাঠাতে সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহ্যামারশীল্ডকে ক্ষমতা দেয়, আর বেলজিয়ামকে সৈন্য সরিয়ে নিতে অনুরোধ জানায়। স্থির হয়, অবস্থা আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত এ-ই সামরিক সাহায্য কঙ্গোকে দেওয়া হবে।

* * *

প্রস্তাব অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অতিক্রুত কাজ হয়। যেহেতু ১৫ই জুলাই তারিখেই রাষ্ট্রপুঞ্জের একদল সৈন্য কঙ্গোতে পৌঁছে এবং জুলাই মাসেই প্রায় ১০ হাজার সৈন্য এখানে মোতায়েন হয়। তবে এই সহায়ক বাহিনী গঠনে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। আফ্রিকার বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ও জোটনিরপেক্ষ দেশের সৈন্যদের নিয়ে এই সেনাদল। কেননা, বৃহৎ শক্তির কোন এক পক্ষের, যেমন মার্কিন বা রুশ—সৈন্য থাকলে ভিন্ন পক্ষীয় সৈন্যের উপস্থিতিও অনিবার্য, যা'র পরিণাম ঠাণ্ডা লড়াই। কিন্তু এত বাছবিচার সত্ত্বেও একে এড়ান সম্ভব হয়নি ; সম্ভব হয়নি বৃহৎ শক্তির—না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না রাশিয়া—অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকার। কাজেই উপায়-হীন কঙ্গো খাল কেটে কুমীর এনেছে। এবং এনেও দারুণ ফ্যাসাদ ; উন্নতি দূরে থাকে, রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন। এখন কাণ্ডারীহারা কঙ্গো গজ-কচ্ছপের লড়াই-এর ঘাটি।

* * *

এবার অল্পবিস্তর অতীতের কাহিনীতে ফিরে আসা যা'ক। চলুন ফিরি ইতিহাসের উজানে। কেননা, যাদের জীবনবিচিত্রায় গড়া আসল আফ্রিকা, তারা সবাই 'কালো মহাদেশের' আদিম সন্তান। তারা পশ্চাদ্‌পটের মূক দলিত মানুষের সারি। এরা উত্তর বা 'সাদা আফ্রিকার' সাদা মানুষ নয় বা আরব-বার্বার ঐশ্লামিক সভ্যতার ধারাবাহী নয়। বরং সভ্যতার উচ্ছিষ্ট এরা—ইতিহাসের উপেক্ষিত। এদের বসবাস বিষুব রেখার দক্ষিণবর্তী—মধ্য ও দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকার তাবৎ অন্তরীপ (ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড বাদে) জুড়ে ; জাতে নিগ্রো ও বাণ্টু নিগ্রো ; আদি মানব বংশের ত্রি-ধারার অন্যতর—নৃতত্ত্বের ভাষায় যা'র নাম 'নিগ্রয়েড'; সভ্য শ্বেতাঙ্গের তুচ্ছার্থক 'নিগার'। য়ুরোপ ও আফ্রি-কার সাদা মানুষের খেলনা, শোষণ-যন্ত্র ;—পীড়ন ও পোষণে শিরদাঁড়া বাঁকা। পৃথিবীময় দাস ব্যবসায়ের বলি, নতুন মহাদেশের সভ্যতার বনিয়াদ গড়ার অরণি। এদেরই এক দলের আশ্রয় মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো। নানা খণ্ড জাতিতে ভরা—সরল, তেজী ও জোয়ান মানবক গোষ্ঠী।

* * *

সভ্যজগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল বহুদিন। নিজেদের খবরও জানতো না, পরিচয়ও রাখতো না ; রাখতো না দেশের অপরিমেয় সম্পদের সম্ভাবনার সংবাদ। অরণ্যচারী জীবনযাত্রার সুখে মহাবিভোর। কিন্তু যেদিন লিভিংস্টোন, স্পেক, রিচার্ড বার্টন প্রমুখ দুঃসাহসী পর্যটকদের তারা দেখা পেলো, সেদিন এরা যেমন আঁৎকে উঠেছিল,—আবিষ্কার করে তেম্নি তাঁ'রা অবাক হয়েছিলেন মাটির মানুষের চরম অবমাননা ও অধোগতি দেখে, বন জঙ্গল মাটির অনাহৃত সম্পদের সন্ধান পেয়ে। এতে করে পশ্চিম দেশে সাড়া পড়ে গেলো। অথচ উনিশ শতকের মাঝামাঝিও কঙ্গোর খবর বাইরের জগতে বেশ কিছুটা অজানা ছিলো, যদিচ পর্তুগীজরা এর খোঁজ পেয়েছিল পঞ্চদশ শতকেই। কিন্তু তখনো কা'রও

নেকনজর পড়েনি। তবে বিখ্যাত ভূপর্যটক ও আবিষ্কারক স্ট্যান্লি যখন গত শতকের শেষ দিকে (১৮৭৭) কঙ্গো নদীর মোহনায় পৌঁছেন তখন য়ুরোপের নানাদিকে আত্মপ্রসারের যুগ। সে সময় কঙ্গোর আয়তন এত বড় ছিল না, রাষ্ট্র হিসাবে এর অস্তিত্বও বিশেষ ছিল না। ছিল বহুধা বিভক্ত কতগুলো খণ্ডজাতীয় (বালুবা ইত্যাদি) সর্দারের আধিপত্য। তবে বেলজিয়ানদের অধীনে এর আয়তন বাড়ে, সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। গোড়ায় বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডই কঙ্গো অববাহিকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁরই উদ্যোগে ব্রুসেলসে ১৮৭৬ সালে ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞদের এক সভা ডাকা হয়। তা'তে গড়া হলো "আফ্রিকার আবিষ্কার ও সভ্যতা প্রসারের আন্তর্জাতিক সমিতি!" আঁধার দেশের কালো মানুষদের ভেতর পশ্চিমী সভ্যতার আলো বিকীরণের ব্যবস্থা। কিন্তু এতেও নিজেদের ভেতর প্রথমে কাড়াকাড়ি মারামারি কম হয়নি। যেহেতু কঙ্গোর মোহনা প্রথম আবিষ্কারের গৌরব পর্তুগালের—১৪৮২ সালে পর্তুগীজ নৌচালক দিয়েগো সিলোর,—সেহেতু পর্তুগাল সহ ক'টি রাষ্ট্র কঙ্গো এলাকায় সভ্যতা বিস্তারের (!) অবাধ ও একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি বেলজিয়ামকে। এর পরের অধ্যায় আরো মজার। আফ্রিকা ভাগাভাগির জন্যে ১৮৮৪ সালের ১৫ই নভেম্বর বার্লিনে এক বৈঠক বসে। তা'তে দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে "সার্বভৌম স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্রের" অধিনায়ক রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপতিরা নিজেদের ভেতর বুঝাপড়া করে অভিভাবকহীন আফ্রিকায় Sphere of influence বা প্রভাব এলাকা গড়ে তুললেন। অসভ্য মূক বুনোরা কামান বন্দুকের গোলাগুলির আওয়াজে গভীর বনের আড়ালে আত্মগোপন করলো। তাদের কথা কানে তোলার প্রয়োজন সেদিন কা'রও হয়নি; তা'দের ব্যক্তিত্ব—আফ্রিকার সত্তা সেদিন পশ্চিমের জয়ধ্বনির ঢেউ-এ ডুবে গিয়েছিল।

* * * *

১৮৮৪ সালের পরবর্তী একটানা ২২।২৩ বছর কঙ্গোর শাসনভার লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত তদারকী ও শাসনের ইতিকথা। কিন্তু এ সময়টায়ও য়ুরোপের অন্যান্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইংলণ্ডের চতুর ব্যবসায়ীর দল বেলজিয়ামের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ঈর্ষা-কাতর, তাদের সুকৌশল প্রচার ও আন্দোলনে রাজশাসিত কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ বহু গলদ জানাজানি হয়। এর ঢেউ বেলজিয়ামের পার্লামেন্টেও লাগে। ফলে ১৯০৮ সালে একচেটিয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজকারবারের অভিযোগে লিওপোল্ডের কাছ থেকে পার্লামেন্টই প্রশাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়। কিন্তু তাঁর আমলে কঙ্গোতে যে সৎ কাজ কিছু না হয়েছিল এমন নয়। যথা ১৬০৮ সাল থেকে আরবদের চালু দাস-ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮ শতক পর্যন্ত এখান থেকে লিসবন ও আমেরিকায় বছরে হাজার দশেক ক্রীতদাস চালান দেওয়া হতো। তবে একাজ ও অন্যান্য কু-প্রথা (!) বন্ধ করার পেছনে বেলজিয়ামের নিজ গরজ ও স্বার্থ ছিল বেশী। যেহেতু কঙ্গোর সম্পদ আহরণে সহায়তার জন্যেও সস্তা মজুরির কুলিকামিনের প্রয়োজন তখন খুব বেশি।

* * *

এর পরের বছরগুলো ধাপে ধাপে বেলজিয়ামের আগ্রাসী নীতির জয়যাত্রার কাহিনী। সারা দেশে খনি আবিষ্কার, ধাতু নিষ্কাশন ও মণিমাণিক্য আহরণের ঘটা; আর কাঁচা মাল ও পণ্য রপ্তানী বাণিজ্যের মারফৎ অপরিমিত আয়ের পথ সুগমের সুচারু ব্যবস্থা। এতে তার ভাগীদার হয় কিছু ইংরেজ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ বণিক ও পুঁজিবাদী। তা'ছাড়া, কঙ্গোর লাগোয়া জার্মান পূর্ব আফ্রিকাও (রুয়াণ্ডা-উরাণ্ডী) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২২ সালের ৩০শে জুন থেকে বৈষয়িক ব্যাপারে কঙ্গোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একজন ভাইস-গবর্নরের অধীনে শাসিত হতে থাকে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের নির্দেশে ঐ এলাকার অছিগিরির ভারও বেলজিয়ামকেই দেওয়া হয়।

একে শাসিত এলাকার আয়তন বিশাল; তা'র ওপর নানাভাবে আয়ের অঙ্কে স্ফীতোদর সে। কাজেই যখন ছোট বড় বহু রাষ্ট্র দেনার দায়ে ডুবুডুবু, তখন ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী বেলজিয়ামের বৈষয়িক স্বচ্ছলতা রূপকথার কাহিনী। অতএব অনেকের চক্ষুশূল। কিন্তু কঙ্গো হাতছাড়া হবার পর থেকেই তা'র আর্থিক অবস্থা দিনদিন

সঙ্গীন থেকে সঙ্গীনতর। নিত্য একটা সঙ্কট থেকে আর একটা সঙ্কটের চুড়োয় তা'র অবস্থিতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বেলজিয়ামের হালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা উল্লেখ্য। যে প্রশাসনিক ব্যয় সাশ্রয় পরিকল্পনার ফলে সেখানে ভূতুড়ে প্যাঁচ এবং যাকে গৃহযুদ্ধ বলা অত্যুক্তি নয়—কঙ্গো থেকে আয়ের ক্ষীর ধারা ক্রমশ শুকিয়ে যাবার মধ্যে তার মূল হেতু নিহিত।

গোড়াতে বলা হয়েছে, কঙ্গোর জন্মলগ্নে দোষ; কাজেই নবজাতকের সে-ব্যাধি। এ বিষয়টা এখন আর বেশি খোলসা করে বলার দরকার নেই। তবে চলমান ঘটনা প্রবাহে যে টানাপোড়েন চলেছে, তা কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বাইরের বিচারে যা'কে নিতান্তই সম্পর্কহীন তুচ্ছ ঘটনা বলে মনে হয়, খতালেই দেখা যাবে সে সবের মধ্যে একটা পরম্পরাগত যোগাযোগ আছে। কঙ্গোর ঘটনার গতি এত দ্রুত যে, তা'র সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন। সেখানকার অবস্থা বেশ ঘোরালো। প্রধানত ত্রিমুখী এর গতি; তবে সবের আকর্ষণ বিকর্ষণই বিপরীতমুখী। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘাত সেখানে রাষ্ট্রগত স্বার্থ-সংঘাতে পরিণত; তা' ছাড়া, রয়েছে বহিরাগত স্বার্থরূপে বেলজিয়াম, ও তার পিছু উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা (NATO). আর রয়েছে রাষ্ট্রিক আদর্শের প্রতিভূরূপে পৃথিবীর দুটো বিরোধী শক্তিযূথের নেতা আমেরিকা ও রাশিয়া। প্রতিটি ব্যাপার যখন কঙ্গোয় ঘটছে, তখনই দেখা যাচ্ছে যে এখানকার বর্তমান নায়কদের দিয়ে পুতুল নাচ চলছে। অভিনেতার আড়ালে রয়েছে সূত্রধার; ঘুড়ির সুতো রয়েছে অন্যের হাতে। তবে চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়েছে যে, এখানকার ব্যাপারে অন্তত কিছুকাল ধরে মার্কিন কূটনীতিরই জয়-জয়কার। প্রথম দিকে রাশিয়ার বজ্রনির্ঘোষ হুমকিতে কিছু ফল হয়েছিল, তবে তা' কিঞ্চিৎ। আর রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফৎ আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর কূটনৈতিক চালাচালিতে কথার ভুবড়ীবাজি হয়েছে যথেষ্ট; হয়ত ফলও কিছুটা হয়েছে। তা হলো: বড়ো শক্তি দুটোর চক্ষুলজ্জা। অবশ্য এখানে এখন রুশ প্রভাব নেই বললেই চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও য়ুরোপে পশ্চিমী শক্তির প্রতিভূ 'নাটো'র গোপন হাতের কারসাজি আপাতত বেশ জমেছে বলে মনে হয়।

* * *

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে কঙ্গোর মুক্তি-যুদ্ধে প্যাট্রিশ লুমুম্বার নেতৃত্বে কঙ্গোলিজ ন্যাশনাল মুভমেণ্ট (Congolese National Movement), আর কাসাভুবুর চালনায় আবাকো দলের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। আবার যখন বেলজিয়াম এদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবার আগে যে-সাধারণ নির্বাচন হয়, তা'তে উভয় দলের প্রতিনিধিই নয়া পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন। তবে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিরাই হলেন দলে ভারী, একক সংখ্যাগুরু। কাসাভুবুর দলের লোকরা বেশ কিছু আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকার করেন। আর স্বতন্ত্র সদস্যরা যে সব আসন দখল করেন, তা'তে একজোট হ'য়ে গোলমাল পাকাবার ক্ষমতা তাঁদের হলো। এহেন অবস্থায় লুমুম্বা ও কাসাভুবু হাত মেলান। তবে লুমুম্বাই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হলেন, অর্থাৎ পার্লামেণ্ট কর্তৃক তিনি প্রধান মন্ত্রী, আর কাসাভুবু প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। মনে হলো, উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ মিটে গেলো; কিন্তু তা ক্ষণিকের। অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে পুরানো ক্ষমতার লড়াই আবার মাথাচাড়া দেয়। স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১১।১২দিন পর কাতাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রী ৎ-শোম্বের স্বাধীনতা ঘোষণাকে উপলক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে ওঠে। দেখা গেল যে, কাসাভুবু কঙ্গো কন-ফেডারেশন (Congo Con-Federation), আর লুমুম্বা ইউনিটারী কঙ্গোর (Unitary Congo) পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত বিভিন্ন প্রদেশকে বেশি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ—যা' প্রায় স্বাধীনতার সমতুল—ক্ষমতা দিতে চান; দ্বিতীয়োক্ত চান কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং তা' শিশুরাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থেই। কিন্তু কাসাভুবু প্রথমদিকে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও গোপনে দলভারী করার জন্যে ৎ-শোম্বের মত সমর্থন করতে থাকেন। স্বভাবতই লুমুম্বার এতে উত্তেজিত হবার কথা। যখন ৬ই জুলাই থেকে নানা স্থানে কঙ্গোলী সৈন্যদের বেলজিয়ান সেনাপসারণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা চলছে, খণ্ড জাতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে খুনাখুনি করছে, বেলজিয়ানরা ছদ্মবেশে দলে দলে কঙ্গোয় ফিরে আসছে, তখনই আবার লুমুম্বা সমর্থকগণ ও তাঁর দলবল কাসাভুবুর দলকে উৎখাত করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং কিছুটা

সফলও হয়। কিন্তু প্রথম ধাক্কা সাম্‌লে নিয়ে কাসাভুবুও তখন পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। তিনি একদিকে হলেন ৎ-শোম্বে সমর্থক, অন্যদিকে সেনা-বাহিনীতে নিজ দলভারীর চেষ্টা করেন। কেননা, সেনা-দলের অধিনায়ক জেঃ লুণ্ডুল্লা [বর্তমানে ওরিয়েণ্টাল প্রদেশে লুমুম্বাপন্থী (প্রাক্তন সহ-প্রধান মন্ত্রী) মুখ্যমন্ত্রী জিজেঙ্গার অধীনে প্রধান সেনাধ্যক্ষ] তখন লুমুম্বার পক্ষে, এবং অধিকাংশ সৈন্যই তাঁকে মানে। কাজেই সেনাদলের ভেতর এমন দলাদলি করা হলো যে প্রথমে লুণ্ডুল্লা (পালিয়ে বাঁচেন) ও পরে প্রধান মন্ত্রী লুমুম্বারই বারবার প্রাণ সংশয় ঘটে। ফলে তাঁকে বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর শরণ নিতে হয় এবং পরে যখন কর্নেল মোবুতু (একদা লুমুম্বা সমর্থক ও ব্রুসেলসে কঙ্গো কূটনৈতিক মিশনের কর্মচারী) কাসাভুবুর দিকে ভর করেন, তখনও তাঁকে তাদের (পলায়ন ও ধৃত না হওয়া পর্যন্ত) হেফাজতেই আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। এহেন অবস্থায় প্রথম পর্যায়ে রাজনৈতিক লড়াই-এ লুমুম্বা জয়ী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। এ বিফলতার হেতু অবশ্য ঠিক ঘরোয়া নয়; আন্তর্জাতিক কূটনীতির চক্রান্তের তিনি বলি। মোবুতু বেলজিয়ান সমরোপকরণ ও অনুরূপ সাহায্যপুষ্ট না হলে এবং কাসাভুবুকে প্রকাশ্য মার্কিন নৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য না দেওয়া হলে তিনি শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হতেন কিনা সন্দেহ। যেহেতু বন্দী হবার আগেও কঙ্গো পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য লুমুম্বাকে সমর্থন করেছেন এবং মোবুতুর জবরদস্তি ও কাসাভুবুর নির্দেশে পার্লামেণ্ট বন্ধ করে দেয়ার সময়ও (বহু লুমুম্বা-সমর্থক সদস্য গ্রেপ্তার করা হয়) পার্লামেণ্ট লুমুম্বা-পন্থীই ছিল। অথচ দেশ-বাসীর সমর্থন থাকা সত্ত্বেও মোবুতুর অনাচারের মাশুল তাকেই পুরোপুরি দিতে হয়েছে। এটা মোবুতুর জয় নয়; কাসাভুবুরও নয়। জয় বরং বেলজিয়াম ও ন্যাটোর; জয় রাশিয়া ও শক্তি-নিরপেক্ষ আফ্রোশীয় গোষ্ঠীর ওপর মার্কিন কূটনীতির। এতে করে একদিকে মোবুতু মহামাতব্বর হয়ে উঠেছেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের সেনাদের নাজেহাল করছেন, ভারতীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে (যদিও যোদ্ধবাহিনীভুক্ত নয়) কুৎসিত অপমান ও প্রহার করিয়েছেন,—অন্যদিকে কাসাভুবু প্রেসিডেণ্টরূপে (ইলিওকে প্রধানমন্ত্রী করে) মহাসুখে প্রভুত্ব ভোগ করছেন; আমেরিকার কৃপা ও কারসাজিতে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিজের প্রতিনিধিদের বহাল করিয়েছেন। কিন্তু এত করেও নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে অপারক। মোবুতু নিজেকে দেশের হিতকামী বলে চালাতে গিয়ে ছাত্র কমিশনার পরিষদ (কলেজ অব ষ্টুডেণ্ট কমিশনার্স) মারফৎ দেশ শাসনের ভার তুলে নিয়েছেন, কাসাভুবুকে কিছুটা করেছেন নিষ্ক্রিয়। এদিকে কাসাভুবু কাতাঙ্গার বিচ্ছেদকামী প্রধান মন্ত্রী ৎ-শোম্বেকে বাগে আনতে পারেননি। দেশের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবমাত্রেই তিনি গররাজি। এবং এরই ভেতর কাতাঙ্গায় নয়া মুদ্রাও চালু করেছেন; বরং তিনি বেলজিয়ামের সঙ্গেই বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মাত্রাধিক উৎসাহী। ৎ-শোম্বের অতীত যাঁ'রা জানেন, তাঁ'রা এটা তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক কিছু হয়নি বলে স্বীকার করেন।

* * *

অনেকে বলে থাকেন: রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব ও প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতাই লুমুম্বার কাল হয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও সার্বভৌম অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যা' করেছেন, তা' ছাড়া অন্য কিছু করা তাঁ'র পক্ষে হয়ত সম্ভবপর ছিল না। তবে নিরাপত্তা পরিষদ (১৪ই জুলাই) বেল-জিয়ামকে কঙ্গো থেকে অবিলম্বে সেনা সরিয়ে নিতে অনুরোধ করার পর দিনই রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চফ কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আবার সেদিনই লুমুম্বা করেন বেলজিয়ামের সঙ্গে কূট-নৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের খবর ঘোষণা। স্বভাবতই এহেন ব্যবস্থা আমেরিকা ও 'নাটো'র পক্ষে দুশ্চিন্তার। তা-ই এদের ইঙ্গিত ও বেলজিয়ামের সরাসরি সাহায্যে মোবুতুর এতটা প্রতিপত্তি ও স্পর্ধা। আর বশম্বদের মতো তিনিও প্রথমেই বিদায় করেন লিওপোল্ডভিল থেকে চেক ও রুশ কূটনীতিকদের, বাজেয়াপ্ত করেন লুমুম্বা তথা কঙ্গো সরকারকে প্রদত্ত যাবতীয় রুশ উপকরণ, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে বন্ধ করেন রুশ প্রভাবের ছিদ্রপথগুলো। কাজেই খুঁটির জোরে যাঁ'র উদ্ভব, পরিণামে ভাগ্য নিয়ন্তারূপে

আত্মপ্রকাশ ঘটে সেই অখ্যাত কর্নেলের। কিন্তু এসবই কঙ্গোয় বিশ্বরাজনীতির তরঙ্গাভিঘাত মাত্র।

* * *

চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, কঙ্গোর পটপরিবর্তনের সব কিছুই যেন আগে থেকে ছকে-গড়া। একটার পর একটা ঘুঁটির চালে আমেরিকা তথা নাটোর বেনামদার পশ্চিমী জোট সব বাজিই মাৎ করে ফেলছে। তা'র প্রতিপক্ষ যে মহাকাশবিজ্ঞানী খোদ রাশিয়া। অফ্রোশীয় গোষ্ঠীকে তা'র থোড়াই কেয়ার। বলতে গেলে তা'দের যেন লেজে-খেলান চল্‌ছে। কথাটা শুন্‌তে কটু, কিন্তু রূঢ় সত্য। তাদের যা' কিছু বল নৈতিক,—যা' কিছু সম্বল অপরাজিত মনোবল—যূথবদ্ধ প্রতিবাদের অহঙ্কার। সামরিক শক্তি নগণ্য, উদ্দেশ্যও সীমিত। কঙ্গোয় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, আইনত প্রতিষ্ঠিত গবর্নমেণ্টকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা, আর তা'র ঘর গোছাতে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই। প্রধানত এজন্যেই সেথানে ভারত সহ আফ্রিকা ও এশিয়ার ৮।৯টি দেশের সেনা পাঠানো। আর ভারতীয় সেনারা যোদ্ধৃদলও নয়। হাসপাতাল চালানো ও সংযোগ ব্যবস্থা রক্ষাই তাদের মুখ্য কাজ। নির্দিষ্ট কাজ ফুরুলেই তাদের ছুটি। কিন্তু আমেরিকা বা রাশিয়ার কাছে কঙ্গোর সমস্যা এত সোজা নয়; দুই শিবিরের মাঝে বিশ্বব্যাপী যে-ঠাণ্ডা লড়াই গত ১৫ বছর ধরে চলেছে, এটা তারই অন্যতম সর্বশেষ ঘাটি। বিরোধী পক্ষকে হতমান ও জব্দ করার হাতিয়ার। কাজেই কঙ্গোকে উপলক্ষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জে কূটনীতিক দাবা খেলা। এখানে কঙ্গোর অধিবাসীদের আশু কল্যাণ বড় নয়; নিজেদের সুবিধাই আসল কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোড়ার দিকে কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা ধরা যাক। এতে জটিল সমস্যা হয় জটিলতর। অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ রালফ বাঞ্চে যখন (৪ঠা আগস্ট) রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর কাতাঙ্গা-প্রবেশের উদ্যোগ হিসাবে এলিজাবথভিলে পৌছেন, তখন ৎ-শোম্বে সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখান নি; বরং তিনি হুম্‌কি দিলেন: কাতাঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জবাহিনী আক্রমণকারী রূপে প্রবেশ করবে। অসারের এ তর্জনেই যেন হ্যামারশীল্ড ঘাবড়ে গেলেন! তিনি রিপোর্ট দিলেন যে কাতাঙ্গার ঘরোয়া (!) বিরোধে নাক গলানো ভালো নয়; বরং রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর কাতাঙ্গা-প্রবেশ সুগম করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদে আগে আইন রচনা করা হ'ক! এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। আইনের ভেল্কি ও বেড়াজালে মূল সমস্যা এড়ানো। কাজেই ৎ-শোম্বের বিরুদ্ধে কোন ফলপ্রদ ব্যবস্থা করা হলো না; অথচ সাপও মলো, লাঠিও ভাঙ্গলো না। ৎ-শোম্বেকে জীইয়ে রাখা হলো, অথণ্ড কঙ্গোর প্রতীক লুমুম্বার ২নং প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে; আবার কঙ্গো-সমস্যার মীমাংসাও দুরপরাহত করা গেলো। এ কৃতিত্ব ফেল্‌নার নয়! যে ৎ-শোম্বেকে জোরে ধমক দিলে পিলে চমকাবার কথা, যার সেনাবল এ দেশের জমিদারদের লাঠিয়ালের চেয়ে বেশি কিছু নয় (অবশ্য বর্তমানে হাজার সাত বেলজিয়ানদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখছে ও তার ২ ডজন অসামরিক বিমান আছে), তাঁকে এতটা সমীহ করার ভেতর গভীর কূটনীতিক চক্রান্ত ছিল। যেহেতু স্বয়ং হ্যামারশীল্ড এক মুখেই দুরকম কথা বলেন, যেমন (ক) কঙ্গো থেকে সেনা সরান সম্পর্কে বেলজিয়াম মিথ্যা খবর দিয়েছে, (খ) কাতাঙ্গায় ঘরোয়া নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব সেনা ও পুলিশ রাখা চল্‌বে, তবে এদের সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্পর্ক থাকবে না! এমনকি আগস্টে কাসাই প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে রুশ বিমান পাঠানর অজুহাতে যাবতীয় বিমান চলাচল বন্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে তিউনিসিয়া ও সিংহল কর্তৃক উত্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত (২০শে জুলাই) এক প্রস্তাবের কথা উল্লেখ্য। এতে বলা হলো: (১) বেলজিয়াম সরকার কাল বিলম্ব না করে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী যেন সৈন্য সরিয়ে নেয়, আর (২) বিভিন্ন রাষ্ট্র যেন কঙ্গোর অথণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কিছু কাজ না করে। কিন্তু প্রস্তাব নিছক প্রস্তাবই রইলো। বরং কাজ চল্‌লো বিপরীতমুখী। যত দিন লুমুম্বার চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল, ততদিনও তাঁর খুশীমত কাজ করার স্বাধীনতা ছিল না,—বৈধ গবর্নমেণ্টের স্বীকৃত মুখপাত্ররূপেও নয়। অথচ রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বেলজিয়াম সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী সমভাবেই চলেছে, চলেছে কাতাঙ্গা ও অছিশাসিত রুয়াণ্ডা-

র্ণাতে। এই সেদিনও (ডিসেম্বর শেষ ও জানুয়ারীর থমে) মোবুতুর সৈন্যরা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষেধ সত্ত্বেও রুয়াণ্ডা-রুণ্ডির ভেতর দিয়ে কিভু প্রদেশ (লুমুম্বা-সমর্থকগণ র্তৃক অধিকৃত) আক্রমণের বিফল চেষ্টা করে। এতে যা-ই হ'ক, বিশ্বসংস্থারূপে রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যদক্ষতা ণ হয় না, অথবা তা'র মর্যাদাও বাড়ে না। বরং অন্যান্য য়ের মতো এক্ষেত্রেও পশ্চিমী, বিশেষ করে মার্কিনী ভাব ও কারসাজি যেন বড় বেশি প্রত্যক্ষ-গোচর। তার রাষ্ট্রপুঞ্জ) গড়িমসি, ঢিলেমি, পাশ কাটাবার কৌশল মন এক পর্যায়ে পৌঁছেচে যে অখণ্ড কঙ্গো রাষ্ট্রের ভিতই ন নড়বড়ে, রাষ্ট্রিক কাঠামোই তা'র ভেঙ্গে পড়ার ক্রম। আর যদি বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী বিচার বেচনা করা হয়, তা' হলে বলা ভালো : কঙ্গোর অখণ্ড ষ্ট্রিক সত্তার নাশ হয়েছে। তা'র বদলে খাড়া রয়েছে র কঙ্কাল। মাত্র ছ'মাসেই তা'র হাল হয়েছে এম্নি। ওপোল্ডভিল এখন নামে মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বলে ভিহিত। কাতাঙ্গা বিচ্ছিন্ন; নতুন মুদ্রা সেখানে চালু জানুয়ারীর প্রথম হপ্তায়), তার সৈন্য পৃথক, প্রশাসন লাদা। হীরকপ্রদেশ কাসাই কেন্দ্রের তোয়াক্কা করে না; লোজির (মুখ্যমন্ত্রী—হালে প্রেসিডেণ্ট) দহরম-মহরম লজিয়াম ও অন্যান্য পশ্চিম দেশের সঙ্গে। ওরিয়েণ্টাল প্রদেশ ম্বা-ভক্তদের কবলে; কিভুও তা-ই। এমনকি হালে উত্তর-তাঙ্গা পর্যন্ত তাদের দখলে। ইক্যুয়েটর হবু-বিদ্রোহী। জেই রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা যেন কতকটা দর্শকের। হাঙ্গামা টাতে গিয়ে যতটুকু দৃঢ়তা দরকার ততটুকুরও যেন অভাব। তএব অবস্থাটা পুরোপুরি বিভেদকামীদের অনুকূল। লে কঙ্গোতে বেলজিয়ামের পক্ষে সেনা ও সমরোপকরণ রবরাহ করা যেমন অসম্ভব হতো, তেমনি হতো শিয়ার পক্ষেও। সেপ্টেম্বরে কাতাঙ্গা ও কাসাই প্রদেশে চ্ছেদকামীদের শায়েস্তা যখন প্রায় করা হয় তখনই াবুতুকে নেপথ্যের ইশারায় রঙ্গমঞ্চে হাজির করা—একটা রিকল্পনার অঙ্গ ছাড়া কিছু নয় এবং এগুলো কোন-ই পৃথক পৃথক ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রপ্রধান কাসাভুবু ধানাসেনাপতি জেঃ লুণ্ডুল্লাকে বরখাস্ত করে কর্ণেল াবুতুকে গদীতে বসান (সেপ্টেম্বরে)। কিন্তু মোবুতু াড়ল হয়েই লুমুম্বা বা কাসাভুবু-গঠিত (ইলিও) উভয় মন্ত্রিসভাই বাতিল করে সামরিক শাসন চালু করেন; ৎসোম্বের সঙ্গে রফা করেন। 'ৎসোম্বে তাঁর শাসন এক বছর মেনে নেবার কথা দিলেন। শেষে নিজে অশেষ মহানুভবতা দেখিয়ে বললেন যে কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা তাঁর নেই—সুশাসন ফিরে এলেই সরে যাবেন! কিন্তু কথা এই : একদা লুমুম্বার প্রসাদভোজী হয়েও তবে কেন তাঁকেই বন্দি-দশার অধীন করলেন, বৈধ গবর্নমেণ্ট করলেন অচল, করলেন পার্লামেণ্টের সংখ্যাধিক লুমুম্বা-সমর্থকদের গ্রেপ্তার ও পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ এবং নিজেই বসলেন কঙ্গোর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে। এমনকি কাসাভুবুর সমর্থনপুষ্ট হয়েও করা হলো কাসাভুবুকেই নাস্তানাবুদ,—অস্ত্র-শস্ত্রের তল্লাসে তাঁর বাসভবন তছনছ। এসব করার পেছনে তাঁর মতলব নিশ্চয়ই সাধু নয়। আবার একক তিনি, তাঁর পিছনের বলভরসা নাই—এ কথাও মনে করা বাতুলতা। এটা ঘরোয়া রাজনীতি হলেও বৃহত্তর প্রেক্ষিতে উপেক্ষণীয় নয়, বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়।

ওদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জে কাসাভুবুর প্রতিনিধিদের (লুমুম্বার বদলে) বৈধকরণে যে ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া হয়, তার তুলনা বিরল। লুমুম্বাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর সহায়তায় নিউইয়র্কে যেতে বাধা দেওয়া হলো; অথচ কাসাভুবুকে সশরীরে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিজ বক্তব্য বলার যাবতীয় সুযোগ করে দেবার কোন অসুবিধাই হলো না। এমনকি তাঁর প্রতিনিধিদের কঙ্গোর সরকারী প্রতিনিধি বলে চালাবার ব্যাপারে মার্কিনী নেতৃত্বে পশ্চিমী মুখপাত্ররা যে-যুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করলেন তাও বিশ্বসভায় হাততালি পায়। এতেই কিন্তু নেপথ্যচারীর মুখোস খসে যায়, অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আশ্চর্য এই—(আর অবাক হবার কীই বা আছে)—যে-পার্লামেণ্ট লুমুম্বাকে প্রধান মন্ত্রী ও কাসাভুবুকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করে, সে-পার্লামেণ্ট ও সংবিধান বাতিল না হলেও অবাঞ্ছিত জনের অধিকার ও কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হলো! লুমুম্বা বিশ্বসভার এক ফতোয়ায় ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হলেন, নেপথ্যে সরে গেলেন। কী মর্মান্তিক পরিহাস!

আর একটা ব্যাপারেও মার্কিন সরকারের মনের আসল কথাটি ফাঁস হয়। সেটা হলো ডঃ বাঞ্চের স্থলবর্তী ও সেক্রেটারী-জেনারেল হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি

শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের কঙ্গো সম্পর্কিত রিপোর্টের ব্যাপারে। ওতে বলা হলো : (ক) বেলজিয়ানরা দলে দলে কঙ্গোয় ফিরে আসছে ও রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে বাধা দিচ্ছে, (খ) রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্ত অমান্য করে সামরিক ও আধা-সামরিক বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে মোতায়েন রয়েছে, (গ) তাদের সমর্থনপুষ্ট মোবুতু সৈন্যরা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। কিন্তু মার্কিন সরকার প্রকাশ্যে এই রিপোর্টের বিরোধিতা করে। হ্যামারশীল্ডকে সাফ বলা হলো যে দয়ালের রিপোর্ট অনুযায়ী বেলজিয়ানদের ওপর বেশি চাপ দেওয়া হলে আমেরিকা তাঁকে আদৌ সমর্থন (!) করবে না। তা ছাড়া, বেলজিয়ামের শুভেচ্ছায় তার আস্থা অগাধ! এক-কথায় অভিযুক্তকে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া। এতে করে পড়লো চিরতরে দয়াল রিপোর্টের ধামা চাপা। সাধারণ পরিষদে আর এর আলোচনাই করা হলো না। ফলত আমেরিকা যেমন সুযোগ বুঝে রাশ আলগা করে, আবার অসুবিধা বুঝলে রাশ টানছেও। যখন যাকে দিয়ে যেখানে খেলান দরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফৎ তাকে দিয়ে ঠিকই খেলিয়ে নিচ্ছে। সাপ হয়ে ছোবল মারা ও ওঝা হয়ে ঝাড়ফুক করা একসঙ্গে চলেছে। এটাই তার কূটনৈতিক brinkmanship. অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রিনীতি আদর্শের দিক থেকে 'অতুলনীয়' যথা, (ক) প্রত্যেকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন হবার ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গবর্নমেণ্টের রূপ দেবার অধিকার স্বীকার আর (গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য দান। অথচ কঙ্গোর ব্যাপারে তার সাম্প্রতিক কাজকারবার এসব ঘোষিত আদর্শের বিরোধী। তা হলেও যেহেতু নাটো-সঙ্গী নাটের গুরু, সেহেতু তার পক্ষাবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু হালের স্বাধীন মধ্য-আফ্রিকার একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ আধা-সভ্য দেশকে এমনভাবে হেনস্তা করা কেন? তার অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব নাশ করার জন্যে এমন নোংরা ঘুঁটি চালাচালি করার অর্থ কি? এর জবাব এক কথায়—রুশ-ভীতি; ঠাণ্ডা লড়াই-এর সীমা বাড়াবার অবোধ আত্মপ্রসাদ অথবা পশ্চিমী-এলাকায় রুশপ্রভাব ঠেকানো। যেহেতু কিউবায় রুশ সূচীমুখ, সেহেতু আফ্রিকায় নাটো তথা আমেরিকার পুরো-ঘাটি থাকা চাই। এটা নাকের বদলে নরুণ। তাতে উলুখাগড়ার প্রাণ যায় সব!

*　　*　　*　　*

আশা করা গিয়েছিল, কঙ্গোর বিবাদ মেটাতে আফ্রোএশীয় গোষ্ঠী বড় রকমের সহায় হবে। গোড়ায় হয়েছিলও। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রায় একশ সদস্যের (৯৯) ভেতর, এদের সংখ্যা আধাআধি। এহেতু এদের মনে একটি আত্মপ্রসাদ জেগেছিল : অবশেষে বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে তার মতামত গ্রাহ্য হবে। গ্রাহ্য না হচ্ছে এমন নয়। কিন্তু যেখানে পশ্চিমী তথা নাটোর স্বার্থ প্রবলতর, সেখানে তার যুক্তির ধার বা ভোটের ভার কোনটাই মান্য নয়। কাজেই গোড়ায় যখন কঙ্গো বিরোধের ফয়সালায় তাদের সেনা সাহায্য চাওয়া হলো, তখন তারা ছিল কুণ্ঠাহীন। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, ততো রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যবস্থাপনায় (অকর্মণ্যতায়?) তাদের সংশয় ও দ্বিধা ততো বেশি জাগছে। যেইমাত্র নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি ওয়াডসওয়ার্থ বললেন যে লুমুম্বার গ্রেপ্তার (২রা ডিসেম্বর) সঙ্গত, অমনি সেক্রেটারী-জেনারেল তা'তে সায় দিলেন। এহেতু ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘানা, গিনি, সংযুক্ত-আরব প্রজাতন্ত্র, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া, এমনকি যুগোশ্লাভিয়া কঙ্গো থেকে সেনা ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম ভারত। তার মতে (যদিও যোদ্ধা ভারতীয় সেনা কঙ্গোয় মোতায়েন নাই) এ-ব্যবস্থায় কঙ্গোয় অনিশ্চয়তা বাড়বে। কিন্তু অনিশ্চয়তা নিঃসন্দেহে এখন চরমে। তবে ভারতের মর্যাদাহেতু তার প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জের কঙ্গোস্থ প্রতিনিধি এবং তার অফিসার রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখ্য সামরিক পরামর্শদাতা। কিন্তু একভাবে এটাও যেন তার পক্ষে অভিশাপ। যেহেতু মোবুতুর গুণ্ডা সৈন্যদের হাতে ভারতীয়দের চরম লাঞ্ছনা ভারতের পক্ষে মর্মবেদনার হেতু। অবশ্য প্রতিবাদ এর বিরুদ্ধে হয়েছে যথেষ্ট। রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রীমেনন মোবুতুর মুণ্ডপাতও কম করেননি, কিন্তু 'ক্যারাভান' ভ্রূক্ষেপহীন। অক্টোবরে অবস্থা ঘোরালো হবার পর শ্রীনেহরু প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্যে কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কমিশন পাঠান হোক। এ সূত্র অনুসরণ করে নভেম্বরে এশিয়া ও আফ্রিকার ১৫টি রাষ্ট্র নিয়ে (ভারত সহ) অপসরফা কমিশন গঠিত হয়। তা'র করণীয় (১)

কঙ্গোর বিভিন্ন বিরোধীদলের মধ্যে মীমাংসা ও (২) পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বানের চেষ্টা করা। এতেও কাসাবুভু বাদ সেধেছিলেন। তাঁর আপত্তি: ঘানা, গিনি, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র লুমুম্বার সমর্থক; এহেতু কমিশনে প্রতিপক্ষভুক্ত। অবশ্য বহু বাদানুবাদের পর শেষ পর্যন্ত কমিশন খাস কঙ্গোয় কাজ শুরু করেছেন, বহু বৈঠকও হয়েছে, কিন্তু কাজ এগোয়নি আদৌ। কাতাঙ্গা-কারাগারে অপসারিত লুমুম্বার আত্তও দেখা পাননি তাঁরা। যেহেতু কঙ্গো এখন বারুদ-স্তূপ। নানা স্থানে বিস্ফোরণে দেশ খণ্ডবিখণ্ড, এমনকি লিওপোল্ডভিলের কাসাবুভু সরকার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকার বলে গণ্য নয়। আরও ৫টির মতো এখন তার অবস্থা। বরং লুমুম্বা-পন্থীদের অবস্থাই এখন সব চেয়ে সংহত। ওরিয়েণ্টাল, কিভু ও কাতাঙ্গার উত্তরাংশ তাদের দখলে। তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তিও প্রসারের পথে। এমনকি যে রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে একতরফা সাহায্যদানের অজুহাতে কঙ্গো থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়, রাষ্ট্রপুঞ্জে দেওয়া হয় প্রবল ধিক্কার, [সাংবাদিক বৈঠক (আগস্ট) আইসেনহাওয়ার বলেন: আফ্রিকায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাশিয়া কঙ্গোয় একতরফা কাজ চালাচ্ছে] এখন নবোত্তমে তাদের ফিরে আসার পথ পূর্বাপেক্ষা বেশি সুগম। এহেন অবস্থায় কর্মোদ্যোগ রাষ্ট্রপুঞ্জের হাত থেকে খসে পড়েছে। অন্তের উস্কানি ও গৃহযুদ্ধে সমগ্র কঙ্গো লণ্ডভণ্ড ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। কাজেই ভারত সহ সাতটি রাষ্ট্র ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জে বন্দীমুক্তি, যাবতীয় বেলজিয়ামের অপসারণ, কঙ্গোর পার্লামেণ্টের অধিবেশন অবিলম্বে আহ্বান ও রাষ্ট্রপুঞ্জকে কঙ্গোর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার দাবি জানিয়ে যে প্রস্তাব করেছিল, তা'র আলোচনা মার্চ পর্যন্ত কৌশলে স্থগিত রাখা হলেও কঙ্গোর ভাগ্য কঙ্গোবাসীরাই হয়ত তার আগে স্থির করে ফেলবে। অন্তত হাওয়ার গতি সেদিকেই; কঙ্গোবাসীদের মেজাজ ও মতিও তা-ই।

এখন দু'পক্ষেরই সমতালে রণসাজ। উভয়েই কম-বেশি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট। একপক্ষ বেলজিয়ামের মারফৎ ন্যাটোর, অন্যে আফ্রিকারই কোন দেশের (সম্ভবত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র) মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ার সমর সম্ভার পাচ্ছে। এখানেই সব শেষ নয়। বেলজিয়ান অফিসার, বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্য ও উপদেষ্টারা লুমুম্বা-বিরোধীদের হয়ে কাজ করছে। হালে বেলজিয়ান বৈমানিক চালিত কাতাঙ্গার বিমান লুমুম্বাপন্থীদের ওপর মনানোতে (উত্তর কাতাঙ্গা) হামলা করেছে; খুন-খারাপিও কিছু হয়েছে। এতে কঙ্গো যুদ্ধের মূল প্রকৃতি বদলাবার আশু সম্ভাবনা খুব বেশি। অর্থাৎ হয় রাষ্ট্রপুঞ্জকে কঙ্গো সম্পর্কে দৃঢ় ও কঠোর হতে হবে—আগের কূটনীতির ছলাকলা পরিহার করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বিশ্ব-সংস্থার সিদ্ধান্ত রূপায়িত করতে হবে—নয় উভয় শিবিরের পক্ষে বৃহত্তর সম্মুখ-সমরের পথ খোলসা হবে। তাতে ঢাক গুড়গুড় কিছু থাকবে না; বরং স্পেনীয় যুদ্ধের মহড়া কোরীয় যুদ্ধের সর্বাত্মক রূপ নেবে। হয়ত এ সম্ভাবনা রোধের জন্যেই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক (২।২।৬১)। এটা নয়া-মার্কিন সরকারের (কেনেডি গবর্ণমেণ্ট) পক্ষে অগ্নিপরীক্ষাও বটে।

* * *

ফলত সঙ্কট শুধু কঙ্গোর নয়, আফ্রিকারও না। চরম সঙ্কট রাষ্ট্রপুঞ্জের। এর অস্তিত্বের। প্রথম যখন কঙ্গোর বিপদে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে সাড়া দেওয়া হয় তখন রাশিয়া বা আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী অথবা পশ্চিমী শিবির—সকলেরই উদ্দেশ্য ছিলো এক। কিন্তু কিছুদিন পরই কর্মপদ্ধতি নিয়ে বাধে যত গোল। দুই সপ্তাহ যেতে না যেতে রাশিয়া বেঁকে বসে; শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট-গোষ্ঠী কঙ্গোয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক ব্যয় বহনে অসম্মত হয় এবং তাদের দেয় অংশ নিতান্ত নগণ্য নয়; শুধু তাই নয়। এর পর থেকে রাশিয়ার বিশ্ব-সংস্থায় পশ্চিমী অভিসন্ধি খুঁচিয়ে বার করার অবিরাম চেষ্টা এবং এতে খানিকটা সফলও না হয়েছে এমন নয়। এমনকি জোট-নিরপেক্ষদেরও মন কিছুটা ভিজিয়েছে। যে-ভারত বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনে (বিশেষ করে আফ্রিকায়) অত উৎসাহী, হালে তা'রও সংশয় জেগেছে! কাজেই অবস্থার রদ-বদল বা পশ্চিমা মানসিকতার পরিবর্তন না হ'লে সে-ও কঙ্গো থেকে চলে আসার কথা ভাবছে। এতে গোড়া ধরে টান পড়ার উপক্রম। যেহেতু ভারতসহ নিরপেক্ষ-গোষ্ঠী সদলে কঙ্গো ছাড়লে খোদ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অস্তিত্বই হবে বিপন্ন। এখানে চাল-কিলের পশ্চিমী ছড়িদারী বা লেজে-খেলান বিফল হতে বাধ্য। কিন্তু যে

হাঁস সোনার ডিম পাড়ছে, ততই শেষবেশ হবে খুন। মজা এই, এমন যে বশম্বদ কাসাবুভু, তিনিও সুযোগ নিচ্ছেন এ অবস্থার। নানা আজগুবি অজুহাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি দয়ালকে কঙ্গো থেকে সরিয়ে নেবার রব তুলেছেন। তা' ছাড়া, আরও একটা বড়ো প্রশ্ন এ সবে জড়িত। তা' হলো: বিশ্ব-সংস্থায় শক্তিসাম্য বা balance of power-এর। হয়তো কঙ্গোর ব্যাপার নিয়ে তা'র একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া বিচিত্র নয়। সূচনায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৫১; এর ভেতর ৩২টি দেশই পশ্চিম য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার। অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমী শিবির ছিল গরিষ্ঠ—brute majority. কিন্তু এখন সদস্য সংখ্যা ৯৯; আর এদের ভেতর অন্তত ৫৪টি দেশ আফ্রোশীয় গোষ্ঠীর। কাজেই যখনতখন দু' তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার জোর (যে কোন ব্যবস্থার জন্যে যা ন্যূনতম প্রয়োজন) খাটানো পশ্চিমী শিবিরের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু এখনও মধ্যপন্থী হালের স্বাধীন আফ্রোশী গোষ্ঠীর মনস্থির হয় নি; জোটও তার তেমন পোক্ত হয় নি জোর বাঁধে নি। অথচ তাদের ঘোর বিপাকে ফেলে প্রহসন। তাদের এমন বাঁদর-নাচানো, তাদের দিয়ে সাক্ষ্য করানো। পশ্চিমের মর্জির দাস বানানো। এস তাদের বুকে বিষম বাজছে। কিন্তু তারা নাচার; নানা বাধ্যবাধকতা ও ভবিষ্যতের চিন্তায় বুক ফাটলেও মুখ তাদের ফোটে না। কাজেই এর কুফল হাতে হাতে না ফলতে পারে; কিন্তু লক্ষণ আদৌ পশ্চিমী জোটের পক্ষে শুভ নয় রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষেও না। অশান্ত কঙ্গো চিরতরে রাষ্ট্রপুঞ্জের গলায় কাঁটা হওয়া অসম্ভব নয়। ২৫।২।৬১

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন করে।' চলেছে মৃত্যুদিনকে অতিক্রম করে মহাজীবনের পথে, চলেছে শতবর্ষের আলোক-তীর্থে। মহাকালের পটভূমিকায় শত একশো বছরের ইতিহাস হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু বাঙালীর জীবনে সে যেন একটা যুগান্ত। একটা যুগ-বিপ্লবের অভিঘাতে বাঙালীর ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সাধনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এই একশো বছরের সার্থক প্রয়াসে আর ব্যর্থ অন্বেষায়। আর শুধু বাঙালীই বা কেন, বিশ্ববাসীর জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝা, দু'দুটো মহাযুদ্ধের মহাপ্লাবন। এই যুগ-বিপ্লবের যুগ-প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সাহিত্যেই স্বাক্ষরিত হয়ে আছে এ গ্রহের ক্রন্দন এবং উল্লাস। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর যুগ-সার্থকতা এইখানেই।

'যখন রব না আমি মর্ত্য কায়ায়' তখন 'ডেকো না ডেকো না সভা'—বারবার রবীন্দ্রনাথ একথা বললেও, এ-যুগের মানুষ কিন্তু রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী উৎসবের আয়োজনে এখন থেকেই মেতে উঠেছে। ১৩৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখের প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে ১৩৬৬ সালেই। সুরু হয়েছে দেশে-দেশান্তরে নগরে-বন্দরে। ইউনেস্কোতে অধিবেশন বসছে, পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে—কিভাবে ডালি সাজানো যায় যুগ-পুরুষের শতবার্ষিকীতে। উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী ইউরোপে একরকম, আমেরিকায় অন্যরকম, এশিয়াতে আর এক রকম। কিন্তু শত পার্থক্য সত্ত্বেও, ভাবের দিক থেকে, উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র কর্মসূচীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সে সাদৃশ্যটা হোল রবীন্দ্রনাথকে বোঝা, রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা, রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তার জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ প্রস্তুত হচ্ছে, রবীন্দ্র রচনাবলীর সঙ্কলন তৈরী হচ্ছে, রবীন্দ্র চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা তো হচ্ছেই, তার উপর চলেছে মহড়া—রবীন্দ্র নাট্যাভিনয়ের এবং সঙ্গীত পরিবেষণার।

রবীন্দ্র-ঋণ পরিশোধের জন্য সারা বিশ্ব তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে এবং করবেও। কিন্তু ভারতবাসীর, বিশেষ করে বাঙালীর দায়িত্ব আরও বেশী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের—এ কথাটা সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর। গ্যয়টেকে রক্ষা করেছে জার্মানী দান্তেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ইতালী, সেক্সপীয়রকে এ-যুগের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ইংলণ্ড। তেমনি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়ার নয়, সে দায়িত্ব বাঙালীর। কেননা বাঙালী নিজেকে খুঁজে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, বাঙালী আজ নিজেকে চিনেছে রবীন্দ্রনাথকে জেনেছে বলেই। বাঙালীর ঘরের কথা বাঙালীর প্রাণের ভাষায় দেশ-বিদেশে যিনি প্রচার করেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র যেমন ধর্ম

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর আসন জগৎ-সভায় সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বাঙালীর মনীষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে।

রবীন্দ্র-সৃষ্টির একটা সার্বিক আবেদন আছে, যা দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে জীবনকে বারে বারে ছুঁয়ে যায়—'জীবনে জীবন যোগ' করে। সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্র-সাহিত্যের তুলনা নেই। মাতৃভাষা বাঙলাতে এই নতুন সম্পদ সৃষ্টি করলেও সমগ্র বিশ্ব-মানবের সে এক গৌরবময় সম্পদ। রবীন্দ্র-বাণীতে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে, সে সুর মানবতার সুর। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে তা শাশ্বত হয়ে আছে। রবীন্দ্র-রচনার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে আছে মহাজীবনের জয়গান। বিশ্ববাসীর কাছে যে বাণী তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, তা' হ'ল 'একের মধ্যে বহুর মিলন'—এক 'unity in diversity'। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মত তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেবলমাত্র ঐক্যের মধ্যেই সত্যম্ শিবম্‌সুন্দরম্' এর অস্তিত্ব।

জীবন-পথের যে দিকটা মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায় দুঃখ-বেদনায় করুণ, মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথ সে জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। বেদনাতুর মানবাত্মার ক্রন্দন তাঁকে চঞ্চল করেছে, মানব-মর্যাদার অবমাননা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছে, অত্যাচার ও বর্বরতা তাঁকে কঠোর প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছে। যা' কিছু অন্যায় আর অসমঞ্জস, যা' কিছু অসুন্দর আর অমানুষিক, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদের বহ্নি জ্বালিয়েছেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সুন্দর ও মানব-মুক্তির সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে আছে। জাতীয় স্বাধীনতা, সামাজিক বিচার, মানব ঐক্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাম করেছেন। সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে তিনি সত্য-সৌন্দর্য্য ও মুক্তি-মর্যাদার ভিত্তি এক চিরন্তন সভ্যতা স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে এই বাংলাতেই ভূমিষ্ঠ, বাংলা যে তাঁর মাতৃভাষা, বাংলা যে তাঁর কর্মভূমি—এ হ'ল বাংলার গৌরব। রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করে এ-যুগের মানুষ অন্তত, ক্ষণকালের জন্য তাঁর মহান আদর্শের সংস্পর্শে পৌঁছাতে পারে। কর্মব্যস্ত মানুষ তার দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম করে একটা বৃহত্তর ও মহত্তর জীবন পর্য্যায়ে পৌঁছাতে পারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে। বাঙালী তাই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালন করবে প্রেমের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, নিষ্ঠার দ্বারা, রজনীগন্ধা ছাড়াই রবীন্দ্র পুজা সম্ভব যে, বাঙ্গালী তা' প্রমাণ করবে, যা তার করা উচিত। হাজার বাতির চোখ-ঝলসানো আলোয় সামিয়ানা-ঢাকা সুদৃশ্য মঞ্চে Carnival এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধ না রেখে বাঙালী তাকে ছড়িয়ে দেবে, তাকে নিয়ে যাবে হাটে, মাঠে, ঘাটে, নিয়ে যাবে পল্লী বাংলার কুটিরে-কুটিরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আর এই নিয়ে যাবার মাধ্যম হবে রবীন্দ্র-নাট্য, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রবীন্দ্র-কাব্য, রবীন্দ্র-চিত্র। এ মহান দায়িত্ব সমগ্র বাঙ্গালীর হয়ে তুলে নেবে শান্তি-নিকেতন, যেখানে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্র-স্মৃতি শালবনের ছায়ায়-ছায়ায়, উত্তরায়ণের কুটির-প্রান্তে, আম্রকুঞ্জের পত্র-মর্মরে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবির পৈতৃক বাসভবন ও 'বিচিত্রা' নামক ভবনটিতে স্মৃতিরক্ষা মন্দির, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোড ও ক্যাথিড্রাল রোডের সংযোগ স্থলে একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শুধু রবীন্দ্র মিউজিয়ম এবং রবীন্দ্র গবেষণার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-চেতনা জাগ্রত করা যাবে না আপামর জন-সাধারণের মধ্যে। রবীন্দ্র-রচনাবলীকে মরোক্ক চামড়ায় বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখেও প্রচার করা যাবে না অল্পবিত্ত বাঙালার কাছে। তার বদলে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য পৌঁছে দিতে হবে বাঙালীর ঘরে ঘরে। এ ব্যাপারে ভারত-সরকারের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য অবশ্য একটা অর্থভাণ্ডার খোলা হয়েছে। আর হায়দ্রাবাদের নিজাম তাতে কয়েক লক্ষ টাকাও দান করেছেন। কিন্তু ধনীর মোটা অংকের দানে শ্রদ্ধার ডালা ভরে তুললে লজ্জা আমাদের ঘুচবে না বলেই ভারত সরকার বোধহয় 'সবার পরশে পবিত্র করা' দান গ্রহণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক, ডাকঘর ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি এক টাকা মূল্যের, পাঁচ টাকা মূল্যের এক লক্ষ কুপন এবং দশ টাকা মূল্যের পঞ্চাশ হাজার কুপন মুদ্রিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির ললিত বাণী শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যুদ্ধ-ক্লান্ত পৃথিবীতে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো দু'টি পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই। দু'টি দেশই রবীন্দ্র-ধ্যানে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস-স্বরূপকে বোঝবার চেষ্টা করছে বলেই ডঃ অমিয় চক্রবর্তী শান্তি-নিকেতনের এক ঘরোয়া আলোচনায় বলেছেন, "মার্কিন দেশে এবং রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যদি কোন সহযোগিতা অথবা সমভাব দেখা দেয়, তাহলে বলবো—রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বিশ্বকল্যাণের আর একটি বিশেষ দ্বার খুলে দেবে।" রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমগ্র বিশ্ববাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত করতে পারে সে গান,—

'মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়াছে একতালে
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে
করেছে একমন।

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ আপনার অজ্ঞাতসারেই শতবার্ষিকী উৎসবের মূল মন্ত্রটিকে উচ্চারণ করেছেন :—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

রবীন্দ্র-কাব্য কৌতুহল ভরে হৃদয়ের আবেগের রঙে রাঙিয়ে পাঠ করা, তার মর্ম উপলব্ধি করার মধ্যেই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে সে, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ আসলে কবি—জগতের এবং মানুষের।



কুহেলী

শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ

পশ্চিমের একটি ছোট্ট সহর। আসে পাশের কলকারখানা আর কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়েই সব কিছু জড়িয়ে আছে এই সহরের। যুদ্ধের আগে এর নিখুঁত সৌন্দর্য্য বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত এক পলকেই। অধিকাংশ বড় বড় বাড়ীগুলোর মধ্যে বাস করত ইংরেজ বাচ্চারা। তাদের ক্লাব, তাদের সমাজ, তাদের সভ্যতায় অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। অনেকেই লোভ এড়াতে না পেরে জাত-ধর্ম্ম খুইয়ে দলে ভিড়ে গিয়েছিল। আজ সহরের সে রূপ পাল্টে গেছে। খোলস-ছাড়া সাপের মত নিৰ্জ্জীব ঝিমিয়ে পড়া ভাব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই সব ভাবধারা বদ্‌লে গেছে যেন। দেশ ছেড়ে চলে গেছে বিদেশীরা, কিন্তু তাদের বিষ ছড়িয়ে রয়েছে সহরের প্রতিটি প্রাণীর মাঝে। এখনও ক্লাব আর সহরতলার নানা স্থানে সেই সব বিষের প্রক্রিয়া চল্‌তে দেখা যায়। এই সহরের একতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করে একটী মেয়ে। নাম তার কুহেলী। নামের সাথে বেশ মিল আছে ওর। রূপের চটকে চোখ ঝলসায় অনেকের। চাল চলন কথাবার্তায় বেশ খানিকটা মাদকতা জড়িয়ে থাকে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হল কুহেলীর সাথে। দেখলাম সবটাই ভেজাল। জীবনের যে কটা বছর পার করে দিয়ে ও এসে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তার মাঝে বিন্দুমাত্র বাস্তবতা নাই, সেকথাই সে জানিয়েছিল আমাকে প্রথম আলাপেই। বাইরের চমক-লাগা দৃষ্টির মাঝে এমন বেদনাদায়ক ইতিহাস লুকিয়ে থাক্‌তে পারে, তা কুহেলীকে দেখার আগে আমি চিন্তা করতে পারি নি। কি অদ্ভুতভাবে কথাবার্তা বলে, কি কেতাদুরস্ত চাল-চলন। নাইটক্লাবের নাচ জমে না কুহেলী আসরে না থাকলে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় কুহেলীর সাথে নাচের পার্টনার হওয়ার জন্য। নিত্য নূতনের মাঝে—পরিচিত হয়ে ওঠার কি অদ্ভুত প্রয়াস!

কুহেলীর রূপের জৌলুষে ওর বয়সের মাপকাঠি নির্ণয় করা যায় না, তার উপর আবার প্রসাধনের প্রলেপ আছে। বিদেশী বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাল নীল আলোর মাঝে দেহখানি দুলিয়ে নাচের মাঝে যে কি মাদকতা আছে তা অনেকেই বুঝতে চায় না। এই সবের মাঝে কুহেলী খাপ খাইয়ে নিয়েছিল নিজেকে যেন ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। কেন যে ওর এলোমেলো চিন্তা ওকে মাঝে মাঝে এমন আনমনা করে দেয় তা নিজেই চিন্তা করতে পারে না। তবুও কুহেলী চিন্তা করে ওর মধুময় অতীতের কথা, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায় তার মাঝে, ভুলে থাকতে চায় এই সব কুৎসিত পরিবেশকে। কি ছিল কুহেলী, কিসের অভাবে আজ এমন হল। সর্বনাশা যুদ্ধই কাল হল কুহেলীর জীবনে, এমনি ধারা বিপর্য্যয় এনে দিল। যুদ্ধ, কি ভীষণ, কল্পনায় এর রূপ দেওয়া যায় না। কত কোটী কোটী মানুষ প্রাণ হারাল, কত দেশ ধ্বংস হল। ধ্বংস হল কত সমাজ শৃঙ্খলা। মানুষের মন বিচ্ছিন্ন হল। কত কিছুর মাঝে কত কিছু হারিয়ে গেল, তার হিসাব মেলে কই। তারই মাঝে কুহেলী হারাল ওর জীবনের সব কিছু। তাইত চিন্তা করে কুহেলী যুদ্ধের কথা—নইলে ব্যক্তিগত জীবনে যুদ্ধের চিন্তায় এতখানি বিপর্য্যস্ত হওয়ার ওর কি কারণ থাক্‌তে পারে। সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে কুহেলী, তবুও বেঁচে থাকার মাঝে মানুষের অহরহঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মৃত্যুকে বরণ করে কুহেলী হয়ত শান্তি পেতে পারত, ভুলে থাক্‌তে পারত সব কিছু, কিন্তু কুহেলী মরেনি। কেন যে মরেনি তা ও নিজেই জানে না। হয়ত এটাই মানুষের জীবনের চরম ভালবাসা। নিজেকে ভাল-

বাসার মাঝে হয়ত জীবন মরণের খানিকটা নির্ভর করেছে।

পৃথিবীকে হয়ত গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিল কুহেলী, তাই নানা ব্যতিক্রমের মাঝে ও মরবার কথা চিন্তা করেনি। অতীতের সেই সুখ-স্মৃতির জাবর কেটে বর্তমানের এই সব অসমঞ্জস ভাবধারাকে মেনে নিতে পেরেছে।

কোথায় গেল বসন্ত। কোথায় গেল ওর স্নেহময় পিতা মলয় বোস। কাল যুদ্ধই ওদের গ্রাস করল। সত্যিই কি তাই, না এই পৃথিবীর মানুষ তার উপর বিশ্বাস-ঘাতকতা করল? কি নিষ্ঠুর মানুষ এই পৃথিবীর। সব-চেয়ে আপনজন তার মা তাকে কোথা দিয়ে কেমনভাবে এমনি ধারা টেনে আনল সে কথা মনে হতেই তার চীৎকার করে কাঁদতে মনে হয়। কি দুঃসহ জ্বালা তিলে তিলে ভোগ ক'রে ওর বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। জীবনে এতখানি ভালবাসা বোধহয় আর কারও কাছ হতে পেল না কুহেলী যতখানি পেয়েছিল ওর স্নেহময় পিতার কাছ হতে। কি মোহময় আবেশে ওদের দিন-গুলো কাটত। ওর রেশমের মত নরম চুলের মাঝে আঙুল গলিয়ে দিয়ে কত আদর করত কুহেলীকে ওর বাপি। এর জন্য কতদিন মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়েছে বাপিকে। অফিস হতে ফিরেই সব ভুলে কুহেলীকে নিয়ে বসে যেতেন তিনি। চা খাওয়ার কথা মনে হত মায়ের বকুনি খেয়ে। কোথায় চলে গেছে বাপি। আজও কি চোখের আড়ালে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে তার আদরের মেয়ে কি দুঃসহ জ্বালা ভোগ করছে? অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত নিজেকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। এই সমাজ সংস্কার ছেড়ে চলে যাওয়ার মাঝে কেমন যেন বাধা অথচ এর মাঝে নিজেকে যেন ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না কুহেলী, এ কেমন ধারা নেশা! বাপি ছিল শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী, কিন্তু মায়ের চাল চলন আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, তাই ওদের মাঝে বেশ মিল ছিল না যেন।

মায়ের বাবা ছিলেন রায় বাহাদুর। রায় বাহাদুর তাঁর মেয়েকে সাহেবী কায়দায় মানুষ করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি, তাই যথেচ্ছাচারিতার বিষ কুহেলীর মাকে অমানুষই করে তুলেছিল। সেই রক্তে পুষ্ট কুহেলী। এই নিয়ে বাপির সাথে ওর মায়ের কত খুঁটিনাটি বিষয়ে ঝগড়া হত তা আজও মনে আছে কুহেলীর। এই কুহেলী নাম রাখার মাঝেই কত মন-কষাকষি। বাপি চেয়েছিল মেয়ের নাম থাকুক "কৃষ্ণা"। কৃষ্ণসখা দ্রৌপদীর রূপ কল্পনা করেই বোধহয় একথা চিন্তা করেছিল বাপি, কিন্তু সভ্য সমাজে, বিশেষ করে ইংরেজ সভ্যতার অনুকরণ যেথানে মজ্জায় মজ্জায় বসে গেছে, সে সমাজে ওই প্রাচীনকালের ভাবধারা আর ঠাকুর দেবতার নাম একেবারে অচল, তাই ও নাম বাদ হয়ে কুহেলী নামই পাকাপোক্ত রয়ে গেছে। আজকের জীবনযাত্রার মাঝে কুহেলী নামই যে সার্থক হয়ে আছে ওর, নইলে কৃষ্ণা নামের অবমাননা করাই হত। আপন মনে হাসি পায় কুহেলীর।

কুহেলীর জীবনে এল যৌবনের স্বপ্ন। নিজের মাঝে যে যৌবনের প্রসার এতখানি ছড়িয়ে পড়েছে সে অনুভূতি জাগিয়ে দিল ওর মা। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝে কুহেলী সেদিন জানতে পারল তার নিজের যৌবনকে। এতদিন সে ছেলেমানুষই ছিল—লজ্জায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছিল। অথচ আজকের সমাজে ও কথায় কারও মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। আগামী কালের প্রতিচ্ছবি যেন ওর জীবন পথে আগেই প্রতিফলিত হয়েছিল, সেইসব কথা চিন্তা করে হাসি পায় কুহেলীর। শুধুই হাসি। কেন হাসবে না। জীবনটাকে নিয়ে কি ছিনিমিনিই না খেলছে সে। এর মাঝে কুহেলীর করার কিছুই নাই, তবুও বিদ্রোহ করতে পারছে না।

সত্যাশ্রয়ী: পিতার যে রক্ত-স্রোত ওর শিরায় শিরায় বইছে তারই প্রবাহে এই আত্মদ্বন্দ্ব, নইলে এসব নিয়ে প্রশ্ন জাগার কথাই নয়। যে রক্তে ও পুষ্ট হয়েছে তাতে এমনি ধারা চিন্তা যেন বিলাস। উচ্ছৃঙ্খলতা। হ্যাঁ উচ্ছৃঙ্খলতা বৈকি? যার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, যার চলার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া আর কি আখ্যা দেবে? কি হতে চেয়েছিল কুহেলী—আর কিসের শেষ সীমানায় এসে হাজির হয়েছে সে! নিজের দিকে চাইতে অনেক সময় ওর চোখ দুটো জ্বালা করে। নিজের কথা চিন্তা করতে বেদনায় অন্তরটা ভরে ওঠে। মনে হয়

সব বন্ধন কেটে ফেলে সেই অতীতে ফিরে যায়। এই সমাজের চিন্তাই ওকে পাগল করে ছাড়বে।

বসন্তকে যেদিন প্রথম আবিষ্কার করল কুহেলী ওদের কলেজে, সেদিনের মধুস্মৃতি আজও ওর জীবনে মধুময় হয়ে আছে। কি উদ্বেল আনন্দের শিহরণ, কি পুলক-ভরা দৃষ্টি-বিনিময়! সব আজ মিলিয়ে গেছে মহাসমুদ্রে, মায়া মরীচিকাময় অতীতের মাঝে হারিয়ে গেছে সব। সেদিনের সেই সুখ স্মৃতির চিন্তাই আজকে এই সামঞ্জস্যহীন সমাজ ব্যবস্থায় পীড়া দেয়, নইলে প্রথম হতে এমনি ধারা খাপছাড়া—ভাব ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠলে কোন প্রশ্নই জাগত না ওর মনে। বর্ত্তমানের এই যে জটিলতা-ভরা সামাজিক জীবন যাত্রা—এটার সবটাই যে ফাঁকি, সেটা বুঝেই আরও দুঃখ পায় কুহেলী। যতদিন চালচলন আর বেশভূষায় নিজেকে জাহির করতে পারবে, ততদিনই নিজের মূল্য পাবে সমাজে, নইলে সব ভুয়ো। নিজের মায়ের কথা চিন্তা করে শিউরে ওঠে কুহেলী। কতখানি বয়েসে মা তার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করল নিজের সমাজ সংস্কার ছেড়ে। নিজের সাথে সাথে মেয়েরও সর্বনাশ ডেকে আনল, আজ যদি বাপি বেঁচে থাকত—তাহলে কেউ কি বসন্তের কাছ হতে কুহেলীকে সরিয়ে নিতে পারত? কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে কুহেলী বসন্তর সাথে! কি ভাবছে বসন্ত আজ কুহেলীকে। ভাবছে কি সব মেয়েরাই ছলনাময়ী। আত্মভোলা বসন্তকে আঘাত করে কি দুঃসহ মর্মবেদনা ভোগ করছে কুহেলী তাকি বসন্ত বুঝতে পারছে? তার মত বসন্তও কি চিন্তা করে কুহেলীর কথা? বসন্তকে কাছে পেয়ে তার কথা এমন ধারা কোনদিন চিন্তা করেনি কুহেলী। আজ নাগালের বাইরে বলেই কি ওর চিন্তায় পেয়ে বসেছে? এমনি ধারা মন নিয়ে যখন বোঝাপড়া করছিল তখন হঠাৎ দেখা পেল কুহেলী—মিঃ আইচের। মিলিটারীর বড় মেডিক্যাল অফিসার মিঃ আইচ। বিলাতী ছাপের সাথে সেখানকার কায়দা-করণও বেশ রপ্ত করে এসেছেন তিনি। আলাপের প্রথম দিনটার কথা বেশ মনে আছে কুহেলীর। মনে থাকার কথাই ত, কারণ অন্যের সাথে এর যেন কোথায় খানিকটা মিল আছে। প্রথমেই মিঃ আইচ পরিচিত হয়ে উঠলেন মায়ের সাথে।

—কি সুন্দর!

হঠাৎ একথায় চম্‌কে উঠে মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মিঃ আইচকে।

—কে, মিঃ আইচ?

—ওই প্রজাপতি! কি সুন্দর পাখনা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখুন।

হ্যাঁ মেয়ে আমার সত্যিই এ্যাঞ্জেল। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ছিলেন মা কুহেলার দিকে চেয়ে।

—আপনার মেয়ে? মিসেস্—। চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময়।

—হ্যাঁ আমার মেয়ে কুহেলী। কিন্তু কি জানেন, ওর রূপের মূল্য কেউ দিতে জানে না। সকলেই ভালবাস্‌তে চায়, কিন্তু ভালবাসা দিতে কেউ রাজী নয়।

—বলেন কি? কুহেলীর কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মাঝে গৌরব আছে বলেই আমার মনে হয়। প্রথম দিনের ওই কথাগুলোই কুহেলীর মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মায়ের এটা নূতন শিকার, সেটা পরের দিনই বুঝতে পেরেছিল কুহেলী। একগাদা রজনী গন্ধার ফুল হাতে—আর বেয়ারার হাতে একগাদা উপহার নিয়ে মিঃ আইচ পরের দিনই মায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই মিঃ আইচ কুহেলীর জীবন পথের উপসর্গ হয়ে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ উপসর্গ বৈকি? জীবনে চলার পথে যাদের কোন প্রয়োজনই নেই, অথচ অনিবার্য্য কারণবশতঃ যাদের এড়িয়ে চলাও যায় না, তাদের নিয়ে চলার মাঝে কত রকমের যে ঝকমারি তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। মিঃ আইচের নিত্য নূতন খেয়ালের ইন্ধন জোগাতে জোগাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল কুহেলী। শুধু কি দিয়েই নিবৃত্তি আছে, পাওয়ার আগ্রহকে বাড়িয়েই তুলেছিল দেওয়ার প্রাচুর্য্য। কিন্তু কোন স্পৃহা ছিল না এই দেওয়া নেওয়ার মাঝে। নিতান্ত প্রাণহীন ছন্দপতন। নেশা যখন কেটে আসত তখন যেন' খানিকটা বুঝতে পারতেন মিঃ আইচ। কুহেলী কাছে থেকেও বহু দূরের। মায়া মরীচিকার পিছনে ঘুরে বেড়ানর—মনে হত, কিন্তু সবই ক্ষণিক। হাঁপিয়ে উঠেছে কুহেলী দিনের পর দিন এমনি ধারা অভিনয় করে। ভালবাসার অভিনয়। এমন ধারা অভিনয় শুধু এখানেই সম্ভব—

এই কুহেলীদের সভ্য সমাজে। স্ত্রীপুত্র সব বর্তমান, তবুও ক্লাবে, ডান্স-পার্টিতে সুযোগ পেলেই জানাতে চায় কুহেলী-কেই ওরা চায়, কুহেলীকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সবাই—। এই সমাজে বাস করেও ঠিক নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না কুহেলী এদের মাঝে। কেন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব? অথচ এমনি ধারা দ্বন্দ্বের মাঝে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেল কুহেলীর জীবনে। প্রথম জীবনে এল বসন্ত; তার পর মিঃ আইচ, মিঃ টমাস—আরও অনেকে।

কেউ ধরে রাখতে পারল না কুহেলীকে, অথবা কাউকে ধরে রাখার মত মন খুঁজেই পেল না বোধহয় কুহেলী। নইলে হয়ত কাউকে নিয়ে পাকা-পোক্ত ঘর বাঁধতে পারত। এমনি অস্থির মন নিয়ে আর যাই করা যাক না কেন,ঘর বাঁধা যায় না তা বেশ বোঝে কুহেলী। তাই একটা চাকুরী সংগ্রহ করেছে। নিঃসঙ্গ জীবন যাত্রার মাঝে খানিকটা রকমফের আর কি? তাছাড়া বয়সের সাথে সাথে জীবনে চলার পথে সম্বলও ত চাই? অবসর সময় শুধু এই সব আবোল-তাবোল চিন্তা করে কুহেলী। নাইট-ক্লাবের নীল আলোর মাঝে মানুষের প্রাণে পুলক জাগালেও কুহেলীর অন্তরে কোন অনুভূতিই জাগে না নূতন করে। তীব্র আলোর যেন জ্বালাধরে ওর প্রাণে। মনে হয় সব আলোগুলো একসাথে নিভিয়ে দিয়ে জমাট অন্ধকার করে দেয় এই পৃথিবীর বুকটাকে, সেই অন্ধকারের মাঝেই আসল রূপটা বুঝি লুকিয়ে আছে। হয়ত ওই অন্ধকারের মাঝেই অনাবিল শান্তি লুকিয়ে আছে। আলোর চোখে ধাঁধা লেগেই হয়ত ওকে মোহগ্রস্ত করে ছিল, তাই ও ঝাঁপ দিয়েছিল এত তীব্র আলোর মাঝে। আবার বুঝি যুদ্ধ আসবে। সে যুদ্ধের ছোঁয়ায় পৃথিবীর রঙ পাল্‌টে ছিল। এই সব অনাচার অত্যাচার—যার স্পর্শে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সদর্পে বিচরণ করছিল। তাদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আবার যুদ্ধের হয়ত ঠিক প্রয়োজন। যে কেড়ে নিয়েছিল বিশ্বশান্তি সেই হয়ত ফিরিয়ে দিতে পারবে। সেই আশায় কুহেলী ওলোট-পালট ডেকে আনতে চায়। নইলে এই বেঁচে থাকার কি বৈশিষ্ট্য আছে ওর জীবনে তা খুঁজেই পায় না। তবুও বেঁচে আছে কুহেলী এটাই সত্য। এটাই জীবনের চরম দুর্ভাগ্য ওর।



আগামী

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

মোর অভিযানের দীপ্ত বাতিঘর,
পুণ্য হে অনাগত আগামী!
নির্ব্বিবেক শোষণের মৃত্যু পরোয়ানায়
তোমার আগ্নেয় স্বাক্ষর দেখিয়াছি আমি।

সমস্যা-জর্জ্জরিত জীবনের পরে
বিস্মৃতির যবনিকা টানি,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হৃদয়ের সব গ্লানি ভুলি,
তাইত চলেছি আমি
তোমাকে জানাতে স্বাগতম্।

কঠিন প্রত্যাশা সব করিতে সফল
স্বর্ণস্রবা বসুধার মাটি যদি হয়ে যায় লাল
মোর জীর্ণক্লিষ্ট ফল্গুবক্ষ
শোণিত ধারায়,
রক্ত-যজ্ঞ কভু মোর হবে নাক বৃথা।

আমার অজাত শিশু রক্তসিক্ত
সেই পথে হয়ে আগুয়া
তোমারে জানাবে সম্ভাষণ—
কল্যাণময় হে মুক্ত আগামী।

উপন্যাস ও পাঠক সমাজ ঃ মমের দৃষ্টিভঙ্গী

[প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের নাম নির্বাচনের ভার প'ড়েছিল সমারসেট মমের উপর ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এর 'রেড্‌বুক' সম্পাদকের অনুরোধে। মম পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম উল্লেখ ক'রে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেছিলেন। এ সব রচনার অনেকগুলিই 'এ্যাট্-ল্যান্টিক' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। টম্ জোনস্, প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস্, দি রেড্ এণ্ড দি ব্লাক্, ওল্ডম্যান্ গোরিয়ট, ডেভিড্ কপারফিল্ড, উদারিং হাইটস্, মাদাম বোভারি, মবি ডিক, ওয়ার এণ্ড পিস্ এবং ব্রাদার্স কারমাজোভ—এ দশটি উপন্যাসকেই মম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলেছেন। মার্সেল প্রাউস্টের রিমেমব্রান্স্ অফ্ থিংগস্ পাষ্ট প্রথমে নির্বাচিত হ'য়েছিল। কিন্তু নানা কারণে এ উপন্যাসখানিকে মম লিষ্ট থেকে বাতিল করতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাউস্টের এ উপন্যাসখানি বর্তমান শতকের একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। কিন্তু এ সুদীর্ঘ উপন্যাসখানিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সুধী সমাজে তুলে ধরবার মধ্যে বিপদ অনেক, তা' ছাড়া সম্ভবও নয়. কেবলমাত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাস নির্বাচনের ভার কতদূর যে হাস্যাস্পদ ও বাতুলতা মাত্র, এ কথা মম নিজেই স্বীকার করেছেন। শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসই কেন একশত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নামও করা যেতে পারে, আবার দু তিন শত উপন্যাসের নামও করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্য ফ্রান্সে খুব সমাদর লাভ করেছিল। ফরাসীরা ইংরেজী সাহিত্য সাগ্রহে পাঠ করতেন। কিন্তু তারপর আজ পর্য্যন্ত ফ্রান্সে ইংরেজী সাহিত্য সে ভাবে সমাদৃত হয়নি। ফরাসীরা তাঁদের নিজ গণ্ডীর বাইরের সাহিত্যে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন না। ফরাসী সাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ এক শত উপন্যাসের একটা তালিকা তৈরী হতে পারে। কিন্তু তার অনেক উপন্যাসই ইংরেজ ভাষাভাষীর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এক একটি উপন্যাস বিশেষ বিশেষ পাঠকের কাছে বিশেষ বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করে। যে উপন্যাস একের কাছে একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সমাদৃত হ'য়েছে হয়তো অপর ব্যক্তির কাছে তার মূল্য সমতুল্য নাও হ'তে পারে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির সংযোগের উপর উপন্যাসের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। মম বলেছেন, যিনি সংগীতপ্রিয় তিনি হয়তো হেনরী হ্যাণ্ডেল রিচার্ডসন্-এর Maurice Guest উপন্যাসখানি পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন। কিন্তু নিছক সত্যকারের বিচার করতে গেলে উক্ত উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

বিভিন্ন উপন্যাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ থাকার প্রথম ও প্রধান কারণ উপন্যাসের কর্ম বা রূপ ত্রুটিশূন্য নয়। মম মনে করেন, Novel is essentialiy an imperfect form. যে দশটি উপন্যাস মম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলোর মধ্যেও কোন না কোন দোষ ত্রুটির ছাপ পরিস্ফুট। মম তাই তাঁর আলোচনা পর্বে প্রত্যেকটি উপন্যাস সম্বন্ধেই গুণ ও ত্রুটির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর অভিমত কোন উপন্যাসের আলোচনা করতে হ'লে শুধু তার প্রশংসা ক'রে যাওয়াটা পাঠক সমাজকে ঠকানোরই সামিল—বিশেষ ক'রে যে সকল গ্রন্থ 'ক্লাসিকস্' ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে পাঠক নিজেই অনেক স্থলে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্মুখীন হ'ন। সহজেই তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, রচনার ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসংলগ্নতা। সমালোচকের কর্তব্য, রচনার ভালো ও মন্দ উভয় দিকই সঠিক ভাবে আলোচনা ক'রে পাঠক সমাজের সুমুখে ধরা। নতুবা পাঠক সমাজের কাছে—তিরস্কৃত হ'ন তাঁরা। কিন্তু এ কথাও সত্য যে 'a novel is to be read with enjoyment.'

প্রত্যেক পাঠকই নিজে নিজের সমালোচক হ'য়ে দাঁড়ায়। কোন্‌টা প'ড়ে আনন্দ পাওয়া যায় বা কোন্‌টা প'ড়ে তৃপ্তি বা আনন্দ আসে না—তা' তিনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারেন। উপন্যাস পড়তে বাঁধা নিষেধ নেই। উপন্যাসের কোনটা মেরিট্ যার ভিত্তিতে মূলতঃ উপন্যাসখানি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং কোথায় তার ত্রুটি বিচ্যুতি এ দু'টো দিকে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে সমালোচকেরা নিঃসন্দেহে পাঠক সমাজের সাহায্যে আসতে পারেন। এরূপ প্রয়াসই মনে হয় সুসমালোচকদের প্রধান ধর্ম। কিন্তু পাঠকসমাজকেও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হ'বে। উপন্যাস ত্রুটিশূন্য হ'বে—এ কথা ভাবলেও চলবে না। উপন্যাস পাঠকদের কাছে লেখকদেরও দাবী আছে। তিন চার শত পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস পড়বার যে টুকু জ্ঞান ও ধৈর্য্য থাকা দরকার তা' পাঠকের থাকা প্রয়োজন। লেখক যে সকল দৃশ্যের অবতারণা, ক'রে তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে পাঠক সমাজে তুলে ধরেন তাঁর হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনার প্রসার ক'রে, তা' পাঠককে উপলব্ধি করতে—হ'বে। তা' হ'লেই লেখকের সৃষ্ট চরিত্র ও দৃশ্যের অবতারণা—পাঠক সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গী ও কল্পনার মধ্যে রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌বে। তবেই লেখক পাঠকসমাজে যে রসসৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা' সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে। সমারসেট মম বলেছেন :…And finally the novelist

has the right to demand from his readers some sympathy, for without it they cannot enter into the loves and sorrows, tribulations, dangers, adventures of the persons of a novel. Unless the reader is able to give something of himself he cannot get from a novel the best it has to give.

ভালো উপন্যাসের মূলতঃ কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে মমের মতামত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, বিষয় বস্তু বিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয় যা' সর্বসাধারণ নরনারীর কাছে আকর্ষণীয় হবে। মন্টিসরি সিস্টেমের উপর ভিত্তি ক'রে উপন্যাস রচনা করলে হয়তো তা' শিক্ষাব্রতীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হ'বে, কিন্তু তা' হ'য়ে দাঁড়াবে নিছক পৃথক শ্রেণীর একটি উপন্যাস। সর্বসাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তা' হয়তো সমগ্র ভাবে সমাদৃত নাও হ'তে পারে। উপন্যাসের মধ্যে থাকবে সঙ্গতি ও গতি, থাকবে আরম্ভ, মধ্য ও অন্ত বা শেষ। কাহিনীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে যবনিকা টানা প্রয়োজন। কাহিনীর পরিণতি হ'বে স্বাভাবিক। প্রারম্ভের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সমাপ্তির রেখা টানতে হ'বে। সম্ভাব্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীর অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হ'বে। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর অবতারণা করলেই চলবে না। উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তাদের চরিত্র-চিত্রণ করতে হ'বে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কর্মপদ্ধতিও নিয়ন্ত্রিত হ'বে। পাঠকেরা যেন সৃষ্ট চরিত্রগুলির চালচলন কথাবার্তা থেকে উপলব্ধি করতে পারেন যে এই চরিত্রগুলি স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই পরিণতিই স্বাভাবিক ও বাস্তব। পাঠকেরা যেন বলতে অবসর না পান যে সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠাই প্রয়োজন। ফ্যাসানেবল্ মেয়ে ফ্যাসানেবল্ মেয়ের মতই কথা বলবে। পথের ভিখিরী পথের ভিখিরীর মতই কথা বলবে এবং আইনজীবী বা উকিল উকিলের মতই কথা বলবে। তাদের ভাষায় তাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। সৃষ্টচরিত্রের কথোপকথনে শিথিলতা বা অত্যধিক তীব্র মতবাদকে অস্বাভাবিক ভাবে রূপায়িত করতে গেলে চরিত্রচিত্রণ ত্রুটিপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়ায়। সৃষ্ট চরিত্রকে চালচলন ও বাচন ভঙ্গীর মাধ্যমে পরিস্ফুট ক'রে কাহিনীকে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই লেখকের কাজ। যে কোনো বর্ণনাই হোক না কেন, তা' হ'বে তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট। অবান্তর বর্ণনাচ্ছটায় ভারাক্রান্ত হ'লে যে কোনো চরিত্র বা পরিস্থিতি সৃষ্ট কার্যের মাধুর্য্যকে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করে। পাঠকের হৃদয়ে তা রেখাপাত করে না। কাহিনীর ভাষা সরল ও জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাতে অল্প-শিক্ষিত লোকও তা' অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে। লেখার ভঙ্গী ও কাহিনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে—সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে হ'বে। পরিশেষে উপন্যাস হওয়া উচিত মনোরম ও আনন্দ দায়ক। এই 'এন্টারটেইনিং ভ্যালু' উপন্যাসের একটি প্রথম ও প্রধান গুণ। জ্ঞানতঃ কেউ উপদেশ বা শিক্ষার অজুহাতে উপন্যাস পাঠ করেন না। শিক্ষা বা উপদেশমূলক বই ব্যতীত যে পাঠক শিক্ষা বা উপদেশ জন্য উপন্যাস পাঠ করেন মাত্র তিনি নির্বোধেরই সামিল।

উপন্যাস উক্ত সমস্ত গুণে সমৃদ্ধ থাকলেও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। ছোট গল্প ত্রুটিহীন হ'তে পারে, কারণ তা' উপন্যাসের মতো ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়। ছোট গল্পে যে কোনো ঘটনার একটি দিক বা সমষ্টি গত ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অল্প পরিসরে সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে রচিত হ'তে পারে ত্রুটিহীন ক'রে এবং এরূপ ত্রুটিহীন সুন্দর ছোট গল্পের নজির অনেক দেওয়া যেতে পারে। মমের ভাষায়ঃ A short story is a piece of fiction that can be read according to its length in anything between ten minutes and an hour and it deals with a single, well-defined subject, an incident or a closely related series of incidents, spiritual or material, which is complete. কিন্তু উপন্যাসের পরিধি অনেক, তা'তে অনেক ঘটনার সমাবেশ ও বহু চরিত্রের ভিড় জ'মে ওঠে। হয়তো উপন্যাসের একটি চরিত্র স্ফুরণে লেখককে অনেক বিষয়ের দীর্ঘ বিবরণ ও অবতারণা করতে হ'য়। বিভিন্ন ঘটনার আয়োজন ও সমাবেশ করতে তা'তে বিভিন্ন সময়ের আশ্রয় নিতে হয়। অনেক স্থলে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য নানা বিবরণের আশ্রয় নিয়ে দু'টি ঘটনার মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে হয়।

লেখকও তো মানুষ। তাঁরও ব্যক্তিগত খেয়াল বা রুচি আছে। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের অনেক ঔপন্যাসিক তাই তাঁদের খেয়াল ও রুচির আশ্রয়ে নিজের প্রিয় বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাসের মধ্যে সেই সব ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। একথা তাঁরা ভুলে যান যে, তাঁদের ব্যক্তিগত খেয়াল ও রুচি যা তাঁদের নিজেদের আনন্দদায়ক ব'লে মনে হয়, তা অপ্রয়োজনে বা অযথা তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে সংযোজিত হ'লে তা উপন্যাসের রস সৃষ্টির বিঘ্ন ঘটায়। একথা সত্য যে ঔপন্যাসিককে তাঁর সমসাময়িক যুগের গতির সঙ্গে পরিচিতির বন্ধন অটুট রেখে চলতে হ'বে। চলমান দিনের আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। মম বলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে দৃশ্যাবলীর বর্ণনার বিশেষ প্রচলন ছিল না। দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে দু' একটি কথার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের বক্তব্য শেষ ক'রে দিতেন। যখন রোমান্টিক স্কুল জনসাধারণের রুচির গতি উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন তাঁরা উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে দৃশ্যাবলীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। ভোরের বর্ণনা, সূর্য্যাস্তের বিবরণ। নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ, মেঘমুক্ত দিন। চন্দ্রোদয় ও অস্ত। অশান্ত সমুদ্র, তুষারাচ্ছন্ন পাহাড়, গভীর অরণ্য—প্রভৃতির বর্ণনা উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে সংযোজনা করার প্রয়াস পেতেন। দৃশ্যাবলীর এরূপ অনেক বর্ণনা চমৎকার ভাবে পরি-

স্ফুট হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর গতির সঙ্গে এ সংযোজনা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। এরূপ দৃশ্যাবলীর বর্ণনা যতই কবিত্বপূর্ণ হোক বা প্রশংসনীয় ভাবে প্রকাশ করা হোক না কেন, অপ্রয়োজনে এর প্রচলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'য়েছে। লেখকেরা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন অনেক পরে। সৃষ্ট চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করতে হয়তো অনেক সময় নানা রূপ বর্ণনার প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে অপ্রয়োজনে নানা বর্ণনার অজুহাতে উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। মম এ সম্বন্ধে বলেছেন : This is an adventitious imperfection in the novel, but there is yet another that seems inherent. উপন্যাসের সুদীর্ঘ রচনা সময় সাপেক্ষ। একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস রচনায় সপ্তাহ, মাস বা বছর ঘুরে যায়। যে অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল হয়তো সে অনুপ্রেরণা লেখকের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত জিইয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। রসোত্তীর্ণ না হলে কাব্য সৃষ্টি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উপন্যাস সেদিক থেকে অনেকটা মুক্ত। একটি উপন্যাস রচনায় হয়তো অনেক দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'তে পারে। কিন্তু তা একেবারে অপাংক্তেয় হ'য়ে দাঁড়ায় না। যদিও ঔপন্যাসিকেরা অনুপ্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে রচনার গতিকে অক্ষত রাখতে পারেন না, তবুও অবচেতন মনের প্রবৃত্তির অনুশাসনে তাঁরা লেখনী পরিচালনা করেন। সম্ভবতঃ একথা বলা চলে যে লেখককে তখন কেবলমাত্র তাঁর কলমটিকে কাগজে পরিচালনা করার দায়িত্বটুকু বজায় রাখতে হয়। তিনি হয়তো উপলব্ধি করেন যে, যে সব কথা তিনি লিখে যাচ্ছেন তা' যেন তাঁর আগেও জানা ছিল না। চিন্তার প্রবাহ তাঁর হৃদয়ে সহসা একে একে যেন কথার মালা গেঁথে যায়—অপ্রত্যাশিত ভাবে। ঠিক যেন অপ্রত্যাশিত অতিথির আগমনের মতো। এর পেছনে কোনো রহস্য নেই। অপ্রত্যাশিত চিন্তাধারার আবির্ভাব বহু পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট আইডিয়া থেকেই জন্ম নেয়। তাই লেখকের যে সব কথা অনর্গল তাঁর লেখনী থেকে রূপ পরিগ্রহ ক'রে যাচ্ছে এবং যা পূর্বে অজ্ঞাত ব'লে মনে হ'য়েছিল তা' তাঁর স্মৃতির বেদীতেই পুঞ্জীভূত হয়েছিল বহুদিন আগে। অবচেতন মন থেকেই সে সব চিন্তাধারায় আবির্ভাব হ'লো আর লেখনীর মাধ্যমে কাগজে আত্মপ্রকাশ করলো। যাঁরা নিয়মিত লেখার অভ্যাস করেন, তাঁরা এর সুফল সহজেই উপলব্ধি ক'রে থাকেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এ চিন্তাস্রোতও অবাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। লেখককে তখন একটা অসহায় অবস্থার এসে পড়তে হয়। কেবলমাত্র বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতা দ্বারা তখন লেখককে তাঁর উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হ'তে হয়। এ অবস্থায় লেখকের রচনা তখনই প্রশংসার যোগ্য হ'য়ে ওঠে যখন তিনি তাঁর শ্রম ও দক্ষতার দ্বারা পাঠককে মুগ্ধ করতে পারেন।

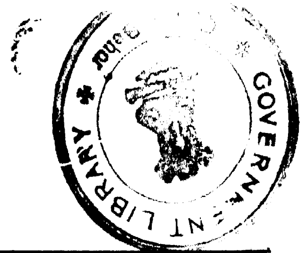
ঔপন্যাসিককে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে—তাঁর রচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অনেক স্খলন পতন ত্রুটি বিচ্যুতিকে এড়িয়ে যেতে সাবধানী হ'তে হয়। এমন কি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস যা' রচিত হ'য়েছে তাও ত্রুটিশূন্য নয়। এ কারণেই কোনো দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নামের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়।

মম বলেছেন, যে কয়টি উপন্যাসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে তিনি আখ্যা দিয়েছেন এ ছাড়াও তিনি আরও ভালো উপন্যাসের নাম করতে পারেন। সেগুলো যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম তার কারণও তিনি দেখাতে পারেন।

পূর্বে পাঠক সমাজ দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আনন্দ লাভ করতেন। উপন্যাসের আয়তন খুব দীর্ঘ হবে এ মনোভাবই তাঁরা পোষণ করতেন। ঔপন্যাসিকেরা তাই তাঁদের উপন্যাসের আখ্যানভাগের প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরেও অনেক বাহুল্য বর্ণনায় উপন্যাস দীর্ঘ করে মুদ্রণের কাজ বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস প্রকাশের নতুন ভঙ্গী ঔপন্যাসিকদের প্রলোভনের বশবর্তী ক'রে তুললো। যে সকল মাসিক পত্রিকা হাল্কা ধরণের সাহিত্য প্রকাশনে ও পরিবেশনে তাদের কলেবর সমৃদ্ধ ক'রে তুলতো. একদিন তাদের মারফতেই লেখকেরা তাঁদের রচনা ক্রমশঃ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পেলেন কিস্তিবন্দীতে। এতে লেখকদের কাছে যেমন একটা নতুন সুযোগ এলো, প্রকাশকদেরও তেমনি লাভবান হ'বার সুযোগ ঘটলো। প্রকাশকেরা উপলব্ধি করলেন সুঔপন্যাসিকদের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে কিস্তিতে প্রকাশিত হ'লে তাঁদের মাসিক পত্রিকার কলেবরও যেমন বৃদ্ধি পাবে সহজেই, লাভের সুযোগও প্রকট হ'য়ে উঠবে। এ রীতি লেখকদের যথেষ্ট উৎসাহিত ক'রে তুললো—যেহেতু তারা একটু আয়াসে অনেকদিন ধ'রে ক্রমশঃ লিখে যেতে পারবেন ধারাবাহিক ভাবে। ফ্রান্সে লেখকদের উপন্যাস বা গল্পের প্রতিটি পংক্তির জন্য মূল্য দেওয়া হ'তো। তাই ফরাসী লেখকেরা রচনায় যত বেশি লাইন লিখতে পারতেন ততই তাঁরা লাভবান হতেন। একবার ব্যাল্‌জাক্‌ ইতালীতে গিয়ে একটি ছবি দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। তিনি তখন তাঁর যে উপন্যাসটি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি তাঁর সে রচনার গতি ব্যাহত ক'রে, সেই ছবিটি সম্বন্ধে একটি আলোচনা লিখলেন—আর তাঁর উপন্যাসে তা' অন্তর্ভুক্ত করলেন। ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকেরা এরূপ কিস্তিবন্দী ক'রে রচনা প্রকাশ ও নির্দিষ্ট দিনের ভেতর লেখা জমা দেওয়াটাকে ঘৃণ্য বোঝার সামিল বলেই মনে করতেন। তবুও তাঁরা এভাবে উপন্যাস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অনেক অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশ ক'রে উপন্যাসের কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি করেছেন। পাঠক সমাজ উপন্যাসের এরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ও আঙ্গিক অসংলগ্ন বিবৃতিতে কেন অধৈর্য্য হয়ে উঠবে না? জ্ঞানী পাঠক উপন্যাস স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের সমতুল্য দায়িত্ব নিয়ে পড়েন না। তিনি পড়েন আনন্দ আস্বাদনের অভিপ্রায়ে। নিজের ব্যক্তিগত জগৎ থেকে কিছুক্ষণ নিজেকে ভুলে থাকতে। তিনি উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি আগ্রহান্বিত হ'য়ে দৃষ্টি রাখেন, কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট চরিত্রগুলি কী ভাবে কাজ ক'রে চলেছে এবং তাদের পরিণাম কী। তাদের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনায়

পাঠকের মনেও আনন্দ বা সহানুভূতি জাগে। এমন কি সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে বিচার করতেও তৎপর হ'য়ে ওঠেন। তাদের সঙ্গে তিনি যেন একইভাবে জীবনযাত্রা ক'রে চলেছেন। মম বলেছেন: Their view of life, their attitude to the great subjects of human speculation, whether stated in words or shown in action, call forth in him a reaction of surprise, of pleasure or of indignation. But he knows instinctively where his interest lies, and he follows it as surely as a hound follows the scent of a fox. But sometimes through the author's failure he loses the scent. Then he flounders about till he finds it again. He skips.

উপন্যাস পড়তে গিয়ে অনেকেই অনেক সময় অনেক অংশ বাদ দিয়ে এগিয়ে চলেন। কিন্তু এভাবে বাদ দিয়ে পড়ায় মূল মর্ম ও ভালো জায়গাগুলিকে এড়িয়ে না যাওয়াটাই শক্ত কাজ। অনেক পাঠক সহজেই উপন্যাসের ভালো জায়গাগুলি বেছে নিতে সমর্থ হ'ন। এ ভাবে পড়ার অভ্যাস পাঠককে অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্চয় করতে হয়। এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে অধিকাংশ উপন্যাসই প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুখপাঠ্য হয় না। উপন্যাসের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে পড়ার অভ্যাসটা হয়তো পাঠকের পক্ষে বদ-অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসের আশ্রয় পাঠককে গ্রহণ করতে হয় উপন্যাস ত্রুটিশূন্য ও সুখপাঠ্য না হওয়ায়। আধুনিক পাঠকের তুলনায় পূর্বের পাঠকেরা ছিলেন খুব ধৈর্য্যশীল। তখন নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে সেকালের পাঠকেরা অবাঞ্ছিত দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে ধৈর্য্য হারাতেন না। মম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উক্ত উপন্যাসগুলির প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্য্যপূর্ণ অংশগুলিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন, অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য অংশগুলিকে বাদ দিয়ে। অনেক সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও সমালোচকের কাছে মূল উপন্যাস থেকে বাহুল্য অংশ বাদ দিয়ে রচনাকে আরও সংক্ষিপ্ত ক'রে তোলা দোষণীয় ব'লে মনে হয়। যে কোনো প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে এভাবে কাটছাঁট ক'রে সংক্ষিপ্ত করাটাকে তাঁরা ভয় পান। তাঁদের অভিমত 'মাষ্টার পিস্'কে নষ্ট করা অনুচিত। ঔপন্যাসিক যেমনটি লিখেছেন ঠিক তেমনটি করেই পাঠকের সব পড়া উচিত। কিন্তু তাঁরা কি সত্যি এ পথ অবলম্বন করেন? মম মনে করেন, তাঁরাও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়েই উপন্যাস পাঠ করেন। কারণ, এই বাদ দিয়ে পড়ার মধ্যে কি ভাবে মূল প্রয়োজনীয় অংশটুকুকে বাদ না দিয়ে পড়া যায় তা' তাঁরা ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে উপন্যাস পড়বার ধারা সব পাঠকের কাছে সহজসাধ্য নয়। কারণ, অনভিজ্ঞ পাঠক প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বাছাই ক'রে পড়তে পারেন না। অতএব এদলীয় পাঠকদের সাহায্য করবার জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যাঁরা ভালোমন্দ অংশ বিচার ক'রে উপন্যাসটিকে রুচিসম্পন্ন ও সংক্ষিপ্ত ক'রে উক্ত পাঠক সমাজের সুমুখে ধরতে পারেন। মূল উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত করার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই। মম মনে করেন, কোনো নাটক এ পর্য্যন্ত হয়তো মঞ্চস্থ হয়নি যা' মূল নাটক থেকে সুবিধে অনুযায়ী কিছু কিছু অংশ মহড়ার সময় বাদ না দিয়েছে। সে কথা উপন্যাসের বেলায়ই বা প্রযোজ্য হ'বে না কেন, যদি তা' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়।



বাঙলা ভাষার কতিপয় গোলমেলে শব্দ

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যসাংখ্যতীর্থ

সত্য বটে আমাদের বাঙলা ভাষায় সুন্দর-সুন্দর চিত্তাকর্ষক ও গভীর ভাব-প্রকাশক বহু শব্দ আছে, যাদের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা যায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে এলোমেলো ও গোলমেলে এমন কতকগুলো শব্দও ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে যাদের বানান ও অর্থ নিয়ে মহাবিভ্রাট ঘটে যাচ্ছে। একই শব্দের দু'রকম বানান হতে পারে না—একটা হয় ঠিক, আর, একটা হয় ভুল। তবে অভিধানের অনুশাসন থাকলে একই শব্দের দু' তিন রকম বানান হতে পারে, যেমন প্রতিকার বা প্রতীকার, শিপ্রা বা সিপ্রা, ইত্যাদি। তেমনি একই শব্দের পরস্পর বিপরীত দুই-প্রকার মানে হতে পারে না। এরূপ কতিপয় শব্দের, মানে, বানান ও ভাব নিয়ে গোলমালের দিকটা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

১। ঐতিহ্য—বর্তমানকালের লেখকগণ, বিশেষতঃ সাংবাদিকগণ সংস্কৃত অভিধান হতে এমন এক-একটা সংস্কৃত শব্দ বাঙলা ভাষায় আমদানী করছেন যারা দেখতে দেখতে বাঙলা সাহিত্যের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। আর, আমদানীকারকগণ যে অর্থে নিজ নিজ রচনায় সেই সব শব্দ ব্যবহার করছেন, অনুকরণ-কারীরাও ঠিক সেই অর্থে সেই সব শব্দগুলাই নিজ নিজ কাজে লাগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কি আমদানীকারক

আর কি অনুকরণকারী, শব্দগুলার মৌলিক অর্থ কি তলিয়ে বুঝছেন না। ঐতিহ্য এইরূপ একটা শব্দ।

এই ঐতিহ্য কথাটা যেখানেই ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানেই তার মানে করা হচ্ছে 'প্রাচীন ভাবধারা।' কিন্তু ইহার আভিধানিক মানে ঠিক "প্রাচীন ভাবধারা" নয়। কথাটার মৌলিক অর্থ হচ্ছে "প্রাচীনকাল হতে আচার্য পরম্পরায় আগত কতিপয় মহান উপদেশ বা মহৎ অনুশাসন।" উপনিষদের ঋষি কোন যুগ আগে তাঁর শিষ্যদের বলে গেছেন, "পিতাকে দেবতার মত মনে করবে, মাতাকে দেবতার মত মনে করবে, আচার্যকে দেবতার মত মনে করবে, অতিথিকে দেবতার মত মনে করবে।" এই মহতী শিক্ষা গুরু পরম্পরায় চলে আসছে, আর আজও বর্তমানের স্কুল কলেজের শিক্ষক ছাত্রদের ঐ একই উপদেশ দিয়ে থাকেন। ইহাই হল ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য। কারণ, ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশ, আর হিন্দু ছাড়া অন্য কোন জাতি বাপ-মা, শিক্ষক-অতিথিকে দেবতার মত পূজা করতে বলবে না।

প্রতীক—ঐতিহ্যের মত প্রতীক শব্দটিও অর্থান্তর গ্রহণ করে বাঙলা ভাষায় নূতন আমদানী হয়েছে। প্রতীকের মৌলিক বা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'অঙ্গ' বা 'একদেশ।' কিন্তু বর্তমান লেখকগণ কথাটার মানে করছেন 'চিহ্ন' বা 'লক্ষণ'। কথাটা শুনতে মিষ্ট বটে কিন্তু যার যা মানে তাকেত সেই অর্থে ব্যবহার করতে হবে? উপনিষদে "প্রতীকের উপাসনা' বলে একটা কথা আছে। তার মানে হল পর ব্রহ্মের একদেশের উপাসনা। পরব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময়। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু নিয়ে পরব্রহ্ম। এরূপ বিরাট পুরুষকে কল্পনায় আনা যায় না, তাই এই কার্য ব্রহ্মের একদেশকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করে উপাসনা করবার অনুশাসন আছে। একেই বলে প্রতীকের উপাসনা—যেমন সূর্যব্রহ্ম, অগ্নিব্রহ্ম, প্রাণব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী—এরাও ব্রহ্ম, ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ গায়ের জোরে চিহ্ন বা লক্ষণ অর্থে প্রতীক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা করে 'ইতরে জনাঃ' তাই অনুকরণ করে। এই যুক্তি অনুযায়ী লক্ষণ অর্থেই না হয় ব্যবহার করা চলুক। কিন্তু ভুলটা জেনে রাখা দরকার।

স্মিতহাস্য—এই যৌগিক শব্দটা আজকাল যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে সংবাদপত্রের স্টাফ্-রিপোর্টারদের রচনায়। কিন্তু সোনার পাথরবাটী বললে যা মানে হয়, এই কথাটারও তাই মানে হয়। 'স্মিত' মানে শব্দহীন মৃদু হাসি, যাকে মুচকে হাসা বলে, আর হাস্য মানে সশব্দে হা হা করে হাসি। স্মিতের ইংরাজী হচ্ছে gentle smile, আর হাস্যের ইংরাজী হচ্ছে loud laugh। সুতরাং দুটা বিপরীতার্থক শব্দকে এক সঙ্গে জোড়া লাগালে কেমন হয়? মুখের অনেক প্রতিশব্দ আছে—আনন, বদন, ইত্যাদি। একটি প্রতিশব্দ অনেকেই জানে না, যা হচ্ছে 'আস্য'। সেইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি গালভরা শব্দ হচ্ছে, 'স্মিতাস্য'। প্রাচীনকালের বাঙলা সাহিত্যিকদের মধ্যে হয়ত কেহ এই কথাটা সন্ধি-বিচ্ছেদ করে লিখে গেছেন—"বালিকাটি স্মিত আস্যে বলিতে লাগিল।" কোন অনভিজ্ঞের হাতে এটি যখন পড়ল তখন সে তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী 'স্মিত আস্যে' 'স্মিত হাস্যে' রূপায়িত করে বসল। তার পর 'অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ' এই ন্যায় অনুযায়ী 'স্মিত হাস্য' এখন কলেজের ছাত্রদেরও রচনায় দেখা যাবে।

বাংলা না বাঙলা—এখানেও এক বিভ্রাট বৈকি! আগে আমাদের দেশকে 'বঙ্গ', 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্গালা' বলে অভিহিত করা হত। 'বাঙ্গলা' কথাটাই বেশী প্রচলিত ছিল। বাঙলা-ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে 'ঙ্গ'এর 'গ' টি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হত না, সুতরাং অনেক লেখক উচ্চারণের সহিত বানানের সামঞ্জস্য রাখবার জন্য অতঃপর 'বাঙ্গলাকে' 'বাঙলা' বলে লিখতে আরম্ভ করে দিলে। একটা যুক্তবর্ণের মধ্যে অল্পোচ্চারিত বর্ণটা বাদ দেবার রীতি আরো অনেক স্থলে দেখা যায়। চলে আসছিল বাঙ্‌লা। কিন্তু হঠাৎ এক বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক, কবি ও সুরস্রষ্টা উচ্চারণের কোমলতা বাড়াবার জন্য 'বাঙলাকে' 'বাংলা' লিখে বসলেন। অমনি ছাত্র শিক্ষক লিখতে আরম্ভ করে দিলে বাংলা। অমনি পশ্চিমবঙ্গের সরকার লিখতে আরম্ভ করে দিলে, 'বাংলা'। কিন্তু মজা এই যাঁরা 'বাংলা' লেখেন তাঁরাই আবার লেখেন 'বাঙালী'। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হত, যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের 'বাংলা' বানানকে আর্যপ্রয়োগ বা শিষ্টপ্রয়োগ বলে মাথা পেতে নিয়ে, অপর সকল লেখক যথাপূর্বম্ বাঙ্‌লাই লিখতে অভ্যস্ত হত। এই লেখক লেখে, 'বাঙ্‌লা'।

রাম কর্তৃক না রামকর্তৃক—অর্থাৎ দুটো কথা পৃথগ্‌ভাবে বসবে না গায়ে গায়ে বসবে? বর্তমানের লেখকগণ দু'টো কথাকে পৃথক্ ভাবে বসিয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন 'কর্তৃক' একটা বাঙ্‌লা প্রত্যয়, যেমন 'হইতে' আর একটা বিভক্তি প্রত্যয়। কিন্তু 'কর্তৃক' একটা বাঙলা বিভক্তি প্রত্যয়ও নয় আবার একটা সংস্কৃত মৌলিক শব্দও নয়। এটা যে কি তা অনেকেই জানে না। উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অনেকেই জানে 'নদীমাতৃক' বলে একটা বাঙলা তৎসম শব্দ আছে। এর মানে হচ্ছে, 'নদী হয়েছে মাতা যার'। কথাটা আসলে 'নদীমাতৃ', কিন্তু উচ্চারণের সৌকার্যের জন্য ব্যাকরণের বিধান-অনুযায়ী শেষে ক'-যোগ হয়েছে। ঠিক সেইভাবে, 'রাম হয়েছে কর্তা যার' অর্থাৎ যে কাজের, এই ভাব বোঝাবার জন্য, যৌগিক শব্দটি গঠিত হয়েছে—'রাম কর্তৃক'। সুতরাং যেমন 'নদী' ও 'মাতৃক' পৃথকভাবে বসান যায় না, তেমনি 'রাম' ও 'কর্তৃক' পৃথকভাবে বসান ব্যাকরণের বিধিবহির্ভূত। আগেকার লেখকগণ উভয় কথাকে গায়ে গায়েই বসাতেন, কিন্তু বর্তমানের লেখকগণ 'কর্তৃকের' সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে না পেরে এক আঙুল দূরে দূরে বসিয়ে থাকেন। ঠিক এইভাবে কুঠারের দ্বারা না হয়ে কুঠারদ্বারা এইরূপ হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার এক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। কি 'কর্তৃক' আর কি 'দ্বারা' বাঙলা বিভক্তি মোটেই নয়। ছাত্রদের বোঝাবার জন্য অধ্যাপকদের আবিষ্কার। ব্যাপার হল এই। কর্তায় ও করণে সংস্কৃতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, রামেণ কুঠারেন রাক্ষসো হতঃ। এখানে 'রামেণ'

হচ্ছে 'রামকর্তৃক:' আর 'কুঠারেণ' হচ্ছে কুঠার দ্বারা। কিন্তু বর্তমানে যে এই দুটি কথা মূল শব্দ হতে ছটকে গিয়ে অনেক দূরে বসে, তাহলে উপায়? বসাতেই হবে। তবে গায়ে গায়ে লিখলেই সবদিকে শোভা পায়।

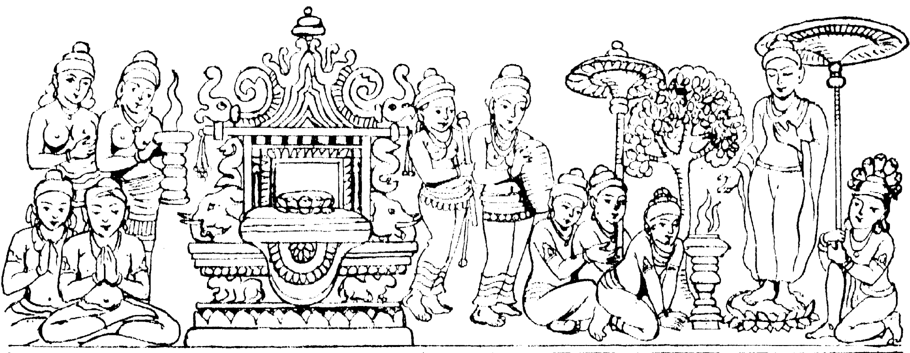
সার্বজনীন না সর্বজনীন? দুর্গাপুজার বাতাস বইতে না বইতে রাস্তায় চলতে চলতে উপরদিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে মা-দুর্গার আগমনের নোটিশ কোথাও আছে, "সার্বজনীন দুর্গাপুজা", আবার কোথাও আছে, "সর্বজনীন দুর্গাপুজা।" কিন্তু কোনটা ঠিক? অধিকাংশ পুজা ছাত্রদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ছাত্ররা কি তাদের পাঠ্যপুস্তক দেখে না? ব্যাকরণ কৌমুদী? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনটা ঠিক, আর কোনটা ভুল। 'সর্বজন' বা 'বিশ্বজন' এই দুটি যৌগিক শব্দের উত্তর 'হিতার্থে' ঈন প্রত্যয় হয়। সকল লোকের হিত—বিশ্বজনীন। ঈন প্রত্যয় পরে সর্ব ও বিশ্বের গোড়াকার অকার ও ইকারের বৃদ্ধি হয় না। সেইজন্য সার্বজনীন বা বৈশ্বজনীন হতে পারে না। স্কুল কলেজের ছাত্ররা এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা একান্ত অনুকরণপ্রিয়। তারা যখন সার্বভৌম বা সার্বজনিক কথা ভাষায় দেখতে পায় তখন মনে করে কেন সার্বজনীন হবে না। তেমনি তারা যখন দেখে 'প্রাতঃকাল' তখন মনে করে 'প্রাতরাশ' ভুল এবং 'প্রাতঃরাশ' ঠিক। কিন্তু সংস্কৃত প্রতিশব্দই যে ব্যাকরণের নিকষ-পাষাণে যাচাই করে শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার করতে হয়, তা তারা বুঝতে পারে না। এইখানেই মুস্কিল। ঠিক উপরিউক্ত যুক্তির দ্বারা আভ্যন্তরীণ না হয়ে 'অভ্যন্তরীণ' হবে। শ্রীআনন্দবাজার লেখেন 'অভ্যন্তরীণ', আর শ্রীযুগান্তর লেখেন 'আভ্যন্তরীণ'। তাঁদের পরস্পর আলোচনার দ্বারা ঠিক করা উচিত, কাঁর ভুল আর কাঁর ঠিক।

সর্বশ্রী—কথাটা একেবারে আনকোরা নূতন এবং নিশ্চয় কোন সাংবাদিকের আবিষ্কার। কতিপয় শ্রীমানকে পাশাপাশি লেখেন এক, স্কুলের কেরানী আর এক স্টাফ-রিপোর্টার। কেরানী কখনো ভাষা নিয়ে মাথা ঘামান না, সুতরাং বুঝতে হবে, এ সৃষ্টি সাংবাদিকের। গোড়ায় বলেছি, বর্তমানের লেখনী চালকগণ এক-একটা শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ সৃষ্টি করছেন বা আবিষ্কার করছেন বটে কিন্তু কথাটার যে কি অর্থ হতে পারে সে বিষয়ে ভাল করে ভেবে দেখছেন না। 'সর্বশ্রী' এরূপ একটি শব্দ

আমরা প্রতিনামের আগে 'শ্রী' বসিয়ে থাকি। আগে বসে বলে অনেকে মনে করেন 'শ্রী' একটি বিশেষণ, কিন্তু বিশেষণ মোটেই নয়। 'শ্রী' হল বিশেষ্য, মানে শোভা। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র মানে শ্রীযুক্তরামচন্দ্র। মধ্যপদলোপী সমাস। সেইজন্য নামের গোড়াকার শ্রীকে বিশ্রী করা যায় না। কিন্তু 'সর্বশ্রী' বিশেষ্যও হতে পারে এবং বিশেষণও হতে পারে। বিশেষ্য যখন হবে তখন মানে হবে, 'সকলপ্রকার শ্রী'। যেমন, 'মেয়েটির সর্বশ্রী আমাকে মুগ্ধ করিল।' আর সকল বিশেষণের বেলায় মানে হবে, 'সকলপ্রকার শ্রী যাহাতে আছে'। যেমন 'সর্বশ্রী রামচন্দ্র', অর্থাৎ রামচন্দ্রের হাব, ভাব, হাসি, রূপ, গঠন সবই শ্রীমণ্ডিত। এখন যদি লেখা যায়—সর্বশ্রী রাম, শ্যাম, রহিম, করিম, মু, চৌ. ‡ তখন সর্বশ্রী কেবল রামকে বিশেষিত করবে, চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ অবধি পঁহুছিবে না। এক লেখা যায়, সর্বশ্রীরামশ্যামরহিমকরিমমুচৌ—অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে। তখন ব্যাকরণের বেড়াজাল হতে বেরিয়ে আসবে বটে কিন্তু এই নবশব্দের আবিষ্কর্তা যা বোঝাতে চাইছেন তা বোঝাবে না। বীর রামলক্ষ্মণ বললে অবশ্যই বোঝাবে বীর রাম ও বীর লক্ষ্মণ। তেমনি সর্বশ্রীরামশ্যামরহিমকরিমমুচৌ লিখলে মিস্টার চৌ এন লাইও সর্বশ্রী মণ্ডিত হয়ে পড়বেন।

তাই বলছিলাম, সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা এই নবজাত শিশুকে নিয়ে খুব মাতামাতি করতে পারেন এবং শব্দের জনকও, জাতকের হুবহু প্রচার দেখে মনে মনে খুশী হতে পারেন। কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকরা এই নিয়ে বড়ই ফ্যাসাদে পড়বেন—অর্থাৎ যাদের বাঙলা ভাষাকে শেখাতে হয়, ছাত্রদের খাতার ভুল শোধরাতে হয়, এবং ব্যাকরণের দোহাই দিতে হয়।

আমাদের ঐশ্বর্যময়ী বাঙলা ভাষায় এই ধরনের গোলমেলে শব্দ অসংখ্য। গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র।



কয়েকটি গান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

দিন ফুরালে শিশু যেমন যায় ফিরে তার মায়ের কোলে,
তেম্‌নি করে খেলা ফেলে তোর কাছে মা যাব চলে'।
হাত দুখানায় ধূলি মাথা অঙ্গে খেলার চিহ্ন-আঁকা,
ময়লা ধূলি দিবি মুছে স্নেহাঞ্চলে ড'লে ড'লে॥
শাসন-বাণী শোনার আগেই ঠোঁট ফুলিয়ে ফেল্‌ব কেঁদে,
কঠোর শাসন ভাষণ ভুলে বাহুর ডোরে ফেল্‌বি বেঁধে।
খেল্‌না বাঁশী থাকবে পড়ে নামবে স্বপন নয়ন ভ'রে
খেলার কথা, সকল ব্যথা, ভুল্‌ব মা তোর কোলের দোলে॥

(২)

দিনের বেলায় পথের ধূলায় খেলায় খেলায় রইনু মাতি,
তোমায় মাগো ভুলিয়ে দিল খেল্‌না, পুতুল, সঙ্গী-সাথী।
তাই বলে কি কখনো মায় ভুলে থাকে আপন বাছায়,
হাজার কাজের মাঝেও আছ এদিক পানে কানটি পাতি।
মাকে ভুলে গাছের তলে ছেলে আপন খেলায় মাতে,
সকল খেলায় মনটি মায়ের রয় যে ছেলের সাথে সাথে।
দিন ফুরালে ফিরলে ঘরে দেখব দ্বারের সোপান'পরে
পথপানে মা চেয়ে আছ হাতে লয়ে সাঁঝের বাতি॥

(৩)

জাগো আমার মানস-সরের মরালীবোধন গাহিয়া।
শতেক আঁখির পাপড়ি মেলে মৃণালী রয় যে চাহিয়া।
কোন অতলের চিন্তামণির সন্ধানে
কোন পাতালে রইলে তুমি কোনখানে,
নাগভূষণের নিখিল বিভব চঞ্চুতে আনবে বাহিয়া?
কণ্ঠ ভ'রে কল্পলোকের অমিয়া, দুগ্ধ ধবলে,
নাগবালাদের মাথার মণি হরিয়া আনছ সবলে?
তরঙ্গিয়া হ্রদের হৃদয় সুন্দরি,
রজত পাখা ঝট্‌পটিয়ে সন্তরি
বাইরে এসো রসকূপের অন্তরে সুধায় নাহিয়া॥

(৪)

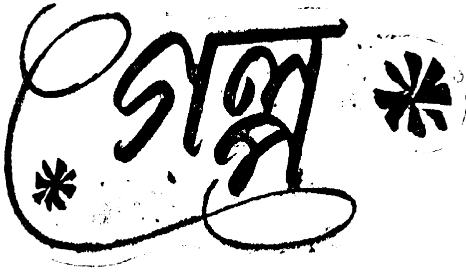
বীণাখানি বাজবে না আর গানের পালা সায়।
রেখে দিলাম আমার বাণা বীণাপাণির পায়।
যতেক গীতি এ জীবনে গেয়ে গেছি আপন মনে
কেউ শোনেনি কেউ শুনছে—কীইবা আসে যায়॥
প্রতিটি গান পাপড়ি হয়ে গেল চরণ পদ্মে রয়ে
কালের হাওয়া কেমন করে শুকিয়ে দেবে তায়?
সহস্রদল পদ্ম মরি, মায়ের পায়ে উঠ্‌ল গড়ি
আর বীণাতে কি কাজ আমার সেও তো ছুটি চায়॥

(৫)

বাঁশী আমার বোবা হয়ে রইল পড়ে ভুঁয়ে।
বাজ্‌ল না আর মধুর সুরে মুখ-বায়ুর ফুঁয়ে।
একদা যা মন ভুলালো বহুজনের লাগ্‌ল ভালো,
বৃথাই তারে আদর করি শুষ্ক অধর ছুঁয়ে।
দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজানু এবার,
নতুন সুরে উঠ্‌ল বেজে, লাগ্‌ল চমৎকার।
এ সুর আমি শোনাব কায়? এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়।
তুমি ছাড়া শ্রোতা ইহার মিল্‌বে কোথা আর?

(৬)

সাঁঝের বেলায় তারার মালায় আমিই জেগে উঠি,
প্রভাত বেলায় বন বাগানে কুসুম হয়ে ফুটি।
কলস্বনে চলে নদী সাগর পানে নিরবধি,
তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে আমিই তাতে ছুটি॥
এই ভুবনের ছায়া পড়ে মনের দরপণে
আমার লীলাই হেরি তাতে বেড়ি এ ভুবনে।
মেঘের বুকে বিদ্যুতে ধাই, গুরুগুরু গান গেয়ে যাই।
উষার সাথে কিরণ হিরণ ছড়াই মুঠি মুঠি॥



বকুলদি

ফণিভূষণ আচার্য্য

দেয়ালে ঝোলানো খাঁড়াটায় মরচে পড়ে।

কবছর হয়তো তাতে শানই পড়েনি। আমরা একভাবে সমানে ওটাকে ঝুলে আসতে দেখছি আজ কবছর ধরে। নীহার বলে: লগনদা, খাঁড়াটায় যে শান দাও না, মরচে পড়ে গেল।

গোপীযন্ত্রে তার পরাচ্ছিল লগনদা। তারটা পরিয়ে আঙুলের একটা হালকা টান দিয়ে কান পেতে সুরটা একবার পরীক্ষা করে। তারপর স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি হেসে বলে: খাঁড়াটাড়া আর ভালো লাগে নারে। নেহাৎ বাবার দেওয়া, তাই। নইলে কোনদিন ওটাকে টান মেরে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতুম।

আমি চেয়ে থাকতুম লগনদার মুখের দিকে। তার দুটো চোখে বারোবছরের বালকের হাসি ঝিলিক মেরে যেত। বয়সে লগনদা আমাদের চেয়ে ঢের বড়ো—কিন্তু তার হাসিতে মনে হতো সে আমাদেরই সমবয়সী—দশ কি বারো। গোপীযন্ত্রের তারে সস্নেহে একটা আঙুলের ঘা দিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দেয় সাবধানে। আবার আমাদের চোখ পড়ে দেয়ালে ঝোলানো খাঁড়াটায়। মরচে পড়ে রংটা এমন হয়ে রয়েছে যে দেখলেই গা শিউরে ওঠে। ঠিক যেন বাসি রক্তের দাগ। আমি বলি: লগনদা, ওটাকে বিক্রী করে দাও না কেন? তাহলে তো ঝামেলা চুকে যায়—

লগনদা তেমনি হাসে। খাঁড়াটার দিকে একবার তাকায়। বলে: বাবা যখন দিয়ে যায়, তখন এতে লোহা কতো ছিল, জানিস? সাড়ে সাত সের। তা এখন সের সাতেক হবে। এক কোপেই—বুঝলি নে?

লগনদার মুখে হাসি মিলিয়ে গেছে। সারা মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর। চোখদুটো আর জ্বলজ্বলে নেই। লগনদা কেমন যেন হয়ে যায়, আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নে। তারপর অতি সহজ গলায় বলে: বাবার দেওয়া তো। বিক্রী করতে নেই।

লগনদার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব আজকের নয়। মনে আছে, মার কাছ থেকে কান্নাকাটি করে একটি পয়সা আদায় করতুম রোজ সকালে। পয়সাটিকে সাদরে হাতের মুঠোয় নিয়ে শীতের রোদ্দুর পোহাতে যেতুম লগনদার দোকানে। ততক্ষণে নীহার লগনদার তিনপায়া বেঞ্চিটায় বসে হয়তো তেলেভাজা চিবোচ্ছে, কিংবা ভাঙা একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছে লগনদার তোবড়ানো বালতি-উনুনটায়। প্রথমটা মনে হতো নীহারটা বড়ো হ্যাংলা। পরে জেনেছি, নীহার আমারই মতো লগনদাকে ভালোবাসে।

শীতের দিনে তেলেভাজা, গরমের দিনে সরবৎ।

খদ্দের এলে লগনদা কথা বলতো না একটিও। আর খদ্দের না থাকলে গলা ছেড়ে গান শোনাতো, যাত্রাদলের বিবেকের গান কিংবা কীর্তনের পদ। নইলে গল্প শোনাতো একটির পর একটি। দোকান জমতো না তেমন, কিন্তু গান আর গল্প জমতো বেশ। তেলে-ভাজা, সরবতের চেয়ে ওগুলো কম উপাদেয় ছিল না।

লগনদার এই চেলাগিরি আমাদের বেশিদিন টিকলো না। একদিন সকালে উঠে লগনদার দোকানে গিয়ে দেখি, একটা ছাল-ছাড়ানো গলাকাটা পাঁঠা ঝুলছে লম্বাভাবে। ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে নিচে বিছানো কলাপাতার ওপর। আর পাশেই পড়ে রয়েছে রক্তমাখা সেই খাঁড়াখানা অতি বীভৎসভাবে। খদ্দেরের ভিড় জমেছে বেশ। নীহার তাকায় আমার মুখে, আমি তাকাই নীহারের মুখে। তারপর হাত ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসি। সেদিন লগনদার যে চেহারা দেখেছিলুম, তা আজও ভাবতে ভয় পাই।

তবু মাঝে মাঝে দেখা হতো লগনদার সঙ্গে। দেখে মনে হতো, মাংসের দোকান করে লগনদার অবস্থা ফিরেছে। কতো লোক এখন লগনদাকে খাতির করে। ভিড় প্রায় সব সময় লেগেই থাকে। শুধু আমরা দুজনেই বাদ পড়ে গেলুম।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল তারপর। লগনদা এখন গাঁয়ের একজন তালেবর লোক। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে শুনলুম—গাঁয়ের বড় চৌধুরীদের বাড়িতে নাকি এক মারাত্মক রকমের ডাকাতি হয়ে গেছে। খুন হয়েছে একটা। পুলিশ এসেছে। সারা গ্রামটা ভয়ে জড়োসড়ো। সেদিন বিকেলেই নীহার এসে আমাকে খবর দিল, বড় চৌধুরী-বাড়ির ডাকাতির জন্যে লগনদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলুম: লগনদাকে কেন রে? লগনদা কি ডাকাতি করেছিল?

উত্তরে নীহার বলে: কেন? লগনদার খাঁড়ায় রক্ত লেগেছিল যে!

আমরা আর লগনদার কোনো খবর পাই নে। গাঁয়ে গুজব, সে নাকি এখন জেলে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এ সব চৌধুরীদের কারসাজি। লগনদা কোনোদিন ডাকাতি করতেই পারে না। মানুষ খুন তো দূরের কথা। তার সেই ছোট্ট ছেলের মতো হাসি, হাসির সময় দু-চোখের সেই জ্বলজ্বলে খুশির ঝিলিক। গাঁয়ের লোকে জানলো, গাঁয়ের বাইরের লোকে জানলো, লগনদা ডাকাত!

ইস্কুলে যাবার পথে গোলপাতায় ছাওয়া লগনদার কুঁড়ে, কুঁড়ের সামনে খানিকটা বারান্দা। সেইটাই ছিল লগনদার দোকান। নীহার আর আমি ইস্কুলে যাবার পথে লগনদার কুঁড়েটাকে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। তারপর নীহার আমার মুখের দিকে তাকাতো, আমি নীহারের মুখের দিকে। তারপর মাটির দিকে চেয়ে পথ হাঁটতুম। চালে পাতা নেই, পাঁজরার মতো বাঁশ দেখা যায়। মাটির দেয়ালগুলো এবার বুঝি আছাড় খেয়ে দেহরক্ষা করবে। লগনদার দোকানের ঝাঁপ আর তোলা হয় না। শীতের সকালে তেলে ভাজার গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে না। বারান্দার কোল ঘেঁসে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কেমন যেন একটা ভয় ভয়, থমথমে ভাব। বুকের ভেতরটা ছমছম্ করতো। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠতো। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতো সেই মরচে-পড়া খাঁড়াখানা। উঃ, কি ভয়ানক।

তারপর একদিন লগনদার দোকানের ঝাঁপ তোলা হলো। নীহার হাসতে হাসতে এসে খবরটা দেয় আমাকে। বলে: লগনদা এসেছে রে। দেখতে কেমন হয়েছে, চল্ দেখবি—নীহার আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে চলে। তাই তো, কতোদিন পরে লগনদা এসেছে! গাঁ ভেঙে লোকে দেখতে যাচ্ছে তাকে। তিন্ তিনটে বছর সে গাঁ ছেড়ে গেছে। তিন বছর দেখিনি, তার সেই হাসি—সেই চোখ। কিন্তু ভয় করে বড়ো। লগনদা ডাকাত, লগনদা মানুষ খুন করে! অন্ততঃ সবাই তো তাই বলে। তা যদি না হবে, তবে এতদিন লগনদাকে জেলে পুরে রেখেছিল কেন? তবু লগনদাকে দেখবো বলে দুজনে হোঁচট খেতে খেতে ছুটেছি। রাস্তায় হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল নীহার। গম্ভীর মুখে বলে: দেখে হাসিস্ নে যেন। সত্যি, যে আগে লগনদাকে একবার দেখেছে, সে এখন তাকে দেখে চিনতেই পারবে না। যদিও বা চিনতে পারে, হাসতেই হবে তাকে। আমি অবাক হয়ে দেখছি লগনদাকে। লগনদা পরেছে গেরুয়া কাপড় পাট করে। গায়ে গেরুয়া একটা বেনিয়ান। কপালে তিলক। এমন কি নাকে একটি রসকলিও। বাদ পড়েনি কিছু। আর লগনদার সেই ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বাবরি চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। নীহার কাঁধের ওপর মুখ টিপে হাসতে থাকে। বলে: হাসিস্ নে যেন—

বহু ছেলে মেয়ে ভিড় করেছে লগনদাকে দেখবার জন্যে। অবশ্য অন্য কারণও ছিল। পাশে গেরুয়াপরা একটি মেয়ে। বয়েস কতো ঠাওর করার মতো বয়েস তখনো আমাদের হয়নি। এখন অবশ্য অনুমান করতে পারি—পঁচিশ কি ছাব্বিশ। তারও কপালে তিলক, নাকে রসকলি। বাড়িতে ঠাকুমার আমলের একখানি কেষ্টনগরের পট ছিল। মা বলতেন, রাধা ঠাকুরাণী। আমার কেবলি সেই পটখানার কথা মনে ভেসে উঠলো। ভিড়করা ছেলেমেয়েদের হাতে নাড়ু দিচ্ছে মেয়েটি। ভয়ে কিংবা লজ্জায় হাত সরিয়ে নিল নীহার। মেয়েটি বলে: ছিঃ ভাই, ঠাকুরের পেসাদ, 'না' বলতে নেই।

আমার মনে হলো, এ গলা যেন আমার চেনা। কোথায় যেন শুনেছি এমনি সুরের কথা। এমনি মিষ্টি, এমনিদরদ-ভরা। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। তখনো কানের কাছে বেজে চলেছে তার সুরেলা গুঞ্জন। মনে হলো যেন লগনদার গোপীযন্ত্রের তারে মৃদু একটি আঙুলের আঘাত পড়লো এবং আমার বুকের ভেতরটাকে একবার নাড়া দিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো তার সুর। নীহার লজ্জা পেয়ে নাড়ুটা টুপ্‌ করে মুখে ফেলে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে উঠলো। আমি তার হাসিতে যোগ দিতে যাবো, এমন সময়ে শাসিয়ে উঠলো: এই, হাসিস্ নে—

মুখের হাসি মুখেই থেকে গেল, হাতের নাড়ু হাতেই।

কতোক্ষণ পরে সবাই চলে গেলে লগনদা আমাদের কাছে ডাকলো। তেমনি হাসিভরা মুখ, তেমনি জ্বলজ্বলে চোখ। বলে: বেশ বড়োসড়ো হয়েছিস যে রে। ভালো আছিস্ তো সব!

দুজনে একসঙ্গে মাথা নেড়ে হাসতে থাকি। হাসির মাঝখানে নীহার গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকায়। অর্থাৎ, হেসে আমি বড়ো অপরাধ করেছি। যাই হোক, লগনদা বলে: আর ওর নাম বকুল। তোরা বকুলদি বলেই ডাকিস্। আমি তো সেই পুরোনো লগনদা, কেমন?

লগনদা হাসতে থাকে। তার হাসিতে আমার মন ছিল না। আমি দেখছিলুম বকুলদিকে। শীতের সকালে শিশির-ভেজা কচি কলাপাতার ওপর রোদ্দুর পড়লে যেমন হয়, তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল বকুলদির মুখখানি। চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করছিল তার বিন্দু বিন্দু হাসি। : আর আমি ওদের কি বলে ডাকবো?

লগনদা বলে: বলে দে না তোদের নামগুলো। আমার আবার তোদের নামদুটো গণ্ডগোল হয়ে যায়।

নীহার সবেতেই আগে। সে বলে: আমার নাম নীহার—

আমি বলি: আমার নাম—

আমার নাম শুনে বকুল হেসে ওঠে। নীহারও। বলে রাখি, নীহার চিরকাল আমার নামের শত্রু। সে বলে, আমার নামটা নাকি নাম নয়।

লগনদা বলে: গান শুনবি? গান—

কতোদিন লগনদার গান শুনি নি। আমরা উৎসাহে মাথা নাড়ি। বকুলদির দিকে চেয়ে লগনদা বলে: ওরা গান বড়ো ভালবাসে। শুনিয়ে দাও তো একখানা।

গান শোনার কথায় আমরা মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠি। বকুলদি গান শোনাবে। যার গলা এতো মিষ্টি, কথায় এতো সুর। না জানি, তার গান কি রকম। উৎসাহে আরো সরে বসি।

লগনদা গোপীযন্ত্রের তারে আঙুল দিতেই তারটা ছিঁড়ে যায় হঠাৎ। লগনদা বলে: হলে কি হয়? কসাইর হাত তো। এতো ভার ওটা সইতে পারবে কেন?

আবার শিশুর মতো তার হাসি। বিকেলের বাতাসের মতো তার হাসি বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছুঁয়ে আসে। লগনদা ডাকাত? বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, সেই খাঁড়াখানা যেখানে ঝোলানো থাকতো, সেখানে একটা ছায়া পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই খাঁড়াখানার কথা মনে পড়লো। কতোকাল শান পড়েনি। শুকনো রক্তের মতো মরচের দাগ। নীহার তাকায় আমার মুখে, আমি তাকাই নীহারের মুখে। তারপর চোখ নামাই দুজনে।

লগনদা তার পরিয়ে নিল গোপীযন্ত্রটায়। সুর বাঁধলো কান পেতে। আমরা বকুলদির মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি। ঠোঁটে পানের রং। রক্ত-পদ্মের পাপড়িগুলো কখন মেলে যাবে, আমরা চেয়ে বসে থাকি।

বকুলদি সেদিন গান শুনিয়েছিল। কীর্তনের পদ। টানা টানা চোখদুটো তার জলে ভরে গিয়েছিল। আমরা সেদিন সে গান কতোখানিই বা বুঝেছিলুম, কিন্তু বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল। সে কথা বোঝাতে পারবো না।

সেদিন থেকে লগনদার বাড়িতে আমাদের ইস্কুলে ফেরার পথে স্থায়ী আসর প্রতিষ্ঠিত হলো। জল, নাড়ু আর বকুলদির গান আমাদের কোনদিনও বাদ পড়েনি।

ইস্কুল বন্ধ ছিল কদিন। লগনদার বাড়িও তাই যাওয়া হয়ে ওঠে না। নীহারও যদি একবার আসে, তবে দুজনে একবার ঘুরে আসতুম। একা যেতে কেমন লাগে। নীহার যত আমার নামের নিন্দেই করুক, তাকে নাহলে

যে আমি পঙ্গু, তা এই কদিনে বেশ বুঝতে পারলুম। সেদিন কিন্তু বকুলদির গান আর নারকেলের নাড়ু আমাকে কিছুতেই ঘরে টিকতে দিল না—নাই-বা এলো নীহার। একাই আমি যাবো। সত্যিকথা বলতে কি, সেদিন আমার চিন্তাগুলো বড়ো স্বার্থপরের মতো। নীহারকে ভাগ দিতে অনিচ্ছুক।

পুরো আদর, ভালোবাসা পাবো বকুলদির। আমি আজ তার গানের একা এবং অদ্বিতীয় শ্রোতা। নীহার আসেনি ভালোই হয়েছে। তবু নীহারকে ছাড়া কেমন খালি খালি লাগছে। একাই নিজের মনে পথ হাঁটছি। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি, নীহার আসছে। নীহার তাহলে আমার আগেই বকুলদির গান আর নারকেলের নাড়ু শেষ করে ফিরে আসছে। না, তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই। কেমন যেন সব উৎসাহ আমার জল হয়ে গেল। আর কি সেই ভাঙা আসরে বকুলদির গান আর নারকেলের নাড়ু আগের মতো জমবে? নীহারের ওপর বড়ো হিংসে হয়। সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলুম।

: কিরে, কোথায় যাচ্ছিস্? বকুলদির ওখানে?

নীহারের মুখটা ভারি। চোখদুটো বড়ো থম্‌থমে। মনে হলো, আমি যেন ধরা পড়ে গেছি। বললুম: হাঁ, তুই চলে এলি যে!

: কবরেজ মশাইকে ডাকতে যাচ্ছি। যদি একটিবার আসে। বকুলদির খুব অসুখ! কদিন জ্বরই কাটে না।

নীহারের চোখদুটো ছলছল করে এলো।

: জানিস্, বকুলদি বোধহয় বাঁচবে না।

সেদিন বুঝতে পারলুম, বকুলদির গান আর নারকোলের নাড়ুকে আমরা ভালো বেসেছি। কিন্তু তাই বলে বকুলদিকে আমরা কম ভালোবাসিনি। নইলে তার অসুখে আমরা এতো কাতর হয়ে পড়েছিলুম কেন? তায় লগনদা বকুলদির অসুখে তার যে চিন্তা? কত তুক, শেকড় বাকড়, কতো পথ্যি যে জড়ো করেছিল সে বকুলদির মাথার কাছে, আমরা দেখে তো অবাক। সারাক্ষণ মাথার কাছে বসে লগনদা বকুলদিকে জিজ্ঞেস করলো: এখন কেমন লাগছে, বকুল?

বকুলদি ককিয়ে ওঠে: তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। জ্বর কি কারো হয় না, শুধু আমারই হয়েছে? তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো, আমি ঠিক—

লগনদা বকুলদির মুখে হাত চাপা দেয়। বকুলদি বলে: একটু সরো তো উঠে বসি—

বকুলদি উঠে বসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো।

: কষ্ট হচ্ছে তোর?

লগনদা একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

: তোমরা একটু কম উতলা হলে আমার কষ্ট কমবে। তোমাদের জন্যেই যে মরে যাচ্ছি। লগনদা কাছেই কোথাও গেল কি একটা আনতে। নীহার গেছে কবরেজ মশাইর কাছে। আমি একা দাঁড়িয়েছিলুম। কেউ কোথাও নেই দেখে বকুলদির কপালে হাতটা রাখলুম ভয়ে ভয়ে। সকালের রোদে ঝলমল মাঠটার মতো কপালখানা তার। খুব জ্বর। কপালটা পুড়ে যাচ্ছে যেন। বকুলদি চোখবুজে তেমনি শুয়ে আছে। দেহে সাড় আছে কিনা বুকের ওঠানামা ছাড়া বোঝার উপায় নেই। দুচোখে তার মোটা হয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে আমার হাতটা কপালের ওপর চেপে ধরে বকুলদি।

: আঃ! তোর হাতটা কি ঠাণ্ডারে—

বকুলদি তাহলে বুঝতে পেরেছে, আমিই তার কপালে হাত দিয়েছি। আমি বিস্ময়ে হতবাক। আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা ধানের পাতার ছোঁয়ায় যেমন হয়, তেমনি শির শির করে ওঠে। বকুলদিকে এতটুকু কাছে পাবার আনন্দ সব খুশিকে ছাপিয়ে যায়। এতদিন তুই আসিস্ নি কেন রে? রোজই ভাবি, তুই আসবি। আর সবাই আসে, শুধু তোরই আর আসা হয় না। হ্যাঁরে, আজ কি একেবারে পথ ভুলে চলে এলি? বকুলদি চোখ মেলে তাকালো। দুচোখ জলে টলমল করছে। সূর্যের আলোয় মেঘের পাড়-বোনার দৃশ্য বহুবার দেখেছি। ঠিক তেমনি করে হাসিটা লেপ্টে আছে বকুলদির ঠোঁটে। আমার হাতটা নিয়ে বকুলদি তার চোখে, মুখে, ঠোঁটে বুলোতে লাগলো।

বললো: আবার কবে আসবি, বল্?

বললুম: কাল।

ঃ কথা দিয়ে গেলি তো?

আশ্চর্য। বকুলদি একটা শক্ত শপথ নিয়ে তবে ছাড়লো। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। আমি বুঝতে পারলুম, কেমন একটা নতুন অনুভূতি আমার ভেতরে গুমরে উঠছে বার বার। সেই আগন্তুক অনুভবটাও যেন ঠিক বকুলদির মতো। একেবারে নতুন। একটু পরে বকুলদি বলে: তোকে আমার কি যে ভালো লাগে। সেদিন সকালে তোকে যখন আমি প্রথম দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, কোথায় যেন তোকে দেখেছি। হ্যাঁরে, বল্না গতজন্মে তুই কি কোথাও আমাকে দেখেছিস? চুপ করে রইলি কেন? ও, মনে পড়ছে না বুঝি?

ভাবলুম, জ্বরের ঘোরে বকুলদি বোধহয় ভুল বকছে। আমার কেমন ভয় করতে লাগলো। কিন্তু যে কথা আমি ভেবেছি মনে মনে, সেই কথা বকুলদি কি করেই বা বলতে পারলো? আমি আজ হঠাৎ যেন বড়ো হয়ে উঠেছি। কি জানি কেন, কেমন ভালো লাগছিল বকুলদির কথাগুলো শুনতে। কোনদিন এমন কঠিন কথা শুনি নি। মনে হচ্ছিল, আবার শুনি, আবার।

নীহার এসে খবর দিল, কবরেজ মশাই আসবে না। তার নাকি জরুরী কোথায় যেতে হবে। ওষুধ একটু নিয়ে এসেছে নীহার। বকুলদি হেসে বলে: ঠিক হয়েছে। ওষুধটা তোরাই খেয়ে ফেল। আমাকে আর জ্বালাস্ নি।

বকুলদি ওষুধ খায় নি। সে নিজেই সেরে উঠলো। কিন্তু শরীরটা চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। বকুলদিকে চেনার উপায় নেই। শুধু মুখের হাসিটা ছাড়া। আর চোখদুটো। মুখের কোথাও বেদনা নেই, বিষণ্ণতার চিহ্নমাত্র ও নেই। মুখখানা দেখে বরাবরই আমার সেই রাধাঠাকুরাণীব পটটির কথা মনে পড়েছে। কপালে অলকা-তিলকা, নাকে রসকলি, এবং চোখে কাজলাদীঘির জল। লগনদার মুখটা বড়ো করুণ দেখায়। বিশেষ করে আজকাল সে যখন বকুলদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরে।

মনে পড়ে, বাতাসে তখন শীতের ছোঁয়া লেগেছে। সকালের রোদ্দুরে কুয়াশার ভিজে-ভিজে গন্ধ। বাবলা-গাছের কৃশ ডালগুলিতে শিশিরের নোলক। ঠাকুমার গল্পের ফাঁকে তার পৌত্র-বধূর মুখের আভাসের মতো। মনে পড়ে, ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য নিজেরই রক্তিম আলোর সমুদ্রে নিজেই ঝাঁপ দিতেন। বাড়ি পৌঁছু তেই সন্ধ্যে হয়ে যেত। বকুলদির বাড়ি আর যাওয়া হয়ে উঠতো না। তবু সেই গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়েটার পাশ দিয়ে আসবার সময় পা-দুটো কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যেত। চোখদুটো খুঁজতো এক সুন্দর ছবির মতো মুখ। কোনদিন দেখা হতো, কোনদিন হতো না। আজকাল একেবারেই না। বকুলদি ইচ্ছে করেই এই সময়টা ডুবে থাকতো অন্য কাজে।

একদিন লগনদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ছোট ছেলের মতো পথ আগলে দাঁড়ালো সে: আজকাল আসিস নে যে। ঘরের পাশ দিয়ে রোজই চলে যাস। তোদের বকুলদি খুব দুঃখু করে। আস্বিনে? কবে আসবি বল?

বললুম: ছুটি হতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়, লগনদা। দেরি হলে বাড়িতে আবার ধমক খেতে হয় কিনা।

লগনদা বিশ্বাস করছিল না। নীহারের কথায় সায় পেয়ে তবে লগনদার বিশ্বাস হলো। তাও বোধহয় পুরো-পুরি নয়।

ঃ তোরা আর আসিস্ না। আর তোদের বকুলদি ত বোধহয় হাসতেও ভুলে গেছে। চেয়ে দেখলুম, লগনদার ঘরের ঝাঁপের মাথায় একটি হাতের আভাস। ও-হাতের প্রত্যেকটি আঙুল যে আমি চিনি। ওর আঙুলের ভাষা সবই যে আমার জানা। তাহলে বকুলদি শুনতে পেয়েছে সব।

লগনদা জিজ্ঞেস করে: আসবি তো?

ঃ আসবো।

ঃ কবে আসবি, বল?

আমি কিছু বলার আগেই ঘরের ঝাঁপটা উঠে গেল একটু। বকুলদির মুখ। চোখে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তের সূর্যাভাস। যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

ঃ না, আসতে হবে না। বলে দাও ওদের, ওরা আর না আসে।

তারপর ঝাঁপ পড়বার শব্দ হলো একবার। চেয়ে দেখি, মুখখানা আড়ালে ডুবে গেছে। আসতে পা উঠছিল না। তবু আসতে হলো। ভেবেছিলুম, দু একদিনের মধ্যে একদিন যাবো। বকুলদির সব রাগ মুছে দেব।

বকুলদির কাছ থেকে আমরাই তো পেয়েছি বেশি। আমরাই তাকে জ্বালিয়েছি দুবেলা। শুধু গান কিংবা নারকেলের নাড়ু নয়। বকুলদি আমাদের যে কতো ভালোবেসেছে, সেদিন গোধূলির আলোয় যতখানি বুঝতে পারলুম, এমন আর কোনোদিন নয়।

ঘরে ফিরে কোনো কাজেই মন বসে না। শুধু সেই মুখ। সেই কথার কাকলি। ভোর রাতে হাড়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। পরের দিন যাওয়া হলো না। তার-পরের দিনও না। এমনি অনেকগুলো দিন রাত্তির কেটে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতোদিন ভেবেছি, বকুলদির মুখের কথা। চোখ বুজে মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করেছি সেই ছবির মতো মুখ, কাজলা দিঘীর মতো দুখানি চোখ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফুটে উঠেছে পটের রাধাঠাকুরাণীর মূর্তি। তেমনি মধুঢালা কণ্ঠস্বর: এতদিন তুই আসিস্ নি কেন রে? রোজই ভাবি, আসবি। সবাই আসে, তোর আর আসা হয় না।

আমি স্বপ্ন দেখছিলুম কিনা জানি নে। নিচে বকুলদির গলায় আমারই প্রিয় গানটি শুনতে পেলুম। হ্যাঁ, এই গানই তো শোনাবার জন্য ওকে কতোদিন জ্বালিয়েছি। মনে মনে প্রার্থনা করলুম: হে ঈশ্বর, স্বপ্নই যদি হয়, তবে এ-স্বপ্ন যেন আমার না ভাঙ্গে। আর যদি জেগেই থাকি, তবে শান দিয়ে ধারালো করে তোলো আমার অনুভূতি-গুলোকে।

আমার ছুটে নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে কেউ না কেউ আমাকে দেখতে পাবে। অথচ বিছানা থেকে ওঠাই আমার বারণ।

গান থেমে গেল। ফুলের গন্ধের মতো সুরের রেশ অনেকক্ষণ বাতাস বয়ে বেড়ালো। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আমার মনের মতো। ঘুম-ছুট্ চোখে চেয়ে দেখলুম, আমি বিছানায় পড়ে আছি। আর আমার সামনের দেয়ালে রাধাঠাকুরাণীর সেই পটখানা অল্প অল্প কাঁপছে বাতাসে।

কদিন পরে আমি সেরে উঠলুম। এবার একদিন যেমন করেই হোক, বকুলদির কাছে যেতে হবে। কিন্তু সেদিনের ব্যবহারে বুঝেছি, বকুলদি খুব রেগে আছে। তারপর আরো কতোদিন অসুখে কেটে গেছে। নীহার কি বলেছে আমার অসুখের কথা? যদি না বলে থাকে, তবে কি করে বকুলদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?

একদিন কোনো কিছু না ভেবে বকুলদির কুঁড়ের দোরে গিয়ে দাঁড়ালুম। বকুলদি বসে কি যেন করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে পাশে নিয়ে বসালো। : চেহারা তো হাওয়ায় উড়ছে। আমার ফাঁড়াটা তাহলে তোর ওপর দিয়েই গেল, নারে?

কপালে হাত রাখলো বকুলদি।

আমার চোখে জল আসছিল। বকুলদি আমার কে-ই বা হয়। পরিচয়-ই বা ক বছরের। শুধু লগনদাকে জানি ছোটবেলা থেকে। ভালোবাসি। আর বকুলদি। মনে হয়, সে যেন কতোদিনের চেনা। যেন কতো আপনজন। আমার অসুখের সব জ্বালা জুড়িয়ে দিল তার আঙুল কয়টির স্পর্শ।

বকুলদির কথা মনে পড়ে: হ্যাঁরে, বল না, গতজন্মে তুই কি কোথাও আমাকে দেখেছিস? চুপ করে রইলি কেন? ও, মনে পড়ছে না বুঝি?

কথাটা, কেন জানিনে, ভুলতে পারি নে। বকুলদির গানের কলির মতো ঘুরে ফিরে থাকে মনের কোণে। পড়েছিলুম, ভগবান তথাগত কতোবার জন্মেছিলেন কতো রূপে। প্রত্যেক জন্মের কথা মনে থাকতো তাঁর। গত জন্ম-জন্মান্তরের কথা তিনি হুবহু মনে করে বলতে পারতেন। তাহলে পূর্বজন্মে আমি কি কেউ ছিলুম? আর বকুলদি? লগনদা? নীহার?

আমি ভগবান তথাগত হতুম।

একদিন সকালে বকুলদি কাঁদতে কাঁদতে বলে: কি হবে?

আমি বলি: লগনদা যতদিন না ফেরে, আমরা তো আছি বকুলদি—

গাঁয়ে আবার একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। লগনদাকে আবার পুলিশের ফাঁড়িতে যেতে হলো। তারপর জেল। দু'বছর।

বকুলদি দিন রাত চোখ মোছে। আমরা কতো রকমে বোঝাই। ছোট্ট মেয়েকে যেমন করে ভুলিয়ে রাখতে হয়।

বকুলদি বলে : কাকদ্বীপের রাস্তার ধারে পড়েছিলুম। সাগরে যাবো বলে বেরিয়ে পড়েছিলুম ঘর ছেড়ে। কাল্না থেকে চলেছি ভিক্ষে করতে করতে। পথ আর ফুরোয় না। তারপর হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এলো একদিন। রাস্তার ধারে পড়েছিলুম। ও এলো। আমার হাত ধরে বললো : চল, তোকে আমি পৌঁছে দেব। সাগর থেকে ফিরে ভেবেছিলুম, ভালোই কাটবে। কিন্তু—বকুলদির দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। আমরা বোঝাবার চেষ্টা করি : লগনদা আবার ফিরে আসবে। তোমাদের ভালোই যাবে। দ্যাখো, বকুলদি—

বকুলদি চোখের জল মোছে। জিজ্ঞেস করে : তোরা রোজ আস্‌বি তো? নইলে কিন্তু আমিও ঘর ছেড়ে চলে যাবো। আর আসবো না। রাস্তা থেকে এসেছিলুম। রাস্তায়ই চলে যাবো।

আমরা আসি। নানা কথায় ভুলিয়ে রাখি বকুলদিকে। বকুলদির মুখে হাসি ফোটে। আমরা বকুলদির গান শুনি। গান ফুরোলে গল্প। গান আর গল্পের মাঝখানে কখন সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যে গাঁয়ের মাথায় অন্ধকার বুনে দেয়। আমরা বাড়ী ফিরি। ফিরবার সময় রাস্তায় একবার দাঁড়াই। মনে মনে বলি : হে ঈশ্বর, বকুলদিকে তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি। তুমি তাকে দেখো। তার কেউ নেই।

পৃথিবী-সূর্য প্রদক্ষিণের পথে দু'বছর কাটিয়ে দিল। আমরাও দু'বছর এগিয়ে এলুম। আমাদের শেষ-পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার শহরে যাবো। নীহারের সঙ্গ ছাড়তে হবে। নীহার পাশ করতে পারে নি। আমার শহরে যাবার আগে লগনদা এসে পড়লে ভালো হয়। নীহারের আজকাল দেখা পাওয়া যায় না। বকুলদি তাকে অনেক বুঝিয়েছিল। ফেল করেছে সে। বকুলদিকে সে আর মুখ দেখাবে না।

আমি শহরে যাবো। তাই এখন প্রায়ই বকুলদির বাড়ি আসি। দুদিন পরে তো আর আসতে পারবো না।

একদিন বকুলদি বললে : তুই আর আসিস নে।

বিশ্বাস করিনি। তবু জিজ্ঞেস করলুম : কেন বকুলদি?

: তুই এতো ঘন ঘন আসিস, লোকে কি ভাববে, বল্‌তো? চেহারাখানা যা হয়ে উঠছে, কতোজনের যে কপাল পোড়াবি—

নামের নিন্দেয় চিরকাল অভ্যস্ত। আমার আবার চেহারার প্রশংসা! মাথায় না হয় বড়ো হয়ে উঠেছি বেশ। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?. বকুলদির কাছে আসবো না কেন? লোকে ভাববে। কি ভাববে?

খিল খিল করে হেসে ওঠে বকুলদি : লোকে ভাববে, আমি বুঝি তোকে মন্তর করেছি।

: 'মন্তর' কি বকুলদি?

বকুলদির হাসিতে বুঝতে পারলুম, আমার প্রশ্নটা বোকার মতো হয়েছে। আমি নিজেও হেসে উঠলুম। বললুম : 'মন্তর' কি বলো না বকুলদি।

বকুলদি গম্ভীর হয়ে বলে : 'মন্তর' হচ্ছে—

আবার হাসিতে বকুলদি ফেটে পড়লো যেন। আমিও ছাড়বো না। বকুলদির একখানা হাত চেপে ধরলুম। বললুম : বলো না বকুলদি, বলো—

: বললে ওসব তুই বুঝবি নে—

: 'মন্তর' কি তাহলে তুমি জানো—

: নারে, আমি জানি নে।

: নিশ্চয়ই জানো।

হাতটায় আরো জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম : তুমি আমাকে মন্তর করো না বকুলদি। বলো, করবে—

বকুলদি বলে : হাতটা ভেঙে দিবি নাকি? ছাড়—

বকুলদি ঘরের ভিতর উঠে যায়। মন্তর করলে কি রকম লাগে জানবার জন্যে বসে আছি। আমার সমস্ত অনুভূতিকে চাঙ্গা করে রাখি। আমি এখন যা আছি, কয়েক মিনিট পরে তা থাকবো না। মন্তর হয়ে যাবো। বকুলদি বেরিয়ে এলো। আমি তৈরী হয়ে বসি। বকুলদি একখানা পোষ্টকার্ড আমার হাতে এগিয়ে দেয়। এ যে লগনদার হাতের খোঁড়ানো অক্ষর। জেল থেকে লিখেছে সে। আগামী সপ্তাহেই সে ফিরবে। ছুটি হয়ে যাবে তার। দু'বছর পূর্ণ হবে দু একদিনের মধ্যেই। কতোদিন লগনদাকে দেখিনি। লগনদা ফিরে আসছে ভেবে মনটা খুশিতে ভরে গেল। তার সেই শিশুর মতো প্রাণখোলা হাসি, গলা ছেড়ে গান কতোদিন শুনিনি! আমি তাহলে

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শহরে যেতে পারবো। কিন্তু মন্তর? বললুম : বকুলদি, আমাকে মন্তর করবে না?

বকুলদি আর হাসে না। তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকাতে ভয় হয়। সে আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি চোখ নামাতে পারি নে। আমার সমস্ত শরীরে একটা আশ্চর্য অনুভূতির ঢেউ খেলে যায়।

: পারবি 'মন্তর' নিতে?

: কেন পারবো না?

: তাহলে কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবি নে।

: বেশ, ফিরবো না।

: তারপর কিন্তু তুই আমার হয়ে যাবি। রাজি?

: রাজি—

তখনই যেন আমাকে মন্তরে পেয়ে বসেছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, আমার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি। বকুলদির ইচ্ছেমতো জবাব দিয়ে যাচ্ছি একটির পর একটি।

: তাহলে কাল সন্ধ্যের পর আসিস—

সারাটা দিন কি করে কাটলো, বোঝাতে পারবো না। দুপুর যদি বা হলো, বিকেল আর হয় না। বিকেল যখন হলো, তখন ভাবি, সন্ধ্যে কতো দূর।

শেষে সন্ধ্যে হলো। সন্ধ্যে যে কতো সুন্দর, এই প্রথম যেন আমার চোখে পড়লো। আকাশের রং বদলালো, গাছ-গাছালির রং বদলালো। তারপর ঘুমের মতো নামলো অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে এলো। কি সুন্দর এই পৃথিবী!

কোনোদিকে না চেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে রাস্তায় নিজের মনে ঘুরে বেড়ালুম। বাতাসে একটা খুব চেনা ফুলের গন্ধ। বুক ভরে নিশ্বাস নিলুম। বকুলদির মুখের মতো আকাশটা মাথার ওপর চেয়ে আছে। মনে পড়ে গেল, রাত হয়েছে। বকুলদির বাড়ি যেতে হবে। মন্তর করবে বকুলদি।

বকুলদির কুঁড়ে দরজায় দাঁড়ালুম। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। কুঁড়ের দরজা বন্ধ। বাইরে ঝাঁপ তোলা। ঝাঁপের বাইরে অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে বকুলদি কি 'মন্তর' করার কথা ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ধ্যের পরেই? কিন্তু ঝাঁপ যে তোলা। ঝাঁপ না ফেলে তো বকুলদি ঘুমোয় না? ডাকবো বলে মুখ খুলে বন্ধ করলুম। খিল খিল করে হেসে উঠলো কেন বকুলদি? হাসি থামতে কে যেন ফিস ফিস করে কি বললো বকুলদিকে। বকুলদি কি বলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমাকে দেখতে পেয়ে সে ইশারায় চুপ করতে বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল একেবারে রাস্তার ওদিকে।

: 'মন্তর' দেবে না বকুলদি?

আমার মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বকুলদি বলে 'মন্তর' দেওয়া আর হলো না রে।

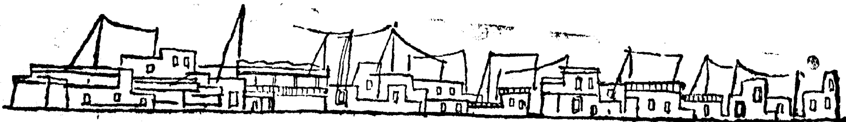
: কেন বকুলদি?

: ও এসে গেছে—

: কে? লগনদা?

: হ্যাঁ, দুদিন আগেই তার ছুটি হয়ে গেছে। তুই যা, ঘরে ফিরে যা—

লগনদার গলা শুনতে পেলুম। বকুলদিকে ডাকলো সে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে আমি কোথায় ছিটকে পড়লুম। হারিয়ে গেলুম বাঁকের আড়ালে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বিছানা নিলুম। আকাশ ভেঙে যেন দু-চোখে ঘুম এলো। এমন ঘুম কখনো ঘুমোই নি। একটু বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠলুম। নিচে নামতেই নীহার এসে খবর দিল, কাল রাতে লগনদা এসে বকুলদিকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।





বাঙলার শ্রেষ্ঠতা

উপানন্দ

ধর্ম্মে সাহিত্যে, শিল্পে স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, দর্শনে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বাঙ্গালী চিরদিন তার প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে এই বঙ্গভূমিতে। এই প্রদেশের পশ্চাতে যে বিরাট গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যের পটভূমিকা রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আবৃত করে রাখ্‌লে, বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তোমাদের সম্যক ধারণা হবে না। বেদে, পুরাণে, মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতে বাঙ্গালীর নাম উল্লিখিত আছে। বাঙ্‌লার ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করে সেখানে বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইতিহাসে বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। জাপানেও অতি প্রাচীন কালে বাঙালীরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, বিভিন্ন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙালীর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল, অনেক পণ্ডিত এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালীর প্রতিভার বিশেষত্ব। প্রস্তর যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগমনে এই জাতির শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলায় পাহাড় পুরের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যে রেখাপাত করেছে, তাতে তোমাদের অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি কর্‌বার মত প্রচুর উপকরণ আছে। পাহাড়পুর বর্ত্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত। এখানে একটি বৌদ্ধ মহাবিহার ছিল। শ্রীজ্ঞান অতীশ প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মনীষী এই মহাবিহারে বাস কর্‌তেন।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ও তাঁর সৈন্যগণ দুর্দ্ধর্ষ সমর-কুশলী জাতির পরিচয় পেয়ে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ়ের দিকে অগ্রসর না হয়ে মগধ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। সে সময়ে উচ্চ শিখরে উঠেছিল বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাঙ্গালী তখন শুধু সামরিক জাতি নয়, তার পণ্যতরী মহাসমুদ্র পথে ও বিশ্বের বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত কর্‌ত। গ্রীকপর্য্যটক ও ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে গেছেন শিল্পে-বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও যুদ্ধবিদ্যায় বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব। মহাকবি কালিদাস ছিলেন বাঙালী, এরূপ মত ও প্রকাশ করেছেন অনেক পণ্ডিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে শীলভদ্রের কীর্ত্তি আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গলার গৌরবমণি। এঁর ধর্ম্মাধ্যক্ষতায় তিব্বত অধ্যাত্ম-আলোক লাভ করেছিল। পালবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ধর্ম্মপাল ভারত বিজেতা। বাংলার আদিশূর, শশাঙ্ক প্রভৃতি রাজাদের কাহিনী ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। খনা বাঙ্‌লার মেয়ে, আজ ও খনার বচন ঘরে ঘরে প্রচলিত। গিরিয়ার মাঠে বাঙালী বালক জালিম সিংহের শৌর্য্য কাহিনী বাঙ্গালীর ইতিহাসকে ধন্য করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে শহীদ ক্ষুদিরাম। রাণী ভবানীর দান শৌণ্ডতার মহিমা আজও বারাণসী ক্ষেত্রে কীর্ত্তিত। দেশবন্ধু দেশের জন্যে সর্ব্বস্বদান করে গেছেন। মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী বাঙালী জাতির উন্নতি কল্পে অজস্র অর্থদান করে গেছেন। এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বাস্তবিক বাঙ্গালী কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম্ম, রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশের 'ন্যায়,' জয়দেব-বিদ্যাপতি-মুকুন্দরামের কাব্য—কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিত রূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধহয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে সার কথা আছে?'

লালাবাবুর স্মৃতি এখনও বৃন্দাবন বুকে ধরে অশ্রুপাত করছে। রাজা রামমোহন রায় বাঙালীর গৌরব। তিনি মহাপুরুষ, নবযুগের স্রষ্টাও বটে। তাঁর বিদগ্ধতা ও মনীষা বিশ্ববিশ্রুত। তাঁর সমাধিক্ষেত্র ব্রিষ্টল বক্ষে ধারণ করে নিত্য তাঁর স্মৃতির প্রদীপ জ্বালছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয়। মানবিকতার মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি। তাঁর পাণ্ডিত্য, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, সমাজ সংস্কারমূলক নানাবিধ কার্য্য,

লোক হিতৈষণা, শিক্ষাসংস্কার, সর্ব্বজীবে দয়া ও সেবাধর্ম্ম অতুলনীয়। তিনি শুধু বিদ্যার সাগর ন'ন, করুণার সাগরও ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁর সহৃদয় দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবে বাঙ্গালার সংস্কৃতি উজ্জ্বলতর হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংস, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রাণী স্বর্ণময়ী, তারক প্রামাণিক, কালী প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় নর নারীর কথা বিশ্ববিশ্রুত। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃত লাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্য জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম্ম সভায় ভারতের সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তের বাণী প্রচার করেছেন, এঁরই গুরু ভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের অবদানও বিরাট। মহীয়সী মহিলা শ্রীশ্রীগৌরীমার পূত জীবনী পরম বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি।

বালক সুরেশ বিশ্বাস পরবর্ত্তী কালে স্বাধীন ব্রেজিল দেশের সেনাপতি হয়ে কর্ণেল উপাধি লাভ করেছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন চন্দ্র পালের বাগ্মিতা বিশ্ববিদিত। সুরেন্দ্রনাথই ভারতের রাষ্ট্রগুরু ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ। সরোজিনী নাইডু, তরুদত্ত, সরলা দেবী চৌধুরাণী, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি মহিয়সী মহিলার অবদান বাঙ্গালীর পরম পাথেয়। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিস্কার বিজ্ঞান জগতে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। রসায়নের ক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যুগান্তর এনেছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্র বসু প্রভৃতি অমর জ্যোতিষ্ক হয়ে রয়েছেন বিজ্ঞান জগতে। চিকিৎসাশাস্ত্রে স্যার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ চারুকলা ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করে গেছেন। পাণ্ডিত্যে পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি অবিস্মরণীয়। সঙ্গীতজগতে রাধিকাপ্রসাদ, গোপেশ্বর, রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বহু ঊর্দ্ধে। রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাসের এঁরা উত্তর-সাধক।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার বছরের মানব সভ্যতার মূর্ত্ত বিগ্রহ, সমগ্র বিশ্বের পরম বিস্ময়। আমরা তাঁর শতবার্ষিক জন্মতিথির উৎসব আয়োজন লক্ষ্য করছি পৃথিবীর এক প্রান্ত হোতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। ভাব জগতের তিনি রাজ রাজেশ্বর, ভগবানের বিশিষ্ট বিভূতি। তাঁকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে পাশ্চাত্য জগত ধন্য হয়েছে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শিশিরকুমার ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালীর গৌরব। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ-প্রেম জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। বিপ্লবী 'বাঘা' যতীন, বিপিন গাঙ্গুলী, উপেন বাড়ুয্যে প্রভৃতি অবিস্মরণীয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে মহিমান্বিত করে গেছেন। এইক্ষণজন্মাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে বাঙ্গালী জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সমুন্নত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বিশ্বের দরবারে বরমাল্য পেয়েছে তাঁরই অসাধারণ কর্ম্মনৈপুণ্যের ফলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ যতীন্দ্রমোহনের স্বদেশের জন্যে অলৌকিক ত্যাগ, অপূর্ব্ব দানশীলতা ও অসীম স্বদেশানুরাগ অতুলনীয়। আদর্শ ব্যবসায়ী-রূপে রামদুলাল সরকার, স্যার রাজেন্দ্রনাথ, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বদান্য মহাপুরুষ ছিলেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার তারকনাথ পালিত, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি।

অপরাজেয় কথাশিল্পী ছিলেন শরৎচন্দ্র, সাহিত্য জগতে চিন্তাধারার যুগান্তর এনে বঙ্গ ভারতীর রত্ন ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন। উপেক্ষিতা নারীজাতির প্রতি ছিল তাঁর অসীম দরদ। সাহিত্য জগতে প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অমর হয়ে আছেন। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' সমগ্র পৃথিবীর সভ্য সমাজে সমাদৃত। বিদগ্ধতার ক্ষেত্রে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি মোহিতলালের স্থান সমালোচনার ক্ষেত্রে সর্ব্বজনসমাদৃত। কাব্যজগতে তাঁর স্থান বহু উর্দ্ধে। কাজী নজরুল, যতীন্দ্র বাগ্‌চি, করুণানিধান, প্রভৃতিও তাঁরই মত বরেণ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে স্যার যদুনাথ ডাঃ রমেশ মজুমদার, ডাঃ সুরেন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দার্শনিকরূপে ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল এবং স্বামী অভেদানন্দ ভুবনবিখ্যাত এবং ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা, ভাগবত-জীবন ও অধ্যাত্ম পথের অপূর্ব দৃষ্টি ভঙ্গিমা নব আলোক সম্পাত করে সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। নৃত্যশিল্পী কলাকুশলী উদয়শঙ্করের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্-জো-দাড়ো খনন করিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করে গেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মহা-মানবের জীবন অবসান হয় কাশ্মীরে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র শুধু রাজনৈতিক জগতের বিরাট জ্যোতিষ্ক ন'ন, বীরেন্দ্রকিশোরও বটে। তাঁর আবির্ভাব না হোলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হোতো না। রাজনৈতিক জগতে বাঙ্গলার দান অপরিসীম। ব্রিটিশ রাজত্বকালে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ইংলণ্ডের কৌলিন্য মর্য্যাদা পেয়ে ব্যারন অব রায়পুর হয়েছিলেন। লর্ড সিংহ বিহারের গভর্ণরও হয়েছিলেন; ভূপেন্দ্রনাথ বসু অণ্ডার সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া পদলাভ করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের হিসাব নিকাশের ভার অর্পিত হয়েছিল ভূপেন্দ্র মিত্রের ওপর। তিনি ফ্রান্সে বসে যুদ্ধে মিত্রশক্তিদের মধ্যে কার অংশে কত ব্যয় হয়েছে তা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। মহামতি গোখেল বাঙালীর মস্তিষ্কের প্রশংসা করেছেন আর বলেছেন—'আজ যাহা বাঙালী ভাবিতেছে, কল্য তাহা সমগ্র ভারত চিন্তা করিবে।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ও বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে অন্যান্য জাতি মুগ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে 'আগষ্ট বিপ্লব' সুরু হয়েছিল, তার নেতৃত্ব করেছে বাঙ্গালী। মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরাজশাসন একপ্রকার লুপ্ত হয়েছিল। মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল।

ভাগ্যচক্রে বাঙ্গালীকে আজ সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিহত করবার চেষ্টা চলেছে। মানচিত্রে বাঙ্গলার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ক্রমেই এর সীমানাকে উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত করা হচ্ছে, এর ওপর গঙ্গায় পলিমাটি পড়ার জন্য বড় বড় জাহাজ কলকাতার বন্দরে প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে কলকাতা বন্দরের অবস্থা শোচনীয়। বাঙালীর কণ্ঠ আজ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে। সর্ব্বতোভাবে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। পঙ্কিলতা আর আবর্জ্জনার মধ্যে বাঙ্গালী মগ্ন হয়ে রয়েছে। বিভীষণের ভূমিকাও গ্রহণ করেছে বাঙালী সমাজের কিছু কিছু ব্যক্তি জাতিকে মরণোন্মুখ করতে।

যখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্বজ্জনোচিত চাকুরিতেও ব্যবসায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য অন্য প্রদেশের লোকেরা বড় বড় দায়িত্বশীল পদে আর সামাজিক পদমর্য্যাদায় নিজ নিজ প্রদেশে বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত দেখেছে। বাঙ্গালীর সাধনার দান চিরন্তন ও শাশ্বত। দেশ ও কালএর চতুষ্পার্শ্বে কোনও গণ্ডী টানতে পারে না—কোনও কৃত্রিম সীমারেখা টেনেও একে নিষ্প্রভ ও মলিন করা যায় না। কিন্তু নানা স্থান থেকে একে বিতাড়নের প্রচেষ্টা ও চলেছে।

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রনায়কতা, শৌর্য্য বীর্য্য, মনীষা, চিন্তা ও আদর্শের ধারা, মহানুভবতা, আর ত্যাগের দীপ্তি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উৎকর্ষ আর বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য সকল দেশেও সকল কালের মধ্যে ব্যাপ্ত। বাঙ্গালীর আদর্শ,প্রেরণা আর লক্ষ্য যে বিরাটমানবাদর্শে পুঞ্জীভূত তা সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। রোমা রোঁলা,বার্ণাডশ,আইনষ্টাইন আলডুস হাক্সলি,সিলভালেঁভি,বার্ট্রাণ্ডরাসেল প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মণীষীরা বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় অবগাহন করে স্নিগ্ধতা অনুভব করেছেন। বর্ত্তমানে বাংলার ছেলেমেয়েরা আর্থিক বিপর্য্যয়ের জন্যে উত্তমভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে না, তা ছাড়া পূর্ব্বেকার মত সেরূপ একনিষ্ঠ সাধনা, পবিত্র আদর্শ, উচ্চ আশা, উন্নত মন ও মেজাজ বর্ত্তমানের বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকের ভেতর নেই। যারা জাতির ভবিষ্যৎ জনক-জননী—তারা যদি অধঃপতনের দিকে নেমে যায়, তাহোলে বাঙালীর গৌরবের সমাধিক্ষেত্র রচিত হবে, এদিকে তোমরা লক্ষ্য রেখে জীবনের উন্নত পথে এগিয়ে যাবে, বিবেকানন্দ, নেতাজী শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতির আদর্শ নেবে, অসৎ সংসর্গে পড়ে মহৎ আদর্শের পথের দিকে দৃষ্টি আবৃত করবে না। এজন্যেই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

এডগার্ এ্যালান্ পো

রচিত

হান্স ফ্যালের এ্যাডভেঞ্চার

সৌম্য গুপ্ত

(সার-মর্ম্ম)

প্রায় একশো বছর আগেকার কথা···

রটারডাম সহরের পথ সেদিন লোকে লোকারণ্য··· ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামার ছেড়ে প্রায় দশ হাজার নর-নারী—ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত পথে এসে দাঁড়িয়েছে···তাদের সকলের দৃষ্টি আকাশ-পানে···আকাশ থেকে নামছে কিম্ভূত-ছাঁদের বিচিত্র এক বেলুন!

পথের এ লোকারণ্যে আছেন বহু বিজ্ঞ প্রোফেশর, ডাক্তার, মেয়র অর্থাৎ সহরের যত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও!

বেলুন নামছে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে···জমি থেকে যখন একশো ফুট উঁচুতে, সকলে দেখলেন, বেলুনের নীচে ঝুলন্ত যে রেলিং-ঘেরা ঝুড়ি-খাঁচা (Box), সেই ঝুড়ির মধ্য থেকে হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে উঁকি দিলো কিম্ভূত-দর্শন একজন মানুষ। তার বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখে পথের লোকজন সবাই ভয়ে সারা! বেলুনের এই সওয়ারী-মানুষটি আকারে বাঁটুল···তার কান নেই···নাকটা প্রকাণ্ড···হাত দুখানা যেন বেমালুম দৈত্যের হাত···এবং মাথায় পরে রয়েছে অদ্ভুত-ছাঁদের একটা টুপি! তাছাড়া, সবিস্ময়ে সকলে দেখলেন—বেলুনটা কতকগুলো ময়লা পুরোনো খবরের কাগজের তৈরী।

সকলের মুখেই এক প্রশ্ন,—কে এ লোক?···এমন কিম্ভূত-চেহারার মানুষ—কোথা থেকে এলো?···

লোকজনের ভিড়ে ছিল বৃদ্ধা মিসেস্ ফ্যাল্···সে বললে—আহা, ঐ টুপি—ও আমার স্বামীর। এমন টুপি দুনিয়ায় আর কারো দেখিনি! ও টুপি আমি খুব চিনি···ভোলবার নয়!···

আশপাশের পাঁচজনে বললে—কিন্তু মিসেস্ ফ্যাল্,

আজ পাঁচ বছর হলো তোমার স্বামী হান্স, আর তার তিন সঙ্গী—তারা তো নিরুদ্দেশ···এই রটারডামের পূব-সীমানায় তাদের হাড়গোড়ভাঙা দেহ পাওয়া গিয়েছিল!···

মিসেস্ ফ্যল্ বললে—কিন্তু, ও টুপি যে আমার স্বামীর—তাতে কোনো ভুল নেই!···

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে—কিম্ভূত-বেলুন আর সেই বিদ্‌ঘুটে-চেহারার মানুষটিকে···এমন সময় হঠাৎ কিম্ভূত-মানুষটি তার জামার পকেট থেকে একখানা খামে-মোড়া চিঠি বার করে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—দিয়েই বেলুন থেকে কটা বালির বস্তা ফেলে বেলুনকে হাল্কা করে, বেলুন উড়িয়ে সটান্ উর্দ্ধ-আকাশে উঠে গেল!

মেয়র ছুটে এসে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিলেন। সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো! মেয়র দেখলেন, চিঠিখানি তাঁকে অর্থাৎ রটার্‌ডাম্ সহরের মেয়র মিন্‌হার্ উণ্ডার্‌ডুক্ আর প্রেফেসার রুবাডাব্—এই দুজনকে উদ্দেশ করে লেখা! চিঠিতে লেখা—

···হান্স্ ফ্যল্‌কে নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে! পাঁচ বছর আগে তিনজন সঙ্গীর সঙ্গে সে রটার্‌ডাম্ সহর ত্যাগ করে গিয়েছিল। আমি সেই হান্স ফ্যল্—এ চিঠি লিখছি!

সহরের সাউয়ারক্র্যাট্-মহল্লায় সপরিবারে পরমসুখে আমি বাস করতুম। হাপর তৈরী করা ছিল আমার পেশা—তাতে বেশ দু'পয়সা রোজগার হতো। স্বচ্ছল সংসার—কোনো অভাব ছিল না। তারপর দেশে হলো বিপ্লব···সকলে লেখাপড়া শিখলো···তখন কারো আর হাপরের দরকার হয় না—সকলে খবরের কাগজ নেড়ে তার বাতাসে চুলী ধরায়! কাজেই আমি বেকার হলুম। শেষে এমন অবস্থা—অন্ন জোটে না! পাওনাদারদের নিত্য তাগাদা! তাদের মধ্যে তিনজন একেবারে লেপ্‌টে রইলো আমাকে—বাড়ীর দরজা ছেড়ে নড়ে না! ভাবলুম, পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করবো! মনের যখন এমন অবস্থা, তখন বিরাট একখানা আকাশ-বিজ্ঞানের বই পড়তে পড়তে আমার মাথায় জাগলো মতলব। ভাবলুম, একটা বেলুন তৈরী করে, সেই বেলুনে চড়ে পৃথিবী ছেড়ে চাঁদের দেশে যাবো! স্ত্রীকে এ কথা বললুম। শুনে স্ত্রী বললে—চাঁদের দেশ তো অনেক দূরে! আমি বললুম—হোক্ দূর, তবু যাবো। সেখান থেকে রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে আসবো! কিন্তু বেলুন তৈরী করতে অনেক খরচ। স্ত্রী বললে,—তাই করো। বেলুন তৈরী করতে খরচ যা লাগবে, সে টাকা আমি বাড়ীর জিনিষপত্র বেচে জোগাড় করে দেবো। তারপর সেই বেলুনে চড়ে আমরা সকলেই চাঁদের দেশে যাবো!

জিনিষপত্র বেচে যে টাকা পেলুম, তা থেকে কতক দিলুম সেই তিন পাওনাদারকে; দিয়ে তাদের বললুম—মতলব যা করেছি, তার জোরে লক্ষপতি হবো! তোমরা যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে চারজনে মিলে একজোটে বেরিয়ে লাখ-লাখ টাকা রোজগার করবো! খুশী হয়ে তারা বললে,—টাকার জন্য যে কাজ করতে বলবে, আমরা রাজী!

তখন সাজ-সরঞ্জাম কিনে আমরা চারজনে বেলুন তৈরী করতে লেগে গেলুম। বাইরের কেউ না জানতে পারে, সেদিকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে আমরা কাজ করতে লাগলুম।

বেলুন তৈরী হলো—চমৎকার মজবুত। বেলুনে খাবারদাবার এবং প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী রাখবার ব্যবস্থা হলো। তারপর যাত্রা করবো, এমন সময় অন্য পাওনাদাররা কড়া তাগাদা সুরু করলে—টাকা, টাকা, টাকা!···

আমি বললুম,—আরে সবুর করো—টাকা পাবে। বেলুনে চড়ে চারজনে বেরুচ্ছি, ঐ টাকার জন্যই তো!

বেলুনে দরকারী কোনো জিনিষই নিতে ভুললুম না—ব্যারোমিটার, টেলিস্কোপ, এয়ার-কন্‌ডেন্সার পর্য্যন্ত। বাড়ীর পোষা বেড়াল আর দুটো পায়রাকেও সঙ্গে নিয়ে চারজনে বেলুনে চড়ে যাত্রা করলুম।

বেলুন চলেছে আকাশ-পথে—খাশা চলেছি···হঠাৎ কি হলো জানি না—টিনের একটা ক্যানেস্তারার মধ্যে বারুদ নিয়েছিলুম ঠেসে···কি করে যেন তাতে আগুন লাগলো···অমনি বজ্রনাদ। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছিটকে পড়লুম—তিন সঙ্গী কোথায় ছিট্‌কে পড়লো, জানিনা—আমার বরাত জোর—বেলুনের ঝুড়িটা ধরে ঝুলতে-ঝুলতে, তারপর বহু কশরৎ করে কোনোমতে ঝুড়ির মধ্যে উঠে আশ্রয় নিলুম।

নিরাপদ আশ্রয়! বেলুন আকাশ-পথে উড়ে চলেছে···

ব্যারোমিটারে দেখলুম—পৃথিবী থেকে চার মাইল উপরে উঠেছি। তখন হিসাব কষতে লাগলুম। হিসাব কষে দেখলুম—এখান থেকে একশো-একষট্টি দিন লাগবে চাঁদের দেশে পৌঁছুতে। আরো উঁচুতে উঠলে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবেনা, তার কারণ, এয়ার-কন্‌ডেন্‌সার্‌ যন্ত্রটি সঙ্গে আছে। আর খাওয়াদাওয়া···সঙ্গে যা আছে, প্রচুর! কাজেই বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।

বেলুন আরো উর্দ্ধ-আকাশ-পথে চলেছে! মনে হলো, এত উঁচুতে পায়রা উড়তে পারে কিনা দেখা যাক! সঙ্গে যে পায়রা দুটি ছিল, তার একটিকে দিলুম উড়িয়ে—ডানা ঝটপট করতে করতে সে বেলুনে ফিরলো—ফিরেই মরে গেল! তখন আরেকটি পায়রা—তাকে নীচের দিকে ছুড়ে দিলুম—দিয়ে দেখি, সে দিব্যি শূন্যে ভেসে নীচে নেমে চলেছে। নামতে নামতে সে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো, ওটা বোধহয় পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছুবে।

তারপর বেলুন আরো উর্দ্ধে উড়ে চললো ঘন কালো মেঘের মধ্য দিয়ে···মেঘের আর্দ্র-বাষ্পে বেলুন হলো ভারী—বেলুন তখন নামতে লাগলো···ক'টা বালির বস্তা ফেলে দিলুম···হাল্কা হয়ে, বেলুন আবার উর্দ্ধে উঠলো।

তারপর বিদ্যুৎ-বহ্নির ভিতর দিয়ে বেলুন উড়ে চললো আরো আরো উপরে। বিদ্যুতের আঁচ বেলুনের গায়ে লাগলো না—বরাতজোর! বহুক্ষণ পরে আবার নির্ম্মল-স্বচ্ছ আকাশ-পথে চলা! হঠাৎ দেখি, পোষা বেড়ালের তিনটি বাচ্ছা হয়েছে···তাড়াতাড়ি বেলুনের ঝুড়ি-খাঁচার এককোণে একটা কাঠের বাক্সে বেড়ালগুলিকে সযত্নে তুলো চাপা দিয়ে রাখলুম।

পৃথিবী থেকে বেলুন উঠলো দশ মাইল উর্দ্ধে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো—সেই সঙ্গে নাক দিয়ে, কান দিয়ে রক্ত-ঝরা সুরু···শেষে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হবার জো! এমন সময় বাতাসের একটা জমাট স্তূপের সঙ্গে লাগলো বেলুনের ধাক্কা—আমার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে যাবে! তাড়াতাড়ি জামার পকেট থেকে ছুরি বার করে হাতের একটা শিরার মুখ কেটে দিলুম এবং সেই সঙ্গে আরো ক'টা বালির বস্তা বেলুনথেকে নীচে ফেলে দিতেই বেলুন শোঁ করে লাফিয়ে আরো অনেকখানি উপরে উঠলো! শিরা কাটার দরুণ খানিকটা রক্তমোক্ষণের ফলে, নিশ্বাস নেবার কষ্ট ঘুচলো! তারপর বেলুন ক্রমেই উর্দ্ধে উঠছে···এয়ার-কন্‌ডেনসারের দু'দিকের দুটো কপাট এঁটে বেলুনের ঝুড়ি-খাঁচাকে বেশ করে 'এয়ার-টাইট' করলুম, কেন না আরো উঁচুতে বাতাস ভয়ানক হাল্‌কা।

তারপর বেশ চলেছি, এমন সময় এক ঘটনা! বেড়ালটা জল খেতে চায়···তাকে জল দিতে গিয়ে। তাদের সেই কাঠের বাক্সের হুকে আচম্‌কা আমার হাতের ধাক্কা লাগলো। যেমন লাগা, অমনি হুক্‌ খশে বাক্সশুদ্ধ বেড়াল-গুলো গেল বেলুন থেকে ছিটকে পড়ে। মনের দুঃখে আমার চোখে জল এলো। কিন্তু, উপায় কি!···

বেলুন চলেছে···চলেছে···সকাল সাতটায় মেরু-প্রান্তের সীমা-রেখা নজরে পড়লো। দিনের আলো ফুটেছে, তবু আকাশে দেখি একরাশ নক্ষত্র। নীচের দিকে চেয়ে দেখি—পৃথিবী যেন সমতল ক্ষেত্র···দিগন্ত-রেখায় মহাসাগর।

চকিতে উত্তর-মেরু পার হলুম···তারপর উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে উঠছি···বেলুন প্রবেশ করলো হলদে-রঙের কুয়াশার মধ্যে···মনে হলো, চাঁদের কিরণরাশির ভিতরে এলুম নাকি?···

রাত্রে আরামে ঘুমিয়েছি···সকালে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, যেন একসঙ্গে এক হাজার কামান গর্জ্জে উঠেছে! কিসের শব্দ বুঝতে পারলুম না···এবং এমনি প্রচণ্ড শব্দ ভেদ করে ঘুরতে ঘুরতে বেলুন চললো! ব্যাপার কি? বেলুনের জানলার ফোকর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম···দেখি, প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র! সেই নক্ষত্রের গা ঘেঁষে বেলুন চলেছে! শিউরে উঠলুম! যদি ঐ নক্ষত্রের সঙ্গে ধাক্কা লাগতো, তাহলে আর দেখতে হতো না—বেলুন সমেত আমি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতুম!

বেলুন ক্রমশঃ আরো উঁচুতে উঠলো···তার চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র ছুটোছুটি করছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, তাদের সঙ্গে এতটুকু ধাক্কা লাগলো না—ছুটন্ত নক্ষত্রগুলোর মধ্য দিয়েই বেলুন উড়ে চললো বরাবর!

কদিন এমনিভাবে চলার পর, একদিন সকালে হঠাৎ ভীষণ শব্দ! বেলুনটা ফেঁশে গেল নাকি?···দেখি, না···তবে বেলুন আর উপরে উঠছে না, নীচে নামছে। বুঝলুম, চাঁদের কাছে এসেছি···পৃথিবীর চেয়ে এখানে

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ঢের বেশী, তাই বেলুন এগিয়ে চলেছে চাঁদের দিকে! টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখি, অদূরে চাঁদ—তবে পূর্ণিমার পুরো চাঁদ নয়—অর্দ্ধ-চন্দ্র···একদিকে ঝকঝকে আলো—আরেকদিকে নিবিড় ছায়া। আরো দেখলুম,—একটা নদী আর সেই নদীর কূলে বিচিত্র এক সহর। বেলুন থেকে আরো কটা বালির বস্তা ফেলে দিলুম···এয়ার-কনডেনসার যন্ত্রটাও ফেলে দিলুম। অনেক ভার কমলো, তবু দেখি—বেলুন নামছে। এমনিভাবে নামতে নামতে এক জায়গায় হঠাৎ বেলুনের গতি হলো বন্ধ! সঙ্গে সঙ্গে দেখি—কিম্ভূত-চেহারার একদল লোক এসে সামনে দাঁড়ালো। মানুষের মতো আকার হলেও এরা খুব বেঁটে···বিশ্রী মোটা নাক···কান নেই। আমাকে দেখে তারা ভয়ে হতভম্ব! আমার মনে হলো—এরা এই চাঁদের দেশের লোক··মানুষ নয়—চাঁদুষ! তাদের বললুম,—কি গো, সব চুপচাপ কেন··· বোবা নাকি?···কথা কও!···

তাদের মুখে কথা নেই। বেলুন থেকে নামলুম··· তারা আমাকে সেলাম করলো। আমি এগিয়ে চললুম— তারাও চললো আমার সঙ্গে সঙ্গে! আমি বুঝলুম— আমাকে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে! আমি তখন নির্ব্বিবাদে এ-রাজ্যের সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলুম। চাঁদুষদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলুম—আমার শিক্ষায় তাদের মুখে কথা ফুটলো···তারা মানুষের মতো হলো!

তারপর পাঁচ বছর চাঁদের দেশে রাজত্ব করলুম। পাঁচ বছর পরে মাটির পৃথিবীর জন্য মন হলো আকুল···পৃথিবীতে ফিরবো···নিজের দেশে···নিজের ঘরে ফিরবো! কিন্তু মনে হলো,—আমার সঙ্গের সেই তিনজন পাওনাদার বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে···হয়তো তার জন্য দেশে ফিরলে সাজা পেতে হবে। তাই এ চিঠিতে সব কথা লিখে জানাচ্ছি···মেয়রের কাছে—

ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানকার যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার দৌলতে পৃথিবীর বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারবো। মার্জ্জনা চেয়ে এ পত্র পাঠাচ্ছি এখানকার এক চাঁদুষের হাতে—সে মার্জ্জনাপত্র নিয়ে এলে তারপর পৃথিবীতে ফিরবো।···

ইতি

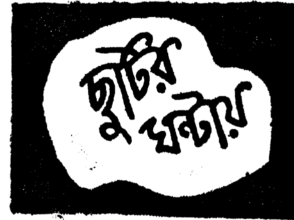
হান্স্ ফ্যাল্

···চিঠি পড়া শেষ হলে মেয়র বললেন—তাইতো, চাঁদুষটা চিঠি ফেলে দিয়ে বেলুন নিয়ে বেবাক্ সরে পড়লো! কি করে মার্জ্জনাপত্র পাঠাই, বলো?···ওদিকে মার্জ্জনাপত্র না পেলে হান্স্ তো ফিরবে না!···

মেয়র চাইলেন মিসেস্ ফ্যালের দিকে! মিসেস্ ফ্যালের মুখ মলিন।

নিশ্বাস ফেলে মেয়র বললেন,—বরাত, মিসেস্ ফ্যাল্! ···তাছাড়া হান্স্ বেচারা মহাপুরুষ···এ পৃথিবী তার যোগ্য স্থান নয়! চাঁদের দেশে রাজত্ব করছে—চাঁদের দেশে থেকে সেখানে সে রাজত্ব করুক···এছাড়া আর উপায় কি!···

—



চিত্রগুপ্ত বিরচিত

এবারে তোমাদের আরো একটি মজার খেলার কথা বলি। এ খেলাটি হলো—মোমবাতির 'সী-স' (See-Saw) বা 'দোলন-দাঁড়'!

মোমবাতির দোলন-দাঁড়—

'সী-স' (See-Saw) কি, তা বোধ হয় তোমরা জানো···নানা পার্কে এখন ছোটদের দোল-খাবার জন্য এই সব 'সী-স' (See-Saw) বা দোলন-দাঁড়ের ব্যবস্থা হয়েছে। পরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তোমরাও তেমনি বিচিত্র খেলার একটি 'দোলন-দাঁড়' (See-Saw) তৈরী করতে পারো। এটি তৈরী করার জন্য বড় একটি মোমবাতি নাও···সে-বাতির দু'প্রান্ত কলম-কাটার ভঙ্গীতে কেটে দু'দিকে একটু করে পলতে বার করে রাখবে। এবারে দু'টি সমান-মাপের কাঁচের গ্লাস নাও···

গ্লাস দুটিকে কোনো সমতল টেবিল বা মেঝের উপর পাশা-পাশি সাজিয়ে রাখো ; তবে, দু'টি গ্লাসের মধ্যে সামান্য



একটু ফাঁক যেন থাকে—উপরের ঐ ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে। এখন ঐ মোমবাতির মাঝা-মাঝি অংশে লম্বা একটি ছুঁচ বা লোহার শিক-কাঠি বিঁধে, উপরের ছবির ভঙ্গীতে পাশাপাশি-রাখা ঐ গ্লাশ দুটির উপর বাতিটি রাখো। তারপর কার্ডবোর্ড থেকে উপরের নক্সার ছাঁদে অবিকল একমাপের দু'টি পুতুল কেটে নিয়ে গ্লাসের-উপর-রাখা মোমবাতির দু'প্রান্তে বসাও। পুতুলের বদলে দু'টি একই ধরণের ঘুঁটিও ব্যবহার করা যেতে পারে…তবে, সে দু'টির ওজন আর সাইজ যেন সমান হয়, না হলে এ খেলাটি জমবে না মোটেই। যাই হোক, এভাবে দুটি গ্লাসের-উপর-রাখা মোমবাতিটির দু'প্রান্তে পুতুল দু'টিকে বসিয়ে দেশলাই দিয়ে বাতির দু'প্রান্তের পল্‌তেয় আগুন জেলে দাও। দু'প্রান্তের পল্‌তে জলার সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকেই টুপ্‌ টুপ্‌ করে বাতির মোম ফোঁটা ফোঁটা গলে পড়তে থাকবে। তবে মজা এই যে, দু'দিকের পল্‌তে সমানভাবে গলবে না—একদিকে কম গলবে, আরেকদিকে বেশী গলবে—জলন্ত বাতি থেকে মোম গলে পড়ার এই কমবেশী হবেই। বাতির যেদিকের মুখ বেশী গলে পড়বে, সেদিকটা অন্যদিকের চেয়ে হবে হাল্‌কা…কাজেই, বাতির ভারী-দিক নীচের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং হাল্‌কা-দিক উঁচু হয়ে উঠে যাবে উপরদিকে। তাছাড়া, বাতির ভারী-দিক নীচে হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, হাল্‌কা-দিকের পল্‌তে জ্বল্‌তে থাকবে বেশী তেজে এবং মোম গলে পড়বে তাড়াতাড়ি। তখন বাতির নাচু দিকটির মোম গলবে কম। এভাবে বাড়ির দু'দিকের মোম কম-বেশী গলে পড়বার ফলে—গ্লাশের-উপর-রাখা পুতুল-বসানো বাতির ভারসাম্যে (Balance of the candle) অদল-বদল ঘটবে—অর্থাৎ, একবার এদিক নীচে নামবে আর ওদিক উপরে উঠবে এবং সঙ্গেসঙ্গেই, ওদিক নীচে নামবে আর এদিক ওপরে উঠবে। ওঠা-নামার এই ব্যাপার ক্রমান্বয়ে চলবে—তার ফলে, বাতির দু'দিক নামবে-উঠবে —'সী-স' (See-Saw) অর্থাৎ 'দোলন-দাঁড়' খেলায় এই রকমই তো ত্যাখো।

এ খেলাটি দেখাবার সময় বাতির দুই প্রান্তের তলায় দু'টি পাত্র রাখবে—বাতির মোম গলে সে পাত্র দুটিতে পড়বে—টেবিলে বা মেঝেয় দাগ ধরবে না। তাছাড়া এ খেলা দেখানোর সময় হুঁশিয়ার থেকো—অসাবধানতার ফলে যেন বাতির আগুনের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগে তোমাদের অঙ্গে কিম্বা জামা-কাপড়ে !

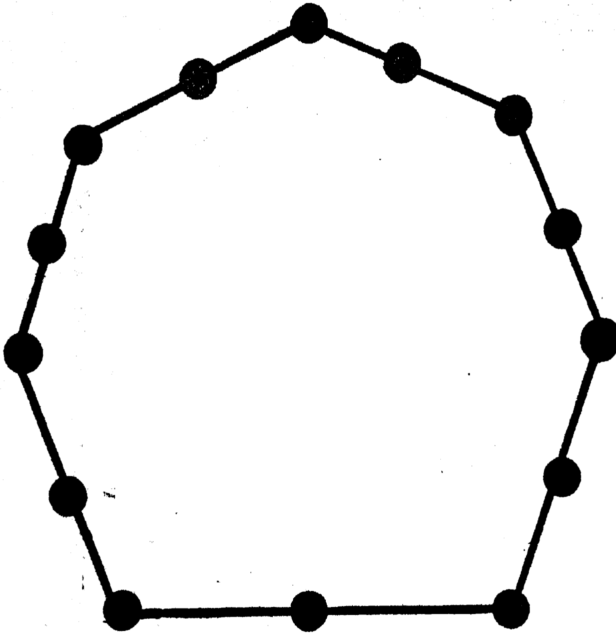
এবারে নিজেরাই পরখ করে ত্যাখো—মজার এই জলন্ত মোমবাতির দোলন-দাঁড়' (See-Saw) খেলাটি। ভালো-ভাবে রপ্ত করতে পারলে বিচিত্র-অভিনব এই খেলাটি দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই অন্য সবাইকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিতে পারবে !

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

চাকতির হেঁয়ালি ঃ

পরপৃষ্ঠার ছবিতে সাত-কোণা পাঁচিল-ঘেরা এলাকাতে গোল-আকারের যে চৌদ্দটি কালো-কালো চাকতি দেখবে, সেই চাকতির প্রত্যেকটির মধ্যে ১ থেকে পর-পর ১৪ অবধি সংখ্যার এক-একটিকে এমনভাবে বেছে নিয়ে সাজিয়ে বসাও, যাতে প্রতি কোণের পাঁচিলে পাশা-পাশি তিনটি চাকতির তিনটি বিভিন্ন সংখ্যাকে একত্রে যোগ দিলে যোগফল হবে মোট ১৯। বলতে পারো, ১ থেকে ১৪ অবধি চৌদ্দটি সংখ্যার এক-একটিকে কিভাবে



উপরের পাঁচিলের সাতটি লাইনের প্রত্যেকটি চাকৃতির মধ্যে সাজিয়ে বসালে ঐ যোগফল মিলবে ?

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

তিন বন্ধু থাকে একটি ঘরে। সে ঘরে মাত্র একটি দরজা আছে। দু'জনের কাছে আছে মাত্র দু'টো তালা। প্রত্যেক তালারই দু'টো করে চাবি আছে। তিন বন্ধুতে ঘরে তালা এঁটে দিয়ে একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলো···কে কখন ফিরবে, তার কিছু ঠিক নেই। অন্য কোনো বাড়তি চাবি না ব্যবহার করে, কিভাবে তারা প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা এসে ঘরে ঢুকতে পারবে—বলো তো ?

রচনা :—বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

পৌষ মাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির" উত্তর ঃ

১। হেঁয়ালি-ছড়ার উত্তর :

লাঠি।

২। তাসের ধাঁধার উত্তর ঃ

পাঁচখানি তাসকে পাশাপাশি দুই ধরণে সাজানো যাবে—হয় ৩ ৯ ১ ৫ ৭, নয় তো ৫ ৭ ১ ৩ ৯—এই ভঙ্গীতে। উভয়-ক্ষেত্রেই, মোট সারি-সংখ্যার গোড়ার ও শেষের দিকের ৩৯ এবং ৫৭—এই দু'জোড়া সংখ্যার গুণফল থেকে মাঝখানের ১ সংখ্যাটিকে বিয়োগ করলে, অঙ্কটি দাঁড়াবে ২২২২ এবং সহজেই হয়ে যাবে এ সমস্যার সমাধান !

৩। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালি-ছড়ার উত্তর :

জামা।

'হেঁয়ালী-ছড়ার' সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৩। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৪। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৫। অনীতা, অনুরাধা, অরূপ ও অঞ্জন সেন (আগড়পাড়া)
৬। কৃষ্ণা, গীতা, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুটু (?)
৭। বেণু ও রুণু (জগদলপুর)
৮। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৯। দেবাশীষ মৈত্র, মানি, প্রভাতী, শুক্লা, বাবুসাহেব (কলিকাতা)
১০। পিণ্টু, বাপি ও বুতাম গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)

'তাসের ধাঁধার' সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। দীপ্তিতোষ (চন্দননগর)
২। দেবাশীষ মৈত্র, মানি, প্রভাতী, শুক্লা, বাবুসাহেব (কলিকাতা)
৩। পপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৪। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৫। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৬। শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (লক্ষ্ণৌ)
৭। পিণ্টু, বাপি ও বুতাম গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৮। রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'হেঁয়ালি-ছড়ার' উত্তর দিয়েছে ঃ

১। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
২। বেণু ও রুণু (জগদলপুর)
৩। দেবাশীষ মৈত্র, মানি, প্রভাতী, শুক্লা, বাবুসাহেব (কলিকাতা)
৪। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৫। শুভা, সোমা, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (লক্ষ্ণৌ)
৬। পিণ্টু, বাপি ও বুতাম গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৭। কুলু মিত্র (কলিকাতা)

আজব দুনিয়া

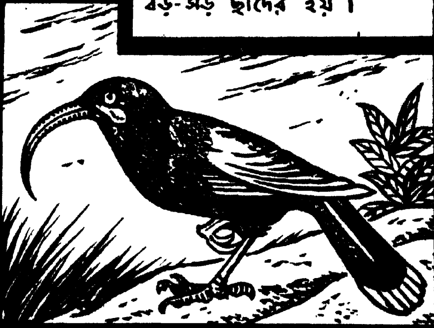
জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



লোমশ সীল : দক্ষিণ সেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের হিম-শীতল সাগরজলের বাসিন্দা…মেরু-অঞ্চলের সীলমাছের জাতভাই। তবে এদের গায়ের চামড়া মসৃণ-তেলা ধরণের নয়—সারা দেহ ঘন-লম্বা লোমে ঢাকা। এ লোমে চমৎকার পশমী-কাপড় তৈরী হয়—তাই এদের লোমের দাম ও চাহিদা খুব বেশী। তাছাড়া এদের দেহের চর্ব্বি ও মাংস থেকে মানুষ সংগ্রহ করে খাদ্য আর তেল। শীকারী-মানুষের অত্যাচারে এদের বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এরা নিরীহ স্তন্যপায়ী ও মেরুদন্তী জীব…বিরাট দেহের ভার বহে জলে-স্থলে এরা চটপট চলাফেরা করতে পারে না। মাছের মতো এদেরও ন্যাজ ও পাখনা থাকে। আকারে এরা বেশ বড়-সড় ছাঁদের হয়।

হুইয়া : বিচিত্র এক জাতের পাখী—বাস নিউজিলণ্ডে। এদের পালক কালো-রঙের পুচ্ছপ্রান্তটুকু শুধু শাদা-রঙের। পুরুষ-পাখীর ঠোঁট ছোট এবং মোটা, স্ত্রী-পাখীর ঠোঁট দীর্ঘ এবং ধারালো। মরা-গাছের গুঁড়িতে যে-সব গুল্ম জন্মায়, সেই গুল্ম এরা ঠোঁটের সাহায্যে খুঁটে বার করে খায় পুরুষ-পাখীরা মোটা-ঠোঁটে গুল্মাদি পিষে চূর্ণ করে, স্ত্রী-পাখী লম্বা-ধারালো ঠোঁটে সে গুল্ম ঠুকরে বার করে গুঁড়ির কোঠর থেকে—তখন কারো আহারে অসুবিধা হয় না। এমনি মিলে-মিশে থাকে এরা।





কানা-কীট : এরা এক বিচিত্র জাতের কীট-দেহ এদের সাপের মতো… পা নেই… দেখতে কীটের মতো হলেও, জাতে সরীসৃপ; নামে 'কানা' হলেও এদের দুটি চোখ আছে বিন্দুর মতো—সে দুটি চোখ 'পল্লবে' ঢাকা; এরা চলে অত্যন্ত শ্লথ-মন্থর গতিতে। নিরীহ জীব—ধুলো-মাটিতে বাস করে।

পশ্চিমবঙ্গে তাঁত-শিল্প

শ্রীশচীপতি রায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁত-শিল্পের উন্নয়নের জন্য বর্ত্তমানে বিশেষ জোর দিয়াছেন। পরাধীন ভারতেও তাঁত-শিল্পের উপর একটা বিশেষ যত্ন নেওয়া হত—যার জন্য সেই সময়ে তাঁতের কাপড় প্রায় প্রতিটি ঘরেই শোভা পেত। ৪০ সুতার বুনানী হতে ১৮০ সুতার কাপড় অনায়াসে তাঁতীরা বুনতে পারতো। দামেও বেশ সস্তা অথচ কাপড়ের উৎকর্ষতা সত্যই সকলকে আকর্ষণ করতো। তাঁতীদের একটা পৃথক সমাজই সৃষ্ট হয়েছিল। সমবায় সমিতি মারফৎ তাঁতীরা সংঘবদ্ধ হয়ে রীতিমত সুশৃঙ্খলরূপেই কাজ করছিল। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ অবশ্য পূর্বে এত বেশী ছিল না। তবে সাধারণ লোকের সাথে এই তাঁত-শিল্পীদের মনের যেন একটা সহজ যোগ ছিল, যার জন্য সকলেই তাঁতের কাপড়কে যে কোন শুভ কাজে ব্যবহার করতে চাইতো।

কিন্তু যন্ত্র-শিল্পের অগ্রগতির সাথেসাথেই যেমন বহু শিল্পের ওপরই তার প্রভাব বিস্তার করেছিল, ঠিক তেমনই দেখা গেল যে বাঙলা দেশেও বেশ কয়েকটা কাপড়ের মিল খোলার সংবাদ বেরুতেই পরিবর্ত্তনশীল মানুষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠ্‌লো। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবেই এই শিল্পটি সেই সময় থেকে মানুষের মনে একটা বিশেষ রেখাপাত করে। ফলে মিলের কাপড়ের প্রতি অনেকের আগ্রহ বেড়ে গেল। তাঁতজাত কাপড়ের দাম অনেক বেশী বলে মনে হ'ত—যখন মিল-মালিকরা একযোগে প্রতিযোগিতার জন্য মূল্য কমিয়ে দিল। সুতরাং ছা-পোষা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক চাপে ক্লিষ্ট বহু লোককেই মিলের কাপড়ের ওপর নির্ভর করতে হ'ত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁত-শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহের সহিত এই শিল্পটির সাথে অন্যান্য বিষয়েও সহযোগিতার দ্বারা তাঁতীদের প্রত্যক্ষভাবে যন্ত্রপাতি ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ক্রমশঃ এই শিল্পটিকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় করার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। সরকারের সমবায় দপ্তরকেই বিশেষ ভূমিকা নিতে হ'ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি স্থাপনের জন্য তাঁত-শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে জন-সাধারণও তাদের সাথে বিশেষভাবে সাহায্যের জন্য সকলকে এই কাজে আত্ম-নিয়োগের জন্য আহ্বান জানায়।

বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলন অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আজ ৩.৫৫ লক্ষ লোক তাঁত-শিল্পে নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে এ রাজ্যে ১'৩৫ লক্ষ তাঁত আছে। আনন্দের কথা যে এই ১'৩৫ লক্ষ তাঁতের মধ্যে '৭৭ লক্ষ সমবায় তাঁত-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে সরকার



দমদম ক্যান্টনমেন্টে-কৃষি-গোপালন শিল্প-শিক্ষালয়ের তাঁত-বিভাগের উদ্বোধন

শ্রীভূপতি মজুমদার (শিল্প মন্ত্রী), শ্রীএম, কে, মুখোপাধ্যায় (ডেপুটি-ডাইরেক্টর, টেক্সটাইল-বিভাগ) ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

হইতে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি তাঁতে ৩ শত টাকা করিয়া ঋণ প্রদান করা হয়। সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ৭৭ হাজার তাঁতের জন্য ২৩১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সমবায় তাঁত-শিল্প ৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে মূলধন পাইয়াছে। এই ৬৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৮ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার সরকারী হস্ত-চালিত তাঁত-সংস্থার পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্য ৪৮ লক্ষ টাকা রাজ্যের তাঁত-শিল্পের কো-অপারেটিভ-এর জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ টাকাও কো-অপারেটিভগুলি উৎপাদনের জন্য ব্যয় করিতে পারেনি। কারণ প্রাপ্ত ঋণের মধ্যে মোট টাকার শতকরা ২৫ ভাগ ও উহার সুদ ফেরৎ দেওয়ায় এবং ১৯ লক্ষ টাকা রিবেটের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আজ পর্য্যন্ত রয়েছে। সুতরাং সমবায় শিল্পে ২০ লক্ষ টাকা বর্ত্তমানে খাটিতেছে। যদিও এর চাইতেও আরো ব্যাপক আয়োজন বর্ত্তমানে দরকার। তাই কেবল সমবায় তাঁত-শিল্প ক্ষেত্রে তৈয়ারী-কাপড় কেনা-বেচা ছাড়া অন্য কোন স্থানে এই কার্য্যের প্রসারতা সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড রাজ্যের তাঁত-শিল্পের জন্য তাঁতীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রাদি, যেমন সূতা ইত্যাদি সরবরাহ করিতে পারে নি।

তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে সরকারের নিকট কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে সরকারী দপ্তরে সমবায় সমিতিগুলির রিবেটের টাকা—যাহা আজ পর্য্যন্ত বাকী পড়িয়া আছে তাহা —প্রদানের জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। নচেৎ তাঁত-সমিতিগুলি আথিক অসুবিধায় অনেক সময় কাজ বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। অল্প পুঁজি নিয়ে এই সব তাঁতীরা তাঁত-শিল্পে নামিয়াছে—সুতরাং এ বিষয়ে সরকারী দপ্তর যদি বর্ত্তমানে একটু যত্ন নেন, তবে সত্যই এ দিকটা উজ্জ্বল হবে সন্দেহ নাই। গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁত-শিল্পের উন্নয়ন বাবদ আরো ২৫ লক্ষ টাকা দরকার—পূর্বের তালিকা অনুযায়ী—অতএব এ বিষয়ে আজ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই টাকা মঞ্জুর করা উচিত।

সারা ভারতে মোট তাঁতজাত কাপড়ের উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ—এই পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা হল যে—এই রাজ্যের হস্ত-চালিত তাঁতের সংখ্যা হল ভারতের মোট হস্ত-চালিত তাঁতের সংখ্যার ৫ শতাংশ মাত্র। আনন্দের এবং আশার কথা যে আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হস্ত-চালিত তাঁতের জন্য ৩ কোটি ৬৮লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আশা করা যায় ঐ সময়ে উৎপাদনের লক্ষ্য ২৪ কোটি গজে পৌছাবে।

আজকাল তাঁত-শিল্পকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতি বছরে একবার তাঁত-সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সময় রিবেটের জন্য আর্থিক সাহায্য তাঁতীদের দেওয়া হয়। এই বৎসরেও তাঁত সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। বর্ত্তমান বছর "অষ্টম তাঁত সপ্তাহ" হিসাবে তাঁতীরা পালন করছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলে ১৯৫২ সালে এই শিল্প অত্যন্ত সঙ্গীণ অবস্থায় পড়ে। এই সময় কয়েক লক্ষ লোক এই শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আথিক কাঠামোর ওপর এক বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়। সরকারের সহানুভূতি এই সময় বিশেষভাবে তাঁতীদের প্রচণ্ড আঘাত হতে বাঁচিয়ে রাখে। এদের জন্য সরকার কাপড়ের কলগুলির ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করেন। এই করই "সেস-তহবিল" নামে পরিচিত হয় এবং এই সেসের টাকা এখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তাঁত-শিল্পের উন্নয়নের এবং তাঁতীদের প্রত্যক্ষভাবে পুনর্ব্বাসনের বিভিন্ন পরিকল্পনা খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। বর্ত্তমানে প্রতি তাঁতে গড়পড়তায় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে।

এ কথা এখনো ভোলা যায় না যে এমন একদিন ছিল, যখন বাংলার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছিল—কেবল "ঢাকাই মসলিন" ও "ঢাকাই জামদানী" কাপড়ের উৎপত্তিতে। আবার এরও পরে "বালুচরী" "বুটিদার" শাড়ী মৌলিক বৈশিষ্ট্যে মহিলা সমাজের সকল স্তরেই প্রসিদ্ধি পেয়ে বাঙলার কাপড় উৎপাদনে তাঁত-শিল্পীদের কৃষ্টি ও শিল্প নৈপুণ্যকে চিরস্থায়ী স্থাপত্যে মহিমান্বিত করে রেখেছে। তাঁতের কাপড় গ্রামের সেই নাম-না-জানা ছোট মেয়েটিও যাতে পায় তার জন্য সরকার আজ ভ্রাম্যমান বিক্রয়-কেন্দ্রের ব্যবস্থা রেখেছেন। ফলে শহরের লোকই কেবল এই কাপড় কেনার সুযোগ পাবে—যেমন ঠিক গ্রামের

ভেতরেও ছোট্ট ছোট্ট কুটীরের পল্লীবধূরাও তাদের সুবিধা মত রঙ বেরঙের বাহারি শাড়ী পছন্দ করে নিতে পারবে। 'কল্যাণী'তে সম্প্রতি একটি সূতা কল তৈরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে—এখন থেকে কাঁচা মাল সরবরাহ করার একটা ব্যবস্থাও সরকারের দপ্তরে রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরো একটি সূতা কল খোলা হবে। এই সূতা উৎপাদন ঠিকমত হলে বর্ত্তমানে তাঁত-শিল্পের কাঁচা মালের যে সব অসুবিধা রয়েছে তা অনেকাংশে দূর হবে।

সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ দানের জন্য সরকার তাঁতীদের সহজ কিস্তিতে পরিশোধের সর্ত্তে শেয়ার মূলধন বাবদ অর্থ ঋণ দেন। এর ফলে ১৯৫৫-৬০ সনে দেশে তাঁতীদের সংখ্যা (সমবায় সংস্থ) অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৫৫ সনে সমবায় সমিতিগুলির অধীনে ৬ লক্ষ ৮২ হাজার তাঁত ছিল। ১৯৬০ সনে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে ১২ লক্ষেরও বেশী হয়েছে। ঐ কয় বৎসরেই তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ১১০ কোটি গজ হইতে বর্দ্ধিত হয়ে ১৯০ কোটি গজ অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ২৫ শতাংশেরও অধিক হয়েছে। তাঁতীদের সমবায় সমিতিগুলির বিক্রীত শেয়ার মূলধনের পরিমাণও ৫০ শতাংশের অধিক হইয়াছে।

সমবায় সমিতিতে যে সব তাঁতী যোগ দেয়, তাদের উৎপাদনের জন্য মেসিন ও অন্যান্য উন্নত ধরণের জিনিষ-পত্রাদি দেওয়া হয়ে থাকে সরকারী দপ্তর হতে। এর মাল বিক্রয়ের জন্য 'বিক্রয়-কেন্দ্র' স্থাপন ও মাল চলাচলের জন্য যানবাহন ক্রয়ের জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। বিদেশেও যাতে এই ব্যবসার প্রসার হয় তার জন্য সরকার বিশেষ উদগ্রীব। ফলে তাঁতীদের বিশেষ কোন প্রকার অসুবিধা এখন আর নেই।

তাঁত-শিল্পের জন্য কারিগরী কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকার "বারাণসী" ও 'সালেমে' কারিগরী-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। আর এ ছাড়া তাঁত-শিল্পের নতুন ডিজাইন, নক্সা, কারিগরী বিষয় ও উৎপাদন বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বারাণসী ও কাঞ্জীপুরমে 'নিখিল ভারত তাঁত পর্ষৎ—তাঁত সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করেছেন। তাঁতীরা নিজেরা যাতে বাসস্থান নির্ম্মাণে সুবিধা পায় তার জন্যও সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁতীরা সহজ কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করে এই সকল বাসগৃহের মালিক হতে পারে। গত বৎসর মার্চ মাস পর্য্যন্ত তাঁতীদের জন্য মোট ৪,৪৮৭টি বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮টি বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে এবং বর্ত্তমানে ১,৭৭৯টির নির্মাণ কার্য্য চলছে।

তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও সমবায় দপ্তরের উপ-মন্ত্রী শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নাম আজ সত্যই উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনিশীথ চক্রবর্ত্তীও সম্প্রতি তাঁত-শিল্পের জন্য বহুভাবে সক্রিয় সহযোগিতা দেখিয়ে আসছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী সকল সময়ে এ বিষয়ে নানা রকম প্ল্যান এবং কারখানা নির্মাণের নক্সা ইত্যাদি বিনামূল্যে তাঁতীদের দিয়া থাকেন।

তাঁত শিল্পের উন্নয়ন তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তাঁত-শিল্পীদের সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ এবং শিল্প হিসাবে বাঙলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পুনরুত্থানে সুধী সমাজ নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই। তবুও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতাও এ বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান।





একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সাটটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সাট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে **সাদা** ও **উজ্জ্বল** করে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

S. 267-X52 BG

মেয়েদের কথা

সিঁদুর যাদের মুছে গেল

নমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

উমা বাপের বাড়ী এলো। দীর্ঘ তিন বছর পর চার ভাই-এর কোলে ছোট বোন উমা আবার ফিরে এলো বাপের বাড়ীর চিরপরিচিত পুরোণ পরিবেশে। উমাকে দেখেই উমার মা চোখে আঁচল চাপা দিলেন, মায়ের বুকে মাথা রেখে আবার উমা কাঁদলো নতুন করে স্বামীর শোকে। বৌদিরা ঘিরে দাঁড়ালো ননদের চার পাশে, মুখে চোখে তাদের ফুটে উঠেছে একটা "আহা" "আহা" চিহ্ন, মনে হচ্ছে উমা যেন কত দুঃখী তাদের কাছে, তাদের সব আছে উমার কিছু নেই। বৌদিদের এই 'আহা' টুকুই পাথেয় করে উমাকে বাঁচতে হবে সারাজীবন। বৌদিদের গলা জড়িয়ে উমা বলে, 'আবার ফিরে এলাম বৌদি তোমাদের কাছে, তোমরা তো আগে অনেকবার আসতে বলেছো—আসিনি, তাই বোধহয় ভগবান দর্প চূর্ণ কোরলেন।' হ্যাঁ সত্যিই আসেনি উমা, মাত্র চার বছরের বিবাহিত জীবনে প্রথম বছর মাত্র কয়েকবার স্বামী সুমন্তসহ বাপের বাড়ী এসে থেকে গেছে দু-একদিন। তারপর এই দীর্ঘ তিন বছর ধরে বহুবার চিঠিতে অনুযোগ জানিয়েছে বৌদিরা না আসার জন্যে, কিন্তু উমার আর আসা হয়নি। যখনি বাপের বাড়ী আসতে চেয়েছে সে—সুমন্ত অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়েছে, বলেছে'—'বেশ তো যাওনা বাপের বাড়ী—কত আনন্দ করে বৌদিরা রেঁধে খাওয়াবে, আর আমি? যখন ইচ্ছে হবে খাব, না হবে খাব না।' ব্যস্ এই কথাতেই আর যাওয়া হয়নি উমার। তবুও বিয়ের পর যে কবার এসেছে বৌদিদের সঙ্গে হৈ হৈ করে সিনেমা দেখে আনন্দে দিন কাটিয়েছে সুমন্ত। আড়ালে সবাই বলেছে,—'না, উমার তপস্যা সার্থক হয়েছে, তাই এমন স্বামী পেয়েছে।' সে দিন আজ ফুরিয়ে গেছে উমার জীবনে। হঠাৎ মারা গেল সুমন্ত তার আদরের উমাকে মাত্র তেইশটা বসন্তের ছোঁয়া লাগা যৌবনে একা রেখে, তাই এবার আর বৌদিদের আহ্বান নয়, অশৌচ কাটিয়ে একাই চলে এলো উমা বিনা আমন্ত্রণে বাপের বাড়ী। কিন্তু উমা তুমি ছেলেমানুষ, তুমি জান না তোমার এই অনাহূত আগমনে বৌদিরা খুশী হয়নি মোটেই। তারা শুধু একবার তাকিয়েছিল তোমার সিঁথির দিকে, কিন্তু যখনই দেখলো তোমার সিঁথি থেকে সুমন্ত মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে—তখনই তো তুমি অপাংক্তেয় এ সংসারে সকলের চোখে। ওকি উমা তুমি হাসছো কেন? ভাবছো, যাঃ তাই হয় কখনও? বৌদিরা, মা, দাদারা আমায় কত ভালবাসে, তারা কতবার আনতে চেয়েছে, আমি আসিনি দেখে কত রাগ করেছে। তারা আজ অখুশী হবে কেন? তারা খুব খুশী হয়েছে, তবে দুঃখ পেয়েছে সবাই, পাবে না? তারা সকলেই যে সুমন্তকে ভালবাসত। কিন্তু সেটা যে উমার কতবড় ভুল ধারণা সেটা বোঝা গেল কদিনেই। ভোরে উমা ওঠেনি দেখে বড় বৌদি মুখ ভার কোরলেন, বললেন,'ঠাকুরঝি, সারাদিন কাজ তো শুধু খাওয়া। সকালে উঠে একটু রান্নার দিকটা দেখলেও তো কাজ হয়? আমরা ছেলেপুলে নিয়ে ব্যস্ত, কদিক সামলাই বলতো?' একটু অবাক হয়ে উমা তাকিয়ে থাকে বড় বৌদির মুখের দিকে। কিছুতেই বলতে পারে না যে বৌদি তুমি আমায় খাওয়ার খোঁটা দিলে? আমি তো শুধু একবেলা দুটি নিরামিষ খাই। কিন্তু কিছুই বলা হয় না উমার। শুধু উদ্গত চোখের জল চাপতে চাপতে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে। এমনি ভাবেই বাপের বাড়ীর জীবনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় বিধবা মেয়েরা। শুধু বাপের বাড়ীতেই নয়, বিধবারা সব পরিবারেই বাড়তি জঞ্জাল, তাদের শুধু মেনে চলতে হয় একটার পর একটা অনুশাসনের বেড়া। বিধি-নিষেধের সীমা ডিঙ্গিয়ে চলার মত দুঃসাহস খুব কম বিধবারই হয়।

শুধু উমা নয়, এমনি আরও অনেক উমাই সংসারে চোখে পড়ে, তারা শুধুশুধুই বা খাবে কেন? হলই বা নিরামিষ, তার খরচ নেই? তাই বিধবা ননদের ঘাড়ে বৌদিরা ফেলে দিয়ে হাঁফ ছাড়ে হাজার রকমের কাজের ফর্দ্দ। একটু একটু করে সব কাজ উমার ঘাড়েও এসে পড়লো। অফিস-ফেরৎ মেজদা ডাকেন,—"উমি—উমি শোন্।" অনেকদিন পর মেজদার স্নেহের ডাক শুনে ছুটে যায় উমা। বহু আগে বিয়ের পরও দৌড়ে দৌড়ে যেত মেজদার ঘরে। পিছন থেকে ছোট বৌদির টিপ্পনী ভেসে আসে,—'মরণ আর কী, বিধবা হয়ে যেন স্ফূর্তি বেড়েছে।' চলমান উমার গতি শ্লথ হয়ে আসে। মেজদার ঘরে বসে আছে মেজদা আর মেজবৌদি দুজনেই। উমাকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মেজদা বলেন,—'দেখ উমা, তোর হাতের বালা দুটো খুলে তোর বৌদির কাছে রেখে দে। এখন আর গয়নাপরা মানায় না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে।' কান্না-ভেজা গলায় উমা আঁৎকে ওঠে—ওকি মেজদা 'এ বালা যে তোমার ভগ্নীপতি আমায় সখ করে গড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল যেন কোনদিন না খুলি এ বালা। তা ছাড়া পাঁচজনে আবার কি বলবে, আমি তো কারও বাড়ী যাই না।'

'তা হোক, বিধবার বালা পরতে নেই, আর সুমন্তই যখন নেই, তখন তার বালা দিয়ে কি হবে?' বলতে পারে না উমা—সুমন্ত নেই তো কি হবে? তার স্মৃতি তো মুছে যায়নি উমার মন থেকে, আর খালি হাতে উমাকে যে বড় বিশ্রী দেখায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না উমা—মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় এই মেজদাই একদিন মেরেছিল তাকে খালি হাত দেখে, বলেছিল,—'উমি তোর অমন গোল গোল হাত খালি রাখিস না, বিশ্রী দেখায়।' একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে উমার দুর্ব্বল হৃদয়ের পাঁজরা ভেদ করে। আস্তে আস্তে সুমন্তর সখের বালা জোড়া খুলে জমা দিয়ে আসে মেজবৌদির কাছে। কিন্তু উমা কিছুতেই বুঝতে পারে না কেমন কোরে এটা সম্ভব। সে যে অনেক পড়েছে। সুমন্ত তাকে পড়িয়েছে নানান দেশ-বিদেশের সাহিত্য, কোন দেশের ইতিহাসে এমন কোন নজীর তো লেখা নেই যে স্বামী মারা গেলে বাইরের রূপে-রসে গন্ধেভরা পৃথিবী থেকে তার সব অধিকার মুছে যাবে? স্বামীর বিরহ যাতনা সহ্য কোরবে, কিন্তু তোমার গতি শুদ্ধ হবে কেন? কেন উমার বৌদিরা বলবে, তুমি আজ বাড়ী থাক ঠাকুরঝি, আমরা সিনেমায় যাই, ঠাকুর-দেবতার বই এলে তুমি যেও।'

আজ উমা সবই বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে বিয়ের পর যখন সে বাপের বাড়ী আসত তখন কেন তার অত আদর ছিল, কেন বৌদিরা ভাল ভাল রেঁধে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, কেন সুমন্ত তাকে রাখতে না চাইলে বৌদিরা ঠাট্টা কোরে বলতো,—'বাব্বা, বৌ যেন আর কারও হয় না, একা আপনারই হয়েছে?' আজ উমার জীবন থেকে সে সব দিন চলে গেছে। সে সব দিন ছিল তার সিঁথির সিঁদুরের দিন। সকলেই সমীহ কোরত তখন ঐ রক্তলাল রেখাটুকুকে। সবাই জানতো ঐ সিঁদুরের অধিকারী বর্তমান, অনাদর তাই হয়নি সেদিন। কিন্তু যেদিনই উমার সিঁথি থেকে মুছে গেল সুমন্তর দেওয়া লালের নিশানা, সেদিনই সে হয়ে গেল জগৎ-সংসারের চোখে এক বাড়তি আসবাব, সবাই যেন বার বার বলতে শুরু কোরল ঐ মোম-সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।' সকলের থেকে সে যেন আলাদা, সে যেন অপবিত্র। হলই বা তার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মাত্র তেইশটা বসন্তের হাওয়া, হলই বা সে প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরা একটা সজীব লতা, কেউ তাকে ক্ষমা কোরবে না, কেউ তাকে টেনে নেবে না সকলের মাঝখানে। সে যে আর কুমারীও নয়, সধবাও নয়—সে বিধবা, তার গণ্ডীর সীমারেখা টেনে রেখে গেছেন আমাদের সমাজ-সংস্কারকের দল অনেক আগে থেকে। সে গণ্ডী পেরিয়ে চলা-ফেরার দুঃসাহস হয় না কারও। সমাজ তাদের চোখ রাঙ্গাবে। উমা তবু ভুল করে। বার বার হোঁচট খেতে খেতে নিজের সীমানা বুঝে নিতে চেষ্টা করে, তবু ভুলে যায়। সম্বিৎ ফেরে বৌদিদের ধমক খেয়ে—'ছিঃ ঠাকুরঝি, তোমায় না টেনেচুল বাঁধতে বলেছি? তুমি বিধবা। অথবা 'পাড় দেওয়া শাড়ী তুমি পরো না উমা, তোমায় মানায় না', 'ও বাড়ীর মিনুর বিয়েতে উমা যেন না যায়, কোথায় কি শুভ জিনিষে হাত লেগে যাবে একটা অমঙ্গল কিছু হোক আর কী?' এমনি হাজার বিধান আছে বিধবা উমার জন্যে। তার সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে বার বার সুমন্তকেই মনে পড়ে উমার। অন্তরের মণি-কোঠায় ঘুমন্ত সুমন্তকে ডেকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে'

'তুমি কি দেখতে পাও না আমার কি কষ্ট ? একাদশীর দিন আমি যে ক্ষিদেয় ছটফট করি, কেউ কিছু দেয় না। কেন—কেন আমি কি করেছি ? কেন তুমি এভাবে হঠাৎ চলে গেলে আমায় বিধবা করে ? কিন্তু যদি আমি মরে যেতাম তোমার আগে ? তুমিও কি ঠিক আমারই মত বাঁচতে পারতে ?'



হাতের কাজ

কাগজের মণ্ডের শিল্প-কাজ

সুচরিতা দেবী

বাজারে আজকাল কাগজের মণ্ড অর্থাৎ 'পেপিয়ার-মাশের' (Papier-Mache) তৈরী নানা রকমের সুন্দর রঙ-চঙে পুতুল ও বিচিত্র সব সৌখিন সামগ্রী পাওয়া যায়। এ সব জিনিষ অনায়াসেই সংসারের কাজকর্ম্মের ফাঁকে ঘরে বসে তৈরী করা যেতে পারে। এ ধরণের শিল্প-কাজে সাজ-সরঞ্জাম যা প্রয়োজন, সেগুলি অতি সাধারণ জিনিষ এবং এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারও নয়। অথচ সুষ্ঠু-ভাবে এ সব শিল্প-সামগ্রী রচনা করতে পারলে, বাড়ীর মেয়েরা শুধু যে নিজেরাই আনন্দ পাবেন তাই নয়, সংসারের আর-পাঁচজনকে খুশী করতে পারবেন। তাছাড়া কাগজের মণ্ড বা 'পেপিয়ার-মাশে'র (Papier-Mache) শিল্পকারু রচনা যে খুব একটা দুরূহ ব্যাপার তাও নয়; যে কেউ দু'চারদিন হাতে-কলমে বিচিত্র এই শিল্প-কাজ করলে অল্প-আয়াসেই রীতিমত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন।

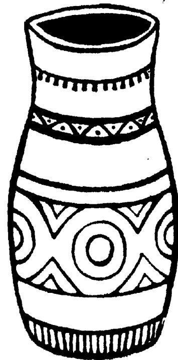
গোড়াতেই বলি—এ কাজের জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, সেগুলির কথা। 'পেপিয়ার-মাশের' শিল্প-কাজ করতে হলে চাই—খানকয়েক পুরোনো খবরের কাগজ আর রঙীণ ঘুড়ীর-কাগজ, একটি বড় পাত্র (Bowl), খানিকটা ময়দা কিম্বা এরারুটের (Arrowoot) গুঁড়ো, আর একবাটি জল। সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, কাগজগুলিকে ছোট-ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলুন। এবারে ঐ বড় পাত্রটি জলে ভরে নিয়ে, তাইতে কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলি সব ভালো করে চুবিয়ে রাখুন বেশ খানিকক্ষণ। সুদীর্ঘকাল জলে ভিজিয়ে রাখার ফলে, কাগজের টুকরোগুলি যখন আগাগোড়া তলতলে হয়ে যাবে, তখন পাত্রের বাড়তি জলটুকু ফেলে দিয়ে, ভিজে সপসপে কাগজের টুকরোগুলিকে বেশ করে নিঙড়ে জল-ঝরিয়ে রীতিমত শুকিয়ে নিন। এভাবে নিঙড়ে জল-ঝরানোর সময় বিশেষ হুঁশিয়ার থাকতে হবে—কাগজে যেন এক ফোঁটা জল না থাকে—এতটুকু জল থাকলেই, শিল্প-কাজের ব্যাঘাত ঘটবে—ভিজে কাগজ বাতাসে শুকিয়ে গেলেই কুঁচকে এবড়োখেবড়ো হয়ে যাবে। কাজেই নিঙড়ে জল-ঝরানোর সময় কাগজের টুকরোগুলি যেন এতটুকু সিক্ত না থাকে—সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

পাত্রের জলে কাগজের টুকরোগুলি যখন ভিজুতে দেবেন, সেই ফাঁকে, ঐ ময়দা বা এরারুটের গুঁড়ো জলে গুলে আগুনে ফুটিয়ে বেশ খানিকটা ঘন কাইকাই ধরণের আঠা বা 'লেই' (Gum-Paste) বানিয়ে নেবেন।

তারপর জল-নিঙড়ে শুকনো-করে-ফেলা কাগজের টুকরোগুলিকে বেশ করে চটকে 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে নিয়ে, ঐ ময়দা বা এরারুটের 'লেই-আঠার' সঙ্গে মিশিয়ে কাদার তালের মতো 'তাগাড়'—যেমন রান্নার সময় লুচি-রুটির জন্য 'ময়েন' দিয়ে আটা-ময়দা মাখেন, ঠিক তেমনিভাবে। তাহলেই তৈরী হবে—এ শিল্প-কাজের প্রধান উপাদান কাগজের 'মণ্ড' বা 'পেপিয়ার-মাশে' (Papier-Mache)। 'মণ্ড' (Pulp) রচনার সময়—কতখানি কাগজের টুকরোর সঙ্গে কতখানি ময়দা বা এরারুটের 'লেই-আঠা' মেশাতে হবে—সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা দরকার। এই মেশানোর একটা নিয়ম আছে। অর্থাৎ যতখানি কাগজের টুকরো থাকবে, তার ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ 'লেই-আঠা' মেশাতে হবে—

কাজের উপযোগী 'মণ্ড' বানানোর জন্য। এ মাপের কম-বেশী হলেই শিল্প-কাজে ব্যাঘাত ঘটবে—কাজেই 'মণ্ড' (Pulp) রচনার সময় এদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে, একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখি। ছাপানো খবরের কাগজ দিয়ে 'মণ্ড' রচনা করলে—সে-'মণ্ডের' চেহারা দেখতে হবে কালচে-ছাইরঙের এবং পরিষ্কার সাদা বা রঙীণ কাগজ দিয়ে 'মণ্ড' বানালে, তার চেহারা হবে অবিকল যে রঙের কাগজ ব্যবহার করবেন, ঠিক তেমনি রঙের। 'মণ্ড' রচনার সময় কাগজ ও 'লেই-আঠা' দুটিকেই বেশ করে চটকে মেখে নেবেন—যেন এতটুকু 'দানা' বা 'ডেলা' না থাকে কোনোটিতে। 'মণ্ডে' কাগজ বা ময়দার এতটুকু 'দানা' বা 'ডেলা' থাকলে শিল্প-সামগ্রীটি পরিপাটি-মোলায়েম ধরণের হবে না—অপরিচ্ছন্ন, এবড়োখেবড়ো দেখাবে। সুতরাং এদিকেও নজর রাখা দরকার।

এইভাবে 'মণ্ড' (Pulp) রচনার পর, শিল্প-সামগ্রী বানাবার কাজে হাত দেবেন। হাতের আঙুলের চাপে কাদা-মাটির তাল দিয়ে মৃৎ-শিল্পীরা যেভাবে পুতুল, হাঁড়ি-কুড়ি তৈরী করে, ঠিক তেমনি ধরণে কাগজের 'মণ্ড' (Pulp) দিয়ে শিল্প-সামগ্রী বানাতে হবে। শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে সহজ ও সরল ছাঁদের শিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে হাত দেওয়াই ভালো। কিছুদিন সাধাসিধা-ধরণের শিল্প-সামগ্রী বানিয়ে নিয়মিত অনুশীলন আর অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনের পর ক্রমশঃ হাত পাকলে তবেই জটিল ধরণের কারুকার্য্য রচনা করা উচিত—সে কথা বলা বাহুল্য।

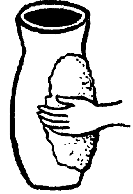


আপাততঃ কয়েকটি সহজ-ছাঁদের 'পেপিয়ার- মাশে' অর্থাৎ কাগজের মণ্ডের' বিচিত্র শিল্প-সামগ্রী রচনার বিষয় জানিয়ে রাখি। বারান্তরে এ-ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব পুতুল ও সৌখিন শিল্প-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করার বাসনা রইলো।

উপরের ছবিতে 'কাগজের মণ্ড' বা 'পেপিয়ার-মাশের' তৈরী একটি বিচিত্র ফুলদানীর নক্সা দেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা সামান্য চেষ্টা করলেই অনায়াসে এ ধরণের সৌখিন শিল্প-সামগ্রী বানাতে পারবেন।

এ ফুলদানীটি রচনার জন্য প্রয়োজন—'কাগজের মণ্ড' এবং বিচিত্র-অভিনব ছাঁদের একটি খালি জ্যামের (Jam) বা মধুর (Honey) বোতল, মাটির ভাঁড়, 'বোতল' কিম্বা বাঁশের চোঙা!

গোড়াতেই 'জ্যামের' বোতল, মাটির পাত্র, বোতল কিম্বা বাঁশের চোঙার বাইরের গাটিকে আগাগোড়া জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিন। তারপর বোতল বা ভাঁড় বা বাঁশের চোঙার বাইরের গায়ে অল্প-অল্প করে কাগজের 'মণ্ড' লাগিয়ে হাতের মিহি-চাপ দিয়ে সেটিকে আগাগোড়া সমানভাবে প্রলেপিত করুন—পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে। বোতল বা পাত্রটির সারা অঙ্গে উপরোক্ত নক্সার ছাঁদে সমান-ভাবে কাদার তালের মতো এই 'কাগজের মণ্ড' (Pulp) প্রলেপিত করবার পর, পাত্রটিকে ছায়া-শীতল জায়গায় রেখে খোলা বাতাসে শুকিয়ে নেবেন। কড়া রৌদ্রে রেখে শুকোতে দেবেন না কখনও—রৌদ্রের তাপে শুকোতে দিলে প্রলেপ অতিরিক্ত-তাপের ফলে, কুঁচকে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই রৌদ্রের তাপে শুকোতে না দেওয়াই উচিত।



যাই হোক, পাত্রের উপরকার 'কাগজের মণ্ডের' আবরণী-প্রলেপ বাতাসে আগাগোড়া পাকাপাকিভাবে শুকনো হয়ে যাবার পর, ইচ্ছামত জল-রঙ (Water Colours) বা 'তেল-রঙে'র (Oil Colours or Enamel Paints) সাহায্যে উপরোক্ত নমুনার ছাঁদে সেটিকে বহুবর্ণের আলঙ্কারিক-চিত্রে রঞ্জিত করে নিলেই বিচিত্র-সুন্দর 'পেপিয়ার-মাশে' (Papier Mache) বা 'কাগজের মণ্ডের' ফুলদানী বা বিবিধ-ধরণের সৌখিন শিল্প-সামগ্রী (Curios) বানানো যাবে।

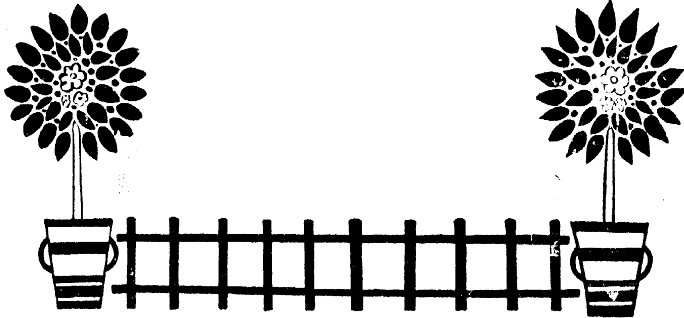
শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে এই ধরণের সহজ সামগ্রী রচনার কথা জানালুম। পরের বারে, মৃৎশিল্পীদের

শিল্প-সামগ্রী রচনার ধরণে, 'কাগজের মণ্ড' বা 'পেপিয়ার-মাশের' সাহায্যে কিভাবে বিচিত্র পুতুল ও বিবিধ ছাঁদের অভিনব কারু-শিল্পের জিনিষপত্র বানানো যায়—সে সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ জানাবার বাসনা রইলো।

পর্দ্দার বাহার

স্নলতা মুখোপাধ্যায়

জানলা-দরজার পর্দ্দা শুধু যে গৃহের আব্রুরক্ষা করে তাই নয়, আধুনিক সৌখিন-সমাজে প্রত্যেক সুগৃহিণীই আজ-কাল এগুলিকে রুচি-সম্মতভাবে গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসাবে গণ্য করে থাকেন। তাই আজ সেই বিষয়ে হু'চার কথা মোটামুটি আলোচনা করছি।



গৃহের জানলা-দরজার পর্দ্দার ব্যাপারে সাধারণতঃ রঙীণ বা নানা ধরণের বিচিত্র নক্সাদার কাপড় ব্যবহার করাই রেওয়াজ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাদা কাপড়ের পর্দ্দায় বাহার করবার জন্য অনেকে বাহারী 'লেশ' (Lace) অর্থাৎ ফিতা, কিম্বা রঙীণ কাপড়ের টুকরো জোড়া দিয়েও অভিনব ধরণের সূচীশিল্পের কাজ করেন। অনেকে আবার সাদা বা একরঙা পর্দ্দার কাপড়ের উপরে রঙীণ স্নতোর সাহায্যে নানা ধরণের স্নন্দর এমব্রয়ডারী (Embroidery) কাজ করে অপরূপ কারু-কার্য্যের বাহার ফুটিয়ে তোলেন। আজ এই ধরণের বিচিত্র এমব্রয়ডারী-কাজ করে পর্দ্দার বাহার ফুটিয়ে তোলার একটি নক্সার কথা বলি। পর্দ্দার বুকে সূচী-শিল্পের সাহায্যে এ ধরণের নক্সা রচনা করা খুবই সহজসাধ্য···অল্প-আয়াসেই এ সব নক্সা স্নন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

নিম্নের ছবিতে পর্দ্দার বুকে রঙীণ স্নতো দিয়ে সাধাসিধা এমব্রয়ডারী কাজ করে তোলার উপযোগী যে নক্সা দেখানো হয়েছে, আপাততঃ সে বিষয়ে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলি!

জানালা বা দরজার পর্দ্দার কাপড়ে এ নক্সা খুবই স্নন্দর ও মানানসই দেখাবে। তবে ছিটের কাপড়ের চেয়ে সাদা কিম্বা একরঙা কাপড়ের উপরেই এ ধরণের রঙীণ স্নতো দিয়ে এমব্রয়ডারী করা নক্সায় বাহার যে আরো বেশী খুলবে—সে কথা বলাই বাহুল্য!

প্রথমেই জানাই, পর্দ্দায় নক্সা-তোলার কথা। পর্দ্দার কাপড়ের উপর নক্সার ছাঁদ তোলবার আগে উপরের ছবিতে দেখানো নমুনাটির আদর্শে প্রয়োজনমত মাপে এটি একটি পাতলা কাগজের উপর পারিপাটিভাবে এঁকে নেবেন। তারপর, কাগজে-আঁকা নক্সাচিত্রের তলায় পরিষ্কার একটুকরো কার্ব্বন-পেপার (Carbon-Paper) বিছিয়ে পর্দ্দার কাপড়ের উপরে সমানভাবে রেখে 'ডিজাইন-টিকে' (Design) আগাগোড়া নিখুঁত-ধরণে 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নেবেন। প্রয়োজন হলে, পর্দ্দার কাপড়ের বুকে নক্সার ছাপ তোলবার সময় যদি 'ডিজাইন-টিকে' কমাতে বা বাড়াতে হয়, তাহলে যেমন দরকার হবে, সেইভাবে দুটি প্রান্তের মাঝে যে বেড়াটি আঁকা রয়েছে, সেটিকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে এঁকে নিতে হবে। এ কাজ এমন কিছু কষ্টসাধ্য নয়—একটু চেষ্টা করলেই অনায়াসে এ কাজে সফলতা লাভ করতে পারবেন।

পর্দ্দার কাপড়ের বুকে নক্সাটি পরিপাটিভাবে আগা-

গোড়া ছকে নেবার পর, রঙীণ সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী সেলাইয়ের কাজ। এজন্য ভালো এবং পাকা-রঙের এমব্রয়ডারী সুতো বেছে নেওয়া প্রয়োজন। সুতো যেন মজবুত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কাঁচা-রঙের কমদামী সুতো তেমন টেঁকসই হয় না—দুদিনেই রঙ জ্বলে ফ্যাকাশে ও জীর্ণ হয়ে যায়। আগাগোড়া 'সাটিন্ ষ্টীচ্' দিয়ে পর্দ্দার বুকে এমব্রয়ডারী-সেলাইয়ের কাজ করে নক্সাটিকে পরিপাটিভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেলাইয়ের সময় নক্সাটিকে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত শিল্প-রুচি ও পছন্দ-অনুসারে ফুল, পাতা, ফুলের টব, বেড়া প্রভৃতির কাজের জন্য বিভিন্ন রঙের সুতো বাছাই করে নেওয়াই ভালো! এ কাজে সুতো কতটা প্রয়োজনে লাগবে, সে বিষয়ে বাঁধাবাঁধি কোনো হদিশ দেওয়া শক্ত—কারণ, পর্দ্দার নক্সা ছোট বা বড়, কতখানি জায়গা জুড়ে হবে, তার কোনো নির্দ্দিষ্ট ধারণা যখন আমাদের জানা নেই! তাছাড়া নক্সা রচনা করবেন আপনারা আপন-প্রয়োজন অনুসারে এবং সকলের ঘরের দরজা-জানলার পর্দ্দাও তো একই মাপের বা এক ধরণের হতে পারে না···কাজেই এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কোনো হদিশ দেওয়া সম্ভব নয়! তবে মোটামুটি একটা আন্দাজ দিয়ে রাখছি—এ সম্বন্ধে! পর্দ্দার কাপড় যদি ২৪″ × ১৪″ ইঞ্চি হয়, তাহলে সব রঙের সুতোই চাই এক 'হালি' বা 'লচ্ছি' করে—এই হলো সাধারণ নিয়ম। প্রসঙ্গক্রমে, কোন্ কোন্ রঙের সুতো কাজে লাগবে—তারও একটু মোটামুটি আভাস দিই। 'ক্যানারি' (Canary) হল্দে, গাঢ় ও ফিকে সবুজ, হাল্কা-বাদামী (Brown), গাঢ়-বাদামী (Dark Brown), গাঢ় লাল (Turkey বা Crimson অথবা Scarlet Red), লাল (Vermillion), গোলাপী (Pink), এবং কমলালেবু (Orange) রঙের সুতোর প্রয়োজন—এসব নক্সা রচনার কাজে। ফিকে-সবুজ রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করবেন—রেটিলিং আর ফুলের টবের সাদা অংশটুকু। গাঢ় সবুজ রঙের সুতোয় রচনা করবেন—গাছের পাতা, পাতার শিরাগুলি হবে হলদে রঙের সুতোয়। গাছের ডালপালা হবে বাদামী রঙের সুতোয়; ফুলের টবের গাঢ়-অংশ এবং হাতলগুলির জন্য ব্যবহার করবেন গাঢ় লাল রঙের সুতো। গাছের পাতার মাঝে মাঝে ফিকে-লাল, গোলাপী, হলদে প্রভৃতি মানান-সই রঙের সুতো দিয়ে দু'চারটি ফুল রচনা করে দিলে নক্সাটির জৌলুশ বাড়বে অনেকখানি! এই হলো মোটামুটি হদিশ। তবে, পর্দ্দার কাপড়ের রঙ এবং শিল্পীর রুচি-অনুসারে এমব্রয়ডারীর সুতো বাছাই করে নক্সা-রচনাই একান্ত বাঞ্ছনীয়—এ কথাটা সর্ব্বাগ্রে বলে রাখা প্রয়োজন!

এবারে আপনারা নিজেরাই হাতে-কলমে পর্দ্দার বুকে রচনা করুন বিচিত্র সব শিল্পকারুর কাজ!

হোরী খেলা

অরূপ ভট্টাচার্য্য

ফাল্গুনেরি পূর্ণিমাতে আবার এলো হোলি
শাখায় শাখায় রঙ্ মাখে গায় নতুন ফুলের কলি॥
এই ধরণীর বীণায় বাজে আনন্দেরই সুর
নতুন এসে পুরাতনকে করল যে আজ দূর॥
মাতোয়ারা হ'য়ে রঙে গায় যে সবাই গান
কেমন যেন বেসুর লাগে, দেয় না সাড়া প্রাণ॥
শুনেছি যে বৃন্দাবনে হাজার বছর আগে
খেল্‌ত হোলি ব্রজাঙ্গনা শতেক অনুরাগে॥
উঠ্‌ত জেগে হা-হা হাসি গীত-বাদ্য রোল
পল্লী পথে হুলাহুলি রঙেরি হিল্লোল॥
রাধা শ্যামে নিয়ে মাঝে ব'সত রূপের মেলা
আপন পরের বিভেদ ভুলে খেল্‌ত হোরী-খেলা॥
গড়াগড়ি দিত সবাই নীপ্-তমালের ছায়
কিংশুকেরি মঞ্জরীতে ফাগ্ মাথাত গায়॥
যত্নে ধ'রে মৃণাল-হাতে কুম্‌কুম্ এরই থারি
ছুটোছুটি করত যত চটুল ব্রজনারী
কুটিল হাসি ফুটিয়ে মুখে শুক্-শারিরে ধ'রে
আবীর গুলাল্ মাখিয়ে দিত কতই সোহাগ ভরে॥
গাভীরা সব উড়িয়ে যেত রাঙা গো-খুর রেণু
রইত পড়ে একটি ধারে শ্যামের হাতের বেণু
পিচ্‌কারীতে রঙ্ ভরে শ্যাম নিপুণ দুটি হাতে
কটাক্ষে তা ঝরিয়ে দিত রাধার মেখলাতে॥
লাল হ'য়ে যে উঠত তখন মন-যমুনার জল
তারই বুকে উঠত ফুটে প্রেমের শতদল॥
হোরী খেলায় তখন ছিল মনের মিতালী
এখন দেখি বাইরে শুধু রঙের দীপালি॥
নয়নে আজ লাগে না সেই বৃন্দাবনী মায়া
নিশি রাতে জ্যোৎস্না যেন দুপুর রোদের ছায়া॥
কোথায় গেল সেই ঘন-শ্যাম কোথায় গেল রাই
বৃন্দাবন যে আজো আছে ওরাই শুধু নাই॥
সবাই মাতে হোলিতে আজ উৎসবেরই ক্ষণে
বাইরে শুধু রং লাগে হায় রং লাগে না মনে॥

মহামিলন তীর্থে

সুধীশপ্রিয় পাল এম-এ

এবারকার নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশন সকলেরই, বিশেষ করিয়া সাহিত্যানুরাগীদের, অত্যন্ত আকর্ষণীয় হইয়াছিল। একে সাহিত্য সম্মেলন, তাতে 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব'—দুটিই এ-আকর্ষণের প্রবল হেতু। অনেকে হয়তো জানেন না প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের প্রথম সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি—সে সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল—১৯২২ সালে কাশীতে। রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশ্বকবির শততম জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ব-সাহিত্য সম্মেলনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অভিনব এবং এই উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পী সমন্বয় এই উৎসবটিকে বিশ্বজনীন রূপদানে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে! ভাষা ও কৃষ্টিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুণী ও জ্ঞানীর একত্র সমাবেশ এই সম্মেলনকে 'মহামিলন-তীর্থে' পরিণত করিয়াছিল। বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত Norman Cousing, ক্যানাডার Council for the Encouragement of the Arts, Humanities, and social Sciences এর Director, A. W. Trueman, ইংরেজ কবি Richard Church, স্পেনীয় কবি Dr. Juan Perez Crues, ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ লেখক Alberto Moravia ও Prof. Anjelo Mȏretta, জাপানের Toluo Morimoto, আইসল্যাণ্ডের Siguradur Magnusson, প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রশিল্পী Garrould প্রভৃতির দর্শন খুব অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে! কাজেই এ উৎসবে ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাছাড়া এই ধরণের বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট রসিক-জনের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই সাহিত্যের উপলব্ধি। সকল বৈপরীত্য ও সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে ঐক্যবোধ—ইহাই তো সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সহিত" শব্দ হইতে 'সাহিত্য' শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে "সাহিত্য" শব্দের মধ্যে মিলনের একটি অপরূপ ভাব-সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। এই অর্থে এই সাহিত্য সম্মেলন সার্থক! সাহিত্য হইতেই আমরা রসাস্বাদন ও আনন্দলাভ করি এবং এই রসেই আমাদের মনের সংস্কার ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

সম্মেলনে বিদেশ হইতে আগত বিভিন্ন সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পী সকলেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সাহিত্যিকগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্বানুভূতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সকলেরই মুখে কথা—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমগ্র বিশ্বের—কেবল বাংলার বা ভারতের নন্। Norman Causing এবং Dr. A. W. Trueman রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। Cousing বলেন যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তাতে অসঙ্গতি নাই। মানুষের সার্ব্বজনীনতাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ—"

"Tagore's challenge still remained. That challenge was as to whether man can transcend his differences in order to make this world safe & fit for human habitation.—Tagore saw no inconsistency between nationalism and internationalism. His ideal was that if there was loyalty above any body's country, that, loyalty should be to universal man.

এই সম্পর্কে Dr. A. W. Trueman এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন—

I have been struck again and again by the evident fact that although Tagore was a world figure he had not ceased to be an Indian. And the more I have read and thought about his career, the more strongly I became convinced that he was a world figure not in spite of the unmistakably Indian cast of his thought to feeling, but on account of it. I know that Tagore became alarmed by :the potentially—and indeed actually—disruptive force of nationalism for a world in which he longed that all men might act as brothers......His own life and the examplo which he gave to the world.reveal atype of nationalism that in my opinion, can form the only secure foundation of world understanding to world peace. This kind of nationalism is based at once on the limitation of human beings and on the limitless powers of their imagination and love."

এ অধিবেশনে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে নানা দিক

য়া যে সব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন উপভোগ্য, তেমনই সারগর্ভ ও ...প্রদ। এইভাবে চিন্তাবিনিময় ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিন দিনের অনুষ্ঠান ... হইয়া গেল। বিদায়ের ব্যথায় মনভারাক্রান্ত। যাঁহাদের বিদায় দিলাম, তাঁহাদের ...-স্মৃতি মন হইতে মুছিবার নয়। সাহিত্য সম্মেলনের পর ফিরিবার পথে অজন্তা ও ইলোরার গুহা-চিত্র ও ভাস্কর্য দেখিয়া যাইব—স্থির করিলাম। খ্যাতনামা ...ত্যিক শ্রীমনোজ বসুও যাইবেন বলিলেন।......সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে......সঙ্গীদল ...জুট কত...নরনারী—মনোজবাবু ও তাঁর স্ত্রী, লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায় ও তাঁর ...দ্বয়, সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক, পূর্ব্ববঙ্গের কবি—জসীমুদ্দিন, ...মি ও আমার সঙ্গে দুই মহিলা এবং আরও দুইজন—মোট আমরা ১৩জন দল ...ছিলাম।

তারপর রাত্রি-৮টা ২০ মিনিটে Victoria Terminus ষ্টেশনে আসিয়া সদলে ট্রেণে চড়িলাম। ট্রেণে কাহারও চোখে ঘুম নাই...গল্পে- গানে, হাস্যে-পরিহাসে রাত্রিটুকু কাটিয়া গেল।

রাত্রি দুইটায় মনমদ্ ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া ভোরে ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছিলাম। সারারাত্রি ট্রেণে কাহারও ঘুম নাই। ঔরঙ্গাবাদে নামিয়া সদলে একেবারে গিয়া হোটেলে উঠিলাম, হোটেলে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল। কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

হোটেলে প্রাতরাশ সারিয়া সকালেই কয়খানি ট্যাক্সিতে চড়িয়া আমরা সদলে যাত্রা করিলাম। পথে দৌলতাবাদ দুর্গ—দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু যাদব রাজগণের রাজধানী ছিল। পরে যিনিই এই দুর্গ জয় করিয়াছেন, তিনিই দাক্ষিণাত্যের অধিপতি হইয়াছেন। দৌলতাবাদ এককালে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল বলিয়া মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দৌলতাবাদ দুর্গ দেখিয়া আমরা ইলোরা পাহাড়ে পৌঁছিলাম। বিরাট পাহাড়...কঠিন পাথরের বুকে খোদাই বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত অনেকগুলি গুহা-মন্দির ও অট্টালিকা... প্রত্যেকটি গুহা-মন্দির ও অট্টালিকাই প্রাচীন যুগের শৈল-শিল্পীদের নিপুণ ভাস্কর্য্য-শিল্পের অপরূপ নিদর্শন। এখানকার স্থাপত্য-শিল্প দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পে ভারত যে একদা বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল ইলোরায় তাহার সাক্ষ্য এখনও বর্ত্তমান। ইলোরার মন্দিরগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং জৈন। বৌদ্ধ মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি। ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে হিন্দু দেব-দেবীর উপাখ্যান শিলা-গ্রথিত—জৈন মন্দিরেও তাই! বিভিন্ন ধর্ম্মের মন্দির পাশাপাশি দেখিয়া মনে হয়, তৎকালে পরধর্ম্মে কারো বিদ্বেষ ছিল না! বৌদ্ধ মন্দিরগুলি আকারে, একতলা, দোতলা এবং তিনতলা। মন্দিরগুলির ভিতরে বড়-বড় ঘরও দালান (Hall) প্রচুর। সর্ব্ব বৃহৎ ঘরটি ১১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ৬০ ফুট প্রস্থ। চব্বিশটি স্তম্ভের উপর বসানো ছাদ! ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের মধ্যে কৈলাস মন্দিরটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ১৬৪ ফুট দীর্ঘ ও ১০৯ ফুট প্রস্থ এবং ৯৬ ফুট উচ্চ। কৈলাসের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কোন



ইলোরা গিরি-গুহার 'হিন্দু মন্দিরের' শৈল-কারু

বৈদেশিক পর্য্যটক এই কৈলাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"The Kailasha is an illustration of one of those rare occasions when men's minds, hearts work is in unison towards the consummation of a supreme ideal."

জৈন মন্দিরের মধ্যে ইন্দ্র সভা ও জগন্নাথ সভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইলোরার গুহামন্দির দেখা শেষ করিয়া ইলোরা-পাহাড়ের অদূরে 'গেষ্ট হাউসে' আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া লইলাম। তারপর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সদলে ঔরঙ্গাবাদ ফিরিলাম। ফিরিবার পথে মোগল সম্রাট ঔরংজেবের ও তাঁহার সম্রাজ্ঞীর সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। সম্রাটের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর সমাধি বিনা আড়ম্বরেই রক্ষিত হইতেছে। বিশাল-মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের কি সাধারণ পরিণতি! উপলব্ধি করিলাম—"Paths of glory lead but to the grave." হৃদয়ে একটু বেদনারও সঞ্চার হইল। ভাবিলাম—"চলে গেছ তুমি আজ, মহারাজ—

রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,...।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা সদলে অজন্তার পথে বাহির হইলাম। পথ অতি দীর্ঘ। কত মাঠ, কত পাহাড় অতিক্রম করিয়া পথ সোজা চলিয়াছে। তিন ঘণ্টারও অধিককাল চলার পর অজন্তা গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রাম অতিক্রম করিয়া গাড়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ে উঠিল। অনেক-গুলি পাহাড় পার হইয়া অবশেষে অজন্তা পাহাড়ের প্রান্তে গাড়ী আসিয়া থামিল। নিকটেই একটি ভোজনাগার—সেখানে চা-পানান্তে পাহাড়ে আরোহণ!

পাহাড়টী অর্দ্ধগোলাকৃতি। অতি মনোরম পরিবেশ। নিম্নে গভীর খাদ। চমৎকার দৃশ্য। শিল্প-সৌন্দর্য্যও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের



অজন্তা গিরি-গুহাবলী

এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। মনে সৌন্দর্য্যের প্লাবন বহিয়া গেল। পথের ক্লান্তি, পথের ক্লেশ পথের প্রান্তে পড়িয়া রহিল। আমরা এক অপরূপ সৌন্দর্য্যালোকে প্রবেশ করিলাম।

প্রথম দুইটি গুহা-মন্দিরের গাত্রেই চিত্র অঙ্কিত। পাহাড় কাটিয়া বিরাট বিরাট দালান ও ঘর! দালান অতিক্রম করিলেই সম্মুখে ভগবান বুদ্ধের বিরাট সৌম্য মূর্ত্তি। মুখে দিব্য হাসি। দালানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর গাত্রে ও ছাদে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। অজন্তার চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ।...রূপ ও সৌষ্ঠবের নিখুঁত সমন্বয়ই ইহার বৈশিষ্ট্য।

এই সম্পর্কে দুইটি চিত্র উল্লেখযোগ্য। একটি মাতাপুত্রের চিত্র, অপরটি চিনা ভিক্ষু সমভিব্যাহারে বৌদ্ধ সভা। অজন্তা শিল্পীদের নারী-চিত্র, জগতের কলা-শিল্পে আজও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ সম্বন্ধে Gladstone Soloman সাহেব লিখিয়াছেন—"The Ajanta Masters use woman as their best decorative assets with brilliant zest extra-ordinary knowledge. Woman is the finest achievement of their art and obviously its best admired theme. They painted women at the toilet in repose, gossiping, sitting, standing, always with a sort of wonder akin to awe. They did not make women pose, they simply copied their poses.

এ যাবৎ অজন্তায় ছাব্বিশটি গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় প্রতি গুহাতেই ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি। গুহার তোরণ, গুহার অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত। ইহার অনুপম ভাস্কর্য্য-শিল্প মৃত্যুবিজয়ী। অজন্তার প্রতিভাশালী শিল্পীরা এমন লোকান্তরিত। কিন্তু তাঁহাদের শিল্প সৃষ্টি আজিও বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় শিল্পকলার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এই সম্পর্কে Hevell সাহেব লিখিয়াছেন—"Very rarely in the world's history has there come together that true symphony of three arts: painting, sculpture and architectonic design creating the most perfect architecture, which are so beautifully hermonized at Ajanta."

জনৈক ডেনীশ্-শিল্পী অজন্তার শিল্প সম্ভার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"They represent the climax to which genuine Indian art has attained ......everything in these fiatures from the composition as a whole to the smallest pearl or flower testifies to depth of insight coupled with the greatest technical skill."

অজন্তার শিল্পকলার মধ্যে সে যুগের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ in Art man reveals himself and not his objects. এই উৎকর্ষ সে যুগের মানুষের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। কারণ তাঁরা নিজের প্রয়োজন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This surplus seeks its outlet in the creation of Art, for man's civilization is built upon his surplus."

—



ইলোরা গিরি-গুহার 'হিন্দু-মন্দিরের' শৈল-কারু



তাৎকালিক প্রশ্ন বিচার

উপাধ্যায়

‘যথোক্তং জাতকে সর্ব্বং তদৎ প্রশ্নেঽপি চিন্তয়েৎ’ জ্যোতিঃশাস্ত্রে উক্ত আছে।

মানুষের জন্ম তারিখ ও সময় অনুসারে জন্মকুণ্ডলী তৈরী করে যেমন সমগ্র জীবনের ফলাফল বলা যায়, অনুরূপভাবে মানুষের প্রশ্ন সময়টী নিয়ে তাৎকালিক কুণ্ডলী তৈরী করে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্নোত্তর দেওয়া যায়। ‘প্রশ্নোঽপি জন্ম সদৃশো ভবতি প্রভেদঃ প্রশ্নস্য চাত্র জননস্য কিঞ্চিদস্তি।’ কোন ব্যক্তির প্রশ্নটী বলা শেষ হোলে ঘড়ি দেখে সেই সময়টী অবলম্বন করে লগ্ন নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাশিচক্র অঙ্কিত করতে হবে—আর বসাতে হবে যথাযথ রূপে গ্রহনক্ষত্রগুলি রাশিচক্রের ভেতর। বিচার করে নিতে হবে জ্যোতিষের গণিতভাগের পদ্ধতি অনুসারে গ্রহদের বলাবল, স্থানবল, দৃষ্টিবল এবং অবস্থান ভেদে এদের গতি ও প্রকৃতি। পঞ্জিকা দেখে ঐ দিনের গ্রহস্ফুট অবলম্বন করে তাৎকালিক গ্রহস্ফুট স্থির করতে হয়। তারপর সুরু করতে হয় প্রশ্নোত্তর দেওয়া। যে রাশিতে লগ্ন হবে, সেইটি প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন লগ্ন। একে কেন্দ্র করেই বিচার।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরাও তৎকালিক প্রশ্ন বিচার করে ফলাফল বলে থাকেন। হিন্দু জ্যোতিষীদের পদ্ধতি এঁরাও অনুসরণ করেছেন। এল্যান লিও বলেছেন—“Having earnestly resolved the question for which a true answer is sought, a map of the heavens must be erected for the exact moment when the question first took complete form and shape.” যেটি লগ্ন, সেইটি প্রথম স্থান বা গৃহ। প্রশ্নকর্ত্তা বিষয়ক জিজ্ঞাস্যগুলি এখান থেকে বিচার হয়। দ্বিতীয় স্থান বা ভাব থেকে ধন, উপার্জ্জন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবস্থার সম্পত্তি প্রভৃতি বিচার করা হয়ে থাকে। তৃতীয় স্থান থেকে বিচার হয় ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় কুটুম্ব, দলিল দস্তাবেজ ক্ষুদ্র ভ্রমণ প্রভৃতি। চতুর্থ ভাব থেকে মাতা, ভূসম্পত্তি, গৃহ, যানবাহন, হারানো জিনিষ, শেষজীবন, পরিকল্পনা বিষয় প্রভৃতি। পঞ্চম স্থান থেকে সন্তান, বিদ্যা বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, আমোদ-প্রমোদ, প্রণয়ের ব্যাপার, দ্যূতক্রীড়াদি, বিদ্যালয়, মন্ত্র, দীক্ষা প্রভৃতি। ষষ্ঠ স্থান থেকে পীড়া, দাসদাসী, মাতুল, মামী, কর্ম্মশক্তি, ঐন্দ্রিয়শক্তি, নীতি প্রভৃতি। সপ্তম স্থান থেকে বিবাহ, স্বামী অথবা স্ত্রী, বাণিজ্য, অংশীদার, বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা মোকর্দ্দমা, প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রকাশ্য শত্রু, বিচ্ছেদ মিলন ও কোর্টসিপ, প্রণয়, পদনিয়োগ প্রভৃতি। অষ্টম স্থান থেকে আয়ু বা জীবনী-শক্তি, মৃত্যু, রক্তপীড়াদি দুর্ঘটনা, উইল, উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয় সম্পত্তির প্রাপ্তি, ঋণ, আবদ্ধ অর্থ, বিনা পরিশ্রমে বা অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাপ্ত অর্থ প্রভৃতি। নবম স্থান থেকে দীর্ঘ ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা, গ্রন্থপ্রকাশ, বৈদেশিক ব্যাপার, আইন সংক্রান্ত বিষয় বস্তু, ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রশ্ন, গৃহ নির্ম্মাণ, পিতা, বিচারালয়, তীর্থযাত্রা, ধর্ম্ম, গুরু প্রভৃতি। কর্ম্ম ভাব থেকে বৃত্তি, কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদা, সম্মান, যশ, চিকিৎসা, ঔষধ প্রয়োগ, অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার, সামাজিক পরিবেশ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা রাজার অনুগ্রহ, পরীক্ষায় সাফল্য বা অসাফল্য। একাদশ স্থান থেকে কন্যা, পুত্রবধূ, বন্ধুবান্ধব, সংঘ, পরিষদ, কাউন্সেল, আশা আকাঙ্ক্ষা, রাজানুগ্রহ বা বিরাগ, বাণিজ্যে লাভক্ষতি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি। দ্বাদশ স্থান থেকে রোমান্স, ষড়যন্ত্র, প্রণয়ের পরিণতি, রাজদণ্ড, অবরোধ, অবনতি, দীর্ঘস্থায়ী রোগ, পঙ্গুত্ব, দুর্ভাগ্য, অপ্রত্যক্ষ ক্লেশ ও দুর্ভোগ, শয়নাদি সুখ, ব্যয়, শয্যা প্রভৃতি।

লগ্ন চর রাশিতে অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরে হোলে পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। এখানে পাপগ্রহ থাকলে অথবা দৃষ্টি দিলে পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবেই ঘটে থাকে। লগ্নে লগ্নাধিপতি বা শুভগ্রহদের পূর্ণ দৃষ্টি বা অবস্থান না ঘটলে পরিবর্ত্তন যে সুনিশ্চিত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবি, মঙ্গল ও শনি পাপ এবং চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র শুভ যবনাচার্য্য এই কথা বলেছেন।

বশিষ্ঠ বলেছেন রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু, কেতু, এবং দুর্ব্বল চন্দ্র পাপ আর পূর্ণচন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র শুভ। অর্দ্ধোনেন্দ্বার দন্দার্কাঃ পাপাস্তৎ সংযুতো বুধঃ রাহুঃ কেতুঃ সদা পাপো শেষাঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ। মঙ্গল, শনি, রবি, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র

শুভগ্রহ কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বুধ এবং অর্দ্ধোনচন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণ ও শুক্লাষ্টমী মধ্যগত চন্দ্র পাপগ্রহ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। কোন মতে রাহু কেতু পাপগ্রহ নহে, কিন্তু পাপদায়ক। বরুণ বা নেপচুন শুভগ্রহ। প্রজাপতি (হার্সেল) ও রুদ্র (প্লুটো) পাপগ্রহ।

স্থির রাশিতে অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশিতে লগ্ন হোলে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা কম। লগ্নাধিপতি অথবা শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকলে আর পাপগ্রহের দৃষ্টি বা সংযোগ না থাকলে পরিবর্ত্তন ঘটবে না। লগ্নে শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি, অবস্থিতি বা সংযোগ থাকলে গ্রহ ও রাশির বলাবল বিচার করে ফল বলতে হয়। দ্বিস্বভাব বিশিষ্ট বা দ্ব্যাত্মক রাশিতে অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশিতে লগ্ন হোলে পরিবর্ত্তনের সুযোগ আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে যদি এখানে লগ্নাধিপতির বদৃষ্টি থাকে। পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকলে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনার বৃদ্ধি ঘটাবে।

তাৎকালিক প্রশ্ন বিচারকালে প্রশ্নকর্ত্তাকে উত্তর দেবার সময় রাশিটী কিরূপ দেখতে হবে অর্থাৎ এটি চর, স্থির কিম্বা দ্ব্যাত্মক কিনা। অবস্থান-ভেদে গ্রহদের সম্বন্ধ বিচার কর্ত্তব্য—গ্রহ অপরের ক্ষেত্রে বা অন্য গ্রহের কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে কিম্বা ক্ষেত্র-বিনিময় করলে সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। গ্রহরা পরস্পর পূর্ণদৃষ্টি বিনিময় করছে কিনা, দুইটী গ্রহের মধ্যে একটি অপরটিকে দৃষ্টি দিয়ে অন্যতর দৃষ্টি সম্বন্ধ স্থাপন করছে কিনা অথবা উভয় গ্রহই একই ভাব ও বর্গে আছে কিনা তাও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। সমগ্র রাশি চক্রটী ৩৬০ ডিগ্রী, প্রত্যেক রাশি ৩০° ডিগ্রী, প্রত্যেক ডিগ্রী ৬০´ মিনিট, প্রত্যেক মিনিট ৬০´ সেকেণ্ড। ডিগ্রীকে অংশ বলা হয়।

দৃষ্ট আর প্রেক্ষা (Aspect) এক নয়। গ্রহের দৃষ্টি, রাশি, ভাব আর ঐ রাশিতে যে গ্রহ থাকে তার ওপর পড়ে। প্রেক্ষা দুইটী গ্রহের বা গ্রহ ও ভাবের ডিগ্রীর ব্যবধান অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হয়। ওটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টির মত পরোক্ষ নয়। একটি গ্রহের সঙ্গে অপর কোন গ্রহ বা ভাবের প্রেক্ষা আছে কিনা তা দেখে নিতে হয় গ্রহটীর স্ফুটের প্রভেদ দিয়ে।

প্রেক্ষা সাতরকমের (১) কন্‌জাংশন্ বা সংযোগ। দুইটী গ্রহের স্ফুট অবিকল এক হোলে পূর্ণ কন্‌জাংশন্ হয়। দুইটী গ্রহের স্ফুটের অন্তর ৯ অংশ বা ডিগ্রী। এর কম হোলেও কন্‌জাংশন প্রেক্ষার ফল পাওয়া যায়। (২) সেমি স্কোয়ার ৪৫° ডিগ্রী (১ রাশি ১৫ অংশ) প্রভেদ। (৩) সেক্‌সটাইল ৬০° ডিগ্রী (২ রাশি) (৪) স্কোয়ার ৯০° ডিগ্রী (৩ রাশি) প্রভেদ (৫) ট্রাইন ১২০° ডিগ্রী (৪ রাশি প্রভেদ) (৬) সেক্‌সকুই কোয়াড্রেট ১৩৫° ডিগ্রী (৪ রাশি ১৫ অংশ) প্রভেদ আর (৭) অপোজিশন ১৮০° ডিগ্রী প্রভেদ (৬ রাশি)। ট্রাইন ও সেক্‌সটাইল প্রেক্ষা শুভপ্রদ। স্কোয়ার, সেমিস্কোয়ার, সেক্‌সকুই কোয়াড্রেট অশুভব্যঞ্জক। কন্‌জাংশন ও অপোজিশন পরিবর্ত্তনশীল। মিত্রগ্রহ ও শুভগ্রহের সঙ্গে এই দুইটী প্রেক্ষা শুভদায়ী। শত্রুগ্রহ ও পাপ গ্রহের সঙ্গে এই দুই প্রেক্ষা শুভদায়ী। প্রেক্ষাটী আগে সম্পূর্ণ হয়ে ক্ষীণতর হোতে থাকলে বিয়োগী প্রেক্ষা (Separating aspect) বলে, এর নামান্তর ইশ্‌রাফ। প্রেক্ষাটী ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে পরে যদি সম্পূর্ণ হয় তাহোলে তাকে সংযোগী প্রেক্ষা (Applying aspect) বলে। এর নামান্তর ইথশাল। তাজিকগ্রন্থে অপোজিশন্ প্রেক্ষাকে প্রত্যক্ষ বৈর দৃষ্টি, স্কোয়ারকে গুপ্ত বৈর দৃষ্টি, ট্রাইনকে প্রত্যক্ষ স্নেহদৃষ্টি সেক্‌সটাইলকে গুপ্ত দৃষ্টি বলা হয়।

প্রশ্নকালীন সময়ে মিত্রক্ষেত্রে শুভভাবে রবি ও চন্দ্র থাকলে অল্প দিনের মধ্যে উচ্চপদ বা অপেক্ষাকৃত উত্তমপদ সুনিশ্চিত হবে। শুভভাবে লগ্নাধিপতি থাকলে আর প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম অথবা একাদশ ভাবের যে কোন একটি ভাবে থাকলে প্রশ্নের উত্তর শুভ হয়। লগ্নের দ্বারা স্থান ও অবস্থা পরিবর্ত্তন বিচার্য্য হয় আর লগ্নাধিপতি মধ্যবলী হয়ে চর রাশিতে বা চর নবাংশে থাকলে, লগ্নে বা দ্বাদশভাবে অবস্থিত কোন গ্রহ রবির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন পাপগ্রহ দ্বাদশে, রবি ও বৃহস্পতি অশুভ ভাবে, পাপযুক্ত হয়ে চর রাশিতে লগ্ন, লগ্নাধিপতি নীচাভিলাষী হয়ে চর নবাংশে থাকলে লগ্নে বা দ্বাদশভাবে অবস্থিত কোন গ্রহ রবির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা।

পৃষ্ঠোদয় চর রাশি (মেষ, কর্কট, মকর) লগ্ন হোলে আর লগ্নে পাপ-গ্রহ থাকলে বা লগ্ন পাপদৃষ্ট হোলে, অশুভভাবে বৃহস্পতি অবস্থান করলে আর ষষ্ঠভাবাধিপতি বলী হোলে নানা ক্ষতি ও দুঃখ কষ্টের পর স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে। স্থান বা অবস্থানের পরিবর্ত্তন হবে না যদি স্থির নবাংশে লগ্ন, লগ্নাধিপতি সবল হয়ে স্থির রাশিতে বা স্থির নবাংশে অবস্থান করে, লগ্ন আর লগ্নাধিপতির শুভ গ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টির মধ্যে থাকে, আর লগ্ন ও দ্বাদশভাবে কোন গ্রহ না থাকে।

সাধারণতঃ বুঝে নিতে হবে চর রাশিতে লগ্ন হোলে পরিবর্ত্তন আর স্থির রাশিতে লগ্ন হোলে একই অবস্থা থাকবে। দ্ব্যাত্মক রাশিতে লগ্ন হোলে প্রথম দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হবে না, শেষে পরিবর্ত্তন ঘটবে।

বর্ত্তমানে কোন কাজ হাতে নিলে তা'তে সাফল্যলাভ হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণ করতে হোলে দেখতে হবে কেন্দ্রে ত্রিকোণে, অষ্টম স্থানে, কেন্দ্র এবং ত্রিকোণ শুভ গ্রহের ক্ষেত্রে পাপগ্রহ আছে কিনা। থাকলে কাজে অসাফল্য ঘটবে। শুভগ্রহ থাকলে সিদ্ধিলাভ। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র অবস্থান করলে অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

যে কাজে হাত দেওয়া গেছে তাতে লাভ করা যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এবং একাদশ স্থানে শুভ না অশুভ গ্রহ আছে। শুভ গ্রহ থাকলে লাভ, অশুভগ্রহ থাকলে ক্ষতি।

শীঘ্রই কি বেকার অবস্থা দূর হবে। সপ্তম এবং দশমভাবে শুভগ্রহ থাকলে বেকার অবস্থা শীঘ্রই দূর হয়ে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া যাবে, কিন্তু এ সব ভাবে পাপগ্রহ থাকলে বা দৃষ্টি করলে শীঘ্রই বেকার অবস্থা দূর হবে না। কোন স্বজন বন্ধুর আগমন বার্ত্তা সম্বন্ধে জানতে গেলে দেখতে হবে কোন্ রাশিতে হয়েছে লগ্ন। চর রাশিতে হোলে যাত্রা করেছে, এখন

পথের মধ্যে। স্থির রাশি হোলে যাত্রা করে নি। দ্বস্বাক রাশিতে আসবে কি না এখনও সে ঠিক করে নি। রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষা করছে প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে গ্রহ সংস্থান, দৃষ্টি আর বলাবলের ওপর। শুভগ্রহ অবস্থান করলে বা দৃষ্টি করলে অসুখ থেকে সেরে উঠবে। অন্যথায় মৃত্যু পর্য্যন্ত হোতে পারে।

যে জিনিষ বা সম্পত্তি চুরি বা বেদখল হয়েছে তা ফিরে পাওয়া যাবে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, প্রথম ও একাদশ স্থান বিচার করতে হবে। শুভগ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি থাকলে ফিরে পাওয়া যাবে, পাপগ্রহ অবস্থান ও দৃষ্টিপাত করলে পাওয়া যাবে না। স্থির রাশিতে লগ্ন হোলে বুঝতে হবে নিজের লোকেরা দ্রব্য চুরি করেছে বা সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে নিয়েছে। বিয়ে কি শীঘ্র হবে। যদি যোড় রাশিতে লগ্ন হয় আর শুক্র থাকে যোড় রাশিতে, তাহলে বিয়ে শীঘ্রই হবে। স্ত্রী গর্ভবতী, পুত্র না কন্যা হবে। যোড় রাশিতে লগ্ন আর বৃহস্পতি যোড় রশিতে থাকলে পুত্র, বিযোড় রাশিতে কন্যা। পঞ্চম স্থান ও লগ্নাধিপতির অবস্থা ও লক্ষ্য করতে হবে।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

ভরণীনক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, কৃত্তিকার পক্ষে মধ্যম এবং অশ্বিনী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য, ধনাগম, বিলাস ব্যসন উপভোগ, নূতন পদ ও মর্য্যাদা লাভ, উত্তম সংসর্গ ও বন্ধুলাভ, সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা, সুখ, শুভ ঘটনা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যয়াধিক্য, অর্থক্ষতি, দুর্ণাম, অপ্রিয় পরিবর্ত্তন, অপবাদ, কলহ, এবং সম্পত্তির বিপত্তি প্রভৃতি অশুভ ফলও দেখা যায়। এতদ্ সত্ত্বেও শুভ ফলাধিক্য প্রত্যক্ষ করা যাবে। সম্মান বৃদ্ধি, পদোন্নতি বা অবস্থার উন্নতি, দায়িত্ব গ্রহণ এবং সমাজিক কল্যাণপ্রদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ঘটবে। নিজের শরীর বিশেষ খারাপ না হোলে ও ছেলেমেয়েদের অসুখে বিব্রত হোতে হবে। গৃহে ঐক্য সুখও সামাজিক কেন্দ্রে আনন্দলাভযোগ আছে। নূতন পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের যোগ আছে। আর্থিকক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যজনিত সন্তোষলাভ। বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে নিযুক্ত ব্যক্তিরা সুখ সুবিধা লাভ করবে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, কিন্তু রেসে লাভ। অস্থাবর সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত সর্ব্ব ব্যাপারে শুভ। বাড়ীওয়ালা, ভূমধ্যকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি ও জয়লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম, চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতায় সিদ্ধিলাভ। কোন কোন চাকুরিজীবীর স্বাধীনভাবে কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার লাভ হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল হোলে ও পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, সামাজিক কার্য্যাদি, রোমান্স, কোর্টসিপ প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন কেননা অপ্রীতিকর ঘটনা ও অপবাদের আশঙ্কা আছে। ভ্রমণ, পার্টিতে যোগদান, পিকনিক ইত্যাদি বর্জ্জন আবশ্যক। গৃহে দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফললাভ। রোহিণী ও মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। মাসটী এই রাশির ব্যক্তিদের পক্ষে মিশ্রফলদাতা। শেষার্দ্ধ শুভ, প্রথমার্দ্ধ অশুভ। শত্রুতা, কলহ বিবাদ, সম্মানহানি, স্বজন বিচ্ছেদ, উদ্বিগ্নতা ও ভয়, শারীরিক কষ্ট, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, দুঃখ এবং আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবিয়োগজনিত মানসিক কষ্ট ইত্যাদি সূচিত হয়। মাসের শেষের দিকে এগুলি দূরীভূত হয়ে নানাদিকে শুভ সূচনা হবে। লাভ, সাফল্য, দুঃখকষ্টের অপনোদন, উত্তম সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভ, সুখ সৌভাগ্য, যশ প্রতিষ্ঠা, বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদিলাভ ইত্যাদি দেখা দেবে। পিত্ত ও বায়ুপ্রকোপজনিত উপসর্গ হেতু সমগ্র মাসের মধ্যে অল্পবিস্তর কষ্টভোগ আছে। মানসিক স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি অধিকাংশ সময়ে থাকবে না। গৃহে প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের অবনতি বা পীড়ার জন্য দুশ্চিন্তা, অগ্রজও গুরুজনবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্য, শেষ পর্য্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হবে। গৃহ ও পারিবারিক ব্যাপারে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হোতে পারে। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় লাভ হবে। আর্থিক ক্ষেত্রেও উত্তম। টাকা লেন দেন ব্যাপারে সতর্ক না হোলে ক্ষতি বা লোকসান হবে, মাসের শেষের দিকে আশাতীত অর্থোপার্জ্জন, আয়বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ, এতদ্সত্ত্বেও ব্যয়াধিক্য ঘটবে। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী উত্তম, কোম্পানির শেয়ারে লাভ, ডিভিডেণ্ট বৃদ্ধি কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপারে টাকা লগ্নী করা গোলযোগের কারণ হয়ে উঠবে, মাসের শেষার্দ্ধে চাকরিজীবীদের পক্ষে উত্তম।

প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন বন্ধুদের আনুকুল্যে চাকুরির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে উত্তম, দীর্ঘ ভ্রমণে সর্ব্বোত্তম ফললাভ, গ্রন্থকার, গবেষক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং প্রকাশকরা বিশেষভাবে সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধিলাভ করবে। মহিলাদের পক্ষে মাসটী নানাদিকেই অনুকূল, বৃহত্তর বন্ধু সমাজে মেলামেশায় আনন্দ উপভোগ করবে। অবৈধ প্রণয়ে আমোদ-প্রমোদ, উপহার লাভ ও অনুরাগের আতিশয্যে দিনগুলি সন্তোষজনক হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ,সর্ব্বপ্রকারআশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণপরিণতি। যে সব মেয়ে চাকুরিজীবী, তাদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা, উন্নতি ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি, শিল্পী ও চিত্রতারকাদের পক্ষে খ্যাতিও একাধিক স্থানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অর্থাগমের আধিক্যজনিত আনন্দলাভ, অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি মধ্যম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে মাসটী নিকৃষ্ট ফলদাতা। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো। সমগ্র বৎসরের মধ্যে এই মাসটী মিথুন রাশির পক্ষে সব চেয়ে খারাপ। মেজাজের ঠিক থাকবে না, ক্রোধ উত্তেজনা, প্রায়ই কলহ বিবাদ, অপ্রিয় ব্যক্তির সংসর্গ, গুরুজনবর্গ ও উপরওয়ালার সঙ্গে শত্রুতা, অপমান ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, কার্য্যে বাধা, জীবনী শক্তির হ্রাস, ভ্রমণে কষ্ট ও ক্লান্তি, ক্ষতি, দুর্ঘটনা, স্বজন বন্ধু বর্গের মাধ্যমে নিগ্রহ ও দুঃখ ভোগ ইত্যাদি ঘটবে। অবশ্য সারা মাস ধরে এতগুলি ঘটনা দিনের পরদিন আসবে না, মাঝে মাঝে গ্রহদের কোপের বিরতি হেতু দুঃখ কষ্টের প্রকোপও কম হবে। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। পুরাতন রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক, রোগের বৃদ্ধি আশঙ্কা করা যায়। রক্তের চলাচল পক্ষে বিশৃঙ্খলতা, শারীরিক উত্তাপ এবং পিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া ঘটবে। দুর্ঘটনার ভয় থাকায় সাবধানে চলাফেরা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী ও সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ হবে, এদের পীড়া ঘটতে পারে। ঘরে বাইরে স্বজন বর্গের সঙ্গে কলহ বিবাহ, এমন কি সাময়িক বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হোতে পারে। আর্থিক অবস্থা কিছুটা অবনতির দিকে নেমে গেলেও কোন প্রকার বিশেষ আর্থিক সমস্যা বা অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুত্থান হবার যোগ নেই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষতঃ টাকা নেওয়া সম্পর্কে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, মনোমালিন্য ও শত্রুতার উদ্ভব হলে, অর্থাগমের জন্যে প্রচেষ্টাগুলি অবশ্য ব্যর্থ হবে না—কিন্তু লাভের দিকটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে, কেননা অনাদায়ী টাকা উল্লেখযোগ্যভাবে হস্তগত হবার সম্ভাবনা নেই। স্পেকুলেশনে ও রেসে লাভ, কোন আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিতে পারে। বাড়ীওয়ালা, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরীজীবীরা উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবে, নানাপ্রকার দুঃখ লাঞ্ছনাভোগ করতে পারে, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি একই ভাবে যাবে, ভালো মন্দ কিছুই বোধ হবে না, যারা ইন্সিওরেন্সের ব্যাপারে নিযুক্ত তাদের আয়বৃদ্ধি যোগ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ নয়, নানাভাবে প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে, আবেগ-প্রধান চিত্তের ঔদার্য্য প্রকাশের পরিণতি দুঃখজনক হোতে পারে, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশানুরূপ নয়।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম, অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম, পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। কর্কট রাশির পক্ষে এ মাসটী শুভাশুভ মিশ্রিত। মানসিক আঘাত প্রাপ্তি, উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য, ক্লান্তিপ্রদ ভ্রমণ, কলহ বিবাদ, শারীরিক কষ্ট, সন্তানাদির পীড়া, অসৎসংসর্গ, সম্মানহানি ও ক্ষতি, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ও স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি অশুভ ফল। সুখ স্বচ্ছন্দতা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও জ্ঞান বৃদ্ধি, লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি শুভ ফল। শারীরিক উত্তাপ, উদর, মূত্রাশয় ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া। পুরাতন রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সতর্কতা আবশ্যক, পারিবারিক কলহ বিবাদ মধ্যে মধ্যে ঘটবে। বিবাহ বা অন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ ক্ষতি দুই-ই হবে। টাকাকড়ি লেন দেন ও চুক্তিতে সাফল্য—মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে। প্রকাশ্য শত্রুদের জন্য কষ্টভোগ। প্রতিযোগিতা, গৃহে বা ভ্রমণের সময়ে চুরির আশঙ্কা আছে। স্পেকুলেশন ও রেস খেলায় ক্ষতি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। চাকুরীজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়, উপরওয়ালার সহিত বনিবনাও হবে না, বিরক্তিকর পরিস্থিতি ও অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়, আকস্মিকভাবে আয় হ্রাস, আশানুরূপ লাভ হবে না। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হবে। পুরুষের নির্য্যাতন ভোগ, অবৈধ প্রণয়ে নৈরাশ্য, পারিবারিক অত্যাচার, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয়, কোন কাজ সহজে সিদ্ধ হবে না, পদে পদে বাধা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আদৌ আশাপ্রদ নয়।

সিংহ রাশি

মঘাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। সিংহরাশির পক্ষে মাসটি শুভাশুভ মিশ্রিত। সাফল্য, লাভ, মানসিক শান্তি, উত্তম স্বাস্থ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়, আনন্দ উপভোগ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, সম্মান, বন্ধু সমাগম, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি শুভ ফল। স্বজন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ, ক্ষতি, ব্যয়বৃদ্ধি, সুখহানি প্রভৃতি অশুভ ফল। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, কেবল হজমের গোলমাল হোতে পারে মাত্র। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের সহিত কলহ বিবাদ, সূচিত হয়। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্থিকলাভ, অপরের দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ আছে, আর্থিক ক্ষেত্রে উত্তম, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম, চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটি মোটের উপর ভালো যাবে। অনেকে প্রতিযোগীতায়, টেষ্ট পরীক্ষায়, বা কর্ম্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা সাফল্য লাভ করবে। বহু বেকার ব্যক্তি চাকুরি পাবে, অস্থায়ী কর্ম্মীদের স্থায়ী পদলাভ হবে। পদ নিয়োগ কর্ত্তারা কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাবে দিন যাপন করতে পারবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সম্পূর্ণভাবে ভালো বলা যায় না, অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বাঞ্ছনীয় নয়। কোর্টসিপ ও প্রণয়ের ব্যাপারে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। পারিবারিক কার্য্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম।

কন্যা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে মাসটি উত্তম। হস্তার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তর ফল্গুনীজাতগণের পক্ষে অধম। কর্ম্মে সাফল্য, সুখ, লাভ, সৌভাগ্য

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, প্রতিপত্তিশালীদের সান্নিধ্য লাভ, প্রভৃতি শুভ ফল। শত্রুবৃদ্ধি, ওপরওয়ালার অসন্তোষ উৎপাদন, স্বজন-বিচ্ছেদ প্রভৃতি যোগ আছে, স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটবে না। স্ত্রীপুত্রাদির সামান্যভাবে শরীর খারাপ হোতে পারে। আত্মীয় স্বজন ও ভৃত্যাদির সঙ্গে বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে অসুবিধা ভোগ, সামান্য ঘটনা থেকে গুরুতর অবস্থা হোতে পারে। আর্থিক অবস্থা একভাবেই যাবে, টাকাকড়ি লেন দেন ব্যাপারে লাভ, স্পেকুলেশনে ক্ষতি, রেসে হার, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারীদের পক্ষে মাসটি উত্তম, গৃহাদি সংস্কারহেতু ব্যয়ের সম্ভাবনা, মামলা মকর্দ্দমা কলহ বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু ওপরওয়ালার সহিত সম্প্রীতির অভাব। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম, স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে এমাসটি অনুকূল, কিন্তু অপরের অসাধুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মনস্তাপ। নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি, শিল্পকলায় ও দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ, ধর্ম্মসাধনায় সাফল্যলাভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ।

তুলা রাশি

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসটি উত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম এবং স্বাতীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব, কলহবিবাদ, আঘাতজনিত রক্তপাত, অর্থক্ষতি, ব্যয়বহুল মামলা মকর্দ্দমা, অসৎকার্য্যে লিপ্ত করে জড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি যোগ আছে। স্বাস্থ্যের অবনতি কষ্টকর ভ্রমণ, দুর্ঘটনা, শস্ত্রোপচারের আবশ্যকতা, স্ত্রী ও সন্তানাদির পীড়া, চর্ম্মরোগ, মূত্রাশয়ের পীড়াদি কষ্ট। আর্থিক ব্যাপারে মাসটি আদৌ ভাল নয়। অর্থ ক্ষতি, চুরি, প্রতারণা দ্রব্যহানি প্রভৃতির সম্ভাবনা। অপরের জন্য জামিন হওয়া বিপত্তির কারণ আছে। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে অর্থ লগ্নী নিষিদ্ধ। স্পেকুলেশন ও রেসে ক্ষতি, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে সম্প্রীতির অভাব, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়, স্ত্রীলোকেরা সকল কাজেই অসুবিধা ভোগ করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অশান্তি ও অপ্রীতিকর ঘটনার যোগ আছে। অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর হোলে জীবন বিপন্ন হোতে পারে। ঘরে বাইরে স্ত্রীলোককে সংযতভাবে থাকতে হবে। যে সব মেয়ে অফিসে চাকুরি করে, তাদের পক্ষে বাঁধাধরা কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকাই ভালো, অন্যথা নানাপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটতে পারে। পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভালো। ইলেক্ট্রিকের ভয় আছে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখাজাতগণের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠাজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং অনুরাধার পক্ষে নিকৃষ্ট। সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিশেষ সম্মান, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ ও উন্নত অবস্থা, উত্তম বন্ধুলাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, অপরের সাহায্যপ্রাপ্তি, প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ, প্রভাবপ্রতিপত্তির বৃদ্ধি ইত্যাদি শুভ সম্ভাবনা। কিছু অসাফল্য, ক্ষতি, কষ্টপ্রদ ভ্রমণ, অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন, বাধা, স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত কলহ বিবাদ ইত্যাদির আশঙ্কা আছে। আঘাতজনিত রক্তপাত, জ্বর, দুর্ঘটনা প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ হবে, ঐক্যসূত্রে সকলে আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু কোন নিকটবন্ধু বা স্বজনের বিচ্ছেদ ও মৃত্যু মানসিক অসুস্থতা এনে দেবে। আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো যাবে না। অপরিচিত ব্যক্তিকে আদর আপ্যায়ন বা এই ধরণের ব্যক্তির সহিত ব্যবসায়াদি কার্য্যে লিপ্ত হোলে বিপত্তি ঘটতে পারে। দান, ক্রয় বা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি লাভের যোগ আছে। ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। কর্ম্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা লাভ, পদোন্নতি যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকেরা নানাবিষয়ে সাফল্য লাভ করবে। বিদ্যার্জ্জনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে। শিল্পকলায় উন্নতি লাভ। চলচ্চিত্র শিল্পীর পক্ষে খ্যাতি অর্জ্জন। গানবাজনা নৃত্যাভিনয়ে প্রশংসা লাভ। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ, সদ্গুরুলাভ। অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রেও আশাতীত সাফল্য ও আনন্দলাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিবেশের সম্মুখীন হবে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়া জাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়াগণের পক্ষে মধ্যম এবং মূলার পক্ষে নিকৃষ্ট। মাসের শেষার্দ্ধটী উত্তম, প্রথমার্দ্ধটী কিছু অশুভ। উত্তম স্বাস্থ্য, সাফল্য, শত্রুজয়, লাভ, সদ্বন্ধু সংসর্গ, সুখস্বচ্ছন্দতা, পারিবারিক ক্ষেত্রে নবজাত শিশুর জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি, সুসংবাদ, প্রমোদজনক ভ্রমণ প্রভৃতি শুভ ঘটনা। উদ্বিগ্নতা, স্বজন বন্ধুর সহিত কলহ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ইত্যাদি দেখা যায়। হজম শক্তির হ্রাস ও উদরের বিশৃঙ্খলা, পুরাতন চক্ষু পীড়াগ্রস্ত রোগীদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। চিত্তের অপ্রসন্নতা সমগ্র মাসটী ধরে থাকবে। মাঝে মাঝে পারিবারিক শান্তি হানি, আত্মীয় স্বজনের কলহ ও শত্রুতা। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের আনুকূল্যে বিশেষ অর্থাগম হবে। স্পেকুলেশন ও রেশখেলায় ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অনুকূল ও বিশেষ-শুভ। চাকুরি জীবীর পক্ষে পদোন্নতি, মর্য্যাদা লাভ, উপরওয়ালার প্রীতিলাভ ইত্যাদি যোগ আছে। প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীরা বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে। অফিসে যে সব স্ত্রীলোক চাকুরি করে বা গার্হস্থালী কাজে ব্যাপৃত তাদের চেয়ে শিল্পী ও সাহিত্য সেবিকারা সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে। সমাজ সেবিকাদের পক্ষে ও মাসটী উত্তম। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পসার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ। অবৈধ প্রণয়ে লাভ জনক পরিস্থিতি ঘটবে। পুরুষের সান্নিধ্যে বহু সুযোগ সুবিধার

সম্ভাবনা। ভ্রমণ, পিকনিক, পার্টি প্রভৃতি রোমান্সের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী চলন-সই।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের পক্ষে মাসটী নিকৃষ্ট। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে অনেকটা ভালো। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, কর্ম্মেবাধা, স্বাস্থ্যহানি, মর্য্যাদাহানি, অকারণ অপবাদ, শত্রুবৃদ্ধি, স্বজন বিয়োগ, ও দুঃখশোক প্রভৃতি অশুভ ঘটনা। উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, সৌভাগ্য, বিলাসব্যসন প্রভৃতি শুভ ঘটনার সংযোগ। চক্ষু, উদর এবং বক্ষে পীড়াদি সম্ভাবনা। রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে যে সব ব্যক্তি ভুগছে তাদের সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্টভোগ। নিকট বন্ধু বা স্বজনের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি এই মাসে ঘটবে। আর্থিক ক্ষেত্র সুবিধাজনক নয়। অর্থাগম প্রচেষ্টায় মাঝামাঝি সাফল্য। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, রেসখেলায় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ, নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি হবার সম্ভবনা আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে যারা চিকিৎসাও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আছে তাদের সাফল্য লাভ ও উন্নতি উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটবে। টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে যারা জ্ঞানার্জ্জন করেছে তাদের পদলাভ হবে, বা পদোন্নতি ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আদৌ প্রীতিজনক নয়। প্রণয় ভঙ্গ, বিবাদ কলহ, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি ও ধনক্ষয় ঘটবে। কোন প্রকারে কোর্টসিপে বা অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হলে মর্ম্মান্তিক কষ্টভোগের কারণ আছে। পার্টি, পিক্‌নিক, ভ্রমণ, পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা বর্জ্জনীয়। গার্হস্থালী কর্ম্মে মনঃসংযোগ করা বাঞ্ছনীয়। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভালো, শতভিষারপক্ষে নিকৃষ্ট ফল। দুঃখ কষ্ট ও উদ্বিগ্নতা, কলহ, মর্য্যাদা হানি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যহানি, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, শত্রুর দ্বারা উৎপীড়ন, মতলববাজ ব্যক্তির পরামর্শমত কাজ করে অশুভ ফলপ্রাপ্তি, নীচ সংসর্গ প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ হবে। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি অসুখে কষ্ট স্বাস্থ্যভঙ্গ, জ্বর, হজমের গোলমাল, বুকে ব্যথা, রক্তের বৃদ্ধি। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনদের জন্যে কিছু কিছু কষ্ট ভোগ। আর্থিক উন্নতির পক্ষে বাধা, আয় হ্রাস, অর্থোপার্জ্জনের পথগুলি রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। চুরির জন্য ক্ষতি হোতে পারে, ভ্রমণ সময়ে অপরিমিত ব্যয়। কোন প্রকার স্পেকুলেশন অনুচিত, রেসখেলায় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হোতে হবে। কর্ম্মক্ষেত্রে উপরওয়ালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না করলে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটবে না। কর্ম্মক্ষেত্র মোটের উপর খারাপ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটামুটি ভাবে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। একটা গোলমাল বা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হোতে পারে। বিলাসব্যসনের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক হওয়ার জন্যে ব্যয়াধিক্য যোগ আছে। অবৈধপ্রণয়ের দিকে অগ্রসর হোলে জীবন বিপন্ন হোতে পারে। কোর্টসিপ, ভ্রমণ, পিক্‌নিক, পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র ভালো বলা যায় না। দৈনন্দিন কাজগুলি করে যাওয়াই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরভাদ্র পদজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফল দাতা। বাসনা সিদ্ধি লাভ, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, সৌভাগ্য, যশ ও জনপ্রিয়তা, সম্মান ও পদমর্য্যাদার বৃদ্ধি। শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা, আত্মীয় স্বজনের সহিত কলহ বিবাদ, অপবাদ, দুঃখ কষ্ট ও উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। অজীর্ণ, জ্বর, গুহ্যদেশে পীড়া রক্তস্রাব, আমাশয় ইত্যাদি যোগ আছে। পারিবারিক শান্তি, উত্তম আহার, গৃহে নবজাত শিশুর আবির্ভাব, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। ঘরে বাইরে স্বজন বর্গের জন্য কষ্ট ভোগ। আর্থিক ক্ষেত্র সন্তোষজনক। অর্থাগম ও লাভ হবে নানা উপায়ে। ব্যয়বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসখেলায় জয়লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভপ্রদ নয়। চাকুরির পক্ষে মাসটী উত্তম। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। কর্ম্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রুবৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী—অশুভ নয়। স্ত্রীলোকের মাসটী এক ভাবেই যাবে, কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই তবে আমোদ প্রমোদে, বিলাসব্যসনে ও যৌন সম্ভোগ বিলাসে তৃপ্তি লাভ হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

***

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

সহোদরের পীড়া, নিজের স্বাস্থ্যহানি, উদর ও মস্তকে রোগাধিকার, সন্তানাদির পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, বিলাসব্যসনে ব্যয়, মাতার স্বাস্থ্যহানি, স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট. বিদ্যাভাব আশানুরূপ বলা যায়।

বৃষলগ্ন

স্বাস্থ্যোন্নতি, আয়বৃদ্ধি, অর্থ অপচয়, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, দাম্পত্য প্রণয় যোগ মন্দ নয়, সন্তানের বিবাহ সম্ভাবনা, বন্ধু লাভ, সাময়িকভাবে ঋণের সম্ভাবনা। বিদ্যার্জ্জনে আংশিক ক্ষতি।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, স্ত্রীর অসুস্থতা, আয়বৃদ্ধি, কর্ম্মক্ষতি আশাভঙ্গ, উদ্বেগ, ভাগ্যহানি, পারিপারিক অস্বচ্ছন্দতা, সহোদরাদির পীড়া। বিদ্যাভাব শুভ।

কর্কটলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, ভাগ্যোদয়ে বাধাবিপত্তি, ব্যবসায়ে অর্থাগম, স্ত্রীর পীড়া, জ্ঞানার্জ্জনে বাধা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা, স্থানান্তরে গমন। বিদ্যাভাব উত্তম।

সিংহলগ্ন

সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থব্যয়, ধনাগম, প্রণয়ে বিপত্তি, আয় বৃদ্ধি, বিদ্যাভাব শুভ।

কন্যালগ্ন

ভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুর্ঘটনার ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অকারণ ব্যয় বৃদ্ধি, ভাগ্য ও ধর্ম্মোন্নতির যোগ, চাকুরিস্থলে সন্তোষজনক পরিস্থিতি, বিদ্যাভাব মধ্যম, গণিতশাস্ত্রের ফল ভালো হবে না।

তুলালগ্ন

ভাগ্যোন্নতি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাফল্য, শুভকার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি, ভাগ্যোদয়ে বিঘ্ন ঘটতে পারে প্রথম দিকে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিদ্যাভাব মধ্যম।

বৃশ্চিকলগ্ন

স্ত্রীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও পাকাশয়ের দোষ দূর হয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা। বন্ধুলাভ। হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন অবস্থা দেখা দেবে ভাগ্যস্থানে। ভয় ও অপবাদ। ব্যয় বৃদ্ধি। বিদ্যাভাব শুভ।

ধনুলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, এজন্য অর্থব্যয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক কার্য্যে অন্তরায়। শত্রুহানি যোগ। ভাগ্যোন্নতি। ভ্রাতাভগ্নী ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। বিদ্যাভাব শুভ, বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অধিকতর উন্নতি লাভের আশা আছে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিদ্যার্জ্জনে শুভ ফল।

মকরলগ্ন

মানসিক উদ্বেগ, শারীরিক কষ্ট, পত্নীর পাকযন্ত্রের পীড়া ও বায়ুবৃদ্ধি, ভ্রাতৃ বিরোধ, অগ্রজ ভ্রাতার জীবন সংশয় পীড়া, অর্থাগম, ব্যয়বৃদ্ধি, মনস্তাপ। বিদেশ ভ্রমণ বিদ্যাভাব শুভ, সংস্কৃতশাস্ত্রের ফল উত্তম।

কুম্ভলগ্ন

বৈষয়িক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা, ব্যয়বৃদ্ধি, ধনাভাবের ফল মধ্যবিধ, স্ত্রীর পীড়া, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, ভাগ্যভাব উত্তম, কর্ম্মক্ষতি, শত্রুবৃদ্ধি যোগ, পিতার জীবনসংশয় পীড়া, সন্তানের পীড়া, বিদ্যাভাব (বিশেষতঃ টেকনিক্যাল) শুভ।

মীনলগ্ন

ধনভাব উত্তম। আকস্মিক আঘাতপ্রাপ্তি। কর্ম্মস্থলে মর্য্যাদা লাভ। সাহিত্যসেবায় খ্যাতি প্রতিপত্তি, নানাস্থানে গমন, পত্নীর পীড়া, সন্তানাদির পীড়া। দুশ্চিন্তা, ব্যয়বৃদ্ধি, বিদ্যাভাব মধ্যম।



পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ভাষণদান কালে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিক পালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মোট ৬৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ টাকায় কবিগুরুর পৈতৃক গৃহ ক্রয়, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ, নৃত্য—নাটক—সঙ্গীত আলোচনার জন্য ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ৪টি কবিতার ফিল্ম প্রস্তুত, বিশ্বভারতীর প্রকাশ-বিভাগের জন্য প্রশস্ততর স্থান দান প্রভৃতি কার্য ঐ টাকা হইতে করা হইবে।

রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব ব্যাপকভাবে করার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাশিয়াতে এ পর্যন্ত ১৬টি ভাষায় ৩০ লক্ষ রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপা হইয়াছে—আরও ৮৪টি ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকাশ করা হইবে। স্কুল, কলেজ ও পাঠচক্রসমূহে-রবীন্দ্র-জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করা হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও ২৭শে মার্চ দেশব্যাপী রবীন্দ্র-উৎসব করা হইবে। চিকাগোতে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া গিয়া বক্তৃতা করানো হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা শহর ও মহকুমা শহরগুলিতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র-উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে।

পদযাত্রা দ্বারা সঞ্চয় ব্যবস্থা—

কেন্দ্রীয় ডেপুটী অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ ৮ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালোরে ২ ঘণ্টা পদযাত্রা করিয়া স্বল্প সঞ্চয়-প্রথা ব্যবস্থার প্রচার করেন। শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় তাঁহার তিন মাইল ভ্রমণের ফলে ২০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে রাজ্যের ডেপুটী অর্থমন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন, এন-সি-সি, গার্ল গাইড ও বয়স্কাউট দল ছিল। ভ্রমণ শেষে তিনি টাউনহলে এক সভায় বক্তৃতা করিয়া সর্বত্র এইভাবে অর্থ সঞ্চয় প্রথা প্রচারের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে একজন মহিলা-মন্ত্রীর পদযাত্রায় সকলে বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কলিকাতার উন্নতির ব্যবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বিধান সভায় বলিয়াছেন—রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত অর্থ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থ দিয়া কলিকাতার নূতন সেচ ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা এবং নূতন শহরতলী-নগর নির্মাণ ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ করা চলিবে। বিদেশ হইতে যে সব যন্ত্র আমদানীর প্রয়োজন, সে জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ দান করিবে। সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে ৪ শত কোটি টাকা লাগিবে—তন্মধ্যে আপাতত যে ১০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারা কাজ আরম্ভ করা হইবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বোর্ডও একাজের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কত টাকা পাইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। সত্বর কলিকাতা শহরের ড্রেণ, সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থার উন্নতি না করা হইলে শহর নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করিবে। বর্তমানে শহরবাসীর অসুবিধার অন্ত নাই—কত দিনে সে সব অসুবিধা দূর হইবে, তাহাই চিন্তার কথা।

লর্ড জেটল্যাণ্ডের মৃত্যু—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের ইয়র্ক শায়ারের রিচমণ্ড নামক স্থানে ৮৪ বৎসর বয়সে লর্ড জেটল্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৯১৭ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত লর্ড রোণাল্ডসে নামে বাংলার গভর্নর ছিলেন ও তৎপূর্বে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের এ-ডি-সি থাকিয়া তাঁহার

জীবনী রচনা করেন। ১৯৩৫ সালে প্রধান-মন্ত্রী মিঃ বলডুইন তাঁহাকে ভারতসচিব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পত্নী ও পুত্র মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত ছিলেন।

নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্র-স্মৃতি—

৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ—কলিকাতা নিমতলা মহাশ্মশানের যে স্থানে ২০ বৎসর পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে একটি ছোট উদ্যান তৈয়ারী করিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করিবেন। সে জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে স্থানটি সরকারের নামে লেখাপড়া করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। সম্ভবত রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ঐ স্থানটিকে উপযুক্তভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইবে।

পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা—

বিহারের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পরলোকগমন করায় বিহারের রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেন বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী শ্রীদীপনারায়ণ সিংহকে অস্থায়ীভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় বিহার বিধান সভার কংগ্রেস দল পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝাকে নেতা নির্বাচন করিয়াছেন এবং রাজ্যপাল শ্রীঝাকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী পাটনায় যাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীঝা পুরাতন মন্ত্রিসভায় রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন।

ডাক্তার অনুপম রায়—

উত্তর কলিকাতায় গিরিশ পার্ক নর্থে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর বাসিন্দা প্রায় ৫০ বৎসর বয়স্ক ডাক্তার অনুপম রায় গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার রাত্রিতে নিজের একটি ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করে এবং নিজে ও স্ত্রী উভয়ে এসিড পান করিয়া আত্মহত্যা করে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র (বয়স ২০ বৎসর) বোলপুরে ছিল এবং একটি ১৬ বছরের ছেলে ও একটি ৬ বৎসরের মেয়ে পিতামাতার সহিত একই ঘরে ছিল—তাহারা কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছে। প্রকাশ দারিদ্র্য ও দেনার জন্য অনুপম ঐ কার্য করিয়াছে। সে খ্যাতনামা নাট্যকার ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌত্র—নিজে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিল এবং ঔষধের ব্যবসা করিত। ঘটনাটি মর্মান্তিক—ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

ভাঙড়ে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়—

২৪ পরগণা ভাঙড় নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্করের মৃত্যুতে ঐ স্থানে উপনির্বাচন হয়—গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেসপ্রার্থী জনাব এ-কে-এম ইছাক সর্বাধিক ভোট পাইয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীসমীরকুমার সরকার ও শ্রীহারাণচন্দ্র দত্ত পরাজিত হইয়াছেন।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি—

ভারতের জনসংখ্যা গণনা কমিশনার শ্রীঅশোক মিত্র ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে জানাইয়াছেন যে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তিনি অনুমান করেন। ১৯৫১ সালে গণনার সময় ভারতের জনসংখ্যা ছিল—(জম্মু, কাশ্মীর ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি বাদে) ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ। তাহার পূর্বে ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা শতকরা সাড়ে ১২ ভাগ বাড়িয়া ছিল। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে জন-গণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ৫ই মার্চ শেষ হইবে। ১৮৭২ সালে এ দেশে প্রথম গণনা আরম্ভ হয়—এবার দশম জনগণনা। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ (১) পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সত্ত্বেও জনসংখ্যা হ্রাস না পাওয়া, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা ও (৩) শিশু মৃত্যু ও মহামারীর প্রকোপ হ্রাস। গণনা যাহাতে নির্ভুল হয়, সে জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলেম লীগ—

আগামী তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত হইবে। সে জন্য সকল রাজনীতিক দলের মধ্যে তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক পরিতাপের

কথা—পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধিবাসীরা আবার ধর্মের দোহাই দিয়া মুসলেম লীগ দল গঠনে অগ্রসর হইয়াছে। ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অসম ব্যবহার করে নাই। পাকিস্তানে যেমন হিন্দুর বাস অসম্ভব হইয়াছে, ভারতে সে ভাব না থাকায় মুসলমানগণ সুখে বাস করিতেছে। এ অবস্থায় যদি মুসলমানগণ ধর্মের দোহাই দিয়া স্বতন্ত্র দল গঠনে অগ্রসর হয়, তবে তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভারত জাতীয়তাবাদী, এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান থাকার কথা নহে। আমরা এ বিষয়ে দেশের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং মুসলমান নেতাদের অনুরোধ করি তাঁহারা যেন ভুল পথে যাইয়া নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া না আনেন।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীর চাকরী—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রকাশ পায়, ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পে মোট চাকরীর শতকরা মাত্র ৩৪·৬৯টি বাঙ্গালীরা পাইয়াছে—আর অবাঙ্গালীরা পাইয়াছে শতকরা ৬৫·৩১টি। ইহা প্রাদেশিকতার কথা নহে—বাঙ্গালীর জীবন-মরণ সমস্যা। বাংলা দেশে যদি বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা কাজ না পায়, তবে তাহারা কোথায় যাইবে। দারুণ বেকার সমস্যা আজ বাঙ্গালা দেশের সকল স্তরের মানুষকে বিপন্ন করিয়াছে। ইহার সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার বিশেষ করিয়া সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গলার শিল্পপতিরা এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নহেন বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে আচার্য ভাবে—

আচার্য বিনোবা ভাবে সর্বোদয়ের কথা প্রচারের জন্য সারা ভারতে পদ-পরিক্রমা করিতেছেন। তিনি ১০ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতে বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন। প্রবেশ পথে বহু তোরণ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। খ্যাতনামা ভূদান-নেতা শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী তাঁহাকে স্বাগত জ্ঞাপন করেন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বেলুচুকা গ্রামে তাঁহার যাত্রা সুরু হয়। এক পাশে পূর্ণিয়া জেলার বিহার সীমান্ত—আর এক পাশে পশ্চিম দিনাজপুরের নূতন মহকুমা ইসলামপুর এলাকা। ঐ স্থান দিয়া শিলিগুড়ি যাইবার জাতীয় সড়ক—বেলুচুকা হইতে ইসলামপুর পর্যন্ত ১৭ মাইল পথ সাজানো হইয়াছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ইসলামপুরে যাইয়া আচার্য ভাবের সহিত দেখা করিয়াছেন। এক ঘণ্টাকাল আচার্যের সহিত তাঁহাদের নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। বিনোবাজী গত ১০ বৎসর ধরিয়া পদযাত্রা করিতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। সারা ভারতের বহু লোক জীবনে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মত সর্বোদয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করায় ভারতের একদল মানুষের মধ্যে নব-ভাবের সূচনা হইয়াছে। ইহা তাঁহার পদযাত্রার সাফল্য।

ভারতে ঘড়ির কারখানা—

মেসার্স ফিনিক্স এণ্ড কোম্পানী নামে এক প্রতিষ্ঠান বোম্বায়ের নিকট গোরেগাঁওএ একটি ঘড়ি নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ফরাসী দেশ হইতে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থায় কারখানার সমস্ত যন্ত্রপাতি আনা হইয়াছে। ইহা ভারতে প্রথম বেসরকারী ঘড়ি নির্মাণ কারখানা। ১৯৬১ সালের শেষে ঘড়ি নির্মাণ আরম্ভ হইবে। ভারত ক্রমে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পতিতা আশ্রম—

১৯৫৬ সালের পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন কার্যকরী করার জন্য হাওড়া লিলুয়ায় দুইটি পতিতা আশ্রম খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে—দুটিতে মোট ১৩০ জন পতিতা নারীর স্থান হইবে—সূচিশিল্প-শিক্ষা দিয়া তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইবে। নদীয়া কৃষ্ণনগরে ২৫জন পতিতাকে রাখার জন্য একটি আশ্রম খোলা হইয়াছে। কলিকাতা শহরে ৮ হাজার ও হাওড়ায় দেড় হাজার পতিতা বাস করে। সকলের জন্য আশ্রম তৈয়ার করিতে বিলম্ব হইবে। পানিহাটিতে ও কলিকাতা ক্যামাক ষ্ট্রীটে ২টি আশ্রমে ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৪৫জনকে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ভাবে পাপ ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে।

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !



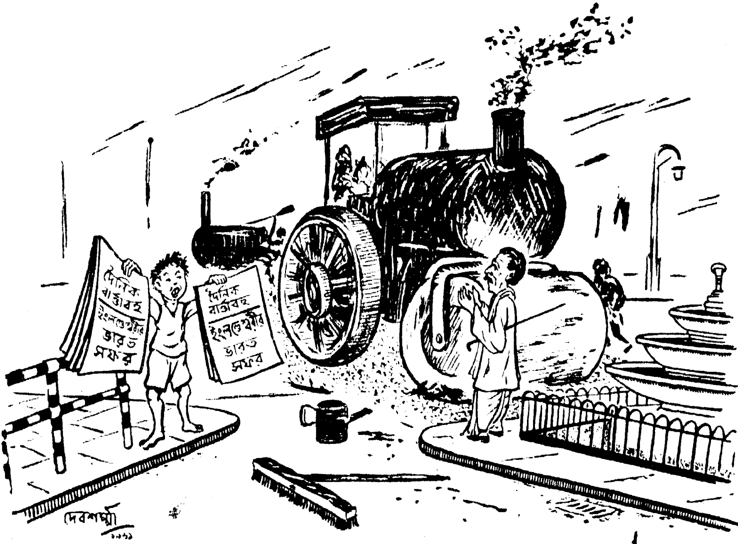
আ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম।
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে।

ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 17-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সফরের দৌলতে…



পথচারী ঃ…ও !…তাই পথ-ঘাট মেরামত হচ্ছে !…আহা, মাগো ইংলণ্ডেশ্বরী—তুমি বছর-বছর এসো মা…তাহলে পথ-ঘাটগুলো সব মেরামত হয়ে আমাদের চলার যুগ্যি থাকে মা…পথের ধারে বাগ্-বাগিচা, ফোয়ারা গজিয়ে বাহার খোলে !…

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

তুমি যে আমারি

বনরেণু ভট্টাচার্য্য

কতদিন গেল চ'লে মাস যায় বয়ে,
জানি না এ ব্যথা আর কত যাবো সয়ে।
মোদের ছিলেনা আগে, সেও ছিল ভালো,
ক্ষণিকের দেখা দিয়ে জ্বেলেছিলে আলো।
আজ কত আপনার তবু মনে হয়,
কেন বা আমার সাথে হ'ল পরিচয়!

কত যে বেসেছি ভালো সব গেছ ভুলে,
অন্যায়ের অপরাধ দেছ রেখে তুলে।
কত চিঠি, কত লেখা, ছন্দে দেই ভ'রে,
ভুল বুঝে দূরে ফেলে, রাখো অনাদরে।
তবু যে ভুলিতে মিতা নাহি চাহে মন,
কেমনে বোঝাব বল হিয়ার বেদন।

তবু আজ লিখে যাব, আঁখি ভরে জলে,
তুমি যে আমারি মিতা, তবু যাবো বলে।







সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত-পাকিস্থান টেষ্টের পরিসমাপ্তি

দিল্লীর ফিরোজ সা কোট্‌লা মাঠে পঞ্চম টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার সাথে সাথে ১৯৬০-৬১ সালের ভারত-পাকিস্থান টেষ্ট ক্রিকেটের পরিসমাপ্তি সুচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই বৎসর পকিস্থানের ভারত সফরের সব কয়টি খেলাই অমামাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। এখন তাদের মাত্র একটি খেলা বাকি আছে বোম্বাইতে। এই খেলাটি পাকিস্থানের ভারত সফরের তালিকাভুক্ত ছিল না। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় লালা অমরনাথের সাহায্যকল্পে এই খেলাটির আয়োজন করেন এবং পাকিস্থান ক্রিকেট দলকে এই খেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। পাকিস্থান ক্রিকেট দলও এই খেলায় তাঁদের যোগদানের সম্মতি জানিয়ে এই বিশিষ্ট খেলোয়াড়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে অমরনাথের খেলোয়াড়-জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে অধুনা পাকিস্থানের লাহোরে। এই খেলা পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সালের পাকিস্থান দলের ভারত সফরের পড়বে পূর্ণচ্ছেদ।

দিল্লীতে পঞ্চম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে সত্য কিন্তু অন্যান্য টেষ্টগুলির সঙ্গে এই টেষ্টের তফাৎ রয়েছে অনেকখানি। এই টেষ্টে ভারত কেবল সময়ের স্বল্পতার জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী ভারতই। কারণ খেলার প্রথম দিনে খেলা আরম্ভ করা হয় বেশ দেরীতে। এই দেরীতে খেলা শুরু করা নিয়ে সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈত দেখা যায়। তারপর অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টরের আহত অবস্থায় পুনরায় ব্যাট করতে নামা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে। পরদিন যখন বিশ্রামের দিন ছিল এবং ভারতীয় দলে ব্যাটসম্যানের অভাব দেখা দেয় নি, তখন ঐ রকম ভাবে কণ্ট্রাক্টরের খেলতে নামার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। মিলখা সিংকে ঐ সময় পাঠালে দ্রুত রান উঠতে পারতো এবং তা ভারতের জয়লাভে অনেকখানি সাহায্য করতো। যাই হক ভারতবর্ষ পাকিস্থানের এই সফরে ভালই খেলেছে বলা চলে। আগামী বৎসর এম-সি-সির বিরুদ্ধে ভারত আস্থার সঙ্গে খেলতে সক্ষম হবে আশা করা যায়।

নিম্নে ভারত ও পাকিস্থান দলের খেলোয়াড়গণের টেষ্টের গড়পড়তা দেওয়া হলো।

ব্যাটিং

ভারত	ইনিংস	সর্ব্বোচ্চ রাণ	নট আউট	মোট রাণ	গড়পড়তা
সি, বোর্দে	৬	১৭৭	২	৩৩০	৮২'৫
পি, উম্‌রিগড়	৬	১১৭	০	৩৮২	৬৩'৬৬
মঞ্জরেকর	৬	৭৩	১	২৪৭	৪৯'৪
জয়সিমা	৫	৯৯	০	২১২	৪২'৪
আর্‌, দেশাই	৫	৮৫	০	১৩৪	২৬'৮
আর্‌, নাদকার্ণী	৪	৩৪	০	৭২	১৮
পাকিস্থান					
হানিফ মহম্মদ	৯	১৬০	১	৪১০	৫১'২৫
সৈদ আমেদ	১০	১২১	১	৪৬০	৫১'১
জাভেদ বার্কি	৯	৭৯	২	৩২৫	৪৬'৪
মুস্তাক মহম্মদ	৭	১০১	১	২৬৩	৪৩'৮
ইমতিয়াজ আমেদ	১০	১৩৫	১	৩৭৫	৪১'৬
ওয়ালিস মাথিয়াস	৭	৪৯	২	১৫০	৩০
ইন্‌তেখাব আলাম	৫	৫৬	১	৯০	২২'৫

বোলিং

ভারত	ওভার	মেডেন	রাণ	উইঃ	গড়পড়তা
আর নাদকার্ণী	১৯১'২	১১৯	২ ৯	৯	২৪'৩
রামকান্ত দেশাই	২১৫'৫	৩৪	৬২৬	২১	২৯'৮
পাকিস্থান					
ফজল মামুদ	১৫০'৩	৫৯	২৪৯	৮	২৭'৬
হাসিব আসান	১০৮	৩২	২৩১	৮	২৮'৮

জার্মান লোকসভা ক্রীড়া-সংঘ

জার্মান প্রজাতন্ত্রের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট সদস্য আর কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারী মিলে গড়ে তুলেছেন জার্মান লোকসভার ক্রীড়া-সংঘ। এই সব গণ্যমান্য ও নধর-কান্তি ভদ্রলোকেরা অতি প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করেন এবং সোজা চলে যান Bonn-এর পার্লামেণ্ট ভবনের নীচের তলায়। সমান্য কিছুক্ষণ পরেই ট্রেনিং-স্যুট্ পরা অবস্থায় অথবা ব্যায়ামের সরঞ্জাম হাতে এঁদের দেখা যায় ছোট্ট ক্রীড়া-কক্ষের মধ্যে। এইভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের দ্বারা এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই প্রাতঃকালীন ক্রীড়া-সংঘ। এখানে প্রাতঃকালীন ব্যায়ামে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা খেলার যেসব সরঞ্জাম নিজেদের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেন, সেই সকল সরঞ্জাম নিয়ে ইচ্ছামত খেলতে বা অনুশীলন করতে পারেন। জার্মান লোকসভার চিকিৎসক তাঁর বিভিন্ন

রোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন, অধিক বয়সে অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ফলে যেসব অসুখের সৃষ্টি হতে পারে, খেলাধুলার কল্যাণে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। যদিও এই ক্রীড়াসংঘের বেশীর ভাগ সভ্যের কাছে খেলাধূলা শুধু "চলন-চিকিৎসা" মাত্র, কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেক সভ্য আছেন যাঁরা ভিন্ন মনোভাব পোষণ করেন। এককালে এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সক্রিয় খেলোয়াড়। এঁদের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রীড়া-পরীক্ষায় উত্তির্ণ হয়ে জর্মানীর 'স্বুবর্ণ ক্রীড়া তকমা' লাভ করা। জার্মান প্রজাতন্ত্রের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এই ক্রীড়া-সংঘের সক্রিয় সদস্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী হলেন 'অল্ জার্মান এ্যাফেয়ার্সে'র' মন্ত্রী এরনস্ট লেমার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্রান্তস ইয়োসেফ স্ট্রাউস্। এঁরা দুজন ব্যায়াম শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঠিক সময় মতো এসে হাজির হন ক্রীড়া-কক্ষে। তারপর দুজনে একটি কৃত্তিম দাঁড়-টানা'-যন্ত্রে অবিরাম দাঁড় টেনে চলেন। ক্রমশঃ ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতে থাকে তাঁদের দেহ থেকে। সুগঠিত এবং সুসমঞ্জস দেহের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মন্ত্রী লেমার বলেন, "স্বচ্ছন্দে আরও কয়েক পাউণ্ড খোয়াতে পারি আমি।"

কিছুদিন আগে দশম বার্ষিক উৎসব পালন করেছে এই ক্রীড়াসংঘ। স্বভাবতঃই উপযুক্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়েছে এই উৎসব। এই উপলক্ষে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য ক্রীড়া-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জার্মান প্রজাতন্ত্রের বৈদেশিক অফিসের সুবৃহৎ কক্ষে বিস্ময়াবিভূত জনতার সামনে "কেন্দ্রীয় খেলোয়াড় দল" প্রমাণিত করলেন যে রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে শুধু মনের দিক থেকে সচল হলেই মানুষের চলেনা, শরীরের দিক দিয়েও গতিশীল হতে হয় তাকে। সাধারণতঃ বৈদেশিক অফিসের এই কক্ষে কালো পোষাক পরা কূটনীতিকদের সমাবেশ হয় বিভিন্ন চুক্তি-পত্রে সাক্ষর দান করতে। কিন্তু সেদিন ক্রীড়া-সংঘের প্রাণবন্ত উৎসব সম্পূর্ণ আলাদা এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল এই কক্ষে। ক্রীড়া-সংঘের সদস্যরা অবশ্য তেমন কোনো নৈপুন্য দেখাতে পারেন নি এই অনুষ্ঠানে। নৈপুন্য প্রদর্শন করেছিলেন সেই সকল সক্রিয় খেলোয়াড়গণ যাঁরা অতিথি হিসাবে



জার্মান পার্লামেণ্টের ভাইস-এ্যাড্‌মিরাল এ, ডি, হেল্‌মুথ হে (সি, ডি, ইউ) তাঁহার 'কোচে'র সহিত দৌড় অনুশীলন করছেন। ইনি ক্রীড়া-সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তবুও প্রশংসার তুফান বয়ে চলেছিলো এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে। মানুষ তো আর প্রতিদিন কোনো মন্ত্রীকে লাফালাফি করতে দেখে না! বিভিন্ন বিখ্যাত অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষগণ ঠিক করেছেন যে, এই অনুষ্ঠানের ফলে যে অর্থসংগৃহীত হয়েছে, পেন্সন ভোগী ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য Bon-এ একটি অবস্থান-কক্ষ প্রতিষ্ঠার কাজে তা দিয়ে সাহায্য করা হবে।

জার্মান প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলর ডক্টর কনরাড আডেনাওয়ার এই ক্রীড়া-সংঘের সম্মানিত সদস্য। কিছুদিন আগে

জনৈক সংবাদিকের নিকট তিনি বলেছেন যে, তিনি শীঘ্রই সক্রিয়ভাবে খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করতে চান। বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে যান সাংবাদিক ভদ্রলোক। ৮৫ বৎসর বয়স্ক চ্যান্সেলর কি ধরণের খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করবেন! কিরূপ খেলাধূলায় তিনি অংশ নেবেন এই প্রশ্নের উত্তরে চ্যান্সেলর জবাব দেন, "আমরা সাধারণ ধরণের একটা বোকসিয়া-গ্রুপ খুলবো। আপনি দেখবেন, আমি অনায়াসে সবাইকে হারিয়ে দেবো।" এটা তাঁর একটা ঠাট্টা না সত্যি এই ব্যাপারে তিনি স্থির সঙ্কল্প, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে Bonn-এর জনসাধারণ। অনেকেই মনে করছেন, এই "প্রাচীন ভদ্রলোকের" পক্ষে সবই সম্ভব। হয়তো একদিন দেখা যাবে 'ট্রেনিং-স্যুট্' পরে খেলার আখড়ায় এসে হাজির হয়েছেন তিনি।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজঃ ৩৯৩ (কানহাই ১১৭, ওরেল ৭১, আলেকজাণ্ডার ৬৩। বেনো ৯৬ রানে ৫, মিশন ৭৯ রানে ৩) ও ৪৩২ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কানহাই ১১৫, হাণ্ট ৭৯, ওরেল ৫৩, আলেকজাণ্ডার নটআউট ৮৭)

অষ্ট্রেলিয়াঃ ৩৬৬ (সিম্পসন ৮৫, বেনো ৭৭, ম্যাকডোনাল্ড ৭১ গিবসন ৯৭ রানে ৫, সোবার্স ৬৪ রানে ৩)

ও ২৭৩(৯ উইকেটে। ও' নীল ৬৫, ম্যাকে ৬২, ক্লিন নট আউট ১৫। ওরেল ২৭ রানে ৩ উইকেট)

এডলেডে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৪র্থ টেষ্ট খেলা অভাবনীয়ভাবে ড্র গেছে।

প্রথমদিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট ক'রে ৭ উইকেটে ৩৪৮ রান করে। খেলার ২য় দিনে ৩৯৩ রানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট হারিয়ে ২২১ রান করে। খেলার ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৬৬ রানে শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২৭ রানে এগিয়ে যায়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের লেন্স গিবস 'হ্যাট-ট্রিক' করেন। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এই প্রথম 'হ্যাট-ট্রিক'। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এর পূর্ব্বে শেষ 'হ্যাট-ট্রিক করেছেন ইংলণ্ডের জে, টি হিয়ার্ণে—১৮৯৯ সালে লিডস মাঠে। ৩য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংসের ১ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে অর্থাৎ ১৭৭ রানে এগিয়ে যায়—হাতে জমা থাকে ৯টা উইকেট।

৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে ৪৩২ রান ক'রে ২য় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ঐ দিন অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলায় ৩উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩১ রান তুলে।

৫ম দিনে অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের থেকে ৪২৮ রান পিছনে পড়ে অষ্ট্রেলিয়া পূর্ব্ব দিনের ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। হাতে জমা ৭টা উইকেট, মাত্র একদিনের খেলা বাকি এবং বিপক্ষের থেকে অনেক রান পিছনে। এই তো অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা! অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের কোন আশাই নেই—একমাত্র আশা খেলাটা ড্র করা। অষ্ট্রেলিয়ার ২০৭ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে গেল। অবস্থা খুব শোচনীয়—হার নিশ্চিত, হাতে মাত্র ১টা উইকেট—খেলার সময়ও প্রচুর পড়ে আছে, প্রায় ১১০ মিনিট। কিন্তু ক্রিকেট খেলা চিরকালই যে অনিশ্চতার জন্যে প্রসিদ্ধ তা এক্ষেত্রেও ফলে গেল।

১০ম উইকেটে বোলার ক্লিন এসে ম্যাকের সঙ্গে জুটী বাঁধলেন। দু'জনেই বোলার—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের আক্রমণে এঁরা আর কতক্ষণ দাঁড়াবেন! এঁদের তো পুঁটি মাছের প্রাণ। অষ্ট্রেলিয়ার হার স্বচক্ষে দেখা যাঁদের সহ্য করা সম্ভব নয় তাঁরা মুখ চুণ করে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল অষ্ট্রেলিয়ার ১০ম উইকেটের জুটি ম্যাকে এবং ক্লিন যেতে চাইলেন না। তাঁরা উইকেট কামড়ে পড়ে রইলেন—১১০ মিনিট ধরে প্রাণপণ আক্রমণ চালিয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বোলাররা এঁদের ১০ উইকেটের জুটী ভাঙ্গতে পারলেন না—খেলার নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত এঁরা নট-আউট রয়ে গেলেন। এঁদের দু'জনের খেলার জন্যেই অষ্ট্রেলিয়া খেলাটা শেষ পর্য্যন্ত ড্র করতে সক্ষম হ'ল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৯২ (সোবার্স ৬৪। মিশন ৫৮ রানে ৪ উইকেট) ও **৩২১** (আলেকজাণ্ডার ৭৩, হান্ট ৫২। ডেভিডসন ৮৪ রানে ৫ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৫৬ (ম্যাকডোনাল্ড ৯১, সিম্পসন ৭৫, ও'নীল ৬৮। সোবার্স ১২০ রাণে ৫, গিবস ৭৪ রানে ৪) ও **২৫৮** (৮ উইকেটে। সিম্পসন ৯২ বার্জ ৫৩। ওরেল ৪৩ রানে ৩। ভ্যালেণ্টাইন ৬০ রানে ৩ উইকেট)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ২—১ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করেছে।

টসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। পীচের অবস্থা ভাল ছিল না। ১মদিনে ৮ উইকেট পড়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২৫২ রান হয়। ২য় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৯২ রানে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ৩ উইকেটে হারিয়ে ২৩৬ রান করে। এইদিনে ৯০,৮০০ সংখ্যক দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিল (বিশ্বরেকর্ড)। অষ্ট্রেলিয়ার ওপনিং ব্যাটসম্যান ম্যাক-ডোনাল্ড এবং সিম্পসনের ১ম উইকেটের জুটিতে দলের ১৪৬ রান ওঠে।

খেলার ৩য় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩৫৬ রানে শেষ হলে অষ্ট্রেলিয়া ৬৪ রানে এগিয়ে যায়। কইদিন মাত্র ১২০ রানে অষ্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট পড়ে যায়।

ঐদিন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংসের খেলায় ২টো উইকেট পড়ে ১২৬ রান ওঠে।

খেলার ৪র্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংস ৩২১ রানে শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ঐদিনের ৪৯ মিনিটের খেলায় ৫৭ রান করে উইকেট পড়ে ১টা।

৫মদিনের খেলা আরম্ভ হ'ল। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের জন্যে তখন আরও ২০১ রান দরকার হাতে ৯টা উইকেট। অর্থাৎ জয়লাভের জন্যে ২য় ইনিংসে তাদের মোট ২৫৮ রান করতে হবে। অষ্ট্রেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রাণ তুলে ২ উইকেটে জয়ী হয়েছে। দলের ২০০ রাণের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। তখন জয়লাভের জন্যে ৫৮ রাণ দরকার পড়ে।

অষ্ট্রেলিয়ার এই 'রাবার' জয়লাভে অষ্ট্রেলিয়াকে নিঃসন্দেহে আজ 'বিশ্ব-বিজয়ী' সম্মানে অভিহিত করা যায়। ১৯৫৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের কাছে শেষ 'রাবার' হারায়। তারপর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড, পাকি-স্থান, ভারতবর্ষ এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় হারিয়ে 'রাবার' লাভ করেছে। এই সময়ে মোট ২৩টি টেষ্ট খেলার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে ১৩টি, হেরেছে ২টি এবং খেলা করেছে ৭টি এবং একটা খেলায় বিপক্ষের রাণের সঙ্গে সমান রান করেছে।

শেষের চারটি টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অধি-নায়কত্ব করেন রিচি বেনো।

আলোচ্য অষ্ট্রেলিয়া-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট সিরিজে 'রাবার' জয়লাভের দরুণ অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক 'ফ্র্যাঙ্ক-ওরেল' ট্রফি জয়লাভ করেছেন।

ভারত-সফরকারী পাকিস্তান ক্রিকেট দল :

ভারতসফরকারী পাকিস্তান ক্রিকেট দল ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৩টি খেলায় যোগদান করে এবং সব খেলাগুলিই ড্র গেছে। এই খেলার মধ্যে ৪টি সরকারী টেষ্ট খেলা আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান এই ১৩টি খেলাতেই টসে জয়ী হয়।

রঞ্জিট্রফি :

রঞ্জিট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে দিল্লী এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার ব্যবধানে বাংলাকে পরাজিত করে। বাংলাদল ১ম ইনিংসে মাত্র ১০ রান পিছনে ছিল।

দিল্লী : ৩০৭ ও ২১০। বাংলা : ২৯৭ ও ৩৮ (কোন উইকেট না পড়ে।

জাতীয় বিলিয়ার্ডস এবং স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ :

১৯৬০ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়াসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান উইলসন

জোন্স ক'লকাতার সোমনাথ ব্যানার্জিকে ৪,৩৬৫—২,৭৩৯ পয়েণ্টে পরাজিত করেন।

১৯৬০ সালের জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে জে, এম, লফির (সিংহল) গত বছরের বিজয়ী উইলসন জোন্সকে পরাজিত করেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

কালীকটে অনুষ্ঠিত ১৯৬০ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। সার্ভিসেস দলের পক্ষে এই প্রথম 'সন্তোষ ট্রফি' জয়।

প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়। ইতিপূর্ব্বে সার্ভিসেস দল ২ বার (১৯৫৪ ও ১৯৫৮) প্রতিযোগিতার ফাইনালে পরাজিত হয়। এছাড়া সার্ভিসেস দল ৩ বার সাম্পাঙ্গি কাপ (সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দলের খেলায় বিজয়ী দলের পুরস্কার) পায়। অপরদিকে বাংলা ১১ বারের, খেলার মধ্যে ১৪ বার ফাইনালে খেলে ১০ বার 'সন্তোষ ট্রফি' পেয়েছে। একমাত্র বাংলা দল উপর্যুপরি 'সন্তোষ ট্রফি' পায় ৩ বার (১৯৪৯—৫১)।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাংলা দল গোল পরিশোধ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। নির্দ্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে বাংলা দল গোল খায়। বাংলার ১০ জন খেলোয়াড় সার্ভিসেস দলের গোলে হানা দিয়ে সার্ভিসেস দলকে নাজেহাল করে কিন্তু বহু সুযোগ পেয়েও একান্ত দুর্ভাগ্যের জন্যে গোল করতে পারেনি। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার দরুণই সার্ভিসেস দল জয়ী হয়।

সেমি-ফাইনালে বাংলা ২য় দিনে কেরালাকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। প্রথমদিনে খেলাটি গোলশূন্য ড্র যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১—০ গোলে আসামকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। এ বছরের প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের কানন একমাত্র 'হ্যাট-ট্রিক' করেন মহীশূরের বিপক্ষে।

সাম্পাঙ্গি কাপের খেলায় আসাম এবং কেরালার খেলাটি ১—১ গোলে ড্র যায়। ফলে ৬ মাস ক'রে তারা কাপটি রাখতে পাবে।

অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি ঃ

১৯৬০-৬১ সালের অন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ২—০ গোলে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী" (প্রথম পর্ব)—৩৲

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "কোষ্ঠী-দেখা" (৩য় সং)—৫৲

শ্রীরমাপতি দাস প্রণীত উপন্যাস "পাথর-চাপা ঝর্ণা"—২.৫০

নিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "দেবলাদেবী" (২৩শ সং)—২.৫০

অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বাগ্‌দত্তা"—৫৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

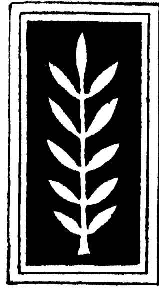
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



গোধূলি

শিল্পী : শ্রীপঙ্কজ

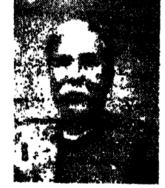
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্











চৈত্র—১৩৬৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

গীতা ও বেদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গীতার কোনও কোনও অংশ পড়িলে মনে হয় যেন বেদ বিরোধী কথা বলা হইয়াছে। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৫ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :

যাহারা বিদ্বান নহে তাহারা নানা কথা পল্লবিত করিয়া বলে। বেদের অর্থবাদের প্রতি তাহারা অতিশয় অনুরক্ত ("অর্থবাদ" অর্থাৎ বেদের যে অংশে বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা যায়)। তাহারা বলে যে স্বর্গ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই সকল ব্যক্তি অত্যন্ত কামনাপরায়ণ এবং স্বর্গলাভের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। ইহারা উৎকৃষ্ট জন্মপ্রাপ্তি এবং উত্তম কর্মফলের কথাই বলিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বহু আড়ম্বর সহকারে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথা বলে। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্তি হেতু তাহাদের চিত্ত তাহাতেই নিবিষ্ট থাকে। তাহারা চিত্ত স্থির করিয়া জীবনের যাহা একমাত্র লক্ষ্য তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। হে অর্জুন—সত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণই বেদের বিষয়বস্তু। তোমাকে এই সকল গুণের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম সকল অবস্থায় সমভাবে থাকিতে হইবে। সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। বাহ্য সম্পদ লাভের আকাংক্ষা, বা রক্ষা করিবার জন্য চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।"

এই প্রসঙ্গে গীতার শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে ভাল হয়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

গীতা ২.৪২-৪৫

"সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ বেদের বিষয়" বলা হইয়াছে। এখানে বেদের কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদে ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের কথা আছে, ইহা সুবিদিত। কর্মকাণ্ডের উপর যাঁহারা বেশী জোর দেন, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য এই কথা যাঁহারা বলেন, এখানে তাঁহাদের নিন্দা আছে। যজ্ঞ করা উচিত নহে, এরূপ কথা বলাও গীতার উদ্দেশ্য নহে। কারণ ১৮.৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "যজ্ঞ দান ও তপস্যা, এই সকল কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এই সকল কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহারা মনীষীদের চিত্ত শুদ্ধ করে।"

যজ্ঞদানতপঃ কর্মনত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

গীতা ১৮.৫

এই সকল কর্ম কি ভাবে অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। "এই সকল কর্ম আসক্তি এবং ফলাকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া করিবে ইহাই আমার নিশ্চিত মত।"

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

গীতা ১৮.৬

স্বর্গ লাভের আশায় যজ্ঞ করার নিন্দা এবং ঐ আকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করার প্রশংসা—ইহাই গীতার উদ্দেশ্য। যজ্ঞ করিতে হইলে উপবাস করিতে হয়, যত্নপূর্বক বিশুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে হয়, অর্থের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এইভাবে আত্মসংযম হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এজন্য উপনিষদও বলিয়াছেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিলে উহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক।

তমেতং বেদানু বচনেন ব্রাহ্মণা
বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪।২২

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ এই ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছায় বেদপাঠ করেন এবং নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে যে গীতা উপনিষদ সকলের সার। এখানে দেখা যাইতেছে যে সত্যই গীতা উপনিষদের সার। ইহাও বলা যায় না যে বেদে যেভাবে যজ্ঞ করিতে বলা হইয়াছে সেভাবে যজ্ঞ করিতে বলা গীতার উদ্দেশ্য নহে। গীতা ১৭ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ না করিলে সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয় না।

অফলাকাংক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥

গীতা ১৭।১১

"ফলের আকাংক্ষা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে মন স্থির করিয়া যজ্ঞ করিলে তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হয়।"

তামসিক যজ্ঞে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করা হয় না।
বিধিহীন সদৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন সদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥

১৭।১৩

"তামসিক যজ্ঞ বিধিহীন, তাহাতে অন্ন উৎসর্গ করা হয় না, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা দেওয়া হয় না, বিশ্বাস থাকে না।"

গীতাতে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, কোন্ কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম কর্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।

গীতা ১৬।২৪

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান বেদ। সুতরাং গীতায় বেদকে অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে। বেদের বিরোধ করা কখনও গীতার উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

গীতায় অন্যত্রও বেদকে সম্মান করিয়া কথা বলা হইয়াছে।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং

(গীতা ১৫।১৫)

সকল বেদে আমাকে জানিবার উপায় বলা হইয়াছে। বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায় আমার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে। বেদের প্রকৃত অর্থ আমিই জানি।"

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্ যতয়োবীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ গীতা ৮।১১

বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে অক্ষয়পুরুষ বলিয়াছেন, বৈরাগ্যযুক্ত মুনিগণ যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহাকে পাইবার উপায় সংক্ষেপে বলিব।

গীতার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে গীতা হইতেছে সমগ্র বেদের সারভূত—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং নিখিলবেদার্থ সারভূতং।"

স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর Vaishnavism, Saivism and Other Minor Religious Faiths নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। Vaishnavism বলিতে তিনি গীতায় প্রতিপাদিত ধর্মই বুঝিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দুইটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে,—যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা এবং বৈদিক যজ্ঞ নিষ্ফল এই মত।" (The repudiation of animal sacrifices and the inefficacy of sacrificial worship are common to Vaishnavism and Buddhism). তাঁহার এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে গীতায় দেখা যায় যে শাস্ত্র অনুসারে কর্ম করা উচিত (১৬।২৪) এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করা উচিত (১৭।১১)। সুতরাং বেদে যেখানে পশুবধের কথা আছে, গীতা অনুসারে সেখানে পশু বধ কর্তব্য। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অশ্ব বধ করা হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫ সূত্রে বলা হইয়াছে "কেহ যদি আপত্তি করে যে যজ্ঞ অপবিত্র—কারণ যজ্ঞে পশুবধ করা হয়, তাহার উত্তর এই যে, বেদে যাহা করিতে বলা হইয়াছে তাহাই ধর্ম, বেদে যখন যজ্ঞের সময় পশুবধ করিতে বলা হইয়াছে তখন যজ্ঞে পশুবধে অপবিত্র হইতে পারে না।" ইহার ভাষ্যে রামানুজ ঋগ্বেদ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে "হে অশ্ব, আমরা তোমাকে হিংসা করিতেছি না, যজ্ঞে তোমাকে ছেদন করিতেছি তুমি স্বর্গে চলিয়া যাইবে বলিয়া।" রামানুজ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে চিকিৎসক হয়ত রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করিল, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য রোগীর কল্যাণসাধন করা; যজ্ঞে পশুবধও সেইরূপ।

গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে বৈদিক যজ্ঞ করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ

যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—

মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

গীতা ৯।২০

"বৈদিক মার্গ অনুসারী ব্যক্তিগণ সোমপান করিয়া পাপমুক্ত হন, তাঁহারা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যময় সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত এবং স্বর্গে থাকিয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করেন।"

সুতরাং স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের এই উক্তি ভুল যে বৈষ্ণব ধর্মে বলা হইয়াছে যে বৈদিক যজ্ঞ নিষ্ফল। এই স্থলে বা অন্যত্র গীতা কোথাও বেদবিরোধী কথা বলেন নাই।

রবীন্দ্রকাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলী

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

রবীন্দ্রকাব্যের সহিত বৈষ্ণব কবিতার সম্পর্ক বাংলাসাহিত্যের বহু আলোচিত বিষয়গুলির একটি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার নূতনত্ব নষ্ট হয় নাই। নিটোল মুক্তা ফলকে নানা দিক হইতে অসংখ্যবার দেখিলেও বার বার নূতন নূতন আলোক বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। সাহিত্যক্ষেত্রের অর্থগূঢ় বিষয়গুলিও তেমনই।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর প্রভাবে দেশবাসীর চিত্ত যখন এককালে ভাবপ্রাবল্যে নিজের স্বাভাবিক চিন্তা স্তরের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, বৈষ্ণবপদাবলীর পূর্ণ সমৃদ্ধি তখনই। বহু কবির সারাজীবন আহৃত ও অনুভূত ভাব সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনার সাধনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহার সহিত প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলী মিলিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডারে শুধুই যে বিবিধ ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী জমিয়া উঠিতেছিল তাহা নহে, চৈতন্যের নিজের জীবন, তাঁহার ভক্ত পার্ষদগণের জীবন, বহু কবির ঐকান্তিক ও জীবনব্যাপী সাধনার আন্তরিকতা সবগুলি মিলিয়া মিশিয়া পদাবলী সাহিত্যের চারিদিকে একটি সম্ভ্রম ও রহস্যমণ্ডিত গোধূলি পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। রোমান্টিক মনের কাছে এই ধরণের পরিমণ্ডল গভীর আবেদনবাহী।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সাধনার উপর এই পরিমণ্ডল কোন না কোনও আকারে কখনও স্পষ্টরূপে, কখনও প্রচ্ছন্নরূপে ছায়া বিস্তার করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্য সাধনাও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কিভাবে বৈষ্ণবপদাবলীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহার বিবরণ জীবন স্মৃতিতে পাওয়া যায়। সারদাচরণ মিত্রের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ পড়িয়া অপ্রচলিত ঝঙ্কারবহুল শব্দাবলীর মধ্যে ভাবের অস্ফুট সঞ্চরণ তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিল। এই ভাষা তিনি চেষ্টা করিয়া শিখিলেন, এবং 'এক মেঘলা দিনের ছায়া ঘন অবকাশের আনন্দে' 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে' পদটি লিখিয়া ভানুসিংহের পদাবলীর সূচনা করিলেন।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন বিশ্বজগতের সব কিছুই তাহার নিকট নূতন মনে হয়। প্রকৃতির রহস্য ও মানবচিত্তের সূক্ষ্মতার কোনও অন্ত পাওয়া যায় না। 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ এই স্তরের মধ্যে সদ্য আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। পদাবলীগুলি সচেতনভাবে কোনও গভীর কাব্যপ্রেরণার আবেশে লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহাদের রচনাকালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কতকগুলি পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপলব্ধি করি।

তখন 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী' রচিত হইয়াছে। আপনার কবিসত্তা সম্বন্ধে কবি সবেমাত্র সচেতন হইয়াছেন। জীবনের প্রথমাবধি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে একটি অচেতন অন্ধ আকর্ষণের ভাব ছিল এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি বিস্ময় আকারে যাহা তাঁহার পরবর্তী কাব্যসাধনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহার মনের মধ্যে তখন তাহার অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। প্রকাশের উপায় স্থিরীকৃত হয় নাই। ঠিক সেই সময়েই বৈষ্ণবকবিতাগুলি তাঁহার নিকট এক বিশেষ আবেদন বহন করিয়া আনিল। একদিকে পদাবলীর বহিরঙ্গে যে পরিবেশগত সৌন্দর্য আছে তাহাই অনুভূতিপ্রবণ চিত্তের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়। মধুঋতুতে পুষ্পিত কুঞ্জবন, ঝড়ের রাত্রে তমসাবৃত অভিসার, যমুনাতীরের বিচিত্র বর্ণবহুল সৌন্দর্য একটি কাব্যময় জগতের আভাস বহন করে, রোমান্টিক মন তাহাতে আপনার কল্পনাকে উধাও করিয়া দিয়া তৃপ্তি পায়। আর একদিকে ভাবের ক্ষেত্রে রাধার আর্তি। প্রখ্যাত বৈষ্ণবকবিদের রচনায় তাহার সংহত ও তীব্র প্রকাশ পাঠক মনকে গম্ভীরভাবে আবিষ্ট করে। বৈষ্ণবকাব্যের বহিরঙ্গ সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিল এবং জগৎ ও জীবনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় ও তজ্জনিত আকুলতার দূরগত প্রতিধ্বনি রাধার আকুলতার মধ্যে কবি অনুভব করিলেন। সেইজন্য রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার নিজের এক একটি অনুভূতি ক্ষণিক বিদ্যুৎশিখার ন্যায় দেখা দিয়াই মিলাইয়া গিয়াছে। কোনও অজ্ঞাতকে উদ্দেশ করিয়া ভানুসিংহ যখন বলিতেছেন—

"হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল
চরণকমলযুগ ছোঁয়।"

অথবা মৃত্যুকে যখন "শ্যাম সমান" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার মেঘবর্ণ জটা, রক্ত অধর, এবং 'তাপবিমোচন করুণ কোর' এক সঙ্গে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তখন তাহাকে ঠিক বৈষ্ণবকবিতার প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র মনে হয় না। বৈষ্ণবকবিতার বহিরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, বৈষ্ণবকবিতার ভাবাবহকে পশ্চাৎপটে স্থাপন করিয়া একালের লিরিক কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিই এখানে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রকাব্যসাধনায় দ্রুত পর্বান্তর ঘটিতেছে। সন্ধ্যাসংগীতের বিষাদময় 'হৃদয়-অরণ্য' এবং প্রভাত-সংগীতের আলোকোজ্জ্বল মুক্তি দুইই তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। ব্যক্তি হিসাবেও তাঁহার অধ্যয়ন বাড়িয়াছে, অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে, কালিদাসপ্রমুখ সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের সহিত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় স্থাপিত হইয়াছে।

এক কথায় তাঁহার অনুভূতির পরিসীমা বিস্তৃততর হইয়াছে। যে রোমান্টিকতা পূর্বে মৃদু ও সঙ্কুচিত আত্মপ্রকাশে ব্যাপৃত ছিল তাহা প্রাণ ক্ষমতায় সম্পূর্ণ আস্থাবান হইয়া সুতীব্র ও মধুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কাব্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'চৈতালি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কল্পনা' পর্যন্ত এই অবিমিশ্র সৌন্দর্যরস পিপাসার একটি সুন্দর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কালিদাসের কালেও 'আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব' ছিল, লোভ হিংসা দ্বেষের অভাব ছিল না, তাঁহাকেও 'জীবনমন্থনবিষ' পান করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাব্যের কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে তব কাব্য সৌন্দর্য কমল
আনন্দের সূর্য পানে।"

এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার মনোভাব অনুরূপ। পদাবলী পড়িবার সময় ঝড়ের বাস্তব অসুবিধা বা অসৌন্দর্য সমস্ত ছাপাইয়া মানসচক্ষে কেবল ছবির মত দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে, বিকশিত কদম্ববনের ছায়াপথে যমুনার তীরে, প্রেমের আকর্ষণে, ঝড় বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো পথ চলেছেন।"

মানবজীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা এই সময় কালিদাসের কাব্যের ও বৈষ্ণব কবিতার নূতন ব্যাখ্যা দান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। 'কুমার-সম্ভব গান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে দেব-দম্পতির নিকট কুমারসম্ভব গান শুনাইতে দেখিতেছেন। সঙ্গীতের কালে দেবীর মুখে হাসি, অশ্রু, স্মিতকৌতুক সমস্ত পার হইয়া যখন অবশেষে 'ব্যাকুল শরম-খানি নয়ননিমেষে নামিল নীরবে' কবি অসমাপ্ত গানে থামিয়া গেলেন। বৈষ্ণব কবিদের প্রেমানুভূতির সূক্ষ্মতায় বিস্মিত হইয়া কবি তাঁহাদের প্রশ্ন করিতেছেন—

—"এই প্রেম কথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার
আঁখি হতে?"

অদ্ভুত প্রবন্ধাবলীতে মানুষের প্রতি মমতায় মুগ্ধ কবি কল্পনা করিতে-ছেন মানবীয় স্নেহপ্রেমের মধ্যে যে অনন্তের অভিমুখী গভীর মহিমা আছে বৈষ্ণব কবিরা তাহাকেই দেবত্বের মর্যাদা দিয়াছেন। বস্তুত রোমান্টি-কতার ইহাই লক্ষণ। তাহা একদিকে যেমন নিত্য পরিচিতের মধ্য হইতে বিস্ময়ের উপাদান আবিষ্কার করে, অপরদিকে তেমনই বাস্তব জীবন পার হইয়া অপরিজ্ঞাত দূর সৌন্দর্যলোকে চলিয়া যায়। রবীন্দ্র-নাথের কবি জীবনের মধ্যাহ্নকালে এই রোমান্টিকতার যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল, যে 'শতেক যুগের কবিদল, আকাশে মিলিয়া 'মত্তমদির বাতাসে' শত শত যুগের গীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্ট রূপরস লোকের বিশিষ্ট সুরটিও অন্যতম।

নদী যতই উৎস ছাড়িয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয় ততই তাহার মধ্যে স্রোতের চাঞ্চল্য অপেক্ষা মন্থর বিস্তারই অধিক পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মনও তেমনই। গীতাঞ্জলি রচনার প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে রবীন্দ্রকাব্যে এইরূপ একটি আত্মনিবেদনমূলক মন্থরতা দেখা দিয়াছে। তখন তাঁহার অনেক রচনাই বৈষ্ণবপদাবলীর প্রায় আন্তরিক প্রতিধ্বনির মত শুনায়।

রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, কৃষ্ণাখ্য স্বয়ং ভগবান দুই রূপে রূপান্ত-রিত হইয়া আপন মাধুর্য আপনি আস্বাদন করিতেছেন—বৈষ্ণব দর্শনের ও কাব্যের ইহা অন্যতম মূল কথা। রবীন্দ্রকাব্যেও জীবনদেবতা বোধের মধ্য দিয়া 'আমি'ও 'তুমি' এই দুই সম্বোধনের মাধ্যমে একটি দ্বৈত সত্তার ধারণা আভাসিত হয়, এবং উপরোক্ত বৈষ্ণবদর্শনের প্রায় প্রতিধ্বনির মতই শুনা যায়—

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের তত্ত্বও বৈষ্ণবকাব্যের অন্যতম প্রধান উপাদান। ভগবানকে ভক্তের আয়ত্তাতীত কোনও ক্ষমতায় মণ্ডিত না করিয়া তাঁহাকে স্নেহময় প্রিয়জনরূপেই কল্পনা করা হয়। রবীন্দ্রকাব্যেও বারংবার এই চরণের উক্তি দেখা যায়—

"তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে
আমার বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাক থেমে।"

ইহা ছাড়াও বৈষ্ণবকাব্যের পূর্বরাগ অভিসার মান অভিমান বিরহমিলন-লীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রকার ভেদের সমার্থক বহু অংশ রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া দুষ্কর নহে। বর্ষারাত্রির নিবিড়তায় তাঁহার মনে হইয়াছে—

"তোমার লাগি জাগেন ভগবান
নিশীথে ঘন আন্ধিয়ারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।"

বিদ্যাপতির 'বিদ্যাপতি কহ কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া'র বিরহব্যাকুল ভাব রবীন্দ্ররচনায় বার বার নানা আকারে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভানুসিংহের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে যাহা লক্ষ্য করা গিয়াছিল এখানেও সেই বিষয়টিই অন্য আকারে আমরা পুনরায় লক্ষ্য করি।

বৈষ্ণবকাব্যের যে প্রিয় সম্বোধন তাহা প্রত্যক্ষভাবে ভগবৎ সত্তা-কেই। রবীন্দ্রনাথের যে 'তুমি' তাহা সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধিত কোনও সত্তা নহে। একটি কবিতা লিখিবার সময় কবির অন্তর্লোকে যে সহস্র ভাবের আলোছায়াপাত হইয়া থাকে, অজস্র স্মৃতি ও অসংখ্য নরনারীর মুখচ্ছবি উদিত হয় তাহা বিশিষ্ট কিছু নহে। "বহু দিনরজনীর বহু নরনারীর, বহু স্মৃতিবিস্মৃতির, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার, বহু ভালোলাগার

একত্র ঘনীভূত সমাবেশ এই 'তুমি'।" সীমার সহিত অসীমের মিলন-সাধনের যে পালাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের প্রধান পালা বলিয়াছেন—আরাধ্যকে সিংহাসনের আসন হইতে নামাইয়া প্রিয়রূপে গ্রহণ করার মধ্যে তাহারও গভীর ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। বিশাল ভাবের সহিত ক্ষুদ্র বাস্তবের সমন্বয় প্রচেষ্টা, একদিকে দেশকালের গণ্ডীতে অবিচ্ছিন্ন বিরাট জগৎ ও চিরপ্রবহমান জীবনধারা, অপরদিকে ব্যক্তির ক্ষুদ্র অনুভূতির মধ্যেই বিরাটের বিরাটত্বের আভাস, এই বোধের আনন্দ ও মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেও কবি বলিতে পারেন—

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম যে হত মিছে।"

বস্তুত আক্ষরিক অর্থে নহে, জীবনদেবতার সহিত লীলার বর্ণনায় নহে, বিচ্ছিন্ন কবিতার ক্ষণস্থায়ী মনোভঙ্গীগুলিতেও নহে, কোনওখানেই রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের অধিকল এক বলা যায় না। মিল অন্যত্র, একেবারে উৎসে, অনুভূতির গভীরতম প্রদেশে, এবং সে স্বধর্মের কারণ এই যে বিভিন্ন প্রতিবেশ ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত হইলেও মানবমনের মধ্যে দেশকালের অতীত কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে।

অনুভূতি যখন কবিচিত্তকে অধিকার করে তখন প্রথমে তাহা একটি তীব্র রূপ ধরিয়া উচ্ছ্বাসে ও উল্লাসে চঞ্চল হইয়া ওঠে। তাহার পর যতই ইহা গভীর ও পরিণত হইতে থাকে ততই চাঞ্চল্যের স্থলে একটি স্তিমিত মন্থরতা আসিয়া উপস্থিত হয়। গভীর রসাবেশের মুগ্ধতায় মনে হয় আমাদের চেতনার পরপারে কাহার যেন অস্তিত্ব রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা জাগায়, অথচ ধরা দেয় না, ব্যাকুল করিয়া তোলে, অথচ সেই ব্যাকুলতার স্বরূপ বুঝিতে দেয় না, এবং সব মিলিয়া চিত্ত জলভারে অবনত শ্রাবণ মেঘের মত সেই অনির্দেশ্যের পদমূলেই নিঃশেষ হইয়া যাইতে চাহে। সমস্ত জাগ্রত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি গভীর আত্মসমর্পণের আবেগ আসিয়া তখন কবিচিত্তকে অধিকার করে। এই আত্মবিস্মৃত শান্তির মধ্যে বিশেষ এক ভঙ্গীর কবিতার জন্ম হয়। যাহার পরিচয় রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' বিষয়ক বহু কবিতায়, চৈতালির 'উৎসর্গে', খেয়ার 'বালিকাবধূ' 'প্রতীক্ষা' প্রভৃতিতে, সমগ্র 'গীতাঞ্জলি'তে এবং শেষ পর্যায়ের বহু কবিতায়।

বৈষ্ণব কবিদের মন যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এই নম্র শান্তির সম্পূর্ণ অনুকূল। অব্যবহিত চৈতন্যপরবর্তী যুগে বৈষ্ণব বলিতে একটি বিশেষ আদর্শ অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে দেশবাসীর চিত্তে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত ছিল। চৈতন্যের নিজের জীবন, তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদগণের ব্যবহার প্রভৃতির মধ্য দিয়া তাহার যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নম্র নিরহঙ্কার স্বল্পে-সন্তুষ্ট একটি জীবন; গভীর সৌন্দর্যবোধে মহিমান্বিত, হরিদাসের একটি উক্তির মধ্য দিয়া যাহার অন্যতম উদাহরণ দান করা যায়—

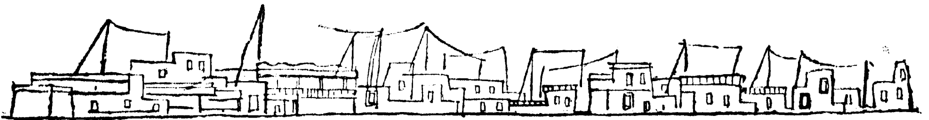
"সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥"

তৎকালীন ভাবুক ও কবিগণের মধ্যেও চিরকালের যে জিজ্ঞাসা বর্তমান ছিল এই আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহাতেই তাহার শেষ পরিণতি স্থির করিয়া তাঁহারা শান্ত ও তৃপ্ত হইয়াছিলেন। সারাজীবনের সাধনা দুই একটি পদ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পদাবলী রচয়িতা বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের রচনায় জীবনব্যাপী সাধনফলের সেই আন্তরিকতা পরিদৃষ্ট হয়। অনেকটা রবীন্দ্রনাথ যাহা তাঁহার অনুভূতি হইতে অভিজ্ঞতাস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন—

"দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই সাদৃশ্য বৈষ্ণবকাব্যের ঠিক প্রভাববশতঃ নহে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব কবি ও উনবিংশ শতাব্দীর লিরিক কবির মানসযাত্রার পথও বিভিন্ন। কিন্তু যে পথেই হউক, গভীর অনুভূতির আকার এক বলিয়াই তাঁহাদের এই সাদৃশ্য।

ব্যক্তির মনের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি ভাসিয়া বেড়ায়, অন্যের রচিত দর্শন সাহিত্য কাব্যে অনেক সময়েই তাহাদের সংবদ্ধ ও অর্থময় সুস্পষ্ট বাণীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। বেদ উপনিষদের নিঃসংশয় শান্তিময় উদাত্ত স্তবের মনোভঙ্গী তাঁহার চিত্তে চিরকাল গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের রোমান্টিক কবিগণের ভাববস্তু তাঁহার রসানুভূতিকে বারংবার আকৃষ্ট করিয়াছে। অনুরূপভাবেই বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্ট রূপজগৎ, এবং কবিদিগের অনুভূতির সুর তাঁহার চিত্তের অন্তর্লোকে একটি গভীর রসপ্রেরণারূপে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার অনুভূতির সহিত নিঃশেষে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব কবিতার স্থান সম্বন্ধে এইরূপই মনে হয়।



রিয়্যালিষ্ট বনাম মডার্ণ আর্ট

অমল বিশ্বাস

ভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আজকাল এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক পক্ষ নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মডার্ণ আর্টের স্বপক্ষে কথা বলছেন, আর অপর পক্ষ রিয়্যালিষ্ট আর্ট সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চাইছেন। ফলতঃ মন কষাকষি ইত্যাদি নানা বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সূক্ষ্ম বিচারের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে উভয় পক্ষের কোনটিকে হেয় প্রতিপন্ন করা চলে না। অপরাপর বিষয়ের মত শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিপত্তি যাই হোক না কেন, এর কার্যকরী দিক একটা আছেই—যে দিকটি দোষ ত্রুটি, গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে; গতানুগতিক খাতে কিছু বয়ে যাওয়ায় সেগুলি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে না। বিপরীত রীতিনীতির সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনায় গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণও সহজসাধ্য হয়।

মডার্ণ ও রিয়্যালিষ্ট আর্টের তুলনায় প্রথমে দেখা যাক মডার্ণ বলতে কি বোঝায়। মডার্ণ অর্থে হঠাৎ কিছুর প্রকাশ নয়—অতীতের আপেক্ষিক তাৎপর্যে মডার্ণত্ব। অর্থাৎ প্রবহমান কোন কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ রূপান্তর। সুতরাং মডার্ণ বলতে আজ যে শিল্পরীতিকে বোঝায় ভবিষ্যতে সে রীতি মডার্ণ বলে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধোত্তর কালে পাশ্চাত্যে মডার্ণ আর্টের যে ঝড় উঠেছে সেই ঝড়ের দাপট প্রাচ্য তথা ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অথচ মডার্ণ বা আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পসৃষ্টি আজও জমে ওঠেনি—নানা পরীক্ষানিরীক্ষা ও বাদানুবাদের মধ্যে চলেছে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে মেনে নেওয়া যেতে পারে না—আবার বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতেই অতীতকে বিচার—মডার্ণ আর্ট ও রিয়্যালিষ্ট আর্টের বিরোধের ক্ষেত্রে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে। মডার্ণ আর্টের প্রচলন রিয়্যালিষ্ট আর্টকে কেন্দ্র করেই। কাঠামোকে অস্বীকার করে যেমন মূর্তি নির্মাণ সম্ভব নয়, তেমনি ভাব, রেখা ও বর্ণবিন্যাসকে অস্বীকার করে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান রূপান্তর বা ইজম্-এর মার-প্যাঁচ রিয়্যালিষ্ট আর্টকেই আশ্রয় করে। বর্তমান যুগে মডার্ণ আর্টের প্রচলনও আকস্মিক বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সংস্কৃতি বহুলাংশে যুগ-নির্ভর। দেশের ধর্ম, শিক্ষা দীক্ষা, রীতিনীতি, শিল্প সাহিত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাপর পরিবর্তনের সঙ্গে মানব মনের বিবর্তন সাধিত হয়। এই বিবর্তনকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটে। মডার্ণবাদীরা আভাষে যা বলতে চাইছেন, তার মর্মার্থ হল সকল গতানুগতিকতা এড়িয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি। আগ্রহ সৎ। কিন্তু ব্যাপকঃ দৃষ্টিতে যেটুকু নতুন বলে প্রতিভাত হচ্ছে তা বিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন নিয়ে আস্ফালনের কিছু নেই। কালের গতির সঙ্গে সংস্কৃতি এক ভাবধারা থেকে আর এক ভাবধারায় রূপান্তরিত হয়। সকল ক্ষেত্রে এই রূপান্তর সার্থক পরিণতি লাভ নাও করতে পারে। আধ্যাত্মিক চেতনা সঞ্জাত সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ধ্যান-ধারণার সাহায্যে রূপ পরিগ্রহ করে ফুটে ওঠে। শিল্পসৃষ্টির এই প্রেরণাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম। এই ধর্মকে অস্বীকার করে এদেশে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে, অতীতের হুবহু অনুকরণ। নিত্য নতুন করণ-প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রয়োজন অনুসারে রিয়্যালিষ্ট আর্ট থেকে রসদ আহরণ করা দোষের কি? এ ব্যাপারে ঔদাসীন্য নিছক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টিতে দেশকাল পাত্র বিশেষে শিল্পকলার রস ভারতীয় শৈলীতে নতুন ভাবে প্রাণ পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা বিবর্তন যা ঘটছে তা অনুভূতির। অনুভূতি পরিবর্তনশীল—তাই মানব মনের ধর্মে নিত্য নতুন ভাবের দ্যোতনা।

মেঘমন

মায়া বসু

এক মুঠো মেঘ উড়ে এসেছিল কোন দূর দ্বীপ থেকে,
অচেনা ফুলের মৃদু সুগন্ধ মেখে !
পার হয়ে কত গিরি প্রান্তর কত ধূ ধূ ময় মরু—
কত বিশীর্ণ পত্রবিহীন তরু !
তোমার বুকের সাহারায় সেই ক্লান্ত মেঘের মায়া,
ক্ষণিকের তরে ফেলে গেল তার মৃদু মন্থর ছায়া।
বিরহ বিধুর উন্মন মন ভুলে,
সে মেঘের পানে চাও যদি চোখ তুলে,
জেনো ওই দুটি আঁখির মায়ায় পথ ভুলে অকারণ,
সহসা থমকি থেমেছে এ মেঘমন !

মধু বসন্ত ফুলের বাসরে বরণের মালা গাঁথে,
নিজন নিশীথে প্রিয়ের প্রতীক্ষাতে।
আবেশ আতুর তুমিও পুলকে···উচ্ছল চঞ্চল,
হৃদি সরসীতে ফুটেছে প্রেমের রক্তিম শতদল।
পুষ্পিত বন শাখায় শাখায়
এলোমেলো হাওয়া দোলে,
প্রিয় মিলনের রাগিণীর সুর বেজে ওঠে হিন্দোলে।
সে সুরের রঙে রঙীণ পলাশ শিরীষ সলজ্জায়,
নব বসন্ত বাহারে প্রাণের গানখানি লিখে যায় !
তৃষ্ণার ফাটা চৌচির মাঠ
চৈত্রের রোদ্দুরে
কার কালো ছায়া কাঁপে ও আকাশ জুড়ে ?
বন্ধ্যা ধূসর মাটির ফাটলে এনেছে যে শিহরণ
বেদনার কালো ছায়া হয়ে দোলে—
সে আমারি মেঘমন !

পথের পত্র

শ্রীভোলানাথ গুপ্ত

পথ প্রান্তে এসে আজ জীবনের ইতিহাস লিখি,
লিখি মনে মনে—
অলস ঔদাস্য-ভরা নিরালা নির্জনে
নিঃসঙ্গ পথিক আমি।
কখনও উতলা হাওয়া অজানার ডাকে ডেকে যায়
বনতল মর্মরে শুধায়,
'কে তুমি একলা
ঝরা পাতা নিয়ে খেল বনছায়ে ক্ষণিকের খেলা ?
বলি যাত্রী আমি
তোমাদের স্নেহ-তীর্থে ক্ষণকাল ক্লান্ত পদে থামি
গেয়ে গান পথ চলা সুরে
সঙ্গীহীন চলে যাব দূরে।
রবে না আমার চিহ্ন, স্মৃতি শুধু দক্ষিণ বাতাসে
মিশে রবে অনাগত ফাল্গুনের কোন অবকাশে,
নামহীন পথিকেরে ক্ষণে ক্ষণে করিয়া উতলা
দিয়ে যাবে দোলা।'
পাতার আড়াল হতে সহসা কূজনে বলে পাখী
'কে তুমি পথিক ওগো এ বিজনে নিঃসঙ্গ একাকী,
কার প্রতীক্ষায়
প্রহর চলেছ গুণে পত্র-ঝরা বনবীথিকায় ?'
বলি পান্থ আমি
নিরালা এ তরুছায়ে ক্ষণিকের অবকাশে থামি,
চলেছি নীরবে এই জীবনের লিখে ইতিহাস ;
কত অশ্রু-হাসি ভরা, কত দীর্ঘশ্বাস
পাতায় পাতায় যার রেখে গেছে
স্মৃতির-স্বাক্ষর।
কত জানাজানি
কত না চোখের কোণে থেমে যাওয়া অকথিত বাণী,
নীরবের কত পিছু ডাকা
মোর সেই ইতিহাসে চিরতরে হয়ে গেছে লেখা।
স্মৃতির অতল হতে সেই রত্ন তুলি একে একে
মোর এই বর্তমান খেলে আসা আপনায় দেখে।'



অমর যখন প্রথম তাকে দেখে, তখন, তাকালে চোখ নামিয়ে নেয়, কথা কইতে কথা আটকে যায়, এমনিই লজ্জা ছিল চারুলতার।

অমর তখন নতুন পাশ করে বেরিয়েছে। স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। পড়াশুনায় ভালো ছিল। চেহারা এবং স্বভাবের গুণে জনপ্রিয় বরাবর-ই। যখন যেখানে, যে পরিস্থিতিতে থেকেছে, সেখানে-ই, সে সকলের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। সেজন্যে তাকে কোন চেষ্টা করতে হয়নি।

সমাজে পরিচিত, সম্মানিত পরিবারের ছেলে হলে স্কুলে কলেজে, বাইরে, একটা প্রভাবপ্রতিপত্তির ঠাঁই এমনিতে-ই মেলে।

সেই কারণে অমরের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ছোটবেলা থেকেই ছিল। সেই আত্মপ্রত্যয়ের একটা দীপ্তি তাকে ঘিরে থাকত। ছাত্র অবস্থাতে-ই মনে হতো অমর যেন অনেক কিছু করতে পারে, করে দিতে পারে অন্যকে।

কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে, বিশেষ কোন লোককে চাই। অথচ ছেলেরা তাঁকে ডেকে-ও পাচ্ছে না। তাঁর সময় নেই। অথবা তিনি হয়তো আগে থেকেই অন্য কোথায়ও যেতে প্রতিশ্রুত।

তখন অমর এগিয়ে আসতো। সকলে জানতেও পারত না, সে কেমন করে কি করলো।

অথচ বিশেষ দিনটিতে সেই বিশেষ মানুষটিকে অমরের-ই গাড়ী থেকে নামতে দেখা যেত। অনুষ্ঠানের সময়-ও অমর-ই সব বিষয়ে অগ্রণী। প্রিন্সিপ্যাল তাকেই সব জিজ্ঞাসা করেন।

এমনিই সব সময়ে। গানের অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন শিল্পীকে প্রয়োজন হলে অমরের নামই সকলের মনে পড়েছে। বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজনে বড় কোন ডাক্তারকে ডাকতে হবে, চাকরীর সুপারিশের জন্যে কাউকে ধরতে হবে, মা বা বোনের জন্যে হাঁসপাতালে একটা ফ্রি বেড করে দিতে হবে, এই সব সময়ে-ও অমর হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছে। যে সব কাজ করবার জন্যে মানুষকে ঘোরাঘুরি করে জুতো ক্ষইয়ে ফেলতে হয়, সরকারী লালফিতের ফাঁস খুলতে গিয়ে হয়রাণ হতে হয়, সেই সব দুরূহ কাজ-ই অমরের কাছে খুব সহজ। কিছুই নয়।

ধন্যবাদ দিতে গেলে অমর সবিনয়ে হেসেছে। বলেছে —ধন্যবাদ দেবার কি আছে? আমি ত' এমন কিছু করিনি। সৌমেনবাবুকে ফোন করতে-ই উনি রাজী হলেন।

নামকরা ডাক্তার, অফিসার বা দেশনেতাকে এমন করে সহজে বলতে পারবার, অনুরোধ করতে পারবার যে গৌরবটুকু, সেটুকু অনুভব করেছে শ্রোতারা। যারা অমরের সৌজন্যে বা সাহায্যে ধন্য হলো, তারা।

অমরের স্বভাবটা অমায়িক। তাই, এত সহজে মানুষের বড় বড় উপকার করবার আত্মপ্রসাদটাকে সে অহঙ্কারে রূপান্তরিত হতে দেয়নি।

তবু, সেই আত্মপ্রসাদে তার মধ্যে অল্পবয়স থেকেই একটা কেউকেটা-র ভাব এসেছে। অনেক কিছু করে দিতে পারে সে। অন্যদের অনেক উপকার করতে পারে। এই ভাবটা তার মধ্যে বিচ্ছুরিত হয়েছে। বিপদে পড়ে, প্রয়োজনে পড়ে, তবু যদি তার কাছে কেউ আসেনি— অমর নিজে এগিয়ে গিয়েছে। বলেছে—

—কি আশ্চর্য, ডক্টর মিত্র সময় দিতে পারছেন না? আমাকে বলনি কেন? আমাকে একবার বললে······

তারপর, চৌষট্টি টাকা ভিজিটের দুর্লভদর্শন ডাক্তার মিত্র, সেই মানুষটির বাড়ীতে গিয়েছেন অমরের সঙ্গে। বত্রিশটাকা নিয়ে-ই বিনা আপত্তিতে চলে এসেছেন। অমর হয়তো সেখানে, সেই পরিবারে আর যেতে পারেনি। কিন্তু সেই পরিবারটি তার কথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছে।

আস্তে আস্তে, অমরের অজ্ঞাতে, তার মধ্যে এই উপকার করে মহৎ নাম কিনবার চেষ্টা, এই পৃষ্ঠপোষকতা করে জয়ী হবার চেষ্টাটা, একটা স্বভাবে দানা বেঁধেছে।

এই-ই অমর।

পরীক্ষা দিতে না দিতে কাকা সরকারী পরীক্ষা দেওয়া-লেন। আর, চাকরীটা তার হয়ে যাবে-ই, এটা নিশ্চিত জেনে অমর গেল কেষ্টনগরে বেড়াতে।

সেখানেই চারুলতাদের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়।

চারুলতার দাদা যখন নেমন্তন্ন করে গেলেন, তখন অমরের কাকা কাকীমা একটু আপত্তি করেছিলেন। কাকা বলেছিলেন

—হ্যাঁ আত্মীয়তা আছে অবশ্য একটা। তোমার মা, অর্থাৎ বড়বৌদির বাপের বাড়ীর দিক থেকে—ভদ্রলোক পাকিস্থান হবার পর থেকে এসে বুঝি কালেক্টরীতে ক্লার্কের কাজ করছেন। কি জান, মফঃস্বলে চাকরী করতে গেলে এই সব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ রাখা চলে না। সবসময় ঠিক-ও নয়। জান ত দেশের লোকের স্বভাব। আজ নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে, কাল বলে বসবে ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ হয়ে আছে, পাইয়ে দাও। নয়তো স্কুলে ছেলেকে ফ্রি করিয়ে দাও। অমনি কথা উঠবে মুখুজ্জে আত্মীয় পোষণ করছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। তখন ঝামেলা সামলানো-ই মুস্কিল।

অমর একটু হাসলো। বললো—

—আমি ত' যাব। খেয়ে চলে আসব। আলাপটুকু পর্য্যন্ত। তারপরে আমি আর এখানে কতদিন! চলেই ত' যাব। চারুদের বাড়ী শহরের শেষে। উদ্বাস্তু মানুষদের পল্লী। দেখলে এক পলকেই বোঝা যায়। টিনের চালা আর বাঁশের বেড়ার বাড়ী। একফালি জমিতে বাগানের প্রয়াস। চারুদের বাড়ীতে কয়েকটা গাঁদা ফুলের গাছ। ছোট একটা লাউ-গাছকে আত্মোন্নতির দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে একগাছা বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে পাড়ের ফালি

দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় উঠতে-ই চোখে পড়লো, কইজুড়ির বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের বংশ তালিকা। চারুলতার মা বললেন—

—দেশঘর কিছুই ত' দেখবে না নাতিরা। তবু নিজের বংশটা সম্পর্কে জানবে। জানবে ওরা কি ঘরের ছেলে।

তারপর অমরের মা-র নাম করে চোখে আঁচল তুলে দিলেন। বললেন—

—দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। তবু ত' একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। সে ভাগ্যগুণে রাজরাণী হয়েছে বাবা। আজ আমার এই কপাল……

অমরকে কাছে বসিয়ে নিজের দুঃখের গল্প করলেন। বিনা প্রয়োজনেই গলা নামিয়ে জানালেন, এ ছেলে তাঁর নয়। সৎছেলে। একদিন তিনিই মানুষ করেছেন। কিন্তু বউ এসেছে থেকে সংসারে নিত্য বিরোধ। রোজ ঝগড়াঝগড়ি। বর্তমানে এক মেয়ে, আর এক নাবালক ছেলেকে নিয়ে তিনি অকূল পাথারে পড়েছেন। বললেন—

—আমার মেয়েটা পড়াশোনায় ভাল। ফ্রি ইস্কুলে ত' ক্লাশ এইট অবধি পড়লো। তারপর বসে আছে। ওর যদি কিছু হয়……কতমেয়ে-ই ত' আজ প্রয়োজনে ছেলের ঠাঁই নিচ্ছে।

বলে ছলছলে চোখে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে অমরের বুঝতে দেরী হলোনা, তাঁর চোখে অমর কোন জগতের মানুষ।

যে কথা তিনি বলতে পারছিলেন না, অথচ যে কথা বলবার জন্য এই নেমন্তন্ন আর সমাদরের বিস্তৃত ভূমিকা— তা হলো, চারুলতার জন্য কি অমর কোন ব্যবস্থা করতে পারে না? তার এত চেনাজানা। সে এত বড়লোকের ছেলে!

চারুলতাকে ডাকলেন সামনে। অমরকে বললেন —মেয়ের কথা নিজমুখে বলব না। দেখ তুমি। যেমন হাতের লেখা। সেলাই করে কত পুরস্কার পেয়েছে স্কুলে।

চারুলতা সামনে আসতে পায়ে পা জড়িয়ে যেন লজ্জায় ভেঙে পড়লো। পানসে ফর্সা রঙ। ভাসাভাসা চোখ। বছর সতেরোর একটি নেহাৎ সাদাসিধে মেয়ে।

অমর-ই সপ্রতিভ হয়ে উঠলো। এইসব পরিস্থিতিতে সে খুব সহজ হতে পারে। বললো—

—কই, খাতা আনো, দেখি! মাসীমা বললেন, সে সব সত্যি কিনা দেখতে হবে ত!

চারুলতা সুশীলাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের কখানা খাতা আনলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। সেলাই-এর কয়েকটা ডিপ্লোমা।

অমর দেখতে দেখতে চোখ তুলে দেখে, চারুলতা দুই চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে চেয়ে আছে।

নিজের কাছে নিজেকেই তার কেমন যেন লাগলো। শুধু হাতের লেখার আর সেলাই-এর ছাড়পত্র দেখিয়ে এই মেয়েটি কি কাজ পেতে পারে? সে-ই বা কি করে দিতে পারে?

উদ্বাস্তু মেয়েরা ভাগ্যের হাতে মার খেতে খেতে ক্রমে শক্তসমর্থ হয়ে ওঠে। অল্পবয়সে সংসারের সব-দিকটা চিনে নেয়।

এই মেয়েটি ঠিক সে রকম নয়।

অমর একটু বিব্রত হয়েছিল বলেই গলা খুলে প্রশংসা করলো। প্রশংসা করতে যখন অর্থ ব্যয় নেই, তখন অজস্র প্রশংসা দিয়ে খুশী করতে আপত্তি কি?

তার প্রশংসা থেকেই যেন তার মাসীমা, চারুলতা, দুজনেই অনুক্ত সব প্রতিশ্রুতি পেলেন। মাসীমা চোখ মুছে বললেন—তোর এমন দাদা! ও তোকে নিশ্চয় দেখবে। করে দেবে একটা কিছু। হাজার হলেও আমারই বোনের ছেলে ত!

বৌমাকে বললেন—ভাত বাড়তে। চারুলতা নিজের হাতে কাজকরা আসন পেতে দিল। সামান্য উপকরণ, সামান্য আয়োজন। তবু অমর প্রশংসা করলো খেতে খেতে।

চলে আসবার সময়ে সে চিঠি লিখবার, খবর নেবার, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এল। বাঁশের বেড়াটা ধরে চারুলতা চেয়ে রইল তার দিকে।

তারপর, কলকাতায় আসতে না আসতে অমর চাকরী পেয়ে গেল। চট করে বড় চাকরী পাওয়া গেলে, নিজেকে সেই দায়িত্বের উপযোগী করে তুলতে হয়। অমর আপাতত সেই গুরুতর কাজে ব্যস্ত হলো। বাবা বললেন

এখন শুধু নিজের কথা ভাব। পরের কথা, পরের কাজ নিয়ে বেগার খাটবার দিন আর নেই। সে সব যথেষ্ট করেছ।

অমরও দেখল,চাকরী ভালভাবে করতে গেলে খানিকটা স্বার্থপর না হয়ে উপায় নেই। নতুন একটা জীবন। তার নতুন পরিবেশ, নতুন চাহিদা, নতুন সব দায়িত্ব।

তাড়াতাড়িই অমর ভাল অফিসার হিসেবে নাম করে ফেলল। সকলেই জানল, মুখার্জির বয়স কম। মানুষটিও চমৎকার। কিন্তু কাজ ফাঁকি দিতে জানে না সে। নিজেও খাটে। অন্যকেও খাটিয়ে নেয়। কেরাণী, বা টাইপিস্ট, বা বেয়ারা, সকলের-ই কুশল সংবাদ নেয়। ভাল ব্যবহার করে।

কিন্তু অফিসের ভেতরের ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করে না।

অমর ওপর-নীচ, দুই মহল থেকেই নাম কিনতে লাগল। বন্ধুবান্ধব তার কাছে কোন আর্জি নিয়ে গেলে, সে বসিয়ে চা খাওয়ায়। আপ্যায়ন করে। কিন্তু ভাইয়ের চাকরীর কথা বললেই নিজের অক্ষমতা জানিয়ে হাতটা চিৎ করে বলে—কি করব ভাই। সরকারী অফিস। আমার হাত-পা বাঁধা!

কোনও আবেদনপত্রে গেজেটেড অফিসারের সই দরকার হলে একদিন ফর্মটা রেখে দেয়। পরদিন খোঁজ-খবর নিয়ে, আবেদনকারীর নামে রাজনীতির গোলমেলে অভিযোগ আছে কি না জেনে, তবে সই করে।

যেখানে কোন উপকারই করে না, সেখানেও তার ব্যবহার তুলনাহীন। বারবার বলে—এবার পারলাম না, তবু যদি দরকার হয়—এই বাড়ীর ফোন নম্বর, এই অফিসের। একটা ফোন করে···

বেরিয়ে আসতে আসতেও প্রত্যাখ্যাত মানুষটি অমরের সৎব্যবহারের কথা মনে করে মুগ্ধ হয়। ডালহৌসীর ফুটপাথ ধরে চলতে চলতে সেই ব্যবহারের রেশটা তার মনে থাকে।

এমনি করে যখন দিন যাচ্ছে, তখন অমর একদিন চারুলতার নামের স্লিপ পেল।

সেই চারুলতা! প্রথমটা বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল। কিন্তু দেখতেই মনে পড়লো সব।

তাঁতের ঘরে-কাচা শাড়ী, হাতে রুপোর চুড়ি, তেল-তেলে মুখে অনেক ভয়, অনেক লজ্জা। সেই চারুলতা। বয়সটা দুইবছর বেড়েছে। শরীরটা বোধহয় তাকে লজ্জায় ফেলবার আর একটা উপসর্গ। তাই আঁচলটা টেনে টেনে সে বুকটা ঢাকবার প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

—সেই যে বলেছিলেন···

কি যে বলেছিল, অমর তা মনে-ই আনতে পারে না প্রথমে। তারপরে মনে হলো টাইপিস্ট ছোকরাটি তাকাচ্ছে, কেরাণীবাবু-ও মজা দেখছেন।

একদিন হাতের লেখা ভাল বলেছিল বলে, দূরসম্পর্কের মাসতুতো বোন তাকে এমনি একটা বিব্রত অবস্থায় ফেলবে, তাতে চারুলতার ওপর তার রাগ হলো।

অথচ রাগ করবার কোনও কারণ ছিল না। নিজেই সেটা বুঝল অমর। তারপর একটু হাসল। বলল—খবর কি? মা কেমন আছেন?

—ভাল নেই। আমরা এখন এখানেই থাকি। নারকেলডাঙায় বাসা। মা বললেন···

—কতদূর যেন পড়েছিলে?

—ক্লাশ এইট।

—ও!

বলে অমর চেয়ে রইল। ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়া, একজন অপ্রতিভ, গেঁয়ো স্বভাবের মেয়ের জন্যে সে কি করতে পারে? কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। সে বললো—শোন, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নামটা লেখাও। ওদের কাছে নানা ধরণের কাজকর্মের খোঁজ থাকে!

—আপনি কিছু···

চারুলতার গলার সুরে আকুতিটা স্পষ্ট। অমর বললো—হ্যাঁ, আমিও খোঁজে থাকব বই কি! তবে কি জানো, ম্যাট্রিকটা অন্তত আজকাল সকলেই চায়। যে কোন কাজই হোক না কেন, এমন কি কারখানার কাজে, ম্যাট্রিকপাশ না করলে ··

চারুলতা একবার তার দিকে, একবার তার চারি-পাশের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর উঠে পড়লো। বললো—আচ্ছা। নাম লিখিয়ে আপনাকে জানাব। তখন অমর বললো—দাঁড়াও। ঠিকানাটা লিখে নিই। সময় পেলে যাব একদিন।

কিন্তু এ কথাটাও অমর রাখতে পারেনি। চারুলতার কথা তার মন থেকে আবার হারিয়ে গিয়েছিল। বৃহত্তর কর্মময় জীবনের আবর্তে পড়লে চারুলতাদের কথা মনে রাখা কঠিন।

ইতিমধ্যে তার বাড়ীতে শাঁখ বাজল। লোরেটো এবং শান্তিনিকেতনের ছাপ নিয়ে অনিন্দিতা এল ঘরে। অমরের আরো দুটো লিফট হলো। গাড়ী একটা কিনতে-ই হলো। নইলে চলছিল না।

এরই মধ্যে মাসীমার হাতে লেখা পোস্টকার্ড। আঁকা-বাঁকা অক্ষরে ফুলদিদির প্রতি শতকোটী প্রণাম জানিয়ে দীর্ঘজীবেষু বাবা অমরকে একটিবার আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। অমর গেল।

নারকেলডাঙায় সে প্রায় বস্তি অঞ্চল। পাকা ঘরে খোলার চাল। ঘরের কোণেই রান্নার ব্যবস্থা। ওপাশে কি কারখানা।

মাসীমার আজকের সব অভিযোগ চারুলতার ওপর। ওদিকে কোন্ ওষুধের কারখানা আছে। শিশিতে ওষুধ ভরবার কাজ করে কোন কোন মেয়ে যেন মাসে ষাট টাকা পাচ্ছে! চারুলতা যদি রাখালের কথা শোনে, তাহ'লে সে-ও পেতে পারে কাজ। কিন্তু চারুলতা রাখালের সঙ্গে যেতে চায় না ডিপার্টমেন্টের বাবুর বাড়ী।

মাসীমা বললেন—তুমি একটু বস বাবা!

তাকে যে চাকরীর জন্যে ধরেননি, আর একপালা কাঁদুনি গাননি, সে জন্যে অমর আশ্বস্ত হলো। চারুলতাকে বললো—রাখালবাবু কে? কি করেন?

মাসীমাই জবাব দিলেন। রাখাল ওখানে স্টোর-কীপার। ভারী জোগাড়ে ছেলে। ভারী পরোপকারী।

চারুলতা তার সাহায্য নেয় না কেন?

চারুলতা শুধু চোখ তুললো একবার। চকিত সে চাহনিতে অসহায়তা, ভীরুতা, বিভ্রান্তি।

অমরের মনে হলো সে বলতে চাইছে, অন্য অন্য চারু-লতারা যে কারণে অন্য অন্য রাখালদের সঙ্গে যেতে চায় না, চারুও রাখালের সাহায্য সেই কারণেই নিতে চায় না।

মাসীমা বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—ওর লজ্জা করে। ওর মানের ভয় করে। নিজের সম্মান নিজে রাখবি। তাতে অন্য কে কি করবে? ঐ মালা, জবা, ওরা কাজ করে না? না কি তারা বেহায়া?

অভাবের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে মাসীমার নীতিবোধটা বদলিয়েছে মনে হলো অমরের। যে মাসীমা তাকে এক-দিন ফ্রেমে বাঁধানো বংশ তালিকার নিচে চেয়ারে বসিয়ে দেশ-গাঁয়ের কথা বলে কেঁদেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এঁর মিল নেই। কলোনীর জীবনেও যে আব্রু, যে সম্ভ্রম-বোধটা জীইয়ে রাখতে পেরেছিলেন, এখানে এসে সেটা আর ঠিক অক্ষুণ্ণ নেই।

অমর আজকেও কিছু বলতে পারল না। আশার কথা, ভরসার কথা। এমন কোন চাকরীর কথা, যাতে চারু-লতাকে বিব্রত না হতে হয়। নিজের সম্ভ্রম, শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করতে পারে চারুলতা।

অতএব বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী অমর গলা ভারী করে, কাজ যে কত মহৎ, কাজেই যে শুদ্ধি, মুক্তি, এই সব বললো। অন্য কোন কাজ হলে ভাল হতো। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন এই কাজই নিক চারুলতা।

মাসীমা আশ্বস্ত হয়ে বললেন—আমিও ত' তাই-ই বলি। এই কাজ করেই ত' কত মেয়ে দেখি ভাল জামা-কাপড় পরে। বাড়ীতে সাহায্য করে।

চারুলতা অনুচ্চকণ্ঠে বললো—সে চাকরীর পয়সায় নয় মা! তুমিও জান। আমিও জানি।

—তুই ত' সব জানিস্। বলে মাসীমা আবার জ্বলে উঠছিলেন। অমর তাঁকে থামাল। থামিকটা সাফাই দেবার গলাতেই বললো—এর পরে আমি ত রইলামই! যদি কোন খবর পাই…

বেরিয়ে আসবার সময়ে মাসীমা এগিয়ে এলেন। গলাটা করুণ হয়ে গেল। বললেন—আমারই লজ্জা করে। মেয়েকে রোজগার করতে বলছি! কিন্তু কি করি বল বাবা? ছেলেটা পড়ে। আমার কোন ক্ষমতাই নেই। তবু রাখাল মানুষটা ভাল। অসময়ে কিছু দেয়!

অনেকদিন কোন যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে অমরের সংসারে নতুন আগন্তুক। অনিন্দিতা আসবার লগ্ন থেকে-ই পরপর উন্নতি। অতএব অনিন্দিতার মর্যাদা বৃদ্ধি। অমর শুধু চাকরী করে-ই খালাস। আর সব দায়িত্ব আস্তে আস্তে অনিন্দিতার দপ্তরে চলে গিয়েছে।

আবার স্লিপ। আবার চারুলতা। এবার আর নিজের জন্যে নয়। এবার ভাইয়ের জন্যে সুপারিশ। উদ্বাস্তু বালকদের কারিগরী ট্রেনিংয়ের জন্যে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেখানে তাকে ভর্তি করতে চায় চারুলতা। একজন গেজেটেড অফিসারের সই চাই। সার্টিফিকেট চাই।

চারুলতার জন্যে কোনদিন কিছু করতে পারল না, সেই কারণে মনে মনে বোধহয় একটা কুণ্ঠা ছিল। তাড়াতাড়ি সই করে দিল অমর। তারপর বললো—

—কেমন আছ? সেই কাজ-ই করছ?

ঘাড় নাড়ল চারুলতা। সেই কাজ-ই করছে। কিন্তু যে সব যোগ্যতা থাকলে ঐ কাজ করে-ও গায়ে আর্ট সিল্কের শাড়ী ওঠে, হাতে ঝোলে প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, চারুলতার সে সব যোগ্যতা বোধহয় নেই। কেন না পোশাকে আরো গরীবিয়ানা। চোখমুখে আরো বিভ্রান্তি। সে কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললো।

—ওভারটাইম করি কোনদিন। তাতে পুষিয়ে যায়। তবে ইচ্ছে মতো ত' পাওয়া যায় না।

যে কথা সে বললো না, না বলেই উঠে চলে গেল ফর্মটা নিয়ে, অথচ যে কথা অমর বুঝলো—ওভারটাইম পেতে হলেও রাখাল, বা বিকাশ বা নারায়ণ বা কালীপদ কোন একবাবুর সঙ্গে খাতির রাখতে হয়। নাচতে নামলে ঘোমটা খুলে ফেলাই বাঞ্ছনীয়। তাতে নাচবার মজুরী মেলে। পরিশ্রম পুষিয়ে যায়। আর লেনদেনের ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকে।

অমরের মনে হলো চারুলতা সেটা ঠিক পারছে না। তাই তার বিভ্রান্তি। তাই তার এই পরাজয়।

এরকম না হওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু বুঝেও অমর যে নিরুপায়। কত চারুলতার কত সমস্যা। উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের বেকার সমস্যার পরিসংখ্যান দেখলে ত' মাথা ঘুরে যায়। ভেতর থেকে লজ্জা এবং অসহায় ভাবটা ছাড়তে পারছে না বলে চারুলতা নিজেকে মানাতে পারছে না, এ সমস্যার সে, অমর, কি করতে পারে? এই সব কথা ভেবে অমর একটু সান্ত্বনা পেল।

কিন্তু এমনই তার ভাগ্য যে একমাস বাদেই আবার চারুলতার কথা তাকে ভাবতে হলো। আবার তার মুখোমুখি হতে হলো।

অফিসে যখন পুলিশ কর্মচারীটি ফোন করলেন, তখনো সে বোঝেনি।

ফোন পেয়ে সে ছুটলো সেই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। প্রিন্সিপ্যালের মুখ ভারী। পুলিশ কর্মচারীটির মুখে একটা কৌতুকের হাসি। সব শুনে অমরের মুখ বিভ্রান্ত, বিরক্ত, অপ্রস্তুত।

চারুলতার ভাইয়ের ব্যাপার।

ছেলেটিকে সে সুপারিশ করেছে। সই করেছে তার ফর্মে। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। আর পেতলের ছাঁচ ঢালাই-এর কাজে তার দক্ষতাও আছে। কাজ শিখতে শিখতে সে মাসে তিরিশ টাকা পাবে। সে টাকা যে তার দরকার, খুবই দরকার, তা-ও বোঝা যায়। কেন না সত্যিই সে হতদরিদ্র।

কিন্তু সেখানেই ত' সব কথা নয়। সেখানে পূর্ণচ্ছেদ টানাও সম্ভব নয়। কেননা, ছেলেটির সম্পর্কে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানা গিয়েছে, ছেলেটির নামে পুলিশে রেকর্ড আছে।

নানা ধরণের। সিনেমার টিকিট নিয়ে গুণ্ডাদের সঙ্গে বিক্রী করেছে সে। ধরা পড়ে থানায় গিয়ে জরিমানা দিয়েছে।

—কেন করেছ? এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে—পয়সা পেতাম যে!

তারপরে অন্য এলাকা। অন্য থানা। অন্য কাজ ছিল না। ছেলেদের সঙ্গে হল্লা করে বেড়াত। পাড়ার কোনো ভদ্রলোকের ফোন পেয়ে ভ্যানটি রাউডি থেকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রমাণাভাবে ওয়ার্নিং দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়। তবু, পুলিশের খাতায় নাম আছে ত!

সেই পাড়া তবু সে ছাড়েনি। ক-দিন বাদে সেই পাড়াতেই, ইলেকট্রিকের এক দোকানে চুরি। প্রথমেই সন্দেহজনক ছেলেছোকরারা গ্রেপ্তার। ওর বিরুদ্ধে আবার প্রমাণাভাব। আবার খালাস।

তারপরের অপরাধ-ই সবচেয়ে গুরুতর। রাস্তায় রাস্তায় খাদ্যআন্দোলনের ইস্তাহার লাগানো। আন্দোলনের

আগে হলেও বা কথা ছিল। আন্দোলনের পরে। বহুজনের মৃত্যুর পরে। হত্যাকারীদের বিচার দাবী করে সব গরম গরম ইস্তাহার।

এবার ছেলেটির ঘাড়বাঁকানো অবাধ্যতা। কে তাকে পাঠিয়েছে, সে তার নাম বলবে না।

অতএব একদিন হাজতবাস। ছাড়া পাবার আগে একটা স্বীকারোক্তি সে করেছে। আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে মনে ঘেন্না এসেছিল। মিথ্যে চুরির অপরাধের পর রেললাইনে গলা দিতে সাধ গিয়েছিল। তখন ঐ সংঘের কর্মীদের সঙ্গে পরিচয়। নাইট স্কুলে পড়ালেখা, আর সময় মতো এইসব কাজ করা।

—কেন করেছিলে ?

—ওরা বলেছিল, আমিও বিশ্বাস করেছি, যে এমনি করে দেশের কাজ করছি।

তারপর, বেরিয়ে দেখেছে অন্য কর্মীরাও গ্রেফতার। অতএব পথে পথে ঘোরা। তারপর, একটা লোককে মেরেধরে ইচ্ছে করে থানায় দাঁড়িয়ে বুকফুলিয়ে বলা—অনেকক্ষণ ধরে একজন মেয়ের পিছু নিয়ে জ্বালাচ্ছিল লোকটা। আমি ওকে জানি। একসময় আমার দিদিকেও জ্বালিয়েছে। লোকটার নাম রাখাল। তখন ছোট ছিলাম। ভয় পেতাম। তাই ওকে কিছু বলিনি। এবার হাতে হাতে ধরেছি, তাই মেরেছি।

—অন্যায় করেছ।

—সেই মেয়েটিকে ডাকুন না। তিনি যে আমার হাত ধরে বললেন, বেশ করেছ ভাই, বেঁচে থাক! এবার খুব কড়া ওআর্নিং। তারপরেই এই পরিস্থিতি।

প্রিন্সিপ্যাল মানুষটি বিচক্ষণ। অমর যখন বিব্রত হয়ে পড়ল, বললো।

—কিছুই ত' জানি না। এমন মুখ ক'রে ভালমানুষের মতো বললো! কে জানতো তলায় তলায় এইসব!

সত্যিই, তখন তার মনে হচ্ছিল, চারুলতার ঐ ভালমানুষীর নিচে একটা শয়তানী আছে। এমনি করে সে অমরকে বিপদে ফেলতে চায়। এটা একধরণের হিংসে। একটা আক্রোশ। অর্থাৎ আমরা যখন দুঃখের পাঁকে রোজই ডুবছি, তখন তুমিও একটু নিচে নাম। একটু কাদা মাখ।

সে ঘাড় মুছে বললো—এইজন্যে কারু উপকার করতে নেই।

প্রিন্সিপ্যাল তারদিকে সহানুভূতির সঙ্গে চাইলেন। তাঁর চোখ দুটো যেন বলতে চাইল—বুঝেছি। তোমার সুনাম বিপন্ন। তোমারও এইধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ? এই লজ্জাতে তুমি বিব্রত হয়েছ। তোমার ঐ বিরক্তি, সেই লজ্জারই একটা প্রকাশ। মুখে বললেন—আমি বিশ্বাস করছি, আপনি সংমনেই সই করেছিলেন। ছেলেটিকে যে আমি রাখতে পারব না। সে কথা ভেবে আমারই দুঃখ হচ্ছে। কেননা, খুঁটিয়ে বিচার করলে, ওর কোন অপরাধটাই মারাত্মক নয়। আর, সত্যিই ওর কাজে এত মন, ওর এমন নিষ্ঠা, যে সুযোগ দিতে হলে একেই দেওয়া উচিত। আমি চেষ্টা করব একে রাখতে। তবে পারবনা, বোধহয় পারব না।

পুলিশ কর্ম্মচারীটি বললেন—কি জানেন, ওর অপরাধগুলো সত্যিই ছোটখাটো। কিন্তু ঐ সব জমতে জমতেই ওরা একদিন বড় কিছু করে বসে।

প্রিন্সিপ্যাল হেসে বললেন—আমরাই হাতে করে ঠেলে দিই ওদের, বলুন! ছোট বয়স থেকে কারণে-অকারণে খাতায় নাম তুলি, আর সেই স্মৃতি ওদের মনে বিষের মতো কাজ করে। দুদিন পরে ওরা নিজেরাই ধরে নেয়, ভাল হয়েই বা কি হবে, আমি ত' অপরাধীই। আমি ত' খারাপ। তারপর···তারপর যা হয় সেটা খাতাপত্রের হিসেব। কত লক্ষ, কত হাজার এইসব—

—জুভেনাইল ডেলিংকুএন্ট্!

অফিসারটি হাসলেন। তারপরে অমরকে পিঠ-চাপড়ানোর ভংগীতে উপদেশ দিলেন—সই করতে ভাল লাগে বলে-ই সই করবেন না। দেখেশুনে করবেন।

অমর চারুলতার ওপর এত রেগে বাড়ী ফিরল, যে তারপরে চারুলতা যখন দেখা করতে এল, দেখা করল না।

কিন্তু, সংসার এবং সমাজ আস্তে আস্তে চারুলতাকে জেদী হতে শিখিয়েছে। পরদিন সে বাড়ীতেই এল। অমরকে বললো—শুনতেই হবে আমার কথা। মাণিক যে ঐসব করেছে, তা কি আমিই জানতাম। আর, এদিকে আমি একটা কাজের খোঁজ পেয়েছি···।

সে সব শোনবার ইচ্ছে আমার নেই। যথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমাকে আর বিব্রত ক'রোনা।

চারুলতার মুখ অপমানে শাদা হয়ে গেল। তবু সে বললো—শুনুন। এবার আমার ফর্ম নিয়ে এসেছি। আমার নামে ত' কোন রেকর্ড নেই! আমি একটা কাজ পাব। সরকারী ক্যান্টিনের কাজ। আশী টাকা মাইনে পাব। আমাকে আপনি এতটুকু সাহায্য করবেন না?

—আবার সই? না, আমি পারব না।

—নইলে আমি যে কাজটা পাব না। আমি যে আর কারুকে চিনি না!

—তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না।

বলে চেয়ার ঠেলে উঠে এল অমর। চারুলতার মুখখানা দেখে তার একবার মনে হলো, চারলতা যেন ডুবে যাচ্ছে। গভীরে। গভীর থেকে গভীরে।

তবু অমর আজ হাত বাড়াল না। সাহায্যের হাত। ওপরে, নিজের সাজানো ঘরে এসে, নিজের নিরাপত্তার নীড়ে এসে, তবে তার মনে হলো, যে সে রূঢ় না হলে, ঐ অবাঞ্ছিত সম্পর্কের জের সে কাটাতে পারত না। দু'দিন বাদে চারুলতা তাকে আবার কোন্ বিপদে ফেলত কে জানে!

নিজেকে খুব পরিচ্ছন্ন মনে হলো তার। এই একই শহরে, কতরকম জীবন। পরিচ্ছন্ন, আবিল, পঙ্কিল।

সে একটা সুন্দর ও শোভন জগতের, জীবনের নাগরিক। ঐ সব গোলমেলে জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তার লাভ কি? তারপর টুকরো টুকরো ভাবে একথা সেকথা কানে এসেছে। তার মা, সংসারের রাণীর পদটা অনিন্দিতাকে দিয়েছেন। এখন আবার তাঁর আত্মীয় পরিজনের খবরবার্তা দেওয়া নেওয়ায় মন গিয়েছে। আর, অবসরপ্রাপ্ত মহিলাদের কাছে এত খবরও আসে। কার মাসী, কার কাকা, কার বেহাই বেয়ান, সকলের সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুর খবর।

সে সব কথা ছেলে খেতে বসলে মা শোনান। ছেলে শোনে। এমনি করেই সে জানল চারুলতার ভাইএর পরিণতির কথা।

প্রিন্সিপ্যালের কথার চেয়ে পুলিশ অফিসারটির কথাই ফলেছে। সেই কাজটি যাবার পর থেকে ছেলেটি খোলাখুলি ভাবে একটা ছিন্‌তাই দলে ঢুকেছে। এখন সে পাড়ায় পাড়ায় রাহাজানী করে বেড়ায়। আর সশ্রম কারের অপরাধী হয়েছে থেকে পুলিশও তাকে আর ধরে না। তাদের দলটায় নানারকম রাজাবাদশা লোক আছে। তাদের পুলিশও খাতির করে চলে।

অমরের মা স্বগতোক্তি করলেন—আহা, বিরজা মরে বেঁচেছে। ছেলের এ দুর্গতি দেখতে হয়নি।

—মারা গেছেন ওর মা?

—সে ত কবে!

—আর ওর বোন?

—সে আর ব'লো না! কতরকমই শুনি! এখানেই কথাবার্তায় ছেদ পড়লো।

তিনি শুনেছিলেন ভাসাভাসা। আর অমর চোখে দেখল। তার আগে থেকেই সে এ সব কথা শুনেছে।

আজকাল তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা হবার পর, ঘরের আকর্ষণ কিছুটা কমেছে তার। একটি স্টিভেডোর বন্ধু তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেরোয়।

দুজনে ঘোরে। ঘুরে ঘুরে দেখে। কলকাতায় রাতের জীবন। দেখে দুজনে কোন একটা নাম-করা বার-এ বসে গলা ভেজায়।

এতে কোন দোষ নেই। মনটা হালকা লাগে। ঘুমটা ভাল হয়। আর বসে বসে নানারকম গল্পগুজব করা যায়। অনেক মানুষের সঙ্গে-ই দেখা হয়। বড় বড় মানুষ সব। তাঁরাও নিজেদের কর্মক্লান্ত জীবনের ক্লান্তি ভুলতে এখানে এসে বসেন।

এখানে বসে শোনে অমর, কলকাতার জীবনে কি-ভাবে পাপ ঢুকছে। ছড়িয়ে পড়ছে। আইন করে আইন করে পতিতাবৃত্তি বন্ধ। এখন ঘরে দোরে গণিকা-বৃত্তি। পাপ চারিদিকে অদৃশ্য জাল ছড়াচ্ছে। ছড়িয়ে চলেছে। ভাল ভাল শান্তিকামী লোককেও টানছে নিজের জালে।

শুনে বাড়ী ফিরে অমর স্টেট্‌স্‌ম্যানে চিঠিপত্রের কলমে চিঠি লেখে। এমনি সময় একদিন। বার-এ বসে আছে তারা। এমনি সময়ে-ই পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল। চলে গেল ওপরে।

সাংঘাতিক কাণ্ড। অতি-সুপরিচিত এই রেসিডেন্শিয়াল হোটেল আর বার।

মালিক হচ্ছেন সমাজের এক নামকরা লোক। গভর্ণরের সাহায্য তহবিলে মোটা চাঁদা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা। ওপরে ঘরে ঘরে সন্ধ্যের পর থেকে জঘন্য কার্যকলাপ। অনেক নামকরা লোক জড়িত। অমররা চলে যেতেও পারত। কিন্তু কৌতূহলই তাদের পা আটকে রাখল।

সারি সারি নেমে এলেন কয়জন। পরিচিতদের নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের সিঁড়ি দিয়ে। তাঁদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ হলে তাঁদেরই ক্ষতি।

সমাজেরও ক্ষতি। এঁরা হচ্ছেন সমাজের দুষ্টু ছেলে। হাঁ, করে ফেলেছেন বাট দুষ্টুমি। তাই বলে সামনে, লোকের সামনে পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে কি হবে! লজ্জা দেওয়া হবে মিছিমিছি!

কিন্তু আর যারা জড়িত? তাদের ত' লজ্জা নেই। তাদের লজ্জা ঢাকবার-ই বা প্রয়োজন কি? তাদের ধরিয়ে দেওয়া দরকার। তাদের সম্পর্কে সকলকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

তারা নামল মাথা উঁচু করে। বার-এর মাঝখানে এসে তারা চ্যাঁচামেচি করতে লাগল। একজনের গলা খুবই উঁচুতে—শুধু আমাদের ধরলে হবে কেন? আমাদের নামই বা লিখবেন কেন? ওঁদের নামও লিখুন! আর বোস সাহেব? মালিকটি কোথায় গেলেন? আমাদের যে মাস গেলে মাইনে পৌঁছিয়ে দেন বাড়ীতে, নিজে মুনাফাটি মারেন? তাঁর নামটা আগে লিখুন।

অমরের চোখ বিস্ময়ে ছিঁড়ে পড়বে বুঝি।

চারুলতা?

চারুলতাই ত'। কিন্তু চারুলতা কি?

পেট, পিঠ, হাতকাটা জামার ওপর নাইলনের শাড়ী। হাতে গলায় ঝুটো কাঁচের হীরে মানিক মুক্তোর জাঁকজমক। মুখে ঠোঁটে রঙ। চোখের নিচে কালি। কিন্তু চোখ দুটি রাঙা। মদ খেয়েছে নিশ্চয়। গলাটা যেন উঁচু, কথাগুলো তেমনি ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলা।

তবু চারু।

পুলিশরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। অমর চেঁচিয়ে বলে উঠলো অজানতেই—চারুলতা!

চারুলতা থমকে দাঁড়াল। অফিসারটির মুখে নিরুপায়ের হাসি। ভাবখানা এই—আপনাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। জানি। তবু আপনাদের দিকে চেয়ে ঢেকে-ঢেকে চলতে চেষ্টা করছি। অথচ আপনারাই যদি......

স্টিভেডোর বন্ধুটি প্রমত্ত ছিলেন—বলে উঠলেন—

—যেতে দাও ভাই! অমন চারু অনেক পাবে।

অমর তখন নিজের অবস্থা উপলব্ধি করে লজ্জিত। মাটি তার পায়ের নিচে দুলছে।

চারু তার দিকে চেয়ে হাসল।

অফিসারটি বললো—চেনেন নাকি, স্যর?

চারু হেসে উঠল। বলল—

—পাগল হয়েছেন? কার না কার সঙ্গে ভুল করেছেন হয়তো! আর, বলেছি তো আমার নাম লতা, লতা ঘোষাল!

—যথেষ্ট বলেছেন! বাকিটা থানায় গিয়ে শুনব।

অফিসারের সঙ্গে মাথা উঁচু করে গটগট করে চারু চলে গেল। নির্লজ্জতার প্রতিমূর্তি। একটা পাপ।

চোখে না দেখেও অমর দেখতে পেল, ভ্যানের দরজাটা হাঁ করেই ছিল। চারুলতাদের তার অন্ধকার গ্রাসের ভেতরে ভরে ফেলে হাঁ বন্ধ করলো।

অন্ধকার। সেখানে এবং তার পরেও। চারুলতার জগৎ এখন থেকে দিনের আলোয় কিংবা রাতের দেওয়ালিতে। থানার ভেতরে এবং থানার বাইরে—শুধুই অন্ধকার। বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে, ভিক্টোরিয়ার পথে চলতে চলতে, পথিকের চোখে লোভ খুঁজে খুঁজে, যেখানেই ফিরবে চারুলতা, ঐ অন্ধকার সে ছাড়াতে পারবে না; ঐ অন্ধকারের হাঁ আছে, জিভ আছে, ধারালো দাঁত আছে। ঐ অন্ধকার চারুলতাকে খাবে। একটু একটু করে। তারিয়ে তারিয়ে।

অন্ধকার। অমরের ঘরেও। সুন্দর ঘরখানি। ও পাশে শিশুদের ঘুমোবার নিঃশ্বাস। এ পাশে অমরের বুকে অনিন্দিতার হাত। ঘরে ধূপের গন্ধ। বাতি

নিভিয়ে দেওয়া সুন্দর ঘুম আনা, ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে দেওয়া অন্ধকার।

এই রকম অন্ধকার সুখী লোকের জন্য।

সুখীলোক, ভাললোক, কলকাতার কাম্য নাগরিক—যারা সুস্থ সমাজজীবন যাপন করে।

এই ঘরে সব পরিষ্কার। বিছানা ধপধপে। মানুষগুলো পরিষ্কার। সব পরিচ্ছন্ন।

তবু অমরের চোখে ঘুম নেই। এত পরিচ্ছন্নতার মাঝখানে শুয়ে শুয়ে সে নিজের অপরিচ্ছন্নতা দেখতে পেয়েছে।

তাই তার চোখে ঘুম নেই।

সে যদি নিজের নিরাপত্তার কথা একটু কম ভেবে চারুলতাকে একটু সাহায্য করাতো? ফর্মে সই করতো। তাকে আশীটাকা মাইনের চাকরীটা পেতে দিতো?

তাহ'লে চারুলতা সব লজ্জা ভুলে এই নির্লজ্জতার বেসাতি নিয়ে বাজারে নেমে দাঁড়াত?

হয়তো নয়।

সুন্দর বিছানায় শুয়ে, সুখীমানুষ, সুন্দর মানুষ, সম্মানিত মানুষ অমর—পরম হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করলো, তার নিজের জীবন পরিচ্ছন্ন থাকলেই সে পরিচ্ছন্ন নয়।

যে হেতু চারুলতা এক সর্বনাশের অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবং যে হেতু চারুলতার ভাই কোনও মাতালের ডেরায় নেশার ঘুমে ডুবে আছে, সে হেতু সে, অমর, সেই সব গ্লানির ক্লেদও মেখেছে।

যে সব হাত এতদিন ধরে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চারুলতাকে ঐ গহ্বরে নামিয়েছে, তার মধ্যে যে তার হাতও আছে। গ্লানিতে মেখে, অনুশোচনায় পুড়তে পুড়তে অমর এখন চারুলতার সঙ্গে চারুলতার শাস্তি ভাগ করে নিতে লাগল।

চারুলতা হাজতে। সে বাইরে।

তবু অমর অনুভব করতে পারল কারাগারটা চারুলতাকে, চারুলতাদের বেষ্টন করে, তারপর, তার পরিধি বিস্তীর্ণ করেছে। সে এগিয়ে এসেছে।

এগিয়ে আসতে আসতে সে অমরের এই ঘর অবধি পৌছে গিয়েছে। এবং এখন, গুঁড়ি মেরে মেরে এই বিছানা অবধি উঠে এসেছে।

চারুলতাকে তার অন্ধকার যেমন, অমরকে তার কারাগারও তেমনই, নির্মমভাবে, অমোঘভাবে অনুসরণ করে চলবে।

অনেকটা নিজের ছায়ার মতন।

নিজের ছায়াটা কখনো বেঁটে, ক্রুর, কখনো রাক্ষুসে হাত বাড়িয়ে লম্বা।

তাই বলে কি ছায়াটাকে কেটে ফেলে দিতে পারে অমর? বাদ দিয়ে দিতে পারে?

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল ভক্তি-সাহিত্যের প্রধান দুইটি ধারা—শৈব ও বৈষ্ণব। এই উভয় ধারা কতকটা সমকালীন হইলেও পরিধি ও বিস্তারে বৈষ্ণব-সাহিত্য অপেক্ষা শৈব-সাহিত্য মহত্তর। মোটামুটি ভাবে ষষ্ঠ শতাব্দীকেই উভয় ধারার সূচনা কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। নবম শতাব্দী পর্যন্ত শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা সমভাবেই অব্যাহত ছিল। কিন্তু নবম শতাব্দীর পরে আর কোনো তামিল বৈষ্ণব-কবির রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাগবতের রচনাকাল অবশ্য দশম শতাব্দী এবং এই ভক্তি-গ্রন্থ তামিলনাড়ের ভক্ত কবিদেরই রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সংস্কৃতে রচিত। বস্তুত নবম শতাব্দীতেই তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ সীমারেখা। শৈব-সাহিত্যের রচনা কিন্তু দশম—একাদশ—দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল।

শৈব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই দেখা যায় যে, শৈব-কবিদের রচনায়, বিশেষত সম্বন্দর, অপ্পর্ প্রভৃতি প্রথম যুগের কবিদের রচনায় অন্য ধর্মের প্রতি, বিশেষত বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের প্রতি যে বিরোধমূলক

মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, বৈষ্ণব সাহিত্যে—তাহা নাই বলিলেই চলে। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত বৈষ্ণব ধর্মের অনীহা এবং বৈষ্ণবভক্তদের নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্য। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটিও উপেক্ষনীয় নয়।

তামিলনাড়ে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে হীনপ্রভ করিয়া ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠালাভে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। জৈনধর্মাবলম্বীরা রাজশক্তির সহায়তা লইয়া শৈবধর্মাবলম্বীদের উপর কম নির্যাতন করে নাই। আবার শৈব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মোট কথা, এই ধর্মযুদ্ধে একপক্ষে জৈন ও অপর পক্ষে শৈব সম্প্রদায় যেরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সম্পর্কে সেরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শৈব-কবি সম্বন্দর কেবল ভক্তি-সঙ্গীতই রচনা করেন নাই, অনেক সময়ে ধর্মযুদ্ধে, তাঁহাকে ক্ষত্রজনোচিত নেতৃত্বও করিতে হইয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সংঘর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথবা এমনও হইতে পারে—চরম ধর্ম-সংঘর্ষের যুগে অর্থাৎ ভক্তি-আন্দোলনের একেবারে প্রথম দিকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বস্তুত, তামিলনাড়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চিরদিনই সংখ্যায় ও শক্তিতে শৈব সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্‌বর্তী রহিয়াছে। রাজশক্তি ও জনশক্তি শৈবধর্মের যতটা অনুকূল ছিল, বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষে ততটা আনুকূল্য লাভ কোনোদিনই সম্ভব হয় নাই। চোল, পাণ্ড্য ও পল্লব—তামিলনাড়ের এই তিনটি অঞ্চলের রাজশক্তিই শৈবধর্মের বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করে। পল্লবনাড়ুর কাঞ্চীপুরম্ এবং চোলনাড়ুর শ্রীরঙ্গম্ বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইলেও চোলসম্রাটের কোপ-ভাজন হইয়াই যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রামানুজকে শ্রীরঙ্গম্ ত্যাগ করিয়া কর্ণাটকে চলিয়া আসিতে হয় ইহা সুবিদিত। মোট কথা, জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা শৈবধর্মই অধিকতর শক্তিশালী এবং আয়তনে ও বৈচিত্র্যে বৈষ্ণব সাহিত্য অপেক্ষা শৈব সাহিত্যই অগ্রগামী। এই সকল কারণেই তামিলনাড তথা দক্ষিণ ভারতকে শৈবধর্মের দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম হইলেও এবং আয়তনে বৈষ্ণব সাহিত্য শৈব সাহিত্যের সহিত তুলনীয় না হইলেও, তাহার ভক্তিরসের গৌরব এবং কাব্যরসের উৎকর্ষ কিছুমাত্র কম বলিয়া বোধ হয় না। তামিল বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত রচনা বর্তমান যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেও সমস্ত কবিকে বা তাঁহাদের সমস্ত রচনাকে স্থায়ীরূপে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহও হয়ত ছিল না। দশম শতাব্দীতে বৈষ্ণবাচার্য নাথমুনি বা রঙ্গনাথ মুনি কর্তৃক বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি সংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ইহাই তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" নামে সুপরিচিত। (১) তামিল সাহিত্য রসিকদের পরম আদরের সামগ্রী এই "নালায়ির দিব্যপ্রবন্ধম্" গ্রন্থে চারি সহস্র (২) পদ বা স্তবক সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে যে বারো জন বৈষ্ণব কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা দ্বাদশ আলোয়ার (৩) নামে প্রসিদ্ধ। এই বারোজন আলোয়ার কবি এবং "নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম্" ব্যতীত তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্য কোনো কবি এবং কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণবকবিদের কালানুক্রমিক বিবরণে কিছুটা মতভেদ থাকিলেও আমরা মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে পারি।

	কবি	সংকলিত পদসংখ্যা
১.	পোয়্‌গৈ আলোয়ার	১০০
২.	ভূদত্তালোয়ার	১০০
৩.	পেয়ালোয়ার্	১০০
৪.	তিরুমলিকৈ আলোয়ার	২১৬
৫.	নম্মালোয়ার	১২৯৬
৬.	মধুর কবি আলোয়ার	১১
৭.	কুল শেখর আলোয়ার	১০৫
৮.	পেরিয়ালোয়ার	৪৭৩
৯.	আণ্ডাল আলোয়ার	১৭৩
১০.	তোণ্ডর্-অডিপ্পোডি আলোয়ার	৫৫
১১.	তিরুপ্পান্ আলোয়ার	১০
১২.	তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার	১৩৬১
	মোট	৪০০০

উল্লিখিত কবিদের মধ্যে পোয়্‌কৈ আলোয়ার ভূদত্তালোয়ার এবং পেয়ালোয়ার এই তিনজন সমসাময়িক কবিদের প্রত্যেকেরই একশতটি করিয়া স্তবক সংকলিত হইয়াছে, যাহা "তিরুবন্দাদি" (অর্থাৎ শ্রীঅন্তাদি) (৪) নামে পরিচিত। পোয়্‌কৈ আলোয়ারের রচনার নাম "মুদল্ (অর্থাৎ প্রথম) তিরুবন্দাদি।" ইহার প্রথম পদে কবি বিষ্ণুর পদ-বন্দনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"পৃথিবীকে দীপাধাররূপে, মহাসমুদ্রকে তৈলরূপে এবং প্রখর সূর্যকে দীপশিখারূপে (ব্যবহার করিয়া) আমি সেই রক্তোজ্জ্বল চক্রধারীর পাদ-বন্দনা করিতেছি শব্দের মালা দিয়া, যাহাতে আমার বিপদসমূহ নিবারিত হয়" (৫) অন্যত্র কবি আরাধ্য দেবতার প্রতি তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়াবেগের কথা বলিতে গিয়া প্রকৃতি-জগৎ হইতে তিনটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন—নদী যেমন ধাবিত হয় উত্তাল সমুদ্রের অভিমুখে, নবীন পুষ্প যেমন চাহিয়া থাকে উদীয়মান সূর্যের দিকে, জীবন যেমন চলিতে থাকে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া, আমার হৃদয়ও তেমনি কামনা করে একমাত্র পদ্মবাসিনীর পতিকে(৬)।

প্রথম কবি পোয়্‌কৈ আলোয়ারের ন্যায় দ্বিতীয় কবি ভূদত্তালোয়ারের প্রথম পদেও আমরা প্রায় অনুরূপ বিষ্ণু-বন্দনা দেখিতে পাই। পার্থক্য এইটুকু যে, কবি এখানে পৃথিবীর পরিবর্তে দীপাধার করিয়াছেন তাঁহার প্রেমকে, মহাসমুদ্রের পরিবর্তে পরম ভক্তিই তাঁহার ঘৃত (বা তৈল), আনন্দ-বিগলিত চিন্তা (বা মন) তাঁহার প্রদীপের সলিতা। এইরূপ আয়োজন করিয়া তিনি তামিল সঙ্গীতের সাহায্যে নারায়ণের জন্য তাঁহার দীপশিখা জ্বালাইয়াছেন (৭)।

সেই যুগে শিব ও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় কবি পেয়ালোয়ারের রচনায়। এই বিষ্ণুভক্ত কবি প্রথম পদেই তাঁহার আরাধ্য দেবতার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে শিবের রূপ ও রঙ্ কিছুটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিতেছেন—"আজ আমার সমুদ্র-শ্যাম দেবতার মধ্যে আমি দেখিয়াছি শ্রীমতী লক্ষ্মীকে; দেখিয়াছি প্রভুর স্বর্ণকান্তি দেহকে, দেখিয়াছি তাঁহার সূর্য-সন্নিভ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ; আরও দেখিয়াছি স্বর্ণচক্র—সমরে বিপুল শক্তিশালী, আর তাঁহার হাতে দেখিয়াছি শঙ্খ।(৮) এই বর্ণনার মধ্যে 'স্বর্ণকান্তি দেহ' এবং 'সূর্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ' এই দুইটি অংশে শিবের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে অপর একটি শ্লোকে—"তিরুপতির গিরিশীর্ষে চারিদিকে প্রবহমান জলপ্রপাতের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমার প্রভু। তাঁহার মধ্যে একই সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে দুই রূপের—একদিকে তাঁহার দীর্ঘ জটা, অপরদিকে উন্নত কিরীট; একদিকে তাঁহার উজ্জ্বল ত্রিশূল (পরশু), অপর দিকে চক্র; একদিকে তাঁহার সর্পবেষ্টনী, অপরদিকে স্বর্ণাভরণ।(৯) এই ভাবে কবির দৃষ্টিতে শিব ও বিষ্ণু একাকার হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্থ কবি তিরুমলিকৈ আলোয়ারের ২১৬টি স্তবকের মধ্যে "নান্মুকন্ (চতুর্থ) তিরুবন্দাদি" অংশে ৯৬টি এবং "তিরুচ্ছন্দ-বৃত্তম্" অংশে ১২০টি স্তবক সংকলিত হইয়াছে। অতি শৈশবে মাতৃ-পরিত্যক্ত এই কবি জনৈক নিম্নশ্রেণীর ভক্ত কর্তৃক প্রতিপালিত হন। কবির রচনাতেও তাঁহার আত্ম পরিচয়ের কিছু আভাস মিলিবে। কুলমর্যাদাহীন, জ্ঞানশূন্য এবং বেদবিদ্যায় অনধিকারী আলোয়ার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দেবতার চরণে যে কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা হৃদয়স্পর্শী। "চতুর্বর্ণের কোনো বর্ণেই আমার জন্ম হয় নাই; মঙ্গল-দায়ী বিদ্যার কথা আমার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই; জ্ঞানশূন্য আমি পঞ্চেন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ; হে পবিত্র দেবতা, হে আমার প্রভু, তোমার উজ্জ্বল চরণ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় নাই (১০)।

ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে কবির বিশ্বাস একটি উপমার সাহায্যে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—"মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ জাগিয়া উঠে, আবার মহাসমুদ্রের বুকেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। সেইরূপ সমস্ত চরাচর (স্থাবর জঙ্গম) তোমার মধ্যে জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া তোমার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।" (১১) ভগবানের এই স্বরূপ উপলব্ধির পরে কবি-চিত্তে আর কোনো সংশয় নাই। তাই তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলিতে পারিলেন—"হে লক্ষ্মীপতি, তুমিই আমার প্রেম, তুমিই আমার সুদুর্লভ পরিপূর্ণ অমৃত, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার সর্বস্ব। হে উজ্জ্বল আলোকময় কেশব, আমি তোমার দাস। ন্যায় বিচারক তুমি এই দাসকে শাসন কর।" (১২)

কবির নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি দেবতার করুণা-বারি নিশ্চয়ই বর্ষিত হইবে। ভক্ত-ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলিতে গিয়া কবির কণ্ঠে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—"আজ হউক অথবা কাল হউক অথবা আরও কিছুকাল বিলম্বিত হউক, আমার প্রতি অবশ্যই তোমার অনুগ্রহ জন্মিবে। কারণ হে নারায়ণ, আমি নিশ্চিত জানি, তোমাকে ছাড়া আমার যেমন কোনো অস্তিত্ব নাই, তেমনি তুমিও আমাকে ছাড়া থাকিতে পার না। নান্ উন্নৈ অণ্ড্রি ইলেন্, নী এন্নৈ অণ্ড্রি ইলৈ।" (১৩)

দ্বাদশ আলোয়ারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নম্মালোয়ার। দিব্য প্রবন্ধের চারি সহস্র পদের মধ্যে ১২৯৬টি পদ তাঁহারই রচনা। একমাত্র তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার ব্যতীত অন্য কাহারও এত অধিকসংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই। কেবল সংখ্যাধিক্যেই নয়, সাহিত্যিক উৎকর্ষেও নম্মালোয়ার অগ্রণী কবি। আমরা তাঁহার সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

নম্মালোয়ারের শিষ্য মধুর কবি আলোয়ার মাত্র ১১টি পদ রচনা করিয়াছেন। তিরুপ্পান্ আলোয়ার ব্যতীত আর কাহারও এত অল্পসংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই। আসলে, মধুর কবি খুব বেশিসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার গুরু নম্মালোয়ারের গান গাহিয়া বেড়ানোই হইবে তাঁহার একমাত্র কাজ। মধুর কবি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন সমস্তই তাঁহার গুরুদেব নম্মালোয়ারের সম্পর্কে। বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি একটি পদও রচনা করেন নাই, কেননা গুরুই ছিলেন তাঁহার একমাত্র দেবতা। কবি বলিয়াছেন—"যিনি কুরুহুরের পুরুষোত্তম (অর্থাৎ নম্মালোয়ার), রসনায় তাঁহারই নামোচ্চারণ করিয়া আমি আনন্দ পাইলাম; সত্য সত্যই আমি উপনীত হইলাম তাঁহার স্বর্ণচরণ তলে। তাঁহাকে ছাড়া আমি অন্য কোনো দেবতা জানি না। তাঁহারই গানের মধুর সুর কণ্ঠে লইয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াইব।" (১৪)

আলোয়ারদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তম আলোয়ার কুলশেখর। ভক্তি সাধনার জন্য ত্রিবাঙ্কুরের এই নরপতি রাজসিংহাসনের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। রাজকার্য অপেক্ষা মন্দিরে তীর্থ-পরিক্রমাই তাঁহাকে অধিক আকৃষ্ট করিত। অবশেষে তিনি সত্যসত্যই একদিন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীরঙ্গম্-এ আসিয়া রঙ্গনাথের সেবক হইলেন এবং সেখান হইতে কাঞ্চীপুরম্, তিরু বেঙ্কটাচলম্ প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার রচনার নিদর্শন ১০৫টি স্তবকে সম্পূর্ণ "পেরুমাল্ (বিষ্ণু) তিরু মোলি (শ্রীবাক্য)।"

কুলশেখরের রচনায় তাঁহার নিজের জীবনের কথা অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কামিনী-কাঞ্চন নয়, মর্ত্যের রাজসুখ নয়, অপ্সরা-পরিবৃত স্বর্গরাজ্যও নয়, কবির কামনা কেবল রঙ্গনাথের প্রেম। তাঁহার নিজের কথাই শোনা যাক—"হে প্রভু, এই জগৎ (অর্থাৎ জগদ্বাসী), যে জীবন সত্য নয়, তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করে। এইরূপ জগতের সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ, আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমারই জন্য আমার ভালোবাসা। সুতোর মতো ক্ষীণকটি বিশিষ্ট রমণীদের এই যে জগৎ, ইহার সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ, আমি ডাকিয়া বলিতেছি, আমার প্রেম কেবল তোমারই জন্য।" (১৫)

এই জীবন-সমুদ্রে ভগবানই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কবি এই কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ: সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুলে একটি পাখী বসিয়া আছে। মাস্তুল ছাড়িয়া সে একবার অন্য আশ্রয়ের জন্য উড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার চারিদিকেই প্রসারিত কূলহীন অনন্ত সমুদ্র। ক্লান্ত পাখী আবার ফিরিয়া আসে তাহার পুরাতন আশ্রয়ে, জাহাজের মাস্তুলে। পদটি এইরূপ:

বেঙ্গণ্ তিণ্ কলিরু অডর্ত্তায়্!
  বিত্তুব্ কোট্টু অম্মানে!
এঙ্গুপ্ পোয়্ উয়্ চেন্, নিন্
  ইণৈ অডিয়ে অড়ৈয়ল্ অল্লাল্।
এঙ্গুম্পোয়্ক্ করৈ কাণাদু
  এরিকডল্বায় মীণ্ডেয়ুম্
বঙ্গত্তিন্ কূম্বু এ রুম্
  মাপ্পরবৈ পোণ্ড্রেনে। (১৬)

তিরুবেঙ্কটাচলম্‌-এ বসিয়া কুলশেখর যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতেই দেখা যায় কবি রাজ্য চাহেন না, অর্থ চাহেন না, উর্বশীর ভালোবাসাও তাঁহার কাম্য নয়। অপ্‌সরা-পরিবৃত স্বর্গের প্রতিও তাঁহার কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি শুধু চান তিরুপতির আশ্রয়ে যে কোনোরূপে জীবনধারণ করিতে। তাহাতে যদি মনুষ্য জন্ম ছাড়িয়া কবিকে মৎস্যজন্মও গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। একটি পদ এইরূপ: স্বর্গলোকের রাজছত্রের নীচে থাকিয়া যদি স্বর্ণ-মেখলা-বেষ্টিত উর্বশীর অঙ্গ-স্পর্শও লাভ করি, তাহার প্রতি আমি উদাসীন থাকিব। বরং আমি আমার প্রভু রক্তপ্রবালধর বিষ্ণুর সেই তিরুবেঙ্কট নামক স্বর্ণপর্বতের উপরে যৎসামান্য জীবন ধারণ করিয়া থাকিব। (১৭)

তিরুবেঙ্কটে রচিত অনুরূপ ভাবের আর একটি পদ উদ্ধৃত করা হইল:

আনাদ চেল্‌বত্ত্‌ আরম্‌বৈয়র্‌কল্‌ তর্‌চুল
বান্‌ আলুম্‌ চেল্‌বমুম্‌ মন্‌ অরচুম্‌ য়ান্‌ বেন্ডেন্‌।
তেন্‌ আর্‌ পুঞ্জোলৈত্‌ তিরুবেঙ্কটচ্‌ চুনৈয়িল্‌
মীনায়্‌প্‌ পিরক্কুম্‌ বি‌ধিউডৈয়েন্‌ আবেনে। (১৮)

কৃষ্ণের বালক্রীড়া দর্শনে যশোদার বাৎসল্য পূর্ণ হৃদয়ের আনন্দ বর্ণনায় কুলশেখর যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। মাকে লুকাইয়া শিশুর দধি-মাখন খাইবার চেষ্টা এবং আড়াল হইতে পুত্রের কীর্তি দেখিয়া মায়ের আনন্দ-কৌতুকবোধের নিদর্শন স্বরূপ আমরা কেবল একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

মুলুদুম্‌ বেণ্‌ণেয়্‌ অলৈনুতোট্টু উণ্‌ণুম্‌,
মুকিল্‌ ইলম্‌ চিরুত্ত্‌ তামরৈক্‌ কৈয়ুম্‌,
এলিল্‌ কোল্‌ তাম্বু কোণ্ডু অডিপ্‌পতর্‌কু এল্‌কুম্‌
নিলৈয়ুম্‌, বেণ্‌ তয়্যির্‌ তোয়্‌ন্দ চেব্‌ বায়ুম্‌,
অলুকৈয়ুম্‌, অঞ্জিনোক্‌কুম্‌ অন্‌ নোক্‌কুম্‌,
অণিকোল্‌ চেম্‌ চিরুবায়্‌ নেলিপ্‌পতুবুম্‌,
তোলুকৈয়ুম্‌ ইবৈ কণ্ড অচোদৈ
তোল্লৈ ইন্‌পত্তু ইরুদি কণ্ডালে। (১৯)

পেরিয়ালোয়ার এবং তাঁহার পালিতা কন্যা আণ্ডাল্‌-এর জীবন-কাহিনী তামিলনাডে সুপরিচিত। দিব্য প্রবন্দম্‌-এ আণ্ডালের মাত্র ১৭৩টি স্তবক সংকলিত হইলেও তামিল-বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে নম্মালোয়ারের পরেই তাঁহার প্রসিদ্ধি সবচেয়ে বেশি। সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রয়োজন মনে করিয়া আমরা এখানে কেবল পেরিয়ালোয়ারের কথা বলিতেছি। বাৎসল্য রসের কবি-রূপেই ইঁহার খ্যাতি। তামিল বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার ১২টি স্তবকে সম্পূর্ণ "তিরুপ্‌ পালাণ্ডু" সমধিক পরিচিত হইলেও আমরা তাঁহার "তিরুমোলি" (শ্রীবাক্য) অংশ হইতে দুইটি পদের সাহায্যে কবির বাৎসল্যরসসৃষ্টির পরিচয় লইব।

"বালগোপাল ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে; বারে বারে দুলিতেছে তাহার কপালের টিক্‌লি; তাহার সোনার কটি-ভূষণে রুনুঝুনু শব্দ হইতেছে; হে চাঁদ, যদি তোমার চোখ থাকে, তবে আমার বালগোবিন্দের ক্রীড়া দেখিয়া যাও।

আমার ছোট্ট বাছা আমার প্রাণ; আমার কাছে সে অনুপম অমৃত; সে তাহার ছোট ছোট হাত তুলিয়া তোমাকে ডাকিতেছে। হে চাঁদ, যদি তুমি এই বাল-কৃষ্ণের সহিত খেলিতে ইচ্ছা কর, তবে মেঘের মধ্যে লুকাইও না, সানন্দে চলিয়া এস।" (২০)

আলোয়ারদের অধিকাংশ নামই তাঁহাদের উত্তর জীবনে গৃহীত বা আরোপিত হইয়াছে। ভক্তজীবনের নামের আড়ালে তাঁহাদের বাল্যকালের নাম প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। এইরূপ একজন কবি তোণ্ডর্‌-অডিপ্‌ পোডি। তাঁহার পূর্ব নাম বিপ্রনারায়ণ। দেবদেবী নামক জনৈক নর্তকীর প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহার মতিভ্রম ঘটে। কিন্তু অনতিকাল পরেই প্রভু রঙ্গনাথের কৃপায় মোহমুক্ত হইয়া তিনি নতুন নামে নতুন জীবন আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার নাম হইল তোণ্ডর্‌-অডিপ্‌-পোডি অর্থাৎ ভক্ত-চরণ-রেণু।

তোণ্ডর্‌-অডিপ্‌-পোডি আলোয়ারের সংকলিত পদ-সংখ্যা ৫৫। "তিরুমালৈ" (অর্থাৎ পবিত্র মালা) অংশে ৪৫টি এবং "তিরুপা-পল্লী-এলুচ্চি" (অর্থাৎ শ্রীনিদ্রাভঙ্গ বা প্রভুর জাগরণ) অংশে ১০টি। আমরা তাঁহার একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদের মধ্য দিয়া কবির অনুতপ্ত চিত্তের কাতর আর্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে—"আমার ঘর (গ্রাম) নাই; নিজের বলিতে এক কানি জমিও নাই; তুমি ছাড়া আমার অন্য কোনো বান্ধব নাই; হে পরমমূর্তি, ইহলোকে তোমার পাদপদ্মেও

আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না। হে আমার কৃষ্ণ, হে আমার নব ঘনশ্যাম, হে আমার রঙ্গনাথ, আমি চীৎকার করিয়া বলিতেছি—আমার কে আছে?" (২১)

"অমলন্ আদি পিরান্" (অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক আদি প্রভু) শিরোনামায় যে দশটি স্তবক সংকলিত হইয়াছে তাহার রচয়িতা তিরুপ্পান্ আলোয়ার। এই কবিতায় ভক্ত-কবি নারীরূপে তাঁহার প্রেমিক দেবতার অঙ্গ-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, মেঘশ্যাম কৃষ্ণের রূপ-দর্শনের পরে ইহলোকে তাঁহার আর দেখিবার কিছুই নাই। কবির বর্ণনার কিয়দংশ এইরূপ—"আমার প্রভু অলংকারশোভিত রঙ্গনাথ; হাতে তাঁহার বঙ্কিম শঙ্খ এবং উজ্জ্বল চক্র; উচ্চ পর্বতের ন্যায় তাঁহার শরীর; তুলসী গন্ধে আমোদিত, উন্নতশীর্ষ। আহা, তাঁহার রক্তিম অধর আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে।

দেবতাদের অপ্রবাসীয় সেই আদি প্রভু রঙ্গনাথ; যিনি হয়বদন-রূপে অসুরের শরীর বিদীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার নির্মল মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল আয়ত রক্তিম নয়নযুগল আমাকে পাগল করিয়াছে।" (২২)

কবি যেন কৃষ্ণ-প্রেম-মুগ্ধ গোপী। তাই তো তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে—"আমার নয়ন দেখিয়াছে সেই ঘনশ্যামকে, গোপালরূপে জন্ম লইয়া যে ননী-মাখনের আস্বাদ লাভ করিল; যে হরণ করিয়া লইল আমার হৃদয়; দেবকুলের রাজা সেই শ্রীরঙ্গবাসীকে, আমার হৃদয়ামৃতকে দেখিবার পরে আমার নয়ন আর অন্য কিছুই দেখিতে চাহে না।" (২৩)

দ্বাদশ আলোয়ারের সর্বশেষ কবি তিরুমঙ্গৈ আলোয়ারের রচনা হইতে সর্বাধিকসংখ্যক পদ-সংকলিত হইয়াছে। (২৪) কবিত্বগুণে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নম্মালোয়ারের সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার পরেই ইঁহার স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। আলোচ্য ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁহার দেবতা পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ সমস্ত গুণের আধার।

পাবমুম্ অরমুম্ বীডুম্
ইন্‌বমুম্ তুনপম্ তানুম্
কোবমুম্ অরুলুম্ অল্লাক্
গুণঙ্গলুম্ আয় এন্‌দৈ
মূবরিল্ এঙ্গল্ মূর্ত্তি
ইবন্ এন মুনিব রোড়ু
দেবর্ ব ন্দু ইরৈঞ্জুম্ নাঙ্গূর্‌ত্
তিরু মণিক্ কূডত্তানে। (২৫)

কবি শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রভু যখন গুহকের মতো দীনহীন ব্যক্তিকেও কৃপা করিলেন তখন অবশ্য কবিও তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

এরৈ এদলন্ কীলমকন্ এন্নাদু
ইরঙ্গি মট্রবর্ক্কু ইন্ অরুল্ চুরন্দু,
"মালৈ মান্‌মড নোক্কি উন্ তোলি,
উম্‌বি এম্‌বি" এণ্ড ওলিন্দিলৈ; উকন্দু
"তোলন নী এনক্কু ইঙ্গু ওলি" এণ্ড
চোর্‌কল্ বন্দু অডিয়েন্ মনত্তু ইরুন্দিড,
আলিবন্ন! নিন্ অডিয়িনৈ অডৈন্দেন্,
অণিপোলিল্ তিরু অরঙ্গত্তু অম্মানে। (২৬)

নামের মহিমা কীর্তন উপলক্ষে নারায়ণ-ভক্ত কবি বলিয়াছেন, যে শব্দটি আমাকে সদ্বংশে জন্মলাভের সৌভাগ্য দান করে, আমার সকল দারিদ্র্য দূর করিয়া সম্পদের অধিকারী করে; ভক্তজনের যত দুঃখকষ্ট দূর হইয়া যায় যাঁহার কৃপায়; যাঁহার প্রসাদে হয় দীর্ঘস্থায়ী স্বর্গবাস, যিনি দান করেন অক্ষয় বৈকুণ্ঠ; যিনি শক্তিদাতা; জন্মদায়িনী জননী অপেক্ষাও যাঁহার মাধুর্য অধিক; সেই সর্বশুভদায়ী নামটি আমি জানিয়াছি—তাহা হইল "নারায়ণ"। (২৭)

সেই নারায়ণের সহিত অনন্ত মিলনই কবির কাম্য। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা তাঁহার কিছুতেই দূর হইল না। এইখানে আমরা বৈষ্ণব কবির সেই বেদনা-বিধুর বিরহী রূপটি দেখিতে পাই। কোথায় সেই তিরুকণ্ণপুরম্, যেখানে রহিয়াছে তাহার প্রিয়তম রক্তলোচন বিষ্ণু। কে সেখানে তাঁহার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে? ঐ যে তরুণ হংস—লাল রক্তের পা দুখানি যাহার, উক্তকেই সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—"হে হংস আজই তুমি সেই নগরীতে যাইয়া তাহাকে বলিও আমার ভালোবাসার কথা। যদি সত্যই তুমি আমার এই অনুরোধ পালন কর, তবে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ আমার আর কিছুই

হইতে পারে না।" হংস নিঃস্বার্থ হইয়া এই দৌত্য কার্য না-ও করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিরহিণী তাহাকে নানারূপ প্রলোভনের কথা শুনাইতেছে—"এই যে সবুজ কানন, ইহা চিরকাল তোমারই হইয়া থাকিবে। আর ঐ যে ধানক্ষেত, উহার জলে আমি তোমাকে মাছ ধরিয়া খাইতে দিব। এখানে আসিয়া তুমি ও তোমার স্ত্রী মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া মহা আনন্দ লাভ করিবে।" (২৮)

আজ হইতে সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম অংশে বৈষ্ণবকবিগণ তামিল ভাষায় যে অপূর্ব প্রেমভক্তির গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই যৎসামান্য পরিচয় দানের চেষ্টা করিলাম। উত্তরকালীন ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য এই তামিল ভক্তি সাহিত্যের প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরসের আকর শ্রীমদ্ভাগবত আলোয়ার ভক্ত সম্প্রদায়েরই সমুজ্জ্বল কীর্তি।

পাদটীকা

(১) নাল্ (চারি) আয়ির (সহস্র) দিব্য প্রবন্দম্ (দিব্য গীতের সংগ্রহ)।

(২) দিব্যপ্রবন্ধম-এর কোনো কোনোসংস্করণে পদ-সংখ্যা ৩৭৭৬।

(৩) আল্ ((নিমগ্ন) + আর্ (সম্ভ্রম সূচক বা বহুবচনাত্মক প্রত্যয়) আল্বার (আলোয়ার) অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম সাগরে নিমগ্ন যাঁহারা।

(৪) প্রথম স্তবকের অন্তে প্রযুক্ত শব্দ বা শব্দাংশকে পরবর্তী স্তবকের আদিতে ব্যবহার করিয়া যে পদগুচ্ছ রচিত হয় তাহারই নাম তিরুবন্দাদি (অন্ত + আদি)।

(৫) বৈয়্‌য়ম্ তকলিয়া. ব্যার্কডলে নেয়্যাক,
বেয়্য কতিরোন্ বিলক্কাকচ্—চেয়্য়
চুডর্ আলিয়ান্ অডিকেক চূট্রিনেন্ চোল্মালৈ,
ইডর্ আলি নীঙ্গুকবে, এণ্ড্ৰ।

(৬) পেয়রুম্ করুঙ্কডলে নোক্কুমারু—শুণ্ পূ
উয়রুম কদিরব্নে নোক্কুম্ উয়িরুম্
ধর্মনৈয়ে নোক্কুম্, ওল্ তামরৈয়াল্ কেল্বন্
ওরুব্নৈয়ে নোক্কুমুণর্বু। (৬৭ সং)

(৭) অন্বে তকলিয়া আর্বমে নেয়্যাক
ইন্পুরুকু চিন্তৈ ইডুতিরিয়া—নন্পুরুকি
ঞানচ্ চুডর্বিলক্কু এট্রিনেন্ নারনর্কু
ঞানত্ তমিল্পুরিন্দ নান্।—ইরণ্ডাম্ (দ্বিতীয়) তিরুবন্দাদি সং ১।

(৮) তিরুক্ কণ্ডেন্, পোন্মেনি কণ্ডেন্, তিকলুম্
অরুক্কন্ অনিনিরমুম্ কণ্ডেন্, চেরুক্কিলরুম্
পোন্ আলি কণ্ডেন, পুরিশঙ্খম্ কৈক্কণ্ডেন্,
এন্ আলি বণ্ণন্পাল্ ইণ্ড্ৰ।
—মুণ্ড্ৰাম্ (তৃতীয়) তিরুবন্দাদি সং ১।

(৯) তাল্ জটৈয়ুম্ নীন্মুডিয়ুম্ ওণ্মলুবুম্ চক্রমুম্
চূল্ অরবুম্ পোন্নাণুম্ তোণ্ড্ৰমাল্—চূলুম্
তিরণ্ডরুবি পায়ুম্ তিরুমলৈমেল্ এন্দৈক্কু
ইরণ্ডুরুবুম্ ওণ্ড্ৰায় ইচৈন্দু।
—ঐ সং ৬৩

(১০) কুলঙ্গল্ আয় ঈর্ ইরণ্ডিল্ ওণ্ড্ৰিলুম্ পিরন্দিলেন,
নলঙ্গল্ আয় নর্কলৈকল্ নাবিলুম্ নবিট্রিলেন,
পুলন্কল্ ঐন্দুম্ বেণ্ড্ৰিলেন, পোরিয়িলেন্, পুনিত! নিন্
ইলঙ্গু পাদম্ অণ্ড্ৰি মট্রোর্ পট্রিলেন এম্ ঈশনে।
—তিরুছন্দ বৃত্তম্ সং ৯০।

(১১) তন্ উলে তিরৈত্তু এলুম্ তরঙ্গ বেণ্ তডম্ কডল্
তন্ উলে তিরৈত্তু এলুম্ তডঙ্গুকিণ্ড্ৰ তন্মৈপোল্
নিন্ উলে পিরন্দিরন্দু নিরপবুম্ তিরিপবুম্
নিন্ উলে অডঙ্গুকিণ্ড্ৰ নীর্মৈ নিন্কণ্ নিণ্ড্ৰদে। ঐ সং ১০

(১২) অন্পাবায়্ আর্ অমুদম্ আবায় অডিয়েন্কু
ইন্পাবায় এল্লামুম্ নী আবায়—পোন্পাবৈ
কেল্বা! কিলর্ ওলি এন্ কেশবনে! কেডিণ্ড্ৰি
আল্বার্কু অডিয়েন নান্ আল্।—নানমুকন তিরুবন্দাদি সং ৫৯।

(১৩) ইণ্ড্ৰাক নালৈয়েয়াক ইনিচ্চিরিন্দুম্
সিণ্ড্ৰাক নিন্ অরুল্ এন পালদে—নণ্ড্ৰাক
নান্ উন্নৈ অণ্ড্ৰি ইলেন্ কণ্ডায় নারণ নে!
নী এন্নৈ অণ্ড্ৰি ইল্লৈ।
—নানমুকন তিরুবন্দাদি, সং ৭।

(১৪) নাবিনাল্ নবিট্রি ইন্বম্ এয়্দিনেন্,
মেবিনেন্ অবন্ পোন্ অডি মেয়্ম্মৈয়ে,
দেবু মট্রু অরিয়েন্, কুরুহুর্ নম্বি
পাবিন্ ইন্ ইচৈ পাডিত্ তিরিবনে।

(১৫) মেয়্যিল্ বাল্ক্কৈয়ৈ মেয় এণক্ কোল্লুম্—ইব্
বৈয়্যন্, তন্নোডুম্ কুডুবদিল্লৈয়ান্,
ঐয়নে! অরঙ্গা! তণ্ড্ৰ অলৈক্কিণ্ড্ৰন—
মৈয়ল্ কোণ্ডু অলিন্দেন্ এণ্ড্ৰন্ মালুক্কে।
কুলিনের্ ইডৈয়ার্ তিরণ্ডেনিরকুম্

এঙ্গন্. তল্লোডুম্ কু ডুবদি য়্যৈয়ান্,
আলিয়া অলৈয়া অরঙ্গা ! এণ্ড
মাল্ এলুন্দু ওক্নিদেন্ এণ্ডুন্ মালুক্কে।

—পেরুমাল্ তিরু।

(১৬) হে প্রভু, যদি তোমার চরণে শরণ না পাই তবে আমি কোথায় যাইব? কোথায় গিয়া নিরাপদ্ আশ্রয় লাভ করিব? যে পাখী তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের নানা দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কূলের সন্ধান না পাইয়া পুনরায় জাহাজের মাস্তুলে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে, আমিও যে সেই পাখীর মত।

১৭। • উম্বর্ উলকু আণ্ডু ওরুকুডৈক্ কীল উরুপ্পচিতন্
অম্পোর্ কলৈ অলকুল্ পেট্রালুম্ আদরিযেন,
চেম্ প্‌বল ব্‌য়ান্ তিরুবেঙ্কটম্ এন্নুম্
এম্ পেরুমান্ পোন্মলৈ মেল্ এদেন্নুম্ আবেনে।

১৮। এই মর্ত্যের রাজত্ব কিংবা চিরযৌবনা অপ্সরাদের দ্বারা বেষ্টিত যে স্বর্গের রাজ্য সম্পদ্ তাহা আমি চাই না। আমার অদৃষ্ট (বা কর্ম) এমন হউক্ যাহাতে আমি যেন মধুময় পুষ্পোদ্যানপূর্ণ তিরুবেঙ্কটাচলের নির্ঝরে মৎস্যরূপে জন্মলাভ করিতে পারি।

১৯। শিশু কৃষ্ণ হাত দিয়া মাখন স্পর্শ করিয়া তাহার আস্বাদ লইতেছে; পদ্মের মত কোমল তাহার ছোট হাত দু'খানি ঈষৎ বোজা; সুন্দর একগাছি দড়ি লইয়া মা তাহাকে মারিতে আসিতেছে বলিয়া তাহার একটু ভয়-ভয় ভাব; কৃষ্ণের লাল মুখখানি দই দিয়া একেবারে মাখা-জোখা হইয়া আছে; তাহার সমস্ত চোখে সুন্দর দৃষ্টি; তাহার লাল মুখের সুন্দর কম্পন; এবং তাহার প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড়-করা হাত—এই সমস্ত দেখিয়া মা যশোদা যে আনন্দলাভ করিল, তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই।

(২০) তন্মুখত্তুচ্চেট্টি তুঙ্গত্ তুঙ্গত্ তবলন্দু পোয়
পোন্মুখক্ কিঙ্কিণী য়ারপ্প পুলুদি অলৈ কিণ্ডান্,
এন্ মকন্ গোবিন্দন্ কূওনৈয়িল মামদি !
নিন্ মুখম্ কন্নুল্ ব্‌কিল নী ইঙ্গে নোক্কিপ পো।
এন্ চিরুকুট্টন্ এনক্কু ওর্ ইন্ অমুদি এন্ পিরান্
তন্ চিরুক্ কৈকলাল্ কাট্টি ক্কাট্টি অলৈকিণ্ডান্,
অঞ্জন-বণ্ণ:নাডু আডল্ আড উরুদিয়েল্
মঞ্জিল্ মরৈয়াদে মামদি। মকিলন্দু ওডি ব্‌।

—পেরিয়ালোয়ার তিরুমোলি (১।৪।১-২)

(২১) উর্ ইলেন্ কানি ইল্লৈ, উরবু মট্রু ওরুবর্ ইল্লৈ;
পারিল্ নিন্ পাদমূলক্ পট্রিলেন্, পরমমূর্তি !
কার্ ওলি বন্ননে ! এন্ কণ্ণনে ! কদরুকিণ্ড্রেন্—
আর্ উলর্? কলৈকন্ অম্মা ! অরঙ্গ মা-নগরুলানে।

(২২) কৌয়নার্ চুরিশঙ্খনলালিয়র, নীল্ বরৈপোল্
মেয়্য়িনার্, তুলপবিরৈয়ার্ কমলনীন্ মুডি এম্
ঐয়নার্—অণি অরঙ্গনার্ অরবিন্নৈমিচৈমেয় মায়নার,

চেয়্য বায়্ ঐয়ো ! এন্নৈচ্ চিন্তৈ কবরন্দতুবে।
পরিয়ন্ আকি বন্দু অবুনন্ উডল্ কীণ্ডু, অমররুক্কু
অরিয় আদি পিরান্ অরঙ্গণ্ডু অমলন্ মুখণ্ডুক্
করিয় আক্কিপ্ পুডৈ পরন্দু মিলিরন্দু চেব্‌বরিয়োডিনীণ্ডবপ
পেরিয় আয়কন্নল্ এন্নৈপ পেদৈমৈ চেয়্দনবে।

—অমলন্-আদি-পিরান্ (পদ সং ৭—৮)

(২৩) কোণ্ডল্ বণ্ণনৈক্ গোবলনায় বেণ্ নৈয়
উণ্ড বায়ন্, এন্ উল্লম্ কবর্ন্তানৈ,
অণ্ডর্ কোন্ অণি অরঙ্গন্ এন্ অমুদিনৈক্
কণ্ড কন্বল্ মট্রূ ওণ্ডি নৈক্ কাণাবে।

(২৪) নম্মালোয়ারের পদসংখ্যা ১২৯৬ এবং তিরুমঙ্গৈ আলোয়ারের পদসংখ্যা ১৩৬১।

২৫। নাঙ্গুর্ তিরুমণির (নামক স্থানের) মন্দিরে বাস করেন এই যে আমার প্রভু, ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিব এই ত্রিমূর্তির মধ্যে আমাদের এই প্রভুকেই মুনি ও দেবতারা আসিয়া পূজা করিয়া যান। ইনি আমার পাপ ও ধর্ম, মোক্ষ ও আনন্দ; ইনিই আমার দুঃখ, ইনিই আমার নিগ্রহ, ইনিই আমার অনুগ্রহ, ইনিই সব কিছু।

২৬। হে সমুদ্র-বর্ণ প্রভু! মনোহর কুঞ্জ-বেষ্টিত শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথ! তোমার মধুর করুণা-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল দীনদরিদ্র নীচবংশীয় গুহকের প্রতি। তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, "এই মৃগনয়নী সুন্দরী রমণী (সীতা) তোমার ভ্রাতৃবধূ, আমার-ভাই তোমারও ভাই। তুমি আমার ভাই।" তোমার সেই কথাগুলি, ভক্ত আমি, আমার অন্তরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমি তোমার চরণ-যুগলে উপনীত হইলাম।

—পেরিয় তিরুমেলাক ৫।৮।১

২৭। কুলম্ তরুম্, চেল্বম্ তন্দিডুম্, অডিয়ার্
পডুতুয়র্ আয়িন এল্লাম্
নিলন্দরম্ চেয়্যুম্; নীলবিচুম্বু অরুলুম্;
অরুলোডু পেরুনিলম্ অলিক্কুম্,
বলম্ তরুম্ মট্রুম্ তন্দিডুম্; পেট্র
তায়িনুম্ আয়িন চেয়্যুম্;
নলম্ তরুম্ চোল্লৈ নান্ কণ্ডু কোণ্ডেন;
"নারায়ণা" এন্নুম্ নামম্। —পেরিয় তিরুমোলি ১।১।৯

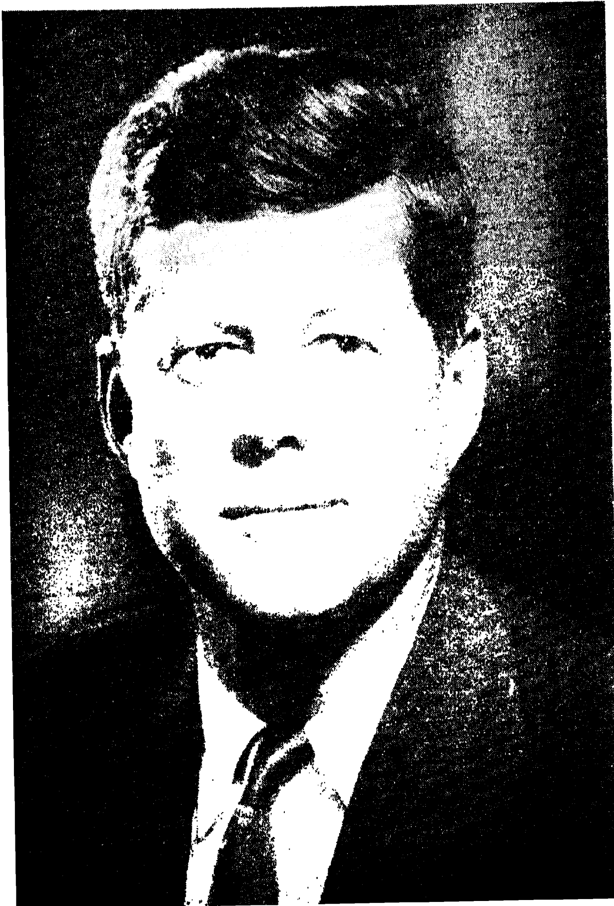
২৮। চেণ্ড্ কাল মডনারায়্ ! ইণ্ড্রে চেণ্ড্র,
তিরুক্কয় পুক্কুন্ এন্ চেণ্ড্ কন্ চেণ্ডকন্ মালুক্কু
এন্ কাদল্ এন্ তুণৈবরক্কু উরৈণ্ডিয়াকিল্
ইদু ওপ্পদু এমক্কু ইনম্ ইল্লৈ; নালুম্
পেণ্ড্ কানম্ ইদেল্লাম্ উনদে আকপ্,
পলনমীন্ কবরন্দুন্নত্ তরুবন্; তন্দাল্
ইঙ্গে ব্‌ন্দু ইনিদু ইরুন্দুন্ পেডৈয়ুম্ নীয়ুম্
ইরু নিলত্তিল্ ইনিদু ইন্বম্ এয়্দলামে।

—তিরু—নেডুন্—তাণ্ডকম্ (দীর্ঘ বৃত্ত) পদ সং ২৭।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ ব্যারিষ্টার-এট্-ল

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডি গত ২০শে জানুয়ারি তাঁর কার্যাভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন ও প্রেসিডেন্ট পদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গত নির্ব্বাচনের সময় আমি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলাম এবং আতলান্তিক মহাসাগর হইতে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা দেখেছিলাম তার তুলনা হয়না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। লস্ এনজেল্‌সে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সঙ্গে এক ভোজসভাতে প্রেসিডেন্টপদের উভয় প্রার্থীর সমর্থক ছাত্রদের আলোচনা শুনেছিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে মিঃ কেনেডি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একসভায় বক্তৃতা করেন। নির্ব্বাচনের কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য বারবার আবেদন জানান হয়েছিল এবং যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এজন্য কয়েকটি সহরে বড় বড় হোটেলে নাম লিখানর ব্যবস্থাও ছিল। নির্ব্বাচনের দিন ৮ই নভেম্বর আমি নিউইয়র্ক ষ্টেটের অন্তর্গত 'বাফালো' সহরে এক আমেরিকান পরিবারে অতিথি ছিলাম এবং তাঁদের সৌজন্যে ঐ সহরে কতকগুলি ভোটদানকেন্দ্র ও উহার কার্য্য পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। স্বাধীন নির্ব্বাচন যে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রক্ষক তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় যে কোটি কোটি লোকের ভোটদানকার্য্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং গণনা ও ফল ঘোষণা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল। পরদিন সকালের খবরের কাগজে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত খবরই প্রকাশিত হয়েছিল—যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার আইনসম্মত তারিখ অনেক পরে ছিল।



প্রেসিডেন্ট জন্ কেনেডি

১৯৬০ সালের নির্ব্বাচন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ 'আলাস্কা' ও 'হাওয়াই' নামক যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দুইটি নূতন রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ এইবার প্রথম ভোটদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রের মোট রাষ্ট্র সংখ্যা হইতেছে পঞ্চাশ।

প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন—জাতীয় দলগুলির মনোনয়নী সংস্থা কর্ত্তৃক প্রেসিডেণ্টপদের জন্য প্রার্থী মনোনীত করা হয়।

Electoral College বা নির্ব্বাচক সংস্থা—যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্র উহার আইনসভার নির্দ্দেশমত সেই রাষ্ট্রের যতসংখ্যক সিনেটর ও রিপ্রেসেন-টেটিভ কংগ্রেসে আছেন তাহার সমসংখ্যক নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু উহারা কেহ যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর, রিপ্রেসেনটেটিভ বা বেতনভোগী কর্ম্মচারি হইতে পারিবেন না। বর্তমানে মোট নির্ব্বাচক সংখ্যা ৫৩৭ তন্মধ্যে—নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের নির্ব্বাচক সংখ্যা ৪৫, ইহাই সর্ব্বাধিক। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে সফলতালাভ করিতে হইলে নির্ব্বাচক সংস্থা বা Electoral Collegeর ২৬৯টি ভোট আবশ্যক। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভোটারগণ তাহাদের নির্ব্বাচকদের জন্য ভোট দেন এবং নির্ব্বাচকগণ আবার তাহাদেরই পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দেন। নির্ব্বাচকদের ভোটগুলি কংগ্রেসে পাঠান হয় এবং কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সম্মুখে ৬ই জানুয়ারি ভোটগণনা হয়। অতঃপর ২০শে জানুয়ারি প্রেসিডেণ্ট তাঁর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করিতে হয়—

"আমি যথাযথভাবে শপথ করিতেছি (অথবা অঙ্গীকার করিতেছি) যে আমি বিশ্বস্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিব এবং আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সংরক্ষণ করিব ও রক্ষা করিব।"

২০শে জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই শপথ গ্রহণ করান।

প্রেসিডেণ্টপদের যোগ্যতা, ক্ষমতাবলী ও কার্য্যকাল—প্রেসিডেণ্ট অবশ্যই ৩৫ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান নাগরিক (Natural-Born Citizen) হইবেন এবং অন্ততপক্ষে ১৪ বৎসর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী হইবেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্টের অনেক ক্ষমতা। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদলের প্রধান সেনাপতি এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা তাঁহারই। সিনেটসভার উপদেশ ও সম্মতিক্রমে তিনি সন্ধি করিতে পারেন। সিনেটসভার পরামর্শ ও সম্মতি লইয়া তিনি রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে প্রেসিডেণ্টের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার স্থান নাই। প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রের শাসনবিভাগগুলির কার্য্য সম্বন্ধে বিভাগীয় প্রধানদের মত গ্রহণ করিতে পারেন। প্রেসিডেণ্টের এই ক্ষমতা হইতে ক্যাবিনেটের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রের সম্বন্ধে খবরাখবর কংগ্রেসকে জানাইবেন। কংগ্রেসের উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত বিল প্রেসিডেণ্ট গ্রহণ করিবেন, অনুমোদন করিবেন, স্বাক্ষর করিবেন অথবা নাকচ করিতে পারিবেন। প্রেসিডেণ্ট চার বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন, নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারি হইতে কার্য্যকাল আরম্ভ হয়। বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সহ অপর কয়েকজন প্রেসিডেণ্ট দুইবারের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া মোট আট বৎসর কার্য্য করেন। একমাত্র ফ্রাঙ্কলিন, ডি, রুসভেল্ট তিনবারের কার্য্যকাল পূর্ণ করিয়া চতুর্থবারের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং কিছুদিন কার্য্য করিয়া ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫এ পরলোকগমন করেন। অতঃপর ১৯৪৭এ গঠনতন্ত্র সংশোধন আইন দ্বারা স্থির করা হয় যে কেহ প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দুইবারের অধিক নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। মিঃ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এবং বয়ঃ-কনিষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট। বিখ্যাত জর্জ্জ ওয়াশিংটন ছিলেন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট এবং তিনি পেশায় ছিলেন Virginiaর চাষী (Planter)। দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট জন আদামস্ ম্যাসাচুসেটসের আইনজীবী। তিনি জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র জন কুইন্সি আদামসকে ষষ্ঠ প্রেসিডেণ্টপদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া যান। তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট জেফারসন ছিলেন চাষী ও আইনজীবী। নবম প্রেসিডেণ্ট উইলিয়ম এইচ হ্যারিসন ৬৮ বৎসর বয়সে নির্ব্বাচিত হইয়া মাত্র এক-মাস কার্য্য করিয়া পরলোকগমন করেন। ২২জন প্রেসি-ডেণ্ট ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। তিনজন প্রাক্তন প্রেসি-ডেণ্ট এখনও জীবিত আছেন যথা হুভার, ট্রুম্যান ও

আইসেনহাওয়ার। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে Virginiaর অধিবাসী ৮জন এবং OHIOর ৭জন প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ম্যাসাচুসেটস্ রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের স্নাতক।

প্রেসিডেণ্ট পদের বার্ষিক বেতন একলক্ষ ডলার, ইহা ছাড়া খরচের জন্য দেওয়া হয় পঞ্চাশ হাজার ডলার, বাৎসরিক চল্লিশ হাজার ডলার ভ্রমণ ও আতিথেয়তার জন্য, এবং খরচের জন্য অতিরিক্ত দশ হাজার ডলার। যদি প্রেসিডেণ্ট কার্য্য করিতে অক্ষম হন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের উপর কার্য্যভার অর্পিত হইবে। প্রেসিডেণ্টের অপসারণ, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অক্ষমতার সময় কংগ্রেসের আইন অনুযায়ি নিম্নলিখিতগণ পর্য্যায়ক্রমে প্রেসিডেণ্টের পদের কার্য্য পরিচালনা করিবেন—হাউসএর স্পীকার, সিনেটের সভাপতি প্রো: টেম, সচিব রাষ্ট্রবিভাগ, সচিব অর্থ বিভাগ, সচিব প্রতিরক্ষা, এ্যাটর্ণি জেনারেল, পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল, সচিব অভ্যন্তর বিভাগ, সচিব কৃষি বিভাগ, সচিব বাণিজ্য বিভাগ ও সচিব শ্রম বিভাগ।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে, যদি অভিযোগে এবং বিচারে তিনি দেশদ্রোহিতা, ঘুষ গ্রহণ বা অপর কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হন। কেবলমাত্র হাউস অব্ রিপ্রেসেনটেটিভের এই অভিযোগ আনয়ন করার ক্ষমতা আছে এবং অধিকাংশ সদস্যের ভোট আবশ্যক। হাউস অভিযোগ করা সাব্যস্ত করিলে ব্যাপারটি বিচারের জন্য সিনেট সভায় প্রেরিত হয়, উহা আদালতের কার্য্য করে। প্রেসিডেণ্টের বিচারের সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতিত্ব করেন। কেবলমাত্র একজন প্রেসিডেণ্ট এণ্ড্রু জনসনকে অভিযোগ আনয়ন দ্বারা অপসারণের চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই।

আমেরিকার উচ্চশিক্ষালয়গুলির মধ্যে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই অধিকাংশ প্রেসিডেণ্টের শিক্ষাক্ষেত্র—এই গৌরবের দাবি করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট কেনেডিও হারভার্ডের স্নাতক। ওয়াশিংটন ও লিংকনসহ নয়জন প্রেসিডেণ্ট কোনও কলেজের ছাত্র ছিলেন না। আব্রাহাম লিংকন ব্যতীত আরও ৬জন প্রেসিডেণ্ট যথা জেফারসন, জ্যাকসন, ফিলমোর, বাকানন্, গারফিল্ড ও আর্থার কুটীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জর্জ্জ-ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট, Confederationর আর্টিকেল অনুযায়ী তাঁহার পূর্ব্বে ১৭৮১ হইতে ১৭৮৯র মধ্যে আরও নয়জন প্রেসিডেণ্ট এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া কার্য্য করেন।

Electoral কলেজ বা নির্ব্বাচক সংস্থার ভোটের সর্ব্বাধিক সংখ্যক ভোট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুসভেল্ট পেয়েছিলেন ১৯৩৬এ। তৎকালীন ৫৩১টি ভোটের মধ্যে তিনি ৫২৩টি ভোট পেয়ে নির্ব্বাচিত হন। তেরবার তেরজন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন যাঁহারা গণভোটের অর্থাৎ Popular voteর শতকরা পঞ্চাশ সংখ্যক ভোট লাভ করিতে পারেন নাই, ইঁহাদের Minority Presidents অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে উড্রো উইলসন, হ্যারি ট্রুম্যান প্রভৃতি আছেন। সর্ব্বকালের সর্ব্বাধিকসংখ্যক গণভোট পেয়েছিলেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার। তাঁহার পক্ষে গণভোট ছিল ৩৫,৫৮৫,৩১৬ এবং নির্ব্বাচক সংস্থার ভোট ছিল ৪৫৭। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেণ্টের অনেক ক্ষমতা, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার প্রধান উৎস তাঁহার অগণিত দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন—যাহা এই গণভোটের মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রের তুলনায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নবীন, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহার মূলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টদের অবদান কম নহে। মহামতি জর্জ্জ-ওয়াশিংটন, জেফারসন, ও আব্রাহাম লিংকন প্রভৃতি যে কোনও জাতি ও দেশের পক্ষে গৌরব।



আলাপ

ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ



আহার

ফটো : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আর সুব্রত তরুণী ছাত্রীর সেই আয়ত চোখের তারার আলোতে কী যেন খুঁজে পেত—উৎসাহে—আনন্দে ভরিয়ে যেত। কখন কখন সুব্রত—একটা Essay লিখতে দিয়ে বলতো—'এটা আমরা দুজনে আলাদা আলাদা করে লিখি, তা হলে তোমার পক্ষে কি ভাবে লিখলে আরো ভাল করে লিখতে পারা যায়, একটা বিষয়ে কতদিকে লিখবার আছে বুঝা সহজ হবে।' মাধবীও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। পড়াশুনাও অনেক রকম ছিল। এমন লিখতো যে কোন্ কোন যায়গায় সুব্রতকে হার মানিয়ে দিত। ছাত্রীর সাফল্যে সুব্রতর মুখ হয়ে উঠত—উজ্জ্বল। মাধবী অবশ্য ঈষৎ হাসিমুখে কৌতুকোজ্জ্বল চোখে তা স্বীকার করতে চাইত না।

ক্রমে দুজনকে দুজনার ভাল লাগতে লাগল। মাধবী সুব্রতকে নিয়ে বিকেলের দিকে দূর বনরেখার দিকে বেড়াতে চলে যেত। একটা পাথরের উপর পাশাপাশি বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে দেখতে কত গল্প কত কথা যে হোত। কিন্তু সব গল্প সব কথাকে ছাপিয়ে হৃদয়ের গভীরে যে অকথিত কথা ছিল, যে একটা নিবিড় আকর্ষণের সুর দুজনকে টানছিল তা ধরা দিতে লাগল। দুজনেই বুঝতে লাগল তাদের দুজনের সার্থকতা হবে দুজনকে পেয়ে।

মাধবীর সম্মতি পেয়ে সুব্রত একদিন কথাটা পাড়ল ভবতোষবাবুর কাছে। সুব্রতর মত অমন ভাল ছেলের হাতে মাধবীর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন মাধবীর বাবা মা। মাধবীর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে শুভকার্য্যটা সম্পন্ন হবে স্থির থাকল।

বিনয় একজন ইনকামট্যাক্স অফিশর হলেও আসলে ছিল শিল্পী। ভাল ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য তার ছবিতে ধরা দিত। মানুষের স্কেচও কয়েকটি রেখায় এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারত যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হোত। লম্বা দোহারা চেহারা গৌরবর্ণ, আর তার সঙ্গে ছিল চোখের স্বপ্নময় গভীর দৃষ্টি। বেশী কথা বলত না, কিন্তু একটা মিষ্টি হাসি সব সময় মুখে লেগে থাকত। বিকেলের দিকে প্রায় একাই বেরিয়ে যেত বরাকর নদীর দিকে। সেখানে একটা পাথরের উপর বসে দূর বনভূমি ও পাহাড়ের পাশদিয়ে ঢলেপড়া সূর্য্যাস্তের রূপ তন্ময় হয়ে মনের মুকুরে কি কাগজের গায় তুলে নিত।

একদিন এসে বিস্ময় পুলকে দেখে—খানিক দূরে বরাকর নদীর বেড়ে একটা পাথরের উপর ইলাদি একাই বসে তন্ময় হয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে সুদূর সীমারেখার দিকে। যেন এক তপস্বিনী মহাশ্বেতা। বিনয়ের পক্ষে লোভ সামলান কঠিন হোল। কাগজের উপর রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলল সেই অনবদ্য দৃশ্য। আঁকা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ইলাদি চোখ ফেরাতেই দেখে অবাক। কপট গাম্ভীর্য্যে বলে উঠল—'বিনয়বাবু ওটা কি হচ্চে?' বিনয় একটু লজ্জা পেলেও উত্তর দিল, 'ধ্যানমগ্না তপস্বিনীর এমন রূপ বহুভাগ্যে মেলে, তাই কাগজের বুকে ধরে রাখবার লোভ সামলাতে পারিনি। ইলাদি মাপ চাইচি।' ইলাদির গভীর দৃষ্টিতে হাসির ঝিলিক খেলে গেল, বলল, 'মাপ করতে পারি যদি আমাকে মালক্ষ্মীর বাহন না বানিয়ে থাকেন ছবিতে।' আগ্রহ ভরে উঠে দেখতে এসে অবাক। এ যে সত্যি সত্যি ইলাদির এক অপরূপ রূপ খুলেছে। দিগন্ত রেখার দিকে বিস্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এ কোন্ ইলাদি? একটা রহস্যময় প্রশান্তি যেন ঘিরে আছে তাকে। 'এত সুন্দর আঁকতে পারেন আপনি?' বিনয় বলল, 'যাক বাঁচলাম, রাগ করেন নি।'

সেই থেকে দুজনের চলল অন্তরঙ্গ আলাপ। পরস্পরের কাছে খুলে গেল হৃদয়ের দুয়ার। ইলাদির কাছে তার জীবনের যে কাহিনী বিনয় শুনল তা মহাশ্বেতার মতই করুণ। তরুণ হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেমকে নিয়ে ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর খেলা। ইলা তখন আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছে ফিলসফিতে অনার নিয়ে। তার দাদার বন্ধু প্রভাতের সঙ্গে আলাপ সেই সময়। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—সদাহাস্যমুখ সুদর্শন তরুণ। বি-এতে ফিলসফিতে প্রথম শ্রেণীর অনার নিয়ে এম-এ পড়ছে ফিলসফিতে। পড়াশুনার সূত্র ধরে সুরু হয়ে ক্রমে দুটি হৃদয় নানা আলোচনা গান গল্পের মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। একজন আর একজনের মাঝে যেন খুঁজে পেল তার সকল চাওয়া-পাওয়ার পরিপূর্ণ রূপ।

তারপর সেই মর্ম্মান্তিক ঘটনা—মোটর দুর্ঘটনায় প্রভাতের মৃত্যু। সকল আলো যেন মুছে গেল ইলার জীবন থেকে। আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের ধারে বসে ইলা

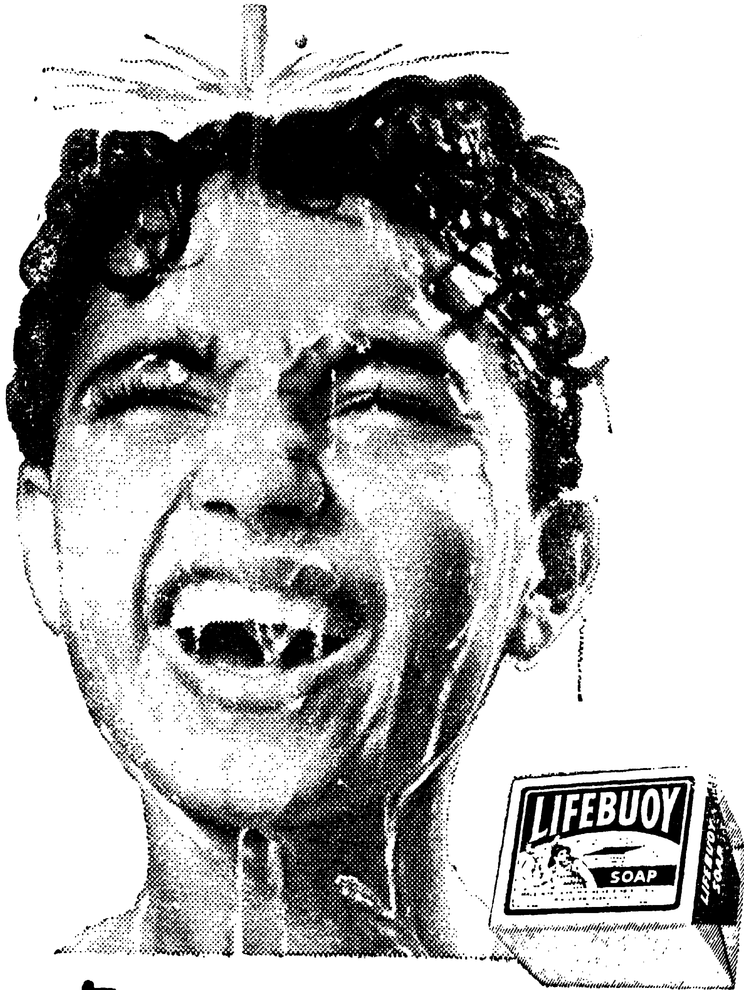
যখন অশ্রুসজল মুখে এ কাহিনী শুনাল—আর ধরা গলায় বলল 'এতদিনেও যে ভুলতে পারছি না বিনয়বাবু', তখন বিনয় কিছু বলতে পারেনি। শুধু সমবেদনায় তা'র হাতখানি ইলার পিঠের উপর রেখেছিল। হাল্কা জোছনার আলো এক মায়াময় প্রলেপ বিছিয়ে ছিল মাঠের উপর। শিল্পীর দরদী হৃদয়ে জাগাল গভীর ব্যথা এক তরুণীর ভুলতে-না-পারা জীবন কথা।

বিনয়ের কাছে সব কথা বলে ইলা অনেক হাল্কা বোধ করল। যে ব্যথা এতদিন তার হৃদয়ের মাঝে লুকিয়ে ছিল বিনয়ের কাছে তা খুলে ধরে যেন কতকটা শান্তি পেল। তারপর দিনের পর দিন সান্ধ্যতারার স্বপ্নময় পরিবেশে সেই বেদনা ধীরে ধীরে রূপান্তর পেল এক প্রশান্তিতে। জীবন রহস্যের পিছনে আছে যে গভীরতা তা যেন নেমে এল তাদের জীবনে। এক নূতন ছন্দে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। এ ভালবাসায় নেই প্রাণোচ্ছল রক্তিম তরঙ্গ, আছে শ্রদ্ধায় আলোকিত এক স্নিগ্ধধারা।

কেতকীর-জীবনধারা চলেছিল কিন্তু অন্যখাতে। যেমন ছিল তার ঝলমল রূপ, তেমনি ছিল তার ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি। তার সঙ্গে প্রাণপ্রাচুর্য্যে চঞ্চল স্বভাব। তার গতিশীল জীবনের খরস্রোতে প্রেমের দেবতার আসন পাতা আর হয়ে উঠতো না। মাধবীকে কী ঠাট্টাই না করত—সুব্রতর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে। বলত 'এক-জনের মাঝেই ডুবে মরলি যদি—জীবনের বিচিত্র রস সুর ছন্দের কি জানবি? সেটাই কি বড় নয়—নিজে না হেসে অন্যকে হাসান? প্রেমের আঁচটি নিজের গায়ে না লাগিয়ে অন্যকে হাবুডুবু খাওয়ান? আমি তো ভাবতেই পারি নে একজনের মধ্যে জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া।" মাধবী বলেছিল 'কোনদিন তো পড়নি না সে রকম পাল্লায়, প্রেমের আর কি জানবি?' অল্প হেসে উত্তর দিয়েছিল কেতকী 'এরি মধ্যে আমার জীবনে তিন তিনবার এমন কিছু ঘটেছে যার যে কোন একটাতে তোরা কোনদিন তলিয়ে যেতিস।' মাধবী খুব উৎসুক হয়ে বলে উঠল 'আমরা না হয় তলিয়ে যেতেই এসেছি, বল্ না ভাই, তোর কি হয়েছিল।'

বিকেলের রোদ এসে পড়েছিল কেতকীর চারধারে। মাঠের কিনারায় পাথরটার উপর পা ছড়িয়ে বসে কেতকী আরম্ভ করল তার কাহিনী—'নামই শুধু তার রঞ্জন না, ছিল সত্যকার নয়নরঞ্জন রূপ, তার সঙ্গে মুখে-চোখে সব সময় কৌতুকময় হাসি খেলত। অনিমার দাদা রঞ্জনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে তাদের দেশের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে। তাদের দোতলা বাড়ীর নীচেই বিরাট দীঘি, বাঁধা ঘাট, নিজেদেরই নৌকা থাকত সেই বাঁধা ঘাটে। দীঘির পাড় আম জাম কাঁঠাল গাছে ঘেরা, মাঝে মাঝে দু-চারটা তাল গাছ। সন্ধ্যার পর সেই গাছের নিবিড় ছায়া পড়তো দীঘির জলে। উপরে তারা-ভরা আকাশ, কখন বা চাঁদের আলোয় জলে রূপালি ঢেউ। এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করতো যখন অনিমা ও আমাকে নিয়ে রঞ্জনদা ধীরে ধীরে নৌকা চালাত—সেই দীঘির চারদিকে। রঞ্জনদাও বি-এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছিল। কাজেই তখন আমাদের তিন বেকারের অখণ্ড অবসর। এক একদিন ভরা চাঁদের আলোয় রঞ্জনদা নৌকা নিয়ে যেত দীঘির মাঝখানে। সেখানে নৌকা থামিয়ে তার বাঁশীতে তুলতো এক অপূর্ব্ব সুর, তা নিয়ে যেত যেন কোন এক স্বপ্নময় লোকে। শরীর খারাপ কি কোন কারণে কখন কখন অনিমা না যেতে পারলে আমরা দুজনেই যেতাম। অনুরোধে যখন গান গাহিতাম—অনুরাগের নিবিড়তায় রঞ্জনের দৃষ্টি যেন গাঢ় হয়ে আসত, আমারও খুব ভাল লাগত। ভাল লাগলেও কখন ধরা দিতাম না। প্রেমের এই ভাল লাগার খেলাতেই ছিল আমার আনন্দ, ধরা পড়াতে না। রঞ্জনদা ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েও পাত্তা পেল না। জানিস, রঞ্জন এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা করতে আসে, গল্পের মধ্যে তার দৃষ্টি অনুরাগ-ঘন হয়ে আসে, আমারও ভাল লাগে—কিন্তু হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিই।

অমর কিন্তু ছিল উদ্দাম। তাতে পাইলট। প্লেন চালিয়ে কিনা জানি না তার বেপরোয়া প্রকৃতিটা যেন বেড়েই গিয়েছিল। ছুটিতে যখন কলকাতায় আসত, যে কয়দিন থাকত আমাদের মাতিয়ে রাখত। বোটানিকেল গার্ডেনে আমার এক বান্ধবীর (তার বোন) সঙ্গে চড়ুই-ভাতিতে গিয়ে আলাপ। এমন আলাপ যে একদিনেই দাঁড়াল অন্তরঙ্গ আলাপে। 'আপনি' কখন 'তুমি'তে এসে ঠেকল বুঝতেই পারলাম না। বোকার মত আবেগ আর



লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে !

আঃ ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম ! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে ! ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 16-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

খুসীর ঢেউএ ভেসে যেতে লাগল সঙ্কোচের গণ্ডী। রেষ্টুরেণ্ট, লেক, সিনেমাতে হাল্কা খুসীতে অমরের সঙ্গে যেন ভেসে বেড়াতাম। তবু আমি ধরা দিই নি। অমরের তো ক্ষেপে যাবার যোগাড়। বেশী এগুলে বলতাম, আমার প্রেম এসথেটিক প্রেম, প্রেম নিয়ে এক কৌতুক দৃষ্টির খেলা। ধরি মাছ না ছুঁই পানি, তবেই না মাছ-ধরা। একদিন রেগে-মেগে সেই যে অমর ভাগল আর এ মুখো হয়নি।

আর একবার কিন্তু ভাই সত্যি সত্যি ডুবতে বসেছিলাম, যদি না ঘটনাস্রোত আমার অনুকূলে যেত। কতকটা ভালমানুষ গো-বেচারী ধরণের ছিল নিখিল। জুলিয়াস সীজার যেমন তাঁর ঘাতকদের দলে ব্রুটাসকে দেখে চমকিয়ে উঠেছিলেন—সেই রকম আমারও কম চমক লাগেনি যখন নিখিলের দিক থেকে প্রেমবিদ্ধ হতে লাগলাম। আমার প্রেমিক দলে তাকে তো কোনদিন কল্পনাও করিনি। অথচ সেই অঘটনই ঘটল। সবে তখন থার্ড-ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। পড়ি যত, হৈ হৈ করি তার তিনগুণ। আমাদের ক্লাসের প্রভারা বেশ বড়লোক ছিল। বেহালার দিকে তাদের প্রাচীর-ঘেরা একটা বড় বাগান ছিল। তার মধ্যে পুকুর, বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপরেই একতলা বাড়ী, বাংলো মত। এক এক রবিবারে প্রভা আমাদের কজনকে তাদের মোটরে করে সেখানে নিয়ে যেত। সারাদিন বাগানে ঘুরে পেয়ারা কুল এই সব পেড়ে বেশ কাটত। খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। দরওয়ানই ব্যবস্থা করত। মাঝে মাঝে দেখতাম পুকুরের বাঁধা ঘাটে একজন নিবিষ্ট মনে ছিপে মাছ ধরছে। বয়স বাইশ-চব্বিশ বছর হবে। ফর্সা রং, চুল বড় বড়, চোখে-মুখে কেমন একটা কবি-কবি ভাব। শুনলাম ছেলেটি প্রভাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, অবস্থা বেশ ভাল। এম-এ পাশ করে আর কিছু করেনি। বাপ-মা নেই। মধ্যে মধ্যে এ দেশ সে দেশ বেড়ায়। কখন কখন প্রভাদের এই নির্জ্জন বাগানবাড়ীতে এসে দুই এক মাস থাকে। বই পড়া আর ছিপে মাছ ধরা তার নেশা। বড় একটা কারু সঙ্গে মেশে না। নাম তার নিখিল।

মাছ ধরা দেখতে আমাদের বেশ মজা লাগত। কাছে গিয়ে সিঁড়ির উপর বসতাম। ছেলেটি কী লাজুক! প্রথম প্রথম তো আমাদের দিকে তাকিয়ে কথা কইতেই পারতো না। ভীরু চোখে এক একবার চেয়ে আস্তে আস্তে কথা কইতো। বঁড়শিতে মাছ গাঁথা পড়লে আমাদের কী উল্লাস! মাছ যত খেলে আমাদের তত চেঁচামেচি ও উৎসুক দৃষ্টি। একদিন একটা মাছকে খেলিয়ে যেমন সিঁড়ির কাছে নিয়ে এসেছে আমি ছুটে গিয়ে সেটাকে হিড়-হিড় করে ডাঙ্গায় তুলে আনলাম। কিন্তু সুতোর টানে বঁড়শিটা আচমকা খুলে আমার হাতে এসে বিঁধল। নিখিল ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি এসে খুব সাবধানে ওটা খুলে দিল। বেশ লেগেছিল, রক্তও বের হতে লাগল। নিখিল ঘরে নিয়ে গিয়ে আইডিন লাগিয়ে যত্ন করে বেঁধে দিল। কিন্তু বেচারা চোখ-মুখ কাঁচু-মাচু করে ঘেমে অস্থির, যেন সব দোষটা তারই। ছোটবেলা থেকেই আমার দুরন্ত স্বভাব, কত ছুটোছুটি করেছি, হাত-পা কেটেছি। বললাম, আপনি অতো ভাবছেন কেন, কতবার আমার এর চেয়ে ঢের বেশী জখম হয়েছে। কোনদিন গ্রাহ্য করিনি।

সেই থেকে নিখিলের সঙ্গে ভাব সুরু। ক্রমে সেই তরুণ-ভীরু মানুষটির সঙ্কোচ কাটতে লাগল, সাহস এল। যাকে মনে করা যেত সাত চড়ে রা বেরুবে না, দেখতাম কী সুন্দর গল্প করতে পারে। কত দেশ যে বেড়িয়েছে! ভুটান সীমান্তের বক্সা-দুয়ার, মহাকাল-এর নিবিড় জঙ্গলের, আসামের মণিপুর অঞ্চলের রোমাঞ্চকর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা শুনাত। আমার এত ভাল লাগত যে কী বলব। গল্প বলতে বলতে তার চোখে-মুখে একটা দীপ্তি ফুটে উঠত, আমাকে মুগ্ধ করে দিত। গল্প শেষে এক একদিন বলত, শুধু শুনলেই হবে না, দক্ষিণা দিতে হবে, একটা গান শুনিয়ে দিন। তখন মনে হত প্রেম এমনি করেই মূককে বাচাল করে। আবার নাকি গানের সময় তার ভাবঘন মুগ্ধ দৃষ্টি আমার মুখের দিকে। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা আমাকেও নাড়া দিতে লাগল। শুধু কৌতুক করে বেড়ানর ভাবটা বুঝি আর টিকবে না মনে হত। এই সময় নিখিলের বন্ধু সুধীর M. R. C. P. পড়তে বিলাত যায়। নিখিলও ইয়োরোপ দেখতে তার সঙ্গে চলে গেল। দু-বছর কেটে গিয়েছে। কোন খবর নেই। সেই থেকে প্রেম নিয়ে খেলা আর জমছে না আমার।'

বেলা শেষ হয়ে মাথার উপর আকাশে কখন তারা ফুটে উঠেছে। মাধবী বলল, 'রাত হয়েছে, চল্ ভাই ফিরে যাই। আমার কাছে কিন্তু ভাই দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার সেই সরল একনিষ্ঠ প্রেমই ভাল—আনমনে জগৎসিংহের নাম লিখবে আর লজ্জারক্ত মুখে মুছবে। সত্তার সবখানি তার ছেয়ে ফেলেছে প্রেমাস্পদ।'

রাষ্ট্রীয় তীর্থে

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় তীর্থে



খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"দস্ত্খত্ কীয়ে।"

সই করে দিলাম।

বৃদ্ধ সইটা দেখে আবার খাতাটি দিয়ে বললেন—কুছ লিখিয়েগা নহি?"—কিছু লিখবেন না?

...কি লিখব! যে স্থানের সম্বন্ধে লিখতে হ'বে তার উপযুক্ত ভাষা কোথায়!

*　　*　　*　　*

সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিতে 'চিত্রকূট' পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। তারই সংক্ষেপিত শব্দ 'চিত্র' থেকেই হয়তো চিতোর হয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা সঠিক বলতে পারবেন যে, চিতোর শব্দের অর্থ বা ব্যুৎপত্তির ভিত্তি কোথায়। মনে হয়, হিন্দীভাষীদের বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গীতে মিত্রবাবু যেমন মিত্তরবাবু, চক্র যেমন চক্কর, তেমনি চিত্র চিত্তর। আর হয়তো কালক্রমে সেই চিত্তরই চিতোর বা চিত্তৌড়-এ রূপান্তরিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে সমস্ত অঞ্চলটিকেই 'চিত্তৌড়' বা 'চিত্তৌড়গড়' বলা হলেও স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু এখনও যে পাহাড়টির উপর চিতোরের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ স্থাপিত তাকে বলেন চিত্রকূট। মেবার (মেওয়াড়) বা মেদপাটের রাজধানী ছিল এই চিতোর। বর্তমানে চিত্তৌড় নামক জেলার সদর মাত্র।

এখানের রাজকুল শ্রীরামচন্দ্রেরই বংশধর বা সূর্য্যবংশীয় বলে পরিচিত ছিলেন।

*　　*　　*　　*

১

সুলতান আলাউদ্দিন। সিংহাসন-লিপ্সায় স্বীয় খুল্লতাত ও শ্বশুর জালালুদ্দিনের শিরশ্ছেদ করাইয়া সেই ছিন্নমুণ্ড বল্লমের মাথায় গাঁথিয়া সৈন্যদের শিবির সন্নিকটে প্রদর্শনের আদেশ দিতে যে আলাউদ্দিনের কণ্ঠরোধ হয় নাই, সিংহাসনের নিরাপত্তার জন্য রাজধানী দিল্লীর নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মোগলপন্থী বিশ সহস্র পুরুষকে একদিনে হত্যা করিতে যে আলাউদ্দিনের চিন্তা করিতে হয় নাই, শা'পুরের নিকট নূতন এক দিল্লী শহরের শুভ পত্তনের প্রাক্কালে, বলিদান কর্ত্তব্য বিধায়, কয়েক সহস্র মোগলের রক্তসিঞ্চন যাঁহার নিকট মাঙ্গলিক কার্য্য, সমগ্র উত্তরপশ্চিম ভারত হয় দাক্ষিণাত্যের মহীশূর প্রদেশ পর্য্যন্ত যাঁহার অব্যাহত বিজয় অভিযানে কম্পিত, সেই দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন।

জীবনে এমন কি ভোগ্য বস্তু থাকিতে পারে যাহা পাইবার জন্য সম্রাট আলাউদ্দিনের চিন্তার প্রয়োজন?



পদ্মিনীর প্রতিকৃতি

সম্রাটের অলভ্য-অনাহৃত বস্তু বিশ্বসংসারে কি থাকিতে পারে তাহাই তো চিন্তার বিষয়। এহেন আলাউদ্দিন কিন্তু সত্যই একদিন এক নারীর চিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

এশিয়ার বহু দেশের অতি সুন্দরী রমণীদের দ্বারা যাঁহার হেরেম সরগরম সেই আলাউদ্দিনের চিন্তার কারণ ঘটাইয়াছে নর্ত্তকী। সম্রাটকে খবর দিয়াছে চিতোরের শাসক ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর। পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা করিয়া নর্ত্তকী বলিয়াছে—জাঁহাপনার হেরেমের সুন্দরীরা পদ্মিনীর বাঁদীতুল্যা!

আলাউদ্দিনের সুলতানী রক্তের উষ্ণতা বাড়িল। তিনি ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে দাবী করিয়া দূত মারফৎ চিঠি পাঠাইলেন।

আলাউদ্দিনের ধারণা ছিল তাঁহার নাম শুনিয়াই ভীমসিংহ বোধহয় দূতের সঙ্গেই পদ্মিনীকে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দূত একাই ফিরিয়া আসিল ও সংবাদ দিল যে, চিতোরের রাজপুরুষগণ কোষোন্মুক্ত তরবারির মুখে তাঁহাকে আতিথ্য জানাইবে বলিয়াছে।

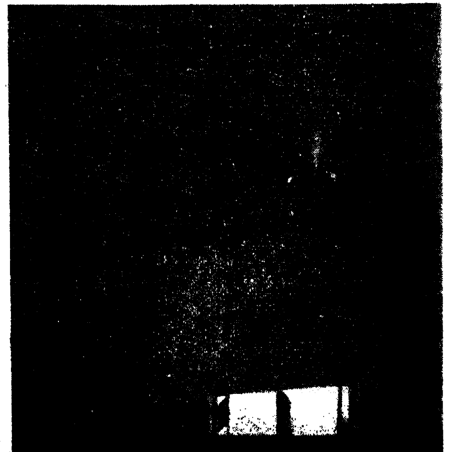
এতবড় অপমানে কি সম্রাট আলাউদ্দিন স্থির থাকিতে পারেন? অবিলম্বে তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন ও পর্য্যুদস্ত হইলেন। তবুও, তিনি নিরস্ত হইলেন না। কপটাচরণ পূর্ব্বক ভীমসিংহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন ও দুরাকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য অনুতপ্ত। তবে, পদ্মিনীকে একবার দেখিয়া ধন্য হইতে চা'ন।

চিতোরের রাজপুরুষগণ ইহাতেও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু পদ্মিনী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পুনঃসংঘটন রহিত করিবার জন্য আলাউদ্দিনের প্রস্তাবে সম্মতি পাঠাইলেন। অবশ্য, সম্মুখ দর্শনের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলাউদ্দিন তাহাতেই খুশী হইবেন জানাইলেন।

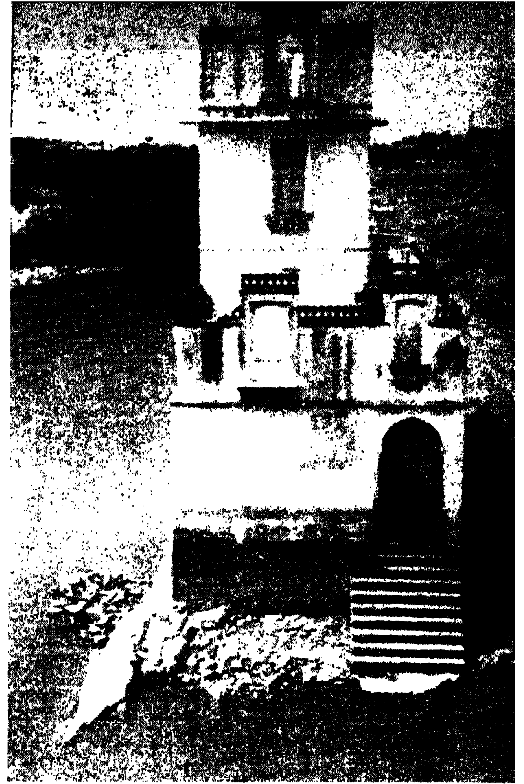
পদ্মিনীর প্রাসাদ একটি সরোবরের জলে অবস্থিত। সরোবরের তীরে বহির্বাটী বা 'আউট হাউস্'। ঐ বহির্বাটীর একটি কক্ষের জানালা দিয়া পদ্মিনীর মহল দেখা যায়। স্থির হইল ওই জানালাটির সরাসরি, বিপরীত দিকের দে'য়ালে, একখানি আরশি রাখা হইবে।

পদ্মিনী তাঁহার কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে আলাউদ্দিন ঐ আরশিতে পদ্মিনীর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন।

ব্যবস্থামত অনুষ্ঠান হইল। আলাউদ্দিন প্রতিবিম্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। স্বগতোক্তি করিলেন, 'এ কি দেখলাম!'



এই আয়নাটিতে আলাউদ্দিন পদ্মিনী দর্শন করিয়াছিলেন। (জনশ্রুতি)



পদ্মিনীর মহল

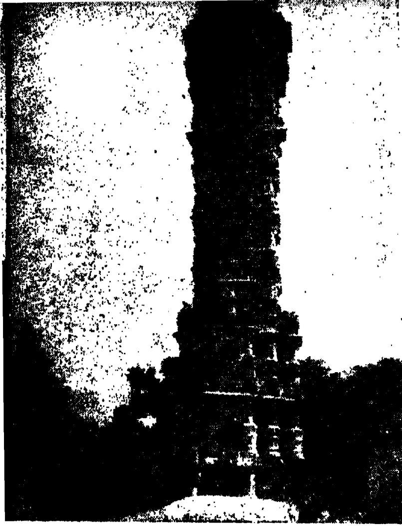
রাজনর্ত্তকীর বর্ণনায় যাহা না হইয়াছিল এখন তাহা হইল। আলাউদ্দিন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্ত হইলেন। পদ্মিনী দর্শনের পর চতুর আলাউদ্দিন ভীমসিংহের সহিত বিশিষ্ট বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন ও ভ্রমণের অছিলায় তাঁহাকে চিতোর দুর্গের বাহিরে আনিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। পদ্মিনী এক চমৎকার কৌশলে আলাউদ্দিনকে বিভ্রান্ত করিয়া ভীমসিংহকে উদ্ধার করিলেন। অপমানিত আলাউদ্দিন জীবনপণ করিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ চিতোর অবরোধ করিল।

আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে তাঁহার হেরেমের নূতন সংগ্রহ ভাবিয়া মশগুল হইলেন। সৈন্যদল লইয়া তিনি পদ্মিনীর মহলের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু সেখানে পদ্মিনীকে পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার একটি সখীকেও দেখা গেল না। চর সংবাদ দিল—রাণী মহারাণার মহলের দিকে গিয়াছেন। আলাউদ্দিন সেইদিকে ছুটিলেন। সেখানেও পদ্মিনীকে পাওয়া গেল না। চর আবার সংবাদ দিল, মহারাণার প্রাসাদ প্রাঙ্গণ হতে এক সুড়ঙ্গ পথ আছে। আলাউদ্দিন সেই পথের সন্ধানে ছুটিলেন।

সত্যই এক গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ ছিল। তাহার প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আলাউদ্দিন কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিলেন ভিতরে লেলিহান অগ্নিশিখা ও ধূম্ররাশি। শুনিলেন বহু আর্ত্ত নারীকণ্ঠের ধ্বনি 'জয়হর, জয় হর।' আর পাইলেন দগ্ধ মেদমাংসের দুর্গন্ধ। যতটুকু দেখা যায় তাহারই মধ্যে দেখিলেন এক অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলিরমণীর দেহপুড়িতেছে। যে দেহগুলিতে তখনও প্রাণ আছে সেগুলি অগ্নিদাহে ছটফট করিতেছে। শেষযে নারীটি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িল সে আলাউদ্দিনকে বলিয়া দিল—পদ্মিনীর সংবাদ। বলিয়া গেল, 'সম্রাট আলাউদ্দিন 'তোমার কাম-লোলুপতা চরিতার্থের জন্য নারীর কাছ থেকে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সম্ভার আদায় করতে চাও বলপ্রয়োগে? তোমার



পদ্মিনীর জহর ব্রতের সুড়ঙ্গপথ



রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ

রাজশক্তি দেখিয়ে! শুনে যাও এই অর্দ্ধদগ্ধ রমণীদের 'জয় হর' শব্দ,—তোমার জয়গৌরব হরণ করবার প্রার্থনা মন্ত্র, তোমার শান্তি হরণ করবার সংগীত। নিয়ে যাও প্রজ্বলিত নারীদেহের অপূর্ব্ব এই গন্ধ,—মেটাও তোমার ক্ষুধা। স্পর্শ তোমায় আমরা দিতে পারলাম না। কারণ, তোমার স্পর্শের চেয়ে অগ্নির স্পর্শ আমাদের কাছে অনেক শীতল, অনেক সহনীয়।'

সম্রাট আলাউদ্দিন চীৎকার করিয়া আর একবার বলিলেন— 'একি দেখলাম!—'

এইরূপে আলাউদ্দিনের জয় গৌরব ব্যর্থকারী সেই রোমাঞ্চকর জহর (জৌহর) ব্রত অনুষ্ঠিত করেছিলেন পদ্মিনী। দৈহিক সৌন্দর্য্যের মহিমা তো জরা এসে একদিন কেড়ে নেবেই—বাসাংসি জীর্ণানি তো ছাড়তে হবেই, তবু যে আত্মা সেই অতিপ্রিয় বাস, অন্যায় স্পর্শের আশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্ণেই ত্যাগ করে যায়—তা'র শুচিবোধে বোধ হয় পরলোকও স্তম্ভিত হয়। তাই ভারতের মাটিতে যতদিন মানুষ থাকবে, পদ্মিনীর নামও ততদিন জীবন্ত থাকবে।

[চিতোরের অধিবাসীদের ধারণা, রাণী পদ্মিনী ঐ সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে যে স্থানে জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করেছিলেন সেই স্থান এক ভয়ংকর অজগর পাহারা দিচ্ছে। তাই কেউই ঐ পথে প্রবেশ করতে সাহস করে না। বিখ্যাত অনুসন্ধানী ও লিপিকার কর্ণেল টড পর্য্যন্ত ঐ পথে প্রবেশ করতে সাহসী হন নি। (২৩৩ পৃঃ—India in the Muhamedan period—V. Smith)

স্বর্গত রাণা সজ্জন সিংহের চেষ্টায় পদ্মিনীর প্রাসাদটির সংস্কার সাধিত হয়েছে। যে আয়নাটির মাধ্যমে আলাউদ্দিন পদ্মিনী দর্শন করেছিলেন 'তা' যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে।]

* * * *

(২)

ক্ষমা পরম ধর্ম্ম। কিন্তু প্রবলতম শত্রু, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ সংঘটনকারীকে পরাস্ত ও বন্দী করার পরও তাহার প্রতি শুধু ক্ষমা প্রদর্শনই নয়, সসম্মানে রাজ-অতিথির সম্বর্দ্ধনা দানের নজির ইতিহাসে অতি অল্পই আছে।

এমনই ক্ষমাসুন্দর, কোমল হৃদয়, এক রাণার স্মৃতি মেবারবাসী আজও সম্মানের সহিত উল্লেখ করে। এই বিশিষ্ট পুরুষটি রাণা কুম্ভ।

১৪৪০ খৃঃঅব্দে মালওয়ার সুলতান মোহাম্মদ্ শাহ (মাণ্ডু) বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া চিতোরের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত দেখা দিলেন। উদ্দেশ্য, চিতোর অধিকার। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল। স্থানীয় পুস্তকাদিতে বিবৃত আছে যে, মোহম্মদ শাহ এই যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু রাণা কুম্ভ তাঁহাকে মুক্তি দেন ও অতি সমাদরের সহিত আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। মোহম্মদ্ শাহ বেশ কিছুকাল চিতোরে অবস্থান করেন। রাণা কুম্ভের ব্যবহারে তিনি এতই চমৎকৃত হন যে, তিনি যে শুধু মহারাণার এক পরম সুহৃদে পরিণত হন তাহাই নহে, পরবর্ত্তী কালে চিতোরের উপর দুইবার বাদশাহী আক্রমণের সময় তিনি রাণা কুম্ভের পক্ষ লইয়া শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করেন।

মোহম্মদ্ শাহের সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্মারক স্বরূপ মহারাণা কুম্ভ এক জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভটি নয়তলবিশিষ্ট ও উচ্চতায় ১২০ ফিট্। প্রকোষ্ঠগুলি চতুষ্কোণ ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য মণ্ডিত।

(প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট্ স্মিথের মতে কিন্তু রাণা কুম্ভ ও মোহম্মদ শাহের যুদ্ধ অমীমাংসিত ছিল। রাণা কুম্ভের ন্যায় মোহম্মদ্ শাহও নাকি নিজেকে বিজয়ী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার রাজধানী মাণ্ডুতে এক বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য বর্ত্তমানে সে স্তম্ভের কোনও চিহ্ন নাই।)

সম্মুখ ভাগে কুম্ভশ্যামজীর মন্দির



রাণা কুম্ভের স্মৃতির অপর নিদর্শন কুম্ভশ্যামজী মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত এই মন্দিরটি।

পৈত্রিক প্রাসাদের পরিবর্ত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তিনি যে রূপ দান করিয়াছিলেন তাহার ফলে ঐ প্রাসাদটি আজও রাণা কুম্ভের প্রাসাদ নামেই অভিহিত হয়।

* * * *

(৩)

[বিভিন্ন যুদ্ধে অস্ত্রাহত হওয়ার আশীটি ক্ষতচিহ্ন ধারণকারী সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্য। অগ্রজ ভোজরাজ অকালে গতায়ু হওয়ায় বিক্রমই চিতোরেশ্বর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিক্রম ও দূত।

বিক্রম—"কি দেখে এলে ?"

দূত—(অবনত মস্তকে) "মহারাণা!"

দূত স্তব্ধ হইল

বিক্রম—"বল দূত, নির্ভয়ে বল।"

দূত—"মহারাণা!"

পুনরায় নীরব হইল

বিক্রম—"বল।"

দূত—"না না আমায় আদেশ করবেন না। আমি বলতে পারব না।"

বিক্রম—"তুমি বল।"

দূত—"দেখে এলাম, আমার অপরাধ নেবেন না—দেখে এলাম গিরিধারীর মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকজন সাধু-সন্তের উপস্থিতিতেই তিনি সংগীত মগ্না, নৃত্যরতা।

দূর হইতে ললিত কণ্ঠের মধুর সংগীত ধ্বনি ভাসিয়া আসিল

'পগ ঘুংঘরু বাঁধি মীরা নাচি রে।'

বিক্রম—"ইস্! মেওয়ারের রাজপরিবারের, সূর্য্য-বংশের মুখ পুড়ে গেল! চিতোরের রাজললনা, বিধবা রমণী, রাজপরিবারের সংযম ও পর্দ্দা, নারীর লজ্জা-সরম সব বিসর্জ্জন দিয়ে এই নিশীথকালে পরপুরুষের কাছে নৃত্য-গীত!"

ক্রোধে বিক্রমের কণ্ঠরোধ হইল। দূতকে আদেশ করিলেন

"মন্ত্রীকে ডাক।"

নিভৃত পরামর্শের পর স্থির হইল, এই কুল-কালিমা নারীকে হত্যা করা হইবে। পরের দিনই রাণার নিকট হইতে একটি সুন্দর ঝাঁপির মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কাল ভুজঙ্গকে ফুল বলিয়া পাঠান হইল। উদ্দেশ্য, মীরা যেমনই ঝাঁপির ডালা খুলিবেন অমনি সাপটি তাঁহাকে কামড়াইয়া মরিয়া পড়িবে। লোকে মীরার মৃত্যু রহস্য জানিবে না।...

... ...

রাণা বিক্রম সংবাদের জন্য অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন।

দূত প্রবেশ করিল

বিক্রম ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন

"সংবাদ এনেছো ?"

দূত নীরব। রাণা স্বীয় স্বর্ণহার খুলিয়া দূতকে উপহার দিবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করিলেন

"বল।"

দূত তবুও নীরব

রাণা হাসিয়া কহিলেন—"বুঝেছি। তোমাদের প্রিয় দেবদাসী মীরার মৃত্যু সংবাদ দিতে কষ্ট হচ্ছে।"

দূত কহিল—"না মহারাণা, তা নয়। সংবাদটা আপনাকে জানাতে সাহস হচ্ছে না।"

বিক্রম—"কেন ?"

দূত—"মহারাণা! মীরার মৃত্যু হয়নি।"

বিক্রম চীৎকার করিয়া উঠিলেন

—"কি! কাল সর্পের দংশনেও মরেনি!"

দূত—"না মহারাজ। আমরা ঝাঁপিতে কাল সাপ পুরে পাঠালাম, কিন্তু মীরা তার মধ্য থেকে পেলেন ফুলের মালা!"



মীরার গিরিধারীলাল মন্দির

উত্তর রাজস্থানের শুষ্ক আবহাওয়ায় রাঠোর রত্নসিংহ-জীর গৃহে জাতা ও মেবারের পাথর আর পাষাণ-কঠোর ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে লালিত৷ এই নারীর ভক্তি-মধুর সংগীতে মেবারের পাথর গলিয়া, চিতোরের পর্ব্বত শীর্ষ হইতে যে রসধারা সেদিন নামিয়া আসিয়াছিল তাহা আজও সমস্ত ভারতবর্ষকে গঙ্গা, গোদাবরীর মতই প্লাবিত করিতেছে। এদেশ তাই মীরার দেশ।

*　　*　　*　　*

(৪)

অগ্নিদেবের হিন্দুনারীদেহের প্রতি বুঝি বড়ই লোভ। উদয়সিংহ, রাণী কর্ণাবতীর (করুণাবতীর) গর্ভে থাকা-কালীন রাণা সংগ (সংগ্রামসিংহ) স্বর্গপ্রাপ্ত হলেন। তাই রাণী সতী হতে পারলেন না অর্থাৎ সহমরণে যেতে পারলেন না। কিন্তু তবুও কি পরিত্রাণ আছে! ১৫৩৪ খৃঃঅব্দে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলেন। চিতোরাধিপতি রাণা বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে পরাস্ত হ'লেন। বাহাদুর শাহ চিতোর অবরোধ করলেন। বিক্রমপত্নী রাণী জওহরবাঈ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হলেন। রাণী কর্ণাবতী তখন শিশু উদয়-সিংহকে বুন্দীতে স্থানান্তরিত করে, অশুচি হতে আত্মরক্ষার জন্য তের হাজার রাজপুতানীর সঙ্গে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেন। একবার সতীদাহ হতে পরিত্রাণ পেলেও শেষ পর্যান্ত অগ্নি তাঁকে রেহাই দিলেন না।

বিক্রম—(ক্ষিপ্ত ভাবে) "মিথ্যে কথা। অবিশ্বাস্য।"
দূত—"হাঁ মহারাজ, অবিশ্বাস্য।"

বিক্রম ফাটিয়া পড়িলেন

—"দূর হও।"

দূত দ্রুত প্রস্থান করিল। বিক্রম স্বর্ণহার পুনরায় স্বীয়কণ্ঠে ধারণ করিলেন।

আবার মন্ত্রণা চলিল। বিক্রম স্বহস্তে মীরাকে বিষদান করিয়া আসিলেন। মীরা বিষপান করিলেন। পরমাত্মা বিষ গ্রহণ করিলেন, তাই জীবাত্মার মৃত্যু হইল না। বিষ অমৃত হইল। বিক্রম কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না। মীরা ও মীরার গিরিধারী গোপালকে উচ্ছেদের নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মীরা চিতোর ত্যাগ করিলেন। বহুতীর্থ পরিক্রমার পর দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেই তাঁহার মহাপ্রয়াণ ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের মতই মীরার তিরোধানও রহস্যাবৃত। তবে, বহুজনস্বীকৃত কাহিনী এই যে, রণছোড়লালজীর মূর্তিতেই তিনি লীন হইয়া গিয়াছিলেন।



মীরার বাসগৃহ

এইখানে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি ও ভস্ম পাওয়া গিয়াছে



(সম্প্রতি স্থানীয় এক সংস্থা এই জহরব্রতের স্থান বলিয়া একজায়গা নির্দিষ্ট করিয়াছেন ও সামান্য খনন কার্য্য চালাইয়াছেন। ফলে, স্তরে স্তরে প্রচুর ভস্ম ও দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি বাহির হইয়াছে।)

*　　*　　*　　*

(৫)

সুশীল অফিস থেকে ফিরে দেখে স্ত্রী অরুণা মুখ ভার করে বসে আছে। সে কাছে যেতেই অরুণা মুখ ঘুরিয়ে বসল। সুশীল বিস্মিত হল। তাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনে অরুণাকে এরূপ ব্যবহার তো করতে দেখেনি! বন্ধু বান্ধবরা অরুণার সদাহাস্যময়ী রূপ দেখে সুশীলকে তার স্ত্রী-ভাগ্যের জন্য ঈর্ষা করে।

বহু চেষ্টার পর অরুণা মুখ খুলল। যা বলল তার সারাংশ এই যে, একমাসের মধ্যে যদি সুশীল বাসা না পাল্টায় তো, সে যাহোক একটা কিছু করে ফেলবে! কারণ, পাড়ার হাসি-বৌদি ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়াকে কেন্দ্র করে, তার ছেলেকে, কেলটে ও হ্যাংলা চেহারার বলেছে। হলই বা তার ছেলের রং ময়লা আর শরীরটা রোগা, তা বলে ও বলবার কে? সুশীল বলল—তাতে আর এমন কি হয়েছে। ছেলে যে তোমার রোগা তাতো সত্যি। তবে, হ্যাংলা না বলে রোগা বলতে পারত।

অরুণা ঝংকার দিয়ে উঠল—আর কেলটে না বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বললে কি ওর মুখ ক্ষয়ে যেত!...এই হল সন্তানের প্রতি মাতার অন্ধ আসক্তির নিদর্শন। অনেকে একে বলবেন স্নেহ, কেউ বলবেন বাড়াবাড়ি, কেউ বা সঙ্কীর্ণতা। যাই বলা যাক না কেন, সন্তানের সম্বন্ধে মাতার এই দুর্বলতার কাহিনী ঘরে ঘরে। এমনই সব মাতার এক প্রতিভূ-চরিত্র যশোদার, বাৎসল্য প্রেমের কাহিনী শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। তাই এক মা যখন নিজের সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে পরের ছেলেকে বুকে নিয়ে গভীর নিশীথে চিতোর ত্যাগ করেছিলেন, সেদিন মাতা প্রকৃতিও মনে হয় চমকিত হয়েছিলেন। ঘাতক বনবীর তাঁরই চোখের সামনে তাঁর প্রিয় শিশুসন্তান করণ সিংয়ের বুকে অস্ত্রাঘাত করল। মা হয়েও পান্না তা দেখে একবার আর্তনাদও করলেন না, একবার কেঁদেও উঠলেন না।

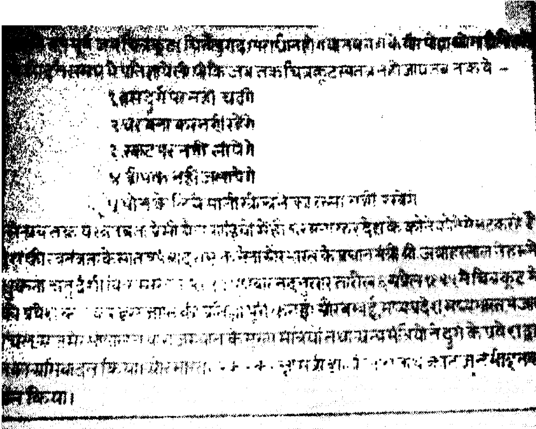


রাজপুতানীর কাছে পুত্র বড় নয়—কর্তব্য বড়, প্রভুভক্তি বড়। রাজপুতানী রাজধর্মী। রাজা ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কি অনুরাগ!

রাজপুত্র, শিশু উদয়কে ঘাতকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মা পান্না যা করেছিলেন তা' কি পৃথিবীর মাটিতে সম্ভব?—বোধ হয় না। তবে, চিতোরের মাটিতে তা' সম্ভব হয়েছিল। মনে হয় চিতোরের মাটি আমাদের পৃথিবীর মাটি থেকে অনেক অনেক উঁচুতে।

*　　*　　*　　*

এইগৃহেই ধাত্রী পান্নার পুত্রকে বনবীর হত্যা করিয়াছিল।



গাড়ী লোহারদের চিত্রকূট প্রবেশের স্মারক

(৬·)

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে আমরা কত প্রতিজ্ঞা, কত সঙ্কল্পই না করেছিলাম—কিন্তু তার খতিয়ান পরীক্ষা করলে দেখব সে সবের অধিকাংশই আমরা বিস্মৃত।

ঢেউ আসে—তার বুকে অনেক কিছুই নেচে ওঠে। ঢেউ চলে যায়,—সব থিতিয়ে যায়, তলিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়। একটা একক মানুষ প্রতিজ্ঞা করে,—কাল থেকে ওটা করব না, এটা বলব না—কিন্তু ক'দিন পরেই আবার তা করে। নিজের নিষেধাজ্ঞা নিজেই ভাঙ্গে। প্রশ্ন করলে বলে, উপায় ছিল না, সম্ভব হ'ল না। এমনই মনুষ্য চরিত্রের স্বাভাবিক শৈথিল্য।

তা'হলে একটা সমগ্র জাতির পক্ষে কি কোনও প্রতিজ্ঞা দীর্ঘদিন ধরে রক্ষা করা সম্ভব ?

একদিন নয়, একমাস নয়, এক বছরও নয়,—কয়েক শতাব্দী আগে একটা জাতি চিতোর ত্যাগ করার সময় সহস্র কণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিল—

যতদিন না স্বাধীনতা ফিরে পাই ততদিন—

(১) আমরা ঘর বেঁধে থাকব না,

(২) খাটে শোব না,

(৩) রাতে প্রদীপ (আলো) জ্বালাব না,

(৪) খাওয়ার জল তোলবার (কূপ হতে) দড়ি রাখব না (ব্যবহার করব না),

(৫) চিত্রকূট পাহাড়ে চড়ব না (ফিরব না) ;

আর অক্ষরে অক্ষরে সেই শপথগুলি তারা পুরুষানুক্রমে পালন করেছে। গরুর গাড়ীর ওপর, কাপড়ের ছাউনির মাঝে হয়েছে বহু জীবনের উন্মেষ, হয়েছে সূর্য্যোদয়। সন্ধ্যা নেমেছে ওই ছাউনিরই মধ্যে, তারা চলে গেছে।

একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশ' বছর অর্থাৎ প্রায় এগার পুরুষ ধরে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এসেছে মেবারের 'গাড়ী লোহার' সম্প্রদায়, রাণা প্রতাপের পরাজয়ের পর থেকে। তাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল মহারাণাদের অস্ত্র নির্ম্মাতা। সেই অস্ত্রের পরাভবের অপমান, লজ্জা ও দুঃখ তাদের এই কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণের কারণ। (জনশ্রুতি)

৬ই এপ্রিল, ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে অগ্রগামী করে, এক বিশেষ উৎসবের মাধ্যমে, গাড়ী লোহাররা সাড়ে তিনশ বছর পরে আবার চিত্রকূটে আরোহণ করেছে।

*　　*　　*　　*

৭

গাইডটির পরণে একটি হাফপ্যান্ট আর আধময়লা শার্ট। জাতে মেওয়ারী (মেবারী)। মেবারের আবহাওয়াতে চেহারায় কাঠিন্য, কিন্তু অতি নম্রস্বভাব, মৃদুভাষী। তিনটি ভাষা জানে। তার আশী বছরের বৃদ্ধা মা চারটি ভাষায় কথা বলতে পারেন। বৃদ্ধাই আগে গাইডের কাজ করতেন।

মজুরী বাবদ দু'টাকা দিতে গাইডটি বলল—"বাবুজী, আজ দুদিন বাদে এই দু'টাকা উপার্জ্জন হ'ল। আজ আমার ঘরে শুধু দু-সের আটা ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি যা দিলেন তা দিয়ে শাকসব্জী আনতে পারব। খেতে আমরা তিনজন। আমি, আমার বিধবা বোন আর মা। আমি বিয়ে করিনি।" বললাম—'তা' একাজ ছেড়ে একটা চাকরী নাও না কেন ?' সে বলল—'বাবুজী, এখানে, এই পাহাড়ী জায়গায়, পাথর কাটা ছাড়া আর কোনও জীবিকা নেই। নীচে, সহরেও কোন কল-কারখানাও নেই যে মজুর খাটব।'

...া কথাই সে বলল। এ সমস্যার সমাধান জানি না, ...প করে গেলাম। সে আবার বলল—'বাবুজী, ...র মানুষের বড় কষ্ট। এমন সব জায়গা আছে ...কার মেয়েদের 'এক মাইল দূরে যেতে হয় খাওয়ার ...আনতে।'

...লে ফেললাম—"তবে যে খবরের কাগজে আমরা ...—সরকার হাজার হাজার টিউবওয়েল দিয়ে তোমাদের ...—রাজস্থানে, জলকষ্ট বলতে কিছু রাখেননি! সরকার ...মিতে ফলবাগান করেছেন যে?"

কুম্ভশ্যামজীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ... অবগুণ্ঠনবতী এক রমণী সামনে এসে দাঁড়াতেই ... জোড়হাত করে আমায় বলল—"বাবুজী মাফ ...জিয়ে গা। ম্যয় সুপারিশ নহি কর রহা হুঁ। যে ...ওয়া অওরতকী সির্ফ এক লড়কী বিনা কোই ভি ন ... যে দো-চার পৈসা লেকর মুশাফিরোঁকো পানি ...াতি। ইন্‌কী গুজারা কি অওর কিস্‌হি উপায় ন হি। ...া কর"—

স্ত্রীলোকটির চাহনি এত করুণ ও অসহায় যে, তাড়া...ড়ি সরে পড়বার জন্য গাইডের হাতে আট আনা দিলাম। ...ইড এই সামান্য সাহায্যকেই বোধহয় অপ্রত্যাশিত ...নে স্ত্রীলোকটির হাতে পয়সাগুলি দিয়ে বলল—"জানতী ... বাবুজী কৌন্‌ দেশকে রহনেওয়ালা?" স্ত্রীলোকটি ...মার দিকে একবার দেখে নিয়ে নেতিবাচক মাথা ...ল। গাইড উৎফুল্লকণ্ঠে হেসে বলল—"বাবুজী সুভাষ...কো দেশকে হ্যয়!"

বীরপ্রসূ মেবার। পরাধীনতার শিকল যখনই তার ...য় চেপে বসতে চেয়েছে তখনি তা' টুকরো করে ফেলেছে ...ার। বীর্যের পূজারী তারা। ভারতের শেষ রাণা ...াপ—সুভাষবাবু তাই তাদের অতি আদরের—তাদের শেষ উল্লেখযোগ্য পুরুষ। সুভাষবাবুর নাম তাদের বড় সম্মানের।

দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে তামিলভূমিতে, যেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি আমার পরিচয় স্বীকৃতি পেয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশের লোক বলে। আর এখানে দেখলাম—আমি তাদের অতি পরিচিত অতিথি—কারণ, আমি যে সুভাষবাবুর দেশের লোক। মুহূর্তের জন্য মনে হল আমি তো অতি সামান্য নই। ব্যক্তিগত-ভাবে বিত্তহীন, খ্যাতিহীন আমার পরিচয় দেবার কিছুই নেই। কিন্তু আমার সমষ্টির বহু পরিচয়, আমার ন্যাশনাল রেফারেন্স আছে। তাই আমার পরিচয়ের স্বীকৃতিও ভারতের আকাশে, মাটিতে, প্রতিপ্রান্তে ছড়িয়ে আছে। সবাই আমায় চিনতে পাবে, বাঙ্গালীকে চেনে সবাই।

এই ভাবনাটিই বুঝি বা রাজনীতির ভাষায় আমার প্রাদেশিকতা দোষ?

* * * *

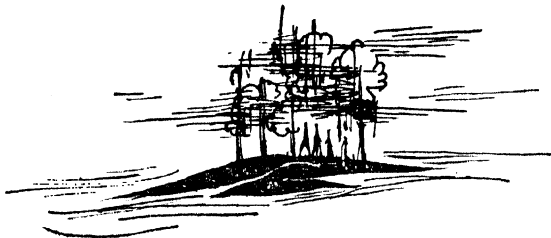
খাতাখানা বৃদ্ধের হাত থেকে নিয়ে লিখলাম—

"I do not find any suitable language to write or comment anything about my visit to Chitor. I do consider me, to be, one of the most fortunate men living, on having the chance to walk on the same soil on which walked Rani Padmini, Mira Bai, Rana Sanga, Dhatri Panna and Rana Pratap."

ফিরে চললাম।

মীরার মন্দিরে এক বৃদ্ধা গাইতে লাগলেন—

"হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
হরে সজন, হরে সজন, সজন সজন হরে হরে॥"



বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

১৫০৭ সালের ঘটনাবলী

লুঠতরাজ ও খিলজাইদের বাসভূমি তোলপাড় করে ফেলার জন্য কাবুল থেকে যাত্রা করি। খিলজাইদের শিবিরের চার মাইল দূর থেকে একটা কালো পর্দার মত দৃশ্য চোখে পড়লো। সেটা হয় ওদের চলার ফলে ধূলো ওড়ার জন্য, না হয় ধোঁয়ার জন্য। আমার দলের তরুণ ও অনভিজ্ঞ সেনারা দ্রুতগতিতে ধাওয়া করলো। আমি তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে তাদের ঘোড়ার পা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলাম। এই ভাবে তাদের গতি খানিকটা রোধ করতে সক্ষম হই। যখন পাঁচ ছয় হাজার লোক দল বেঁধে লুঠতরাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। যাহোক, আল্লার ইচ্ছায় সবই ঠিক হয়ে গেল। আমার লোকজন শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

মাইল খানেক দূর থেকে বোঝা গেল যে কালো ছায়ার মত যেটা দেখাচ্ছে সেটা আফগানদের শিবির সমাবেশের জন্যই হয়েছে। একদল লুণ্ঠনকারীকে সেই দিকে পাঠানো হয়। লুঠতরাজের জন্য এই আক্রমণে অনেক ভেড়া লাভ হলো। এক সঙ্গে এতগুলো ভেড়া এর আগে কোনও বারই পাওয়া যায় নি। যখন আমরা ঘোড়া থেকে নেমে লুঠের মাল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলাম, শত্রু পক্ষ একত্রিত হয়ে সমতল ভূমিতে নেমে যেয়ে যুদ্ধের জন্য প্ররোচনা দিচ্ছিল। আমাদের দলের কয়েকজন বেগ ও কিছু সৈন্য তাদের একটা দলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে প্রত্যেককে তরবারির আঘাতে হত্যা করে। নাজির মির্জ্জাও এমনি আর একটা দলকে পেয়ে তাদের প্রত্যেককে কেটে ফেলে। আফগানদের মাথার খুলি দিয়ে একটা স্তম্ভ খাড়া করা হয়।

আমার কয়েকজন বেগ ও কর্ম্মচারীকে লুঠের মালের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করার জন্য নির্দ্দেশ দিলাম। কাসিম বেগ ও আরও কয়েকজনকে অনুগ্রহ দেখিয়ে তাদের লুঠের মাল আর ভাগ করা হলো না। যাহোক, যেগুলো ভাগ করা হলো—তাতেই এক পঞ্চমাংশে দাঁড়ালো যোল হাজার ভেড়া। সুতরাং মোট সংখ্যা হলো আশি হাজার। তাহলে ক্ষতি খেসারত ধরে এবং যাদের কাছ থেকে এক পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়নি—সব যদি এক সঙ্গে যোগ করা যায় তাহলে মোট সংখ্যাটি এক লাখই দাঁড়াবে।

এইখান থেকে পরদিন সকালে রওনা হই। কাত্তেওয়াজের সমতল ক্ষেত্রে সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করে একটা বড় ব্যূহ রচনা করে শিকারের ব্যবস্থা করা হলো। এখানকার হরিণ আর বন্য গাধা খুব মোটাসোটা চর্বিওয়ালা—আর এগুলো খুব প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের রচিত ব্যূহের মধ্যে অনেক হরিণ আর গাধা আটকা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেকগুলোই শিকার করা হলো।

এই শিকারের সময় একটা বন্য গাধাকে তাড়া করে খুব কাছে গিয়ে তীর ছুড়লাম। তারপর আর একটা তীর। কিন্তু গাধাটার আঘাত এমন সাজ্ঘাতিক হয়নি যাতে সেটা মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু দুইবার আঘাত পেয়ে তার দৌড়ানোর গতি ধীর হয়ে এলো। ঘোড়া ছুটিয়ে গাধাটার কাছে এসে তরবারি দিয়ে ওর দুই কানের পেছনে মাথার নীচে এমন আঘাত করলাম যে ওর শ্বাসনলী কেটে গেল। গাধাটা ঘুরপাক খেয়ে এমনভাবে পড়লো যে ওর পেছনের পা দুটো ঘোড়ার রেকাবের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। তরবারির আঘাতটা খুবই জোর হয়েছিল। গাধাটাও খুব মোটা সোটা ছিল। এর পাঁজরার হাড়টাই মেপে দেখা গেল দুই ফিট লম্বা।

*   *   *   *

সেবাক খাঁ মুরখাব অতিক্রম করে মহরম মাসে হেরাট অবরোধ করে। তার উপস্থিতির দুই তিন দিন পর নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রাচীর ঘেরা সহরের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সেবাক খাঁর সঙ্গে দেখা করে সহর তার হাতে সঁপে দেয়।

হেরাট অধিকার করবার পর সেবাক খাঁ ঐ দেশের রাজাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের ওপর কদর্য্য ব্যবহার করে। শুধু তাদের প্রতি নয়, সেখানকার প্রতিটি লোকের ওপর এমন রূঢ়, অকথ্য, অমানুষোচিত ব্যবহার করে যাতে তার সুনামের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। পার্থিব লাভের জন্য তার সমস্ত গরিমা ধুলায় লুটিয়ে পড়ে।

সেবাক খাঁর প্রথম কুকর্ম্ম হলো এই যে সে ঘোর নীচতার বশে সা' মনসুরের হাতে খাদিজা বেগমকে সমর্পণ করার আদেশ দেয়—যাতে সে তাকে নীচ ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করে' তার সব কিছুই লুণ্ঠন করতে পারে। তা ছাড়া, সে অশেষ ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র সাধু সেখ পুরাণকে মোগল আবদুলের হাতে তুলে দেয় তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবার জন্য। তাঁর প্রত্যেক পুত্রকেও ঐ একই ভাবে এক এক জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানকার কবি ও সাহিত্যিকদের মোল্লা বিনাইয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়—যাতে সে মোচড় দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে টাকা-কড়ি আদায় করে নিতে পারে। এই বিষয় নিয়ে একটা কবিতা খোরাসানের লোকদের মুখে মুখে শোনা যায়।

'কবিদের লুঠ করে অনেক ধন পাবে
বিনাই এই কথা ভেবেছিল।

কিরণর ছাড়া যে, আর কারও কিছু নাই
এ কথা কি কেউ তাকে বলেছিল ?
টাকার রং বল, দেখেছে কোন্ কবি
আবদালা কিরণর ভিন্ন।
বিনাই হয়েছিল আনন্দে মশগুল,
(হায়রে) শেষে তার আশা হলো ছিন্ন।'

ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে থাকা সত্ত্বেও সেবাক খাঁ অহঙ্কার বশে কোরাণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিত। সে তার কলম নিয়ে সুলতান আলি ও চিত্রকর বেহ্জাদের লেখা ও অঙ্কন সংশোধন করার ধৃষ্টতা দেখাত। যদি সে কোনও সময়ে দুই লাইনের নীরস কবিতা কোনও রকমে লিখে ফেলতো তাহলে আর রক্ষা ছিল না। সে সেটা প্রচার-বেদী থেকে পাঠ করে লোককে শোনাতো, বাজারে সেই কবিতা লিখে ঝুলিয়ে রাখতো, আবার এই আনন্দজনক ঘটনায় সহরের লোকদের কাছ থেকে দাতব্যের জন্য কিছু অর্থ আদায় করতো। সে হয়তো কোরাণ পাঠ কিছু কিছু করতো, কিন্তু সে যে অসংখ্য বুদ্ধিহীন, কিম্ভুতকিমাকার, হঠকারী, অবিশ্বাসহীন কাজ ও কথার জন্য দোষী, একথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এই সময় সা বেগ ও তাঁর ছোট ভাই আমার কাছে উপর্যুপরি দূত পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। যে সময় উজবেকরা সমস্ত দেশটা অধিকার করে ফেলেছে তখন আমার মত লোকের অলসভাবে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখাটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমার আমিরদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হলো যে তাঁদের সাহায্যের জন্য আমরা সসৈন্যে বেরিয়ে পড়বো।

আমরা যখন কিলাতে পৌঁছাই, হিন্দুস্থানের বণিকরা বাণিজ্যের পসরা নিয়ে ঐ দিক দিয়েই আসছিল। সৈন্যরা তাদের পথে আচমকা এসে পড়ায় তারা আর পালাবার সুযোগ পেল না। সাধারণভাবে এই মতবাদেরই প্রাধান্য দেখা গেল যে বর্তমানের মত গোলমেলে সময়ে পরদেশ থেকে যে সব জিনিষপত্র এসে পড়েছে সেগুলো লুঠ করে নেওয়াই উচিত। কিন্তু আমি এ মতবাদে সায় দিই নি।

আমি বল্লাম—এই বিদেশী বণিকদের অপরাধ কি? যদি ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে এই সব তুচ্ছ জিনিষ লুঠতরাজ করে আত্মসাৎ করতে বিরত হই, তা'হলে ঈশ্বর একদিন না একদিন এর প্রতিদানে আমাদের ওপর অপার করুণা বর্ষণ করবেন; কিছুদিন আগে যখন আমরা খিলজাইদের বিরুদ্ধে অভিযান করি এবং যখন মোমেন্দরা তাদের ভেড়ার পাল, আসবাবপত্র, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আমাদের সামনে পড়েছিল, তখনও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ করার জন্য অনেকেই প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও ঐ একই রকম ভাবাবেশে আমি এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তার ফল কি হয়েছিল? পরদিন সকালে সেই বিদ্রোহী আফগান খিলজাইদের, ভগবানের দয়ায়, যে সব বিপুল সম্পত্তি সেনাদলের হাতের মধ্যে এসে গেল, তেমন কি আর কোনও বার লুঠের ফলে পাওয়া গিয়েছে ?

কিলাত পার হয়ে আমরা শিবির স্থাপন করি এবং কর হিসাবে সামান্য কিছু বণিকদের ওপর ধার্য্য করে তা আদায় করি।

কিলাত অতিক্রম করার পর খাঁ মির্জ্জা আমার সঙ্গে যোগ দেয়—যাকে কাবুলের বিদ্রোহের পর খোরাসানে যেতে বাধ্য করেছিলাম।

আমি সেইখান থেকে সা বেগ ও মকিমকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই যে তাদের অনুরোধ মত আমি এতদূর এসে পৌঁচেছি। একথাও তাদের জানিয়ে দিই যে উজবেকদের মত বিদেশী শত্রু যখন খোরাসান অধিকার করে বসেছে তখন নিরাপত্তার জন্য সকলের সঙ্গে একযোগে পরামর্শ করে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার উপায় স্থির করা উচিত। আমার চিঠি পেয়ে তারা কোনও ভদ্রোচিত ভাষায় উত্তর দিয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা তো জানালোই না—বরং কর্কশ, অশিষ্ট ভাষায় তার জবাব দিল। তাদের অশিষ্টতার একটা নিদর্শন হচ্ছে এই—যে চিঠিটা তারা আমাকে লিখেছিল তার পেছনের দিকে মোহরাঙ্কিত করেছিল যেখানে একজন আমির আর একজন আমিরকে চিঠি লেখার সময় করে থাকে, না ঠিক তাও নয়—যেখানে একজন উঁচু দরের আমির আর একজন নীচুদরের আমিরকে চিঠি লিখার সময় মোহরের ছাপ দেয়। যদি তারা এমন ঔদ্ধত্যের অপরাধে অপরাধী না হতো এবং ওরূপ অপমানকর ভাষায় চিঠির উত্তর না দিত তা'হলে তাদের পরিণতি এত মন্দ কিছুতেই হতো না। কথায় বলে—

'একটা অতি তুচ্ছ বিবাদ
ঘটায় এমন অঘটন,
যার ফলে প্রাচীন বংশ
সমূলে হয় উৎপাটন।

তাদের এই উদ্ধত ও কলুষিত আচরণের ফলে তাদের পরিবার পরিজন ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে যে ঐশ্বর্য্য এবং সম্মান অধিকার করেছিল সবই হাওয়ায় উড়ে গেল।

আমার অনুচরদের এ দেশের সমস্ত অংশের সঙ্গেই ভালভাবে পরিচয় ছিল। তারা পরামর্শ দিল যে নদীগুলি কান্দাহারের দিকে গিয়েছে তার ধার দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়া যাক। আমি এই প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম। পরদিন সকালে যুদ্ধযাত্রার মত সৈন্য সাজিয়ে মার্চ করে চলতে লাগলাম।

তুফান আরঘুন একা আরঘুন সৈন্যদলের দিকে এগিয়ে গেল। আসিক উল্লা নামে একজন শত্রু পক্ষের লোক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাত আটজন লোক নিয়ে তুফান আরঘুনের দিকে জোরে ধাওয়া করলো। তুফান একাকী তাদের মুখোমুখি হয়ে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। তারপর, আসিক উল্লাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে সেই মাথা আমাদের কাছে নিয়ে আসে। তার এই অদ্ভুত বীরত্ব শুভ সূচনার নিদর্শন বলে ধরে নিলাম।

আমরা আর কালবিলম্ব না করে শত্রুর দিকে এগিয়ে চল্লাম। যখন তীরের পাল্লার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি তখন শত্রুরা সহসা আক্রমণ করায় আমাদের অগ্রগামী সেনারা বিহ্বল হয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য

হলো। তারা আমাদের প্রধান সৈন্যদলের দিকেই পিছিয়ে আসছে দেখে তারাও তীর ছোঁড়া বন্ধ রেখে ওদের সঙ্গে মিলবার জন্য এগিয়ে গেল। পেছনের দলকে এগোতে দেখে অগ্রগামী দলও তীর না ছুঁড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

শত্রুপক্ষের একজন লোক তাদের লোকজনদের হাঁকডাক করে আমার দিকে ধেয়ে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে লক্ষ্য করে ধনুকে তীর সংযোজন করছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাই। যখন প্রায় তার কাছে পৌঁছে গেছি তখন আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করলো না, ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেল। এই লোকটাকে আমি চিনেছিলাম—সে স্বয়ং সা' বেগ।

আমার সৈন্যরা নদী পথ আগলে রেখে শত্রুর চলার রাস্তা বন্ধ করে দেয়। আমাদের সৈন্য সংখ্যা অল্প হলেও তারা বীরের মত যুদ্ধ করতে থাকে এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

কামবার আলি আহত হয়। কাশিম বেগের কপালে শর বিদ্ধ হয়। ঘোরি বিলাসের ভুরুর ওপরে তীর লেগে সেটা গাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

এই অবস্থাতেও শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করি। মারখানের পাহাড়ের পাশ দিয়ে যে নদী বেরিয়েছে সেই নদী পেরিয়ে আসি। শত্রু সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই আমার সৈন্যরা তাদের দিকে ধাওয়া করে তাদের বন্দী করতে থাকে। আমার কাছে তখন মাত্র এগারো জন সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে একজন লাইব্রেরিয়ান—আবদাল্লা।

মোকিম কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ চালাচ্ছিল। আমার সঙ্গের লোকের স্বল্পতা উপেক্ষা করে এবং ভগবানের ওপর আস্থা রেখে রণ-দামামা বাজিয়ে শত্রুর দিকে ধেয়ে গেলাম।

'আল্লার যদি হুকুম থাকে
এমন দেখা যায়,
বৃহৎসেনা ছোটর কাছে
বেদম মার খায়।

দামামার শব্দ শুনে ও আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে ওদের সাহস ফুরিয়ে গেল। ওরা ছুটে পালাতে লাগলো। ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হলেন। শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে আমি কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয়ে 'চারবাগে' এসে আস্তানা করলাম।

সা' বেগ ও মোকিম তাদের পালাবার সময় কান্দাহার দুর্গ উদ্ধারের আশা নাই দেখে দুর্গ রক্ষার জন্য কোনও সৈন্য না রেখেই চলে গেল। আলি তেরখানের ভাইরা, কুলি বেগ ও আরও কয়েকজন—যাদের আমার প্রতি আনুগত্য ছিল এবং আমাকে সম্মান করতো, তারা কিন্তু দুর্গেই থেকে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে মৌখিক কথাবার্তা চলার পর তারা তাদের ভাই ও আত্মীয়দের জীবনের কোনও হানি হবে না এই আশ্বাস চাওয়ায় আমি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবো এই কথা জানিয়ে দিই। তারাও দুর্গের ফটক খুলে দেয়।

কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে আমি দুর্গে প্রবেশ করি। দুই একজন লুণ্ঠনকারীকে দেখতে পেয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিই। প্রথমে যাই মোকিমের ধনাগারে। সেটা ছিল দেওয়াল ঘেরা সহরের মধ্যে। সেখান থেকে দুর্গে চলে আসি। সে রাত্রে দুর্গনগরেই বাস করি। পরদিন সকালে ফেরুকজাদের বাগানে যাই। সেখানেই সৈন্যরা ছিল। কান্দাহার রাজ্যের ভার আমি নাসির মির্জ্জাকে দিই। সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করে খচ্চরের পিঠে বোঝাই করার পর আমরা দুর্গের ধনাগারের দিকে আসি। নাসির মির্জ্জা সাতটি খচ্চরের ওপর রৌপ্য মুদ্রা বোঝাই করে নিয়ে গেল। আমি সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার কথা না বলে' সেগুলো তাকেই উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলাম।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে সৈন্যদের এগিয়ে শিবিরে যেতে বলে আমি ঘোরা পথে অনেক দেরীতে শিবিরে এসে পৌঁছাই। যে শিবির আমি ফেলে গিয়েছিলাম—ফিরে এসে দেখি সে শিবির যেন আর নাই। এ শিবির যেন আমি চিনতেই পারছি না। সেখানে দেখতে পেলাম অসংখ্য ঘোড়া, লম্বা চুলওয়ালা মর্দ্দা ও মাদি উটের শ্রেণী। রেশম বস্ত্র বোঝাই খচ্চরের দল। লম্বা চুলওয়ালা মাদি উটের পিঠে বোঝাই চামড়ার ব্যাগ, তাঁবু আর লাল রংয়ের মখমলের সামিয়ানা। প্রতি বাড়ীতে সিন্দুকে বোঝাই দুই ভাইয়ের হাজার হাজার সের ওজনের জিনিষপত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। প্রতিটি গুদামে তোরঙ্গের ওপর তোরঙ্গ, কাপড়ের বোঝার ওপর বোঝা এবং আরও অনেক জিনিষ একটার পর একটা জড়ো করে রাখা হয়েছে। পোষাকের ব্যাগের ওপর ব্যাগ। টাকা বোঝা পাত্রের ওপর পাত্র সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক লোকের বাসায় বা তাঁবুতে অপর্য্যাপ্ত লুঠের মাল। অনেক ভেড়াও ছিল বটে—কিন্তু অন্য সব মালের কাছে এদের কোনও মূল্য ছিল না।

খেলাতের দুর্গ রক্ষী সৈন্যদের ভার আমি কাশিমবেগের ওপর অর্পণ করি। সেই সঙ্গে সেখানকার সমস্ত সম্পত্তি। কাশিম বেগ দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি। সে আমাকে যত শীগ্‌গির সম্ভব কান্দাহার দেশটা ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করে। তার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাবুলে ফিরে আসার জন্য আবার বেরিয়ে পড়ি। পূর্ব্বেই বলেছি কান্দাহার রাজ্য আমি নাসির মির্জ্জাকে অর্পণ করি। সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আমিও কাবুলের পথ ধরি।

কান্দাহার প্রদেশের মধ্যে থাকার সময় আমাদের প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার সময় হয়নি। কারাবাগে পৌঁছিয়ে ওগুলো ভাগ করে ফেলার অবসর পাওয়া গেল। টাকাকড়ি গুণে গুণে ভাগ করা কষ্টসাধ্য মনে হওয়ায় দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করে ওগুলো ভাগ করা হলো। বেগ, কর্ম্মচারী, ভৃত্য এবং আত্মীয় স্বজনরা ভারবাহী পশুদের পিঠে নিজেদের জিনিষপত্রে বোঝাই ছালা, টাকার থলে আর পশুর খাদ্য নিয়ে চললো। আমরা বহু লুঠের মাল ও ধনরত্ন নিয়ে সগৌরবে কাবুলে পৌঁছে গেলাম।

ছয় সাত দিন পর শুনলাম যে সেবাক খাঁ কান্দাহার অবরোধ করার আয়োজন করছে। এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে সেটা বুঝতে পেরেই

দূরদর্শী কাশিম বেগ আমাকে তাড়াতাড়ি কান্দাহার ত্যাগ করে চলে আসার জন্য অতটা ব্যগ্রতা দেখিয়ে ছিল।

'যুবজন আয়নায় দেখে যা,
সাধুজন পোড়াইঁটে দেখে তা।'

কান্দাহারে পৌঁছিয়ে সেবাক খাঁ নাসির মির্জ্জাকে অবরোধের মধ্যে ফেলেছে।

*   *   *

জমায়ল মাসে আমরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করার জন্য কাবুল থেকে রওনা হই। কাবুল এবং লেমঘানের মধ্যে যে সব আফগান বাস করে তারা ডাকাত ও লুণ্ঠনকারী। শান্তির সময়েও তারা এই সব দুষ্কর্ম্ম করে থাকে। তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে অভ্যস্ত এই বলে যে, গোলমাল ভাল করে লাগিয়ে দাও প্রভু যাতে আমরা লুটে পুটে খেতে পারি। কিন্তু তাদের ভাগ্যে কদাচিৎ এ রকম বিশৃঙ্খলা ঘটে থাকে—যাতে তারা তার সুযোগ নিতে পারে।

যখন তারা জানতে পারল যে আমি কাবুল ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য সসৈন্যে বেরিয়ে পড়েছি তখন তাদের বেপরোয়া ঔদ্ধত্য দশগুণ বেড়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা ভাল ছিল তারাও দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যায় কাজ করার জন্য ঝুঁকে পড়লো। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে যেদিন আমরা জাগদালিক থেকে মার্চ করা সুরু করি সেই সময় আফগানরা এই ফন্দী আঁটলো যে—যখন আমরা তাদের দেশের মাঝ দিয়ে আসবো—কারণ সেই দিক দিয়েই আমাদের যাওয়ার পথ—তখন তারা কোটাল কিংবা জাগদালিক গিরি-সঙ্কটের মুখে আমাদের গতিরোধ করবে এবং উত্তর দিকের পাহাড়ে সবাই জড় হয়ে রণদামামা বাজিয়ে, তরবারি আস্ফালন ক'রে ভীষণ রণহুঙ্কার তুলে আমাদের বিপর্য্যস্ত করে দেবে।

সেই জায়গায় পৌঁছিয়েই আমি সৈন্যদের পাহাড়ে উঠে শত্রুপক্ষের যাকে কাছে পাবে তাকেই আক্রমণ করার আদেশ দিলাম। সৈন্যরা আদেশানুসারে অগ্রসর হয়ে নানা পথ ধরে দলে দলে আফগানদের কাছে উপস্থিত হতেই তারা হতভম্ব হয়ে মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়িয়ে থেকে একটা তীর পর্য্যন্ত না ছুঁড়ে পালাতে লাগলো। আফগানদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা পাহাড়ের মাথার ওপর উঠলাম। একজন আফগানকে আমার কাছ দিয়ে পাহাড়ের ঢালু পথে পালিয়ে যেতে দেখে তার বাহুতে শর নিক্ষেপ করে আহত করি। তাকে এবং আরও কয়েকজনকে ধরে ফেলে আমার কাছে আনা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়।

সৈন্যরা অনেক চাউল আটক করে। পাহাড়ের তলদেশে ধান-ক্ষেত। প্রায় সব গ্রামবাসীই পালিয়ে বাঁচে। কয়েকজন কাফের হত হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় কাফেররা একদল লোককে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর বুকে শোয়া অবস্থায় আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য রেখে যায়। কাফেররা পালিয়ে যাওয়ার পর তারা পাহাড় থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে তীর নিক্ষেপ করে আমাদের বিরক্ত করতে থাকে। কাশিম বেগের জামাতা পুরাণকে আহত করে তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। তার অবশিষ্ট লোক সেই দিকে ছুটে এসে শত্রুপক্ষকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং পুরাণকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আমরা এক রাত্রি কাফেরদের ধান ক্ষেতেই কাটিয়ে দিই। সেখান থেকে অনেক ধান সংগ্রহ করে আমরা শিবিরে ফিরে আসি।

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হওয়াটা এ সময়ে সুবিধা হবে না মনে করে আমি মোল্লাবাবাকে কিছু সৈন্য দিয়ে কাবুলে পাঠিয়ে দিই। তার কয়েকদিন পর, শীতঋতুর মাঝামাঝি সময়ে আমি কাবুলে পৌঁছে যাই।

এ পর্য্যন্ত তাইমুরের বংশধররা রাজতক্তে বসলেও তাঁরা 'মির্জ্জা' এই উপাধি ছাড়া অন্য উপাধি গ্রহণ করেননি। এই সময়ে আমি নির্দ্দেশ জারি করি যেন আমাকে সম্রাট বলে সম্বোধন করা হয়।

এই বছরের শেষে জেল্‌কাদে মাসের চার তারিখ মঙ্গলবার সূর্য্য যখন মীনে সেই সময় হুমায়ুনের জন্ম হয়। হুমায়ুনের জন্ম উপলক্ষে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়। সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, ছোট বড় সকলেই নানা রকমের উপহার নিয়ে আসে।

*   *   *   *

১৫০৮ সালের ঘটনাবলী

অভিযান থেকে ফেরার কয়েকদিন পর যখন আমরা কাবুলে বাস করা আরম্ভ করেছি—সেই সময় কাচ্‌বেগ, ফকির আলি, বাবা চেহেরে আমাকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার মতলব করলো। তাদের ষড়যন্ত্রটা ধরা পড়ে যেতেই আমি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে তাদের ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। জাহাঙ্গীর মির্জ্জার জীবন কালেও তারা প্রায়ই এই রকম কদর্য্য ব্যবহার দেখিয়েছে—আমি আদেশ দিলাম—বাজারে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য জায়গায় এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। বাজারের ফটকের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য যখন গলায় দড়ি পেঁচানো হচ্ছে, সেই সময় কাশিম বেগ তাদের ক্ষমা করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানায়। এই বেগকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ওদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিলেও কারাগারে বন্দী করে রাখার হুকুম দিলাম।

এক রাত্রে চারাবগের দরবার কক্ষে নমাজের পর বসেছিলাম। এমন সময় মুসা খাজা এবং আর একজন লোক দ্রুতবেগে আমার কাছে এসে কানে কানে ফিসফিস করে বললো যে—মোগলরা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মতলব এঁটেছে, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। আমি কিন্তু একথা বিশ্বাস করতে পারলাম না যে—তারা আবদুল রেজ্জাককেও তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনেছে। আরও বিশ্বাস করতে পারলাম না যে—তারা এই ষড়যন্ত্র কার্য্যকরী করার জন্য সেই রাত্রিই ধার্য্য করেছে। আমি সেইজন্য এদের এই সংবাদে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল ততটা না দিয়েই একটু পরেই হারেমের দিকে গেলাম। হারেমের কাছে আসতেই দেখতে পাই যে আমার অনুচরদের মধ্যে সব শ্রেণীর লোক—এমন কি রাতের পাহারাদাররাও চলে যাচ্ছে।

তারা চলে গেল, শুধু কয়েকজন আমার নিজের বিশ্বাসভাজন লোক এবং ক্রীতদাস সঙ্গে নিয়ে বাজারের দিকে আসতে থাকি। লোহা-ফটকের গরখানার কাছে এসে পৌঁছাতেই খাজা মহম্মদ আলি বাজারের দিক থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো, এবং—। (এই বছরের ঘটনাগুলির বর্ণনা আত্মচরিতে হঠাৎ এইখানেই শেষ হয়েছে)।

১৫০৮ সাল থেকে ১৫১৮ সাল পর্য্যন্ত বাবরের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[আত্মচরিতের ধারা আবার ১৫০৮ সালে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুনরায় ১৫১৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে চলতে থাকে।

বাবর তাঁর কিছু বিশ্বাসী অনুচর নিয়ে সজ্বর্ষে নেমে পড়েন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রথমে তিন হাজার হলেও ক্রমে এই সংখ্যা বার হাজারে দাঁড়ায়। এই ভাগ্য বিপর্য্যয় সত্বেও নিরাশার মধ্যেই সাহসের স্ফুলিঙ্গ তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। প্রত্যেকটি সজ্বর্ষে তিনি নিজে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। যেখানেই বিদ্রোহীদের দেখতে পেয়েছেন সেখানেই তাদের উপর অপূর্ব্ব সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একবার তিনি নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে আবদুল রেজাককে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু সে আহ্বানে কোনও সাড়া দেয় না রাজকুমার আবদুল রেজাক। কিন্তু তার পাঁচজন সহচর একটি কক্ষে একে একে তাঁর সম্মুখীন হয় এবং তাঁর তরবারির আঘাতে প্রত্যেকেই ধরাশায়ী হয়। তাদের নাম দেখে মনে হয় তারা ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির লোক।

শত্রুরা তাঁর সাহসের প্রশংসাও করতো এবং তাঁকে ভয়ও করতো। একের পর এক যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করে, বাবর পুনরায় কাবুল ও গজনির একচ্ছত্র সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হন।

১৫১০ সালে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যা বাবরের ভাগ্যের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। সা ইসমাইল সেই সময় পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। একদল শত্রু সৈন্য তাঁর রাজ্যের এক অংশ আক্রমণ করায় তিনি সেবানি খাঁয়ের কাছে সাহায্যের জন্য দূত প্রেরণ করেন। সেবানি খাঁ উত্তরে তাঁকে কতকগুলো উপদেশ দিয়ে চিঠি লেখে ও সেই সঙ্গে দূত মারফৎ ফকিরের ভিক্ষাপাত্রও পাঠিয়ে দেয়। এর উত্তরে সা ইসমাইল একটা টেকো আর কিছু তুলো পাঠিয়ে দেন—এই কথা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে—সে ঘরের কোণে বসে নিশ্চিন্তে সুতো কাটুক যে কাজের জন্যই সে উপযুক্ত।

এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করে এবং শত্রুকে প্রস্তুত হওয়ার সময় না দিয়ে সা' ইসমাইল সৈন্য চালনা করলেন। সেবানি খাঁ আঠাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসে। মার্ভের দশমাইল দূরে একটা নদী অতিক্রম করে আসার আগে সা' ইসমাইল আগে ভাগে সৈন্য পাঠিয়ে নদী পার হওয়ার পর নদীর সেতু ভেঙ্গে ফেলে সতেরো হাজার পারস্যের অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেবানি খাঁ পরাস্ত হয়। তার পিছিয়ে যাওয়ার পথও রুদ্ধ হয়। সে অবশ্য পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। নদীর ধারে একটা ঘেরা জায়গায় সে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেটাও অধিকৃত হয়ে গেলে সে ঘোড়ায় চড়ে নদীর দিকের দেওয়াল টপকাতে গিয়ে পড়ে যায়। এতেই তার মৃত্যু ঘটে। তার মাথার খুলিতে ঘাস পুরে কনষ্ট্যান্টিনোপলে তুর্কির সুলতানের কাছে পাঠানো হয়। সেই মাথার খুলিটা স্বর্ণখচিত করার পর অনেক বড় বড় উৎসবে দেখানো হতো।

বাবরের সবচেয়ে বড় শত্রু, যে তাঁর সমস্ত দুর্গতির মূল এবং যে তাঁকে পূর্ব্বপুরুষের রাজত্ব থেকে তাড়িয়েছে—তার মৃত্যুতে বাবরের মনে পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধার করার আশা জেগে ওঠে।

এই সময় সা' ইসমাইল কয়েকজন সৈন্যকে সঙ্গে দিয়ে বাবরের ভগ্নী খানজাদে বেগমকে বাবরের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাবর ছয় দশেক আগে যখন সমরকন্দ ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাঁর এই ভগ্নী সেবানি খাঁর হাতে আটক পড়েছিল।

বাবরের অবস্থার এত দ্রুত উন্নতি হলো যে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিসার, বোখারা ও সমরকন্দ অধিকার করে ফেলেন। কিন্তু উজবেগদের ক্ষমতাও ক্রমে ক্রমে এমন বেড়ে উঠলো যে ১৫১৫ সালে বাবর আবার সমরকন্দ হারিয়ে কাবুলে ফিরে এলেন।

এই সময় থেকে তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করার আশা তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তবে দৈব প্রেরণায় হিন্দুস্থান জয় করার ইচ্ছাটা তাঁর মনে জেগে ওঠে এবং সেই দিকেই তিনি মনঃসংযোগ করেন।

পরবর্ত্তী আত্মকথা ভারতে প্রথম আক্রমণের বর্ণনা দিয়ে পুনরায় সুরু হয়েছে।]

১৫১৯ সালের ঘটনাবলী

মহরম মাসের প্রথম তারিখে উপত্যকার নিম্নাংশে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প প্রায় আধঘণ্টা চলে। পরদিন সকালে বাজুর দুর্গ আক্রমণ করার জন্য এইখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। দুর্গের কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করে বাজুরের সুলতানের কাছে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিই যে—সে তার লোকজন সমেত আমার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গ আমার হাতে সমর্পণ করুক। কিন্তু এইসব বেকুব আর হতভাগার দল আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে অদ্ভুত উত্তর পাঠায়। আমি তখন সৈন্যসামন্তদের অবরোধের জন্য যন্ত্রপাতি, মই এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে আদেশ দিই। সমস্ত যোগাড় যন্ত্র ঠিক করে ফেলার জন্য আমরা একদিন শিবিরে অপেক্ষা করি।

বাজুরের অধিবাসীরা তখনও পর্য্যন্ত গাদা বন্দুক কি জিনিষ চোখে দেখেনি। যখন বন্দুকের আওয়াজ শুনলে তখন তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নানারকম অসঙ্গত কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলো। সেইদিনই গাদা বন্দুক দিয়ে আলিকুলি পাঁচজন লোককে এবং ওয়ালি খাজিন আরও দুইজনকে মেরে ফেলে। আরও সব বন্দুকধারী সৈন্য খুব সাহস দেখিয়ে ভাল কাজ করেছিল। তারা

ঢাল, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ ফেলে দিয়ে এমন নিশানা করে বন্দুক ছুঁড়তে থাকে যে সন্ধ্যার আগেই দুর্গের মধ্যের সাত, আট, দশজন বাজুরিকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এরপর দুর্গের লোকরা এমন ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ে যে বন্দুকের ভয়ে তারা আর দুর্গ থেকে মাথা বের করতে সাহস করলো না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে সৈন্যদের তখনকার মত সরিয়ে আনা হয়। তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হলো যে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তারা যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গ আক্রমণের জন্য আবার বেরিয়ে পড়বে।

ঊষার আলো দেখা দিতেই রণদামামা বাজিয়ে যুদ্ধোদ্যম সুরু করার জন্য আদেশ দেওয়া হলো। সৈন্যরা শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের নিজ-নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

দোস্ত বেগের লোকেরা দুর্গের উত্তরপূর্ব্বদিকে একটা বুরুজের পাদদেশে পৌঁছিয়ে দুর্গের দেওয়ালের নীচে গর্ত্ত খনন করে দেওয়াল ভাঙ্গার কাজ সুরু করে দিল। আলিকুলিও সেখানে ছিল। সেদিনও সে তার গাদা বন্দুকের সদ্ব্যবহার করেছিল। বিদেশে তৈয়ারী বন্দুকটা দুইবার ছোঁড়া হয়। ওয়ালি খাজিন তার বন্দুক দিয়ে একটা লোককে মেরে ফেলে। দুর্গের মাঝামাঝি জায়গার বাঁ পাশে মই লাগিয়ে কুতুব আলি দেওয়ালের ওপর উঠে গিয়ে শত্রুপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করে। প্রধান সৈন্যদল যেখানে ছিল সেই জায়গায় দুর্গ দেওয়ালে মহম্মদ আলি আর তার ছোট ভাই মই দিয়ে উঠে বর্শা আর তরবারি নিয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে। বাবা ইসাওয়েল আর একটা মই দিয়ে দেওয়ালের ওপর উঠে একটা কুঠার নিয়ে প্রাচীরের মাথা ভাঙ্গতে সুরু করে। আমাদের দলের অনেকেই সাহস করে দুর্গ দেওয়ালে চড়ে তীরধনুক দিয়ে শত্রুদের এমন বিপর্য্যস্ত করে তোলে যে তারা আর মাথা তুলতে পারে না। আমাদের দলের আরও কতকগুলি লোক শত্রুপক্ষের বাধা দেওয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এবং তাদের তীরধনুকের পরোয়া না করে দুর্গ প্রাচীরে গর্ত্ত করে ওদের প্রতিরোধের স্থানগুলি ভেঙ্গে ফেলতে থাকে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দোস্ত বেগের লোকগুলো উত্তরপূর্ব্ব দিকে কেল্লার যে অংশে তারা গর্ত্ত খুঁড়ছিল সেখানে একটা ভাঙ্গনের সৃষ্টি করলো। এই ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে তারা কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রধান সেনাদলও সেই সময় মই দিয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আল্লার অনুগ্রহে আমরা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই এই সুরক্ষিত দুর্গ দখল করে ফেলি। আমার সকল শ্রেণীর অনুচরই খুব সাহস ও সহনশীলতা দেখিয়ে তারা যে সত্যই বীর এই সুখ্যাতিলাভ করেছে।

বাজুরের অধিবাসীরা শুধু বিদ্রোহী নয় তারা ইসলামধর্ম্মাবলম্বীদেরও বিরোধী। তাদের এই বিদ্রোহ এবং শত্রুতার জন্য তারা দণ্ডভোগের যোগ্য।—এ ছাড়াও, তারা বিধর্ম্মী কাফেরের রীতিনীতি পালন করে' তাদের মধ্য থেকে ইসলাম ধর্ম্মকে একেবারে নির্ম্মূল করে ফেলায় তাদের তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করা হয় এবং তাদের স্ত্রী ও পরিবার পরি-জনকে বন্দী করা হয়। তিন হাজারের ওপর লোককে এই ভাবে হত্যা করা হয়।

বাজুরের বিরুদ্ধে অভিযান এইরকম সন্তোষজনক ভাবে শেষ হওয়ার একটি উঁচু মাটির ঢিপির ওপর নরমুণ্ড সাজিয়ে একটা বিজয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করতে আদেশ দিই।

মহরম মাসের দশ তারিখ বুধবার আমি অশ্বারোহণে বাজুর দুর্গে যাই। সেখানে সুরাপান উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাজুরের কাছাকাছি গ্রাম থেকে কাফেররা চামড়ার পাত্রে মদ নিয়ে এসেছিল। আমি সারারাত এই খানেই কাটাই। পরদিন সকালে দুর্গের বুরুজ, প্রাচীর ইত্যাদি নানাস্থান পরিদর্শন করে অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরে আসি।

বাজুরের ওপরের দিকে একটা পাহাড়ে শিকার করতে যাই। এই পাহাড়ের বুনো মহিষ কালো, কিন্তু তার লেজ অন্য রংয়ের। এই পাহাড়ের তলায় হিন্দুস্থানের দেশগুলোর ষাঁড় ও হরিণ সবই কালো রংয়ের। এই দিনই আমি 'সারিক' পাখী ধরি।—তার শরীরও কালো, চোখও কালো। এই দিন 'বুরকুট' নামে আমার একটা পোষা বাজ একটা হরিণকে ঘায়েল করে।

সৈন্যদের খাদ্য-শস্যের অভাব হওয়ায় আমরা খেরাজ উপত্যকায় গিয়ে সেখানে প্রচুর শস্য আটক করি। তারপর ইউসুফজাই আফ-গানদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য সিওয়াদের দিকে অগ্রসর হই।

পরদিন আমরা অগ্রসর হয়ে চন্দুন ও বাজুর নদীর সংযোগস্থলে শিবির স্থাপন করি। ইউসুফজাইরা কিছু পরিমাণ 'কিমাল' সুরা নিয়ে আসে। এটা খেতে সুস্বাদু কিন্তু একটুতেই ঘোর মাতাল হয়ে যেতে হয়। আমি একটা পাত্র তিন ভাগ করে একটা ভাগ আমি খাই, আর এক একটা ভাগ তাগাই আর আবদাল্লাকে দিই। কিন্তু এটুকু খেয়েই আমি এমন মাতাল হয়ে পড়ি যে যখন বেগরা সন্ধ্যাকালীন নমাজের সময় সমবেত হয়—তখন আমার পক্ষে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সামর্থ্য থাকে না। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে এখন আমি একটা গোটা 'কিমাল' খেলেও কিছুমাত্র নেশা হয় না। সেবার কিন্তু ঐটুকু খেয়েও আমার চূড়ান্ত মত্তাবস্থা ঘটেছিল।

ত্রিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে সাহাবাজ কালেন্দার নামে একজন আল্লায় অবিশ্বাসী অসাধু লোক ইউসুফজাই ও দিলজাক উপজাতির মনে ধর্ম্মে অবিশ্বাসের প্রেরণা জুগিয়ে ছিল। মকাম পাহাড় হঠাৎ শেষ হওয়ার পর একটা ছোট পাহাড় দেখা যায়—সেটা যেন চারিপাশের সমতল ভূমি চোখ মেলে দেখছে। দৃশ্যটা অতি সুন্দর। নীচু জমি থেকে এই পাহাড়টাও মনোরম দেখায়। এই পাহাড়ের ওপর সাহাবাজ কালে-ন্দারের কবর আছে। আমার মনে হলো—এমন সুন্দর, নয়নাভিরাম জায়গায় একজন অবিশ্বাসীর কবর থাকবে—এটা অন্যায়। সেইজন্য আমি আদেশ দিলাম—কবরটা ভেঙ্গে ফেলে মাটির ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হোক। এই জায়গাটা আবহাওয়া ও দৃশ্যের দিক দিয়ে খুব

সুন্দর হওয়ায় আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি এখানে উত্তেজক সুরা পান করি এবং কিছু সময় এখানেই থেকে যাই।

পরদিন ভোরে সিন্ধুনদের দিকের রাস্তা ধরে এগোতে থাকি। এই নদীর তটভূমির নীচ ও ওপরের মাটি কেমন পরীক্ষা করে দেখার জন্য একদল সৈন্য পাঠাই। নদীর দিকে সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে গণ্ডার শিকার করতে বেরিয়ে পড়ি। অনেকগুলো গণ্ডার চোখে পড়লো বটে, কিন্তু দেশটা ঝোপঝাড়ে পূর্ণ বলে তাদের একটারও নাগাল পাওয়া গেল না। একটা স্ত্রী গণ্ডার ছানা-পোনা নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ছুটে পালালো। তাকে লক্ষ্য করে অনেকগুলো তীর ছোঁড়া হলো বটে, কিন্তু কাছেই ঝোপে-ঘেরা জমি থাকায় তার মধ্যে ঢুকে গেল। ঝোপঝাড়ে আগুন লাগালাম কিন্তু কোনও গণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেল না। আর একটা গাণ্ডারের অবশ্য দেখা পাওয়া গেল—সেটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় খোঁড়া হয়ে দৌড়াতে পারছিল না এটাকেই হত্যা করে তার দেহের এক একটা অংশ শিকারের স্মরণ চিহ্নরূপে কেটে নিই। যে দল নদী পথের অবস্থা দেখবার জন্য গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে গণ্ডারের এক একটা অংশ কেটে নেয়।

পরদিন সকালে আটকের কাছে ঘোড়া, উট ও মালপত্র সহ সিন্ধুনদ পার হই। শিবির বাজার ও পদাতিক দল ভেলায় পার হয়। সেই দিনই সেখানকার অধিবাসীরা একটি সুসজ্জিত অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সম্মান জানায়। আমাদের সমস্ত লোকজন পার হয়ে এলে সেদিনই দুপুরের নমাজের পর সৈন্য চালনা করে এগিয়ে যাই। রাতের প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলে জারক নদীর কাছে থামি। তারপর সেই নদী পার হয়ে সেই রাত্রেই সিংদাকি গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করে বিশ্রাম নিই। সৈয়দ কাশিমের ওপর পেছনের সৈন্য দলের ব্যূহ রক্ষা করার ভার ছিল। কয়েকজন গুজরকে অনুসরণ করতে দেখে সে তাদের কয়েকজনের মাথা কেটে ফেলে ও সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসে।

(ক্রমশঃ)

সুরোদ্ভাস

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

বহুদূর হ'তে সুর ভেসে আসে,
আন্‌চান্ করে প্রাণ গো।
কে যেন কাহার পরশ-পিয়াসে
গাহে আনমনা গান গো!
আগল-ভাঙানো সেই পাগলের
কী যে চুম্বক টান গো!

২

ঘরে যা'রা রয়, কানে কানে কয়
ঘর-ছাড়া হ'তে বারবার।
পথে আর ঘরে একাকার করে
সেই প্রেমিকের ঝঙ্কার।
ছাড়ালে না ছাড়ে একবার যা'রে
পায় কোনভাবে টান তা'র।

৩

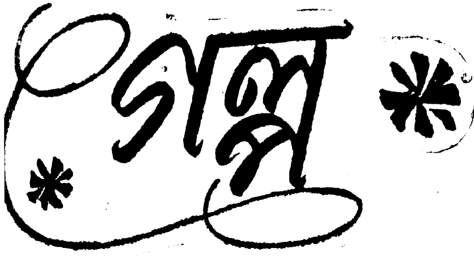
সে চির-প্রেমিক সুর-চুম্বনে
আল্‌গোছে খোলে মন গো;
চুপি চুপি খোঁজে গীতি-নিরালায়
প্রীতি প্রতিদান ক্ষীণ গো
হৃদয় মথিয়া প্রেম-ননী তোলা
সে ননী চোরের পণ গো।

৪

বহুদূর হ'তে ভেসে আসে সুর;—
দূর নয় ওরে দূর নয়;
হৃদয়েরই সুর দূর হ'তে এসে
হৃদয়েরে করে তন্ময়।
সুর-মৃগনাভি মরমে আমার—
লভিনু তাহারই পরিচয়।

৫

সুর-রসিকের লুব্‌ধ তিয়াসা
লুব্‌ধ করিলো হায় রে;
এই দেহ-রূপ সুরের আগুনে
গলিয়া ঝরিয়া যায় রে;
পরম-প্রেমিক সুরে সুরে মোরে
টেনে নিলো তার পায় রে।
সে চির-প্রিয়ের সুর ভেসে আসে;—
কান হোলো মোর কায় রে।



কান্নার প্রার্থনা

সুজিতকুমার নাগ

একটু আগেও বুঝতে পারেননি বাসবীলতা তিনি কি করতে চলেছেন। হঠাৎ মনে এলো, না আর এগোবেন না সমস্যা-সঙ্কুল পথে। কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়ল। সময় চলে যাচ্ছে, একটু পরেই আসবেন বিমলকান্তি, আসবেন ঠিকই। প্রাত্যহিক ঘূর্ণায়মান দিনগুলি চলে যাচ্ছে যেন ছায়াছবির মত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একই পুনরাবৃত্তি। কি করবেন বাসবীলতা? স্পষ্ট করেই কি জানিয়ে দেবেন বিমলকান্তিকে? বলবেন কি তাঁকে, তিনি সুখে থাকতে চান, শান্তিতে থাকতে চান। আবার সেই ভাবনা। আবার সেই সমস্যা। না। যা' হবার হয়ে গেছে। ভেবে আর লাভ কি?

বাসবীলতা বিছানা থেকে উঠলেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন মাত্র। ঘড়ির দিকে তাকালেন, একটা বেজে গেছে। না আর সময় নেই। আসবেন বিমলকান্তি। আসবেন ঠিকই। আয়নার দিকে তাকালেন। শিহরণ খেলে গেলো সর্বাঙ্গে। চোখের কোণে এঁকে দিলেন কাজলের রেখা। কপালে এঁকে দিলেন ছোট একটি টিপ। লাল রঙের শাড়িটি জড়িয়ে নিলেন নিজের দেহেই। আবার তাকালেন আয়নার দিকে। ভাবলেন হৃদয়ের গোপন রহস্যের কথা। আর কি কিছু করবেন এখন? না—আর কি প্রয়োজন বিমলকান্তিকে সব দেখাবার? বয়সটাকে যেন কমিয়ে দিতে চাইছেন বাসবীলতা? নিজের দেহ ও মনকেও। হঠাৎ নজরে এলো সুব্রতর ছবিটি টেবিলের প'র। সরিয়ে দিলেন ছবিটিকে। টেবিলের সমস্ত জিনিষ পরিষ্কার করে রাখলেন। তারপর সাজালেন বিমলকান্তির ছবিটাকে। এ যেন আর এক অভিসারের চরম লগ্ন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেলো এ ঘরের। সেই সঙ্গে মনেরও। সুব্রত? হাসি পেলো বাসবীলতার। সেই সুব্রত? সামান্য একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, আয় যা করে এ বাজারে তাতে চলে নাকি? শিক্ষা, দীক্ষা, সব কিছুরই উপর যার অধিকার নেই কোনকালে সেই সুব্রতই চিরকাল ধরে বাসবীলতার কাছে থাকবে? না, বিমলকান্তিই আসবে বাসবীলতার মনে, হৃদয়ে, বসন্তে! বিমলকান্তি? এবার খুশী হয়ে উঠলেন বাসবীলতা। চমৎকার, উজ্জ্বল-স্বাস্থ্য, প্রচুর অর্থ, সুমার্জিত ব্যবহার। সব কিছুরই মধ্যে চমক লাগিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে বিমলকান্তির। তবুও, বিমলকান্তি আসবেন, চুপি চুপি চোরের মতন। কি করবেন, কি করছেন বাসবীলতা? কিন্তু বিমলকান্তি আসবেন, আসবেন ঠিকই। না, আর ভেবে লাভ নেই। অন্য একটা পরিবেশে যাবার চেষ্টা করলেন বাসবীলতা। আশ্চর্য এই নির্জন দুপুর একটু পরেই মুখর হয়ে উঠবে কথায় গানে। আসবেন বিমলকান্তি। রোজকার মতন বলবেন, 'না বাসবী আজ যাই'। কিন্তু বাসবীলতা জানেন যাবেন না তিনি। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথার মধ্যে বিমলকান্তি নিবিড় হয়ে থাকবেন বাসবীলতার কাছে। হাত দুটি ধরে জানাবেন 'ভালবাসি তোমায়।' তারপর টেনে নেবেন কাছে, আদর করবেন। চরম আত্মদানের জন্যে নিজেকে ঠিক করে নেবেন বাসবীলতা। তারপর ভুলিয়ে দেবেন বিমলকান্তিকে। রঙ্গমঞ্চের নটীর মতন। কিন্তু দেনা-পাওনার প্রতিদানে কি পাবেন বাসবীলতা? এবার খুশীর আবেগে ঝিলমিলিয়ে ওঠে মন। এবার যেন পরিপূর্ণ আনন্দে রোমাঞ্চিতা হয়ে ওঠেন বাসবীলতা। টাকা? যা চাইবেন তাই পাবেন বিমলকান্তির কাছ থেকে।

কিন্তু সুব্রত? বাসবীলতা আর ভাবতে পারলেন না। যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে। এখন ওসব ভেবে লাভ নেই। ভেবে লাভ কি?

বাসবীলতা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঝড়ের মত প্রবেশ করলেন বিমলকান্তি। বাসবীলতার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য! সুন্দর মানিয়েছে আজ। পরিপূর্ণ খুশী হয়ে উঠলেন বিমলকান্তি। সিগার ধরালেন। আর বাসবীলতা? বিমলকান্তিকে মিষ্টি কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়ে উচ্ছ্বসিত কথার আবেগে ভুলিয়ে দেন। হাসেন বিমলকান্তি। এক ঝলক মিষ্টি হাসি। বললে বিমলকান্তি, 'তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম এই মালা।' নিজের সবল হাতে আস্তে আস্তে গলায় পরিয়ে দিলেন মুক্তোর মালা, তারপর বললেন, 'আজ যাই লতা।' কিন্তু বাসবীলতা জানেন, বিমলকান্তি যাবেন না। আদায় করে নেবেন প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে তার দেহকে।

বিমলকান্তি বিকেলের আগেই চলে গেলেন। না আর সময় নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে চলেছে। একটু পরেই অফিস থেকে ফিরবেন সুব্রত। এবার আরেক অভিনয়ে যেতে হবে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। বিমলকান্তির দেওয়া মালা খুলে ফেললেন। হাতের চুড়ি খুলে পরলেন সাদা শাঁখা। কপালের টিপ তুলে এঁকে দিলেন সিঁদুরের ফোঁটা। দামী শাড়ি ছেড়ে পরলেন একটি কালো রঙের সস্তা দামের শাড়ি। বিমলকান্তির ছবিটিকে সরিয়ে দিয়ে সামনে রাখলেন সুব্রতর ছবি। আগের মত ঘরটিকে সাজিয়ে তুললেন। কে বলবে একটু আগেও ছিল আরেক পরিবেশ? আর এখন? কিন্তু কতদিন চলবে এই অভিনয়?

সন্ধ্যের কিছু আগেই ফিরলেন সুব্রত। বাসবীলতার স্বামী। বয়স ত্রিশের উপর। চেহারায়, মনে, আর দেহে অসুস্থতার ছাপ। যখন ফিরলেন সুব্রত, দেখলেন বাসবীলতা বিছানায় শুয়ে আছেন। আশ্চর্য! এই ভর সন্ধ্যেবেলায় শুয়ে? শরীর খারাপ নাকি বাসবীলতার? "লতা তোমার শরীর খারাপ নাকি?"

সস্নেহে বলে উঠলেন সুব্রত। সাড়া নেই কোন। গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন বাসবীলতা।

"এসেছো তুমি? ডাকোনি কেন?"

"ঘুমিয়েছিলে কিনা তাই।"

'ভারী অন্যায় হ'য়ে গেছে' নিজের মনেই বল্লেন বাসবীলতা। সত্যি কি অবিচার করেছেন বাসবীলতা স্বামীর উপর? সেবা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সার্থক করে তুলেছেন কি তাঁর নারী-জীবনকে? কিন্তু কেন এই অভিনয়? কেন বিমলকান্তি আসেন এখানে? টাকা? শুধু কি বাসবীলতার নিজের জন্যেই? না—বলবেন তিনি। সব বলবেন স্বামীকে।

তারপর?

কিন্তু সে রাতে কি ঘুমিয়েছিলেন বাসবীলতা? ঘুমিয়েছিলেন কি সুব্রত? মাঝ-রাতে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করেছেন সুব্রত? এই কি জীবন? এই কি সংগ্রাম? সুব্রতর মনের উপর এলো ধিক্কার। বাসবীলতাকে তিনি সব বলবেন; যে তার চাকরী নেই, আশ্রয় নেই। রোজ দুপুরে বের হন। সন্ধ্যের আগেই ফেরেন—সে শুধু লোক দেখাবার জন্যে। জীবন সংগ্রামে আজ তিনি পরাজিত। না। সব বলবেন। চিন্তার পর চিন্তা। কিন্তু টাকা? কোথায় পাবেন তিনি টাকা?

এবার শিউরে উঠলেন সুব্রত। দেশের বাড়ীটা পর্যন্ত বন্ধক রেখেছেন, মাত্র কয়েকশ টাকার বিনিময়ে। কি দিয়ে ফিরিয়ে নেবেন তাঁর শেষ আশ্রয়। কিন্তু যখন সমস্ত রহস্য ফাঁক হয়ে যাবে তখনও কি বাসবীলতা তাঁকে শ্রদ্ধা করবেন? না, না, তা হতে পারে না। সমস্ত বলবেন বাসবীলতাকে। বাসবীলতার দিকে তাকালেন সুব্রত। বাইরে রহস্যময় অন্ধকার। নির্জন রাত। পাশে রয়েছেন বাসবীলতা। কিন্তু তবু কেন শান্তি নেই জীবনে? একটা হতাশায় মন ভরে ওঠে সুব্রতর। অন্ধকার। সব অন্ধকার।

দিন যায়, রাত আসে। এমনিভাবে চলেছে দিন। বাসবীলতাও ঠিক তেমনি আছেন। সুব্রতও তাই। বিমলকান্তিও। কিন্তু একটু আগেও কি বুঝতে পেরেছিলেন বাসবীলতা তিনি কি করতে চলেছেন? একটি গোপন জীবিকা অর্জনের জন্যে আত্মদান করতে হবে। না। আজই শেষ। কিন্তু যদি ধরা পড়েন সুব্রতর কাছে? তখন? না, আর ভাববার সময় নেই। আসবেন বিমলকান্তি। একটা বেজে গেছে। আয়নার কাছে গেলেন, বেশ পরিবর্তন করলেন। কিন্তু হৃদয়ের আবরণে পোশাকী বাহার ঢাকা রয়েছে সেটাই কি সত্যি নয়? একটু শান্তি, আর সুখের সংসার। কিন্তু কি করলেন তিনি? নিজের

হাতে অর্থের লোভে, নিজেকে বিলিয়ে দিলেন কেন? বিমলকান্তির কাছে কেন ধরা দিলেন? কিন্তু যা হবার নয় তা আর ভেবে লাভ নেই। নিজের জালে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। কোথায় আশ্রয়? কোথায় নীড়? নিজের মনের সংশয় কাটিয়ে বিচিত্র আবেশে যেন জেগে উঠলেন বাসবীলতা। চোখের কোণে এঁকে দিলেন কাজলের রেখা। পড়লেন নীল রঙের শাড়ি। হাতের শাঁখা খুলে পরলেন সোনার চুড়ি, বিমলকান্তির দেওয়া মুক্তোর মালা গলায় দিলেন ঝুলিয়ে।

কিন্তু একটু আগেও কি জানতে পেরেছিলেন বাসবীলতা? কি দেখছেন? একটু আগেও কি বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে? কি হতে চলেছে? কখন যে নিঃশব্দে এসে পড়েছেন সুব্রত, তা মোটেই টের পাননি বাসবীলতা। তিনি তখন ধ্যানমগ্না। আর এক স্বপ্নে। আর এক অনুভূতির গভীরে। একি সত্যি, না স্বপ্ন দেখছেন সুব্রত? এই কি সেই বাসবীলতা, যার পরণে দিতে পারেন নি নতুন কাপড়? গলায় দিতে পারেন নি স্বর্ণহার, অলঙ্কার? এই কি সেই? কি দেখছেন সুব্রত? এ যেন আর এক জীবন। বাসবীলতার নতুন রূপ। আর বাসবীলতা? অপেক্ষা করছেন এতদিনকার গোপন অভিসারের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে। সুব্রত দেখছেন বাসবীলতাকে, বাসবীলতা ভাবছেন সুব্রত কেন এলেন?

ঠিক সেই সময়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলেন বিমলকান্তি। হাতে এক ঝাড় রজনীগন্ধা। চমকে উঠলেন সুব্রতকে দেখে। সিগারটি মাটিতে ফেলে বলে উঠলেন, "আরে, এখানে আপনি? সেই যে আপনার দেশের বাড়ীটি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে গেলেন—আর তো দেখা নেই আপনার।"

কি রকম যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সুব্রতর। বাসবীলতা—না নিজেকে? এই সেই বাসবীলতা যার গলায় ঝুলছে মুক্তোর মালা, হাতে সোনার চুড়ি, কপালে কুমারী ব্রতের টিপ, পরণে নীলাম্বরী শাড়ি, চোখে মুখে গভীর রহস্যময়তা। চরম লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে লাগলেন সুব্রত। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুব্রত!

বিমলকান্তি হঠাৎ রজনীগন্ধার ঝাড়টি বাসবীলতার হাতে দিয়ে বললেন: 'আজ যাই লতা।' কিন্তু বাসবীলতা জানেন বিমলকান্তি যাবেন না।

প্রতিটি অর্থের বিনিময়ে তিনি আদায় করে নেবেন তাঁর দেনা-পাওনা।

সন্ধ্যের কিছু' আগেই চলে গেলেন বিমলকান্তি।

কিন্তু কোথায় সুব্রত?

রাত হয়ে আসছে। সুব্রত ফেরেননি। হঠাৎ এক আশ্চর্য অনুভূতিতে বাসবীলতা শিউরে উঠলেন। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন টাকার বিনিময়ে হারিয়েছেন নারী জীবনের গৌরব, হারাতে চলেছেন সমাজ-সংসার। একি করেছেন তিনি? ক্ষণিকের দুর্বলতায়, অর্থের লালসায় নিজের জীবনকে বিষময় করে তুলেছেন।

বিমলকান্তি কি আসবেন রোজই? শিউরে উঠলেন যেন। যখন দেহের এই যৌবন যাবে সরে, চোখে থাকবে না বিদ্যুৎ, মনে, দেহে আসবেনা হিন্দোল, তখন কি করে থাকবেন তিনি? ভবিষ্যৎ পরিচয় কি অনাগতের কাছে? কিন্তু কেন গেলেন সুব্রত? এই যে অর্থ, এই যে ছলনা, এই যে আত্মদান—সে কি শুধু তার নিজের জন্যে? বাসবীলতা জানতেন সবই, জানতেন তাদের অবস্থা। দিনের পর দিন রুগ্ন স্বামীর কি অমানুষিক পরিশ্রম। শুধু সুখে থাকবে বলেই তো তার এই কষ্ট-সাধনা? অর্থের প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনবেন বলেই বিমলকান্তির সঙ্গে তাঁর অভিনয়!

রাত কটা? দশটা?

কিন্তু সুব্রত কেন চলে গেলেন। আগামী প্রভাত কি তার চোখে আবার নতুন লাগবে? আবার কি প্রাত্যহিক ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের মতন আসবেন বিমলকান্তি? আবার কি দীপ জ্বালার আগেই ঘরে ফিরে আসবেন সুব্রত? নির্জন এই রাত, বাইরে অন্ধকার। কোথায় নীড়? কোথায় আশ্রয়? অনুভব করতে লাগলেন দুটি প্রশস্ত হাতের জন্যে। কেই বা রাতে তাকে ধরে রাখবেন সস্নেহে? বুকের মাঝে কে দেবে এই অন্ধকারে তাকে নিবিড়তর আশ্রয়?

কেন গেলেন সুব্রত? আর ভাবতে পারলেন না। বাইরের দিকে তাকালেন। গভীর রহস্যময় রাতের অন্ধকারে তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন আগামী প্রভাতের ছবি। না আর ভাববেন না। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছেন তিনি? অবশ হয়ে আসছে সারা দেহ। অলস হয়ে আসছে মন।

আর ভাবতে পারছেন না। বাসবীলতার সমস্ত চেতনা-শক্তি যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা ঠাণ্ডা হিমের স্পর্শ যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে নেশার মত।



ভূমিকম্প কেন হয়

উপানন্দ

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ভূকম্পন হয়ে আসছে। পাঁচ হাজার বছর আগে ও যে সব ভূকম্পন হয়েছে তার সম্বন্ধে ও রামায়ণ মহাভারত, পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন যুগের মানুষের ধারণা ছিল ধরিত্রী পাপভারাক্রান্ত হোলে ঈশ্বরের কোপে ভূকম্পন হয়। বাসুকী নাগ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, তার মাথা টল্‌লে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। রামায়ণে কথিত আছে চারটী বৃহৎ হস্তী মাথায় ধারণ করে আছে ভূমণ্ডল। পূর্ব্বে বিরূপাক্ষ, দক্ষিণে মহাপদ্ম, পশ্চিমে সৌমস আর উত্তরে ভদ্র। এদের মধ্যে একটি হস্তীর মাথা নড়্‌লে, পৃথিবী নড়ে ওঠে আর ভূমিকম্প হয়। এই সব পৌরাণিক বিশ্বাস হিন্দু, গ্রীক, খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে সুদৃঢ় ছিল। অপ্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবী কেঁপে ওঠে—আমাদের প্রাচীনেরা বল্‌তেন। নানাপ্রকার কুসংস্কারজনিত ধারণা এসম্পর্কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল।

৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, তার ফলে পম্পাই সহর ধ্বংস হয়ে যায়। প্লিনি এ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তদানীন্তন কালে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভৌতিক শক্তির অসাম্য হেতু ভূমিকম্প ঘটে থাকে এরূপ বিশ্বাস ছিল। এই মতবাদের প্রধান উদ্‌গাতা ছিলেন থেল, এ্যানাক্‌সাগোরাস, এ্যানাক্‌সিমাস, এরিষ্টটল, সেনেকা প্রভৃতি। এঁদের ধারণা ছিল পৃথিবীটা বৃহৎ স্পঞ্জের মত, অসংখ্য বৃহৎগুহায় সমাচ্ছন্ন, এদের ভেতর প্রচণ্ড বায়ু ইতস্ততঃ ধাবিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভূমণ্ডল কেঁপে ওঠে অথবা পুরু বাষ্পের চাপের ফলে পৃথিবী নড়ে উঠে। মাটির ভেতর যে অগ্নি পিণ্ড আছে তাতে অসংখ্য জল পড়ে বাষ্পের উদ্ভব হোলেও পৃথিবী দুলে ওঠে। প্রাচীনদের এই মতবাদের পরিবর্ত্তন হোলো ভূমিকম্প নির্দ্দেশক যন্ত্রের আবিষ্কারের পর। এর দ্বারা বোঝা যায় ভূপৃষ্ঠ সব সময়েই মৃদু মৃদু কাঁপ্‌ছে।

ভূমিকম্পের কতকগুলি কারণ আছে। প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা এ পৃথিবী পরিচালিত। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পর্ব্বতাদির বৃদ্ধি বিস্তার প্রভৃতি হেতু ভূ-ত্বকের মধ্যে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন ঘটে। অগ্ন্যুদ্‌গীরণের সময়ে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, এটীও একটি কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আগ্নেয়গিরি থেকে বহু দূরে অবস্থিত এমন স্থানেও ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। এই সব স্থান, হয় ভঙ্গিল পর্ব্বতের, না হয় সমুদ্রের গভীরতম অঞ্চলগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভঙ্গিল পর্ব্বতাঞ্চলে ভূ-ত্বক সুস্থিত নেই। প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল সুগভীর খাত রয়েছে, তারাও ভূ-ত্বকের ভাঁজজনিত বলে অনুমিত হয়। এজন্যে পণ্ডিতদের ধারণা যে,ভূ ত্বকের যে অংশে শিলাস্তর অস্বাভাবিকরূপে কুঞ্চিত অবস্থায় আছে, সেই সব অংশে ভূ-ত্বকের সর্ব্বদাই চেষ্টা চল্‌ছে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আস্‌বার। এই প্রচেষ্টার নিদর্শন স্বরূপ দেখা যায় ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে কয়টি প্রবল ভূমিকম্প হ'য়ে গেল, তাদের উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের অন্তর্গত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আসামে যে ভীষণ ভূমিকম্প হোলো তার শক্তি দশলক্ষ এ্যাটম বোমার পুঞ্জীভূত শক্তির সমতুল্য। জাপান ও ইটালীর লোকেরা ভয়াবহ অগ্ন্যুদ্গীরণের দৃশ্য দেখেছে, অনুভব করেছে সাংঘাতিক ভূমিকম্প। এদানীং ধারণা হ'য়েছে যে ভূত্বকের ভেতর পাহাড়গুলোর হঠাৎ চাপের ফলে দ্রুত কম্পন সুরু হওয়া থেকে অধিকাংশ ভূমিকম্প ঘটে থাকে। এই চাপে পড়ে ভূত্বকের ফাটল ধরে, আর নানা রকম অদল বদল হয়। এজন্যে ভূকম্পনের গতি সমান্তরালভাবে চল্‌তে থাকে। কোন বাধা পেলেই সাংঘাতিকভাবে কম্পন হোতে থাকে।

যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি, তাকে কেন্দ্র বলে। সাধারণতঃ ভূমিকম্পের কেন্দ্র ৭.৮ মাইল গভীরে অবস্থিত। সময়ে সময়ে একশো মাইলের ও অধিক গভীর হয়। কোয়েটার ভূমিকম্পের উৎপত্তি-কেন্দ্র থেকে অগভীর ছিল বলে অনুমিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমি-তরঙ্গ

সঞ্চালনের অঞ্চল বিশেষ বসে যায়, আর বিদীর্ণ হয়ে ফাটলের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের দরুণ নদীর অববাহিকার পার্শ্বদেশ থেকে ধ্বস নেমে সময়ে সময়ে নদীর প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে সাময়িক হ্রদের সৃষ্টি হোতে দেখা গেছে। কালক্রমে সেই বাঁধ বিদীর্ণ হয়ে জল হঠাৎ প্রবাহিত হোলে বন্যাও দেখা দেয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র সমুদ্রতলে থাকলে, সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের মাঝখানে এই তরঙ্গ জাহাজ ইত্যাদিকে আন্দোলিত করে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি করে না—কিন্তু তটবর্ত্তী অঞ্চলে জলের গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় তরঙ্গ প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হয় আর যথেষ্ট ক্ষতি করে। ভূমিকম্পের সময়ে কেন্দ্রস্থলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তা চারি পাশের শিলাগুলি মারফৎ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চূণের পাথর-প্রধান দেশগুলিতে মাটির ভেতরে যেসব গুহাগহ্বর আছে, সেগুলো ভেঙ্গে পড়লে ভূকম্পন তীব্র হয়, গভীর খনির ভেতর অগ্নিকাণ্ডের ফলেও ভূমিকম্প হয়ে থাকে, মহীশূর অঞ্চলে সোনার খনিতে এরূপ ঘটনা ঘটে ছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আসামে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তাতে ১,৫০০,০০০ বর্গ মাইল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে টোকিওর ভূকম্পনে সহরের ৮৩০০ একর আয়তনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সমুদ্রের উপরিভাগস্থ চলিষ্ণু ঢেউয়ের ভেতর দৃঢ় প্রস্তর খণ্ডগুলির আন্দোলনের ফলে ভূকম্পন হওয়াতে বিরাট জলোচ্ছ্বাস হোতে থাকে। আকারে যাট ফিটের ওপর হয়। ঘণ্টায় গড়পড়তা তিনশো চারশো মাইল বেগে যেতে থাকে। এই সব ঢেউ উপকূলে এলে সাংঘাতিক অবস্থা হয়, বহুধনসম্পদ ও প্রাণীর বিনাশ ঘটে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সামুদ্রিক ভূমিকম্পের দুটী কটিবন্ধ আছে। একটি প্রশান্ত মহাসাগরকে বেষ্টন করে আছে। এই মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশগুলি কম্পনের আবেষ্টনে পড়ে বিপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নিউজিল্যাণ্ড, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, এলিউসিয়ান দ্বীপগুলি, আলাস্কা আর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলগুলি। আর একটি কটিবন্ধ ভূমধ্যসাগর বেষ্টিত করে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি, ইটালী আর সিসিলিকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে আর পশ্চিম-এসিয়া, মধ্য-এসিয়া, উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত এর গতিবেগ অনুভূত হয়, অবশেষে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে প্রথম কটিবন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়। আটলাণ্টিক মহাসাগর, সুমেরু সাগর পশ্চিম ভারত মহাসাগর—পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেষ্টনী আছে যেখানে ভূকম্পনের সক্রিয়তা অনুভূত হয়। পৃথিবীর অন্যান্যভাগে মাঝে মাঝে সাধারণ ভাবে কমবেশী ভূমিকম্প হয়ে থাকে। ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। ১,৮০,০০০ ব্যক্তি এই ভূমিকম্পে মারা যায়। ভারতবর্ষেরও ভূকম্পনের কুখ্যাতি আছে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে প্রায় পঁচিশটী ভূমিকম্প হয়েছে, এর ফলে সত্তর হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়, আর অসংখ্য মূল্যবান পার্থিব বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতবর্ষের ভূকম্পনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় হিমালয় পর্ব্বতের পাদগিরি উপত্যকায় বেশীর ভাগ ধ্বংসাত্মকলীলা ঘটে গেছে। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমির দক্ষিণ অঞ্চল প্রধান প্রধান ভূমিকম্পের কবল থেকে মুক্ত। কেবল একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল মহীশূর রাজ্যে। ভারতবর্ষের উপদ্বীপ অংশটী খুব সুদৃঢ়। ভূত্বকের প্রাচীনতম প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা গঠিত, এই অঞ্চলে বহুকাল থেকে পাহাড় গড়ে ওঠার অবস্থা স্থগিত হয়ে গেছে, আর এরা একভাবেই আছে। সময়ে সময়ে এদিকে খুব সামান্যই ভূকম্পন অনুভূত হয়। উত্তর ভারতে যখন বৃহত্তর ভূকম্পন হয়, তখন এদিকে কিছু কিছু কম্পন অনুভব করা যায়। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণের অধিবাসীরা ভূমিকম্পনের প্রকোপ থেকে মুক্ত। ইতিহাসে যে পাঁচটী সব চেয়ে বড় ভূমিকম্পের পরিচয় পাওয়া যায় তার একটী হচ্ছে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের আসাম ভূমিকম্প। গত একশো বছরের মধ্যে আসাম প্রদেশে বারোটী বড় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আসামের মত বিপজ্জনক এলাকা খুব কমই আছে। যে কোন সময়ে এখানে বেশ বড় রকমের ভূমিকম্প হয়ে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা সুরু হোতে পারে। ভূকম্পন নিবারণ এখনও বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত।

দী ফল্ অফ্ দী হাউস্ অফ্ আশার্

এডগার অ্যালেন পো রচিত

সৌম্য গুপ্ত

(সার-মর্ম্ম)

রুডরিক্ আশার—বিরাট ধনী, বোনেদী-জমিদার… গ্রামের প্রান্তে তাঁর বিশাল প্রাসাদ…চারিদিক পাঁচিলে-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান! বোনেদী-জমিদার হলেও, রুডরিক্ কৃতবিদ্য—চিত্র-শিল্পে এবং গীত-বাদ্যে বিশেষ পটু…রীতিমত সৌখিন মানুষ! তাঁরই অন্তরঙ্গ এক বাল্যবন্ধু এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বন্ধুটি বলেন—

"…বোনেদী আশার-পরিবারের বিরাট প্রাচীন ভবন গ্রামের সীমান্তে নিরালা ধূ-ধূ প্রান্তরে অবস্থিত…কাছা-কাছি কোথাও কোনো জন-মানবের বসতি নেই! সাবেকী আমলের জরাজীর্ণ সাত-মহলা জমিদার-বাড়ীটি যেন ক্রমেই ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে…দূর থেকে বাড়ীখানি দেখলে কেমন অজানা আতঙ্কে গা ছম্‌ছমিয়ে ওঠে! অথচ এমনই নিয়তির লীলা যে এই অভিশপ্ত-ভবনে নিদারুণ

আতঙ্ক-দুশ্চিন্তার মধ্যে ক'দিন কাটিয়ে এখানকার বিভীষিকাময় জীবন-রঙ্গের কত কী মর্ম্মান্তিক ব্যাপারই না আমায় স্বচক্ষে দেখে যেতে হয়েছে…দুঃস্বপ্নের মতো সেই দিনগুলির কথা মনে পড়লে আজো গায়ে রীতিমত কাঁটা দিয়ে ওঠে! যাই হোক, কেন যে এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলুম, সেই কথাই বলি!

…বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন বন্ধু রড্রিকের এক পত্র পেলুম। রড্রিক্ লিখেছেন—

* * *

প্রিয়বরেষু,

আমার দেহ-মন ব্যাধিভারে জর্জ্জরিত—বোধ হয় শীঘ্রই পাগল হবো! তুমি আমার একান্ত বন্ধু—বাল্যকাল থেকে আমার সুখ-দুঃখের সহচর…তাই, এ বিপদে তোমাকে ডাকছি…তুমি এসো বন্ধু—যদি আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারো! দেরী করো না বন্ধু…এ পত্র পাবামাত্র তুমি এখানে আসবে!

ইতি

রড্রিক্ আশার্

* * *

এ পত্র পাবার পর, ক'দিন যাবো কি যাবো না—এ চিন্তায় কাটলো…তারপর একদিন ঘোড়ায় চড়ে আমি রড্রিক্ আশারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করলুম।

সুদীর্ঘ পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দিনের আলো মিলিয়ে যাবার ঠিক আগেই চোখে পড়লো—গ্রামের প্রান্তে ধূধূ প্রান্তরের বুকে লাল-রঙের প্রকাণ্ড প্রাসাদ! নিরালা নির্জ্জন প্রান্তর…জন-মানবের চিহ্ন নেই কোনোখানে… আকাশে একটা পাখী পর্য্যন্ত উড়ছে না…চারিদিকে কেমন একটা থম্‌থমে-ভাব! জরাজীর্ণ সাবেকী আমলের বিরাট বাড়ীখানা দেখে গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো! দূর থেকে মনে হয় না, বাড়ীতে মানুষ আছে বা জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কোথাও! ঘোড়াও যেন চলতে চায় না… কোনো মতে ঠুক্‌ঠুক্ করে গড়খাদের জীর্ণ সাঁকো পার হয়ে ঝোপঝাড় আর আগাছার জঙ্গলে-ভরা বাড়ীর বাগানে প্রবেশ করলুম…তারপর বাড়ীর সদর-দেউড়ীতে! সাবেকী-আমলের জমিদার-বাড়ী…বাড়ী নয় তো, যেন দুর্গ!

সদরে পৌঁছুবামাত্র রড্রিকের এক ভৃত্য এসে সামনে দাঁড়ালো। আমি বললুম—তোমার মনিব বাড়ী আছেন? ভৃত্য বললে—আজ্ঞে, আছেন! তবে তিনি বাড়ী থেকে কখনো কোথাও বেরোন না!

ঘোড়া থেকে নামলুম—ভৃত্য ঘোড়াকে নিয়ে গিয়ে বাগানের প্রান্তে আস্তাবলে রাখলো…তারপর এসে আমাকে বললে—আসুন…মনিব আপনার পথ চেয়ে আছেন।

ভৃত্যের সঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করলুম…সামনেই প্রকাণ্ড হল-ঘর। সে ঘরে সাবেকী-আমলের রাজ্যের জিনিষ—পাথরের বড়-বড় মূর্ত্তি, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, ঢাল-বর্শা-সড়কী, শিকার-করা জন্তু-জানোয়ারের মাথা, সাবেকী-আমলের লোহার-বর্ম্ম-ঢাকা যুদ্ধের সাজ-পোষাক, ছবি…আগাগোড়া এমনি নানা ধরণের বিচিত্র জিনিষ-পত্রে সাজানো বোনেদী জমিদার-বাড়ী! দেখে ভাবলুম, আশ্চর্য্য মানুষ রড্রিক্… সৌখিন সামগ্রী সংগ্রহ এ পরিবারের বংশানুক্রমিক সখ, তারো এ সখ পুরো-রকম বজায় আছে!

খানিক এগুতেই, এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা …তিনি ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন… শুনলুম—তিনি এ-বাড়ীর ডাক্তার।

কার অসুখ…কি অসুখ…এ প্রশ্ন করা হলো না! ডাক্তার ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। তারপর ভৃত্যের সঙ্গে বিরাট সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় উঠতেই রড্রিকের সঙ্গে দেখা! ডাকলুম—রড্রিক!…

রড্রিক্ অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করছিল—ডাক শুনে চম্‌কে আমার পানে তাকালো…মুখে কথা নেই! আমি বললুম, কতকাল পরে দেখা!…

রড্রিক্ বললে—হ্যাঁ, কবে সেই ছেলেবেলায়!… আমার চেহারা খুব বদলে গেছে—না? দেখে তুমি বোধ হয় অবাক হচ্ছো!

আমি বললুম—হ্যাঁ! এমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে উঠেছো যে?…

নিশ্বাস ফেলে রড্রিক্ বললে—কথা কইবো, এমন মানুষ কেউ নেই…দেহ-মনের ব্যাধিতে আমি জর্জ্জরিত। আমাদের বংশে এক অদ্ভুত ব্যাধি আছে…কোনো চিকিৎসাতেই সে ব্যাধি সারবার নয়! সেই বংশগত-

ব্যাধিতে পাছে পাগল হই, এই ভয়ে তোমাকে আসবার জন্ম চিঠি লিখেছি···যদি তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থেকে কথাবার্ত্তা কয়ে আমাকে সুস্থ করতে পারো!

আমি বললুম—একা থাকো···আর্টিষ্ট-মানুষ···মানুষ-জনের দেখা পাও না···কথা কইবার মানুষ নেই বিরাট এই পুরীতে—এতে পাগল হবার কথাই তো!···

মাথা নেড়ে রড্‌রিক্ বললে—উঁহু, তুমি বুঝবে না! এই বাড়ী···জানো, এই বাড়ীই আমাকে পাগল করবে! তুমি জানো না—এ বাড়ী, যা দেখছো—এ হলো অভিশপ্ত জীবন্ত-পুরী···এর প্রাণ আছে! এ বাড়ীর ইট, কাঠ, পাথর, কড়ি-বরগা···তোমার আমার মতো এদেরও চোখ আছে, কান আছে···এরা সব কিছু দেখতে পায়, সব কিছু শুনতে পায়···এরা একজোট হয়ে এখানকার বাতাস এমন বিষিয়ে রেখেছে যে, সে-বিষের ক্রিয়া তুমিও বুঝবে—যদি দু-দিন এই সর্ব্বনাশা পুরীতে বাস করো!···

কথা শুনে বুঝলুম—এত বড় বাড়ীতে এত কাল একা-একা বাস করে রড্‌রিকের মনে অস্বস্তি জেগেছে। রড্‌রিক্‌কে আমি অনেক বোঝালুম···অনেক আশ্বাস দিলুম। রড্‌রিক্ বললে—মরণকে আমি ভয় করি না···বিপদকেও ডরাই না···তবু কি জানি, সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়ে কাটাই!···এই ভয়কেই আমি ভয় করি!···রীতিমত ভয়!···

দুজনে কথা কইছি, হঠাৎ ঘরের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি—ঘরের পাশেই যে বড় দালান, সেই দালান দিয়ে চলে গেল এক নারী···আপাদ-মস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা, শুধু মুখখানি খোলা। ঘরের দিকে সে নারী-মূর্ত্তিটি একবারও তাকালো না···কেমন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো নিঃশব্দে চলে গেল!

দেখলুম, রড্‌রিক্‌ও তাঁকে লক্ষ্য করেছে···আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কে উনি? রড্‌রিক্ একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, তুমিও দেখেছো?···ও আমার বোন মাদেলিন্···ওকে জীবন্ত দেখলে—তবে, এই প্রথম, আর এই শেষ ওকে জীবন্ত দেখা!···দুরারোগ্য নিদ্রারোগে ভুগছে ও বহুদিন—যাকে বলে কাল-নিদ্রা! কত বছর ধরে ভুগছে, তার হিসাব হয় না! এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্ম, ও অহরহ যেন সংগ্রাম করছে···কিন্তু মিথ্যা এ সংগ্রাম!···মাদেলিন চলেছে এখন ওর ঘরে···ঘরে গিয়ে বিছানায় শোবে···মৃত্যু ওর আসন্ন···আমি জানি!···

তারপর ক'দিন ও বাড়ীতে কাটলো···বন্ধুর পাশে পাশেই সারাক্ষণ থাকি···পাঁচ রকম কথায় তাকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করি···সব সময়েই বোঝাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না!···রড্‌রিকের মনের আতঙ্ক আর ঘোচে না! শেষে একদিন বললুম—আমাকে ছবি আঁকতে শেখাবে, রড্‌রিক্? বহুদিন থেকে বাসনা আমার—ছবি আঁকা শিখবো।

প্রস্তাব শুনে রড্‌রিক্ জবাব দিলে—ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি! যে ছবিই আঁকি, সব কেমন ঘোলাটে হয়ে যায়···মনে হয়, কালো ছায়ায় ঢেকে আছে। তাই আজকাল ছেড়ে দিয়েছি—ছবি আঁকা!

আমি বললুম—বেশ তাহলে বেহালা বাজাও···গান গাও—শুনি!

রড্‌রিক বললে, আমার গান-বাজনা শুনবে? কিন্তু কি গাইবো! গানও যেন আমার কণ্ঠে আজকাল কেমন পাগলামিতে ভরে ওঠে! আর বাজনা?···ওসব আর চর্চ্চা করি না বহুদিন!

আমি বললুম—তবু বাজাও···আমি শুনবো! মাঝে-মাঝে সঙ্গীত-চর্চ্চা করলে দেখবে মনে আরাম পাবে!

রড্‌রিক্ বেহালা বাজালো কিন্তু দু'মিনিট মাত্র! গানও গাইলো—গানের একটি কলি মাত্র! তারপর বললে—উঁহু···গান চলবে না! গান মরে গেছে!···

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা···

আমি একা বসে চা খাচ্ছি—ভৃত্য আমার পাশে, হঠাৎ পাগলের মতো রড্‌রিক এসে ঘরে ঢুকলো···দু হাত তুলে বললে—আমার বোন···মাদেলিন্···মরে গিয়েছে!···

আমি চম্‌কে উঠলুম! রড্‌রিক্ বললে—কিন্তু কবরে দেবো না···ওর দেহ আমি দু সপ্তাহ বাড়ীতে রাখবো! ডাক্তাররা দেখুন পরীক্ষা করে—কি রোগ ছিল ওর! যদি এ তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন তো জগতের অশেষ কল্যাণ হবে!···

আমি নিরুত্তরে তার পানে চেয়ে রয়েছি, হঠাৎ রড্‌রিক্ বললে, এ বাড়ীর একতলায় যে পুরোনো দিনের প্রকাণ্ড

ভাঁড়ার ঘর (cellar) আছে—খিলান-করা সুড়ঙ্গ কুঠুরী, সেই সুড়ঙ্গ-কুঠুরীতে ওর দেহ আমি কফিনে বন্ধ করে রাখবো।···

•

তারপর যথারীতি কফিনের বন্দোবস্ত হলো এবং সে কফিনে মাদেলিনের দেহ বন্ধ করে রড্‌রিক্‌ বললে—চলো, দুজনে ধরাধরি করে এ কফিন সেই সুড়ঙ্গ-কুঠুরীতে নিয়ে গিয়ে রাখি

তাই হলো···একতলার দীর্ঘ দালান দিয়ে আমরা দুজনে কফিন বয়ে বাড়ীর নীচেকার ভাঁড়ার-ঘরে এলুম···তারপর ভাঁড়ারে অনেকগুলো খিলান পার হয়ে, সাবেকী-কালের সুড়ঙ্গ-কুঠুরী···সে কুঠুরীতে কফিন নামিয়ে রাখলুম।

আমার কি মনে হলো···বললুম—আমি একবার তোমার বোনের মুখখানি দেখতে চাই !···

একটু ইতস্ততঃ করে রড্‌রিক্‌ বললে—বেশ, আমি কফিনের ডালা খুলছি ! দেখে নাও তার চেহারা !···

এই বলে ইস্ক্রুপের প্যাঁচ ঘুরিয়ে কফিনের ডালা খুললো রড্‌রিক্‌···বাতির অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম—মাদেলিনের মুখ···অবিকল রড্‌রিকের মুখ যেন !···বললুম—তোমার মুখের সঙ্গে বোনের মুখের কোনো তফাৎ নেই দেখছি !

রড্‌রিক্‌ বললে—আমরা যমজ ! · তাই হয় তো এমন মিল ! এই বলেই সে আবার ইস্ক্রুপ এঁটে কফিনের ডালা বন্ধ করে দিলে। তারপর কফিনটি সেই নিরালা অন্ধকার সুড়ঙ্গ কুঠুরীতে রেখে আমরা দুজনে সেখান থেকে চলে এলুম। আমি বললুম—দীর্ঘকাল রোগের যাতনা ভোগ করেছেন···ভগবান এখন ওঁকে শান্তি দিন !···

রড্‌রিক্‌ কোনো জবাব দিলো না···চম্‌কে উঠে শুধু একবার আমার পানে তাকালো !···

এ ঘটনার কদিন পরে, রড্‌রিকের অবস্থা আরো খারাপ হলো !···সে চলে, বসে—যেন ভয়গ্রস্ত বিড়ালের মতো··· সারাক্ষণই আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছে যেন !

তার এই অবস্থা দেখে আমি বললুম—আমি কিছু সাহায্য করতে পারি ?

নিশ্বাস ফেলে রড্‌রিক্‌ বললে—না···কিছু না !···

ক্রমশঃ সে যেন কেমন বিচলিত হয়ে উঠলো ! অনেক সময় মনে হতো, রড্‌রিক্‌ কি যেন আমাকে বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না শুধু ভয়ে !

তাকে ভরসা দিয়ে কতবার বলেছি—কি মনে হচ্ছে, বলো আমাকে···দয়া করে বলো !

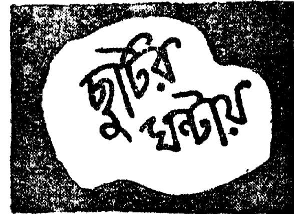
নিশ্বাস ফেলে রড্‌রিক্‌ জবাব দিয়েছে—না, না, কি আর বলবো ! কিছু না !···

এমনি চুপচাপ থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন রড্‌রিক্‌ বললে—মাদেলিনের দেহ যে-কুঠুরীতে রয়েছে, সে কুঠুরীতে মাঝে মাঝে কত রকম শব্দ হয়···আমি স্পষ্ট শুনি !···তুমি শুনতে পাও না ?···

আমি বললুম—না !···

রড্‌রিক্‌ আর কোনো কথা বললে না···একটা শুধু নিশ্বাস ফেললে মাত্র ! ক্রমশঃ

—

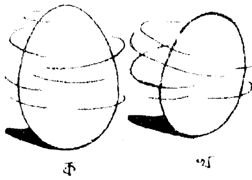


চিত্রগুপ্ত বিরচিত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের একটি মজার খেলার কথা বলবো। এ খেলাটি থেকে শুধু যে নিছক আনন্দলাভ করবে, তাই নয়, এটি থেকে বিজ্ঞানের একটি বিচিত্র তথ্য জানতে পারবে এবং সে জ্ঞান দৈনন্দিন ব্যবহারিক-জীবনেও তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। বিচিত্র এই খেলাটির নাম হলো—"ডিম-চেনার কায়দা" ! এ খেলার জন্য লাগবে দুটি ডিম—একটি সিদ্ধ এবং আরেকটি অ-সিদ্ধ অর্থাৎ কাঁচা ডিম ! এখন শোনো—এ খেলাটি দেখানো যাবে কি করে, সেই কথা বলি।

ডিম-চেনার কায়দা ঃ

লাট্টুকে যেমন লেত্তি দিয়ে জড়িয়ে পাক ঘুরিয়ে দাও—ছুড়ে নয়, ধীরে-ধীরে সন্তর্পণে সমতল মেঝে বা টেবিলের উপর রেখে, ঠিক তেমনিভাবে দুটি ডিম—অর্থাৎ একটি ডিম সিদ্ধ করে ('ক' চিহ্নিত ডিম) এবং অপরটি সিদ্ধ না করে কাঁচা (অ-সিদ্ধ) অবস্থাতেই ('খ' চিহ্নিত ডিম), নিয়ে সাবধানে হাতের আঙুলে ধরে অনেকটা ঐ লাট্টু-ঘোরানোর ভঙ্গীতে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে দাও—



উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, অবিকল তেমনি ধরণে! ডিম দুটি এমনিভাবে লাট্টুর ভঙ্গীতে সমতল-জমির উপর ঘুরিয়ে দিলেই দেখবে—ডিম দুটির মধ্যে যেটি সিদ্ধ, সেটি অনেকক্ষণ ঘুরবে এবং যে ডিমটি কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না-করা (অ-সিদ্ধ), সেটি একটু ঘুরেই কাৎ হয়ে জমিতে পড়ে থেমে যাবে।

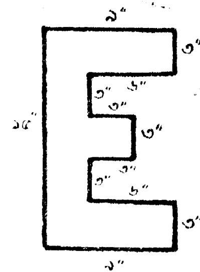
এর কারণ কি জানো? শোনো বলি। সিদ্ধ-ডিমের ভিতরের শাঁস জমাট-কঠিন···কিন্তু সিদ্ধ-না-করা ডিমের ভিতরে আছে তরল-পদার্থ! ঘোরবার সময় দোলা পেয়ে সিদ্ধ-না-করা ডিমের তরল-পদার্থ ঘূর্ণী-ঘর্ষণের ফলে, ডিমের খোলার ভিতরে শক্তভাবে সেঁটে থাকে না, কাজেই ভিতরকার তরল পদার্থটুকু একদিকে না-একদিকে হেলে পড়ে···এবং এভাবে একপাশে হেলে-পড়ার দরুণ ডিমের সেদিকটি অন্যদিকের চেয়ে ভারী হয়···জমিতে হেলে পড়ে থেমে যায়। কিন্তু সিদ্ধ-ডিমের ভিতরকার শাঁস জমাট-কঠিন বলে ঘুরতে থাকে—যতক্ষণ ঘূর্ণীর দম থাকে। এই হলো এ খেলাটির রহস্য।

এবারে এ খেলার কায়দাটুকু রপ্ত করে, একটি সিদ্ধ-ডিম এবং আরেকটি সিদ্ধ-না-করা ডিম নিয়ে পাঁচজন বন্ধুকে ডেকে বলবে—দুটি ডিম ঘুরিয়ে বলে দেবো—কোনটি সিদ্ধ, কোনটি কাঁচা! এই বলেই সমতল টেবিল বা মেঝের উপর ডিম দুটিকে লাট্টুর ভঙ্গীতে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে দাও। বন্ধুরা তো জানে না, এ-খেলার ভিতরকার রহস্য···কাজেই ডিম-ঘোরানোর পর তোমার সঠিক জবাবে তাদের রীতিমত তাক্ লেগে যাবে!

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। অক্ষর-ছাঁটাইয়ের আজব-হেঁয়ালি ঃ



উপরের ছবিতে দেখছো—ইংরাজী অক্ষর "E"। এ বারের আজব-হেঁয়ালিটি হলো—ছবিতে দেখানো ঐ "E" অক্ষরটিকে বুদ্ধি খাটিয়ে এমনভাবে কায়দা করে পাঁচ টুকরোতে কাটতে হবে যে, ছাঁটাই-করা সেই পাঁচটি টুকরোকে আবার একত্রে জোড়া দিলে যেন নিখুঁত একটি চতুষ্কোণ (Square) তৈরী হয়। এ হেঁয়ালির সমাধানের জন্য—একটি কাগজে, উপরের ছবিতে দেখানো মাপের ছাঁদে ইংরাজী "E" অক্ষরটিকে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে বেশ পরিপাটিভাবে এঁকে নাও। উপরের ছবিতে "E" অক্ষরটির প্রত্যেকটি অংশ-রেখার মাপ দেওয়া হলো ইঙ্গিতে—অবিকল ঐ সব মাপ-অনুসারে কাগজের উপর অক্ষরের নক্সাটি আঁকতে হবে আগাগোড়া। তবে মনে রেখো—ছাঁটাই-করা কাগজের পাঁচটি টুকরো একত্রে জোড়া দিলে

নির্মিত চতুষ্কোণ রচনার সময়—প্রত্যেকটি টুকরো মাত্র একবারই ব্যবহার করা চলবে—কোনো অংশই একবারের বেশী ছ'বার কাজে লাগানো যাবে না।

কাগজের বুকে উপরোক্ত মাপ-অনুসারে কলম বা পেন্সিলের রেখা টেনে অক্ষরের ছবিটি এঁকে নেবার পর কাঁচি দিয়ে কেটে সেই "E" অক্ষরটিকে পাঁচ টুকরো করে কাটো। তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে সেই ছাঁটাই-করা কাগজের পাঁচটি টুকরোকে একত্রে জোড়া দিয়ে একটি সমরেখার চতুষ্কোণ (Square) তৈরী করো তা দেখি!

১। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালি ঃ

বুদ্ধির ধাঁধা ঃ

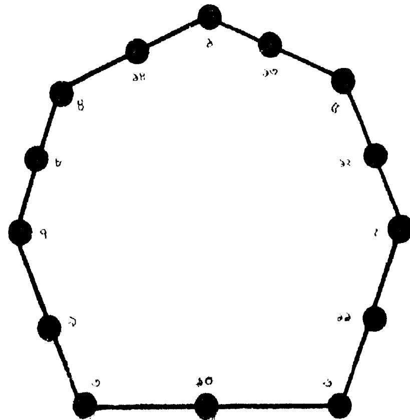
১	ক	ল	ত
২	অ	র	দ
৩	প	য়	ন
৪	ম	ভ	জ
৫	গু	ট	ল

উপরের পনেরোটি খোপে পনেরোটি অক্ষর এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। এই অক্ষরগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে বসাও, যাতে প্রথম লাইনে হয় একটি গাছের নাম, দ্বিতীয় লাইনে হয়-পৃথিবীর একটি প্রসিদ্ধ সহরের নাম, তৃতীয় লাইনে হয়—বিশেষ ধরণের একটি পাখীর নাম, চতুর্থ লাইনে হয়—বাঙলা দেশের একটি নদীর নাম ও পঞ্চম লাইনে হয়—প্রাচীন ভারতের সুবিখ্যাত এক রাজার নাম। এই হলো ধাঁধাটি—এবারে তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করে দেখ দেখি—নামগুলি ঠিক মতো সাজাতে পারো কিনা!

রচনা: কৃষ্ণা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

ফাল্গুন মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালীর উত্তর ঃ

"চাক্তির হেঁয়ালির" উত্তর ঃ



পাশের ছবিতে ১ থেকে পর-পর ১৪ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যাকে কিভাবে ঐ সাত-কোণা পাঁচিল-ঘেরা এলাকার গোলাকার চৌদ্দটি চাক্তির মধ্যে সাজিয়ে বসাতে হবে তার সুস্পষ্ট হদিশ দেওয়া হলো। এক থেকে চৌদ্দটি সংখ্যার প্রত্যেকটিকে আগাগোড়া এমনি ধরণে সাজিয়ে বসালে প্রতি কোণের পাঁচিলে পাশাপাশি তিনটি চাক্তির বিভিন্ন সংখ্যার যোগফল হবে মোট ১৯। এই হলো এ হেঁয়ালির সমাধান। এ ছাড়াও অন্য ধরণে সাজিয়ে এ হেঁয়ালির মীমাংসা করা যায়।

'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত "ধাঁধার" উত্তর ঃ

২। ঘরের দরজার একটা কড়ায় একটা তালা লাগিয়ে বন্ধ করতে হবে। তারপর অন্য তালাটা, দরজার অন্য কড়াতে ও আগের তালার আংটার মধ্যে লাগিয়ে বন্ধ করতে হবে। এমনিভাবে ঘরের দরজা তালা-বন্ধ হয়ে

যাবে। অথচ, যে কোনো তালা খুললেই ঘরের দরজা খোলা চলবে। এবারে যে কোনো বন্ধু তার একটা বাড়তি-চাবি তৃতীয় বন্ধুকে দিয়ে রাখলেই, অনায়াসেই দরজা খোলার সমস্যা মিটে যাবে।

ফাল্গুন মাসের "ধাঁধা আর হেঁয়ালির" উত্তর ঃ

১। যারা প্রথমটির সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৩। বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৪। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
৫। অরবিন্দ, রবি, তমাল, মিহির, বাঁকু (পঞ্চগ্রাম)
৬। জিতেন, অমূল্য, শশাঙ্ক ও পুটু (ফুল্লরা গাঁ)
৭। সুমন্তকুমার বিশ্বাস (কলিকাতা)
৮। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)
৯। বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
১০। রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
১১। হাসি রায় (কলিকাতা)
১২। কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)

২। যারা দ্বিতীয়টির সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। কৃষ্ণা, গীতা ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর)
২। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)
৩। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৪। জিতেন, অমূল্য, শশাঙ্ক ও পুটু (ফুল্লরা গাঁ)
৫। অরবিন্দ, রবি, তমাল, মিহির, বাঁকু (পঞ্চগ্রাম)
৬। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৭। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৮। সুজাতা রায় (কলিকাতা)
৯। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (মোগলসরাই)
১০। বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)

দোল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দোল দিলোরে দোল দিলো।
বেরিয়ে এলো বনে বনে
যেথায় যত ফুল ছিলো।

কিসের এ দোল
জানে কি কেউ!
প্রাণের মাঝে অথই সাগর
উথলে ওঠে তাতেই যে ঢেউ।

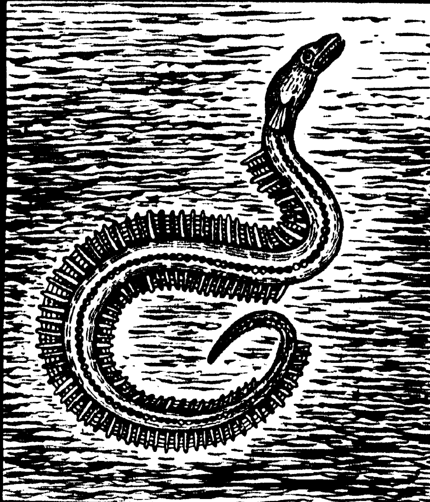
দোল দিলো কি শুধু বনে?
দোলা লাগে সবার মনে।
জানত কে আর সঙ্গোপনে
সেথাও এত রঙ ছিলো।

বাইরে যে রঙ মাখাই মাখি
অন্তরে তা লাগবে না কি?
এই দোলাতে ভোলায় যেন
যেথায় যত ভেদ ছিলো।

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



সর্প-মৎস্য: চেহারা সাপের মতো হলেও, আসলে এরা একজাতের 'ঈল্-মাছ'... ভূমধ্যসাগরে বাস। আকারে প্রায় ফুট ছয়েক দীর্ঘ এবং আয়তনে মানুষের হাতের মতো মোটা। এরা মাংসাশী, নৃশংস-প্রকৃতির... যেমন দুর্দ্দান্ত-হিংস্র, তেমনি লোভী। প্রাচীন রোমে সৌখিন ধনীরা এ সব হিংস্র মাছ মহা-সমাদরে তাঁদের প্রাসাদে, বিলাস-ভবনে বড় চৌবাচ্ছায় বা পুকুরে সযত্নে পুষে রাখতেন। রোম-সম্রাট নীরো নিরীহ মানুষকে এই সব মারাত্মক-মাছের চৌবাচ্ছায় ফেলে দিতেন এবং মাছেরা যখন সেই অসহায় মানুষের দেহ কামড়ে-কামড়ে খেতো, তখন সেই বীভৎস-দৃশ্য দেখে তিনি কৌতুক-উল্লাসে মাতোয়ারা হতেন!



মেদুসি: বিচিত্র এক ধরণের সামুদ্রিক জীব... ব্যাঙের ছাতার মতো চেহারা—থলথলে চর্ব্বির মতো দেহ। শরীর এমনি কোমল যে রৌদ্রের তাপ লাগলে গলে যায়। ছাতার মতো ঢাকনি নীচেই থাকে এদের পাকস্থলী, মুখ আর করাল-গ্রাসী বাহু... মুখটি এদের সারাক্ষণই খোলা—শিকার পেলেই বাহু প্রসারিত করে আঁকড়ে মুখে ফেলে দেয়। ঘন্টার মতো দেহের ছাতা-অংশ ভাসিয়ে এরা অনায়াসে জলের বুকে ভেসে থাকে... তবে ঢেউয়ের চেয়ে শান্ত-জলে থাকা পছন্দ করে



কফার-মাছ: এরাও একজাতের সামুদ্রিক মাছ তবে অন্যান্যদের মতো পাখনার সাহায্যে সাঁতার দিতে পারেনা—নৌকার মতো ভেসে বেড়ায়। চোখের পাশে ও পিঠে বিষাক্ত কাঁটা—মাংসও বিষাক্ত—এ মাছ খেলেই মৃত্যু ঘটে। দেহের কাঁটাও সাংঘাতিক!

টরপেডো-মাছ: এরাও একজাতের বিচিত্র সামুদ্রিক জীব... দেখতে অনেকটা 'শুলওয়ালা 'ডেভিল-মাছের' মতো... বাস ভূমধ্যসাগরে। এদের বিকট দেহের চারিদিকেই রশ্মিজালের মতো চামড়ার পাতলা ঝালর থাকে... দেহটিও আগাগোড়া মৌচাকের মতো একরাশ সরু-সরু নলে ভরা... এ সব নল থেকে এক ধরণের বিচিত্র তরল-পদার্থ বেরোয়। উপরন্তু, এদের দেহে থাকে অদ্ভুত এক রকম বৈদ্যুতিক-প্রবাহ—দেহ স্পর্শ করলেই তীব্র-জোরে লাগে বিচিত্র 'ইলেকট্রিক্-শক্'। এই 'বৈদ্যুতিক-শক্তির' দৌলতে এরা অনায়াসেই জলের এবং স্থলের যে কোনো শিকারকেই নিমেষের মধ্যে কাবু ও নিস্তেজ করে ফেলে উদরসাৎ করতে পারে। সাগর-জলে এবং তট-ভূমিতে সর্ব্বত্রই এদের গতিবিধি। মাছ এদের প্রধান খাদ্য হলেও, অন্যান্য জীবজন্তুর মাংস আস্বাদনেও অরুচি নেই। তাই জলের ও ডাঙ্গার সব জীবই প্রাণভয়ে সর্ব্বদা এই টরপেডো-মাছের সংস্রব এড়িয়ে চলে!



জার্মান রোমান্টিসিজম এবং শিলার

মলয় রায়চৌধুরী এম-এ

ক্লাসিকাল এবং আধুনিকতার তুলনামূলক আলোচনাকালে ফ্রেডারিক শ্লেগেল সর্বপ্রথম রোমান্টিক কবিতার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এককালে যে-আধুনিকতাকে তিনি নিম্নমানের বলে ঘোষণা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাকেই তিনি রোমান্টিক বলে অভিহিত করেন তাঁর মাধুর্যবিষয়ে মতামতের সমানুপাতিক হওয়ায়। যে-কালে শ্লেগেল ক্লাসিসিস্ট ছিলেন, তিনি গ্রীক শিল্পধারা ও কান্ট-এর জ্ঞানতত্ত্ব সমন্বয়ে শ্রীবোধের নবধারণায় প্রযুক্ত ছিলেন। শিল্পের উদ্দেশ্য যেন বাস্তববাদী সৌন্দর্য হয়, সৌন্দর্যশাস্ত্রের নিয়মানুবর্ত হয়, যেগুলি মানব-মনের অত্যাবশ্যক গঠননির্ভর এবং তজ্জন্য সমস্ত কাল ও যুগে অপরিবর্তনীয়। আধুনিক কবিতাকে সে-সময়ে শ্লেগেল মনে করতেন অশ্রেণীগত, একারণ যে তা মানবমনের বিভিন্ন আত্মপ্রয়োজক উদ্দেশ্যকে আকর্ষণ জানাত এবং ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করত, যার ফলে সার্বিক ভাবধারাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হত। জীবনের যাবতীয় পূর্ণতা ও ভিন্নতাকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে তারা ভুলে যেত যে "সমস্ত শিল্পকলারই একটি সীমা থাকে", যে-সীমার জন্যে গ্রীক কবিতা উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল এবং সক্ষম হয়েছিল শ্রীসত্তার দক্ষতা আনয়নে।

প্রাগুক্ত তাবৎ মতামত ঠিক সেই সময়েই শিলার-ও ভাবছিলেন। মতামতে কোনো অনৈক্য ছিলনা। কিন্তু পরে, এই মতামতের জন্যেই শিলার আক্রমণ করেছিলেন শ্লেগেলকে। শ্লেগেল-এর মতোই তিনিও প্রাচীন আর্টের মধ্যে বাস্তবিকতাকে আবিষ্কার করেছিলেন, যার জন্যে প্রথমদিকে তিনি খুবই উৎসাহিত বোধ করতেন। বাস্তব সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও স্বতঃসিদ্ধ ; মানুষের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মবাদের পরিবর্তন হলেও তার কোনো পরিবর্তন হয়না। শুধুমাত্র ব্যক্তির কাছেই তা উপভোগ্য নয়, সকল শ্রেণীর নিকটও তা মনোরম। কান্ট-এর তর্কশাস্ত্রের নির্ভুল বিচার-ধারার মতো শিল্পকলারও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত "প্রয়োজনীয়তা এবং সার্বজনীনতা।" সুতরাং কবি নিজেকে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলবেন—যেগুলি জাতি অথবা প্রজাতির পক্ষে সাধারণ, সার্বিক, এবং সঙ্গত। তা করতে হলে কবির উচিত হবে অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিজেকে নিজের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য হতে দূরে সরিয়ে রাখা। শিলার তাঁর এই ক্লাসিকাল যুগটিতে এতোদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন যে একসময়ে তিনি আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী একটি ঘোষণা করে ফেলেছিলেন : every individual man is the less man, nay so much as he is individual। বস্তুগত কলায় যে-বস্তুটিকে চিত্রায়িত করা হয়ে থাকে সেটি এবং কলাকারের মন যেন সাধারণ হয়, কোনো ক্রমে তাতে যেন মেজাজের বৈশিষ্ট্য না এসে যায়।

১৭৯৫ সনে *Die Horen*-এ প্রকাশিত শিলার-এর রচনা *Briefe uber die asthetische Erziehung des Menschen* পাঠান্তে প্রতীয়মান হয় যে সে-সময়ে শিলার এক পরিবৃত্তিকালে অবস্থান করছেন। তবু, সে-সময়েও তিনি জোর দিয়েছেন বস্তুবাদ ও সার্বজনীন স্বীকৃতির ওপর ; আবেগের স্তিমিত করণকে মনে করেছেন মাধুর্যের নীতি ; সৌন্দর্য উপভোগের প্রচলিত নিরপেক্ষতা-রীতিকে বারংবার আবৃত্তি করেছেন ; অমান্য করছেন দার্শনিক ও নীতিমূলক কবিতাসমূহের মাধুর্য-মূল্যায়ন ; সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং উপলব্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন একই কালে নিয়মের সার্বিক স্বাধীনতা এবং মান্যতা ; শিল্পকে এক-প্রকার ক্রীড়া বলে ঘোষণা করেছেন ; এবং গ্রীকদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে স্বীকার করেছেন। মানব-মনের দুটি আপাতবিরোধী প্রেরণার অন্তর্দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত শ্রীলতার সৃষ্টিকল্পে শিলার তাঁর পূর্বকালীন মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। প্রেরণাদুটির একটি জীবনকে বৃহত্তর প্রতিভায় রূপায়িত করে এবং শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে পৃথিবীর বহুবিধ ক্ষেত্রের সংযোগ স্থাপনে। অপরটি একাগ্রতা এবং স্থায়িত্বের অনুসন্ধান করে ; মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশধারার ওপর সঙ্গতি আরোপ করে ; অপরিবর্তনীয় নিয়মাদি সূচিত করে এবং তা আমাদের সমস্ত প্রকার বিচারের সার্বিক ও প্রয়োজনীয়তার সূত্রবৎ।

প্রথম থেকেই শিলার এই দুটি প্রেরণাকে মনের অপরিবর্তনীয় আঙ্গিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সে-মন তার্কিক বিচারসিদ্ধ সক্রিয় হোক অথবা সৌন্দর্যের সৃষ্টিমূলক কোনো কর্তব্য হোক। কান্ট এর থিয়োরী হতে সাদৃশ্য গ্রহণ করতঃ তিনি পূর্বাহ্নেই এই মতবাদে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে কলাশাস্ত্রের দুটি শেষ প্রান্ত আছে, একদেশদর্শিতায় যেগুলি ভুল। অনেকে রূঢ় পর্যালোচনার ফলে সৌন্দর্যের লোপ হওয়ার ভয় করে থাকেন ; কিন্তু এ-বিষয়ে কখনও বিশ্লেষণ হয়নি যে মাধুর্য্যের সত্তা নিয়মহীনতায় নয়—বরং নিয়মের সামঞ্জস্যে, খেয়ালে নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়তায়। অনেকে আবার সপ্রতিভলীনতাকে একারণ ভয় করে থাকেন যে তা সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতাকে খারাপ করে দিতে পারে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে এই সূক্ষ্মতা মুখ্য বাস্তবতাকে পরিহার করে নয়, বরং তাদের অন্তর্লীন করাতেই স্থিত ! অর্থাৎ সীমার পরিবর্তে অসীমকে স্বীকৃতি প্রদান। মনে হতে পারে যে এ যেন

শ্লেগেল বর্ণিত ক্লাসিসিজম-এর অস্বীকৃতি। কিন্তু শিলার-এর কাছেও ফর্মের নিপুণতাই শিল্পের উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য।

আঠারো শতকের নবম দশকের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে শিলার ও ফ্রেডরিক শ্লেগেল প্রায় একই বিষয়ের অবতারণা করে একই কেন্দ্রাভিমুখী হচ্ছিলেন। যেটুকু মতান্তর তাঁদের মধ্যে ছিল তা অতি সামান্য। তাঁরা দুজনে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরা উভয়ে সৌন্দর্য বিষয়ে যে-মতস্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন তা প্রায়াংশে এক, তাহলে বস্তুবাদের ওপরে তাঁদের দৃঢ়তা এবং তার জন্য তত্ত্বের চেয়ে ফর্মের প্রতি লক্ষ্য বেশী। ফ্রেডরিক শ্লেগেল-এর মনের মধ্যে কিন্তু একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছিল—যা পরবর্তীকালে তাঁকে ক্লাসিকাল হতে রোমাণ্টিকে পরিবর্তনে প্রচুর প্রভাবিত করেছিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি শক্তি থেকে শিলার ও শ্লেগেল দুজনেই তাঁদের ক্লাসিসিজম-এর প্রতি আকর্ষণের দার্শনিক প্রেরণা পেয়েছিলেন। ক্লাসিসিজম-এর সত্যতা প্রতিপাদনকল্পে তাঁরা কাণ্ট-এর জ্ঞানশাস্ত্র হতে কয়েকটি কল্পনা আহরণ করত তাঁদের নিজস্ব সৌন্দর্যবোধে আরোপ করেছিলেন। কিন্তু কাণ্ট-এর প্রভাবের দুটি ভিন্নমুখী প্রকাশধারা ছিল। কাণ্ট-এর দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা যে সৌন্দর্যবোধ প্রতিপাদিত, তা শিল্পকে সার্বজনীনতার বৃত্তে সর্বদা আবদ্ধ রাখতে চায়, যা-কিনা সমস্ত যুগ এবং মানবসমাজের জন্য এক এবং এই সঙ্গতিলাভের জন্যে ব্যক্তিগত, স্থানগত, অথবা ঐতিহাসিক প্রভাবকে অস্বীকার করা প্রয়োজন। কাণ্ট-এর নীতিশাস্ত্রের আরেকটি ভাবধারা কিন্তু অন্যরূপ। সেখানে পরম বা চরম অনুজ্ঞা হল মূলাদর্শ। প্রকৃত অস্তিত্বের পরিবর্তে সেথায় অশেষ প্রগতিশীল আসন্নতাই সমর্থনযোগ্য। কাণ্ট-এর মতে A finite rational being is capable only of an infinite progress from lower to higher stages of moral perfection. কাণ্ট-এর এই আদর্শবাদকে ফিশতে দার্শনিক তত্ত্বে পরিবর্তিত করেন ১৭৯৪ সনের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে এবং তাবৎ সমস্ত অস্তিত্বকে অমেয় ও অতৃপ্ত বলে ঘোষণা করেন। এই অতৃপ্তিই কিন্তু বহির্জগতে তাঁর নিজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যদিও সে-বাধাকে তিনি একসময়ে জয় করতে সমর্থ হন। এমনি করেই দর্শনশাস্ত্রে সসীমকে সরিয়ে অসীম স্থান করে নেয়; সক্রিয়তার আদর্শের স্থানে অর্জিত পরিপূর্ণতা এবং মনের শান্ত শুদ্ধতার স্থানে আকুলতা।

অথচ কাণ্ট-এর নীতিশাস্ত্র থেকে তাঁরা যখন ওই ধরণের কিছু ধারণা গ্রহণ করে নিলেন, তখন তার সঙ্গে শ্লেগেল-এর ক্লাসিসিজম-এর বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কেননা, তৎমতানুসারে মাধুর্যকে যুগে যুগে পরিবর্তনীয় ও আপেক্ষিক রূপে গ্রাহ্য করতে হবে এবং শিল্পের একটি ক্রমবিকাশ-পথ আছে বলে স্বীকার করে নিতে হবে। সেই জন্য প্রথম থেকেই তাঁর রচনাবলীতে আমরা এক অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করে থাকি। ক্লাসিসিজম-এর জন্যে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হয় সেগুলি ক্রমশ দুর্বল তথা অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। এমনকি শ্লেগেল যে-আধুনিকতা ও ক্লাসিকাল-এর তুলনা করতেন—তাতেও গ্রহণ করতেন কাণ্ট-এর আধুনিক দার্শনিক মতবাদসমূহ। তাঁর মতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে দুটি সম্ভাব্যপথে প্রকাশ করা চলতে পারে। হয় তা ঘটনাবলীর ক্রমাবর্তন ও পুনরাবৃত্তিতে অথবা অশেষ ক্রমোন্নয়নে সূচিত হয়। এই কল্পনাধারার প্রথমোক্তটি কাণ্ট-এর তত্ত্বীয় সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। শ্লেগেল মনে করতেন যে একমাত্র এক দ্বারাই ইতিহাসকে 'পূর্ণ সংশ্লেষ' (কাণ্ট-এর *Completed Synthesis*) বলে ঘোষণা করা চলতে পারে। অতএব কাণ্টীয় সিদ্ধান্তমতে একই সময়ে সংস্কৃতির দুটি ভেদের অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ—একটি কৃত্রিম ও অপরটি স্বতস্ফূর্ত। শেষোক্তটি সর্বদা প্রথমে থাকে এবং তাকে অনুসরণ করে প্রথমোক্তটি। প্রাচীন কালের সংস্কৃতি শেষেরটির ওপরেই সংস্থাপিত আধুনিক সংস্কৃতি প্রথমটির ওপরে—ইতিহাসের নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত। গ্রীক, রোমান অথবা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে তারা যেন একই পথে অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে, সে-পথ কেবল এগিয়ে যাওয়ার, কিন্তু জীবনযাত্রার কোনো ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ পরিবর্তন না আসে। তদানীন্তন ঐতিহাসিকেরাও এই মত স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁদের দেশের ইতিহাস যেন সমস্ত মানব সমাজের ইতিহাস। সভ্যতার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করার চেষ্টা এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী হয়েছিল যে প্রতিটি সভ্যতারই ধ্বংস একদিন অবশ্যম্ভাবী। প্রতিটি সমাজই একদিন উৎকৃষ্টতার পরিচায়ক হয়, হওয়ার পর তা আবার বিলীন হয়ে যায় কালের কবলে।

অপরপক্ষে, আধুনিক সভ্যতা ইতিহাস-নির্দেশিত অন্য পথে যাত্রা করে। সেইহেতু তার জীবনযাত্রার সবকিছু, শিল্প-সংস্কৃতি সাহিত্য, যেন কখনই পূর্বানুবৃত্তি না হয় এবং প্রাচীনতার অনুকারক না হয়। এই মতানুযায়ী সমস্ত ব্যক্তির মতো সমস্ত যুগই is an end in itself, and has an inalienable right to be itself। আধুনিক সংস্কৃতি নির্ধারিত হয় বাস্তববাদী কার্যকারণে। শ্লেগেল-এর কথায়: through the satisfaction of the demands of the practical reason, which alone determines the direction of modern culture, the power and perfection of ancient culture gains its highest worth; and if our history must remain ever uncompleted, our goal unattained, our striving unsatisfied, yet is our goal infinitely great। এই কথাগুলো শুনলে যেন ক্লাসিকাল শিল্পের স্বাতন্ত্র্য প্রকট হয়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে এও মনে হয় যে আধুনিক সংস্কৃতি, সৌন্দর্য অথবা মাধুর্যের দিক দিয়ে কোনো অংশে হীন নয়। আধুনিকতাকে এ-মর্যাদা দিলেও প্রাচীনতার গুণগান করতে কখনই ভুলতেন না। "প্রাচীনতার অধ্যয়ন শেষে আমরা মহত্তর শিল্পকলায় পৌঁছাতে পারবো, কেননা, গ্রীকরা বা রোমকরা ছিল উচ্চাদর্শী, তাদের শিল্প ছিল সুন্দর পরিচ্ছন্ন, তারা অভিজাত, এবং তাদের ছিল মানবতাবোধ; এর থেকেই আমরা একালে ফিরে পেতে পারি পরিপূর্ণতা, সঙ্গতি, ভাবসাম্য, জীবনীশক্তি, আধুনিক সংস্কৃতির অমার্জিত শিল্পকলা যাকে এ-পর্যন্ত ক্ষুদ্রায়ত,

অপূর্ণাঙ্গ, বিশৃঙ্খল, বিকৃত, বিভাজিত এবং ধ্বংস করেছে।” “সেকালের প্রখ্যাত গ্রীক ও রোমকগণ যেন অমানব (wil wesen ubermenschlicher Art), যেন তাঁরা সবচেয়ে উচ্চপ্রকৃতির মানুষ।” বোঝা যাচ্ছে যে এই ধারণাটি নিজের সাথেই একটি ভুল ঐক্য স্থাপন করে বসে আছে। কেননা আধুনিক সংস্কৃতির যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ ও আদর্শ থাকে, তাহলে আধুনিক শিল্পীকে প্রচীনতার অনুসরণ করতে বলাটা এক ধরণের অসঙ্গতি।

ঠিক এই প্রকারেরই অসাম্য শ্লেগেল-এর অন্য একটি রচনায় দ্রষ্টব্য। সেখানেও তিনি প্রাচীনকালের কবিদের মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন এবং তাঁদের আদর্শকে অভীষ্ট বলে মনে করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি এ-কথাও বলেছেন যে ক্লাসিকাল শিল্প যেহেতু বিশ্লেষণ ও আত্মআলোচনার পরিবর্তে মুখ্যত প্রবৃত্তিজাত—তাই তা অগ্রসর হতে পারেনা, বরং যেন ক্রমশ বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। অথচ আধুনিক শিল্পের সেই ভুলগুলোই আশার বাণী বহন করে, কারণ সেই ভুলগুলো মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা, অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি ও প্রেরণা হতে উদ্বুদ্ধ। এই আধুনিকতাই যখন এককালে প্রাচীনত্ব পায় এবং তারপর এক অপরিবর্তনীয় পথে স্থিত হয় তখন মানব-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। শ্লেগেল-এর রচনার এই অসঙ্গতি পাঠককে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় রেখে দেয়, পাঠান্তে মনে হতে পারে যে রচয়িতা যেন নিজেই ঠিক করে উঠতে পারেননি কোনটা ভলো আর কোনটা খারাপ। কোনো-কোনো সময়ে মনে হয় যে তিনি যেন দুটিকেই ভালো বলতে চেয়েছেন। আবার কোনো সময়ে মনে হয় যে তিনি দুটির প্রতিই সন্দিহান হয়েছেন, এ কারণে যে দুটিতেই কোনো-না-কোনো বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষণীয়।

শ্লেগেল-এর অন্তর্দ্বন্দ্বের অবতারণা আমরা এই জন্যে করলাম যে তা বহুলাংশে শিলার-এর কল্পনার সঙ্গে মেলে। শ্লেগেলকে প্রভাবিত করাতেও শিলার-এর স্থান কোনো অংশে ম্লান নয়। অবশ্য শ্লেগেল যে ক্রমশ রোমান্টিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার জন্যে তাঁর নিজের রুচি ও প্রকৃতিও দায়ী। মানুষের প্রকৃতি ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ কখনও তাঁকে একটি ক্ষুদ্র ধারণার বৃত্তে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তাঁর প্রাক-রোমান্টিক যুগের একটি আলোচনায় অকস্মাৎ তিনি এ-মত ব্যক্ত করেছিলেন যে সেকালে গ্রীক কবিতায় পুরুষ ও রমণীকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে চিত্রায়িত করা হত একালে তেমন হয়না। অর্থাৎ ‘ব্যক্তিগত’ চিত্রায়নকে খুঁজতে শ্লেগেল বাধ্য হয়েছিলেন। এ-থেকেই বোঝা যায় যে রোমান্টিসিজম সম্বন্ধে কল্পনা সে-সময়েই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাঁর দুটি বৈশিষ্ট্য হতেই এ-কথা প্রকট : প্রথম হল কান্ট-এর নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ—যে-মতানুযায়ী শিল্পকলা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-মুখ, এই অগ্রগতি একটি অতি উচ্চ আদর্শের জন্য। দ্বিতীয়টি হল শেক্সপীয়ারের কবিতার প্রতি আকর্ষণবোধ।

কিন্তু ১৭৯৬ পর্যন্ত শ্লেগেল শেক্সপীয়ারের আকর্ষণকে স্বীকার করেন নি এবং কান্টকে অনুসরণ করার সময়ে এ-কথা ভেবে দেখেননি যে তাঁর মতের মধ্যে একটি অসঙ্গতি আশ্রয় করে নিচ্ছে। অতএব সে-সময়ে একটি বাহ্যশক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যা তাঁর সমস্ত সন্দেহের নিরসন করতে পারত এবং তাঁকে তাঁর পরবর্তী ‘রোমান্টিক’ ধারণায় নিয়ে যেতে সাহায্য করত। এই বাহ্যশক্তি শ্লেগেল যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি হলেন শিলার। অবশ্য শিলার-এর ‘সেন্টিমেন্টালিজম’ থেকে শ্লেগেল তাঁর ‘রোমান্টিসিজম’ আহরণ করলেও, ওদুটি কিয়দংশে ভিন্ন।

শিলার-এর ‘সেন্টিমেন্টালিজম’ বিষয়ে রচনাটি পাঠ করেই শ্লেগেল তাঁর আকর্ষক কবিতা এবং ক্লাসিকাল কবিতার ধারণাকে স্ফটিক-স্বচ্ছতা দিতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, রচনাটি যদি তাঁর পূর্বাহ্নে পাঠ করার সুযোগ ঘটত, তাহলে তাঁর মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি নাও হতে পারত। ১৭৯৫ সনে *Die Horen*-এ প্রকাশিত শিলার-এর রচনা *Uber naive und sentimentalische Dichtung* পাঠ করার জন্যেই শ্লেগেল তাঁর দ্বৈতমতধারার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু শ্লেগেল-এর এই পরিবৃত্তিকাল স্থায়ী হয়েছিল ১৭৯৭ পর্যন্ত, কারণ তার পরেই তিনি ‘রোমান্টিক’ সৌন্দর্যবোধকে আবিষ্কার করেন, আধুনিকতার উৎকর্ষতাকে শিলার-এর মতানুযায়ী গ্রহণ করেন এবং রোমান্টিসিজম্-এর কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যকে ঘোষণা করেন।

শিলার-এর রচনাটিতে এমন কি অত্যদ্ভুত বস্তু ছিল যা শ্লেগেলকে দ্রুত মতপরিবর্তনে বাধ্য করেছিল তা জানা বিশেষ কঠিন নয়। রচনাটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতার বিষয়ে—যে-বিষয়টি নিয়ে প্রায় জীবনের সমস্ত সময়টুকুই আলোচনা-পর্যালোচনায় কাটিয়েছিলেন শ্লেগেল। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ কল্পে শিলার ও শ্লেগেল উভয়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর ঐক্য পূর্বেকার মতো নেই; আগেকার কবির তুলনায় এখনকার কবি সাবজেকটিভ, বস্তু কি প্রভাব ফেলে জানবার চেয়ে বস্তুটিকেই তাঁরা আগে জানতে চান। অথচ প্রাচীন কবিরা আমাদের প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যান, বাস্তবতার সঙ্গে তাঁরা পরিচয় করিয়ে দিতে চান। অপরপক্ষে, আধুনিক কবিরা আমাদের ধারণার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান। শিলার-এর মতবাদে যে-জোর ছিল তা ক্রমে সংক্রামিত হল শ্লেগেল-এর মনেতে। শ্লেগেল স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে আধুনিক শিল্প সংস্কৃতি-সাহিত্য একটি লভ্য উৎকর্ষতার প্রমাণ। আধুনিক কবিতা যে নিম্নমানের নয় তা তিনি স্বীকার করলেন এবং আধুনিক কবির অনুসৃত পথকে সর্বমানবের, ও সর্বজাতির ঔচিত্য বলে জানালেন। এই মতানুযায়ী একথাও প্রমাণিত হল যে সৌন্দর্যের কোনো অবজেকটিভ পরিমাপ বা অনুশীলন থাকতে পারেনা।

এ-কথা মনে করা অবশ্যই ভুল হবে যে শিক্ষার তাবৎ সমস্ত কার্য-কারণ-যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা শ্লেগেলকে ওই পথে যেতে বাধ্য করেছিলেন, তিনি কেবল প্রাচীন ও আধুনিক, অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ এবং রুদ্ধ ও গতিশীলের তুলনার দ্বারা আধুনিকতার উৎকর্ষতা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং জার্মান রোমান্টিসিজম-এর জন্যে

শ্লেগেল-এর দান যতখানি,শিলার-এর তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শিলার-এর সেন্টিমেন্টালিজম ও শ্লেগেল-এর রোমান্টিসিজমকে যেমন এক বর্গীয় বলে প্রতীয়মান হয়, আধুনিকতা যেন শিলার-এর "অনন্তের শিল্প" কথাটির মধ্যে নিহিত,ও পরবর্তীকালে শ্লেগেল জানিয়েছিলেন যে সেন্টিমেন্টাল কথাটিকে তিনি কখনও প্রথাগত ধারণায় ব্যবহার করতে চাননি, তিনি তার মধ্যে "প্রেমের সত্তা" আনবার চেষ্টা করেছেন ; আর প্রেম বলতে তিনি ব্যক্তির প্রতি আবেগজনিত আগ্রহের চেয়েও বেশী কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। শিলার-এর সেন্টিমেন্টালিজম-এর সঙ্গে শ্লেগেল-এর রোমান্টিসিজম-এর একবর্গীয়তা থাকলেও, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদও আছে। কারণ শ্লেগেল-এর রোমান্টিক কবি কখনও কখনও মিলে গেছে শিলার-এর প্রকৃত (naive) কবির সঙ্গে। শিলার-এর উদাহরণ অনুযায়ী 'প্রকৃত' কবি হলেও গ্যোটে, শেক্সপীয়ার, মলিয়ের প্রমুখ হলেন আধুনিক কবি। অথচ শ্লেগেল-এর কাছে শেক্সপীয়ার রোমান্টিক কবিদের মধ্যে মুখ্য। শিলার এবং শ্লেগেল উভয়েই আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বলেছেন তার তত্ত্বের অসীমতাকে, সেখানে একটি আদর্শ থাকলেও তাকে আয়ত্তে আনা দুঃসাধ্য। কিন্তু উভয়ের কাছেই ওই 'অসীম' একই বস্তু নয়। শিলার-এর উদ্দেশ্যকে নীতিশাস্ত্রমূলক বলা যেতে পারে। অর্থাৎ,কবি প্রথমত,তাঁর শিল্পের অনুপ্রেরণা লাভ করবেন কোনো নৈতিক আদর্শ অথবা নৈতিক আবেগ থেকে—যে আদর্শ ও আবেগ বহুমুখী অথবা অতুচ্ছ হওয়ার জন্য পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হবার সম্ভাব্যতা রাখেনা ; দ্বিতীয়ত, শিল্প সামান্য রহস্যাবৃত অথবা পরোক্ষ হবে। কিংবা সম্পূর্ণতার জন্য আকুলতা—যার প্রলোভন কোনো বর্ণনাতীত ও অজ্ঞেয় অভিজ্ঞতায় স্থিত ; অথবা তৃতীয়ত, তার প্রকৃতি সর্বদাই নব নব অনুভূতি এবং আনন্দ লাভের জন্যে উন্মুখ থাকবে এবং তার শিল্পকে তার এই ব্যক্তিত্বের প্রদর্শক করে তুলবে ; অথবা চতুর্থত, ফাউস্ট-এর মতো সে অতৃপ্তিকেই স্বীকৃত আদর্শ বলে মনে করবে—আর এ-আদর্শকে তার শিল্পের কেন্দ্ররূপে প্রকাশ করবে ; কিংবা পঞ্চমত, সে শিল্পকে সর্বদা অগ্রসারী অথচ কখনও সম্পূর্ণতা নেই, এমনই এক অশেষ জীবনাদর্শে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মানুষের আন্তরিক অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে চিত্রায়িত করবে। এই অনন্ত-অশেষ অসীম থেকেই ক্রমবিকাশ হল রোমান্টিসিজম-এর। আর সেই জন্যেই রোমান্টিসিজম-এর অনেকগুলো অর্থ ও প্রকাশভঙ্গী হয়ে পড়েছিল।

শ্লেগেল এই অসীমতাকে আধুনিক শিল্পের উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই অসীমতা কোনোমতে মানব প্রকৃতির অনায়ত্ত নৈতিক সম্পূর্ণতার আদর্শ নয়। তা বাস্তবজীবনের ভালো অথবা খারাপ যা-কিছুই হোক না কেন, কাব্যবস্তুর—অসীমতা। প্রাগুক্ত সম্ভাব্যতার মধ্যে শ্লেগেল গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চমার্থটি। শ্লেগেল-এর মনে বহুকাল ধরেই ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শী এক আকুলতা অসীমের জন্যে সুপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই মিলে গিয়েছিল তাঁর পূর্বকার,আধুনিকতার দোষগুলির সঙ্গে। শিল্পের মধ্যে প্রকৃতির ভিন্নতা ও জটিলতা বহন করছিল শ্লেগেল-বর্ণিত রোমান্টিক আদর্শের অসীমতা।

শিলার-এর সেন্টিমেন্টাল কবির অসীমতার জন্যে আকাঙ্ক্ষা কিন্তু উপরোক্ত পাঁচটির প্রথমটি। এ-আকাঙ্ক্ষা হল নৈতিক আদর্শের পরিপূর্ণতা প্রকাশের জন্যে, কেননা কবির হৃদয়ে যে অতৃপ্তির সঞ্চার হয় তা আদর্শ এবং বাস্তবতার বিরোধের জন্যেই হয়ে থাকে। যে-কবি আধুনিক শিল্পকলার আদর্শকে চিত্রায়িত করবেন তিনি মানুষের বাস্তবিক প্রকৃতির বিষয়ে ততো চিন্তা করবেন না, যদিও কখনো প্রয়োজনবোধে সত্য প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করতে পারেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। কবির পক্ষে উচিত হবে পাঠককে উচ্চে নিয়ে যাওয়া ও তার চিত্তবিনোদনে সাহায্য করা।

শিলার তাঁর কবিদের বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহী দেখেছিলেন। কিন্তু শ্লেগেল-এর রোমান্টিক কবিতা অনেকাংশে ইতিহাস নির্ভর। আত্মজীবনীগুলি তাই তাঁর কাছে *Roman*গুলির মধ্যে অন্যতম। রুসো'র স্বীকৃতিকে সেইজন্য তিনি উচ্চস্তরের *Roman* রূপে অভিহিত করেছেন। তাবৎ সমস্ত রোমানগুলিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি এবং তাদের অন্তস্থ জীবনভঙ্গিমার অনুপাতে প্রত্যক্ষ করা উচিত। শিলার একস্থানে বলেছেন যে there are two ways in which poetry may have an unending content ; in one of these ways, even the natural poet may be said to aim at infinity, when he represents an object with all its limits, when he individualizes it. অর্থাৎ একটি বস্তুর পূর্ণ পরিবেশন কালেও কর্তব্য ঠিকই অনন্ত থেকে যায়, যদি সেই বস্তুর বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু সেন্টিমেন্টাল কবির কর্তব্য কখনও এই ধরণের নয়, কেন না শিল্পের সমস্ত বাধাকে সরিয়ে সে তার আদর্শ রূপায়িত করতে চায়। এই সামান্য মতদ্বৈধতার জন্যে শিলার-এর কাছে সেক্সপীয়ার Natural অর্থাৎ naive কবি। অথচ শ্লেগেল-এর কাছে সেক্সপীয়ার হলেন রোমান্টিক কবি। শিলার এবং শ্লেগেল উভয়েই সেক্সপীয়ারকে প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের-নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা। *Athenaeum* (১৭৯৮)-এর ১১৬ অংশে প্রথমবারের মতো শ্লেগেল রোমান্টিক কবিতার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং তাকে *Progressive Poesie* রূপে ঘোষণা করেছিলেন। রোমান্টিক কবিতা কেবল উন্মেষিত হয়েই চলেছে, তার বিরাম নেই। এই উন্মেষিত হওয়াটা অনেকাংশে শিলার-এর সেন্টিমেন্টাল কবিতার সমপর্যায়ে পড়ে। কিন্তু রোমান্টিক কবিতা সার্বিক—এই অর্থে যে তাবৎ তত্ত্ব তার মধ্যে স্থান পায়। কবিতায় যা-কিছু দেওয়া যেতে পারে এবং যা কিছু কাব্যিক, তাই পড়ে এর আওতায়। সেইজন্যই সমগ্র পৃথিবীটি যেমতেতুচিত্রবৎ অর্পিত হয় এর মধ্যে। যেহেতু কবিকে স্বাধীনতা দেওয়া একান্তই প্রয়োজন, সেইহেতু কবিতায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত—কেন না স্বাতন্ত্র্য না থাকলে মৌলিক সৃষ্টি সম্ভবপর নয়।

এমনি করেই জার্মান রোমান্টিসিজম-এর আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমে, পরবর্তীকালে, তা আরও সূক্ষ্ম ও পরিবর্ধিত হয়েছিল। শিলার-এর সেন্টিমেন্টাল কবিতা হতে রোমান্টিসিজম-এর সূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর জন্যেই শ্লেগেল রোমান্টিসিজম-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং সে-হিসেবে শিলার-এর দান অল্প নয়। আজকের রোমান্টিসিজম আরও গভীর, আরও ব্যাপ্ত। কিন্তু তবু, শ্লেগেল এবং শিলার-এর কাছে তা ঋণী। এ ঋণ আবহমানকাল থাকবে—শুধু জার্মানীতে নয়, থাকবে পৃথিবীর সমস্ত শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির কাছে।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

পূর্বপ্রকাশিতের পর

রাস্তায় লোকের ভিড়। এত লোক, এত যাওয়া আসা, এত কথা, এত হাসি। তবু নিজেকে একলা মনে হচ্ছে। কষ্ট একটি তীক্ষ্ণ শরের মতো সন্তবিদ্ধ যন্ত্রণায় প্রতিটি পদক্ষেপে খোঁচাতে লাগল। সময় যত পার হল, ততই কষ্ট বাড়ল। কে আছে? কার কাছে যাবে অভয়? রাস্তায় এত মুখ। অনেক চেনা মুখ ভেসে ভেসে উঠছে তার মধ্যে। চোখের বাইরেও আরো অনেক চেনা মুখ ভেসে উঠছে। চোখের বাইরে—সামনে, এই সব চেনা মুখেরা সকলেই ভাল। কেউ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে না। বন্ধুত্ব এবং স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে, দূর করে দেবে না। যতটুকু হাসি তাদের আছে, কার্পণ্য করবে না সেটুকু দিতে। সবাই আহ্বান করবে। তার কথা শুনবে। সমবেদনা প্রকাশ করবে।

কিন্তু অভয়ের মন সায় দেয় না। সাড়া দেয় না। এই কি তবে পাপ? যারা তার সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ দ্বারমুক্ত আলোয় প্রকাশিত, তাদের সে তার বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? সকলের কাছে কি তার যাবার কথা নয়? সবাই কি তার মনের কথা শোনার বন্ধু নয়? এই সব মুখেরা, সেই সব মুখেরা? আকাশের অজস্র তারার মধ্যে যারা চেনা তারার মতো?

মন সায় দেয় না। সংসারে কতগুলি সীমারেখা টানা আছে। ইচ্ছে করলেই তাকে ভেদ করা যায় না। অভয়ের দরজা বন্ধ—ভিতরটা খা-খা করছে। তার বাইরে যারা উঠোন জুড়ে বসে আছে, তাদের সে নিজে বসিয়ে রাখে নি। ওই সীমারেখাটা তারা নিজেরা টেনেছে। তারা নিজেরা ওখানে বসেছে। কবাট লাগানো ভিতর দুয়ার তাদের চোখে পড়ে না। সেই দুয়ার ভেঙে তারা ভিতরে আসে না। সেটা তাদের দোষ নয়। উঠোন জুড়ে বসেছে, সেই তাদের মহত্ত্ব।

আর সেই বন্ধ দুয়ার—ভিতরটা খা-খা করছে। যেখানে অভয়ের লাজ লজ্জা নেই, মান-সম্ভ্রম নেই, কোনো দায়-দায়িত্বের চিন্তা নেই—সেখানে সে উলঙ্গ, মহার্ঘ বেশে আবৃত। সেখানে সে শিশু, সেখানে সে বৃদ্ধ। তার পাপ এবং পুণ্য সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করে, বোঝে এবং লড়ে। তার সেই বন্ধ-দরজা-ভিতরটা নিঃসঙ্গ। সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করে, এমন নিমিত্তের ভাগীদার কে আছে? সেই বন্ধু কে আছে, সেই সঙ্গী কে আছে, যাকে সে বলতে চায় তার কথা?

কেউ নেই। এই মুখেরা নয়, সেই মুখেরা নয়। কেউ নেই। একাকীত্বের চিন্তা যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিল। সংসারে সব থাকতে এত অভাব!

ক্রমে ভিড় সরে গেল। আলো দূরে চলে গেল। আবার সেই নির্জনতাই টাবুটুবু হয়ে উঠতে লাগল তাকে ঘিরে। পাশের বড় বড় বাড়িগুলি ঘনিয়ে রেখেছে অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলি নিষ্প্রভ।

একটি বাড়ি অভয়ের পরিচিত। সে দাঁড়াল। বড় বারান্দাওয়ালা এ বাড়ির দরজায় সে ইচ্ছে করেই এল কিনা, নিজেও সহসা ভেবে উঠতে পারল না। কিন্তু বারান্দায় উঠল সে স্বাভাবিক ভাবে। যেন এই তার গন্তব্য। ভিতরে আলো দেখা যায় জানালা দিয়ে। মানুষ দেখা যায় না। আস্তে দরজার কড়া নাড়ল অভয়।

ভিতর থেকে সাড়া এল—কে ?

—আমি। আমি অভয়।

—এস এস। দরজাটা জোরে ঠেলে দাও, খুলে [যা]বে।

দরজা জোরে ঠেলল অভয়। জীবন চৌধুরী বসেছিলেন [ই]জি-চেয়ারে। সামনের টেবিলে নমিত বাতিদান। আলোর [বৃ]ত্ত ছোট হয়ে পড়েছে টেবিলের ওপরে। বাকী অংশে [অ]স্পষ্ট প্রদোষ ছায়ায় ভরা। জীবন চৌধুরী যেন [হাঁ]পাচ্ছিলেন। থেমে থেমে বললেন, এস, আজই তোমার [কা]ছে যাব ভাবছিলুম। শরীরটা তা হতে দিলে না। এস, [কা]ছে এসে এই চেয়ারে বস।

চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে প্রথম যেদিন এসেছিল, সে-[দি]নই মাটিতে বসতে যাচ্ছিল অভয়। উনি তা দেননি। [চে]য়ারে বসল অভয়।

জীবন চৌধুরী বললেন, তুমি কোনো চিঠি পেয়েছ [ক]লকাতা থেকে ? লোক-শিল্প-সম্মেলনের চিঠি ?

এই কথাই বলতে এসেছিল অভয়। চৌধুরী মশায়ের [অভি]মত জানতে চাইছিল সে। বলল, পেয়েছি। সেই [জন্যে]ই আপনার কাছে এলুম।

—বেশ করেছ। নইলে আমাকেই যেতে হত। [অ]নেক দিন এদের সঙ্গে ছিলুম, তাই এখনো নতুন কমিটি [প]রামর্শ চায়। আমি তোমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। আমার কাছেও চিঠি এসেছে, তোমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে সব বুঝিয়ে দিই। বুঝিয়ে দেবার কিছু নেই। তোমার [চি]ঠিতে তারিখ দেওয়া আছে। তোমাকে তাঁরা আমন্ত্রণ করেছেন। তুমি তারিখের দিন গান গেয়ে আসবে। [ঢো]লক আর কাঁসী বাজাবার লোক তুমি ব্যবস্থা করবে। খরচ সব তাঁরাই দেবেন। গায়েন বায়েনের আলাদা আলাদা মজুরিও পাবে। সেসব দিক থেকে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

জীবন চৌধুরী হাঁপাতে হাঁপাতে এতগুলি কথা বললেন। মাথা পেতে দিলেন ইজি-চেয়ারে। মোটা লেন্সের মধ্যে [তাঁ]র চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড় দেখায়। চোখ মেলে অভয়ের দিকে তাকালেন তিনি।

অভয় বুঝল, কলকাতার আহ্বান কার মারফৎ [এ]সেছে। সে বলল, এনারা কারা ?

চৌধুরীমশায় অবাক হলেন। বললেন, এঁদের তুমি চিনবে না অভয়।

—এঁরা বুঝি কলকাতার সব বড় বড় লোক ?

অভয়ের গলায় যেন একটি প্রাক্-সিদ্ধান্তের প্রত্যয় ফুটল।

চৌধুরী দাঁতহীন চোপসানো ঠোঁটে হাসলেন। একটু হাঁপিয়ে নিয়ে বললেন, বড় বড় লোক কিনা, জানিনে। এই আমার মত লোকেরাই আছেন। আমরা কি বড়-লোক অভয় ?

অভয় বলল, না, আমি টাকা পয়সাওয়ালা ধনী লোকেদের কথা বলছি। শুধু তাদের সখ মেটাতে আমার যেতে ইচ্ছা নাই চৌধুরীমশায়। আমার গান কেন মিছি-মিছি ওঁরা শুনবেন ?

জীবন চৌধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অভয়ের মনে হল, তাঁর গলার শিরগুলি ধরে যেন কেউ টানাটানি করছে। চোখ বুজে রয়েছেন। বললেন, এসব কথা তোমাকে কে বুঝিয়েছে অভয় ? গণেশ ?

অভয় মিথ্যে করে বলল, আঁজ্ঞে না।

—তুমি নিজে বুঝেছ ? তবে তো বড় ভুল বুঝেছ অভয়। বাংলা দেশে ক'জন ধনী লোক আছে হে ? তাদের তো হাতে গোণা যায়। সেখানে গান শুনবে কল-কাতা মফঃস্বলের হাজার হাজার লোক। সেখানে ধনী-দরিদ্রের বিচার কেন ? তুমি তোমার মত গান করবে। কারুর মুখ চেয়ে নয়। যার ভাল লাগবে শুনবে, যার লাগবে না সে আসর ছেড়ে চলে যাবে। বাকী বিচারের ভার তুমি কেন নিচ্ছ ?

প্রতিবাদের কথা খুঁজে পেল না অভয়। মাথা নীচু করে বসে রইল। জীবনচৌধুরী চোখ বন্ধ করতে পারছেন না। শ্বাসরুদ্ধ কষ্টে চোখ বুজতে চায় না। হাতের বই বুকে চেপে ধরে বললেন, আত্ম-সম্মানবোধ থাকা ভাল বাবা। কিন্তু মিথ্যে সম্মানের অহঙ্কার ভাল নয়।

অহঙ্কার ? অভয় বলল, আমার কোনো অহঙ্কার নাই চৌধুরীমশাই ?

—জানি। অপারগের অহঙ্কার থাকে। অক্ষমের থাকে। তুমি এর কোনোটাই নও। তোমার কেন মিথ্যে অহঙ্কার থাকবে ? বাংলা দেশের লোক সমাদর করে

তোমার গান শুনতে চেয়েছেন। তুমি তোমার ইচ্ছায় গাইবে। পরের ইচ্ছার দাস হয়ে যখন গাইবে, তখন তোমার সম্মান যাবে। এখানে তো তা নয়। আর, তুমি একলা নয়। বাংলাদেশের আরো অনেক কবিয়াল আসবেন, সকলেই গাইবেন। কয়েকজনের সখ মেটাবার কথা এখানে আসে না।

জীবনচৌধুরীর গলায় ঈষৎ ক্ষোভ ছিল। অসুস্থতার দরুণই হয় তো একটি অসহায় ব্যথার আভাস ছিল। অভয় বলল, আমার ভুল হয়েছে চৌধুরীমশায়।

জীবনচৌধুরী তবু বললেন, তুমিই তো গান বেঁধেছ, 'আমি এ জীবনের কূল পাই না।' জীবন তো ছোট নয়। তোমার আশে-পাশে মিত্রবন্ধু যারা আছে, তারা ছাড়াও সংসার ব্যাপক। আবদ্ধ থেক না। আমি থেকেছি, তাই আমার মুক্তি হল না। এই দেখ, আজ একলা ঘরে অন্ধকারে চুপটি করে বসে আছি। আমার নিজের কাছেও কোনো সান্ত্বনা নেই। যা আমার করার কথা ছিল না, তাই করেছি জীবনভর। লোক-প্রিয় হয়েছি, কিন্তু সব দল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। মনের বিশ্বাস্ অনেক-দিন গেছে। এখন শরীরে শক্তি নেই। গোটা জীবনটা শূন্য মনে হচ্ছে। এখন আমার দৃষ্টি ছোট হয়ে আসছে। তার মানে মরণ ঘনিয়ে আসছে। শেষ দিনের ছায়াটা এগিয়ে আসছে।

নিজের বুকে কষ্ট থাকলে, অপরের কষ্ট বুকে এসে সহজে বাজে। শহরের সকলের শ্রদ্ধেয় জীবনচৌধুরীকে এত একলা, এত অসহায় কখনো মনে হয়নি অভয়ের। তাঁর কথাগুলি যেন কান্নার মতো শোনাচ্ছে। তার নিজের বন্ধ-দরজার ভিতরের শূন্যতা আরো বিশাল হয়ে উঠছে। সে ডাক দিয়ে উঠল, চৌধুরীমশায়!

—অভয়!

চৌধুরীমশায় সাড়া দিয়ে বললেন, আমার উচিৎ ছিল তোমার মত গান বাঁধা। নয় তো বই লেখা। যাকে বলে সৃষ্টি। সেখানে আমি মুক্তি পেতুম, স্বাধীনতা পেতুম। সত্য আমার পক্ষে থাকতো। রাজনীতি করতে গিয়ে কোনোটাই পাইনি। না পেরেছি পরের জন্য কিছু করতে —না নিজের জন্য।

জীবন চৌধুরীর বুক কাঁপিয়ে কাশি উথ্‌লে উঠল। তাঁর কষ্ট বেড়ে উঠল। অভয় নিজেকে দায়ী মনে করল এর জন্যে। কিন্তু আজ অভয়কে বলতে গিয়ে তিনি নিজের কথা বলছেন।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁপালেন চৌধুরী। বাড়ির ভিতর দিকের দরজা বন্ধ। ছোটখাটো বাড়ি নয়। মস্তবড় সেকালের মহলওয়ালা বাড়ি। কে কোথায় আছে, কিছু সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। অভয় উঠে ইজিচেয়ারের পাশে গিয়ে বলল, আপনার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেব?

জীবন চৌধুরী দ্রুত মাথা নাড়লেন। না না না, হাত বোলাতে হবে না অভয়। তুমি বস। আমার কষ্ট কদিন ধরেই বেড়েছে। এ সহজে যাবার নয়। এ সবই সময়ের কারসাজি হে। সে জানান দিচ্ছে। সময় একদিন সকলেরই আসে। সে একদিন সবাইকেই টেনে নেয়। নিজের গোটা জীবনটার জন্য যদি এখন আফ্‌সে মরতে হয়, তার চেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই। এই দেখ, গীতাখানি নিয়ে বসেছিলুম। আজ মনে মনে নিজের কথাই ভাবছিলুম খালি। তাই গীতাখানি নিয়ে বসেছিলুম। এখন রাজ-নীতিকদের কাছে এটা পুরণো হয়ে গেছে। আমি তো পুরণো লোক। আমার কাছে যায়নি। তামসিকতার সঙ্গে সংগ্রামের কথা আর এমন করে কোথায় বলা হয়েছে? শরীরে কষ্ট হচ্ছে, তাকে সহ্য করা যায়। কিন্তু মনের কষ্ট আরো বেশী যন্ত্রণাকর। তাই পড়ছিলুম। এমন সময়ে তুমি এলে। ভাল করেছ এসে। তোমার কথা শুনলে আমার নিজের কথা মনে হয়। আমি তোমাকে উপদেশ দিই নে। আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। আবার বলি অভয়—দলের চেয়ে দেশ বড়। তুমি যাকে ধনী বল, আমি তাকে পাপী বলি। আমার কাছে ধনীদরিদ্রের প্রশ্ন নেই। আমার কাছে পাপপুণ্যের প্রশ্ন। তোমার বিশ্বাস যদি অটুট থাকে, সত্য যদি তোমার সঙ্গে থাকে, তুমি ভয় করবে কাকে? আর শিল্পীরাই হল সবচেয়ে স্বাধীন। সে জীবনের নির্দেশ মেনে চলে। তুমি জীবনের নির্দেশ মেনে চল, এইটুকু আমি বলি। তখন দেখবে, মিথ্যে ভেদাভেদ ঘুচেছে। আর অন্যায় পাপ তোমাকে শত্রুর চোখে দেখছে।

চুপ করলেন চৌধুরী। হাঁপাতে লাগলেন তেমনি। তবু যেন শান্ত অচঞ্চল বিকারহীন স্থৈর্য লাভের চেষ্টা

করছেন। নিঃশব্দ ঘরে শুধু তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে দোল-ঘড়িটা তাল দিয়ে চলেছে। অভয়ও চুপ করে বসে রইল। চৌধুরীমশায়ের এতগুলি কথার মধ্যে শেষ কথাটিতে এসে তার মন ঠেকে রইল। জীবনের নির্দেশ কী? সে কোথা থেকে আসে? কেমন করে তার নির্দেশ বোঝা যায়। লোকশিল্পী সম্মেলনে যাওয়াটা এখন বাধাহীন মনে হচ্ছে। কিন্তু কিসের নির্দেশে সে অনাথকে অপমান করে এসেছে? তার বুকে তীক্ষ্ণ শর-বিদ্ধ কষ্টটা জীবনের কোন্ নির্দেশে দূর হবে? সেই কষ্ট তো দূর হচ্ছে না। প্রসন্নতা কোথায়? বিষণ্ণতার অন্ধকার যে তাকে ঢেকে রাখছে। তার সারাদিনের সব কাজের মধ্যেও, ছায়ার মত একটি বাঁধা-ধরা বিষণ্ণতা পায়ে পায়ে ফেরে। দোকানে, গানের আসরে, ইউনিয়নের নানান কলরবের মধ্যে সে যতই চাপা থাকুক, রাত্রের আকাশে তারার মতো সে ফুটে ওঠে। তার বন্ধ-দরজা ভিতরের শূন্যতা ঘোচে না। চৌধুরীমশায়ের কাছে এলে, জীবনের কতগুলি লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখানে সে শ্রোতা, উপকৃত। কিন্তু তার নিজের কথা সে কাকে বলবে? কথার চেয়ে, নীরবতাই যেখানে অজস্র বাণীর বাহন, সেই শব্দহীন জোয়ারে সে ডুব দেবে কাকে নিয়ে? সেই বন্ধু কোথায়, যে তার অব্যক্তকে ব্যক্ত করে দেবে সাহচর্য দিয়ে?

জীবন চৌধুরীকে অভয় শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। অনাথকে ভালবাসে। একমাত্র অনাথখুড়োর কাছ থেকেই হয় তো জীবনের সেই নির্দেশ সে পেত। একমাত্র অনাথ তার নিজের ভিতর-বাহির একাকার করে প্রকাশ করেছে অভয়ের কাছে। কিন্তু সেই মুক্ত মন থেকে অনাথ বিচ্যুত।

অতএব শূন্যতা থাকবে। নিজের সঙ্গে নিজের বোঝা-পড়া নিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। একাকীত্বের এই কষ্টের সঙ্গে তাকে একলাই লড়তে হবে।

অভয় বলল, আমি তা হলে এখন যাই।

কী ভাবছিলেন জীবন চৌধুরী। সুপ্তোত্থিতের মত ধড়বড়ে গলায় বললেন, অ্যাঁ? হ্যাঁ, এস। কাগজটা তুমি সই করে দিয়ে যেও, আমি পাঠিয়ে দেব।

—আচ্ছা।

—আর যা তোমার ইচ্ছে, যা প্রাণ চায়, সেই গান ভাব। মনপ্রাণ দিয়ে যা গাইবে, তাই লোকের ভাল লাগবে।

অভয় চুপ করে শুনল। তারপর বেরিয়ে এল। মনে মনে বলল, 'মন প্রাণ যা চেয়েছে, কে কবে তাকে গানে বাঁধতে পেরেছে?' গোটা জীবনটা কী আশ্চর্য অমিলের সংমিশ্রণ। এত অমিলকে এক সূত্রে বাঁধা যায় না।

অন্ধকার নিঝুমতা পেরিয়ে শহরের কেন্দ্রে ফিরে এল অভয়। বাড়ির পথ ধরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রাস্তায়। ইচ্ছে করল না। সেখানে ভামিনী ছেলে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। গিন্নি রান্না করছে। দোকানে বসেছে সুধীনের জটলা। সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। তবু পা' দুটি চলতে আরম্ভ করল। যেন অভয় জানল না। খেয়াল করল না। মনে মনে সে তখনো যেন আশ্রয় সন্ধান করছে।

তারপর কখন সেই বড় বড় বাড়িগুলির ছায়ায় ছায়ায়, গলির মধ্যে বাঁক নিল অভয়, নিজেও জানতে পারল না। যেন চেনা, তবু এক অচেনা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে সে। কারা কানাকানি করছে। ফিস্‌ফাস শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার রহস্য দোলায় দুলছে।

মেয়েরা সরে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে বুকের মধ্যে ভয় ও যন্ত্রণার একটি যুগপৎ কাঁপুনিতে তাকে অবশ করে দিল। এ কিসের নির্দেশ? কোন্ নির্দেশ? কার নির্দেশে সে সুবালার বন্ধ দরজার দিকে চোখ তুলে তাকাল? এ কোথায় এসে উঠেছে সে?

অভয় দ্রুত ফিরতে গেল। একটা তীব্র কান্নার শব্দে আবার থমকে দাঁড়াল সে। যেন কোনো মেয়েকে কেউ মারছে গলা টিপে। সে আর্তনাদ করছে। ভয়ে এবং যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। অভয় উপরের দিকে ফিরে তাকাল আবার। শব্দটা ওপর থেকে আসছে।

ক্রমশঃ

❋ মেয়েদের কথা ❋

বৈদিকযুগের গার্হস্থ্য জীবন

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

ঋগ্বেদে সূর্য্যের মকর রাশিতে বাসন্তিক সংক্রমণের উল্লেখ আছে, এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে গণনা দ্বারা অনেকে প্রমাণ করছেন যে বেদ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়েছিল। বৈদিক সূক্ত মতে প্রমাণিত হয়েছে যে সংখ্যাতীত শতাব্দীতে ঋষিরা বেদমন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন, পরবর্ত্তীকালে যে সব ঋষির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরা বেদের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অবশেষে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সমস্ত বেদমন্ত্রকে সংহিতার আকারে লিখে বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। সে সময়ে নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে নিম্নপর্য্যায়ভুক্ত ছিল না। নারীরাও বেদমন্ত্র প্রচার করেছিলেন, আর নারীদের মধ্যেও ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা। আয়ু, যশ, বল, স্বাস্থ্য, সিদ্ধি, পুত্র প্রভৃতি লাভের জন্যে ঋষিরা মন্ত্ররচনা করে দেবতাদের উপাসনা করতেন, লাভ করতেন দেবতাদের শক্তি। যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের পরিতৃপ্তি সাধন হোতো। দুগ্ধ, ঘৃত, তণ্ডুল, মাংস, সোমরস ইত্যাদি সাধারণ খাদ্য ও পানীয় বস্তু আহুতি প্রদান করে যজ্ঞ করা হোতো—প্রতিগৃহে থাকতো অগ্নিকুণ্ড। যজ্ঞকালে বেদোক্ত দেবতার স্তবস্তুতি পাঠ করা হোতো। উপাসনা ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেখা যায়। ঋক্‌বেদে পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি নারী দেবতার উল্লেখ আছে। মূর্ত্তিপূজা বহু কাল পরে প্রচলিত হয়। সমাজ ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্ব্বময় কর্তা। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গসমন্বিত পরিবার গঠিত হোতো। এই যুগে লতাপাতা দ্বারা নির্ম্মিত পর্ণকুটীর ও কাঠের তৈয়ারী গৃহে ঋষিরা বাস করতেন। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। একাধিক বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। মানুষ পুত্র সন্তান কামনা করতো। বৈদিক-সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব উন্নত। লোপামুদ্রা, বিশ্বপরা, ঘোষা—নারী হোলেও বেদমন্ত্রের ঋষি। গার্গী ও মৈত্রেয়ীর বিদগ্ধতার পরিচয় আজও বিশ্বকে বিস্মিত করে তোলে। তাঁদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল দর্শনশাস্ত্রে। স্বামীর সঙ্গে নারীরা যুদ্ধে যোগদান করতেন। এক্ষেত্রে ইন্দ্রসেনা, অপালা প্রভৃতি নারীর নাম উল্লেখযোগ্য। মনু যদিও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করেননি মনুসংহিতায়—তথাপি নির্দ্দেশ দিয়েছেন নারী শিক্ষার। সাম্প্রতিক কালের মত বৈদিক যুগেও নরনারীরা সূচীকার্য্যের সাহায্যে কাপড়ের পাড় প্রস্তুত করে ব্যবহার করতেন—আর পাড়দ্বয়কে প্রাতঃ সূর্য্য আর সায়ং সূর্য্য—আর কাপড়ের মধ্যবর্ত্তী অংশকে অন্তরীক্ষ বা সূর্য্যের গমনপথ বলে বর্ণনা করতেন। সেকালে দ্বিবস্ত্রের ব্যবহারের প্রথা ছিল। পরিধেয় বস্ত্রকে পত্তু ও উত্তরীয়কে ভদ্রি বলতো। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সে যুগের মানুষেরা অমনোযোগী ছিলেন না। পরিধেয় বস্ত্র কার্পাস, রেশম ও পশম দ্বারা নির্ম্মিত হোতো। পুরুষ ও নারী মস্তকে উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন। স্বর্ণ ও পুষ্পের অলঙ্কার প্রচলিত ছিল। নারীরা পাশ, কুরীর, শৃঙ্গ, জালের মত কবরী বেঁধে বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ ঢেকে বাহিরে বেরিয়েছেন। স্ত্রী পুরুষ সকলেই রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতেন। গলদেশে 'নিষ্ক', বক্ষে 'রুক্ম' হার স্রজ, কর্ণে খাদি, হস্তে মণি, সিপ্র, হস্তত্র প্রভৃতি ধারণ করতেন। নারীরা আচার্য্য গৃহে গিয়ে বেদের আলোচনা করতেন। গৃহস্থেরা প্রতিদিন দেবতাকে নিবেদন করে খাদ্য গ্রহণ করতেন। অতিথিসেবা এঁদের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য ছিল। এঁরা যব, তণ্ডুল, তিল, শিম প্রভৃতি দুগ্ধে সিদ্ধ করে বা শুকিয়ে ভোজন করতেন। অশ্ব, মেষ, ছাগ, মহিষ, ষণ্ড মাংস রেঁধে আহার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। গোদুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও মধু এঁদের অতি প্রিয় আহার্য্য ছিল। বৈদিকযুগে আমিষ ও নিরামিষ দ্রব্যের আহারের ব্যবস্থা ছিল। এ সময়ে নারী পুরুষ হস্তী, অশ্ব, মৃগবাহিত রথ ও গোশকটে চড়ে চলাফেরা করতেন। গোধন ছিল প্রধান সম্পদ। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গো, অশ্ব, মেষ, কুকুর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যৌথ অধিকারভুক্ত ছিল গৃহ চারণ ভূমি। বিনিময়ের জন্যে প্রথম যুগে নিষ্ক নামক স্বর্ণখণ্ড প্রচলিত ছিল।

কাষ্ঠ ও রজ্জু দ্বারা চারি পায়া তৈয়ারী করে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে শয়ন করতেন। বর্ত্তমান সময়ে আহার্য্য জিনিষ চর্ম্ম পাত্রে রাখা নিষিদ্ধ হোলেও বৈদিকযুগে জল ও মধু রাখবার জন্য চর্ম্ম পাত্র ব্যবহার হোতো। বর্ত্তমান কালের মত ঘোড়দৌড়খেলা বৈদিকযুগেও ছিল। অক্ষ ও দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করা হোতো। এ সময়ে গর্গর, গোধা, পিঙ্গা, কর্করি, বীণা, দুন্দুভি, বেণু, গাথা, নাকুলি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই সব যন্ত্র সংযোগে সঙ্গীতাদির চর্চ্চা হোতো। নৃত্যগীত, বীণাবাদন, নানা বাদ্যযন্ত্র সংযোগে উৎসব অনুষ্ঠান, শিকার, রথচালনা ও ধনুর্ব্বাণ প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিকযুগে স্থলযান, জলযান ও আকাশযানে গমনাগমনের কথা জা

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।

লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটী কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্ত্তৃক

268 C-X52 BG

যায়। বেদপাঠকেই ব্রহ্মযজ্ঞ মনে করা হ'ত। এ যজ্ঞে নারীরও অধিকার ছিল। অতিথিকে বেদে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। অতিথিকে সেবা করলে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার সমফল হয়। অতিথিকে সেবা না করে নিজে ভোজন করলে 'পাপাত্মা' বলে সমাজে ঘৃণ্য হোতে হোতো। দুপুর বেলা অতিথি ফিরে গেলে গৃহীর অকল্যাণ হয় এ সংস্কার এখনও আমাদের মধ্যে আছে। বেদে কোন সময় থেকে বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। আট প্রকারের বিবাহ প্রথা এই যুগে দেখা যায়। ছেলের পক্ষ ও কন্যা পক্ষ মিলিত হয়ে ধর্ম্মাচরণ করে বর অর্চ্চনা সহকারে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। এপ্রথা এখনও আমাদের সমাজে আছে। শাস্ত্রজ্ঞানী ছেলেকে আহ্বান করে পূজা অর্চ্চনাদি সহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। বর্ত্তমানে এদেশে এরূপ বিবাহও প্রচলিত আছে।

বৈদিকযুগে আর্য্যরা যুদ্ধের শেষে বিজিত পক্ষের নারীগণকে হরণ করে এনে বিবাহ করতেন। একে রাক্ষস বিবাহ বল্‌তো। অজানাবস্থায় কন্যাকে হরণ করে এনে তার অসম্মতিতে বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ। বর কন্যার পরস্পরের মনের মিলন হয়ে বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এ প্রথাও বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। ছেলের পক্ষ থেকে এক বা দুটি গো-মিথুন গ্রহণ করে শাস্ত্রমতে কন্যাদানের নাম আর্য্য বিবাহ। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে বস্ত্র ও অলঙ্কারে আবৃত করে কন্যাদান করার নাম দৈব বিবাহ। একমাত্র ঋগ্বেদে উর্ব্বশী ও পুরুরবার কথোপকথন থেকে অনুমান হয় যে তদানীন্তন সময়ে কন্যারা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন—আর নিজের ইচ্ছামত কারো সঙ্গে স্ত্রীপুরুষ রূপে বাস করতেন। এই আট প্রকারের বিবাহ সংস্কারের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধানই স্বাভাবিক রীতি, এটি মানুষের সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে চলে এসেছে।

বৈদিকযুগে ঘটকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্বন্ধ করা হোতো। বর ঘটকের সঙ্গে কন্যার বাড়ীতে যেতেন, আর কন্যা নির্ব্বাচন করতেন। সে সময়েও কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা দেখা যায়। বিয়ের দিনে মেয়েকে স্নান করিয়ে তার মাথায় লাঙ্গল স্পর্শ করানো হোতো। তারপর বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে ঘরের বাইরে একখানা শিলাখণ্ডের ওপর আনা হোলে বর নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করতেন—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবার ভব
ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

অর্থাৎ 'তুমি শ্বশুর, খাশুড়ী, ননদ আর দেবরগণের কাছে সুশোভমানা হও' ইত্যাদি নানা মন্ত্র পাঠ করে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও দেবগণকে সাক্ষী করে কন্যাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করা হোতো, আর বিয়ের পর বর-কন্যা রথে চড়ে স্বামীগৃহে যেতেন।

বৈদিকযুগে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সেকালে স্বামীর মৃত্যু হোলে স্ত্রী স্বামীর চিতার পার্শ্বে শায়িতা হয়ে অগ্নিতে ভস্মীভূত হোতেন। অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরের সঙ্গে গৃহে থেকে বৈধব্য জীবন পালন করতেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দর্শন করে সময় ঠিক করা হোতো, আর পূজা যাগযজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্যে বৎসর, মাস, অহন, রাত্রি, দণ্ড, পল ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছিল। আর্য্য ঋষিরা বিবাহ করতেন। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে রাজার খুব ক্ষমতা ছিলনা। পরবর্ত্তী কালে তাঁর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি ছিল চতুরাশ্রম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে চতুরাশ্রমের বিধানগুলি অনুসরণ করতে হোতো। শূদ্র ও নারীর পক্ষে চতুরাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না। নারীর পক্ষে চতুরাশ্রমের নিয়ম পালন করার দরকার হোতো না। নানাপ্রকার কলাচর্চ্চা, বিদ্যার্জ্জন ও শিল্প কর্ম্মে নারীরা মনোনিবেশ করতেন। প্রথমে বর্ণভেদ জন্মায়ত্ত ছিল না। এ সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এই বর্ণভেদ মনুসংহিতার সময়ে জাতিভেদে পরিণত হয়, আর জন্মায়ত্ত হয়ে যায়। সমাজে নানাপ্রকার শঙ্কর বা মিশ্রজাতির উদ্ভব হয়। আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হোলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলিত হয়েছিল। বৈদিকযুগে লোকসংখ্যা যখন কম ছিল, তখন তাঁদের মধ্যে ভাষার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা বনেই বাস করতেন, আর বনজাত ফলমূলাদি আহার করতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যে নানা জিনিষের নামকরণের প্রয়োজনীয়তা মনে করে আর্য্যরা ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে আচার্য্য সমীপে অবস্থানের নামই উপনয়ন। উপনীত বালক মৃগচর্ম্ম, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু ও মেখলা ধারণ করে দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত হোতেন। এইভাবে ব্রহ্মচারীবেশে দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন, গুরুসেবা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোলে গৃহাশ্রমে ফিরে আসতেন। ছাত্ররা বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ শিক্ষালাভ না করতে পারলে বিবাহ করে সমাজে গৃহী হোতে পারতেন না। যেসব ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতে মুগ্ধ হয়ে পড়তেন, তাঁরাই আজীবন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকতেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণরা বেদবিদ্যা শিক্ষা করে বিশুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ নূতন সামাজিক জন্মলাভ করতেন। তাই তাঁদেরকে দ্বিজ বলা হোতো।

ঋগ্বেদীয় যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতীত জনসাধারণ নিজ নিজ ব্যবসায় ভেদে বপ্তা (নাপিত), চর্ম্মণ (চামার), দৈবজ্ঞ (গণকঠাকুর), ধীবর (জেলে) কুলাল (কুম্ভকার), মৃগয় (ব্যাধ), কাষ্ঠাহার (কাষ্ঠ ব্যবসায়ী), সুরাবত (মদবিক্রেতা), বাসপলপুনা (রজকিনী), আজিনে সন্ধ (চর্ম্মকার), মাগধ (স্তুতিকারক), নৃত্তু (নর্ত্তক), কর্ম্মার (কামার) প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত হয়েছিলেন। সেকালে সূত্রধর ও রথকারের স্থান বৈদিক সমাজে অতি উচ্চ ছিল। প্রাচীন আর্য্যরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করতেন, কিন্তু পরে অনার্য্য প্রভাবে তাঁরা মৃতদেহ দাহ করে অস্থি তীর্থে বা নদীতে নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। বেদ আর্য্যদের সকল ধর্ম্ম ও চিন্তার মূল, নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয়। ঋক্‌বেদ মন্ত্রবাচক। বেদকে কেন্দ্র করেই বহু ধর্ম্মমত ও পথ গ্রহণ করেছিলেন আর্য্যরা। বর্ত্তমান যুগে যদিও বৈদিকযুগের গার্হস্থ্য জীবন আশা করা যায়না, তথাপি একথা সত্য, নারীর অধিকার ও ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা স্বাধীন ভারত দিয়েছে বৈদিক যুগের মতই, এটি অবশ্য আনন্দের কথা।

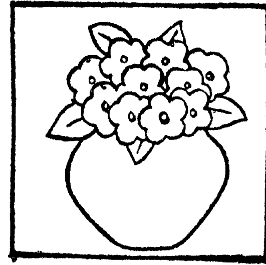


কাগজের চিত্র-রচনা

স্বপর্ণা মুখোপাধ্যায়

সকলেই রঙ-তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে না। তবে সখ থাকলে এবং একটু চেষ্টা করলেই, নানা রঙের রঙীণ কাগজের টুকরো দিয়ে অনেকেই বহু রকমের শিল্পশ্রী-মণ্ডিত বিচিত্র অভিনব চিত্র-রচনা করতে পারবেন—আজ সেই বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা করি। পরিপাটিভাবে বিভিন্ন-বর্ণের কাগজের টুকরো দিয়ে এই ধরণের চিত্র-রচনা করতে পারলে শুধু যে মনে তৃপ্তি পাবেন তাই নয়, এ সব বিচিত্র শিল্প-কাজের দৌলতে গৃহের সজ্জা-শোভা বর্দ্ধিত হবে অনেকখানি। তাছাড়া, সংসারে বিশেষ কোনো উৎসব-উপলক্ষে সৌখিন ফ্রেমে-বাঁধানো কাগজের রঙীণ টুকরো সাজিয়ে তৈরী এই সব অভিনব চিত্র উপহার দিয়ে আত্মীয়-বন্ধু মহলে রীতিমত সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারবেন।

এ ধরণের শিল্প-কাজ করতে হলে, যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন—গোড়াতেই সে কথা বলি। এ কাজের জন্য চাই—খান কয়েক বড় সাইজের সাদা বা এক-রঙা মোটা ড্রইং-কাগজ (Dhawing Paper) কিম্বা কার্ডবোর্ড (Crad-board Paper), লাল, নীল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের কয়েক শিশি Water-proof Drawing Ink বা কালি, এক শিশি ভালো আঠা (Gumpaste) এবং রঙ-বেরঙের একরাশ কাগজের টুকরো। এ সব সরঞ্জাম জোগাড় করা এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় এবং জিনিষগুলি বাজার থেকে কিনতেও অর্থব্যয়ও হবে না তেমন বেশী। তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণের রঙীণ কাগজ সংগ্রহ করতেও খুব বেশী হাঙ্গামা ভোগ করতে হবে না—বাড়ীতে সাধারণতঃ যে সব কাগজ এসে জমা হয়—অর্থাৎ, দোকানের জিনিষপত্র মোড়া রঙীণ কাগজের ঠোঙা বা 'র‍্যাপার' (Wrapper), ছেলে-মেয়েদের স্কুলের খাতার মলাটের রঙীণ কাগজ প্রভৃতি দিয়েও এ সব ধরণের চিত্র-রচনার কাজ চলবে। তবে, এ সব রঙীণ কাগজের এক-পিঠ অন্ততঃ পরিষ্কার থাকা চাই—অর্থাৎ, অক্ষর ছাপার কোনো দাগ যেন না থাকে সে-পিঠে—এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।



পাশের ছবিতে রঙীণ কাগজের টুকরো সাজিয়ে তৈরী শিল্প-কাজের একটি নমুনা দেওয়া হলো। এ নক্সাটি রচনা করা এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। তাহলেও শিক্ষার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্য, এই নক্সাটি কিভাবে রচনা করতে হবে, সে-সম্বন্ধে মোটামুটি একটু আভাস দিচ্ছি।

রঙীণ কাগজের টুকরো সাজানো চিত্রটি যে মাপের তৈরী করবেন, গোড়াতেই সেই রকম মাপে ড্রইং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডটিকে পরিপাটিভাবে কাঁচি বা ছুরি দিয়ে কেটে নিন।

কাগজটি মাপ মতো ছাঁটাই হবার পর, সে-কাগজের বুকে রঙ-বেরঙের অন্যান্য কাগজের টুকরো সাজিয়ে এঁটে যে-চিত্রটি রচনা করবেন তার একটা মোটামুটি আন্দাজ বা খশড়া ছকে নিতে হবে···ছবির কতখানি অংশ সাদা থাকবে, আর কোন-কোন অংশে আঠা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের ও ছাঁদের কাগজের টুকরোগুলিকে সাজিয়ে জুড়তে হবে, তার একটা মোটামুটি পরিকল্পনা কাজের গোড়াতেই স্থির করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। এ ধরণের শিল্প-কাজে সব ছবিতেই

সর্ব্বদা খানিকটা জমি সাদা বা ফাঁকা (Blank) রাখা ভালো…রঙীণ কাগজের টুকরো দিয়ে কোনো ছবিকেই আগাগোড়া ভরাট করে তোলা সঙ্গত নয়—কারণ, তাতে রূপ-রচনার সৌষ্ঠবহানি ঘটে সবিশেষ। কাজেই, ছবির কোন অংশে কতখানি জমি সাদা বা ফাঁকা রাখবেন এবং কতখানি জমি বিভিন্ন ছাঁদের রঙীণ কাগজের টুকরো সাজিয়ে ভরাট করবেন, সে ব্যবস্থা শিল্পী কাজের গোড়াতেই স্থির করে নেবেন। এ ব্যবস্থাটি স্থির করে নেবার পর, ছবির কাগজ কিম্বা কার্ডবোর্ডের উপর খুব আলতোভাবে পেন্সিলের দাগ বুলিয়ে নক্সাটির একটা মোটামুটি খশড়া এঁকে নিতে পারলে কাজের সুবিধা হবে অনেকখানি। অবশ্য যাঁরা অল্প-স্বল্প ছবি আঁকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ কাজ এমন কিছু কঠিন নয়। তবে, যাঁদের আঁকার হাত নেই, তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপার খুব শক্ত ঠেকবে। এ বিষয়ে তাঁরা যদি প্রথমেই নক্সার প্রতিলিপিটি এক-টুকরো পাৎলা ট্রেসিং-কাগজের (Tracing Paper) উপর ছকে নিয়ে, সেটিকে ঐ ছবির মাপ-মতো ছাঁটাই করা ড্রইং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডের বুকে বিছিয়ে তলায় কার্ব্বন-কাগজ (Carbon Paper) রেখে নক্সাটিকে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে এঁকে নিতে পারেন, তাহলে আর কাজের কোনো অসুবিধা ঘটবে না। বরং ছবিটি শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে সুন্দর পরিপাটি-ছাঁদের।

নক্সাটিকে ড্রইং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডের উপর নিখুঁতভাবে ছকে নেবার পর, স্থির করে নিতে হবে, কোথায় কোন ছাঁদের ও কোন রঙের কাগজের টুকরো সাজিয়ে আঠা দিয়ে জুড়তে হবে। ধরুন, উপরের ছবিতে দেখানো নক্সার ছাঁদে ঐ ফুলদানীতে রাখা নানা রঙের ফুলগুলির চিত্র-রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। কিভাবে নানা রঙের কাগজের টুকরো দিয়ে এ নক্সাটিকে রূপদান করবেন—সেই কথাই বলি।

ধরে নেওয়া যাক্, ফুলদানীর রঙ হবে পোড়ামাটির মতো, ফুলগুলির রঙ লাল, হলদে, কমলা, সাদা আর নীল…এই পাঁচ রকমের, ফুলের পিছনে পাতাগুলির রঙ হালকা সবুজ ও পাতার শিরার রঙ গাঢ়-সবুজ এবং ফুল-সাজানো ফুলদানীর পিছনের পটভূমি বেগুনী রঙের। এই সিদ্ধান্তে আসার পর, যে-রঙের কাগজে ফুলদানীটি রচনা করতে হবে, হুবহু ফুলদানীর নক্সার মাপে সেই-রঙে কাগজের টুকরো কেটে নিন। ফুলদানীর নক্সাটি দু'দিক সমান ছাঁদে কাটতে হলে, রঙীণ কাগজটিকে ভাঁজ দিয়ে দু'পাট করে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কাটুন, তাহলেই ফুলদানীর দুটি দিক সমান হবে। কাগজটি কাটবার পর, ভাঁজ খুলে দুটি পাট সমান করে নিন্। তারপর ফুলদানীর নক্সার ছাঁদে ছাঁটাই করা রঙীণ কাগজের টুকরোটিতে পারিপাটিভাবে আঠা লাগিয়ে, সেটিকে ড্রইং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডের বুকে আঁকা ফুলদানীর খশড়া-চিত্রের উপরে সেঁটে দিন। তাহলেই রচিত হবে ফুলদানীর চিত্র।

ফুলদানীর নক্সানুসারে ছাঁটাই করা রঙীণ কাগজের টুকরোটি আঁটা হবার পর, ফুল ও পাতার টুকরোগুলি আঁটবার পালা।

পাতা ও ফুলের চিত্র-রচনার জন্য—লাল, হলদে, কমলা, সাদা ও নীল এই পাঁচ রঙের পাঁচটি কাগজ নিন এবং এই পাঁচখানি রঙীণ কাগজ উপরি-উপরি সমানভাবে সাজিয়ে রেখে ফুলের নক্সার ছাঁদে নিখুঁতভাবে কাঁচি দিয়ে কাটুন। তাহলেই তৈরী হবে পাঁচটি বিভিন্ন বর্ণের ফুলগুলি।

ফুলগুলির পর, পাতার চিত্র-রচনার কাজ। এ কাজও করতে হবে আগাগোড়া উপরোক্ত ধরণে…অর্থাৎ ফুলের চিত্র-রচনার পদ্ধতিতেই। পাঁচটি হাল্‌কা-সবুজ রঙের কাগজ নিয়ে, সেগুলিকে উপরি-উপরি সমানভাবে রেখে পাতার নক্সার ছাঁদে পরিপাটিভাবে কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করে নিলেই তৈরী হয়ে যাবে পাতাগুলি।

এবারে একের পর এক, এ সব ছাঁটাই-করা রঙীণ কাগজের বিভিন্ন টুকরোগুলিকে আগাগোড়া ফুলদানীর চিত্র-রচনার ভঙ্গীতে আঠা দিয়ে ড্রয়িং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডের উপর এঁটে দিতে হবে।

আঠা দিয়ে কাগজের টুকরো আঁটবার সময়, পরিষ্কার একখানি ব্লটিং-কাগজের (Blotting-Paper) উপর কাগজ রেখে তার পিঠে পাতলা করে আঠা লাগাবেন। এভাবে আঠা লাগানোর অর্থ—প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গায় আঠা ছড়িয়ে পড়বে না এবং বেশী আঠা লেগে কাগজ নষ্ট হবারও আশঙ্কা থাকবে না।

ড্রয়িং-কাগজ বা কার্ডবোর্ডের উপরে আঁকা নক্সার প্রত্যেকটি অংশে বিভিন্ন ছাঁদের ও বর্ণের কাগজের টুকরো আঁটা হয়ে যাবার পর, সেটিকে অন্ততঃপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মতো বাঁধানো বই বা কোনো ভারী জিনিষের চাপে রেখে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, দীর্ঘকাল ভারী



জিনিষের চাপের তলায় রাখলে, আঠা-মাখানো কাগজ বা বোর্ড শুকিয়ে গেলে দুমড়ে বা বেঁকে যাবে না—আগাগোড়া সমান ও পরিপাটি দেখাবে। তাছাড়া ফুল-পাতা-ফুলদানীর নক্সার ছাঁদে রচিত আঠা দিয়ে সাঁটা কাগজের টুকরোগুলিও আগাগোড়া অটুট ও পাকাপাকি হয়ে বসবে—শুকিয়ে গেলে সহজে খসে পড়বে না।

চব্বিশ ঘণ্টা ভারী জিনিষের চাপে রাখার পর, কাগজের টুকরো জুড়ে তৈরী চিত্রটিকে টেবিল বা সমতল জমির উপর বিছিয়ে ফুলে-ভরা ফুলদানীর পিছনের পটভূমিকে, হয় শিশিতে রাখা 'ওয়াটার-প্রুফ ড্রইং-কালি' (Waterproof Drawing Ink) সাহায্যে, নয় তো বা বেগুনী রঙের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে এঁটে, আগাগোড়া ভরাট করে দিতে হবে। পটভূমি যথাযথ না হলে, চিত্রটি অসুন্দর ও বেমানান দেখাবে। কাজেই এদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এ কাজের পর, হালকা-সবুজ রঙের পাতার উপরে, গাঢ়-সবুজ রঙের কালি কিম্বা অনুরূপ রঙের কাগজের টুকরো কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে, পাতার শিরাগুলি রচনা করতে হবে। ফুলের মাঝে মাঝে যে গোল 'রেণু-রেখা' রয়েছে, সেগুলিও রচনা করতে হবে ঠিক উপরোক্ত পদ্ধতিতে। এই হলো কাগজের টুকরো দিয়ে চিত্র-রচনার মর্ম্ম।

প্রসঙ্গক্রমে, পাশের ছবিতে আরো একটি এ ধরণের শিল্প-কাজের নক্সার নমুনা দেওয়া হলো। এটি অবশ্য একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের নক্সা। নানা রঙের কাগজের টুকরো সাজিয়ে উপরোক্ত প্রথায় সুষ্ঠুভাবে এ চিত্রটি রচনা করতে পারলে, শিক্ষার্থীরা প্রচুর আনন্দ ও সুখ্যাতি লাভ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

পাঞ্জাবী

আমাদের দেশে পুরুষদের নিত্য-প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ পাঞ্জাবী—এবারে সেই পাঞ্জাবী বানানোর ছাঁট-কাট ও সেলাই সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করছি।

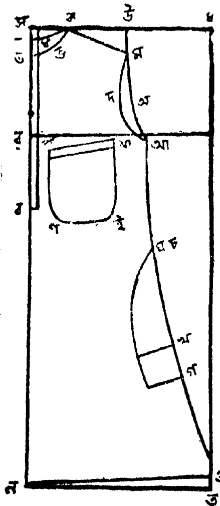
সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালের উপযোগী পাঞ্জাবী বানানোর জন্য সুতীর ভালো এবং খাপি-ধরণের মার্কিন, লংক্লথ, আদ্দি, নয়ানসুখ, মলমল্ কিম্বা খাদি কাপড় ব্যবহার করাই ভালো। যাঁরা সিল্কের পাঞ্জাবী তৈরী করতে চান, তাঁদের পক্ষে গরদ, তসর প্রভৃতি রেশমী কাপড় খুবই উপযোগী হবে। শীতকালের উপযোগী পাঞ্জাবী বানানোর জন্য ফ্লানেল, সার্জ্জ প্রভৃতি নরম ও মজবুত ধরণের পশমী কাপড় ব্যবহার করাই বিধেয়। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়াতেই দামী কাপড় ব্যবহার না করে, কম দামের সাধারণ কাপড় নিয়ে কাজ করে হাত পাকানো উচিত... এতে যে অর্থ অপচয় এবং মনস্তাপের সম্ভাবনা কম হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য!

বাজারে পাঞ্জাবী বানানোর কাপড় মেলে নানা বহরের। তবে, আমরা আলোচনা করছি, সাধারণতঃ ৩৬″ ইঞ্চি থেকে ৪৪″ ইঞ্চি পর্য্যন্ত যে কাপড়ের বহর, সেই কাপড়ের হিসাবে। পাঞ্জাবী তৈরী করতে হলে এ সব বহরের কাপড় কতখানি প্রয়োজন লাগবে, তার একটা মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। ৩৬″ ইঞ্চি থেকে ৪৪″ ইঞ্চি

পর্য্যন্ত যে সব কাপড়ের বহর, তার দুই লম্বা ও এক হাতা মাপের কাপড় লাগবে একটি পাঞ্জাবী তৈরী করতে। অর্থাৎ এ সব ক্ষেত্রে—৩৬″ ইঞ্চি + ১″ ইঞ্চি (১″ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য) = ৩৭″ ইঞ্চি × ২″ ইঞ্চি = ৭৪″ ইঞ্চি ; তার মানে, ৭৪″ ইঞ্চি + ২৪৷০″ ইঞ্চি + ১৸০″ ইঞ্চি = ১০০″ ইঞ্চি = ২′ গজ ২৮″ ইঞ্চি কাপড় লাগবে পুরো একটি পাঞ্জাবী তৈরী করার জন্য।

যাই হোক, বাজার থেকে প্রয়োজনমত মাপ-মাফিক কাপড় কেনার পর, যাঁর গায়ের পাঞ্জাবী তৈরী হবে, মাপের ফিতার সাহায্যে নিম্নলিখিত নিয়মে তাঁর গায়ের মাপ নেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ, ধরুন, যাঁর পাঞ্জাবী তৈরী হবে, তাঁর গায়ের মাপ : ঝুল—৩৬″ ইঞ্চি, ছাতি—৩৩″, গলা—১৩৸০″ ইঞ্চি, পুট—৮৷০″ ইঞ্চি, পুটহাতা—৩২৷৷০″ ইঞ্চি (শুধু হাতার মাপ হবে তাহলে ৩২৷৷০″ ইঞ্চি—৮৷০″ ইঞ্চি = ২৪৷০″ ইঞ্চি) এবং মুহুরী—৬৷৷০″ ইঞ্চি। এই হলো পাঞ্জাবীর মাপ নেবার নিয়ম।

এবারে বলি—পাঞ্জাবীর কাপড় ছাঁটাই করার কথা। গোড়াতেই থান থেকে দুই লম্বা (ঝুল) অর্থাৎ ৭৪″ ইঞ্চি কাপড় কেটে নিন। তারপর তার আড়াআড়ি দিকে ছাতির মাপ যতখানি (অর্থাৎ ৩৩″ ইঞ্চি), ঠিক ততখানি



ঘের বা বেড় রেখে কাপড়টিকে পরিপাটিভাবে মুড়ে দিন। এভাবে পুরো কাপড়টিকে ভাঁজ করে নিয়ে, সেই ৭৪″ ইঞ্চি লম্বা বা ঝুল আধাআধি করে ভাঁজ দিয়ে নেবেন। এবারে পাশের ছবিতে যেমন নমুনা দেওয়া হয়েছে, অবিকল তেমনি. ছাঁদে কাপড়টিকে আগাগোড়া প্রয়োজনমত মাপ-অনুসারে রঙীণ খড়ি বা পেন্সিলের দাগ টেনে নক্সা-চিহ্নিত করে নিয়ে কাঁচি দিয়ে পরিপাটিভাবে ঐ দাগে-দাগে ছাঁটাই করে ফেলুন। অর্থাৎ

'স' থেকে 'ন'—ঝুল + ১″ ইঞ্চি = ৩৭″ ইঞ্চি ;

'ন' থেকে 'ত'—আধ ইঞ্চি ঘের = ৷৷০″ ইঞ্চি ছাতির মাপের সমান = ১৬৷৷০″ ইঞ্চি ;

'স' থেকে 'উ'—পুট + ৷০″ ইঞ্চি = ৮৷৷০″ ;

'উ' থেকে 'ম'—১৷৷০″ ইঞ্চি, ছোটর ১″ ইঞ্চি ;

'স' থেকে 'র'—ছাতির ১/৪ = ৮৷০″ ইঞ্চি ;

'ক' থেকে 'স'—ছাতির ১/১২ = ২৸০″ ইঞ্চি ;

'র' থেকে 'আ'—ছাতি + ৭″ ইঞ্চি ঢিলা। তার ১/৪, ৩৩″ ইঞ্চি + ৭″ ইঞ্চি = ৪০/৪ = ১০″ ইঞ্চি ;

'ত' থেকে 'ও'—১″ ইঞ্চি ;

'আ' থেকে 'চ'—১০″ ইঞ্চি ; ছোট—৬″ ইঞ্চি, ৭″ ইঞ্চি, ৮″ ইঞ্চি ;

'চ' থেকে 'খ'—পকেটের মুখ—৭″ ইঞ্চি ;

'খ' থেকে 'গ'—২″ ইঞ্চি ;

'ধ' থেকে 'প'—৯৷৷০″ ইঞ্চি ;

'র' থেকে 'প'—১৷৷০ ইঞ্চি ;

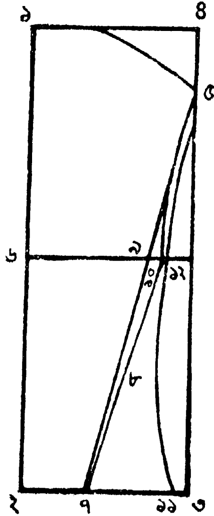
'স' থেকে 'ব'—বুকের চেরাই = ১৫ ইঞ্চি ;

'ফ' থেকে 'ই'—৭″ ইঞ্চি ;

'ই' থেকে 'ণ'—৬″ ইঞ্চি ;

লম্বা কাপড়টিকে দুই ভাঁজ করে নেবার ফলে সামনে ও পিছনে দুটি 'পাট' বা ভাঁজ (Fold) হলো—একটি পাঞ্জাবীর সুমুখের 'পাট' এবং আরেকটি পিছনের 'পাট'। যেটি সামনের 'পাট' সেটির গলার টলন (অর্থাৎ 'ক', 'ভ', 'ড') আর মোহড়া (অর্থাৎ 'ম', 'দ', 'আ') কিঞ্চিৎ বেশী খাড়া হবে। 'চ', 'খ', আর 'গ'র কাছে শুধু নাচি কাটা, যার ফলে, চারটি পাটেই সামান্য একটু চিহ্ন করে রাখা সম্ভব হবে। এবারে উপরের ছবিতে যেমন নমুনা দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে নক্সানুসারে দাগ দিয়ে কাপড়টিকে সুষ্ঠুভাবে ছাঁটাই করতে হবে। যদি 'ন' আর 'ত' যোগ করে সমান লাইনে ছাঁটাই করা হয়,

তাহলে কাপড়ের কোণ ঝুলে পড়বার সম্ভাবনা—এজন্য ১″ ইঞ্চি উপরে ছাঁটাই করা প্রয়োজন। ঘের অর্থাৎ 'ন' 'ত', ছাতির মাপমত থাকে বলে এক্ষেত্রে তাই ১৬৷৷০″ ইঞ্চি রাখা রয়েছে। কারণ, এটি দুই ভাঁজ করা আছে।



পাঞ্জাবীর পাশের পকেট দুটিকে ছাঁটাই করার প্রথা হলো—লম্বা ১৮৷৷০″ ইঞ্চি এবং চওড়া ৬৷৷০″ ইঞ্চি ছাঁদে কাপড়টিকে কাটতে হবে। তারপর লম্বা ৭৷০″ ইঞ্চি কাপড়টিকে কতকটা অর্দ্ধচন্দ্রের মতো বঙ্কিম-ছাঁদে বাঁকা ভঙ্গীতে ছাঁটাই করতে হবে। এভাবে ছাঁটাই করে, বাকী যে ১১″ ইঞ্চি থাকবে, সেটিকে দুই ভাঁজ করে পাঞ্জাবীর পকেটের থলি বানিয়েনিন। এমনিভাবে পকেটটিকে সেলাই করে নিয়ে পাঞ্জাবীর দেহের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে জোড়া দিন।

পাঞ্জাবীর দেহাংশটি পরিপাটিরূপে কাট-ছাঁট করে নেবার পর, পাঞ্জাবীর হাতা ছাঁটাইয়ের কাজ। এ কাজের জন্য লম্বা ২৬″ ইঞ্চি মাপের কাপড় নিয়ে সেটিকে আড়া-আড়িভাবে চার ভাঁজে পাট করে নিতে হবে, তাহলেই একসঙ্গেই পাঞ্জাবীর দুটি হাতা ছাঁটাই করা যাবে। পাশের ছবিতে পাঞ্জাবীর হাতা-ছাঁটাইয়ের প্রণালীটি নক্সার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ—

'১' থেকে '২'—হাতার লম্বা+১৸০″ ইঞ্চি=২৬″ ইঞ্চি ;

'১' থেকে '৪'—ছাতির ½=৮৷০″ ইঞ্চি ;

'২' থেকে '৭'—মুহুরীর ৷৷০″ ইঞ্চি+১৷৷০″ ইঞ্চি=৪″ ইঞ্চি ;

'১' থেকে '৬'—'১' থেকে '২' এর অর্দ্ধেক, এই কনুইয়ের কাছে কাপড় ঢিলা রাখতে হবে ;

'৯' থেকে '১০'—৸০″ ইঞ্চি ;

'৭' থেকে '৮'— ৬″ ইঞ্চি ;

'৪' থেকে '৫'—'৩' থেকে ৩৷০″ ইঞ্চি ;

কাপড়ের উপর উপরোক্ত মাপ-অনুসারে নক্সা চিহ্নিত করে নিয়ে ২নং ছবির ছাঁদে পাঞ্জাবীর হাতার কাপড়টিকে ছাঁটাই করতে হবে। ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী ছাঁটাই করতে হলে, কনুইয়ের কাছের অংশ এবং মুহুরী শুধু ভাঁজ থেকে খানিকটা কমিয়ে দিলেই চলবে।

এমনিভাবেই পাঞ্জাবীর কাপড়টিকে আগাগোড়া ছাঁটাই করে নেবার পর—সেলাইয়ের কাজ। সে কাজের বিষয়ে আগামী সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করবো।



অনুবাদ সাহিত্য



গবা

আলবর্টো মোরাভিয়া

অনুবাদ—দিলীপ দত্ত

মানুষ নিজের সম্বন্ধে ঠিক ওয়াকিবহাল নয়। সে জানেনা কে তার চেয়ে বড়, আর কেইবা তার চেয়ে ছোট। আমার সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমি বরাবরই নিজের সম্বন্ধে ছোট ধারণা পোষণ করে এসেছি। একথা ঠিক যে আমার শরীরের গঠন ইস্পাতের মত কঠিন নয়, কিন্তু মাটির পাত্রের মত যে একথা ঠিক। কিন্তু আমি নিজেকে ভাবতুম ভঙ্গুর কাঁচের মত, একেবারে সবচেয়ে পাতলা কাঁচের মত। মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতুম: দৈহিক শক্তি-শূন্য, দেহের গঠন ছোট্ট, হাত পা কাঠির মত, রুগ্ন চেহারা, ঠিক যেন একটা মাকড়সা। বুদ্ধি—কিছু না থাকার চেয়ে একটু বেশী—একথা বলছি কারণ একটা হোটেলের ডিস ধোওয়ার কাজের বেশী উন্নতি আমি করতে পারিনি। চেহারা—শূন্যের চেয়েও কম, আমার মুখের গঠন লম্বা ফ্যাকাশে, চোখ ঘোলাটে আর নাকটা আমার ডবল মুখের উপযুক্ত। নাকটা সোজা নামতে নামতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বেঁকে গিয়েছে, ঠিক যেন কাঠবেড়ালী লেজ তুলে আছে। এ ছাড়া সাহস, চটপটে স্বভাব, ব্যক্তিগত আকর্ষণ প্রভৃতি গুণের কথা যতটা না বলা যায় ততই ভাল। কাজেই এসব জেনেশুনে আমি মেয়েদের দিকে বিশেষ এগোতুম না। কেবল হোটেলের এক ঝির সঙ্গে একবার ভাব করবার চেষ্টা করেছিলাম। সে আমার প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছিল একটি কথা দিয়ে। 'গবা,' সে বলেছিল। তাই আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলুম যে আমার পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ, যাতে কারও পথের বাধা হয়ে না পড়ি।

দুপুর-বেলা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রোম হোটেলের একতলায় সারি সারি জানলা দিয়ে দেখতে পাবেন প্লেটের পর প্লেট সাজানো রয়েছে ঘরের মধ্যে। আর ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাসন ধোওয়ার গন্ধ। এইটেই আমার কর্মস্থল। এই জগতই আমি বেছে নিয়েছি, পাছে কারও চোখে না পড়ি টপ করে। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, যা আমি সবচেয়ে কম আশা করেছিলুম—যে ঐ বাসন ধোওয়ার ঘরের ঐ এক কোণেই একজন আসবে আর আমাকে অবাক করে দেবে। ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ফুল যেন বেরিয়ে এল। ইডা, আমাদের নতুন ঝি, গিউডিটার সন্তান-সম্ভবা, তার জায়গায় সে এসেছে। ছেলেদের মধ্যে আমি যেমন, মেয়েদের মধ্যে ইডাই তেমনি। গোবেচারী, আমার মতই রোগা লিকলিকে চেহারা। কিন্তু সে ছিল চঞ্চল উদ্দাম। দুজনেরই একই জায়গায় কাজ, তাই সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর একের পর এক ঘটনার পর সে আমার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এক রোববারে সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ করার মত অবস্থা করে তুলল। আমি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই তাকে নেমন্তন্ন করলাম। আর অবাক হয়ে গেলাম যখন সে সিনেমার মধ্যে অন্ধকারে তার হাতটা আমার হাতের মধ্যে তুলে দিলে। বোধহয় ভুল হয়েছে তাই—এমনকি হাত ছাড়িয়ে নেবারও চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু সে কানে কানে আমায় চুপ করে বসে থাকতে বলল। হাত ধরা-ধরিতে আর দোষের কি থাকতে পারে? তারপর সিনেমা থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, সে বলল যে হোটেলে আসার

দিন থেকেই সে আমায় লক্ষ্য করে আসছে, আর সে আশা করে যে তার প্রতিও আমার করুণার উদ্রেক হয়েছে, কারণ সে এখন আমাকে ছাড়া বাঁচতেই পারবে না। এই প্রথম কোনো একটি মেয়ে, ইডার মত মেয়ে হলেও, এরকম কথা আমাকে বলল। আর আমার মাথার ঠিক রইল না, আমি তার সব কথারই উত্তর দিলুম—আর তাছাড়াও দিয়ে ছিলুম অনেক কিছুই।

তবুও আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না, অবাকের ঘোর কাটল না, আর যদিও সে আমায় বারবার করে বলতে লাগল যে সে আমার জন্যে পাগল, তবুও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই যখন দুজনে বেড়াতে বেরোতাম আমি ঠিক ঐ কথাই বারবার জিজ্ঞেস করতুম। কিছুটা আনন্দ পাবার জন্যে—আর কিছুটা তা বিশ্বাস করতে পারলাম না বলেই।

"বলত কেন তোমার আমাকে ভাল লাগে, আমার মধ্যে তুমি কি দেখেছ?" আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ইডা আমার হাত জড়িয়ে ধরে প্রশংসমান দৃষ্টিতে মুখ তুলে ধরে বলত—"আমি তোমায় ভালবাসি কারণ তোমার মধ্যে সব ভাল গুণগুলোই রয়েছে······আমার কাছে তুমি আশ্চর্য্য সুন্দর।" অবিশ্বাস্য ভাবে আমি আবার বলতাম, "সব ভাল গুণ আছে, বাঃ আমি আগেত তা জানতাম না।"

"হ্যাঁ, সব···প্রথম কথা তুমি দেখতে এত সুন্দর!"

সত্যি কথা বলতে কি আমি হাসি চাপতে পারতাম না —"আমাকে ভাল দেখতে, তুমি বোধহয় আমায় ভাল করে দেখইনি।"

"নিশ্চয়ই দেখেছি···সব সময় ত দেখছি।"

"কিন্তু আমার নাকটা? আমার নাকটা দেখেছ কি?"

"ঐ নাকটার জন্যেই ত এত ভাল লাগে।" দু আঙুল দিয়ে আমার নাকটাকে ঘণ্টার মত নাড়া দিয়ে বলত, "ওঃ ঐ নাক, নাক, নাকটার জন্যে আমি কিনা করতে পারি।" তারপর আবার বলত—"তাছাড়া তুমি কত বুদ্ধিমান।"

"আমি বুদ্ধিমান, সবাই ত বলে আমি বোকা।"

"তারা তোমায় হিংসে করে তাই, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান, তুমি যখন কথা বল আমি অবাক হয়ে তোমার কথা শুনি, যতজনের সংগে মিশেছি তারমধ্যে তুমিই বেশী বুদ্ধিমান।"

আচ্ছা যাহোক। কিছুক্ষণ পর বলি "তুমি কিন্তু আমাকে নিশ্চয়ই শক্তিমান বলতে পার না?"

"কেন নয়," সে জোর দিয়ে বলত, "তুমি শক্তিমান, খুব শক্তিমান।" তখন আমি ঢোক গিলে নির্বাক হয়ে যেতাম। সে আবার বলত, "তাছাড়া তুমি যদি সত্যিই জানতে চাও তাহলে বলি, তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যার জন্যে তোমাকে এত ভাল লাগে।"

আমি জিজ্ঞেস করতুম, "সেটা কি আমায় বল।"

সে বলত, "কি করে তা বোঝাব ঠিক বুঝতে পারছিনা, তোমার গলার স্বর, তোমার কথা বলার ভংগী, তোমার চলার ছন্দ······সত্যি তোমার মত এসব আর কারও নেই।"

স্বভাবতঃ আমি তা বিশ্বাস করতুম না, আর আমি তাকে বারে বারে সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে বলতুম। তার কারণ এতদিন আমার নিজের সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল তার সংগে এই কথাগুলো মিলিয়ে নিতে বেশ মজা লাগত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যতই দিন যেতে লাগল, আমার মনে পরিবর্তন আসতে লাগল, ভাবতে লাগলুম সত্যিই যদি ঐ কথাগুলো সত্যি হয়। কিন্তু তবুও আমি নিজেকে নিজের ধারণা থেকে বদলে নিইনি, কিন্তু ইডার সেই এমন একটা কিছু, আমাকে ভাবিয়ে তুলল, তার সেই কথাটার মধ্যেই সব রহস্যের সন্ধান রয়েছে, তাই এমন একটা কিছুর জন্যেই ত কত মেয়ে বামন, কুঁজো এমনকি দৈত্যদেরও ভালবাসে, তাহলে আমাকেও কেন একজন ভালবাসতে পারবেনা, আমি ত বামন বা দৈত্য নই।

একদিন আমরা সার্কাস দেখতে গেলাম। আমাদের পাশেই হাতধরাধরি করে বসেছিলেন একজন লম্বা চেহারার সুন্দরী ভদ্রমহিলা, আর খেলোয়াড়োচিত চেহারার শক্তিমান এক পুরুষ। কিন্তু তাদের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে সার্কাস দেখতে লাগলাম। মাঝে খেলা দেখানোর জায়গাটা তখন একেবারে ফাঁকা—কিন্তু দূরে একটা উঁচু জায়গায় বসে লাল জামা পরে ব্যাণ্ডের দল একটার পর একটা মার্চের মত বাজনা বাজিয়ে চলেছে। অবশেষে চারজন ক্লাউন এল, তাদের মধ্যে দু'জন খুব বেঁটে, রং করা ঢিলেঢোলা প্যাণ্ট পরে তারা হাসির হুল্লোড় তুলে দিল। ইডা ত হাসতে হাসতে কেসেই উঠল।

তারপর আবার ব্যাণ্ড বেজে উঠল আর সুরু হল ঘোড়ার খেলা—ছটা ঘোড়া, তিনটে কাল আর তিনটে সাদা—তারা গোল হয়ে দৌড়তে লাগল, আর তাদের ট্রেনার লাল রংএর জামা পরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে খালি ছিপটির আওয়াজ করতে লাগল। এমন সময় লাল স্কার্ট আর সাদা জামা পরা একটি মেয়ে এসে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে দৌড়তে লাগল, তারপর কখনো তার ওপর চড়ে কখনও লাফিয়ে নেমে পড়ে খেলা দেখাতে লাগল। ঘোড়ার খেলা শেষ হলে ফের এল ক্লাউনের দল। তাদের মজা দেখানো সাংগ হলে এল এক ট্রপিজ পরিবার, মা বাবা আর ছেলে। সকলেরই সুগঠিত চেহারা, বিশেষ করে ছেলেটির। তারা লাফিয়ে একটা দড়ি বেয়ে উঠে গেল একেবারে তাঁবুর মাথায়। সেখান থেকে ট্রপিজ দুটোকে দুলিয়ে দিয়ে কতরকমের খেলা দেখাতে লাগল। একসময়ে ছেলেটাকে ছুঁড়ে দিল একটা ফুটবলের মত, আর ট্রাপিজটাকে পায়ে আটকে ধরে একজন তাকে খপ করে ধরে ফেললে। আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে খেলা দেখতে দেখতে ইডাকে কানে কানে বললাম, "দেখ আমারও ঐ রকম ট্রপিজের খেলা দেখাতে ইচ্ছে করে, ঐ রকম নিজেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে পা দিয়ে ধরব ট্রপিজটাকে।"

"এত অভ্যেসের ব্যাপার, অভ্যেস করলে তুমিও পারবে।"

সেই সুন্দরী মহিলাটি আমাদের দিকে চাইল—আর কানে কানে সংগীটিকে কি যেন বলল, আর তারপরে দুজনেই হেসে উঠল উচ্চৈস্বরে।

ট্রপিজের খেলার পর প্রধান আকর্ষণ সিংহের খেলা, লাল কোট-পরা কয়েকজন লোক এসে ট্রপিজ খেলোয়াড়দের ব্যবহৃত লাল কার্পেট গুটিয়ে নিয়ে গেল, ইতিমধ্যে দেখা গেল একজন ক্লাউনকে তারা গুটিয়ে নিয়েছে কার্পেটের মধ্যে। ইডা, কার্পেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা ক্লাউনের অসহায় দৃষ্টি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এরপর দেখা গেল যে কয়েকজন লোক একটা সিংহের খাঁচা ঠেলে নিয়ে এল একেবারে মাঝখানে; আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল পাঁচটি সিংহ। একটা সিংহ বেরিয়ে এসেই গর্জন করতে লাগল। তাদের ট্রেনার এলেন। গায়ে তাঁর সবুজের ওপর সোনার কাজ করা জামা, একহাতে ছিপটি আর এক হাতে ছড়ি। তিনি এসেই মাথা নুইয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। সিংহগুলো তাঁকে ঘিরে ঘুরতে লাগল, আর তিনি শান্ত স্মিতহাস্যে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করতে লাগলেন। এরপর তাদের পিঠে খোঁচা দিয়ে তাদের কতকগুলো ছোট ছোট টুলের ওপর উঠতে আদেশ করলেন, সিংহগুলোও গর্জন করতে করতে তাঁর আদেশ পালন করল। তিনি কাছে যেতে কিন্তু একটা সিংহ দাঁত বের করে তাঁর দিকে একটা থাবা এগিয়ে দিল। তিনিও চট করে সরে গেলেন। "ওঁকে যদি খেয়ে ফেলে" ইডা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে তীক্ষ্ণস্বরে বলল। এই সময় গুড় গুড় করে ড্রাম বেজে উঠল, আর সেই ট্রেনর একটা বুড়ো মত সিংহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, সিংহটা হাঁ করল, আর তিনি তারমধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন, পরপর তিন-বার। তীব্র হর্ষধ্বনির মধ্যে আমি ইডাকে বললাম,

"তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না—কিন্তু সত্যি আমায় ইচ্ছে হচ্ছে আমিও ঐরকম সিংহের মুখের মধ্যে মাথা পুরে দি।"

ইডা আমার কাছে এসে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল "আমি জানি তুমি পারবে।" এই কথা শুনে সেই ভদ্র-মহিলাটি হেসে উঠলেন আমাদের দিকে চেয়ে। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না, যে তারা আমাদের লক্ষ্য করেই হাসছে। ইডা রেগে উঠে বলল, "ওরা আমাদের কথা শুনেই হাসছে—গিয়ে বল না এটা অত্যন্ত অভদ্রতা।" এই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল আর সিংহগুলো তাদের খাঁচায় ঢুকে পড়ল॥ খেলার প্রথম অংক হল শেষ।

আমরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম, তারা আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ইডা গট গট করে চলতে চলতে বলল, "তোমাকে বলতেই হবে ওদের, ওরা কত বড় অভদ্রতা করেছে; যদি না বল তাহলে বুঝব তুমি একটা কাপুরুষ।'

আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, ঠিক করলুম কিছু একটা করতে হবে। বড় তাঁবুটার বাইরে সার্কাসের চিড়িয়াখানা। সেখানে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে সার্কাসের জন্তুদের দেখা যায়। সেখানে সারি সারি খাঁচার মধ্যে হিংস্র জন্তুরা থাকে—আর একদিকে খড়ের ওপর জেব্রা

হাতি, ঘোড়া, কুকুর সব ছাড়া অবস্থায় থাকে। জায়গাটা অনেকটা অন্ধকার কিন্তু তার মধ্য থেকেই দেখতে পেলুম, তারা দুজন ভাল্লুকের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ভদ্রমহিলা নীচু হয়ে ঘুমন্ত ভাল্লুকটাকে দেখছিলেন, আর সঙ্গীটি তাঁর হাত ধরে সেখান থেকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন। আমি ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে কঠিন স্বরে বললাম, "আপনারা আমাদের দেখে হাসছিলেন কেন?"

তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন "কই না ত, আমরা ত একটা মশাকে হাতি হবার চেষ্টা দেখে হাসছিলাম।'

"আর সেই মশাটা বোধহয় আমি?"

"যদি তাই মনে করেন তাহলে তাই।"

ইডা আমার হাত ধরে ক্রমশ তার দিকে ঠেলা দিচ্ছিল। আমি গলা চড়িয়ে বললাম, "আপনি একটি আস্ত গাধা।"

তিনি রেগে উঠলেন, "ওঃ মশা তাহলে হুল ফোটাতে আরম্ভ করেছে।"

তাই শুনে ভদ্রমহিলা হাসতে সুরু করলেন। ইডা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "এতে হাসবার কিছু নেই··· মনে করছেন কিছু জানি না, কিছু দেখিনি, আপনি আমার স্বামীর গায়ের সংগে গা ঘষছিলেন, দেখিনি কি।"

আমি অবাক হয়ে গেলুম, কারণ আমি এটা লক্ষ্যই করিনি, তিনি আমার পাশে বসেছিলেন তাই হয়ত তাঁর কনুইটা আমার গায়ে লেগেছিল। তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থামুন, থামুন, আপনার বোধহয় মাথার ঠিক নেই।"

"না আমার মাথা খুব ঠিক আছে, আমি দেখেছি গায়ে গা লাগাতে।" "ঐ গবার সংগে গা ঘষতে যাব কেন, যদি গা ঘষতে হয় তাহলে একজন সত্যিকারের পুরুষের সংগে গা ঘষবো, এই দেখুন সেই মানুষ।" বলে তিনি ভদ্রলোককে হাত ধরে টেনে এনে দেখালেন, ঠিক যেমন কসাই মাংস তুলে খরিদ্দারদের দেখায়। "দেখুন কি রকম স্বাস্থ্যবান চেহারা, কি শক্তি গায়ে।"

সেই ভদ্রলোক আমার সামনে এগিয়ে এসে ভয় দেখিয়ে বললেন, "হয়েছে হয়েছে, শীগগির চলে যান এখান থেকে, তা নাহলে ভাল হবে না বলছি।"

আমি বুক চিতিয়ে আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে তাঁর সমান হবার চেষ্টা করে বললাম, "ও ভারী আমায় ভয় দেখাতে এসেছেন।"

তারপর যা কাণ্ড ঘটল তা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। সেই ভদ্রলোক আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আমায় চ্যাংদোলা করে ওপরে তুলে ধরলেন ঠিক হাল্কা পালকের মত। আগেই বলেছি, আমাদের সামনেই খড়-বিছানো জায়গায় সার্কাসের জন্তু জানোয়ার ছিল, সামনে ছিল তিনটে হাতি। তারা এককোণে লম্বা লম্বা কান আর শুঁড় আনত করে শুয়েছিল। আর সেই লোকটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটার পিঠের ওপর আমায় ধপাস্ করে বসিয়ে দিলেন। আর সেই জন্তুটা হয়ত ভাবলে যে এবার তাদের খেলা দেখাবার সময় হয়েছে, তাই সে আমাকে পিঠে নিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলে। চারদিক থেকে লোক দৌড়ে এল। ইডাও চিৎকার করতে করতে দৌড়তে লাগল। আর আমি, যাতে পড়ে না যাই সেজন্যে নীচু হয়ে হাতিটার কানদুটো পাকড়াতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আমি হাতিটার পিঠ থেকে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলাম। মাথার পেছনে বেশ জোরে লেগেছিল। তার পরের ঘটনা আমার মনে নেই, কারণ আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। যখন জ্ঞান হল দেখি আমি এক First Aid Postএ শুয়ে আছি, আর ইডা আমার পাশে বসে আছে আমার হাতটা ধরে। একটু সুস্থ হয়ে আমরা সেখান থেকে চলে এলাম সার্কাসের দ্বিতীয় অংশ না দেখেই।

পরদিন ইডাকে বললাম, "তোমার জন্যই সব হল, তুমি আমার মাথায় কি যে ঢুকিয়ে দিলে, তাতে মনে হল আমি একটা কি না কি, কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলার কথাই ঠিক, আমি একটা গবা ছাড়া আর কিছু নয়।"

কিন্তু ইডা আমার একটা হাত ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তুমি আশ্চর্য্য সুন্দর, লোকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর তাই তো সে তোমাকে ঐ হাতিটার পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিল। তুমি যখন হাতিটায় চড়ে যাচ্ছিলে তখন তোমায় কি অপূর্বই না লাগছিল—তুমি পড়ে যেতে বড় দুঃখ হল।"

কাজেই করবার কিছু নেই। ইডার কাছে আমি একরকম, আর অন্য লোকের কাছে আর একরকম। কিন্তু আপনারা কি বলতে পারেন—মেয়েরা যখন ভালবাসে তখন প্রিয়তমের মধ্যে কি তারা দেখতে পায়।

ব্যর্থতা

শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত

বাহিরেতে ঐ সোনালী আলোর,
নীচে ওকে নিয়ে চলো।
প্রতিদিনই ওর ঘুম যে ভাঙ্গাত,
সূর্য্যেরই মৃদু স্পর্শ ;
লুটিয়ে পড়তো ওর বুকে, মুখে,
মুঠো মুঠো মিঠে আলো।
বল্‌তো যে, "জাগো! মাঠেতে এখনও
ছড়ানো হয় নি শস্য।"

আজকেও যদি কিছুতে তাহার,
এই কালঘুম ভাঙ্গ্‌তো ;
অমলিন এই দরদী সূর্য্য
নিশ্চয় তাহা জান্‌তো।

এই বাসভূমি বসুন্ধরা,
সূর্য্যেরই এক অংশ।
রক্তমাংসে গড়া জীবদেহ
সুগঠিত এই অঙ্গ,
এখনও তাপ রয়েছে যাহাতে ;
প্রাণসঞ্চার কি কঠিন তাহাতে ?
যদি এই ছিল তার পরিণতি,
আলো দিয়ে তারে রাঙ্গাতে।
কিবা প্রয়োজন ? সকলি ব্যর্থ
পৃথিবীরই ঘুম ভাঙ্গাতে।

* [সৈনিক ইংরেজ কবি W. Owen এর 'Futility' নামক বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অপর এক সৈনিক বন্ধুর উদ্দেশ্যে এই কবিতাটী রচিত।]



সরকারী কাজে বাংলা ভাষা—

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন যে, আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক দিন হইতে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গরাজ্যের সকল সরকারী কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা নীতি-হিসাবে প্রবর্তিত হইবে। এই কার্য্যে প্রথম দিকে অবশ্যই কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিবে। বহু বৎসর ধরিয়া আমরা ইংরাজী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছি—তবে সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে সে সকল অসুবিধা দীর্ঘস্থায়ী হইবেনা। সকল রাজ্যই নিজনিজ মাতৃভাষাকে সরকারী কাজের বাহন করিতেছে—পশ্চিমবঙ্গ সে বিষয়ে পিছাইয়া থাকিলে তাহা লজ্জার বিষয় হইত।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—

গত ১১ই মার্চের সংবাদপত্রে প্রকাশ—১৯৬১ সালের লোক গণনায় জানা গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬৩ লক্ষ হইতে গত ১০ বৎসরে শতকরা ৩২.৯ ভাগ বাড়িয়া এক্ষণে প্রায় সাড়ে তিন কোটি হইয়াছে। ১৯৫১ সালে লোকসংখ্যা ছিল—২৬৩০২৩৪৬—আর ১৯৬১ সালে হইয়াছে ৩৪৯৬৭৬৩৪। অন্যান্য জেলার তুলনায় কলিকাতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা কম। কলিকাতা ও হাওড়া সহরের জনসংখ্যা এইরূপ

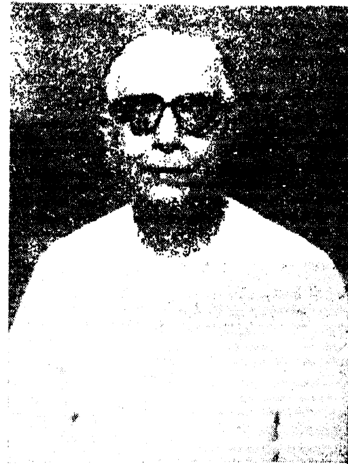
কলিকাতা—১৯৫১—২৬৯৮৪৯৪
১৯৬১—২৯২৬৪৯৮

হাওড়া—১৯৫১—৪৩৩৬৩০
১৯৬১—৫১৪০৯০

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯.১—কলিকাতা সহরে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫৮.৫ জন। জন্মের হার বাড়িয়াছে ও মৃত্যুর হার কমিয়াছে—ফলে জনসংখ্যা এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। জনসংখ্যার হিসাব দিয়া দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা স্থির করা হয়—কাজেই এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হইবে এবং সমস্যা সমাধানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—

খ্যাতনামা নাট্যকার ও সাংবাদিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত গত ৫ই মার্চ রবিবার বেলা ২টার সময় কলিকাতা ২৮এ



শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভুপেন্দ্র বসু এভেনিউ শ্যামবাজারস্থ বাসভবনে ৬৭ বৎসর বয়সে রক্তচাপবৃদ্ধির ফলে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৪০ বৎসর কাল কলিকাতার রঙ্গালয়ে তাঁহার বহু নাটক অভিনীত হইয়াছে। ১৮৯৩ সালে খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে জন্মলাভ করিয়া রংপুর জেলাস্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িয়া তিনি কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে ভর্তি হন—তৎপরে বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি শিক্ষকতার সহিত বিপ্লব প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন। পরে তিনি কিছুকাল আর-জি কর মেডিকেল স্কুলে ও কটক মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা লাভ

করেন। কিন্তু পুলিস বাধা দেওয়ায় পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই—পরে কিছুকাল মৈমনসিংহে থাকিয়া কবিরাজী শিক্ষা করেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। তিনি বিজলী, আত্মশক্তি, নবশক্তি, বৈকালী, কৃষক, ভারত প্রভৃতি বহু সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রে বহু বৎসর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-লাভ করেন। তাঁহার প্রথম নাটক গৈরিক পতাকা অভূতপূর্ব সাফল্যদান করিয়াছিল। ক্রমে রক্তকমল, ঝড়ের রাতে, জননী, সতীতীর্থ, স্বামীস্ত্রী, তটিনীর বিচার, প্রলয়, আবুল হাসান, নার্সিং হোম, সংগ্রাম ও শান্তি, সুপ্রিয়ার কীর্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, কাঁটাকমল, ধাত্রীপান্না, নরদেবতা, কালো টাকা, বাংলার প্রতাপ প্রভৃতি বহু নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হন ও প্রায় সকল নাটকই বহু সময় ধরিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আদর লাভ করে। তিনি পথের দাবী, রজনী, সাহের বিবি গোলাম প্রভৃতির নাট্যরূপও দান করেন। তাঁহার রচিত "বাংলার নাটক ও নাট্যশালা" সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। তিনি শান্তি পরিষদের প্রতিনিধিরূপে চীন, রাসিয়া প্রভৃতি বহু দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সে ভ্রমণ-কাহিনী 'মানবতার সাগর সঙ্গমে' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহুকাল ভারতবর্ষের লেখক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী বলিয়া তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।

ফরক্কার সেতুবাঁধ—

১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের অভূতপূর্ব বন্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিশিষ্ট এঞ্জিনিয়ার শ্রীমানসিংহের নেতৃত্বে ১৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত কমিটীর প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ—ফরক্কার নিকট গঙ্গার সেতুবাঁধ নির্মাণ ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। অবিলম্বে সরকারের ঐ কাজ আরম্ভ করা উচিত। কলিকাতা সহরকে রক্ষা করার জন্যও হুগলী নদী তথা গঙ্গার সংস্কার করা প্রয়োজন। কলিকাতার জল নিষ্কাষণেরও কোন উপায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহর তথা নিম্ন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কি হইবে, সে বিষয়ে সকলে ভীত হইয়াছেন। কলিকাতায় জল সরবরাহ ও সহরের জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা না হইলে শুধু বড়বড় বাড় নির্মাণ করিয়া সহরকে রক্ষা করা যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া ১৯৬১—৬২ সালের ব্যয়বরাদ্দে এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন।

পূর্বপাকিস্তানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

সম্প্রতি কয়েক দিন ধরিয়া পাকিস্তানের নানা জেলায় সংখ্যাল্প হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নানা প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা কম বটে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এখনও বহু হিন্দু বাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। এবারের দাঙ্গায় বিশেষ করিয়া ধনী ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ লুঠ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে বহু জেলায় এই হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—ফলে বহু সম্ভ্রান্ত ধনী হিন্দু নিহত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাকিস্তান রাষ্ট্রনেতা জেনারেল আয়ুবের সহিত ভারত-নেতা শ্রীনেহরুর কয়েকটি বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ার ফলে জেনারেল আয়ুব এই সকল দাঙ্গা-দমনে প্রথমে তেমন অবহিত হন নাই। ১০।১৫ দিন পরে পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু পাকিস্তানবাসী হিন্দুরা আর তথায় নির্ভয়ে বাস করিতে সাহস করিতে পারিতেছে না। ইহার ফল ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীনেহরুকে সকলেই এ বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে আবেদন জানাইয়াছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী, রসবেত্তা ও খ্যাতনামা আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টা ৪৪মিনিটে তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ গৃহে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র অলক গুপ্ত প্রভৃতি শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার প্রতুল গুপ্ত আমেরিকায় আছেন। তাঁর মৃত্যুতে কলিকাতার নাগরিক জীবনে যে স্থান শূন্য হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ২ পুত্র, কন্যা প্রভৃতির মৃত্যুতে তিনি বিশেষ শোকার্ত হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন আইন-ব্যবসায়ী রূপে তিনি সারাভারতে সর্বজনপরিচিত

হইয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনই বাংলা সাহিত্যে নব নব অবদানের দ্বারা সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ—

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৭ই মার্চ সকাল ৮টা ৫০মিঃ দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী, একমাত্র পুত্র কে-সি-পন্থ, ২কন্যা লক্ষ্মী ও পুষ্প মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী মেনন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী প্রভৃতি ঐ সময় পন্থজীর গৃহে উপস্থিত ছিলেন। পন্থজী ১৮৮৭ সালে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনি নৈনিতালে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন ও ১৯২৩ সালে উত্তর প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ও ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন—

গত ১০ই মার্চ কলিকাতার নিকট দক্ষিণ দমদমে যশোহর রোডের ধারে নয়াপট্টি রোডে ৩৩ বিঘা জমীর উপর রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরিচালনায় বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন নামে মহিলাদের জন্য একটি আবাসিক তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের কলেজের উদ্বোধন হইয়াছে। আগামী জুলাই মাসে কলেজের কাজ আরম্ভ হইবে। দমদমনিবাসী শ্রীডি-এন-ভট্টাচার্য্য এ জন্য এক বিরাট সম্পত্তি দান করিয়াছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা সচিব ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন—উপস্থিত ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার, অধ্যক্ষ ডাঃ রমা চৌধুরী প্রভৃতি। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বিদ্যাভবনের জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভাষণ দেন। এইরূপ মহিলা-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল—রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় আমরা সে জন্য দেশবাসী সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

কলিকাতায় ইংলণ্ডের রাণী—

ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও তাঁহার স্বামী এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বিকালে কলিকাতায় আসিয়া ২ দিন বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনে যে বিরাট সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব বলা যায়। সাজসজ্জা ও লোকসমাগম পূর্বের সকল ঘটনাকে অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি কৃষি মেলা, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত প্রীতি-সম্মিলনীতে মিলিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী সকল দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন—ভারতবর্ষও দেখিয়া গেলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ তাহার জনকল্যাণ কার্য্যের জন্য বহু বিদেশী সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—ইংলণ্ডও প্রচুর সাহায্য দান করিয়াছে। রাণীর আগমনের ফলে ভারত-বৃটেন সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া ভারতের উন্নতি সাধিক হউক, ইহাই সকলে কামনা করে।

ডাক্তার অনিলকুমার দাস—

হায়দ্রাবাদের নিজামিয়া মান-মন্দিরের ডিরেক্টার ও কোদাইকানাল মান-মন্দিরের প্রাক্তন ডেপুটী ডিরেক্টার ডাক্তার অনিলকুমার দাস গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৫৭ বৎসর বয়সে হায়দ্রাবাদে পরলোকগমন করিয়াছেন! তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন ও ১৯৬০ সালে 'পদ্মশ্রী' লাভ করেন! তাঁহার চেষ্টায় কোদাইকানাল মানমন্দির পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মান-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মোৎসব—

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মদিন দোলোৎসবে ২রা মার্চ কলিকাতায় বিপুল হরিনাম সংকীর্তন ও বিরাট সভা হইয়াছিল। উত্তর কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কের মত স্থানে তিলধারণের স্থান ছিল না—তিন

ঘণ্টা ধরিয়া উত্তর কলিকাতার পথে এক মাইল দীর্ঘ সংকীর্তনের মিছিল চলিয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টার পর খ্যাত-নামা নাম-প্রেমী ভক্ত ও সাধক শ্রীল সীতারামদাস ওঙ্কার-নাথের সভাপতিত্বে বিরাট মঞ্চের সম্মুখে জনসভা হয়! মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও প্রাক্তন-স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাপ্রভুর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। সর্বশেষে সভাপতি ওঙ্কারনাথজী সুললিত ও সুমিষ্ট ভাষায় বহুবিধ প্রার্থনা জানাইয়া বহুক্ষণ উপদেশ দান করেন! তাহার ভাষণে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংকীর্তন মিছিলের সহিত তিনিও কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়াছিলেন। মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং সর্বসাধারণের মধ্যে পুণ্য দিনে এই ভাবে ধর্ম প্রচার ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়—দেশে সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে।

নূতন নাগা রাজ্য গঠন—

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী আসামের রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশ কোহিমাতে অন্তবর্তীকালীন নূতন নাগারাজ্য গঠন করেন। ইহা ভারতীয় ইউনিয়মের মধ্যে ষোড়শ রাজ্য। ৪২ জন সদস্য-নেতা ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহাদের লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হয়। নূতন রাজ্যের আয়তন—(১) নাগাপাহাড়—৪২৯৮ বর্গ মাইল ও (২) তুয়েনসাং—২০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা নাগাপাহাড়—২০৫৯৫০—তুয়েনসাং—২লক্ষের কিছু বেশী।

সুরেশচন্দ্র তালুকদার—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ ও খ্যাতিমান এডভোকেট সুরেশচন্দ্র তালুকদার ৮১ বৎসর বয়সে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার কলিকাতা ভবানীপুরস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া তিনি ১৯১৬ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন—তৎপূর্বে তিনি ১০ বৎসর বরিশালে উকীল ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ছিলেন—১৯৫৪ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

যাদুকর পি-সি সরকার—

(১) ইণ্টারন্যাশানাল ব্রাদারহুড অব্ ম্যাজিসিয়ান্স ও (২) সোসাইটী ফর আমেরিকান ম্যাজেসিয়ান্স—২টি আমেরিকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর সংস্থা। প্রথম সংস্থার ইণ্টারন্যাশানাল সভাপতি শ্রীহ্যারিস এ সলোমন ইতিপূর্বে ভারতীয় যাদুকর পি-সি সরকারকে "বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যাদুকর" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্থার সভাপতি শ্রীউইলিয়ম-জে-ম্যাকার্থি বর্তমান বৎসরের জন্য যাদুকর সরকারকে তাঁহার সংস্থার ভারতীয় সহ-সভাপতি পদ দানে সম্মানিত করিয়াছেন। পূর্বে আমেরিকার বাহিরের আর কেহ এ সম্মান লাভ করেন নাই। একজন ভারতীয়ের এই অসাধারণ সম্মান লাভে ভারতবাসী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন।

সকল শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর লোকসভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৫৯-৬০ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের নহে—সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়া তাহাকে জাতীয় সমস্যারূপে বিবেচনা করা উচিত। সে জন্য রাজ্য সরকারসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উপযুক্ত সংস্থা গঠন করা কর্তব্য। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকগণের বেতন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিলেও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্য বহু স্থানেই কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। কমিশন এ বিষয়ে অবহিত হওয়ায়, আমাদের বিশ্বাস, সত্বর এই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণীত হইবে।

॥ দস্তুর ॥



পথচারী : শীগগির···শীগগির এসো, সেপাইজী···ঐ ছুটন্ত বাস এক ভদ্দরলোককে চাপা দিয়ে মেরেছে !···

সেপাই : তা, পুলিস কি করবে ?···বাস্ পথে রোজই ছুটবে, আর রোজই মারবে···যেমন দস্তুর !···



অক্ষরে অক্ষরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ট্যাক্সি উত্তর মুখে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। যানবাহন আর জন-বাহুল্যে মহানগরীর পথ আকীর্ণ। এই সন্ধ্যার আলোয় উৎপলের মনে হল সে যেন এক অচেনা নগরীর পথ দিয়ে ছুটে চলেছে। তার গন্তব্যের স্থিরতা নেই, লক্ষ্যের নিশ্চয়তা নেই। এক রহস্যময় পুরীতে দিশেহারা পথিকের মত সে চলেছে তো চলেইছে। কিন্তু এই নিরুদ্দেশ চলার মধ্যে কিসের যেন এক অননুভূত উল্লাস আর আনন্দের স্বাদ পেল উৎপল। মাঝে মাঝে এই শহরের অপরিচিত কোন জায়গায় গেলে পর এ রকম অচেনা অচেনাই মনে হয়। কিংবা হয়ত উৎপল নিজেই তার পরম পরিচিত জগৎকে মাঝে মাঝে এক রহস্যময়তার আবরণে আবৃত করে দেখতে ভালোবাসে। কিন্তু নগরীর এই অঞ্চলটি ততখানি অপরিচিত না হোক—যে মহিলাটি এখন উৎপলের পাশে বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। নিতান্তই এক বৈষয়িক কাজে, তাঁর মৃত স্বামীর জীবনী লেখার দায়িত্ব নিয়ে উৎপল তাঁর সংস্পর্শে এসেছে। কাজের বিনিময়ে টাকা। এ ছাড়া আর কোন সম্পর্কই তো তাদের মধ্যে নেই। তবু উৎপলের মনে হচ্ছে সেই সম্পর্কের সীমা একটু একটু করে তারা যেন অতিক্রমও করছে। এই যে দুদিন ধরে সাহিত্য, সমাজ, তার লেখার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে আলাপ আলোচনা তাদের মধ্যে চলেছে, তা কি শুধুই বৈষয়িক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ আছে? অবশ্য উৎপলের কাজের ধরণটাই এমন যে দোকানের জিনিস কেনার মত তা এক কথায় শেষ হবার নয়। কথা তাকে বলতেই হবে, কথা তাকে বলতেই হবে। সেই সহস্র প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কথার ভিতর থেকে নিজের কথাবস্তুটুকু ছেঁকে নিতে হবে উৎপলকে।

ট্যাকসি মৌলালীর মোড়ে আসতে অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন, ‘আপনি কি এখানে নামবেন—না আপনাকে মানিকতলা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসবে?’

উৎপল বলল, ‘না না। আমি এখান থেকেই যেতে পারব। আপনি কেন মিছিমিছি—।’

অনুরাধা বললেন, ‘আর একটা কথা বলি। যদি কিছু মনে না করেন, আর আপনার তেমন কোন কাজ না থাকে তাহলে আপনিও আমাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে পারেন।’

উৎপল বলল, ‘আমার আর কী কাজ।’

কথাটা বলে ফেলেই উৎপল ভাবল এভাবে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করলেও হত। সে যে বেকার—তা এমন স্পষ্ট করে বলবার দরকার ছিল কী।

অনুরাধা হেসে বললেন, "তা ঠিক। আমাদের কাজের সঙ্গে আপনাদের কাজের অনেক তফাৎ। আমাদের বাঁধা সময়ের বাঁধা কাজ। আপনারা যখন ঘোরেন বেড়ান, গল্প করেন—তখনো আমাদের কাজ চলতে থাকে। অভিজ্ঞতার পুঁজি যত বাড়ে ততই তো আপনাদের ভালো।'

ড্রাইভারকে ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে চলতে বলে অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন, 'কী বলুন, ঠিক বলিনি ?'

উৎপল বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি ভাবছি আপনি এ সব কথা জানলেন কী করে। আমার মনে হয় মুখে স্বীকার না করলেও আপনি গোপনে কোন না কোন শিল্পের চর্চা করেন। না হলে তার অন্দরমহলের এত কথা আপনার পক্ষে জানা কী করে সম্ভব ?'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'আপনার কথার ধরণ অনেকটা বিশুর মত। এটা অমন কেন হল মা ? ওটা তুমি কী করে জানলে ? যখন আমার সঙ্গে বিশু একা থাকে ওর জেরার চোটে আমি অস্থির হয়ে যাই। কিন্তু বাইরের আর কেউ থাকলে ও বিরক্ত করে না। ও তখন ওর বাবার বয়সী পারফেক্ট জেণ্টলম্যান।'

উৎপল লক্ষ্য করল—বিশু সত্যিই ড্রাইভারের পাশে চুপচাপ বসে রয়েছে। নিজের মনেই রাস্তার লোকজন দোকানপাট দেখতে দেখতে চলেছে। বাইরের আর কোন ভদ্রলোক সঙ্গে থাকলে যে দুরন্তপনা করতে নেই, এমন কি মার ওপরও কিছুক্ষণের জন্যে দাবি ছেড়ে দিতে হয়—এ শিক্ষাও বোধহয় অনুরাধাই ছেলেকে দিয়েছেন, কি বিশু নিজেই দেখে শুনে খানিকটা বুঝে নিয়েছে।

অনুরাধা বললেন, 'আপনাকে বিশুর সঙ্গে তুলনা করলাম বলে আপনি রাগ করলেন না তো ?'

উৎপল হেসে বলল, 'রাগ কেন করব। আপনি আমাকে শিশুই বলুন, আর বৃদ্ধই বলুন আমি যা তাই থাকব।'

অনুরাধা বললেন, 'কিন্তু তাই কি সব সময় থাকি ? নিজের বয়সের কথা কি সবসময় আমরা মনে করে বসে থাকতে পারি ?'

উৎপল বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকাল। একথা কাকে বলছেন অনুরাধা ? নিজের বয়সকে যে সব সময় নিজের সঙ্গে বয়ে নেওয়া যায়না, বয়ে নিতে ইচ্ছা করেনা একি ওঁর নিজের অভিজ্ঞতা ?

তা ছাড়া কি। আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু লিখি, তার কিছুই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। উৎপলের মনে পড়ল একটু আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা বলছিলেন অনুরাধা। লেখকের অভিজ্ঞতা যত বাড়ে—যত বিচিত্র হয়—ততই ভালো। এই যে একটি রূপবতী বুদ্ধিমতী মহিলার পাশে বসে সে গল্প করতে করতে যাচ্ছে—এও তো এক ধরণের অভিজ্ঞতা। যদিও এ অভিজ্ঞতা হয়তো তার কোন কাজেই লাগবেনা। কোন গল্পে কি উপন্যাসে সরাসরি এর ব্যবহার সে করতে পারবে না। করবার কথা মনেই হবে না। তবু এই ভালো-লাগাটুকু পরম উপভোগ্যতার মধ্যে এই খণ্ডিত সময়ের ব্যাপ্তিটুকু মনে আরো অনেক প্রসন্ন মাধুর্যের সঙ্গে মিশে থাকবে। তারপর একদিন আকস্মিকভাবে তার রচনার মধ্যে কোথায় কীভাবে তার প্রকাশ হবে উৎপল তা নিজেও বলতে পারে না। অভিজ্ঞতা এইভাবেই প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে আসে। তাকে কাজে লাগাবার ধরণটাও এমনি পরোক্ষ। লেখকের সচেতন চিন্তা চেষ্টার বাইরে সে প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রসঙ্গের পায়ে পায়ে গায়ে গায়ে এসে উপস্থিত হয়। তাকে আলাদা নাম গোত্রে ঘটনায় সন তারিখে চিহ্নিত করা যায় না। এই অভিজ্ঞতা কোমর বেঁধে অর্জন করব বলে অর্জন করা যায়না। আবার কোন অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখব বলে তোড়জোড় করে লিখতে বসলেই লেখা হয়ে ওঠেনা। বেশির ভাগ সময়েই সে সব রচনা ঘটনার বিবরণমাত্র হয়, শিল্পের রূপ রস বর্ণে গন্ধে ভরে ওঠেনা। তবে কি লেখক সচেতনভাবে কিছুই করবেন না ? নানা বিষয়ে পড়াশুনো করবেন না, তাঁর অধ্যয়ন চিন্তা পর্যবেক্ষণের সচেতন অনুশীলন করবেননা ? শুধু কি আলো হাওয়া রোদবৃষ্টির মত স্বাভাবিক-ভাবে যা আসে, জীবনের পথে চলতে চলতে যে কয়েকটি মানুষের সঙ্গে জানাশোনা দেখা সাক্ষাৎ বা তাঁদের গভীর অগভীর কিছু না কিছু ছাপ তাঁর মনে মুদ্রিত হয়ে থাকে লেখক, কি শুধু সেই সঞ্চয়ের ওপরই নির্ভর করবেন ? তাঁর এই অনায়াস সংগ্রহশালা কি নিতান্তই ক্ষুদ্রায়তন আর বৈচিত্র্যহীন হবেনা ? আর এই সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল সৃষ্টির সর্বাঙ্গে কি তুচ্ছতার ছাপ লেগে

থাকবেনা? তাই যদি হয় তাহলে উৎপল নিজের দায়িত্ব পালন করছেনা, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে যাওয়া আর এত দীর্ঘক্ষণ সময় কাটানো অকর্তব্যের পর্যায়ে গিয়ে পড়ছে। কারণ এতে তার অভিজ্ঞতা সত্যিই বাড়বেনা। অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সে নিতান্তই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে ডুবে থাকবে।

'চুপচাপ কী ভাবছেন বলুন তো?'

অনুরাধার কথায় উৎপল তার চিন্তা সমুদ্রের তলা থেকে যেন ওপরে ভেসে উঠল।

উৎপল বলল, 'কই কিছুই ভাবছি না তো।'

অনুরাধা হাসলেন, 'কিছুই ভাবছেন না? কারো মন এতক্ষণ ধরে একেবারে বিনা ভাবনায় বসে থাকতে পারে আমি তা বিশ্বাস করি না।'

উৎপল বলল, 'তাহলে আপনিই বলুন কী ভাবছিলাম।'

অনুরাধা বললেন, 'নিজের মনকে অত নির্ভয়ে আর একজনের হাতে ছেড়ে দেবেন না। আমি কিন্তু থট-রিডিং জানি।'

উৎপল হেসে বলল, 'ভয় নেই বলেই তো ছেড়ে দিতে পেরেছি।'

অনুরাধা বললেন, 'তাহলে শুনুন। আপনি ভাবছিলেন—আচ্ছা এক নাছোড়বান্দা মহিলার পাল্লায় পড়া গেছে। কোথায় এই সন্ধ্যার সময় আমি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেব, তাদের সঙ্গে গল্প করব, চা খাব, ঘুরে বেড়াব, তা নয় ইনি আমাকে ছেলের জামা কেনার জন্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তাতে আমার লাভ কি? বলুন ঠিক বলিনি?'

অনুরাধার অনুমান অনেকটা কাছাকাছি গেলেও উৎপল প্রতিবাদ করে বলল, 'না মোটেই ঠিক বলেন নি। আপনার থট-রিডিং আমার বেলায় একেবারেই ভুল হয়েছে। কারো কারো হাতের লেখা যেমন অস্পষ্ট, সহজে পড়া যায় না, কারো কারো মনের চিন্তাও তেমনি দুষ্পাঠ্য, সহজে অনুমান করবার জো নেই।'

অনুরাধা উৎপলের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে কী দেখলেন, তারপর হেসে বললেন, 'তাই নাকি? ওপর থেকে আপনাকে তো অমন দুর্বোধ্য আর জটিল মানুষ বলে মনে হয় না? তাহলে আপনিই দয়া করে বলুন, কী ভাবছিলেন। দোহাই আপনার বানিয়ে বলবেন না। বানিয়ে বানিয়ে লেখাটা আর্ট, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে বলাটা নীতি-বিরোধী। তাতে মিথ্যা কথনের পাপ হয়।'

উৎপল অনুরাধার কথার ভঙ্গিতে, কণ্ঠের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে রইল। সময় নষ্ট করার জন্যে যে অনুশোচনা একটু আগে তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—তা একেবারে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। অনুরাধার কথার মধ্যে যে নৈকট্য, বন্ধুত্বের প্রশ্রয় রয়েছে তা যেন এই মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবার নয়। তা যেন আরও দূর ভবিষ্যতের দিকে আঙুল বাড়িয়ে রেখেছে। সেই একটি মাত্র রেখাই যেন জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র।

উৎপল বলল, 'আপনার মানসপাঠ ভুল বলে ধরা পড়েছে। এবার আমি যা বলব তাই আপনার বিশ্বাস করতে হবে।'

উৎপল কি একটু বেশি দাবি করে বসল? প্রাপ্যের অতীত অধিকার চাইল সে? তার এই দাবির জোর দেখে কিছু মনে করবেন না তো মিসেস রায়?

কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হল না তিনি কিছু মনে করেছেন।

অনুরাধা বললেন, 'সে আপনার বিশ্বাস করাবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।'

উৎপল কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ বিশু পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'মা, ওই যে ভারতী স্টোর্স। এই ড্রাইভার—রোকো রোকো—আমরা এখানে নামব।'

অনুরাধা হেসে বললেন, 'ছেলের কিন্তু চোখ এড়াবার জো নেই। আমি তো ভাবছিলাম বিশু, তোমাকে একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে বাড়ি নিয়ে যাব। জামাটা বরং আজ থাক কী বলো?'

বিশু বলল, 'ঈস তা হবে না। আমার জামা আজ কিনে দিতে হবে।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে অনুরাধা ছেলেকে নিয়ে সুবৃহৎ ভ্যারাইটি স্টোর্সে গিয়ে ঢুকলেন। উৎপল চলল তার পিছনে পিছনে। যেতে তার আগ্রহও আছে আবার একধরণের কুণ্ঠাও জড়িয়ে রয়েছে। এখানে তার ভূমিকাটি কী, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে উৎপলের মনে। সতীশঙ্করের জীবনী লেখক হিসাবে এখানে তার আসবার

কথা ছিল না, মিসেস রায়কে সান্নিধ্য সাহচর্য দান তার কৃত্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবু মিসেস রায় তাঁদের সঙ্গে আসবার জন্যে সামান্য একটু অনুরোধ করা মাত্রই উৎপল রাজী হয়েছে। উৎপলের মনে পড়ল—বেশ কয়েক বছর আগে একবার সে ছাত্র পড়াবার কাজ নিয়েছিল। মাস দুয়েক পড়াবার পর ছাত্রের মা একদিন বললেন, 'মাষ্টার-মশাই, আপনাকে একটু কাজ করে দিতে হবে। কলেজ ষ্ট্রীট থেকে আপনার ছাত্রের একখানা বই এনে দিতে হবে। উনি বাড়িতে নেই—।'

তত প্রসন্ন মনে না হলেও বই এনে দিয়েছিল উৎপল। বইয়ের পর খাতা পেনসিল কালি-কলম। তারপর যখন ক্রমে ব্যাঙ্কের চেক ভাঙাতে কি ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার অনুরোধ আসতে লাগল উৎপল কোন কারণ না দেখিয়ে টুইশনটি ছেড়ে দিয়ে এল।

উৎপলের দাদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কীরে পাথুরে-ঘাটায় আর যাচ্ছিসনে যে ?'

উৎপল বলেছিল, 'ও টুইশন ছেড়ে দিয়েছি দাদা।'

দাদা বলেছিলেন, 'কেন রে! কেবল ধরছিস আর ছাড়ছিস, ব্যাপারখানা কি।'

উৎপল জবাব দিয়েছিল, 'ব্যাপার আর কিছুই নয়। বেশিদিন ওখানে ছেলে পড়ালে পড়ানো ছাড়া আর সব কাজেই পাকা হয়ে যাব। বাজার করা, ছাত্রের ছোট ভাই-বোন ক'টিকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—সবই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

দাদা-বউদি দুজনেই হেসে উঠেছিলেন।

এখনো তো প্রায় সেই ব্যাপারই ঘটতে যাচ্ছে। জীবনী লেখার কাজ নিয়ে এসে উৎপল মিসেস রায়ের সঙ্গে জামা কিনতে বেরিয়েছে। এর পর আরো কত ফাই-ফরমায়েস খাটবে। শেষ পর্যন্ত আর সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাজারের ফর্দ লিখবে উৎপল, মিসেস রায়ের জমা-খরচের খাতা লিখবে। কে জানে ভিতরে ভিতরে অনুরাধা হয়তো উৎপলের সেই ব্যক্তিত্বের, তার সূক্ষ্ম মান-সম্মান বোধের পরীক্ষাই নিচ্ছেন। আর পদে পদে ফেল করছে উৎপল। হেরে যাচ্ছে, কিন্তু এ ধরণের ঝুঁকি নিতেই হয়। কাগজের রিপোর্টারকে যেমন অনেক বিপদ-আপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তেমনি সাধারণ লেখককেও অনেক প্রীতি-কর অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে না গেলে চলে না। শুধু শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা নয়, অনেক অনাদর, অবহেলা অপমান লাঞ্ছনায় তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অনুভূতি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়। লেখকের এই সব অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শিল্পের মধ্যে এই সব বস্তুই নৈর্ব্যক্তিক রূপ নেয়। জনসমাজ থেকে বহু দূরে, শ্রদ্ধার উঁচু আসনে বসে তিনি তাঁর মান-সম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারেন—কিন্তু সে যেন দূর থেকে সমস্ত দেখার মত। পাহাড়ের চূড়া থেকে পৃথিবীকে দেখার মত। সেই চূড়ায় বসে তিনি যা তৈরী করেন তা বরফের পুতুল। রক্ত-মাংসের মানুষ তৈরী করতে হলে লেখককে রক্ত-মাংসের আনন্দ আর যন্ত্রণার স্বাদ নিতে হয়, হাটের ধুলো গায়ে মাখতে হয়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে মুহুর্মুহু ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় তাঁকে। এই জন্যেই অকল্যাণ অসংযম অপচয়··· আর তাই নিয়ে অনুশোচনা লেখকের নিত্য সঙ্গী। এসব বাদ দিয়ে তিনি চলতে পারেন না। সৃষ্টির সময় কেউ কেউ এসব বাদ দেন। তাঁদের হাতে আম-জাম-সবেদা-আতার মত ফল ফলে। আবার কারো হাতে আনারসের চাষ ছাড়া আর কিছু হয় না। অনেক ফেলে ছড়িয়ে তবে তার রসে গিয়ে পৌছতে হয়।

নিজের আচার-আচরণকে ফলতত্ত্বের আশ্রয় দিল উৎপল। মনের মত একটি উপমা পেয়ে খুসি হয়ে উঠল।

অনুরাধা বললেন, 'উৎপলবাবু আসুন।'

একটি দোকান তো নয় একটি বাজার। জামা-কাপড় শাড়ি ব্লাউস থেকে শুরু করে স্নো-পাউডার সেন্ট, মনো-হরণ, নয়নহরণ নানা বস্তুর বিপণি। কোথাও বিল লেখা হচ্ছে, কোথাও প্যাকিং হচ্ছে, কোথাও চেকিং হচ্ছে। দেখতে দেখতে এগোতে এগোতে অনুরাধা দর্জিদের কাউন্টারে এসে থামলেন।

উৎপলও তাঁর পিছনে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোগা মত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফিতে দিয়ে একজন খদ্দেরের বুকের ছাতির মাপ নিচ্ছিলেন, অনুরাধাকে দেখে বললেন,—'আরে আপনি যে—মিসেস রায়। কী আশ্চর্য আপনি এসেছেন—'

অনুরাধা স্মিতমুখে বললেন 'এলাম। আপনারা তো আর খোজখবর নেবেননা বিপুলবাবু।'

বিপুলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কী যে বলেন। আপনি যখনই ডেকে পাঠাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হব। সতীশঙ্করদা কী কম করেছেন আমাদের জন্যে? সারাজীবনেও যে সে ঋণ শোধ হয়না। এক মিনিট। আমি ওঁর মাপটা নিয়ে নি মিসেস রায়।' অনুরাধা বললেন 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি হাতের কাজ সেরে নেবেন বইকি। আমার তাড়া নেই।'

এখানেও সতীশঙ্করদা! উৎপল ভাবেনি তার ভাবী নায়কের নামটি এখানেও ধ্বনিত হবে। অনুরাধা কি তাহলে ইচ্ছা করেই উৎপলকে নিয়ে···ছেলের জামা কেনাটা তাহলে শুধু উপলক্ষ্য? বেড়ানোটাও তাই? একমাত্র লক্ষ্য সতীশঙ্করের জীবন, সতীশঙ্করের জীবনী প্রণয়ণ? মুহূর্তের জন্যে এই মৃত অতীত মানুষটির উপর খানিকটা ঈর্ষ্যা বোধ করল উৎপল। অশরীরী প্রতি শরীরীর ঈর্ষ্যা। এই ঈর্ষ্যায় অশরীরীর কিছু এসে যায় না। শুধু শরীরীর দেহ মন চঞ্চল হয়, বিকৃত হয়। উৎপল ভাবল—সারা শহর ভরে যে সতীশঙ্করের অনুগৃহীতেরা ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রমাণ আর উৎপলের কাছে তুলে না ধরলেও পারতেন অনুরাধা। সে তা স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিয়েছে। যাঁরা ক্ষমতাবান—দল পুষ্টির জন্যে তাঁরা এমন অনেককেই অনুগ্রহ করেন। তাতে তাঁদের নিগ্রহের শক্তি আরো বাড়ে। যাঁরা আত্মীয়-বৎসল তাঁদের পরন্তপ হতে বাধা নেই।

একটু বাদে ব্যস্ত বিপুলবাবু কথা বলবার অবসর পেলেন। বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই বুঝি ছেলে? দেখেই চেনা যায়। আর বলে দিতে হয়না। সেই নাক মুখ, সেই চোখ, অবিকল সেই জোড়া ভ্রূ—ঠিক যেন ছেলের রূপ নিয়ে আমাদের সেই সতীদা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বুঝলে খোকা, শুধু বাপের মত দেখতে হলেই হবেনা। বাবার মত শক্তি রাখা চাই, কীর্তিমান পুরুষ হওয়া চাই। বাবার নাম রাখতে হবে তোমাকে।'

বিশু সরে এসে লজ্জিতভাবে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বাপের নাম রাখার কোন পরিকল্পনায় তার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয়না।

বিপুলবাবু এতক্ষণে উৎপলের দিকে তাকাবার অবসর পেলেন, 'আপনার কী চাই স্যার?'

অনুরাধা একটু হেসে বললেন, 'উনি আমার সঙ্গে এসেছেন। আমার অনুরোধে এসেছেন। পরিচয় দিলে চিনতে পারবেন। লেখক উৎপল সেন।'

বিপুলবাবুর দুটি চোখের কোন পরিবর্তন হলনা। উৎপল তা আসাও করেনি। কিন্তু বিপুলবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড় করে নমস্কার জানালেন, 'কী ভাগ্য, কী ভাগ্য।'

অনুরাধা তবু যেন কৌতুক করবার জন্যেই বললেন, 'পড়েছেন ওঁর কোন বই?'

বিপুলবাবু বললেন, 'আর লজ্জা দেবেননা মিসেস রায়। লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক কি আর আছে?' একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'সেই আটটায় বাড়ি থেকে বেরোই, আর ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ছেলেমেয়েগুলি কী করছে না করছে দেখতে পারিনে—আর কি নিজে পড়ব। থাকগে খোকার একটা জামা করে দিই কী বলুন?'

বিশু বলে উঠল, আমরা তো সেই জন্যেই এসেছি। বিপুলবাবু হেসে বললেন, 'তাই বলো? এতক্ষণ অমন চুপ করে ছিলে কেন।'

কাপড় বাছাই আর জামার মাপ নেওয়ার পর্ব শেষ হলে অনুরাধা বললেন, 'আপনার সঙ্গে আরো একটু দরকার আছে বিপুলবাবু।'

'বলুন।'

অনুরাধা বললেন, 'আমি ভেবেছি উৎপলবাবুকে দিয়ে ওঁর একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনী আমরা লিখিয়ে নেব।'

বিপুলবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ। খুব ভালো হয় তাহলে। অমন একজন মানুষের বায়োগ্রাফি অবশ্যই থাকা উচিত মিসেস রায়।'

অনুরাধা বললেন, 'আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে বিপুলবাবু। সে যুগের অনেক কথাই আপনি জানেন—।'

বিপুলবাবু বললেন, 'জানি বইকি মিসেস রায়। কিন্তু এযুগে এসে এই হাল হবে এ কথাটাই শুধু জানা ছিলনা। আজতো সময় নেই। উনি যদি দয়া করে আর একদিন আসেন, তাহলে বড় ভালো হয়। এই সন্ধ্যার দিকে নয় এ সময় বড় ভিড়। এখনতো মরবারও ফুরসুৎ নেই দয়া করে সকালের দিকে আসবেন। তখন—।'

দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে নামল উৎপল। ভাবল—ইনিও কি বিপ্লবী ছিলেন! যে হাতে বোমা মেরেছেন, পিস্তল বন্দুক ধরেছেন, সেই হাতে এখন কাঁচি আর গজ ফিতে প্রহরণ হয়ে উঠেছে! তাতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। যুদ্ধের সময় যারা সৈনিক, শান্তির সময় তারা হলধর। জীবন সংগ্রামের প্রহরণ তো একরকমের নয়। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর জীবিকায় খুসি নন। হয়তো শ্রমের তুলনায়—বাড়িতে যে সব পোষ্য আছে তাদের অনুপাতে পারিশ্রমিক নিতান্তই কম। বড় বড় সব কর্মশালায় বাণিজ্যকেন্দ্রে এই সব অসংখ্য ক্ষুদ্র কর্মীই তো ভিড় জমিয়ে রাখে।

অনুরাধা বললেন, 'আমার স্বামীই বিপুলবাবুকে এই কাজ জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ভারতী স্টোর্সের ডিরেকটরদের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা ছিল। দিনে অনেক সুপারিশ চিঠি তিনি চাকরিপ্রার্থীদের জন্যে লিখতেন। নিজের প্রেস্টিজ নিয়ে দূরে সরে থাকবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। আমি এই নিয়ে কতদিন রাগ করেছি। কেন যেখানে সেখানে ওদের পাঠাও। মিছিমিছি মুখ হারানো। সবাই তো তোমার কথা রাখেন না। তিনি বলতেন—আমার কথার চেয়ে ওদের প্রাণের দাম বশি। যদি কারো হয়ে যায়, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি ক। এমন অনেকের সুবিধা সুযোগের জন্যেই তিনি চেষ্টা করে গেছেন। আজ আর তাদের দেখা মিলবারও জো নেই। সংসারের নিয়মই এই। দরকার ফুরোলেই সম্পর্ক ফুরোল।'

একটু চুপ করে থেকে রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অনুরাধা বললেন, 'এখন কী করা যায় বলুন তো। ট্রাম বাসে ওঠা যাবেনা। ট্যাকসিটা ছেড়ে দিয়ে ভুলই করেছি। আর একটা ট্যাকসি কি এখন আর চাইলেই মিলবে?'

উৎপল বলল, 'চলুন এসপ্লানেডের দিকেই বরং এগোন যাক। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

বিশু বলল, 'আমি কিন্তু এক্ষুণি বাড়ি যাব না মা।'

অনুরাধা বললেন, 'ওমা, তবে কোথায় যাবি?'

বিশু বলল, 'সেদিনকার মত আমি রেস্টুরেণ্টে খাব, গঙ্গার ধারে বেড়াব, জাহাজে উঠব—।'

অনুরাধা গম্ভীরভাবে বললেন, 'না বিশু, আজ আর ওসব হবে না। পদ্মা তোর লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে। জানেন উৎপলবাবু, আমার এই ছেলেটির লোভের সীমা নেই। একবার রাস্তায় বেরোলে ওর আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না।'

উৎপল স্মিত মুখে অনুরাধার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। আজ সেও যে কখন ঘরে ফিরতে পারবে তার কিছু ঠিক নেই। (ক্রমশঃ)

লাওসের সঙ্কট : 'ভদ্রলোকের লড়াই'

—অনাদিনাথ পাল—

কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে। লাওসে নাকি Gentle-manly war' অর্থাৎ ভদ্রলোকের লড়াই চলেছে! ও যেন সোনার পাথর বাটির মতোই হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য। অন্য লোকে একথা বললে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যেতো। অথচ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অল্প কিছুকাল আগে ঐ শব্দ দুটোই লাওসের হালের যুদ্ধ সম্পর্কে মোক্ষম প্রয়োগ করেছেন। তবে একথা বলার অর্থ হয়ত এই যে—লাওসে খুব কম লোকই হতাহত হচ্ছে, ক্ষতির পরিমাণও কম, বিস্তারও ততো নয়। আর এ যুদ্ধের আর একটা বৈশিষ্ট্য —এটা সবিরাম ও এর গতি মৃদুমন্দ। যেন জিরিয়ে জিরিয়ে ঢিমেতালে বলেকয়ে লড়াই। চূড়ান্ত হেস্ত-নেস্ত করার ইচ্ছা যেন কোন পক্ষেরই নেই। যেমন পুরানো দেশ, তেমন পুরানো যুদ্ধরীতি ও কৌশল, ততোধিক পুরানো মন। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও অনুত্তেজক। মনে হয় যুদ্ধবিগ্রহেও মাটির স্বাদ—বৌদ্ধ জীবন-দর্শনের দীর্ঘায়ত ছায়া।

* * * *

হালের বিবাদের সূচনা ১৯৫৯ সালের জুলাই থেকে। কিন্তু গত দশএগার বছর ধরেই এর রেওয়াজ চলেছে—তবে তালভঙ্গ, গতিভঙ্গ হচ্ছে বৈকি। কখনো কম, কখনো বেশি—কখনো ঢিমেতালে, কখনো বা দ্রুত লয়ে। অথচ বিশ্ব-পটভূমিকায় এখানকার যুদ্ধটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক নয়; ঘরোয়া বিবাদের সূতো আন্তর্জাতিক শক্তি-দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়েছে। এখানেই যত কিছু ঝামেলা ও বিপদ। একে নিয়ে মাথা-ব্যথা শুধু রাশিয়া বা আমেরিকার একার নয়—ভারতসহ পূর্ব-এশিয়ার ছোট-বড় সকল দেশের তো বটেই, এমনকি খোদ রাষ্ট্র-পুঞ্জেরও। যেহেতু যুদ্ধ শেষ মনে হলেও এখানকার চিতা-চুল্লী অনির্বাণ। অন্তত অবস্থা দেখে তা-ই মনে হয়।

* * * *

একদিকে ঘরোয়া বিবাদ—শাসন ক্ষমতা দখলে রাখার নানা ছল-চাতুরী ও চক্রান্ত। অন্য দিকে বিরোধী শক্তি-জোটের আবির্ভাব। এতে অল্প-প্রাণ লাওসের প্রাণান্ত; অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যাবতীয় স্বাধীন দেশের মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম, সাকুল্য এলাকা ৯০ হাজার বর্গ মাইল। জনসংখ্যাও লাখ চল্লিশ। লোকজন কষ্টসহিষ্ণু যেমন, পরমতসহিষ্ণুও তেমনি। রাজশাসনাধীন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। দেশটা কিন্তু একদম গরীব, কৃষিপ্রধান; আধুনিক শিল্প-সংগঠন প্রায় নেই বল্লেই চলে। অথচ ভূগোল ও ইতিহাস এর কপালে যেমন প্রসিদ্ধির তিলক এঁকেছে, তেমনি করেছে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন লণ্ডভণ্ড ও অন্যের লোভের বলি। এর উত্তরে চীন ও উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণে কম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, পশ্চিমে তাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্ম, আর পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কিছুটা। উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের লাগোয়া সামানার বিস্তার ছ'শ মাইল। তা' ছাড়া ভিয়েৎনাম (উভয়), কম্বোডিয়া, তাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মের সঙ্গে সাধারণ সীমান্ত। অর্থাৎ অন্য দিক যেমনতেমন, ভৌগোলিক অবস্থিতি হেতু এর সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। তাই ইন্দোচীন অন্তরীপের দুরধিগম্য অঞ্চলে নানা দেশ-বেষ্টিত হলে হবে কি, গত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস এর আদৌ নিরুপদ্রব নয়। বরং লোভীর লোভে বারবার একে আত্ম-বলি দিতে হয়েছে, চার পাশের ক্ষমতালোভী রাজাদের কামনার ইন্ধন হয়েছে লাওস।

* * * *

লাওসের পুরানো ইতিহাসের রহস্য এখনও কম-বেশি অনুদ্‌ঘাটিত। তবে তাই-দের এদেশে আসবার আগে এখানকায় আদিবাসী হলো মেও বা ময়, ফৌথেং ও ইয়াও এরা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। অর্ধেকেরও বেশী হলে (২০ লক্ষের মতো) বংশানুক্রমিক ধারায় লাও। এ

তাই বংশোদ্ভব। এদের ছাড়া ডজনখানেক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী আছে। কাজেই সংখ্যাগুরু লাওদের ভাষাই এখানে রাজভাষা আর ধর্ম বৌদ্ধ। এ সত্ত্বেও বিভিন্ন গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির সমবায়ে দেশটা গঠিত। তবে জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মাত্র সাক্ষর।

অবশ্য দেশটা জঙ্গল ও পাহাড়ময়। যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে আদিম যুগের। রেল নেই বল্লেই চলে। রাস্তা-ঘাটের সংখ্যা অল্প; আর সারা বছরে ব্যবহারের উপযোগী বিমান ক্ষেত্রের সংখ্যা মাত্র গুটিকয়। আধুনিক পরিবহন অজ্ঞাত-প্রায়। এখানকার বৈষয়িক অবস্থাও সঙ্গীণ; ৯৫ শতাংশ লোকের জীবিকা আহরণ হয় ভূমি থেকে। প্রধান ফসল ধান, বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য চলে। পণ্যদ্রব্যে পরনির্ভর; রপ্তানী বাণিজ্যের আয় বছরে ২০-৩০ লক্ষ ডলার। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বছরে মাত্র ৫০ ডলার। হালে যন্ত্র-বিদ্যার সঙ্গে পরিচয়, তা-ও বেশিটা যুদ্ধের দৌলতে।

* * * *

আগে লাওসের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে; আর ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। যদিচ এর বেশির ভাগ বিষয়ে প্রমাণসিদ্ধ নিদর্শন উপস্থিত করা কঠিন, তবু ৭১৩ খৃঃ অঃ নাম চাও-এর (Nam Tchao) প্রথম স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কাহিনী জানা গিয়েছে। তবে অষ্টাদশ শতকে শ্যামদেশীয়রা লাওসের অধিকাংশ দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে নেয়; অন্যদিকে আনামীরা দেশের দক্ষিণ পূর্বাংশ কুক্ষীগত করে। অবশ্য উত্তরাংশের লুয়াং প্রবাং-এর রাজা নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করলেও আনামের সম্রাটকে ১৮৩০ সাল থেকে কর দিতে হয়। কিন্তু ফরাসীরা ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ লাওস জয় করে (এর আগেই আনামে ফরাসী পতাকা উড়েছিল)। আর ১৯০৪ সালে উত্তর লাওসের লুয়াং প্রবাং রাজ্য এর রক্ষণাবেক্ষণে আসে। এমনি করে ইন্দোচীন অন্তরীপের (১) লাওস, (২) কম্বোডিয়া (৩) টংকিং (৪) আনাম ও (৫) কোচিন-চীন ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। ফরাসী গবর্নর জেনারেল ছিল এসবের প্রকৃত শাসনকর্তা। তবে তাদের অধীনে লাওস ও কম্বোডিয়ার রাজা, আর আনামের সম্রাট নিজ নিজ এলাকায় প্রজাদের ওপর নামমাত্র কর্তৃত্ব করতেন।

* * * *

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়-ঝাপ্টায় সব কিছুর মতো লাওস ও ইন্দোচীনের অন্যান্য এলাকায় ফরাসী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিজয়ী সেনা নিয়ে আসে জাপান। ১৯৪৫ সালের ৯ই মার্চ সমগ্র লাওস জাপ নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম উপলব্ধি করে তারা দেশময় মুক্তিস্পৃহা জাগিয়ে দিয়ে যায় এবং ইচ্ছা করেই—যাতে পশ্চিমী সাবেক মনিব আর ফিরে ঘাটি গাড়তে না পারে। নিজেরা তো থাকবোই না, অন্যকে—বিশেষ করে ঘোর শত্রু পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ প্রভুকেও আদৌ নয়—এই তাদের কর্মকৌশল। কাজেই আগস্টে ('৪৫) আত্মসমর্পণের আগে ১৫ই এপ্রিল জাপ রক্ষণাধীনে লাও সরকার গঠিত হয়। উত্তর লাওসের লুয়াং প্রবাং-এর রাজা শিশাভং ভং (১৯০৩ সাল থেকে লাওসের রাজা) সারা লাওসের রাজা ঘোষিত হন। তা' ছাড়া ইন্দোচীনের আর চারটে এলাকাতেও স্বাধীনতার দাবি স্বীকৃত হয়।

* * * *

লাওসে জাপ-রাজত্বের মেয়াদ অল্প; কিন্তু দেশবাসী মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল। তা-ই তারা সঙ্ঘবদ্ধ মুক্তিকাম দল খাড়া করে। এর নাম 'স্বাধীন লাও' ('লাও ইসারা' বা লাওদের দেশ)। এর জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রথম চোটেই ফরাসী-পন্থী বলে রাজাকে গদীচ্যুত করে স্বল্পস্থায়ী 'অস্থায়ী সরকার' গড়েন। আর করেন প্রত্যাবর্তনকারী ফরাসী বাহিনীকে (৪৬ সালের এপ্রিল) প্রতিরোধের জন্যে ছোট ছোট সশস্ত্র দল সংগঠন। কিন্তু যে নাগাদ পর্যুদস্ত হয়ে অস্থায়ী সরকারের নেতারা থাইল্যাণ্ড পালিয়ে যান; আর সেখানে 'নির্বাসিত সরকার' গড়েন। এহেন অবস্থায় ফরাসী শাসন কায়েম হলো বটে, তবে একবার যারা মুক্তির স্বাদ পায়, সে-ই বহুদিন ও বহুভাবে বঞ্চিত মানুষেরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই ফরাসী প্রশাসক দল এক ঢিলে দু'পাখী মারবার কৌশল করে,—নিজেদের বহাল রাখে ও জাতীয় অস্থিরতাকে ঠাণ্ডা রাখে। লুয়াং প্রবাং-এর রাজা শিশাভং ভং-কে তারা সারা লাওসের নিয়মতান্ত্রিক রাজা করে ও ভিয়েনতিয়েন রাজবংশের প্রিন্স

সোভন্ন ফৌমাকে প্রধান মন্ত্রী করে অখণ্ড লাওস গড়বার জাতীয়তাবাদী নীতি স্বীকার করে নেয়, ১৯৪৬ সালের আগস্টে এক অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করে, আর নয়া রাজত্বকে বহুলাংশে প্রশাসন কর্তৃত্ব দেয়। আবার তারা টংকিং, আনাম ও কোচিন-চীনকে নিয়ে নয়া ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র গঠন করে। আনামের প্রাক্তন সম্রাট বাওদাইকে এর প্রধানরূপে খাড়া করা হয়। এর পর ধাপে ধাপে লাওসের পুরো শাসন ক্ষমতালাভের পালা। ১৯৪৭ সালের মে-তে নয়া সংবিধান বলবৎ হবার পর থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের মারফৎ পরিষদীয় রাজনীতির আমদানী হয়। আর ১৯৪৯ সালের জুলাই-এ ফ্রান্সের সঙ্গে নিষ্পন্ন চুক্তি অনুযায়ী ফরাসী ইউনিয়নের ভেতর লাওস স্বাধীনতা পায়। আর এর পর থেকেই সূচনা হয় নয়া যুগের। ব্যাঙ্ককের 'নির্বাসিত সরকার' ভেঙ্গে দেওয়া হলো ; 'স্বাধীন লাও'-এর অধিকাংশ নেতা দেশে ফিরে আসলেন। উদ্দেশ্য রাজকীয় শাসনে দেশের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। কিন্তু লাওসের স্বাধীন সত্তা পুরোপুরি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত জন-আন্দোলনের গতি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ফলশ্রুতি : '৫৩ সালের অক্টোবরে লাওসের পূরা স্বাধীনতা লাভ ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি ; তবে কয়েকটি বৈষয়িক ও সামরিক ব্যাপারে ফ্রান্সের দুটো ঘাঁটি রাখবার ও তদারকীর ক্ষমতা থেকে যায়। কিন্তু একদিকে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রচণ্ড চাপ ও হানাহানি, অন্যদিকে অশান্ত জনমতের চাপে এ-ক্ষমতাও তাদের চূড়ান্তভাবে ছাড়তে হয় '৫৪ সালের শেষভাগে, আর '৫৫ সালের ডিসেম্বরে বিশ্বসভা—রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম সদস্যরূপে লাওসের অভ্যুদয়।

* * *

কিন্তু দুঃখের নিশা শেষ হতে চায় না। যদিচ পরবশতা শেষ হলো, ঘরোয়া বিবাদ মিটলো না। একে জীইয়ে রাখলো একদিকে নিজেদের ভেদবিভেদ ও অন্যদিকে বাইরের শক্তি, একদা যে-'স্বাধীন লাও'-এর (Free Lao or Lao Issara) উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম (১৯৪৫) সাধারণ শত্রু উপনিবেশবাদী ফ্রান্সকে তাড়াতে, গড়ে উঠল তারই আনুষাঙ্গিক 'প্যাথেট লাও' প্রতিরোধ কমিটি। এর জন্ম কাল ১৯৪৬ সাল নাগাদ। তবে ভিয়েৎনামের মুক্তি আন্দোলনের জন্য ১৯৪৫ সালে হ্যানয়ে গঠিত ডি আর ভি (D R V) বা Democratic Republic of Vietnam-ই এর আদর্শ, আর রসদ সংগ্রহের উৎস। এই ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রথম দিকে উত্তর ভিয়েৎনামের যাবতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মিলন ভূমি হলেও পরে এর সর্বময়নিয়ন্তা হো-চী-মিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টি। ১৯৪৬ সালের শেষভাগে যখন উত্তর ভিয়েৎনামে এদের ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদলের মধ্যে প্রচণ্ড আহব শুরু হয় তখন অনিবার্যভাবেই ভিয়েৎনামের অন্যান্য অংশেও তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসে দাবাগ্নি জ্বলে। বলা বাহুল্য, অবস্থাটা ফরাসীদের আদৌ কাম্য ছিল না। তাই তারা ইন্দোচীন অন্তরীপের পর্বতসঙ্কুল দুরধিগম্য অনগ্রসর ও কৃষিপ্রধান লাওসে কিছুটা দেশ-শাসনের নামে স্বায়ত্ত-শাসনের নকল ক্ষমতা দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চায়। এ-চালবাজিতে কিছুকাল তা'রা সফলও হয়েছিল। তবে এলাকাটি অনুন্নত, স্থানীয় লোকজনের রাজনীতি-জ্ঞান প্রখর নয়, দাবিদাওয়াও যৎসামান্য। আর হানাহানি ও রক্তারক্তির মূল ক্ষেত্র উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন। কাজেই ১৯৪৯ সালে 'স্বাধীন লাও'-এর (Free Lao) অধিকাংশ নেতা লাওস-সরকারে যোগ দিতে বা এখানকার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে যখন ফিরে এলেন, তখনও কিন্তু ফরাসী বিরোধীর সংখ্যা একেবারে লোপ পায়নি। এঁরা যেন রক্তবীজের গোষ্ঠী। এমনকি তখনকার প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সোভন্ন ফৌমার ভাই—প্রিন্স সৌফান্নুভং-এর নেতৃত্বে কিছু বামপন্থী বেঁকে বসেন। ভিয়েৎনামের সংগ্রামীদের সঙ্গে হাত মেলান ; ফরাসী উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্ন লোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এমনকি ১৯৪৯সালে 'নির্বাসিত বা প্রবাসী সরকার' ভেঙ্গে দেওয়ার আগেই প্রিন্স সৌফান্নুভং ব্যাঙ্ককে 'লাও মুক্তি কমিটি' গড়ে তোলেন এবং '৫০ সালের সেপ্টেম্বরে প্যাথেট লাও প্রতিরোধ গবর্নমেণ্ট' গড়বার কথা উত্তর-ভিয়েৎনাম বেতারে ঘোষিত হয়। এতে করে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। কোন কোন পশ্চিমী রাষ্ট্র, বিশেষ করে আমেরিকার মতে '৪৯ সালে ব্যাঙ্ককে গঠিত সৌফান্নুভং-এর কমিটিই লাওসের বর্তমান যুদ্ধে কুখ্যাত (?)

বা বহুখ্যাত 'প্যাথেট লাও'-এর জনক। তবে একথাও সত্য, দক্ষিণপন্থী সরকারের ফরাসী প্রীতি, আপসরফা ও রাজকীয় শাসনের আনুষঙ্গিক স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির চরম বিরোধিতা ও জনশাসন প্রতিষ্ঠাই এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই অভীষ্ট সাধনের সঙ্গী বলে যাদের তার মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা করে চলাই তা'র পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে সে ডি-আর-ভি (ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিক অব ভিয়েৎনাম) র সর্বাঙ্গীণ সাহায্য পেয়েছে ও পাচ্ছে। নীতি, কৌশল ও ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তার পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই অনেকের মতে বর্তমানে কম্যুনিস্ট উত্তর ভিয়েৎনাম তা'র পরমর্শদাতা, মিত্র ও সমব্যথী। এই হেতু 'প্যাথেট লাও'কে কম্যুনিস্ট বলা হয়। যে-নামেই বলা হ'ক, এর মূল লাওসের জাতীয় জীবনের গভীরে প্রোথিত। তা ছাড়া, ১৯৫০ সালের পর থেকে কম্যুনিস্ট চীন (এ সময় চীনের মূল ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব পায়) উত্তর ভিয়েৎনামের ফরাসী-বিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করে তোলে;—সমর সম্ভারসহ নানা সাহায্য দিতে থাকে। এর কিছুটা ভাগ লাওসের সংগ্রামীরাও,—বিশেষ করে 'প্যাথেট লাও'-এর অনুগামীরাও পায় এবং যুগপৎ ফরাসী সেনা ও নিজ স্বদেশীয় দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এর ফলে ১৯৫১ সালের জুনে লাওসের 'এক-তৃতীয়াংশে' (চীনা বেতার অনুযায়ী) কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তবে ১৯৫৩ সালের এপ্রিলের পরই উত্তর ভিয়েৎনামের সাহায্যপুষ্ট প্যাথেট লাও বাহিনী দুর্বার গতিতে আক্রমণ চালায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালের শেষাশেষি পর্যন্ত তাদের তিনটি আক্রমণ ধারাই শুদ্ধ হয়ে যায়; অবশ্য লাওসের এক-চতুর্থাংশ তাদের দখলে আসে এবং ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত উত্তর লাওসের সাম নেউয়া ও ফং স্যালি প্রদেশে নিজস্ব প্রশাসনরীতি চালু রাখে। এর পরবর্তী সময়ে নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক মীমাংসা হয়; ফলে 'প্যাথেট-লাও'-এর সামরিক তৎপরতা আপনা থেকেই কমে আসে। এর নেতা ও অনুগামীরা দেশের স্বাভাবিক ও সুস্থ রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে লাওসের ঘরোয়া রাজনীতির টানাপোড়েনের ইতি হয় বলে মনে হয়। কিন্তু তা-ও ক্ষণস্থায়ী। কেন, পরে বলা যাবে।

* * * *

এখানে বলা ভালো, ইন্দোচীন অন্তরীপের লড়াই-এর প্রচণ্ডতা হো-চী-মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েৎনামে যত বেশি সংহত হয়েছিল, এমন আর কুত্রাপি নয়। কাজেই উত্তর ভিয়েৎনামের ওপরই ফরাসী আক্রোশও বন্যাবেগে সহস্র ধারায় নেমে এসেছিল। এর হেতু: পূর্ব এশিয়ার এই কাঁচা-মাল সমৃদ্ধ ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি শুধু একটু হুমকি একটু হুজ্জত-হাঙ্গামা বা সামান্য রক্তারক্তি ও লোকক্ষয়ে ছেড়ে যেতে ফ্রান্স রাজি নয়। কিন্তু ভিয়েৎমিনের সর্বাত্মক আক্রমণে (১৯৪৬-'৫৪) তাদের সঙ্কল্প শিথিল হয়, বানচাল হয় পরিকল্পনা, ভিতে ঘুণ ধরে, অস্তিত্ব-সংকট হয়। একদিকে স্থানীয় লোকজনের প্রতিকূলতা, অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী বিপুল ব্যয়বহুল, বহু দূর-পাল্লার যুদ্ধ চালনায় ফরাসী জনসাধারণের অনিচ্ছা—আর আন্তর্জাতিক বিরোধিতায় (যথা ভারতের আকাশ পথে সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী ফরাসী বিমানের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা) জঙ্গীবাদী ফরাসী প্রশাসকগণ নতি স্বীকার করেন। তাই ইন্দোচীনের যুদ্ধের অবসান কামনায় '৫৪ সালের মাঝামাঝি সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুষ্ঠান; চারমাসস্থায়ী (এপ্রিল—জুলাই) ঐ সম্মেলনের অধিবেশনে যে-শান্তি-চুক্তি হয়, তা'তে করে অশান্ত ইন্দোচীনে শান্তি ফিরে আসে। যেহেতু সকল পক্ষই ওতে যোগ দিয়েছিল, যথা ফ্রান্স, লাওস, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর ভিয়েৎনামের তরফে ডি আর ভি (Democratic Republic of Vietnam), ব্রিটেন ও রাশিয়া, কম্যুনিস্ট চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর ওতে সহযোগী সভাপতি ছিল (Co-chairman) ব্রিটেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা। এখানে উল্লেখ্য, তখনকার ডি-আর-ভি-র পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফামভ্যান্ ডং জেনেভা বৈঠকের একাধিক প্রকাশ্য অধিবেশনে (৮ই ও ১০ই মে) ও বহু বৈঠকে প্যাথেট লাও-এর প্রতিনিধির উপস্থিতির জন্য পীড়াপীড়ি করেও সফল হননি। তবে প্যাথেট লাও-এর নেতা নৌহাক ফৌমসাভান ডি-আর-ভি প্রতিনিধি দলভুক্ত হয়েছিলেন। তা' ছাড়া, লাওসে বৈরিতার অবসানকল্পে যে-চুক্তি হয়েছিল, তা'তে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন 'প্যাথেট লাও'-এর জঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি ও ডি-আর-ভি বাহিনীর তরফে তা কুয়াং বুউ

(ডি-আর-ভি-র সহকারী জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) এবং ফরাসী বাহিনীর তরফে একজন সামরিক প্রতিনিধি। অর্থাৎ প্যাথেট লাও-কে জেনেভার সভা-সমিতিতে পাত্তা দেয়া হলো না, কিন্তু লাওসে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধির সম্মতি ছিল অত্যাবশ্যক। এখানেই পশ্চিমী রাষ্ট্রযূথের যত কিছু কারসাজি। গায়ের জোরে হেরে গেলেও ভোটের জোরে কিস্তিমাতের ব্যবস্থা।

*   *   *   *

এখন লাওসের অবস্থাটা বেশ একটু ঘোরালো, বে-কায়দার। অর্থাৎ সে-ই পুরানো কাসুন্দি। ক্ষমতা দখলের জন্য ঘরোয়া লড়াই, আড়ালে আছে আন্তর্জাতিক ফেউ-এর দল অর্থাৎ শক্তিজোটের খেলা। আমেরিকা ও রাশিয়ার গুঁতোগুতি, পারস্পরিক তর্জনগর্জন। তবে অসার কেউ নয়। কাজেই '৫৪ সালটা গত হলেও '৬০-৬১ সালের মেজাজটা পূর্ববৎ। এহেন অবস্থায় জেনেভা চুক্তি-পত্র থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা দরকার, যথা :—

Article 9. Upon the entry into force of the present agreement and in accordance with the declaration made at the Geneva Conference by the Royal Govt of Laos on 20, July 1954, the introduction into Laos of armaments, munitions and military equipment of all kinds is prohibited, with the exception of a specified quantity of armaments in categories specified as necessary for the defence of Laos.

Article 14. Pending a political settlement, the fighting units of 'Pathet Lao' concentrated in the Provisional Assembly areas, shall move into the provinces of Phonsaly and Sam-Neua,……

Article 25. An international commission shall be responsibie for control and supervision of the application of the provisions of the agreement on the cessation of hostilities in Laos. It shall be composed of representatives of the following states : Canada, India & Poland. It shall be presided over by the representative of India. It's headquarters shall be at Vientiane.

Article 39. The International Commission for supervision and control in Laos may, after consultation with the International commission in Cambodia and Vietnam, and having regard to the development of the situation in Cambodia and Vietnam, progressively reduce its activities. Such a decision must be adopted unanimously.

বলা দরকার, জেনেভা চুক্তির তিনটি অংশ যথা (১) লাওসে যুদ্ধাবসানের চুক্তি (২০শে জুলাই, '৫৪) (২) লাওসের রাজকীয় গভর্নমেণ্টের ঘোষণা (২১শে জুলাই) ও (৩) জেনেভা সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণা (২১শে জুলাই)। শেষোক্ত অংশের ১২নং নিবন্ধে বলা হয়েছে—

In their relations with Cambodia, Laos Vietnam, each member of the Geneva Conference undertakes to respect the sovereignty, the independence, the unity and the territorial integrity of the above-mentioned states, and to refrain from any interference in their internal affairs.

আগে জেনেভা শান্তি-চুক্তির যেসব অংশের কথা বলা হয়েছে, সেসব বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিধান বিহিত হয়েছে দেখা যাবে, যথা (১) বাইরে থেকে সমরোপকরণ আনা বন্ধ ও নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি, (২) লাওসের জাতীয় জীবনে 'প্যাথেট লাও'-এর অবিসংবাদী কর্তৃত্ব স্বীকার, (৩) আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনের করণীয় কাজ ও মেয়াদ নির্ধারণ, (৪) জেনেভা সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলোর লাওস সম্পর্কে কর্তব্যনির্ণয়।

প্রথম দিকে পক্ষভুক্ত সকলের সহযোগিতায় কমিশনের কাজ দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। ভারতের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিশন আপোস-আলোচনার মাধ্যমে বিবদমান পক্ষগুলোকে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সহায় হয়। এর ফলে ফরাসী সৈন্য দেশ ছেড়ে চলে যায়, লুয়াং প্রবাং-এর ১২ মাইলের মধ্যে আগত প্যাথেট লাও সেনারাও উত্তর-পশ্চিম দিকে নিজ প্রভাব-এলাকায় প্রস্থান করে। আবার

রাজসরকারও কোন সামরিক জোটে যোগ না দিতে অথবা কোন বহিঃশক্তিকে দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না বলে অঙ্গীকার করে। এমনকি ২।৩ বছর টানা-হেঁচড়ার পর নির্বাচনী আইন সংশোধন করায় প্যাথেট দল রাজ-সরকারে যোগ দেয়; তাদের দুজনকে মন্ত্রী করে নেওয়া হয়। কিন্তু '৫৮ সালে নির্বাচনের পরই আবার নতুন করে গোল বাধে—প্যাথেট লাও ও তার সহপন্থীরা পরিষদে সংখ্যালঘুদলে পরিণত হয়। কাজেই দক্ষিণপন্থী মন্ত্রিসভা গণতান্ত্রিক-প্রথা অনুযায়ী প্যাথেট লাওকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়; আবার আন্তর্জাতিক কমিশনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এর কাজ গুটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করে। এর ফলে কমিশন শুধু নামসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়; সরকারী অনুজ্ঞায় functious officio বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণদৃষ্টে যা' করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল, হাতেকলমে তা'র বিপরীত ফল পাওয়া গেলো। দেশে আবার কায়েমী ও প্রগতি-বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দেয়, নানা দিকে কুচক্রীদলের খেলা জমে উঠে। এর আড়ালে চলে অদৃশ্য হাতের ভেল্কি-বাজি। এসব নষ্টামির সামগ্রিক ফল: বা Vicious circle-এর সৃষ্টি।

* * * *

এখানে পশ্চাদপটের ঘটনাবলীর উল্লেখ প্রয়োজন। তখন ১৯৫৫ সাল। লাওসের রাজকীয় গবর্নমেণ্ট জেনেভাশান্তি-চুক্তির বিধান অনুযায়ী ২৮শে আগস্ট সারা লাওসে গোপন ভোটের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির করে। কিন্তু মনোমত না হওয়ায় 'প্যাথেট লাও' এতে যোগ দেয় না। ফলে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়। প্যাথেট লাও-এর দাবি ছিল: নির্বাচনী বিধির চূড়ান্ত সংশোধন। শেষ নাগাদ ছিটেফোঁটা রাজকীয় সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি অবশ্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা' যথেষ্ট নয় মনে করে প্যাথেট লাও নির্বাচনে যোগ দেয় না। এসত্বেও নির্বাচন হয় এবং প্রধানমন্ত্রী কাতে ডি সাসোরিথের চালনায় জাতীয় প্রগতিশীল দল (National Progressive Party) ও ফৌমী সানাইকোনের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দল জাতীয় পরিষদের মোট আসনের দু' তৃতীয়াংশ (৩৯টি) দখল করে। এদুটো দলই নরম বা মধ্যপন্থী অর্থাৎ ইংরেজীতে যা'কে বলা হয় moderate। নির্বাচন অন্তে '৫৬ সালের ২১শে মার্চ প্রথমোক্ত দলের অন্যতম নেতা প্রিন্স সৌভন্ন ফৌমার পরিচালনায় নয়া সরকার (৩৩-১ ভোটে) গঠিত হয়। কিন্তু নূতন গবর্নমেণ্ট গঠন সত্বেও—এবং চলতি সংবিধান অনুযায়ী—'প্যাথেট লাও' ছাড়া সবই যেন শিবহীন যজ্ঞ বলে মনে হয়। তাই এর প্রতিনিধিরা যা'তে সরকারে যোগ দিতে পারে, এবং সে-সরকার যেন জাতীয় সরকারের সম্মান পায়,—এমন ব্যবস্থাই করা হয় ১০ই আগস্ট, ১৯৫৬ সালে। অর্থাৎ লাওসে 'প্যাথেট লাও'-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে মিশ্র সরকার,—কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট গড়া হবে বলে রাজ-সরকার প্যাথেট লাও-এর দাবি স্বীকার করে নেয়। এর পর ২৮শে ডিসেম্বর ('৫৬) প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সৌভন্ন ফৌমা, আর প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স শেঠপানু-ভং এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন। এর একাংশ নিম্নরূপ, যথা—The coalition Govt., to which the Pathet Lao forces will be adequately represented, will thus constitute a symbol of the, national reconciliation on the basis of a proper policy aiming at building up a pacific, democratic,united, independent and prosperous Laos. * * *. উভয় নেতা ২৯শে ডিসেম্বর এক চিঠিতে আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দেন যে তাঁদের অনুসৃত ব্যবস্থা অনুযায়ী লাওসের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা হবে ["the political settlement as foreseen by Article 14 of the Geneva Agreement will be realised."]

এর পর যা' কিছু, সবই মামুলি। অর্থাৎ ১৯৫৭ সালের নবেম্বর নাগাদ রাজ সরকার ও প্যাথেট লাও-এর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি (১২ই নবেম্বর); প্যাথেট লাও নেতা প্রিন্স সৌফানুভং হলেন পুনর্গঠিত জাতীয় সরকারে পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন মন্ত্রী, আর ফৌমী বং বিচিত হলেন ধর্ম ও চারুশিল্প-মন্ত্রী। জাতীয় পরিষদ ১৯শে নবেম্বর এ-মন্ত্রিসভাকেই সর্বসম্মত অনুমোদন জানায়। অন্যদিকে প্যাথেট লাও সৈন্যদল ও তার সমরসম্ভার জাতীয় বাহিনীভুক্ত হয়।

* * * *

বলা দরকার, নির্বাচনী বিধি পরিবর্তনের দাবিই ছিলো প্যাথেট লাও-এর সঙ্গে প্রথম দিকে রফা না হবার মূল কারণ। কিন্তু যখন দেখা গেল, একে বাদ দিয়ে চলে না—তখনই শুধু তা'র দাবি মেনে নেওয়া হলো, জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৯ থেকে বাড়িয়ে করা হলো ৫৯ জন। তা ছাড়া, পূর্ব সর্ত অনুযায়ী নতুন নির্বাচন একটু আগে করার ইচ্ছা থাকলেও রাজ সরকার 'নিউ লাও হাক জাত'-এর (Neo Lao Hak Xat,—প্যাথেট লাও-এর রাজনৈতিক ফ্রন্ট) দাবির নিকট ১০ই ডিসেম্বর নতি স্বীকার করে, অর্থাৎ বিলম্বে ১৯৫৮ সালের মে-তে পরিপূরক নির্বাচন হবে বলে দিন স্থির করে। এবং ৪ঠা লাওসের সমস্ত প্রদেশে (নয়া ২০টি ও খালি ১টি, মোট ২১টি আসন) নির্বাচন হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র ও জাতীয় প্রগতিবাদী সরকারপন্থী প্রার্থীরাই অধিকাংশ আসন দখল করেন। 'নিউ লাও হাক জাত' ও সমপন্থী 'শান্তিফাব' দলের সদস্যরা পান মোটামুটি ৪০ শতাংশ ভোট, আর প্রথমোক্ত আসন পায় ৯টি ও শেষোক্ত চারটি। এর ফলে সম্প্রসারিত জাতীয় পরিষদের সদস্য-ভাগ হয় এই মতো, যথা—অকমুনিস্ট ৩৮, নিউ লাও হাক-শান্তিফাব ফ্রন্টের সদস্য ও সমর্থক ২১ জন।

*　　*　　*　　*

'প্যাথেট লাও'-এর আর একটা মূল দাবি রাজ সরকার বহু আগেই (৫৫ সালের ১৯শে এপ্রিল) মেনে নিয়েছিল। তা'হলো : প্যাথেট লাও-নিয়ন্ত্রিত উত্তর ভাগের ফংস্যালি ও সামনেউয়ায় সকল স্তরে যাবতীয় সরকারী চাকরির আধাআধি বখরা পাবে প্যাথেট লাও সমর্থকরা। কিন্তু মূল রাজনৈতিক সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ-প্রস্তাব তাদের কাছে গ্রাহ্য হয়নি। তবে সব কিছু মীমাংসা হবার লক্ষণ দেখা গেলে '৫৭ সালের ১২ই নবেম্বর সরকারী প্রস্তাবটি মেনে নেওয়া হয়। আর প্যাথেট লাও-ও বদলে প্রদেশ দুটোর শাসন ভার ছেড়ে দেয় (৮ই ও ১২ই ডিঃ)। জাতীয় জীবনে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। এ-মধ্যবর্তী টানাপোড়েনের মেয়াদ প্রায় সাড়ে তিন বছর।

*　　*　　*　　*

রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির পর লাওসের রাজনৈতিক আকাশ নির্মেঘ ও নির্মল হয়। চক্রান্ত, শঠতা, বিরোধিতা ও হানাহানির বদলে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ সকল দলের কর্মসূচিতে প্রাধান্য পায়। জাতীয় সরকার ও জাতীয় কাজ হয় একার্থক। মনে হয় আর বুঝি জাতীয় জীবনে মেঘাড়ম্বর হবে না। এমনি ধারা অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শৌভন্ন ফৌমা আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতিকে (২০শে মার্চ, '৫৮) এক পত্রে কমিশনের কাজ গুটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেন। ওতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেন—"* * * the Cabinet Council has decided to ask for the winding up of the International Commission for supervision and control in Laos with effect from the date of supplementary elections (4 May, '58). The Royal Govt, considers in fact that the supplementary elections of May 4, '58 constitute the last phase of the implementation of the Geneva Agreement of 20 July '54, on the cessation of hostilities in Laos.

কাজেই স্বাভাবিকভাবে লাওসের আন্তর্জাতিক কমিশনের তদারকি ১৯৫৮ সালের ১৯শে জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়, আর এর বেশির-ভাগ সদস্য লাওস ছেড়ে চলে যান। তবে ভাগ্যের পরিহাস এই, যিনি উপলক্ষ হয়ে কমিশনকে দেশছাড়া করালেন, তাঁকেই কমিশন অভাবে হালে কম্বোডিয়ায় আশ্রয়প্রার্থী হতে হয়েছে।

*　　*　　*

কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আদর্শ ও স্বার্থগত সঙ্ঘাতের সূচনা হয়। চিরদিন রাজনীতিতে যা হয়ে এসেছে, এখানেও সে-ই বাম ও দক্ষিণমার্গের বিবাদ। ক্রমশ দেখা গেল—বামপন্থী দলরূপে 'নিউ লাও হাক জাত'-এর (প্যাথেট লাও) প্রভাব দিন দিন গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে। এর আদর্শ ও কর্মসূচী সাধারণের ভেতর নূতন সাড়া জাগাচ্ছে। এতে ভয় হয়, আশংকা জাগে—মধ্যপন্থী উভয় দল—জাতীয় প্রগতিবাদী (National Progressive) ও স্বতন্ত্র দলের (Independents)। তা'রা নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব লোপ করে নতুন একটি সংগঠন খাড়া

করে। এর নাম—Rally of the Lao People বা লাও জন-সংস্থা। প্রধানমন্ত্রী সৌভন্ন ফৌমা নির্বাচিত হলেন এর দল-নেতা, আর কাতে ডি সাসোরিথ ও ফৌমী সানাইকোন হলেন সহ-নেতা বা সহ-সভাপতি (১৩ই জুন, '৫৮)।

* * *

লক্ষ্যের বিষয়, পরিপূরক নির্বাচন হয় ৪ঠা মে ('৫৮), জাতীয় পরিষদ একে অনুমোদন করে ২২শে জুলাই ('৫৮)। আর এ-দিনই লাওসের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সৌভন্ন ফৌমার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। এর পর ১৮ই আগস্ট ফৌমী সানাইকোনের নেতৃত্বে এক নয়া সরকার গঠিত হয়। অবশ্য প্যাথেট লাও-এর সদস্যদের বাদ দিয়ে। তবে নয়া সদস্যরা হলেন লাও জনসংস্থা (Rally of the Lao People) ও জাতীয় স্বার্থরক্ষী কমিটির (Committee for the Defence of the National interests) লোকজন। শেষোক্ত দল গঠিত হয় একদল তরুণ সরকারী চাকুরিয়া, ব্যবসায়ী ও সামরিক অফিসারের উদ্যোগে (১৫ই জুন, '৫৮)। এরই নেতা চৌন আউম ও জেঃ নোসাভান—কাজেই ১০।১২ বছর অবিরাম বিরোধ ও অক্লান্ত চেষ্টার পর জাতীয় সংহতির খাতিরে যে-কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট গড়া হয়েছিল, তা' প্রধানত কায়েমী জোটের স্বার্থ-উদ্ধারের কারসাজি ছাড়া কিছু নয়। নইলে এরূপ হঠকারী ও মূঢ় কাজের আর কোন ব্যাখ্যা চলতে পারে কি? যদি আরো কিছুদিন কোয়ালিশন সরকার টিঁকিয়ে রাখা যেতো, তবে নিশ্চয়ই অবস্থার এতো দ্রুত অবনতি ঘটতো না। অথবা তা সম্ভব না হ'লেও পরে নয়া কোয়ালিশন সরকার কি গড়া যেতো না? অবশ্য যদি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির কথা ভেদবাদীদের মনে প্রাধান্য পেতো।

* * *

ফল যা হবার তা-ই হলো। এতো চেষ্টাযত্নে গড়া জাতীয় ঐক্যে ফাটল বাড়লো বই কমলো না। যে জেনেভা শান্তি-চুক্তি হয়েছিল দেশে পারস্পরিক হানাহানির অবসান ঘটাতে, আর জাতীয় সংহতি পুনরুদ্ধারে, নয়া গবর্নমেণ্টের প্রথম কাজেই সেই প্রক্রিয়ায় বাধা পড়ে। ক্ষুব্ধ ও ক্ষমতাচ্যুত প্যাথেট লাও দল সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সরকারবিরোধিতায় প্রবৃত্ত হলো। আর বঞ্চিত আশাহত গরীব মানুষের মধ্যে দলীয় প্রচারের মাত্রা বাড়াতে শুরু করলো। এতে আতংকিত হলো দক্ষিণীরা ও তাদের সহযাত্রীরা। শমন তখন শিয়রে। তাই পাঁচ মাস রাজত্বের পর ১৯৫৯ সালের ১২ই জানুয়ারী জাতীয় পরিষদের জরুরী অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী ফৌমী সানাইকোন ভয়ে ভয়ে বললেন যে নাশকতাবাদীরা জাতীয় পুনর্গঠন ব্যাহত করছে। তবে তিনি এ-খবরও জানাতে কসুর করেননি যে উত্তর ভিয়েৎনাম লাওসের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করছে, এমনকি কোন কোন স্থানে ঢুকেও পড়েছে। অবশ্য এসবই অভিসন্ধিমূলক; সাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টি, আর প্যাথেট লাও-বিরোধী মেজাজ গড়ে তোলার প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ হেন অবস্থায় জাতীয় পরিষদও ১৪ই জানুয়ারী ('৫৯) তাঁকে একবছরমেয়াদী বিশেষ ক্ষমতা দেয় এবং তিনি ইচ্ছামতো মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন (২৪শে জানুয়ারী, ৫৯)। এভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়া সরকারের দাপট ও প্রতিস্পর্ধা প্যাথেট লাও মেনে নেয়নি নির্বিবাদে। সরকার বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ সাধারণও পিছপা' হয় নি। চূড়ান্তভাবে জাতীয় সৈন্যদলভুক্তির প্রশ্নে এর হাজার দেড় সেনা অশান্ত হয়ে উঠে, আর জিয়েং খোয়াং-এ মোতায়েন এক ব্যাটালিয়ন প্যাথেট লাও সেনা সরকারী বেষ্টনী ভেদ করে নিরাপদ এলাকায় চলে যায়। এর প্রতিশোধ হিসাবে প্যাথেট লাও ও 'শান্তিকাব' দলের নেতাদের নজরবন্দী করে রাখা হয়। তবে জুন মাসে সরকারী সামরিক অভিযান বিফল হবার পর এঁদের ওপর থেকেও নিষেধবিধি তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তখন অবেলা।

* * *

এর পর থেকে সবিরাম ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই-এর শুরু উভয় পক্ষে। কখনো গরম, কখনো নরম-গরম, আবার ঠাণ্ডা গরম লড়াই জমজমাট হয়ে উঠে। রাজ-সরকারের অভিযোগ: ডিসেম্বর ('৫৮) থেকে উত্তর ভিয়েৎনামী সেনারা দক্ষিণ পূর্ব লাওসের সাভানখেত প্রদেশের এক ভূমিখণ্ড জবর দখল করে গুটিকয়েক সামরিক ঘাটি স্থাপন করেছে। উত্তর ভিয়েৎনাম তথা চীন গৃহবিবাদে ইন্ধন জোগাচ্ছে, উস্কানি দিচ্ছে। অন্য পক্ষের (কম্যুনিস্ট জোট)

পাল্টা অভিযোগ : জেনেভা চুক্তি ও '৫৬-৫৭ সালের রাজ সরকার-প্যাথেট লাও চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্য ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনামী চরদের মধ্যে যোগসাজস রয়েছে, লাওসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটি স্থাপনে সম্মতি দেয়া হয়েছে, আর প্রচুর মার্কিন ও সামরিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে। উত্তর ভিয়েৎনামের স্থল ও আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে ইত্যাদি। এ সব চাপান ও উতোরে ঠাণ্ডা লড়াই কখনো হিমাঙ্কে পৌঁছে, আবার গরম লড়াই-এর উত্তাপে আবহাওয়া সরগরম হয়। অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগে মেজাজ তুঙ্গে চড়ে। যা' শুধু ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীমিত ছিলো, তাতে ভর করে আন্তর্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্ব। ঘর ছেড়ে বিশ্ব-নিখিলে ঘটে এর প্রসার। তবে একথা সত্যি, '৫৫ সালের ১লা জুন থেকে '৫৯ সালের ৩০শে জুন অবধি লাওসে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ১৯ কোটি ২লক্ষ ৮১ হাজার ডলার (অধিকাংশ লাওসে সেনা পোষণার্থ), এমনকি '৫৯ সালের ২৬শে আগস্টেও বিরোধী শক্তি ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ প্রচুর বাড়ান হয়। এর হিসাবের অঙ্ক অজ্ঞাত। কাজেই প্যাথেট লাও যেমন আশ্রয় করে—প্রতিবেশী উত্তর ভিয়েৎনাম ও তা'র মারফৎ চীন আর রাশিয়াকে, রাজ-শাসিত দক্ষিণমাগা সরকার ধর্ণা দেয় তাইল্যাণ্ড, পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা জোটের প্রতিভূ দক্ষিণপূর্বএশিয়া চুক্তি সংস্থা বা সিয়াটো (SEATO)—আর শেষ ভরসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। এমনি করেই শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু বৌদ্ধ লাও জাতি নানা বিরোধী স্বার্থসংঘাতে উদ্বেল ও ক্ষুব্ধ; আত্মঘাতী আহবে মত্ত।

* * *

'৫৯ সালের জুলাই-এর মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণী চক্রীগোষ্ঠীর দুঃশাসনে ক্ষতবিক্ষত সাম নেউয়াও কিছুটা পরিমাণ ফং স্যালি প্রদেশে সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহ ঘটে; এবং স্বভাবতই এর নেতৃত্ব করে প্যাথেট লাও গেরিলা দল। লাওস-উত্তর ভিয়েৎনাম সীমান্ত বরাবর লাওসের ভেতর ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটার এলাকায় প্রধানত এই সজ্ঘাত-ক্ষেত্র বিস্তৃত। তা' ছাড়া, লাওসের অন্যত্রও সরকার-বিরোধী ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চলতে থাকে। অবস্থা ক্রমশ গুরুতর হয়ে পড়ে। তাই লাও সরকার ৪ঠা আগস্ট ('৫৯) রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল সকাশে প্রেরিত এক তারবার্তায় লাওসের গৃহবিচ্ছেদ ও বহিঃশক্তির (উত্তর ভিয়েৎনাম) একতরফা হস্তক্ষেপের বিষয় অভিযোগ করে। পরে অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর সেক্রেটারী-জেনারেলকে সে-খবরও দেওয়া হয় এবং সদস্যরাষ্ট্ররূপে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জরুরী সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এতদনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ৭ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে রাশিয়া ও পশ্চিমী জোটের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডার পর আর্জেন্টিনা, ইতালী, জাপান ও তিউনিসিয়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে তথ্যনিরূপণকারী কমিটি গঠন করা হয়। আর ১৫ই সেপ্টেম্বর কমিটি লাওসে পৌঁছে যথারীতি তদন্ত করে। এতে করে লড়াই আর বেশি ছড়ায় না, বরং সাময়িক শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু তা' ঝড়ের সংকেত।

* * * *
* * *

কমিশন কিন্তু লাওস আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখতে পাননি। যা হ'ক, '৫৮-৬০ সাল পর্যন্ত লাওসে কোন স্থায়ী মন্ত্রিসভা ছিলনা। রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে রাজার মর্জিমাফিক পরপর ৩,৪টি মন্ত্রিসভার উথানপতন ঘটে এ সময়। সৌভন্ন ফৌমার পর ফৌমী সানাইকোন, খো অভয় ও প্রিন্স শিমশানপ একে একে এসেছেন ও বিদায় নিয়েছেন। এখানকার অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জ সরকারী অনুরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারে হ্যামারশীল্ড ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে আসেন এবং অবস্থা দৃষ্টে তখনকার প্রধানমন্ত্রী সানাইকোনকে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন। এতেই দক্ষিণপন্থীরা ক্ষু হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। রাজা এ নির্দেশবলে জেঃ নোসাভানকে তিন মাসের জন্য প্রধা মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর দল (The Committe for the Defence of National Interest—সংক্ষে CDNI—যার অন্যতম নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বে আউম) হেরে যায়; কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী থেকে যে চাইলে ব্রিটিশ, ফরাসী ও এমনকি মার্কিন মিশন তাঁকে তেমন আমল দেয় না। তবে রাজার জাতিভ

...শিমশানপ কে প্রধানমন্ত্রী করে তাঁকে প্রতিরক্ষা-...ীর গদীতে বসান হয়। এসময় অপরিমেয় মার্কিন ...সম্ভার সরবরাহ করা হয় লাওসকে। কিন্তু দল ও ...ক্তিগত রেষারেষির ফলে জাতীয় জীবনের যে-বিড়ম্বনা ...স্থিত হয়, তার বিরুদ্ধে প্যাথেট লাও-এর পরিচালনায় ...দ্রোহ ঘটে, গ্রামাঞ্চলে 'নিউল্যাও হাকজাতর' প্রভাব ...ড়ে যায়।

* * *

...সৌভন্ন ফৌমা জাতীয় অধঃপতনে স্বতই ক্ষুব্ধ ও ...ন্তিত। হতাশ হলেও হাল তিনি ছাড়লেন না। তাঁকে ...রা হলো জাতীয় পরিষদের সভাপতি। পরে '৬০ ...লের মাঝামাঝি তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলেন। ...র সংহতি ও ঐক্যের খাতিরে জেঃ নোসাভানকে (...KNDI) করতে চাইলেন অন্যতম মন্ত্রী। কিন্তু ...নি গোঁসা করে বসে রইলেন দলীয় শক্ত ঘাঁটি সাভান-...তে। এ সত্ত্বেও তাঁর কাছে এলো অপর্যাপ্ত মার্কিন ...হায্য, ভিয়েনতিয়েনের কথা আমেরিকা গেলো ভুলে। ...নি ধারা অবস্থায় জেঃ নোসাভান ফৌমা মন্ত্রিসভার ...রুদ্ধে জেহাদী জিগীর তোলে। এদিকে তাইল্যাণ্ডও ...বরোধ ঘোষণা করে। ফলে লাওসে খাদ্যাভাব ...ট। তাই বাধ্য হয়ে ফৌমা রাশিয়াকে জরুরী অত্যা-...শ্যক দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে অনুরোধ জানান। ...শিয়াও ৬ই ডিসেম্বর ('৬০) হ্যানয় থেকে বিমানে ...রবরাহ দিতে শুরু করে। এদিকে ভিয়েনতিয়েন ও ...ভানখেতের মধ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠে। সাভানখেতে প্রচুর ...র্কিন সমরোপকরণ মজুতে ভিয়েনতিয়েনের ভয় হয়। ...ক্যাপ্টেন কং লে (লাওসের শ্রেষ্ঠ প্যারাবাহিনীর নায়ক) ...দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে উদগ্রীব হলেন, কিন্তু ফৌমা তাঁকে ...নিরস্ত করেন। এ সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী যোগসাজসে ও ...নোসাভানের উস্কানীতে ফৌমার বিরুদ্ধে ভিয়েনতিয়েনের ...একদল সেনা ৮ই ডিসেম্বর বিদ্রোহী হয়; আর সাভানখেত ...থেকে বিমানে এদের সরবরাহ দেওয়া হতে থাকে। কং ...লে-র প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রাণ-সংশয় হলে ফৌমা ও ৬জন মন্ত্রী ...কম্বোডিয়ায় চলে যান এবং এখনও তিনি নমপেনে ...আছেন। কং লে রাজধানী দখল করেও শেষে হেরে যান ...এবং বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে দুর্গম জার্স প্রান্তরের দিকে প্রস্থান করেন। এখানেই তিনি সঙ্গী পান তাঁর এককালের শত্রু 'প্যাথেট লাও' গেরিলা সেনাদলকে। অথচ এদের বিরুদ্ধেই তিনি একদা কত না যুঝেছেন। অথচ রণ-নীতির খাতিরে এখন তারা 'অদ্ভুত শয্যাসঙ্গী'।

* * *

আসলে লাওসের ক্রান্তি তা'র একার নয়। একার হলে বিরোধ মিটতো। কিন্তু এখন এ-ই অজ্ঞাত ...য় দেশটাকে দলে ভিড়ান নিয়ে দুটো জোটের (বরং বলা ভালো একটা জোট=একটা পক্ষ অর্থাৎ আমেরিকা) মাঝে টানাহেঁচড়া চলছে। কম্যুনিস্ট জোটের ইচ্ছা—লাওস তাদের প্রভাবে থাকুক; কিন্তু পশ্চিমী জোটের মুখপাত্র আমেরিকা তাকে রাখতে চায় 'সিয়াটো'র (SEATO) তাঁবে। তাই বাইরের উস্কানি ও প্রলোভনে এখানকার রাজারাজড়া, সেনাপতি ও দল-নেতাদের মধ্যে ভাগবাঁটো-য়ারা ও ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি। কেননা দেখা গিয়েছে, লাওসের ব্যাপারে বছর কয়েক আগেও উভয় পক্ষের কিছুটা চক্ষু-লজ্জা ছিল। কিন্তু হালে ওসবের বালাই আর কারো নেই। নেই উত্তর ভিয়েৎনাম+চীন+রাশিয়া বনাম তাইল্যাণ্ড+দক্ষিণ ভিয়েৎনাম+আমেরিকার। আবার শেষোক্তের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার গাঁটছড়াবাঁধা। তবে এবারকার সঙ্কটে একে হাত করার চেষ্টায় আমেরিকাও বিফল হয়েছে। অথচ লাওসে মার্কিন হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট। ভিয়েনতিয়েনের কাছে অনেক মার্কিন অফিসার ও দুজন তাই সামরিক অফিসার নাকি ধরা পড়েছেন (হ্যানয় ১৮।২।৬১)। প্রচুর রসদ ও মার্কিন সমরোপকরণ দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে দক্ষিণপন্থী বৌন আউম ও জেঃ নোসাভান সরকারকে। অন্য পরে কা কথা, লাওসের মার্কিন হস্তক্ষেপ সম্পর্কে প্রখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার ওয়াল্টার লিপম্যান পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন—"In ways which have never been adequately reported or explained to the American people, the Administration has involved itself deeply in the internal affairs of Laos।" (4।1।61) পক্ষান্তরে লাওসে কয়েকদল ভিয়েৎমিন সৈন্যের ঢুকে পড়ার ও যুদ্ধ করার খবর মার্কিনী সরকারী মহলেও অসমর্থিত। কাজেই লাওসের বিরোধ বলপ্রয়োগে মিটবার নয়। এমন

কি আণবিক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েও নয়। যেহেতু বলের দিক থেকে উভয়ই প্রায় সমান সমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সামরিক শক্তিতে মিটবার হলে কোরিয়ার নিশ্চিত জেতা যুদ্ধও অনিশ্চিত অবস্থায় এসে ঠেকতো না। তখন আমেরিকাকে ভারতের পক্ষ থেকে সবিনয়ে জানান হয়েছিল যে উত্তর কোরিয়ায় আঘাত হান্‌লে চীন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবারও ভারত অনুরূপ সন্দেশ বিতরণ করেছে। কাজেই দুশ্চিন্তা কম নয় তার। আবার নিজের গোষ্ঠীর ভেতরই মতভেদ। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তার কথায় সায় দিচ্ছে না। তাকেই আগু বাড়িয়ে কাজ করতে হয়েছে এখানে। তবে একা কোরিয়ার মার খেতে এখানে সে গররাজি। তা'ছাড়া লাওসের রাজা সাবাং বাত্তানা স্বয়ং (১০।২।৬১) সোচ্চার ঘোষণা করেছেন—লাওস নিরপেক্ষ থাকতে চায়। কাজেই চক্ষু-লজ্জার ভাণ করা ও মুখ রক্ষার একটা ছল-ছুতো খোঁজা তার পক্ষে স্বাভাবিক। এদানীং রাজনৈতিক মীমাংসার প্রস্তাব যখন প্রথম ভারতের (আন্তর্জাতিক কমিশনের পুনরুজ্জীবন ও জেনেভা ধরণের বৈঠক) তরফ থেকে করা হয়, তখন থেকে কম্বোডিয়ার রাজা নরোদম শিহানকের প্রস্তাব (১৪টি জাতি নিয়ে এশিয়ার কোথাও বৈঠক—যা' রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক সমর্থিত) পর্যন্ত তাকে শান্তি স্থাপনের ঔচিত্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে চুলচেরা বিচার করতে হচ্ছে। এমনকি ছুঁচো গেলার মতো রাশিয়ার সঙ্গেও চলেছে আলাপ-আলোচনা। আর রাশিয়াকে এক্ষেত্রে দোষ দেওয়া বিফল। যেহেতু আপোস তার একান্ত কাম্য,—তবে ভিত্তি লাওসের নিরপেক্ষতা। সে আশ্বাস বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে প্রাক্তন নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী সৌভন্ন ফৌমাই (বর্তমানে কম্বোডিয়ার নমপেনে) শুধু দেননি, মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত রাজা ও তাঁর অনুগৃহীত দক্ষিণপন্থীদের আচরণেও সে-প্রতিশ্রুতি। তারা যেন অতীতের ঘটনায় লজ্জিত ও অনুতপ্ত। হালে (৯।৩।৬১) ফৌমার ঘোর বিরোধী জেঃ নোসাভান (বর্তমানে সহ-প্রধান মন্ত্রী) পর্যন্ত লাওস-সমস্যা মীমাংসায় ফৌমার সাহায্য-প্রত্যাশী। যেহেতু তাঁর প্রভাব দেশের আপামর সাধারণের ভেতর, দূর দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে—প্যাথেট লাও বাহিনী ও তার রাজনৈতিক শাখা 'নিউ লাও হাক জাত' ও দুর্ধর্ষ সমর নায়ক কং লে সহ সেনাবাহিনীর এক বৃহদংশের মধ্যে। কাজেই পটভূমি প্রস্তুত এবং তাতে আমেরিকার ইঙ্গিত ও উৎসাহ রয়েছে মনে হয়। রুশ নায়ক ক্রুশ্চফ তো স্পষ্টই বলেছেন—

"* * if the United States understood its mistakes at last, the Laotian problem would speedily be solved in accordance with the aspirations of the Laotian people and peace would again be restored in South-East-Asia'

—(১২।১।৬১)। তবু বৌম আউম সরকারকেই আমেরিকা বৈধ বলে এখনো মানছে, আর রাজা কর্তৃক প্রস্তাবিত তথ্য-নিরূপণকারী কমিশন নিয়োগের সে পক্ষপাতী। সংস্কার একেবারে যায় না বলে যে-প্রবাদ আছে, এ-ও তাই। তবে নীতি যখন একবার মেনে নেওয়া হয়েছে, তখন পদ্ধতিগত মতভেদ বেশিদিন থাকবার কথা নয়। অথচ এদিকে উলুখাগড়ারা রীতিমতো মরছে এবং মরবেও। —১০।৩।৬১



নষ্টকুষ্ঠি বা প্রশ্নকুষ্ঠি

উপাধ্যায়

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি নষ্ট জাতস্য লক্ষণং। যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ মহদাশ্চর্য্য কারণং ॥"

যেমন জন্মদিনের লগ্ন নিরূপণ করে কুষ্ঠি প্রস্তুত হয়, তেমিভাবে প্রশ্ন শুনে ও জাতক কোন শকে, কোন মাসে, কোন্ পক্ষে, কোন্ বারে, কোন্ তিথি ইত্যাদিতে জন্মেছে তা বলে দেওয়া যেতে পারে। এটা অত্যাশ্চর্য্য কথা তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অদ্ভুত বিষয় সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রেখে বহু জ্যোতিষীরা পুরুষানুক্রমে নিজেদের পুঁথির মধ্যে সীমিত রেখেছেন, সহজে কোন ব্যক্তিকে শেখাবার চেষ্টা করেন না। অধুনা বিরল প্রাচীন গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলা আছে।

কোন্ বৎসরে অর্থাৎ কোন্ শকাব্দে প্রশ্নকর্ত্তা জন্মেছে, প্রথমে সেটা জানা দরকার। কুষ্ঠিহীন ব্যক্তি যে সময়ে প্রশ্ন করবে, সেই সময় ঘড়ি রেখে লগ্ন নির্ণয় করতে হবে। যে লগ্ন স্থির হবে সেই লগ্নের অধিপতি কোন গ্রহ তা দেখা দরকার। প্রশ্নের বাক্যের মধ্যে যে যে সংখ্যক অক্ষর থাকে তা নির্ণয় করতে হবে। তারপর সেই অক্ষর সংখ্যাকে লগ্নের অধিপতি গ্রহের সংখ্যা দ্বারা গুণ করে গুণফলকে ১৬ দিয়ে ভাগ করতে হবে, ভাগফল ও গুণফলে সংযোগ করলে যে অঙ্ক হবে, তাই প্রশ্নকর্ত্তার বয়স। পরন্তু প্রশ্নকর্ত্তার অবয়ব দেখে যদি ঐ বয়স অসম্ভব বলে বোধহয়, তাহোলে ১২ অন্তর করতে হবে। অন্তর ফল যত অঙ্ক হবে, সেইটেই হবে তার বয়স। এইভাবে বয়স ঠিক হোলে তা বর্ত্তমান শক থেকে অন্তর করলে জন্মশক ঠিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ কোন শকাব্দে প্রশ্নকর্ত্তা জাত। আর এক প্রকারে ও করা যায়। যে লগ্নে প্রশ্ন হবে, সেই লগ্নকে ১২ দিয়ে ভাগ করে দ্বাদশাংশ নিরূপণ করতে হবে, এই দ্বাদশাংশের যে অংশে প্রশ্ন হবে, প্রশ্ন লগ্ন থেকে তত সংখ্যক গৃহে জন্মকালীন বৃহস্পতি কল্পিত-রূপে স্থাপন করতে হবে। এরপর দেখতে হবে বর্ত্তমান শকাব্দে বৃহস্পতি কোন স্থানে আছে। এই কল্পিত বৃহস্পতি হোতে বর্ত্তমান বৃহস্পতি কত রাশি অন্তর অর্থাৎ তফাৎ, তা লিখতে হবে। একে বলে ধ্রুবাঙ্ক। প্রশ্ন-কর্ত্তার বয়স ১২ এর অধিক ২৪শের অনধিক হোলে ধ্রুবাঙ্কে ২৪ যোগ করবে। ৩৬ এর অধিক ৪৮ এর অনধিক হোলে ধ্রুবাঙ্কে ৩৬ যোগ করবে। ৪৮এর অধিক ৬০এর অনধিক হোলে ধ্রুবাঙ্কে ৪৮ যোগ করলেই প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ঠিক নির্ণয় হবে। বর্ত্তমান শক থেকে অন্তর করলেই শক নিরূপণ হবে।

অয়ন জ্ঞান

অগ্রে অক্ষর বিবরণ বলা যাচ্ছে। অক্ষর সকল পাঁচভাগে বিভক্ত যথা—উত্তর, অধর, উত্তরোত্তর, অধরাধর ও দগ্ধ।

কোন কোন অক্ষর কোন কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, তা নিয়ে দেওয়া গেল।

ক চ ট ত প য শ এই সপ্তাক্ষর উত্তর।

খ ছ ঠ থ ফ র ষ " " উত্তরোত্তর।

গ জ ড দ ব ল স " " অধর।

ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ " " অধরাধর।

ঙ ঞ ণ ন ম এই পঞ্চাক্ষর দগ্ধ।

এ ও এই দুই বর্ণ উত্তরোত্তর।

অ ই উ এই বর্ণ ত্রয় উত্তরাধর।

ঐ ঔ এই বর্ণদ্বয় অধরাধর।

অং অঃ নপুংসক। স্বরবর্ণের মধ্যে আবার তিন প্রকার অবান্তর ভেদ আছে, যথা,—আলিঙ্গিত, অভিধূমিত ও দগ্ধ। অ, ই, এ, ও—এরা হ্রস্ব মাত্রা ও আলিঙ্গিত। আ, ঈ, ঐ, ঔ—এরা দীর্ঘ ও অভিধূমিত, আর উ, ঊ, অং, অঃ এরা দগ্ধ।

এই সমস্ত বর্ণ দ্বারা যে ভাবে নষ্ট কুষ্ঠি উদ্ধার হয়, তা বলা যাচ্ছে।

গণক প্রশ্নকারীর সঙ্গে কোন রকম আলাপ করবেন না। প্রশ্নকারী ব্যক্তি এসে গণককে প্রশ্ন করলে গণক প্রশ্নের প্রথমাক্ষর নিয়ে প্রশ্নকারীকে কোন ফল, ফুল বা দেবতার নাম করতে বলবেন। সেই ফল, ফুল বা দেবতার নামের প্রথম অক্ষর ধরেই কার্য করতে হবে। প্রশ্নবাক্যে ফল ফুল বা দেবতার নামের আদ্য অক্ষর যদি উত্তর বর্ণ হয়ে তবে উত্তরায়ণে, যদি অধর বর্ণ হয় তবে দক্ষিণায়নে, আর যদি দগ্ধ বর্ণ হয়, তবে উত্তরায়ণ

ও দক্ষিণায়নের সন্ধি স্থানে জন্মেছে, এইরকম সিদ্ধান্তেই আসতে হবে। আর একরকমে ও ঠিক করা যায়। প্রশ্নলগ্নকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করলে পূর্ব্ব ছয় ভাগ প্রথম হোরা উত্তরায়ণ অর্থাৎ মাঘাদি ছয়মাস, দ্বিতীয় ছয়ভাগ দ্বিতীয় হোরা দক্ষিণায়ণ অর্থাৎ শ্রাবণাদি ছয়মাস।

মাস জ্ঞান

প্রশ্নবাক্যও ফল পুষ্পাদির আদ্যাক্ষর অ, এ কিম্বা ক হোলে ফাল্গুন, চ কিম্বা ট হোলে চৈত্র, ই, ও, গ, জ কিম্বা ড হোলে বৈশাখ, দ, ব, ল কিম্বা স হোলে জ্যৈষ্ঠ, ঈ, ঔ, ঘ, ঝ, ঢ কিম্বা ধ হোলে আষাঢ়, ভ, ব, কিম্বা হ হোলে শ্রাবণ, উ, ঊ, ঙ, ঞ, ণ হোলে ভাদ্র, ন, ম, অং কিম্বা অঃ হোলে আশ্বিন, ত কিম্বা প হোলে কার্ত্তিক, য, শ অগ্রহায়ণ, আ, ঐ, খ, ছ, থ, ঠ পৌষ, এ, র, ষ হোলো মাঘ মাস জন্মমাস হবে।

পক্ষ নিরূপণ

অ এ ক চ ট ত প য শ ই ও গ জ ড দ ব ল স।এই সমস্ত অক্ষরের কোন একটি থাকলে শুক্লপক্ষ—আর আ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ষ ঈ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব এদের কোন একটি থাকলে কৃষ্ণপক্ষ জানবে। উ ঊ অং অঃ উ ঞ ণ ন ম এই সকলের কোন একটি আদিতে থাকলে উভয়পক্ষ বুঝায়। সুতরাং এক্ষেত্রে জ্যোতিষীর পক্ষে বিশেষ সতর্কতা আর বিবেচনা পূর্ব্বক অনুমানে পক্ষ নিরূপণ করতে হয়।

অন্যপ্রকারে ও পক্ষ নিরূপণ করা যায়। প্রশ্নকালীন লগ্নকে ২ ভাগ করে প্রথম ১৫ অংশ শুক্ল, দ্বিতীয় ১৫ অংশ কৃষ্ণপক্ষ হবে।

তিথি নিরূপণ

উচ্চারিত ফল পুষ্পাদি নামের আদ্যাক্ষর অ, ই, এ, ও হোলে শুক্ল প্রতিপদ, আর আদ্যাক্ষর ক চ ট ত প য শ গ জ ড দ ব ল স এই চোদ্দটী অক্ষরে যথাক্রমে শুক্ল দ্বিতীয়া থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ তিথি হবে। আর যদি প্রশ্নবাক্যের আদ্যাক্ষর আ, ই, ঐ, ঔ থাকে তবে কৃষ্ণ প্রতিপদ, খ, ছ, ঠ থ ফ র ষ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ এই চোদ্দ অক্ষরে যথাক্রমে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত জন্মতিথি বুঝতে হবে।

আরও একরকমের নিয়মে তিথি বের করা যায়। প্রশ্নলগ্নকে ত্রিশ ভাগ করে প্রথমভাগে শুক্লা প্রতিপদ, দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয়া, এইরূপ প্রথম ১৫ অংশে শুক্ল পক্ষ আর দ্বিতীয় ১৫ অংশে কৃষ্ণপক্ষের তিথি সকল জন্মতিথি বলে জানা যাবে।

নক্ষত্র নিরূপণ

ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে ঞ ঙ ণ ন ম এই পাঁচটি অক্ষর ত্যাগ করে ক থেকে হ পর্য্যন্ত ২৮টী অক্ষরে (অভিজিৎ নিয়ে ২৮ নক্ষত্র) অর্থাৎ উচ্চারিত ফলপুষ্পের আদ্যাক্ষর ক হোলে অশ্বিনী খ হোলে ভরণী, গ হোলে কৃত্তিকা এইভাবে জন্মনক্ষত্র জানা যাবে। মতান্তরে নক্ষত্র গণনার কথা বলা যাচ্ছে। যে নক্ষত্রেরনামানুসারে জন্ম মাসের নাম হয় (অর্থাৎ বিশাখা বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি) সেই নক্ষত্রের অঙ্কের সঙ্গে জন্মতিথির অঙ্ক শুক্ল পক্ষ হোলে ১১, কৃষ্ণপক্ষ হোলে ১০ যোগ করতে হবে, এই যোগফলই প্রশ্ন কর্ত্তার জন্ম নক্ষত্রের অঙ্ক। এই নক্ষত্র সংখ্যা ২৭এর অধিক হোলে ২৭ দিয়ে ভাগ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাই হবে জন্মনক্ষত্র। যদি না মেলে তবে কখন তাতে ১ যোগ, কখন বা তা থেকে ১ বিয়োগ করতে হয়।

রাশি নিরূপণ

জন্মতিথির অঙ্ককে দ্বিগুণ করে তাতে ৬ যোগ করা দরকার। সমষ্টিকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হবে, জন্ম মাস থেকে গণনা করে সেই অঙ্ক যে মাসে পড়বে তাই জন্মরাশি। আর ২ নক্ষত্রে এক-রাশি ধরে জন্মনক্ষত্র গণনা করে যে রাশি হবে তাই জন্মরাশি। আরও জন্মনক্ষত্রকে ৪ দিয়ে গুণ করে ৯ দিয়ে ভাগ করবে। ভাগাবশিষ্টে ১ যোগ করলে যা হয়, তাই মেষ থেকে গণনা করে সে যে রাশিতে শেষ হবে, তাই জন্মরাশি।

সন তারিখ গণনা

শকাব্দার ৫১৫ বৎসর পরে বাঙ্গলা সন হয়েছে, সুতরাং বাঙ্গলা সনকে শকাব্দ করতে হোলে এ'তে ৫১৫ যোগ করলে যোগফল শকাব্দ হবে। আর শকাব্দ থেকে ৫১৫ বিয়োগ করলে সন হবে। শকাব্দাকে ইংরাজী সনে পরিণত করতে হোলে শকে ৭৮ যোগ কর, ইংরেজী সালকে শকে পরিণত করতে হোলে ৭৮ বিয়োগ কর। বাঙ্গলা সনকে ইংরেজি সনে পরিবর্ত্তন করতে হোলে বাঙ্গলা সনে ৫৯৩ যোগ কর—আর ইংরেজী সনকে বাঙ্গলা করতে হোলে ইংরেজী সন থেকে ৫৯৩ বিয়োগ কর। যদি বাঙ্গলা তারিখ জানতে হয় তবে ইংরেজী সন মাস ও তারিখ থেকে ৫৯৩।৩।১৩ বিয়োগ কর—আর ইংরেজী সন, মাস ও তারিখ জানতে হোলে বাঙ্গলা সন মাস ও তারিখের সঙ্গে ৫৯৩।৩।১৩ যোগ কর। যদি না মেলে তবে যোগ বিয়োগ ফলের সঙ্গে ১।২।৩ যোগ করলে নিশ্চয়ই মিলবে।

লগ্ন নিরূপণ

যস্মিনৃক্ষে স্থিতো ভানুস্তস্মাৎ পূর্ব্বাপরে দিনে। সপ্তমে দ্বাদশে ঋক্ষে লগ্নং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ। রাত্রৌ পূর্ব্বাপরার্দ্ধেতু যনক্ষে' সিদ্ধিসংজ্ঞকে। রবিযুক্ত ক্ষতো নিত্যং বরাহাদিষু নিশ্চিতম্। যে নক্ষত্রে রবি বাস করেন দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম হোলে সেই থেকে গণনায় সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হবে তাই জন্ম লগ্ন। দিবসের পরার্দ্ধে জন্ম হোলে, রবিস্থিত নক্ষত্র হোতে গণনায় দ্বাদশ নক্ষত্রে যে রাশি হবে সেই জন্মলগ্ন। আর রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম হোলে রবিস্থিত নক্ষত্র থেকে গণনায় সপ্তদশ নক্ষত্রে যে রাশি হয়, তাহাই জন্মলগ্ন। রাত্রির পরার্দ্ধে জন্ম হোলে রবিস্থিত নক্ষত্র থেকে গণনায় চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্রে যে রাশি হয়, তাই জন্মলগ্ন হবে। অন্য প্রকারেও লগ্ন ঠিক করা যায়। প্রশ্ন লগ্নকে ৬০ দিয়ে ভাগ করে যে অংশের মধ্যে প্রশ্ন হয়েছে ।ঠিক তত দণ্ডের সময় প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম। প্রশ্নকর্ত্তার জন্মমাস, রাশি থেকে জন্মরাশি যত অন্তরে আছে স্থির করবে, তাতে যে ফল হবে

…াকে ৫ দিয়ে পূরণ করে ২ বাদ দেবে, অবশিষ্ট যা থাকবে ততদণ্ডের সময় জাতকের জন্ম হয়েছে।

লগ্ন পরীক্ষা

চন্দ্র যে রাশিতে আছেন সেই রাশি কিম্বা চন্দ্রস্থ রাশির নবম কি পঞ্চম স্থানে লগ্ন হবে। লগ্নাধিপতি যে রাশিতে থাকেন সেই রাশির বিযোড় রাশিতে লগ্ন হবে। চন্দ্রস্থ রাশির অধিপতি গ্রহ যে রাশিতে থাকেন তার পঞ্চম, সপ্তম, নবম কি দ্বাদশ গৃহে লগ্ন হবে। প্রশ্ন সময়ে সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকেন, সেই নক্ষত্র থেকে দ্বাদশ নক্ষত্র মধ্যে জন্ম হোলে দিবাতে, অন্য কোন নক্ষত্রে হোলে রাত্রিতে জন্ম হবে।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী নক্ষত্রাশ্রিত জাতগণের পক্ষে অশ্বিনী অথবা কৃত্তিকা জাতগণের অপেক্ষা উত্তম। মাসটি মিশ্রফলদাতা। সাফল্য, উদ্দেশ্য-সিদ্ধিলাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, পসার প্রতিপত্তি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উত্তম বন্ধু লাভ প্রভৃতি শুভ ফল দেখা যায়। বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য। শুভ ফলগুলি মাসের প্রথম দিকে দেখা যাবে। ক্ষতি, দুঃসংবাদ, কলহ, নিজের এবং সন্তানদের শারীরিক কষ্ট, অপবাদ প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা করা যায়। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো যাবে। কিন্তু জটিল জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। সন্তানদের স্বাস্থ্যের দিকে এমাসে লক্ষ্য রাখা দরকার—প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা উপভোগ্য হবে। অস্বচ্ছন্দতার লক্ষণ এ মাসে বিশেষ অনুভূত হবে। গৃহে নব-জাতকের আবির্ভাব অথবা পারিবারিক সংখ্যা বৃদ্ধি। বিলাসব্যসন দ্রব্যলাভ। আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। উত্তম আয়, ব্যয়ের মাত্রাধিক্য ঘটায় সঞ্চয়ের আশা করা যায় না। শেষের দিকে নানা প্রকারে কিছু আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করা যায়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ ঘটতে পারে। সম্পত্তিসংক্রান্ত কোন নব-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী বিশেষ ভাল বলা যায় না; নানাপ্রকার উপদ্রব, উৎপাত ও ঝঞ্ঝাট আসতে পারে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। পদোন্নতি বা পদমর্য্যাদা লাভ যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সাফল্য ও ক্ষতি দুই-ই ঘটবে—তবে সাফল্যের ভাগই বেশী। মহিলাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে শুভ। সাংসারিক, পারিবারিক, প্রণয় ও কর্মক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ। সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ, অবৈধ প্রণয়, সৌভাগ্য ও সামাজিক মর্য্যাদা, পুরুষের বান্ধবতা, আনুকূল্য, উপঢৌকন, অর্থ প্রভৃতি পার্থিব বস্তুসম্পদ ও ভোগাসক্তির মাধ্যমে মাসটী সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে। শিল্পীরা মর্য্যাদা পাবেন, পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ প্রভৃতিতেও মেষরাশির মহিলারা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করবেন। রেস-খেলায় প্রথম দিকে জয় লাভ হবে, শেষের দিকে পরাজয়ের সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীরা ও পরীক্ষার্থীরা সাফল্য লাভ করবে।

বৃষ রাশি

রোহিনী জাতগণের পক্ষে উত্তম, মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম, কৃত্তিকার পক্ষে অধম। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে নানাবিধ কর্ম্মে অল্পবিস্তর সাফল্যলাভ, উত্তম বন্ধুত্ব ও সংসর্গ, নূতন মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শত্রুজয়, সৌভাগ্য, পারিবারিক শান্তি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যলাভ। প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের নিগ্রহ ভোগ, কষ্টকর ভ্রমণ, নিষ্ফল প্রচেষ্টা, স্বজন বন্ধুবিয়োগ তজ্জনিত মানসিকষ্টভোগ, কলহ স্বাস্থ্যক্ষতি উদ্বেগ ও অপমান প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ হোতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো যাবে, কিন্তু যাদের বায়ু পিত্তের প্রকোপ প্রায়ই ঘটে থাকে, তাদের পক্ষে আহারাদি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। উদ্বেগ ও নানা আশঙ্কার চিন্তায় মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটবে—কেননা বন্ধু স্বজন বিয়োগের দুঃসংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরে বাইরে স্বজনবর্গের সঙ্গে মনের যোগাযোগ ঠিকই থাকবে, কোনরকম মনান্তরজনিত অশান্তির সৃষ্টি হবে না। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হোতে পারে। উত্তম অর্থোপার্জ্জন হবে সত্য, কিন্তু অসতর্কতা ও অতি বদান্যতার ফলে সঞ্চয় হবে না। লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যবসারে লিপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। এই সব ব্যবসায়ে অংশীদাররাও লাভবান হবেন। স্পে-কুলেশন বর্জ্জনীয়। রেস খেলায় জয় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। পুঁজিবাদীরা এসময়ে কৃষির দিকে অর্থনিয়োগ করলেও, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি প্রথা অবলম্বন করলে বহু অর্থ লাভ করতে পারবেন। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ, বিশেষতঃ যাঁরা সৈন্য, নৌ ও বিমান বিভাগে আছেন—আর যাঁরা আছেন তরল পদার্থ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানেও তৈল সরবৎ ঔষধ রসায়নিক দ্রব্য, হাসপাতাল আতুর-আশ্রম ও স্বাস্থ্য নিবাস সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানে। মণিহারী দ্রব্যের কারবারে কর্ম্মীরাও লাভবান হবেন। তা ছাড়া শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, প্রভৃতির মধ্যে যে সব কর্ম্মী আছেন তাঁরাও কর্ম্মোন্নতি করবেন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে এমাসটী উত্তম। তাঁরা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবেন। মহিলাদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। পরিবারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য লাভ। অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন মহিলারাও সিদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হবেন। ভ্রমণ আমোদ প্রমোদ অবৈধ প্রণয়ও বিহার পুরুষের আনুকূল্য ও স্তাবকতা, প্রীতি ও সৌজন্য, থিয়েটার, সিনেমা ও দর্শনীয় স্থানে গমনাগমনের মাধ্যমে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ ও চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পুরুষের সহিত মানসিক উত্তেজনার ফলে হৃদয়ের আদান-

প্রদান সম্পর্কে উদারতা বর্জ্জনীয়, দ্রুত বিবাহের পাকাপাকি করে কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদানও বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাসটি নিকৃষ্ট। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসু আর্দ্রার তুলনায় কিছু ভালো। এমাসও মিথুন রাশির ব্যক্তিদের কাছে কোন আশার বাণী শুনাবে না, নানাভাবে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত করে তুলবে। শত্রুদের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে মনোবৈকল্য, চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রের আয়োজন, কর্ম্মে বাধা, জীবনী শক্তির হ্রাস, ক্ষতি, অকারণ অপবাদ, ক্লান্তি কর ভ্রমণ, দুর্ঘটনার ভয়, স্বজন বিরোধ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ প্রভৃতি সূচিত হয়। এতদসত্বেও ক্রমে বাসনার বস্তুগুলি করায়ত্ত হবার পথে আসতে পারে, এই টুকুই সান্ত্বনা। রক্ত, পিত্ত ও উষ্ণতার প্রকোপ জনিত শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, জীবনী শক্তির হ্রাস, স্বজনবর্গের আচার আচরণের প্রতিকূলতা, অকারণ কলহ বিবাদ ও সহানুভূতির অভাব—ফলে সতর্ক না হোলে আত্মীয়স্বজনের শত্রুতার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে। স্ত্রী ও সন্তানবর্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ নজর নেওয়া আবশ্যক। আর্থিক ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি সমান তালে চলবে। বন্ধুদের মাধ্যমে অবশ্য বেশ কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা থাকলেও লভ্যাংশ গ্রহণের সময় এমন কতকগুলি বাধাপ্রদায়ক পরিস্থিতি ঘটবে, যার জন্যে কিছুটা ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যাবে না। মাসের শেষার্দ্ধটি কিছুটা আশাপ্রদ। স্পেকুলেশনের দিকে খুব ঝোঁক আসবে, এ-ঝোঁক না এড়ালে বেশ কিছু ক্ষতি ভোগ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায়, কিন্তু আয় বৃদ্ধির লোভে কোন পরিকল্পনার দিকে আগ্রহশীল হোলে বিপর্য্যয় ঘটতে পারে। চাকুরিজীবীরা অপমান, লাঞ্ছনা ও কর্ম্মোন্নতির রুদ্ধ অবস্থা-সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত হবেন। উপরওয়ালা বা প্রভুদের বিরাগ-ভাজন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের ভাগ্যে নৈরাশ্যের রেখাপাত হবে। মাসটি মহিলাদের জীবন যাত্রার পক্ষে প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। পুরুষের সহিত মতানৈক্য, লাঞ্ছনা, দুঃখকষ্ট, কলহবিবাদ প্রভৃতি অশান্তির কারণ হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বহু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। স্নেহ ভালোবাসা বা আমোদ প্রমোদ সম্পর্কে এ মাসটি অনুকূল ফল-প্রদাতা নয়। সুতরাং ভ্রমণ, পিকনিক, পার্টি, সভাসমিতি নিমন্ত্রণ প্রভৃতি এড়িয়ে চলাই ভালো। এধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোনরূপ অসুবিধা বা গোলযোগের সৃষ্টি হবে না।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুর পক্ষে উত্তম, অশ্লেষার পক্ষে মধ্যম, আর পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট। কলহ বিবাদ, দুশ্চিন্তাও উদ্বেগ, অসৎসংসর্গ, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, স্বজনবিরোধ, ক্ষতি, মামলায় পরাজয়, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষদায়ক ঘটনা-সঙ্কুল পরিবেশ, অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। নূতন বিষয়ে পাঠগ্রহণ ও সময়ে সময়ে সন্তোষ লাভ। প্রথমেই রক্তের চাপবৃদ্ধি ঘটবে। পিত্তপ্রকোপ ও চক্ষুপীড়ার যোগ আছে। যেমনভাবে হয়ে থাকে তেমনিভাবে পারিবারিক নিগ্রহ ভোগ হবে। ঘরে বাইরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কলহ-বিবাদজনিত বিশেষ অশান্তি। এমাসে গৃহে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হোতে পারে। আয় ও অর্থাগম সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত অঙ্ক দেখা যাবে না—পরিবর্ত্তন আর উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে সময় চলে যাবে। যারা রেলওয়ে, কলকারখানা, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি হবেনা। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থলাভ হোলেও শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতি। অর্থের জন্য অপরের সঙ্গে কলহ-বিবাদ ঘটবে। লগ্নী ব্যাপারে অর্থনিয়োগ বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়, চাকুরিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। কোন ক্রমেই কাজগুলি মনোমতভাবে হোতে পারবে না, উপরওয়ালার সঙ্গে হবে মতবিরোধ, আর এর পরিণতি ও ভালো বলা যায়না। ঝি চাকরের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও অসাধুতার জন্যে নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটবে, আর সমস্যার সম্মুখীন হোতে হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীদের পক্ষেও মাসটী শুভ বলা যায়না। মহিলাদের পক্ষে মাসটী অতিসাধারণ, ভালো মন্দ কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। ঘরের বাইরে বেশী আনা-গোনা করা উচিত নয়, গৃহকর্ম্মে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত। অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে আসা অনুচিত, অবৈধ প্রণয়ে বিড়ম্বনা ভোগ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দিনগুলি চলনসই।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনী জাতগণের পক্ষে উত্তম। মঘা ও উত্তরফল্গুনী জাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, বহু প্রকারের উদ্বিগ্নতা, ক্ষতি প্রভৃতি দেখা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধি, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, বিলাসব্যসন দ্রব্য লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। মাসের শেষের দিকে বিশেষ অবনতি ঘটবে। পূর্ব্ব থেকে যাঁরা রক্তের চাপবৃদ্ধিতে ভুগছেন তাঁদের কষ্টভোগ হবে। যদিও শারীরিক অবস্থা মোটের উপর মন্দ যাবে না, মানসিক অবস্থা মোটেই ভালো যাবে না। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ হবে, যদিও কিছু কিছু অশান্তি ভোগ হোতে পারে পারিবারিক ক্ষেত্রের বাইরে। আর্থিক অবস্থা ভালো মন্দর মধ্য দিয়ে যাবে। সময়ে সময়ে অর্থোপার্জ্জনের স্ফীতি ঘটবে সত্য, কিন্তু ব্যয়াধিক্য হেতু সঞ্চয়ের আশা কম। চুরি হবার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কারো জন্যে জামিন হওয়া বিপজ্জনক। স্পেকুলেশনে খুব ক্ষতি হবে। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। পূর্ব্বপরিকল্পনাগুলি এ মাসে কার্য্যকরী হোতে পারে। চাকুরীজীবীর পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে

সাফল্য লাভ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়লাভ, শত্রুদমন, উপরওয়ালার অনুরাগভাজন হওয়া, অধস্তন কর্ম্মচারীদের আনুগত্য প্রভৃতি সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর সাধারণতঃ ভালো বলা যায়। মহিলাদের পক্ষে মাসটী সাধারণতঃ শুভ হবে। এঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ হবে, আর পূর্ণ হবে আশা আকাঙ্ক্ষা। মাসটী হবে আনন্দপ্রদ। সামাজিক কার্য্যে খ্যাতি অর্জ্জন, জনপ্রিয়তা লাভ—বিশেষতঃ পুরুষের নিকট সমাদর প্রাপ্তি ঘট্‌বে। পিক্‌নিক্‌, পার্টি, সভাসমিতি প্রভৃতি আদর আপ্যায়ন লাভ হবে। অবিবাহিতার পূর্ব্বরাগ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দেবে, অবৈধ প্রণয়েও আশাতীত সাফল্য লাভ, প্রণয়ীর আনুগত্য ও নানাবিধ উপহার অন্তরে প্রীতি উৎপাদন করবে। ধর্ম্মসাধনায় রত মহিলারা ভাগবত-জীবনের পথ অবলোকন করবেন। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা, সম্মান, অর্থ ও উপহার লাভ।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে মধ্যম, আর উত্তরফাল্গুনীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল ও নানাবিধ কষ্ট ভোগ। মাসটী সম্পূর্ণ ভালো বলা যায়। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধে হবে উত্তম। সাফল্য লাভ, চিত্তের প্রসন্নতা ও শান্তি, শত্রুদমন, সুখ, জনপ্রিয়তা-অর্জ্জন ও খ্যাতি, উপরওয়ালার অনুগ্রহপ্রাপ্তি, প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন সমাজে সমাদর লাভ, ধনীর সংসর্গ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পুণ্যাদি কার্য্য, নূতন বিষয়ের অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, তৈজসপত্র, অলঙ্কার, রেডিও, আসবাবপত্র ক্রয় প্রভৃতি সূচিত হয়। সৌভাগ্য-বৃদ্ধি ও উত্তম স্বাস্থ্য লাভ। শেষার্দ্ধে মামলা মোকর্দ্দমা, সামান্য ব্যাপারে মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা, ব্যয় বৃদ্ধি, ভ্রমণাধিক্য হেতু অবসাদ আর অকারণ উদ্বিগ্নতা ঘট্‌তে পারে। স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা যায় না, কিন্তু হজমের দোষ হেতু উদরের গোলমাল ও গুহ্যদেশে প্রদাহ বিরক্তি উৎপাদন করবে। ভ্রমণ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা দরকার, সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য, গৃহে আমোদ উৎসবের আয়োজন, অতিথির আবির্ভাব, পরিবারের বহির্ভুক্ত আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সদ্ভাব প্রভৃতি দেখা যায়। আর্থিক ক্ষেত্র উত্তম, আর্থিক ক্ষেত্রের বৃদ্ধি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হবে। আশাতীত লাভ অবশ্য হবে না। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দিকে প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ধনী বন্ধু সমাজের দৃষ্টি পড়্‌বে—সমাজের উপর তলার বন্ধুরা সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি এক ভাবেই যাবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম, পদোন্নতি, মর্য্যাদা লাভ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। চাকুরীজীবী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হোলে অবশ্যই সাফল্য লাভ কর্‌বে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও বিশেষ শুভ। শিক্ষিতা বিদুষী মহিলাদের পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ। সাধারণ রমণীরা মোটামুটি ভাবে সময় অতিবাহিত করবেন। গৃহস্থালী ব্যাপারে, লেখ্য বৃত্তিতে, চিঠিপত্র আদান প্রদানে, বক্তৃতায় যোগদানে, সাহিত্য সঙ্গীত কাব্য শিল্প আলোচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে। জিনিষপত্র ক্রয়েও সুযোগ সুবিধা ঘট্‌বে। প্রতিবেশীর সৌজন্য, ভ্রমণে আনন্দ, জ্ঞাতিবর্গের সমাদর প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। অবৈধ প্রণয়ে ও পূর্ব্বরাগে বিশেষ সাফল্য। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকারে ব্যক্তিত্ব অভিব্যক্ত হবে।

রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের উত্তম ফললাভ।

তুলা রাশি

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম, আর স্বাতীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। মানসিক অশান্তি, উদ্বিগ্নতা, স্বাস্থ্যহানি, দুর্ঘটনা, শত্রুদের উৎপীড়ন, প্রতিদ্বন্দ্বীর অপপ্রচার, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, মানহানি, মর্য্যাদা হানি, উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম, মিথ্যা অপবাদ, স্বজন, বন্ধুবর্গের সঙ্গে কলহবিবাদ প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সম্ভব, শেষার্দ্ধে কিছু উপশম হবে, মানসিক শান্তি আশা করা যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। দুর্ঘটনা ও রক্তপাতাদির সম্ভাবনা। শারীরিক দুর্ব্বলতা। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। স্বজন বিয়োগজনিত দুঃখ, পারিবারিক কলহ, স্ত্রীর পীড়াদি কষ্ট প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। নানা ভাবে অর্থকৃচ্ছ্র তাহেতু কষ্ট ভোগ। ব্যয়াধিক্য ও আয় হ্রাস। প্রতারণা, জাল জুয়াচুরি ও ধাপ্পাবাজির কবলে পড়ে যথেষ্ট ক্ষতি। কোন ব্যাপারে জামিন হওয়া বর্জ্জনীয়। গৃহ থেকে জিনিষ চুরি হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে হার হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধি-কারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অশুভ। মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। জমিকেনা-বেচায় ক্ষতি। চাকুরিজীবীরা নানা ভাবে বিব্রত হয়ে পড়বে, আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না। অপরের অপকৌশল ও কুচক্রান্ত হেতু উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। অধস্তন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদের কুব্যবহার মানসিক কষ্টের অন্যতম কারণ হবে। ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীর আয় হ্রাস। লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। নৈরাশ্যের অন্ধকারে মহিলারা কষ্ট পাবেন। পুরুষের প্রতারণা, জাল জুয়াচুরি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা বিশেষ ভাবে মাসের প্রথমার্দ্ধে পরিস্ফুট হবে। অবৈধ প্রণয়ের মধ্যে পড়ে শেষে আস্‌বে বিপন্নতা, অপবাদ ও কুৎসিত ঘটনার সমাবেশ। পরপুরুষের সান্নিধ্যে বিপত্তির কারণ ঘট্‌তে পারে। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বহু অবাঞ্ছিত ঘটনা অপেক্ষা করছে।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখাজাতগণের পক্ষে উত্তম, জ্যেষ্ঠার পক্ষে মধ্যম, অনুরাধার পক্ষে নিকৃষ্ট। দুঃখ, ভগ্নস্বাস্থ্য, স্বজন বন্ধু বর্গের সহিত কলহ বিবাদ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বিগণের জন্য নিগ্রহ ভোগ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, ক্ষতি, দুর্ঘটনা, কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অসাফল্য, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, মামলামোকর্দ্দমা অপমান প্রভৃতি অশুভ ঘটনার আশঙ্কা করা যায়। সুখ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য, সম্মান লাভ, শত্রুজয় প্রভৃতি শুভ ঘটনারও

আশা আছে। বিশেষ অসুখ না হোলেও স্বাস্থ্যের অবনতি হ'বে। অর্থ ভোগ। দুর্ঘটনা, ক্ষতাদি দোষ, রক্তস্বল্পতা, রক্তস্রাব প্রভৃতি সম্ভব। রক্তপাত হোলে উপেক্ষা করা চলবে না, অবিলম্বে প্রতীকারের আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাধাবিপত্তি ঘট্‌বে। নগদ টাকায় টান ধরবে। অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্যে পাওনাদারের কটূক্তি বারম্বার প্রকাশ পাবে। মামলা মোকর্দ্দমায় বিশেষ ক্ষতি। ব্যয়াধিক্য চিন্তার কারণ হবে। স্পেকুলেশন ও রেস খেলা বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভব্যঞ্জক। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ না হোলেও নানা প্রকার কষ্ট ভোগ আছে। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি ভালো। মহিলাদের পক্ষে মাসটী মধ্যম। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমাবেশ হবে না। শিল্পকলা, গানবাজনা, সাজ পোষাক ও পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতির দিকে ঝোঁক দেখা যাবে।

ধনুরাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, মূলা ও উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। মাসটী মিশ্রফল দাতা। প্রথমার্দ্ধ শেষার্দ্ধ অপেক্ষা কিছু ভালো। সাফল্য, শত্রুদমন, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্দ্যলাভ, নূতন পদ মর্য্যাদা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ উপভোগ, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ। স্বজনবর্গের সঙ্গে শত্রুতা, অর্থহানি, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুগণের জন্য কষ্টভোগ, বন্ধুবিচ্ছেদ, ভগ্ন স্বাস্থ্য সর্ব্ববিষয়ে বাধাপ্রাপ্তি প্রভৃতিরও সম্ভাবনা আছে। প্রথমার্দ্ধে শরীর ভালো যাবে। কিন্তু চক্ষু পীড়া, উদরের গোলযোগ, রক্তপাত প্রভৃতি শেষার্দ্ধে ঘট্‌তে পারে। শেষার্দ্ধেই পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ ও মনান্তর দেখা যায়। প্রথমার্দ্ধেই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ভালো। অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হবে বিবিধ কর্ম্মের আনুকূল্যে। প্রতারিত হওয়ার যোগ আছে। অনাদায়ী টাকার জন্যে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী অশুভ নয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে অনুকূল। প্রথমার্দ্ধে কর্ম্মোন্নতি, পদমর্য্যাদা লাভ। উপরওয়ালার অনুগ্রহ লাভ প্রভৃতি দেখা যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। মহিলাদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধটী অনুকূল। সাংসারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় সতর্কতার প্রয়োজন। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। এসময়ে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'বে।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠানক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তরাষাঢ়া বা শ্রবণার অপেক্ষা উত্তম, উত্তরাষাঢ়া অপেক্ষা শ্রবণাজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম। মাসের প্রথমার্দ্ধে অশুভফলগুলি প্রাধান্য লাভ করবে, শেষার্দ্ধে কিছু শুভ হোতে পারে। আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, শত্রুবৃদ্ধি, ধনক্ষয়, অপমান, অকারণ অপবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের চক্রান্তে মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুষ্কর্ম্মে বাধাবিপত্তি, স্বাস্থ্যহানি, ক্ষতি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। শেষার্দ্ধে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ, সুখ স্বচ্ছন্দতা, সুখকর ভ্রমণ, সুসংবাদ প্রাপ্তি, শত্রুদমন, সৌখীন দ্রব্যাদি ক্রয়। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘট্‌লেও পীড়ার আশঙ্কা নেই। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভ্রমণে ক্লান্তি। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হবে না। কিন্তু পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে দুর্ব্ব্যবহার পাবার জন্য মানসিক কষ্ট ভোগ হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। প্রথমার্দ্ধ আর্থিক ক্ষেত্রের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, অর্থক্ষতির যোগ আছে। একটু চেষ্টা করলে অনাদায়ী অর্থ লাভের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে লাভ, আয়বৃদ্ধি, প্রচেষ্টায় সাফল্য প্রভৃতি যোগ আছে। বিলম্ব ও বাধাবিপত্তির পর সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত। নব নব প্রচেষ্টায় সফলতা ও আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও আশানুরূপ অর্থসঞ্চয় হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে শেষার্দ্ধটী অতীব উত্তম। কিন্তু গৃহনির্ম্মাণ বা সংস্কার বর্জ্জনীয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়—এতদ্‌সত্ত্বেও নানা অসুবিধা ভোগ করতে হবে কর্ম্মক্ষেত্রে, কোন প্রকার উন্নতির যোগ নেই। অধস্তন কর্ম্মচারী বা ভৃত্যদের জন্য কষ্ট ভোগ আছে। শেষার্দ্ধে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটা ভালো হয়ে উঠ্‌বে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মোটামুটি একই ভাবে যাবে, বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায় না। দৈনন্দিন কার্য্য-পদ্ধতি শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসৃত হলেও মানসিক অবস্থা আদৌ ভালো যাবে না। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দিনগুলি এক ভাবেই কেটে যাবে। বাহিরের কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত, ভ্রমণ না করাই ভালো। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি ঘট্‌বে। রেসখেলায় জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী শুভফলদাতা। শতভিষার পক্ষে উত্তম নয়। কুম্ভরাশিজাত ব্যক্তিগণ এমাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য শুভ ঘটনার সম্মুখীন হবে না, বরং নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়ে দিনগুলি অতিবাহিত হবে। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মর্য্যাদাহানি, বন্ধুবিচ্ছেদ, স্বজনবিরোধ, অর্থ সম্পত্তিহানি, মতলববাজ ব্যক্তিদের পরামর্শে বিভ্রান্তিজনিত দুঃখ কষ্ট ভোগ প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সংযোগ হোতে পারে। কিন্তু গোটা মাসই অবশ্য খারাপ যাবে না। উত্তমসঙ্গ, সৌখিন দ্রব্যাদিলাভ, সাফল্য, প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থলাভ ইত্যাদিও সূচিত হয়। নানা প্রকারের পীড়া ঘট্‌তে পারে, উদর, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের ওপর রোগের সম্ভাবনা আছে। চক্ষুপীড়া হোতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে যারা আক্রান্ত, তাঁদের সতর্কতা আবশ্যক। সন্তানদের পীড়া। স্বজনবর্গের সঙ্গে অনেক সময়ে ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য ঘট্‌বে, অবশ্য এর জন্যে বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই, নানাভাবে আর্থিক অবস্থার অবনতি সূচিত হয়। গুরুতর ক্ষতি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। ভ্রমণের সময়

সতর্কতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। কোন প্রকার নব প্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। স্পেকুলেসন অনুচিত। রেসখেলায় পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ হোলেও গৃহ নির্ম্মাণ বা সংস্কার, ভূম্যাদি ক্রয় প্রভৃতি অনুচিত। মামলা মোকর্দ্দমা বর্জ্জনীয়। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্র ফল, ভালোমন্দ দুই-ই ঘট্‌বে। পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকলে এমাসে ঘট্‌বেনা, নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে পড়ে উপরওয়ালার প্রীতিভাজন হওয়ার পথরুদ্ধ হবে। যাঁরা খনি, ভাস্কর্য্য, সিমেন্ট, ভূখনন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মী আছেন তাঁদের কর্ম্মের উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি এক ভাবেই যাবে।

মহিলাদের পক্ষে মাসটি সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হবেনা, নিজেরাই নিজেদের দুঃখ কষ্ট টেনে আনবেন। যদি গর্ব্বিতা, উচ্চাভিলাষিণী, মুখরা ও কলহ প্রিয়া না হয়ে ওঠেন, তাহোলে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘট্‌বে না। অবৈধপ্রণয়িনীরা সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হবেন। প্রণয়প্রার্থনা বিপজ্জনক। পদেপদে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ হবে। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে খুব সংযত ভাবে চলতে হবে,পাছে কোন উত্তেজনার বশে কোনরূপ বেদনাদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পর পুরুষের সংস্রবে আসা যুক্তিযুক্ত নয়।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম, রেবতীর পক্ষে মধ্যম আর উত্তর-ভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তমস্বাস্থ্য, সৌভাগ্যসুখ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, উপঢৌকন প্রাপ্তি, নূতন পদ মর্য্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধনলাভ, সম্পত্তিপ্রাপ্তি প্রভৃতি শুভ সংযোগ দেখা যায়। দুঃখ কষ্ট, বন্ধুদের সঙ্গে কলহ বিবাদ, মর্য্যাদাহানি, ক্লান্তিকর, প্রতারক বন্ধুদের চক্রান্তে কষ্টভোগ, শারীরিক কষ্ট, অর্থক্ষতি, মনোমালিন্য প্রভৃতি অশুভ সংযোগেরও সম্ভাবনা আছে। শেষার্দ্ধে উদরপীড়া, হজমের ব্যাঘাত আমাশয় প্রভৃতি সম্ভব। পারিবারিক ক্ষেত্র সুখশান্তিপূর্ণ, সৌখীন-দ্রব্য লাভ বিলাসব্যসনের দিকে দৃষ্টি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সূচিত হয়। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছু কষ্ট ভোগ। আর্থিকক্ষেত্র অতীব উত্তম, নানাভাবে ধন সম্পত্তি উপঢৌকন লাভ। সম্পত্তি থেকেও অর্থলাভ রঙ্গমঞ্চ, ছায়াচিত্র, বস্ত্রব্যবসায়, মনিহারি দ্রব্যাদি মাধ্যমে বেশী পরিমাণে অর্থ আসবে। অর্থের আধিক্য ঘটলেও ব্যয়ের চাপে সঞ্চয়ের অভাব ঘট্‌বে। স্পেকুলেশনে ধনলাভ। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরিক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়, এদের সাফল্য ঘট্‌বে ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভ। মধ্যে মামলা মোকর্দ্দমা বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে কিছু দুঃখ ভোগ—ভূমি ও খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মলাভ। অস্থায়ী পদে নিযুক্ত কর্ম্মীরা স্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত হবে। পদনিয়োগকর্ত্তারা কর্ম্মচারীদের কাছথেকে সন্তোষ-জনক কাজ ও ব্যবহার পাবেন। মহিলাদের পক্ষে মাসটী উত্তম। বিদুষী ও উচ্চশিক্ষিতারা নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন। মানসিক স্বচ্ছন্দতা, ধনসম্পদ ও অলঙ্কার লাভ। খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য, দুঃসাহসিক কর্ম্মগুলিও বিপত্তির কারণ ঘটাবেনা। সাংসারিক, সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, সমাদর-লাভ ও খ্যাতির যোগ পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমণেও আনন্দ লাভ।

ব্যক্তিগত লগ্নের ফলাফল

মেষলগ্ন

শিরঃপীড়া, চক্ষুপীড়া ও কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট। ধনাগম, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা, ব্যয়াধিক্য। ধর্ম্মপ্রবণতা, সহোদরাদির সহিত মতদ্বৈধ। নিকট সম্পর্কীয়ের মৃত্যুযোগ, দাম্পত্য প্রীতি, সুখলাভ, পারিবারিক শান্তি। সন্তানের পীড়া, এমন কি সন্তানহানিযোগ, শত্রুবৃদ্ধি, স্ত্রীর পীড়াদি সম্ভাবনা, সৌভাগ্য লাভ, আয়বৃদ্ধি, আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

বৃষলগ্ন

শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, সহোদরপ্রীতি, মাতৃপীড়া, কোন স্ত্রী-লোকের সাহায্যে অর্থপ্রাপ্তির আশা, লৌহজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভ। সাংসারিক ব্যাপারে মানসিক অশান্তি, স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি, ভাগ্যোদয়ে বাধা-বিপত্তি, কর্ম্মস্থলে বিশৃঙ্খলতা, উত্তম আয়,সৌখিন দ্রব্যাদির জন্য ব্যয়াধিক্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভ, বন্ধুর চেষ্টায় চাকুরি বা পদোন্নতি। পারিবারিক অশান্তি, পিতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা তাদৃশ নয়। দুর্ঘটনা, দাম্পত্য সুখের অভাব, ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণে বা সংস্কারাদিতে ব্যয়াধিক্য, স্ত্রীলোকের শুভাশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী উত্তম। রবিশস্য ব্যবসায়ে উত্তমলাভ।

কর্কটলগ্ন

কিঞ্চিৎদেহপীড়া, পত্নীর স্বাস্থ্যহানি, সহৃদ্মলাভ, ব্যয়বাহুল্য হেতু মানসিক চাঞ্চল্য। তীর্থ ভ্রমণে প্রবল ইচ্ছা, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার, আয় বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে উন্নতি, কর্ম্মলাভ। কর্ম্মোন্নতির সূচনা থাকা সত্ত্বেও অন্তরায়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী শুভ, বিদ্যায় উন্নতি লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

সিংহলগ্ন

স্নায়বিক পীড়া, উদর ও শুক্রঘটিত পীড়া, সহোদরের সহিত মনো-মালিন্য, বিদ্যাস্থান ও সম্ভব স্থলে সন্তান স্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শুভ না হোলেও কিছু কিছু শুভ ফলের আশা করা যায়। ধনাগম যোগ, মিত্র-লাভ, নবনির্ম্মিত গৃহে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ফল মধ্যবিধ।

কন্যালগ্ন

স্বাস্থ্যের উন্নতি, ভ্রাতৃবধূর মারাত্মক পীড়াযোগ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, মাঙ্গলিক কর্ম্মে যোগদান, দাম্পত্য প্রণয়ের দৃঢ়তা। ধান্য ও চাউল ব্যবসায়ে লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ভাগ্য ও ধর্ম্মোন্নতিরযোগ, চাকুরিক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিস্থিতি এমন কি পদোন্নতির সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম সময়।

তুলালগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা। শিল্প-সাহিত্যচর্চ্চায় খ্যাতি। চাকুরিক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্ত্তন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ভাগ্যোন্নতির যোগ থাকা সত্ত্বেও আংশিক বাধা-বিঘ্ন, ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যাস্থানে বাধা বিঘ্ন। পত্নীর ও সন্তানের পীড়াবশতঃ অশান্তিভোগ, কর্ম্মস্থানে কিছু কিছু বাধা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী অশুভজনক।

বৃশ্চিকলগ্ন

দেহভাব শুভ, আকস্মিক প্রাপ্তিযোগ, ভূ-সম্পত্তিলাভ বা ক্রয়ের যোগ, স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি, ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায়। বিদেশভ্রমণযোগ। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশানুরূপ ফল দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ফল মধ্যবিধ।

ধনুলগ্ন

আর্থিক, মানসিক ও সাংসারিক বিষয়ে শুভ, প্রদাহ সংক্রান্ত পীড়া সাময়িকভাবে ঘটতে পারে। স্বাস্থ্যোন্নতি যোগ আছে, পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, মাতার দৈহিক অসুস্থতার জন্যে অর্থ ব্যয়। আর্থিকোন্নতি বিশেষভাবে ঘটবে। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অধিকতর উন্নতি, মাঙ্গলিক কার্য্যে অন্তরায়, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকরলগ্ন

মানসিক ও শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়, ভ্রমণ। কর্ম্ম স্থলে কিছু কিছু বাধা ঘটবে—তাতে বিশেষ ক্ষতি না হোলেও মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। চিকিৎসাদিতে লাভবান হবার যোগ। অধ্যাপনায় খ্যাতিলাভ, অর্থাগম যোগ, শিল্প ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ, দাম্পত্য সুখ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যবিধ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

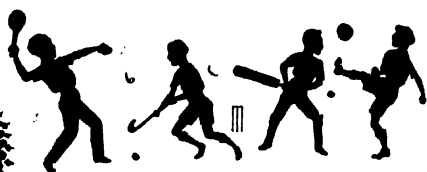
কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ, ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার, পিতার স্বাস্থ্যহানি। মাতার স্বাস্থ্য উত্তম। পত্নীর আন্তরিকতা। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু ফল। বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য, স্ত্রীর-হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, আত্মীয় বিয়োগ, পাট, ধান ও লৌহজাত ব্যবসায়ে লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

মীনলগ্ন

শারীরিক স্বচ্ছন্দতা, আশানুযায়ী অর্থলাভ না ঘটলেও নিতান্ত কম হবে না, ব্যয়াধিক্য, রাষ্ট্রানুগ্রহ লাভ। আত্মীয়ের পীড়া। দাম্পত্য প্রণয়, সন্তান লাভ বা সন্তানের বিবাহসূচনা, ব্যয় বাহুল্যহেতু সাময়িক ঋণযোগ আছে। কর্ম্ম-স্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধিযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।





সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের মহিলা হকি দল

হ্যারল্ড হেষ্টিংস

ব্রিটেনে মহিলাদের হকি খেলার জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, জনসাধারণের মধ্যে মহিলাদের হকি খেলা দেখার আগ্রহাতিশয্য থেকে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ। ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসে ইংলণ্ড ও জার্মান মহিলা কি দলের মধ্যে যে খেলা হয় তা দেখবার জন্য ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রায় ৫৪,০০০ দর্শক সমবেত হন। এই খেলায় ইংলণ্ড ২—১ গোলে জার্মানাকে পরাজিত করে। ই বৎসর ওই মাঠেই ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। এবার দর্শক সংখ্যা ০,০০০ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এই আশা সত্য লে পূর্ব্বের সমস্ত রেকর্ড এবার ভঙ্গ হবে।

১৯৫১ সালের পর থেকে মহিলাদের হকি খেলার নপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই সময় 'অল্ লণ্ড উইমেন্‌স হকি এ্যাসোসিয়েশন' আন্তর্জাতিক লাগুলির ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ রেন। এর পূর্ব্বে সারে কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের হেড্-য়ার্টার্স ওভাল মাঠে মহিলাদের আন্তর্জাতিক হকি-লাগুলি অনুষ্ঠিত হত। এই মাঠে ২০,০০০ দর্শকের শী স্থান সংকুলান সম্ভব হতো না, যার ফলে আরও বড় ঠের সন্ধান চলতে থাকে।

ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত প্রথম মহিলাদের হকি খেলায় সমালোচকগণ যথেষ্ট দর্শক সমাগম হবেনা বলেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কিন্তু দেখা যায় এই খেলায় ত্রিশ হাজারেরও বেশী দর্শকের সমাগম হয় এবং সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হয় ৪,০০০ পাউণ্ড।

'অল ইংলণ্ড উইমেন্‌স হকি এসোসিয়েশন' একটি সুদক্ষ ক্রীড়া-সংগঠন। খেলা পরিচালন ব্যাপারে এই সংগঠনটি এতদূর দক্ষতা প্রদর্শন করেছে যে এর চেয়ে অনেক বড় পেশাদার ক্রীড়া সংগঠনের সমকক্ষতা দাবী করতে সক্ষম। এর অধীনে আছে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ৩০,০০০ খেলোয়াড়। তা ছাড়া ৫০০,০০০ বা তারও অধিক স্কুলের মেয়ে প্রতি মরশুমে হকি খেলছে।

ব্রিটেনে সর্ব্বসমেত ১,০০০ কাউন্টি ও অন্যান্য 'সিনিয়র' ক্লাব আছে এবং তার সঙ্গে আছে ১,৭০০ স্কুল ও সংশ্লিষ্ট ক্লাব।

ওয়েম্বলিতে যখনই কোন আন্তর্জাতিক খেলা অনুষ্ঠিত হয় তার কয়েকমাস আগেই দেখা গেছে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে যায়। সমস্ত টিকিটই ক্লাব এবং স্কুলগুলিকে দেওয়া হয়, যাতে সত্যকারের হকি ক্রীড়ামোদীরাই এই খেলা দেখবার সুযোগ পান। খেলার দিন হাজার হাজার স্কুলের মেয়েকে তাদের স্কুলের 'ব্লেজার' ও 'স্কার্ফ' পরে এবং জাতীয়



ইংলণ্ড বনাম স্কটল্যাণ্ডের মহিলাদের আন্তর্জাতিক হকি খেলায় স্কটল্যাণ্ডের গোল-কিপারকে একটি গোল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে। ইংলণ্ড এই খেলায় ৫-২ গোলে জয়লাভ করে।

প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হবে কেপ্-টাউনে আর শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হবে নাইরবিতে।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা হকি খেলোয়াড় শ্রীমতী রাসেল ভিক্, ইংলণ্ড দলের পক্ষে কত গোল যে দিয়েছেন তা তিনি নিজেও বোধ হয় স্মরণ করতে পারেন না। শ্রীমতী ভিক দু'টি সন্তানের জননী।

ব্রিটেনের মহিলা হকি খেলোয়াড়গণ সত্যকারের শৌখীন খেলোয়াড়। গোল হবার পর তাঁরা যে যার খেলার জায়গায় ফিরে যান নিঃশব্দে গোলদাতাকে কোনরূপ অভিনন্দন বা আনন্দ প্রদর্শন না করে। পোষাক, জুতা, স্টিক্ সবই তাঁরা নিজেদের পয়সায় ক্রয় করেন। আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদানের জন্য বিনামূল্যে তারা যা লাভ করেন তা হলো তাঁদের ব্লাউজে আটকাবার জন্য ব্যাজ। তাঁদের মধ্যে এই ব্যাজ ধারণ করার ন্যায় গৌরব ও উত্তেজনার অন্ত নেই।

রং-এর ফিতার ফুল লাগিয়ে দলে দলে স্টেডিয়ামের দিকে যেতে দেখা যায়।

ইংলণ্ড দলের আন্তর্জাতিক রেকর্ড লক্ষ্য করার মত। মাত্র দু'টি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এরা পরাজিত হয়েছে ১৯৩৩ সালে ২-১ গোলে স্কটল্যাণ্ডের নিকট এবং ১৯৫০ সালে ৫-০ গোলে আয়ার্লাণ্ডের নিকট পরাজিত হয়। এ ছাড়া বাইরের কোন দলের নিকট এরা পরাজয় বরণ করেনি।

গত আমেরিকা সফরে গিয়ে ইংলণ্ডের মহিলা হকি খেলোয়াড়গণ তাঁদের গোল দেবার দক্ষতা এবং খেলার উৎকর্ষতার জন্য সেখানে অভাবনীয় সুনাম অর্জন করেন।

ওয়েম্বলিতে ইংলণ্ড দল পর পর ১০টি খেলায় জয়-লাভের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এই আন্তর্জাতিক সাফল্য লাভ করতে তাদের জার্মানী, বেলজিয়াম এবং হলাণ্ড দলকে পরাজিত করতে হয়েছে। এই বৎসরে ইংলণ্ডের মহিলা হকি দল আফ্রিকা সফরে যাবে দু'মাসের জন্য। তাদের

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ২৬তম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল সর্ব্বাধিক ৩৮টি পদক (স্বর্ণ ১৮, রৌপ্য ১৪ এবং ব্রোঞ্জ ৬) লাভ ক'রে প্রথমস্থান পেয়েছে। প্রতি-যোগিতায় ১৫টি দলের মধ্যে ১৪টি ছিল বিভিন্ন রাজ্য। গুজরাট, বিহার এবং উড়িষ্যা কোন পদক লাভ করতে পারেনি। পশ্চিম বাংলা মোট ২৫টি পদক পায় (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮)। চারদিনের অনুষ্ঠানে ১৪টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪টি বিষয়ে পূর্ব্বের রেকর্ডের সঙ্গে সমান হয়।

পুরুষ বিভাগে ৭টি, মহিলা বিভাগে ২টি, বালকদের

বিভাগে ৩টি এবং বালিকাদের বিভাগে ২টি নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ভিসেস দলের জোরা সিং ২০ কিলো-মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ক'রে উপর্যুপরি ৫বার এই অনুষ্ঠানে জয়লাভ করার গৌরব অর্জ্জন করেন।

বালিকাদের বিভাগে মহারাষ্ট্রের পনের বছরের বালিকা ক্রিষ্টিনি ফোরেজ ৬টি বিষয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের ষ্টিফি ডি' সুজা ১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড়ে ১ম স্থান লাভ করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১০০ মিটার দৌড়ে মিস ডি' সুজা এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ২০০ মিটার দৌড় অনুষ্ঠানে তিনি নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন এবং এশিয়ান রেকর্ডের সমান করেন। পুরুষ বিভাগের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে কৃপাল সিং স্বর্ণপদক পেয়ে মিস্ ডি'সুজার মতই স্প্রিণ্টে 'ডবল খেতাব' লাভ করেন।

নতুন ভারতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

হ্যামার থ্রো: দেবী দয়াল (সার্ভিসেস) দূরত্ব ১৬৭´ ১১´´

৫০ কিলো মিটার ভ্রমণ: জোরা সিং (সার্ভিসেস)—সময় ৪ঘঃ ৩৩মিঃ ১৮.৬সেঃ (এশিয়ান রেকর্ড)

সটপুট: ডি ইরাণী (মহারাষ্ট্র) দূরত্ব ৫০´ ৪´´ (এশিয়ান রেকর্ড)

৮০০ মিটার দৌড়: অমৃত পাল (সার্ভিসেস)—সময় ১মিঃ ৫২.১ সেঃ

পোল ভল্ট: আজিব সিং (পাঞ্জাব) :

১০,০০০ মিটার দৌড়: ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস) সময় ৩১মিঃ ৯.২সেঃ

৩,০০০ মিঃ ষ্টিপল চেজ: পান সিং (সার্ভিসেস) সময় ৯মিঃ ২.৩সেঃ (এশিয়ান রেকর্ড)

বালকদের বিভাগ

সট পুট: সাধু সিং (পাঞ্জাব) দূরত্ব ৪১´ ৬½´´

লং জাম্প: কে, পি, সিং (মহীশূর)—দূরত্ব ২১´ ১¾´´

৪ × ১০০ মিটার রীলে: ইউ, পি। সময় ৪৫.৯সেঃ

বালিকাদের বিভাগ

বর্শা নিক্ষেপ: ক্রিষ্টিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র) দূরত্ব ১০৫´ ৭¾´´

সট পুট: ক্রিষ্টিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র)—দূরত্ব ২৭´ ৪½´´

মহিলা বিভাগ

২০০ মিটার দৌড়: ষ্টিফি ডি'সুজা (মহারাষ্ট্র) সময় ২৫.৩সেঃ (এশিয়ান রেকর্ডের সমান)

১০০ মিটার দৌড়: স্টিফি ডি'সুজা (মহারাষ্ট্র) সময় ১২.২সেঃ (এশিয়ান রেকর্ড)

পদক লাভের তালিকা

দল	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সার্ভিসেস	১৮	১৪	৬
মহারাষ্ট্র	১৩	৪	৪
পাঞ্জাব	৫	৮	১২
উত্তরপ্রদেশ	৫	৩	৫
বাঙলা	৪	১৩	৮
দিল্লী	৩	৬	৭
মহীশূর	৩	২	৩
মাদ্রাজ	২	১	৫
কেরলা	১	১	২
রাজস্থান	০	১	২
অন্ধ্র	০	১	০
মধ্যপ্রদেশ	০	০	১

পশ্চিমবাংলার স্বর্ণপদক

পোলভল্ট: ডি, আর, রায় (বালক বিভাগ)— উচ্চতা ১১´ ৮¾´´

হাইজাম্প: জি ব্রাউটন (মহিলা বিভাগ)—উচ্চতা ৪´ ৯´´

সটপুট: এ্যান রিচসন (মহিলা বিভাগ)—দূরত্ব ৩২´ ৩´´

রঞ্জি ট্রফিঃ

বোম্বাই খেলার দেড় দিন সময় থাকতে এক ইনিংস এবং ২০৩ রানে দিল্লী এবং ডি-সি দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে।

বোম্বাইঃ ৫২৭ (আর জি নাদকার্নী ২৮৩ নট আউট, আর বি দেশাই ৬৯, পি আর উমরীগড় ৬৬)

দিল্লী এ্যাণ্ড ডি-সি-এঃ ১৩২ (দেশাই ৫০ রানে ৫, জি গার্ড ৪৭ রানে ৫ উইকেট) ও ১৯২ (দিয়াকর ৩৮ রানে ৪ এবং দেশাই ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে খেলার ২য় দিনে বোম্বাই দলের ১ম ইনিংস ৫২৭ রানে শেষ হয়। দিল্লী ও জেলা ক্রিকেট এসোসিয়েসন দলের ১ম ইনিংস ঐ দিনেই মাত্র ১৩২ রানে শেষ হয়। ফলো-অন ক'রে দিল্লী দল ২ উইকেট হারিয়ে ৩৯ রান করে। খেলার ৩য় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের ৪৫ মিনিট পরে ২য় ইনিংস ১৯২ রানে শেষ হয়। অফ্-স্পিনার দিয়াদকর ৩৮ রানে ৪টি উইকেট পান। দেশাই ৩টি উইকেট পান ৭৯ রান দিয়ে। জি গার্ড অসুস্থতার দরুণ এই দিন খেলায় যোগদান করেন নি।

রাজস্থানঃ ৩০১ (রুংটা ৭৪। প্রভাকর ৮৫ রানে ৪, ভি কুমার ৭৫ রানে ৪ উইকেট) ও **২১০** (কুমার ৭৮ রানে ৪)

মাদ্রাজঃ ৩২৮ (কৃপাল সিং ৬৫, মিলখা সিং ৫৬, শ্রীধর ৯৮। ডুরাণী ৭৩ রানে ২ উইকেট ; মানকড় ৪২ রানে ২ উইকেট) ও **১১৬** (ডুরাণী ৬ রানে ৩, সুভাষ গুপ্তে ৪০ রানে ৩, মানকড় ৩৪ রানে ২ উইকেট)

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফির অপর দিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় রাজস্থান ৬৭ রানে মাদ্রাজকে নাটকীয়ভাবে পরাজিত করে। ৪র্থ দিনে লাঞ্চের ৪০ মিনিট পর খেলার নিষ্পত্তি হয়। এই দিন মাদ্রাজের ১০টি উইকেট নাটকীয়-ভাবে পড়ে যায়। পূর্ব্বদিনের ৬ রানের সঙ্গে ১১০ রান যোগ হয়। মোট ১৭৮ রান তুলতে পারলে মাদ্রাজ জয়ী হ'ত।

ফাইনাল ঃ

ভূপালের নোবলস কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই ৭ উইকেটে রাজস্থান দলকে পরাজিত করে। ৩য় দিনের লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর পাঁচ দিনের খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এই নিয়ে বোম্বাই দল উপর্যুপরি তিনবার এবং সর্ব্বসমেত ১২ বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভ করলো। গত তিন বারের বিজয়ী বোম্বাই দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করলেন পলি উমরিগড়। খেলাটি হয়েছিল ম্যাটিং উইকেটে।

১ম দিনের খেলায় রাজস্থান দলের ১ম ইনিংস ১৪০ রানে শেষ হয়। দেশাই একাই ৪৬ রানে ৭টা উইকেট পান। এই দিন বোম্বাই ৪টি উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রান করে। ৫ম উইকেটে জুটি বেঁধে ছিলেন নাদকার্ণী এবং রামচাঁদ—তাঁরা যথাক্রমে ৩৮ ও ৩৭ রান ক'রে নট আউট ছিলেন। ২য় দিনে ৩৪৬ রানে বোম্বাইয়ের ১ম ইনিংস শেষ হয়। ৫ম উইকেটের জুটিই শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাইকে বাঁচিয়ে দেয়—এই জুটিতে ১৮৭ রান ওঠে। রামচাঁদ ১১৮ এবং নাদকার্ণী ৯৬ রনে করেন। রাজস্থান দলের সেলিম ডুরাণী ৯৯ রানে ৮টা উইকেট পান—৩২ ওভার বল দিয়ে। ২য় দিনে রাজস্থানের ২য় ইনিংসে ৩টে উইকেট পড়ে ১০৯ রান ওঠে। ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও রাজস্থানের ৬৮ রান প্রয়োজন ছিল। ৩য় দিনে রাজস্থানের ২য় ইনিংস ২৪৯ রানে শেষ হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৪ রান তুলতে বোম্বাই দলকে ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। ৪২ মিনিটে ৪৪ রান তুলে দেয়—৩টে উইকেট পড়ে যায়। বোম্বাই ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

রাজস্থান ঃ ১৪০ (দেশাই ৪৬ রানে ৭ উইকেট) ও **২৪৯** (দেশাই ৭৪ রানে ৪ ; বালু গুপ্তে ৫০ রানে ৩)

বোম্বাই ঃ ৩৪৬ (রামচাঁদ ১১৮, নাদকার্ণী ৯৮। সেলিম ডুরাণী ৯৯ রানে ৮ উইকেট) ও ৪৪ (৩ উইকেটে)

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত ২৬তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ১৩টি দল যোগদান করে। গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেস দল একদিকের সেমি-ফাইনালে ২-৩ গোলে পাঞ্জাব দলের কাছে পরাজিত হয়। অপর দিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে দল ১-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে হারায়।

বাংলা দল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম খেলে এবং প্রথম খেলাতেই দুর্ভাগ্যক্রমে ০-১ গোলে পাঞ্জাব দলের কাছে পরাজিত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে সরাসরি খেলেছিল ৪টি দল—গত বছরের বিজয়ী সার্ভিসেস, বাংলা, রেলওয়ে এবং উত্তর প্রদেশ।

এ বছর দু'দিন ফাইনাল খেলা হয়। প্রথম দিন উভয় পক্ষই একটি ক'রে গোল করে। প্রথমার্দ্ধের খেলা গোল শূন্য থাকে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় রেলওয়ে দল অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ১-০ গোলে পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করে। রেলওয়ে দল ১৯৫৭ সাল থেকে উপর্যুপরি তিন বছর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসীপের পুরস্কার 'রঙ্গস্বামী কাপ' জয়লাভের পর পুনরায় এ বছর জয়ী হ'ল। গত বছর রেলওয়ে দল সেমি-ফাইনালে উত্তর প্রদেশ দলের কাছে পরাজিত হয়েছিল। এ বছরের সেমি-ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে দল ১-০ গোলে উত্তর প্রদেশকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্ব বৎসরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। রেলওয়ে দল সর্ব্বসমেত পাঁচবার ফাইনাল খেলে (১৯৩০, ১৯৫৭-৫৯ এবং ১৯৬১) পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে ; সর্ব্বাধিক সাতবার জয়ী হয়েছে পাঞ্জাব। উল্লেখযোগ্য জয়লাভ সার্ভিসেস ৪ বার, বাংলা ৩ বার ; বাংলা শেষ জয়ী হয়েছে ১৯৫২ সালে। ১৯৫৫ সাল থেকে রেলওয়ে এবং সার্ভিসেস দলই জয়ী হয়েছে—রেলওয়ে দল ৪ বার এবং সার্ভিসেস দল ৩ বার।

সাহিত্য সংবাদ

স্মৃতিচারণ—চরণিক : শ্রীদিলীপকুমার রায়।

বইখানির বিপুল আয়তন দেখে ভীত হ'য়ে পড়েছিলুম। এত বড় গ্রন্থ পড়ে শেষ করতে যে অনেক সময় লেগে যাবে! অথচ তৃতীয় রিপুর আকর্ষণও গ্রন্থকীটেদের পক্ষে অজেয়। মানুষের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই যে অপর মানুষের মনের মধ্যে উঁকি মেরে দেখার সুযোগটুকু। সুমুদ্রিত বইখানি নেড়েচেড়ে এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটের উপর দু'চারবার হাত বুলিয়ে ইতস্তত: করতে করতে শেষটা 'ভূমিকায়' কি বলেছেন লেখক দেখা যাক—বলে আবরণ খুলে ফেলা হল। সুদীর্ঘ ভূমিকা। সুলিখিত। এক নিঃশ্বাসেই পড়ে ফেললুম। লেখক অযথা অনেক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন দেখলুম। বইখানির ভিতর দিয়ে লেখক নিজেকেই বেশিরকম জাহির করেছেন যাঁরা বলছেন তাঁদের এ হাস্যকর মন্তব্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কারণ তাঁদের এ জ্ঞানটুকুও নেই যে নিজের স্মৃতিকথা লিখতে বসে নিজেকে বাদ দিয়ে তা করা যায় না। সে চেষ্টা যদি করা হয় তবে দেখা যাবে বইখানি হয়ে দাঁড়িয়েছে—Hamlet-without the Prince of Denmark! 'ভূমিকায়' আকৃষ্ট হ'য়ে অবশেষ এই বিরাট গ্রন্থ 'স্মৃতিচারণ' সবটাই পড়ে ফেললুম। বলা বাহুল্য খুবই ভাল লাগলো। লেখকের রচনার মধ্যে যেন নূতন করে ফিরে পেলুম অনেক হারানো বন্ধুকে। কেউ বা পরম শ্রদ্ধেয়, কেউ বা অশেষ প্রীতিভাজন, পেলুম তাঁদের সেই ভুলে যাওয়া পুরানো পরিবেশের মধ্যে, সেই সাজ পোষাকে, সেই পরিচিত চাল-চলনে। তাঁদের সেই বিশেষ কথা বলার ভঙ্গী, সেই সরস আলাপ আর সেই সঙ্গে তাঁদের অন্তর বাহিরের অনবদ্য রূপ বার বার মনকে যেন স্পর্শ করে যাচ্ছিল। মনে মনে স্বীকার করলুম সার্থক হয়েছে এই রচনা। লেখকের জয় হোক। আরও অনেক অপরিচিত দেশী ও বিদেশী নরনারীর চরিত্র চিত্রণ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থখানিতে যাঁরা বিশ্বসভায় কীর্তিমান বলে গণ্য। লেখকের কৃপায় তাঁদের সঙ্গেও কিছু পরিচয় ঘটলো এই গ্রন্থে। স্মৃতিচারণের মধ্যে নূতন করে দেখা পেলুম দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর অগ্রজ হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিয় বন্ধু গিরিশদাকে অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে, নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, যতীন্দ্রনাথ বসু, খগেন্দ্রনাথ মজুমদার (আমাদের তকুমামা), হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ), কবি বরদাচরণ মিত্র, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বকুবাবু প্রভৃতি আরও অনেক সুপরিচিত জ্ঞানী গুণীর বাঞ্ছিত সঙ্গ লাভ করে ধন্য হলুম। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের জীবনের মাত্র দুটি পর্ব সংকলিত হয়েছে। প্রথম পর্বে লেখকের শৈশব ও বাল্য চিত্র এবং দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি পেয়ে প্রীত হয়েছি। আশা দিয়েছেন তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বও লিখবেন। আমরা প্রতীক্ষায় রইলুম।

[ডিমাই আট পেজী সাইজ। ৬১৩ পৃষ্ঠা। মূল্য—১২৲]

নরেন্দ্র দেব

প্রেমের ঠাকুর : সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন অনেক ভক্ত, অনেক সাহিত্যিক। "প্রেমের ঠাকুর" সেই জীবনী-সাহিত্যের মালায় একটি মূল্যবান মুক্তা স্বরূপ। ভক্তিমান লেখক যে শুধু ঠাকুরের তথ্যমূলক জীবনালেখ্য রচনা করেছেন তা নয়, তিনি ঠাকুরের সাধক-জীবনের একটি মনোরম চিত্রও অঙ্কিত করেছেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়"—এ কথাটি যে কত বড় সত্য তা 'প্রেমের ঠাকুর' পাঠে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে লেখক কয়েকটি স্বরচিত গান যোজনা করেছেন। এ গানগুলিও সুলিখিত ও উপযোগী হয়েছে।

গ্রন্থটি ভক্ত মাত্রেরই, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগীদের কাছে যে বিশেষ সমাদর লাভ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু। ৮, প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর, কলিকাতা—৩৬। মূল্য ৪৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য :

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

বিরাট দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ, বিপুল বিচিত্র তার সংস্কৃতি। তার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আপ্লুত হতে হয়। তেমনি, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে পূজ্যপাদ ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সদ্যোলিখিত 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থের মুখোমুখি হয়ে। কেবলমাত্র বহুধা ক্ষেত্রেই নয়, ভারত-সংস্কৃতির একটিমাত্র প্রবাহের কতো ধারা-উপধারা, দেশে-কালে তার কতো বিবিধ-বিবর্তিত রূপ এবং কী বিরল শ্রম ও আন্তরিকতা নিয়ে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সেই অপরূপ

রূপের মর্মোদ্ঘাটন করেছেন, তার বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন, এবং সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ঐক্য--তাকে গ্রথিত করেছেন অপূর্ব স্থাপত্যকলায়।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই অনুসন্ধান-পর্ব সূচিত হয়েছে গত শতক থেকেই। কিন্তু সেদিন বিদেশী গবেষক একাজে নেমেছিলেন মুখ্যতঃ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান দৃষ্টি নিয়ে এবং ভারতীয় মনীষীর বিচার-বুদ্ধির নিয়ামক স্বাভাবিকভাবে ছিল দেশপ্রেমের আবেগ। চেতনা দুটি রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে একটি বিন্দুতে সমাহৃত হল বিংশ শতকে। বিন্দুটিকে কঠিন প্রয়াসে দিনে-দিনে যাঁরা উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন, ডঃ দাশগুপ্ত তাঁদের অগ্রগণ্য। অতীতকে তিনি দেখেছেন, সনাতন মোহ অথবা উন্নাসিক আধুনিকতার কাজল-চোখে নয়; তাকে ভালোবেসেছেন, জানতে চেয়েছেন তার সত্য স্বরূপ। তাই ইতিহাসবুদ্ধি এবং অধ্যাত্মচেতনা উভয়কেই গ্রহণ করেছেন সমান শ্রদ্ধায়। এই উদার ও ব্যাপক অথচ তথ্যসম্মত মনোভঙ্গি তাঁর পূর্বগামী গবেষণা-গ্রন্থ—অ্যান ইন্‌ট্রোডাক্‌সন্‌ টু তান্ত্রিক্‌ বুড্‌ঢিজ্‌ম্‌', অব্‌স্কিওর রিলিজিয়াস্‌ কাল্ট্‌স্‌' এবং 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'—এর মধ্যেও বিদ্যমান।

বহুবিধ ধর্মস্রোতের মধ্যে যে কটি সাধনমার্গ ভারতীয় জীবনে ও মানসে গভীরতম ছায়া ফেলেছে, শাক্ত দর্শন ও সাধনা তাদের অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থটির বেধ অতল এবং পরিধি বিরাট। সূচনার দৃষ্টিকোন এবং তার আলোকে শক্তি-দেবীর উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বিবর্তনের দৃশ্য পেরিয়ে-পেরিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাধনা, বৈষ্ণব ও রামায়ণ সাহিত্য এবং বাংলা মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদের আলোয় দীপান্বিতা দেবীর ক্রম-বিকশিত বিভিন্ন রূপের ছবিগুলি একে-একে মেলে ধরা হয়েছে। আবার ঐতিহ্য তো শুধু অতীতে আবদ্ধ নয়, সে আমাদের মধ্যে বর্তমানের বহুসঞ্চারী; শক্তিতত্ত্ব কেবল সেকালে নয়, একালেও নানাভাবে বিদ্যমান। ডঃ দাশগুপ্তের সমগ্রদৃষ্টি আধুনিক সাহিত্য ও সাধনার মধ্যে শক্তিসাধনার সনাতন রূপ এবং নবরূপায়ন লক্ষ্য করতে ভোলে নি। এর চেয়েও মহত্তর উপলব্ধি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে গ্রন্থটির শেষে চার অধ্যায়ে, যেখানে তিনি ওড়িয়া-মৈথিলী-অসমীয়া-হিন্দী শাক্ত সাহিত্যের বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন। প্রয়োজনস্থলে বিভিন্ন ধর্ম ও সাহিত্যের সাদৃশ্য বিচার করেছেন অপক্ষপাতে। বাংলাদেশকে কেন্দ্রে রেখেই এই বহুমুখী বিশ্লেষণ আবর্তিত ও প্রসারিত হয়েছে, তবু পরিধি-পরিক্রমায়ও তিনি অক্লান্ত ও মৌলিক। আজ যখন ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তখন শেষ অধ্যায়গুলি এক অপরিসীম মূল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতে শাক্ত সাধনা ও সাহিত্যের যে বিবর্তিত রূপ, তার কিছু পরিচয় আছে ইংরেজি নিবন্ধে ও গ্রন্থে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ধার-করা তথ্য' ব্যবহারে অনীহ, দক্ষিণী ভাষায় অধিকার নিয়ে অগ্রস্তুতির সংকল্প জানিয়েছেন। এই সংযম এবং তথ্যের প্রতি আনুগত্য বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণতার চেতনার স্বাক্ষর। বিশ্লেষণে তিনি বস্তুসচেতন, প্রকাশভঙ্গিতে সহজ-সরল, ভাষাপ্রয়োগে 'অনুচ্ছাসিত। তবু বক্তব্য স্থিতধী রসবোধে উজ্জ্বল।

ডাঃ দাশগুপ্ত শাস্ত্র ও সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন, তার বাইরে লোকসমাজেও পদক্ষেপ করেছেন। এ-সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা যদি থাকত, ('শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বিশ্লেষিত) শক্তিতত্ত্বের সংহত রূপের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় যদি এখানে সংযোজিত হত, এবং সেই উচ্চবিত্ত দর্শনের পাশে বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক শক্তি-আরাধনার একটি পরিচিতি দেওয়া হত—আমরা লাভবান হতাম। এই অভাববোধ তাঁর কাছে আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা থেকে জাত, অপূর্ণতার আক্ষেপসঞ্জাত নয়। কারণ ভারতীয় জীবন ও মানসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী মনন যে বিরল আনায়াসে পরিভ্রমণ করেছে, তা বিস্ময়কর। বৌদ্ধতন্ত্র, লোকায়ত ধর্মবৈষ্ণব তত্ত্ব, অবশেষে শক্তি-সাধনার ব্যাপক গভীরতায় তিনি আমাদের নিয়ে এসেছেন এবং প্রতিবারেই আমাদের ঋণী করে তুলেছে।

ঋণ অপরিশোধ্য। একথা জেনেই তাঁর কাছে একটি নিবেদন বা দাবি উপস্থাপিত করছি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিদেশী, বিশেষতঃ ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম-সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কে, কিছু কিছু আলোচনা সত্ত্বেও, আমাদের অজ্ঞতা অপরিমেয়। এবিষয়ে যদি তিনি বিস্তৃত পর্যালোচনার সূত্রপাত করেন, তবে শুধু আমরা নই, আগামীকালের ভারত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

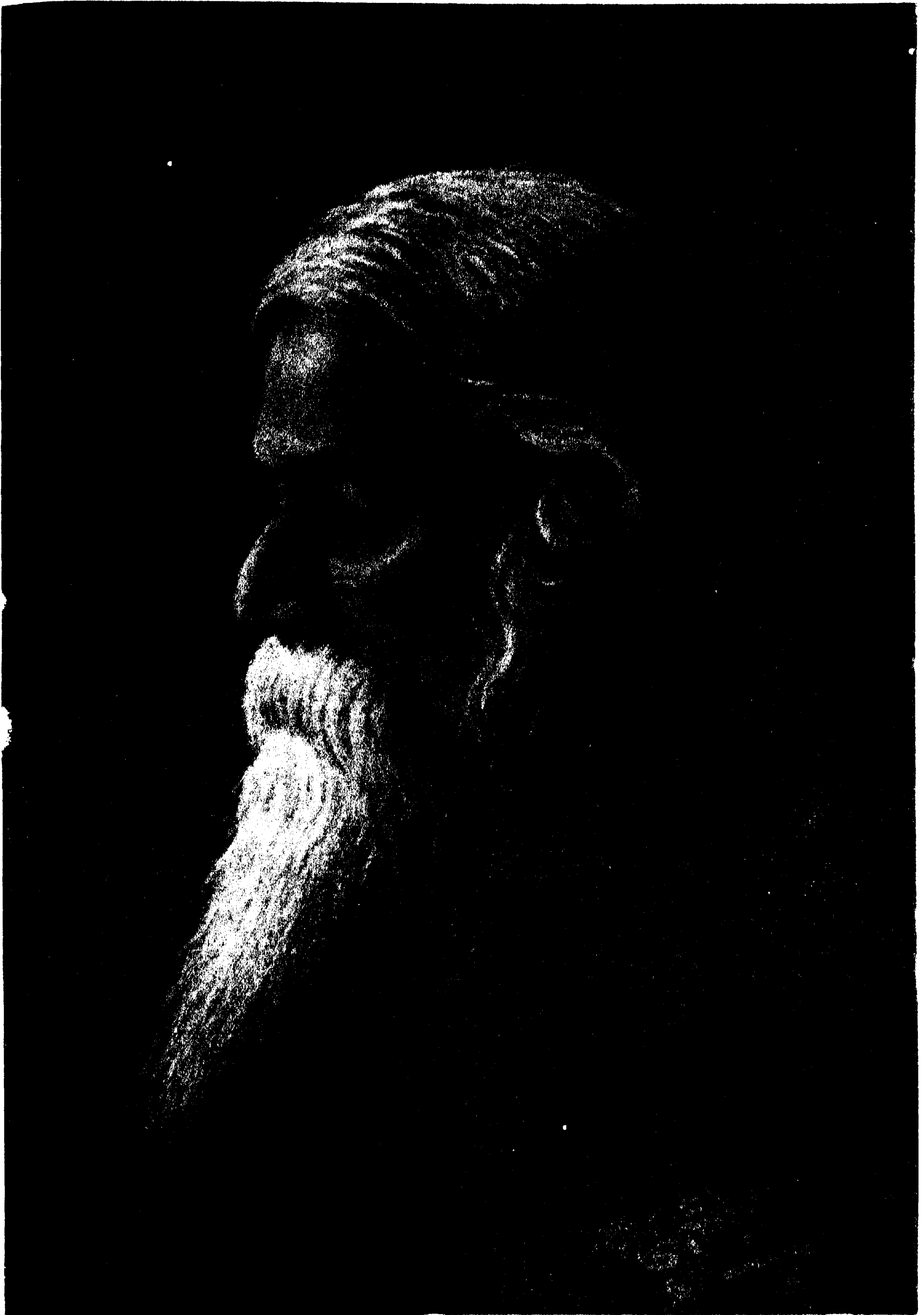
বলা বাহুল্য মুদ্রণ ও আনুসঙ্গিক পরিপাট্যে সাহিত্য সংসদ স্বনাম ও সুনাম অনুযায়ী যত্ন নিতে ত্রুটি করেন নি॥

সাহিত্যসংসদ, কলকাতা—৯। ১৫৲ টাকা॥

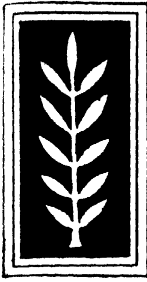
ডাঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

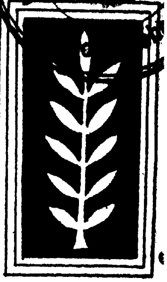
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



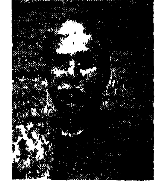
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন











বৈশাখ—১৩৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতির অধ্যাত্মবিশ্বাসে উত্তরণ

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে আমরা অদ্বয়ের মধ্যে যে দ্বয়বোধের কথা পাই তাহার মূল কথাগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে যাইবার মধ্যে একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গকে সাধারণভাবে আলোচনা করিতে গেলে তাহার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; মূল প্রশ্নগুলির সহিত কতকগুলি পার্শ্বপ্রশ্নও নৈয়ায়িক পন্থাতেই অপরিহার্য-রূপে দেখা দিবে। ফলে যাহা গিয়া দাঁড়াইবে তাহা হইল 'রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা'—যে জিনিসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অত্যন্ত ভীত ছিলেন। কবি অনুভূতিগুলিকে কাটিয়া ছাটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া একটা পূর্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন রূপ দিবার চেষ্টাকে আর কেহ না হোক কবি নিজে নিশ্চয়ই অপছন্দ করিতেন, আর নিশ্চয়ই অপছন্দ করেন তাঁহারা—যাঁহারা কবি-অনুভূতির বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কবিকে কবি করিয়াই পাইতে চান, যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত 'পাকা দার্শনিক' করিয়া দেখিতে চান না। কবির ভাষা সম্বন্ধে কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, ইহা হইল 'বালচন্দ্র'; একেবারে পরিষ্কার ভাবে গোটা চন্দ্র নয়, খানিকটার মধ্য দিয়া স্ফুট-অর্ধস্ফুট-অস্ফুট কত আভাস ইঙ্গিত। কবির দার্শনিকতা সম্বন্ধেও সেই কথা—একটা গোটা মত নয়—বিচিত্র আভাস ইঙ্গিত; তাহার সবটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে—কবি অনুভূতির সঙ্গে নিজের হৃদয়ানুভূতিকে মিলাইয়া লইয়া তবে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বয়বোধকে স্পষ্ট কোনও দ্বৈত-বাদের কোঠায় ঠেলিয়া পৌছাইতে চেষ্টা করিব না। কি তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কি তিনি বলিতে চাহিয়া-ছেন তাহা নিজের ভাষায় গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা না করিয়া যতটা পারি এ বিষয়ে কবিকেই অনুসরণ করিবার চেষ্টা

করিব। সে চেষ্টাও যতটা সম্ভব কালানুক্রমেই করিবার চেষ্টা করিব; কারণ তাহাতে কবির একটি ধাতুগত প্রবণতা জীবনের বিভিন্নকালে কবি-মানসকে কি ভাবে বিচিত্র খাতে বহাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবারও সুযোগ লাভ করিব। এ-পদ্ধতির মুখ্য গুণ হইল কবির বাণীকে ইহাতে কবির গানে এবং কবিতাতেই বুঝিয়া লওয়া যায়, কবিকে বুঝিবার ইহাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা; ঐতিহাসিক-ক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া কবির চিত্ত-বিকাশের ধারাটিও এখানে লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে আলোচনার গুণের সঙ্গে বড় একটি দোষও অনিবার্য—তাহা হইল অনেকখানি পুনরুক্তি। এই দ্বয়বোধকে অবলম্বন করিয়া কবির হৃদয়ানুভূতি অনেক সময়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাষায় ছন্দে কতকগুলি সমজাতীয় অনুভূতিকেই প্রকাশ করিয়াছে। সেই পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা কবির কবিতা ও গানকে ঐতিহাসিক ক্রমে অনুসরণ করিয়াই এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

বিশ্বসৃষ্টি রচনার পশ্চাতে এক 'মহাদেবে'র যে একটি 'মহাস্বপ্ন' রহিয়াছে এবং যে-পর্যন্ত সৃষ্টি দেখা দেয় নাই সে-পর্যন্ত এই মহাস্বপ্নের দ্বারাই যে মহাকাল এবং অনন্ত গগন পূর্ণ ছিল, রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের লেখা 'প্রভাত সংগীতে'র 'মহাস্বপ্ন' কবিতার মধ্যেই আমরা তাহার উল্লেখ পাই। এ-বিশ্বাস কবি-চিত্তে এখনও স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই—এখনও দেখি ছড়ান ছড়ান তরলভাবের নীহারিকা-পুঞ্জ, কিন্তু এই নীহারিকার ভবিষ্য আবর্তন-পথকে এইখানেই চিনিয়া লওয়া যায়। 'মহাস্বপ্নে'র পরবর্তী কবিতা 'সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়'; এই কবিতাতেও প্রাক্-সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে সৃষ্টির মূল রহস্য বাণী লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতি-শূন্য, মহাশূন্য'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান।
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।

এখানকার এই শেষের কথাটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান লইয়া সমগ্র কালও সৃষ্টির পূর্বেই অবস্থিত ছিল, তাহা অনন্ত দেশকে অবলম্বন করিয়া যে পর্যন্ত গতি লাভ না করিয়াছে সে-পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছে আদিদেবের ধ্যানের মধ্যে। ধ্যানের মধ্যে যাহা ছিল অমূর্ত 'ভাব'মাত্র—তাহাই বাহিরে মহাকমলের ন্যায় একটু একটু করিয়া দল বিকাশ করিতে লাগিল। এই 'বিকাশিছে দল' কথাটির ভিতরেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'ব্রহ্মকমলে'র ধারণার একটি অস্পষ্ট আভাস লাভ করি। জ্যোতির্ময় ধ্যানের বহির্মুক্তিতেই যে বিশ্বনির্ঝরের অকস্মাৎ প্রবাহ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পরবর্তী বর্ণনায়—

মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎ স্ফূর্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয় মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর…।

এ ক্ষেত্রে কবি বিধাতাকে আর সৃষ্টি-নির্ঝরকে নিত্য-সহ-অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না, কিন্তু সৃষ্টির যাহা কিছু তাহার সবই যে আদিদেবের ধ্যানবিধৃত ইচ্ছারই বিগ্রহীভবন মাত্র, এ ধারণাটি এইখানেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম। এই ধারণারই পরিণতি দেখিতে পাই পরবর্তী কালের গানে—

তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখি মোরে কেমনে কব,
আপন মনে মেঘ-স্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।

এই প্রথম দিকের কবিতায় একদিকে যেমন সৃষ্টির পিছনকার ধ্যানসত্যে বিশ্বাস দেখিতে পাই, অন্য দিকে তেমনি একটি 'পরম তুমি' যোগে 'আমি'র অর্থ এবং মূল্য অনুভব করিবার আকুতিও লক্ষ্য করিতে পারি। ছোট আমিটিকে ঘিরিয়া যে দৈনন্দিন আবর্তন, তাহার ভিতরে নাই জীবনের কোনও গভীর উপলব্ধি; জীবনে কেমন তাই একটা 'হাহাকার'—কেমন একটা আত্ম-অসন্তোষ। সেখানেই দেখি কবি একটি 'তুমি' দ্বারা জীবনের সকল শূন্যতাকে ভরিয়া তুলিতে চাহিতেছেন—

বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার—
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণবাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমায় হায় অস্থিচর্মসার।
কোথা নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার নাথ, বিশ্বঘেরা হাসি।

আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।

ক্ষুদ্র আমিকে একটি বৃহতের আলিঙ্গনের দ্বারা বড় করিয়া অনুভব করিবার বাসনা দেখা দিয়াছে, ক্ষুদ্র আমির শূন্যতার নৈরাশ্যকে একটি 'বিশ্বঘেরা হাসি' দ্বারা ভরিয়া লইবার আকুতি দেখা দিয়াছে; কিন্তু এই 'তুমি' সম্বন্ধে কবির মন এখনও প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারের পথে। নিজের জীবনে এই 'তুমি'র স্বরূপ এখন পর্যন্ত জীবনানুভূতির ভিতর দিয়া সত্য মূল্য লাভ করে নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই এক মুহূর্তের বিশ্বাসের পাশেই ঠিক পর মুহূর্তের সংশয়। এখানে দেখি, অপর সকলের ন্যায়ই রবীন্দ্রনাথও যেখানে জীবন-জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে সেইখানেই একটা কিছু বিশ্বাসের দ্বারা জিজ্ঞাসার সমাধান লাভ করিতে চাহেন; কিন্তু জিজ্ঞাসাটা অত্যন্তভাবে প্রথাবদ্ধ নয় বলিয়া বিশ্বাসের পথে যে সমাধান তাহার ভিতরে একটা ক্রূর সংশয় উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। 'কড়ি ও কোমলে'র ভিতরে চারি অংশে খণ্ডিত 'চিরদিন' নামে যে একটি কবিতা রহিয়াছে তাহার মধ্যেই দেখিতে পাই সংশয়াম্বিত কবি-চিত্তের এই দ্বন্দ্ব। 'এক' কেহ আছেন ইহা যদি জানিলাম, তাহাতেই বা লাভ হইল কি? শুধু এই 'এক'ই সত্য নয়, 'একে'র ভিতর দিয়া জগৎ ও জীবন সত্য ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কিছুই হইল না। সুতরাং কবিমনের সোজাসুজি প্রশ্ন, 'তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?' সেই 'এক'ই সত্য—আর সব কিছু আছে আর নাই—সুতরাং আর কিছুই 'ত্রৈকালিক' সত্য নয়, অতএব মিথ্যা—এ কথা ত আর কিছু নূতন কথা নয়, মায়াবাদী বেদান্তের এই-ই তমূল কথা। এ তত্ত্বে ত প্রাণের 'হাহাকার' কিছুই মিটিবার নয়। প্রাণে 'হাহাকার' কোন্ প্রশ্ন লইয়া?

প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?

বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে অফুরন্ত গান ইহা শূন্যে জাগিয়া একান্ত অশ্রুতভাবে শূন্যেই আবার হারাইয়া যাইতেছে—এ কথা প্রাণ কি করিয়া সহ্য করিবে? প্রাণ চায়, অনাদি কালের এই গানকেই কোথাও অনাদিকালেই বসিয়া বসিয়া শুনিতেছে—নিজের প্রয়োজনেই শুনিতেছে, সেই প্রয়োজনেই এই গানের সকল মূল্য। 'বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন?' 'প্রভাতসংগীতে'ই কবি বলিয়াছেন বটে যে এ স্বপ্ন স্বয়ং 'মহাদেবে'রই স্বপ্ন; কিন্তু সে বলার পিছনে গভীর জীবনবোধ ছিল না; তাই আবার সংশয় এবং প্রশ্ন। এ সংশয় এবং প্রশ্নের পশ্চাতে কবির প্রকাণ্ড একটা কিছু বলার আছে, তাহা হইল এই—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।

অর্থাৎ কবিকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে শুধু একটি 'সর্বশূন্য এক'কে পাইলে চলিবে না, সেই একক পাইতে হইবে বিশ্ব-জীবনের যত ধ্বনি তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া, যত প্রাণ তাহার প্রতিপ্রাণরূপে, জগতের আত্মোৎসর্জনের ভিতর দিয়া যত কিছু দান তাহারই প্রতিদানরূপে। এই কথাটি কবির চিত্তে আরও অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল 'প্রভাতসংগীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির ভিতরে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি যে কোথায় কি—সে সম্বন্ধে কবিহৃদয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা বা বিশ্বাস দেখা দেয় নাই, কিন্তু কবি অস্পষ্টভাবে এ কথা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিয়াছেন—

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো,
পদতলে মরিবারে চায়।

'মরিবারে চায়' মরিবার জন্য নয়, নবপ্রাণ পাইয়া শাশ্বত মূল্য লাভ করিবার জন্য; প্রতিধ্বনির ভিতরে যে তাহার শাশ্বত মূল্য নিহিত আছে তাহা দৃঢ়ভাবে আবিষ্কার করিবার জন্য। এই প্রতিধ্বনির তাৎপর্য এই বয়সে রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেই স্পষ্ট ছিল না, থাকিবার কথাও নহে; কিন্তু ইহা কবি-হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাববীজ বহন করিতেছিল, পরিণত বয়সে সে ব্যঞ্জনার তাৎপর্য কবির নিকটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে এই প্রতিধ্বনির ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন—

"একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ বা বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনি-রূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দ স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া

তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটিকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি।"

এ জাতীয় একটি ভাব কবির হৃদয়ে অস্ফুটভাবে আনাগোনা করিতেছিল, কিন্তু এই ভাবের মধ্যে তখনও চিত্তের কোনও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল না, তাই আবার ক্ষণে ক্ষণেই দেখা দিত সংশয়।

কবি-হৃদয়ের এই সংশয়ের রেশ চলিয়াছে 'মানসী' পর্যন্ত ; 'মানসী'র 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাটির মধ্যে কবিকে আবার দেখিতে পাই এই রূঢ় প্রশ্নের সম্মুখীন। 'নিষ্ঠুর-সৃষ্টি' নামটির মধ্যেই কবির সংশয়ান্বিত চিত্তের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়িয়াছে। সৃষ্টি যেখানে কোথাও বাঁধা নাই—শুধু একটা কালপরিধিতে সীমান্বিত ভাসমান স্রোত মাত্র—সেখানে চরম অর্থহীনতা দ্বারাই সৃষ্টি চরম নিষ্ঠুররূপে দেখা দেয়।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

এতখানি নিখিল শূন্যের নিষ্ঠুরতা দ্বারা পীড়িত মানব-চিত্ত তখন কি চায় ? কোন্ প্রশ্ন জুড়িয়া বসে তাহার সর্বদেহ-মন ? সে প্রশ্ন এই—

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা ?

এই যুগের এই জাতীয় সব প্রশ্নগুলিই হইল উত্তরের সংকেত-বাহী প্রশ্ন ; এখানে যাহার সংকেত, পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাই তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। 'মানসী'র 'মরণস্বপ্নে'র মধ্যেও সেই সংশয় ও বিশ্বাসের দোলা।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।

'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গে'ও দোলায়িত একদিকে 'মহা-শঙ্কা', অন্যদিকে 'মহা-আশা।'

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব।
... ...
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।

এই যে 'মহা-শঙ্কা'র পাশেই 'মহা-আশা' সেই মহা-আশাই কবিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে এই কথা বলিতে—

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব হৃদয়ে
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন !
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে
তুমিও কেন গো সাথে করনা ক্রন্দন !

এই সংশয় জিজ্ঞাসা ও শাশ্বত সত্যের মূল আঁকড়াইয়া ধরিবার আকুতির ভিতরেই আবার পাই 'ধ্যান' কবিতাটি—সে কবিতার মধ্যে শুধু 'তুমি' 'আমি'তে বিশ্বাস নয়—তাহাদের মধ্যে একটা গভীর আনন্দলীলার যোগের প্রশান্ত সুর নামিয়া আসিয়াছে—এ যেন গীতাঞ্জলির সুরের প্রথম উচ্চারণ।—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

পূর্ণিমার আকাশের আলোর স্পর্শ আসিয়া লাগে সমুদ্রের বুকে, তবেই জাগে তাহার চাঞ্চল্যের উদ্বেলতা—তাহাতেই ত জাগে পূর্ণিমার আনন্দ পূর্ণতা। কিন্তু এখানে কবি বলিতেছেন, 'তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন', আর 'আমি অশান্ত বিরামবিহীন' ; পরে এই ধারণাও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে চির-চঞ্চলতা দেখি উভয়ক্ষেত্রেই ; একজনের মধ্যে আনন্দ-চঞ্চলতা—অপরের মধ্যে তাহার প্রকাশ, আবার সেই অপরের প্রকাশ লইয়াই সেই একের আত্মানুভূতির পূর্ণতা।

কিন্তু উপরে বর্ণিত এই যে 'তুমি-আমি'র প্রেম, ইহা বর্ণনার অসাধারণ চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও অনেকখানিই যেন একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি ; জগতের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে ইহার যোগ স্পর্শযোগ্য নহে। সেই যোগ ব্যতীত কবির মনেও তৃপ্তি নাই। তাই দেখি মানবীয় সীমানায় আসিয়া যে গভীর প্রেমের স্মৃতি তাহার ভিতরেই—

দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া

তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

এই যে যুগলপ্রেমের স্মৃতি—তাহা মর্ত্য প্রেমেরই অনন্তস্মৃতি; কবি অনুভব করিয়াছেন এই জন্মে জন্মেগত মর্ত্য যুগলপ্রেম ইহার মূল রহিয়াছে সৃষ্টির মূলে—যেখানে একের আনন্দ একটি অনন্ত যুগলপ্রেমের স্রোত রচনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রেম একই—তাহার উৎপত্তি আদি—তুমি ও আমিকে লইয়া; সেই আদি তুমি-আমিই হইল আদি-যুগল, সেই আদিযুগলের প্রেমই মর্ত্যের নর-নারীর প্রেমরূপ গ্রহণ করিয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে।

'মানসী'র পরে 'সোনারতরী'তে আসিয়া কবি এই 'আমি'ও'তুমি'কে লইয়া'দুই পাখি'কবিতা রচনা করিলেন। 'আমি' হইল 'খাঁচার পাখি', আর 'তুমি' হইল 'বনের পাখি'। কবি উপনিষদের একই দেহবৃক্ষে সখারূপে বাসকারী জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুই পাখাকে অবলম্বন করিয়াই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মূল প্রেরণা উপনিষদের এই বর্ণনা হইতে লাভ করিয়া থাকিলেও কবিতাটির ভিতরে জীব ও পরমাত্মা বা রবীন্দ্রনাথের 'আমি' ও 'তুমি'র রহস্য আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুদিন পর্যন্ত সত্যকার একটি খাঁচার পাখী ও বনের পাখীকে লইয়া অতি চমৎকার একটি কবিতা বলিয়াই কবিতাটিকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি,এবং এখনও সকল তত্ত্বজ্ঞান সত্ত্বেও কবিতাটিকে যে কারণে অপূর্ব বলিয়া আস্বাদন করি তাহা জীবাত্মা পরমাত্মা—বা 'আমি-তুমি'র রহস্য লইয়া নয়—তাহা বাস্তব একটি খাঁচার পাখা ও বনের পাখী লইয়া। কিন্তু কবির নিজেরই স্বীকৃতি—এ দুই পাখী 'আমি' ও 'তুমি'।

জীবনের মূলে একটি পরমপুরুষের বিশেষ ইচ্ছা বা আত্মাবলোকনের আনন্দকণা সক্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করিবার কবি-প্রবণতাকে আমরা 'সোনারতরী'তে একটি নূতন ভঙ্গিতে দেখিতে পাইলাম। যৌবনে কবিমনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবন উভয় ক্ষেত্র হইতেই একটা অমোঘ আকর্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন; এই উপলব্ধি সৌন্দর্যের এবং প্রেমের। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের কোনও স্পষ্ট স্বরূপ তখন কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হয় নাই, সুতরাং এই সৌন্দর্যের ও প্রেমের আকর্ষণ লইয়া বিশ্বভুবন অনেকখানিই কবিচিত্তের কাছে তখন অজ্ঞাতরহস্যের কুহেলিকাবৃত। একটা অসীম মুগ্ধতা ও ব্যাকুলতা কবিচিত্তে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল একটা অনির্দেশ্য রোম্যান্টিক আকুতি। কিন্তু এই রোম্যান্টিক আকুতি ক্রমগভীরতা এবং ক্রমবিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে একটা ঘনীভূত জীবনজিজ্ঞাসার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং এই ঘনীভূত জীবন-জিজ্ঞাসা কবিমনকেও রোম্যান্টিকতার স্তর হইতে উত্তরণ করিয়া একটা মিস্টিক অদ্বয় অনুভূতির পথে পরিচালিত করিতেছিল। সেই মিস্টিক অনুভূতির স্পন্দন প্রথম ধরা পড়িয়াছে 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতাতেই ইহার অস্পষ্ট বাসনা রহিয়াছে, সেই অস্পষ্ট বাসনা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে শেষ কবিতায়। জীবনের সকল রূপমুগ্ধতা এবং প্রেমমুগ্ধতা কবিচিত্তে আসিয়া মূর্তিগ্রহণ করিতেছিল একটি অদৃশ্য রহস্যময়ী মোহিনী নারীর অমোঘ আকর্ষণের রূপে। বিচিত্র জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া কবি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি নিজেই শুধু চলিতেছেন না, জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় একটি অপরিচিতা মধুরহাসিনী বিদেশিনার নীরব ইঙ্গিতই যেন অদৃশ্য শক্তিরূপে সমগ্র জীবনকে টানিয়া লইতেছে। এই যে তাহার আকর্ষণ তাহা শুধু মর্ত্য সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর্ষণ নয়—ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর—ইহা জীবনের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক আকর্ষণ। এ আকর্ষণ শুধু একজীবনের আকর্ষণ নয়—জীবনমৃত্যুকে জুড়িয়া যে অখণ্ড যাত্রা সেই অখণ্ড যাত্রাপথেরই আকর্ষণ। তাই একদিকে যেমন দেখি—

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
… …
তরীতে উঠিবা শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জী[বন]
আশার স্বপন ফলে কি হোথা[য়]
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।



তাহার পরে দীর্ঘদিন চলিয়াছে জীবনযাত্রা, তাহাতে কখনও আনন্দদীপ্ত সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ—কখনও মেঘাবৃত; কখনও ক্ষুব্ধ সাগর, কখনও শান্তছবি। তাহার পরে যখন—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
… … …

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

'সোনার তরী'র এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ভিতর দিয়াই 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা'র পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাইতেছে। রহস্যঘন কবি-অনুভূতির অস্পষ্টতাকে বিদীর্ণ করিয়া একটি নিজস্ব অধ্যাত্মবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার পূর্বে 'তুমি-আমি'কে লইয়া যে অধ্যাত্মবোধের প্রকাশ তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানি ঐতিহ্য ও সংস্কারের অনুগামিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন; সকল ঐতিহ্য-সংস্কার 'জীবনদেবতা'কে অবলম্বন করিয়া স্বধর্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। 'চিত্রা'র ভিতরে লক্ষ্য করিতে পারি, 'জীবন-দেবতা'র বোধ এখানে আচমকা কোনও অধ্যাত্মবোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, কবি-সত্তার সমগ্রপুরুষীয় বোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই দেখা দিয়াছে। এ সত্যটি সর্বাপেক্ষা ভালভাবে লক্ষ্য করিতে পারি 'চিত্রা'র 'অন্তর্যামী' কবিতা-টির মধ্যে। কবিতাটির মধ্যে স্পষ্ট চারিটি স্তর রহিয়াছে। আমাদের বিচারে এই চারিটি স্তরকে স্পষ্ট পৃথক্ পৃথক্ করিয়াই দেখা চলে, চারিটিকে মিলাইয়া মিশাইয়া ফেলিয়া অযথা একটা জটিলতা এবং গোলযোগ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; ব্যবহারিক কবি অভিজ্ঞতার সহিত যে পর্যন্ত অধ্যাত্মবোধকে ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া না লইতে পারিতেছিলেন, সে পর্যন্ত কবি স্বধর্মে প্রতি-ষ্ঠিতই হইতে পারিতেছিলেন না।

'অন্তর্যামী' কবিতাটির প্রথম স্তরে, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সকল স্তরে নিজের মধ্যে যে দ্বৈতসত্তার লীলা অনুভব করিতেছিলেন এই দ্বৈতত্বের অনুভূতি প্রায় সকল সাহিত্য-স্রষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে অনন্ত-কৌতুকময়ী কবির 'অন্তরমাঝে বসি অহরহ' মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইতেছেন, যিনি কবির নিজের ভাষাকে 'দহিয়া অনলে ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে, নবীন প্রতিমা নবকৌশলে' মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাকে আমরা কবির গভীর পুরুষীয় সত্তায় বিধৃত বাসনালোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, অলঙ্কা-রিকের ভাষায় অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকের ভাষায় মগ্ন-চৈতন্য বা অচৈতন্যের চেতনস্তরে আলোড়ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, সমাজতন্ত্রবাদিগণকে অনুসরণ করিয়া শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সমাজসত্তার সক্রিয় প্রতিফলন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখি তাঁহার অনুভূতির তথ্য তাঁহাকে অন্যপথে পরিচালিত করিয়াছে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তরেই দেখিতে পাই, এই যে এক কৌতুকময়ী অদৃশ্য নিয়ন্তৃশক্তি রূপে দেখা দিয়াছেন ইনি ত শুধু কবিকর্মের ক্ষেত্রেই অনুভূত হইতেছেন না, তিনিই অন্তর্যামীরূপে অনুভূত হইতেছেন সমগ্র জীবনকর্মের মধ্য দিয়াই। তাই প্রথমে 'আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে—বলিতে দিতেছ কই' প্রশ্ন করিয়াই কবি প্রশ্ন করিতেছেন 'যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে, চলিতে দিতেছ কই।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিশক্তি কোনও পৃথক্ শক্তি নয়, যে শক্তি সমগ্র জীবনকর্মের নিয়ন্তৃশক্তি রূপে জীবনকে গতি, পরিণতি ও অর্থ দান করিতেছে তাহাই সকল শিল্পকৃতিরও গতি, পরিণতি ও অর্থ দান করিতেছে। এখানেই কবিজীবনের সহিত অধ্যাত্মজীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ মিলন হইয়া গেল। কবি যখন 'আমার অর্থ' ও 'তোমার তত্ত্ব' জানিতে চাহিলেন তখনই বুঝিলেন সমগ্র জীবন লইয়াই—

আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?

প্রশ্নচ্ছলে কথাটি উপস্থিত করিলেও আসলে ইহা প্রশ্ন নয়, ইহাই সত্যানুভূতি। 'আমি'কে এইভাবে একটি বীণাযন্ত্ররূপে অনুভূতির কিছু পরেই দেখিতে পাইলাম—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে ?

এইখানেই অন্তর্যামী 'জীবনদেবতা' রূপে প্রকাশ পাইলেন। বিশ্বের অন্তর্যামী এক দেবতা; সেই এক দেবতার আলো আমার বিশেষ জীবন প্রদীপকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ প্রভা দান করিতেছে; আমার ব্যক্তিকেন্দ্রে আসিয়া আমার মধ্যে তিনি বিশেষ রূপায়ণ ও অর্থলাভ করিতেছেন; ইহাই আমার ব্যক্তিজীবনের অখণ্ডপ্রবাহকে বিশেষ মূল্য দান করিতেছে। এক দেবতা আমার ব্যক্তিজীবনের ধারায় আমার জীবন-দেবতার রূপ ধারণ করিতেছেন। আমার জীবন প্রদীপের অখণ্ড প্রবাহ ধরিয়া যে বিশেষ আলো বিকীরিত হইতেছে তাহা শেষ পর্যন্ত গিয়া লাগিতেছে কোন্ কাজে ? লাগিতেছে আত্ম অপ্রকাশের 'রহস্যঘেরা অসীম আঁধার মহামন্দির-তলে' যে এক দেবতা বিশ্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহার মুখের উপর হইতে অপ্রকাশের সকল

যবনিকা দূর করিয়া প্রকাশের নিত্যনব মহিমায় তাঁহার মূর্তি উদ্ভাসিত করিয়া তোলায়। অনন্ত জীবনারতিতেই সেই এক দেবতার অনন্ত জাগরণ। শেষে দেখিতেছি, যে শক্তি কৌতুকময়ী রূপে কাব্যের অন্তর্যামী তিনিই রূপ ধারণ করিলেন—

চির দিবসের মর্মের ব্যথা
ক্ষত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?

আরও পরে দেখিলাম,আমার জীবন—আমার জগৎ বলিয়া যাহা মনে করিতেছি তাহার সব কিছুর তাৎপর্য হইল 'আপনার মাঝে আপনি মত্ত।' এক যিনি 'আপনার মাঝে আপনি মত্ত হইয়া' নিত্যকালে অসীম দেশে বিশ্বদেবতা হইয়া—'মহান্ পুরুষ' হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারই এক অর্থ অসংখ্য অর্থে ভাগ হইয়া অসংখ্য স্বতন্ত্র ধারায় দেশে কালে অসংখ্য জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি করিতেছে ; বিশেষ জীবনের মধ্যে অর্থবান্ হইয়া উঠিবার লীলা করিতেছেন বিশ্বদেবতার যে অংশটি তিনিই জীবনদেবতা। কবি রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া গভীরভাবে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার মধ্যে নিত্যপ্রকাশ-কামনায় ধাবমান যে 'আমি'-পুরুষটি সে-আমি, এক অদ্বিতীয় আমি, সে আমির বিশ্বে কোথাও কোনো জুড়ি নাই,—সেই অপরূপ একটি 'আমি'কে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনদেবতা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন একটি বিশেষভাবে আত্মানুভূতির প্রয়োজনে। কবির বিশ্বাস, তাঁহার বিশেষ জীবনটির ভিতর দিয়া প্রকাশিত চৈতন্যের যে লীলা—তাহা বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যে আর কোনও দিন কোথাও ছিল না ; যাহা অন্য আর কোথাও নাই তাহাই তাঁহার জীবনের ভিতর দিয়া জীবনদেবতা জ্ঞান করিতে চান ; এই একটি বিশেষ 'তিয়াস' রহিয়াছে কবির জীবনদেবতার ভিতরে। তাই কবি 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতাটির ভিতরে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম ?' এই 'তিয়াস' সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠার অর্থই হইল জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ওঠা। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াই কবি সমগ্র জীবনকে একটি পানপাত্র করিয়া বিচিত্র জীবনরসে তাহাকে পূর্ণ করিয়া জীবন দেবতার নিকটে নিবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই 'জীবনদেবতা'র অনুভূতি একটা বিশেষভাবে কবির মনকে নাড়া দিয়াছিল, কারণ এই 'জীবনদেবতা'র ধারণার মধ্যে ব্যবহারিক জীবন ও অধ্যাত্ম-জীবনের গভীর সমন্বয় কবিকে গভীর উল্লাস ও নির্ভর দান করিয়াছিল। এই অনুভূতি সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'The Religion of Man' ভাষণে বলিয়াছেন—

"I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art.

To this Being I was responsible ; for the creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same creative Mind that is shaping the universe to its eternal idea ; but in me as a person it had one of its special centres of a personal relationship growing into a deepening consciousness.…I felt that I had found my religion at last, the religion of Man, in which the infinite became defined in humanity and came close to me so as to need my love and co-operation."

'Personality' ভাষণেও কবি বলিয়াছেন—

"He gives us from his own fulness and we also give him from our abundance. And in this there is true joy not only for us, but for God also."

মানুষের ভিতরে যে abundance—যে সম্পদ্-প্রাচুর্য সেইটাকেই কবি বলিয়াছেন মানুষের ভিতরকার surplus—যেটা মানুষের জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের অপার মহিমারূপে দেখা দেয়। এই অপার মহিমা হইতেই উৎসারিত মানুষের সকল সৌন্দর্য-প্রেম, মানুষের শিল্প সাহিত্য ধর্ম বিজ্ঞান ; এই অপার মহিমাতেই মানুষের মনুষ্য সীমানার মধ্যেই আভাসিত হয় যেই অসীমতা—সেই অসীমতাতেই জীবনদেবতার সঙ্গে তাহার যোগ।

এই যে আত্মাবলোকন বা আত্মোপলব্ধির তাগিদেই অসীমের মানুষের সীমায় অবতরণ এবং মানুষের প্রেম ও সহযোগিতার প্রার্থী হইয়া মানুষকে তাঁহার নিত্যকালের সরিক বলিয়া স্বীকার, মানুষের জীবনমূল্য-হিসাবে এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথের মন ভরিয়া দিয়াছিল। জীবন হইতে জীবনান্তরকে তিনি তখন অতি সহজভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন ; এক জীবন যখন এমনভাবে পুরনো হইয়া যায় যে সে আর জীবনদেবতাকে নূতন কোনও জীবনরস পান করাইতে পারে না তখন এক সত্তা ভাঙিয়া নূতন রূপ

—নূতন শোভা আনিবার প্রয়োজন হয় ; সেই নূতন রূপ ও শোভার মধ্য দিয়াই 'নূতন বিবাহে আনিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।'

'চিত্রা'র ভিতরে এই জীবনদেবতা কবির প্রেমভক্তির স্পর্শে স্পষ্ট কোনও ধর্মীয় রূপ লাভ করে নাই, একটা রহস্য-ঘেরা গভীর কবি-অনুভূতিতেই বিভিন্ন কবিতায় ইহা বিভিন্ন আলো-ছায়ায় রূপ লাভ করিয়াছে। সেই জীবনদেবতার আবছা-আবছা পরিচয় ভাসিয়া ওঠে 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতায়, 'চিত্রা'র 'দিন শেষ' কবিতায়—'চিত্রা'র 'সিন্ধু-পারে' কবিতায়। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে অজ্ঞাত-রহস্যময়ী মোহিনী নারীরূপে জীবনদেবতার যে আভাস পাই, তাহারই রেশ চলিয়াছে 'সিন্ধুপারে'র 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি'তে কৃষ্ণ-অশ্বে আরোহিতা অবগুণ্ঠনবতী নারীর মধ্যে—যে নারী যখন 'মুখে না কহিয়া বাণী' শুধু একবার অবগুণ্ঠনখানি খুলিয়া দিয়াছিল তখন—

"এখানেও তুমি জীবন দেবতা!" কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।"

'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতার 'জীবনদেবতা' নারীরূপে কল্পিতা নন, বরঞ্চ শেষের দিকে বিবাহডোরের রূপকের ভিতর দিয়া কবি নিজেকেই খানিকটা প্রেমিকারূপ দান করিয়াছেন ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কৌতুকময়ী বা মোহিনী রহস্যময়ী রূপেরই আধিক্য। ইহার রেশ পরবর্তী কিছু কিছু কবিতার মধ্যেও দেখিতে পাই। 'চিত্রা'র ভিতরে যাঁহাকে কৌতুকময়ী বা মোহিনী রহস্যময়ী করিয়া দেখিতে পাই, 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতার মধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে পাই 'কঠোর স্বামিনী' করিয়া, সমস্ত জীবনে যিনি মুহূর্তের জন্য বসিয়া থাকিতে—বিশ্রাম করিতে দিলেন না, টানিয়া লইলেন শুধু নিত্য নব কঠোর কর্তব্যের অমোঘ আহ্বানে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে— শেষ নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?

কিন্তু কঠোর স্বামিনীর এই নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও কবি সমগ্র জীবন এই স্বামিনীর আহ্বানে নিরলস ভাবে সাড়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই সাড়া দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে একটি প্রবল আত্মাভিমান—সে দুর্লভ অভিমান এই, আমার জীবনে যে সাড়া দিবার অধিকার সে অধিকার আমারই—সেই অধিকারে আমার সমগ্র জীবনধারাই যে স্বামিনী কর্তৃক বৃত হইয়াছে।

শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে—
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

'চৈতালি'র 'শান্তিমন্ত্র' কবিতাটির মধ্যেও দেখি 'অন্তর্যামিনী দেবী'কে—

হে অন্তর্যামিনী দেবী, ছেড়ো না আমারে

যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা পাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি।

অবশ্য 'কল্পনা'র মধ্যে 'জীবনদেবতা'র যেমন 'কঠোর স্বামিনী'রূপও দেখিতে পাই, আবার এমন বর্ণনাও পাই যাহার ভিতর দিয়া 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' এবং 'নৈবেদ্য' 'গীতাঞ্জলি'তে পরিণতি 'জীবনদেবতা'র একটা মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন 'ভিখারি' কবিতায়—

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস,
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারি, আমার ভিখারি!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?

অথবা তাঁহার 'কল্পনা'র প্রসিদ্ধ গান—

জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে।



ঝড়

শক্তিপদ রাজগুরু

সীমাকে ভাল লাগে প্রণবেশের। এ ভাল লাগার কূলতল নেই, শালবন আর পাহাড়ের মধ্যে যেমন ভালবাসা, পাখীর ডাক আর বনভূমির যে ভাললাগা, এ যেন তেমনি একটি মধুর স্বপ্নরচনার জগৎ, প্রীতিমাধুর্য আর মনের সব রং দিয়ে রাঙ্গানো একটি আবেশ।

তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করা যায়। প্রতিটি দিনের সব মুহূর্তগুলো তার বিচিত্র রংএ বর্ণময়।

কয়েকটা বছর কেটে গেছে কোনদিকে, সে হিসাব কেউ রাখেনি। সহজ সাবলীল গতিতে কেটে এসেছে এতদিন। অতি সহজেই যে কাযটা ঘটে, মানুষের বেঁচে থাকার সময় সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের কায, হঠাৎ সেইটাই বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যু; তেমনি অতর্কিতে সীমা আর প্রণবেশ আবিষ্কার করেছে সেই কঠিন নির্মম সহজ সত্যটা।

মনের অতলে দুজনের অজ্ঞাতসারেই সেই ভাললাগার ক্ষীণতম রেশটুকু সমস্ত তন্ত্রীতে কি আলোড়ন তুলেছে; গোপনে কবে তাদের এই টুকরো কথা হাসির শব্দ মনে সুর তুলেছে, গানের সব ছন্দ গোপনে অধিকার করে বসে আছে।

প্রণবেশ আজ এগিয়ে এসেছে—থমকে দাঁড়িয়েছে সীমা। সমস্ত মনে তার কি এক সর্বনাশা ঝড় উঠেছে।

ভাঙ্গনের ঝড়—মত্ত তাণ্ডব আনা সেই ঝড়। চারিদিকের সব বাঁধন—জীর্ণ আশ্রয় যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে তার।

…চুপ করে বসে আছে। সামনে ফাইলগুলো রাখা; নোট পেপারে কিছু লিখতে চেষ্টা করেও পারেনা, চিন্তাধারা কেমন সব একাকার হয়ে যায়। কলম দিয়ে হিজিবিজি কাটছে কাগজে।

…দশটা পাঁচটার খেয়া পারাপার করা জীব; সাত সকালে উঠে স্নান সেরে কোন রকমে উনুনে আঁচ দিয়ে চাট্টি আলুভাতে ডিমসেদ্ধ—না হয় ঝোল-ভাতের পর্ব সেরে ঝিএর হাতে বাড়ীর তদারকী ফেলে ছুটে আসতে হয়; পুরুষদের ভিড় জমে ট্রামে বাসে। এক স্টপেজে দু তিনটে বাস ট্রাম ছেড়ে দিয়ে কোমর কসে পুরুষদের ভিড় ঠেলে কনুইএর লোলুপ গুঁতো হজম করে মুখ বুজে বাসে উঠে দুপায়ে ভর দিয়ে এদিক ওদিক টাল সামলে অপিসপাড়ায় এসে পৌছায় যখন—তখন কাঁটা দশটার ঘর ছাড়িয়ে গেছে। কোনদিকে চাইবার সময় নেই—চলা আর চলা।

টেবিলের উপর রাশিকৃত ফাইল। সীমা ব্যাগটা পাশের হোয়াটনটের উপর রেখে দিয়ে গ্লাসে জল নিয়ে ধীরে সুস্থে খেয়ে সিটে এসে বসল। আরও পাঁচজনের মত তার একটা চেয়ার টেবিলও নির্দিষ্ট। ড্রআর থেকে কলম পেন্সিল প্যাড কার্বন-পেপার বের করে কাজে মন দেয়।

মাঝে মাঝে ফাইলের ড্রাফট পাস্ করেনি সাহেব, টানা ইংরাজীতে লেখা Bring in. না হয় কোন ড্রাফট কেটে কুটে তছ্‌নছ করে পাশ করেছে।

—সাব সালাম দিয়া। জলদি বিল্‌টিং ফাইল।

সীমা হাতের কায ছেড়ে ফাইল তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল।

…কাযে আর চিন্তায় ভরাট এর প্রতিটি মুহূর্ত। তার মাঝে সময়টুকু কাটে রিটায়ারিং রুমে, সেখানেও কায—অপিসের নানা চিন্তা! প্রতিমা বলে—ডেসপ্যাচ সেকশনে ট্রানস্‌ফার করেছে, কাযের চোটে চোখে সরষে ফুল দেখছি। হাঁফ ছাড়বার সময় নেই। তার ওপর আছে বড়বাবুর হুমকি। বাথরুমে যাবো তাও বলে গেলে ভাল হয়। শুনছি তিন বছরের পর সবাইকেই বদলি করবে।

বীণাও সায় দেয়—তাই শুনলাম। আমার আবার ক্যাসএর ব্যাপার। ঢোকো দশটায়, হিসেব না মেলা অবধি রেহাই নেই। তা ছটাই হোক, আর আটটাই হোক না কেন!

মনের সব শ্রী-সবুজ যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এদের প্রতাপ আর কাঙ্গনের উষ্ণতায়।

তবু এর মাঝে সীমার মনে কোথায় বাজে অন্য একটি বিচিত্র সুর। মনের একটা দিককে সে নিঃশেষ করতে পারেনি। কোথায় যেন বেঁচে আছে এই নিয়েই।

প্রণবেশকে কয়েক বৎসর আগে এইখানেই দেখে, বাজেট সেকশনে এসেছে প্রথম। একটা বাজেটের ব্যাপারে ওর কাছে গেছে রিপোর্ট আনতে, প্রণবেশই ওর হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে বলে,

—বসুন। ঠিক রিপোর্ট দিলেও এর জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে সেণ্ট্রাল অপিসকে। বড্ড ভোগাচ্ছে এ ব্যাপার নিয়ে।

নিজের কলমটা তুলে নিয়ে ঘসঘস করে একনিঃশ্বাসে দুপাতা ড্রাফটখানা লিখে এগিয়ে দেয়—এইটাই ফেয়ার করে Put up করুন গে।

ব্যাপারটা নিয়ে ক'দিন থেকেই সীমা ভাবনায় পড়েছিল। একটা কাঁটার মত খচখচ করে যেন অহরহ গলায় বিঁধছিল এটা। জবাব দিয়ে আজই ছেড়ে দেয় ফাইলটা।

তারপরও দু একবার এসেছে তার কাছে কাজের ব্যাপারে। দেখছে বিনা প্রতিবাদে চুপ করে ফাইল টেনে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জবাব দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ফাইল। মাঝে মাঝে উপদেশও দেয়।

—ও নোটটা এইভাবে দেন। কোন কমিটমেণ্টএর মধ্যে যাবেন না। স্রেফ জবাব দিয়ে দেন।

একবার ওর দিকে মুখ তুলেই মুখ নামাল সীমা।

চারিপাশের ছড়ানো টেবিলে অনেকেই কায করছে, যোগ বিয়োগ আর বিলের যোগ দিতে ব্যস্ত। তারই মাঝখানে বসে কি যেন একটা বিচিত্র দিবাস্বপ্ন দেখছিল সীমা। এক মুহূর্ত! মন থেকে সেই স্বপ্নের রেশ নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ফাইল হাতে নিয়ে। আবার নিজের হল ঘরে এসে ফাইলের মকসো করতে মন দেয়।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে আসে। জানলা দিয়ে দেখা যায় বাইরের ছাদের গায়ে অভ্ররোদ কখন গেরুয়া হয়ে উঠেছে। ঘড়ির কাঁটাও এগিয়ে চলেছে।

আসার ভাবনা—তারপরই কাযের স্রোত—আবার ফেরার ভাবনা। ট্রামে বাসে সেই অসহ্য দুর্ভোগ।

বাড়ী ফিরে জিরিয়ে তবে যেন কায করবার মত উৎসাহ পায় সীমা।

ছোট্ট সংসার। কবে যেন ভুল করে পেতে ফেলেছিল। অবশ্য ভুলটা সেদিন বুঝতে পারেনি। নিজেই এগিয়ে এসেছিল সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই। সমর রাজী হয়নি। সীমাই সেদিন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তার। সমর এড়াতে চেয়েছিল, অতীতের সেই বাড়ী-ঘর-দেশ সব ভেসে গেছে সীমা, শুধু সেই দিনটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করো না। দুঃখই পাবে।

সমরকে তবু ফেরাতে পারেনি সীমা। বিবেকে বেধেছিল। বোধহয় অতীতের ভালবাসার কিছু চিহ্ন তখনও অবশেষ ছিল। তাই সমর ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার কথা তখনও ভাবতে পারেনি। নোতুন আসা একটি মেয়ে, সব হারিয়ে বাবাকে নিয়ে মহানগরীর পথে পা দিয়েই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এত বড় বড় বাড়ী লোকজন জনারণ্যে হারিয়ে যাবার ভয়ে শিউরে উঠেছিল মনে মনে। সরকারী ঔদার্যে একটা চাকরীও জুটে যায়, কিন্তু আরও নিঃসঙ্গ একাকী বোধ করে নিজেকে সীমা, বিশাল অপরিচিতের এই অচেনা ভিড়ে যেন কোথায় হারিয়ে যাবে সে। একক অসহায় সীমা—হঠাৎ আবিষ্কার করে সমরকে। সেদিন কি এক পরম পাওয়ার দিন।

বৈকালে ছুটির পর আসছে। সারা শরীর ক্লান্ত। তখনও দশটা পাঁচটার ঘানিতে অভ্যস্ত হয়নি সে। দীর্ঘ সময় এক ঠাঁই আবদ্ধ থাকতে হাঁপিয়ে উঠছে। এসপ্লানেডের কাছে হঠাৎ সমরকে দেখে চমকে উঠে।

—এ্যাই! অস্ফুট স্বর বের হয়ে পড়ে।

—তুমি! সমরও অবাক হয়েছে ওকে দেখে।

ভুলে গেছে সীমা কলকাতার কোলাহল। কোথায় দূরে কোন হারানো গ্রামের প্রান্তে ঘাসের ধারে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন জেলবাসের পর ফিরে এসেছে সমর। সারা দেহে একটা শীর্ণতা। রাজদ্রোহিতার অপরাধে জেলবাসের মেয়াদের পরও গ্রামে অন্তরীণ রয়েছে।

কি শরীর করেছো বল দিকি!

কথাটা আজও সেই জনকোলাহলের মাঝে দাঁড়িয়ে বলে সীমা! হারানো দিনগুলো মনে পড়ে দুজনের। সমরও দেশ ছেড়ে আসার পর কলকাতার কাছেই কোথায় মাস্টারী করছে।

সীমা সেদিনের নিঃসঙ্গ নির্জনতাকে সহ্য করতে পারেনি। সারা মনে একটা হতাশার ছায়া। শুধু বেঁচে থাকার মানে অন্য কিছু আছে—তাই যেন আশা করেই এগিয়ে গিয়েছিল সে। বাবা অমত করেনি। নিজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি, আজ সেই যদি বিয়ে করতে চায়—তিনি বাধা দেবেন কেন? সমরই বাধা দিয়েছিল—আজ দিন বদলে গেছে সীমা।

—না! মানুষ তবু বদলায় নি। মনও।

সমর জবাব দেয়নি, হেসেছিল মাত্র।

ঘর বেঁধেছে সীমা। ছোট্ট একটু ঘর; নিজের প্রীতি স্নেহ দিয়ে ঘর গড়েছে। সমরকেই যেন দয়া করেছে সীমা, অহেতুক করুণা! প্রথমে সমর ঠিক ভাবতে পারেনি এটা।

আপিসের বন্ধুত্বও তখন ঠিক গড়ে ওঠেনি অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। অল্পস্বল্প দুচারদিনের আলাপ মাত্র। তাই নিয়ে বিয়ের আসরে সবাইকে নেমন্তন্ন করা যায়না। রমা—গীতাকে করেছিল।

কিন্তু তারা যেন এই বিয়েটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। রূপ গুণে সীমা যে কোন ছেলেরই কাম্য, ইচ্ছা করলে এর চেয়ে অনেক ভাল বর সে পেতো। অনেক কম বয়সীই। রমা গীতাকে ফিসফিস করে বলে—ও যে বুড়ো রে!

কথাটা সীমার কানেও যায়। কিন্তু কোন কিছুই জবাব দেয়নি সীমা। ওরা জানে না—দেখেনি সমরের আগেকার সেই দেহ, মন। সারা অঞ্চলের মধ্যে সমর তখন একচ্ছত্র অধিপতি। জনপ্রিয় নেতা। কত রাত্রে পলাতক সমর এসেছিল তাদের বাড়ীতে, চারিদিকে পুলিশের প্রহরা এড়িয়ে এসেছে। সীমা জানতো তার এই সঙ্কেত।

দু তিনদিন হয়তো খাওয়াই জোটেনি। কোমরে পিস্তল গোঁজা—কোনরকমে দুমুঠো ভাত তরকারি নাকে মুখে গুঁজেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যেতো।

হঠাৎ কয়েক রাত্রি আর এল না, খবর পাওয়া গেল পুলিশের হাতে পড়েছে। আড়িয়ল খাঁয়ের তুফান-ওঠা বুকে লাফ দিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করেও পারেনি।

সেই সমরকে তারা দেখেনি। সীমা তাকে ভাল-বেসেছিল। আজকের দেশহারা সর্বহারা আধা-বয়সী একটি নিরীহ মাস্টারকে নয়।

কিন্তু আজ থমকে দাঁড়িয়েছে সীমা। এতদিন কোথায় যেন একটা বানানো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। আজ মনে হয় গীতা রমার সেই ফিস্‌ফিসানি কথাটা বোধহয় অনেকখানি সত্য, যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, তা সত্যই।

প্রণবেশকে দেখেছিল সেদিন চৌরঙ্গীপাড়ায়। সীমার বাতিক আছে পুরনো বই হাতড়ানো। সস্তায় মেলে ভালো জিনিস।

হঠাৎ প্রণবেশকে সেখানে দেখে বলে ওঠে—আপনি!

হাসে প্রণবেশ, হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়, একরাশ কোকড়ানো চুলের নীচে ডাগর টানা-টানা দুটো চোখের চাহনিতে কেমন শান্ত মাধুর্য ফুটে ওঠে। প্রণবেশ জবাব দেয়—প্রশ্নটা আপনাকেই করবো ভাবছিলাম।

কয়েকখানা আর্গসী, ওআইড ওআর্লড ম্যাগাজিন আর হ্যামিংওয়ের একটা বই বেছে দেয় সীমাকে সে—পড়ে দেখবেন।

সীমাই অপ্রস্তুতে পড়ে, ব্যাগে পয়সাও বিশেষ নেই। আজ সমরকে বাস ভাড়া বাবদ দিতে হয়েছে, আজ বলে নয়—প্রায়ই পয়সা দিতে হয় তাকে। ওর মাইনে সংসারে ঢোকে না বিশেষ; এতদিন সীমাও প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আজ এই অপ্রতিভ হবার মূলে সমরের দোষটাই বড় হয়ে দেখা যায়।

প্রণবেশও যেন বুঝতে পারে ব্যাপারটা, নিজেই বলে ওঠে—ঠিক আছে, দামের জন্য ভাববেন না, পড়ে ফেরৎ দেবেন।

সীমাই নিজেকে ছোট মনে করে। ব্যাগে পয়সাও নেই যে চা খাওয়াবে তাকে। দোকানে ঢুকলে নিদেন একটা টাকাও লাগবে। তাও নেই।

—আচ্ছা আজ চলি।

—নমস্কার!

প্রণবেশ দুহাত তুলে তাকে নমস্কার করে।

সেদিন সমর পয়সা চাইতেই ফেটে পড়ে সীমা অসহায় রাগে। টেবিলের উপর বইগুলো তখনও নামানো। ওরা যেন সীমাকে অহঃরহ তার দৈন্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সমরও ওকে হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে দেখে চমকে উঠেছে।

—কি বল্লে?

সীমা বলে ওঠে—দরকার হয় একটা টুইশানি করলেই পারো। সব খরচ যোগাতে আর পারছিনা।

সমর কথা বললোনা, বইগুলোর দিকে চেয়ে সহজ-কণ্ঠেই বলে ওঠে, কাল আবার ফুটপাথ কোম্পানীকে বাজেটের কিছু টাকা দিয়ে ফেলেছো বুঝি?

—আমার টাকা যা খুশি করবো!

সমর ধীরকণ্ঠে জবাব দেয়—কৈফিয়ৎ চাইনি।

—চাইলেও দোবনা। সীমা অকারণেই যেন ধৈর্য হারায় আজ। সমর কথা না বাড়িয়ে পায়ে পায়ে বের হয়ে গেল। দরকার হয় একপিঠ হেঁটেই ফিরবে। তিনবার চা খেতো তিন আনার, একবারই খাবে আজ। তবু সীমাকে হঠাৎ চটে উঠতে দেখে কেমন যেন বিস্মিত হয়েছে সে।

এ কথাটা সীমাও ভেবেছে সারাদিন। কেমন যেন হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে। প্রণবেশের সঙ্গে দেখা হতেই আজ বিশেষ কথাবার্তা ও বলে না। অন্যদিন দু চারটে কথাবার্তা হয়, আজ ওর টেবিলে বইএর প্যাকেট নামিয়ে রেখে চলে এল।

—বইগুলো রইল।

কাল বৈকালের কেনা বইএর বাণ্ডিলটা ফেরৎ দিয়ে যেতে দেখে প্রণবেশ একটু অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল। সীমার মুখ চোখ কেমন থমথমে; কোন কথাই বললনা সীমা।

প্রণবেশ ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা। অনুমান

করে বোধহয় কালকের অযাচিত ব্যবহারে কোথায় একটু মাত্রাধিক্য ঘটিয়ে ফেলেছে প্রণবেশ। সারাটা দিন নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

প্রায়ই ঘটে এমন বিড়ম্বনা কেরাণীর জীবনে। বৃষ্টি আসবে তাও ঠিক ঘড়ি ধরে ন'টা পাঁচটায়, বাড়ী থেকে খেয়ে বের হতে যাবে, মেঘ যেন মুখিয়ে ছিল—নামল বৃষ্টি। ভেজ কুকুরভেজা হয়ে। কোনরকমে অপিস ঠেঙিয়ে বের হতে যাবে—অমনি আবার এসে হাজির। একটু ক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে কি না হয়েছে ব্যাস—রাস্তায় জল জমে ট্রাম বাস সব যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গেল। সব কেরাণীকুল মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক ছুটছে।

বিশেষ করে মেয়েদের হয় আরও দুর্ভোগ। অসময়ের বৃষ্টি, শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়েও কুলোয় না। ভিজে যায় কাপড়-চোপড়, হাঁটু জলে রাস্তা পার হতে হবে—সে এক বিড়ম্বনা।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছে এসপ্লানেডের দিকে সীমা। সেখানে গিয়ে যদি বাস ধরতে পারে এই আশায়। বৃষ্টি ভেজা শহর—মাঝে মাঝে আলো জেলে চলেছে দুএকটা গাড়ী। রাজভবনের ঘন সবুজ গাছ গাছালির মাথায় অন্ধকার ঘনিয়ে রয়েছে, থেকে থেকে দমকা বাতাসে ঝরছে বৃষ্টির জমা জল। আলোর আভায় কালো মেঘ-ঢাকা আকাশ কেমন লালচে হয়ে উঠেছে।

একাই চলেছে সীমা—কোথায় কোন হারাণো দিনে ফিরে গেছে সে। বৈশাখের ঝড়ের পর বৃষ্টি নামতো—তখন আমবাগানে আম কুড়োতে ব্যস্ত। আশশেওড়া গোদালে লতার জঙ্গলে বৃষ্টির ঝিমঝিম শব্দ—বাতাস হু হু হেঁকে আসতো নদীর উথল পাথাল বুক থেকে, ঘেটুফুলের সৌরভ-মাখা জলো বাতাস। আজ সন্ধ্যায় সেই কুমারীমন যেন অজানতেই তাকে পেয়ে বসেছে।

ওকে দেখে চমকে উঠে চাইল সীমা, প্রণবেশও ফিরছে। গাড়ী পায় নি। হেঁটেই চলেছে এসপ্লানেডের দিকে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বলে ওঠে—ভিজছেন কেন, ছাতার নীচেই আসুন।

কি ভেবে ছাতার নীচে এগিয়ে এল সীমা। প্রায়ান্ধকার পথটা ধরে কার্জনপার্কের গা দিয়ে চলেছে তারা।

—ওমাথায় গিয়ে যদি গাড়ী পাওয়া যায় দেখি—প্রণবেশ বলে ওঠে।

সীমা কথা কইল না, কেমন যেন একলা এই বৃষ্টির রাতে একটু বিপদে পড়েছিল। সেটা যেন ঘুচে গেছে। মনে তার অজানতেই আসে একটু ভরসা।

প্রণবেশ বলে ওঠে—ঠাণ্ডায় জমে গেছি। গিয়েতো গাড়ীও পাবোনা। ততক্ষণ একটু চা খেতে পারলে মন্দ হতো না।

সীমা একবার মৃদু আপত্তি তোলে, ওদিকে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে যে!

—ফিরবেন কিসে?

—তাও তো বটে! সীমা ভাবছে।

কেমন যেন এই বাদলারাতের বাতাসে সব চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়; একটা ক্ষীণ বাধা কোথায় জেগে থাকে অহরহ। মনে হয় জীবন থেকে কোথায় একটা মহামূল্যবান মুহূর্তকে সরিয়ে রেখেছে, বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সে। ইচ্ছে করলেও তাকে কাছে আনতে পারেনা। নির্বাসন দিয়েছে নিজের সেই সত্তাকে।

—কই যাচ্ছেন না যে? প্রণবেশের কথায় চমকে ওঠে সীমা। কি যেন ভাবছিল তার কামনা-ব্যাকুল মন। কি না পাওয়ার ব্যথা! ওর ডাকে মুখ তুলে চাইল।

—এইতো যাচ্ছি।

চপে কামড় দিতে থাকে সীমা।

বাইরে বৃষ্টির ঝিমঝিম সুর। পথঘাটে লোক চলাচল কমে এসেছে। যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। রেস্তোরার ভিতরেও জমেছে অনেকে। কবোষ্ণ মিষ্টি একটি পরিবেশ। হালকা নীল রং এর পর্দাটা ঝুলছে—নড়ছে বাতাসে। ট্যমাটো সস্ আর মাস্টার্ড এর ঝাঁঝ কেমন জলে-ভেজা শরীরের কোষগুলোকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

—বইগুলো ফেরৎ দিয়ে গেলেন, কাল বোধহয় আমিই একটু অন্যায় করেছিলাম। প্রণবের ডাগর দুচোখে কি যেন বেদনার আভা। সীমা নিজেই অনুতপ্ত বোধ করে। কিন্তু কি করে বোঝাবে সে তার জীবনের একটা বেসুরো তারের ব্যর্থ সুরের আর্তনাদ। আজ মনে হয় অন্য জীবনের ক্ষণিক স্বাদ পেয়ে সে যেন চমকে উঠেছে।

সাহচর্য—সহানুভূতি আজকের জীবনের পথ চলার কোন পাথেয়ই তার নেই। একজনকে করুণা করতে গিয়ে রক্ষা করার মহৎ দায়িত্ব বইতে গিয়ে সে যেন দেউলিয়া হয়ে গেছে মনের দিক থেকে।

চুপকরেই রইল সে। প্রণবেশের কথার জবাব দিল না!

হঠাৎ বাইরে একটা ট্যাক্সি খালি হতে দেখে কোন রকমে দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকাল প্রণব।

—চলুন পৌছে দিয়ে ওই পথেই ফিরে যাবো আমি।

সীমা যেন এই উপকারটুকুও ঠিক নিতে চায় না। কেন? বাসেই চলে যাবো।

বাসের স্ট্যাণ্ডে তখন রীতিমত মারামারি চলেছে। ট্রাম তখনও চলেনি। জগুবাবুর বাজারের কাছে, এলগিন রোডের মোড়েও জল জমে আছে।

বাধ্য হয়েই উঠলো সে। ট্যাক্সি দেখে আরও দুচার জন লোক এসে জমেছে। কিন্তু হতাশ হয় তারা। কে বলে ওঠে—চললেন যোড়ে, আর কি ট্যাক্সি পাবেন?

কথাটা সীমার কানে যেতেই কি এক দুর্বার লজ্জায় পড়ে সে। পা যেন আটকে আসে।

—উঠুন!

তড়বড়িয়ে বৃষ্টি নেমেছে আবার। তারই মাঝে চলেছে গাড়ীখানা। রাস্তার এক ঝলক আলো পড়েছে প্রণবেশের মুখে, ওর কোকড়ানো চুলে। কি যেন ভাবছে সে। বাইরের বৃষ্টিঝরা ময়দানের দিকে চেয়ে—অন্তহীন অসীম অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তারা দুজনে।

সীমা চুপ করে বসে আছে, হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে প্রণবেশ একটু চমকে ওঠে। ফর্সা নিটোল স্বাস্থ্য, মেঘের তারায় কি যেন একটা উন্মাদনার আভাস। কানের লতিতে দু এক বিন্দু জলকণা—যেন বৃষ্টিস্নাত একটা ফুল!

ভিজে বাতাসে কিসের উন্মাদনা।

—আপনার তো বকুলবাগান?

—হ্যাঁ! ডানপাশেই আমি নামবো।

ভিজে বৃষ্টির রাতে ওকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে এককাপ চা খাওয়াতে পারলে হয়তো ভদ্রতা করা হতো। কিন্তু সমর হয়তো থাকবে। প্রণবেশই বলে ওঠে, যেন এড়িয়ে গেল তাকে—

—ফিরতে আবার গাড়ী পাবো না। আজ চলি!

নেমে গেল সীমা।

কি যেন হালকা মনে গুনগুনিয়ে, বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। ছোট দু ঘরের ফ্লাটে আলো জলছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সীমা। সমর দিব্যি খাটে একটা চাদর চাপা দিয়ে বসে কি পড়ছে। ওকে দেখে মুখ তুললো।

সীমা একটু চমকে ওঠে। নিজে সারাদিন খেটে খুটে জলে ভিজে গোবর হয়ে বাড়ী ফিরল, ঝি আসে নি। আবার উনুনের পাট নিয়ে বসতে হবে। সমর দিব্যি আরাম করে বসে আছে বাড়ীতে। ক'দিন থেকেই দেখছে সমরের এই ব্যাপার। উষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে—চাকরী বাকরী কি নেই?

সমর ওর দিকে মুখ তুলে চাইল। বেদনার্ত চাহনি। ও বলতে পারেনি তার নিদারুণ ব্যথা আর অপমানের কথা। স্কুলের এ্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার মশায় রিটায়ার করার পর তাকে প্রমোশন না দিয়ে তার নীচের একজনকে তুলে এনেছে, তাকে বরং নামিয়েই দিয়েছে স্কুল কমিটি।

বলিষ্ঠ সত্তা, সেই ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা আজও সব হারিয়ে যেন মরেনি নিঃশেষে। তাই প্রতিবাদ করেছে সমর—চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছে। অন্য চাকরীর খোঁজ করছে।

কথাটা শুনে চমকে দাঁড়াল সীমা। সারাদিন কেটেছে অপিসে, বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে। তবু মনে কোথায় একটু সুর বেজেছিল। ক্ষণিকের অস্তিত্ব সেই সুরের, মনের গোপনে তবু তৃপ্তি আনে। হঠাৎ সমরের মুখে কথাটা শুনে চমকে ওঠে সে।

—কি বললে? আর্তনাদ করে ওঠে সীমা।

—বললাম তো রেজিগ্‌নেশন দিয়ে এসেছি। স্থিরকণ্ঠে জবাব দেয় সমর।

সীমা ওর দিকে যেন তীব্র জ্বালাভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে। এখনি ফেটে পড়বে খান খান হয়ে, ভেঙ্গে পড়বে ওর সব শিক্ষা, ভালবাসার মোহ দিয়ে গড়া এই ঘর। পরক্ষণেই সামলে নেয়।

পাশের ঘরে চলে গেল। সমর কথা বলে না। ওর

দিকে চেয়ে থাকে—সীমাও আজ বদলে গেছে তা অনুমান করতে দেরী হয় না। এখুনি খসে পড়বে ভালবাসার মুখোস, সমরও তা জানে। জেনেছে ক্রমশ—আজকের দিনগুলোই কেমন যেন বদলে গেছে। প্রেম প্রীতি ভালবাসা—মনুষ্যত্বের মর্যাদা আজ নির্মম জীবনসংগ্রামের কাঠিন্যে মূল্যহীন অবাস্তবে পরিণত হয়েছে। সমরের মত প্রাণী আজ সমাজের বাতিল একটি জীব। যেদিন সমাজের প্রয়োজন ছিল—সেদিন সমাজ ওকে নিংড়ে নিয়েছে। দূরে ফেলে দিয়েছে ছিবড়ের মত। যে সমরকে একদিন শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছিল সীমা, আজ তার সেই সত্তার অপমৃত্যু ঘটেছে। সমর এক শোচনীয় পরিণতির কথা জেনেছে।

সীমাও তা বুঝেছে, বুঝেছে বহু মূল্য দিয়ে, বহু ত্যাগের মধ্যে। আজ সমর যেন তার ঘাড়েই বসে থেতে চায়। নীড়বাঁধার দায়িত্বটুকুও সম্মানের দোহাই দিয়ে দূরে ফেলে দিতে চায় সে। নইলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসতো না এককথায়। ঘরের শান্তি বজায় রাখতে গেলে বাইরে অনেক ত্যাগ, আপোশ, সহনশীলতার প্রয়োজন, যার তা নেই ঘর বাঁধার পথে সে মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা।

আজ বাইরের জগতে বেরিয়ে দেখেছে সীমা—জীবনটা আরও বড়। আরও তৃপ্তির, উপভোগের। কিন্তু অনেক আগেই সব তৃপ্তি আনন্দের ভোজ থেকে নিজেকে বঞ্চিত-করে বসেছে সে। ঘর বেঁধেছিল কত আশায়—কিন্তু আজ আবিষ্কার করে ঘর বেঁধেছে সে চোরাবালিতে; যার অস্তিত্বটুকু যে কোন মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রাত কত জানে না। আকাশের বৃষ্টি এক একবার থামছে আবার ঘিনঘিন করে নামছে। সারা পাড়া নিশুতি। সীমা চুপ করে বসে আছে—আজ প্রণবের কথা মনে পড়ে।

কেমন যেন উদগ্র কামনা-মদির ব্যাকুল সেই চাহনি। সীমাকে সারাদিনের কর্মক্লান্তি ভোলায়—বাঁচবার আমন্ত্রণ আনে।

পিছনের সেই সবুজ স্মৃতি সব ক্রমশ আবছা হয়ে আসে। নীল আলোটা জ্বলছে। ঘুম আসে না। ওদিকে শুয়ে রয়েছে সমর, ম্লান বিবর্ণ চেহারা। কানের কাছে চুলগুলোয় এসেছে সাদা আবছা আভাস, চোখ দুটো বসে গেছে—ঠেলে উঠেছে চোয়ালের দুইপাশ। চাকরী নেই—আপন বলতেও কেউ নেই ওর। জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত বিপর্যস্ত একটি প্রাণী।

সীমা সরে গেল নিজের ঘরে।

রাত কত জানে না, আলো নিভিয়েও ঘুম আসে না। হু হু করে সারা মন কি একনিদারুণ ব্যর্থতায়।

অনেক সহ্য করেছে সমর। অবহেলা অত্যাচার ঘৃণা অপমান দুঃখ কষ্ট অনেককিছু সয়েছে সেই যুগ থেকেই। আজ তার দাম কিছুই নেই। কানাকড়িও নেই। বাইরে—স্কুলে—সমাজের অন্যত্রও তারা যেন বাতিল হয়ে গেছে।

সীমার কথায় সেদিন ফিরে চাইল—কায কর্ম কিছু দেখছো?

যেন ওকে তাগাদা দিচ্ছে কোন পাওনাদার। আজ সব সম্পর্ক ম্লান হয়ে গেছে। সীমাও একা বাড়ী ভাড়া সংসার খরচা সব ঠেলে উঠতে পারছে না। মনে হয় এ সংসারে কোন আকর্ষণই তার নেই, প্রেমপ্রীতি, সেই শ্রদ্ধা, কোথায় সব যেন কর্পূরের মত উপে গেছে, নিজের হাতে গড়া সংসার আজ সিন্ধুবাদের বোঝা হয়ে উঠেছে তার কাছে।

সমরও ভাবছে। ক্রমশ এ বাড়ীর নিঃশ্বাস বায়ু তার কাছে যেন ভারি হয়ে উঠেছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। ভাবছে মফঃস্বলে কোথাও একটা চাকরী জুটে যেতে পারে। জবাব দেয়—দেখছি।

সীমা কথা কইল না। চুপ করে অপিস বের হয়ে গেল।

জীবনের একটা দিকে আঘাত যে পায়, অন্যদিকের প্রীতি কুড়িয়ে সেই আঘাত ভোলবার চেষ্টা করে সে, নদীর দুকূল একসঙ্গেই ভাঙ্গে না। একদিকে ভাঙ্গে, গড়ে ওঠে অন্যদিক পূর্ণতার প্রসাদে।

তাই প্রণবেশকে যেন অজ্ঞাতেই ভাল লাগে সীমার। তার কাছে প্রণবেশ যেন নোতুন-পাওয়া একটা বই, পড়ে ফেলবার উদগ্র কৌতূহল সারা মনে। আজ অপিসের মেয়েদের জীবনও নোতুন চোখে দেখেছে সে। গীতা—রমলা বিয়ে যা করেছে ভালবেসে, তাদের সংসারেও দেখেছে দুজনের মধ্যে কতখানি মিল, কি যেন এক স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে তারা।

নিজের মনের দৈন্যটা আজ বড় হয়ে দেখা দেয়, জীবনে সে দিয়েই গেল সব কিছু। বিনিময়ে কি পেয়েছে সে! সেদিন সেই কথাটাই যেন প্রকারান্তরে প্রকাশ করে প্রণবেশের কাছে। এতদিনের ব্যর্থ বঞ্চিত মনের নীরব জ্বালা ফুটে ওঠে ওর কথায়।

গঙ্গার বুকে রাত্রি নেমেছে। আবছা ধোঁয়া আর ধোঁয়া। দূরে মিটি মিটি জলছে আলোগুলো। বটগাছের বুকে পাখীগুলো চুপ করে গেছে। প্রণবেশ ওর দিকে ফিরে চাইল। অজ্ঞাতেই সীমার আরও কাছে এসে গেছে অনেক, সীমা বলে চলেছে—মনে হয় আদর্শ, শ্রদ্ধা—এর কোন দাম আজ নেই!

—কেন?

—নিজের জীবনেই দেখলাম; শুধু উজাড় করে দিয়েই যাবে, পাবে না কিছু। প্রণবেশ জীবনের হাহাকার এখনও শোনেনি। আশাবাদী সে। বলে ওঠে—পাওয়া যায়, হয়তো সে পাওয়া দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।

সীমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাকে ও'পাশের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে চুপ করে গেল। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় না। তবু মনে হয় লোকটা যেন তাদের কথাই শুনছিল, হঠাৎ উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ওকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে প্রণবেশ বলে ওঠে—কি হল?

—কিছুনা!

সীমা যেন অত্যন্ত ক্লান্ত অসহায় মনে করে নিজেকে।

সমরের শূন্য মনে আজ ওর কথাগুলো চাবুকের মত বাজে। সারাটা দিন এখান ওখানে ঘুরেছে পায়ে হেঁটেই। একটা আশার আলো সে দেখেছে। সেকালের জেল-বাসের সময়ের একজন কংগ্রেস কর্মী বন্ধু আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি ওর জন্য ব্যবস্থা করেছেন। হয়তো হয়ে যাবে একটা কিছু।

বসেছিল নদীর ধারে, অন্ধকার নামে। তারার আলো-জলা অন্ধকার। মনটাও অনেকখানি হালকাহ য়ে গেছে। একটা নির্ভর জুটলে আবার শান্তি ফিরে আসবে সংসারে! সীমার জন্যও নিজেকেই অপরাধী মনে করে।

হঠাৎ ওকে নির্জন গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে আর কার সঙ্গে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছে। সীমা যে দুঃখ বেদনা ব্যর্থতার কথা তাকে জানায়নি, আজ সেই ছেলেটির কাছে সেই ব্যর্থতায় ফেটে পড়ে।

সমর এগিয়ে আসছে আলো ঝলমল এসপ্লানেডের কাছে। বাস স্টপের কাছে পানের দোকানের আয়নায় কার ছায়া পড়তেই চমকে ওঠে। একটি প্রায় প্রৌঢ় মানুষ, চুলগুলো পেকে আসছে। ক'দিনেই তার চোখ যেন কোটরে ঢুকে গেছে, চারিপাশে পড়েছে কালির দাগ।

সীমার মনের ব্যর্থ কান্না আজ তাকেও যেন ব্যাকুল করেছে, ওর সুরে সুর মিশিয়েছে সমরের ব্যর্থ যৌবনের অতিক্রান্ত সুর।

সীমাকে কোথায় যেন ঠকিয়েছে সে। তাকে সবদিক থেকে ঠকিয়েছে।

সীমাও তাই ভাবে মনে মনে। প্রণবেশের হাতে ওর হাতখানা। সীমা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। বাতাসে ভাসে নদীর স্রোতের শব্দ, মনে হয় আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে সেই চাপা কান্না।

সীমা উঠে দাঁড়াল—চল।

নিজেকে আর যেন বিশ্বাস করে না সে, এখুনি এই আদিম রহস্যান্ধকারে সে হয়তো ফেটে পড়বে, নিজের সব হারিয়ে ফেলবে। প্রণবেশের চোখেও দেখেছে পূর্ণ-যৌবনের সেই আকুতিময় আহ্বান।

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে রাস্তার দিকে।

কি যেন অপরাধীর মত বাড়ী ঢোকে সীমা, রাত হয়ে গেছে। আজ গঙ্গার ধারে সেই মুহূর্তগুলো মনে কি ঝড় তোলে। নোতুন করে বাঁচার স্বাদ আনে মনে, এ যেন তার মনের অন্য দিক। যেদিন ভেবে ছিল ব্যর্থতা আর হতাশায় মরে গেছে তার সব সত্তা নিঃশেষে, হঠাৎ তখনই যেন আবিষ্কার করেছে বেঁচে আছে সে। আর কাউকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায় সে।

সমরের ঘরে আলো জলছে, ঢুকতে একবার ওর দিকে মুখ তুলে চাইল মাত্র, আবার কি যেন লেখায় মন দেয়। দুজনেই যেন দুজনের অপরিচিত, একজন এড়িয়ে যায় কি এক বেদনায়, সীমা সরে যাচ্ছে তার থেকে দূরে—কি যেন এক পাবার মোহে।

সমর কয়েকদিন পরই কথাটা প্রকাশ করে। মফঃস্বলের স্কুলে হেডমাস্টারী নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। সীমা কথা কইল না। রবিবার হবে বোধ হয়, প্রণবেশের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল। এই প্রথম ছবি দেখতে গিয়েছিল দুজনে। পাশে বসে কাটিয়েছে কয়েক ঘণ্টা। ছবির পর্দার দিকে নজর ছিল, কিন্তু সীমার সারা মনে কি যেন খুশীর আবেগ। জীবনের বিচিত্র স্বাদ থেকে সে ছিল বঞ্চিত। সমবয়সী একটি যুবক—যাকে চিনেছে জেনেছে, তার সঙ্গে মনে হয় যেন কত দিনের পরিচয়,সমর সেই তুলনায় অনেক অচেনা। বহু দূরের মানুষ। কাপড় বদলে এসে দাঁড়াল। সমর তার-বই-পত্রগুলো প্যাক করছে। দেওয়াল থেকে খুলে নিল তার ছবি ক'খানা। ওদের বিয়ের একখানা ছবিও।

সীমা চেয়ে দেখল মাত্র, আগে ওখানায় মাঝে মাঝে মালা দিত। আজ অনেক দিন হল সেখানার দিকে নজর দেয়নি আর, জীর্ণ মালাটা কালো সুতোর মত ঝুলছিল। হাতের ছোঁয়ায় সেখানা খসে পড়ে মাটিতে, সমর বলে ওঠে —ওর আর দরকার নেই।

সীমার মনে একটা চাপা প্রতিবাদ ফুটে ওঠে, সমরের কথার সুরে যেন ব্যঙ্গের একটু তিক্ততা।

সীমা এগিয়ে আসে—কি বললে ?

সমর বিছানা বাঁধতে বাঁধতে বলে—এ যুগে বোধ হয় আদর্শ, শ্রদ্ধা, ভালবাসার কোন দাম নেই, দিয়ে যায় শুধু একজনই। ঠকায় তাকে সবাই। তাই নিস্কৃতি দিয়ে গেলাম তোমায়।

চমকে ওঠে সীমা। সেই রাত্রিতে গঙ্গার ধারে বসে প্রণবেশকে ওই কথা বলেছিল সে। সীমা নিষ্ফল ক্ষোভে ফেটে পড়ে—ভীতু কাওআর্ড তুমি। হেরে গেছো জীবনে—তাই পালিয়ে বাঁচতে চাও।

সমর জবাব দিল না, হাসতে হাসতে বলে—এর জবাব অত্যন্ত বিশ্রী শোনাবে তাই দিলাম না। সীমার দিকে চেয়ে থাকে সমর স্থিরদৃষ্টিতে।

এ যেন অন্য মানুষ। যে এতদিন তাকে ভালবেসেছে, সেবা যত্ন দিয়ে নোতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে, সেই কঠিন ত্যাগের চিহ্ন আজ ওর মুখে-চোখে কোথাও ফোটে নেই। সারা দেহ-মনে কামনার জোয়ারে ভেসে যাবার দুর্বার আকর্ষণ তাকে বদলে দিয়েছে।

জীবনের জটিলতা আজ বেড়েছে। ঘরের সীমানা আজ ভেঙ্গে গিয়েছে—সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি সমাজ—একটি জাতি। সীমা আজ একা নয়—এই ঝড় আজ অনেকের জীবনে বিপর্যয় এনেছে। পথ কোথায় জানেনা ওরা।

সীমা বলে ওঠে—তাহলে জেনেছো সব ?

সমর জবাব দিল না।

জবাব আর পায় নি সীমা, পরদিনই চলে গেছে সমর। শূন্য ঘর; আজ মনে হয় ঘরের শূন্যতা তার মনের অতলে একটা নিঃস্ব হাহাকার এনেছে। ওর ঘরে পড়ে আছে শূন্য খাট, টেবিল চেয়ার। এদিকওদিকে পড়ে আছে কাগজ-পত্র। দীর্ঘ পনেরো বৎবের পরিচয় এক দিনেই যেন মুছে দিয়ে কোথায় চলে গেছে সমর।

একজনের কথা মনে পড়ে। ছুটির বৈকালগুলো কেমন যেন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে সীমা। প্রতি-দিনের চলা পথগুলোও রঙীণ হয়ে উঠেছে। ময়দানের ওদিকের আকাশে শেষ সূর্যের রক্তলাল প্রভার দিকে চেয়ে কেমন স্বপ্ন দেখে। লাল হয়ে উঠেছে চারিদিক। রক্ত-লাল। ময়দানের গাছে পাতা ঝরছে।

প্রণবেশের দিকে চেয়ে হাসে সীমা। কেমন যেন উধাও হয়ে যাবার আমন্ত্রণ! ওর হাতখানা নিবিড়ভাবে পিষে ফেলতে চায় সে। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে সীমা—উঃ লাগে।

পাওয়া আর হারানো—দুটোকেই জীবনের মাঝে নিয়েছে। প্রণবেশ ক'দিন আসেনি। শূন্য ঘরে চুপ করে বসে থাকে সীমা। মনের দৈন্যকে ভোলবার জন্যই যেন দুর্বার স্রোতে ভেসে যেতে চায় সে। ভাবছে একবার প্রণবেশের হোটেলে যাবে কিনা! বড্ড একা একা ঠেকে।

ক'দিন ছুটি নিয়েছে অপিসে প্রণবেশ, কে জানে শরীর খারাপ হয়তো।

হঠাৎ ওকে ঢুকতে দেখেই এগিয়ে যায়। কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়, সীমা—এসো।

সমরের চেয়ারখানাতেই বসে প্রণবেশ। হাসি-খুশী একটি কিশোরী হয়ে উঠেছে সীমা—বসো, চা করে আনি, সেই সঙ্গে পাঁপড় ভাজা।

প্রণবেশের গালটা নাড়া দিয়ে হালকা কণ্ঠে বলে ওঠে—এত গম্ভীর কেন ?

সময় বড্ড কম! এখুনিই উঠতে হবে।

প্রণবেশ কেমন যেন বদলে গেছে। সীমার উদ্দাম-স্রোতে কেমন বাধা পড়ে।

—কেন?

এগিয়ে এল সীমা। দুচোখের দৃষ্টিতে ওর নীরব ব্যাকুলতা। প্রণবেশ ব্যাগ খুলে কার্ড একখানা বের করে এগিয়ে দেয়।

—বাবা ছাড়ছেন না, আসছে ৭ই বিয়ে করছি।

—বিয়ে করছো?...কথাটা সীমার অজানতেই যেন আর্তনাদের মত বের হয়ে পড়ে।

কি যেন ভাবছে সে। অতীতের দিনগুলো—কত চৈতী সন্ধ্যা, কত রক্ত স্বপ্নমাখা অপরাহ্ণ, সিনেমা হলে বসে একটি নীরব সত্তার প্রকাশ—গঙ্গার ধারে ওর ব্যর্থমনের হাহাকার—নীরব কান্না, সব যেন আজ ব্যঙ্গ বলে মনে হয়।

সীমার পা দুটো কাঁপছে। কোন রকমে টেবিল ধরে সামলালো, সারা শরীরের রক্ত মুখে চলকে উঠেছে, প্রণবেশ বলে চলেছে—মেয়েটি নাকি ভালো, এবার বি-এ দিয়েছে।

সীমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না। প্রণবেশ চলে গেছে, পড়ে আছে ফাঁকা চেয়ারটা—শূন্য ঘরে একা সেইই রয়েছে। আলোও জ্বলে নি। মূর্তিমান প্রেতাত্মার মত অন্ধকার শ্মশানে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

চলে গেছে সমর—তার জীবনের শ্রদ্ধা ভালবাসা মনুষ্যত্বের বিকাশ যাকে কেন্দ্র করে ঘটাতে চেয়েছিল! চলে গেছে প্রণবেশ—তার প্রেমেরও অপমৃত্যু ঘটেছে। সমরের কাছে ফেরবার পথও যেন জানে না।

কি নিয়ে বাঁচবে সে! ক্লান্ত ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইবে! মনে হয় এ যুগের জটিলতায় সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে, সেই ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কাঁদছে তার ব্যর্থ বঞ্চিত নারী মন—কোথাও কোন সান্ত্বনা নেই। ক্লান্ত পাখী সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হারানো বাসা খুঁজে ফিরছে—ব্যর্থ সে অন্বেষণ।

ঘর তার নেই। যে ঘরে দিনান্তে জ্বলবে সন্ধ্যাদীপ—মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সব কোথায় হারিয়ে গেছে সীমার।

বাংলা সমালোচনার গোড়ার কথা

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কম বেশি হাজার বছরের। সাহিত্যের এই দীর্ঘ ধারায় ছোট বড় মাঝারি অনেক কবি শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণভাবে সব লেখকই রচনার গুণ দোষ সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন থাকেন। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য পাঠে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পরন্তু বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, দাশু রায় প্রভৃতি কবিগণ যে বিশেষভাবে সচেতন শিল্পী ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এঁদের সমালোচকের ভূমিকায় কখনও দেখতে পাইনে। কোন কোন কবি পূর্বসূরীর উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁদের গ্রন্থ সম্পর্কে দু'চার কথা বলেছেন, যেমন মনসামঙ্গলকার বিজয় গুপ্ত কানাহরি দত্তের গ্রন্থ সম্পর্কে (১) এবং চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত সম্পর্কে (২)। কিন্তু এগুলোকে সমালোচনা আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ বিশেষ কোন শিল্পধারণা বা দৃষ্টি থেকে বিচার করে কিছু বলা হয় নি।

কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি, বিশেষ করে বৈষ্ণব কবিগণ যে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ এই শাস্ত্রের শাসন তাঁদের মানতে দেখা যায়। কিন্তু তথাপি কোন বাংলা কাব্য সম্পর্কে কোন আলোচনা কেউ রেখে যান নি। অপর পক্ষে দেখা যায় সম-

১। মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥

২। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ।

সাময়িক কালে সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকার নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা চলেছে (৩)। যেমন অন্য প্রদেশ তেমনি বাংলা দেশেও। বাংলা সাহিত্য কেন বিচারের বাইরে রয়ে গেল সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি রচিত হওয়ার অনেক পরে অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভব এবং তার বিকাশ অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস প্রভৃতিরও অনেক পরবর্তীকালে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "বোধ হয় খৃষ্ট পূর্বে গ্রন্থাকারে কোনও অলংকার শাস্ত্র লিখিত হয় নাই (৪)।"

বাংলা সাহিত্যে নাটক উপন্যাসাদি বিভিন্ন রূপকল্পের ন্যায় সমালোচনা-মূলক রচনার সৃষ্টিও আধুনিক যুগে ইংরাজীর প্রভাবেই ঘটেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রভৃতির আনুকূল্যে বাংলা গদ্য তার প্রথম অক্ষম অভিযাত্রা সুরু করে। রামরাম বসু, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায় প্রভৃতির দ্বারা বাংলাগদ্য নানাভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। রামমোহন ধর্ম দর্শন সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তর্ক-বিচারমূলক লেখার প্রবর্তন করে বাংলার শক্তি বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে না যে বাংলা গদ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আসে গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৪৩ সালে, বিদ্যাসাগরের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রকাশ ১৮৪৭ সালে। তত্ত্ববোধিনীতে তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী প্রায় সকলের লেখাই প্রকাশিত হত। তাঁদের মধ্যে অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারা-শংকর তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুখ্যত হিন্দু কলেজ ও রামমোহন রায়ের দ্বারা ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনুরক্তি গত শতাব্দীর গোড়ার দিকেই জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যে তার ফল প্রকাশ পেতে কিছু সময় লেগেছে। নূতন ভাবাদর্শের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে দেখা দিয়েছে সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে। রামমোহন রায় একদিকে প্রাচীনপন্থী, অপরদিকে খৃষ্টান-পাদ্রীদের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ চালিয়েছেন। কিন্তু এই ভাবের দ্বন্দ্ব মনে হয় চতুর্থ দশকে প্রবলতম হয়ে উঠেছিল—মধুসূদন, লালবিহারী দে প্রভৃতি কয়জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাওয়ায়। তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস নিবদ্ধ আছে, এই কাগজে দর্শন বিজ্ঞান সম্পর্কেও মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হত।

এই ভাবে যখন অর্ধশতাব্দী বিগত হল, তখন একদিকে যেমন বাংলা ভাষা সুপুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, অপরদিকে বাঙ্গালী মন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রাথমিক আঘাত সামলে নিয়েছে, স্বধর্ম ত্যাগ না করেও ইংরাজী ভাষা-বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে এবং যুক্তিবাদের মূল্য মেনে নিয়েছে।

১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার স্তম্ভেই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম আবির্ভাব।

১৮১৮ সালের দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ প্রভৃতি থেকে সুরু করে অজস্র পত্রপত্রিকা গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়েছে। ওগুলোতে সবরকমের খবরই স্থান পেত, বইয়ের খবরও বাদ যেত না। কাজেই যখন যে বই প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পর্কে দু'কথা বেরিয়েছে। কিন্তু এই দুকথাকে কিছুতেই সমালোচনার পর্যায়ে ফেলা যায় না। এ নিছক বিজ্ঞাপন। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্, "সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে 'দম্পতীশিক্ষা' গ্রন্থ অর্থাৎ সাংসারিক ব্যবস্থা নানা পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ পূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তম বাংলা অক্ষরে ছাপাইয়া গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া ॥০ আট আনা স্থির করা গিয়াছে।" (১৫ই মার্চ ১৮৩৪) (১) ঠিক এই জাতীয় বিজ্ঞাপনই সব কাগজে প্রকাশিত হত। তার পাশে 'বিবিধার্থসংগ্রহ' থেকে পুস্তক পরিচয়ের অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই উভয়ের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান স্পষ্ট হবে—"অধুনা নাটকের সম্যক সমাদর হইতেছে, সকলেই নাটক দর্শনে উৎকণ্ঠ, অতএব বর্তমানের কুপ্রবৃত্তিসকল নাটক দ্বারা সুন্দর তিরস্কৃত হইতে পারে, এই বিবেচনায় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ "একেই কি বলে সভ্যতা" নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকটিত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য নববাবুদিগের পানাসক্তির নিগঞ্জন; এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সিদ্ধ হইয়াছে।" (২) এখানে শুধু বইয়ের বিজ্ঞাপনই দেওয়া হয়নি, তার শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে, উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে যে এই জাতীয় নাটকের দ্বারা সমাজের কুপ্রবৃত্তির তিরস্কার সম্ভব তাও বলা হয়েছে। পূর্বেরটিকে যদি বিজ্ঞাপন বলা যায়, তবে এটিকে স্বচ্ছন্দে বলা যাবে সমালোচনা বা critical review.

এই সমালোচনা যে প্রথম থেকেই খুব স্পষ্টভাবেই পাশ্চাত্য আদর্শানুগ তাও বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রহসন 'সাহিত্য দর্পণে' দশপ্রকারের, এক প্রকার রূপক বলে গণ্য হয়েছে; তা পরিবেশন করে হাস্যরস। কিন্তু এখানে সমালোচক প্রহসনে যে উদ্দেশ্যের আরোপ করেছেন সে উদ্দেশ্যেই মুখ্যত comedy রচিত হয়েছে এথেন্সে, রোমে, ইংলণ্ডে।

ঐ পুস্তক পরিচয়েরই পরবর্তী অংশে আছে,—"মনুষ্যের যথার্থ প্রবৃত্তির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ঘাষণ যে কবির প্রকৃত ধর্ম ও বীণাপাণির মুখ্যপ্রসাদ তাহা দত্তজ উপলব্ধি হইয়াছে।" (২)

—এখানে সাহিত্য বা কবি কর্ম সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশ পেল তা কি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য নয়? তারপরে "ইয়ং বেঙ্গল"

৩। মল্লিনাথ, কুমারস্বামী, রূপগোস্বামী, জগন্নাথ প্রভৃতি আলং-কারিকগণ চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

৪। 'কাব্যবিচার' পৃঃ ১৬

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৭

২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা।

অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণ বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জ্ঞানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"—এইভাবে নাটকের বাস্তবতার অন্বেষণ ও প্রমাণ সংগ্রহ এবং বাস্তবতার নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়ন আমাদের দেশে এই প্রথম।

বিবিধার্থসংগ্রহের লেখাগুলোতে সমাজের জন্যই যে সাহিত্য এই ধারণাটা খুব প্রবল দেখা যায়। বস্তুতঃ উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিশেষত নাটক ও উপন্যাস সব দেশেই অতিমাত্রায় সমাজ সচেতন। অশ্লীলতার প্রতিও যে একটা বিরূপতা দৃষ্ট হয় তাও অ-সংস্কৃত রুচিরই পরিচায়ক।

দেশে দুরাচার দমনের জন্যে ব্যঙ্গোক্তিমূলক কাব্যের প্রয়োজন স্বীকার করলেও আলোচ্য লেখকের দৃষ্টি যে আবিল হয় নি, তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি স্পষ্টভাবেই বিশুদ্ধ কাব্যের নিম্নে স্থান দিয়েছেন ব্যঙ্গ কাব্যের—"ইতোমধ্যে কবিদিগের উদ্দেশ্যই যে কাব্যামৃত দ্বারা জনসমাজের তৃপ্তিসাধন করেন ; পরন্তু সকল কবি তাহাতেই তৎপর নহেন ; অনেকে দুরাচার দমনার্থে সাবক্ষেপ বাক্য দ্বারা নানাবিধ ব্যঙ্গ-কাব্য রচনা করিয়া থাকেন।" অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর কাব্য রচনা যাঁদের শক্তির বাইরে তাঁরাই ব্যঙ্গকাব্য রচয়িতা।

'বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত রচনাবলীর সম্যক্ পর্যালোচনার সুযোগ আমাদের নেই ; উপরের আলোচনা থেকে এইটুকু স্পষ্ট হবে যে বাংলা সমালোচনা ও সাহিত্যদৃষ্টির নিঃসন্দিগ্ধ সূত্রপাত ওখানেই হয়। তার পূর্বে কি জাতীয় আলোচনা তথা বিজ্ঞাপন বেরোত তা আমরা দেখেছি ; সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাও যে কি ছিল তারও প্রমাণ মিলবে তখনকার যশস্বী কবি ঈশ্বর গুপ্তের উক্তিতে। তাঁর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটলেও ভারতচন্দ্রের অনুসরণ (১) করে তিনিও লিখেছেন, "সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস।" ইত্যাদি। সাহিত্যে আনন্দবাদ সব দেশে সর্ব কালেই আছে। কিন্তু এ যে নিতান্তই "বাক্য রসাত্মকং কাব্যং" এর গতানুগতিক পুনরুক্তি তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। প্রসঙ্গত বলা দরকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিদিগের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায়। সমালোচনা হিসাবে ওগুলোর দাবী যে কি তা ডাঃ সুশীলকুমার দে লিখিত ভবতোষ দত্ত মশায়ের সম্পাদিত 'প্রাচীন কবিজীবনী'র ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশ থেকেই স্পষ্ট হবে—"পূর্বকালের কবিদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের যে পক্ষপাত ছিল, তাহা আন্তরিক হইলেও তাঁহাদের রচনার প্রকৃত মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও স্পষ্টরূপ ধারণা ছিল না। তাঁহার প্রচেষ্টার পিছনে কোনও সাহিত্যিক আদর্শ বা সাহিত্য-ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সাহিত্য সমালোচনার চেষ্টাও তিনি করেন নাই।"

১। প্রাচীন কবিগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।—ভারতচন্দ্র

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাতও আমরা দেখতে পাই 'বিবিধার্থসংগ্রহে'। মুখ্যত ইংরাজী ধারার অনুসরণ করলেও বাংলা সমালোচনা স্বদেশীয় সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখেছে। উপরে উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যেই আমরা দেখেছি কাব্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—"কাব্যামৃত দ্বারা জনসমাজের তৃপ্তিসাধন" ; প্রহসন নামটিও সংস্কৃত থেকে নেওয়া। 'ব্যঞ্জনা'র অভাবে কাব্যের অসার্থকতার কথাও আছে।

বিবিধার্থসংগ্রহের আর একটি দান 'সমালোচনা' শব্দটি (১)। কোন কোন মহল থেকে আপত্তি সত্ত্বেও 'সমালোচনা' কথাটিই ইংরাজী criticism অর্থে শেষ পর্যন্ত বাংলায় সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এখন প্রশ্ন হল 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র এই লেখাগুলি কার লেখনী নিঃসৃত। ওগুলির ভাষা ও ভাব থেকে প্রতীতি হয় একই ব্যক্তি এ সকলের লেখক। 'সমালোচনা সংগ্রহের সম্পাদকীয় মন্তব্যাংশে অমরেন্দ্রনাথ রায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ঐ সমস্ত লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচয়িতা ও মহাভারতের অনুবাদক বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালায়' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' 'কা-প্র সি' স্বাক্ষরে তিনি (কালীপ্রসন্ন সিংহ) কয়েকখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন।" এ থেকে আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহকেই বাংলা সমালোচনা পত্তনের গৌরব দান করতে পারি। রাজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে।

ঐ যুগে যখন সাধারণের মনে সংস্কৃত অলংকারের শাসন ছিল প্রবল, যার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কাব্যজগতে ইংরাজী আদর্শে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকারী মাইকেল মধুসূদনকেও সংকল্প গ্রহণ করতে হয়েছিল (২) সেই যুগে সহজ আয়াসহীনভাবে উপরে আলোচিত সাহিত্য আলোচনা রীতি ও মূল্যবোধের প্রবর্তনা কম দূরদর্শিতা ও গৌরবের কথা নয়।

যাই হোক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা ছেড়ে দিয়ে বিশুদ্ধ সমালোচনা হিসাবে বিচার করতে গিয়ে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্বের কথা মনে রেখেও একথা বলতে হবে যে এই সমালোচনা তেমন কিছু একটা হয়ে উঠে নি। সমুচ্চ সমৃদ্ধ সমালোচনার জন্যে চাই উপযুক্ত সাহিত্য, সে সাহিত্যেরই অভাব ছিল সে সময়ে। 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়

১। দ্রষ্টব্য 'ভূমিকা সমালোচনা সংগ্রহ', সম্পাদনা অমরেন্দ্রনাথ রায়, প্রকাশনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। "If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Biswanath of the Sahitya Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models." রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত চিঠির অংশ বিশেষ।

১৮৫১ সালে এবং উঠে যায় ১৮৫৯ সালে। এই সময়কালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের একটি তালিকা দিলেই বোঝা যাবে যে যে জিনিসের উপর দাঁড়াবে সমালোচনা, সেই জিনিসেরই ছিল কি অকিঞ্চনতা।

১৮৫২ জি, সি, গুপ্ত—কীর্তিবিলাস (নাটক)
তারাচরণ শিকদার—ভদ্রার্জুন (নাটক)
১৮৫৪ রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীনকুলসর্বস্ব
১৮৫৫ শকুন্তলা—বিদ্যাসাগর
১৮৫৭ প্যারীচাঁদ মিত্র—আলালের ঘরের দুলাল
" ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক উপন্যাস
১৮৫৮ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—পদ্মিনীউপাখ্যান
" মধুসূদন—শর্মিষ্ঠা (গ্রন্থকারের প্রথম বাংলা রচনা)
১৮৫৯ মধুসূদন—একেই কি বলে সভ্যতা।

দ্বিজেন্দ্রলাল

নারায়ণ চৌধুরী

দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক গঠনে কালোচিত সমাজচেতনাও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিতে প্রচলিত রীতি নীতি আদব-কায়দা আচার-অভ্যাসের বিরুদ্ধে যে ক্ষুরধার সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায় তা এই সমাজ-চেতনা থেকেই উদ্ভূত। এবং এই সমালোচনার কেন্দ্রমূলে আছে তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তাবাদের একজন প্রধান ঋত্বিক ছিলেন। আমাদের দেশের যে কয়জন লেখক জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ও দেশপ্রেমকে তাঁদের রচনার প্রধান উপজীব্য স্বরূপ গ্রহণ করে লেখনী চালনা করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁদের অগ্রগণ্য সারির একজন বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' কাব্য, তাঁর হাসির গান, তাঁর ঐতিহাসিক নাটক, তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত—সব কিছু এ কথার নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করে। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে দেশপ্রেম বিশদ ভাবে আলোচনার যোগ্য একটি বিষয়। মদীয় 'বাংলার সংস্কৃতি' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। যোগ্যতর ব্যক্তিরা বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন।

৩

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সাহিত্য-সংসারে বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর নাটকগুলির জন্য। এখানে তাঁর নাট্য সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির মধ্যে এই কটি নাটক সমধিক পরিচিত—প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নুরজাহান (১৯০৮) মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), ও চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)। তাছাড়া তাঁর পরিণত বয়সের রচনা পরপারে (১৯১২) ও বঙ্গনারী (প্রকাশকাল ১৯১৬—দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে) এই দুটি সামাজিক নাটকও মোটামুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এদের ভিতর সাজাহান নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে সার্থক নাট্যরচনা বলা যায়। তারপরে মেবারপতন, দুর্গাদাস, নুরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, রাজপুত-মুঘল ইতিহাস বিষয়ক, দুই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ক। শেষোক্ত পর্যায়ে মাত্র দুখানি নাটক তিনি লিখেছিলেন—চন্দ্রগুপ্ত ও সিংহল বিজয় (১৯১৫—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। এর মধ্যে রাজপুত-মুঘল ইতিহাস বিষয়ক নাটকগুলিই রচনা-নৈপুণ্যের দিক্ থেকে সমধিক সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছে। তার একটা কারণ, এই ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কল্পনাশক্তির ব্যবহার ক্ষুণ্ণ না করেও ইতিহাসের তথ্য মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করতে পেরেছেন, প্রাচীন ভারতের নাটকে তাঁর সে সুবিধা ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত এবং সিংহল-বিজয় উভয় নাটকেই কল্পনার অতিপ্রাধান্য ঘটেছে এবং যে পরিমাণে তাতে এই দোষ ঘটেছে সেই পরিমাণেই তাদের নাটকীয় কাহিনীর প্রতীতিযোগ্যতার হানি হয়েছে। বিরল উপকরণের ভিত্তির উপর নাটক দাঁড় করানোর ফলে এই দুটি নাটকের বাস্তবতা দানা বাঁধতে পারে নি। তা হলেও দর্শক সাধারণের নিকট চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে ভিন্নতর কারণে। চাণক্য চরিত্রের প্রখর ব্যক্তিত্ব এই আকর্ষণের মূল হেতু। একদিকে কূটনীতিজ্ঞ চাণক্যের নির্বিবেক রাষ্ট্রপরিচালন-নৈপুণ্য, অন্যদিকে তাঁর বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়ের স্নেহকাতরতার সংঘাতে নাটকের ভিতর একটা আবেগ-তীব্র থরথর নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটকীয় সম্ভাবনায় থমথমে অ্যান্টিগোনাসের আত্মপরিচয় লাভের প্রবল ব্যাকুলতার রূপায়ণমূলক দৃশ্য। যদিও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা ভালো যে, চাণক্যের আর অ্যান্টিগোনাসের আখ্যায়িকার মধ্যে সঙ্গতি-সূত্র কোথাও নেই, সেই সূত্র যোজনার চেষ্টাও নাটকে পরিলক্ষিত হয় না।

সাজাহান নাটক মনস্তত্ত্ব রূপায়ণ মূলক রচনার একটি সুন্দর উদাহরণ। এতে পিতা-পুত্রের মানসিক সংঘাতের দ্বন্দ্ব অতি নিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সাজাহানের বৃদ্ধ বয়সের ও বন্দিদশার মর্মযাতনার

চিত্রায়ণে যেমন আছে অসাধারণ নাটকীয় লিপিনৈপুণ্য, তেমনি ঔরংজীবের প্রতি মনোভাবে বৃদ্ধ সম্রাটের মানসক্রিয়ায় বিচিত্র এক মিশ্র অনুভূতির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ঔরংজীবের ক্রূর নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্ষমাহীন হয়েও এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়ে সম্রাট যুগপৎ পুত্রবৎসলতায়ও কাতর। ঔরংজীবের মধ্যেও বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোড়ন। পিয়ারার আপাত হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে ঔরংজীবের নানা কার্যের প্রচ্ছন্ন অথচ সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা নিহিত। পিয়ারার সংলাপের বহিরঙ্গের এক অর্থ, অন্তরঙ্গের এক অর্থ। এই সব একাধিক লক্ষণ বিচার করে দ্বিজেন্দ্রলালের—সাজাহান নাটকটিকে মনস্তত্ত্বপ্রধান আধুনিক নাটকের একটি সার্থক দৃষ্টান্তস্থল বলা যেতে পারে।

নুরজাহান নাটকটিকেও একই গোত্রের রচনা বলা যায়। এখানেও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই প্রাধান্য। স্বামী শের আফগানের হত্যাকারী যুবরাজ সেলিমের প্রতি প্রতিহিংসাবৃত্তি কী করে ধীরে ধীরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে আত্মসমর্পণে রূপান্তরিত হল তারই এক মনস্তাত্ত্বিক আলোছায়াময় রূপালেখ্য নুরজাহানের চরিত্র। চার বৎসরের বৈধব্যদশা নুরজাহানের জীবনে এক বিচিত্র আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। তারপর সম্রাজ্ঞীরূপে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এই ভূমিকায় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এক অলস বিলাসী সম্রাটের ভোগজীবনের উপর অবাধ প্রভুত্বের গৌরব ও বিরুদ্ধবাদীদের দমন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্রূর-কুটিল লিপ্সাটাই বড় হয়ে উঠেছে। বৈধব্যের বিরহের শুভ্রতা এই পর্বে ক্ষমতালুব্ধতার কলুষ-কালিমায় সম্পূর্ণ মলিন হয়ে গেছে। নুরজাহান চরিত্রের এই রূপান্তর নাটকের এক প্রধান কেন্দ্রগত বিষয়।

প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, মেবার পতন তিনটি নাটকই মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজপুত শৌর্যবীর্যের কাহিনী। মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতীয়তার প্রতিরোধ তিনটি নাটকেই একটা প্রবল স্বাদেশিকতার চেতনার আবহ সৃষ্টি করেছে। দেশপ্রেম এই তিন নাটকের প্রধান উপজীব্য বলা যায়। বিশেষ করে প্রতাপসিংহ ও মেবার পতন নাটকে এই দেশাত্মিকা বুদ্ধি সবিশেষ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মেবার-পতন নাটকের বৈশিষ্ট্য মাত্র এই লক্ষণেই সীমিত নয়। সেখানে কবি জাতীয়তাবাদী অভীপ্সার রূপায়ণের পাশে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শটিকেও রূপায়িত করেছেন এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শই যে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। মানসী চরিত্রটিকে এই ভাবের বাহিকা রূপে আঁকা হয়েছে। সত্যবতীর কণ্ঠে জাতীয়তার চারণগান; মানসীর চক্ষে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র আর বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন। মেবার পতন নাটক ১৯০৮ সনে লেখা। ওই সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে, বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ প্রচার বাংলা নাটকের পক্ষে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের পক্ষেই এক অভিনব ব্যাপার। বঙ্গভঙ্গের স্রোতোমুখে ভেসে আসা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আলোড়নের দ্বারা মথিত-সংক্ষুব্ধ বাংলাদেশের মানসভূমিতে আন্তর্জাতিক আদর্শের বীজ তো পরের কথা, সর্বভারতীয়তার বীজও তখন ভাল করে উপ্ত হয় নি। সেই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালকে একটা বলিষ্ঠ প্রাগ্রসর ভাবের অগ্রপথিক বলা যায়। তিনি যে যুগের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী হয়ে চিন্তা করতে পেরেছিলেন না মেবার-পতন নাটকে মানসী চরিত্রের পরিকল্পনাই তার প্রমাণ। মানসী সত্যবতীকে উদ্দেশ করে এক জায়গায় বলছে—"যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় তো মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক! দেশের স্বাধীনতা ডুবে যাক—এ জাতি আবার মানুষ হোক।"

এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে যে কী অসাধারণ বৈপ্লবিকতার বাণী সুগুপ্ত আছে তা পরবর্তী কালের চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।" অথবা, "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।" এ সব বিশ্বাত্মিকা-বুদ্ধি প্রণোদিত আন্তর্জাতিক আদর্শেরই কথা এবং এ সব পংক্তি যদিও বিশ শতকের গোড়াতেই রচিত হয়েছিল তা হলেও এ সব কবিতা পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় মেবার-পতন নাটক প্রকাশের অন্ততঃ ছ'বছর পরে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে জাতীয়তাবাদী উগ্র স্বাতন্ত্র্যচেতনার বন্ধন থেকে মুক্তি এই পর্বে সংসাধিত হয়। তীব্র স্বাজাতিকতার অহমিকার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের উদার-মুক্ত অঙ্গিনায় আশ্রয় গ্রহণ আরও পরেকার ঘটনা। এই মহান আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাস্তব রূপলাভ করে ১৯২১ সনে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের মধ্য দিয়ে। একই সময়ে কিংবা তারও কিছু পরে মহাত্মা গান্ধীও অনুরূপ ভাবের কথা বলতে থাকেন। "আমাকে যদি স্বরাজ এবং সত্যের মধ্যে বাছাই করতে হয় তবে আমি সত্যকেই বেছে নেব।" এটি গান্ধীজীর উক্তি। সত্য বলতে, এখানে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শের দ্বারা ধৃত বিশ্বমৈত্রীর কথাই বলা হয়েছে। এই কথা মানসীর উক্তির হুবহু প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। এই সব পরবর্তী ভাবনা ও ঘটনার বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মেবার পতন নাটকে যুগের তুলনায় কী অসাধারণ বৈপ্লবিক বাণীবাহী ভাবধারাই না পরিবেশন করেছেন! সত্য বলতে কি, দ্বিজেন্দ্রলালের সমকার মানস-পরিবেশ, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও রুচিপ্রবণতা, তাঁর কবিজীবনে জাতীয়তাবাদী ভাবের আবেশ ও আচ্ছন্নতা বিচার করলে দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এবংবিধ আদর্শের প্রচারণা এক এক সময় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অথচ ঘটনাটি অবাস্তবও নয়, অবিশ্বাস্যও নয়। মেবার পতন নাটকের মানসী চরিত্রের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এই ভাবধারার অভ্রান্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে তৎপক্ষে পরিসরের একান্ত অভাব। সুতরাং আমি শুধু এখানে দ্বিজেন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের রেখাঙ্কন করেই নিবৃত্ত হলাম। যাঁরা এ বিষয়ে বিশদ জানতে চান তাঁদের ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় কৃত

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্র-শিল্পী-ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ দিক্। এই ক্ষেত্রেও তাঁর যথাপ্রাপ্য সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতে তাঁর দান অতুলনীয় বললেও চলে। সে সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। এখানে তার সুযোগ নেই। কাজেই আমরা শুধু এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দিলীপকুমার একাধিক জায়গায় তাঁর পিতৃদেবকে প্রধানতঃ 'সুরকার' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। 'স্মৃতিচারণে'র উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল গায়ক হিসাবে খ্যাতিমান্ ছিলেন ; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন সুরকার হিসাবে। তিনি একজন অসামান্য সুরকার ছিলেন।

এ কথা যথার্থ। সঙ্গীত জগতে দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টিক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় কণ্ঠশিল্পী হিসাবে নয়, সুরকার অর্থাৎ composer হিসাবে। সুর রচনার ক্ষমতাই হচ্ছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষমতা। এ জিনিস আমাদের দেশে এখনও আমরা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারি নি। তা যদি পারতাম তা হলে দ্বিজেন্দ্রলালকে একজন প্রথম শ্রেণীর সাঙ্গীতিক স্রষ্টা পুরুষ রূপে মাথায় করে রাখতাম। ইউরোপে সুরকারের যে সম্মান, কণ্ঠসঙ্গীতকার বা বাদকের সম্মান তার সিকির সিকিও নয়। এ রেওয়াজ এখনও আমাদের দেশে তেমন করে চালু হয় নি, হলে ভাল হত। অন্ততঃ সে ক্ষেত্রে মুড়ি মিছরির এক দর হাঁকবার প্রবণতা সঙ্গীত মহল থেকে লোপ পেত। আমাদের দেশে সুরকারের আপেক্ষিক অনাদরের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সুরকার লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে সুর রচনা করেন, আর গায়ক হাজারো মানুষের প্রকাশ্য জমায়েতে সে গান গেয়ে আসর মাত করেন। ফলে সম্মান-স্বীকৃতির নগদ বিদায়টা গায়কের ভাগ্যে যে পরিমাণে ঘটে, সুরকারের ভাগ্যে তেমন ঘটে না। এতে যে সুরকারের প্রতি অবিচার করা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুখের বিষয় ইদানীং এ অবস্থার কিছু কিছু প্রতিকার হতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক দানের মূল্যায়নে আমরা সঙ্গীতের ইউরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসাবে মর্যাদা দিতে শিখেছি। কিন্তু আমাদের উদারতা রবীন্দ্রনাথেই থেমে গেছে, এই সংস্কার অন্যান্য সুরকারদের বেলায় প্রয়োগ করতে আমরা ভুলে গেছি। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের সুরকারের প্রতিভা মেনে নিতে আজও শিখি নি। তেমনি আমরা অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম, দিলীপ কুমার, হিমাংশু দত্ত, সুরসাগর প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর সুরকারদের সুর-যোজনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আজও অল্পবিস্তর উদাসীন। কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে যে মর্যাদা পেয়েছেন সুরকার হিসাবে তার একাংশ মর্যাদাও পান নি, যদিও নিরপেক্ষতার তৌলদণ্ডে তাঁর কাব্য-প্রতিভা বড় কি সাঙ্গীতিক প্রতিভা বড় সে বস্তু এখনও পরিমাপ হওয়ার অপেক্ষা রাখে। দিলীপকুমারকে এখনও আমরা মুখ্যতঃ গায়ক হিসাবেই চিনি, তাঁর অসাধারণ সুরযোজনার ক্ষমতাকে এখনও পর্যন্ত আমরা আদর করতে শিখি নি। এ আমাদের সুরবোধের দৈন্যেরই শুধু পরিচয় ঘোষণা করে। দিলীপকুমার সুররচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ্য উত্তরাধিকারী। দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা তাঁর সুযোগ্য পুত্র দিলীপকুমার শিল্প রচনার এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পান নি এটি পরিতাপের হলেও সত্য।

সুররচনায় নানা শাখায় দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তির পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। হাল্কা ছাঁদের ছন্দোপ্রধান সুর রচনার সার্থক সৃষ্টির উদাহরণ—গগনভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী, আয় রে আমার সুধার কণা, আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে, ইত্যাদি এবং একাধিক হাসির গান। হিন্দী ধ্রুপদ এবং খেয়াল ভেঙেও তিনি অনেক বাংলা গান রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে তাঁকে একজন প্রধান পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে; তাঁর এই বর্গের গানের নাম—প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে (জয়জয়ন্তী) সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই (বাগেশ্রী), ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী (ভূপালি ঠাট), পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী ঠাট), ইত্যাদি। আজকাল যাকে কাব্যসঙ্গীত বলা হয় তারও প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলাল। তবে এখনকার হাল্কা চটুল ভঙ্গীর কাব্যবর্জিত তথাকথিত কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীতের নামেই শুধু মিল, অন্য কোন লক্ষণে মিল নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসঙ্গীত কাব্যময়, উদার, গম্ভীর, যথার্থ সুরৈশ্বর্যযুক্ত। কাব্য ও সঙ্গীতের সেখানে অঙ্গাঙ্গী মিলন হয়েছে। তার অর্থ যে সব গানে কাব্য বড় কি সুর বড় তা বোঝবার উপায় নেই; দুইয়ে মিলে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতা। দুটি সার্থক দৃষ্টান্ত—নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো (দেশ ঠাট) ও মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ওই ভেসে আসে (কল্যাণ ঠাট)। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত গানটির জোড়া মেলা ভার—কি বাণীর দিক থেকে কি সুরের দিক থেকে।

কিন্তু এহো বাহ্য। সুরকার রূপে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর জাতীয় ভাবোদ্দীপক কোরাস গানগুলির রচনায়। এ ক্ষেত্রে আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন, বিনা দ্বিধাতেই বলা চলে এ কথা। দ্বিজেন্দ্র-সুহৃৎ প্রসিদ্ধ মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ" গানটি শুনে বলেছিলেন—"How wonderful, how magnificent !" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় প্রতিটি স্বদেশী কোরাস গান সম্পর্কেই এই উচ্ছ্বসিত মন্তব্য প্রয়োগ করা চলে। যেমন গানগুলির ভাব ভাষা তেমনি তাদের সুর। এ বলে আমায় ভাখ, ও বলে আমায় ভাখ। জাতীয় ভাবোদ্দীপক এষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গানের বাণী যেমন রজঃগুণ সমৃদ্ধ তেমনি সুরের বাঁধুনিতেও বলিষ্ঠতা ও বীর্যব্যঞ্জকতা। গানগুলির সুর থেকে একটা সাংগ্রামিক চেতনা যেন স্বতঃই ঝরে ঝরে

পড়ছে। বাঙালী তাঁর এই গানগুলির সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিচিত, তবু এই স্থলে এ-জাতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি রচনার নামোল্লেখ করছি—ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা, মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার জননী আমার, যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ। সেথা গিয়াছেন তিনি, কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ, প্রভৃতি।

উল্লিখিত গানগুলির সুরযোজনায় তিনি সজ্ঞানতঃ বিদেশী কোরাস গানের সুরভঙ্গি ও গাইবার ঢঙ্ আমদানী করেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশ সুরের মূলে আমাদের প্রথাগত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর আমেজ মিশে আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সুরের এ এক আশ্চর্য যাদুক্রিয়াসুলভ—হাঁ, যাদু-ক্রিয়াই বলব—মিলন ঘটেছে। ইউরোপীয় সুর আর ভারতীয় সুর তেল-জলের মত পরস্পরের সঙ্গে মিশ খায় না বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অসামান্য সাঙ্গীতিক ক্ষমতার দ্বারা এ ধারণা যে সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় তা প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর কোরাস গানগুলিতে ইউরোপীয় সুরের ঢঙ আর ভারতীয় রাগের আমেজের ভিতর গঙ্গা-যমুনা সমন্বয় সাধিত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন, ধনধান্যে পুষ্পভরা গানটির ছন্দ, গায়নপ্রণালী, স্বরবিরাম (cadence) ইত্যাদি ইউরোপীয় সুরভঙ্গির কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ তা রচিত হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতেরই এক সুপরিচিত ঠাটে—কেদারা ঠাটে। কিংবা যেদিন সুনীল জলধি হইতে গানটির কথা ধরা যাক। তাতেও একই প্রকার ইউরোপীয় সুরের আমেজ লক্ষ্য করা যায়, অথচ তা রচিত হয়েছে ভূপকল্যাণ ঠাটে। তেমনি ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে শীর্ষক সামরিক সঙ্গীতটি পাশ্চাত্ত্য military march সঙ্গীতের ঐতিহ্যের স্মারক কিন্তু তার রাগরূপটি হল আমাদের পরিচিত কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। এস্নি, বঙ্গ আমার জননী আমার, এস্নি, সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির প্রভৃতি গান।

শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু ভক্তিভাবাত্মক ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যার কথা দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয়-গানের ভিতর কয়েকটি প্রামাণ্য গান হল—চরণ ধরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস না মা, আর কেন মা ডাকছ আমায়, প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে, তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, ইত্যাদি।

৫

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটে ১৯১৩ সনে। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু নিশ্চিতরূপেই অকাল মৃত্যু। মাত্র পঁচিশ বৎসর কি তার কাছাকাছি সময় তিনি সাহিত্যসাধনার জন্য নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ের ভিতর তিনি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখে গেছেন—কাব্য নাটক প্রহসন সঙ্গীত সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি। শুধু সাহিত্যের দুই জনপ্রিয় শাখায় তাঁর অনুরাগের—অন্ততঃ অনুরাগের বহির্ভিব্যক্তির—প্রমাণ নেই। সে দুটি শাখা হল উপন্যাস ও ছোটগল্প। তৎসত্ত্বেও নিয়োজিত সময়ের পরিমাণ বিচার করলে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট ভারী বলতে হয়। এক নাট্যরচনার পরিমাণই মনে দাগ কাটবার মত। ওর উপর সব জাতের গান মিলিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টির পরিমাণও বড় কম নয়। এই থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলাল যদি আরও আয়ুর প্রসাদ পেতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য আরও নানা প্রকারে বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধ হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যের এই তিন বিশিষ্ট স্রষ্টা কেউ দীর্ঘজীবী হন নি। তবে সান্ত্বনা এই, প্রতিভার ধর্মে আয়ুর পরিমাণটা বড় কথা নয়, বড় কথা প্রতিভার দ্যুতিময় বিচ্ছুরণ—হোক তা ক্ষণিকের, হোক তা স্বল্পকালের। এই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে দু হাত ভরেই তাঁর সৃষ্টির দানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলেছিলেন তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

'নিরক্ষর'

গান

শ্রীস্বপন মজুমদার

সাক্ষী রইলে চাঁদ
শুনলে তো ওগো তারা
সে আজ যে কথা দিয়েছে
শুনেছ রাত নিদ্ হারা।
রজনীগন্ধা মিতা শুনেছ
ভ্রমর বঁধু কাল গুণেছ
সে আজ যে কথা দিয়েছে
মোর ডাকে দিয়েছে সাড়া

আলোর চুমকি জ্বালা চঞ্চল
ওগো জোনাকি
মোর ডাকে সে যে সাড়া দিয়েছে
বলবে না কি?
মিষ্টি আবেশ ভরা দখিণা
বল আকাশ তুমিও কবে কিনা
সে আজ যে কথা দিয়েছে
দিয়েছে শপথের ইশারা॥

অমৃতের কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর রহস্য-ঘন কুহেলিকাচ্ছন্ন গভীর তিমিরাবৃত। জীবনের হস্যের চেয়ে মৃত্যুর গোপনতত্ত্ব আরও জটিল, আরও র্বোধ্য ও আরও দুজ্ঞে'য়। উপনিষদের ঋষিরা মৃত্যুর সত্ত পারে 'অমৃততত্ত্বের উপলব্ধি ক'রেছিলেন ও তাঁদের সই আত্মানুভূতি উপনিষদের বাণীতে বাণীতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সেই চিরশাশ্বত অনন্ত বাণীর সূত্র ধরে সেই চিরন্তন সত্যের শিখায় জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জলিত ক'রে সন্ত, সন্ন্যাসী, তাপস, সাধক অনন্ত ভবিষ্যতে বাস করেন। মহৎ আশা ও পরম আনন্দ, অপূর্ব্ব গৌরব ও গরিষ্ঠ গরিমা যাঁদের ভবিষ্যতে, তাঁরাই রচনা করেন উচ্চাঙ্গীন মানব সভ্যতা। সমষ্টির মধ্যে যাঁদের ব্যাপ্তি, অনন্তের মধ্যে যাঁদের লীলা, পৃথিবীর ধূলায় তাঁদেরই ফেলে-আসা জীবন-বেদে রেখে ান যে অমৃতের বাণী, তাঁদেরই স্মরণ ক'রে জেনেছে মানুষ আপনাকে অমৃতের পুত্র ব'লে। তাই 'মানুষ'কে শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' ব'লে আহ্বান করেছিলেন আমাদের আরণ্যক ঋষিরা, জগৎ সভ্যতার অতি প্রত্যূষে। মৃত্যুর যে ভীতি-বিহ্বলতার রূপ মেরী লেণেরু তাঁর অপূর্ব্ব নাটক Les Affranchis, Act III & IV এ বলেছেন—

"Death and death alone is what we must consult about life ; and not some vague future or survival, in which we shall not be present. It is our own end ; and everything happens in the interval between death and now. Do not talk to me of those imaginary prolongations which wield over us the childish spell of number ; do not talk to me—to me who am to die outright—of societies and peoples. There is no reality, there is no true duration, save that between the cradle and the grave. The rest is more bombast, show, delusion. They call me a master because of some magic in my Speech and thoughts, but I am a frightened child in the presence of death."

মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী অশরীরী মূর্ত্তি মানুষেরই স্বকপোল-কল্পিত রচনা। তাই নেপোলিয়ান বলেছিলেন—

The doctors and the priests have long been making death grievous."

(চিকিৎসক ও পুরোহিতেরা প্রাচীনকাল থেকে মৃত্যুকে ভয়াবহ করে তুলেছেন।)

শরীরের পীড়া, মৃত্যুর প্রাক্কালে, সে তো জীবদেহের বেদনা। মেটারলিঙ্ক তাঁর 'মৃত্যু' নামক পুস্তিকায় বলেছেন—

"Death has two terrors looming behind it. The first has neither face nor shape and overshadows the whole region of our mind, the other is more definite, more explicit, but almost as powerful and strikes all our senses."

"Death descends upon us to take away a life or change its form : let us judge it by what it does, and not by what we do before it comes and after it is gone. And it is already far away when we begin the frightful work which we try hard to prolong as much as we possibly can, as though we were persuaded that it is our only security against forgetfulness. I am well aware that, from any other than the human point of view,

proceeding is very innoxious. Looked upon from a sufficient height, decomposing flesh is no more repulsive than a fading flower or crumbling stone. But when all is said, it offends our senses, shocks our memory, daunts our courage, whereas it would be so easy for us to avoid the hateful test. Purified by fire, the memory lives in the heights as a beautiful idea; and death is naught but an immortal birth cradled in flames."

তাই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে জীবনের পরিপূর্ণতার বাণী বিঘোষিত ক'রলেন—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি
তোমার তরে ব'হে বেড়াই
দুঃখ সুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা
না জেনে যায় তোমার পানে
সকল ভালবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেউ বা আপন, কেউ বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

মৃত্যুর কৃষ্ণযবনিকা উত্তোলনের একান্ত আগ্রহে মৃত্যুর পরের অবস্থার কথার বিশ্লেষণে মেটারলিঙ্ক বলেন—

"Outside the religion there are four imaginable solutions and no more; total annihilation, survival with our consciousness of today; survival without any sort of consciousness; lastly survival with universal consciousness different from that which we possess in the world."

তাঁর কল্পিত মতবাদের বিশ্লেষণে তিনি বললেন "সম্পূর্ণ বিনাশ অসম্ভব।"

—"Total annihilation is impossible. We are the prisoners of an infinity without outlet, wherein nothing perishes, wherein everything is dispersed, but nothing lost."

রবীন্দ্রনাথও এ ভাবে ভাবান্বিত হ'য়ে গীতাঞ্জলিতে ব'ললেন—

যে ফুল না ফুটিতে
ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি গো জানি তা'ও হয়নি হারা।

আবার গাইলেন—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা।"

Neither a body nor a thought can drop out of universe, out of time and space. Not an atom of our flesh, not a quiver of our nerves, will go where they cease to be, for there is no place where anything ceases to be.

উপনিষদের বাণী 'সর্ব্বমিদং খলু ব্রহ্ম' গীতাঞ্জলির শেষের কবিতাগুলির মধ্যে এক অনন্তপূর্ণতার চিরন্তনী বাণী অমৃতলোকের সুনির্ণয়ে উদ্গীত হ'য়েছে। যেমন—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে, কত গন্ধে
কত গানে, কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়,
জাগে হৃদয় পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

আবার ক্ষণিক সন্দেহ দোলায় মৃদু দোদুল্যমান কবি বলেন—,

মনে করি এইখানেই শেষ
কোথা বা হয় শেষ
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন ক'রে হৃদয় জাগে
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই উদ্দেশ।

আবার মনস্থির—শেষের মধ্যে অশেষের উপলব্ধি, সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি···

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।
সুর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

সম্মুখে সীমাহীন ভবিষ্যৎ; পশ্চাতে অনন্ত অতীত। মানুষের জীব-লীলা বর্তমানের অক্ষরেখায়। চলমান বর্তমান অনন্ত ভবিষ্যতকে অনন্ত অতীতের গর্ভে নিরন্তর নিক্ষেপ ক'রছে। এই নিত্য ক্রিয়া শাশ্বত ও চিরন্তন। বর্তমানের বুকে জীবলীলার যতি আনে মৃত্যু। কিন্তু মানব-লীলার গতি থাকে অবিচল। অমৃতের মধ্যে তার নিবাস—সমগ্রের মধ্যে সে মঙ্গল—অনন্তের মধ্যে তার পরিব্যাপ্তি। 'সমগ্রের মধ্যেই শিব' শিব ঐক্য স্থাপনে ও ঐক্য বন্ধনে। কথন "স্বলক্ষণন্তু যো বেদ সংমুনিশ্রেষ্ঠ উচ্যতে" পরমাত্মার লক্ষণকে যে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছেন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ আর আনন্দাত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি করেই মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন—মরণশীল মানুষ।

কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে মৃত্যুর রহস্য উপলব্ধি করার উদগ্র বাসনা যে কত তীব্র, তা ফুটে উঠেছিল তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' ব্রজবুলির অক্ষম অনুকরণে। ভাবের দৈন্য কখনও হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে নি। তাই তিনি গেয়ে উঠেছেন—জানি না ইহা অনুভূতির গভীরতার স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কিনা?

"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর রক্ত অধরপুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত কর দান
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥"

জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর আবেশের অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত রয়েছে। মৃত্যুতে জীবনের চিরসমাপ্তি—শ্রেয় নয়—মুক্তির মাঝে তা'কে জাগিয়ে তুলতে হ'বে। 'মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে' এই যে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষণ জীবনের প্রকাশ মৃত্যুরই মাঝে, সত্যের মাঝে, নিত্যের মাঝে। জীবনের বৈশিষ্ট্য মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে 'প্রভাত সঙ্গীতের' কবি 'রাহুর প্রেমে' ব'ললেন—

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে আশার পিছনে ভয়
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরি দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।

মানুষের জীবনে মরণের ডাক বার বার আসে।

প্রাবন্ধিক ও কবি এমারসন্ অনুরূপ মত পোষণ করেন।

For the soul's communication of truth is the highest event in nature, since it then does not give somewhat from itself, but it gives itself, or passes into and becomes that man whom it enlightens; or in proportion to that truth he receives, it takes him to itself.

We distinguish the announcements of the soul; its manifestation of its own nature, by

the term Revealation. These are always attended by the emotion of the sublime. For this communication is an influx of the Divine mind into our mind. It is an ebb of the individual rivulet before the flowing surges of sea of life. Every distinct apprehension of this central commandment agitates men with awe and delight. A thrill passes through all men at the reception of new truth or at the performance of a great action, which comes out of the heart of nature.

সেক্সপীয়ার বলেছেন—

"Cowards die many times before their death
But valiants never taste of death but once."

কবি কিন্তু মৃত্যুর করাল আহ্বানকে অস্বীকার করেছেন; মৃত্যুকে কবি—প্রতিভার উন্মেষের প্রভাতে তিনি চান্‌নি, তাই 'কড়ি ও কোমলে' গেয়ে উঠেছেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

'মানসী'র কবি 'ভৈরব গান' এ গাইলেন—

'যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ
সুখ আছে সেই মরণে।"

'সোনার তরী'র অতীন্দ্রিয়তা বিলাসী কবি ভাবের কুজ্ঝটিকায় তন্ময় হ'য়ে এক অভূতপূর্ব্ব পরীক্ষায় নিজেকে সম্মুখীন ক'রে গাইলেন—

'আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা।
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।

মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা,
নিশীথ বেলা।

হৃদয় যমুনাতে মৃত্যুর শান্ত-শীতল গভীর রূপ উপলব্ধি ক'রে গাইলেন—

যদি মরণ লভিতে চাও এসে তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে॥

চিত্রায় 'মৃত্যুর পরে' কবিতায়—

সকল অভ্যাস ছাড়া সর্ব্ব আবরণ হারা
সদ্য শিশু সম
নগ্ন মূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম॥
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাই মিছে
সে কি আমাদের?
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি ত বুঝা যায়
সে যে অনন্তের॥

'নৈবেদ্যে'র কবি 'মৃত্যু' কবিতায় মৃত্যুকে জানা-না-জানার সংশয় দোলায় দোদুল্যমান। তাই তিনি লিখলেন—

'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।'
* * *
* * * * * * মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়॥

'উৎসর্গে'র কবি 'মরণ' সম্বন্ধে জ্ঞানাশ্রয়ী বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ ক'রে মরণকে সম্বোধন ক'রে কত সনির্বন্ধ অনুরোধ, কত

কাতর আকুতি জানালেন, কত স্তুতি ক'রলেন, কত মিনতি জানালেন, কত কথা কইলেন, কত প্রশ্ন করলেন—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও
ওগো একি প্রণয়েরি ধরণ।
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নামিয়া,
যবে ফিরে আসে গোষ্ঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

কবি তখন বলছেন, কেন তুমি গোপনে চোরের মত রাত্রের ঘন অন্ধকারে লুকিয়ে তিমির অবগুণ্ঠনে বদন ঢেকে আসো? আমিই যে যাব তোমার কাছে তোমারই অভিসারে, মিলন মেলায়···সকল বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিপর্যায় তুচ্ছ-অগ্রাহ্য ক'রে।

আমি যাব যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ—
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎ-ফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহা বরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

সেই মাভৈঃ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কবি গেয়ে উঠলেন—

"ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।
হে রুদ্র তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব।

মৃত্যুর মাঝেই যে জীবনের মুক্তি। নব নব জন্মে নব নব জীবনের উদ্ভব, নব নব জীবনের আস্বাদন, নূতন অভিজ্ঞতা, নবীন পরিচয় মৃত্যুরই দুয়ার পার হ'য়ে।

কেনরে তোর দুয়ার টুকু
পার হ'তে সংশয়
জয় অজানার জয়।

মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের যে পরিব্যাপ্তি, নূতনত্বের আস্বাদ, নব নব পরিচিতি পাবার উদগ্র বাসনা তা বিশ্বকবি তাঁর 'জন্ম ও মরণে' লিপিবদ্ধ করলেন।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে। প্রেম আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে,
বাহিরে আসিব ছুটি অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যবে রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যবে এ কে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে। নব নব মৃত্যু পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

পরিণত বয়সে বিশ্বকবি পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে প্রকাশ করলেন 'প্রান্তিকে'—

আজি বিদায় বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
যাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রাম শেষে নবতর বিদায় যাত্রায়।

কবি 'সুপ্রভাত'এ বললেন, মৃত্যুকে অমৃত ক'রে নিতে হবে, সেই পরমব্রহ্মের উপলব্ধির পরিপূর্ণতায়। কবির ভাষায়—

জীবন স'পিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে

ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহ বাহনে--
মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্র শিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে॥

মানস-সুন্দরী, লীলা-সঙ্গিনী, ছায়া-সঙ্গিনী, জীবন-দেবতা এঁরা কি মৃত্যুর অতীতে অমৃতময়ের এক অপরূপ রূপ নয়? উপলব্ধির আবেশ নয়? ভাবের ঘোরের তপময়তা নয়? নিবিড় পরিচয়ের মেঘ চিত্তাকাশে হঠাৎ ছায়া ফেলে আবার দূরে চলে যায়।

পূরবীর কবি 'আহ্বানে' জানাচ্ছেন—

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'ল তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার ক'রেছেন তাঁর কাব্যের বহু ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, বিশেষ করে নিজের অলক্ষ্যে, জ্ঞানের অগোচরে। ফুলের ফসলও বদল হয়েছে; তৈরী হয়েছে বিচিত্র মধু, নানা বর্ণের ও নানা গন্ধ ও স্বাদের। কাব্যের এই হাওয়া-বদল থেকে ভূমি-বদল—এতো স্বাভাবিক; এর কাজ হ'তে থাকে অন্য মনে পরোক্ষে। কবির এ সম্বন্ধে সঠিক খেয়াল থাকে না। মৃত্যুর উপলব্ধি সম্বন্ধে কবি-মনের হাওয়া বদলের নিশানা পাই।

ওই মরণের সাগর পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবন মোহন স্বপন রূপে।

কবির শেষের দিকে মৃত্যুকে অস্বীকার করেছেন তার বিভীষিকাময় মিথ্যা ত্রাসবিজড়িত ছলনাময় রূপে। 'পরিশোধে'র কবি বলেছেন, 'মৃত্যুঞ্জয়ে'—

তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
সেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড় হও

তুমি ত মৃত্যুর চেয়ে বড় নও
"আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো" এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।

'প্রান্তিকে'র কবিতাগুচ্ছ মৃত্যুর ও মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্যকরূপে আত্মানুভূতির মাধ্যমে পরিমূর্ত্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বকবির অন্তরে—

মনে ভাবি,
পুরাণের দুর্গ দ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল। তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে।

আবার—

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিণ ব্যর্থতা,—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।
'অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়' রূপায়িত হ'য়ে
'এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হ'য়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদির তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধে চেয়ে সেই জোড় হাতে—
হে পূষণ; সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মি জাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

এক অপূর্ব অনবদ্য অনুভূতি। উপনিষদের গভীর বাণী বিকশিত হয়েছে বয়ঃপ্রবীণ তরুণ-হৃদয় বিশ্বকবির অন্তর আকাশে।

ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।
প্রভাত সূর্য্য এসেছে রুদ্র সাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে

মৃত্যুর হোক লয়
তোমারি হউক জয় ॥

ভাবনের ধূসর গোধূলি লগ্নে কবি দেখলেন—

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে ॥

শেষ লেখা কবিতাগুলিতে মৃত্যুর পদধ্বনি শ্রুত হওয়ার অশ্রুত বাণী ঘোষিত হচ্ছে কবিতার ছন্দে ছন্দে, সুরে সুরে, তালে তালে। অন্তর দিয়ে যে অমৃত সত্যকে অনুভব করে, কবি মৃত্যুকে তার বিকট বিকৃত ভয়াল রূপে স্বীকার করতে চাননি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর 'শেষ লেখা'র কবিতাগুলিতে লিপিবদ্ধ। অতি সরল সহজভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে বলেছেন, যেমন—

রূপনারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম, এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভাল বাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে ॥

আবার—

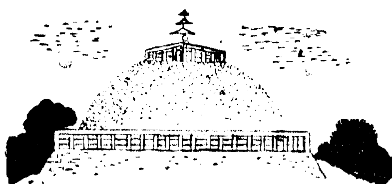
দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা তাহার ॥
যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হারজিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে ॥

তাই তিনি বলেছেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

অতি সুগভীর ও সম্যক উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ শেষ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন—এক অপূর্ব্ব সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের সকল রহস্য পরিষ্কার হয়ে উঠেছে নয়ন সমক্ষে।

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।





সমাধান

রমেন চৌধুরী

রোজই তাঁর সংগে দেখা হয়। শুধু আমি নই; এ পথ দিয়ে ন'টা-পাঁচটায় যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁরা সকলেই দেখেন। দেশনেতা ন'ন, ফিল্ম-ষ্টার ন'ন, ক্রোড়পতি ন'ন, পথ চলতি লোকের মাঝে তাঁকে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার কিছু নয়; তবুও সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন তাঁকে সকলে।

গ্রে ফ্লানেলের প্যান্ট আর খয়েরী টুইডের কোট গায়ে, গলায় ছাই-রংয়ের মাফলার। কড়া ইস্ত্রির ক্ষুরধার ক্রীজ নেই তা'তে। ময়লা, বিশীর্ণ। ছিমছাম নয়, অগোছাল। পোষাক তো নয়, এ যেন তা'র ট্রেডমার্ক। নাম, ধাম, পেশা কিছুই জানিনা, কিন্তু তাঁর চলনভংগী আর পোষাকের সংগে আমাদের নিবিড় পরিচয়। বহুদুর থেকে এক নজর দেখেই বলে দিতে পারি যে তিনি যাচ্ছেন। রোজ দেখে দেখে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে এখন একদিন না দেখলেই আমাদের মন খুঁত খুঁত করে। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ খুঁজতে কত সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা করি আমরা। তাঁর সংগে আলাপ পরিচয় নেই কোনকালে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করি চব্বিশ ঘণ্টা।

কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপছোপ নেই সারা অংগে, দশজনের একজন। অতি সাধারণ সাদামাটা চেহারা ভদ্রলোকের। বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। রগের পাশের চুলে পাক ধরেছে। মাথায় দাক্ষিণাত্যের তট-ভূমির আকৃতিতে টাক। টিকালো নাক, চুপসান গাল, বর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে। চোখে কালো শেলের চশমা। ডানহাতে মোটা শিমলাই লাঠি, আর বাঁ'হাতে ঝুলানো কাপড়ের থলে। একদা থলের বর্ণ কি ছিল তা' গবেষণা সাপেক্ষ, কিন্তু এখন ময়লা বিবর্ণ হয়ে যা' হয়েছে তা'কে বর্ণ-বিজ্ঞানে বুঝানো যাবে না। পাটল! বলতে পারেন; পাঁশুটে—তাও বলতে পারেন। অতি সাবধানে ধীর পদক্ষেপে চলেন তিনি। আনত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। মাঝে মাঝে নুয়ে রাস্তা থেকে কি যেন কুড়িয়ে থলেতে রাখেন। দেখে মনে হয় যাবার পথে বুঝি কিছু হারিয়ে গিয়েছেন তাই এখন অতিক্রান্ত পথ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে চলেছেন তিনি।

প্রথম দিন আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু রোজ রোজ একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি দেখে দেখে সে ধারণা আর বজায় রাখা যায় না। তবে কি নুড়ি কুড়ান! হ'তে পারে, কিন্তু এ বয়েসে ও কাজটি তো জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে হ'লেই মানায় ভাল; রাজধানীর রাজপথে নয় নিশ্চয়ই। তবে কি পরশ পাথর! হ'বেও বা। কবিগুরুর কবিতা মনে পড়ে 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর। কিন্তু ভদ্রলোক লোহার শিকলিতে না ছুঁইয়ে যে ভাবে ঝুলিতে রাখছেন তা'তে পেলেও তো টের পাবেন না। মনে হ'ল ওঁর মাথায় ছিট আছে। শুধু আমি নই; দেখলাম এ সিদ্ধান্তে আরো অনেকেই পৌছেছেন।

ন'টা পঁচিশের বাস থেকে উদ্যোগ ভবনের ষ্টপেজে রোজই নামি আমরা অর্থাৎ আমি, আলোক, প্রবীর, আরও অনেকে। নেমেই তাঁকে দেখি। ঘাড় নুইয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন তিনি। কোনদিন পাশাপাশি, কোনদিন খানিকটা সামনে, কোনদিন বা আমাদের কিছু পেছনে। ইয়র্ক রোড পেরিয়ে থামেন এসে হেষ্টিংসের ক্রসিং-এ। ভাল করে দু'পাশ দেখে নিয়ে রাস্তা পার হ'ন তিনি। তারপর ডালহৌসী রোড ধরে চলতে থাকেন। মাঝপথে আমরা সেক্রেটারিয়েটে ঢুকে পড়ি। উনি আরও এগিয়ে যান।

ক্বচিৎ তাঁকে দেখতে না পেলে আমাদের সারা দিনটাই ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। কোন কাজে মন বসে না। একটা চিন্তা সারাক্ষণ মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে 'কি জানি কি হ'ল তাঁর'। তাই বাস থেকে নেমেই আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। দেখতে না পেলে অবাংগালীরা বলে, "উস্ পাগলা কা আজ ক্যা হো গিয়া, কহি ভি দিখাই নহী দেতা?" আমরা বলাবলি করি' "আজ যে পাগলটাকে দেখছি না, ব্যাপার কি?"

সেদিন আমাদের একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। বাসে বসেই কথা হ'চ্ছিল তাঁকে পাব কি না। নেমেই দেখি তিনি আমাদের আগে আগে চলেছেন। প্রবীর আমাকে ব'লল, "অজয়,তোমারঘড়িতেনা ন'টা পঁয়ত্রিশ বেজেছে বলেছিলে। এই বেলা ঘড়ি মিলিয়ে নাও।" ঠাট্টা ক'রল সে।

ভদ্রলোক যেন ক্রনোমিটার! তাঁকে দেখে যেন ঘড়ি মেলান যায়।

তা' বোধহয় যায়। উনি ক্রনোমিটার না হলেও খুব সময়নিষ্ঠ। যাকে বলে রিলিজিয়াসলি পাংচুয়াল।

আলোক এতক্ষণ তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এ'বার ব'লল, "জানিস অজয়, এঁর স্ত্রী নেই।"

আমি জবাব দিলাম, "তুমি কি ব'লতে চাও যে ইনি উদ্ভ্রান্ত প্রেমের মত একখানি বই লিখবার মালমশলা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে থলেতে পুরছেন?"

"আরে না।"

"তা'হলে কি করে বুঝলে?"

প্রবীর ব'লল, "আর গুলতানি করিস না। খবর পেয়েছিস্ নাকি কিছু, তাই বল?"

"না।"

আমরা দু'জনে একসংগে বলে উঠলাম, "তা'হলে?"

আলোক গম্ভীর হ'য়ে ব'লল, "বাই ডিডাক্‌শন্।"

"দুত্তোর, এ রকম একটা সিরিয়াস মেটারেও খালি ইয়াকি মারছিস। শালা শার্লক হোম্‌সের ভাই শ্রীয়ালোক হোমস্" ব'লল প্রবীর।

"সত্যি ব'লছি, নট্ এন্ আয়োটা অব্ ইয়াকি।"

প্রবীর ব'লল, "একেবারে সেন্টপার্সেন্ট আন্এডাল্টারেটেড্ ব্লাফ্।"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, একটুও ব্লাফ্ নয়। দেখছিস না ওর মোজা আর শার্টের কলার ছিঁড়ে গেছে। স্ত্রী জীবিত থাকলে কি আর সেলাই করে দিতেন না।"

আলোকের গবেষণা আর বেশীদূর এগোতে পারল না। অপর ফুটপাথ দিয়ে বইখাতা বগলে এক দংগল স্কুলের ছেলে আসছিল। তারা ওঁর কাছে এসেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—'ভ্যা।'

তিনি ওদের পানে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "ভ্যা ভ্যা করবে না বলেই তো এ'সব করছি। বাছাধনেরা এখন বুঝবে না। আরও বড় হও তখন বুঝবে।"

আলোক ব'লল, "বাই জোভ, কেল্লা মার্ দিয়া। ক্লু পেয়ে গেছি।"

ততক্ষণে আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে গিয়েছি। ওঁর অনুগমন না করে এ'বার আমরা অন্য পথ ধরব। আমরা দু'জনেই আলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "কি পেয়েছিস বল্?"

আলোক রহস্যময় হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের কৌতুহলকে উস্‌কে দিয়ে জবাব দিল, "এখন না, পরে ব'লব। তোরা অফিসে চলে যা; আমি একটু দেখে আসি।"

লাঞ্চের ছুটিতে টিফিন রুমে বসে চা খাচ্ছি। আলোক এসে আমাদের পাশে ব'সলো; ব'লল, "জোর খবর।"

আমরা তা'র পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে গা' ঘেঁষে আরও ঘন হ'য়ে বসলাম। আলোক হাত উঁচিয়ে বলল, "দিস্ ফার এ্যাণ্ড নো ফার্দার। মুখে এই ছিপি আঁটলাম। মস্ত ভারী স্কুপ। আগে চা—সিগ্রেট—পিলাও; তারপর ব'লব। মুফ্‌তে হবে না।"

প্রবীর সরবে জোর প্রতিবাদ কর'ল, ব'লল, "ইট ইজ বিট্রেয়াল, স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা।" কিন্তু গরজ বড় বালাই; তাই নিমরাজী হয়ে চায়ের অর্ডার দিল। আমি একটি সিগারেট বের করে দিয়ে বললাম, "এবার বল।"

আলোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরিয়ে বলল, "ভদ্রলোক ছাগল পুষেছেন।"

ইয়াকি শুনে রাগে আমার পা' থেকে তালু পর্যন্ত জলে গেল। ইচ্ছে হ'ল ঠাস্ করে ওর গালে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষি।

প্রবীর রেগে ব'লল, "তুত্তোর, কে তোর ছাগলের কেচ্ছা শুনতে চায়। আসল কথা বল।"

"আসল কথাই তো বলছি। ভদ্রলোক নির্ঘাৎ ছাগল পুষেছেন।"

আমি অধৈর্য হয়ে শুধাই, "এটাও তোর ডিডাক্‌শন্‌ নাকি?"

"আরে না, নিজে দেখে এলাম।" নির্বিকারে বলে আলোক।

"কি দেখে এলি? ছাগল?"

"না।"

এবার চটে উঠলো প্রবীর। ব'লল, "দূর ছাই! সব কিছুতেই তোর ঠাট্টা। কি দেখে এলি বল। তা' না; শুধু ব'লছে ছাগল—রামছাগল কোথাকার।"

আলোক প্রতিবাদ করে ব'লল, "সত্যি বলছি। উনি কলার খোসা কুড়িয়ে থলেতে রাখছেন দেখে এলাম।"

প্রবীর গর্জে উঠলো, "মিথ্যাবাদা উজবুক কাঁহাকার।"

আলোক ব'লল, "মাইরি বলছি, নিজের চোখে দেখে এলাম। এখন তুই বল; ছাগল না পুষলে ওগুলো দিয়ে উনি কি করবেন? ও তো আর খাবার জিনিস নয়? অবশ্য গরু মোষও পুষতে পারেন। কিন্তু রাস্তা থেকে খাবার কুড়িয়ে নিয়ে তো আর ওদের পেট ভরানো যাবে না।"

অকাট্য যুক্তি। এর পর আর কথা চলে না। আমরা আম্‌তা আম্‌তা করছিলাম। আলোক ব'লল, "নিশ্চয়ই ওঁর স্ত্রী বাতে ভুগছেন। উনি যে ভুগছেন না—তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। যে ভাবে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, শক্ত কাঠামো না হ'লে কবে পট করে ভেংগে পড়তেন। বাড়ীতে নিশ্চয়ই ছাগ-দুগ্ধের প্রয়োজন। নইলে দিল্লীতে দুধ যা' সস্তা, কে আর বাড়ীতে ছাগল রাখে বল। সরকারী কোয়ার্টারে ছাগল রাখাও তো চাটিখানি কথা নয়। পারমিশন নাও, হাংগাম-হুজ্জুৎ কর, গাঁটের কড়ি খরচ করে লাইসেন্স বানাও, খাওয়াও-দাওয়াও, দেখশোন, যত্ন আত্তি কর কত ঝক্কি। আবার ছেড়ে দিলে তো ঘরে না ফেরা পর্যন্ত আর বিশ্বাস নেই! বাইরে তো আর শত্রুর অভাব নেই। শিয়াল কুকুর, গাড়ীঘোড়া, মানুষ। এত কষ্ট সত্ত্বেও যে ছাগল পোষে তা'র প্রয়োজন গুরুতর না হয়ে যায় না।"

প্রবীর ব'লল, "রাখ বাবা তোর থিয়োরী। সকালে ব'ললি ওঁর স্ত্রী নেই। এখনও পুরো পাঁচ ঘণ্টা হয়নি বলছিস ওঁর স্ত্রী বাতে ভুগছেন। বিকেলে হয়ত বলবি ওঁর ছেলেপুলে হয়েছে তাই বাচ্চার দুধের জন্য ছাগল রেখেছেন।"

আলোক লাফিয়ে উঠে বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। এই কথাটি এতক্ষণ আমার মোটেই স্ট্রাইক করেনি। দি আইডিয়া; নির্ঘাৎ ভদ্রলোকের ছেলেপুলে হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। পরিমিত মাতৃদুগ্ধ হ'তে হয়ত শিশুটি বঞ্চিত। তাই ভদ্রলোককে এ বয়সে এত কষ্ট স্বীকার করেও ছাগ-পালন ক'রতে হচ্ছে। একমাত্র সন্তানের জন্যই মা-বাপ যে কোন কষ্ট হাসিমুখে স্বীকার করেন। সে তুলনায় একটা ছাগল রাখা তুচ্ছ। যাক্‌ এবার ডেফিনিট্‌লি বুঝা গেল ব্যাপারটা। একেবারে কিউ, ই, ডি।"

আমি বললাম, "এত চট করে ডেফিনিট হ'সনা আলোক। মত পাল্টাতে তোর দু'মিনিটও লাগে না। আজ রাতটা বরং চিন্তা করে দেখ।"

আলোক ব'লল, "ঠিক কথা, তা'হলে আর একটু ইন্‌ভেষ্টিগেট করে দেখি।"

পরের দিন সকালে অন্যদিনের চেয়ে আগেই এল আলোক; ব'লল, "চল আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।"

আমি বললাম, "আজ আলোক হোমস্‌-এর অনুসন্ধান পর্ব সুরু হবে মনে হচ্ছে। তা' ঠোঙ্গায় করে কি নিয়ে চলেছিস?"

"পরে দেখবি। এখন একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়। দয়া ক'রে তোর সওয়াল-জবাব এখন মুলতুবী রাখ; নইলে শেষে ঐ ন'টা পঁচিশের বাসই পাবি" ব'লল আলোক।

ন'টা পনেরর বাস থেকে আমরা নামলাম। আলোক তার ঠোঙ্গা থেকে কলা আর কমলার খোসা ওঁর পথের উপর ছড়িয়ে রাখলো।

প্রবীর ব'লল, "টোপ ফেললি?"

"হ্যাঁ; কিন্তু লক্ষ্য রাখিস গরুতে না খেয়ে যায়।"

আমরা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাঁর পানে চেয়ে আছি; কখন তিনি আসবেন। দশ

মিনিট পরে তিনি এলেন। আলোকের টোপ থেকে কলার খোসাগুলি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

"দেখলি ; ছাগল কি না!" খুসীতে ডগমগ হ'ল আলোক।

আমি সন্দেহাকুল হ'লাম ; বললাম, "শুধু কলার খোসা খায়, এ তোর কেমন ছাগল!"

সত্যি ; কমলার খোসাগুলি রাস্তায় পড়ে আছে তেমনি। একটাও উঠান নি তিনি। ছাগলের এত বাক—সে তো আগে কখনওশুনিনি! তা'হলে!

আলোক ব'লল, "ঠিক আছে, এবার বুঝেছি। ভদ্রলোক কবরেজী করেন। নিশ্চয়ই ছাগলাদ্য ঘৃত বানাবার ফিকিরে আছেন তিনি। কলার খোসায় বোধহয় ভিটামিন বেশী, তাই শুধু…।"

কথা শেষ করবার সুযোগ দিল না প্রবীর। বিরক্ত হয়ে ব'লল, "দুত্তোর উজবুক ; রেখেদে তোর আয়ুর্বেদ। কারণটা বের করতে পারছিস না, খালি নতুন নতুন থিয়োরী আওড়াচ্ছিস।"

আলোক লজ্জা পেল, ব'লল, "তোরা অফিসে চলে যা। আমি এর একটা সুরাহা না করে আজ আর ফিরছি না।"

সত্যি, রহস্যটা আমাদের পেয়ে বসেছে। এর মীমাংসা না করে আর স্বস্তি নেই। ভদ্রলোকের পরিচিত এমন একজন লোকও পাচ্ছিলাম না, যা'র কাছ থেকে ব্যাপারটি জেনে নিতে পারি। আমাদের জ্বালিয়ে মারবার জন্যই যেন তিনি নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব হয়ে জন্মেছেন। নইলে এ বয়েসে লোক স্বভাবতই একটু বাক্‌বিলাসী হয়। তাঁর তো মুখে কুলুপ এটে বসে থাকে না। বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের সংখ্যাও একটু বাড়ে। কিন্তু আমাদের বরাতে সব উল্টো। পঞ্চাশ বছরের পলিত-কেশ বৃদ্ধ গোপনতাপ্রিয়, স্বল্পবাক্ ; কোট-প্যান্ট-পরা রীতিমত রেসপেক্‌টেবল্ জেন্টল্‌ম্যান রাস্তা থেকে ছোটলোকদের মত ফলের খোসা কুড়ান। অবিশ্বাস্য—কিন্তু তবুও নিত্য আমাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান তিনি।

দুপুরে টিফিন রুমে আলোক এল। চেয়ার টেনে আমাদের পাশে বসে পড়ে হতাশ হ'য়ে ব'লল, "না ; এ রহস্য দুর্ভেদ্য।"

আমরা কৌতূহলে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তা'র উপর। আলোক এই প্রথম অতি প্রাঞ্জল ভাষায় নিজের পরাজয় স্বীকার ক'রল, ব'লল, "কোন সুরাহাই করতে পারলাম না। যত সব উদ্ভট খেয়াল।"

আমরা দু'জনেই একসংগে বলে উঠলাম, "কি জেনেছিস আগে তাই বল।"

আলোক নিস্পৃহ কণ্ঠে ব'লল, "জানব আর কি! আমার অনর্থক ঘোরাটাই সার হ'ল। উনি প্রথম যে ডাস্টবিন পেলেন তা'র মাঝেই থলে উজাড় করে সমস্ত জঞ্জাল ঢেলে দিয়ে দিব্বি গট্ গট্ করে নেভাল হেড কোয়ার্টার্স-এ ঢুকে গেলেন। বুঝলাম তিনি ওখানে কাজ করেন, কিন্তু এতে আমাদের কী লাভটা হ'ল শুনি?"

সত্যিই তো। আমরা চমকপ্রদ কোন কাহিনীর উদ্‌ঘাটন আশা করেছিলাম ; প্রতীক্ষা করছিলাম কোন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের। কিন্তু এই পর্বতপ্রমাণ সম্ভাবনা থেকে যা' বেরুল তা একটা মূষিক মাত্র। এতে কার না মন-মেজাজ বিগড়ে যায়? এর চেয়ে যদি তিনি বামাল দশ বিশ ক্রোশ পথ পরিক্রমা করতেন কিম্বা হারিয়ে যেতেন আলোকের দৃষ্টিপথ থেকে, তা'হলেই যেন আমরা বেশী খুশী হ'তাম। কিন্তু আমাদের হতাশ করলেন তিনি আর আলোককে বানালেন বেকুব।

আমি বললাম, "আলোক, তা'হলে তোমার ছাগলের থিয়োরী আর টিঁকল না।"

আমসির মত মুখ করে আলোক ব'লল, "না, টিঁকল নাইতো দেখছি। দূর ছাই ; মিছিমিছি এক পাগলের পেছনে ঘুরে ঘুরে সারা সকালটা মাটি করলাম।"

যথাপূর্বং তথা পরম্। আবার সেই পাগলের থিয়োরীতে ফিরে এল আলোক। কিন্তু এ কি রকম পাগল! দিব্বি সরকারী চাকুরী করে চলেছেন তিনি। আমরা তিনজনেই ঠিক করলাম ওঁর কথা আর মোটেই ভাবব না ; শেষে আমাদেরই পাগল করে দেবেন উনি। কিন্তু রোজই তাঁকে দেখি, আর রোজই তাঁকে নিয়ে খানিকটা আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে।

এভাবেই হপ্তা তিনেক চলল। তারপর একদিন আমরা যথারীতি বাস্ থেকে নেমেছি ; পেছন থেকে কে যেন বলল, 'নমস্কার।' কে কাকে নমস্কার জানালো ঠিক

বুঝা গেল না। আমরা পিছন ফিরে তাকালাম। অভিবাদন যথাস্থানে পৌছায়নি দেখে আমাদের এক সহযাত্রী আবার বললেন, "নমস্কার ব্রজবাবু।"

আমাদের রহস্যলোকের নায়ক সেই ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর প্রসন্ন হাস্যে বললেন, "আরে; বিপিন যে! ভাল আছ তো। আজকাল তো লোদী রোডেই আছ। কেমন লাগছে নতুন বাড়ী ?"

বিপিনবাবু বললেন, "হাঁা, ভালই। তারপর, আপনাদের বাড়ীর সব খবর ভাল তো ?"

"ভাল আর কোথায়। ছেলেটা এখনও সারলো না; এদিকে ছোট নাতিটাও আবার জ্বরে ভুগছে। যেও একদিন আমার ওখানে।" ব্রজবাবু সাদর আহ্বান জানান।

এঁরা দু'জন পরস্পরের খবর লেন-দেন করতে করতে এগিয়ে গেলেন।

যাক্ বাঁচা গেল। এতদিনে তবুও জানা গেল যে ভদ্রলোকের একটা নাম আছে। নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করছেন তিনি; অসুখ-বিসুখ হ'লে চিন্তিত হ'ন, সামাজিকতা, লৌকিকতা করেন; হেসে দু'দণ্ড কথা বলতেও জানেন। একেবারে নির্বান্ধব, পাষাণপ্রাণ মেসিন ন'ন; আমাদের মতই হাড়ে-মাংসে, সুখে-দুঃখে মেশান মানুষ তিনি।

প্রবীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আলোক, তোর পাগলের থিয়োরীও ফেল মারল। এখন ঐ বিপিনবাবুই ভরসা! ওঁকে ধরে যদি ব্যাপারটি জানা যায়।"

কিন্তু আমাদের ভাগ্য দোষে বিপিনবাবু গিয়ে ঢুকলেন আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সে। পরস্পর অপরিচিত তিন পক্ষ তিন বিভিন্ন অফিসে থেকে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হ'ল তাকে পরিচয়ের নিবিড়তা দিয়ে সরল করে নেয়া বড় সহজ ছিল না। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'ল এর জন্য। পরবর্তী সাতদিন আমরা ইচ্ছে করেই বিপিনবাবুর সংগে এক বাসে এলাম। এ কদিন রোজই আগে ভাগে বাসে চড়ে তাঁর জন্য জায়গা রেখেছি; আমাদের পাড়ায় নতুন বাসিন্দা জেনে তাঁর সুবিধা অসুবিধার খোঁজ-খবর নিয়েছি। অল্প-স্বল্প আলাপ আলোচনা করে মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছি তাঁর। কিন্তু আসল কথা পাড়বার মওকা আর পাই না। শেষে যা থাকে কপালে বলে একদিন জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

ব্রজবাবু সেদিন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পানে আংগুল দেখিয়ে বললাম, "ঐ আপনার ব্রজবাবু যাচ্ছেন না ?"

বিপিনবাবু ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "ব্রজবাবু বলেই তো মনে হচ্ছে। আপনিও জানেন বুঝি ওঁকে? তা জানবেনই তো। এ রকম পরোপকারী মানুষ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ভদ্রলোক বড় ভাল মানুষ; নমস্য ব্যক্তি।"

আমি বললাম, "না, না; সে রকম কোন পরিচয় নেই। রোজই দেখা হয় তাই মুখচেনা আর কি।"

প্রবীর মনে মনে ভাবল 'আ মলো যা, ওর পরোপকারের ফিরিস্তি কে শুনতে চাইছে।' কিন্তু প্রকাশ্যে বলল, "উনি যেন রাস্তা থেকে কি কুড়ান মনে হ'ল ?" রেখে-ঢেকে নয়; একেবারে সরাসরি প্রশ্ন শুধায় প্রবীর।

বিপিনবাবু মৃদু হেসে বললেন, "হাঁা, কলার খোসা; কিন্তু আপনাদেরও নজর এড়ায়নি দেখছি।"

"ছাগল পুষেছেন নাকি উনি ?" একেবারে সংশয়হীন বেপরোয়া প্রশ্ন করে আলোক। ভব্যতার ধারে কাছে ঘেঁষে না সে।

বিপিনবাবু হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন, "আরে না না; ছাগল-টাগল নয়। সে একেবারে অন্য ব্যাপার। বড় করুণ কাহিনী।"

সুতরাং কাহিনীর জন্য তাঁকে সকলে মিলে চেপে ধরলাম।

বিপিনবাবু বললেন, "কাহিনী সামান্যই। ব্রজবাবুর ছোট ছেলে বসন্তকে নিয়ে। বছরখানেক আগের ঘটনা। ছেলে তখন বি-এ ক্লাসে পড়ে। এক সন্ধ্যায় খেলার মাঠ থেকে ফিরছিল সে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে গিয়েছে এমন সময় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এল। ছেলে ভাবল জোর বৃষ্টি নামবার আগে সে দৌড়ে বাড়ী পৌছে যাবে। কিন্তু দৌড়াতে গিয়েই ফ্যাসাদ। কলার খোসায় পা পিছলে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'ল বসন্ত। রাস্তার লোকরা তাকে ধরাধরি করে বাড়ী পৌছে দিল। ডাক্তার এসে বললেন, 'এখনি হাসপাতালে নিয়ে যান।' হাসপাতালে

এক্স-রে হ'ল। সেরা অরথোপেডিষ্ট দেখে বললেন, 'ডান পায়ের হাড় ভেংগেছে—বড় বিশ্রী ভাবেই ভেংগেছে। এ সারানো প্লাষ্টারের কর্ম নয়। Open-up করে এর হাড়ে পেরেক ঠুকতে হবে।' বিশেষজ্ঞের মত, সুতরাং তাই করা হ'ল। ছেলে অবশ্য সুস্থ হয়েছে, কিন্তু স্বাভাবিক আর কর্মক্ষম হ'তে পারেনি এখনও ; আর বোধহয় পারবেও না কোন দিন। ব্রজবাবু তাই এখন রাস্তা-ঘাটে কলার খোসা দেখলেই তা কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দেন। বলা যায় কি, আর কেউ যদি পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাংগে! আর কোন মা-বাপের যদি ভাংগে কপাল!"

কাহিনী শেষ করে বিপিনবাবু আমাদের পানে চোখ তুলে তাকালেন। আমাদের চোখ তখন লজ্জায় মাটিতে নিবদ্ধ। ওঁর পানে চেয়ে দেখবার সাহসটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। কোন মতে আত্মগোপন করতে পারলেই যেন বাঁচি। আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আত্ম-ধিক্কারে নিজেদের একটানা ছি ছি করলাম মনে মনে। যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য আমাদের অনুক্ষণ নাজেহাল করছিল তার সমাধান হ'ল এতদিনে। কিন্তু এ তো সমাধান নয় ; এ যেন চাবুক। সমাজে চলতি মূল্যমান দিয়ে আমরা এতদিন যাঁকে তুচ্ছ অবজ্ঞেয় সাব্যস্ত করেছিলাম তাঁরই মমতা ও মনুষ্যত্ববোধের কাছে আমরা হীন অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলাম! আমাদের আত্মম্ভরিতার ভুয়ো দম্ভ ঐ চাবুকের একটি ঘায়ে খান্ খান্ হয়ে ভেংগে পড়ল। লজ্জায় আমরা নির্বাক নীল হয়ে গেলাম।

প্রত্যাশা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

দস্যু দশগ্রীব এসে বণিকের বেশে
বিষপাত্র মুখে ধরি সুপ্তির গভীর ঘোরে
ভুলায়ে কোন্ মোহিনী মায়ায়
রেখেছিল রাজকন্যায়
নেশায় বিভোর করে।
অর্দ্ধশত কোটি জনতার আকুল আগ্রহ
আর ভীম ঐক্য রবে
ভেঙে গেছে মোহ ঘুম
কেটে গেছে ঘোর।
জাগ্রত আঁখি মেলি
হেরে ছবি বাস্তব জীবনের রক্তের দর্পণে—
আর শোনে নবজীবনের উচ্ছ্বসিত গান।

উত্তাল তরঙ্গ বেগে ভেসে আসে তার প্রতিধ্বনি
উত্তর বায়ুর সাথে
স্বর্ণপ্রসু মহাভূমির লুণ্ঠিত এই
রিক্ত নিঃস্ব তীরে।

অধীর উন্মুখ চেয়ে আছি
হিমালয় শৈল শৃঙ্গপানে
গভীর প্রত্যাশায়—
উৎকর্ণ সেই বাণী লাগি
চীনের প্রাচীর ভাঙি
কবে হবে স্পষ্ট হতে আরো স্পষ্টতর।

বিফলতার ব্যর্থ মনোরথে
ফিরে গেছে রাজা ছেড়ে দূর দ্বীপান্তরে।
জনতার বিপুল বিক্রমে
আতঙ্কিত ভীত ত্রস্ত
শ্রেষ্ঠী বেশী দস্যু দশানন।
ছলনার ছলাকলা
সকলই বিফল হল।
ফোঁসে আর গর্জ্জে শুধু
নিষ্ফল আক্রোশে
লোলচর্ম্ম দন্তহীন শ্বাপদের মত।

সাগরিকা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ পূততুণ্ড

মানব মনের চিরন্তন প্রকৃতিই হোলো পার্থিব জগতে চির অধিষ্ঠিত হয়ে থাকা। মানুষের আশা, মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ভাব ভালবাসা পৃথিবীতে জাগরূক থাকতে চায় অনাদিকালের জন্যে। আর এই আশা-আকাঙ্ক্ষাই যুগে যুগে মানব-মনে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে এই পৃথিবীতে। আদিম যুগ থেকেই মানব-মানবীর প্রেম-প্রীতি ভালবাসা কল্পনা ও ঐশ্বর্য যুগ থেকে যুগান্তরে প্রভাবিত হয়ে আজিও চিরনূতনরূপেই জগতে জাগরূক হয়ে আছে। প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে যে অনাবিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সাক্ষ্য আজিও পৃথিবীর বহু স্থানে কীর্তিত হয়ে আছে। প্রত্যেকটি জাতিই চায় তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে জাগরূক রাখতে—তার আগামীদিনের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে নবতর সফলতার উদ্দেশ্যে,—এই উদ্দেশ্যেই জাতি করে প্রাচীনের গুণ গান। কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সাগরিকা'র মাধ্যমে তাই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিকটি আমাদের দিকে তুলে ধরে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর সৃজেপনার ভিতর দিয়ে আমরা তাঁর মনোময় সত্যময় অন্তর্জগতের পরিচয়ই পাই। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হয়েও বিশ্বের, ভারতবাসী হয়েও বিশ্বেরই অধিবাসী—বিশ্বের মানবাত্মার সাথেই যেন তাঁর সংযোগ। তিনি তো নিজেই বলেছেন—

"দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।"

বাস্তবের আহ্বানে তিনি যে একদিন তাঁর এই দেশে দেশে 'ঘর' খোঁজার আহ্বানে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়কার একটি দিনের কবি-কল্পলোকের কবির অন্তর্জগতের একটি ক্ষুদ্র ফলপ্রসূ কবিতা এই 'সাগরিকা' কবিতাটি।

সাগরিকা—সাগরকন্যা,বাস্তব জগতের বলিদ্বীপেরই কবি-কল্পলোকের নামান্তর। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বলিদ্বীপ কবি কল্পনায় এক অমেয় রূপলাবণ্যের আধার লাস্যময়ী নারীরূপেই প্রতিভাত। এই বলিদ্বীপের সাথেই ভারতের সংযোগ যুগ যুগান্তের। এক কালের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ বর্তমানের কবিকে বর্তমানের সংযোগের ক্ষীয়মাণতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেন ইঙ্গিতে অস্পষ্ট আভাসে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে—নতুন করে গড়ে তুলতে বিশ্ব জগতের সাথে ভারতের পুনঃ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংযোগ, ছড়িয়ে দিতে বিশ্ব জগতের সভায় ভারতের গৌরবময় কৃষ্টি শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য মাধুর্যময় অনাবিল চিরশান্তির বাণী। কবি তাই প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই বর্তমানের কথা মনে রেখেই লাস্যময়ী নারীকে প্রশ্ন করেছেন—

"এনেছি শুধু বীণা
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?"

একটি ঐতিহাসিক সত্য আত্মগোপন করে আছে কবির এই 'সাগরিকা' কল্পনার পশ্চাতে। যুগে যুগে ভারতের সংস্কৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলীতে প্রসৃত হয়েছিল। কবি কল্পনা করেছেন তিনি ভারত মহাসাগরের বালিদ্বীপে বিংশ শতকের সংস্কৃতির শেষ দূত। তিনি নিজেকেই বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপেই কল্পনা করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মূর্তিতে তিনি দ্বীপবালা সাগরিকার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। এর ফলেই গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। একটা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে জ্ঞানে শিল্পকলায় বিভূষিত করে তুলেছে ভারত দ্বীপবাসী বালিকে—একটা চিরন্তন আত্মিক সম্পর্ক স্থির হয়ে গেছে তাদের মধ্যে।

প্রেমে মাতোয়ারা রোমান্টিক কবি একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অন্তরালে একটি প্রেমের ছবিই অঙ্কন করেছেন। কবি-কল্পনায় একটি জড়-ভূমিখণ্ড প্রাণময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে কবির সাথে প্রেমে বিভোর হয়েছে—এ প্রেম বিশ্বপ্রেম—এ প্রেম অনন্ত সৌন্দর্য ও চিরন্তন মাধুর্যের আধার। সাগরিকা নারী—সে প্রেমিকা, আর কবি প্রেমিক। প্রেমিকার হৃদয় জয়ের গূঢ়তর কথাই কবি বলেছেন এখানে। 'ধরণীর চির-যৌবনা মূর্তি সমুদ্রোত্থিতা সাগরকন্যা কবির জন্ম-জন্মান্তরের প্রণয়াস্পদা 'সাগরিকা'। সমুদ্রস্নাতা সাগরিকা জলসিক্ত এলোচুলে উপকূলের শিলাময় তটে উপবিষ্টা। পীতবর্ণের বালুকাকীর্ণ সৈকত যেন দ্বীপবালার বিস্রস্ত বসন-শিথিল প্রান্তের মতই 'লুটায় চারিপাশ।' বক্ষোদেশ তার 'নিরাবরণ', দেহখানি তার 'নিরাভরণ।' এ যেন এক আদিম নারী, কৃত্রিম সাজসজ্জায় অনভিজ্ঞা। উষার রক্তিম রশ্মিমালা যেন স্বভাবসুন্দর অনাবৃত অঙ্গখানিকে অনির্বচনীয় প্রসাধনে অপরূপ রূপসৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। দ্বীপবালা সাগরিকার চক্ষু-বিনোদন রূপসৌন্দর্য আকর্ষণ করলো ভারতীয় অভিযাত্রীকে। রাজবেশী কবি-প্রেমের আকর্ষণে উপস্থিত হলেন 'সাগরিকা'র দ্বারে। আচমকা রাজবেশী পুরুষ দেখে শংকায় সংশয়ে সাগরিকা দোদুল্যমানা হয়। ধীরে ধীরে যখন তার কাছে প্রতিভাত হয় ভারতীয় আত্মার চিরকল্যাণময়, চিরসুন্দরময় প্রেমস্নিগ্ধ স্বরূপটি, তখনই সে ধরা দেয়, তখনই সে করে আত্মসমর্পণ—তখন থেকেই শুরু হয় আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন। অধ্যাত্মব্রতী ভারত তাকে দীক্ষা দেয় শৈব ধর্মে। দেব দেউল গড়ে উঠে ধীরে ধীরে—ভারত ও বালি নটরাজের পূজায় করে মন প্রাণ সমর্পণ। অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সাগরিকার মানস।

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" ও সন্ত্রাসবাদ

...বা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

বাঙলার সন্ত্রাসবাদের প্রতিবাদে "চার অধ্যায়" উপন্যাসখানি লিখে এককালে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথকে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেদিন তাঁর স্বদেশবাসী অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁর অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যেও কেউ কেউ হয়েছিলেন বিস্ময়বিমূঢ়, কেউ বা হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। আবার কেউ কেউ সংশয়াকুলচিত্তে তাঁর খাঁটি নির্ভেজাল দেশাত্মবোধকেও সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর পাঠক-সমাজের একশ্রেণী তাঁর তীব্র নিন্দায় মুখর হয়ে উঠে সেদিন তাঁকে 'দেশদ্রোহী' অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। তাঁর "বারো আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত," একথা রবীন্দ্রনাথের নিজেরও অবিদিত ছিল না। তিনি জানতেন যে এই "নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন।" তাই তারা পাত্রাপাত্র বিচার করবার প্রয়োজন দেখে না—নিন্দাপরিবেশনেই তাদের আনন্দ। কিন্তু রাজরোষ অথবা নিন্দার ভয়ে নির্ভীক কবি কোনও দিনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বা সত্যভাষণে ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজেই বলেছেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

তাই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর অমানুষিক হত্যালীলার সুতীব্র প্রতিবাদ-কল্পে ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত পরম সম্মানসূচক খেতাব—"নাইটহুড"—প্রত্যাখ্যান করে তখনকার বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে কবি যে চিঠি-খানি লিখেছিলেন তাতেই রয়ে গেছে তাঁর সুগভীর দেশাত্মবোধের এবং অন্যায়ের প্রতি অপরিমেয় ঘৃণার অম্লান স্বাক্ষর। দেশের অপমান ও অগৌরবে তিনি চিরদিনই অপমান ও অগৌরব বোধ করেছেন। দেশ-বাসীর সেদিনকার সেই পুঞ্জীভূত বেদনা ও অপমানের গ্লানি বাঙলার কবি নিজ বেদনাহত চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করেই ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উচ্চ সম্মান ধূলিসাৎ করে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লিখেছিলেন—"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings." বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে কবির রচিত বহু স্বদেশী সংগীত দেশবাসীর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিল অসীম উদ্দীপনা এবং যুগিয়েছিল অন্তহীন কর্মপ্রেরণা। সেদিন দেশ প্রেমে মত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগণিত স্বদেশবাসীর সুরে সুর মিলিয়ে মুক্তকণ্ঠে গেয়েছিলেন—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী,' 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান' ইত্যাদি। শ্রীঅরবিন্দের দেশের জন্যে কারাবরণে কবি তাঁকে তাঁর নিজ অন্তরের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে লিখেছিলেন—

"দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

"চার অধ্যায়" উপন্যাসখানিতে সেই রবীন্দ্রনাথই যখন বাঙলার সন্ত্রাস-বাদের তীব্র নিন্দায় তাঁর লেখনী উদ্যত করলেন, তখন তাঁর দেশের লোক তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষণাকে সন্দেহ করলো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। কবিগুরু রচিত তখনকার অনেকগুলি সুপরিচিত স্বদেশী গানই সেই আন্দোলনে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু ক্রমেই যখন প্রমত্ত স্বাদেশিকতার কুশ্রী নগ্ন রূপটি প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো, কবির মন সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলো। বৈধ আন্দোলনের পথ ছেড়ে সেদিন তাঁর দেশবাসী যে ধ্বংসাত্মক পন্থা বেছে নিয়েছিল তাতে তাঁর সৃষ্টিধর্মী ন্যায়-নিষ্ঠ, ভদ্র মন সায় দেয়নি। "চার অধ্যায়" উপন্যাসখানির রবীন্দ্রনাথের স্বলিখিত মুখবন্ধেই এর কতকটা আভাস পাওয়া যায় এবং এই বইখানি লিখবার তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যও বিশেষভাবে সূচিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একসময়ে বোলপুর শান্তিনিকেতনে কবি প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। উপাধ্যায় মশায়ের মধ্যে এক ত্যাগী, নির্ভীক, তেজস্বী রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীর অপূর্ব সাহস, আত্ম-ত্যাগ ও আদর্শ নিষ্ঠার এবং এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের অসামান্য পাণ্ডিত্যের ও বৈদগ্ধের অদ্ভুত সমন্বয় সংঘটিত হয়েছিল। এঁর প্রতিভা ও অধ্যাত্মবিদ্যায় নিষ্ঠা কবিবরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন যখন উন্মাদনার চরমে পৌঁছেছিল তখন এই কর্মবীর সন্ন্যাসীও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত "সন্ধ্যা" কাগজখানিতে তাঁর জ্বালাময়ী বাণী প্রদীপ্ত দীপশিখার মতোই তখনকার বাঙলাদেশের লোকের মনে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এই

"সন্ধ্যা" কাগজেই স্বদেশী আন্দোলনের এই সংকটপূর্ণ, বিভীষিকাময় রূপটির সূচনা দেখে কবি আতংকিত হয়েছিলেন। দেশময় নানা উৎপাত উপদ্রবের সংবাদে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত যখন অত্যন্ত পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁর কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে উপাধ্যায় মশায়ের আবির্ভাব। সেদিন অনেক পুরোনো কথা ও নানা প্রসংগ আলোচনান্তে বিদায় নেবার ঠিক পরমুহূর্তেই একবার ফিরে চৌকাঠের কাছ থেকেই কবির উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—"রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" তাঁর সেদিনকার এই কথা ক'টির মধ্যেই তাঁর মর্মন্তুদ বেদনার যে করুণ সুরটি বেজেছিল তাতেই রবীন্দ্রনাথ গভীর মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝলেন এই আদর্শনিষ্ঠ মানুষটি নিজ কর্মজালে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন যে তা থেকে এখন মুক্তি পাওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়—যদিও নিজের ভুল বুঝতে তাঁর বাকী নেই। "চার অধ্যায়" উপন্যাস খানিতে বোধ হয় কবি আদর্শবাদী বিপ্লবী অতীনের মুখ দিয়েই আদর্শভ্রষ্ট সন্ত্রাসবাদীর নিষ্ফল ব্যর্থতার এই সকরুণ কাহিনীটিই বিশেষভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তার কথাগুলির মধ্যে আমরা যেন কবির নিজ মতামতেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive resistance) ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত গান্ধীজীকে লিখিত তাঁর একখানি পত্র থেকেই বেশ ভালো করে বোঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন—"I have always felt and said accordingly that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it. And India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule her by their right of conquest······ Armed with her utter faith in goodness she must stand unabashed before the arrogance that scoffs at the power of spirit." "চার অধ্যায়" এ অতীনের মুখ দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই যেন বলছেন—অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায়ের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়, মানুষের পাশবিক বল তার আত্মিক বলের কাছে একদিন না একদিন পরাভব মানতে বাধ্য হবেই। আশাভংগের অপরিসীম গ্লানিতে অতীনের চিত্ত যখন নিদারুণ পীড়িত ও ব্যথিত তখন সে তাই এলাকে বলছে—"দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্প অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এত বড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হোলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এত বড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন?"

"চার অধ্যায়" এ ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী নেতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য নেতার মতোই ইন্দ্রনাথের মনের গহনেও রয়েছে দুর্জয় নেতৃত্ব-স্পৃহা—নিজেকে বড়ো প্রতিপন্ন করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অফুরন্ত প্রয়াস—উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ যাই হোক না কেন। সুশ্রী চেহারা, সুকঠিন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব, এবং অন্যান্য যা যা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থাকলে মানুষ নেতা হয়ে উঠতে পারে ইন্দ্রনাথের তা সবই আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—"ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ-শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজা-ঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না, কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু ভোলে না এবং অতিক্রমও করে ন······দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবী সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবী সহজে অগ্রাহ্য হবে না।" নেতা হবার তার যে যথেষ্ট যোগ্যতা আছে সে কথা ইন্দ্রনাথ নিজেও বিলক্ষণ জানে। তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার আকর্ষণে কতো লোক এসে তার চারপাশে জুটেছে! সে ডাকতে জানে বলেই কতো মানুষের মতো মানুষ মরণ-পণে তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। মানুষ নিয়েই নিত্য চলেছে তার "রসায়নের সাধনা।" কতো মানুষকেই যে সে রসিয়ে তুলেছে তার ঠিকানা নেই। হারজিতের প্রশ্ন তার মনে জাগেই না। তার মনে অন্ধ বিশ্বাসেরও কোনও স্থান নেই। সে জানে সে এক বিরাট কর্মক্ষেত্রের সর্বময় কর্তা—অধিনায়ক। যে "ঐতিহাসিক মহাকাব্যে"র নায়ক সে, তার পরিসমাপ্তি যদি শেষ পর্যন্ত পরাভবেই ঘটে, তাতেও তার কিছুমাত্র লজ্জা, গ্লানি বা পরিতাপ নেই। এই 'গোলামি-চাপা' 'খর্ব মনুষ্য-ত্বর' দেশে সে নায়কের মুকুট মাথায় পরে মরার মতোই মরবে। একদিন যারা তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে তাকে ছোট করতে চেয়েছিল, তাদের কাছে সে মরেই আজ প্রমাণ করবে সে কতো বড়ো। তার হারজিত দুইই সমান বড়ো। সমস্ত ইউরোপ ঘুরে ইংরেজকে সে যতোটুকু জেনেছে তাতে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে সমস্ত পশ্চিমী জাতের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়ো। রিপুর তাড়নায় এরা কখনও মারলেও এরা পুরোপুরি নীচ বা ছোট হতে পারে না। তাতে এদের কোথায় যেন লজ্জা ও সংকোচে বাধে। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদের কাছে জবাবদিহি করতেই ওরা সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। তাই ইংরেজদের উপরে ইন্দ্রনাথের রাগ ও বিদ্বেষ 'ফুল স্টীম' বানাবার মতো যথেষ্ট প্রবল নয়। এদের সংগে বিরোধিতা করলেও সে অন্তরে এদের শ্রদ্ধাই করে। অসীম ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ সরকার মারের চোটে অনায়াসেই দেশের লোকের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু ওদের কিছুটা মনুষ্যত্ববোধ আছে বলেই ও কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব হয়

নি। এ কথা ইন্দ্রনাথ খুব ভালো করে জানে বলেই সে ওদের শ্রদ্ধা না করে পারে না। এখন পরের দেশ শাসন করতে করতেই ওদের মনুষ্যত্ব ক্ষয়িত হচ্ছে এবং ওদের স্বভাবেরও বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু তবু ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতেই ইন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেহেতু বিদেশী শাসন "স্বভাববিরুদ্ধ"। এই অস্বাভাবিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে সে নিজ "মানব স্বভাব"কেই বিশেষভাবে ঘোষণা করছে। এই হলো তার বিপ্লববাদ বা সন্ত্রাসবাদের মূলকথা। জয় বা সফলতা লাভের কোনও সুনিশ্চিত আশা যে সে মনে মনে পোষণ করে তা নয়। কিন্তু তবু সে এগিয়েই চলবে। পরাজয়ের আশংকা আছে জেনেও সে নিজ আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে অসমসাহসে সেই ভয়কে শেষ পর্যন্ত জয় করবেই। এই কাজকেই সে তার শেষ কর্তব্য বলে মনে করে। ইন্দ্রনাথের মানুষ চিনবার ক্ষমতাটিও অসাধারণ। কার দ্বারা কোন্ কাজ হওয়া সম্ভব, তা বুঝতেও তার দেরী হয় না। অতীনের প্রতি তার এতো ঔৎসুক্য, কারণ সে বুঝেছে যে ওর (অতীনের) মধ্যে 'বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে' এবং ও যে এলার টানেই দলে ভর্তি হয়েছে, এ কথাও সে জানে। ইন্দ্রনাথের দলে মেয়ে পুরুষ কেউই বর্জনীয় নয়। সে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসীও নয়। কাঞ্চনের প্রয়োজন হলে সে কাঞ্চনকেই চেয়েছে। আবার যেখানে কামিনীর প্রয়োজন সেখানে সে তাকেই বেদীতে বসিয়েছে। স্ত্রীপুরুষের মিলনে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে তাও তার অজানা নয়। সে আগুনকে ভয় করে না বলেই তো সে তার যথার্থ সদ্ব্যবহার জানে। তার 'অগ্নিকাণ্ড' সারা দেশ জুড়ে। নেবানো মন দিয়ে যে আগুন জ্বালানো কখনও সম্ভব নয়, এ কথাও সে জানে। "প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে ভস্মকুণ্ডে, সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না," এও তার জানা আছে। সেইজন্যেই তার দলের কোনও "অগ্নিউপাসক" যদি অনবধানতাবশতঃই নিজেদের মধ্যে 'অগ্নিকাণ্ড' বাধাতে বসে, তাকে সরিয়ে দিতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। আগুন নিয়েই তো সৃষ্টিকর্তার খেলা। ইন্দ্রনাথ তাই দেশের স্বাধীনতা-সৃষ্টির কাজেও আগুনকে বাদ দিতে চায় না। সে জানে দেশ শুধু "বৃদ্ধ শিশু"দেরই মা নয়—সে "অর্ধনারীশ্বর" এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনেই তার কাজ সুসম্পন্ন হবে। এই হলো বিপ্লবী নেতা ইন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এবং তার কাজের কলাকৌশল। এই ছকেই তার কর্ম্মপদ্ধতি মোটামুটি বাঁধা। তার কাছে দলীয় স্বার্থই সবচেয়ে বড়ো। তার পায়েই সে স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, বিবেক, যুক্তি, বিচার সব কিছুই বলি দিয়েছে। দলের নীতি সকলের মত। কোনও অবস্থায়ই দলের অমোঘ অলঙ্ঘনীয় নিয়মকে কেউ ভাঙতে পারবে না। নেতার আদেশ নির্বিচারে সকলকেই পালন করতে হবে, এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েই সবাই দলে ভর্তি হয়েছে।

এলা অপূর্ব সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, অবিবাহিতা এবং মাতৃপিতৃহীনা। বিবাহের প্রতি 'বিমুখতা' কতকটা যেন তার "সংস্কারগত"ই। পিতার মৃত্যুর পর সে যখন তার কাকার সংসারে বাস করতে এল, তার কাকীমা মাধবী তখন তার বিয়ের চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ তাঁর নিজের কন্যাটিও প্রায় বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিবাহে এলার ঘোরতর আপত্তি দেখা গেল। তাঁর স্নেহশীল কাকা সুরেশ তাঁর ভাইঝির 'একগুঁয়ে' অবিবেচনায় চিন্তিত হয়ে উঠলেন, আর তার কাকীমা হয়ে পড়লেন অসহিষ্ণু। এলা বুঝলো—সে তার কাকার 'স্নেহের সংগে' তাঁর 'সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে'। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে ইন্দ্রনাথের সংগে তার দেখা। এলাকে দেখেই ইন্দ্রনাথ বুঝলো এর দ্বারা তার কার্যসিদ্ধ হতে পারে। তাই এলা যখন তার কাছে একটি কাজ প্রার্থনা করলো—সে তাকে বললো, সে তাকে দেখেই চিনেছে যে সে "নবযুগের দূতী" এবং সে "দেশের—সমাজের নয়"। ইন্দ্রনাথ এলার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করলো যে সে কখনও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে না। কয়েক বছর ধরে এলা পরম উৎসাহে খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই দলের প্রত্যেকটি কাজ করে যেতে লাগলো। এমন সময়ে একদিন মোকামাঘাটে ষ্টীমারে খেয়া পার হতে গিয়ে অতীনের সংগে তার দেখা হল। তাকে দেখবামাত্রই সে তার প্রতি 'আকৃষ্ট হল। কিন্তু তার আগেই এলা নিজেকে দেশের কাজে একান্তভাবে সঁপে দিয়েছে—সে দেশের কাছেই "বাগদত্তা"। সে তো তাই তার নিজের জন্যে কিছু রাখতে পারে না। তার সব কিছুই যে দেশকে নিবেদন করে দিতে হবে। সেজন্যে সে সেদিন অতীনকেও দেশের কাজে আহ্বান করলো। অতীনও এলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে যখন দেখলো—এলার সংগে তার মিলবার প্রচলিত বাঁধা পথটি বন্ধ, তখন সে এই বাঁকা পথেই তার সংগে মিলিত হতে চাইলো। এলার আহ্বানে, তার সংগলাভের দুর্বার লোভেই, অতীন জীবনমরণ পণ করে দেশের কাজে নিজ জীবন উৎসর্গ করলো। দিন যতোই যেতে লাগলো এলা ক্রমে বুঝতে পারলো—অতীনের প্রতি তার আসক্তি দিন দিনই যেন বেড়ে চলেছে এবং তার সেই ভালোবাসা যেন তার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমকেও ছাপিয়ে উঠছে। ইদানীং তার কেবলি মনে হচ্ছে তাদের দলের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাও কেমন যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের দল যেন এক "বেতালা ঝোঁকে" ক্রমেই "বিচার শক্তির বাইরে" চলে যেতে বসেছে। সে মনে মনে শংকিত হয়ে উঠলো, ভাবলো—"এমন সব ছেলেদের এ কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে !" ইন্দ্রনাথকে তার এই আশংকার কথা জানাতেই সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অর্জুনের চিত্তবিক্ষোভের সংগে তার এই ভয়ের তুলনা করে বললো—"শক্তির গোড়া নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয় তো ক্ষমা ...তোমরা শক্তিরূপিনী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলা-জমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।" এলা দল থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলে ইন্দ্রনাথ তাকে মুক্তি দিতে অসম্মত হয়ে বললো—"তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।......তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও না তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্ত চন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনের

কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না।" ইন্দ্রনাথ একথাও খুব ভালো করেই জানতো অতীনের প্রতি এলার ভালোবাসা যতই গভীর হোক না কেন, সেই "ভালোবাসার গুরুভারে" সে কখনই নিজের ব্রত বিসর্জন দিতে পারবে না। এলা অতীনকে দল থেকে নিষ্কৃতি দিতে অনুরোধ করলে ইন্দ্রনাথ বললো—"আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে! ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।" এলা বুঝলো নিজ শপথের নাগপাশেই তারা জড়িয়ে পড়েছে, এর থেকে তাদের নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায়ই নেই। সে অতীনকে অতোখানি ভালোবাসলেও তাকে সে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ সে দলের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে অতীনকে একদিন তাই বললো—"যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান—তা এলো আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁটবাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্র পড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে—ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে সব কথা কোনো দিন ভাবতে পারি নি।" অতীন জবাব দিল—"দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ, তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও।" এলার পণরক্ষার এই প্রাণপণ চেষ্টাকে অতীন 'স্বধর্ম-বিদ্রোহ বলেই মনে করে। তার মতে "যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী" তাকে দলের পায়ে দলিত করবার শাস্তি একদিন এলাকে পেতেই হবে। এলার বিরুদ্ধে তার নিরুদ্ধ অভিমানের সীমা নেই। সে তো তাকে—তার প্রেমাস্পদকে—দেশের কাজে এগিয়ে না দিয়ে নিজ অন্তরের "মধুর্যলোকে"ও স্থান দিতে পারতো। তাতে করে এলা তার জীবনকে সংসারের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমিত করে তাকে ছোট করে ফেলতো বলে, যে সে ভয় করছে তা নিতান্তই অমূলক। নারীর অন্তরের সেই মাধুর্যলোক তো ছোট নয়, হলোই বা তার প্রসার ছোট। সে লোক যে অন্তরের মধ্যে অতল গভীর। 'দেশ' উপাধি দিয়ে এলার দলের লোকেরা যে স্বল্প পরিসর জগতের মধ্যে অতীনের জীবনকে সীমায়িত করতে চেয়েছে তাই আজ হয়ে উঠেছে তার উদার, চিরমুক্ত স্বভাবের পক্ষে খাঁচা—যার বাহিরে যাবার তার আর কোনও পথ নেই। তার ভিতর তার আপন শক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে কেবলই বাধা পাচ্ছে, যার ফলে তার মন ও স্বভাবেরও বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। আজ তার মনে হচ্ছে তার মনের ডানা দুটিও যেন ছিন্ন—তার অবাধ সঞ্চরণের পথটি যেন বন্ধ। তার পা দুটি যেন বেড়ির মধ্যেই আবদ্ধ—তার চলবার উপায় নেই। সে জানে নারীর পুরুষকে ভোলাবার শক্তি দুর্নিবার, অমোঘ। এলার সেই চিত্ত-বিমোহিনী শক্তির কাছে সে হার মেনে আজ নিজ আদর্শচ্যুত হয়েছে। তাতেও তার কোনও দুঃখ ছিল না, যদি সেই শক্তি তাকে নিয়ে যেতো সেইখানেই—যেখানে তার "আপন বিশ্ব, আপন অধিকার।" কিন্তু তা না নিয়ে গিয়ে এলা তার দলের কথারই প্রতি-ধ্বনি করে দলের বাঁধা কর্তব্য-পথেই তাকে চালিত করতে চেয়েছে। এইটেই তার ক্ষোভ। এই ক্ষোভ সে আজ কিছুতেই ভুলতে পারে না। সেই শান-বাঁধা কর্তব্যপথে অবিরাম ঘুরপাক খেয়ে অতীনের বাধাবন্ধনহীন স্বাধীন জীবনস্রোত যেন কেবলই আবর্তিত হচ্ছে। তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার আজ মৃত্যু ঘটেছে। তার স্বাধীন চিন্তা ও বিচার শক্তিকেও যেন টুঁটি টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। আজ তাই তার আর কোনও ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত বলে কিছু নেই। দলের শাসনকে কোনও যুক্তি বিচার না করে মেনে নেবে বলে সে যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখনও সেই শাসনের নির্মম কঠোরতার কথা সে অত তলিয়ে দেখে নি। সে সেদিন শুধু এলার সংগ কামনাই করেছিল। আজ এলার চিত্ত জয় করেও অতীন তাকে পুরোপুরি পেল না। অথচ ঐটুকু পাবার জন্যে তাকে কী মূল্যই না দিতে হয়েছে! সে চির-স্বতন্ত্র— চিরদিন "কথায় পাওয়া মানুষ" সে। তাকেই কিনা এলা ভর্তি করে নিল—"দলের সতরঞ্চি খেলার ব'ড়ের" মধ্যে। সে তার মধ্যে তাই নিজেকে খাপখাওয়াতে পারলোনা। সে যে "আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব" "পুতুলনাচ" নাচাতো তার ধাতে নেই। স্বদেশী কর্তব্য যেন "জগন্নাথের রথ।" মন্ত্রদাতা নেতার আদেশেই সকলকে উঠতে বসতে হবে মন্ত্রদাতার হুকুমেই দলের সকলে মিলে দুই চক্ষু বুজে কোমর বেঁধে রথের দড়ি টানতে থাকবে। আবার নেতা যখন উল্টো রথের মন্ত্র আওড়াবেন তখনই রথ ফিরবে। এই তো হল দলের কাজ। কতো লোক পড়লো সেই রথের চাকার তলায়, কতো লোক চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে গেল তার কোনও হিসাবই নেই। প্রথম থেকেই সকলের আপন শক্তির উপরে বিশ্বাস ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই আজ দলের সবাই সেই বিশ্বাস হারিয়ে বসেছে সরকারী পুতুল নাচের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে স্পর্ধাভরে রাজী হয়েই সকলে দলে ঢুকেছে। সেজন্যে আজ আর কারও কোনও স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামত বলে কিছু নেই। নেতার দড়ির টানে সবাই যখন একতালে নাচতে শুরু করলো, সকলেই সেটাকে 'শক্তির নাচ' বলে ভুল করলো। কিন্তু অতীন সবার মধ্যে নেমে এসে সকলের সংগে সমান তালে নাচতে পারলো না। সে আজ মর্মে মর্মে বুঝেছে সে জীবনে কত বড়ো ভুলই না করেছে! এই দলে এমন সব ছেলে সে দেখেছে, বয়সে সে তাদের চেয়ে বড়ো না হলে যাদের সে পায়ের ধুলো নিতো। তারা কী দেখেছে, কী সয়েছে তা কোনও দিনও প্রকাশিত হবে না। আবার কেমন করে এদেরই ক্রমশঃ অধঃপতন হয়েছে—আস্তে আস্তে এরাই কেমন করে আপন মনুষ্যত্ব হারিয়েছে তাও সে দেখেছে এবং অন্তরে অসহ্য ব্যথা পেয়েছে। সে বার বার তাদের বলেছে—"অন্যায় অন্যায়কারীর সমান হোলেও" তাদের হার হবে। মরবার আগে এই কথাটা তাদের নিজ জীবন দিয়ে অপরাধীদের বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মনুষ্যত্বে তারা ওদের চেয়ে অনেক বড়ো। তবেই দুর্বলের আত্মিক শক্তির কাছে প্রবলের বাহুবলের হবে পরাজয়। কিন্তু তার সেই সতর্ক-বাণীতে খুব কম লোকই কর্ণপাত করেছে—অন্তরে তার কথার সত্যতা

উপলব্ধি করলেও। তাই আজ যখন শাস্তির নিষ্ঠুর জাল চারদিক থেকে তাদের জড়িয়ে ধরেছে সে তখন তার বিপন্ন সংগীদের আসন্ন বিপদের মুখে ফেলে কিছুতেই পালাতে পারে না। সে বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কিছুতেই হার মানবে না—ভয়ে নয়, পীড়নে নয়, সব কিছু কিছুতেই নয়। মনে নিয়ে সে শেষ পর্যন্ত এগিয়েই বলবে, তার ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন। একটা কথা সে এই অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভালো করেই বুঝেছে যে তারা গায়ের জোরে ইংরেজের অসমকক্ষ হয়েও যদি তাদের সংগে গায়ের জোরে "মল্ল যুদ্ধ" লড়তে যায় তাহলে তাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না—শক্তিমান ইংরেজ মনুষ্যত্বের অবমাননা করেও হয়তো কিছুদিন জয়ডংকা বাজিয়ে চলতে পারে। কিন্তু তাদের—দুর্বলদের—পক্ষে তা কখনই সম্ভব হবে না। তাহলে তারা অশেষ কলংক-কালিমায় লিপ্ত হয়ে পরাভবের চরমসীমায় পৌঁছে অখ্যাতির অন্ধকারেই মিলিয়ে যাবে। সে দেখেছে স্বাদেশিকতার নামে যা চলছে তার মধ্যে অগৌরব ছাড়া গৌরব নেই। 'মুখোষ পরা' চুরি, ডাকাতি খুনোখুনির মধ্যে স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ নেই। এতে করে তার দলের লোকেরা শুধু তাদের নিজ আত্মারই সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। এর ফল যে নিশ্চিত পরাভব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেবল পরাভব তেমন গ্লানিকর নয়, যেমন আত্মার পরাভব। এই আত্মার পরাভব ঘটলেই তা টেনে আনবে "গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকার" অসীম কদর্যতা। এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের মধ্যে অতীনের উদার বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ মন শুধু দেখেছে হীনতা, মিথ্যাচারিতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ক্ষমতালোলুপদের নীচ চক্রান্ত, গুপ্তচর বৃত্তি—যা একদিন তাদের দলকে অতলপাঁকের তলায় টেনে নিয়ে যাবে। এই ক্লেদাক্ত জগৎটার বিষাক্ত আবহাওয়ায় মানুষের মন চিরদিনের মতোই পঙ্গু ও অসুস্থ হয়ে যাবে। তার দ্বারা জগতের আর কোনও বড়ো কাজ চলবে না। "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর কথা মিথ্যে—পৃথিবীশুদ্ধ ন্যাশনালিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে।" এর প্রতিবাদ করবার জন্যে অতীনের বুকের ভিতরটা "অসহ্য আবেগে" গুমরে গুমরে উঠছে। মেকি স্বাদেশিকতার এই কুৎসিত রূপটি আজ স্পষ্টই তার চোখে ধরা পড়েছে। সে তাই এলাকে বলছে—"তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমীরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা।" জাতীয়তার নামে আজকের এই সভ্যজগতে মানুষে মানুষে যে খুনোখুনি মারামারি চলছে, সেই তথাকথিত স্বাদেশিকতার আসল রূপটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চার-অধ্যায়" উপন্যাসখানিতে দেখাতে চেয়েছেন। অতীনের মুখে কবির অন্তরের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর মনুষ্যত্ববোধ তাঁর দেশাত্মবোধকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। তাই দেশের আত্মাকে মেরে স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি সমর্থন করেন নি। এতে করে তাঁর দেশাত্ম-বোধ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি দেশকে কারও চেয়ে কম ভালোবাসেন নি। তিনি আজীবন দেশের লেশমাত্র অমর্যাদা বা অপমান সহ্য করেননি। তাই বলে তিনি অন্ধ দেশ-প্রেমের কাছে মানবতাবোধকে বলি দেবার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর আশি বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে "সভ্যতার সংকট" নামক তাঁর অভিভাষণেও তিনি এই মানবতারই জয়গান করে বলেছেন—"আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব—প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে—।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবির সেই স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎবাণী আজ সফল হয়েছে—ভারতের স্বাধীনতা লাভে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি

মিহিরকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ কবি, ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা। তাঁর এই পরিচয়ের পাশে আর একটি পরিচয় আমাদের দেশে তেমন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেনি—অন্ততঃ সাধারণ্যে সেই পরিচয় ততখানি প্রসার লাভ করেনি। সে পরিচয় হচ্ছে রাজনীতিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। 'রাজনীতিক' শব্দটি সাধারণ-ভাবে যে অভিজ্ঞা বহন করে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেভাবে এটির ব্যবহার চলে না। তাঁকে সাধারণভাবে রাজনীতিক না বলে রাজনীতির রাজর্ষি বলাই অধিকতর সংগত। দীর্ঘ পরমায়ুর আশীর্বাদ-ধন্য কবি-জীবন নানান্ অভিঘাতের চিহ্ন-লাঞ্ছিত গ্লানির কলঙ্ক-চিহ্নিত। তার একমাত্র কারণ কবি রাজনীতিকের চিন্তাধারা সমসাময়িক উত্তেজনার ফলে মূল্যায়নের অগ্নি-পরীক্ষায় স্থায় বলে প্রতিভাত হয়নি। অবশ্য এর কারণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ত্রুটিতে নেই, বরং আছে সমসাময়িক সমা-লোচকের বিচার-বিভ্রান্তিতে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দিকটির উপর আলোকপাত ঘটলেও, তা আজও বিচার সাপেক্ষ।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বাস্তবক্ষেত্রে রাজনীতির সত্যকে রূপায়িত করার ক্ষমতা। কবি যে সত্যকে দেখেন অন্তর্দৃষ্টিতে, স্রষ্টা তাঁর কল্পনা বলে সেই দুরধিগম্য সত্যকে

বাস্তবে রূপদান করতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্যটি ধরা পড়েছিল, তা সমকালীন রাজনীতিকদের কাছে ভাল ঠেকেনি। কথান্তরে বলা উচিত কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর্ষ দূরদৃষ্টিতে যেটিকে সত্য বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করবার অভীপ্সা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিনের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে উন্মাদনা এসেছিল, তখন কবি-উক্ত সত্যটি রাষ্ট্রনীতিতে আশু-ফলপ্রদ বলে গৃহীত হতে পারেনি।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা অন্যায় নয় যে, সেদিনের স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষী মনীষীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটলেও, উভয়পক্ষের মতামত বিচারের ক্ষমতা সমালোচকের রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কবির মতামত বিচার্য, তাই অন্য প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর বলেই পরিত্যাগ করা গেল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে রাজনৈতিক চিন্তাধারা আকস্মিক উত্তেজনার অভিঘাত-প্রসূত নয়। যা তিনি বহুদিন ধরে কল্পনা করেছেন, মস্তিকের ক্ষুরধার প্রশাসনে যা ন্যায় বলে প্রতিভাত হয়েছে তাই তিনি নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করে গেছেন। "রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি,জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।" কবি-কথিত ঐ 'ঐক্য-সূত্র' অনুসন্ধানই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস গড়ে তুলবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ পদসঞ্চার—একথা বলাতে অন্যায় নেই বলেই মনে হয়। লর্ড কার্জনের প্রতিনিধিত্বে ভারতবর্ষ যখন ভিক্টোরীয়া কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বরাজ-আন্দোলনের ঢেউ প্রবল হয়ে না উঠলেও, তার সূত্রপাত যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ সৃষ্ট 'ভারতীয় সঙ্ঘ' (Indian Association) স্থাপনের মধ্য দিয়ে দেখা গিয়েছিল—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' সেই অঙ্কুরকে মহীরুহের আকার দানে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে উঠেছিল বই কি ! এই সকল সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এতদ্দেশীয় শাসিত জন-গণের দাবীকে শাসক শ্রেণীর কাছে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টা যখন প্রবল আকার ধারণ করছিল, তখন লর্ড কার্জন সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেবার মতলব আঁটছিলেন। সেদিনের বাঙালীসমাজ এই অন্যায়কে প্রতিহত করবার জন্যে সমবেত হ'য়েছিল 'এক প্রাণ, একমন, একতা'র বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন গৃহ কোণে কল্পনা সুন্দরীর অনুধ্যানে নিজেকে মগ্ন রাখতে পারেন নি। বাঙালী জাতির একতাকে ক্ষুণ্ণ করতে যে পরদেশী শাসক বদ্ধ পরিকর তার বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু সে বিরুদ্ধতা রক্তপাতের হিংস্রতা-মণ্ডিত নয়; কিংবা তা রণবাদ্যমুখরিত রাজপথের গতানুগতিক অনুসৃতিও নয়। সেদিন কবি জনতার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বাঙালী মানসকে 'একজাতি, এক প্রাণ, একতা'র মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলবার উদ্দেশ্যে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেদিন সমগ্র ভারতে বয়ে গেল প্রবল আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। আর সেই আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছিল রৌলট আইন,জালিয়ানবালাবাগের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা। সংক্ষেপতঃ এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও বিভিন্ন রচনা তাঁর রাজনীতি তথা স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করবে।

* * * * *

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম কোন ভৌগোলিক সীমারেখাকে অবলম্বন করে উদ্বুদ্ধ হয়নি। তাঁর বড় পরিচয় তিনি কবি—মানব প্রেমিক। জার্মান কবি-দার্শনিক গ্যায়টে কবির স্বদেশ-স্বরূপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "......the poet as a man and a citizen will love his native-land, but nativeland of his genius lies in the world of goodness,greatness and beauty ; a country without frontiers or boundaries, ready for him to seize and shape whenever he finds it."* * (১)

রবীন্দ্রনাথের দেশ-চেতনা সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি যথাযথভাবে সত্য। দেশের প্রতি ইংরেজ-শাসকদের ঘৃণা ও অবমাননার দিনে তিনি যে প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন, তাতে তাঁর ভারতীয়ত্বের পরিচয় যতখানি ফুটে উঠেছে, ততোধিক প্রকাশিত হ'য়েছে মানবিকতার উৎসাদনের দিনে মানব-প্রেমিক কবির সহজাত সহানুভূতি ও অন্তর্লীন সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবির 'নাইট হুড' প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি এ প্রসঙ্গের স্মারক হিসেবে উদাহৃত হতে পারে। দেশ-কাল-সম্পর্কে কবির মতবাদ কি তা কবির কথাতেই জানা যায়—"I love India, but my India is an idea and not a geographical expression".** (২)

তাই তাঁর হৃদয় সর্ব মানবের জন্যে কেঁদে উঠেছে—যখন তিনি দেখেছেন নিরীহ জাতিসমূহকে অত্যাচারের বীভৎসতায় উৎসাদিত হবে। আর এই জন্যেই তাঁর নির্ভীক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আমেরিকার নিগ্রোদের প্রতি পশু-শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জাপানী সাম্রাজ্য-বাদীদের হাতে পর্যুদস্ত কোরীয়াবাসীদের জন্যেও তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। সমসাময়িক ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই 'নেশন'-প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে স্বাদেশিকতার সীমিত গণ্ডীতে মানবিকতার ঘটে অপমৃত্যু, সাবিক মানবপ্রেম সেখানে হয় কুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত। তাঁর মতে প্রত্যেক জাতিই বিশ্ব-মানব-সভার সভ্য। বিশ্বমানবকে দেবার, সহায়তা করবার এষণাই প্রত্যেক জাতির স্মরণ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্বমানবতার নীতি জ্ঞান যেখানে ক্ষুণ্ণ, সেখানেই কবির সত্য-সন্ধ হৃদয় পেয়েছে ব্যথা, ধ্বনিত হয়ে উঠেছে কবির প্রবল প্রতিবাদ। যখন ভারতবাসী স্বাধীনতার নামে 'নেশন' প্রতিষ্ঠায় ছিল ব্যস্ত, তখন কবির আশীর্বাদ তাদের উপর

ড়েনি। কারণ, স্বাধীনতা ও 'নেশন' এক নয়। স্বাধীনতা বলতে নি বুঝতেন অন্তরের স্বাধীনতা, হৃদয়ের বিস্তৃতি ও আত্মশক্তির উদ্ধন। তাই যখন স্বরাজ-আন্দোলনের যুগে কবি এদেশের নেতাদের গুক্ত চিত্তবৃত্তির পরিচর্যার বদলে দেখলেন স্বদেশ-প্রেমের নামে, বীনতার নামে মানবধর্মের উৎসাদন, হৃদ্-বৃত্তির নিমজ্জন, তখন তিনি তিবাদ না করে পারলেন না। আর সেই প্রতিবাদের ইতিহাস লুকিয়ে ছে তাঁর সে সময়ের রচিত প্রবন্ধাবলীতে, চিঠিপত্রে এবং স্বরচিত পন্যাসগুলিতে।

বংগভংগ আন্দোলনোত্তর ভারতীয় ইতিহাস বিদেশী শাসকের প্রতি সূয়া প্রকাশে, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও ম্যানচেষ্টারের কলনির্মিত বস্ত্র ীকরণের কলঙ্ক-চিহ্নে লাঞ্ছিত। তদুপরি বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদের ন্যে একদিকে চলেছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অন্যদিকে চলেছে রক্ত-াতের তামসিক নীতির অনুসরণ।

রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলন-যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত নব প্রাণের সাহসিকতাকে অর্ঘ্য না দিয়ে পারেননি। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ ছিল অন্যত্র। মাদের দেশের তৎকালীন বহু নেতানামধেয় ব্যক্তির বাহাড়ম্বর তিনি করতে পারেন নি। ঐ সকল নেতাদের স্বদেশপ্রেম অধিগত স্তকের পাঠ বহির্ভূত কোন সত্য হিসেবে ধরা পড়েনি; তাদের কথা র্তায়, আচারে-ব্যবহারে বার্ক, গ্লাড্‌স্টোন, ম্যাটসিনি ও গ্যারিল্ডি'র কণ্ঠস্বর শোনা যেতো। রবীন্দ্রনাথ ঐ সকল নেতার স্বদেশ-প্রেমের নামে অবাঞ্ছিত অনীহা সহ্য করতে পারেন নি। তদুপরি সকল নেতা স্বদেশ-শাসনের স্বাধিকার দাবী করতে গিয়ে ইংরেজ রকারের কাছে 'আবেদন-নিবেদনের থালা'র নৈবেদ্য সাজাতে ধিকতর ব্যগ্র, তাদের কর্মপন্থা কবির কাছে হেয়, আত্ম-দৈন্য-দোষদুষ্ট লেই মনে হয়েছে। কারণ যে স্বরাজ—আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে অধিগত য়, যা অন্তঃকরণের সাধনার বলে আহৃত হয়নি, তা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য —এটিই ছিল কবির বক্তব্য। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এইযে সত্য-ন্বিৎসার অভাব, এই যে আত্মদৈন্য ঢাকবার সুলভ আবরণ—তা রদিনই রবীন্দ্রনাথকে লজ্জা দিয়েছে, তাঁর সত্যনিষ্ঠ মনকে ব্যথিত রেছে।

তাই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজীর রাজনীতিক্ষেত্রে মহত্তর আবির্ভাবে বীন্দ্রনাথের সত্যসন্ধ কবি-চিত্ত অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিল বই কি! তদিন যে আন্দোলন নকল সৌখীন মজদুরী'র পর্যায় ছাড়িয়ে কোন হত্তর লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি, তা গান্ধীজীর আবির্ভাবকে অবলম্বন রেই এক সত্যতর মূর্তিতে বিমূর্ত হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর প্রেমের আহ্বানকে, সত্যের আহ্বানকে শ্রদ্ধায় বরণ করে নিলেন। তদিন যে স্বপ্ন-কল্পনা কবির অন্তর্লোকে নির্বস্তুক সত্যরূপে বিরাজ রছিল, তারই চিন্ময় আবির্ভাব মহাত্মাজীর মধ্যে। সত্যদ্রষ্টা কবির কল্পনায় যে সত্য প্রতিভাত হয়েছিল, তা মহাত্মাকে কেন্দ্র করেই বাস্তবে পায়িত হ'তে চললো। এই দু'জন মনীষীর মধ্যে যে সাদৃশ্য অনুভব রা যায় তা ঐ সত্যসন্ধতা, প্রেম ও আন্তর শক্তির উদ্‌বোধন মন্ত্রকে কেন্দ্র করেই। রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও ইংরেজের প্রতি কোন জাতিগত অসূয়া প্রকাশ করেন নি। তাঁরা ইংরেজের শাসনযন্ত্রে মানবিকতার কণ্ঠরোধকে ও তাঁদের যান্ত্রিক হৃদয়হীন ব্যবহারকে বলিষ্ঠ ভাবে ঘৃণা করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে—একজন ইংরেজ তরুণীর ভ্রান্ত অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য ভ্রমণ কালে কবি লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র-নিবাসে 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন। কবি এই ভাষণের উপসংহারে বলেন: "সে (পশ্চিম) পূর্বদেশে আসিয়াছে রিপুর আক্রোশে, লোভের তাড়নায়। পশ্চিম প্রাচ্যে গুরুর ন্যায় আসিতে পারিত; কিন্তু সে আসিল প্রভুত্ব করিতে, ব্যক্তি ও জাতিকে দাসত্ব বন্ধন করিতে। সেই সাক্ষাৎকারকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিতে হইলে মানুষের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা ও বৃত্তিনিচয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; সেই মহত্ত্বের পটভূমিতে মনুষ্যত্বকে সার্থক করিতে হইবে।" [The Morning Post, London, 9th April, 1921,—হ'তে অনূদিত] **......(৩)

কবির এই বক্তৃতা শুনে উক্ত মহিলা কবির কাছে প্রতিবাদ-পত্র লিখে পাঠান। তাতে তিনি কবিগুরুর ব্রিটিশ জাতির উপর অকারণ অসূয়া প্রকাশকে নিন্দা করেন। কিন্তু কবি-গুরু সেই প্রতিবাদ-পত্রের উত্তরে যে পত্র লেখেন তা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুটনের সহায়ক বলেই উদ্ধারযোগ্য—

"পৃথিবীর যে সকল দুর্বল জাতি শক্তিমান্ নেশনের নিষ্ঠুর শোষণ নীতি-বলে লাঞ্ছিত ও বসুন্ধরার স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত—আমি তাহাদের সকলের বেদনাই গভীর ভাবে অনুভব করি—সে তাহারা পূর্বেরই হউক, আর পশ্চিমেরই হউক। আমেরিকার যে হতভাগ্য নিগ্রো জীবন্ত দগ্ধ হয়—তাহার জন্যও আমার যেমন দুঃখ, তেমনই বেদনা পাই কোরিয়ানদের জন্য, যাহারা জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বলি-স্বরূপ যূপবদ্ধ—ঠিক তেমনই কষ্ট পাই আমার দেশের অসহায় অগণিতের উপর যখন কোনো অন্যায় হয়।" এনড্রুজ্‌কে প্রেরিত সেই পত্রের অনুলিপির বঙ্গানুবাদ হ'তে] **......(৪)

এই উদ্ধৃত অংশ হ'তেই কবিগুরুর মানবপ্রেমের স্বরূপ সহজবোধ্য হ'বে বলেই ধারণা।

প্রাক্তন প্রসঙ্গ টেনে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মতবাদ অনেকখানি একাভিমুখী হ'লেও, তাঁদের পার্থক্যও কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ, অসহযোগ আন্দোলন মানুষের সহজধর্ম নয়। তাই তিনি—এটিকে 'Political asceticism' বলে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজির 'চরকার' আহ্বানেও কবি সাড়া দিতে পারেননি। কারণ, বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোট করা যায়, ছোটকলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যা, চরকার দ্বারাও। তাছাড়া কবি স্বাধীনতা অর্থে শুধু বস্ত্র সংস্থানের স্বচ্ছলতাকে গ্রহণ করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। সুতরাং গান্ধীজির 'সুতো কাটো' আহ্বানের

পেছনে ভারতীয় কৃষিজীবি-কর্ষকের সামগ্রিক অন্ন-সংস্থানের মহত্তর পরিকল্পনার সূচনা থাকলেও তা যে "সূতার চেয়ে মন কাটে" অনেকখানি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মের অবতারণাকে চিরদিনই অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছেন। "যে দেশ শুধু ধর্ম্মের মিলেই মানুষকে মেলায়"—সে দেশ কবি কর্তৃক ভৎসিত হয়েছে। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিমত প্রাপ্তব্য। যে ধর্ম্ম মানুষের আত্মার, মনুষ্যত্বের ও বিশ্ববোধের সহায়ক নয়, যে ধর্ম্ম শুধু আচারের চোরাবালিতে অবরুদ্ধগতি—সে ধর্ম্ম কবি-গুরুর সমর্থনধন্য হ'তে পারেনি। এবার এই প্রবন্ধের যতিপতনের প্রয়োজন। কারণ সাবধানী পাঠকের কাছে তাঁর রাজনীতিক-স্বরূপটি অজ্ঞাত নয়। উপসংহারে এইটুকু বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সর্বমানবতার মন্ত্রে উজ্জীবিত। উপনিষদিক ভাবধারায় পুষ্ট কবি-মানস সমস্ত কিছুকেই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তদুপরি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই রাজনীতিকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে পারেন নি। কারণ, "Politics, in every country has lowered the standard of morality, has given rise to a perpetual contest of lies and deceptions, cruelties, hypocrisies and has increased inordinately national habits of vain glory." মনুষ্যত্বের এই অবমাননা, মিথ্যা, জুগুপ্সা, নিষ্ঠুরতার বিভীষিকাকে কবি চিরদিনই ঘৃণা করেছেন।

কবিগুরুর স্বদেশপ্রেমের প্রশস্ত প্রতিনিধি নিখিলেশ চরিত্রটি। সন্দীপ ও গোরার মধ্য দিয়ে কবির বিরোধীমতের উদ্‌ঘাটন দেখা যায়। সন্দীপের মাধ্যমে আত্মশক্তির অভাব জনিত, বক্তৃতাসর্বস্ব স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে, আর গোরার চরিত্রে অন্ধ আচারসর্ব্বস্ব দেশপ্রেমের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু উপন্যাসের শেষে গোরার জীবনের ভুল ভেঙ্গেছে সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে পেরে বিশ্বমানবের প্রেমে আত্ম-উৎসর্জনের মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করেছে। আর এইখানেই গোরার জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব।

রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী কবি। তিনি সত্য-শিব ও সুন্দরের পূজারী। তাই তাঁর মতবাদ অত্যুচ্চ আদর্শের বর্ণসমারোহে রঞ্জিত। সুতরাং তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ তৎকালিক রাষ্ট্রনায়কদের মতবাদের বিরোধী হ'লেও শাশ্বত সত্যের ও সুদূর ভবিষ্যের সত্য-পরীক্ষায় পরীক্ষিত ও পরিশুদ্ধ। ঋষি-কবির অন্তর্দৃষ্টিতে যে সত্য আভাসিত হয়েছিল, তারই প্রকাশের সম্ভাবনায় জগতের সমস্ত ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সমৃদ্ধির পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে আছে।

**…(১) Political Philosophy of Rabindranath
— S. Sen.

**…(২)—(৪) রবীন্দ্র-জীবনীতে (৩য়)
— প্রভাত মুখোপাধ্যায়

ছিন্নপত্রে রবীন্দ্র-মানস

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

ব্যক্তি মানসের সব কথাই সাহিত্যের রসে রসায়িত ক'রে সব সময় প্রকাশ করা যায় না। গল্পে উপন্যাসে কাব্যে বা প্রবন্ধে ব্যক্তিগত পরিস্ফুটনের স্থান স্বল্প। সেখানে স্বকীয় চিন্তাধারা বিভিন্ন চরিত্রের উপর আরোপিত হ'য়ে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়—। যদিও সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সেই ব্যক্তিমনের একটি অখণ্ড রূপ—তবুও তার মধ্যে অনেক না বলা থেকে যায়। কিন্তু মনের সব কথা নিবিড়ভাবে প্রকাশ করা যায় চিঠিতে। কারণ বাইরের জনকোলাহলের বিচিত্রতার মাঝে সে প্রবেশ করে না—একটি মাত্র হৃদয়ের কাছে অনাহত হ'য়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়। অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চারি পৃষ্ঠা চিঠি মনের ঠিক যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিংবা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না।" 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থটি কবির এই মনোভাবকেই আগাগোড়া বহন ক'রে চলেছে। ছিন্নপত্রের মাধ্যমে আমরা কবির যে রূপটি পরিলক্ষণ করি, তা তাঁর কবি-মানসের স্বতন্ত্র রূপ। কাব্যে যে ভাব পরিস্ফুটনের প্রয়াসী এই গ্রন্থ সেই ভাবের পরিচয় পত্র।

কবি-মনের যে রহস্য কাব্যে অন্ধিতে সন্ধিতে লুকিয়ে থাকে—কাব্যের রসপিপাসুগণ অনেক সময় কবি-মনের সেই রহস্যের জাল উন্মোচন ক'রে ব্যক্তিটিকে দেখার ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। এই ব্যগ্রতার যথার্থ কারণ এই যে, যে মন থেকে কাব্যরস ক্ষরণ হ'চ্চে—সেই মনের অন্তর্লোকের সন্ধান পেয়ে কাব্যের পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করা যায় এবং কবি ও কাব্য উভয়কেই বোঝবার অবকাশ হয়। তাই চিঠিপত্র—যাতে সকলের চেয়ে মনের কথা নিবিড়ভাবে প্রকাশ করা যায় তার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলে কবি ও কাব্যের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্যাঁত ব্যভের (Sante Beve)

আলোচ্য চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায়, তিনি তাদের অনেক চিঠিপত্র থেকে অনেক ছোট খাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের আসল অবয়বটি অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। ম্যাথু আর্ণল্ডও বহু সমালোচনায় এই পথ বেয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। তাই পত্রসাহিত্য—সাহিত্য গুণাগুণের বিচারের চেয়ে ব্যক্তি-মানসের পরিচয় নিকটতর করে।

ছিন্নপত্র কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে বলে অনেক সম্পাদন করতে হয়েছে। এক কথায় পত্রের অনেক অংশে ব্যক্তিগত দোহায়ের কবলে প'ড়ে প্রকাশিত। যার ফলে ছিন্নপত্রের পত্রগুলিতে ব্যক্তিগত রসের অভাব ঘটেছে।

এ সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি স্মর্তব্য: "একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল শতদলে বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, এই ছিন্নপত্রগুলিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পত্র সেই নন্দন গন্ধটুকু বহন করিতেছে বটে, কিন্তু ছিন্ন হইবার বেদনার রক্তলেখা ইহাদের গায়ে লাগিয়া আছে।" যে চিঠিতে ব্যক্তি সত্তার প্রাধান্য থাকে না—অথচ বৈশ্বিক অন্তর রসে ও রঙে অনুরঞ্জিত হয় তাতে সাহিত্য মূল্যবোধ যতই থাকুক না কেন তাকে উত্তম পত্র বলা যায় না। উত্তমপত্রে লেখক ও প্রাপকের মধ্যে বিনিময়ের উষ্ণতা প্রকাশমান বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় শোনা যাক: "যারা ভাল চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে—আলাপ ক'রে যায়—তার কোন ভার নেই—বেগও নেই, স্রোত আছে।...চলতি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মত হাল্কা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ ব'লেই জিনিষটি সহজ নয়। ভারহীন সহজ রসই হ'চ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া ও দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতে আছে। কথা বলবার জিনিষ নেই অথচ কথা বলবার রস আছে, এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়।" [৩৭ সংখ্যক চিঠি: পথে ও পথের প্রান্তে]

"ভারহীন সহজ রসই" পত্রসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। এখন বিচার্য বিষয় ছিন্নপত্রে এই গুণটি কতখানি আছে। ছিন্নপত্রের পত্রগুলিতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি কিছু প্রকাশমান। কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করেন নি—এবং কবি-মানসের অযথা প্রাধান্য দেন নি—অথবা পত্রলেখার নাম করে কোন প্রবন্ধ লেখেন নি। তাই ভানু সিংহের পত্র, পথে ও পথের প্রান্তের তুলনায় ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি অনেক ব্যক্তিগত।

তাই সম্পাদিত হয়েও এর ভাব সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত ঘটেছে বলে মনে করা যায় না। ১৮৮৫—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ—দশ বৎসর কালের কবি মানসের অভিব্যক্তি ঘটেছে এই চিঠিগুলিতে। কিন্তু চিঠিগুলি পড়তে পড়তে দীর্ঘকালের ব্যবধান কোথায় হারিয়ে যেন যায়। সামান্য ব্যবধানে যেখানে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটে যায়—কিন্তু দশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রজীবনে পদ্মা প্রবাহের পরিবর্তন ঘটেনি। প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য্য আকুল আগ্রহে পরিলক্ষণ ক'রে মমতার রঙ্কে গ্রথিত করেছেন। যার ফলে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভাবের ঐক্যবোধ থাকায় ছিন্নপত্রগুলি যথেচ্ছ পক্ষ বিস্তার করতে পারেনি।

কালের পরিধিতে বিচার করলে দেখা যায়—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা ও ছোট গল্পগুলি যে সময় রচিত হয়েছিল—ছিন্নপত্র সেই পর্বের অনবদ্য স্বাক্ষর। তাই ছিন্নপত্র গ্রন্থটি সম্যক মনন গ্রাহ্য না হলে এই পর্বের রচনা ও পরিবেশের অন্তর্লোকে প্রবেশ করা যায় না। প্রতিটি চিঠির ছত্রে ছত্রে সেই সময়ের কবির কল্পনাপ্রবণ মনটি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে—এমনটি আর কোথাও হয়েছে বলে মনে করা যায় না। এমন কি এই গ্রন্থখানিকে রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যের পরিপূরক হিসাবে মনে করা যেতে পারে। সময়ের বিচারে দেখা যায় সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী ও আলোচ্য ছিন্নপত্র খানি রচিত হ'য়েছে কবির পদ্মাবাসের সময়। এই পদ্মাবাস কালেই কবির হৃদয়ে মানব প্রকৃতির স্বরূপ ধরা প'ড়েছিল। একদিকে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য রাশি অপর দিকে সমস্যা-কণ্টকিত মানবজীবন—এই উভয়বিধ অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে ছিন্নপত্রের পত্রাবলীতে। প্রকৃতির অন্তরে নিঃশব্দ সঞ্চারে যে বিশ্বাত্মবোধ মূর্ত হ'য়ে ওঠে—যখন সেই অপরূপাকে আপন জননী রূপে কল্পনার পরিণতি লাভ করে তখনই কবি প্রকৃতিকে চিরন্তনের নতুন বলে বোধ করেছেন—আর বন্দনা ক'রে বলেছেন, "আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক নতুন জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম।" এই আধ্যাত্মিক কবিসত্তা ও নৈসর্গিক পদ্মাসত্তার সাজুয্য ঘটেছে রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যের বিস্তৃতক্ষেত্রে।

পদ্মা প্রবাহের প্রভাব এই পর্বের রচনায় অধিকতর বিদ্যমান। পদ্মাতীরের নৈসর্গিক দৃশ্যগুলির অন্তঃস্থলে অবস্থান ক'রে সীমাহীন নীলিমার নীচে বসে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশিকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। মাটির পৃথিবীর অন্তরের সঙ্গে আপন অন্তরের রাখি বেঁধেছেন। পদ্মা কবিকে ঔদার্যের বাণী শুনিয়েছে—হৃদয় প্রসারের ঐশ্বর্য্যদান করেছে—পদ্মা কবিসত্তার পরিস্ফুটন—পদ্মা কবির কাছে মূর্তিমান রোমাঞ্চ। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বিশীর মন্তব্য অনুধাবন যোগ্য "...পদ্মা কবির কাছে কতখানি সত্য নদীমাত্র রূপে নয়—ভাব বা ভাবমূর্তি মাত্র রূপে নয়, একেবারে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য লৌকিক সত্তা রূপে। কথাটি বেশ ভাল করিয়া না বুঝিলে এই পর্বের কাব্যবোধ অসম্পূর্ণ থাকিবে ও ছোট গল্পগুলির রহস্যোদ্ধার হইবে না।"

পদ্মা প্রকৃতির প্রাণ-স্পন্দন এসব পত্রে মুখর হ'য়ে উঠেছে। তাই ছিন্নপত্র চিরন্তনের রোমান্টিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত হ'য়ে আছে। পদ্মা সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেলেই কবি তার সদ্ব্যবহার করেছেন: "এই খানে নির্জন স্বজনের নিত্য সংগম চলছিল আমার জীবনে, অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবন ধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।...সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ

পাশাপাশি প্রসারিত হ'তে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ ক'রে তুলেছিল আমার এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব লোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। (সোনার তরীর ভূমিকা : রবীন্দ্ররচনাবলী)

ছিন্নপত্র, সোনার তরী, চিত্রা—চৈতালীর সুরে সুরে পদ্মা আর পল্লী প্রকৃতি লীন হ'য়ে আছে। কবির লেখনীর উৎসধারার সঙ্গে যেন পদ্মা মিশিয়েছে তার আপন স্রোতধারা। রূপসী প্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্যের পসারা ছড়িয়ে রেখেছে পৃথিবীর বুকে—তাই জীবনে আর সুন্দরতায় মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এই দু'য়ের মিলনের যে মাধুর্য্য—কবি তার সন্ধান লাভ ক'রেছিলেন পদ্মার অতিথি হ'য়ে। তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে সমালোচ্য গ্রন্থখানি।

প্রকৃতির "বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালায়" পাঠ নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। রূপ মাধুরিমায় হৃদয়ের পাত্রটিকে পূর্ণ ক'রে তুলে প্রকৃতির অঙ্কশায়িত হ'য়ে কবি বড় "বেশী নিজের মত হয়ে পড়েন।" একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছেন "এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌনী ও সর্বদা গুপ্ত সে অংশটি আস্তে আস্তে বের হ'রে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাহত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ ক'রে বেড়িয়েছে; এখানকার দিনগুলো তার সেই অনেক দিনের পদচিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত।" (একশবার)

প্রকৃতির নৈকট্যবোধ কবির যে কতখানি প্রখর তা পুনরায় তাঁর ভাষায়ই শোনা যাক : "আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র জিনিষের মত পড়ে থাকি; তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনাও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলি স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।" (একশ ষোল)

ছিন্নপত্রের শেষের দিকের কয়েকটা চিঠিতে আমরা দেখতে পাই, কবি প্রকৃতির কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-রাশিতে তাঁর মন ভরছে না। নতুন একটা সুর যেন ব্যাকুল হ'য়ে রণিয়ে উঠছে। এবার প্রকৃতির কোল থেকে ভূমার অন্তরে প্রবেশের আকুলতা জেগে উঠেছে। কবি বলেছেন "কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলছে, কে আমাকে অতি নিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে; বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন ক'রে তুলছে। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হ'য়ে যাক, মূঢ় সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের সঙ্গে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি—আমি ধন্য।"

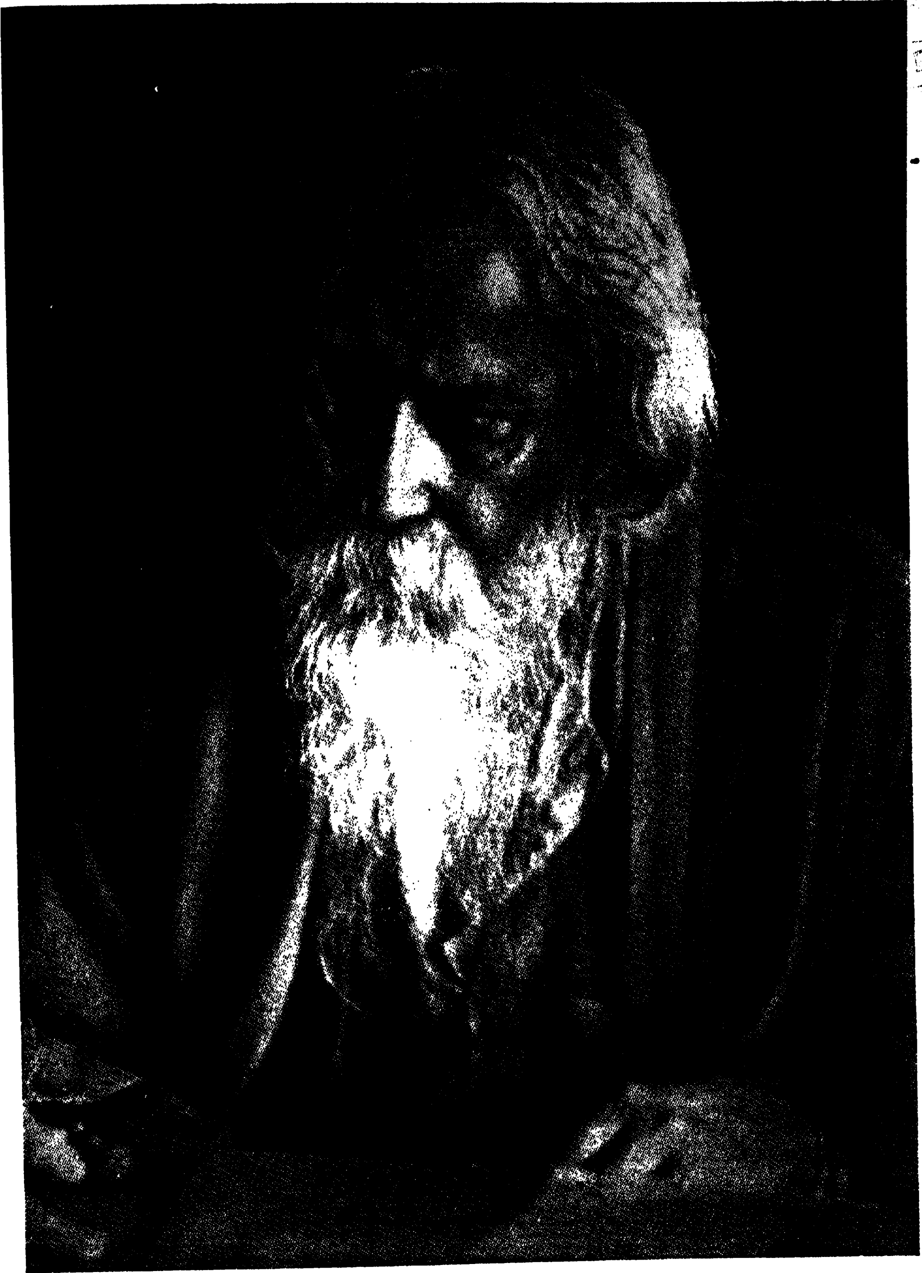
এখানে কবি যেন প্রকৃতির মায়াবন্ধন কাটিয়ে অধ্যাত্মবোধের সন্ধানে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, ছিন্নপত্রে আমরা কবির জীবনের কিছু ব্যক্তিগত খবর পেয়েছি—পদ্মা প্রকৃতির রূপ দর্শন করেছি—পল্লী বাংলার সাংসারিক সুখ দুঃখের বর্ণনা পেয়েছি; কবি-মানসের অতি প্রাকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেছি। তা ছাড়া সমকালীন বহু কবিতা ও গল্প রচনার ইতিবৃত্ত এই পত্রগুলির বুকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সাহিত্য

সলিল বসু

কালের রথে চ'ড়ে আবার পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো আমাদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মমহালগ্নের পর অনেকগুলো পঁচিশে বৈশাখ কেটে গেছে, বছরে বছরে অনেক উৎসব সমারোহ আমরা করেছি। কবির গানে, কবির কবিতায়, কবির ছন্দে, নাট্যে আমরা ভরিয়ে তুলেছি আমাদের এই সময়ের কটা দিন, জীবনকে ক'রেছি ধন্য। কবির বহুধা সৃষ্টির মাঝে আমরা পরশ পেতে চেয়েছি কবির, অবগাহন করতে চেয়েছি তাঁর সৃষ্টি মহিমায়। আলোচনা ক'রেছি তাঁর কত অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে, ছবি নিয়ে। তবে তাঁর যে রচনা, যে সৃষ্টি মহিমা এখনও খুব বেশী আলোচিত হয় নি, সে হ'ল তাঁর বিজ্ঞান সাহিত্য। তিনি কবি, শুধু কবি নন কবিসম্রাট, তাঁর বিজ্ঞান রচনার কথা হয়ত' অনেকে একেবারেই জানেন না, অনেকে জেনেও জানেন না। বাংলার জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্য যে তাঁর বহুধা প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয় নি তার প্রমাণ, তাঁর 'বিশ্বপরিচয়,' জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্য ও তত্ত্বের অপরূপ কাব্যিক ব্যঞ্জনা, অনবদ্য গদ্যছন্দ সুষমায়। রচনার লেখনী ধ'রে তাঁর নিজেরই মাঝে মাঝে সঙ্কোচ লেগেছে, অনধিকার চর্চা মনে ক'রে। তাই তিনি ব'লেছেন, "……হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হো'ল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হোল। যাই হোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি



তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহান—



ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

শিল্পী : পঞ্চানন রায়

কোন মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্য-রসিক ও বিজ্ঞানী এই অত্যাবশ্যক কর্তব্য কর্মে নামেন তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।"

শুধু কবি আর সাহিত্যিকদেরই নয়, প্রকৃতির অপরূপ লীলা যুগে-যুগে বারে-বারে সাধারণ-মানুষের মনে জাগিয়েছে বিস্ময়। চোখে লাগিয়েছে নেশা। প্রত্যুষ তপনকে দেখে, সন্ধ্যার স্বর্ণসূর্য্যকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র, আকাশে লক্ষ তারার 'দেয়ালী'। "ঐ যে আকাশ-বিছানো মেঘসম্ভার, ঐ যে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ, ঐ যে কড় কড় শব্দে ডেকে-ওঠা বাজ, এদের ধেয়ানে মনে তার লাগে পুলক, আঁখিতে ঘনায় বিস্ময়, এদের ধ্বনি শুনে বুকে তার অপূর্ব শিহরণ।" তবুও আদি যুগ থেকে মানুষ অধীর আগ্রহে জানতে চেয়েছে এদের মূল বৈজ্ঞানিক সত্ত্বাকে। সেদিনের গুহাবাসী আদমের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল—সাগরের জলে দোলে কেন নীলের দ্যুতি, আকাশ কেন আসমানী? শুধু আজকের গায়ত্রী বোসই নয়, সেদিনের বনচারিণী ইভের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল, "সূর্য্য কোথা যাও, কেন গো লুকাও……?"

সাধারণ মানুষের এই চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার কিছুটা প্রশস্তির মানসে কবিগুরু লেখনি ধ'রেছিলেন। "তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।'' তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক যুগ এবং সামনে যে যুগ আসছে আসছে তার প্রতি পদক্ষেপে স্বীকার করতে হবে বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি, বিজ্ঞানের চিন্তাধারা। তাই বলেছেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।'' তিনি নিজে বিজ্ঞান সাধক নন, বিজ্ঞান রচনার যথাযোগ্য অধিকার হয়ত' নেই। তাই সে রচনা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন, "আমার তরফে সামান্য কিছু বলার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু ডাক্তারের মতো তাঁর বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার ক'রে নিতে পারে। কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিষ নয়।''

পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-আখ্যায়িকা কবির পরিণত বয়সের রচনা হ'লেও, বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধিৎসা তাঁর জেগেছিল ছোটবেলা থেকেই। শ্রদ্ধেয় সীতানাথ দত্ত মহাশয় প্রায় প্রতি রবিবারেই জোড়াসাঁকোর বৈঠকে যেতেন, আর তাঁরই কাছে শিশু রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান কৌতুহল সুরু। কবির বয়স তখন মাত্র ৮.৯ বছর। একদিকে যেমন তখন ভাবছেন, আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি……,'' অপর দিকে তেমনি দত্তমহাশয়ের কাছে শিখছেন,……আগুনে বসালে তলার জল গরমে হাল্কা হ'য়ে উপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে; জল গরম হওয়ায় হাল্কা হ'য়ে উপরে ওঠে, আর উপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে; জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট ক'রে দিলেন তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারি বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে পড়ে।'' এই হ'ল তাঁর বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার প্রথম সুরু। তারপর প্রায় ১২ বছর বয়সের সময় ডালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁর পিতার সঙ্গে। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে পিতার কাছে শিখতেন কোন্‌টা গ্রহ, কোন্‌টা নক্ষত্র, সূর্য্য থেকে তাদের দূরত্বটাই বা কত, প্রদক্ষিণের সময় কত? এই সব বিবরণী তাঁকে এত বিমুগ্ধ ক'রেছিল যে, তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধই লেখেন এই সময়। "স্বাদ পেয়েছিলুম ব'লেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ।'' এরপর বয়স বাড়ল,' প'ড়তে লাগলেন ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞানের বই, বিশেষ ক'রে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণতত্ত্ব। নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না ব'লে, অনেক সময় 'গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হ'য়েছে,' কিন্তু অসুবিধে হয় নি' খুব—বিশেষ কারণ 'কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়।' এইসব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি নিজেই ব'লেছেন ……"ক্রমাগত প'ড়তে প'ড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা ক'রেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।"

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার দেশে যত হবে, জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাহিত্য ততই জনসমাদৃত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তা' হয়নি।' যা' দু'একখানা বই প্রকাশিত হ'ত তা' বেশীর ভাগই প্রশংসনীয় নয়। তাই ভারাক্রান্ত মনে কবিগুরু বল'লেন "……এক বয়সে যখন দুধ ভালবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকিদেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত ক'রেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন।'' বিজ্ঞান রচনার একটা অন্যতম সমস্যা হ'ল যথাযথ পরিভাষা নিরূপণ। বিজ্ঞানের কোন দেশীয় রূপ নেই, এ' হ'ল আন্তর্জাতিক। তাই পরিভাষা করার সময় নিছক দেশ-প্রেমের দোহাই দিয়ে এমন কোন পরিভাষা ক'রলে চ'লবে না যাতে ক'রে এই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় প্রয়োজন মত একই শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ ক'রতে হবে অবস্থা ও প্রয়োগ বুঝে। কবি ব'লেছেন, "ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে। কিন্তু মাল খুব কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্ত্তব্য বোধ করিনি'। দয়া ক'রে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।……কিন্তু পরিভাষা চর্বজাতের জিনিষ। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য।…… সেই কথা মনে ক'রে যতদূর পারি সহজে বোঝা ভাষার দিকে মন দিয়েছি।''

তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান রচনা 'বিশ্বপরিচয়।' প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, বিষয়বস্তু হ'ল জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্য ও তত্ত্বের কাব্যিক বিশ্লেষণ। বইটি বিভক্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে, পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর জগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোক। এ'ছাড়া শেষ আর একটি পরিচ্ছেদ

উপসংহার, আলোচিত নব্য প্রকৃততত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। সহজ প্রাঞ্জল রসঘন ভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যায় প্রথম নাম ক'রেছিলেন অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। কবিগুরু শুধু এই ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে প্রাঞ্জল ও রসঘনই করেন নি', ক'রেছেন আরও যথোপযোগী। কোন সামগ্রীর ইলেকট্রিক চার্জ বোঝাতে গিয়ে তিনি ব'লেছেন, "পজিটিভ নেগেটিভে যথা পরিমাণ মিলে যেখানে সন্ধি ক'রে আছে, সেখানে যদি কোনো উপায়ে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাৎ ক'রে, তা' হ'লে সেই জিনিষে বিদ্যুতের পরিমাণের হিসাব হবে গরমিল, অতিরিক্ত হ'য়ে প'ড়বে পজেটিভ বৈদ্যুতের চার্জ। মেয়ে পুরুষ মিলে যেখানে গৃহস্থালীর সামঞ্জস্য,সেখানে মেয়ের প্রভাবকে যে পরিমাণে সরিয়ে দেওয়া যাবে, সংসারটা সেই পরিমাণে হ'য়ে প'ড়বে পুরুষ প্রধান, এও তেমনি।" আবার শেষ পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ প্রসঙ্গে ব'লছেন,—অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হোলো ; অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা আছে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হ'চ্ছে, আর বিলীন হ'চ্ছে ; ঘুম আর ঘুমভাঙ্গার মত। তাঁর এই জাতীয় বিশ্লেষণ অভিব্যক্তি পদ্ধতিতে যাতে কোন দিন বিজ্ঞানের অমর্য্যাদার প্রশ্ন উঠতে না পারে, তার পরিসমাপ্তি তিনি ক'রে দিয়েছেন সামান্য কয়েকটি কথায়, "শিক্ষা যারা আরম্ভ ক'রেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না থেকে, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার ক'রলে তাতে অগৌরব নেই।

এই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান পুস্তক রচনা ছাড়াও "লিপিকা," "বৃক্ষবন্দনা" প্রভৃতি কবিতায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বেঁধেছেন সে এক অপরূপ ছন্দে। এ' ছাড়া "নম যন্ত্র, নম যন্ত্র, নম যন্ত্র ; তব লৌহগলন শৈলদলন অচল চলন মন্ত্র" রবীন্দ্র সঙ্গীতটাত' আমরা অনেকেই জানি। পৃথিবীর কোনদেশে কোন ভাষায়, কোন জাত কবি এভাবে যন্ত্রের বন্দনা ক'রেছেন ব'লে ত' জানা নেই। কবিগুরুর 'বিশ্বপরিচয়' দিয়েই বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার সুরু, তারপর আরও কতকগুলো বই তাঁরা প্রকাশ ক'রেছেন বিভিন্ন লেখকের। এ' ছাড়া বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকেও কিছু কিছু বিজ্ঞান পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। আরও কয়েকজন লেখকের কিছু বইও বেরিয়েছে। তবে একথা ঠিক যে কবিগুরু যা' ক'রতে চেয়ে ছিলেন, যথাযথ তা' হ'য়ে ওঠেনি'। নিজে কাব্যজগতের পুরোধা হ'য়েও কবিগুরু বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে যা' ক'রেছিলেন, আমরা অনেকে ডিগ্রীগত ও পেশাগত বিজ্ঞানকর্মী হ'য়েও তার সামান্যতমও ক'রতে পারি-নি,' দেশবাসীর প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করা আমাদের হয় নি'। কবিগুরু হয়ত' অনেক আশা নিয়েই ব'লেছিলেন।

পঁচিশে বৈশাখ চ'লেছে,
জন্মদিনের ধারাকে বহন ক'রে
মৃত্যু দিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।"

কিন্তু হায়! নানা রবীন্দ্রনাথ দূরে থাক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথই আমরা পেলুম না। তাই স্বাগত জানাচ্ছি পঁচিশে বৈশাখকে আর এক সৃষ্টিধর মানুষের জন্মদেবার জন্যে, যার নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর শুনেছি পঁচিশে বৈশাখের সেই মানুষের সৃষ্টির ভেতর। আজ পঁচিশে বৈশাখের সেই মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। পঁচিশে বৈশাখ, জীবনে জীবনে নুতনের ডাক দাও। আমরা আজ তারই প্রতীক্ষায়, আমরা উন্মুখ।

পঁচিশে বৈশাখ

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

একটি মহৎ সূর্য পঁচিশে বৈশাখ মাসে করলো পরিচয়।
সেই পরিচয় নিয়ে এ-দিনটি পূর্ণ ক'রে রেখেছে হৃদয়।
এই দিনে জেগে ওঠে একখানি ভোরের আকাশ,
সে-আকাশে দেখা যায় অপরূপা মানসীর তনুর আভাস।
আলোর কোমল তারে নির্ঝরের স্বপ্নভাঙা গান
বিপুল উচ্ছ্বাসে জাগে,—জীবনের অভিসারে জেগে ওঠে প্রাণ।

মধ্যাহ্নে এসেছে সূর্য, আশ্চর্য ময়ূখে
পৃথিবী ঝলসানো এক দীপ্তি রেখা আকাশের বুকে!
দ্রাক্ষাকুঞ্জ বনে নিচে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরেছে তো ফল,
জীবনদেবতা এসে হাত ধরে ডাক্‌ছে কেবল!
সেই ডাকে দিয়ে সাড়া একা,
খেয়ার একান্তে বসে পরম সুন্দরে যায় দেখা।

বিকেলের শেষ রঙে রাঙা হ'য়ে উঠেছে আকাশ,
অনেক হ'লেও বলা না-বলার গোপন আভাস
নিখিল ভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয় ;
জেলেরা সেখানে সব জাল শুকোবার জন্যে
বহু ব্যথা নিয়ে বসে রয়,
সেইখানে প্রাণ ভেসে যায়,
'কৃষাণের জীবনের শরিক' হ'তে যে মন চায়!
যেখানে হ'লো না পূর্ণ, সেখানে তুলতে ঐকতান
ব্যাকুলতা নিয়ে জাগে গোধূলির প্রাণ,
এই ধরণীর বুকে খুঁজে পায় আনন্দ স্বরূপ,
জীবনের সুর তাই শেষ লগ্নে হয় অপরূপ।
এ-সূর্যের দৃষ্টিমাঝে রূপনারাণের কূলে ফুটে ওঠে সত্যের স্বাক্ষর ;
ছলনাময়ীর জাল ছিন্ন করে সৃষ্টিপথে দিয়া দেয় অরূপ সুন্দর!

অস্ত সিন্ধুপারে এসে রবি,
পূরব দিগন্তপানে পাঠায়েছে অন্তিম পূরবী।
তবু জানি, অন্ত নেই এ সূর্যের যুগে যুগান্তরে,
পঁচিশে বৈশাখ রাখে ধ'রে।



বিপিন বকসী আমার দাদামশায়ের আমলের লোক। ঢুকেছিলেন মুহুরী হয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর হয়ে দাঁড়ালেন মুরুব্বী। আমাদের একটি ছোটখাট জমিদারী ছিল। তার দেখাশুনো, ক্ষেত ক্ষামারের বিলি ব্যবস্থা, চাষআবাদ, আদায় তহশিল—সবই চলে গেল ওঁরহাতে। বাবা কাকা কিঞ্চিৎ সমীহ করে চললেও, আমাদের স্তরে বিপিনদার সম্পর্কটা ছিল সহজ বন্ধুত্বের। আমি যখন কলেজে ঢুকেছি, ওঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তিন-কুলে কেউ কোথাও নেই, বিয়ে থাও করেনি। তাই নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা করতাম। এই প্রসঙ্গেই একদিন তাকে বলতে শুনেছিলাম, কি জানো, দাদুভাই, বিয়েটা হচ্ছে ঠিক ডাঙা জমির পয়লা চাষ। সময়মত হল তো হল। তা নৈলে আর হয় না। জো চলে যায়।

মনে আছে খুব হেসেছিলাম বিপিনদার এই অদ্ভুত থিওরী শুনে। কখনো ভাবিনি অভিজ্ঞ বৃদ্ধের এই সরস পরিহাস (তাই বলেই ধরে নিয়েছিলাম) আমার জীবনে একদিন কঠোর সত্যের রূপ নেবে। বিয়াল্লিশ পেরিয়েও

যখন কৌমার্যের উষরতা ঘুচল না, তখন আমারও ঠিক ঐ কথাটাই মনে হয়েছিল—

জো চলে গেছে। বিপিনদা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এক গাল হেসে মাথা নেড়ে বলতেন, কেমন, বলিনি ?

বিপিন বক্সীর জীবনে কী ঘটেছিল, যার ফলে পয়লা চাষটা ঠিক সময়ে পড়েনি, সেটা তিনি কোনদিন খুলে বলেননি। হয়তো আমারই মত ঠিক কারণটা তার জানা ছিলনা। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমিই বা কী উত্তর দেবো ? শুধু বলতে পারি 'জো'টা যে কখন এল আর চলে গেল, বুঝতে পারিনি।

একথা অস্বীকার করতে পারিনা, আমার বেলায় এই 'পয়লা চাষ' সম্বন্ধে আর কেউ না হলেও আমার মা রীতিমত সজাগ ছিলেন। তবু যে কেন হলনা, কোথা দিয়ে বেলা বয়ে গেল, সে কথা এখন থাক। পরের অংশটাই আগে বলি।

অন্য দশজন ভদ্র সন্তানের মত আমিও যথাসময়ে এম-এ পাশ করলাম। সাধারণভাবে পাশ করলে হয় তো ঐখানেই দাঁড়ি টানতে হত, এবং তারপর যথারীতি চোখ-বুজে সংসার নামক ঘানি টানতে শুরু করতাম। কিন্তু যেহেতু পরম-কারুণিক বিশ্ববিদ্যালয় আমার নামটাকে টেনে একেবারে সকলের মাথার উপরে তুলে দিয়েছিলেন, আমার আর তখন থামবার উপায় রইল না। আরও উপরে চড়বার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লাম। বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহ এবং যথাস্থানে মুরুব্বীর অভাব ছিলনা। সুতরাং গৌরীসেনের অর্থেই সাগর পাড়ি দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বছর কয়েক পরে ভূতত্ত্ব বিষয়ে বিশাল বিদ্যা এবং ততোধিক বিশাল একটি সরকারী চাকরি সংগ্রহ করে যখন দেশে ফিরলাম, তখন আমার পারিবারিক বন্ধন প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে গেছে। বাবা অনেক আগেই গিয়েছিলেন, মা নেই, দিদিরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, ভাই কোনোদিন ছিলনা। আর যারা আছেন, তারা আমার মত বিলাত-ফেরৎ বড় চাকরে সম্বন্ধে 'শত হস্তেন বাজিনঃ' এই সনাতন চাণক্য নীতি অবলম্বন করে চারদিকে উল্টো কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন, 'দীপক কি আর সেই দীপক আছে ? এখন সে মস্ত বড় সাহেব, আমাদের মত গরীব কালা-আদমির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের ?'

এই ঘটনার মূলে ষষ্ঠ রিপুর সেই চিরন্তন কারসাজি লক্ষ্য করে আমিও তাদের কাছে ঘেঁষবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করলাম।

তারপর বছরের পর বছর মাটির তলায় নুড়ি আর পাথরের ঢেলা দিয়ে ঘেরা যে জগৎ তার মধ্যেই ডুবে রইলাম। মহাকাল যে অদৃশ্য লিপি লিখে রেখে গেছে ভূগর্ভের স্তরে স্তরে, যেখানে সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে তারই পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করলাম। মাটির উপরে যে বিচিত্র জীবজগৎ প্রতিদিন নব নব রূপে অশ্রুহাসির মালা নিয়ে মানুষকে আহ্বান করছে, তার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর হলনা। আলো বাতাস আর আকাশে জড়ানো এই প্রাণময় পৃথিবীর দরজা আমার কাছে রুদ্ধই রয়ে গেল।

বিধাতার রাজ্যে 'নারী' নামক যে অপরূপ সৃষ্টি তার সম্বন্ধে আমি কোনোদিন উৎসুক ছিলামনা, একথা যেমন বলা চলেনা, তেমনি, 'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া'—এটাও সত্য নয়। বারম্বার নয়, একবার বোধহয় ডেকেছিলাম। 'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে' দ্বারও খুলেছিল। তারপর সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে। সে সব অনেক কাল আগেকার ইতিহাস। পরের অধ্যায়ে পট বদলে গেল। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল বেলা। হঠাৎ একদিন চমকে চেয়ে দেখলাম, আঙিনার কোলে অপরাহ্ণের প্রলম্বিত ছায়া।

বাংলা দেশেরই একটা পাহাড়ী অঞ্চল। নাম-ধাম গুলো অনুক্ত রাখতে চাই। তার কারণ আমার এ কাহিনীর পক্ষে সে সব অনাবশ্যক। আরও একটা কারণ আছে। লেখাটা পাঠিকামহলের নজরে পড়তে পারে। তাতে করে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু এ আখ্যায়িকার শেষ দৃশ্যে যার আবির্ভাব ঘটবে, স্ত্রীজাতির অতি-কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে হয়তো তারা এমন কোন তথ্য আবিষ্কার করে বসবেন, যা আমি বলতে চাইনি। তাই এই সামান্য গোপনতার আশ্রয় নিতে হল।

জিলা সহর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ের কোলে ভূতত্ত্ব-বিভাগের খনন-কার্য চলছে।

চাঞ্চল্যকর তথ্য-উদ্ধারের সম্ভাবনা। সুতরাং দিল্লী থেকে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। সারাদিন কাদামাটি আর পাথর ঘাঁটাঘাঁটির পর সন্ধ্যাবেলা সহরের সার্কিট হাউসে ফিরে এসেছি। যে জায়গায় আমাদের কাজ চলছে, সেখানে বা তার আশেপাশে আমাদের মত নুড়ি-কারবারী ছাড়া আর কারো কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। সুতরাং রাস্তা বলতে কিছু নেই। কোথাও চষা ক্ষেত, কোথাও উঁচু নিচু পাথুরে জমি, যাকে অতিক্রম করা জীপের মত বাহন এবং জিওলজি-ডক্টরের মত বাহকের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু জিওলজিষ্টের মনটা পাথর হয়ে গেলেও দেহের কাঠামোটা হাড়ের। যখন ফিরলাম, মনে হল তার কোনোটাই বোধহয় আস্ত নেই। জীপ থেকে নেমে কোনো রকমে সেগুলোকে টেনে নিয়ে বিছানায় ফেলতে পারলে হয়।

আমার আস্তানা ছিল চার নম্বর ঘরে। তালা খোলার জন্যে চৌকিদারকে ডাকতেই সে সবিনয়ে সেলাম করে এগিয়ে ধরল একখানা চিঠি। পড়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠলেও বুঝলাম করবার কিছু নেই। কালেক্টর জানাচ্ছেন, বিকালের দিকে হঠাৎ স্কুলসমূহের ডিভিশনাল ইনস-পেকট্রস্ সাহেবা বিনা নোটিসে এসে পড়াতে আমার ঘরেই তাকে জায়গা দিতে হয়েছে। বাকী কামরাগুলো আমার আসবার আগে থেকেই booked. অতএব ড্রইং রুমের একধারে একখানা ক্যাম্পখাট বসিয়ে দেওয়া ছাড়া তিনি আমার জন্যে আর কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে বিশেষ দুঃখিত।

চিঠির শেষ কটি লাইনে রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। লেখা আছে—'অবশ্য আইন অনুসারে সকলের পরে যিনি আসবেন, এ ব্যবস্থা তার বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি মহিলা, অতএব কালেক্টর আশা করেন ডক্টর ব্যানার্জি (অর্থাৎ আমি) এই অনিচ্ছা-কৃত অসুবিধাটুকু সিভালরি অর্থাৎ মধ্যযুগীয় নাইট-সুলভ বীরত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।'

ডিনার নামক প্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাট সংক্ষেপে মিটিয়ে ফেলে একটু সকাল সকালই ক্যাম্পখাটের আশ্রয় নিলাম। আমার চোখের সামনেই চার নম্বরএর দরজা খোলা। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, গতরাত্রে আমি সে আরামদায়ক স্প্রীংএর শয্যায় রাত্রিযাপন করেছি, তার উপর নতুন 'হোল্ডল'এ জড়ানো অন্য লোকের বিছানার বাণ্ডিল, পাশে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস, গায়ে শাদা অক্ষরে নাম লেখা। এধার থেকে শুধু একটা কথা পড়া যাচ্ছে—মিস্, বাকীটুকু আড়ালে পড়ে গেছে। একটা চাপরাশী গোছের লোক ঘোরাঘুরি করছে। আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

দুর্গ্রহের মত হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যে ব্যক্তি আমার রাত্রির আশ্রয়টুকু কেড়ে নিলে, তার সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাব ছাড়া আর কী থাকতে পারে? কিন্তু, কি আশ্চর্য! ঐ মহিলাটি সম্বন্ধে আমি যেন মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। যাকে চিনি না, হয়তো কখনো চোখেও দেখিনি; কোথাকার কোন্ মেয়ে-ইস্কুলের ভ্রাম্যমান-পরিদর্শিকা', তারই একটা কল্পিত রূপ আমার মনের মধ্যে জুড়ে বসল। অজ্ঞাতসারে ভাবতে শুরু করলাম, মহিলাটি কেমন দেখতে, কত বয়স, কী ধরণের বেশভূষা, কেমন স্বভাব। আমি যাদের দেখেছি, আমার মনের উপর ক্ষণেকের তরে যাদের ছায়া পড়েছিল, (খুঁজে দেখলে তার একটু অস্পষ্ট আভাস হয়তো এখনো লেগে আছে), তাদের মধ্যে কেউ নয় তো? তাই যদি হয়, বেশ মজা হয় কিন্তু।

শুনেছি, কবিরা কল্পনার সঙ্গে 'জাল'এর তুলনা করে থাকেন। কিন্তু জাল বুনতে হয়, কল্পনা নিজেকে নিজেই বুনে চলে। একবার রাশ খুলে দিলে আর রক্ষা নেই, চোখের পলকে ছেয়ে ফেলে বিশ্বসংসার।' সেদিন আমার সেই বিশ্বগ্রাসী কল্পনার জালে কত দৃশ্য যে ধরা দিল, যাদের একটিবার দেখে ভুলে গেছি, কিংবা একেবারেই দেখিনি! বিস্মৃতির কুহেলীঢাকা অলিগলি পার হয়ে একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, একদিন আমার নব-জাগ্রত যৌবন-দুয়ারে যে ছিল বিশেষ জন, অনেকের মধ্যে যে একক, বহুর মধ্যে অনন্যা। তাকে ঘিরে, যা জানি তাই শুধু নয়—যা জানিনা, হয় তো কোথাও শুনেছি কিংবা শুনিনি, এমনি কত উদ্ভট, অবাস্তব ছবি ছায়া-চিত্রের মত আমার নিমীলিত চোখের উপর ভেসে বেড়াতে লাগল।

তারপর কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

রাত কত জানিনা। ঘুমের মধ্যেই যেন দেখলাম, কে একজন আমার খাটের পাশে এসে বসল। মশারি খাটানো ছিল; চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেলনা। জিজ্ঞাসা করলাম, কে? তরুণ কণ্ঠে জবাব এল, তার মধ্যে একটু যেন কৌতুকের সুর, চিনতে পারছ না?

—না তো।

—'আমি তোমার 'একুশ বছর'।

—একুশ বছর!

—হ্যাঁ।

—তাই যদি হয়, তোমাকে তো অনেক দিন হল পেছনে ফেলে এসেছি। এতকাল পরে আজ হঠাৎ—

—ডাকলে বলেই এলাম।

—তোমাকে ডেকেছি!

—ডেকেছ বৈকি? শুধু আমাকে নয়, আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকেই তো ডাক দিয়েছ। তার মধ্যে বিশেষ করে একজনকে।

আমি চুপ করে রইলাম। মিনিটখানেক বিরতির পর আবার শুনলাম, সে বলছে, আচ্ছা, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে?

—কোন্ দিন?

সেই যেবার এম-এ পরীক্ষার পর দেশে গিয়েছিলে। একদিন বৈকালিক জল-খাবারের নাম করে মা তোমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারনি। ঘরে ঢুকেই চমকে উঠেছিলে। কার্পেটের আসনের সামনে তোমার মিষ্টান্নের থালা। তার ডান পাশে আর একখানা আসনে জড়সড় হয়ে বসে ছিল একজন। তখন 'গোধূলি বেলা। উল্টোদিকের জানালা পার হয়ে অস্তমান সূর্যের কয়েকটি রক্তাভ রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মুখের উপর। তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল লজ্জার লালিমা। এক ঝলক দেখেই তোমার মনে হয়েছিল মুখখানা অপরূপ। সেও একবার চকিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেছিল তোমার দিকে। দুটি স্বপ্নময় নীলাভ চোখ। তারপর আর মুখ তোলেনি। তুমিও আর তাকাতে পারনি। ঘেমে নেয়ে উঠেছিলে। কোনো রকমে ঘাড় গুঁজে মিষ্টিগুলো নাড়া-চাড়া করে উঠে পালিয়ে গিয়েছিলে নিজের ঘরে। মা পেছন থেকে বলেছিলেন, "একি! সবই যে পড়ে রইল। যাচ্ছিস কোথায়? শোন।" তুমি ফিরে চাও নি। অস্ফুট স্বরে শুধু বলেছিলে, খিদে নেই।'……মনে পড়ছে?

সাড়া দিলাম, 'বলে যাও।'

'একুশ বছর'এর কাহিনী এগিয়ে চলল—'সেই রাতেই মা এলেন তোমার ঘরে। তুমি চুপ করে শুয়েছিলে। আলোটা ভালো লাগেনি, অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছিলে। তন্ময় হয়ে ভাবছিলে সেই সন্ধ্যাটির কথা। মা আসতেই ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েছিলে। মা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'উঠছিস কেন? শুয়ে থাক।' তারপর আলোটা একটু উসকে দিয়ে তোমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, মেয়েটি বেশ সুন্দর, নারে?

—'কার কথা বলছ?' না-বোঝার ভান করেছিলে তুমি।

—যাকে দেখলি।

—তা কি জানি? আমি ওদিকে তাকাই-টাকাই নি।

—আচ্ছা, আরেক দিন ডাকবো। ভালো করে দেখিস। যা যা তোর জানবার ইচ্ছে, জিজ্ঞেস করিস। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। এই তো সবে পনেরোয় পা দিয়েছে এরই মধ্যে কত কী শিখেছে। ওর বাবা যে ওকে নিয়ম করে পড়ান। গলাটা কী মিষ্টি; ঠিক যেন একটি দোয়েল পাখি। গানও শিখছে। তা ছাড়া সংসারের যা কাজ; রান্না-বান্না সেলাই-ফোঁড়াই মোটামুটি সবই জানে। মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে সবই করতে হয়। লোকজন তো নেই। বাপ সামান্য মাষ্টারি করে। কোন রকমে চলে।

তুমি কোনো সাড়া দিচ্ছনা দেখে মা বলেছিলেন, কী হল? তুই যে কিছুই বলছিস না, দীপু?

—কী বলবো?

—আচ্ছা আজ থাক। আরেক দিন ভাল করে দেখে তখন বলিস।

দেখার ব্যবস্থা তুমিই করে নিয়েছিলে, মা কবে কি করবেন, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকনি।

ঐ মেয়েটির বাপ মাস কয়েক আগে সেকেণ্ড-মাষ্টারের

চাকরি নিয়ে তোমাদের গ্রামে এসেছেন। বাসা ছিল গ্রাম ছাড়িয়ে ইস্কুলের পাশে যে মাঠ, তারই ধারে। কাছেই তোমার ঠাকুরদার আমলের বড় পুকুর। চারদিকে আম-বাগান, জায়গাটা হঠাৎ তোমার ভালো লেগে গেল। রোজ বিকেলে একা একা বেড়াতে যেতে। সেইখানে সেই ছায়া-ঢাকা পথের ধারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ঠিক হঠাৎ নয়। তুমি জানতে ঐ সময়ে ঐ পথ দিয়ে সে কলসী কাঁখে জল নিয়ে বাড়ি যায়। তুমি যা ভয় করেছিলে, তা হয়নি। পালায়নি, চমকেওযায়নি। মনে মনে সেও বোধহয় চেয়েছিল এই গোপন দেখার মাধুর্যটুকু। তোমার ভরসা হল। কাছে গিয়ে বললে, 'একি! আপনি এখানে!' যেন অত বড় একটা বিস্ময়কর ব্যাপার তুমি একেবারেই আশা করনি। সে বোধহয় ধরে ফেলেছিল তোমার ছদ্মবেশ। বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিয়েছিল, কেন আপনি জানেন না? পাশেই আমাদের বাড়ি, রোজই তো এই পুকুরে জল নিতে আসি।

—ও, তাই নাকি? কই, আমাদের বাড়ি তো আর গেলেন না?

সে হেসে উঠেছিল।

—হাসছেন যে?

—আমাকে বুঝি 'আপনি' বলতে হয়?

—ও, আচ্ছা বেশ; 'তুমিই' বলছি। মা তোমার কথা বলেন। একদিন যাওনা কেন?

কোনো কথা না বলে সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠল। সাড়া না পেয়ে অভিমান হল তোমার। ক্ষোভ-মেশানো উদাস সুরে বললে, যেতে যদি ইচ্ছে না হয়, থাক। আমি তো আর জোর করতে পারি না।

—আমি তাই বলেছি নাকি?

—তবে কী?

—লজ্জা করে না বুঝি?

—কেন, লজ্জা কিসের?

—আপনি যেন কিছুই জানেন না?

—বাঃ, আমি কেমন করে জানবো?

একটু বোধ হয় সংশয়ের ছায়া পড়েছিল তার মনের কোণে। তারপরেই তোমার মুখের পানে এক পলক তাকিয়ে বুঝে ফেলেছিল, ওটা তোমার ছল। না-জানার ভান করে, 'লজ্জার' সেই মধুর কারণটুকু ওর মুখ থেকে শুনতে চাও। তাই তোমার কথার জবাব না দিয়ে অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে সুধা ঢেলে বলেছিল, 'যান, আপনি ভারী দুষ্টু।' মাথাটা আরো নুয়ে পড়েছিল মাটির দিকে। তুমি ওর একান্ত কাছটিতে সরে গিয়েছিলে। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠেছিল। ইচ্ছা হয়েছিল ঐ সলজ্জ হাসি-রঞ্জিত আনত মুখখানা দুহাতে একটিবার তুলে ধরে—। কিন্তু পারনি। বড্ড ভীরু ছিলে তুমি। শিক্ষা, সংস্কার এবং চিরাচরিত সংযমের পাশ তোমার হাত জড়িয়ে ধরেছিল। সে কিন্তু এতটুকু আপত্তি করতনা। হয়তো মনে মনে অপেক্ষা করে ছিল।

তারপর আরো কতবার দেখা হয়েছে তোমাদের। তোমার মা ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওর বাবাও তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। পাশে বসিয়ে মেয়েকে দিয়ে পরিবেশন করিয়ে খাইয়েছেন তার নিজের হাতের রান্না। তোমার সঙ্গে কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে মুগ্ধ হয়েছেন সেকেণ্ড-মাষ্টার ভূপতিবাবু। তোমাকে ভালবেসেছিলেন। তুমি তো শুধু ধীমান নও, শ্রীমান। বিদ্যায়, বিনয়ে, স্বভাবে, আচরণে তোমার জোড়া কোথায়? মারও ওঁদের সবাইকে বড় ভাল লেগেছিল। দরিদ্র, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ পরিবার।

আজ হয়তো তুমি স্বীকার করবে না, কিন্তু আমি তো জানি, তোমার বুকের মধ্যে বসে দেখেছি, সেদিনকার সেই কাঁচা মনের উপর মাধুরীর মধুর মুখখানা গভীর দাগ কেটে বসে গেছে। তাকে তুমি ভালবেসেছিলে এবং সেকথা কারো কাছেই অস্পষ্ট ছিল না। সেই জোরেই মা তাদের কথা দিয়েছিলেন। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেননি। অনেকক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে থেকে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার মত ভাগ্যবান কে? কিন্তু আপনার ঐ হীরের টুকরো ছেলে। ওর যোগ্য সম্মান দিতে পারি, সে সঙ্গতি তো আমার নেই।

মা বলেছিলেন, আপনাকে কিছুই করতে হবে না, বেয়াই মশাই। শুধু আপনার মাধুরীর হাতখানা আমার দীপকের হাতে তুলে দিয়ে দু'জনকে আশীর্বাদ করবেন।

—আপনার অশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু তারও তো একটা

অনুষ্ঠান আছে, আয়োজন আছে। সেটুকু যে করে উঠতে পারবো—

—সে ভারও আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। মনে করুন, মাধুরী আমারই মেয়ে, আমিই তার বিয়ে দিচ্ছি।

•

কিছুদিন পরেই তুমি কলকাতায় ফিরলে। এম্-এ পরীক্ষার ফল বেরোল। সকলের উপরে তোমার নাম, কাগজে কাগজে তোমার ছবি, তোমার অসামান্য কৃতিত্বের বিবরণ। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, সতীর্থ, অধ্যাপক—সবারই মুখে এক কথা—সাবাস! একদল তাতিয়ে তুললেন, না, এখানে থেমে গেলে চলবে না; এগিয়ে চল। দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু চায়, অনেক বেশী তার প্রত্যাশা। তোমাকে তা পূর্ণ করতে হবে।

পুরুষের জীবনে সব চেয়ে বড় মোহ বোধ হয় যশের মোহ, সব চেয়ে প্রবল আকর্ষণ কীর্তি। তারই দূরাগত দীপ্তি তোমার দুচোখ ঝলসে দিলে। তার পাশে, জীবনের আর যত প্রাপ্তি ও পাওনা, ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাস কয়েকের মধ্যেই তুমি পশ্চিমের পথে ভেসে চললে।

মা প্রথমে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলেন। বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর অনুমতির অপেক্ষা তুমি করবে না। শুধু বারংবার পীড়াপীড়ি করেছিলেন বিয়েটা হয়ে যাক। তুমি রাজী হওনি। লিখেছিলে, 'আমার সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কবে ফিরব, কি নিয়ে ফিরব, জানি না। এ অবস্থায় আর একজনের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইনা।' মা জানতে চেয়েছিলেন, ওরা কি অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করে থাকবে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, 'না, তার দরকার নেই। ইচ্ছা হলে ওঁরা অন্যত্র সম্বন্ধ করতে পারেন।'

এই স্পষ্ট উক্তির পরেও যাবার আগে একটি বার দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন তোমার মা। তুমি সময় করতে পারনি। আমি জানি, সেটা মিথ্যা কথা। মায়ের এবং মাধুরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ তোমার ছিল না, সাহস হয়নি।

ফিরে এসে মাকে আর দেখতে পাওনি। যে আঘাত দিয়ে গিয়েছিলে, তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যাবার পরেই সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন, সেই তাঁর শেষ শয্যা।

আর মাধুরী? তার মনের খবর কেউ পায়নি, আমিও জানিনা। মুখ ফুটে কেউ তাকে কোনোদিন কিছু বলতে শোনে নি।

তুমি কি সত্যিই তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছিলে? আমি তোমার 'একুশ বছর।' আমাকে তুমি পেছনে ফেলে চলে গেলে। কিন্তু তোমার চোখে আমার এই দৃষ্টি, তোমার মনে আমার এই স্পর্শ, তখনো লেগেছিল, অনেক দিন কাটিয়ে উঠতে পারনি। কেউ পারে না। সাগরের ওপারে বসেও নানা কাজের মাঝে তোমার তরুণ মন এক একবার চঞ্চল হয়ে উঠত। সামনে পড়ে থাকত খোলা বইএর পাতা। তার সেই শুকনো অক্ষরের বন্ধন ছাড়িয়ে তোমার উদাস চোখ দুটি কখন জানালা দিয়ে চলে যেত দূরে কুয়াশা-ঢাকা আকাশের গায়। সেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠত একখানা মুখ, পাতলা ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠত, তারি ভিতর থেকে বাঁশীর সুরে ভেসে আসত দুটি একটি সরমে-জড়ানো কথা। কথা না, যেন গান। তারপর সশব্দে জানালা বন্ধ করে সমস্ত মনটাকে তুমি গুটিয়ে এনে ফেলতে সেই পুঁথির পাতায়। মনে মনে আবৃত্তি করতে, না, না, এ চলবে না। আমাকে বড় হতে হবে, আরো বড় হতে হবে। I must get rid of this idle sentiment.

তোমার সাধনা সফল হল। যখন ফিরে এলে, কীর্তিমান, কর্মী পুরুষ। মাধুরী নামে যে একটি অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা কবে কোন দুর্বল মুহূর্তে ভীরু পদক্ষেপে তার অন্তরের খোলা দ্বার পথে দুদিনের তরে দেখা দিয়েছিল, সেদিনকার দীপক ব্যানার্জির কাছে সে ঘটনাটা নিতান্তই তুচ্ছ ও হাস্যকর। কোথায় সে মাধুরী, কেমন আছে, কিংবা আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহলও তার মনে লাগেনি।

বিদেশে থাকতে মা তোমাকে যে-সব চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে সামান্য কুশল প্রশ্ন ছাড়া বড় একটা কিছু থাকত না। এ কথা একবারও জানান নি, শেষ কটা দিন ঐ মাধুরীই ছিল তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গিনী। ও যা করেছে, তাঁর নিজের মেয়েরা তার সিকি ভাগও করতে পারেনি। দিন

ততই ঘনিয়ে আসতে লাগল—ঐ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর একটা তীব্র অশান্তি বোধ করতেন বুকের ভিতর। তারপর একদিন ওর বাবাকে ডেকে পাঠালেন। নিজে থেকেও মাঝে মাঝে আসতেন ভূপতিবাবু। সেদিন সবাইকে ঘর থেকে সরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার একটা শেষ অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। বলুন রাখবেন?

তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। জিব কেটে বললেন, অমন করে বললে যে আমার অপরাধ হয়। আপনি জানেন না, আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশ।

মা একখানা খাম তাঁর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, এই কটা টাকা আমি মাধুরীর বিয়ের জন্যে তুলে রেখেছিলাম। আমার তো আর দেখে যাওয়া হল না। আপনি আমার হয়ে একটি ভালো ছেলে দেখে ওকে পাত্রস্থ করবেন।

ভূপতিবাবু জোড় হাত করে বললেন, আপনার কাছে আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি তার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না। তার ওপরে সে বোঝা আর বাড়াবেন না। ওকে শুধু আশীর্বাদ করে যান। লক্ষ টাকার চেয়ে তার দাম অনেক বেশী।

মা বললেন, কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছিলাম, ওর বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার আমার।

—তার জন্যে আপনি মনে কোনো ক্ষোভ রাখবেন না। যাকে উপলক্ষ করে কথা দিয়েছিলেন, তাকেই যখন পেলাম না, শুধু কতগুলো টাকা দিয়ে আমি কী করবো?

মায়ের মনেও ঠিক এই আশঙ্কা ছিল। ভূপতিবাবুকে তিনি চিনতে ভুল করেন নি। এই দারিদ্র্য-ব্রতী ইস্কুলমাষ্টারটিকে বিধাতা ধনদৌলত থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু একটি বড় সম্পদ অকাতরে দান করেছিলেন—তার নাম চরিত্রবল। কোনো অবস্থাতেই একে দান বা অনুগ্রহগ্রহণে সম্মত করা যাবেনা, একথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই ও নিয়ে আর বৃথা পীড়াপীড়ি করেন নি।

কিন্তু মন যে কিছুতেই স্থির হতে চায়না। কদিন পরে ঐ খামখানা মাধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, তুলে রাখ। বাড়ি যাবার সময় নিয়ে যাস।

খোলা মুখ দিয়ে হাজার টাকার পাঁচটি বাণ্ডিল দেখা যাচ্ছিল। মাধুরী চমকে উঠল, সর্বনাশ! এতটাকা নিয়ে আমি কী করবো?

—কি করবি মানে! একটা মেয়ে পার করতে কত লাগে খবর রাখিস?

—দরকার নেই আমার খবর রেখে। আমি তো আর মেয়ে পার করতে যাচ্ছি না।

—পাগলামি করিসনা মাধু। ও টাকা আমি তোর নাম করে রেখেছি। না নিলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

মাধুরীর চোখ ছল ছল করে উঠল। বলল, এ হুকুম আমাকে করোনা মা। দিতে যদি হয়, বাবাকে দিও।

—তিনি নিলেন না।

—তবে আমাকে নিতে বলছ কেন?

—বলছি এই জন্যে যে তুই আমার মেয়ে। আমার কাছ থেকে কোনো কিছুই নিতে তোর বাধা নেই, লজ্জা নেই।

মাধুরী তখনো মাথা নিচু করে বসে আছে দেখে মা সেই অবস্থাতেও রুক্ষ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন গর্জন করে উঠলেন, কিছুই যদি না নিবি হতভাগী, তবে কেন এসেছিলি আমার কাছে? কাল থেকে আর আসিস না। তোর মুখ দেখতে চাইনা আমি।

মাধুরী দুহাতে মায়ের সেই শীর্ণ দেহখানা জড়িয়ে ধরে বলল, মাগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। নেবো, নেবো, তুমি যা দেবে, আমি মাথায় করে নেবো।

বলে, সেই খামখানা পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকাল। দারুণ উত্তেজনার পর মা নির্জীবের মত পড়ে রইলেন। বহুদিন পরে সেই রোগক্লিষ্ট মুখখানার উপর যেন একটা গভীর প্রশান্তির স্নিগ্ধ আভা ফুটে উঠল।

পরদিন মা যখন আবার একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন, মাধুরী তাঁর বুকে হাত বুলোতে বুলোতে আব্দারের সুরে বলল, তোমার কথা আমি শুনেছি। আমার একটা কথাও কিন্তু শুনতে হবে তোমাকে।

মা খুশির সুরে বললেন, তোর কোন্ কথা আমি শুনতে বাকী রেখেছি, মুখপুড়ী?

মাধুরীর কণ্ঠে গাম্ভীর্যের সুর বেজে উঠল—তোমার ঐ টাকা আমার বিয়ের পেছনে খরচ করতে বলোনা।

—ওমা! তবে কী করতে চাস ও দিয়ে?

—আমার যা ভালো বলে মনে হবে, তেমন কাজে যেন লাগাতে পারি, এই অনুমতি দিয়ে যাও।

মা একটু কী ভাবলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ তাই করিস।

মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যাবার পর মাধুরী একদিন বাবাকে গিয়ে ধরল, বাবা আমি পড়বো। আমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দাও।

—স্কুলে! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, মা।

—টাকা আমি দেবো।

মাধুরী সেই খামখানা এনে তুলে দিল বাবার হাতে। তার পিছনে যে ইতিহাস—একটু একটু করে তাও সব খুলে বলল। ভূপতিবাবু নিঃশব্দে শুনে গেলেন, কিছুই বললেন না। কয়েকদিন পরেই মেয়েকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পড়াশুনোয় সে বাড়িতেই অনেকখানি এগিয়ে ছিল। হেড্‌মিস্ট্রেস মোটামুটি পরীক্ষা করে খুশি হলেন এবং একেবারে সব চেয়ে উপরের ক্লাসে নিয়ে নিলেন। পাশেই বোর্ডিং। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা হল।

পরের বছর স্কলার-সিপ্‌ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল মাধুরী। ঢুকল কলেজে। তারপর এগিয়ে চলল এক ধাপের পর আরেক ধাপ········

* * * *

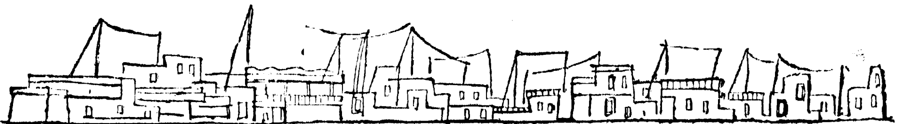
তন্ময় হয়ে শুনছিলাম সেই একটানা গুঞ্জন ধ্বনি। সহসা ছেদ পড়তেই বলে উঠলাম, 'তারপর ?'

কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, সার্কিট হাউসের ড্রইং রুমে সেই ক্যাম্পখাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। ভোর হয়ে গেছে। চাকর-বাকরদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শরীর ও মন দুই-ই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বেরোবার মত তৈরি হয়ে নিতে বেশ খানিকটা দেরি হল। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গিয়ে যখন বসলাম, অন্য সকলের ঐ পর্বটি তার আগেই শেষ হয়ে গেছে। যার যেখানে দরকার, বোধহয় বেরিয়েও পড়েছেন। বেয়ারাকে চলে যেতে বলে কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছি। একটি নারীকণ্ঠ কানে যেতেই চমকে উঠলাম। লম্বা ডাইনিং হল-এর একেবারে ওদিকের দরজা দিয়ে বলতে বলতে ঢুকলেন একজন মহিলা—আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম। কী কাণ্ড বলুনতো। আমার জন্যে আপনাকে সারারাত ঐ ড্রইং রুমের ক্যাম্পখাটে······। ছিঃ ছিঃ আগে জানলে আমি ডাকবাংলো কিংবা—

হঠাৎ থেমে গেলেন। আমারও মাথার ভিতরটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। ইনি কি সত্যিই কোনো শারীরী প্রাণী, না গত রাত্রির স্বপ্নের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে ?

বিহ্বল চোখে তাকালাম। দেখলাম স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুটী নীলাভ তারা, একটু যেন ক্লান্ত।



বহুবাজার শিশুহত্যা মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

এই মামলাটি 'বৌবাজার শিশু হত্যার মামলা' রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। ১৯৩৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আমি বহুবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রূপে কার্যে বাহাল ছিলাম। এই সময় একদিন শীতের রাত্রে প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকায় আমি থানার অফিসে বসে অধস্তন অফিসারদের লিখিত স্মারক-লিপিসমূহের উপর আপন মন্তব্য সহ হুকুম-নামা লিখে যাচ্ছি, এমন সময় দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত একটি সুবেশ গুজরাটী যুবক থানায় প্রবেশ করে একেবারে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'নমস্কার স্যার! এই থানায় আমার একটা এজাহার দেবার আছে। এই এজাহারটি হচ্ছে খুনের এবং এই খুনের আমি নিজেই হোতা।' এই গুজরাটী যুবকের এই স্বীকৃতিমূলক এজাহার আমাকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল। কিন্তু এই গুজরাটী যুবকের মধ্যে আমি লেশমাত্রও উতলা ভাব দেখতে পেলাম না। কোনও আসামীকে সামনে পেলে পুলিশ অফিসারদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে—তাকে পাকড়াও করে গ্রেপ্তার করা এবং তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে—তৎক্ষণাৎ তার দেহ তল্লাসী করে তার কাছ হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উদ্ধার করা। তা না হলে এই সকল আসামী সহসা অস্ত্র বার করে তাঁদের আঘাত করতে পারে, কিংবা প্রামাণ্য দ্রব্য পকেট হতে বার করে তা নষ্ট করতে পারে। বহুক্ষেত্রে তারা কাগজপত্র ও নোট প্রভৃতি সুযোগমত ছিঁড়ে ফেলেছে, কিংবা অফিসারদের চক্ষের সামনেই গলাধঃকরণ করে তা বিনষ্ট করেছে। এই জন্য আমি তৎক্ষণাৎ তাকে পাকড়াও করে (ভিন্ন কারণে থানায় উপস্থিত) দুইজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর সম্মুখে তার সারা দেহটি তল্লাস করে ফেললাম। এই সময় ঐ আসামীর পরণে একটি পরিষ্কার ধুতি ও একটি পরিষ্কার পাঞ্জাবী ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তার নিকট হতে একটি মাত্রও প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার করতে আমি সমর্থ হতে পারি নি। এদিকে আসামী নিজে যে সংবাদটি দিয়েছে তা ছিল একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডের। এইজন্য আমি এই খুন সম্পর্কে থানার প্রাথমিক সংবাদ বহিতে লেখালিখি করার পূর্বে তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে বহুক্ষণ ধরে রক্তকণার সন্ধান করলাম। কিন্তু তার ধবধবে সাদা পরিচ্ছদের কোথাও লেশমাত্র রক্তেরও সন্ধান আমি ঐ দিন পাই নি। বেশ বোঝা গেল যে সে খুনের পর কোনও গোপন স্থানে এসে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে প্রচুর জলে স্নান করে নিজের দেহটা পরিষ্কার করে তবে থানায় এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অঙ্গুলীর নখের নিম্নে শুষ্ক রক্তকণা থেকে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এই জন্য আমি একটি ছুরিকার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তার নখের তলা থেকে সব কিছু চেঁছে তুলে নিলাম, কিন্তু সেখানে কোনও প্রকার রক্তকণা ছিল কিনা তা বুঝা গেল না। এই সময় আমার সন্দেহ হলো—হয়তো সে কাউকে খুন করে নি। সে হয়তো কাউকে ভয় দেখাবার কিংবা দুঃখ দেবার জন্য এইরূপ এক অলীক সংবাদ থানায় এসে প্রদান করছে। এদিকে এই আসামীর চক্ষের চাউনিটিও আমার কাছে ভালো ঠেকে নি। আমার এমন সন্দেহও হলো যে হয়তো বা তার মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রে কথাবার্তা হতে বহু লোককে পাগল বলে বুঝা যায় না। মাত্র একটি বিষয়ে পাগল হলেও অন্যান্য বিষয়ে তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই প্রতীত হয়। আমার সন্দেহ হলো, হয়তো লোকটা ঐরূপই এক ব্যক্তি হবে। এর পর আমি স্থির দৃষ্টিতে আসামীর দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখে প্রাথমিক সংবাদবহিতে এই খুন সম্পর্কীয় সংবাদটি লিপিবদ্ধ করে নিতে শুরু করলাম। এই খুনের প্রাথমিক সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার নাম শ্রী———। আমার পিতার নাম শ্রী———। জাতিতে আমি একজন গুজরাটী হিন্দু। গুজরাট প্রদেশের অমুক গ্রামে নিবাস। সেখানে এখন আমার বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেউই নেই। তবে দাস-

দাসী আমাদের সেখানে বহু আছে। আমি সেখানকার এক সাবেকী জমিদার পরিবারের সন্তান। আমি ম্যাট্রিক ও পরে কম্পাউণ্ডারি পাশ করে আই-এ পড়তে পড়তে পড়াশুনা ছেড়ে দিই। এতোদিন আমি গুজরাটী সাহিত্যের চর্চা করে সময় কাটিয়েছি। সম্প্রতি কোনও এক কারণে আমি দেশ ছেড়ে কোলকাতা শহরে এসেছি। বর্তমানে আমি——নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ নিবাসী ডাঃ অমুক প্যাটেলের ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের কায করছি। বাল্যকালে আমার ডাক্তার হবার শখ ছিল। কিন্তু তা না হতে পারায় আমি কম্পাউণ্ডারি শিখি। এর পর আমি আই-এ পড়বার জন্যে কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু পরে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করে দিই। গুজরাটের কয়েকটা মাসিক পত্রিকায় আমার গল্প বেরিয়েছে। আমি শুধু গল্পই লিখেছি। প্রবন্ধ বা কবিতা আমি কখনও লিখি নি।"

[আসামী যা বলে যাচ্ছিল তাই আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম। এদিকে খুনের ব্যাপার এড়িয়ে সে নিজের কথাই বলে যাচ্ছিল। এইজন্য তাকে নিরস্ত করে আমি খুনের ব্যাপারটি আগে বলতে নির্দেশ দিলাম। এর কারণ প্রকৃত বিষয়টি অবগত হলে আমরা ত্বরিতগতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবো। কিন্তু এইখানেই আমি ভুল করেছিলাম। এর কারণ আমি একে তখনও পর্যন্ত একজন অপরাধ-রোগী ব'লে বুঝতে পারি নি। অন্যথায় তাকে আমি মধ্যপথে এমনিভাবে থামিয়ে দিতাম না। বরং তাকে আমি প্রাণ খুলে ইচ্ছামত কথা বলতে দিতাম। তবে তদন্তের ব্যাপারে অন্য বহু বিষয়ও আমাদের চিন্তা করতে হয়েছে। এই সব চিন্তার মধ্যে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করণের চিন্তা ছিল অন্যতম। প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করতে অধিক দেরী হলে তদন্তে বহির্গত হতে দেরী হয়ে যায়। এর ফলে ঘটনাস্থলের বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। অথচ প্রাথমিক সংবাদটি সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ না করে তদন্তে বার হলে উহার মধ্যে বহু ভুল ত্রুটি থাকার জন্যে বিচারের সময় আসামীরা বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারে। এইজন্য সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে প্রাথমিক সংবাদবহিতে এই সব প্রাথমিক সংবাদ প্রথমেই লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। এইজন্য এই ব্যাপারে একটু সময় নষ্ট করা ভিন্ন শান্তিরক্ষীদের অন্য কোনও উপায়ও নেই। কখনও কখনও একজনকে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার কার্যে নিযুক্ত রেখে অপর একজনকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়ে থাকলেও এই মামলায় তার বিশেষ সুযোগ বা সুবিধে ছিল না। এর কারণ আসামীর কাছ হতে ওই খুন সম্পর্কে প্রতিটি সংবাদ না জেনে নিয়ে তদন্তের জন্য বাহির হওয়া হতো নিরর্থক। এইজন্য আমি খুন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য তাড়াতাড়ি তাকে বলে যেতে বললাম। এই মামলার আসামী জনৈক অপরাধ-রোগী বিধায় এই ভাবে বাধা পেয়ে বিগড়ে গেলেও যেতে পারতো। সৌভাগ্যক্রমে আসামী আমার উপদেশ শিরোধার্য্য করে খুন সম্পর্কে তার শেষ বক্তব্যটুকু বলে চুপ করলো। আমিও তার এই বিবৃতির নিম্নোক্ত শেষ অংশটুকুও তাড়াতাড়ি লিপিবদ্ধ করে নিলাম।]

"আমি আজ সকালে আন্দাজ আট ঘটিকায় আমার মনিবের চারি বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রটিকে ঠাকুর দেখাবার অছিলায় বাইরে আনি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে সন্ধ্যার দিকে তাকে বারাকপুরের একস্থানে এনে নিহত করে কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার মনিবের নাম ডাক্তার অমুক প্যাটেল। তিনিও আমার মত গুজরাটের অধিবাসী। এক বৎসর পূর্বে কোলকাতায় এসে আমি তাঁর ডিসপেনসারীতে কম্পাউণ্ডারির চাকুরি শুরু করি। তদবধি আমি তাঁর বাড়ীতেই বসবাস করছি। আহারাদিও আমি তাঁর ওখানে করে থাকি। কোনও এক কারণে ডাঃ প্যাটেল ও তাঁর স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি তাঁদের ঐ একমাত্র পুত্রকে আজ সন্ধ্যায় হত্যা করে এলুম। ডাক্তার প্যাটেলের ঐ শিশু পুত্রটিকে ঠিক কোথায় ও কেমন করে হত্যা করেছি তা আমি প্রাণ চলে গেলেও এখন প্রকাশ করবো না।"

আসামীর উপরোক্ত বিবৃতিটুকু লিখে নেওয়ার পর এই সম্পর্কে তার বিস্তারিত বিবৃতির জন্য আমি তাকে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম। কিন্তু সে কিছুতেই খুন সম্পর্ক আর একটি কথাও বলতে চায় না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে সে ডাক্তার-দম্পতিকে শুধু কষ্ট দেবার জন্যই এইরূপ

এক বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু তার মুখ চোখ হতে আমি বুঝতে পারলাম যে সে আদপেই প্রকৃতিস্থ নয়। এইজন্য আমি কৌশলে মনস্তাত্ত্বিক মারপ্যাঁচের সাহায্যে তার কাছ হতে প্রকৃত তথ্য অবগত হতে সচেষ্ট হলাম। এই সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। এই সম্পর্কে আমি তাকে যা প্রশ্ন করেছিলাম এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে সে যা বলেছিল তা হতে অপরাধ-রোগী-কৃত অপরাধের তদন্তরীতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবহিত হওয়া যাবে।

প্র—তোমার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে তুমি ঐ খোকাটিকে তার মা বাপের মতই ভালবাসতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি কি করে তাকে অমন করে খুন করতে পারলে। সত্যি করে সব কথা তুমি আমাকে খুলে বলো। মনের কথা খুলে বললে তুমি কষ্ট না পেয়ে শান্তি পাবে। আমি বুঝতে পারছি যে তুমি মরণকে ভয় করো না। তাই যদি হয় তো আমাদের মত পুলিশকেই বা এতো ভয় কেন?

উঃ—আপনি মশাই ঠিকই বুঝেছেন। আমি খোকাকে খুবই ভালবাসতাম। তাই আমি তাকে খুন করবার সময় তার দিকে ফিরেও চাইতে পারিনি। আমি পিছন ফিরে তার দিকে না চেয়ে তার গলায় ছুরিটা বসিয়ে দিয়েই চলে এসেছি।

প্রঃ—কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সে এখনও মরে নি। আমার মনে হয় এখুনি সেখানে গেলে ডাক্তারদের সাহায্যে তাকে বাঁচানো যেতে পারে। তুমি ঝোঁকের মাথায় যা করে বসেছো তার তো আর চারা নেই। এখন এসো তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে সকলে মিলে তাকে বাঁচিয়ে তুলিগে—

উঃ—আজ্ঞে না মশাই। তার বাঁচার কোনও আশা নেই। আমার ছুরির আঘাত ছিল অব্যর্থ। আমি একটু দূরে চলে এসে গাছের আড়াল থেকে তার কান্নার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার একটুও কান্না আর সেখানে শোনা যায় নি। সারাদিন সে বারে বারে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু আমার অমোঘ ছুরির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে চুপ্। তবে আমার বুকের ভেতর হতে তার কান্না এখনও আমি শুনতে পাচ্ছি। যেখানে তার কচি লাসটা পড়ে আছে, সেখানে কিছুতেই আমি আপনাদের নিয়ে যাবো না। এর চেয়ে বরং আপনারা একটা ছুরি নিয়ে এসে আমার এই হাতটা টুকরো টুকরো করে কেটে দিন। আমার এই ডান হাতটা দিয়েই এইদিন ওকে মারবার জন্যে আমি ঐ ছুরিখানা ধরেছিলাম।

প্রঃ—না না। তোমাকে সেই খুনে জায়গাটা আমাদের দেখাবার কোনও দরকার নেই। তুমি শুধু বলো, কেন তুমি ঐ এক-রত্তি ছেলেটাকে অমন করে খুন করে এলে? আমার মনে হয়—নিশ্চয়ই কেউ নির্মমভাবে তোমার মনে ব্যথা দিয়ে থাকবে। কে? বলো বলো। তুমি বলে ফেল।

আমার এই সব সময়োপযোগী চোখা চোখা বাক্যবাণে অভিভূত হয়ে আসামী সব কথা বলি বলি করে বলেই ফেলছিল। আমার বিশ্বাস, সে তখুনি খুন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আমাদের জানিয়ে দিত। কিন্তু হঠাৎ সেই সময় আমাদের একজন তৎকালীন উর্ধ্বতন অফিসার তাঁর থানা পরিদর্শন ব্যপদেশে আমাদের অফিসে ঢুকে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে বসলেন। তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আমরা আসামীর কথা ভুলে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলাম। তাঁকে এই খুনের সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আদপেই কোনও খুন বোধ হয় হয়নি। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস হয়েছিল যে ওদের বাড়ীতে খোঁজ খবর করলে দেখা যাবে যে ঐ শিশুটি সেখানে বাহাল তবিয়তে জীবিত আছে। আমাদের ঐ উর্ধ্বতন অফিসার আরও বলে গেলেন যে—ঐআসামী নিশ্চয়ই এক বদ্ধ পাগল-টাগোল হবে। ওকেই বোধ হয় এতোক্ষণ ওর আত্মীয়েরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। আমাদের উর্ধ্বতন অফিসার থানা হতে বিদায় নিলে আমি আবার আসামীকে নিয়ে পড়লাম। কিন্তু ততক্ষণে সে তার মনোবল ফিরে পাওয়ায় সে এই সম্পর্কে আর একটি কথাও আমাদের জানালো না। এমন কি কতো নম্বর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে তার মনিব ডাক্তার সাহেবের বাস, তাও সে এখন আর আমাদের জানাতে চায় না। অগত্যা নাচার হয়ে আমি অফিসের মুন্সীবাবুকে ডাক দিয়ে ঐ দিন থানায় জাবেদা খাতায় [জেনারেল

ডায়েরি] ছেলে হারানো সংক্রান্ত কোনও সংবাদ কেউ লিপিবদ্ধ করে গেছে কিনা তা তাকে আমি দেখতে বললাম। এর কারণ আসামীর বিবৃতি সত্য হলে এতক্ষণে ঐরূপ কোন সংবাদ থানার বহিতে লিপিবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ থানার জেনারেল ডায়েরিতে ঐরূপ একটি খবর লিপিবদ্ধ না হলে আমাকে এ সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী থানাসমূহে খোঁজ খবর করতে হতো। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কয়েক মিনিট পরেই থানার মুন্সীবাবু ঐরূপ একটা সংবাদ এই থানার জাবেদা খাতাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমাকে জানালেন। থানায় ঐ দিনের ডায়েরিতে নথিভুক্ত ছেলে-হারানোর সংবাদটি নিম্নে যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা হলো।

"অদ্য সকাল এগারো ঘটিকায় অতো নম্বর সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউনিবাসী ডাঃ অমুক প্যাটেল থানায় এসে জানালেন যে তাঁর কম্পাউণ্ডার তাঁর চারি বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রটিকে ঠাকুর দেখাবার জন্য বাড়ীর বাইরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা গৃহে না ফিরায় সংবাদদাতা বিশেষ চিন্তিত আছেন। সংবাদদাতা ডাক্তার অমুকের সন্দেহ হয় যে রাস্তায় তাদের কোনও দুর্ঘটনা হয়েছে, কিংবা কোনও কারণে তারা কোথাও পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়েছে। এক্ষণে সংবাদদাতা ও তাঁর আত্মীয়েরা থানায় থানায় ও শহরের হাঁসপাতালসমূহে খোঁজ খবর করছেন। এই থানার লোকেদেরও তাদের খুঁজে দেখবার জন্য সংবাদদাতা অনুরোধ করলেন। এই জন্য জমাদার নং ২২৪ রামচন্দ্র সিংহকে ঐ শিশুটির খোঁজে পাঠানো হলো এবং অন্যান্য থানাতেও টেলিফোন যোগে খোঁজ করার ব্যবস্থা করা হলো।" (ক্রমশঃ)

॥ বাজেটের কামড় ॥



খুব্‌লে খাচ্ছে চারিধারে,
(আবার) ট্যাক্‌সোর বোঝা চাপ্‌লো ঘাড়ে !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা



রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী

উপানন্দ

পঁচিশে বৈশাখ। অমিতায়ু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনের শতবর্ষ পূর্ণ হোলো। সমগ্র বিশ্বে চলেছে তাঁর জন্মতিথির জয়ন্তী উৎসব। ভগবানের লোকোত্তর বিভূতির মূর্তরূপ তিনি। ভাবজগতের রাজ-রাজেশ্বর তিনি। মহাজ্যোতিষ্কমণ্ডলের সূর্য্যসারথী রবীন্দ্রনাথ। চিরশিশু চিরসুন্দর তিনি। অস্তদিগন্তের কোলে হেলে পড়ছে জীবন-সূর্য্য, গোধুলি নির্ঝর তলে দাঁড়িয়ে মায়ামৃগ দূরপানে চেয়ে, তখনও শিশুমনের ছবি এঁকে চলেছেন তিনি। স্মরণের গ্রন্থপত্রে রয়ে গেল 'শিশু' 'শিশু ভোলানাথ' 'খাপছাড়া' প্রভৃতি।

সংসার কাননের তোমরা এক একটী ছোট ছোট স্ফুটনোন্মুখ কলি। তোমাদের মত হয়ে তোমাদের জন্যে শিশুজীবন উপভোগ করে গেলেন কবি কখনো খেলাচ্ছলে, কখনো ছেলেবেলাকার দিনগুলিকে বহু রঙে রাঙিয়ে দিয়ে। নানা রহস্যজাল বিস্তার করে খোকার মনের শত সহস্র প্রশ্নকে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, কত প্রশ্নেরই না দিয়ে গেলেন উত্তর—কত দরদই না দেখিয়ে গেলেন তোমাদের জন্যে।

শিশুর মনে ছড়িয়ে আছে হাসি, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা। সে কখন দেখায় বীরত্ব, কখন প্রকাশ করে ভাবপ্রবণতা—তার খেলাঘর কল্পনার বাদুঘর, নানা খেয়াল খুসীতে ভরা সে। শিশুদের কথাই হয়েছে তাঁর শেষের দিনের বক্তব্য। মাকে তিনি হারিয়েছিলেন ছেলেবেলায়, মা-হারাদের দলে এসে শুনিয়ে গেছেন চিরশিশু কবিগুরু—

"মাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে
মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে
মা বুঝি গান গাইতো আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে
মা গিয়েছে যেতে যেতে গানটী গেছে ফেলে।"

মা-হারা অভাগার ছবি তাঁর অমর তুলিতে অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—'বেলফুলের কুঁড়িগুলি আস্তে আস্তে কপালে বুলাতাম, মনে করতে চেষ্টা করতাম মায়ের হাতের আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছি।' তোমরা যারা শিশু, যারা কিশোর, চিরদিন রূপকথাপ্রিয়। তোমাদের কল্পনায় জাগে পক্ষীরাজ ঘোড়া, জাগে তেপান্তরের মাঠ, কত দূরদূরান্তর, পাতালপুরীর কথা, সাতসমুদ্র পেরিয়ে কোন্ অচীন্ দেশের রহস্যময় পরিবেশ। মনে পড়ে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, মেঘবরণ রাজকন্যার চিরন্তন কাহিনী তোমাদের খেলাধুলা আর পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে।

তাই খোকার মুখে শুনি—

"সাতমহলা বাড়ী যেথা থাকেন সুয়োরাণী
সাতরাজার ধন মাণিক গাঁথা গলায় মালা খানি।"

বিশ্বজীবনের খণ্ড অংশরূপে শিশুকে দেখেছেন তিনি, শিশুর মধ্যে দেখেছেন মনুষ্য জীবনের দীপ্তিতে একটি দিব্য প্রকাশ। কবির বহু আকাঙ্ক্ষা আর ব্যর্থতা শিশুকাব্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি ছিলেন শিশুসাথী, চিরন্তন শিশুকে রেখেছিলেন তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। মানবের অবচেতন মনে যে শিশু প্রকৃতি বর্তমান, তার নেই জরা বার্দ্ধক্য, নেই মৃত্যু—সে অবগাহন করে নব নব ভাব-ধারায়, নূতনত্বের অগ্রযাত্রা প্রয়াসী সে—রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আত্মাই শিশুতে আত্মস্থ। কবি ছেলেদের নাটক লিখে গেছেন অনেক। বলেছেন—'শিশুরা ধনলোভী নয়, ওরা খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে—' ডাকঘরে একটি বালকের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার চরিত্রের দেখিয়েছেন সামঞ্জস্য, মুকুট রচনায় রাজ্যধরের চরিত্র এঁকেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার সঙ্গে। তিনি সমগ্র শিশুসমাজকে দিয়ে গেছেন কাব্য, নাটক, ছড়া ছবি। তোমরা তাঁর রচনা পড়লে বুঝতে পারো তোমাদের মনের খোরাক তিনি সারা জীবন ধরে দিয়েছেন, এমন করে কোন কবি কোন কালে কোন দেশে দিতে পারেন নি, পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সাধকের সাধনায়, কথকের কণ্ঠে, বাউলের একতারায় যে সব ভাব-অনুভাব ব্যক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সে গুলিকে গ্রহণ করে নিজস্ব ছাঁচে অপূর্ব রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ চিরমানুষের কথা ধ্বনিত করে বলেছেন—

'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি ॥'

সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে, শিল্পকলায়, চিত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা দেদীপ্যমান। ভারতের প্রতি বৃটিশের নিগ্রহ ও অত্যাচারের চরম নিদর্শন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। বৈশাখী পুর্ণিমার বুকে ঐতিহাসিক সায়াহ্নে এলো ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ সাল। অমৃতসরের সর্ব্বময় শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত জেনারেল ওডায়ারের নির্দ্দেশে নক্ষত্রগতিতে লক্ষ্যহীন গুলী চল্‌তে লাগ্‌লো বাগের ময়দানে যেখানে চলেছিল জনসভা, নরনারী শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে জনতাকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠ্‌লো মেশিনগানগুলো। পলায়নের পথরুদ্ধ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাগের ভেতর রক্তপ্লাবন সুরু হোলো। এই নির্ম্মম ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুব্ধ বেদনা চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হোলো, তার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ সমবেদনা জ্ঞাপন করে। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজি তাঁর কাইজারহিন্দ আর বুয়োর যুদ্ধের পদক বর্জ্জন করলেন, আর কবিগুরু এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌লেন। ইংরাজের প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে যে পত্র দিয়ে ঘৃণার সঙ্গে উপাধি বর্জ্জন করেছিলেন সেই পত্রটী ঐতিহাসিক পত্ররূপে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রের ভেতর কবি বলেছেন—

……The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions by the side of my countrymen, who for their so-called insignificance are liable to suffer a degradation not fit for human being. And these are reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency to relieve me of my title of knighthood……"

এরূপ দেশাত্মবোধের দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে নানা ভাবে নির্য্যাতিত হয়েছেন, তবু তিনি দেশ ও দেশবাসীকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভালো বেসেছেন। বঙ্গপল্লীর স্নেহের ছত্রচ্ছায়ায় কেটেছে তাঁর জীবনের দিনগুলি। আজ প্রত্যক্ষভাবে তিনি আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আছেন আমাদের অন্তরে বাহিরে বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে। দেশে দেশে চলেছে তাঁর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে। এস আমরা এই অমর কবির উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।

রবীন্দ্রনাথ

প্রভাকর মাঝি

একশো বছর, একশো বছর আগে,
যে শিশু চোখ মেললো অনুরাগে
এই পৃথিবীর সূর্যালোকে ভাই—
আজ সে শিশুর জোড়া কোথায় পাই ?
আসলো পরশ মাণিক সাথে নিয়ে
সবকে সোনা করলো সে তা দিয়ে।
কাব্যে কলায় নাটকে সঙ্গীতে
উঠলো কলধ্বনি সকল চিতে।
কোথাও এমন ঠাঁই রয়েছে ফাঁকা
যেথানে তার ছাপ না আছে আঁকা ?
ছড়িয়ে রাঙা আলোক দেশে দেশে
সেই শিশুটি সূর্য হোল শেষে।

আমরা যারা তার সে আলোকেতে
লিখ্‌ছি এবং পড়ছি আনন্দেতে,
পড়তে পড়তে, থমকে বারে বারে
ভাবতে থাকি ! এ কোন্ প্রতিভা রে !
হঠাৎ ঢুকে গোপন অন্তরে
সবার কথা মায়াবী অক্ষরে
কে বলে দেয় ? চিনি, চিনি, চিনি।
আমরা যে তার ভালবাসায় ঋণী
তাই তো খুশি শিশির হয়ে ঝরে
একশো বছর, একশো বছর পরে।

কবি-প্রণাম

শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা

প্রণমি তোমায়
বিশ্ববরেণ্য
যুগ-প্রণম্য কবি
শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করি
উপনিষদের বন্ধন ছিঁড়ি
এঁকেছ সত্য ছবি।

তুমি ছড়ায়েছো জ্ঞানের আলোক
উদ্ভাসিত করি দ্যুলোক-ভূলোক
মানবের তরে কাঁদিয়াছ তুমি
কাঁদিয়াছে তব বীণা
তাইতো তোমার অর্ঘ রচিছে
জগতের মনোবীণা।

তোমার বিহনে কাঁদে না পৃথ্বী
গাহে তব জয়গান
বিশ্বজনের কণ্ঠ ভেদিয়া
বেদনা তোমার ঝরিয়া ঝরিয়া
স্মৃতিরে তোমার উজ্জ্বল করি
করিছে মাল্যদান।

অতীত তোমার
বর্ত্তমানে ফিরি
ছড়ায়-গন্ধ নিশিদিশি ভরি
স্মৃতির বেদনা
করে না কাতর
তোমারে নিত্য হেরি।

ধরণীর শিশু স্মরিতেছে তোমা
এসো ফিরে এসো ঝঙ্কারি বীণা
দাও ভরি দাও
আর্ত্ত মানবে অমৃতময় দুখ।
অন্তর তব আলোকিত করি
জেগেছিল যেই সুখ।

ঝরা বকুলের গন্ধ নাহি যে
নাহি তো যুথির মালা
ভক্তি কুসুমে রচেছি অর্ঘ
গেঁথেছি বরণ ডালা
মনোমন্দিরে যে ধূপ পুড়িয়ে
চুয়া চন্দনে আরতি করিছে
প্রাণ প্রদীপে জ্বালিয়া আলোক
গাহি তব জয়গান
সিক্ত বেদনে প্রণাম রচিছে
যত কিশলয় প্রাণ।

সুমতি

শ্রীমতী বেলা দেবী

'সমু, যাওতো একটু, মুদির দোকান থেকে একসের চিনি নিয়ে এসো।'

'হ্যাঁ, নাচ্ছি আর কি! পড়াশুনো নেই আমার?'

'পড়াশুনো যে কত সে তো আমি জানি। এখুনি তো যাবে রাস্তায় গুলি খেলতে, নয়ত প্রণবদের বাড়ী আড্ডা মারতে। আর একটু কাজের কথা বললেই চার পাখনা গজিয়ে লেখাপড়ার চাড় আসে—না?

'গুলি খেলতে? প্রণবদের বাড়ী আড্ডা দিতে? হুঁ, এবার বুঝতে পারলুম।'

'কি বুঝতে পারলে শুনি?

সৌম্য একথার জবাব দিল না। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বৌদির দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে পড়ার ঘর চড়াও হয়ে দাদার কানমলা ও গাঁট্টাগুলোর তাৎপর্য্য এবার যেন সে একটু বুঝতে পারলো। মনে মনে বললো 'হুঁ, আমার নামে সাতখানা করে দাদার কাছে লাগানো, আচ্ছা'—সৌম্য ঘরে ঢুকে একখানা বই খুলে নিয়ে পড়ার টেবিলে গুম্ হয়ে বসে রইল।

সৌম্য'র মা নেই, সংসারে এই দাদা আর বৌদিই অভিভাবক। দাদার এক ছেলে এক মেয়ে, হাবুল আর রুণি, সৌম্য'র বয়স ১৩।১৪ হবে। হাইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে, পড়াশুনোর চাইতে তার খেলাধুলা ও দুষ্টামীর দিকেই ঝোঁক বেশী। এজন্যই মাঝে মাঝে দাদার কাছে চড় চাপড়টা লাভ হয়। সৌম্য'র ধারণা তার এই নির্য্যাতনের কারণ বৌদি। বৌদি না লাগালে দাদার পক্ষে তার দুষ্টামীমূলক কোন কার্য্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। ঐ তো প্রণব আছে সুজিত আছে নিখিল আছে

—তাদের, দাদা-রা তো যখন তখন তাদের ধরে পেটাতে আসে না। তাদের যে-মা আছে, তাদের বৌদিরা তাদের নামে সাতখানা করে দাদাদের কাছে লাগিয়ে দেখুক না একবার! আর সৌম্যর মা বাবা নেই কি না তাই…। দুঃখে অভিমানে সৌম্যর বুকটা টন্‌টন করে ওঠে। দু'চোখ ভরে জল আসে। তাই বৌদি অনুভার উপর সৌম্য'র বুকভরা আক্রোশ। আর ঐ ঝাল বৌদির উপর মেটাবার কোন উপায় নেই বলে—পড়ে গিয়ে হাবুল আর রুণির উপর। সৌম্যর উপরে দাদার শাসন অনুযায়ী হাবুল আর রুণিকেও প্রস্তুত থাকতে হয় কাকুর শাসনের জন্য। অকারণেই হয়ত কষিয়ে দেবে দু'টো থাপ্পড় নয় কিল। চেঁচিয়ে ওঠে ওরা। ওদের কান্নায় ছুটে এসে অনুভা হয়ত বলে—'হাবুলকে মারলে কেন সমু?'

'দুষ্টামি করলে মারব না?'

'কি দুষ্টামি করেছে শুনি!'

কাঁদতে কাঁদতে হাবুল বলে 'না মা, আমি কিছু করিনি। কাকু শুধু শুধুই আমায় মারলে।'

'কই, বললে না কি দুষ্টামি করেছে?'

উপযুক্ত কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে সৌম্য বলে 'ইঃ, একটু ছুঁতে না ছুঁতেই দৌড়ে এলেন। দাদা যে শুধুশুধু আমাকে বেধড়ক পেটায়—তখন তো পাওয়া যায় না। না, তখন একেবারে আহ্লাদে আটখানা!'

প্রাণপণে হাসি চেপে অনুভা ছেলের চোখের জল মুছিয়ে তাকে কোলে নিয়ে ঘরে চলে যায়। বোঝে—দাদার শাসনের জের ভোগ করছে দাদার পুত্র। কিন্তু বৌদি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি হাবুলের এই শাস্তি সে দাদার পুত্র বলে নয়—বৌদির পুত্র বলে। শাসন করে দাদা, কিন্তু সৌম্য'র যত আক্রোশ যত বিদ্বেষ বৌদির উপরে। তাই দু' চোখের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে সৌম্য পারলে যেন বৌদিকে দগ্ধ করে।

সৌম্য ছেলেটি যে নেহাৎ খারাপ তা নয়। কিন্তু তার সঙ্গী সাথী যে সব কজ'নাই ভাল তা বলা চলেনা, প্রণব ছেলেটির দুষ্টামির ধারা সাধারণতঃ একটু কু-দিক ঘেঁষেই চলত। সেদিন বিকেলের দিকে নদীর পাড়ে বসে সৌম্য ও প্রণব গল্পগুজব করছিল। জায়গাটা ছিল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। হঠাৎ প্রণব পকেট থেকে দামী সিগারেট বের করে বললে 'খাবি একটা?'

সৌম্য সভয়ে চারদিকে চেয়ে বলল—'ওরে বাবা? দাদা জানতে পারলে খেয়ে ফেলবে একেবারে। দাদা নিজেই বিড়ি সিগারেট খায় না কখনও। আর আমি খাই জানতে পারলে কি আর আস্ত রাখবে!'

'হ্যাঁ, জানতে এসেছে আর কি! এখানে কেউ দেখতেও আসছে না, আর খেয়ে একটা এলাচ চিবিয়ে নিলে গন্ধ ও টের পাওয়া যাবে না। একেবারে ভাই লক্ষ্মণ আর কি!'

'না ভাই, যদি কোনদিন টের পেয়ে যায়।'

'আরে, তুই কি রোজ খাচ্ছিস। একদিন খেলে এমন কিছু হয় না। আর গন্ধখানা কেমন দেখ্। আমার জামাইবাবু এসেছেন কিনা। তিনি এগুলো খান। এই গন্ধ পেয়েই তো আর লোভ সামলাতে পারলাম না। এই ক'খানা পকেট থেকে গেঁড়া মেরেছি,—নে ধর।'

সৌম্য ভয়ে ভয়ে সিগারেট ধরিয়ে সবে দু' একটান দিয়েছে এমন সময় সামনে পড়বি তো পড়্ পাড়ার রাজুখুড়ো। থতমত খেয়ে সৌম্য হাতের সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল। প্রণব ওদিকে হাওয়া। রাজুখুড়ো চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—তাইত বলি, প্রণবের সঙ্গে এত খাতির কেন? বড় ভাইটী রামচন্দ্রের মত চরিত্রবান। না পান, না তামাক আর কি সুন্দর আচার ব্যবহার। আর ছোটটি যেন বখাটের রাজা, আবার এই বয়সে সিগারেট ধরেছেন।'

সৌম্য প্রথমে খুবই ঘাবড়ে গেছিল। সে সিগারেট খায় না, আজও খেতে চায়নি। প্রণবের পীড়াপীড়িতে আজই শুধু একটা দেখছিল। তাই বলে পাড়ার লোক এসে তাকে শাসন করে যাবে, অমনি তার মিইয়ে-পড়া পৌরুষ বুকের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উদ্ধতকণ্ঠে সে বলল 'বেশ করেছি। তোমার বাবার পয়সায় খাচ্ছি।'

'তবেরে ছোঁড়া, বদমাসের ধাড়ি! বাপ্ তুলে কথা। দাঁড়া—' বলে হাতের লাঠিখানা উঁচিয়ে তেড়ে এল রাজুখুড়ো। অমনি সৌম্য দু'পা পিছু হটে এক মাটির ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল রাজুখুড়োকে। 'বাপ্‌রে' বলে আর্ত্তনাদ করে উঠল রাজুখুড়ো। মুহূর্ত্তে কি যে হয়ে গেল বুঝতেই পারল না সৌম্য, ব্যাপারটা যখন অনুভূতিতে ধরা পড়ল—অমনি দে ছুট—ছুট—ছুট।

নিশ্চয়ই বাড়ীতে খবর চলে গেছে। সারা সন্ধ্যা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল সৌম্য। বাড়ী ফিরবার সাহস নেই। আর ওদিকে বৌদিও নিশ্চয়ই একশখানা করে লাগাচ্ছে দাদার কাছে। ভাবলে রাত বেশ হলে চুপি চুপি তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে, আর ভোর হলেই পালাবে। দু' এক দিন কেটে গেলেই দাদার রাগটা নরম প'ড়ে যাবে।

রাত দশটার পর পা টিপে টিপে বাড়ী ঢুকল সৌম্য। উঠোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে টের পেল দাদার ঘরে কথাবার্ত্তা চলছে। মনে মনে বললো—হুঁ, যা ভেবেছি। ঠিক লাগাচ্ছে আমার নামে, নইলে দাদা তো আগে এমন ছিল না। মা বেঁচে থাকতে দাদা কত আদর করত আমাকে। আর এখন যেন আমি ওর দু' চখের বিষ। দিনরাত এত লাগালে মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে!' বৌদির উপর আক্রোশে কঠিন হয়ে উঠল সৌম্য। না, শুনতে হবে কি বলছে, শুধু তাই নয়। কাল দাদা আফিসে চলে গেলে একটা হেস্ত নেস্ত করতে হবে। কোথাকার কে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন—মোড়লীর বহর দেখনা একবার। পা টিপে টিপে সৌম্য দাদার ঘরের জানালার পাশে এসে দাঁড়াল।

সুধীর বলছে—তুমি জান না অনুভা ও কত খারাপ হয়ে গেছে।'

অনুভা বলছে—জানি গো 'জানি, ছেলেরা অমন একটু আধটু দুষ্টুমি করেই থাকে।'

'একে বলে একটু আধটু। রাজুখুড়ো আমাকে ডেকে দেখাল

ওর কপালটা ফুলে ঢ'াই হয়ে উঠেছে। আর এ বয়সে সিগারেট ধরা কি সাংঘাতিক।'

'হ্যাঁ, রাজুখুড়োর বোন আন্নাপিসীও বাড়ী বয়ে আমাকে খুব শুনিয়ে গেছে। আমি হাতে পায়ে ধরে ঠাণ্ডা করেছি—ছেলেমানুষ হঠাৎ করে ফেলেছে। এবারটি মাপ কর। আমরা তাকে খুব শাসন করে দেব।'

'সেই কথাই তো বলছি। শাসন করা দরকার—নইলে ও আরও দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠবে।'

'ধরে পেটালেই কি শুধু শাসন হয়। না, তুমি ওকে মার ধোর করতে পারবে না। ওর মা নেই, তাই অল্পেতেই মনে লাগে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।'

'মুখের কথায় শোধরাবার পাত্রই বটে। দিন দিন কেমন বেড়ে যাচ্ছে দেখছ তো? রোজ দু'বেলা আফিস যেতে আসতে রাজুখুড়োর নালিশের চোটে কান পাতা দায়। তোমার ভাই হ্যানো করেছে, ত্যানো করেছে, কত সয় বল?'

সৌম্য ভাবলে ওঃ। এ তাহলে রাজুখুড়োর কীর্ত্তি। আমি ভাবি বৌদি বুঝি।

বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কাল শোধরাতে হবে, রাজুখুড়োকে ঢিল মেরেছে বলে এবার তার আনন্দ হল। আহা! ঢিলটা কপালে না লেগে চোখে লাগল না কেন? ব্যাটা জন্মের মত কানা হয়ে থাকত।

অনুভা বললো—'পাড়ার লোকের কথা এত ধরবার কি আছে। না পাড়ায় আর দুষ্টু ছেলে নেই। তবে ঐ প্রণবের সঙ্গ ওকে ছাড়াতে হবে। আমার মনে হয় সিগারেট খাওয়াও ঐ প্রণবেরই দুর্ব্বুদ্ধি। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব, তুমি এ নিয়ে মারধোর করো না কিন্তু। দিব্বি রইল আমার।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা, যা ভাল বোঝ কর।'

সৌম্য উচ্ছ্বসিত হয়ে মনে মনে বলল বৌদি, এবারটি আমায় বাঁচাও, এবার থেকে তুমি যা বলবে তাই শুনব। ঐ প্রণব হতভাগা আমাকে কি বিপদেই না ফেলেছে।'

পরদিন সকাল বেলা কাকুর কাছ থেকে হাতভরা চকোলেট আর বিস্কুট উপহার পেয়ে হাবুল আর রুণি তো অবাক। যে হাতের গাট্টা আর কানমলা ছাড়া তারা কোনদিন কিছু খায়নি—সে হাত থেকে এমন সব উপাদেয় বস্তু লাভ! অনুভা বলল—কাল কখন বাড়ী ফিরলে সমু?' কান চুলকে আমতা আমতা করে সৌম্য বলল,'রাত্তিরে—একটু দেরী হয়ে গেছিল বৌদি'। একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বলল—'বৌদি, তুমি সত্যিই বলেছ ঐ প্রণবের কথায়ই আমি—আর কখনও করবো না বৌদি—এখন থেকে তুমি যা যা বলবে তাই শুনব। প্রণবের সঙ্গে আর মিশব না।'

'আমি সত্যি কথা বলেছি মানে।' অনুভা অবাক। হঠাৎ কি মনে পড়তেই হেসে বললে,'ওঃ' রাত্তিরে দাদার ঘরে আড়ি পেতেছিলে বুঝি।'

লজ্জায় আকর্ণ লাল হয়ে সৌম্য বললে—'যাঃ।'

চিবুকে হাত দিয়ে ওর লজ্জানত মুখখানা তুলে ধরে অনুভা বললে 'তাইত বলি, এত সুমতি যে। হাবুল রুণিরই বা এত ভাগ্য কেন? কিন্তু সমু, তুমি এত দুষ্টুমি করলে দাদা দুঃখ পান যে।'

'আর কখনও করব না বৌদি। এবার ক্ষমা কর।'

এমনি সময় সুধীর ওদিক থেকে ব্যাপার দেখতে পেয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। হঠাৎ দাদার দিকে নজর পড়ায় দ্বিগুণ লজ্জায় বৌদির কাঁধেই মুখ লুকাল সৌম্য।

এড্‌গার অ্যালেন পো রচিত

দী ফল্ অফ্ দী হাউস্ অফ্ আশার্

(সার-মর্ম্ম)

সৌম্য গুপ্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

দিন যায়···ক্রমশঃ আমারও মন কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে ভরে উঠলো! মাদেলিনের মৃত্যুর প্রায় দিন সাতেক পরে, একদিন রাত্রে আমার ঘরে শোবার আগে বেশভূষা ছাড়ছি, এমন সময় দরজায় হঠাৎ করাঘাত! চেয়ে দেখি, ত্রস্তভাবে রড্‌রিক্ এলো ঘরে···এসে বিচলিত-কণ্ঠে বললে—তুমি দ্যাখোনি তো?···এসো···শীগগির···দেখবে এসো!···

এ কথা বলে সে আমাকে টেনে ঘরের বড় জানলার পাশে আনলো···বাইরের দিকে নির্দ্দেশ করে বললে—চেয়ে দ্যাখো···বাইরে···দূরে ঐ বদ্ধ-জলার দিকে···

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়···হু হু বেগে বাতাস বইছে···

···আকাশ কালোয় কালো···বিদ্যুতের রেখা মাত্র নেই!

আমি বললুম—এ দেখে কি হবে! সরে এসো···ও শুধু ঝড়! ঝড় কি দেখবে?

রড্‌রিক্ নিশ্চল, নির্ব্বাক!···তারপর হঠাৎ যেন গর্জ্জনের নাদ···সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বিকাশ···মনে হলো—দূরের ঐ বদ্ধ-জলার বুক থেকে যেন কালো বাষ্প উঠছে!

রড্‌রিকের হাত ধরে টেনে এনে কৌচে বসালুম··· বললুম—আমি একখানা বই পড়ি···বসে শোনো। ওদিকে মন দিয়ো না!

টেবিলের উপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে আমি

রড্রিক্‌কে রাজা আর্থারের বীর-সর্দার (Knight) এথেলরেডের কাহিনী পড়ে শোনাতে লাগলুম। আমি সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছি—

"…সাধু তাঁকে কোনোমতেই ঘরে ঢুকতে দেবেন না… কাজেই এথেল্‌রেড্ তখন তাঁর হাতের খড়্গাঘাতে সাধুর ঘরের দরজা ভেঙ্গে …"

যেমনি এই ছত্রটুকু পড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ঘটনা …সে কথা মনে পড়লে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!…আমি স্পষ্ট 'শুনলুম—বাড়ীর কোন ঘরের দরজা-জানলা ভাঙার শব্দ…কে যেন সজোরে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কাঠগুলো সব চ্যালা করে ফেলছে!…'

রড্রিক্ উৎকর্ণ হয়ে সে আওয়াজ শুনতে লাগলো… আমি তা গ্রাহ্য না করে আবার বই পড়ে শোনাতে লাগলুম। পড়লুম—

"…এথেল্‌রেড্ ঢুকলেন সাধুর ঘরে…ঢুকে দেখেন, প্রকাণ্ড এক ড্রাগন একটি স্বর্ণপ্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে। এথেল্‌রেড্ ড্রাগনকে সজোরে কুঠারাঘাত করলেন…সে আঘাতে ড্রাগন এমন তীব্র চীৎকার করলো যেন সে চীৎকারে আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ হয়ে গেল!…"

এই ছত্রটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট শুনলুম—নীচেকার সেই সুড়ঙ্গ-কুঠুরী থেকে প্রচণ্ড আর্ত্ত-চীৎকারধ্বনি!

তবু আমি পড়তে লাগলুম—

"…ঘরের দেয়ালে ঝুলানো রূপার প্রকাণ্ড ঢাল…সেই দেয়ালের কাছে এথেলরেড্ যাবামাত্র দেয়াল থেকে ঢালখানা খসে ঝন্‌ঝন্ শব্দে মেঝেয় পড়লো!"

এ ছত্রটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, নীচেকার ঘরে ধাতু-সামগ্রী পড়বার শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম…তাতে কোনো ভুল নেই! আমি বললুম—শব্দ শুনেছো রড্রিক্!

রড্রিক্ যেন পাথরের মূর্ত্তি…তার মুখে কথা নেই! আমি ডাকলুম—রড্রিক্…রড্রিক্…

রড্রিকের কোনো সাড়া নেই! তাকে সবলে ধাক্কা দিয়ে বললুম,—বলো…বলো…শব্দ শুনেছো!…

কেমন উদাস রড্রিকের দৃষ্টি…স্খলিত কণ্ঠে সে বললে,—ও শব্দ…রোজ…রোজ…আমি শুনি! ভয় করে…তাই বলতে পারিনি!…

আমি বললুম,—তোমার বোন মাদেলিন মারা যায় নি…তুমি তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছো! এথেল্‌রেডের দরজা-ভাঙার শব্দ…সে তোমার বোনের কফিনের ডালা-ভাঙার শব্দ…আর ঐ ড্রাগনের চীৎকার—সে তোমার বোনেরই আর্ত্ত-চীৎকার আর ঐ দেয়াল থেকে ঢাল খসে-পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ—ও হলো ঐ নীচের সুড়ঙ্গ-কুঠুরীর দরজার লোহার তালা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ!…

আমার কথা শুনে রড্রিকের মুখ বিবর্ণ…দু'চোখের দৃষ্টি ভয়ে আতুর! রড্রিক্ সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো… স্খলিত-কণ্ঠে বললে,—ঐ…ঐ…শুনছো, ঐ পায়ের শব্দ… সে আছে…আছে…আমাকে রক্ষা করো…বাঁচাও… বাঁচাও!…

এই কথা বলেই রড্রিক্ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো…বললে,—এসেছে…এসেছে…ঐ দরজার বাইরে…

অজানা-আতঙ্কে আমারও গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো… আমি ডাকলুম,—রড্রিক্…রড্রিক্…

কোনো জবাব না দিয়ে রড্রিক্ এগিয়ে চললো দরজার দিকে! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দমকা বাতাসে ঘরের দরজা খুলে গেল…দেখলুম স্পষ্ট—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাদেলিন—মড়ার মতো ফ্যাকাশে তার মুখ…অপলক দৃষ্টি তার চোখে!

খোলা দরজার মধ্য দিয়ে টলতে-টলতে মাদেলিন্ এলো ঘরে…তারপর হঠাৎ তার দেহ সজোরে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লো স্তম্ভিত রড্রিকের উপর! আচম্‌কা এই ধাক্কার চোটে রড্রিকের দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো…সঙ্গে সঙ্গে সে হলো মূর্চ্ছিত!…আর মাদেলিন্…ঘরের কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই! আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম মূর্চ্ছিত রড্রিকের পাশে…বহু চেষ্টাতেও রড্রিকের চৈতন্য ফিরে এলো না! বুঝলুম—দারুণ আতঙ্কে তার মৃত্যু ঘটেছে!

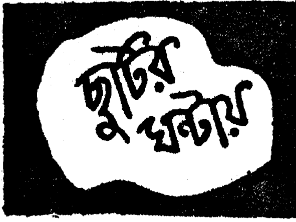
আমারও মনে জাগলো দারুণ আতঙ্ক…মনে হলো, আর এখানে নয়…এখুনি পালাতে হবে!…

পাগলের মতো ছুটে আমি দোতলা থেকে নীচে নামলুম…তারপর এক দৌড়ে সদরে…

বাগানের প্রান্তে এসে দেখি—সারা আকাশ আলোয় আলো! পিছনে ফিরে দেখি—রড্রিকের বিরাট ভবনে আগুন জ্বলছে…জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান-শিখার আভায় রাতের আকাশ রঙীণ হয়ে উঠেছে!

কোনোমতে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বার করে তার পিঠে চড়ে বসলুম…ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিছনে রড্রিকের অত বড় বাড়ী আগুনে পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! এমনি শোচনীয় ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো বিরাট বোনেদী-জমিদার আশার্-বংশের।

এ ঘটনার পর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে, তবু এখনো মনে হয়—মাদেলিন্ তো কোনো অপরাধ করেনি; অথচ রড্রিক্ তাকে ও-ধরণে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছিল কেন? কিসের ভয়ে মনে তার অমন বিকার জন্মেছিল?… এ রহস্য আজো আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেছে!…"

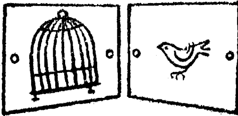


চিত্রগুপ্ত বিরচিত

গতবারে যে মজার খেলাটির কথা বলেছি, তোমরা অনেকেই হয় তো ইতিমধ্যেই সে-খেলাটি রপ্ত করে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিয়েছো। এবারে তোমাদের আরো একটি বিচিত্র মজার খেলার কথা বলি। এ খেলাটির নাম—"খাঁচার মধ্যে পাখী"। খেলাটি হলো আসলে—দৃষ্টি-বিভ্রমের কারচুপি। এ খেলাটি নিতান্তই সহজসাধ্য এবং খেলার জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলি সংগ্রহ করাও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়, সামান্য একটু চেষ্টা করলেই, প্রত্যেকেরই বাড়ীতে অতি-সাধারণ ঘরোয়া এই সব উপকরণ মিলবে। আপাততঃ বিচিত্র এ মজার খেলাটি কি করে সুষ্ঠুভাবে দেখানো যাবে, সেই কথা জানাই।

খাঁচার মধ্যে পাখী ঃ

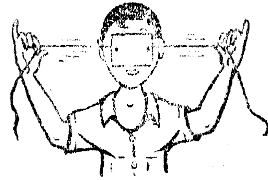
পোষ্টকার্ডের সাইজের একখানি কার্ডবোর্ড নাও এবং



পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ঐ কার্ডবোর্ডখানির একপিটে আঁকো—একটি পাখীর ছবি। তারপর কার্ডবোর্ডখানির উল্টোপিঠে আঁকো—একটি শূন্য খাঁচার ছবি···অর্থাৎ, উপরের ঐ নক্সায় যেমন দেখানো রয়েছে, হুবহু তেমনি ছাঁদে।

এবারে ঐ পাখী আর শূন্য-খাঁচার ছবি-আঁকা কার্ড-বোর্ডখানির দুই প্রান্তে দুটি 'রন্ধ্র' (Hole) বা 'ফুটো' করো···এই 'ফুটো' বা 'রন্ধ্র' দুটি যেন সমান মাপে ও সমান লাইনে হয়, সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, 'ফুটো' বা 'রন্ধ্র' (Hole) সমান লাইনে এবং সমান-মাপে না হলে, খেলা-দেখানোর সময় অসুবিধা ঘটতে পারে, সেইজন্যইএ কথাটি গোড়াতেই বলে রাখলুম। দুপিঠে ছবি-আঁকা কার্ডবোর্ডের দুই প্রান্তে 'রন্ধ্র' বা 'ফুটো' দুটি কিভাবে রচনা করতে হবে—উপরের ছবিতে তারও সুস্পষ্ট-হদিশ দেখানো রয়েছে নক্সাটি দেখলেই তোমরা সহজে বুঝতে পারবে।

যাই হোক, এবারে ঐ কার্ডবোর্ডের দুই প্রান্তে সমান-লাইনে ও সমান-মাপে রচিত 'ফুটো' দুটির মধ্য দিয়ে খানিকটা মজবুত 'টোয়াইন্-সুতো' (Twine-chord) পরিয়ে দাও—পাশের দু'নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো

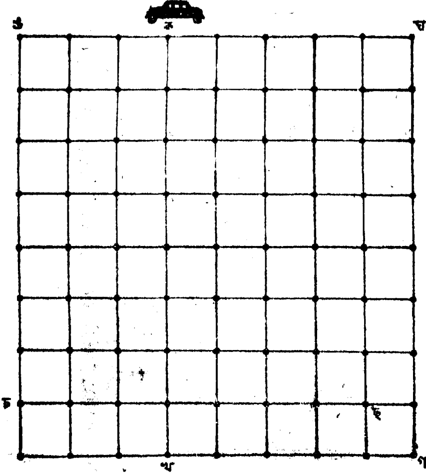


হয়েছে' ঠিক তেমনিভাবে। তারপর' পাশের নক্সায় যেমন দেখছো—অর্থাৎ, ঐ ছেলেটি যেমনভাবে ফুটোওয়ালা-কার্ডবোর্ডের দুদিককার দড়ি টেনে ধরেছে, ঠিক তেমনি-ভাবে 'তোমাদের কার্ডবোর্ডের দুদিকের 'টোয়াইন্-সুতোর' (Twine-chord) প্রান্ত টেনে ধরে' পাখী আর শূন্য-খাঁচার ছবি-আঁকা কার্ডবোর্ডখানি চোখের সামনে রেখে, দু'হাতের আঙ্গুলের চাপে সুতোটিকে পাক দিয়ে বেশ জোরে জোরে ঘোরাও। কার্ডবোর্ডখানি দ্রুতবেগে ঘোরানোর ফলে দেখবে—উল্টোপিঠের শূন্য খাঁচার মধ্যে যেন এপিঠের পাখীটি সেঁধিয়ে বসে রয়েছে···এ দুখানি ছবি আলাদা আলাদা মনে হবে না···মনে হবে যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। অর্থাৎ দৃষ্টি বিভ্রমের ফলেই এমন দেখায়। এ দৃষ্টি বিভ্রমের কারণ—আমাদের দৃষ্টির গতিবেগ এবং কার্ডবোর্ডখানির ঘোরার গতিবেগের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে (Second) ১/১০ ভাগ পার্থক্য ঘটে! এই হলো বিচিত্র মজার এ খেলাটির রহস্য!

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। মোটর-গাড়ীর ধাঁধা :



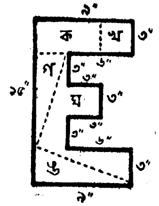
কুণালবাবু নতুন মোটর গাড়ী কিনেছেন…সেই মোটরে চড়ে তিনি সফরে বেরুবেন 'ক'-চিহ্নিত স্থান থেকে। কুণালবাবু চান—মাত্র পনেরো বার গাড়ীখানিকে মোড় ঘুরিয়ে যত দুর পারেন, ঘুরে আসবেন…তবে একই পথে দুবার মোটর চালাবেন না—এই তাঁর ইচ্ছা। উপরের চতুষ্কোণ-নক্সাটিতে যে ফুটকি-চিহ্নগুলি দেখছো, সেগুলি হলো বিভিন্ন সহর…এক সহর থেকে পরের সহরটি একমাইল দূরে…অর্থাৎ, প্রত্যেকটি সহর পাশের সহরের এক-এক মাইল দুরে রয়েছে। ধরো, কুণালবাবু 'ক'-চিহ্নিত স্থান থেকে মোটর চালিয়ে এলেন 'খ'-চিহ্নিত সহরে…তারপর একটি মোড় ঘুরে তিনি চললেন 'গ'-চিহ্নিত সহরে…এমনি ভাবে পর-পর এক-একটি মোড় ঘুরে ক্রমান্বয়ে মোটর চালিয়ে তিনি এলেন 'ঘ', 'ঙ', 'চ' আর 'ছ'তে। এভাবে আসায় পাঁচবার মোড় ঘুরে ৩৭ মাইল পথ মোটর চালিয়েছেন। এখন বলো দেখি,—সবশুদ্ধ পনেরোবার মোড় ঘুরে তিনি কত মাইল তাঁর মোটর চালাবেন? মনে থাকে যেন—এক পথে মাত্র একবারই মোটর চলবে—দুবার নয়!

২। কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালি

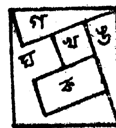
তিন অক্ষরে নামটি তার,
আচার বেড়ে হয়,
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
শ্মশানেতে রয়!
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে
অমৃত ফল ফলে,
কেমন করে ভাবতে পারো
কি বা এরে বলে?

সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

১। চৈত্র মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :



পাশের ছবিতে দেখিয়ে দেওয়া হলো—কিভাবে ইংরাজী 'E' অক্ষরটিকে বুদ্ধি খাটিয়ে পাঁচ টুকরোতে ছাঁটাই করা যাবে। তারপর ছাঁটাই-করা এই পাঁচটি টুকরোকে, নীচের ছবির ভঙ্গীতে,



কায়দা করে সাজাতে পারলেই দিব্যি পরিপাটি একটি চতুষ্কোণ রচিত হয়ে যাবে। এছাড়া আরো কয়েকটি বিভিন্ন ধরণে অক্ষরটিকে ছাঁটাই করা ও চতুষ্কোণ-আকারে সাজানো যেতে পারে।

২। কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তর :

১। কদম
২। লণ্ডন
৩। পটল
৪। অজয়
৫। ভরত

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



<u>সমুদ্র-ঘোটক</u>: চেহারা কতকটা ঘোড়ার মতো বলেই বিচিত্র এই জলচর জীবের এমন নাম দেওয়া হয়েছে... আসলে এরা অদ্ভুত এক ধরণের দুষ্প্রাপ্য সামুদ্রিক মাছ। এদের মুখ আর ঘাড় দেখতে অনেকটা ঠিক ঘোড়ার মতো... চোয়াল দেহের উপরাংশের সঙ্গে একত্রে জোড়া... সারা দেহ কাঁটায় ঢাকা... চেহারা লম্বা নলের ছাঁদের বলে এদের অপর নাম – 'পাইপ্-ফিশ্' বা নল-মাছ। এই নলের মতো দেহটিকে এরা খুশীমতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে। অন্যান্য মাছের মতো এরা তেমন সন্তরণ-পটু নয়... বড় পাখনা নেই এদের, তবে ল্যাজের ব্যবহারে রীতিমত সুপটু... তাই সমুদ্রের অল্পজলে শ্যাওলার জঙ্গলে বাস করে এবং নাগালের মধ্যে ছোট-ছোট সামুদ্রিক কীট শিকার করে খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের জাতের মেয়ে-মাছেরা ডিম পাড়ে, তবে সে ডিমগুলি ল্যাজের উপর বয়ে বেড়ায় পুরুষ-মাছেরা। ল্যাজে জড়ানো এদের স্বভাব।

<u>চাক্‌মা-বেবুন</u>: বেবুন, আসলে মর্কটের নিকট জাতি এবং এই চাক্‌মা-বেবুন হলো, বেবুনেরই একটি বিশিষ্ট শ্রেণী সম্ভূত। বেবুন-জাতের মধ্যে এরা হলো আকারে সবচেয়ে বড়। এদের সর্বাঙ্গে বড়-বড় লোম থাকে, তবে ঘাড়ের কেশর তেমন বড় নয় আর ল্যাজের ডগাতেও থাকে না ঘন লোমের গোছা। এদের গায়ের লোম কালো এবং সেই কালোর উপর সবুজের আভা। তবে এদের পা, হাত আর মাথার রঙ ঘোর-কালো... মুখের রঙ লাল, চোখের চারিপাশের রঙ সাদা। এরা মর্কটের মতো গাছে চড়তে আর ডালে-ডালে লাফালাফি করতে তেমন পটু নয় ...তাই এরা দল বেঁধে মাটিতেই বাস করে। এদের স্বভাব খুব হিংস্র এবং বল-বিক্রমও অসাধারণ... ক্ষেপে গেলে এদের আক্রমণে বনের বাঘ-সিংহও কাবু হয়। সাধারণতঃ ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করে, তবে পোকামাকড়, গিরগিটি, কাঁকড়া-বিছা, পাখীর ডিমেও অরুচি নেই। বাস – দক্ষিণ-আফ্রিকায়।





<u>কেরানী-পাখী</u>: এরা হলো শকুন-জাতের বিচিত্র এক ধরণের পাখী... মাথায় কটি বড়-বড় পালক থাকে বলে এদের দেখায় ঠিক কানে-কলম গোঁজা কেরানীর মতো – তাই এদের নাম হলো কেরানী-পাখী। আকারে এরা প্রায় চার ফুট দীর্ঘ হয়। এদের পা দুটি হয় খুব লম্বা ছাঁদের, পায়ে থাকে বড়-বড় ধারালো নখ... মুখে সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট। এরা সাপ, ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি শিকার করে খেয়ে জীবনধারণ করে। বিষধর সাপ এদের প্রিয় খাদ্য... সাপ দেখলেই এরা ছুটে গিয়ে বলিষ্ঠ ডানার ঝাপটে তাকে বধ করে পরমানন্দে গিলে খায়। এদের গতি খুব ক্ষিপ্র এবং চোখের দৃষ্টিও রীতিমত তীক্ষ্ণ! এদের সাহস এবং বুদ্ধিও খুব প্রখর। আফ্রিকা দেশের বনে-জঙ্গলে এ সব পাখীর বসবাস। চেহারার দিক দিয়ে শকুনের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকলেও, স্বভাব এদের তেমনি নির্ভীক আর বেপরোয়া ধরণের... অন্য জীব এদের সমীহ করে!

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

উষার উদয় রাগে পঁচিশে বৈশাখে তব নাম
দেশে দেশে ধ্বনিতেছে অবিরাম। তোমারে প্রণাম
কবি! তোমারে প্রণাম; জীবনের বেদনাপ্রবাহে
আশা-আবেগের সেতু রচি সবে হর্ষোচ্ছ্বাসে গাহে
তোমারি সঙ্গীত, শতবর্ষ পরে জন্মদিনে তব
চেনা-অচেনার ছেদ রেখা মুছে ভাবে অভিনব
রবি-সাধনার ধূপ জালি ধরণীর পরিসরে।
নতুন ক্রান্তির দিকে অগ্রযাত্রা বাহিরে অন্তরে
চলিয়াছে তব। মুহূর্ত্তের বৃন্তে বৃন্তে পুষ্পদল
ওঠে ফুটে তোমারি পরশে, তুমি এসে ধরাতল
করে গেছ উর্বর শ্যামল, চির মানুষের কথা
ব্যক্ত করি অনুরাগে, হৃদয়ের প্রেমগুল্মলতা
ব্যাপ্ত করি সমগ্র জগতে, অমৃতের বার্ত্তাবহ!
প্রাত্যহিক যাত্রাপথে বাণী তব শুনি অহরহ।

নিখিল জীবন তটে কাব্য তব অনন্ত জলধি,
অনাদিকালের স্রোত বক্ষে তার মিশে নিরবধি—
আকাশ গঙ্গার স্বপ্ন করেছে সার্থক
বীর্য্য আর বীজে;
অনেক বন্ধুর পথে ইতিহাস ফেলে রেখে গিছে
কীর্ত্তির শিখরে তব নত শিরে পূজারিণী সম
এ শতাব্দী অর্চ্চনামগন—হে সুন্দর, সর্ব্বোত্তম
সভ্যতার জীবন্ত বিগ্রহ! বর্ষে বর্ষে এমনি বৈশাখে
চিরদিন করে যাবো জন্মতিথি সাজায়ে তোমাকে।

ভারত আত্মার তুমি অব্যয় আত্মীয়—হে সারথী
মহাজ্যোতিষ্কের রথে এনেছিলে উদয়-ভারতী,
নিখিলের ভাব রাজ্যে চিরতরে করে গেলে দান;
তোমারে প্রণাম কবি! নব নব সৃষ্টির নিধান।

রবীন্দ্র-মানস ঃ দ্বিধা, সমন্বয় ও পরিণাম

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

'বলাকা'র একটি কবিতায় কবি বলেছেন, "জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে ফোটে তোমার মানস-সরোবরে।" ক্রমবিকশিত অখণ্ড জীবন-পরিণতির এই সরল সংক্ষিপ্ত আশ্চর্য-সুন্দর রূপ-কল্পটি জীবন-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ স্বীকৃতি। শিল্পের যেমন একটি বিশেষ রূপ আছে, তেমনই জীবনশিল্পেরও একটি বিশেষ স্বরূপ আছে। জীবন হতে জীবনান্তরে প্রসারিত একটি সত্তার ক্রমবিকশিত রূপ যেন জীবন-বিধাতারই গতিশীল স্বপ্ন-প্রবাহ—আজও যা পূর্ণ নয়, কিন্তু পূর্ণতার প্রতীক্ষায় উন্মুখ। জীবনোপলব্ধির এমনই এক সন্ধিসীমায় কবি মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর মন্তব্য করেছেন। সেই উপলব্ধির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কম নয়—তাতে যেমন দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও ঋজু রাখা দুরূহ ব্যাপার, তেমনি দুরূহ এই বৈচিত্র্যের পথে পথে যে আপাত-বৈপরীত্যের অসমতল ভূখণ্ড আছে, তাকে অতিক্রম করা। তাই প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কবির ছোটখাটো টুকরো কথাকে যেমন তেমন অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা যেমন সহজ, তেমনই দুরূহ কবির অখণ্ড জীবনাভিপ্রায়ের যথার্থ রূপ আবিষ্কার করা। কবির দীর্ঘ জীবনে যে-সমস্ত উপলব্ধি ঘটেছে, তার দ্বিধা ও বৈপরীত্য কম নয়। কিন্তু তাতে কবির অভগ্ন জীবনাচরণের মূল-সত্যটিই নিঃসংশয়িত হয়েছে। শিল্পীর জীবনে, বিশেষত যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মত জীবনশিল্পী—তাঁদের জীবনে, এই দ্বিধা

ও বৈপরীত্যের মূল্য কম নয়। দুই বিপরীত কোটির আপাত-বিরোধী আন্দোলন কবির বাসনা-লোককে নিরন্তর সৃষ্টিরহস্যে স্পন্দিত করেছে।

"সোনার তরী"—পর্বে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা একখানি চিঠিতে কবি এই সময়ের একটি উপলব্ধির কথা বলেছেন। "আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" লোকালয়াশ্রিত জীবন-বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই পর্বে কবির পরিচয় ঘটেছে—আত্মরুদ্ধ অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভাবনাগুলি জীবনের বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত। "সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা" এবং "সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা" আপাতদৃষ্টিতে যতই বিপরীত হক না কেন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্তরের সীমা পার হয়ে যখন শিল্পরূপ পেয়েছে, তখন তার মধ্যে আর কোন বিরোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এখানে "যেতে নাহি দিব"-র মত কবিতাও যেমন আছে, তেমনই আছে "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র মত কবিতা। এক সময় মোহিতলাল "উর্বশী" কবিতায় স্বত-বিরোধ খুঁজে পেয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণেই ("আধুনিক বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থের "বিহারী-লাল চক্রবর্তী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ সম্পর্কে কবি নিজে যে জবাবদিহি করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। "নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে-সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাবসট্র্যাক্ট সৌন্দর্যের টান আছে, তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলী যাকে ইনটেলেকচুয়্যাল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকে অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্য আমি দায়ী নই।" কবির এই উক্তি থেকে সৌন্দর্যের আপাত-বিরোধী দ্বিমুখী প্রকৃতির সমন্বয় কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক রচনাতেও তেমনি বহু বিপরীত মন্তব্য চোখে পড়বে। "কড়ি ও কোমল"-এর যুগে কবি বলেছিলেন, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" আবার সেই কবিই পরবর্তীকালে বলেছেন, "মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া সব সম্পদ খোয়ায়ে।" মৃত্যুহীন জীবন-পূজারীর আকস্মিকভাবে মরণ-রসিক হয়ে ওঠা আপাত-দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হলেও মূলে কোন বিরোধ নেই। সাধারণ দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রসারী চেতনার আলোকে এই দু জগৎ এক হয়ে উঠেছে। এক অখণ্ড গতিচেতনাকে কবি জীবন ও জগতের বৃহত্তর তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন—জীবনই মৃত্যুর মহাসমুদ্রে স্নান করে প্রতিমুহূর্তে নূতন হয়ে দেখা দিল—এখানে জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা পর্যন্ত যেন অবলুপ্ত হয়েছে।

"ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।"

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত অথবা তারুণ্যের মধ্যেও এই ধরণের একটি কবিভাষা আছে। "ফাল্গুনী" নাটকের ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন…"পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে—যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে, জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।" কবি তাঁর এই উপলব্ধির আপাতবিরোধী উপাদান সম্পর্কে নিজেই যা মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। "সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। এই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হক তার মূলে একটি গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতির মধ্যেও এক জাতীয় বিরোধ চোখে পড়ে। কবিতায় নাটকে ও কথাসাহিত্যে সর্বত্রই এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ চিহ্নিত। "কড়ি ও কোমল"-এর যৌবন-স্বপ্নের মধ্যে যেমন একদিকে আচ্ছন্নতা ও বিহ্বলতা, তেমনই অন্যদিকে অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার করুণ সুন্দর বিষণ্ণতা। সম্ভোগের নেপথ্যে এক ভোগাতীত বিস্ময় ও জীবনদ্বন্দ্বের বিচিত্র রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। যৌবনের "কুসুম কারাগার" থেকে বৃহত্তর মানবজগতে নিজেকে

মুক্ত করার সাধনা কবিকে পীড়িত করেছিল—তাই কীটসীয় সৌন্দর্যসাধনার অতি বিচিত্র রূপবিহ্বলতার জগৎ রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সৌন্দর্য মণ্ডলীর একটি বিশিষ্ট অবস্থা মাত্র, সবটুকু নয়। "মানসী"র "সুরদাসের প্রার্থনা" কবিতাটি এই লগ্নের কবি-মানসের আত্মকাহিনী। তাই জীবন-দ্বন্দ্ব জর্জরিত কবি সুরদাস বলেছেন,

"যাক তাই যাক! পারিনে ভাসিতে
কেবলই মূরতি-স্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোক-মগন
মূরতি-ভুবন হতে।"

এই সময়ের "রাজা ও রাণী" নাটকে প্রেমের বিপরীত প্রবাহের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। বিক্রমের "প্রচণ্ড আসক্তি" আর সুমিত্রার আদর্শান্বিত কল্যাণ-পরিণাম প্রেমের দ্বন্দ্ব কবিমানসের একটি জটিল উপলব্ধির নাট্যরূপ মাত্র। সুমিত্রার মৃত্যু এই দ্বন্দ্ব অবসানের একটি অসাধারণ উপায়। পরিণত অভিজ্ঞতার আলোকে এই আত্মিক সমস্যা মহুয়া-তপতী-শেষের কবিতার যুগে পূর্ণতর রূপ পেয়েছে। এই পরিণতির জন্য একটি আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। "খেয়া" থেকে "গীতাঞ্জলি" পর্ব এই প্রস্তুতির কাল-পরিধি। প্রকৃতি-সত্য, মানব-সত্য ছাড়াও আর একটি জগতের পরিক্রমা তখনও বাকী। বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ভাবচর্যার নিভৃত লগ্নে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন ছিল। এই ভাবচর্যা জীবনাচরণেরই একটি অবস্থা, আবার জীবনাধিক তন্ময়তাও বটে। "মহুয়া" কাব্যে কবি তাঁর প্রেম-কবিতার মধ্যে স্পষ্টত দুটো দল দেখতে পেয়েছেন। একটি—"প্রণয়ের প্রসাধনকলা" যার মধ্যে হাস্য-লাস্য-ভঙ্গি-উচ্ছলতা, কোনটিই বাদ পড়েনি; দ্বিতীয়টি—"প্রণয়ের সাধনবেগ" —যার মধ্যে আছে প্রেমের ঋজু-দীপ্ত তপস্যা-পরায়ণা মহাশ্বেতা-মূর্তি। "মহুয়া"র মধ্যে যে প্রকৃতিমুখ্য ভাবলাবণ্যের বাণীরূপ আছে, তারই মানব-মুখ্য কথাচিত্র। তাই শেষের কবিতায় এই ভাবদ্বন্দ্বের সংঘাত তীব্রতর। লাবণ্যের চিঠিতে এই সংঘাতের পূর্ণ পরিচয় আছে—শিল্পী অমিতের জন্য লাবণ্যের রইল "সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়, সে আমার প্রেম।" আর মানবী-লাবণ্য অনায়াসে বলতে পেরেছে "মোর লাগি করিয়ো না শোক, আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।"

প্রকৃতির আরণ্যক ব্যঞ্জনায় প্রেমের তির্যক অভিব্যক্তি স্বল্পাভাস-সুন্দর; কখনও প্রকৃতি পটভূমিকায়, কখনও বা ভূমিকায়। এখানেই প্রেমের সমন্বিত সৌন্দর্যের পূর্ণতা। কিন্তু মানবমনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে যতবার যুক্ত হয়েছে, ততবারই দ্বিধার সুর সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। যেখানে সমন্বিত হয়েছে, সেখানে প্রেম একটি বিশেষ ধরণের সৌন্দর্যচর্চায় পরিণত হয়েছে। ব্রাউনিং-এর যেখানে মানবানুগ প্রেম-বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের সেখানে সৌন্দর্যচর্যা। অপরপক্ষে "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে, "চার অধ্যায়-"এর অতীন-এলার প্রেম কাহিনীতে যে উচ্ছ্বসিত দাবদাহের বর্ণাঢ্য ছবি আছে, তা থেকে শেষ-জীবন পর্যন্তও কবির সম্মুখে একটি প্রেম-দ্বন্দ্বের স্বরূপ ছিল, তা উপলব্ধির পক্ষে কোন বাধা থাকে না। "বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" "পিত্রার্কা" ও "গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ" (ভারতী, ১২৮৫ : শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন) প্রবন্ধত্রয়ে তার শুরু, "শেষের কবিতা"য় তার পরিণতি। তথাপি উত্তর-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাচঞ্চল কণ্ঠে বলেছেন, "প্রেমে আর মোহে, একেবারে বিরুদ্ধ কি দোহে!" গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথও তাঁর বহু রচনায় শিল্পজীবন ও প্রেমের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে প্রেমের যে সুসমঞ্জস ছবি ফুটেছে, শিল্পীর জীবন ও মানবজীবনের দিক থেকে সে-সামঞ্জস্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মধ্যবয়সে কবি গভীর আত্মনিরীক্ষার মুহূর্তে বলেছিলেন —"এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ, এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়—যে-সমাধান পরমশক্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি।" ইংরেজ সমালোচক শিল্পীকে "গুড আর্টিস্ট" ও "গ্রেট আর্টিস্ট"—এই দুভাগে ভাগ করেছেন। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে সমালোচক এই শ্রেণী বিভাগ করতে কাব্যের চেয়ে কবিমানসের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করলেই "মহৎ শিল্পী" হয় না, "মহৎ শিল্পীর" ভিত্তিমূলে আছে কবিমানসের একটি বিশেষ প্যাটার্ন। জীবন দ্বন্দ্বের আলোকদীপ্ত সূর্যোদয়ে তার এক একটি পাপড়ির উন্মোচন। দ্বন্দ্ব সেখানে

ক্ষয়িষ্ণুতার অবসাদ আনে না, বরং নূতন পথ দেখায়—"এপার হইতে নবজীবনের পারে, চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।" এই নবজীবনের আর শেষ নাই। যতবার দ্বিধা, যতবার সংশয়, ততবারই নূতন পুর্বাচলের অনুসন্ধান। এই কারণেই মহৎ আর্টিস্ট মাত্রেই গতিরাগের সুরকার রেনেসাঁর কাল থেকে মানবেতিহাসের যে কয়েকজন "মহৎ শিল্পী" আছে, অন্য দিকে তাঁদের পরস্পরের প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, যে-জীবনকে তাঁরা দেখেছেন বহু দ্বিধা-বঙ্কিম পথের ভিতর দিয়েও তার অভিপ্রায় সমগ্র ও অখণ্ড। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিরেখায় দান্তের কাব্যে পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর সামগ্রিক স্বপ্ন, রেনেসাঁর পূর্ণ-প্রতিভা শেক্সপীয়ারের নাটকে সৃষ্টিরহস্যের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও মননশীলতার সঙ্গে শাশ্বত মানব-অভীপ্সার উদার সমন্বয়-সাধক গ্যয়টের সমুন্নত দৃষ্টি, উচ্চতর জীবননীতি ও আপাত-সুন্দর অকল্যাণের দ্বন্দ্বে কাতর ঋষি টলস্টয়ের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা মানবেতিহাসকে যে সমুন্নত ও মুক্ততর প্রেরণা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তারই উত্তর সাধক। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যতই থাকুক, তাঁর উপলব্ধিসঞ্জাত নির্দেশ ছেড়ে তিনি পথভ্রষ্ট হননি। সাময়িকভাবে ধূলি উড়ল, তর্কে-বিতর্কে জল ঘোলা হয়ে গেল, অথচ সব সময়ে তিনি নিজের কালের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হয়েও রইলেন সর্বকালের উর্ধ্বে। কবি বলেছেন, "সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে, তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই।···যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই।"—(আত্মপরিচয়, পৃ—৩৬)

উত্তর-সপ্ততি রবীন্দ্রনাথের গহনময়তা ও অন্তর্গূঢ়তা অনন্যসাধারণ। আত্মোপলব্ধির এই মৌন মুহূর্তে কবির সম্মুখে এক চরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

শিল্প-সত্য ও আত্মতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-মানসের চূড়ান্ত পরিণাম। এই সত্যের উপলব্ধির পথে এসেছে নানা বিরোধ, নানা সংশয়, কিন্তু কাব্যাচরণের অভিপ্রায় তাতে ব্যাহত হয়নি। রবীন্দ্রমানসের বিস্তৃতি ও বহুভাষণের কেন্দ্রে অবস্থিত এই উপলব্ধিই তাঁর শিল্প জীবনের প্যাটার্নকে রূপায়িত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে কবি তাঁর কবিপুরুষের মৌলিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলেছিলেন,

"The 'I am' in me realizes its own extension, its own infinity whenever it truely realizes something else." (The Religion of an Artist).

জীবনের বহু-বিরোধী উপাদান কীভাবে তার মূল সত্যের চারপাশে এসে সংহত হয়েছে তার কথা বলেছেন অন্যত্র—সেখানেই তাঁর শিল্পীজীবনের মহাসমন্বয় ও মহৎ পরিণাম। "আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ধর্মবোধ, যে-প্রেমের এক দিকে দ্বৈত, আর এক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও একেকে পূজা করে।" (আত্মপরিচয়) কবির এই স্বীকৃতির মধ্যেই তাঁর কাব্যাচরণের দ্বিধা, সমন্বয় ও পরিণামের মূল সুর পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্যাটার্ন অনুসরণ করেই একমাত্র বিচিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব। জীবনের কেন্দ্রগত মর্মকোষ থেকেই বর্ণবিচিত্র পাপড়ির উন্মোচন।

"Tagore's life-pattern was essentially melodic, with numerous improvisations indeed, but it was built round the radiant notes." (Tagore—a, study : Dhurjati Prasad Mukherjee)

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের এইখানেই অখণ্ড সত্য-সাধনা।



ভেক বিসর্জন দেবার জন্যে আর এক জাতের ভেক ধারণ প্রয়োজন হোয়ে পড়ল। কারণ ভেক না হোলে ভিখ মিলবে না। গোঁফ দাড়ি চুল নেই, মালা তিলক জলসমাধি লাভ করেছেন। কিন্তু দিন ত' চলা চাই। ঝোলা ঝেড়ে রেস্ত যা বেরল, তার অর্দ্ধেক গেল গেরস্ত ঘরের ভদ্র সন্তান সাজতে। গেরস্ত ঘরের একটি ভদ্র সন্তান এবং ভদ্র সন্তানের একটি ভদ্র পরিবার। হিসেব করে জোটাতে জোটাতে জুটে গেল সবই। ঘোর সবুজ রঙের ওপর টকটকে লাল পদ্মফুল আঁকা এক টিনের সুটকেশ, আর গরগরে লাল কালো ডোরা-কাটা সতরঞ্জি জড়ানো হালকা একটু বিছানা, এই দুই বস্তু ত' চাই-ই চাই। ভদ্র গেরস্ত ঘরের সন্তান, সপরিবারে ঘুরছে, তার সঙ্গে একদম কিচ্ছু না থাকলে লোকে ভাববে কি! তারপর থান দুই ধুতি, থান তিনেক শাড়ী একটা দুটো করে গেঞ্জি ব্লাউস্ সার্ট সায়া কিনতেই হোল। সর্ব্বোপরি দু' জোড়া স্যাণ্ডেল। স্যাণ্ডেল হোল চাপরাস। স্যাণ্ডেল পায়ে থাকলে সহজে কারও কিছু সন্দেহ হবে না। সপরিবার ভদ্র সন্তানেরা স্যাণ্ডেল সম্বল করেই টিকে আছেন।

অপরে সন্দেহ করুক না করুক, আমার নিজেরই কেমন সন্দেহ হোতে লাগল। গেরস্ত সন্তানের পরিবারটির পানে তাকিয়ে বলেই ফেললুম—মনে হচ্ছে কি জান সই, মনে হচ্ছে আমি কারও ইয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে পালাচ্ছি।

পালাচ্ছই ত'। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে নিয়ে দেশান্তরি হচ্ছ।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী! ওরে বাব্বা! তিনি আবার কে!

যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। বিপিনবিহারী বেচারা একটি চাকরি করছিল, বৌটিকে নিয়ে ঘর-কন্না পেতেছিল। হঠাৎ চাকরিটি গেল। তাই আবার চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি চাকরি-বাকরী জুটলেই হাঁড়ি পেতে ফেলবে।

খুবই জুতসই গল্প বটে। যেখানে সেখানে বলা যায় এবং যার তার মুখ থেকে শোনাও যায়। যতকাল গেরস্ত ঘর আছে, ততকাল ভদ্র সন্তান থাকবেই। ভদ্র সন্তান হোলেই চাকরির চেষ্টা করতে হবে। চাকরি করবে ভদ্রতা বাঁচাবার জন্যে। আবার চাকরিটুকু যখন ঘুচবে তখন আর পাঁচটি ভদ্র সন্তানের দ্বারস্থ হোয়ে তাঁদের ভদ্রতার উত্তাপে উত্তপ্ত হোয়ে উঠবে। এ সমস্ত হোল অতিশয় স্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা। আকচার ঘটছে, সুতরাং ভদ্র সন্তানের ভেক নিলে পস্তাতে হবে না।

তবু একটু কোথায় যেন কিন্তু রয়ে গেল। গেরস্ত

ঘরের ভদ্র সন্তান, চাকরির চেষ্টা করতে বেরিয়েছে পরিবার-টিকে পিঠে বেঁধে নিয়ে! এটা যেন কেমন একটু বাড়াবাড়ি গোছের হোয়ে দাঁড়াচ্ছে না।

পরিবারটি বিশেষ রকম পরিপক্ক। ঠোঁটের ডগায় জবাব জুগিয়েই আছে। বললেন—আহা, সে দুঃখের কাহিনী আর শুনিয়ে লাভ কি সকলকে—নেহাত যদি শোনাতেই হয় তবে শোনাবে। বাপ-মা-মরা মেয়ে। তিন কুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের মামার ঘরে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হচ্ছিল। সেই মামাই ঐ চাকরিটি করে দেয়। তার বদলে ভাগনীটিকে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু ভাগনী হতভাগীর কপালে চাকরিটুকু টিকল না। অগত্যা সঙ্গে নিয়েই ঘুরতে হচ্ছে। ফেলবে কোথায়? সেই হাড়হাবাতে মামার ঘরে ত' আর তুলে দিয়ে আসতে পারে না।

অনেকক্ষণ হাঁ করে রইলাম। তারপর বললাম—তুলে দিয়ে আসাই উচিত ছিল। এমন ডাহা মিথ্যুক ভাগনীর মামার কাছেই থাকা উচিৎ। তা' শ্রীবিপিন-বিহারী চক্রবর্ত্তী বাবুর স্ত্রীর নামটি ত' শোনা হোল না। সেটাও এই বেলা শুনে নি।

পরম গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে পরিবার বলে ফেললেন—সেটাও আবার কাজে লাগবে নাকি! লাগলে বোল, বিপিনবিহারীর স্ত্রীর নাম আর কি হোতে পারে! নিস্তারিণী বা হেমাঙ্গিনী বা জগত্তারিণী। যা মুখে আসবে, বলবে। মেয়েদের কি একটা নাম থাকে। বিয়ের আগে যার নাম ছিল টুলু বা বাবলী, বিয়ের পরে সে হোয়ে গেল অনসূয়া বা আত্রেয়ী—। ওতে কিছু যায় আসে না। যেটা চালাবে সেইটেই চলবে।

চলতে লাগলাম।

উদ্ধারণপুর থেকে কাটোয়া, ছোট রেলে চেপে আহমদপুর, তারপর বড় রেলে চড়ে নামলাম গিয়ে যেখানে, সেখানেই ভেক পরিবর্ত্তন সুসম্পন্ন হোল। তখন আর পথ চলা আটকায় কে! চলতেই লাগলাম।

ফ্যাসাদ বাধল শাস্ত্র নিয়ে। শাস্ত্রে নাকি আছে, রাস্তায় ঘাটে রাণী নিয়েচলতে নেই। শাস্ত্র যাঁরা লিখে রেখে গেছেন, তাঁরা যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, সেটা পদে পদে মালুম হোতে লাগল। পরিবার সমেত চাকরি-বিহীন বিপদগ্রস্ত ভদ্র সন্তানকে কয়েক দিনের জন্যে আশ্রয় দিতে অনেকেই পেছপা হন না, বরং একটু মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহই প্রদর্শন করেন। কিন্তু পরিবারটি বেঁকে বসেন। একটা বা দুটো রাত কাটবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পথে নেমে পড়েন। কারণ! কারণ কিছুই নয়, শুধু পথ চলার নেশা। শিকল-কাটা ময়না দাঁড়ে বসে ছোলা কাটবে কেন?

কানে কানে বলেন—চলনা গোঁসাই, চলনা আরও এগিয়ে যাই। এর মধ্যেই বসে পড়বে! দু'দিনে বিষিয়ে উঠবে যে ঘর সংসার।

তা' উঠবে। কিন্তু পথেই যদি ঘুরবে তা'হলে ভেক পাল্টাতে গেলে কেন? মালা ঝোলা তিলক ফোঁটা থাকলে এতটা বাধবাধ ঠেকত না, দুটো ভিক্ষেও জুটত। ওধারে পুঁজি যে ফরসা হোয়ে এল। কাজকম্ম একটা জোটাতে হবে ত'।

জুটবে। যখন যেখানে জোটবার কথা, জুটবেই। এক জায়গায় বসে কতকগুলো ডেঁপোর সঙ্গে গলাগলি করলেই সগ্‌গে উঠব আমরা। কথাবার্ত্তা শুনলে গা জ্বলে ওঠে। আহা—যেন কত কি জানেন সবাই, কত কি বোঝেন। লেখা পড়া শিখেছে, চাকরি করছে, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। চাকরি করার বিদ্যে পেটে আছে যখন, তখন আর ওঁদের জানবার বাকী আছে কি। দূর দূর, চল আরও ঘুরি, আরও এগিয়ে যাই। মনের মত ঠাঁই ত' জোটা চাই। যেখানে সেখানে চাকরি পেলেই—অমনি তাই নিয়ে বসে পড়তে হবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি দিয়েছে কেউ।

জবাব দিই না। জবাব নেইও। ভয় পাচ্ছে বেচারী। ঝোঁকের মাথায় ভাসিয়ে দিলে পথের মানুষের পরিচয়, ঘরে সেঁধুতেও ভয় পাচ্ছে। পথের ধুলো গায়ে লাগলে গা ঝেড়ে ভিন্ দেশের ভিন্ পথে পা বাড়ানো যায়—ঘরের ঝুল মুখে মাখলে সে মুখ নিয়ে সেই ঘরেই লুকিয়ে থাকতে হয়। পথ চলার জের টানা শেষ হয় না, পথ অফুরন্ত। ঘরের জের ঘরের দরজা ডিঙিয়ে বাইরে বেরয় না, বেরলে ঘরের জাত যায়। তাই ঘরের চৌহদ্দিতে পা দিতে ডরিয়ে উঠছে।

এধারে জবাব দিতে দিতে জেরবার হোয়ে মরছি আমি। অমন একটি পরিবারের স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হোলে যথেষ্ট তালিম নেওয়া প্রয়োজন। রক্তবর্ণ গোলাপ আঁকা সবুজ রঙের টিনের স্যুটকেশ, আর গরগরে ডোরা কাটা সতরঞ্জি-বাঁধা বিছানা মোটেই যেন সাহায্য করছে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, সন্দেহের পাহাড় আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে। ভাগিয়ে যে এনেছে মেয়ে-মানুষটাকে, এটা ত' বলাই বাহুল্য। এখন কোথা থেকে কার ঘর থেকে ভাগিয়ে এনেছে, সেইটুকু জানতে পারলেই সকলের সব সমস্যার সমাধান হোয়ে যায়।

সমস্যার সমাধান ওধারে এগিয়ে এসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে, মোটেই আমরা বুঝতে পারিনি। পারব কেমন করে, উদ্ধারণপুরের ভস্মে নজর যে তখনও ছাইচাপা পড়ে আছে।

ঝড় উঠছিল। বিহারী ঝড়, যেমন গোঁ তেমনি গর্জন। যেন আহেলী বাবা বৈদ্যনাথের বাহন।

সকাল থেকে হিজিবিজি কত কি ফুটে উঠছিল আকাশের গায়ে। দুপুর নাগাদ সব যেন লেপটে গিয়ে একাকার হোয়ে গেল। পশ্চিম দিকে মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হোতে লাগল বড় বড় পাহাড়। চড়া রোদে পাহাড়গুলোকে তুলোর পাহাড় বলে মনে হোল। তারপর সেই পাহাড়গুলো গুটিগুটি এগিয়ে এসে রোদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্যাকাশে হোয়ে গেল আকাশের মুখ। হঠাৎ দেখা গেল, পাহাড়ের গোড়ার দিকটাও গুড়গুড়িয়ে উঠে আসছে। যেমন কালো তেমনি ভয়ঙ্কর। হঠাৎ সমস্ত পাহাড়টা যেন ফেটে গেল ভেতরের চাপে। রাশি রাশি ধুলো আর বড় বড় পাথরের চাঙড় জড়ামড়ি করতে করতে ছুটে চলল আকাশের চতুঃসীমায়। ঝড় উঠল।

বগলে সেই সতরঞ্জি বাঁধা বিছানা আর হাতে টিনের স্যুটকেশ নিয়ে যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে চলছিলাম ষ্টেশনের উদ্দেশে। পেছনে পরিবার ছাতা এবং ঘটি হাতে স্যাণ্ডেল টেনে টেনে এগিয়ে আসছেন। আকাশে মাটিতে ছোঁয়া-ছুঁয়ি হোয়ে গেল। লাল মাটি আর লালচে কাঁকরের ঝাপটায় বসে পড়তে হোল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম দিকের দু' তিনটে ঝাপটার পরে মাটি পাথর আর রইল না, রইল শুধু হাওয়া। তখন হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে উঠে দাঁড়ালাম।

সামনে কয়েক পা এগলেই ডান ধারে এক ফটক। ফটক দেখে বুকে বল হোল। বললাম—চল শিগ্‌গির, ঐ বাড়ীটায় ঢুকে পড়ি।

বলেই ছুটলাম, বাক্স বিছানা স্যাণ্ডেল নিয়ে ছোটা—ছোটা নয়। পড়ি ত' মরি করে ফটকের সামনে পৌঁছে দেখি, ইয়া মোটা লোহার শেকল আর ইয়া বড় এক তালা ঝুলছে ফটকে। এখন উপায়।

পেছন থেকে পরিবারটি বলে উঠল—ঐ ত' ভাঙা রয়েছে নিচেকার দুটো কাঠ। ঢুকে পড়, আড় হোয়ে গলে যাও শিগ্‌গির। আবার ঐ গোঁ গোঁ আওয়াজ উঠছে।

বিছানা আর স্যুটকেশ ফেলে দিলাম সেই ফাঁক দিয়ে। তারপর নিচু হোয়েকায়দা করে গলে গেলাম। বকরা-বকরীদের যাওয়া আসার জন্যে ফটক ভেঙে পথ করা হোয়েছে, মানুষও তা' দিয়ে গলে যেতে পারে। তবে ঐ বকরা-বকরীর মত চার হাত পায়ে হাঁটতে হয়। সেই কায়দায় নিজে গললাম, পরিবারও গলে এল। তারপর সচল সংসার তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে উঠলাম দালানে। পাঁচিল ঘেরা বাগান, বাগানের মাঝখানে বাড়ী। দস্তুরমত সখওয়ালা মানুষের বাড়ী। দালানে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী বাগান দেখতে লাগলাম। ওধারে বাবা বৈদ্যনাথের বাহন তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে তুললে।

পশ্চিম দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কোথায় যেন শুনেছিলাম, বাঙলার বাইরে বাঙালীর কাছে বাঙালীর আদর আছে। বাঙলার বাইরে বাঙালী বাঙালীর সঙ্গে যেচে আলাপ করে। যেতে যেতে পথে পড়ল দেওঘর। অর্থাৎ বাবা বৈদ্যনাথ নাগালের মধ্যে এসে গেলেন। এ হেন মওকা, পরিবার-ওয়ালা গৃহস্থ মানুষ ছাড়তে পারে না। ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ বিধেয়। অতএব নামতে হোল। নেমে বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করে পাণ্ডাগণের খপ্পর থেকে নিস্তার পাবার আশায় তৎক্ষণাৎ ফিরে যাচ্ছিলাম ষ্টেশনে। উঠল ঝড়, ঝড়ের ধাক্কায় ভিড়তে হোল কূলে। অকূলে কূল পেলাম।

যাক্, দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। বাড়ী বন্ধ, জন-

প্রাণীর সাড়াশব্দ মিলল না। অর্থাৎ ঝড় যদি না থামে দালানে বিছানা বিছিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

মস্ত মস্ত থাম, থামের মাথায় বিপুলাকৃতি কড়ি, তার ওপর দালানের ছাত। থামের গা থেকে চুণবালির চাপড়া খসে গেছে। দালানের মেঝেতেও অনেক জায়গায় সিমেণ্ট নেই। হাত বিশ পঁচিশ চওড়া দালানের ভেতর ঘরের দেওয়াল। দেওয়ালটা গোলাকার। গোলাকার দেওয়ালের গায়ে পাঁচটা খড়খড়ি আঁটা দরজা। খড়খড়িগুলোও সেঁটে বন্ধ হোয়ে রয়েছে। ভেতরে মানুষ থাকলে ওভাবে খড়খড়ি বন্ধ থাকত না। হাওয়া চলাচলের জন্যে খড়খড়িগুলো তোলা থাকত। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপিনবিহারীবাবুর পরিবারকে বললাম—ঝড় বৃষ্টি না থামলে এখানেই আজ রাত্রিবাস। ভাল জায়গাতেই উঠলাম।

গায়েতে বেশ করে আঁচলখানি জড়িয়ে টিনের সুটকেশটা হাতে নিয়ে পরিবার বললে—বিছানাটাও আন। ঐ দরজার পাশে বিছানা পেতে ফেলি। জল এল। ঝাট কি ঐ ভেতর পর্যান্ত যাবে?

জল এল। যার নাম মুষলধারে বৃষ্টি। লড়াই শুরু হোয়ে গেল ঝড়ে বৃষ্টিতে। ঝড় বলে, আমিই শুধু থাকব, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব বৃষ্টিকে। বৃষ্টি বলে, নড়ানা দেখি নড়া। এক চুল নড়াতে পারিস ত' বুঝব তুই বাহাদুর বটে। ফলে একটু তেরছা হোয়ে বৃষ্টির ছাট দালানে ঢুকতে লাগল। দালানের ভেতর স্রোত বইতে লাগল। ঘরখানা বোধ হয় একটু বসে গেছে, কিংবা দালানের মেঝের ঢাল ভেতর দিকে। দেখতে দেখতে জমতে লাগল জল। বিছানা পাতা মাথায় উঠল। বাক্স বিছানা ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ক্রমেই আঁধার জমতে লাগল দালানের মধ্যে। ঝড়-বৃষ্টির দাপট ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল। একটা খড়খড়ি ঠেসান দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে। ঝড়ে জলে একটু যেন এলিয়ে পড়ল চিত্ত। মানে—বেশ ভিজে উঠলাম মনের মধ্যে চুপি চুপি। ডেকে ফেললাম—সই।

গলার নিচে বুকের ভেতর থেকে সাড়া দিলে—উঁ।

কি যে বলতে চেয়েছিলাম, গুলিয়ে গেল। যা বদনে এল বলে ফেললাম—কষ্ট হচ্ছে তোমার, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। কষ্টও পাচ্ছ, লাভও হচ্ছে না কিছু। তাই বলছিলাম—কি—এই—

তোতলাতে শুরু করলাম।

হঠাৎ খানিক গা ঝাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হোয়ে উঠল সই। মুখ ঘুরিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে রইল আমার চোখের দিকে। তারপর ওর মার্কামারা হাসি হাসতে লাগল। ঝড়-জলের মাতামাতি ছাপিয়ে ছল-ছলিয়ে ছুটে চলল সেই হাসির স্রোত। বেদম অপ্রস্তুত হোয়ে পড়লাম। রাগও যেন হোল খানিকটা। কি বিপদ! পাগল ঠাওরেছে নাকি আমায়! তেড়ে উঠলাম—সব কথায় কি যে হাস ছাই!

সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ, বিশ্বের ভয় জমে উঠেছে সেই অতি-মুখর চক্ষু দুটিতে। অভিমানে কেঁদে ফেলে আর কি। ভেজা-ভেজা সুরে বললে—শুধু যদি ঐ ধমকা-ধমকিটা না করতে, তা'হলে আর কষ্ট ছিল কোথায়। কেমন দু'জনে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর মধ্যে কষ্ট শুধু ঐ তোমার মেজাজ নিয়ে। কখন যে কি অপরাধ করে ফেলি, এই ভয়েই মলাম।

মোটেই টললাম না। ওর ঐ সুর, ঐ চোখ ছলছল ভালমানুষীপনা, সবই এক রকম মুখস্থ হোয়ে উঠেছিল। বাইরে ঝড় জল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এসপার ওসপার একটা কিছু করবার জন্যে মরিয়া হোয়ে উঠেছে আকাশের দেবতা। এই বেআদব দুনিয়াখানার টুঁটি টিপে ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাচ্ছে আর গজরাচ্ছে—জবাব দাও, দাও জবাব এখনই। কেন—কিসের দরুণ অমন উলটো-পালটা চালে চলে তোমার সংসার? কেন তোমার সংসারে—কোনও কিছুর কানাকড়ি মূল্য নেই? কেন ছিটে-ফোঁটা বিশ্বাস নেই তোমার দুনিয়াদারির অন্তরে? কি চাও তুমি, কি পেলে তুষ্ট হও—জবাব দাও।

আকাশের বজ্র-বিদ্যুৎ আমার বুকে চিড়িক মারতে লাগল। কি যেন কি ঘটে গেল মগজের মধ্যে। জবাব, শুধু জবাব, জবাবের পর জবাব চাইতে লাগলাম।

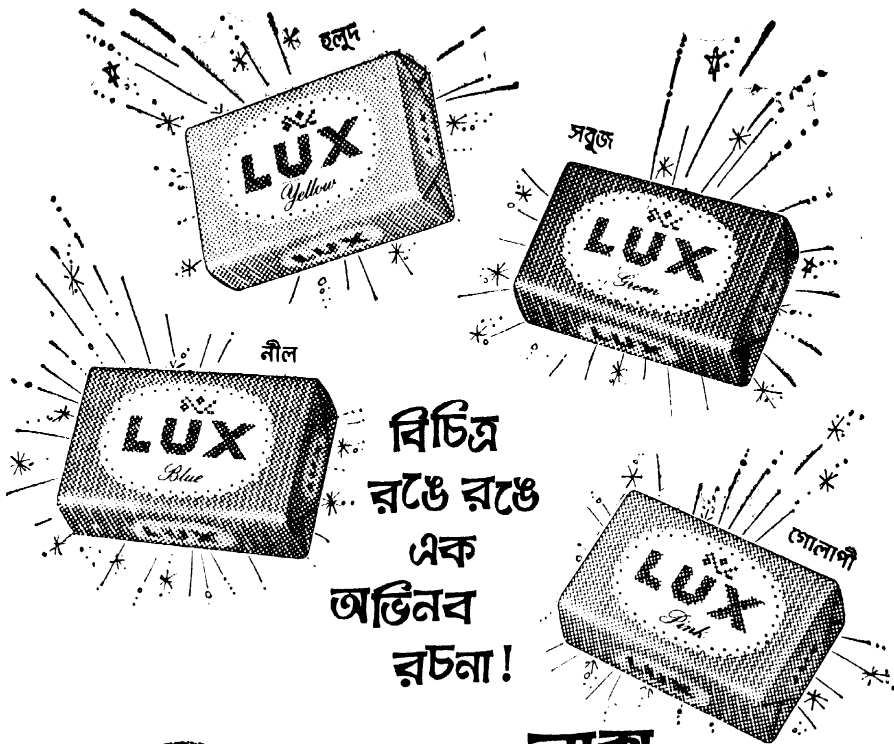
বল তুমি, কি চাও? কেন আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ? কি আছে আমার? কি তোমায় দিতে পারি? বল বল, শিগ্‌গির বল, কেন এই অযথা বিড়ম্বনা ভোগ? এই

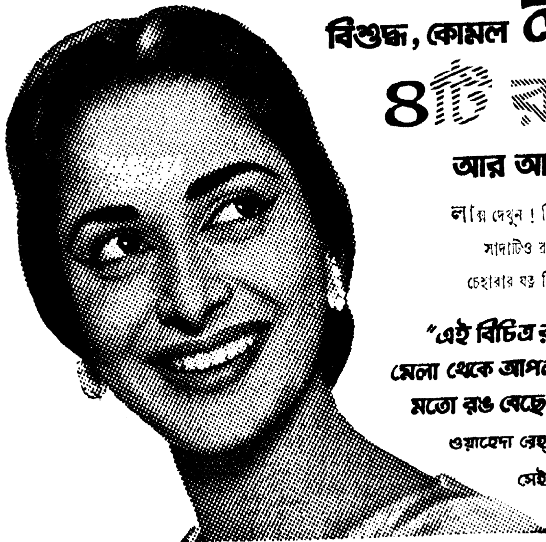
মিথ্যে সম্পর্কের ঝুটা বাঁধনে আটকে পড়ে অনর্থক দগ্ধে মরার সার্থকতা কোথায় ?

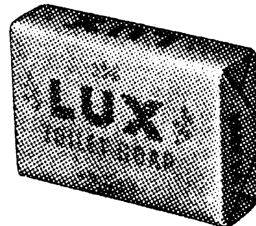
দস্তুরমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল নিতাই। নিতাই নয় —থুড়ি—শ্রীবিপিনবিহারীবাবুর পরিবারটি। বললে—কি আপদ! মাথা-ফাতা বিগড়ে গেল নাকি!

মাথা বিগড়াবার মতই একটা কাণ্ডকারখানা করতে যাচ্ছিলাম। ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম সেই মুহূর্তে। চমকে উঠেই মুখ ঘোরাতে হোল। একটি দশ এগার বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভাসাভাসা চক্ষু দুটিতে বিস্ময় থমকে রয়েছে। বললে—আপনারা ভেতরে চলুন, মা বলে পাঠালেন।

ক্রমশঃ


হলুদ
LUX
Yellow
সবুজ
LUX
Green
নীল
LUX
Blue
গোলাপী
LUX
Pink
বিচিত্র
রঙে রঙে
এক
অভিনব
রচনা!




LUX

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে যাঁর নাম আগে মনে হয় তিনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে সময়ে ইংরাজী সভ্যতার জোয়ারে বাঙালীরা নিজেদের মাতৃভাষাকে পর্য্যন্ত দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল সেই সময়েও ঠাকুর পরিবারে নিয়মিত মাতৃভাষার চর্চ্চা হইয়া আসিয়াছে। মাতৃভাষার প্রতি মহর্ষির জ্বলন্ত অনুরাগের দৃষ্টান্ত—কোন এক নূতন আত্মীয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে লিখিত পত্র তৎক্ষণাৎ ফিরৎ পাঠানো। দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন ঠাকুর পরিবারের অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বদেশের প্রতি নিজেদের অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে স্বাদেশিকতার পরিচয় পাই তা' উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল।" (জীবনস্মৃতি: স্বাদেশিকতা প্রবন্ধ)।

প্রায় দুইশ' বছর ধরিয়া বিদেশী সরকার ভারতের বুকে শাসনের নামে চালাইয়াছে শোষণ—আর সেই শোষণের অবসানকল্পে ভারতের বুকে এক একটি করিয়া সংগ্রাম চলিয়াছে। পিণ্ডারী ও ঠগী বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ ইত্যাদি একটির পর একটি বিপ্লব আসিয়া হাজির হইয়াছে ভারতের বুকে। এইরূপ বিভিন্ন সংস্কার ও আন্দোলন জাতীয়তা-বোধের মূলে বিস্তর রসদ জোগাইয়াছে। দেশের এইরকম এক অবস্থার মধ্যে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সুতরাং সেই সময়ের পারি-পার্শ্বিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতা উন্মেষের অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভা সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাসে' লেখেন:…"এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্বতোভাবে রাজকীয় সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা ও ধর্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। "স্বধর্মে থাকিয়াও যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্ত এই পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং বাঙালীর স্বধর্মকে ভিত্তি করিয়া বাংলার যাহা কিছু নিজস্ব তাহা এবং তদুপরি সমাজের আবর্জনা দূর করিয়া দেশী বিদেশী বিশুদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রচারের ভার লইল এই 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকা।" প্রকৃতপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী'র আমল হইতেই বৃটিশ ভারতে স্বদেশীভাব প্রচারের সূত্রপাত হয়। যদিও ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করে।

বাল্যকালে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর পরি-বারের আভিজাত্যের সমস্ত রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়া সাধারণ মোটা জামা, মোটা ধুতি পরিতে আর খুব সাধারণ আহার করিতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছু নয়—স্বদেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরাগও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; পরবর্তীকালে ইহারই পরিচয় আমরা তাঁহার অজস্র রচনা-প্রবন্ধ-গানের মধ্যে পাই। ১৮৮৭ সাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ্য পরিচয় মিলিতে থাকে। প্রবন্ধ গানের মধ্য দিয়ে জাতির সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে তৎপর হলেন রবীন্দ্রনাথ। ইংরাজ শাসকদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষায় তীব্র প্রতিবাদ তাঁর এই সময়ের লেখা প্রতিটি রচনায় মেলে। তিনি একটি গান লিখলেন: 'তোমারি তরে মা স'পিনু দেহ।' যতদূর জানা যায়, এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

উক্ত বছরেই কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী সঙ্গীতটি রচনা করেন সেটি হল: 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' গানখানি রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে আরো ৪টী দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন বলে জানা যায়। সেগুলি হল: 'তবু পারিনে স'পিতে প্রাণ', 'আগে চল আগে চল ভাই', 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে', ও 'আমায় বোলো না গাইতে বোলো না।' 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানখানি অবশ্য কিছু পরে লেখা। এই রকম অজস্র স্বদেশী সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত যে অতি উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে দেশনেতাদের পোষিত উচ্চ ধারণা' জননায়ক বিপিনচন্দ্রের উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়: "Rabindranath's patriotism is a part of his religion and his national songs fully deserve to be called not mere songs, but sacred hymns, and as such, they touch the heart of religious Hindu and Mohamedan population" of Bengal more quickly than the old patriotic songs…

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র

বলেছেন, "জাতীয় সঙ্গীতের প্রধান লক্ষ্য হ'ল দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগ্রত করা। গৌরববোধ না থাকলে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব নয়।" তাই জন্মভূমি বাংলা দেশ সম্বন্ধে কবি বলেছেন,'সার্থক জনম মাগো,জন্মেছি এই দেশে।'

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা-বিকাশে অন্যতম সহযোগী হলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। কংগ্রেসের ৪র্থ অধিবেশনের সূচনার পূর্ব্বে রাজনারায়ণবাবু "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের" উদ্দেশ্য লইয়া একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ইহারই পরবর্তী প্রচেষ্টা—চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগাইয়া তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টার সহিত বাঙালী এক নূতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল। সভা-সমিতি, আলোচনা ও সঙ্গীতের মধ্যে এতদিন যে প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল তাহাই ব্যাপক রূপ লাভ করিল হিন্দুমেলা প্রবর্তনে। এই মেলার প্রধান উদ্যোক্তা হলেন নবগোপাল মিত্র এবং উদ্যোক্তা-সভাপতি হলেন রাজনারায়ণবাবু। ঋষি রাজনারায়ণ লিখেছেন, "যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্তিকার আলোকে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, ইহা হইতেই চৈত্র বা হিন্দুমেলা রূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে।" কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন' গানখানিই ঋষি রাজনারায়ণের হিন্দুমেলা প্রবর্ত্তনের প্রধান অনুপ্রেরণা বলে জানা যায়। হিন্দুমেলার সভাপতি রাজনারায়ণ সম্বন্ধে কবিগুরু 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, "রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র মহাগুণী রাজনারায়ণবাবু দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য সর্বদাই কতরকম সাধ্য অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। দেশের শাসনের খর্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন।"

ইংরেজী শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার কোন ইচ্ছা বা কর্মপন্থা হিন্দুমেলার ছিল না। ইহার দুইটি প্রধান কার্য্য ছিল—(১) স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, ও (২) জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেমের নতুন আবেগ সঞ্চার। এই মেলা স্বদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, মৃত বা মৃতপ্রায় নিত্য-প্রয়োজনীয় শিল্প ও শিল্পযন্ত্র চরখা তাঁত প্রভৃতি, কৃষি ও কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি, জাতীয় ব্যায়াম ও সেই সঙ্গে শরীরচর্চার সাজ-সরঞ্জাম সংস্কার ও সংশোধন, পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃপ্রচারে ব্রতী হয়।

হিন্দুমেলাতে দেশের স্তবগান গীত হইত। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই মেলাতেই শোনা যায়:

'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাবনা হরষ গান,
এসোগো আমরা যে ক'জন আছি
আমরা ধরিব আর এক তান।'

মেজদাদার লেখা 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানখানিও এই মেলায় গীত হয়।

হিন্দুমেলা সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমান কালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অনিবার্য্য হিসাবে যে জাতীয় কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী দেখিয়া আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি তাহার গোড়াপত্তন ঘটে বাংলার এই হিন্দুমেলা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের বাড়ীর সাহায্যে হিন্দুমেলা বলে যে একটি মেলার সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।"

১৮৯৬ সালে বোম্বাইয়ে প্লেগ মহাব্যাধির আমদানী হ'লে ইংরেজ সরকার হতবুদ্ধি হয়ে এমন সব আইন জারী করলেন—যা' লোকের কাছে জুলুম বলে মনে হল। ভারতের সর্বত্রই ইংরেজদের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কাগজে কাগজে সমালোচনা বার হতে লাগল। ইংরেজ সরকার তখন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য 'সিডিসন বিল' আনল। এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার পূর্বদিন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার টাউনহলে এক বিরাট জনসমাবেশে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার হীন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। 'কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে উল্টো ফল ফলে'—সতর্কবাণী উচ্চারণের পর রবীন্দ্রনাথ যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'রাজার বিরুদ্ধে গুরুতা যদি রাজদ্রোহ নামে চলে, তবে প্রজার বিরুদ্ধে রাজপুরুষদের অত্যাচারকে প্রজাদ্রোহ বলা যাবে না কেন? প্রজার স্বার্থবিরোধী রাজকার্য্য প্রজাদ্রোহিতা।'

বিংশ শতকের গোড়ায় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন বিলাতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক চিঠি লিখলেন। স্বদেশের প্রতি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সুগভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সে চিঠিখানা হল, "তোমার কাছে জ্ঞানের পথ ভিক্ষা করিতেছি—আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে;—তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই; আর একবার তাহাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে। নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনই উপায় নাই।' জগদীশচন্দ্রের সাধনার গবেষণার পথে যাহাতে কোন বাধা না পড়ে সেজন্য কবি নিজে ত্রিপুরার মহারাজার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা তাঁকে পাঠালেন।

সে সময়ে ধনী ব্যক্তিদের পুত্রেরা বিলাতে লেখাপড়া শিখতে যেত, আর মধ্যবিত্তদের পুত্রেরা যেত জাপানে—বিস্কুট, সাবান, জুতার কালির প্রস্তুত প্রণালী শিখতে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, 'পর্য্যাপ্ত খাদ্য পেলে মানুষের উদ্বৃত্ত শক্তি বাড়বে এবং তারই উপর নির্ভর করবে জাতির সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি।' তাই, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত সন্তানদের কৃষিকার্য্য শেখবার জন্য জাপানে পাঠাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, নিজের কনিষ্ঠ জামাতাকেও কৃষি ও গোপালন বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠালেন।

স্বদেশী সঙ্গীতের মত প্রবন্ধগুলিও রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে এক বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে। ১৯০২ সাল হইতে ১৯০৯ সালের

মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতামূলক প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শগত বৈষম্য,

(২) গঠনমূলক স্বাদেশিকতা ও

(৩) ইংরেজ অত্যাচার ও দমননীতির প্রতিবাদ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজদের অনুকরণ করার একটা অন্ধ-প্রবৃত্তি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজকে দুরারোগ্য ব্যাধির মত পেয়ে বসেছিল। বিলাতী দ্রব্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের মোহ শুধু গৃহ-সজ্জায়, আসবাবপত্রে বা পোষাক-পরিচ্ছদে নহে, এমন কি পূজার্চ্চনায়ও মৌরসী স্বত্ব করে বসেছিল। ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, এই 'পরদেশী' সজ্জা পরিত্যাগ করতে যতখানি মনোবলের দরকার তার বড়ই অভাব ঘটে।

শিক্ষিত সমাজের এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মর্মাহত করিল। নকলের চাকচিক্যে দেশবাসীকে আসল হারাতে দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আচার ব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মত, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।'

১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নয়া আইন সংশোধিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতের রাজনীতিবাদের দাবী ছিল—প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের। কিন্তু সে দাবী তো নস্যাৎ হইলই, উপরন্তু ভারতীয়দিগের উপর আরো সরকারী বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। শিলিং-এর সহিত টাকার বিনিময় ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভেদ রাখা হইল। ফলে শিক্ষিত সমাজের মন উঠল বিষিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্ব গৌরব মনে করিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই ততদিন যেন আমাদের মধ্যে জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।' দেশের মনোভাব যখন এইরূপ, তখন রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক' এবং 'রাজা ও প্রজা' নামে কয়েকটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি লিখলেন, "ইউরোপের নীতি কেবল ইউরোপের জন্যে। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাদের পক্ষে উপযোগী নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের লেখা রচনাগুলির প্রতিছত্রে উপরোক্তরূপ তীব্র দেশাত্মবোধ প্রকাশ পাইয়াছে।

'অত্যুক্তি' হইল স্বদেশীযুগের স্মৃতিবিজড়িত রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বড়লাট লর্ড কার্জন ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে উক্তি করেন তারই তীব্র প্রতিবাদ—'অত্যুক্তি'। যুক্তির কাঠিন্যে আর বুদ্ধির চমৎকারিত্বে, গভীর গাম্ভীর্য্যে আর সুষ্ঠু সরসতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে লর্ড কার্জনের সমাবর্তন ভাষণের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন। প্রাচ্য চরিত্রের সম্বন্ধে উদ্ধত বিদেশী অপবাদের এমন তীব্র নির্ভীক স্বদেশী প্রতিবাদ সে সময় আর ধ্বনিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

১৯০০—১৯০৪ সাল; এই পাঁচ বছরে যে কয়েকটি বিষয় স্বাদেশিকতা উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে 'বীরাষ্টমী ব্রত' হইল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই সময়েই নব্য জাপানের ভাবপ্রতীক ওকাকুরার আগমন ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। ওকাকুরা 'এশিয়া ফর এশিয়াটিকস্' গ্রন্থে বলেছেন, "এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপরে ইউরোপ খবরদারি করিবে ইহা বড়ই অসহ্য এবং আত্মমর্য্যাদাহানিকর। এশিয়ার দেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি, সমাজব্যবস্থা এমন কি রাজনীতিতেও যে স্বকীয়তা রহিয়াছে তাহা কোনমতেই বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না।" তিনি (রবীন্দ্রনাথ) 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় বললেন, "পল্লীসমাজ জাতির মেরুদণ্ড।...পরমুখাপেক্ষিতার জন্য এই পল্লীসমাজ উজাড় হইতে চলিয়াছে, ইহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমরা আত্মনির্ভর শক্তিরই অনুশীলন করিতে থাকিব। ফলে একদিকে যেমন আত্মপ্রত্যয় বাড়িবে অন্যদিকে তেমনি পল্লীসমাজ সত্যিকার 'স্বদেশী' হইয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিল।

ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বাঙালী জাতিকে নূতন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক নূতন পথের সন্ধান দিল। বিদেশমুখী না হইয়াও স্বদেশমুখী হইবার পথনির্দেশ করিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। এই উপলক্ষে দেশে স্বাদেশিকতার যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয় তাহার আঘাতে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন সাহিত্য-চেতনা লাভ করেন। সম্পূর্ণ প্রাণের আবেগে তিনি এই সময় যে কয়েকটি স্বদেশী গান ও কবিতা লেখেন তা' দেশকর্মীদের মধ্যে অশেষ প্রেরণার সঞ্চার করে এবং পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গিবার প্রেরণা জোগায়। দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল হ'তে মুক্ত করার সঙ্কল্প-গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতগুলির অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'ওই অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে
সময় এসেছে নিকটে এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঙলার যুবকগণ পথে পথে গাইতে লাগিল :

'নব বৎসরে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন, না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।'

বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে সারাদেশ যখন এক অভূতপূর্ব্ব প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ, সেই উত্তেজনাময় মুহূর্ত্তে রবীন্দ্রনাথের স্থিরমস্তিষ্কপ্রসূত কর্ম্মনির্দেশ দেশবাসীর নিকট পৌঁছিল—"উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত না হয়ে একটি কথা পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা দরকার—আমরা দেশের হিত চাই, অথচ এর জন্যে কষ্ট স্বীকার বা ত্যাগ স্বীকার না করে পরের ভাণ্ডার থেকে সে হিত ভিক্ষা করে নিতে চাই। ভিক্ষা করে মঙ্গললাভ করার চেষ্টার মত মূর্খতা আর নেই।" তিনি স্পষ্টই বললেন, "সুযোগ যখন এসেছে, মোহ যখন ঘুচেছে, তখন আত্মচেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজের কাছে ভিক্ষুকের মত প্রত্যাশী হয়ে লাভ নেই।" স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশনেতারূপে বরণ করতে আবেদন জানালেন।

১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন দমন করবার জন্য সরকার কঠোর অত্যাচার চালালে নেতারা এই অত্যাচারকে স্বাগত জানালেন—কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, অত্যাচার যত তীব্র হবে, দেশের লোকের রাজনৈতিক চেতনা তত বৃদ্ধি পাবে। নেতাদের এই মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রচিত গানের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করলেন :

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে···
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে···
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।'

অতিপ্রিয় এই গানখানি সম্বন্ধে ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র বলেন, "......I noticed something supernatural and divine in the agitation when I heard for the first time in the compound of Pashupati Nath Bose and the Federation Hall, the songs of Rabindranath to the effect that redder the eyes of the authorities, the greater will be the force of our agitation."

জাতির চরিত্র গঠনের মূলভিত্তি—শিক্ষা। ১৮৯২ সালে রাজসাহী এসোসিয়েশনে প্রদত্ত 'শিক্ষার হেরফের' নামে এক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির গুরুতর ত্রুটিগুলির কথা অতি পরিষ্কার ভাষায় সমবেত সুধীমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করলেন। এই বক্তৃতার সাধুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "তিনি তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত।" বিদেশীভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানহেতু পাঠ্যপুস্তক রাশির মধ্যে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিকাশ লাভ না করে 'ক্রমশঃ যে সমাধিলাভ করছে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় তা' নানা প্রমাণ প্রয়োগে দেখালেন। তাঁর মতে, "যে শিক্ষায় লোকের মনে স্বদেশের অবস্থান, লোকজন, ধর্ম্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা গবেষণায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই হইল 'স্বাধীন শিক্ষা'।" কিন্তু ঐ সময়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে 'স্বাধীনশিক্ষা'র স্থান ছিল না।

'স্বদেশী শিক্ষা'র বিজাতীয় রূপ বদলাইতে নেতারা যখন সচেষ্ট, তখন লর্ড কার্জ্জন একটি শিক্ষা কমিশন বসিয়ে উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচনে উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'স্যাডলার কমিশনে' শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পাঠালেন, "ইংরেজী ভাষাকে ২য় ভাষারূপে খুব ভাল-করে শেখাতে হবে। কিন্তু স্কুল কলেজে, য়ুনিভার্সিটিতে পর্য্যন্ত মাতৃভাষার আধারে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখাতে হবে।" মেকী শিক্ষার পরিবর্ত্তে আসলশিক্ষার প্রবর্ত্তনকল্পে বাংলাভাষাসাহিত্যের যোগ্য অধিকার সম্বন্ধে এমন ক'রে আর কেউ ইতিপূর্ব্বে বলেছেন কিনা সন্দেহ, যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

লর্ড কার্জ্জনের শিক্ষা সঙ্কোচনমূলক সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব সঞ্চিত বিক্ষোভ যখন অধিকতর ভাবে ধূমায়িত হতে লাগল, ঠিক তখনই বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত করে 'বয়কট' আন্দোলন জনসমাজে অতি দ্রুত প্রসার লাভ করল। এই 'বয়কট' বা বিলাতীদ্রব্য বর্জ্জন প্রচেষ্টা তীব্রতর হয়ে উঠলে যুব ছাত্র সমাজ শাসকবর্গের হাতে নির্যাতিত হতে লাগল—আরম্ভ হল—ছাত্র-দমন।

সুভাষ বসু কর্তৃক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেব প্রহৃত হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসন' প্রবন্ধে লিখলেন, "ছাত্রেরা যদি নিয়মিত বিদেশী অধ্যাপকদের কাছে তাদের দেশের, জাতির, ধর্ম্মের অপমানকর কথা শোনে, ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করবেই ; যদি না করে তবে সেটাই হবে দুঃখের, লজ্জার।'' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষাগুরু প্রহার সমর্থন করেননি, কিন্তু অপমানিত ছাত্রেরা যে কাণ্ড করেছিল তাকে নিন্দা করে একথাও বলতে পারেননি যে, কাণ্ডটা অস্বাভাবিক। কারণ জাতীয় অপমান সহ্য করতে বলার মত কোন উপদেশই রবীন্দ্রনাথ দিতে পারেন না—তাতে মনুষ্যত্বেরই অপমান।

'বিজাতীয়' শিক্ষার হাত হতে ছাত্রদের রক্ষা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের তপোবনের শিক্ষার আদর্শে শান্তিনিকেতনের নির্জন তরু-সমাচ্ছন্ন পরিবেশে 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়' স্থাপন করলেন। তিনি স্বয়ং এই আবাসিক বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে ছাত্রদের যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মবোধ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকদের দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'র ব্যবস্থা করলেন। বর্ত্তমান সরকারী মর্য্যাদাপ্রাপ্ত 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় এই 'ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের'ই পরিণতি।

১৯১৯সালে কুখ্যাত রাউলাট রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রচরিত হইবামাত্র সমগ্র জাতির প্রাণ যখন ক্ষুব্ধ ও বেদনাভারাক্রান্ত, বৃটিশ শাসকের অমানুষিক বর্বরতার প্রতিবাদে আকাশবাতাস যখন মুখরিত, ঠিক সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বৃটিশের দেওয়া রাজসম্মান 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যান করে রাজপ্রতিনিধি চেমসফোর্ডের নিকট বজ্রকঠোর ভাষায় লিখিত প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে এক অমর ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে আরও অনেক

টুকরো টুকরো ঘটনা আছে যা'র প্রতিটির মধ্যে দেশের প্রতি তাঁর মহান প্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিশোর রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেছে রবিবারে রবিবারে চেনা-অচেনা রবাহূত-অনাহূত দলবল নিয়ে শিকারে যেতে, তারপর বাঁধানো ঘাটে উচ্চ-নীচ-নির্বিচারে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করতে। তাঁর স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে ঘৃণার স্থান ছিল না। পরবর্তীকালে তাই তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে: 'বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক এক হউক এক হউক—হে ভগবান।'

কোনও এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, "দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশী ছিল না। যতটুকু ছিল নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি।... ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। একমুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। আমাদের কাজ ছিল কি?...জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্যন্ত সবকিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার চেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কুটির-শিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্মাণ আমরা করিনি কি?" (রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য: সজনীকান্ত দাস)।

অনেককে বলতে শোনা গেছে যে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ভাববিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাববিলাসিতার কথা অস্বীকার করে লেখেন:

"It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary association with official activities and of applying ourselves to the organisation of our economic, social and educational life independently of official help and control. Through the boycott of British goods as a protest against the partition of Bengal originated with others and was adopted by the political leaders of the country...it was Rabindranath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the administration to the furthest limits that the laws of the land allow us to do." (Indian Nationalism).

'বস্তুতঃ যুগে যুগে খোলস পরিবর্তন করিলেও পরাধীন, আত্মনির্ভরতাহীন দেশের জন্য একটি দুশ্চিন্তাবোধ ও কল্যাণ সাধনের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম রচনা হইতে তাঁহার জীবনের প্রায় শেষ রচনা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। একটা গভীর দেশাত্মবোধ ফল্গুর মত কবির অন্তরের গভীর গহনে প্রচ্ছন্ন থেকে তাঁহার জীবন ও কর্মকে বরাবরই নিয়ন্ত্রিত করিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে কয়েকটা বছর এই দেশপ্রীতির প্রবাহ উদ্দাম উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল।'

'রবীন্দ্রনাথ যে মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখেছেন তা বাংলার নয়—ভারতবর্ষের। আজীবন ধরে কবি তাঁর অজস্র গান, কবিতা ও রচনার মাধ্যমে এই মাতৃভূমির বন্দনাগান গেয়ে গেছেন। তাঁর জীবিতকালে আরও অনেক শক্তিমান কবির সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তাঁদের কারও লেখনী দিয়ে 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' বা 'জনগণমন অধিনায়ক' বেরোয়নি। শুধু তাই নয়, বারবার বিদেশে গিয়ে বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সেতু রচনা করে গেছেন।'

বৃটিশ শাসনের ঘোর দুর্দিনের মধ্যে নিপীড়িত ভারতের আশার আলোক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়েছেন—মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'-র মধ্য দিয়ে যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত করে যান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের সেই মহান প্রেরণাকে প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে পুত্রের উপযুক্ত কাজ করে নিজেকে ঠাকুর পরিবারের যোগ্য উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করেছেন।

সাহায্য স্বীকার:—

১। জাগৃতি ও জাতীয়তা বোধ: যোগেশচন্দ্র বাগল।

২। প্রবোধ সান্যালের বোম্বাই ভাষণ। জানু '৬১

৩। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য: সৌমেন্দ্র গাঙ্গুলী।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা



S/P. 2-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নীচের একটা ঘরের দরজা খুলল কে শব্দ করে। ক্রুদ্ধ গলায় চীৎকার করে উঠল, এসব কী? এ সবের মানে কী? এটা কি ভূতের বাড়ি—না মেয়েমানুষের বাড়ি?

সঙ্গে সঙ্গে আরো দু' তিনটি ঘরের দরজা খুলে গেল। নীচে এবং ওপরে, কয়েক ঘরেই মেয়েরা পণ্য রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। হয়তো মেয়ে-গলার তীব্র আর্তনাদ শুনে সবাই দরজা খুলে বেরিয়ে আসত না। মোটা পুরুষ-গলার চীৎকারটা সবাইকে অবাক করেছে, কৌতূহলিত করেছে। যারা দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তারাও ছুটে এল উঠোনে।

লোকটা তখনো বাজখাই গলায় চীৎকার করে চলেছে, কোথায় রাজুমাসী, ডাক তাকে। রোজ রোজ এই এক ফ্যাচাং ভাল লাগে না। ট্যাঁকের কড়ি খরচ করে একটু জুড়োতে আসি, তার মধ্যে ওরকম থেকে থেকে পেত্নীর চীৎকার সহ্য হয় না।

একটি মেয়ে-গলার সমর্থন শোনা গেল, তাই না বটে! রোজ রোজ এ কি ধ্যালান্ বাপু। আচমকা শুনলে কার না বুক কেঁপে ওঠে।

দেখা গেল মেয়েরা সকলেই একমত। সকলেই ঘাড় নেড়ে সমর্থন করল কথাগুলি। আর একজন কে পুরুষ বলে উঠল, এই নিয়ে আমি তিনদিন শুনলুম। প্রথম দিন তো ভেবেছিলুম, কেউ কাউকে ছুরি টুরি মেরেছে। লক্ষ্মী বললে, কে নাকি একটা মেয়েমানুষ আছে দোতলায়, সুবালা বলে। সে মদ খেয়ে ওরকম করে।

সেই বাজখাই গলা আবার হেঁকে উঠল, মদ খাক, পাগল হোক কিম্বা ডাইনিতে পাক, চেঁচিয়ে জানান দেবার কী আছে? এখানে দশজন আসে, দশের জায়গা। এক-জনের খেয়াল তো চলবে না। হয় ওকে তাড়াও—নয় তো বাকী মেয়েদের রাস্তা দেখতে বল। বাড়ির কি কোনো অভাব আছে?

আর্তনাদ তখন থেমে গেছে। সকলেরই দৃষ্টি দোতলার বন্ধ দরজাটার দিকে। কারণ, কথাগুলি আসলে সুবালাকে শাসানোর উদ্দেশ্যেই। ওখানকার প্রতিক্রিয়াটাই সকলের লক্ষণীয়। কিন্তু বন্ধ-দরজার ভিতরে বাইরে একটি ভুতুড়ে স্তব্ধতা। কোনো সাড়া শব্দ নেই। এ স্তব্ধতায় সকলেই খুশি। এ বাড়ির মেয়ে নাদু্র পাশে-দাঁড়ানো সেই বাজখাই-গলা লোকটির প্রতি সকলেই সমীহ করে তাকাল। বোঝা যায়, লোকটি মদ খেয়েছে। কিন্তু মাত্রাধিক্য নয়। যদিও বেশ ঘোর আছে। তার পাশে অগোছালো নাদুকে, এ বারোস্বামী-র জন্যে বেশ গরবিনী মনে হচ্ছে। তার ঠোঁটের হাসি আর মদ-আরক্ত চোখের ঘৃণা হানছে সুবালার বন্ধ দরজায়। এককালে নাদু রাজুবালার বাড়ির সেরা মেয়ে ছিল। সুবালা এসে ভেঙে-ছিল সেই অহঙ্কার। বাজখাই-গলা লোকটির এ নেতৃত্বের জন্য হয় তো নাদুই তাকে তাতিয়েছে। সুবালার প্রতি স্বয়ং বাড়িউলী রাজুবালার অবোধ্য দুর্বলতা তার অসহ্য। নাদু হয় তো তারই শোধ নিতে চাইছে। রাজুবালা কখন ভিড়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ দেখতে পায়নি। অভয়ও না। কে একটা মাতাল মোটা গোঙা স্বরে বলে উঠল, কিন্তু ও সুবালা!

বাজখাই-গলা বলে উঠল, সুবালা হোক আর মহারাণী হোক, বেশ্যাবাড়িরও একটা নিয়ম আছে। ধারে কারবার

তো করতে আসি নি। রোজ রোজ এ কি রকম মরাকান্না বাবা! শোক হয়ে থাকে, গঙ্গার ধারে গিয়ে বস।

কে একজন বলে উঠল, ভাতারের শোক নাকি?

সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। আবার স্তব্ধতা। দোতলার বন্ধ দরজাটা যেন নীচের এ কথাগুলির প্রতি উৎকর্ণ হয়ে আছে। যে যার ঘরে ও স্থানে ফিরে যাবার উদ্যোগ করল।

সহসা একটা ধাতব আঘাতের শব্দ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই বিরাট কাঁচ ভেঙে পড়ার ভয়ংকর ঝনঝন্ শব্দে চমকে উঠল সকলে। আড়ষ্ট হয়ে ফিরে তাকাল দরজার দিকে। সেই মুহূর্তেই দরজায় একটা ভারী কিছু আছড়ে পড়ল যেন। দরজাটা ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠল। আর উঠোনের কেউ কেউ ভয়ে পালাবার উদ্যোগ করল। ভাবল, সুবালা দরজা খুলে নেমে আসছে হয় তো। তারপরেই কাঁচ-ভাঙা গলার তীক্ষ্ণ হাসি, ঘরের মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে বাজতে লাগল। বাজতে বাজতে, অতলে ডুবতে লাগল। যেন কেউ গলাটা টিপে ধরেছে।

রাজুবালা এগিয়ে এল। আশ্চর্য। রাজুবালা এসে অভয়ের পিঠে হাত দিল। অভয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। সেই অবয়ব এবং পাকা চুলের বাঁকা সীঁথি না থাকলে অভয় হয় তো চিনতে পারত না রাজুবালাকে। নুয়ে-পড়া শরীর আর মুখের অজস্র হিজিবিজিতে অনাবিষ্কৃত লিপি। বসে বসে হয় তো মদ খাচ্ছিল সে। তাই চোখের মণি দুটি অচঞ্চল। সীসার গুলির মতো নিরেট এবং ভারী। তবু তাতে একটি অনুনয় ফুটে উঠল। সে ঠেলতে লাগল অভয়কে। প্রায় চুপি চুপি বলল, তুমি এসেছ জামাই? বাঁচিয়েছ, বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাকে। যাও, একবার যাও তুমি।

বাজখাই-গলা তখন নীরব হয়ে গেছে। সকলেই নিশ্চুপ। অভয়কে পথ করে দিল সবাই। হাসিটা তখনো পাতাল থেকে যেন উঠছে। অভয় অবাক হয়ে বলল, কোথায় মাসী? আমি কোথায় যাব?

সকলের চোখ তখন অভয়ের দিকে। রাজুবালা বলল, ওই ঘরে। সুবলির ঘরে।

অভয় বলল, আমি?

—হ্যাঁ বাবা, তুই।

অভয়ের হাত চেপে ধরল রাজুবালা।—আর কেউ গেলে হবে না। তোর দুটি হাতে ধরি বাবা জামাই, তুই যা। ছুঁড়ি তো পাগল নয়। কোনো ব্যামোও নয়। ওর কথা কেউ বুঝবে না। কিন্তু আর উপায় নেই। এবার ওকে তাড়ানো ছাড়া আর আমার রাস্তা নেই। তুই যা জামাই, লক্ষ্মী বাবা আমার। সে তোকে কী চোখে ত্যাখে, আমি জানি। আমি রোজ সন্ধেয় তোর মুখ চেয়ে থাকি বাবা। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসব ভাবি। কিন্তু তুমি এখন মানী লোক বাবা। আমার বাড়িতে এলে যদি মান যায়, তাই ডাকিনি। আজ তোমার ঘাড়ে কে ভর করেছে, জানি না। আজ তুমি আপনি এসেছ। তুমি একবারটি যাও।

রাজুবালার তুই তুমি জ্ঞান নেই এখন। সে অভয়কে ঠেলতে লাগল।

অভয় বলল, রাজুমাসী, তুমি জান না, আমাকে দেখলে সে হয় তো আরো ক্ষেপে যাবে। এতদিনের মধ্যে তোমরা সবাই কতবার বাড়িতে এসেছ গেছ, সে একবারও যায় নি।

হাসিটা তখন চাপা গোঙা স্বরে যেন দেয়াল ঘষছে। রাজুবালা বলল, তার কারণ আছে বাবা। সে আমি তোমাকে পরে বলব। তুমি এখন একবারটি গিয়ে দেখ, কী হয়।

একটি মেয়ে-গলা শোনা গেল, হবে, ছাই হবে।

রাজুবালা ফিরে তাকাল না। অথচ তাকাবারই কথা। তার মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারুর না থাকারই কথা। কিন্তু শাসনের সে অধিকার আজ শিথিল হয়ে গেছে। অভয় দেখল, রাজুবালা অসহায় চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। আবার বলল রাজুবালা—যা বাবা একটু। ক্ষেপেই যদি যায়, যাবে। তেমন কিছু করলে, তোকে আমি বলছি বাবা, তুই ওকে মেরে আধ-মরা করে ফেলে রেখে আসিস্। কী করব! ওর কপালে এর পরে মার আর হাতে পায়ে বেড়ি ছাড়া কিছু নেই।

অভয় ফিরে তাকাল উপরের দিকে। পায়ে পায়ে অগ্রসর হল। সুবালার ঘরে সেই শেষ দিন আসার কথা তার মনে পড়ল। প্রায় মার-খাওয়া কুকুরের মতো নিজেকে বিতাড়িত মনে করেছিল সে। কিন্তু নিজের

কথা সে ভোলে নি। তার ভিতরের সেই অন্ধকার প্রবৃত্তির কথা। তার আবর্তিত ঘোলা রক্তের ডহর কানা হয়ে উঠেছিল। সুবালা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে, সুবালার অনুতপ্ত আহ্বান শুনতে পেয়েছিল সে। তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না। তখন সত্য জানা হয়ে গেছে।

আজ কেন এসেছিল অভয়? সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে পা ভারী হয়ে এল অভয়ের। আজ কেন এসেছিল সে? পাপ! একি পাপ নয়! নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় এখানে কেন এসেছিল অভয় আজ? এই সেদিনেও নিমিকে হারাবার দায় সে অনেকখানি সুবালার কাঁধে দিয়ে, তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেছিল। আর আজ সে এখানেই ছুটে এসেছিল। সব তা হলে মিথ্যে! নিজেকে চেনে না অভয়। নিজের কাছে সে অনাবিষ্কৃত। আর সে শ্রমিক-আন্দোলনের কথা বলে। সে গান বাঁধে। অপরের অন্যায়ের সন্ধানী সে। আর প্রবৃত্তি তার বুকের ভিতরে মিথ্যা এবং অনাচারের বাসা তৈরী করছে। নিমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে। সুবালার সান্নিধ্য আর একজন কেউ লালন করছিল তার বুকের মধ্যে? নইলে সে কেন এসেছিল?

সুবালার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল অভয়। যাক্। আপাতত সে এসব ভাববে না। নিজের কাছে, আপন বিচার তার তোলা রইল। সে যখন এসেছে, তখন একবার সুবালার মুখোমুখি হবে। সত্যের এই বোধ হয় নিয়ম। সুবালাকে যে সে একবার চোখে দেখতে চায়, তার বুকের ভিতরে সে সত্য এখন উজ্জীবিত, সচকিত, কৌতূহলিত।

অভয় ডাকল, সুবালা।

গোঙানি থেমে গেল ঘরের মধ্যে। নীচের উঠোনে রাজুবালার চাপা চাপা গলা শোনা গেল, যাও, তোমরা যে যার ঘরে যাও। এই আলতা, যা, দরজায় গিয়ে দাঁড়া। সন্ধে থেকে তো এমনি বসে আছিস।

নীচে একটা চাপা গুলতোনি উঠল। সবাই সরে যেতে লাগল। অভয় আবার ডাকল, সুবালা।

একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল, কে?

বলতে বলতেই ধড়াম্ করে দরজা খুলে গেল। অভাবিত দৃশ্য ঘরের মধ্যে। অবর্ণনীয় অবস্থা সুবালার। কিন্তু স্বাভাবিক হতে চাইল অভয়। যেন অনেকদিনের আলাপীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এমনি স্বাভাবিক গলায়, প্রায় হেসে বলল, চিনতে পার?

সুবালার কালি-পড়া চোখ দুটিতে শ্লেষের ঝিলিক হানল। ঠোঁট দুটি উল্টে ঝুলে পড়ল প্রায়। অভয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে দুলতে লাগল খানিকক্ষণ। হঠাৎ উপছানো গলায় বলল, চিনব না? তুমি শৈলদিদির জামাই, নিমির বর, মালীপাড়ার মানী স্বদেশী-জামাই তুমি। তুমি আমার সঙ্গে তবলা বাজিয়েছিলে। এক রাত্রের ফিরে-যাওয়া-নাগর তুমি আমার। তোমাকে চিনব না?

হিস্‌হিস্ করে হেসে উঠল সুবালা। তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। অভয় এক মুহূর্ত কোন কথা খুঁজে পেল না। তার মাথা হেঁট হয়ে এল। সুবালার দিকে চোখ রাখতে পারছে না সে। ক্ষেপে ওঠারই লক্ষণ সুবালার ভাবে-ভঙ্গিতে। হয় তো, অপমানে মাথা নীচু করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ঘটবে না। যদিও বোঝা যাচ্ছে, সুবালা জ্ঞানে নেই। মানুষ সে চিনতে পারে। কিন্তু মদ এবং মনের ভেসে-ওঠা অতলতা কাজ করছে এখনো। সে কোন্‌দিকে ঝুঁকবে, কেউ বলতে পারে না। এখন সে ভিতর থেকে কথা বলছে। তার বাহ্য-সংবিত নেই।

সুবালা সারা শরীরে একটি মোচড় দিয়ে দুলে উঠল। হাত জোড় করে বলল, তা দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস। যত্ন করে ঘরে তুলি তোমাকে, যত্ন করে নিয়ে যাই এস।

অভয়ের সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। নীচে একটি মেয়ে-গলার হাসির নিক্বণ শোনা গেল। এখুনি নীচে নেমে যাবে কিনা, ভাবল অভয়। দাঁড়িয়ে থাকলে হয় তো শেষ পর্যন্ত রাজুবালার কথাই সত্যি হবে। অভয় আঘাত করে বসবে সুবালাকে।

কিন্তু সে শান্ত গলায় বলল, কিন্তু ঢুকব কোথায়। ঘরের কি হাল করেছ, দেখেছ?

সুবালা হাত মটকা দিয়ে বলল, দেখেছি। তুমি এস দিকিনি নাগর। বলে, হাত ধরে টানল অভয়ের। অভয় বাধা দিল না। সুবালা আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল। দিয়ে, দরজাতেই হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুবালার দিকে এখন আর ফিরে তাকানো যায় না। বাইরে থেকে

তাকানো যাচ্ছিল। বন্ধ-দরজা ঘরে সব পরিবেশ যেন ল গেল হঠাৎ। সুবালা আর তার ঘর। গোটা মেটায় কাঁচ ছড়িয়ে পড়ে আছে। আলমারীর মাঝের কর দুটো কাঁচ নেই। ছোট একটি চ্যাপ্টা মদের চল কয়েক টুকরো হয়ে ছড়ানো। পাশ-বালিশটা ড়-খোলা অবস্থায়, মেঝেয় পড়ে আছে থ্যাঁতলানো রমতো। বিছানা চটকানো। শাড়িটা দলা পাকিয়ে আছে বালিশের কাছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা রের দিকে ফেরানো। ছাদের কড়ি-বরগার ছায়া ছে সেখানে। হয় তো সুবালা নিজের ছায়া দেখতে নি বলেই, ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আর সুবালার গায়ে জামাটি পর্যন্ত নেই। শুধু বডিস শায়া তার গায়ে। খোঁপা হয় তো নিজেই খুলেছে। নীও অর্ধেক মুক্ত। মুখে নেই রংএর প্রলেপ। সন্ধ্যা-সাজে নি হয় তো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা পা চ্ছে সুবালা। দু'হাত পিছনে, দরজায় চেপে রেখেছে। সর্বাঙ্গ দুলছে। তার পশুর মতো শক্ত বলিষ্ঠ শরীর। বাসরের জীবন তার দেহের ঔদ্ধত্য ভাঙতে পারে নি। ঠ, আর নিষ্ঠুর মৃত্যুর মতো তার স্তনান্তরের ঈষৎ কাশের অন্ধকার। জীবিকার কষাঘাতের সঙ্গে বাজী দেহ অনমনীয়, অদমিত। তার প্রমত্ত মন দিয়ে গড়া কটিতট অধরা অকূল হয়ে উঠেছে নিতম্বে। নাচানো র তালে বিলুলিত জঘন আর মধ্য সমুদ্রের ঢেউয়ে ক্ষিপ্ত নিঃশব্দ জলস্তম্ভের মতো আভঙ্গ ঘন উরু।

অভয়ের রক্তের মধ্যে যেন একটা ক্ষিপ্ত মহিষ তার ত কঠিন শিং নিয়ে পাশবিক শব্দে ছুটে আসতে ল। মিথ্যুক। মিথ্যাবাদী অভয়। নিজের মনের তার কল্পনা শুধু। বাস্তবে সবটাই এত ভয়ংকর মিথ্যে? র কাছে সে চিরকাল ধরে এত অপরিচিত! একেবারে লিয়া হয়ে, রক্তের কাছে ঋণের তার শেষ মুচলেকা বসে আছে? সব আদর্শের আড়ালে, এই পাপ তার রে! নিমিকে সে তা হলে ভালোবাসে নি? সংসারকে -ময় করার এই শেষ উপহাস তার বাকী ছিল?

সুবালা ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল ঘাড় বাঁকিয়ে। বাসি-তা-পা তেমনি নাচতে লাগল। বলল, তারপর? র মানী স্বদেশী নাগর, এতদিনে মনে পড়ল?

হ্যাঁ, এমনি করে কথা বলুক সুবালা। ক্ষিপ্ত মহিষটার গায়ে তাতে চাবুক পড়ে। তার ঘোর ভাঙে, খোয়াড়ি কাটে। অভয় বলল, তা পড়ল। আলমারী ভেঙে, তছ-নছ করে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে যা কাণ্ড করেছ, গোটা শহর এবার এ ঘরে আসবে।

এক মুহূর্ত সুবালার পা থামল। আবার নাচতে লাগল। বলল—হ্যাঁ, রাজুমাসীর অনেক ক্ষতি করেছি। মাইরি। এবার আমাকে তাড়িয়ে দেবে। কী করব বল, বোতলটা হাঁটকে দেখি, এক ফোঁটা মাল নেই। সেই পরশু একটা লোক এসে এক বোতল ফাউ দিয়ে গেছল। আজ পর্যন্ত কেউ আর বোতল নিয়ে আসে নি।

অভয় যেন কথা বলতে পেয়ে, নিজের হাত থেকে বাঁচল। বলল, তা লোকে আসবে, বসবে, তবে তো। বোতল কি আর হাতে করে ঢুকবে।

—হ্যাঁ, আমার ঘরে তাই ঢুকতে হবে। পেটে না পড়লে আমি কানা। চোখেই দেখতে পাইনে, মাইরি বলছি।

বলতে বলতে হেসে উঠল। কাৎ হয়ে মুখটা গুঁজে দিল দরজায়।

অভয় বলল, পেটে পড়েও তো দেখতে পাচ্ছ না এখন।

ঘাড় ফেরাল সুবালা। গোটা শরীরটা যেন অভয়ের মুখোমুখি হল। বলল, মনের মতন পড়ে নি। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এই তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার পুরনো নাগরকে। কিন্তু মান যাবে না তোমার?

দরজা ছেড়ে অভয়ের দিকে এক পা এগিয়ে এল সুবালা। তার বুকের সংক্ষিপ্ত আবরণটুকু যেন টলমল করছে। অভয় নিজের সঙ্গে শক্ত হয়ে যুঝতে লাগল। বলল, মান কি যাবার জিনিস সুবালা?

—তা বটে। তোমাদের মান যায় না।

বলতে বলতে দু'হাত বাড়িয়ে অভয়কে ধরল সুবালা। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—তবে এতদিন এ পাড়ায় তোমাকে দেখিনি কেন নাগর?

অভয় শক্ত হল। আঘাত করে সরিয়ে দিতে উদ্যত হয়েও থমকে গেল সে। এখানে কেন এসে পড়েছিল অভয়? কার কাছে? কার কথা মনে করে? এ যে

নিজের দুর্বলতায় ফুঁসছে সে। নিজের প্রতি উদ্যত আঘাত সে আর একজনকে করতে যাচ্ছে। নিজের ধিক্কার হানছে অপরকে। কিন্তু সুবালার এই অটুট শরীরটা ফাঁকি নয়, মিথ্যে নয়। এ অভঙ্গ অঙ্গ তার মনের চেয়ে সত্য রূপের বিভাস।

সুবালা আবার বলল, সেই অনেককাল আগের এক-দিনের আজ শোধ দেব। আজ তোমাকে যত্ন করে নেব আমার কাছে, মাইরি!

অভয় গর্জন করে উঠতে চাইল। কিন্তু পুড়ছে সে। ক্ষয় হচ্ছে। সে তার সব লুকোচুরির শক্তি জড়ো করে ডাকল, সুবালা।

সুবালা প্রায় এলিয়ে পড়ল অভয়ের গায়ে। বলল, ভয় নেই, আজ তোর মিনি-মাগনা, সত্যি বলছি।

অভয় সামনের দেয়ালে ফিরে তাকাল। সে তার ঈশ্বরকে ডাকতেও ভুলে গেল। নিজের সঙ্গে একটা কঠিন শক্তি পরীক্ষায়, দাঁতে দাঁত চাপল। সুবালার দু' হাত ধরে তাকে গায়ের কাছ থেকে সরিয়ে বলল—একটু হুঁস কর সুবালা। জ্ঞানে এস।

সুবালা নিজেই সরে দাঁড়াল একটু। একটা ভয়ংকর ভঙ্গিতে দুলতে লাগল সাপিনীর মতো। ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঢুলু ঢুলু চোখে হেসে বলল, আজ আর মনে ধরছে না নাগরের? তবে তুই কী জন্যে এসেছিস আমার কাছে? মেয়েমানুষের কাছে অত বড় শরীরটা নিয়ে কী করতে এসেছিস, অ্যাঁ?

শায়া ছেড়ে, কাঁচুলির মাঝখানটা ধরে টান দিল সুবালা। তার বুকের বাঁধ যেন ভাঙছে। অভয় আবার ডাকল, সুবালা।

সুবালা মাথাটা ঝাঁকিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল—হুঁ, মজিস নি এখনো?

তারপর অস্ফুটে বিড়বিড় করল খানিকক্ষণ। আবার বলল, তবলা বাজাবি? গান করব আমি।

দরজার দিকে ফিরবার উদ্যোগ করেছিল। গানের কথা শুনে অনড় রইল। বলল, গাইবে? সত্যি?

—তুই বাজাবি তো?

—বাজাব।

—তবে গাইব।

বলে, সুবালা নিজেই উপুড় হয়ে খাটের তলায় ঢুকে গেল। টেনে টেনে মেঝের ওপর নিয়ে এল হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা। বাঁয়াটা গড়িয়ে গেল অনেকখানি। অভয় নীচু হয়ে ধরে ফেলল। সুবালা হারমোনিয়মটা দু'হাতে বুকের কাছে তুলে, খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হার-মোনিয়মের রীডগুলি আঘাত পেয়ে ঝনঝনিয়ে উঠল। তারপর বলল, আয়, খাটের ওপর আয়।

অভয় বাঁয়া-তবলা খাটের ওপর রেখে, আগে শাড়িটা হাতে তুলে নিল। কারণ, তখন আর সুবালার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। বলল, এ শাড়িটা পরে নাও।

সুবালা চোখ না তুলে, স্টপার টানতে টানতে বলল, অত আমার সময় নেই। গায়ে আমার কিছু রাখতে ইচ্ছেই করে না। তা আবার শায়ার উপর শাড়ি।

একটি পা সোজা মেলে দিয়ে, আর এক পা দিয়ে হারমোনিয়মটা পেঁচিয়ে ধরল সুবালা। তারপর রীডের ওপর তার আঙুল চলল। এই আর একটি সত্য। সুবালার দেহের মতোই। যতো অসংবৃত উন্মত্তই হোক, হাত পড়া-মাত্র যন্ত্র যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেজে উঠল। প্রথমে কাটা কাটা সুরে গজলের ঝংকার উঠল। পরমুহূর্তেই বেসুরো এলোমেলোভাবে গজল থেমে গেল। আর একটা সুর বেজে উঠল। কিন্তু এত বিলম্বিত যে, তাল কখনোই দিতে পারবে না অভয়। সুর তার চেনা অচেনার মাঝামাঝি। সুবালা নিজে, আর এই গোটা ঘরের পরিবেশ, সুরের সঙ্গে মিলতে চাইল না। সুবালা হাসল। তাকাল অভয়ের দিকে। বলল, কেমন?

—ভাল।

—কী সুর?

—জোনপুরী?

সুবালা ঘাড় নাড়ল, না। কিন্তু নাম বলল না। চড়া সুরে টেনে টেনে গাইল।

প্রদীপ নিভিয়া যায় সব আশা হায় মিলায় আঁধারে।
এখন নিজ অঙ্গে দেখি নিজ রঙ্গে কালের আঁচড়ে॥

এ বিলম্বিত সুরের সঙ্গে তবলা সঙ্গত অসম্ভব নয় শুধু। অভয় স্থাণুর মতো বসে রইল। বাঁয়া-তবলার কথা ভুলে গেল সে। সুবালার রক্তাভ চক্ষু মুদ্রিত। চোখের

পাতা দুটি তার অসম্ভব লাল দেখাচ্ছে। হয় তো মদের মাত্রাধিক্যেই, তার ঠোঁট কুঁচকে বিকৃত হয়ে উঠছে। কিন্তু গানের শ্বাসরুদ্ধ বিলম্বিত সুরে ও কথায় সুবালার সব মালিন্য কোথায় অদৃশ্য হল। সন্দেহ হল, সুবালা কাঁদছে।

কিন্তু তার চোখে জল নেই। না থাক। সুবালার যে-বেশবাস অশ্লীল মনে হচ্ছিল, গানের সঙ্গে তা যেন একাত্ম হয়ে গেল। তার বসবার ভঙ্গিতে, প্রতি মুহূর্তে যে একটি রুদ্ধশ্বাস ভয়-ধরানো লজ্জা বিভাদোন্মুখ ছিল, সুর তাকে গ্রাস করল। কথা তাকে আবরণ দিল। অবিকৃত, আরো উচ্চ ব্যথা-ধরা গলায় সে গাইল,

চিনিতে নারি আর, বুঝিতে পারি শুধু আপন হৃদয়।
পাষাণ সম লাগে এ হৃদয়েরি ভার চাহি বরাভয়॥
নাথ! হে নাথ!
রেখ না দাঁড়ায়ে লহ তোমার গোপন গহন গভীরে।
প্রদীপ নিভিয়া যায়……

গান শেষ হল। শুরু হল আবার। সুবালার গলার শিরা ফুলতে ফুলতে তার গাল বেয়ে, চোখের কোল বেয়ে, কপালে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এ তার স্বাভাবিক অবস্থার গান নয়। তাই কেবলি পুনরাবৃত্তি। পুনরাবৃত্তি কেবলি গোপন গহন গভীরে যাবার। নিঃশেষে লয়ের, হারাবার। সুবালার চোখে জল নেই। কিন্তু সে যেন চীৎকার করে কাঁদছে। এও যেন সুবালার দেহের মতো সত্য। সুবালা মুক্তি চায়। মৃত্যু চায়।

আবার, আজ আবার সেই বহুকাল আগের এক রাত্রের নতমাথা পদাহত-বিতাড়িত বলে নিজেকে মনে হচ্ছে অভয়ের। রাজুবালার অনুরোধ এখন মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। এ ঘরের ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল অবস্থা যেন সত্য নয়। আসোয়ারী সুর সত্য। মৃত্যুর আকুতি সত্য। সুবালার কোথাও ফাঁকি নেই। মিথ্যা শুধু অভয়ের মধ্যে। মিথ্যাচার তার নিজের সঙ্গে।

সে উঠতে গেল। গান থেমে গেল সুবালার। তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো শুদ্ধ হল তার গলা। বাইরে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। যারা শুনতে এসেছিল, তারা সরে পড়ছে হয় তো। সুবালা হারমোনিয়মের ওপর কনুই রেখে, গালে হাত দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করল অভয়ের দিকে। কিন্তু তার চোখের পাতা অসম্ভব ভারী। খুলতে চাইছে না। বলল, চলে যাচ্ছ নাগর?

গলার স্বরে আর তার মত্ত উল্লাস ফুটছে না। চাপা পড়া শুকনো স্বর ধীরগতি করাতের মতো শোনালো। বলল, কোথায় যাবে? তোমার নিমি তো নেই।

হাসিতে ফুলে ফুলে উঠল সুবালা। থু থু জমে, শাদা দেখাচ্ছে তার ঠোঁটের কষ। অভয় নেমে দাঁড়াল। পালাবার সময় এসেছে তার। সুবালা দ্বিতীয়বার মুখ খোলবার আগে চলে যেতে হবে তাকে।

সুবালা যেন হাসতে হাসতে বলল, মরবার আগে এসেছিল তোমার নিমি। আমার কাছে এসেছিল।

অভয়ের পা অবশ হয়ে গেল। অনড় নিশ্চল সে সুবালা শুকনো চাপা পড়া গলায় বলল, নিমি আমাকে বললে, 'রাক্ষুসী, তোর এ কি মায়া রাক্ষুসী। আমাকে না দিতিস, তোর ধরে রাখতে কী হয়েছিল।' একে বলে মেয়েমানুষ, বুঝলে হে নাগর। আমি কাউকে ধরিনি, ছাড়িও নি বাবা। আমি হেসে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম নিমিকে। নেঙো-বাই ছুঁড়ির, আমার পেছুতে লাগতে এসেছিল। সেই ঘেন্নায় তোমাকে দেখতেও যাই নি। তুমি জেল থেকে এলে। পাড়া ঝেঁটিয়ে তোমাকে দেখতে গেল। আমি যাইনি। শেষে সবাই ভাববে, তালে আছি।

আবার ফুলে ফুলে হাসল সুবালা। উপুড় হয়ে এলিয়ে পড়ল হারমোনিয়মের ওপর। বেণী তার পিঠের পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। হারমোনিয়মে গুঁজড়ে পড়া মুখ থেকে তার গলার স্বর বেরিয়ে আসতে লাগল—বেশ্যারা কাউকে ধরেও না, ছাড়েও না। তার সবাই আপন, সবাই পর, কী বল অ্যাঁ? যখন যার, তখন তার। তবে হ্যাঁ, আমি বাপু একটু সুখী। মনের মতন নাগর না হলে আমার ঘরে তুলতে ইচ্ছে করে না। বলে, মনের মতনটি হয়নি বলে আমার সাতপাকে বাঁধা সোয়ামী ছেড়ে চলে এসেছিলুম।

আবার হাসতে লাগল। তারপর সহসা মাথা তুলল। ভ্রূকুটি করে তাকাল অভয়ের দিকে। ঠোঁট কুঁচকে বলল, ও, তুমি কি ভেবেছ আমার ব্যায়রাম আছে? তাই থাকলে না?

দু'হাত বাড়িয়ে বলল, এই দেখ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নাও। কোথাও রোগ নেই আমার। তা, তোমার নিমিটা আমার জ্বালায় জ্বলল, তাই একটু শোধ দিতে চাইলুম। আচ্ছা, বল তো, নিমি তোমাকে কেন সন্দেহ করত? তুমি কি আমাকে মনে মনে···।

সুবালা মোটা শুকনো গলায় হেসে উঠল। অভয়ের বুকের মধ্যে কাঁপছে। যে ক্ষিপ্ত মহিষ তার রক্তের মধ্যে দাপাচ্ছিল, সে অনেকক্ষণ মরেছে। অক্ষমের মতো মাথা খুঁড়ে সে অনেকক্ষণ ঘাড় মটকে লুটিয়ে পড়েছে। সে বলি প্রত্যক্ষ হয়নি। সুবালার দেহের প্রতীক প্রতিমার পায়ে, মনের অন্ধকারে সে নিহত হয়েছে। এখন শুধু সংশয়ের জ্বালা। সুবালাও সেই কথার বিন্দুতে এসে থেমেছে। তবে কি তাই? সে কি মনে মনে তাই চেয়েছিল? সেই চাওয়া কি তার সব ভাসিয়ে, আজ এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল? আশ্চর্য! আজ এখানে আসার সঙ্গে সারাদিনের ভাবনা-চিন্তার কোনো যোগাযোগ নেই, তবে?

এখন নয়। এ ভাবনা এ মুহূর্তে নয়। তার সারা জীবনের এই একটি প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হবে তাকে।

সুবালা আবার বলে উঠল—তা বলে আমাকে? একটা বেশ্যাকে? নিমির বর হয়ে? দূর দূর দূর!

যেন অভয়কে দূর দূর করে উঠল সুবালা। এ তার প্রাপ্য ছিল। তার কল্পনার শূন্য ঝাঁপিতে সাপ ছিল, এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তবু তাকে মুখ খুলতে হবে। সুবালাকে দুটি কথা বলতে হবে। আর সে কথা এখন তার নিজের কাছে ভাণ মাত্র। সে বলল, কিন্তু এ ভাবে তুমি আর কতদিন চালাবে? এটা ব্যবসার বাড়ি।

সুবালা একটা অবর্ণনীয় বিভঙ্গে কাৎ হয়ে পড়ল। হাত চাপা দিল চোখের ওপর। বলল, জানি। মাসীকে তো বলি। যে অঙ্গ পচে গেছে, তাকে বাদ দাও মাসী। মাসী তাড়ায় না যে।

—কোথায় পচেছে? তোমার রূপ আছে, বয়স আছে।

—মন গো মন! মন পচেছে। আমার মন!

একটি নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে সুবালা সহসা ফুঁপিয়ে উঠল। ফিস ফিস্ করে বলে উঠল—আমি কী করব? আমার ঘর ভাল লাগে নি। আমার শরীর বেচতে ভাল লাগে না। আমি কী করব? আমার মরতে ভয় করে। আমি কী করব?

যেন ফ্রক-পরা একটি ছোট মেয়ে কাঁদছে। দু'হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হতে ইচ্ছে করল অভয়ের। কিন্তু তার সাহস হল না। তার নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় নেই। তার ইচ্ছের সঙ্গে আপন হাতের পরিচয় নেই। সে দেখল, সুবালা নিশ্চুপ। এলিয়ে পড়ে আছে অচৈতন্যভাবে। সে পিছন ফিরে ঘরের দরজা খুলল। দেখল রাজুবালা দাঁড়িয়ে।

রাজুবালা কোনো কথা না বলে আগে ঘরে ঢুকল। দেখল সব। তারপর শাড়ি নিয়ে ঢেকে দিল সুবালাকে। দিয়ে, ঝুঁকে পড়ে দেখল সুবালাকে একবার।

অভয় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। পিছন থেকে ডাকল রাজুবালা, শোন জামাই।

অভয় দাঁড়াল। উঠোনটা তখন খালি। বাড়িটার ঘরে ঘরে বন্ধ দরজায় গুলতোনির শব্দ। রাজুবালা অভয়ের সামনে এসে বলল, ওকে দিয়ে ব্যবসা যে আর চলবে, মনে হয় না।

অভয় কোনো জবাব খুঁজে পেল না। রাজুবালা আবার বলল, বল তো জামাই, ওকে কি তোমার পাগল মনে হল?

অভয় বলল, এ রকম পাগল তো আর দেখি নি মাসী।

—সেই তো কথা বাবা। সবাই ওকে তাড়িয়ে দিতে চায়। ব্যবসা করতে গেলে, দেওয়াই উচিত। কিন্তু সব কি মানা যায়? এ লাইনে মেয়েদের জীবনে একবার এ রকম সময় আসে। আবার চলেও যায়। খাওয়া-পরার ভয়ের গুঁতোয় চলে যায়। আমি জানি, আমারও এক সময়ে এ রকম হয়েছিল। লোচন ঘোষ বাঁচিয়ে দিয়েছিল আমাকে। সে আমার সঙ্গে গাইত। কিন্তু সুবলির খাওয়া-পরার ভয় নেই। শুকিয়ে মরার ভয় নেই। ও যে আর ব্যবসা করতে পারবে, মনে হয় না। কী পেলুম? এই ভাবনা। কী পেলুম? এ জীবনটা নিয়ে কী করছি? এ সব চিন্তা মাথার ঘায়ের মতো। তাদের

শান্তি নেই। কিন্তু কী বলব! এখন ওকে কে আদর করে ওকে নিয়ে সোহাগ করবে? দিন রাত খোসামোদ করতে হবে, খেসমত খাটতে হবে। তাও ব্যাটাছেলে হওয়া চাই, কিন্তু কোনোদিন কাছে যেতে চাইবে না। যেদিন ওর মর্জি হবে, শুধু সেদিন। তা এমন লোক কোথায় পাব আমি? যে লোক ওকে নিয়ে সারাক্ষণ থাকবে?

অভয় মাথা নীচু করে শুনল। কিন্তু কোনো জবাব দিল না। হয় তো রাজুবালার কথায় ইঙ্গিত ছিল। অভয়ের চিন্তায় স্থান পেল না। সে বলল, মাসী যাচ্ছি।

—এস বাবা। সময় পেলে একটু-আধটু এস। তোমার কত নাম ধাম, কিন্তু আমরা তোমার পর নই কিন্তু। তোমার নাম হলে, আমাদের বুক ফোলে।

অভয় বলল, জানি মাসী।

সে বেরিয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ তার বুকের মধ্যে যন্ত্রণা একটা কাঁটার মতো বিদ্ধ হল। সেই সন্ধ্যাবেলার মতোই। অভয়ের কত নাম! তার গৌরবে, অপরের গৌরব! মিথ্যে! সব মিথ্যে হয়ে গেছে আজ তার নিজের কাছে। কী ভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত হবে? কেমন করে। তার ভিতরের পাপের সঙ্গে সে কী দিয়ে যুঝবে? তার বাইরেটা এক। ভিতরটা আর এক। সে অবিশ্বাসী। মিথ্যুক। তবে কোথায় দাঁড়িয়ে সে বাঁচছে? দশজনের সঙ্গে চলছে, ফিরছে, কথা বলছে?

একদিন রাত্রে যেটাকে ভুল মনে হয়েছিল, আজ দেখা গেল, সেটা শতপাকে জড়ানো। নিজের সঙ্গে অপরিচয়ের দুঃসহ ব্যথা নিয়ে, বাড়িতে এসে পৌছুল সে।

ক্রমশঃ

শান্তং পাপং

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রগতি কি দুরগতি নয়—
অধঃপতন হচ্ছে খাঁটি,
অমৃতের সব কুণ্ড ভেঙে—
হচ্ছে গড়া গরল ভাটি।
বিশ্বাস হ'ল দুর্বলতা,
ভক্তি ও প্রেম ভূয়া কথা,
ধর্ম্ম ওতো মানব মনের—
তৈরী মুখোস পরিপাটী।

২

মরে মাটি হওয়ার চেয়ে—
বেঁচে মাটি হওয়াই ভাল,
পরকাল তো ছিল না—নাই—
যাতে তাতে হও রসালো।
'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'
যে বলেছে সেই তো ঋষি—
উল্টো যে কয় চালাও লাঠি।

৩

দেহই আদি, দেহই তো সব—
আধ্যাত্মিকের দিন গিয়েছে,
রসতো শুধু মধুর রসই—
অন্য রস আর ভিঁয়াও মিছে।
স্ফূর্ত্তি কর—লাফাও হেসে,—
মুক্তি দেবে মরণ এসে,
জানো যুগের আদর্শ তো—
চড়াই এবং পাঁঠা পাঠী।

৪

ভগবান যে সবার বড়—
ভাবুক রসিক প্রেমিক বোঝে,
কৃষ্টি সাথে মিশিয়ে আছে—
যুগের যুগের সাধনা যে।
দীর্ঘ তুমি হওনা য গজ,
যতই বড় হউক মগজ,
পুষ্ট শিমুল-বাকড়া সম
উড়িয়ে তুলা পড়বে ফাটি।

৫

বৃহৎ বিষম জাল বুনিছ—
উল্লাসে বিষ-উর্ণনাভ,
'একটা কিছু নূতন করার'
খেয়ালের কি মূল্য ভাবো?
বিষ বিলায়ে বিশিষ্টতা,
ভাবছ পাবো—পাবে না তা,
জেনো তোমার প্রসার ভূমে—
ডি, ডি, টির এক বসবে ঘাটি।

❋ মেয়েদের কথা ❋

আমাদের ঘরোয়া কথা

রেণুকা চক্রবর্ত্তী

"রূপে তোমায় ভোলাব না

ভালবাসায় ভোলাব গো"

কে যেন গেয়ে চলেছে। শুনে মনে হল মেয়েদের ব্যাপারেও কি একথাটা খাটে? কিন্তু তখনই মনে হল এটা সম্পূর্ণ ভুল। আজ নারীর আন্তরিকতায় বা ভালবাসায় পুরুষকে ভোলাবার সুযোগ সুদূর-পরাহত। সেখানে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কনে দেখার ব্যাপার বরাবরই জটিল ছিল। আজকাল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী মানুষ ব্যাপারটাকে আরো জটিলতর করে তুলেছেন।

পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, পরমা সুন্দরী, প্রকৃত গৌরবর্ণা, অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ পাত্রী চাই। যৌতুক তো থাকবেই। কি সর্বনাশ! বাংলাদেশে গৌরবর্ণা মেয়ে কয়টি বলুন তো? আজও শিক্ষিত মানুষের বিচার হবে বর্ণ দিয়ে? যে বর্ণের ব্যাপারে আমাদের এতটুকু হাত নেই। বাইরের সুন্দরের স্থায়িত্বই বা কতটুকু? অতি রূপবান মানুষও স্বভাবে কি ভীষণ কুৎসিত হয়ে ওঠে, আবার অতি-কুৎসিত মানুষেরও স্বভাবে কতই না মিষ্টি লাগে। তখন তাকে অপরূপ মনে হয়। তা ছাড়া স্ত্রী কি ঘরের আসবাব? যার হাতে তুলে দিতে হবে সংসারের দায়িত্ব, ঐতিহ্য। তার বিচার চেহারা দিয়ে? তারপর ভাবুন বেচারা পিতার কথা, মেয়েকে দীর্ঘদিন খাওয়াতে, পরাতে, উচ্চশিক্ষার গুরু ব্যয়ভার বহন করতে, পূর্বেই এক বিয়ের খরচ হয়ে গিয়েছে। এখন আসর সাজিয়ে, কনে সাজিয়ে, বৌভাতের খরচা বরের পিতার হাতে তুলে দিয়ে কন্যা পার করতে পিতার প্রাণটুকু পার হবার দাখিল। পূর্বে পৈত্রিক ভিটে বন্ধক দিয়েও কিছু টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হত, এখন সে গুড়ে বালি। ভিটে কয়জনের আছে?

আজও যদি বিয়ের বাজারে শুধু রূপ আর রূপেয়া ধরেই আমরা বসে থাকি, তবে কোথায় থাকে আমাদের শিক্ষার গর্ব্ব? পূর্বে আর একটু সুবিধে হত, চেনা-জানার ভেতর অনেক বিয়ে হত। তাতে মেয়ের চেহারা বা পাশ নিয়ে তেমন আপত্তি ঘটত না। বংশ বা অন্যান্য গুণে উৎরে যেত। ছেলের সম্বন্ধে মেয়ের বাড়ীর, মেয়ের সম্বন্ধেও ছেলের বাড়ীর লোক প্রকৃত সংবাদ পেত। চেনা, জানা ঘরে বিয়ে দিতে পারলে অনেকটাই নিশ্চিন্তি। আজ আগুন নিয়ে খেলা চলছে। তাই খবরের কাগজে এমন খবরও দেখা যায় যে, বিয়ের পরে নব-বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর পয়সাকড়ি নিয়া উধাও। আজ আমরা কোথায়? অসম্ভব বলে আর কিছুই নেই।

মেয়েদের মনোবৃত্তিরও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। কারো অধীন হবার কথা ভাবতেই পারেনা। তারা ভাবে—বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শুধু খাবে, সিনেমা দেখবে, বেড়াবে, নিত্য নূতন শাড়ী গহনা কিনবে। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আর কিছু করণীয় আছে বলে তারা জানেনা এবং ধরেই নেয়—তাদের শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল হবে।

এদিকে বিয়ের নামে ছেলেদেরও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াব কি? যার তিন-শত টাকা মাইনে সে ভাবে, পাঁচশত হোক, তখন বিয়ে করা যাবে। বৌ-পোষা কি চাট্টিখানি কথা। একাধিক পরিবারেই দেখি বিয়ের যোগ্য ছেলেদের বিয়ের কথা বললে জবাব দেয়, আজকালের বৌ এসে তো তোমাদের কাজ করে দেবে না। তার চেয়ে তোমাদের কাজের লোক রেখে দিচ্ছি।

মেয়েরা বলে—পয়সা না থাকলে বিয়ে করে মরতে যাব কেন? চাকুরি করে খাব।

সক্ষম মেয়েরা চাকুরী করে থেকে এবং কাজের লোক রেখে সংসার চালালেও জীবনের বহু সমস্যাই বাকী থেকে যায়। তাই আবার সম্বন্ধের খোঁজ করতেই হয় এবং তা হয় খবরের কাগজের মাধ্যমে। দুপক্ষই নিক্তি নিয়ে বসে থাকেন। কনে পক্ষের চাই অফিসার, নয়ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। যেন মেয়ে সুখী হতে হলে এগুলি অপরিহার্য।

আর বরপক্ষের প্রকৃত সুন্দরী, অন্ততঃ ম্যাট্রিক, যেন এই মানুষের পরিচয়ের একমাত্র মাপ কাঠি। তারপর নগদ ৫।৭ হাজার তো চাই-ই। আজকাল কচিৎ কখনো দু একজন মহৎ লোক দেখা যায় যাঁরা বলেন—দাবী নেই। এটা খুবই আনন্দ ও গর্ব্বের কথা। কেউ বা আবার দেখেশুনে এমন সম্বন্ধই করেন যেখানে পাওয়া যাবে প্রচুর। সেখানে নিজের মহত্ব বজায় রাখতে আপত্তি কি? বলেন—আমার কোন দাবী নেই। এও মন্দের ভাল। অন্যের মহত্বকে প্রকাশ করার সুযোগ দেন।

আজকাল শিক্ষিতা চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্বামীদের চলতে হয় দেশে, বিদেশে। সেখানে নানা ভাষা নিয়ে কারবার, তার উপর প্রয়োজনবোধে চাকুরী করা, ছেলে-মেয়ে মানুষ করার জন্যও অন্ততঃ ম্যাট্রিক-পাশ দরকার নিশ্চয়ই। তাছাড়া আজকাল সহধর্ম্মিণীর চেয়েও সহমর্ম্মিণীর প্রয়োজনই বেশী।

তবু সব জিনিষেরই বুঝি সীমা আছে। ট্র্যাজেডিটা বুঝুন, একটি বড় বংশের মেয়ে মা মারা যাওয়ায় ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে হয়, সংসারের সমস্ত দায়িত্বই এসে পড়ে তার ঘাড়ে। শিক্ষিত বাপ পরম যত্নে মেয়েকে যেটুকু লেখাপড়া শেখান, সেটুকু তুচ্ছ নয়। তার চলার পথে যথেষ্ট পাথেয়। দেখা যায় বিয়ের বাজারে মেয়েটি একেবারে অচল। ম্যাট্রিক পাশ নয় শুনে কেউ আর দেখতে আসারও দরকার মনে করে না। ঘটনা-ক্রমে এলেও চা-জলযোগ করাই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। একটি পরিচিত পরিবারে মেয়েটির সম্বন্ধের কথা উথাপন করা হয়। হৃদয়ের সম্পদ, সাংসারিক কাজে পটুতা জানা সত্ত্বেও শুধু ম্যাট্রিক পাশ নয় বলে সে পরিবারও নাকচ করে দেয়। পূর্ব্বের অক্ষরহীন মেয়েরও বুঝি এমন দুর্গতি হত না। অথচ এই পরিবারের বড় বধূটি দেখতে সুশ্রী নয়, কিন্তু তার গুণে সমস্ত পরিবার এমন মুগ্ধ যে বৌ-ছাড়া কেউ কিছু করার কথা ভাবতেও পারেন না। কি করে তিনি ছাড়পত্র পেয়েছিলেন কে জানে। হয়ত কয়েক বছর আগে বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এত গেল ডিগ্রীর কথা। এবার বলি রূপের কথা। এক ধনীর দুলালী বড় হতেই বাবা-মা বিয়ের চেষ্টা করেন। মেয়েটি দেখতে কালো। তাই সহসা তার সম্বন্ধ জোটে না। মেয়েটি বলে—সে বিয়ে করবে না। এম, এস, সি, পাশ করে রিসার্চে লেগে যায়। বাবা মা কত ঝুলোঝুলি বিয়ে দেবার জন্য। মেয়েটি রাজী নয়। আমরা সুখ্যাতি করি—বাঃ চমৎকার মেয়ে। কি হত বিয়ে করে। একদিন ওর এক বন্ধু ধরে পড়ে, 'হ্যাঁরে তুই বিয়ে করবি না?'

'পাত্র কোথায়?'

'বেশ যা হোক। তোর পাত্রের অভাব। তুই আজ মুখের কথা খসালে কাল মাসীমা-মেসোমশাই ডজনখানেক ছেলে এনে হাজির করবেন।'

'সে তো আসবে আমার বাবার দেওয়া জড়োয়া গহনা আর নগদ কয়েক হাজার টাকা নিতে, আমাকে নিতে নয়। কেউ যদি কিছুই যৌতুক না নিয়ে আমায় বিয়ে করে তবেই আমি বিয়ে করব। নয়ত নয়।'

সেদিন যেন মেয়েটিকে নূতন করে দেখলাম। তার বিয়ের উপর বিতৃষ্ণার কারণ বুঝলাম। তাই বলছিলাম—গুণে ভোলাবার, হৃদয়ের সম্পদে ভোলাবার আগে চাই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ আর প্রকৃত গৌরবর্ণ। এটাই সংসারে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। এ না হলে সংসারের বাইরেই থাকতে হবে চিরকাল।





হাতের কাজ

কাঠের মালার কারু-কার্য্য

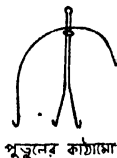
রুচিরা দেবী

কয়েকমাস পূর্ব্বে (ভারতবর্ষ, পৌষ সংখ্যা, ১৩৬৭) এ আসরে, নানা আকারের ও রঙের কাঠের মালা বা Beads সংগ্রহ করে, সেগুলিকে মজবুত অথচ সরু তার (Wire) কিম্বা সুতো (Chord) দিয়ে সুকৌশলে একত্রে গেঁথে কিভাবে বিবিধ-ধরণের সৌখিন পুতুল, ঘর-সাজানোর অভিনব উপকরণ এবং বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে প্রিয়জনদের উপহার দেবার উপযোগী বিচিত্র কারুকার্য্য-মণ্ডিত সামগ্রী তৈরী করা যায়, সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করি, অনেকেই হয় তো ইতিমধ্যে এ ধরণের শিল্প-কাজ করে বহু বিচিত্র কারু-সামগ্রী রচনা করেছেন। আজ তাই, কাঠের রঙীণ মালা গেঁথে রচনা করা যায়, এমনি ধরণের আরো দু'একটি অভিনব সামগ্রী তৈরী করার বিষয় বলি।



পাশের ছবিতে 'লাঠি হাতে এবং টুপি মাথায় আঁটা বিচিত্র একটি মানুষের' নক্সা দেখানো হলো। ইতি-পূর্ব্বের আলোচনায় যেমন ভাবে বলেছি, ঠিক তেমনি ধরণের নানা রঙের ও আকারের কাঠের মালা গেঁথে, অনায়াসেই বিচিত্র এই পুতুলটি রচনা করা যাবে। ইতিমধ্যে এ ধরণের কাঠের মালার শিল্প-কাজ করে যাঁদের হাত পেকেছে, তাঁদের পক্ষে এ পুতুলটি রচনা করা সহজ-সাধ্য, তবে যাঁদের এখনও শিক্ষানবীশীর পালা চলেছে, তাঁদের বোঝবার সুবিধার জন্য এসম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি হদিশ জানিয়ে রাখি।

উপরের নক্সা-অনুসারে কাঠের মালার পুতুলটি তৈরী করতে হলে, গোড়াতেই একটি লম্বা মজবুত-ধরণের 'তার' বা 'সুতো' নিয়ে, সেটিকে অর্থাৎ তারের বা সুতোর কাঠা-মোটিকে আগাগোড়া পাশের ২নং নক্সার ছাঁদে, বাঁকিয়ে মুড়ে পুতুলের কাঠামো রচনা করে নিন। তার বা সুতোটিকে এভাবে বাঁকিয়ে মুড়ে নেবার ফলে রচিত হয়ে যাবে—পুতুলটির মাথা, দেহ এবং দুটি পায়ের কাঠামো। তারপর পুতুলের এই কাঠামোর হাতের অংশ থেকে সুরু করুন Beads অর্থাৎ কাঠের মালাগুলি গেঁথে সাজানোর কাজ—উপরের ১নং নক্সায় যেমন দেখানো রয়েছে, আগাগোড়া সেই ধরণে। হাতের সঙ্গে সঙ্গে লাঠির কাঠামোটিতেও উপরোক্ত নক্সানুসারে কাঠের মালাগুলি গেঁথে নিতে হবে। এমনিভাবে হাত ও লাঠির কাঠামোতে কাঠের মালাগুলি গেঁথে নেবার পর, খানিকটা সরু তার বা সুতো নিয়ে, সমান-মাপে কেটে পুতুলের দু'হাতের দশটি আঙুল রচনা করতে হবে। তারপর ঐ মিহি-তারের অবশিষ্টাংশ দিয়েই কাঠের মালা গাঁথা আঙুলগুলিকে পাকাপাকিভাবে জড়িয়ে জুড়ে দিতে হবে হাতের অংশের সঙ্গে।

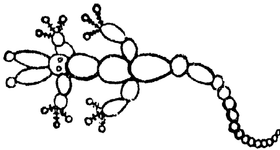


পুতুলের কাঠামো

এমনিভাবেই দেহের একদিককার অংশের সঙ্গে আরেকদিকের অংশ জোড়া দিতে হবে আগাগোড়া ঐ মিহি-তার বা সুতো জড়িয়ে এঁটে। উপরের ১নং নক্সাতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই পুতুলের মাথা ও মুখ তৈরী করবেন বড় সাইজের গোলাকার কাঠের মালা বা Beads গেঁথে। কাঠের মালাগুলি গেঁথে নেবার পর, পুতুলের মুখ নাক, চোখ, আর ঠোঁট ফুটিয়ে তুলতে হবে রঙ-তুলির রেখা এঁকে। তাছাড়া পুতুলের দেহের অংশের Beads বা মালাগুলিতেও রঙ-তুলির রেখা টেনে জামা—পাৎলুন প্রভৃতি বিচিত্র রঙদার করে তুলতে হবে। এমনিভাবে রঙ-চঙের ফলে, পুতুলটির বাহার আগাগোড়া খুলবে অপরূপ-সুন্দর! তাছাড়া পুতুলটিকে দাঁড় করিয়ে সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন—কাজেই দুটি পা এবং হাতের লাঠির উপর ভর করে পুতুল যাতে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে

পারে—সেজন্য দুটি পায়ের ও লাঠির অংশগুলিকে কায়দা করে সামান্য একটু আগে-পিছে ধরণে বসানো চাই, যাতে পুতুলের দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে পুরোপুরি। পুতুলটিকে ঠিকভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য—পুতুলের ডান পা আগে রেখে, তার সঙ্গে ভারসাম্যের সমন্বয় সাধন করে হাতের লাঠিটিকে সমান লাইনে সাজিয়ে রাখতে হবে এবং বাঁ-পাটিকে সরিয়ে রাখবেন একটু পিছনে—তাহলেই এই 'তিন-পায়ের' উপর ভার রেখে পুতুলটি ঠিক খাড়া থাকতে পারবে। উপরন্তু, এমনি ধরণে সাজানোর ফলে, পুতুলটি দেখলে মনে হবে যেন—একজন মানুষ এক পা এগিয়ে এবং আরেক পা পিছিয়ে, হাতের লাঠির উপর দেহের ভর রেখে দিব্যি স্বচ্ছন্দ-গতিভঙ্গীতে হেঁটে চলেছে।

এমনি ভাবেই একটু চেষ্টা করলে কাঠের মালা গেঁথে উপরের পুতুলটির মতোই আরো নানাধরণের বিচিত্র কারু-শিল্পসামগ্রী বানানো যাবে। প্রসঙ্গক্রমে, পাশের ছবিতে ছোট-বড় নানা সাইজের রঙীণ কাঠের মালা বা Beads গেঁথে রচনার উপযোগী আরো একটি অভিনব সৌখিন শিল্প-সামগ্রীর নক্সা মুদ্রিত করা হলো। এ নক্সাটি—একটি কুমীরের ছাঁদ! আলোচিত পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে



শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই তার বা সুতো দিয়ে বিভিন্ন সাইজের রঙীণ কাঠের মালা বা Beads গেঁথে এ কুমীরটিকে রূপ-দান করতে পারবেন। কুমীরের নক্সাটিকে রূপদান করতে হলে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত কাঠের মালা গেঁথে রচিত ঘোড়া, জিরাফ, লাঠি-হাতে ও মাথায় টুপি-আঁটা মানুষটি যে পদ্ধতিতে তৈরী, আগাগোড়া ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

এবারে আপনারা নিজেরাই উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এবং হাতে-কলমে কাজ ক'রে কাঠের-মালা বা Beads গেঁথে এমনি ধরণের নানান্ বিচিত্র-অভিনব শিল্প-সামগ্রী বানিয়ে তুলুন। এ কাজে শুধু যে নিজেরাই আনন্দ পাবেন তাই নয়, সংসারের আত্মীয়-বন্ধু আরো পাঁচজনকেও আনন্দ দান করতে পারবেন প্রচুর।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব-বিচিত্র শিল্প কারুর বিষয় আলোচনা করার বাসনা রইলো।

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

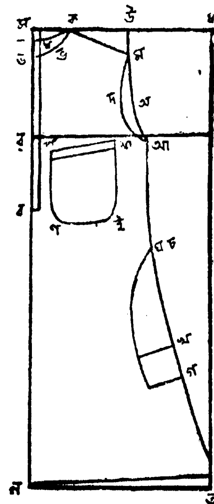
স্নলতা মুখোপাধ্যায়

পাঞ্জাবী

(২)

গতমাসে পুরুষদের নিত্য-প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ পাঞ্জাবী-বানানোর ছাঁট-কাট সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবারে মোটামুটি হদিশ জানাবো—পাঞ্জাবী সেলাই করবার পদ্ধতি সম্বন্ধে।

প্রয়োজনমতো মাপ-অনুসারে পাঞ্জাবীর কাপড়টি ছাঁট-করে নেবার পর সেলাইয়ের কাজ সুরু করতে হবে। সেলাইয়ের সময়, গোড়াতেই পাঞ্জাবীর সামনের পাটের ছাটাই-করা কাপড়টি নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। কাপড়ের সামনের পাট অর্থাৎ পাঞ্জাবীর যে অংশ বুকের 'পটি' বা 'পাতের' (Fold) জন্য 'চেরাই' (চিরে দেওয়া)



করা হয়, সেই জায়গার বাঁ-দিকে বোতামের বসানো 'পটি' এবং ডান-দিকে বোতামের 'কাজ-ঘর' বা 'বোতাম-আঁটার ঘর' সেলাই করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উপরের ছবিতে দেখানো 'স' থেকে 'র' চিহ্নিত অংশটি দেখলেই ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারবেন।

বোতাম-পটি সেলাইয়ের পর, পাঞ্জাবীর 'বুক-পকেট' অর্থাৎ উপরের নক্সার 'প,' 'ফ,' 'ণ' ও 'হ' চিহ্নিত অংশটি সেলাই করতে হবে। বুক-পকেট সেলাইয়ের কাজে, পাঞ্জাবীর সামনের কাপড়ের উপর উপরোক্ত চিহ্নিত-অংশের ছাঁটাই-করা কাপড়ের টুকরোটিকে পরিপাটি ভাবে বসিয়ে সেলাই করা প্রয়োজন। সেলাইয়ের সময়, উপরের চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে বুক-পকেটের কাপড়ের টুকরোটিকে ঈষৎ-হেলানো ছাঁদে বসিয়ে সেলাই করতে হবে। এ কাজটুকু কিন্তু করতে হবে 'বুক-পকেটের' মাথা অর্থাৎ নক্সার 'প' থেকে 'ফ' চিহ্নিত অংশ মুড়ে দেবার সময়—'পকেট' বসানোর সময় নয়। এমনিভাবে পকেটের মাথাটি মুড়ে দিয়ে বসানোর পর, সেলাইয়ের কাজ করতে হবে।

বুক-পকেটটিকে সুষ্ঠুভাবে সেলাই করে নেবার পর উপরের নক্সাতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে পাঞ্জাবীর সামনের 'পাটের' কাপড়ের 'চ', 'খ', 'ও' এবং 'ন' পর্য্যন্ত চিহ্নিত অংশটিতে আগাগোড়া 'হেমিং' (Hemming) সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। এভাবে, 'হেমিং' সেলাই দেবার পদ্ধতি হলো—কাপড়ের কিনারাটিকে গোড়াতেই ¼" ইঞ্চি করে মুড়ে দিতে হবে, তারপর আবার সেই 'মোড়াইটিকে' আধাআধিভাবে মুড়ে দিয়ে এমন পরিপাটিভাবে সেলাই করতে হবে যে, কাপড়ের আসল কিনারাটি যাতে আদৌ নজরে না পড়ে। তবে খেয়াল রাখবেন—উপরের নক্সায় দেখানো 'থ' থেকে 'গ' চিহ্নিত অংশে এই 'হেমিং' সেলাইয়ের কাজ না করা হয়। কাপড়ের পিছনের 'পাটেও' ঠিক এমনি ধরণে সেলাই দিতে হবে। এ কাজের পর, পাঞ্জাবীর কাপড়ের সামনে 'পাটটিকে' সমতল টেবিল কিম্বা মেঝের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে···এভাবে বিছানোর সময় খেয়াল রাখবেন—কাপড়ের সোজা-দিক অর্থাৎ যেদিকে বুক-পকেটটি সেলাই করা হয়েছে,সেদিকটি যেন উপরে থাকে। এবারে এই বিছানো—সামনের 'পাটের' কাপড়ের উপর পাঞ্জাবীর পিছনের 'পাটের' কাপড়টিকে বিছিয়ে দিন পরিপাটি ভাবে। তবে পাঞ্জাবীর পিছনের 'পাটে'র কাপড়টিকে বিছানোর সময় বিশেষ নজর রাখবেন যে, এ-কাপড়ের সোজা-দিক অর্থাৎ বাহির-দিক (Outer-facing) যেন নীচে থাকে এবং অপর দিক অর্থাৎ উল্টো বা অন্দর-দিক (Inner Facing) যেন উপরে থাকে।

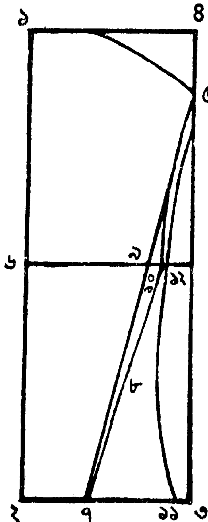
এমনিভাবে পাঞ্জাবীর কাপড়ের সামনের ও পিছনের 'পাটের' অংশ দুটিকে সমানভাবে বিছিয়ে নিয়ে, উপরের নক্সাতে দেখানো—'আ' থেকে 'চ' এবং 'থ' থেকে 'গ' চিহ্নিত অংশ দুটিকে একত্রে মিলিয়ে দিতে হবে। তারপর 'হেমিং' করবার সময় গোড়াতেই যেমনভাবে কাপড়ে 'মোড়াই' দিতে হয়, ঠিক তেমনি ধরণে উপরোক্ত অংশে সেলাইয়ের কাজ করতে হবে। পাঞ্জাবীর 'পুট' অর্থাৎ নক্সাতে দেখানো—'ক' থেকে 'ম' চিহ্নিত অংশটিও আগাগোড়া এইভাবে সেলাই করা নিয়ম। এভাবে সেলাই দেবার ফলে, কাপড়ের দুটি 'পাটই' সুষ্ঠুভাবে জোড়া দেওয়া যাবে। পাঞ্জাবীর 'পুট' সেলাই করার পর, সেই সেলাই-গুলিকে 'ডবল' (Double) অর্থাৎ কাপড়ের যে দুটি 'পাট' সেলাই হয়েছে, সেই দুটি 'পাটকে' ইতিপূর্ব্বের সেলাইয়ের ঠিক দু' পাশ থেকে টেনে ধরে উক্ত সেলাইয়ের দাঁড়টিকে (অর্থাৎ যে সেলাইয়ের অংশ উঁচু ও উদ্বৃত্ত থাকবে) কাপড়ের সঙ্গে (অর্থাৎ যে পাশে মুড়লে আগের সেলাইয়ের কিনারা নজরে পড়বে না, সেই দিকে) ফেলে পরিপাটি ভাবে পুনরায় একবার সেলাই দিতে হবে। সূচী শিল্পে 'ডবল' সেলাইয়ের কাজ করবার এই হলো প্রচলিত রীতি।

যাই হোক, এমনিভাবে পাঞ্জাবীর 'বডি' (Body) অর্থাৎ দেহাংশটি সেলাই হয়ে যাবার পর জামার পাশের পকেট দুটিকে, যে মাপে ছাঁটাই ও সেলাই দিয়ে জোড়া দেবার নিয়ম আগেই উল্লেখ করেছি, সেইভাবেই জামার দেহাংশের (Body) কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে সেলাই দিতে হবে।

এ কাজের পর—পাঞ্জাবীর 'গলা' বানানোর পালা। পাঞ্জাবীর 'গলা' বানানোর জন্য, কাপড়ের সামনের 'পাটটিকে' অর্থাৎ উপরের নক্সাতে দেখানো—'ক', 'ভ',

'ঙ' চিহ্নিত অংশ ঈষৎ নামিয়ে এবং কাপড়ের পিছনের 'পট' অর্থাৎ উপরের নক্সার 'ক', 'ধ', 'ধ' চিহ্নিত অংশ ঈষৎ কমিয়ে ছাঁটাই করতে হবে। তবে মনে রাখবেন যে জামার 'গলা' যেন মাপের চেয়ে সর্ব্বদাই ১ইঞ্চি বড় থাকে। এছাড়া পাঞ্জাবীর 'গলা' রচনাকালে কাপড়ের আলাদা একটি টুকরো ছাঁটাই করে, 'ওরেফ পটি' অর্থাৎ একই কাপড়ের একটি কোণাকুনি—পটি যেটি টানলে বাড়তে পারে, প্রথমেই জামার ঐ 'গলার' কিনারায় সঙ্গে সমান ভাবে বসিয়ে সেলাই করা প্রয়োজন। পাঞ্জাবীর 'গলার' কাপড়ের এই পটি বসানোর পর 'ওরফে-পটির' ধার মুড়ে জামার দেহাংশের সঙ্গে সমান ভাবে সেলাই করে দিলেই 'গলা' তৈরী হয়ে যাবে।

পাঞ্জাবীর 'হাতা' (Sleeve) বা 'হাত' সাধারণতঃ দু' ধরণের হয়—'ঢিলে-হাতা' এবং 'চুড়িদার'। ঢিলে-হাতা-



ওয়ালা পাঞ্জাবী বানাতে হলে,জামার 'মুহুরী' অর্থাৎ পাশের ছবিতে দেখানো নক্সার '২' থেকে '১১' চিহ্নিত অংশ 'হেমিং' সেলাই দেওয়া প্রয়োজন। তারপর উপরোক্ত রীতি অনুসারে কাপড়ের কিনারা মুখোমুখি বসিয়ে ২নং চিত্রের '৫', '১২' এবং '১১' চিহ্নিত অংশে 'ডবল' সেলাইয়ের কাজ করতে হবে।

তবে পাঞ্জাবীর 'হাতা' যদি 'চুড়িদার' ছাঁদের বানাতে হয়, তাহলে ২নং চিত্রে দেখানো '৮', '৭' এবং '২' চিহ্নিত অংশের কিনারা ⅛" ইঞ্চি মাপে ভাঁজ করে নিয়ে, তাইতে আরেকটি টুকরো কাপড়ের 'বাড়তি' বা 'বাজে' (False) পটি বসিয়ে, ১" ইঞ্চি চওড়া ছাঁদে ভাঁজ করে, জামার 'হাতার' ঐ ভাঁজের নীচে সেটিকে সুষ্ঠুভাবে বসিয়ে সেলাই করা প্রয়োজন। এরপর উপরের নক্সাতে যেমন দেখানো রয়েছে '৮' থেকে '৫' চিহ্নিত অংশ পর্য্যন্ত 'ডবল' সেলাই দিতে হবে। জামার দুটি 'হাতাতেই' এমনি ধরণের সেলাই করা চাই, তবে যখন 'সিঙ্গল্' (Single) অর্থাৎ 'একতরফা-সেলাই' করবেন, তখন, দুটি হাতা যেন একই হাতের না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ 'সিঙ্গল্'-সেলাইয়ের সময় দুটি হাতার ভাঁজ দু'দিকে করতে হবে, এছাড়া পাঞ্জাবীর চুড়িদার-হাতা সেলাইয়ের আর কোনো বিষয়ে এতখানি নজর রাখার তেমন বিশেষ দরকার হয় না। ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী সেলাইয়ের কাজে অবশ্য এ সব বিষয়ে এতখানি নজর রাখার প্রয়োজন নেই।

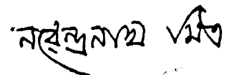
যাই হোক, উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে পাঞ্জাবীর 'হাতা' দুটি সেলাই হয়ে গেলে, বাঁ-হাতাটিকে জামার বাঁ-দিকে এবং ডান-হাতাটিকে জামার ডানদিকে জুড়ে এমন-ভাবে সীবন-কার্য্য করতে হবে যে 'হাতার' 'ধারি' অর্থাৎ 'কিনারার সেলাই' যেন জামার দেহাংশের 'ধারি' বা 'কিনারার' সেলাইয়ের সঙ্গে বেমালুম মিলে যায়। পাঞ্জাবীর বগল অর্থাৎ উপরের ১নং নক্সাতে দেখানো 'ম', 'থ', 'আ' চিহ্নিত অংশ যদি ২নং নক্সাতে দেখানো হাতার '১' থেকে '৫' চিহ্নিত অংশের চেয়ে আকারে ছোট হয়, তাহলে পুনরায় সঠিক মাপ-জোপ নিয়ে কাপড়টিকে ছেঁটে-কেটে সমান করে নেওয়া প্রয়োজন। সেলাইয়ের কাজে সাধারণতঃ 'মহড়া' বড় হয় না। এবারে জামার 'বডি' অর্থাৎ দেহাংশের সঙ্গে হাতা দুটিকে দুদিকে পূর্ব্বোক্ত 'ডবল'-সেলাই পদ্ধতিতে সীবন করে সুষ্ঠুভাবে জোড়া দিলেই পাঞ্জাবী তৈরী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে পাঞ্জাবী সেলাই হয়ে যাবার পর, পরিপাটি-ভাবে জামার বোতাম আর বোতামের ঘর রচনা করতে পারলেই পরিচ্ছদ-বানানোর কাজ সম্পূর্ণ হবে।

এবারের মতো এ আলোচনা শেষ করবার আগে শিক্ষার্থীদের আরো একটি কথা বলে রাখা বিশেষ দরকার। পাঞ্জাবীর ছাঁট-কাট ও সেলাই শেখবার সময় শিক্ষার্থীরা যদি গোড়ার দিকে একটি তৈরী-পাঞ্জাবী সামনে রেখে সেটির প্যাটার্ণ এবং ছাঁট-কাট প্রভৃতি দেখে কাজ সুরু করেন, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবী-সেলাইয়ের কাজ বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বারান্তরে অন্যান্য ধরণের আরো কয়েকটি ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজের কথা আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

এখানে ওখানে



(পূর্বানুবৃত্তি)

শেষ পর্যন্ত বিশুর দাবি মানতেই হল। অনুরাধা প্রস্তাব করলেন—'চলুন তাহলে এক কাপ চাই খেয়ে নেওয়া যাক। ছেলে যা নাছোড়বান্দা, ওকে কিছু না খাওয়ালে আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

চায়ের স্পৃহা উৎপলেরও হচ্ছিল। অনুরাধার প্রস্তাবনায় সেও খুশি হল। হেসে বলল, 'বিশ্বরূপকে ধন্যবাদ। ওর সৌজন্যে আমাদের জন্যেও তাহলে একটু চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। চলুন।'

উৎপল এবার আর অনুবর্তী নয় অগ্রবর্তী। চৌরঙ্গীর মোড়ে একটি দোতলা বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন।'

অনুরাধা মৃদু আপত্তির সুরে বলল—'একি, এখানে কেন।' উৎপল বোধ হয় তা শুনতে পেলনা, কি শুনেও জবাব দেওয়ার দরকার বোধ করল না। দ্রুত পায়ে বিশুর হাত ধরে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।'

বিশু বলল, 'ওকি, আমার হাত ধরছেন কেন! আমি কি অত ছেলেমানুষ নাকি? ছাড়ুন, ছাড়ুন।'

বিশু হাত ছাড়িয়ে নিল। একটু উদ্ধত, রূঢ়, অনাত্মীয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় অনিচ্ছুক। ওর বাবাও কি এই রকম ছিলেন? সতীশঙ্করের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেনি উৎপল। সে চেষ্টাও করেনি। তবু ছেলেকে দেখে কি বাপকে খানিকটা অনুমান করা যায়? বাপ-মার দোষগুণের উত্তরাধিকার তত্ত্বে কি বিশ্বাস করে উৎপল? পুরোপুরি করে না। কিন্তু অংশত করে বই কি। সন্তান বাপ-মায়ের শুধু বিষয়-সম্পত্তি পায় না, আকৃতির সাদৃশ্য পায়, অবিকল একাকার বড় হয় না, কিন্তু চুল, নখ, চোখ, চিবুক, হাত-পায়ের আঙুল, নাকের গড়ন, মুখের ডৌল কোথাও না কোথাও মিল থাকে না। সেই মিলের মধ্যেই বাপ-মায়ের আত্ম-প্রসাদ,তাদের নিজত্ব। আত্মজ বলে চিহ্নিত করবার উপায়। যেমন আকৃতির বেলায়, প্রকৃতির বেলায়ও কি তেমনি? বাপ-মার দোষ-গুণের অংশও কি ছেলে-মেয়েকে বাধ্য হয়ে নিতে হয়? না নিয়ে পারে না? মানুষের নিজের প্রবৃত্তি-প্রবণতার ওপর তাহলে কি তার হাত নেই? কতটুকু তার নিজের দুখানি হাতের জোর···আর কতখানি অদৃশ্য দশভুজের?

রেস্টুরেন্টের 'বয়' এগিয়ে এসে পর্দা-ঢাকা একটা কেবিন দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওটা খালি আছে বাবু। ওখানে যান।'

বয় মানে বালক নয়, পূর্ণবয়স্ক সুপুরুষ। সাদা ইউনি-ফর্মপরা। চোখে মুখে এক বিশেষ ধরণের চাতুর্যের সবজান্তা

ভাব। 'আপনি কাকে নিয়ে এসেছেন তা জানি, আপনাদের মধ্যে…কী সম্পর্ক তা টের পেতে বাকি নেই।' লোকটি তাই কি বলতে চায়? ওর ওই হাসির আভাস লাগা চোখের এই কি একমাত্র বক্তব্য? অস্বস্তি বোধ করে উৎপল চোখ ফিরিয়ে নিল। ওদের অবজ্ঞা করাটাই সম্ভ্রম রক্ষার সেরা উপায়।

কেবিনে ঢুকে উৎপল নিজে একটা চেয়ার নিয়ে বসবার আগে মিসেস রায়কে উল্টো দিকের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

বিশু মায়ের পাশাপাশি বসে কাঠের কুঠুরিটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

উৎপল বিশুর দিকে চেয়ে বলল, 'কী খাবে বল। তুমি কী খেতে ভালোবাসো।'

অবলোকিতেশ্বর বিশুর মুখখানি হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার গাম্ভীর্য আর ঔদাসীন্যের কোন চিহ্নমাত্র রইল না।

পরম আগ্রহে বিশু বলে উঠল, 'পদ্মা মাসী সেদিন আমাকে ফাউল কাটলেট খাইয়ে ছিল। খুব ভালো।'

উৎপল হেসে বলল, 'বেশ তাহলে ফাউল কাটলেটই হোক।'

বয়কে ডেকে তাড়াতাড়ি বলে দিল, 'তিনটে ফাউল কাটলেট, আর তিন কাপ চা।'

অনুরাধা বাধা দিয়ে বললেন, 'ওকি, তিনটে কাটলেট কী হবে?'

উৎপল বলল, 'কেন আপনি—'

অনুরাধা ভ্রূ-কুঁচকে বিরক্তির সুরে বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ উৎপলবাবু? আমি ওসব খাই?'

উৎপল একটু চুপ করে রইল, তারপর লজ্জিত হয়ে বলল, 'Sorry, মিসেস রায়—আমি খেয়াল করিনি। আপনি যে ওসব—আপনাকে আগে আমার জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত ছিল। আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—।'

অনুরাধা হাসলেন, 'থাক। অপকীর্তি যা করে ফেলেছেন ফেলেছেন। তার জন্যে আধঘণ্টা ধরে ক্ষমাভিক্ষে আপনার না করলেও চলবে। আপনারা যা খাবার খেয়ে নিন। আমার জন্যে কিছু বলতে হবে না।'

উৎপল বলল, 'কিন্তু এক কাপ চাও যদি না খান তা হলে বুঝব আপনি ক্ষমা করেন নি, এখনো রাগ করে রয়েছেন।'

অনুরাধা বললেন, 'বেশ তাহলে শুধু এক কাপ চায়ের কথা বলুন। প্রমাণ করে দিই রাগ জল হয়ে গেছে।'

কাটলেট এল, চা এল।

বিশু সুপারিশ করে বলল, 'তুমি একটা খেলে পারতে মা। পদ্মা মাসী যে আমাকে সেদিন কাটলেট খাইয়েছিল তার চেয়ে এটা ঢের ভালো।'

অনুরাধা রাগ করলেন না, ছেলেকে ধমকেও উঠলেন না। হেসে বললেন, 'হতভাগা ছেলে। তুমি আমাকে ওসব খেতে দেখেছ? আমি ওসব খাই? না কি—আমার ওসব খেতে আছে?'

বিশু বলল, 'কেন মা, খেতে নেই কেন?'

অনুরাধা বললেন, 'বোকারাম। তোমার বাবা যে নেই।'

বাবা কেন নেই একথা আর বিশু জিজ্ঞাসা করলনা। অত বোকা ছেলে সে নয়।

আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে বিশু বুদ্ধিমান ছেলের মত গম্ভীরভাবে শুধু খেয়ে যেতে লাগল। কাঁটা চামচের ব্যবহারে তার কিছুমাত্র ত্রুটি ধরবার জো নেই।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উৎপল বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মিসেস রায় যদি রাগ না করেন—।'

অনুরাধা উৎপলের দিকে তাকালেন, তারপর স্মিত-মুখে একটু তরল সুরে বললেন, 'রাগ, করবার মত কথা যদি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই রাগ করব। অবুঝের মত কথা যদি বলেন তাহলে বিশুর মত আপনিও ধমক খাবেন। আপনার সব কালের জন্যে সব কথার জন্যে বরাভয় কী করে দিই?'

উৎপল বলল, 'তাহলে সভয়েই বলি। আধুনিক বিধবারা এসব কেনই বা মানবেন?'

অনুরাধা বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনসব?'

উৎপল বলল, 'এই খাওয়া দাওয়ার আচার বিচার? শুচিতা রক্ষার কি আর কোন উপায় নেই? শোক-প্রকাশের কি আর কোন পথ নেই?'

অনুরাধা বললেন, 'আছে বইকি। অনেক আছে। তার মধ্যে এও একটি।'

উৎপল বলল, 'আমি যদি বলি এসব সংস্কার ছাড়া কিছু নয় ?'

অনুরাধা বললেন, 'সংস্কারই তো। সব সংস্কার আর সভ্যতাই হাজার হাজার সংস্কারের গিঁটে বাঁধা। সেই গিঁট যদি আপনি একটানে সব ছিঁড়ে ফেলেন সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।'

উৎপল বলল, 'কিছুই বিশৃঙ্খল হবে না। আপনি যাকে গিঁট বলছেন সেগুলি সুতোর গিঁট। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার শিকল লোহার মত শক্ত। তা অত সহজে ছেঁড়েও না, তাতেও না। আমার তো মনে হয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মূল শিকড় এইসব ছোটখাটো সংস্কারের মধ্যে নেই। এ সব সংস্কার তো অভ্যাস মাত্র।'

অনুরাধা বললেন 'শুধু অভ্যাস ?'

উৎপল বলল, 'তাছাড়া কি মিসেস রায় ? আজ আপনি সাদা ধবধবে থানের বদলে সরু কালোপেড়ে শাড়ি পরেছেন, সরু হার পরেছেন, দুগাছি চুড়িও আছে হাতে। দেখে আমার ভালোই লাগছে। আমি এরজন্যে কৃতজ্ঞ।'

অনুরাধার মুখে যেন লজ্জার আভা লাগল। তিনি কোন জবাব দিলেন না।

উৎপল বলল, 'কিন্তু দশবছর আগে এসব চলতনা। আমাদের এই মধ্যবিত্ত সমাজেরই কোন কোন স্তরে কোন কোন পরিবারে এখনো এসব অচল। সেখানে এখনো থান না পরলে নিন্দা হয়। কোন বিধবার পায়ে যদি সামান্য একটু সোনার চিহ্নও থাকে তাঁর মান সম্মান রাখা ভার হয়ে ওঠে। শিক্ষিত সমাজ থেকে এসব গোঁড়ামি ক্রমেই উঠে যাচ্ছে, দেখে আমাদের ভালোই লাগে। আমার মনে হয় বিধবাদের পোশাক সম্বন্ধে যেমন অভ্যাস আর রুচির বদল হয়েছে, তেমনি খাদ্য সম্বন্ধেও রীতি-নীতি বদলাবে। আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। আপনি আমিষ খাননা, তবু আমিষের রেস্টুরেন্টে ঢুকেছেন। আমাদের পাশে বসে খাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যতখানি উদার, অনেকেই তেমন উদার নন। আমার এক মাসতুতো বোন আছে। বিয়ের বছর দুই বাদেই বিধবা হয়। কলেজে তিনচার বছর পড়াশুনোও করেছিল। কিন্তু তার গোঁড়ামি দেখলে আপনি অবাক হবেন। মাছের হেঁসেলে পর্যন্ত সে যায়না। অথচ আগে রেস্টুরেন্টে কী খাওয়াটাই না খেত।'

অনুরাধা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এ এক ধরণের reactionও তো হতে পারে। হয়তো গভীর দুঃখ ক্ষোভ আর হতাশা থেকে তিনি এমন হয়ে গেছেন। এ দুঃখ যে কী বস্তু, তা আপনি বুঝবেন না উৎপলবাবু। মৃত্যু যে হঠাৎ অতর্কিতে এসে সব সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা কীভাবে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যায় বোধহয় সে ধারণা আপনার হয়নি। না হোক সেই ভালো।'

হঠাৎ অনুরাধার আবেগের এই উদ্বেলতায় স্তব্ধ হয়ে গেল উৎপল। কী যে বলবে ভেবে পেলনা। অনুরাধাও খানিকক্ষণ একেবারে চুপ করে রইলেন।

খাওয়া শেষ করে গুরুগম্ভীর দার্শনিকের মত বিশুও যে তাদের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে, সে খেয়ালও যেন তাঁর নেই।

একটু বাদে অনুরাধা ফের কথা বললেন, 'সবই সংস্কার সবই অভ্যাস তা মানি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যুক্তি দিয়ে এর অনেক ব্যাপারকেই সমর্থন করা যাবেনা। কিন্তু ভেবে দেখুন—আমাদের কত স্নেহ ভালোবাসা, মায়া মমতা এই সব যুক্তিহীন ছোট ছোট সংস্কারের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। এইসব তুচ্ছ খুঁটিনাটিকে আশ্রয় করে জড়িয়ে রয়েছে। আপনি যদি একদিন হঠাৎ ঝেঁটিয়ে সব বিদায় করতে চান আমাদের অনেক সুখদুঃখের ভাবাবেগ বায়ু-ভূত নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে।'

উৎপল মনে মনে বলল, 'তা পড়বে না মিসেস রায়। আমাদের সেই সব আবেগ নতুন নতুন অভ্যাস আর আচারের মধ্যে নতুন বাসা খুঁজে নেবে। আমরা লক্ষ্য করি আর না করি, রোজ আমাদের সেই বাসা বদল হচ্ছে। নিত্য নতুন অভ্যাসের ভিতর দিয়ে আমরা বদলে যাচ্ছি। অথচ সেই পরিবর্তনের কথাটা স্বীকার করতে আমাদের কী কষ্টই না হয়।'

কিন্তু মুখে কোন প্রতিবাদ করলনা উৎপল। বলা যায়না মিসেস রায় হয়তো আহত হবেন।

একটু বাদে অনুরাধা বললেন, 'অবশ্য তিনিও আপনার মতই কথাবার্তা বলতেন। মতামত আপনাদের মতই আধুনিক ছিল।'

উৎপল বলল, 'মিঃ রায়ের কথা বলছেন ?'

অনুরাধা বললেন, 'হ্যাঁ। একবার আমাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল—কে আগে মরব, কে পরে মরব এই সব নিয়ে। আমি বলেছিলাম আমি মরবার এক মাস পরেই তুমি তো বিয়ে করবে। লুকোচুরির কাজ কি—তার চেয়ে সোজা কথায় স্বীকার কর, সেই ভালো। আমি অনুমতি দিয়ে রাখলাম। লোকের কাছে বলতে পারবে। সবাইকে বলতে পারবে, কী আর করব, বউয়ের অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাই। তিনি হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন বেশ আমিও অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি। উহুঁ চট করে বিয়ে করবার পারমিশন দিতে পারছিনে। মুখে আটকে যাচ্ছে। সেটা আমার অবর্তমানে তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করো। তবে আমি বর্তমান থাকতেই তখনকার আহারাদির বিধি নষেধ সব তুলে নিচ্ছি। মাছ-মাংস সব খেয়ো। আমি বলেছিলাম, তুলে নেওয়ার তুমিই বুঝি একমাত্র কর্তা ? আমার নিজের রুচি-প্রবৃত্তি বলে বুঝি আর কিছু নেই ? আশ্চর্য সেদিনও ঠিক আজকের মতই সমাজে বিধবার স্থান, তার আচার নিষ্ঠার সার্থকতা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম আলোচনা হয়েছিল।'

ট্রেতে করে মসলার প্লেট আর বিল নিয়ে বয় এসে দাঁড়াল।

অনুরাধার আপত্তি সত্ত্বেও উৎপলই টাকাটা দিয়ে দিল।

অনুরাধা বললেন, 'একি, আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম চা খাওয়াবার জন্যে, আর আপনি কেন দেবেন ?'

উৎপল বলল, 'তা হোক। আমার তো অতিথির ভূমিকা বাঁধাই আছে! আজ কয়েক মিনিটের জন্যে আমাকে গৃহী হতে দিন।'

অনুরাধা কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। এবারও কি মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠল তাঁর ?

শুধু রেস্টুরেন্টের বিল নয়, বিশুকে গঙ্গার ধার থেকে বেড়িয়ে আনবার জন্য প্রিন্সেপস ঘাট পর্যন্ত ট্যাকসি ভাড়াটাও উৎপলই আগে ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিল। যদিও জানে হাত খরচে টানাটানি পড়বে, ফিরবার সময় হয়তো সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে অতীন মজুমদারদের মেসে গিয়ে হানা দিতে হবে, তার পকেট থেকে কিছু হাতড়েও নিতে হবে, কিন্তু তবু উৎপল এই মুহূর্তে তার যথাসর্বস্ব ব্যয় না করে পারল না।

অনুরাধা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'অদ্ভুত পুরুষ আপনারা। আর অদ্ভুত আপনাদের প্রেস্টিজবোধ। মেয়েদের কাছ থেকে সব নিতে পারেন, শুধু টাকা নিতেই আপত্তি।'

উৎপল যা ভেবেছিল তা কিন্তু হল না। গঙ্গার ধারে এসে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন অনুরাধা। কিছুতেই মন খুলে কথা বললেন না।

বড় বড় দুটো জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। কৌতূহলী বিশু সেই জাহাজের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আদার ব্যাপারী উৎপলের সাধ্য কি এই বালকের সব ঔৎসুক্য মিটায়, সব জিজ্ঞাসার জবাব দেয়। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার চেয়ে এই জাহাজ-জিজ্ঞাসা উৎপলের কাছে কোন অংশে সহজ নয়।

একটু বাদে অনুরাধাই ছেলেকে ধমক দিলেন, 'আঃ থামো তো। অনেক বক বক করেছ, এবার চুপ করে থাকো। সব সময় কথা বলতে নেই বিশু।'

ধমক খেয়ে বিশ্বরূপ চুপ করে গঙ্গার রূপ দেখতে লাগল। মাঝে মাঝে তীব্র আলোয় কালো জল ঝলসে দিয়ে ছোট ছোট লঞ্চ যাচ্ছে। আবার সব চুপ-চাপ। শুধু একটানা ছলাৎছল জলের শব্দ।

ওপরে তারকা-ভরা আকাশে কোন শব্দ নেই।

উৎপল লক্ষ্য করল অনুরাধার মুখে কোন কথা নেই। এই স্তব্ধতা ভাঙতে উৎপলের মন সরল না। চেষ্টা করলেও কি পারত ?

খানিকবাদে বিশু মায়ের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজলে। হয়তো ঘুমিয়েও পড়ল।

মিসেস রায় কি তাঁর স্বামীর কথা ভাবছেন ? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকবার এসব জায়গায় বেড়াতে এসেছেন ? সেই সব কথা কি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁর ? কিন্তু তিনি নিজে থেকে যদি কোন কথা না বলেন উৎপল আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেবে।

ঘুমন্ত ছেলের মাথা কোলের মধ্যে রেখে হয়তো স্বামীর কথাই ভাবছেন অনুরাধা। তাঁর এই নীরব স্মৃতি-চারণে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

উৎপল তাঁর পাশে নিঃশব্দে বসে রইল। উঠি উঠি করেও উঠতে পারল না।

কোন কোন মুহূর্তে জাহাজের মত মানুষকেও নোঙর ফেলতে হয়।

ক্রমশঃ

কর্মব্রতী কবি

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

১৯২২ সনে শান্তিনিকেতনের অনতিদূরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রভক্ত ভারতদরদী লিওনার্ড এলম্‌হার্স্ট নামক জনৈক ইংরাজের অর্থানুকূল্যে কবি রায়পুরের কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের নিকট হতে সুরুল গ্রামের কিছু অংশ কিনে নিয়ে তাঁর পল্লীসংগঠনের কাজ শুরু করেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা কবি জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়। পল্লীসেবা ও সংগঠন প্রয়াসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কবির অকপট দেশপ্রেমের এক পূর্ণতর রূপ। একদা সংবেদনশীল তরুণ কবির চিত্তে এ দুর্ভাগা দেশের শত দুঃখ, দুর্দশা ও লাঞ্ছনা অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছিল। যে বেদনাবোধ কবি-কণ্ঠকে অগ্নিবাণী-মুখর করে তুলেছিল সেই গভীর দেশাত্মবোধই সার্থক, মূর্তরূপে প্রকাশ পেল সুরুল-শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে। কবির আজীবন আমরণ স্বদেশপ্রীতি দুইপর্বে অভিব্যক্ত। যে পারিবারিক পরিমণ্ডল ও সামাজিক আবহাওয়ায় বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ মানুষ, তার প্রভাব অতি শৈশবেই কবিচিত্তে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করে। তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলা উপলক্ষে তৎকালীন সমাজনেতা ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসেন। হিন্দুমেলাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জাতীয় গান আবৃত্তি করেন :

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।

সমকালীন জাতীয় সঙ্গীতের কথায় ও সুরে অখণ্ড জাতি ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন ও আদর্শ প্রচারিত হতে লাগল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত : মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ

গাও ভারতের যশোগান ;

কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত' প্রয়াগের গোবিন্দচন্দ্র রায়ের : "কতকাল পরে বল ভারতরে" মনোমোহন বসুর : "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন" প্রভৃতি রচনার ভিতর দিয়া দেশমুক্তির আকুতি রণিত হয়ে উঠল। রাজনারায়ণ বসু বয়সে বৃদ্ধ হলেও হৃদয়াবেগে ছিলেন তরুণ। তিনি স্থাপন করেছিলেন জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা, আর সেই সভার সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমবয়সী বালকেরা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "উত্তেজনার আগুন পোয়ানই" ছিল এই সভার সভ্যগণের প্রধান কাজ। স্বাধীনতা অর্জনের কোন সঠিক পন্থা তখনো নির্ধারিত হয় নি। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। হিন্দুমেলার মাধ্যমে দেশে জাতীয়তার আদর্শ প্রচার কংগ্রেসের আগেকার ঘটনা। তরুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে কিন্তু সে সময় থেকেই জাতীয়তা বোধ সঞ্চারিত হয়। স্বদেশ প্রেমের বহ্নিজ্বালা পরবর্তী জীবনে অনুপম উদ্দীপনাময় ছন্দে কবি কণ্ঠে উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে,
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দাম প্রলয়গর্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কবিকণ্ঠও সরব হয়ে উঠেছিল। সুবিধাবাদী হিসেবীর ভয়-সঙ্কোচ, দ্বিধাসংশয় বর্জন করে কবি অকুতোভয়, অপরিণামদর্শী প্রমত্ত যৌবনকে সেদিন মরণাহবে আহ্বান জানিয়েছিলেন

শিকল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী, চিরকাল কি রইবে খাড়া !
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি,
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে,
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেঁড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলি সব আনরে বাছা বাছা।

এ-কি কেবল কবি-কণ্ঠ? এ-যে বিপ্লবীর তূর্য-নিনাদ। পরাধীনতার জ্বালায় অস্থির হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে কবির তৎকালীন রচনায়। দেশ-মুক্তি আন্দোলনের ভাব-প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে কবির রচিত গান, গাথা, কাব্য ও প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে। তারপর হল জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। দাসত্ব শৃঙ্খলিত জাতির অব্যক্ত দাবীর মুখপাত্র হল এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সেটা ছিল মুখ্যতঃ আবেদনের যুগ। সভা করে, আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করে রাজদরবারে দাবী জানানই ছিল সেদিনকার জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রচেষ্টা। কিন্তু নিষ্ফল আবেদন-নিবেদনের পালা খুব বেশীদিন চলল না। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী সভাসমিতিতে গৃহীত চোস্ত ইংরাজীতে রচিত প্রস্তাবগুলির যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে রাজী হলেন না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকেই ব্যঙ্গচ্ছলে microscopic minority বা অত্যল্প সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিষ্ঠান আখ্যা দেওয়া হল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার হলেন পুনায়। সারা দেশে প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হল। কলকাতায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় কবিকণ্ঠে শুনা গেল:

"রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনির সুরে 'কিছু দাও কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহু বলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথই প্রকৃত পক্ষে এই নতুন সুরের প্রথম উদ্গাতা। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি স্মরণীয়:

It was Rabindranath who had first preached the duty of eschewing all voluntary association with official activities, and of applying ourselves to the organization of our economic, social and educational life independently of official control."

তারপর এল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। সে আন্দোলনের পুরোভাগেও দেখা গেল কবিকে। কবি কলকাতায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাজপথ পরিক্রমায় বের হয়েছেন, নিজ হাতে মিলনের রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন আপামর জনসাধারণকে, আর কণ্ঠে উদ্গীত হচ্ছে মিলন-মন্ত্র:

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার স্থল;
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

* * * *

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান।

বঙ্গভঙ্গে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সময় দেশ-মাতৃকার যে উদার ও অখণ্ড রূপটি রবীন্দ্রনাথের মানসচক্ষে প্রস্ফুটিত হয়েছিল তা' হচ্ছে:

"উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আদর্শের মূল নিহিত আছে আত্মনির্ভর বা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং সর্বোপরি চিত্তশুদ্ধির উপর। দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রত্যাগত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ভাবের ঐক্যই বন্ধুত্বের পাকা ভিত্তি। তাই প্রথম পরিচয় হতে শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী—বর্তমান ভারতের দুই যুগ্ম স্রষ্টা—অচ্ছেদ্য সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে ছিল একটা অটুট ও অকৃত্রিম প্রীতি এবং গুণগ্রাহিতা। রবীন্দ্রনাথই গান্ধীজীকে মাহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করেন। গান্ধীজীও কবিকে গুরুদেব সম্ভাষণ করেছেন আজীবন। রাজনীতিক মতবাদে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কখনো কখনো অমিল দেখা দিত। লক্ষ্য এক হলেও পন্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর মধ্যে মাঝে মাঝে যে মতানৈক্য দেখা দিত, তার একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় ১৯১৯ সনে কুখ্যাত রাওলাট অ্যাক্টের প্রতিবাদে এবং গান্ধীজী ঘোষিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পরিণাম সম্বন্ধে কবির সংশয়ে। কবি গান্ধীজীকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন তার ছত্রে ছত্রে এ-কথাটাই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে যে, আত্মিক উৎকর্ষ, নৈতিক বিশুদ্ধতা ও চিত্তশুদ্ধিই হল দেশ-প্রেমের মূল এবং মূল্যায়ন।

"Power in all its forms is irrational, it is like the horse that drags the carriage blind-folded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force which is not necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes a temptation.

* * * *

তাই গান্ধীজীর নিকট কবি আবেদন পাঠালেন:

"This is why I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into your marching line; that martyrdom for the cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into the self-deception that hides itself behind sacred names."

অচিরেই গান্ধীজীকে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল যে এই আন্দোলন শুরু করে তিনি হিমালয় সদৃশ এক বিরাট ভুল করেছেন।

যেদিন আমাদের স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলন নেতিবাচক বর্জন ও বিনষ্টির অপপ্রয়াস মাত্রে পর্যবসিত হতে দেখলেন, সে-দিন থেকেই অনুভূতিশীল কবি বিরূপ হলেন আন্দোলনের সকল উগ্রতা ও উত্তেজনার প্রতি। নীরবে, একান্তে সরে দাঁড়ালেন রাজনীতির কোলাহলময় রাজপথ হতে। পরাধীন দেশে রাজনীতি দেশ-প্রেমের নামান্তর। একমাত্র রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীই দেশপ্রেমিক, এ হচ্ছে এক প্রচলিত ধারণা। দেশপ্রেমিক বলতে মুখ্যতঃ আমরা তাদের কথাই ভাবি যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশমুক্তির কথা বলেছেন বা স্বাধীনতা-অর্জনের নিমিত্ত চেষ্টা করেছেন। রাজনীতিক আন্দোলন আর দেশপ্রেম যেন একে অন্যের দোসর। এ-দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ রাজনীতিক সংগ্রাম হতে অবসর গ্রহণ তৎকালে বহুনিন্দিত হয়েছিল। অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, রাজরোষ, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ভয়েই কল্পনাবিলাসী কবির সৌখীন দেশপ্রেম কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কবিকে অনেকে ভীরুতার অপবাদও দিয়েছিল। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তার একটা প্রমাণ মিলে

যে-দিন জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল অকুতোভয়তার বাণী।

"he time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part wish to stand, shorn of all special distinctions. by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

সেদিন ভীত, সন্ত্রস্ত, লাঞ্ছিত ভারতবাসী এই বজ্রবাণীতে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল।

পরাধীনতার জ্বালা ও পরবশ্যতার অপমান কবিকে চিরদিন করেছে ব্যথিত, পীড়িত। দেশপ্রেম শুধু নেতিবাচক নয়। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর দেশবাসীকে আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে তুলতে। দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সংযোগ আর অন্তরঙ্গ পরিচয়। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে দেশপ্রেমের উদ্দীপ্ত আদর্শ, আর দেশসেবার বাস্তবধর্মী কর্মপন্থা। স্বাধীনতা সংগ্রামের উদগ্র উত্তেজনায় অনেকে আপাত লক্ষ্যটাকেই বড় করে ভাবতেন। এই শ্রেণীর মানুষের মনোভাবটা ছিল অনেকটা এ-ধরণের যে—ন্যায় বা অন্যায় যে কোন উপায়ে হউক ইংরাজকে বিতাড়িত করে স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন হবার পর ভাবা যাবে আমাদের করণীয় কি? এই বিরাট দেশ আর বিপুল সমস্যা—সে সম্বন্ধে ভাবা যাবে পরে। এ ভাবের যারা ভাবুক তারা আমাদের যত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা অভাব অভিযোগ সব ঐ যত-নষ্টের গোড়া ইংরাজের ঘাড়ে চাপিয়ে একটা আত্মপ্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতেন।

কবি নিঃসন্দেহে কবি।

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বমায়ের,
তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা।"

কিন্তু, এই বাউলধর্মী গীতি-কাব্যের কবি আবার পুরোপুরি বাস্তবধর্মী। কবিসুলভ আবেগ আর অনুভবলব্ধ এবং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বাস্তববোধ এ'দুয়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে কবির চিন্তায় ও কর্মে।

"ভারত মাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন এ-কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র; কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া জীর্ণ প্লীহা রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।'

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট বিলাতী পণ্য বর্জনের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে কলকাতার টাউনহলে রবীন্দ্রনাথ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন:

"আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসন কার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। চাষীকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে।"

পঞ্চায়েতী শাসন ও গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ—যা নিয়ে আজকের দিনে নানা প্রস্তাব ও পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দানের চেষ্টা হচ্ছে—কবির কথা সেই আদর্শেরই এক অতি সরল ও সহজ ব্যাখ্যা।

প্রায় এ সময়টাতেই কবির বিখ্যাত উপন্যাস "গোরা" এবং "ঘরে বাইরের" প্রকাশ। দেশপ্রেমের আদর্শ আর আদর্শ দেশ-প্রেমিকের একটি নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে গোরার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে। কবির স্বাদেশিকতার একটা সঠিক পরিচয় পাওয়ার পক্ষে এই গ্রন্থ দু'খানা অপরিহার্য। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক লেখাটি ১৯০৭ সালে রচিত। এটি হচ্ছে কবির গ্রামসেবা উদ্যোগের ভূমিকাস্বরূপ।

"দেশের যুবকদের প্রতি আমার একটিমাত্র পরামর্শ আছে। সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিওনা। অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিওনা।......যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎ সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে।......তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।" একটি সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরলেন দেশের যুবকদের জন্য।—"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। উত্তেজনা নয়, বিরোধ নয়, কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃত তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া, সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

কবির এই কথাগুলি যেন আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা। দেশময় যে অর্থনৈতিক সংগঠন প্রচেষ্টা চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপরিচালক, সমাজনেতা ও কর্মী—এই কথাগুলি থেকে একটা বড় উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। আজ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সমষ্টি-উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপক দেশগঠন উদ্যোগের পটভূমিতে যে মনোভাব বিশেষভাবে প্রকটিত, তাকে মোটামুটি দু'ভাগে বিশ্লেষণ করা চলে। প্রথমতঃ হচ্ছে একটা আত্মশ্লাঘার ভাব এবং আত্মপ্রচারের ধুম। নানা প্রচার-মাধ্যমের মারফৎ দেশে কৃষি শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদির পরি-সংখ্যান প্রগতির একটা বিস্ময়কর চিত্র প্রতিদিন আমাদের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস চলেছে। আমরা অনবরতই শুনতে পাই, কত লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হয়েছে, কত হাজার মাইল রাস্তা নির্মিত হয়েছে, বা

কত কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছে। ভারত অমুক অমুক দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নতি সাধন করেছে ইত্যাদি। আর এ-সবের সাক্ষী হচ্ছে অনেক বিদেশী স্তাবক।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই এসব সত্য। কিন্তু শ্রোতা জনসাধারণের মনে এই একঘেয়ে একটানা প্রচার কি প্রতিক্রিয়া করছে—সেটা বিচার করে দেখা দরকার। অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ অতশত পরিসংখ্যানের মহিমা বুঝতে পারে কি? স্বল্পে তুষ্ট ভারতীয় জনসাধারণ চায়—পেটের ভাত আর পরণের কাপড়। যতদিন তাদের এই মৌলিক চাহিদা না মিটছে, ততদিন তারা এই পরিসংখ্যান-প্রগতির গুরুত্ব বুঝতে পারবে কি? একদিকে আত্মপ্রচারের ঢাকঢোল, আর অন্যদিকে সংকল্পের অভাব ও বিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতা। যে সংকল্প, প্রতিজ্ঞা আর আত্মপ্রত্যয় মানুষকে অসাধ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করে, আজ দেশগঠনের মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপনে জনসাধারণের মধ্যে সে মনোভাব খুব লক্ষিত হয় কি। প্রচার-দম্ভ পরিত্যাজ্য। নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের পরিবর্তে চাই স্বীয় দোষ ত্রুটি-সচেতন বিনম্রতা।

"কিসের এত অহংকার দম্ভ নাহি সাজে,
বরং থাক মৌন হয়ে সসঙ্কোচে লাজে।"

যতদিন ভারতের কোটি কোটি মানুষ অনশনে অর্ধাশনে ও অজ্ঞতায় পশুপ্রায় জীবন যাপন করছে, ততদিন এই সঙ্কোচ ও বিনম্রতা যেন আমাদের সব কিছু প্রচেষ্টাকে আত্মদম্ভের কালিমায় লিপ্ত না করে। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান ও বিনম্রতা—দুর্বলতা বা প্রত্যয়হীনতার নামান্তর নয়। সত্যকে অবিচল নিষ্ঠায় গ্রহণ, এবং সেই অভীষ্টকে অর্জনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস। দেশ-কল্যাণ আমাদের সেই সত্য, সেই অভীষ্ট। অবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয়ের অভাব মূঢ়তা মাত্র।

যিনি নানা কণ্ঠে কন্‌ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়;"

* * *

ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

রবীন্দ্রনাথ যেদিন উত্তেজনাময় রাজনীতির প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ হতে সরে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন হয়তো ভ্রান্তদেশবাসীর ধিক্কারে তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক দেশপ্রেমের পথ যে তাঁর পথ নয়, এ-কথার স্বীকারোক্তি তাঁর নিজের লেখাতেই আছে।

"বিদায় দেহ, ক্ষম আমায় ভাই!
কাজের পথে আমি তো আর নাই।"

* * *

"নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে
পাবনা কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।"

নিজের ত্রুটি স্বীকারের সঙ্গে মেশান আছে খানিকটা অভিমান। অভিমানক্ষুব্ধ কবি কিন্তু নিরাপদ নিষ্ক্রিয়তার পথে গেলেন না। আধুনিককালের অন্যতম মনীষী-সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের মধ্যে এক মানবপ্রেমিক সমাজদরদী কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। শোষণহীন সমাজ আর বিখ্যাত Phoenix School-এর আদর্শ টলস্টয়ের জীবনদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবির জীবনেও অনুরূপ কর্মকাণ্ড অনুসৃত হতে দেখি। কবির কর্ম-মানসের মূল সূত্রটি বিধৃত রয়েছে—"এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতায়।

* * * ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।

রবীন্দ্রনাথের লোকহিতৈষণা সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক এবং জাতীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে একটা বিশ্বজনহিতৈষণায় উন্নীত হয়েছে। বিশ্বজনের বেদনাবোধ, এবং আর্ত, লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত মানুষ—যে-যেখানেই থাকুক—সবার প্রতি মমত্ববোধ কবির কর্ম-মানসের মূল উৎস।

কবি নিজেকে তাঁর নিজ-সৃষ্ট শ্রীনিকেতনের কাজে নিযুক্ত করলেন, বাংলার অবহেলিত, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য নিপীড়িত, মৃতপ্রায় গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে আজকের দিনের কম্যুনিটি ডেভেলপ্‌মেন্ট প্রজেক্টের (Community Development Project) অনেকখানি আদর্শগত সাদৃশ্য দেখা যায়। গাঁয়ের উন্নতি বলতেই গাঁয়ের মানুষগুলির উন্নতি—তাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ, আত্মনির্ভরশীলতা আর সমষ্টিগত উদ্যোগ—উভয় ক্ষেত্রেই এ-হচ্ছে গোড়ার কথা। শিক্ষা ভিন্ন দেশবাসীর সুপ্তচৈতন্যকে জাগান অসম্ভব। তাই লোকশিক্ষাকে কর্মীকবি তাঁর দেশগঠন প্রোগ্রামে এত উচ্চস্থান দিয়েছেন। শিক্ষা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয়ের জন্য নয়। শিক্ষা হবে সর্বজনীন। শিক্ষা-ভিত্তিক পল্লীসংগঠনের প্রবর্তক বলা যায় রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী

আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে, সেজন্য গত একবৎসরকাল ধরিয়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং আরও একবৎসরকাল এ উৎসব চলিবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ভারতের নানা সহরে যাইয়া উৎসবের উদ্বোধন করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বোলপুর শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং শ্রীনেহরু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য পদে (চ্যান্সেলার) অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বভারতীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। আগামী ২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান—৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর (জোড়া-সাঁকো) লেনস্থ তাঁহার পৈতৃক বাসগৃহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে ক্রয় করিয়া তথায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং শ্রীনেহরু ঐ সময় কলিকাতায় আসিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিবেন। ঐ স্থানে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইবে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বহু সহরে এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নামে পাবলিক হল, সাধারণ পাঠাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি খোলার আয়োজন চলিতেছে। সকলেই জানেন, এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৭৫৲ টাকা মূল্যে ১২ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রায় ৫০ হাজার লোক ইতিমধ্যে সেজন্য অর্থ জমা দিয়াছেন—২৫শে বৈশাখ ২খণ্ড নূতন রবীন্দ্ররচনাবলী ক্রেতাদিগকে প্রদান করা হইবে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু এ সকল বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৬৫ বৎসর ধরিয়া তাঁহার রচনা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া সারা বিশ্ববাসী, তথা ভারতবাসী ও বিশেষ করিয়া বঙ্গবাসীকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, এই উৎসব উপলক্ষে দেশবাসী যদি তাহা স্মরণ ও আলোচনা করে, তবেই দেশ সত্য সত্য উপকৃত হইবে। তিনি তাঁহার কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া শুধু ভারতের বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতির প্রচার করেন নাই, ভারতের চিরন্তন সত্য—উপনিষদের বাণী অতি সহজ, সরল ও সুবোধ্য ভাষায় সকলের জন্য ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। আজ সমগ্র পৃথিবী অধর্ম ও দুর্নীতিতে কলুষিত হইয়াছে, সেজন্য মানুষের দুঃখদুর্দ্দশার সীমা নাই—তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? আমরা যদি শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নূতন করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনা অন্তরের সহিত পাঠ করি, তাহার অর্থ যদি গ্রহণ করিতে সমর্থ হই, যদি

ভারতের সনাতন জীবনযাত্রা পদ্ধতির কথা চিন্তা করিয়া শাশ্বত আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলেই সর্বত্র, রবীন্দ্র শতজন্মবার্ষিক উৎসব করা সার্থক হইবে এবং আমরা সত্যই উপকৃত হইয়া সকল অনিষ্টের আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। আজ দেশবাসী সকলে উৎসব পালনের সময় যেন এই কথাটি মনে রাখি—আমরা যাহাই মনে করি না কেন, বক্তৃতা পাঠ, আবৃত্তি, নৃত্য, গীত, নাটকাভিনয়—আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে তাহার মধ্য দিয়া আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা—জীবনের সকল অসত্যকে বর্জন করিয়া, সত্য, শিব ও সুন্দরকে পূর্ণভাবে জীবনে লাভ করা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি দিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই আমাদের মনে এই বাসনা ও কামনা জাগ্রত হইবে এবং ঈপ্সিত লাভের জন্য চেষ্টা করিতে শক্তি ও বুদ্ধিদান করিবে। আসুন আমরা সকলে আজ এই শুভদিনে সেই মহাপুরুষ, মহাকবি, মহামানব রবীন্দ্রনাথের শ্রীচরণের উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম জানাইয়া আমরা তাঁহার আত্মার নিকট এই প্রার্থনা জানাই—তাঁহার রচনাবলীর সহিত তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইয়া আমাদের জীবনপথ সুন্দরও মঙ্গলময় করিয়া তুলুক—রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিক উৎসব দিবসে যেন সকলের মনে এই চিন্তা এ প্রার্থনাই সর্বতোভাবে উদিত হয়।

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৭ই এপ্রিল শুক্রবার হইতে তিন দিন কলিকাতায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্বিংশ প্রাদেশিক সম্মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালিত হইয়াছে। শুক্রবার সকাল ৮টায় কবিগুরু ভবনে (জোড়াসাঁকো) সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণ বারান্দা সংলগ্ন দ্বিতলস্থ বৈঠকখানা ঘরে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও কবিগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। উৎসবে ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েক শত সুধীব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও মূল সভাপতিরূপে বিশ্ববিশ্রুত কোবিদ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ঐ দিন সঙ্গীতনৃত্যনাট্য একাডেমীর অধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের সহিত সভার উদ্বোধন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের (শনিবার বিকাল ৫টার) সভার ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিবার সকালের সভায় ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও রবিবার বিকালে কবি-সম্মিলনে শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ সকল সভায় শ্রীমনোজ বসু, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ফাদার পি-ফ্যালো, শ্রীগজেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী, ডক্টর শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর রথীন রায়, ডক্টর অজিত ঘোষ, শ্রীঅখিল নিয়োগী, শিল্পী শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপধ্যায়, শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ, শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীরণজিৎ সেন, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষণ দেন। শনিবার সন্ধ্যায় ইনিষ্টিটিউট গ্রুপ কর্তৃক কাবুলিওয়ালা অভিনয় হয় এবং রবিবার সন্ধ্যায় ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী লিখিত সংস্কৃত নাটক ভারতভাস্করমের কতকগুলি সংস্কৃত সংগীত গীত হয়। তাহা ছাড়া প্রতি সভাতেই শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা সেন, অধ্যাপিকা রেখাচন্দ্র, অধ্যাপিকা মায়া সেন শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সম্মিলনকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

কবি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সংহতি-সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে প্রভৃতির চেষ্টায় বহুদিন পরে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন পুনর্জীবিত হইয়া এক বৎসর কাল যেভাবে রবীন্দ্র রচনা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন, সে জন্য উদ্যোক্তারা সকলেই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষ করিয়া এই তিন দিন ব্যাপী সম্মিলনে বহু মনীষীর সমাগম ও মনোজ্ঞ ভাষণের ফলে কয় দিনে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করায় শ্রোতারা সত্যই উপকৃত হইয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের এই শুভ প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্র-পুরস্কার—

শততম রবীন্দ্র-জয়ন্তী বৎসরে রবীন্দ্র-পুরস্কার সমিতি মহাভারত সম্পাদনের জন্য পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে ও সঙ্গীত সম্পর্কে একখানি ইংরাজি গ্রন্থ লেখার জন্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবৎসর বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই—মোট ৩২ খানি বই কমিটির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাভারত অনুবাদ, সম্পাদন ও প্রকাশ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামীজিও সঙ্গীত জগতে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্র। তাঁহাদের পুরস্কার দিয়া যোগ্যতার সমাদর করা হইল।

দণ্ডকারণ্য সমস্যা—

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ঘরে রাজ্য সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দ এবং দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেনের মধ্যে এক বৈঠক হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা যদি অধিক সংখ্যায় দণ্ডকারণ্যে যাইতে না সুরু করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে দণ্ডকারণ্য পশ্চিমবঙ্গের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। কেরল, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য দণ্ডকারণ্যে উদ্বৃত্ত অধিবাসী প্রেরণে উৎসুক হইয়াছে। এঅবস্থায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু না যাইলে কেন্দ্রীয় সরকার তথায় প্রস্তুত-জমিতে অন্য রাজ্যের লোক আনিয়া বসাইতে বাধ্য হইবেন। এক শ্রেণীর বিরোধী নেতাদের কথা শুনিয়া শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য যাইতে ভয় পাইতেছে। সে ভয় সম্পূর্ণ মিথ্যা—এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার করা দরকার। অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী যাইলে দণ্ডকারণ্য বাঙ্গালী-উপনিবেশে পরিণত হইবে—তথায় বাঙ্গালীর বসবাসের কোন অসুবিধা হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন—

পশ্চিমবঙ্গে সকল শ্রেণীর শিক্ষক, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার একটি বেতন কমিশন গঠন করিবেন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই সংবাদ ঘোষণার সহিত জানাইয়াছেন—বর্দ্ধিত বেতন না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক মাসিক ৮ টাকা অধিক বেতন পাইবেন। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক আছে—সহরাঞ্চলে (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল এলাকায়) সত্বর ঐ ব্যবস্থা চালু করা হইবে। মাসিক বেতন পাইতে বিলম্ব হয় বলিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল, তৃতীয় ব্যবস্থায় তদপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয়ের কথা আছে। মোটের উপর ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে। শিক্ষিতের হার না বাড়িলে দেশের অন্যবিধ উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রী—

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ অসুস্থ হইয়া পড়ায় ঐ বিভাগের কাজ করিবার জন্য মেদিনীপুর হইতে নির্বাচিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য এম-এল-একে ২০শে মার্চ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বয়সে তরুণ হইলেও সুপণ্ডিত লোক। ঐ দিন উপমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে এম-এল-এ'কেও রাষ্ট্রমন্ত্রী পদে উন্নীত করা হইয়াছে। শ্রীকোলে প্রচার ও পরিষদ বিভাগের কাজ করিবেন। তিনিও বয়সে তরুণ। তাঁহাদের দ্বারা স্ব স্ব বিভাগের কার্য্যধারা সংশোধিত ও সুপরিচালিত হইলেই দেশের লোকের কল্যাণ হইবে।

হলদিয়ায় নূতন বন্দর—

গত ২২শে মার্চ নয়াদিল্লীতে লোক সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে তৃতীয় পাঁচশালা ব্যবস্থায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিয়ায় একটি নূতন বন্দর নির্মাণ করা হইবে। খড়্গপুর হইতে হলদিয়া পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে—রেল বাজেটে সে জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা—এই ভাবে এক একটি সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা হইলে বাঙ্গালীর দুঃখদুর্দ্দশা কমিয়া যাইবে।

কলিকাতা—দুর্গাপুর নূতন রাস্তা—

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গাড়ীর ভিড় কমাইবার জন্য কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর—একটি নূতন পথ নির্মিত হইতেছে।

কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত জমীর জরিপ শেষ হইয়াছে, সে জন্য ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়। আপাততঃ বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত পথ তৈয়ার হইলে পরে বৰ্দ্ধমান—দুর্গাপুর পথের কাজে হাত দেওয়া হইবে। কলিকাতা—বৰ্দ্ধমান জি—টি রোডে সর্বাধিক মোটর দুর্ঘটনা হয়—সে জন্য নূতন পথটি সত্বর নির্মাণ করা প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত কণ্ট্রোলার—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীঅরুণচন্দ্র রায় এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীপুরের (খুলনা) বিখ্যাত



শ্রী অরুণচন্দ্র রায়

রায় বংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনের আরম্ভ হইতে সর্বস্তরের পরীক্ষায় ইনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বৃত্তি ও বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি, এস, সি, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে (অনার্স) প্রথমশ্রেণীতে ও এম, এস, সি, পরীক্ষায় ফিজিক্সে (পদার্থ বিদ্যায়) প্রথমশ্রেণীতে বিশেষ সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হন। আই, এ, এস, পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করিয়া ডাক ও তারের বিভাগীয় অধিকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫১ সালে সরকারের কাজ ছাড়িয়া দিয়া পরীক্ষা সমূহের এসিস্ট্যান্ট কণ্ট্রোলার রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বর্ত্তমানে কণ্ট্রোলার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা—

৩রা এপ্রিল হইতে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে বাৎসরিক স্কুল-ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এবার মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৭৪৩—তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৯১ জন স্কুল-ফাইনাল ও ১৭ হাজার ৩৫২ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। স্কুল-ফাইনালে প্রাইভেটের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৪৬০—তন্মধ্যে ১৭ হাজার ৮৮ ছাত্রী। নিয়মিত পরীক্ষার্থী ছাত্রী স্কুল ফাইনালে ২৬৪১৪ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্রী ৩০৩০। শুধু কলিকাতা সহরে ৪১৭৪১ জন পরীক্ষা দিবে, তন্মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা—২৩৭৭৯। এই সকল ছাত্রছাত্রীর জীবিকার্জনের উপায় সম্বন্ধে এখন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সমস্যা হইয়াছে। প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস, তিন—বৎসরের ডিগ্রী ক্লাস, মেডিকেল ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সংখ্যা এখনও এত কম যে বহু ছাত্রই উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় না। তাহার উপর যাহারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিবে, তাহাদের ত কোন আশাভরসাই নাই।





মতান্তরে নষ্টকুষ্ঠির সন মাস লগ্ন নিরূপণ ইত্যাদি

উপাধ্যায়

প্রশ্ন লগ্নকে ৬০ দিয়ে ভাগ করে যে অংশের মধ্যে প্রশ্ন হয়েছে ঠিক তত দণ্ডের সময় প্রশ্নকর্তার জন্ম। প্রশ্নকর্তার জন্মমাস, রাশি থেকে জন্মরাশি যত অন্তরে আছে স্থির করবে তাতে যে ফল হবে তাকে ৫ দিয়ে পূরণ করে ২ বাদ দেবে, অবশিষ্ট যা থাকবে তত দণ্ডের সময় জাতকের জন্ম হয়েছে।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি বর্ণ থাকবে তাকে ৪ দিয়ে গুণ করবে আর গুণফলের সঙ্গে ৩ যোগ করলে যোগফল যা হবে তাই ধ্রুবাঙ্ক। ধ্রুবাঙ্ককে ৩২ দ্বারা গুণ করলে শকাব্দা, ৮ দ্বারা গুণ করলে মাস, ১০ দিয়ে গুণ করলে পক্ষ, ১২ দিয়ে গুণ করলে তিথি, ২০ দিয়ে গুণ করলে রাশি আর ১৫ দিয়ে গুণ করলে বার নিরূপণ হবে।

মাস জানতে হোলে ধ্রুবাঙ্ককে ৮ দিয়ে গুণ করে ১২ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হবে তাই বৈশাখাদি মাস জানবে অর্থাৎ ১ বৈশাখ, ২ জ্যৈষ্ঠ, ৩ আষাঢ় ইত্যাদি।

পক্ষ জানতে হলে ধ্রুবাঙ্ককে ১০ দিয়ে গুণ করে গুণফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলে পক্ষ জানা যাবে। তিথি জানতে হোলে ধ্রুবাঙ্ককে ১২ দিয়ে গুণ করে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগাবশিষ্ট তিথি জানবে।

রাশি লগ্ন জানতে হোলে ধ্রুবাঙ্ককে ১৫ দিয়ে গুণ করে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগাবশেষ মেষাদি রাশিলগ্ন জানবে।

বার জানতে হোলে ১৮ দিয়ে গুণ করে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগাবশিষ্ট বার হবে।

রাশি জানতে হোলে ধ্রুবাঙ্ককে ২০ দিনে গুণ করে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগাবশেষ রাশি হবে।

বয়স জানতে হোলে ধ্রুবাঙ্ককে ৩ গুণ করে ২৪ দিয়ে ভাগ করলে বয়স। যুবার বয়স জানতে হোলে ৪৮ দিয়ে আর বালকের বয়স জানতে হোলে ৯২ দিয়ে ধ্রুবাঙ্ককে ভাগ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তার বয়সকে ২ গুণ করে ৫ ভাগ করলে যত ফল হবে বর্তমান বর্ষের শনি থেকে দক্ষিণাবর্ত গণনায় তত রাশি অন্তরে শনি জন্মকালে ছিল বুঝতে হবে।

জন্ম মাস রাশিতে রবি ও জন্ম নক্ষত্র রাশিতে চন্দ্র স্থাপন করবে। বর্ত্তমান বর্ষীয় শনি থেকে বামাবর্তক্রমে জন্মকালীন শনি যত রাশি অন্তরে ছিল তাকে ৫ গুণ করে গুণফলকে ৩ ভাগ করলে যে ভাগফল হবে বর্তমান বর্ষীয় রাহু হোতে তত রাশি অন্তর কেতু থাকবে। কেতুর সপ্তম রাশিতে রাহুর অবস্থান। রবিস্থ রাশিতে কিম্বা তন্নিকটস্থ রাশিতে শুক্র ও ঐরূপ স্থানেই প্রায় বুধকে থাকতে দেখা যায়।

কেতু বর্ত্তমান বর্ষীয় রাহু থেকে দক্ষিণ দিকে যত রাশি অন্তরে থাকবে সেই সংখ্যাকে ৩ দিয়ে গুণ করে ২ ভাগ করলে যে ফল হবে বর্ত্তমান বৃহস্পতি থেকে দক্ষিণাবর্তক্রমে তত রাশি অন্তর বৃহস্পতি জন্মকালে ছিলেন বুঝতে হবে।

যে শকে জন্ম তা থেকে ১ বাদ দাও, তারপর তাকে ২ দিয়ে গুণ করো, ফল যত হবে তাকে জন্মবারের অঙ্ক, নক্ষত্রের অঙ্ক, আর তিথির অঙ্ক একত্র করে গুণ করলে যত হবে সেই সংখ্যাকে ১০৮ দিয়ে ভাগ করলে ভাগাবশিষ্ট যত অঙ্ক থাকবে তত বৎসর আয়ু হবে।

রোগ নির্ণয় ও অন্যান্য অশুভ যোগ

মঙ্গল এবং শনি লগ্নে থাকলে বা দৃষ্টি করলে হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি হয়। চন্দ্র শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী হোলে আর রবি মকরে থাকলে জাতকের হাঁপানি প্রভৃতি অসুখ থেকে শ্বাস কষ্ট হয়।

লগ্নে অবস্থিত রবি মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হোলে শূল বেদনা, যক্ষ্মা ও হাঁপানি হবার যোগ দেখা যায়। শনি ষষ্ঠে থেকে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা শুভগ্রহের সহাবস্থান বর্জ্জিত হয়—আর রবি, মঙ্গল ও রাহুর দ্বারা দৃষ্ট

হয় তা হোলে শ্বাস কাস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হবে। রবি ও চন্দ্র সিংহ বা কর্কটে একত্র থাক্‌লে যক্ষ্মা হয়। দুইটি পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হয়ে চন্দ্র অবস্থান করলে এবং শনি সপ্তম ভাবে থাক্‌লে বিস্ফোটক, প্লীহা ও যক্ষ্মার একত্র সক্রিয়তার জন্য অত্যন্ত শারীরিক কষ্ট ভোগ হবে। রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ শুক্র ও শনি একত্র অবস্থায় থাক্‌লে যক্ষ্মা হয়।

যক্ষ্মা সম্পর্কে বল্‌তে গেলে তিনটি শ্লেষ্মাকারক গ্রহের কথা মনে পড়ে। চন্দ্র শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহই শ্লেষ্মাকারক। এদের সঙ্গে শনি ও মঙ্গলের সম্বন্ধ হোলে ক্ষয়রোগ হবে। শনির ওপর মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি থাক্‌লে আর ঐ মঙ্গল দুঃস্থানের অধিপতি হোলে ক্ষয়রোগ হয়।

কর্কটে চন্দ্র মঙ্গল থাক্‌লে রক্তপিত্ত রোগ হয়। পাপযুক্ত ও দৃষ্ট মঙ্গল সপ্তম স্থানে থাক্‌লে রক্তবমি ঘটে। রবি ও চন্দ্র কর্কটে থাক্‌লে অস্থি ক্ষয় হয়। চন্দ্র দ্বিতীয়ে, ষষ্ঠে, অষ্টমে ও দ্বাদশে থাক্‌লে চক্ষুরোগ হয়। দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ ও রবি বা শুক্র একত্রে অবস্থান করলে চক্ষুরোগ হয়।

অষ্টম স্থান ও মঙ্গল এই দুইয়ের অশুভ যোগে অর্শরোগ হয়, শনি মঙ্গলের যোগেও অর্শের সম্ভাবনা। চতুর্থে, সপ্তমে বা নবমে মঙ্গল থাক্‌লে অর্শরোগ হয়।

মঙ্গল পঞ্চম বা সপ্তম স্থানে বৃহস্পতি ও শনি দ্বাদশে আর চন্দ্র বা চতুর্থাধিপতি পাপযুক্ত বা দৃষ্ট হোলে উন্মাদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বাদশে চন্দ্র দুর্ব্বল হয়ে শনি যুক্ত হোলে মানুষের মস্তিষ্ক বিকার হয়। চন্দ্র শনি ও কেতু যুক্ত হয়ে যে কোন স্থানে, বিশেষ করে লগ্নে থাক্‌লে পাগল হওয়ার সম্ভাবনা। রবি চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনি একত্রে থাক্‌লে মানুষ পাগল হয়।

মঙ্গল লগ্নে থেকে যদি শনি রবি রাহু দ্বারা দৃষ্ট হয় তা হোলে পদচ্ছেদ যোগ হয়। রবির সঙ্গে শনি ও রাহু অবস্থান করলে বংশনাশ যোগ হয়। কর্কটে পাপযুক্ত শনি থাক্‌লে আর শুভগ্রহের দৃষ্টি বর্জ্জিত হোলে খঞ্জ যোগ। মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন হয়ে সেখানে রবি ও শনি পাপ সংযুক্ত অবস্থায় থাক্‌লে কর্ণচ্ছেদ যোগ। লগ্নে মঙ্গল ও রবি পূর্ণদৃষ্টি করলে শুদ্ধ বংশজাত ব্যক্তি হোলেও পাতকী যোগ।

চন্দ্র কর্কটে আর মঙ্গল মকরে থেকে অশুভ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় তা হোলে লিঙ্গচ্ছেদ যোগ। ষষ্ঠে শুক্র আর লগ্নে মঙ্গল থাক্‌লে নাসাচ্ছেদ যোগ।

তিনটী পাপগ্রহ একত্র অবস্থান করলে জাতমানব শূলরোগ গ্রস্ত হয়। বৃহস্পতির গৃহে বুধ আর শনির গৃহে মঙ্গল থাক্‌লে পঁচিশ বৎসর ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মৃত্যু ঘটে।

শুক্র ক্ষেত্রে শনি ও চন্দ্র থাক্‌লে আটাশ বর্ষে অসির আঘাতে মৃত্যু। শনির গৃহে রাহু এবং সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থান কালে কেহ জন্ম গ্রহণ করলে তার শিরশ্ছেদ হয়।

যার জন্মকালে কর্কট রাশিতে শনি আর মকরে মঙ্গল অবস্থান করে সে চৌর্য্যাপরাধে কিম্বা আপনার দুঃসাহসিক বাহুবলজনিত অপরাধে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে আর তার নিশ্চয়ই শিরশ্ছেদ হয়।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে লগ্ন আর রবির ক্ষেত্রে শনি পাপসংযুক্ত অবস্থায় থাক্‌লে ভুজচ্ছেদ যোগ হয়।

যে জাতকের কোষ্ঠীতে কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ থাকে না, সে জারজ এবং যার কোষ্ঠীতে সকল গ্রহই দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারিটী গৃহে অবস্থান করে, সে পরজাত। লগ্নে রাহু ও মঙ্গল এবং সপ্তমে চন্দ্র ও রবি থাক্‌লে জাতকের মাতা মহারাণী হোলেও সে নীচ জাতির ঔরসে জাত। লগ্নে চন্দ্র ও দ্বিতীয়স্থানে মঙ্গল ও শুক্র অবস্থান করলে জাতকের জারজত্ব সূচিত হয়। যদি লগ্নে পাপগ্রহ, সপ্তমে শুভগ্রহ এবং দশমস্থানে শনি থাকে তা হোলে জাতক বর্ণশঙ্কর (পিতা এক জাতি ও মাতা অপর জাতি)। লগ্নে রবি ও চতুর্থে রাহু অবস্থান কালে জন্ম হোলে পিতৃব্যের ঔরসে জন্ম। লগ্নাধিপতি লগ্নে থাক্‌লে সমস্ত জারজ যোগ ভঙ্গ হয়ে থাকে।

***

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। ভরণীর পক্ষে উৎকৃষ্ট এবং কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম।

উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ, কর্ম্মে সাফল্য, সুখস্বচ্ছন্দতা, বিলাসব্যসন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য, বিদ্যার্জ্জনে ও পরীক্ষায় সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভ ঘটনার সমাবেশ হবে। অপবাদ, সম্মানহানি, অর্থক্ষতি, স্বাস্থ্য ও পদ মর্য্যাদার হানি, কলহ, অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, সম্পত্তির বিপত্তি, শত্রুপীড়া, স্বজনকর্ত্তৃক নির্য্যাতন ভোগ, মতলববাজ ব্যক্তিদের কু-পরামর্শে কার্য্য করা হেতু নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্টভোগ, বন্ধুদের দ্বারা প্রতারণা উদ্বিগ্নতা, কর্ম্মে বাধা, ভ্রমণ কষ্ট, প্রভৃতি অশুভ ফলের সমাবেশ দেখা যায়। ব্যাধিগ্রস্তব্যক্তিরা অজীর্ণ, গুহ্যদেশে পীড়া, আমাশয়, অর্শ প্রভৃতি ভোগ করবে, মাসের শেষার্দ্ধে রক্তের চাপবৃদ্ধি, স্বজন বন্ধু বিরোধ, পারিবারিক অশান্তি, সন্তানগণের পাড়া প্রভৃতি সূচিত হয়। আর্থিক অনাটন বা অস্বচ্ছন্দতা ভোগ। প্রতারণা, কুপরামর্শ, পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থক্ষতি ঘটবে, এর কথঞ্চিৎ উপশম হোতে পারে চতুরতা, লাভ আর অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ প্রাপ্তির আনুকূল্যে। অর্থ এলেও সঞ্চয়ের আশা কম। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে কিঞ্চিৎলাভ। নানাপ্রকারে বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীরা অসুবিধা ও কষ্টভোগ করবে। জমিতে ফসল ও বাড়ীভাড়া আদায়ের বিষয়ে কিছু কষ্টভোগ। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্যে ফসলের ক্ষতি, তাছাড়া অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশ বশতঃ ক্ষতি। জমির ব্যাপারে গোলযোগ ও দুর্ঘটনার ভয়। মামলা মোকর্দ্দমা, মারপিট, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোল। চিত্তের সমতা ও ধৈর্য্য থাকলে

অশুভ ফলের হ্রাস হবে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ নয়। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন, কর্ম্মবিপত্তি প্রভৃতি আশঙ্কা আছে। বৃত্তি-জীবী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে ও মাসটা ভালো বলা যায় না। মহিলাদের পক্ষে কিছুটা শুভ। বিলাসব্যসন ও অলঙ্কারাদির ব্যাপারে ব্যয় করবার ঝোঁক আসবে। অবৈধ প্রণয় ও রোমাণ্টিক ব্যাপারের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা! পরপুরুষের সংস্রবে আসা বাঞ্ছনীয় নয়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

বৃষ রাশি

রোহিনীজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ফল, কৃত্তিকা ও মৃগশিরার পক্ষে মধ্যম। কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য ও লাভ। সুখ ও সৌভাগ্য, নূতন পদ মর্য্যাদা ও লাভ, শত্রুজয়, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আয়বৃদ্ধি, বন্ধুলাভ, বিলাসিতা, আনন্দসম্ভোগ প্রভৃতি শুভ ফল। ব্যয়বৃদ্ধি, শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাধাপ্রদান, ক্ষতি, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, অপবাদ দুঃখ শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা। শুভফলের আধিক্য হোলেও মাসটী মিশ্রফলদাতা। মাসের অধিকাংশ সময়ে স্বাস্থ্য ভালো যাবে, তবে মধ্যে মধ্যে বায়ুপিত্ত প্রকোপ ঘটবে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলতা এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিলক্ষিত হয়। গৃহে শিশুর জন্ম লাভ। বন্ধু ও আত্মীয় সমাগম, বনভোজন ও ভ্রমণ, নানা প্রকার আমোদ উৎসবে দিন অতিবাহিত হবে। আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হোলেও ব্যয়াধিক্য। সওদাগরী অফিসের কাজে ব্যবসা বাণিজ্যে এজেন্সি ও কমিশন ব্যাপারে সুবিধা সুযোগ। স্পেকুলেশনে ক্ষতি, শেষার্দ্ধে স্পেকুলেশনে কিছু লাভ হোতে পারে। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে অশুভ নয়। চাকুরি-জীবীর পক্ষে উত্তম। পদোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি, প্রশংসালাভ, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ। অপরের জন্য সুপারিস করলেও সাফল্যলাভ। বৃত্তি-জীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম, কর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রমণেও এরা লাভবান হবে। গবেষণাকারীরাও সাফল্যলাভ করবে। কোর্টসিপ, অবৈধ প্রণয়, পূর্ব্বরাগ ও বিবাহের যোগাযোগে স্ত্রীলোকেরা প্রচুর আনন্দ ও সুখ সম্ভোগ করবে। প্রণয়ীর প্রগাঢ় প্রেম এবং বন্ধুত্ব প্রত্যক্ষ করে আসক্তি ঘনীভূত হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সুখশান্তি লাভ। কোনরূপ দুঃসাহসিকতার মাধ্যমে কোন কিছু অঘটন ঘটলেও ভাগ্যের আনুকুল্যে তা চাপা পড়ে যাবে লোকচক্ষুর অগোচরে। উত্তম বন্ধুলাভ, অর্থ উপঢৌকন ও অলঙ্কার লাভ নৃত্যসঙ্গীতোৎসবে আনন্দ, পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণে পুরুষের সহৃদয় আনুকুল্য লাভ ও অবাধ বিহারজনিত চিত্তের প্রফুল্লতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উত্তম।

মিথুন রাশি

আর্দ্রানক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মৃগশিরা ও পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে উত্তম। মাসটী মিশ্রফল দাতা হোলেও অশুভ সম্ভাবনার যোগ বেশী পরিমাণে আছে। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম প্রচেষ্টায় বাধা বিপত্তি ও বিলম্ব। ভ্রমণ কষ্ট ও স্বাস্থ্যহানি। অকারণ কলহ বিবাদ ও মনোমালিন্য। ভ্রমণকালে ক্ষতি ও দুর্ঘটনা। দলকেন্দ্রিকতার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা, লাভ, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি ও ভোগ, রথী মহারথীদের সঙ্গে সৌখ্য সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ও তজ্জন্য মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হওয়ার যোগ, সুখসম্ভোগ, খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সৌভাগ্য ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির যোগ। উদর পীড়া, রক্তদুষ্টি, পিত্ত ও উত্তাপবৃদ্ধিজনিত কষ্ট। শ্লেষ্মা ও বাতপ্রকোপ। পারিবারিকক্ষেত্রে স্বজন ও ভৃত্যবর্গের আচরণে বিক্ষোভ ও অশান্তি। আর্থিক অবস্থা এ মাসে আশাপ্রদ নয়। কোন প্রকারে আর্থিক উন্নতি হবার বা ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নেই। অর্থক্ষতি, প্রতিকূল মামলামোকর্দ্দমা, ব্যয়াধিক্য, প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গতাজনিত ক্ষতি। অর্থ লগ্নী করার প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা নেই। রেস খেলায় হার। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। মামলা মোকর্দ্দমা বর্জ্জনীয়। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী কষ্টপ্রদ নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে কোন প্রকার উন্নতি বা বিস্তৃতির যোগ নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দুর্ভোগ। নিজেদের হঠকারিতা, উগ্রম জোজ এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক ও ক্রোধ প্রবণ আচরণ জনিত পরিণতি শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে। রন্ধনশালায় গ্যাসইলেকট্রিক প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। প্রণয় সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। কোর্টসিপ ও অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী অশুভ।

কর্কট রাশি

অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং পুষ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। উত্তম ও পসার প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহযোগ ও আনুকূল্য লাভ, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, সাফল্য আশা-আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধি, শত্রুজয়, সৌভাগ্য, সুখ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও ব্যুৎপত্তি লাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি শুভ সম্ভাবনা। বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কলহ, পদমর্য্যাদা হানি, স্বজন বিচ্ছেদ, কলহ, ক্ষতি, প্রচেষ্টায় অসাফল্য, স্বাস্থ্যহানি, ভ্রমণ কষ্টও ক্লান্তি প্রভৃতি অশুভ সম্ভাবনা। সাধারণ দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষ পীড়ার যোগ নেই। দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তির ভয়। রক্তপাত, দূষিত ক্ষত ও তজ্জনিত নানাপ্রকার জটিল উপসর্গ। পারি-বারিক গোলযোগের আশঙ্কা নেই। আর্থিক ক্ষতি, অর্থের জন্যে শত্রুতা, ব্যয়বৃদ্ধি, শেষার্দ্ধে কিঞ্চিৎ লাভ। ভারতের বহির্বাণিজ্যে ব্যব-সায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, গ্রন্থ প্রকাশক এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষকরা কিছু লাভবান হবে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। রেসখেলায় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি অশুভ। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটি শুভ। প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে পরীক্ষাও সাক্ষাৎ লাভে সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে উত্তম, গভর্ণ-মেণ্ট কণ্ট্রাকটারদের পক্ষে উত্তম সুযোগ। স্ত্রীলোকেরা সে সব বিষয়ে বেশী আগ্রহলাভ সেসব বিষয়ে মিশ্রফল লাভ। মানসিক উত্তেজনা, স্পষ্টবক্তৃত্ব, বদমেজাজ ও কলহ প্রবণতার জন্য ঘরে বাইরে অশান্তি সৃষ্টি

হবে। অবৈধ প্রণয়ে প্রমত্ত নারীর পক্ষে বিপত্তির কারণ আছে। পূর্ব্বরাগ প্রণয় ভঙ্গে পরিণত হবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, ক্ষতি ও দুর্ভোগের আশঙ্কা। অধ্যয়নানুরক্তা নারী নূতন বিষয়ে পাঠরত হোলে জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া লাভ করবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি উত্তম।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তরফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম এবং মঘাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। এ মাসটি মিশ্রফলদাতা। সুনাম, সৌভাগ্য, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, অনুকূল সামাজিক কর্ম্মসম্পাদন, নূতন বন্ধুলাভ, শত্রুজয়, প্রতিযোগিতায় সাফল্য, উত্তম স্বাস্থ্য। গ্রহদের বিরুদ্ধতা হেতু মনস্তাপ, কর্ম্মে বাধা, কলহ বিবাদ, ক্লান্তিপ্রদ ভ্রমণ; মিথ্যা অপবাদ, ক্ষতি, অস্বচ্ছন্দতা, স্ত্রীলোকের নিকট নির্য্যাতন ভোগ, অসম্মান, পদমর্য্যাদা হানি, দুষ্ট সংসর্গ এবং অপরিমিত ব্যয়াধিক্য। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ও পিত্তপ্রকোপ চক্ষুপীড়া ইত্যাদি অসতর্কতাহেতু ঘটতে পারে। পারিবারিক অশান্তি, ঘরে বাইরে স্বজনবর্গের অপ্রীতিকর আচরণ ও তজ্জনিত কষ্টভোগ, নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা ভালোই যাবে। প্রকাশক, বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যকারী, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী প্রভৃতি লাভবান হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারীও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ, শেষার্দ্ধে আশানুরূপ পরিস্থিতি দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ শুভ নয়। অনেকের পক্ষে মাসটী রোমান্স, কোর্টসিপ, পূর্ব্বরাগ ও অবৈধ প্রণয়ের আবেষ্টনী সৃষ্টি করবে। বেশী বয়স্কেরা সামাজিক কার্য্যে উদ্দীপনা অনুভব করবে। নতুন ও অসাধারণভাবে বন্ধুত্ব ঘনীভূত হবে। পরপুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা বর্জ্জনীয়। রেসে অর্থপ্রাপ্তি। বিদ্যার্থীও পরিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

কন্যা রাশি

হস্তাজাতগণের পক্ষে উত্তম, চিত্রাজাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। প্রচেষ্টায় সাফল্য, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি, সুখ ও সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, প্রতিপত্তিশালীও ধনী ব্যক্তির সাহচর্য্যে লাভ, শত্রুজয়, বিলাসব্যসন দ্রব্য ও অলঙ্কারাদি ক্রয়, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন এবং জ্ঞানবৃদ্ধি। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, মানসিক দুর্ব্বলতা, উদ্বিগ্নতা, কর্ম্মে বাধা, কলহবিবাদাদিরও সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্য মোটামুটি। হজমের দোষ, গুহ্য প্রদেশে পীড়া ও রক্তের চাপবৃদ্ধি হোতে পারে। সন্তানাদির পীড়া। পারিবারিক কলহ। শেষার্দ্ধেই আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা বেশী। নানাভাবে লাভের যোগ। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসখেলায় জয়লাভ। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারি ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম কিন্তু টাকা লগ্নীর ব্যাপারে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটি অনুকূল হয়, উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি মোটামুটি ভালো যাবে, কর্ম্মের বৃদ্ধি বিস্তারের যোগ নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অবিবাহিতা নারীর বিবাহের যোগ। অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য। অর্থ ও অলঙ্কার লাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতি-পত্তি। যে সব স্ত্রীলোক অফিসে চাকুরি করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ উপরওয়ালার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হোতে পারে বা রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যে পূর্ব্বরাগের পথে অগ্রসর হোতে পারে। পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ প্রভৃতি অত্যন্ত লাভজনক হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা রাশি

চিত্রা ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে শুভ, স্বাতীজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। ভ্রমণে ক্লান্তি ও অবসাদ, স্বাস্থ্যের অবনতি, কলহবিবাদ, সর্ব্বপ্রকার মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, দুর্ঘটনা, অসম্মান, প্রচেষ্টায় বাধা প্রাপ্তি, মিথ্যা অপবাদ, দুর্জ্জনের সংসর্গে ক্ষতি প্রভৃতি যোগ আছে। শত্রুজয়, সুখ, মানসিক শান্তি, উত্তম, স্বাস্থ্য, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি শুভ ফলের সম্ভাবনা আছে। অজীর্ণতা, গুহ্যদেশে পীড়া, অর্শ, আমাশয় প্রভৃতির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার ভয় আছে। দাহ্য পদার্থ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি থেকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্ত্রী ও সন্তানাদির সঙ্গে কলহবিবাদ এজন্য পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা ভালো যাবে না। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে হার। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটী শুভ নয়, নানা প্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটবে, ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। গৃহ নির্ম্মাণ বা সংস্কার ক্ষতিজনক হয়ে উঠবে। চাকুরি-জীবিদের পক্ষে মাসটি উত্তম, কিন্তু প্রথমার্দ্ধে কিঞ্চিৎ অশুভযোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না, নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্র ফলদাতা। কোনপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া বিপত্তির কারণ হবে। পারিবারিক কর্ম্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখাই ভালো। ভ্রমণ, পিকনিক, সামাজিক উৎসবে যোগদান অনুচিত। পরপুরুষের সংস্রব বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম, বিশাখার পক্ষে মধ্যম এবং অনুরাধা নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফল দাতা। মাসের প্রথমার্দ্ধটী শুভ ব্যঞ্জক নয়, শেষার্দ্ধটী আশাপ্রদ। প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের নিকট আঘাত প্রাপ্তি, দুঃখও উদ্বিগ্নতা, পীড়াদি কষ্ট, দুর্ঘটনা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, প্রলোভনে বিপত্তি, অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন, পদমর্য্যাদাহানি, মামলা মোকর্দ্দমা, ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ ফল। সম্মান ও সুখসমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, শুভ ঘটনা, বন্ধুর সাহায্য প্রাপ্তি, প্রভৃতি শুভ ফল শেষার্দ্ধে আশাকরা যায়। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি, দুর্ঘটনা আঘাত প্রাপ্তি, আঘাতহেতু

রক্তপাত ও দূষিতক্ষতের সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাকবে মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্য বা কলহের সূত্রপাত হওয়া স্বত্বেও। মাসের প্রথম দিকে অর্থকৃচ্ছ্রতা চিন্তার কারণ হবে, ব্যয়াধিক্য ও সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় বাধার জন্য মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ভোগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। মাসের শেষার্দ্ধে রেসখেলায় জয়লাভ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে গোল-যোগের সৃষ্টি হোতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়। চাকুরিজীবীরা ও এমাসে নানা প্রকার অশুভ পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়বে। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার যোগ আছে। পদমর্য্যাদা ও সম্মানহানি, চারিত্রিক দোষ প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রতিকূল নয়। অবৈধ প্রেম, পূর্ব্বরাগ, রোমাণ্টিক আবহাওয়া, কোর্টসিপ, বিবাহ, অবাধমেলা মেশার সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি যোগ আছে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সৌভাগ্য, প্রীতি ও আনন্দলাভ। গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের পক্ষে অনুকূল। অলঙ্কার উত্তম বস্ত্র ও নানা উপঢৌকন লাভ। ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

ধনুরাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম, উত্তরাষাঢ়াগণের পক্ষে মধ্যম এবং মূলার পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। দুঃখ, বাধাবিপত্তি, কলহ বিবাদ, আর্থিক অনটন, শত্রুদের জন্য কষ্টভোগ, স্বাস্থ্যের অবনতি দুর্ঘটনা, স্বজন শত্রুতা, মর্য্যাদা হানি, স্বজন-বিয়োগ প্রভৃতি গ্রহবৈগুণ্য জনিত অশুভ ফল কিন্তু শুভ ফলগুলি যথা—শত্রু জয়, বাধাবিপত্তি অতিক্রম, বন্ধুদের সাহায্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নূতনপদ মর্য্যাদা, সৌভাগ্য ও স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতিও দেখা যায়। মাসের মধ্যম সময়টী কষ্টপ্রদ। অজীর্ণতা ও উদরের গোলযোগ, চক্ষুপীড়া প্রথমার্দ্ধে এবং শেষার্দ্ধে দুর্ঘটনা ও আঘাত প্রাপ্তিজনিত কষ্টভোগ। শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা ও স্নায়ু দৌর্ব্বল্য সারা মাসের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করবে। ঘরে বাইরে স্বজন বিরোধ ও কলহজনিত দুঃখ ভোগ, মানসিক কষ্ট প্রভৃতি সম্ভব। শেষার্দ্ধে আর্থিক অবস্থায় উন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। নানাভাবে অর্থাগম সূচিত হয়। টাকা লগ্নী করলে বেশ দু পয়সার সম্ভাবনা আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসখেলায় অর্থলাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ। চাকুরিজীবীদের পক্ষে শুভ হোলেও শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার যোগ আছে। যাদের এই মাসে পদোন্নতি প্রভৃতি যোগ আছে তাদের পক্ষে বিলম্ব হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি এক ভাবেই চলবে। স্ত্রী লোকের পক্ষে সামান্য বিরক্তি ও নৈরাশ্য ঘটবে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ঠিক ভাবেই চলবে। ব্যয়াধিক্য হোতে পারে এজন্যে সতর্কতা আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়ে অসাধারণ সাফল্য ও সুখ সম্ভোগ। পারি-বারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সঙ্কটজনক পরিস্থিতি নেই। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটী উত্তম।

মকর রাশি

শ্রবণাজাতগণের পক্ষে মাসটী উত্তম, ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম এবং উত্তরা-ষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। মাসটী মিশ্রফলদাতা। উত্তম প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন বন্ধুলাভ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়, বিলাসব্যসন উপভোগ, প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ, মামলা মোকর্দ্দমা ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের অবসান, সৌভাগ্য ও আয়বৃদ্ধি, উত্তম ভ্রমণ, সুসংবাদ প্রাপ্তি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সূচিত হয়। শেষার্দ্ধে স্বজন বন্ধুর সঙ্গে মনো-মালিন্য, সর্ব্ববিষয়ে বাধা প্রাপ্তি, ক্ষতি ও বহুবিধ বিষয়ে চিন্তা, অপবাদ, অসঙ্গত পরিবর্ত্তন, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর বৃদ্ধি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায় কিন্তু এসব অশান্তি ধীরে ধীরে দূর হবে। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে না। যেসব ব্যক্তি অনেকদিন থেকে ভুগছেন তাঁদের সতর্ক হওয়া দরকার। পারিবারিক ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা উত্তম। অনাদায়ী অর্থ হস্তগত হবে। নানাদিক দিয়ে হবে অর্থাগম। সঞ্চয়ের আশা কম, ব্যয়াধিক্য ঘটবে। রেসখেলায় লাভ হবে। সম্পত্তিপ্রাপ্তি যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অসন্তোষজনক। চাকুরিজীবীদের পক্ষে উত্তম মাস। পদোন্নতি, উত্তম মর্য্যাদালাভ, উপর-ওয়ালার সহৃদয় সৃষ্টি ও প্রশংসা অর্জ্জন, পরীক্ষা মূলক প্রতিযোগীতায় সাফল্য, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়। মাসের শেষার্দ্ধে চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু বিশৃঙ্খল অবস্থা ও উপরওয়ালার বিরক্তি উৎপাদন প্রভৃতি যোগ আছে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। কলহ বিবাদ ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি জনিত অশান্তি ভোগ। অবৈধ প্রণয়ে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা। পুরুষের সান্নিধ্যে এসে সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় মধ্যে নানা প্রকার কষ্টভোগ। পারি-বারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা জনক পরিস্থিতি দেখা যায় না, বরং প্রতিকূল পরিবেশ। ব্যয়াধিক্য। সাজসজ্জা ও আনন্দ সম্ভোগের দিকে বিশেষ লক্ষ্য ও তজ্জনিত ব্যয়াধিক্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জাতগণের পক্ষে উত্তম, শতভিষার পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধই শুভ। সাধারণ ভাবে সাফল্যলাভ, স্বাস্থ্যোন্নতি, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, সৌভাগ্য লাভ, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদিলাভ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। প্রথমার্দ্ধে গুরু জনবর্গের বিরাগভাজন হবার যোগ মামলামোকর্দ্দমা, ক্ষতি, ভ্রমণে ক্লান্তি, ব্যয়বৃদ্ধি, অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, স্বজনবর্গের দ্বারা নিগ্রহ ভোগ, অপবাদ, মিথ্যা অভিযোগ। স্বাস্থ্যসম্পর্কে মোটামুটি ভালো যাবে। কিন্তু সন্তানদের অস্বচ্ছন্দতা ও পীড়াভোগ। ঘরে বাহিরে স্বজন বিরোধ। আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। জিনিষপত্র বা টাকাকড়ি চুরি যেতে পারে। নানাপ্রকারে অর্থক্ষতি, ভ্রমণকালেও ক্ষতি। ব্যয়বৃদ্ধি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মোটের উপর ভালো। গৃহাদি নির্ম্মাণ, অর্থলগ্নী প্রভৃতি

বর্জ্জনীয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসের প্রথম দিক অশুভ, শেষার্দ্ধ শুভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি, শত্রু ও প্রতিযোগীদের পরাজয়ে সম্মান ইত্যাদি সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ ভালো বলা যায় না। রেসখেলায় লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম। কোন প্রকারে উত্তেজনা প্রকাশ ক্ষতিকর। অবৈধ প্রণয়াসক্তিতে সাফল্যলাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ক্ষেত্রে আশাতীত সুখলাভ। সকল প্রচেষ্টায় সিদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

মীন রাশি

রেবতী নক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং উত্তর ভাদ্রপদনক্ষত্র জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। উত্তম স্বাস্থ্য, সুখ সমৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, উপঢৌকন প্রাপ্তি, বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি ও পরীক্ষায় কৃতিত্বলাভ, সর্ব্ব প্রকার আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি শুভফল এবং কিছু ক্ষতি, কলহ বিবাদ, অপবাদ, মিথ্যা অভিযোগ, স্বজন বর্গের সহিত শত্রুতা, কিছু শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। নবপ্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ও ক্লান্তিকর ভ্রমণ। উত্তম স্বাস্থ্য, হাঁপানি, উদরঘটিত পীড়া, চক্ষুপীড়া প্রভৃতিতে যারা ভুগছে, তাদের রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হৃদরোগ ও রক্তচাপ বৃদ্ধি, পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাকবে। আর্থিক বিষয়ে মাসটী উত্তম। টাকাকড়ি লেন-দেন ব্যাপারে বিশেষ লাভের আশা আছে। লেখক, প্রকাশক, সাধারণ ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্ম্মলিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাফল্যলাভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। চুরি, দুর্ঘটনা শস্য অপহরণ প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। চাকুরিজীবীদের পক্ষে মাসটী অনুকূল। অস্থায়ীভাবে বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভ করবে। উপরওয়ালা ও ভৃত্যাদির সহিত প্রীতিসূত্র ছিন্ন হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে লাভ ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম মাস। নানা প্রকার সুবিধা সুযোগ, আনন্দ, সুখস্বচ্ছন্দতা, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার লাভ। বিশেষ ভাবে অর্থ হস্তগত হবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত লাভ এবং অর্থ ও উপহার লাভ। কোর্টসিপ, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির পক্ষে মাসটি উত্তম। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, সুখ সম্ভোগ ও সর্ব্বোতোভাবে আনন্দ লাভ। সঙ্গীদের সহিত ভ্রমণ, পিকনিক, পার্টি প্রভৃতিতে যোগদান করে মানসিক স্বচ্ছন্দতার আধিক্য। একাধিক পুরুষের আনুগত্য ও বন্ধুত্ব লাভ। রেসখেলায় জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অতীব উত্তম।

***

ব্যক্তিগত লগ্নফল

মেষলগ্ন

বেদনা সংযুক্ত পীড়া, বায়ুঘটিত পীড়া, পাক যন্ত্রের পীড়ার সম্ভাবনা। বিদ্যালাভে বাধা। পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা বিশেষত জরায়ু বা পাক যন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া। সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যহানি। ভাগ্য ও কর্ম্মভাব অশুভ নয়। মাতার স্বাস্থ্যহানি, পিতার স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। ব্যয়বৃদ্ধির স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ যোগ, আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

বৃষলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ। ধনভাব শুভ। সাহোদর ভাব শুভ নয়, সহোদর হানির সম্ভাবনা আছে। বিদ্যায় উন্নতি। সন্তানের শারীরিক সুস্থতা। ভাগ্যোন্নতি লাভ, ভাগ্যোদয়ে সামান্য বাধাবিঘ্ন। মাতার বিশেষ পীড়া। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ। নানারকমে অর্থব্যয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

মিথুনলগ্ন

দেহভাব শুভ। ধনোপার্জ্জন যোগ সত্বেও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মনশ্চাঞ্চল্য। সহোদরের সহিত মনোমালিন্য ও মতদ্বৈধজনিত অশান্তি ভোগ। বন্ধুলাভ। বিদ্যালাভে অন্তরায়। সন্তানের দেহপীড়া। কর্ম্মোন্নতির যোগ আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও শত্রু বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কটলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। বেদনাঘটিত পীড়া, দাঁতের পীড়া, শিরঃপীড়া। সন্তানগণের বিদ্যার্জ্জন। পত্নীর স্বাস্থ্য ভালোই যাবে সন্তানের বিবাদ সম্ভাবনা। ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

সিংহলগ্ন

শারীরিক অবস্থা মধ্যবিধ। ধনোপার্জ্জন যোগ। সহোদর ভাব শুভ। সদ্বন্ধুলাভ। সন্তানগণের বিদ্যার্জ্জন —ভাগ্যোন্নতি। কর্ম্মভাব শুভ। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। মাতার শারীরিক অসুস্থতা। পিতার স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কন্যা লগ্ন

দেহভাব মধ্যম। সহোদর ভাব ফল শুভ। মিত্রলাভ যোগ। শত্রুবৃদ্ধি। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটবে না। দাম্পত্য প্রণয় যোগ উত্তম। পত্নীর আন্তরিকতা। অবিবাহিত ও অবিবাহিতদের বিবাহযোগ। কর্ম্মোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

তুলা লগ্ন

মধ্যে মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব। ধনাগম যোগ। সহোদর ভাবের ফল শুভ নয়। মিত্রলাভ যোগ। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশানুযায়ী ফললাভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালোই বলা যায়। পিতার স্বাস্থ্যহানি যোগ। বিজ্ঞানাদিশাস্ত্রে অধিকতর উন্নতি। কন্যার বিবাহ বা বিবাহযোগ। ধান্য ও চাউলের ব্যসায় লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিক লগ্ন

দেহভাব শুভ। ধনবৃদ্ধি। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। দাম্পত্য প্রণয় যোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে। ভাগ্যোন্নতিযোগ। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতার যোগ থাকলেও উল্লেখযোগ্য পীড়া ঘটবে না। কন্যাসন্তানের বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যবিধ।

ধনুলগ্ন

শারীরিকভাব মধ্যম। ধনাগমযোগ। নানাপ্রকার ব্যয়বৃদ্ধি। সহোদরের সহিত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য। মিত্র লাভ কিন্তু কপটমিত্রের সমাগমই বেশী হবে। পড়াশুনায় কৃতিত্ব অর্জ্জন। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহের সম্ভাবনা বা আলোচনা। ভাগ্যোন্নতির পক্ষে অন্তরায়। ধর্ম্মকার্য্যে বাধা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকরলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ। সহোদরের সহিত অসদ্ভাব। সন্ধন্ধু লাভ। কোন অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশানুযায়ী না হোলেও বিফল মনোরথ হবার যোগ নেই বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠানও তীর্থপর্য্যটনে অর্থব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। অর্থকৃচ্ছ্রতা। ব্যয়বৃদ্ধি। সম্বন্ধু লাভ। বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় চাকুরি বা পদোন্নতি লাভের আশা। সুখ স্বচ্ছন্দতার অভাব। মাতৃকষ্ট। বিদ্যাস্থান ও সন্তানস্থানের ফল অশুভ স্ত্রীর শারীরিক অশান্তির যোগ। ভাগ্যভাব আংশিক দুর্ব্বল। কর্ম্মভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আদৌ শুভ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মীনলগ্ন

দেহভাব সম্পূর্ণ শুভ। ব্যয়াধিক্য হেতু বিব্রত হবার যোগ। সহোদরভাব শুভ। বন্ধু লাভ। সন্তানস্থানের ফল শুভ। ভাগ্যোন্নতি। বিদ্যাস্থান শুভ। অধ্যাপনা কার্য্যে সুনাম। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। বিবাহার্থীর স্ত্রীলাভ স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যবিধ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কবি-প্রণাম

শ্রীবাণী দে

সার্থক তব নাম—
হে সূর্য্যদেব! রবীন্দ্রনাথ তোমারে করি প্রণাম।
প্রণমি তাদের হ'য়ে—
যারা বাংলার হৃদয়ের মধু পল্লীর বধূ মেয়ে।
যা'রা গৃহকোণে রুদ্ধ দুয়ারে
বাতায়ন-ফাঁকে আলোকের তরে
চেয়ে থাকে সদা, দীপ্ত রবির
আলোকের রেখা,—বিশ্ব-কবির
কবিতার ছোঁয়া, যতটুকু পায়
তাই বুকে লয়ে আগাইয়া যায়—
মূরতি তোমার ধেয়ানে ধরি
তাদের হইয়া প্রণাম করি।

যা'রা কোনদিন পায়নি দরশ,
প্রণমি'—লভেনি চরণ পরশ,
শ্রবণ যাদের করে হাহাকার
শুনে নাই তব সুর-ঝঙ্কার।
তবু প্রতি প্রাতে, প্রতি সন্ধ্যায়
যাহাদের মন তোমার পূজায়
ভরিয়া উঠেছে; সংসার মাঝে
প্রতি দিবসের ছোটবড় কাজে
গৃহ-দেবতার পূজার সময়ে
তোমারে পূজিছে যারা,—
প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালায়ে
তুলসীর মূলে ভূমিতে লুটায়ে
তোমারি চরণে প্রণতি জানায়
হইয়া আপনা হারা।
সেই শত শত বাংলার বধূ
পল্লীবালার হ'য়ে
প্রণমি তোমার পায়ে।





সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্র

খেলোয়াড়দের শক্তি সামর্থের সীমারেখা নির্ধারণ করে তাঁদের ক্রীড়া নৈপুণ্য। দুনিয়ার নামজাদা খেলোয়াড়দের বেলায় যা খাটে, খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অসংখ্য খেলোয়াড়দের পক্ষেও তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু খেলাধুলার জগতে অনেক তরুণ খেলোয়াড় আছেন যাঁরা নিজেদের কাছ থেকে অনেক বেশী কিছু দাবি করেন, যার জন্য তাঁরা শক্তির অতিরিক্ত ট্রেনিং গ্রহণ করে থাকেন। ফলে একদিন তাঁদের শরীর ভেঙ্গে পড়ে, সারা জীবন ধরে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়। নিজেদের শক্তি সামর্থের সীমারেখা কোথায় সে সম্পর্কে অনেক খেলোয়াড়ের সত্যকার কোন ধারণাই নেই।

জার্মান প্রজাতন্ত্র এই সম্পর্কে প্রশংসনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের প্রবর্ত্তন করেছেন। মুষ্টিযুদ্ধ এবং 'রোয়িং'-এর ক্ষেত্রে এই প্রমাণপত্রের ব্যবস্থা অবশ্য অনেকদিন আগেই হয়েছে। প্রমাণ পত্রের প্রবর্ত্তনের ফলে বেশ সুফলও পাওয়া গেছে।



জার্মানীর চ্যাম্পিয়ন ফুটবল দল 'হামবুর্গ স্পোর্টস ক্লাবে'র এবং জার্মান জাতীয় ফুটবল দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড উবে জীলারকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রমাণ পত্র দিবার পূর্ব্বে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এবার পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ প্রদেশ নর্ডরাইন-বেষ্টফালেনের সব রকম খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রমাণ-পত্রের ব্যবস্থা করা হবে। সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমের কুফলের হাত থেকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বর্ত্তমানে রাইন আর রুহরের বিভিন্ন শহরে পুরোদমে চলছে "স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্র অভিযান।" প্রথমে ১৪ ও ২১ বছরের মধ্যবর্ত্তী বয়সের ২,০০০০০ খেলোয়াড়কে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে চোদ্দ বছরের খেলোয়াড়গণকেও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশের প্রায় সব খেলোয়াড়কে চিকিৎসা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে।

এই কাজের জন্য স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীরা তাঁদের রঞ্জন-রশ্মি আর ইলেকট্রো কাডিওগ্রামের যন্ত্রপাতি দিয়ে ক্রীড়া-চিকিৎসকগণকে সাহায্য করবেন। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে যেখানে যাতায়াতের সুবিধা আছে এবং যেসব জায়গায় বড়ো বড়ো ক্রীড়াসংঘ গড়ে উঠেছে, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা সেই সকল জায়গায় খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যাবেন। এই পরীক্ষাকার্য্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনের জন্য প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই অনেক সংঘ গড়ে উঠেছে। এই সব সংঘে ক্রীড়া-চিকিৎসক, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী, ক্রীড়া সংঘের প্রতিনিধি ও সেই এলাকার অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আছেন। পরীক্ষার পর খেলোয়াড়ের শরীরে জটিল কোনো কিছুর সন্ধান পাওয়া গেলে আরও ভালভাবে পরীক্ষার জন্য কোলনের ক্রীড়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

খেলোয়াড়গণও ক্রীড়া চিকিৎসকগণ এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার এই ব্যবস্থাকে আনন্দের সাথে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে চিকিৎসকগণ সব রকমের সাহায্য আর পৃষ্টপোষকতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্রীড়া চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ নন, এমন সব চিকিৎসকও সাহায্য আর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এই অভিযানে।

১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নর্ড-রাইন-বেস্টফালেন পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে প্রথম প্রদেশ যেখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রমাণপত্র ছাড়া কোনো খেলোয়াড়ই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না, সে যে কোনো খেলাই হোক। অন্যান্য প্রদেশেও এই ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তন করা হবে। সরকারী সকল ক্রীড়া-অনুষ্ঠানে, সংঘে এই প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যহানি রোধ করাই হলো এই ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর প্রয়োজনবোধে কোনো খেলোয়াড়কে কোনো নির্দ্দিষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে চিকিৎসক ঘোষণা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সেই খেলোয়াড়ের পক্ষে সেই নির্দ্দিষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে তার নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরে।

খেলা-ধূলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতা ঃ

ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ জাতীয় সাইকেল প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র ৩২ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করে। রেলওয়ে ২৭ পয়েন্ট পেয়ে ২য় এবং এয়ার ফোর্স ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ৩য় স্থান পায়। শেষদিন অর্থাৎ ১৯শে মার্চ ১২০ কিলোমিটার (৮১ মাইল) রোড রেস প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র ১ম স্থান (২২ পয়েন্ট), এয়ার ফোর্স ২য় স্থান (১৬), পশ্চিম বাংলা ৩য় স্থান (১২) এবং রেলওয়ে ৪র্থ (১০) স্থানে ছিল। ৮১ মাইল রোড রেস প্রতিযোগিতার ফলাফলে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ স্থানের পরিবর্ত্তন হয়। এই অনুষ্ঠানের ৬টি স্থানের মধ্যে মহারাষ্ট্র ১ম স্থান, রেলওয়ে একাই ২য় থেকে ৫ম স্থান লাভ করে এবং এয়ার ফোর্স পায় ৬ষ্ঠ স্থান। ফলে রেলওয়ে পয়েন্টের তালিকায় পূর্ব্বের ৪র্থ স্থান থেকে উপরে উঠে ২য় স্থান পেয়ে যায় এবং এয়ার ফোর্স পূর্ব্বের ২য় স্থান থেকে ৩য় স্থানে এবং পশ্চিম বাংলা ৩য় স্থান থেকে

৪র্থ স্থানে নেমে যায়। মহারাষ্ট্র তার পূর্ব্ব ১ম স্থান অটুট রাখে—আরও ১০ পয়েন্ট বেশী ক'রে।

আলোচ্য বৎসরের প্রতিযোগিতায় পাঁচটি রাজ্য এবং দুটি সরকারী সংস্থার (মহারাষ্ট্র, এয়ারফোর্স, বাংলা, রেলওয়ে, পাঞ্জাব, বিহার এবং উত্তর ভারত) প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন। ১০টি অনুষ্ঠানের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু বালিকাদের ২০০০ মিটার ল্যাপ রেসটি অনুষ্ঠান তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সর্ব্বাধিক পদক লাভ ক'রে উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান লাভ করে। মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্রের জেসমীন লাদক ৫০০ মিটার স্প্রিন্ট এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত পারসুট অনুষ্ঠানে ১ম স্থান লাভ করেন। অপর দিকে পুরুষ বিভাগে মহারাষ্ট্রের পি ইরাণী ১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল এবং ১২০ কিলোমিটার (৮১ মাইল) রোড রেসে প্রথম হন।

পুরুষ বিভাগ

১০০০ মিটার টাইম ট্রায়াল: ১ম পি ইরাণী (মহারাষ্ট্র) সময় ১ মিঃ ২৮.৪ সেঃ।

২০০ মিটার স্প্রিন্ট: ১ম জে বাটলিওয়ালা (মহারাষ্ট্র)। সময় ১৫.৮ সেঃ।

৪০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারসুট: ১ম অমর সিং (বিহার)। সময় ১ মিঃ ৫৭ সেঃ।

৪০০০ মিটার টীম পারসুট: ১ম এয়ার ফোর্স। সময় ৬ মিঃ ১৩.৬ সেঃ।

৫ ল্যাপ রোড টীম টাইম-ট্রায়াল (২৩ মাইল): ১ম বাংলা। সময় ৫৯ মিঃ ৩৫.৬ সেঃ। (বাংলা দলে ছিলেন পি সি বসাক, আর শর্ম্মা, এস শীল এবং বিজয় ঘোষ)।

মহিলা বিভাগ

৫০০ মিটার স্প্রিন্ট: জসমীন লাদক (মহারাষ্ট্র)। সময় ১৯.৪ সেঃ।

২০০০ মিটার ব্যক্তিগত পারসুট: জসমীন লাদক (মহারাষ্ট্র)। সময় ৪৮.৪ সেঃ।

বালক (জুনিয়র)

২০০ মিটার স্প্রিন্ট: ১ম ভাগওয়াগর (মহারাষ্ট্র)। সময় ১৬.৬ সেঃ।

৪০০০ মিটার ল্যাপ রেস: ১ম রবীন্দ্রনাথ পাল সিং (উত্তর ভারত)। সময় ৬ মিঃ ৪৬.৪ সেঃ।

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৬১ সালের অল-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পাঁচটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে ডেনমার্ক ৩ টিতে (পুরুষদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস) এবং আমেরিকা ২ টিতে (মহিলাদের সিঙ্গলস এবং আয়ার ল্যাণ্ডের সঙ্গে ডবলসে) জয়লাভ করেছে। অল-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় জয়লাভের গুরুত্ব ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ব-খেতাব লাভের সমান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দলগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যেমন টমাস কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা বলতে অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানকে ধরা হয়। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এই প্রতিযোগিতায় খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। নামের দিক থেকে কেবল ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতাটি সীমাবদ্ধ নয়। এক সময়ে মালয় দেশের খেলোয়াড়রা টমাস কাপ এবং অল-ইংলণ্ড প্রতিযোগিতায় একাদিক্রমে একাধিপত্য রেখে ছিল।

আলোচ্য বছরে, ডেনমার্কের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডবলস অনুষ্ঠানের ফাইনালে ডেনমার্কের খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। মিক্সড ডবলসে ডেনমার্ক বৃটেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে জয়ী হয়। ডেনমার্কের পর আমেরিকার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। বৃটেন মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডবলস এবং মিক্সড ডবলসের ফাইনালে উঠে পরাজিত হয়।

গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী ডেনমার্কের আরলাণ্ড কোপস এবারও ফাইনালে জয়লাভ করেছেন। ডেনমার্কের এফ কোবেরো (পুরুষদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলস) এবং আমেরিকার মহিলা খেলোয়াড় মিস জুডী

হাসম্যান (সিঙ্গলস ও ডবলস) দুটি ক'রে অনুষ্ঠানে জয়লাভ ক'রে দ্বিমুকুট সম্মান লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালের দুটি অনুষ্ঠানেই এশিয়ার খেলোয়াড়রা (মালয় দশে) পরাজিত হন।

পঃ বঙ্গ স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ

ক'লকাতা পশ্চিম বাংলার রাজধানী। রাজনীতি থেকে আরম্ভ ক'রে শিল্প-বাণিজ্য, খেলাধূলা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ক'লকাতাকে পীঠস্থান ধরা হয়। খেলাধূলাতে পশ্চিমবাংলায় ক'লকাতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ক'লকাতার অধিবাসীরা এতদিন জোর গলায় জাহির ক'রে আসছিলেন। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটছে। অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানের ফলাফল থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। বালক বিভাগে মেদিনীপুর ২৩ পয়েন্ট পেয়ে ১ম স্থান লাভ করেছে। মাত্র এক পয়েন্ট কম পেয়ে মধ্য ক'লকাতা ২য় স্থান পেয়েছে। বালিকা বিভাগে মেদিনীপুর ১ম (১৯) এবং জলপাইগুড়ি ২য় (১৩) স্থান লাভ করেছে।

বালক বিভাগে বীরভূমের অধীর ঘোষ তিনটি বিষয়ে (ডিসকাস, জাভেলিন এবং সটপুট) ১ম স্থান পেয়েছে।

মেদিনীপুরের সুখলাল হাঁসদা ২টি বিষয়ে (ব্রডজাম্প এবং হপ—ষ্টেপ—জাম্প) প্রথম স্থান লাভ করেছে।

বালিকা বিভাগে ২টি বিষয়ে ১ম স্থান লাভ করেছে—জলপাইগুড়ির বীথি দাক্ষী (হাই জাম্প এবং সট পুট); সাউথ ক্যালকাটার শ্রীপর্ণা ঘোষ দস্তিদার (১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়)।

মেদিনীপুরের মীনা দে ডিসকাস থ্রোতে নতুন রেকর্ড (৫৩ ফিঃ ১ইঃ) করে।

বালিকা বিভাগে হাওড়ার দেবীকা হাজরা জাভেলিন থ্রোতে নতুন রেকর্ড (৬৩ ফিট ১০ইঃ) স্থাপন করে।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী জেলাগুলির মধ্যে হাওড়ার কৃতিত্ব একদিক থেকে উল্লেখযোগ্য বলা যায়। হাওড়া থেকে মাত্র দু'জন (একজন বালক ও একজন বালিকা) যোগদান করে। বালক বিভাগে সব্যসাচী চ্যাটার্জি—৮০০ মিটার দৌড়ে ১ম এবং ১,৫০০ মিটারে ২য় স্থান লাভ করে। অপরদিকে হাওড়ার বালিকা দেবীকা হাজরা জাভেলিন অনুষ্ঠানে ১ম স্থান অধিকার ক'রে নতুন রেকর্ড করে।

প্রথম বিভাগ হকি লীগ ঃ

ক'লকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৭টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট ক'রে উপস্থিত শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। তাদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাস্টমস ক্লাব ১৫টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট করেছে। এই দুই দলের খেলাটি গোলশূন্য ভাবে ড্র গেছে। ১৯টি ক্লাবের মধ্যে এই দুটি ক্লাবই এখনও পর্য্যন্ত কোন খেলায় হার স্বীকার করেনি। দুই দলই দুটো ক'রে খেলা ড্র করেছে।

মোহনবাগান ১৭টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট করেছে। গ্রীয়ার ক্লাবের বিপক্ষে ১-২ গোলে হেরেছে আর ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে খেলায় যোগদান না করায় মোহনবাগানকে দুটো পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে ২৩শে মার্চ্চ ইস্টবেঙ্গল বনাম গ্রীয়ার দলের খেলায় একদল দর্শকের অশোভন আচরণে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল। খেলার শেষে একজন আম্পায়ার নিগৃহীত হ'ন। ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে মোহনবাগান ক্লাবের জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত পান। এই ঘটনার পরের দিন শুক্রবার, মোহনবাগান ক্লাবের সম্পাদক নিজ দলের খেলোয়াড় এবং সভ্যদের নিরাপত্তার দিক বিচার ক'রে শনিবারের ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে খেলায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে ঐ খেলাটি স্থগিত রেখে অপর একটি দলের সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা করার জন্য বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনকে অনুরোধ জানান। এসোসিয়েশন খেলাটি স্থগিত রাখা সম্ভব হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—ফলে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত শনিবারের খেলায় মোহনবাগান যোগদান না করায় ইস্টবেঙ্গল দলকে ২টি পয়েন্ট দেওয়া হয়।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিতে মোহনবাগান দল নির্দ্ধারিত খেলাটি স্থগিত রাখবার এবং তার পরিবর্ত্তে অন্য খেলার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল তা যেমন

অযৌক্তিক ছিল না, তেমনি মোহনবাগান দলের পক্ষে অন্যায় আবদারও হয়নি। সংবাদে প্রকাশ, বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতি খেলাটি স্থগিত রাখা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সমিতির পক্ষ থেকে মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ মহলের কাছ থেকে সহযোগিতা এবং খেলোয়াড়ী মনোভাব কামনা করা হয়। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত অশোভন এবং অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব কি প্রকাশ পায়নি? প্রকারান্তরে নতি স্বীকার করাই হয়েছে।

মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্রে কোন দলের সঙ্গে একেবারেই খেলবেনা এমন কথা কোথাও বলেননি; ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সাময়িক উত্তেজনা ছিল তা নিজদলের খেলোয়াড় এবং সভ্যদের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল নয় বিবেচনা করেই তাঁরা খেলা স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নিরাপত্তার এ ধরণের আবেদন যে কেবলমাত্র দলের স্বার্থের পক্ষে নয়, পরন্তু খেলাধূলার সুস্থ পরিবেশের অনুকূলে আবেদন তা হকি এসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ উপলব্ধি করেননি। তাঁরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা খেলাধূলার সুস্থ পরিবেশ রচনার পক্ষে অনুকূল হয়নি।

লীগ তালিকায় প্রথম তিনটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৭	১৫	২	০	৪৫	৪	৩২
মোহনবাগান	১৭	১৫	০	২	৫৬	৭	৩০
কাস্টমস	১৫	১২	২	০	৪৯	৪	২৮

তারিখ: ১১।৪.৬১

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

১০৭তম বার্ষিক বোট রেস প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ৪½ লেংথে গতবছরের বিজয়ীদল অক্সফোর্ডকে পরাজিত করে। ইংলণ্ডের টেমস নদীর ওপর পুটনি থেকে মর্টলেক পর্য্যন্ত ৩৭৪ গজ দূরত্ব অতিক্রম করতে কেম্ব্রিজের ১৯মিঃ ২২ সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। এ পর্য্যন্ত কেম্ব্রিজ ৫৯বার এবং অক্সফোর্ড ৪৭বার এই বিশ্বখ্যাত বোট-রেস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে। ১৮৭৭ সালের প্রতিযোগিতা 'dead-heat' হিসাবে রেকর্ড হয়েছে।

টমাস কাপ ঃ

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় থাইল্যাণ্ড এশিয়ান জোন বিজয়ী হয়েছে।

ডেভিস কাপ ঃ

আন্তর্জাতিক ডেভিসকাপ লন্‌টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষ পূর্ব্বাঞ্চলের খেলার সেমিফাইনালে থাইল্যাণ্ডকে ৫—০ খেলায় পরাজিত করে! পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষ খেলবে জাপান বনাম ফিলিপাইনের খেলায় বিজয়ীদলের পক্ষে।

ভারত সফর-কারী থাইল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন দল ঃ

হায়দাবাদে অনুষ্ঠিত ১ম টেষ্ট খেলায় থাইল্যাণ্ড ৭—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।



সাহিত্য সংবাদ

ধ্যান ও প্রার্থনা : শ্রীঅরবিন্দ কথিত ও শ্রীমা লিখিত।

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১৯১৪ সালের ২রা আগষ্ট হইতে ১৯৩৭ সালের ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই গুলি প্রদত্ত। ইহা দ্বিতীয় ভাগ। ভারতের চিরন্তন ধ্যান ও প্রার্থনাই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত। ১৯২৭ সালের ৬ই মে তারিখের প্রার্থনা এইরূপ—" জীবন দিতে পারা চাই, মরণকেও দিতে পারা চাই, দিতে পারা চাই সুখ, দিতে পারা চাই দুঃখ—সকল ক্ষেত্রে নির্ভর করা চাই ভগবানের উপর—তিনিই আমাদের যাবতীয়সিদ্ধি সম্ভাবনার বিধাতা, এক তিনিই নির্দেশ দিতে পারেন, এবং নির্দেশ দিয়ে থাকেন—আমরা সুখী হব কি হব না, আমরা বেঁচে থাকব কি থাকব না, সিদ্ধির ভাগী আমরা হব কি হব না। এই প্রেমের এই আত্মদানের সমগ্রতা ও পরাকাষ্ঠাই এনে দিতে পারে পরম শান্তি, আর এই শান্তিই আবার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠা।" এইরূপ প্রার্থনায় বইখানি পূর্ণ।

[প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সোঁয়েদান : বিনয়রঞ্জন সেনগুপ্ত

আলোচ্য গ্রন্থের নাম করণে বিস্ময়ের অবকাশ আছে কিন্তু কাহিনী আংশিক ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক হোলেও শেষ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেনা। গতানুগতিক ধারাকে বর্জ্জন করে নিজস্ব রচনা ভঙ্গীতে গঠিত হয়েছে সোঁয়েদান। গ্রন্থকারের কল্পনার রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এই ক্ষুদ্র দ্বীপ আলোচ্য গ্রন্থের কোথাও ঘটনার মাধ্যমে সংযোজিত হয়নি নায়কের সোয়েদান যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের যবনিকা টেনে দেওয়া হয়েছে। লিপি কৌশলের অভাবে উপন্যাসের বিস্তৃতি, জটিলতা, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, হৃদয়াবেগ, বুদ্ধিবাদ বা মনোবিকলন প্রভৃতির কোনটী স্ফুরিত হয়ে রস পরিণতে হোতে পারেনি। উপন্যাসে অনাবশ্যক প্রসঙ্গের অবতারণা করা বা অনাবশ্যক চরিত্র সৃষ্টি করা পাঠকপাঠিকার সহানুভূতি উদ্রেক করে না। উপন্যাসের নায়ক চন্দ্রকমল। তারই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পথে যে রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে তারই আলেখ্যের ওপর উপন্যাসের পটভূমিকা রচিত হয়েছে অথচ সাংবাদিকের চরিত্র ঠিক মত ফুটে ওঠেনি। ডাকাতদলের কর্ম্মপদ্ধতি ও চক্রান্ত, শয়তানের ভূমিকায় নরেন ডাক্তারের অপকৌশলের নীতি, জেরামিন, সোহেন, রতনমণি প্রভৃতির গতিবিধি, সত্যেন, মলিনা 'প্রকাশবাবুর প্রভৃতির অন্তরের উদ্দেশ্য মূল কাহিনীটাকে জমিয়ে তুলবার বাহন মাত্র। চন্দ্রকমল সোঁয়েদান নতুন জগৎ সৃষ্টি করবে পৃথিবীর সেরা সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে, আর যেখানে সে সত্য যুগ বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে এরূপ উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করেছে। নায়কের আদর্শের কোন অভিব্যক্তি বা মহত্তর প্রকাশ উপন্যাসে সক্রিয় হয়নি। যাদের প্রণয়ের স্রোতোধারায় সে অবগাহন করতে নেমেছিল তাদের দুজনেই তার জীবনটাকে প্রেমের স্নিগ্ধতায় নিস্নাত করতে পারেননি। এই চরিত্র দুটী উপন্যাসে প্রধান অংশ নিতে গিয়ে লেখক দোষে পঙ্গু হয়ে গেল। মনি আর প্রতিমা চন্দ্র কমলের প্রণয়িনী। ডাক্তারের বিষ প্রয়োগে মলির মৃত্যু ঘটলো প্রণয় পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হোলো না। প্রতিমার আকস্মিক উপস্থিতিতে প্রকাশবাবু তার বালবৈধব্যের কথা তুলতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো, চন্দ্র কমল ও প্রতিমার ভালোবাসা ব্যর্থ হোলো। রোমান্সের ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়ে ফলে পুষ্পে পরিপূর্ণ হোতে পারেনি। উদ্দেশ্যবিহীন চরিত্র সৃষ্টি অর্থহীন, অন্তরে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনা রসানুভূতির অভাবে। প্রচ্ছদপটটী মনোজ্ঞ। উপন্যাস খ্যাতি পড়ে আনন্দ পাওয়া গেল না, গ্রন্থকারের কাঁচা হাতের পরিচয় সম্যক ভাবে ফুটে উঠেছে।

[প্রকাশিকা—শ্রীমতী পূর্ণিমা সেনগুপ্ত ৯৩ এফ, বেলতলা রোড, কলিকতা—৬, মূল্য—২.৫০ নঃ পঃ]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীমদ্ভগবদগীতা : পদ্যানুবাদ—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

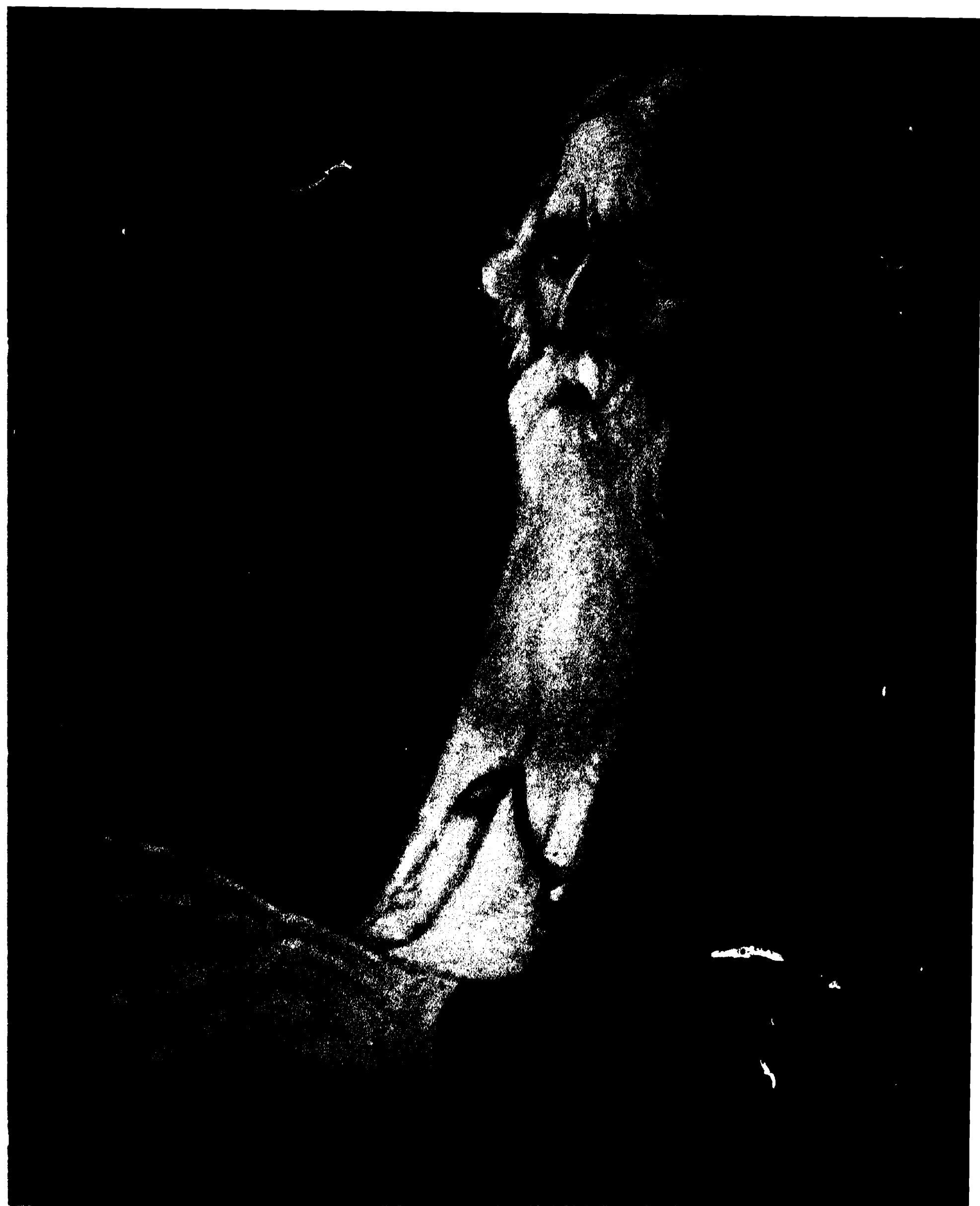
গীতা শুধু হিন্দুদের নয়, মানুষ মাত্রেরই পবিত্র গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থের সরল পয়ার ছন্দের বঙ্গানুবাদ করে লেখক সমগ্র গীতাপিপাসু ভক্তিমান পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন। এ গ্রন্থের যে বহুল প্রচার হবে সেই আশাই করি।

[শ্রীমতী বীথি ও বিনীতা দত্ত কর্ত্তৃক ৫২, সারপেন্টাইন্ লেন, কলিকাতা—১৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—১৫০ নঃ পঃ]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

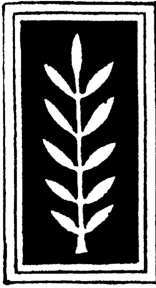
সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরি—

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্








জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

সাধন-চতুষ্টয়

স্বামী জীবানন্দ

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক

ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ-অধিকারলাভ করতে হ'লে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হ'তে হয়। সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অর্থাৎ নিত্য বস্তু ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য তার জ্ঞান। নিত্য বস্তু বলতে যা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে একই প্রকার থাকে, যার কোন পরিবর্তন হয় না তাকেই বোঝায়। একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, আর যা কিছু সবই অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয়। যা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি সবই অনিত্য, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিটি বস্তুই অনিত্য। কোন বস্তু চিরকাল বর্তমান থাকে না, একদিন না একদিন তার নাশ হয়ই হয়—আজই হ'ক, শত বৎসর পরে হ'ক বা যুগান্ত পরেই হ'ক। তাই ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। আবার ব্রহ্মই চিৎ-জ্ঞান-স্বরূপ, যার প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মই আনন্দস্বরূপ। যার থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি, যাতে স্থিতি এবং পরিণামে যাতে সব কিছু লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তাই ব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতি হ'লে আর চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকে না; চরম জ্ঞান, চরম আনন্দ এবং চরম প্রাপ্তি ব্রহ্মানুভূতিতে।

বৈরাগ্য

ব্রহ্ম ছাড়া অপর যা কিছু শাশ্বত নয়—এই ধারণা দৃঢ়

করতে হ'লে প্রয়োজন বৈরাগ্য। তাই দ্বিতীয় সাধন—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। ইহলোকে এই জীবনের ভোগ যেমন, পরলোকের স্বর্গাদির ভোগও তেমনি অনিত্য—এইরূপ নিশ্চয়হেতু অল্প বা অধিক সকল ভোগে যে স্পৃহাশূন্যতা ও তুচ্ছবুদ্ধি তারই নাম বৈরাগ্য। আচার্য শঙ্কর 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে বৈরাগ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন :

তদ্‌বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ,
দেহাদি ব্রহ্ম পর্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগ্যবস্তুনি,
বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ॥

জীবের স্থূল দেহ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত সকল ভোগ্যবস্তুতে প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রবাক্য প্রভৃতি অনুসারে যে ত্যাগে ইচ্ছা অর্থাৎ গ্রহণে অনিচ্ছা—তাকে বৈরাগ্য বা 'ইহামুত্রফল-ভোগ বিরাগ' বলে। সংসারে অনিত্যতা বোধ যত দৃঢ় হবে, জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি পাবে। বৈরাগ্য বিনা সমস্ত সাধন নিষ্ফল।

আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন নির্বাপিত হয় না—ক্রমশই বর্ধিত হয়। কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনার শান্তি না হ'য়ে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভোগ আপাত-রমণীয়—কিন্তু পরিণামে বিষম; † তাই উপদেশ : মুক্তিমিচ্ছসি চেৎতাত বিষয়াম্ বিষবৎত্যজ।

এই জগতের বিচিত্র বিষয় ভোগ হয়তো দীর্ঘকালস্থায়ী হ'তে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন তা ভোগ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়—তাই উপভোগের সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সাধক বিষয় ভোগ ত্যাগ করাই প্রয়োজন মনে করেন। * অভাব-অনটনজনিত সংসার বিরক্তি বৈরাগ্য নয়, স্ব-স্বরূপের উপলব্ধির ব্যাকুলতায় যে ত্যাগ তাই নাম বৈরাগ্য।

প্রকৃত সম্পত্তি

জগতে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হ'তে কে না চায়? সম্পত্তি বলতে সাধারণতঃ জমিজায়গা, বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, ধনরত্ন, মণিমাণিক্যের কথাই মনে আসে। অনেকে আছেন যাঁরা অগাধ বিদ্যাবত্তা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যকেও সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ক'রে থাকেন; অবশ্য তাঁরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ থাকের। আবার এমন লোকও আছেন, তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়, যাঁরা নিষ্কলুষ চরিত্রকেই সম্পত্তি ব'লে মনে করেন।

এসব ছাড়া আর একরকম সম্পত্তি আছে, যা লাভ করলে অন্য সব সম্পত্তিই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায়। যাঁরা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করতে চান অর্থাৎ নিজের প্রকৃত স্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবটিকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁরা এই সম্পত্তিতে ধনী হ'তে চান। কি সেই অমূল্য অতুলনীয় সম্পদ, যার স্থান এত উচ্চে—যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? তা হ'ল বেদান্তের ভাষায় ষট্ সম্পত্তি—অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা—এই ছটি।

শম

মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল। মন চঞ্চল কিনা এমনি বোঝা যায় না, লোকের সঙ্গে বেশ তো কথা কইছি, কই মন যদি চঞ্চল হ'ত তবে তো অসংলগ্ন কথা বেরুত, কেউ শুনত না, তা তো হয় না। যখন কাজকর্ম করি চাঞ্চল্য ধরা পড়ে না, মন চঞ্চল হ'লে কাজ ঠিকভাবে হয় কেমন ক'রে? এ তো ভাল কথা। কিন্তু যখন একটু স্থির হ'য়ে ব'সে কোন বিষয় ভাবতে বা ধ্যান করতে চেষ্টা করা যায়, তখন কি মনের চাঞ্চল্য ধরা পড়ে না? তখন মনটি যে কত লাফালাফি করে বোঝা যায়—এই ফুটবল খেলার মাঠে ছুটল, এই সিনেমা হাউসে, সেখান থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, হিমালয়ের গিরিগুহায়, অতলস্পর্শ সমুদ্রে! আবার যারা দুঃখ দিয়েছে, অপমান করেছে, যারা প্রশংসা করেছে, যশের মালা পরিয়েছে, তাদের কথা সব মনে পড়ল। হয়তো ছুটতে ছুটতে মনটি কল্পলোকের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছুল ইন্দ্রাদি দেবতার সান্নিধ্য লাভের জন্যে। মন কখন স্বর্গলোকে যাচ্ছে, কখন চন্দ্রলোকে ছুটছে! এই কি তার স্বরূপ? এ যে মত্ত মাতঙ্গ!

বানরের স্বভাব চঞ্চল, তার উপর তাকে মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে বিছের কামড়ে জর্জরিত করা হ'লে যে অবস্থা হয়, মনের কি সেই অবস্থা?

মন হ'ল ইন্দ্রিয়দের রাজা। রাজা ঠিক থাকলে যেমন প্রজারা ঠিক থাকে, রাজা সংযমী হ'লে যেমন প্রজাদের মধ্যে আপনা থেকেই সংযমের ভাব আসে, কোথাও অনাচারের সুযোগ থাকেনা, তেমনি মন সংযত হ'লে ইন্দ্রিয়েরা বিষয়মুখী হ'তে পারেনা। চালক ভাল হ'লে গাড়ী তো ঠিক পথে চলবেই।

চঞ্চলমনকে বশে আনতে হ'লে যে গুণের প্রয়োজন তার নাম শম। আচার্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে শমের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন : স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে। বারংবার দোষ দর্শনে বিষয়ে বৈরাগ্য হ'লে স্বীয় লক্ষ্য পদার্থে মনের সংযতভাবকে বলে শম।

বিষয় ভোগে মন পুষ্টিলাভ করলেই তমঃপ্রধান হয়, তামস মনের যে বিষয় রস তা আবিল। মনে বিষয়-বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হ'লে মন অন্তর্মুখ হয়, বাহ্য বিষয়রস তাতে না থাকাতে সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে অন্তরের মাধুর্য ফুটে ওঠে। চঞ্চল মনে আত্মচিন্তা হয় না, বাহ্য বিষয়ের জন্যই তার ব্যাকুলতা। ঘরের মধ্যে যদি একটা বাঘকে অবরুদ্ধ রাখা হয়, তাহলে বাঘটি বেরুবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, হাঁপাতে হাঁপাতে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তেমনি মন বিষয়ভোগের সুযোগ না পেলে শান্তভাব ধারণ করতে বাধ্য হয়।

দম

ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই বহির্মুখ—বাইরের বিষয় ভোগ করবার জন্য উন্মুখ। চক্ষু চায় রূপ উপভোগ করতে, কর্ণের আকর্ষণ শব্দে, নাসিকা গন্ধের জন্য ব্যাকুল, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণে তৎপর, ত্বক্ স্পর্শব্যাকুল। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এইগুলিই তো ইন্দ্রিয়দের বিষয়।

প্রথমে মনে সঙ্কল্প ওঠে—ইচ্ছা হয় বিষয়ভোগের। তার পর বুদ্ধি নিশ্চয় ক'রে দেয় কি করতে হবে। কোন জিনিস খেতে বাসনা হ'ল। কোথায়? মনে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি নিশ্চয় ক'রে দিলে কি করতে হবে। বুদ্ধির নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ইন্দ্রিয়গুলি যে যার কাজে লেগে গেল। ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য যে যে ইন্দ্রিয়ের তৎপরতা আবশ্যক, তাদের সাহায্যে জিনিসটি মিলল, আর জিহ্বা তার স্বাদ-গ্রহণের কাজ শুরু ক'রে দিল। এমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বেলায়ও।

যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ভোগ করতে না দেওয়া হয়, তবে তারা আর ছুটাছুটি করতে পারবে না। আগুনে ইন্ধন না দিলে অগ্নিশিখা প্রোজ্জ্বল হবে কিরূপে?

কে সেই ধীর ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় ভোগ থেকে বিরত রাখেন? তিনি আত্মসন্দর্শন প্রয়াসী। কোন গুণের দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়দের বশে রাখেন? যে গুণের দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করেন তার নাম দম। দম—অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ।

> বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্ব স্বগোলকে।
> উভয়েষা-মিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ॥ বি, চূ

—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সকলকে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে স্ব স্ব স্থানে সংস্থিত করার নাম দম।

উপরতি

চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের খোরাক থেকে বঞ্চিত ক'রে গুটিয়ে নিতে হবে। উৎকৃষ্ট খাদ্য পেলেই নিকৃষ্ট খাদ্যের প্রতি লোভ হয় না। অনাসক্তি আসে। ইন্দ্রিয়গুলিকে এমন একটি বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করা চাই, যার প্রতি আসক্ত হ'লে বহির্বিষয়গুলি তাদের কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যাবে। চক্ষুকে রূপ থেকে, কর্ণকে শব্দ থেকে, নাসিকাকে গন্ধ থেকে, জিহ্বাকে রস থেকে, ত্বক্‌কে স্পর্শ থেকে অন্তরের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। এই যে বহির্বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করা এর নাম উপরতি। বাহ্য পদার্থে চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ না থাকাই উপরতি।

> বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা।—বিবেকচূড়ামণি

তিতিক্ষা

মানুষের প্রকৃতি এমনি যে যেরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সেই ভাবেই সে নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। প্রকৃতির কোলে যারা মানুষ হয়, তাদের শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সহ্য করবার ক্ষমতা অনেক বেশী; যারা বিলাসের ক্রোড়ে লালিত তাদের একটুতেই কাতর হ'তে দেখা যায়। এমনি ভাবে সুখ-দুঃখ মান-অপমান প্রভৃতির অনুভূতিতেও মানুষে মানুষে কত পার্থক্য! একজন সামান্য একটু দুঃখে অধীর হ'য়ে পড়ে, আর একজন কঠিন আঘাতেও হয়তো অনেকটা ধীর স্থির। আবার এমন লোকও আছেন যিনি সব কিছু অবিচলিত ভাবে সহ্য করতে পারেন।

সর্বপ্রকার দুঃখে শোকে আঘাতে অপমানে অবিচলিত থাকার নাম তিতিক্ষা। শুধু কি তাই? সুখে সম্পদে আনন্দের মধ্যেও স্থির থাকা চাই। কারণ জীবনে শুধু

একটানা দুঃখই আসে না, সুখও আসে—অমাবস্যায় অন্ধকারের পর পূর্ণিমার আলো। মানুষ সাধারণতঃ দুঃখের অবস্থায় ঠিক থাকতে পারে না, আবার সুখের সময়েও নিজেকে হারিয়ে ফেলে। 'বিবেকচূড়ামণি'তে তিতিক্ষার সংজ্ঞা :

সহনং সর্বদুঃখানাম প্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥ ২৫

—চিন্তা ও বিলাপ বর্জিত এবং প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হ'য়ে যে সর্বদুঃখ-সহিষ্ণুতা তাকে তিতিক্ষা বলে।

যিনি তিতিক্ষু, সহিষ্ণুতা অভ্যাস যাঁর সাধনার অঙ্গ তিনি দুঃখ সহ্য করেন তো বটেই, দুঃখের কোন প্রতিকারের চেষ্টাও তিনি করতে রাজী হন না। তিনি জানেন জলের তরঙ্গ যেমন উঠছে, পড়ছে, ভাঙছে, তেমনি দুঃখ আসবে যাবে প্রকৃতির নিয়মেই, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র—যে সয় সে রয়,যে না সয় সে নাশ হয়। নেহাইএর ওপর হাতুড়ির আঘাত পড়েই চলেছে একটার পর একটা, নেহাই অবিচল! কূটস্থবৎ অবস্থান করেন তিতিক্ষু সর্বাবস্থায়।

সমাধান

সুখ দুঃখ আসছে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের বিষয় থেকে উপরত হয়েছে—এখন তাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আকর্ষণ করতে হ'বে। হৃদয়গুহায় যে আনন্দরসঘন পরমজ্যোতি' পরমাত্মা রয়েছেন, তিনিই সেই ধ্যেয় যাঁর প্রতি হবে এই আকর্ষণ। এখন ধ্যেয় বস্তুর একাগ্রভাবে চিন্তা। তৈলধারার মধ্যে কোন ছেদ থাকে না, একটানাভাবে পড়তে থাকে, একাগ্রতায়ও কোন ছেদ নেই। ঐকান্তিকতা যত প্রগাঢ়, একাগ্রতা তত গভীর।

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্॥ বি,,চূ ২৭

অবিচলিত শুদ্ধ ব্রহ্মে যে নিরন্তর বুদ্ধিস্থাপন তার নাম সমাধান। চিত্তচালনা হ'লে তাকে সমাধান বলা যাবে না। পরমাত্ম-চিন্তায় বিভোর সাধক ভুলে যায় বহির্জগৎ, পরম প্রাপ্তির আনন্দে ফুটে ওঠে তার মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি।

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করে। শ্রদ্ধা কি? 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর শ্রদ্ধার সংজ্ঞা দিয়েছেন :

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে ॥ ২৬

শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুর উপদেশে যে সত্যবুদ্ধি অবধারণ, তা সুধীগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা নামে কথিত। সেই শ্রদ্ধা দ্বারা পরমপদার্থ ব্রহ্মবিষয়েও অপরোক্ষানুভূতি হয়।

যিনি পরমপদ প্রাপ্তির পথ দেখিয়ে দেন তাঁর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রেখে সে শাস্ত্রে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত সেই বেদান্ত শাস্ত্রকে অভ্রান্ত ব'লে ধারণা করতে হবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কেন এত বিশ্বাসের প্রয়োজন? কারণ, বিশ্বাসই সিদ্ধিলাভের মূলে। বিশ্বাস মানুষ সব কাজেই করে, বিশ্বাস না থাকলে পাথিব কোন বিষয়েই সিদ্ধি লাভ হয় না, পারমার্থিক সিদ্ধি তো দূরের কথা! মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন প্রত্যেককেই লোকে বিশ্বাস ক'রে নেয়—কার সঙ্গে কি সম্বন্ধ কেবলমাত্র শুনে বিশ্বাস ছাড়া উপায় নেই। শিক্ষক যে দিন অক্ষর পরিচয় করিয়েছিলেন, গণিতের সংখ্যাগুলি শিখিয়েছিলেন—সেদিন যদি শিশু তা বিশ্বাস না করত তাহলে আজ হয়তো সে এত বড় সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক রূপে বিখ্যাত হ'ত না। শ্রদ্ধা এমনি জিনিস যে পরমধনের অধিকারী ক'রে দেয়। শ্রদ্ধা লাভ হ'লে মায়া মোহ অজ্ঞান সব দূর হয়।

মুমুক্ষুত্ব

দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে যদি মুমুক্ষুত্ব জাগে তবেই উত্তম। মুমুক্ষুত্ব কি?

অহঙ্কারাদিদেহান্তাম্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতাম্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা ॥ বি, চূ ২৮।

আত্মস্বরূপের বোধ দ্বারা অজ্ঞান-কল্পিত অহঙ্কার থেকে দেহ পর্যন্ত বন্ধনের মোচনেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই,চিত্ত নই, অহঙ্কার নই—বা আমার—শরীর নেই, মন নেই, বুদ্ধি নেই, চিত্ত নেই, অহঙ্কার নেই—এসবই অজ্ঞানের খেলা, অজ্ঞান-বশে এগুলি 'আমি' রূপে বা 'আমার' ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে। আমাতে অজ্ঞান নেই,

আমার স্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সৎচিৎ আনন্দ। অজ্ঞান বশে আমি নিজেকে বদ্ধ মনে ক'রে কখন নিজেকে সুখী, কখন দুঃখী মনে করছি, কখন রুগ্ন শোকার্ত মূর্খ দরিদ্র রোগী আর্ত হ'য়ে হায় হায় করছি—আমি কিন্তু সকল বন্ধনের অতীত। যতক্ষণ স্বরূপের নিত্যত্ব শুদ্ধত্ব বুদ্ধত্ব মুক্তত্ব উপলব্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ আমি বদ্ধই। যতক্ষণ বদ্ধ বলে অনুভব হচ্ছে ততক্ষণ যদি আমার বন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা না জাগে তবে মহান্ অনর্থ, যদি জাগে তবে মানবজীবন কৃতকৃত্যতার দিকে অগ্রসর হবে।

মুমুক্ষুত্ব তিন রকম: তীব্র, মধ্যম ও মৃদু। মধ্যম বা মৃদু মুমুক্ষুত্বের অধিকারী হলেও বৈরাগ্য সহায়ে শমদমাদি বলে এবং গুরুর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে তীব্র বৈরাগ্যের অধিকারী হওয়া যায় এবং শেষে মোক্ষ লাভ হয়। যার তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র মুমুক্ষুত্ব তার শমদমাদি সার্থক ও ফলবান্ হয়।

কারো মাথায় যদি জলন্ত আগুন রাখা হয়, তবে সেই ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছটছট করতে থাকে। কোথায় জল, কোথায় জল?—খুঁজতে খুঁজতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। সুশীতল জল তার চাই-ই, তা নইলে যে তার শান্তি নেই। সেইরূপ তীব্র মুমুক্ষু ব্যক্তিরও মনে হয়—দুর্বার সংসার-দাবানলে আমি দগ্ধ হচ্ছি, শান্তি বারি আমাকে পেতেই হবে। চার দিকে মৃত্যুর ছায়া, সংসার যেন মৃত্যুর কূপ, বিষয় বাসনা আমাকে গ্রাস করতে চায়, এ সবের থেকে রক্ষা পেতে হবে। কোথায় সেই সাধু মহাপুরুষ যিনি নিজে ভীষণ সংসার সাগর পার হয়েছেন এবং আমাকেও পার করিয়ে দেবেন!

এমনিভাবে অনুসন্ধান করতে করতে একদিন সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি পরম কারুণিক মহাপুরুষের কৃপা লাভ করেন—যে কৃপা বসন্ত ঋতুর মলয় পবনের ন্যায় অযাচিতভাবে লোক কল্যাণ সাধনে রত।

সেই বিদ্বান্ গুরু তখন শিষ্যকে অভয় প্রদানের পর আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেন। শমদমাদি গুণের অনুশীলনে বিশুদ্ধচিত্ত শিষ্যের অন্তঃকরণে যথাকালে স্বস্বরূপ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তিনি তখন নিজেকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করেন।

পঁচিশে বৈশাখ

অরূপ ভট্টাচার্য্য

আবার এসেছে ফিরে পঁচিশে বৈশাখ
পূর্ণ হ'ল শতবর্ষ
হৃদয়ে স্ফুরিছে হর্ষ
তোমার আরতি লাগি' দিকে দিকে ওগো কবি
পড়িয়াছে ডাক
এলো ফিরে পঁচিশে বৈশাখ॥

তুমি যে বলেছ কবি শতবর্ষ পরে
তোমার কবিতাখানি
অমৃত মধুর বাণী
মর্ত্যালোকে মঞ্জু-সুরে পড়িবে যে মনে মনে
কুতূহল ভরে
ওগো ঋষি শতবর্ষ পরে॥

আমি তবে বলি আজ শতবর্ষ নয়
তুমি জ্যোতির্হাস্য রবি
চির যুগ-জয়ী কবি
তোমার অমর-বাণী যুগান্তেও রহিবে যে
এমনি অক্ষয়
শুধু মাত্র শতবর্ষ নয়!
তব মায়া-মুগ্ধ আমি, তাই বার বার
তব শুভ জন্মদিনে
গীতধ্বনি ল'য়ে বীণে
তোমারই উদ্দেশে কবি কৃতাঞ্জলিপুটে আমি
করি নমস্কার
জন্মদিনে আজি বার বার॥
এ শুভ পঁচিশে বৈশাখ
কালে কালে কাব্যলোকে শাশ্বত সত্য হয়ে থাক্॥



ডাকঘর

সঙ্কর্ষণ রায়

ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে হেস্‌দো নদীতে স্নান করতে যেতেন পুরন্দর অগ্নিভোজ। তাঁর দশ বছরের মেয়ে সরস্বতীও যেত তাঁর সঙ্গে।

স্নান সেরে অগ্নিভোজজী মেয়ের হাত ধ'রে ভজন গাইতে গাইতে ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরতেন। তাঁর গান শুনে কোলিয়ারির কলোনির ঘুম ভাঙত। তখন পূব আকাশের রক্তিমায় নতুন দিনের সূচনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছে পাখীদের কলকাকলি।

বাড়ি ফিরে অগ্নিভোজজী রান্নার উদ্যোগ করতেন। মেয়ে সরস্বতী তার অপটু হাতে তাঁকে সাহায্য করত। কুকারে রান্না চাপিয়ে বাপ-মেয়ে দু'জনে মিলে আগের রাতের হাতে-গড়া রুটি দিয়ে জলযোগ করতেন। তারপর সরস্বতী বসত তার বইদপ্তর নিয়ে পড়াশুনা করতে—তাকে পড়া বুঝিয়ে অগ্নিভোজজী ডাকঘরে এসে শুরু করতেন তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচি।

মধ্যপ্রদেশের যমুনিয়া কোলিয়ারির ডাক-তার ঘরের একাধারে ডাক ও তারবাবু অগ্নিভোজজী। স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জও রয়েছে ডাকঘরেই।

অগ্নিভোজজীর বাসার সামনের ঘরটিতে ডাকঘর। তিনি এসে তাঁর টেবিলে বসবার অনেক আগেই পিওনরা তাদের কাজ শুরু করত। সকাল ৯টার ট্রেণে সকালের ডাক যাবে—ডাকবাক্স থেকে চিঠিপত্র এনে বাছাই ক'রে শিলমোহর লাগিয়ে ব্যাগে ভরতে থাকে তারা। অগ্নিভোজজী এসে ডাকঘরের সিন্দুক থেকে বের ক'রে দেন ইন্‌সিওর ও রেজেষ্ট্রি করা চিঠিপত্র—সেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ছোট ছোট ব্যাগ তৈরী থাকে। ফর্ম ভ'রে ইন্‌সিওর করা চিঠিগুলো স্বহস্তে ব্যাগে ঢুকিয়ে দেন অগ্নিভোজজী। ঘরের মাঝখানকার টেবিলে বড় বড় মোমবাতি জ্বলে—তাতে গালা গলিয়ে ব্যাগের মুখে লাগিয়ে ডাকঘরের শিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়।

অগ্নিভোজজী দপ্তরে এসে বসতেই টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি মুখর হ'য়ে ওঠে। জরুরি সব তারবার্তা গ্রহণ করেন তিনি একের পর এক।

ইতিমধ্যে কোলিয়ারির বাস এসে দাঁড়ায় ডাকঘরের পাশে। বাওরিডাঁড় রেলস্টেশন থেকে আসছে বাসটি ভোরের ট্রেণে আসা ডাক নিয়ে। পিওনরা তাড়াহুড়ো ক'রে ডাকের ব্যাগগুলো নামিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিলকরা ব্যাগগুলো তুলে দেয় তারা বাসে। বাস একটু বাদেই আবার যাবে বাওরিডাঁড়—সকাল নটার ট্রেণ ধরিয়ে দিতে।

সকাল আটটায় ডাকঘর খোলে। তার একটু আগে আসে অগ্নিভোজজীর সহকারী রামলাল দুবে। রামলাল এসে খাম-পোস্টকার্ড-ডাকটিকিট ইত্যাদি গুছিয়ে নেয়—তারপর ঠিক আটটা বাজতেই কাউণ্টার খুলে দেয়। কাউণ্টারের বাইরে অপেক্ষমান জনতার চাহিদায় রামলাল হিমসিম খায়।

কাউণ্টারের সঙ্গে ডাকঘরের দরজাও খুলে দেওয়া হয়। দরজার ওপর যদিও প্রবেশ নিষেধ লেখা আছে, তবু অনেকে এসে ঢোকে—ঢুকে জটলা পাকায় অগ্নিভোজজীর টেবিলের সামনে।

শীর্ণ দেহ ম্লানমুখ ২৪।২৫ বছর বয়সের একটি যুবক প্রায়ই আসে ডাকঘরে। সে-ও এসে দাঁড়ায় অগ্নিভোজজীর টেবিলের সামনে। কোলিয়ারির অফিসে ডিউটিতে যাওয়ার পথে আসে।

ছেলেটির নাম অলকেশ রায়—যমুনিয়া কোলিয়ারির অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী সে। তার চাকরির মত চেহারাটিও ছোটখাট। পাঁচ ফুট লম্বা একটা ক্ষীণ অস্তিত্ব—আর পাঁচজনের মধ্য থেকে খুঁজে বের করা শক্ত। বিবর্ণ শুকনো ফ্যাকাশে দেহটার মধ্যে চোখ জোড়াই শুধু জীবন্ত। টানা-টানা সুন্দর চোখ দুটির দৃষ্টিতে সুদূর নিবদ্ধ গভীরতা ফুটে ওঠে।

অগ্নিভোজজী বিশেষ একটু স্নেহের চোখে দেখেন ছেলেটিকে। স্বল্পভাষী লাজুক ছেলেটি, মুখ তুলেও কারুর দিকে তাকায় না। সে আসে ডাক দেখতে ও ডাকটিকিট কিনতে। চিত্রবিচিত্র যে সব ডাকটিকিট বিশেষ উপলক্ষে ডাকঘরে আসে সেগুলোর ওপর ওর পক্ষপাত। অগ্নি-ভোজজী প্রায়ই সেগুলো থেকে কিছু কিছু আলাদা ক'রে রাখেন অলকেশের জন্য। সেদিন অলকেশ আসতেই তিনি বললেন, এই যে অলকেশবাবু, আপনার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী স্ট্যাম্প রেখে দিয়েছি। হঠাৎ খুশির ঝলকানিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে অলকেশের মলিন মুখখানি। ওকে খুশি হ'তে দেখে অগ্নিভোজজীর মনও খুশিতে ভ'রে ওঠে।

অলকেশ সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নেয় ডাকটিকিটগুলো। তারপর পকেট থেকে বের করে দামি নীলাভ রঙের খাম। কী একটা এসেন্সের মৃদু মিষ্টি গন্ধ খাম থেকে বেরিয়ে আসে। খুব যত্নের সঙ্গে খামে ডাকটিকিট লাগায় অলকেশ। খামের ওপর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা নাম ও ঠিকানা দু'একবার অগ্নিভোজজীর চোখে পড়েছে—চৈতালি মিত্র—ঠিকানা কলকাতা আর্ট কলেজ।

চিঠি ডাকে দিয়ে অলকেশ ডাকপিওনের কাছে গিয়ে চিঠিপত্রের স্তূপে নিজের চিঠি খোঁজে। মাঝে মাঝে তার নাম-লেখা নীল রঙের খাম বেরিয়ে আসে। পিওনের হাত থেকে চিঠিটা নিতে অলকেশের রীতিমত হাত কাঁপে। চিঠিটা নিয়েই সে বুকপকেটে রাখে—নিজের অজ্ঞাতসারে পকেটের ওপর হাত চেপে ধরে বারবার—সহস্র কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও অগ্নিভোজজী তা' লক্ষ্য করেন। চিঠি যেদিন পায় সেদিন অলকেশ অনেকটা যেন ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় ডাকঘর থেকে।

সকালের দিকে সপ্তাহে দু'বার ক'রে আসেন যমুনিয়া কোলিয়ারির ক্যাসিয়ার মোহনলাল ইন্‌সিওর করা পার্সেল খালাস করিয়ে নিতে। মোটা-সোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক—পরণে ফিনফিনে পাতলা তাঁতের ধুতি, সিল্কের গলাবন্ধ কোট। ডাকঘরে এসে অগ্নিভোজজীর সামনের টুলটিতে ব'সে বলেন, প্রণাম পণ্ডিতজী। তারপর কোটের পকেট থেকে পানের ডিবে বের ক'রে খুলে ধরেন অগ্নিভোজজীর সামনে। এক খিলি পান তুলে নিয়ে অগ্নিভোজজী বলেন, কী খবর শেঠজী?

মুখে পান পুরতে পুরতে মনোহরলাল বলেন, আপনার আশীর্ব্বাদে সবই ভাল।

সিন্দুক খুলে অগ্নিভোজজী ইন্‌সিওর করা পার্সেলটি বের ক'রে আনেন। পার্সেলটি সই ক'রে নিয়ে মনোহরলাল বলেন, পণ্ডিতজী, আপনাকে দিয়ে একটা স্বস্ত্যয়ন করাবো ভেবেছিলাম।

অগ্নিভোজজী জিজ্ঞাসা করেন—কিসের স্বস্ত্যয়ন?

মুখে এক চিমটি সুগন্ধি জর্দ্দা ঢেলে মনোহরলাল বলেন, সারা জীবন অনেক পাপই তো করেছি—আপনার মত ধার্মিক লোককে দিয়ে একটু শোঁধন করিয়ে নিতে চাই।

—আত্মশোধন করুন শেঠজী—আমাকে দিয়ে আর কী স্বস্ত্যয়ন করাবেন?

দাঁত বের ক'রে হেসে মনোহরলাল বলেন, সে কী হ'বার জো আছে! নিজেকে শোধন করবার ফুরসৎ কই! আপনার মত ধার্মিক হ'বার সময় তো আমার নেই। তাই তো আপনাকে আশ্রয় করতে চাই।

বলতে বলতে পার্সেলটি নিয়ে মনোহরলাল ডাকঘর থেকে বেরিয়ে যান।

সরস্বতী পড়া বুঝে নিতে আসে এক এক সময়। চারপাশে চিঠিপত্র নিয়ে একগাদা লোকের কর্মব্যস্ততা সে তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলে দেখে। সে ভেবে পায় না এত সব চিঠি কোথা থেকে আসে—কারা লেখে। সে একদিন অগ্নিভোজজীকে জিজ্ঞাসা করে, বাপুজী, এত সব চিঠি কার?

অগ্নিভোজজী কাগজপত্র থেকে চোখ না তুলে বলেন, কোলিয়ারির লোকেদের।

—আমাদের একটাও নেই?

—না। আমাদের আর কে লিখবে?

—কেন বাপুজী, মা তো লিখতে পারেন। তুমি ভাল করে দেখেছ তো—ও সব চিঠিপত্রের মধ্যে মার চিঠি আছে কি না?

অগ্নিভোজজী চমকে মুখ তুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকান। মেয়ে ধরা গলায় ব'লে চলে, কত দিন তো হ'য়ে গেল মা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন—কই একটাও তো চিঠি লিখলেন না!

অগ্নিভোজজীর বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে—মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বলেন, লিখবেন বৈ কি মা, শিগ্‌গিরই লিখবেন। এখন যাও তো লক্ষ্মী মেয়ে—গরুর ওপরে প্রবন্ধটি লিখে আন।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি যেন নীরব হ'তে চায় না। একটার পর একটা টেলিগ্রাম আসতেই থাকে। এদিক থেকেও প্রতি দিন অসংখ্য তারবার্ত্তা পাঠাতে হয়। অগ্নিভোজজীর হাত ব্যথা হ'য়ে যায়।

টেলিগ্রাফের সঙ্গে টেলিফোন আছে। কোলিয়ারি থেকে দিনে তিন চারটা ক'রে ট্রাঙ্ককল আসে—কলকাতার হেড অফিসে ফোন করেন কোলিয়ারির ম্যানেজার বা এজেন্ট। অগ্নিভোজজী তাঁর ওপরওয়ালাকে লিখেছেন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জন্য আলাদা একজন সহকারী নিযুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে। একা তাঁর পক্ষে সব সামলে ওঠা শক্ত। তিনি আর পারছেন না।

টাকাকড়ির হিসাব দিতে আসে রামলাল। ঘড়িতে তখন বারটা বেজেছে।

হিসাবের লেজার ও টাকাকড়ি অগ্নিভোজজীকে দিয়ে রামলাল বাড়ি চ'লে যায়—আবার বেলা দেড়টার সময় আসিবে।

অগ্নিভোজজী টাকাকড়ি সব একটা ব্যাগে ভরে ব্যাগটা শিল্ ক'রে ফেলেন—তারপর বন্ধ ক'রে রাখেন সিন্দুকে।

সরস্বতী এসে বলে, বাপুজী, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

অগ্নিভোজজী মেয়ের হাত ধ'রে ভেতরে চ'লে যান। কুকার নামিয়ে ফেলে থালা-লোটা জল দিয়ে সাফ ক'রে ফেলেন—তারপর খেতে বসেন মেয়েকে নিয়ে। এবেলা ভাতই খান—সঙ্গে ডাল ও একটা সব্‌জী। দেশের গ্রাম থেকে আনানো খাঁটি গাওয়া ঘি মেখে নেন ভাতের সঙ্গে—ডালেও ছিটিয়ে দেন। রামলাল দুবের স্ত্রী মাঝে মাঝে দু'চার রকমের আচার ক'রে পাঠিয়ে দেন। সেই আচারও থাকে।

খাওয়ার পর মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে অগ্নিভোজজী ডাকঘরে আসেন। রামলাল ততক্ষণে কাউণ্টারে এসে ব'সে তার কাজ শুরু করেছে।

বিকেলের দিকে বেশির ভাগ সময় হিসেবপত্রের লেজার বই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অগ্নিভোজজী।

সন্ধ্যাবেলায় ডাকঘর বন্ধ হ'বার একটু আগে আসে অর্ণব দত্ত—কোলিয়ারির মালিকের ছেলে। মাসখানেক হ'ল বিয়ে করেছে। স্ত্রী অরুণা আপাততঃ কলকাতায় বাপের বাড়িতে আছে। একটা নতুন বাগানবাড়ি করছে অর্ণব তার স্ত্রীর জন্য—কোলিয়ারির কলোনির বাইরে, হেস্‌দো নদীর ধারে।

ডাকঘরে ব্যস্তসমস্ত ভাব নিয়ে আসে অর্ণব—যেন তার এক মুহূর্ত্তেরও ফুর্সৎ নেই। এসেই স্ত্রীকে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠায়। বাড়ি তৈরীর কাজ কতদূর এগুলো সে খবরই থাকে টেলিগ্রামের অধিকাংশ জুড়ে।

রোজই একটা ক'রে টেলিগ্রাম পাঠায় অর্ণব—চিঠি লেখে না। অগ্নিভোজজীকে একদিন বলেছিল, আমরা হ'লাম গিয়ে কাজের মানুষ—চিঠিপত্র লেখবার সময় কোথায়?

টেলিগ্রামের বিনিময়ে অবশ্য টেলিগ্রাম আসে না—অরুণা তার স্বামীকে চিঠিই লেখে। নীলাভ খামে ভরা চিঠি—অগ্নিভোজজী লক্ষ্য করেছেন।

অর্ণবের টেলিগ্রামটি পাঠিয়ে দিয়ে অগ্নিভোজজী তাঁর দপ্তর বন্ধ করেন। বিকেল পাঁচটার সময় ডাকঘর বন্ধ হয়।

ডাকঘর বন্ধ হ'লেও জরুরি তারবার্ত্তা এলে গ্রহণ করেন অগ্নিভোজজী। এ বিষয়ে অবশ্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই—রাত্রিবেলা সাড়া না দিয়ে পরদিন সকালে ডাকঘরে এসে গ্রহণ করলেও চলে। কিন্তু অগ্নিভোজজী তা' করেন না। টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি সক্রিয় হ'লেই তিনি ডাকঘরে চলে আসেন। তিনি জানেন নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে খুব জরুরি তাগিদ না থাকলে কেউ টেলিগ্রাম পাঠায় না। তাঁর নিজের জীবনে একবার একটা জরুরি

টেলিগ্রাম এসেছিল—কিন্তু সময়মত তিনি তা' পান নি তার-বাবুর অবহেলায়। তখন তিনি পিপারিয়ার ডাকঘরে সহকারীর কাজ করেন। সন্ধ্যার পর তারবার্তা এল—কিন্তু তাসের আড্ডায় মশগুল তারবাবু তা' গ্রহণ করেন নি। পরদিন সকালে তিনি ডাকঘরে এসে পেলেন টেলিগ্রামটি—পাওয়ামাত্র কুশিয়ারা রওনা হ'লেন। পিপারিয়া থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে কুশিয়ারা—ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যায় সেখানে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌছে গেলেন সেখানে। কিন্তু স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পান নি—গিয়ে শুনলেন আধঘণ্টা আগে তিনি মারা গেছেন। রাত্রে সময়মত টেলিগ্রামটি পেলে তিনি এসে তাঁকে দেখতে পেতেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত না কি তাঁর জ্ঞান ছিল—মিনিটে মিনিটে তাঁর খোঁজ করেছিলেন।

সন্ধ্যার পর কোন তারবার্তা এলেই অগ্নিভোজজীর চোখের সাম্নে স্ত্রী অনসূয়ার করুণ মুখখানা ভেসে ওঠে। হন্তদন্ত হ'য়ে তিনি ছুটে আসেন ডাকঘরে। ডাকঘর ছেড়ে তিনি কোথাও যান না নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন না হ'লে—সর্বদা কান পেতে থাকেন টেলিগ্রাফ যন্ত্রটির উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যাবেলায় স্নান সেরে তিনি ঠাকুর ঘরে ব'সে সন্ধ্যাহ্নিক করেন। তারপর আসেন রান্নাঘরে। এবেলা শুধু রুটি করতে হয়। ওবেলার রান্না তরকারী থাকে। সরস্বতী তাঁকে সাহায্য করে। রান্না করতে করতে বার বার তিনি সরস্বতীর মুখের দিকে তাকান—কচি পাতার মত স্নিগ্ধ মুখখানাতে অনসূয়াকে দেখতে পান তিনি। অনসূয়া যেন তার সমস্ত লাবণ্য রেখে গেছে মেয়ের মুখে। অগ্নিভোজজীর বুক চিরে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

রুটি সেঁকা শেষ হ'লে বাইরে চারপাই পেতে বসেন অগ্নিভোজজী মেয়েকে নিয়ে। সরস্বতী লণ্ঠনের আলোয় সুরেলা গলায় প'ড়ে শোনায় রামচরিতমানস—চোখ বুজে শোনেন অগ্নিভোজজী।

ডাকঘরের কর্মসূচিতে দাগা বুলিয়ে যাওয়া—সেই টেলিগ্রাম-টেলিফোন, হিসেবের খাতা—যন্ত্রচালিত কর্মজীবন। রাশি রাশি তারবার্তা হলদে পাতলা কাগজে লিখে নেওয়া—অনেক উদ্বেগ, অনেক শঙ্কাভীরু প্রতীক্ষা, অসংখ্য ব্যাকুল জিজ্ঞাসা—হাজার হাজার নরনারীর হৃদয়ের স্বাক্ষর সেই কর্মপ্রবাহে মিশে গিয়ে ভেসে যায়। ডাকবাবু হিসেব করেন—কটা টেলিগ্রাম এল, কটা গেল।

সেদিন মুখে পান পুরে মনোহরলাল বললেন, পণ্ডিতজী আপনি সত্যি সত্যিই একজন ভগ্নদূত।

লেজারের খাতায় চোখ রেখে অগ্নিভোজজী বললেন, কেন বলুন তো?

—অনেক দুর্ঘটনা—দুর্বিপাকের খবর তো আপনিই এনে দিচ্ছেন। এই তো সেদিন কোম্পানির অত বড় একটা লোকসানের খবরের টেলিগ্রামে এল। টেলিগ্রামটি পড়তে পড়তে এজেন্ট সাহেবের মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠল।

অগ্নিভোজজী কিছু বললেন না—শুধু একটু হাসলেন।

নিয়মিতই আসে অলকেশ রায়—যমুনিয়া কোলিয়ারির কনিষ্ঠ কেরাণী। তার জন্য অগ্নিভোজজী আলাদা ক'রে রেখে দেন চিত্রবিচিত্র ডাকটিকিট। কিন্তু ডাকটিকিট হাতে নিয়ে আর তেমন হঠাৎ খুশির ঝলকানিতে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না তার চোখ দুটি। একটা মলিন বিষাদ সর্বদা তার মুখখানা আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। অগ্নিভোজজী লক্ষ্য করেছেন—পর পর ক'দিন ওর নামে কোন চিঠিপত্র আসে নি।

তবু রোজ নীলাভ খামে ডাকটিকিট এঁটে চিঠি ডাকে দেয় অলকেশ। নিরুত্তর নীরবতার উদ্দেশ্যে বুঝি তার নিষ্ফল পত্র প্রবাহ ভেসে যায়। রোজই পিওনের কাছে গিয়ে চিঠির খোঁজ করে অলকেশ—পিওন মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় যে তার নামে কোন চিঠি নেই। অলকেশ ম্লান মুখে ডাকঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রোজ বিকেলে অর্ণব দত্ত এসে তার টেলিগ্রাম পাঠায়। নব-পরিণীতা স্ত্রীকে রোজই জানায় বাগানবাড়ি নির্মাণের কাজ কি রকম এগুচ্ছে। বিরাট টেলিগ্রাম—পাঠাতে আধঘণ্টা সময় লাগে অগ্নিভোজজীর।

সেদিন অর্ণব নিজে এল না—কোলিয়ারির চাপরাশি মারফৎ পাঠিয়ে দিল টেলিগ্রামের ফর্ম। টেলিগ্রাফ লাইনে তখন কী একটা গণ্ডগোল হ'য়েছে। পিপারিয়ার তারঘরে টেলিফোন ক'রে অগ্নিভোজজী শুনলেন যে ঘণ্টা দেড়েক বাদে লাইনটার সংযোগ আবার পাওয়া যাবে। অর্ণবের টেলিগ্রামটি তিনি নিয়ে রেখে দিলেন।

জরুরি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে অর্ণব—স্ত্রীকে তার ক'রে জানাতে বলছে—তাদের শোবার ঘরে কোন্ রঙের ডিস্টেম্পার করাতে চায় সে—সবুজ না নীল।

বিকেল পাঁচটা বাজল। তখনো টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত হয় নি। দপ্তর বন্ধ ক'রে উঠবার উদ্যোগ করেন অগ্নিভোজজী। টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ হওয়া মাত্র তিনি অর্ণবের টেলিগ্রামটি পাঠিয়ে দেবেন—যত রাত হোক না কেন।

ভেতরে এসে অগ্নিভোজজী দেখলেন সরস্বতী তখনও তার বইখানা নিয়ে বসে আছে। এক মনে কি যেন সে লিখে যাচ্ছে খাতার ওপর ঝুঁকে। মেয়ের মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, সরস্বতী মায়ি, একেবারে যে সরস্বতী ঠাকরুণ হ'য়ে উঠেছিস। কি লিখছিস অত মন দিয়ে?

সরস্বতী খাতা থেকে মুখ না তুলেই বললে, মাকে চিঠি লিখছি। শোন না বাপুজী কি লিখেছি। লিখেছি, মাগো, তুমি চলে এস। আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার বুঝি কষ্ট হয় না!—চিঠিটা কালই পাঠিয়ে দিও বাবা।

অগ্নিভোজজী অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করেন। জানালা দিয়ে অনিমেষ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে থাকেন বাইরের দিকে—কিছু বলেন না।

রুটি সেঁকে মেয়েকে নিয়ে বাইরে চারপাইতে রোজকার মত এসে বসেন অগ্নিভোজজী। টেলিগ্রাফ-যন্ত্র তথনো নিঃসাড়—লাইন মেরামত হয় নি।

সরস্বতী সুর ক'রে পড়ে রামচরিতমানস থেকে অযোধ্যাপর্ব। হেসদো নদীর ওপারে পাহাড়ের মাথায় পশ্চিম আকাশে দিনান্তের স্বর্ণলেখার বুকে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে সন্ধ্যাতারাটি। সন্ধ্যাতারা তো নয়, যেন তাঁদের দুজনের দিকে চেয়ে থাকা অনসূয়ার অনিমেষ দৃষ্টি।

তারপর আরও অনেক তারা জেগে ওঠে আঁধার আকাশের পটে। লক্ষ তারার দীপালির নীচে শুধু নিশ্ছিদ্র আঁধার—ছোট্ট একটুখানি আলোর বৃত্তের মধ্যে সুরেলা গলায় রামচরিতমানস পড়ছে সরস্বতী। এমন সময় সামনের নিশ্চল অন্ধকার যেন নড়ে উঠল। কে যেন এগিয়ে আসছে।

অগ্নিভোজজী তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। আলোর কাছে সে এগিয়ে এল না—একটু দুরে দাঁড়িয়ে রইল।

অগ্নিভোজজী বললেন, কে?

কম্পিত স্বরে জবাব এল, আমি অলকেশ।

সোজা হ'য়ে বসে অগ্নিভোজজী বললেন, অলকে[শ] বাবু! হঠাৎ এই রাত্রে! ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন- চারপাইতে এসে বসুন।

অলকেশ এগিয়ে এল। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো[য়] অগ্নিভোজজী দেখলেন, অতি ম্লান শীর্ণ মুখ, দীপ্তিহীন চো[খ] দুটি—এ যেন সে অলকেশ নয়। তাকে দেখে মনে হচ্ছি[ল] যেন এইমাত্র সর্বস্ব খুইয়ে এসেছে সে—তার সমস্ত মু[খ]খানাতে যেন চরম রিক্ততার স্বাক্ষর। চারপাইতে এ[সে] বসল সে মুখ নীচু ক'রে। অগ্নিভোজজী স্নিগ্ধ স্ব[রে] তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার অলকেশবা[বু]। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আপনার শরীর ভ[ালো] নেই।

অলকেশ মুখ না তুলে কাঁপা গলায় বললে, কলকা[তায়] একটা ট্রাঙ্ককল্ করতে চাই পণ্ডিতজী—আর্জেণ্ট কল্।

অগ্নিভোজজী বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বললেন, কলকা[তায়] ট্রাঙ্ককল্! কিন্তু সে যে অনেক ঝামেলার ব্যাপা[র]। কানেক্‌শন পেতে পাঁচ ছ' ঘণ্টা লেগে যাবে। তা' ছা[ড়া] অনেকগুলো টাকাও খরচ হ'বে আপনার।

অলকেশ মুখ নীচু ক'রেই বলে, তা' হোক—আপ[নি] কানেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

—ভেবে দেখুন অলকেশবাবু, আপনার সারা মা[সের] মাইনের অর্ধেকটা লেগে যাবে।

অলকেশ মুখ তুলে তাকাল—অগ্নিভোজজী দেখলে[ন] শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা এক জোড়া চোখ—দেখছে ত[বু] দেখছে না। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে জীবনের স্পন্দন নে[ই]। অলকেশ ক্ষীণ নিষ্প্রাণ স্বরে বললে, কলকাতায় ট্রাঙ্ক[কল] আমাকে করতেই হবে পণ্ডিতজী।

অগ্নিভোজজী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ডাক[ঘরে] গেলেন—তার পেছনে পেছনে এল অলকেশ।

অলকেশ তাঁকে টেলিফোন নম্বরটি দিল। অ[গ্নি]ভোজজী জিজ্ঞাসা করলেন, কার নামে কল্‌টা বুক ক[রব] অলকেশবাবু?

অলকেশ কম্পিত স্বরে বললে, চৈতালি মিত্র। না[ম] উচ্চারণে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম জীবন্ত হ'য়ে ওঠে

গলার স্বর। তার বুকের সমস্ত মধু যেন ঢেলে দেয় নামটির ওপর।

অগ্নিভোজজী তার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন যেন তার ফ্যাকাশে মুখে একটু রক্তের ছোপ লেগেছে।

পিপারিয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অলকেশের নামে ট্রাঙ্ককল্ বুক করেন অগ্নিভোজজী—ফোন নম্বর ও নাম জানিয়ে রিসিভারটি রেখে দিলেন। তারপর অলকেশের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, কানেকশন যে কখন পাবেন তার ঠিক নেই। চার পাঁচ ঘণ্টার আগে নয়। এখন চলুন বাইরে গিয়ে বসি।

অলকেশ বললে, আমার জন্য ব্যস্ত হ'বেন না পণ্ডিতজী—আমি এখানেই ব'সে থাকব।

ডাকঘর থেকে কিছুতেই নড়ান গেল না অলকেশকে। বাইরে চারপাইতে এসে তিনি বসতেই ডাকঘরের সাম্নে এসে দাঁড়াল নতুন মডেলের উইলিস জীপ। গাড়ি থেকে নামল অর্ণব দত্ত।

অর্ণব ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে অগ্নিভোজজীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার টেলিগ্রামটি পাঠিয়ে দিয়েছেন তো?

অগ্নিভোজজী জবাব দিলেন, না। টেলিগ্রাফ লাইন খারাপ হ'য়ে আছে— এখন পর্যন্ত মেরামত হয় নি।

অর্ণব অগ্নিভোজজীর কথা শুনে অগ্নিশর্মা হ'য়ে ওঠে। প্রায় চিৎকার ক'রে সে বলে, আমার চাপরাশিকে সে কথা ব'লে দেন নি কেন?

—তখন পিপারিয়া থেকে আমাকে জানিয়েছিল যে আধঘণ্টার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত হ'য়ে যাবে—কাজেই বলার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি নি। লাইন মেরামত হ'তে যে এতক্ষণ লাগবে তা' তো জানতুম না। আপনি যদি চান আপনার পয়সা রিফাণ্ড দিয়ে আপনার টেলিগ্রামটিও ফেরৎ দিয়ে দিই।

অর্ণব অগ্নিভোজজীর কথায় কর্ণপাত না ক'রে ব'লে যেতে থাকে, শোবার ঘরে কি রঙের ডিস্টেম্পার হ'বে আমার ইমিডিয়েটলি জানা চাই—অরুণা যে কি রঙ ভালবাসে তা' তো জানি নে। না জেনে অর্ডার পাঠাতে পারছি না। কালকে স্টোর ক্লার্ক পিপারিয়া যাচ্ছেন—তাঁর মারফত অর্ডারটা পাঠাব ভেবেছিলাম। এদিকে টেলিগ্রাফ লাইনে গড়বড়! কী যে করি!

অগ্নিভোজজী বললেন, ঘাবড়াবেন না দত্তসাহেব—কাল সকালের মধ্যেই লাইন ঠিক হয়ে যাবে। যত রাত হোক না কেন, লাইন কানেক্শন হওয়া মাত্র আমি আপনার টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব।

অর্ণব বললে, চুলোয় যাকগে। অরুণাকে এক্ষুণি আমি একটা ট্রাঙ্ককল্ করব—আর্জেণ্ট কল্।

—ট্রাঙ্ক কল্! কিন্তু—

—কিন্তু কী! টেলিফোন লাইনটারও বারটা বেজেছে নাকি!

—তা' নয়। কিন্তু লাইন তো এন্‌গেজড্। একটু আগে একটা আর্জেণ্ট কল্ বুক করা হ'য়েছে, আপনার নামেও একটা কল্ বুক করতে পারি—কিন্তু সেটার কানেক্শন তো পরে দেবে—আগেরটা আগে—কানেক্শন পেতে আপনার অন্ততঃ দশ ঘণ্টা লেগে যাবে।

—কে বুক করেছে?

অলকেশ রায়—আপনাদের কোলিয়ারির অফিসের কেরাণী।

অর্ণব ভুরু কুঁচকে তিক্ত স্বরে বললে, আমাদের অফিসে সামান্য একজন কেরাণী—তার কল্ পাবে প্রাওরিটি। ক্যানসেল ক'রে দিন তার কল্!

অগ্নিভোজজী গম্ভীর মুখে বললেন, সে তো আমি পারি না।

অর্ণব ঝাঁঝালো স্বরে বললে, কোথায় সেই লোকটা! দেখে নেব আমি ওর ঘাড়ে কটা মাথা যে কল্ ক্যানসেল না ক'রে পারে।

—ডাকঘরের মধ্যে ব'সে আছেন অলকেশ বাবু।

অর্ণব দ্রুত পদক্ষেপে ডাকঘরে ঢুকল। তাকে দেখে হন্ত দন্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল অলকেশ।

অলকেশের আপাদমস্তক জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে লেহন ক'রে অর্ণব বললে, শুনলাম তুমি একটা আর্জেণ্ট কল্ বুক করেছ। সেটা ক্যানসেল করে দাও এক্ষুণি। আমাকে এক্ষুণি একটা জরুরি টেলিফোন করতে হবে কলকাতায়।

অলকেশ একবার অর্ণবের মুখের পানে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল—তারপর ক্ষীণ অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, তা হয় না স্যার। বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই আর্জেণ্ট কল্ বুক করেছি।

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে অর্ণব ফেটে পড়ে, ক্যানসেল করতেই হবে তোমাকে। নইলে তোমার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

অলকেশ তেম্নি মুখ নীচু ক'রে বলে, ক্যানসেল আমি কিছুতেই করব না—মিথ্যে আপনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন।

দুঃসহ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে অর্ণব চিৎকার করতে থাকে, তোমাকে দেখে নেব আমি—কালই দেখে নেব। সামান্য একটা কেরাণী, তার এমন আস্পর্ধা! তোমার মত ছুঁচোকে টুঁটি টিপে মারতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগবে না।

ব'লে ঝড়ের বেগে ডাকঘর থেকে বেরিয়ে গেল অর্ণব। কয়েক সেকেণ্ড বাদে জীপ ষ্টার্ট করার শব্দ শোনা গেল।

অলকেশ আবার ব'সে পড়ে চেয়ারে। টেবিলের ওপর ডান হাতটা রেখে হাতের আঙুলগুলো দিয়ে কপাল চেপে ধরে।

অগ্নিভোজজী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত রাখলেন—তারপর স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন, অলকেশ-বাবু, আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি যে আপনার খাওয়া হয় নি।—বোধ হয় সারাদিন কিছু মুখে দেন নি। চলুন, আমার সঙ্গে কিছু খাবেন।

মাথা নেড়ে অলকেশ বললে, না পণ্ডিতজী—খাওয়ার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

—তবু কিছু মুখে দিন। পুরোপুরি উপোস করলে শরীর তো টিঁকবে না অলকেশবাবু।

—আমাকে ক্ষমা করুন পণ্ডিতজী। কিছুতেই আমি পারব না খেতে এখন।

অগ্নিভোজজী আর তাকে বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। সরস্বতীকে নিয়ে ভেতরে চ'লে গেলেন তিনি। যাবার আগে অলকেশকে বললেন, টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলেই আমি চলে আসব অলকেশবাবু। আমার মেয়েটা আবার একা শুতে ভয় পায়—নইলে আমি আপনার কাছেই বসে থাকতাম। ঘাবড়াবেন না—আমি সজাগই থাকব।

অলকেশ বললে, আমার জন্য ব্যস্ত হ'বেন না পণ্ডিতজী—আমি দিব্যি ব'সে থাকতে পারব।

রাত্রের খাওয়া সেরে মেয়েকে ঘুম পাড়ান অগ্নি-ভোজজী। গল্প না বললে মেয়ের ঘুম আসে না। তোতা ময়নার গল্প বলেন তাকে। সরস্বতী চোখ বড় বড় ক'রে শোনে।

ঘুমোবার আগে সরস্বতী বলে—বাপুজী, আমি মাকে যে চিঠিটা লিখেছি তা' ডাকে দিয়ে দিও কাল।

অগ্নিভোজজী ম্লান হেসে বললেন, দেব বৈকি মা।

—মা চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই জবাব দেবেন—না বাপুজী? তারপর চ'লে আসবেন আমাদের কাছে।

অগ্নিভোজজী ধরা গলায় বললেন, হ্যাঁ মা।

সরস্বতী ঘুমিয়ে পড়ে।

অল্পক্ষণ বাদেই টেলিফোন বেজে ওঠে। অগ্নিভোজজী ডাকঘরে এসে রিসিভার তুলে বলেন, হ্যালো পিপারিয়া, হ্যাঁ যমুনিয়া কোলিয়ারি থেকে বলছি। ট্রাঙ্ককলের কানেকশন হয়েছে? হ্যাঁ ফোর-সিক্স-থ্রি-ফাইভ-টু-ফোর—হ্যাঁ চৈতালি মিত্র। কী—চৈতালি মিত্র বাড়ীতে নেই? ওর দাদা বীরেন মিত্র আছেন? আচ্ছা, ধরুন।

তারপর রিসিভারের মুখটি হাত দিয়ে চেপে ধ'রে অগ্নিভোজজী অলকেশকে বললেন, কথা বলবেন নাকি বীরেন মিত্রের সঙ্গে?

অলকেশের মুখখানা অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠেছে—ঢোঁক গিলে সে যেন আত্মগতভাবে বলতে থাকে, চৈতালি বাড়ি নেই! কোথায় গেল।

অগ্নিভোজজী বলেন, বলুন অলকেশবাবু, বীরেন মিত্রের সঙ্গে কথা বলবেন নাকি।

ঢোঁক গিলে অলকেশ বলে, হ্যাঁ বলব। বীরেনদা হয়তো—হয়তো—

অগ্নিভোজজী রিসিভারের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, হ্যালো পিপারিয়া, হ্যাঁ অলকেশ রায় বীরেন মিত্রের সঙ্গে কথা বলবেন। আসুন অলকেশবাবু।

কম্পিত হস্তে রিসিভারটা কানে তুলে নেয় অলকেশ। কম্পিত স্বরে বলতে থাকে, বীরেনদা—হ্যাঁ আমি অলকেশ। রাত হ'য়েছে অনেক···কিন্তু—কিন্তু—বীরেনদা···ঘুমোচ্ছিলেন!···কিন্তু রাত্রে ছাড়া সহজে কানেকশন পাওয়া যায় না···বীরেনদা···চৈতালি!···বাড়ি

নেই! কোথায় গেছে? মুসৌরী! ক-কবে আসবে··· সুগত চৌধুরীর সঙ্গে গেছে!···সু-সুগত!

অগ্নিভোজজী দেখলেন অপ্রতিবিধেয় পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা যেন অলকেশের শীর্ণ মুখের রেখাগুলিতে ফুটে বেরুচ্ছে।

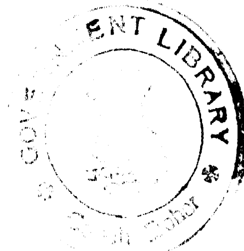
রিসিভারটি আস্তে আস্তে রেখে দিল অলকেশ। বাইরের অন্ধকারের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে অগ্নিভোজজীকে ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কত টাকা লাগবে?

অগ্নিভোজজী বললেন, চল্লিশ টাকা। অসুবিধে হ'লে দেবেন না—আমি ম্যানেজ ক'রে নেব।

অলকেশের ফ্যাকাশে মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে—সে হাসির চেয়ে করুণতর কখনো কিছু দেখেন নি অগ্নিভোজজী। অলকেশ বললে, অসুবিধে কী আর!

ব'লে সে চল্লিশ টাকা বের ক'রে দিল পকেট থেকে—তারপর আর একটি কথাও না ব'লে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারের মধ্যে।

পরদিন থেকে অলকেশ আর ডাকঘরে আসে না। মনোহরলালের কাছে অগ্নিভোজজী শুনলেন যে চাকরি থেকে বরখাস্ত হ'য়েছে অলকেশ। তারপর সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না।



রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ইন্দিরা দেবী

শ্রীজয়দেব রায়

পরিণত বয়সে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর দেহান্ত ঘটিয়াছে—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক যুগের অবসান ঘটিল। জোড়াসাঁকো পরিবেশে যাঁহাদের পরিবেষ্টনীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিসাধনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নিকট হইতে অহরহঃ অনুপ্রেরণা পাইয়া নব নব সুর সৃষ্টির মোহে মাতিয়াছিলেন, যাঁহারা গানগুলিকে স্বরলিপির বন্ধনে সুরক্ষিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন—তাঁহারা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ পূর্তির পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রতিভা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ তো কবির পূর্বেই বিদায় লইয়াছেন—সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবীও চলিয়া গেলেন।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে গীতিচর্চার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে তাঁহাদের পরিবারের পরিবেশ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিজের ছিল সঙ্গীতে পরমোৎসাহ; নিখুঁত সুরে তানমানলয় অক্ষত রাখিয়া তাঁহার গৃহে সঙ্গীতচর্চা করিতে হইত। তাঁহার জীবনীকার এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"উৎসবের চার পাঁচ দিন পূর্ব হইতে, যে-সব সঙ্গীত সংকীর্তন হইবে, মহর্ষির সম্মুখে বসিয়া তাহার তালিম দেওয়া হইত, তানমান সুরের ব্যতিক্রম হওয়ার জো নাই, একটু এদিক-ওদিক হইলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যে-পর্যন্ত না তানমানলয় সমস্ত ঠিক হইত, ছাড়িতেন না।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সঙ্গীতের জন্য ভাগবতী গীতি রচনার একটা রেওয়াজ ছিল তাঁহার গৃহে, তিনি এবং তাঁহার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সকলেই প্রচলিত হিন্দীগানের সুর অবলম্বনে 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' নামে রাগপ্রধান ভাগবতী গীতি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে ব্রাহ্মসমাজের জন্য নিযুক্ত গীতিশিক্ষকগণ তাঁহার গৃহে সসমাদরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রভৃতি গায়কগণের নিকটে ঠাকুর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে মাঘোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেসকল সঙ্গীতানুষ্ঠান হইত, তাহারই অনুকরণে বাড়ির ছেলেমেয়েরা খেলা করিত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলার অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।"

এইরূপ পরিবেশে এই ভাবেই মানুষ হইয়া উঠেন ইন্দিরা দেবীও। তিনি বলিয়াছেন—"সরলাদিদিও আমার মত এক সময়ে লোরেটো ইস্কুলে যেতেন, কিন্তু কেবল বাজনা শেখার জন্য—লেখাপড়ার জন্য নয়, আর ফিরে এসে এক একবার দুজনেই তেতালায় ছুটতুম পিয়ানোর কাছে কে আগে পৌঁছবে, কে আগে টুলে বসে বাজাবে সেই চেষ্টায়। গান বাজনা যেন আমাদের পক্ষে ডাল ভাতের মত উপজীব্য এবং দৈনিক কার্যের মধ্যে গণ্য ছিল। মাঘোৎসবে বাড়ীর মেয়েদের উঠানে বসে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।"

ইন্দিরা দেবীর পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের প্রথম স্বদেশী গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়া যশস্বী হন। তিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী। কথিত আছে, ইন্দিরা দেবীর মাতা

জ্ঞানদানন্দিনীকে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতেন। জ্ঞানদানন্দিনীর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, ভারতী পত্রিকায় তাঁহার বহুলেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বালক।' অভিনয়েও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' অভিনয় হইয়াছিল ঠাকুর-বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে, তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন দেবদত্ত, জ্ঞানদা-নন্দিনী সুমিত্রা, রবীন্দ্রনাথ রাজা। ইহা লইয়া সে সময়ে বহু সমালোচনা হয়। ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—

"রাজা ও রাণী প্রথম যেবার হ'ল—মনে আছে তার পরদিনই বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুর বাড়ীর নূতন ঠাট' নামে একলেখা বেরুল, তাতে প্রত্যেক ভূমিকায় অবতীর্ণ পাত্রের নাম পাশে পাশে দেওয়া আছে। তার অর্থ এই যে, কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সেজেছিলেন, সেইটে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, যথা ভাসুর ভ্রাতৃবধূ।" শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁহার পিতামাতার সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারিণী।

শিশু বয়স হইতেই ঠাকুরবাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েদের মতো ইন্দিরা দেবীও রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে শুরু করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র সঙ্গীত রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—"কথা ফোটবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভানুসিংহের পদাবলী গাইতে আরম্ভ করেছি 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।' বেশ মনে আছে, তখন 'ইন্দু' কথাটার মানে জানতুম না, অথচ সিমলা পাহাড়ে বসে গেয়ে যাচ্ছি 'ঢালে ইন্দু অমৃত ধারা।"

রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত বহু গান এই ভাবেই ইন্দিরা-প্রতিভা ও সরলা দেবীর কণ্ঠেই প্রথম রূপায়িত হইয়া উঠে।

শ্রীমতী সরলা রায় বেথুন স্কুলের সাহায্যার্থে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্র-নাথকে বালিকাদের উপযোগী একটি গীতিনাট্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। এইভাবেই রচিত হয় সখী সমিতি কর্তৃক অভিনীত 'মায়ার খেলা।' এই গীতিনাট্যে সঙ্গীত ও অভিনয়ে ইন্দিরা দেবীও অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—"বেথুন স্কুলে তার সাহায্যার্থে 'মায়ার খেলা'র গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয়ে আমরা ঘরের মেয়ে অনেকে নেমেছিলুম ও সরলাদিদি একজন নায়ক সাজাতে সকলে বলেছিল বাপের সঙ্গে খুব আদল আসছে।"

ইহার পূর্বেও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যে সকল গীতোৎসব হইয়াছে প্রত্যেকটিতে ইন্দিরা দেবীও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন—"আমি ও ঊষাদিদি কাল-মৃগয়ায় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডান হাতের ভঙ্গীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প ক'রে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম যুগের গানের একমাত্র ভাণ্ডারী-রূপে এই সেদিন পর্যন্ত তাঁহার নিকটেই গীতরসিকদের বারবার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"দুটি পুরানো গীতি-নাটিকাকে উদ্ধার করায় আমার কিছু হাত ছিল 'কাল মৃগয়া' আর 'ভানু সিংহের পদাবলী।' ভানু সিংহের পদাবলীর যে অল্পসংখ্যক গান জানতুম, সেগুলিকে সাজিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই নাটিকাটি অভিনীত হয়।"

রবীন্দ্র সঙ্গীতের গানের অপর ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার এই সুর সম্পর্কে চুক্তি হইয়াছিল—"দিনুর সঙ্গে রবিকাকার গানের সুর সম্বন্ধে আমার তর্ক হলে এই একটি চুক্তি ছিল যে, নতুন গানের সুর সম্বন্ধে তার কথা মানব, কিন্তু পুরানো গানের বেলায় নয়।"

ইন্দিরা দেবীর রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুশীলন রবীন্দ্রনাথেরই পদপ্রান্তে বসিয়া, তাই তাঁহার পুঁজি রবীন্দ্রনাথেরই সুর। তিনি এই প্রসঙ্গ স্মরণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—"আমি রবিকাকার কাছে আলাদা ক'রে বসে কখনো গান শিখেছি ব'লে মনে পড়ে না। কেবল বাড়ীময় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়ীতে পিয়ানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দু-একটা গান শেখাতে চেয়েছেন বলে মনে পড়ে—যেমন, 'কে গো অন্তরতর সে' প্রভৃতি। আর আমার গান শিখতে দেরি হয় ব'লে মন্তব্য করায় আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতচর্চায় কিরূপ উৎসাহ দিতেন সেই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী বলিয়াছেন—"তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে অপটু প্রচেষ্টাকেও কোনদিন নিরুৎ-সাহ করেননি। মনে আছে আমাকে, আমার দাদা সুরেনকে, আর সরলা-দিদিকে রবিকাকা একবার 'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির উপর একটি স্বরসন্ধিযুক্ত পিয়ানোর গৎ রচনা করিতে বলেছিলেন।"

বিলাতী গানের চর্চাতে রবীন্দ্রনাথ অধিক উৎসাহ দিতেন। সরলা দেবীও বলিয়াছেন—"বাড়ীতে শেখা দেশী গান বাজনায় শুধু নয়, মেমেদের কাছে শেখা য়ুরোপীয় সঙ্গীতচর্চায়ও আমাদের উৎসাহদাতা ছিলেন রবিমামা।"

ইন্দিরা দেবী বিলাতী সঙ্গীত এবং পিয়ানো ও বেহালা বাদ্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লোরেটো কনভেন্টে তিনি সেন্টপলস ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট স্লেটারের নিকট পিয়ানো এবং ম্যানজাটো নামক এক ইটালীয়ানের কাছে বেহালা শিখিয়াছিলেন। এমন কি, কেম্ব্রিজের 'ট্রিনিট কলেজ অব মিউজিকে'র ইন্টারমিডিয়েটও তিনি পাস করিয়াছিলেন। বিলাতে থাকাকালেও তিনি ইংরেজী গানের চর্চা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে (১৮৭৮) ইন্দিরা দেবীর সঙ্গেই বিলাতে বিলাতী গানের চর্চা করিতেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা বলিয়াছেন—

"আইরিশ কবি টমাস মুরের আইরিশ মেলডিজ তখন খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে 'দি লাষ্ট রোজ অব সামার' নামে একটি গান আমি ফিরতি বেলায় জাহাজের কাপ্তেনকে গেয়ে শুনিয়ে ছিলুম, একটু একটু মনে পড়ে।"

এই আইরিশ মেলডিজ-এর সুর অনুকরণে কবি রচনা করেন

ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন এখন। এখন একটা সত্য কথা আপনাকে আমাদের বল্‌তে হবে। আসামীকে চাকরি দেবার পূর্বে আপনি নিজে তো তাকে চিনতেন না? কিন্তু আপনার স্ত্রী বা বাড়ীর আর কেউ কি তাকে আগে থেকে চিনতেন?

উঃ—না না না। আমরা কেউই তাকে আগে হতে চিনতাম না। ও এখন বলুক আমাদের খোকন কোথায়? আমার স্ত্রীকে বালিকা বললেই চলে। তার এখন বয়স মাত্র সতের। এই তার প্রথম সন্তান। খোকাকে কয় ঘণ্টা না দেখায় সে বারে বারে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এখন খোকা খুন হয়েছে শুনলে সে আর বাঁচবেই না। আর আমিই কি এরপর বেঁচে থাকবো? আমাকে একবার আসামীর সঙ্গে কথা বলতে দিন। ও আমার কাছে সত্য কথাই বলবে।

প্রঃ—আর একটা মাত্র বিষয় আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। এরপর আমি আসামীকে পুনরায় এ ঘরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে আনবো। সেই চাকরী হতে বরখাস্ত বাঙালী কম্পাউণ্ডার কি এর মধ্যে আপনার গুজরাটী কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে দেখা করেছে? এদের দুজনার মধ্যে ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব বা আলাপসালাপ হয়ে যায় নি তো?

উঃ—আজ্ঞে, এ সব কথা ভগবান জানেন। এক বৎসর আগে তাকে আমি চাকুরি হতে বিদায় দিয়েছি। তারপর থেকে তাকে এ অঞ্চলে কখনও দেখিনি। তার নাম আমার মনে আছে। কিন্তু তার পিতার নাম ও তার ঠিকানা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারবো না।

ডাক্তার প্যাটেলের পূর্বতন বাঙালী কম্পাউণ্ডার তার পরবর্তীকালীন গুজরাটী কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে তার বরখাস্তের একবছর পর প্রতিশোধার্থে কোনও প্রকার যোগসাজস যে করবে, এইরূপ কোনও সন্দেহ আমাদের মনে স্থান পায় নি। কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাই তদন্তের ব্যাপারে প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি। এই জন্য আমরা ডাক্তারবাবুর পূর্বতন বাঙালী কম্পাউণ্ডারের খোঁজ খবর করছিলাম। আপাতত তদন্তের এই দিকটায় আর অগ্রসর না হয়ে আমি সিপাহীদের আসামীকে পুনরায় আমার ঘরে আনবার জন্য হুকুম দিলাম। একটু পরে আসামী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে নতমস্তকে নির্বাক নিশ্চল ভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই সময় ডাক্তার প্যাটেল ছুটে এসে তার কাঁধ দুটো দুই হাতে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে কি? তুই তাকে খুন করেছিস?'—দুই হাতে নিজের চোখের জল মুছে আসামী উত্তর করলো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি তাকে খুনই করেছি। কিন্তু এজন্য আপনাকে আমাকে ক্ষমা করতে বলবো না।'

আসামীর এই জবাবে ডাক্তার প্যাটেল ছিন্নমূল বৃক্ষকাণ্ডের মত অতর্কিতে জ্ঞানহারা হয়ে থানার অফিস ঘরের মেঝের উপরেই লুটিয়ে পড়লেন। ডাক্তার প্যাটেলকে এইভাবে সশব্দে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—আসামীই এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি মাটির উপর বসে পড়ে ডাক্তার প্যাটেলের মাথাটা সস্নেহে তার কোলের উপর তুলে নিয়ে 'জল—জল' করে হাঁক ডাক শুরু করে দিলে। তাকে ডাক্তার প্যাটেলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দেখে আমার সহকারী সুরেনবাবু ক্ষেপে উঠে একজন সিপাহীকে তাকে টেনে হিঁচড়ে ওখান হতে তুলে হাজত ঘরে নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমি ইশারায় তাঁকে এই ব্যাপারে নিষেধ করে ডাক্তারকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তাঁর এমন কিছুই হয় নি। ইতিপূর্বেই আমার অপর সহকারী অপহৃত বা নিহত শিশুটির একটা ফটো চিত্র আমার পূর্ব নির্দেশমত প্যাটেলদের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছিল। আমি কাগজে মোড়া সেই ফটোখানি তার হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিলাম। এর পর আমার নির্দেশমত আমার সহকারী ডাঃ প্যাটেলকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে আমি ঐ ফটোটি আসামীর চক্ষের সামনে মেলে ধরে বলে উঠলাম, 'এমন সুন্দর তুলতুলে নরম খোকাকে তুমি খুন করেছ! অথচ একটু আগেই তুমি বললে—তুমি তাকে না কতোই ভালোবাসো। আর কতো মিথ্যে বলবে তুমি?' আসামী অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ ঐ শিশুর ফটোটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে নীচের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, 'আজ্ঞে, আমি আর কোনও কথাই গোপন

করবো না। এখুনি আপনি আপনাদের কাগজ পত্র নিয়ে বসুন। আমি আপনাদের কাছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই খুন সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিতে চাই।' এরপর স্বভাবতই আসামীর বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু আমার সহকারী মাল-খানা হতে নূতন একটা ডায়েরি বুক আনতে অস্বাভাবিক রূপে দেরী করে ফেললো। এর মধ্যে আবার আরও দুই তিনটি প্রভাবশালী নাগরিক কার্যব্যপদেশে থানায় এসে উপস্থিত। এদের সঙ্গে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলে তাদের বিদায় দিয়ে আমি আসামীর বয়ান লিপিবদ্ধ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু এইটুকু সময়ের ব্যবধানে আসামী তার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সুস্পষ্টভাবে সে এইবার আমাকে জানিয়ে দিলো যে, সে মরে গেলেও খুন সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেবে না। এর পর আমি আসামীকে পাশের অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সহকারীকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললাম। এ'বার দরজার সিপাহীকে সেখানে অন্য কাউকে আসতে দিতেও বারণ করে দিলাম। বাহিরের লোকেদের এই নিরালা ঘরে হঠাৎ এসে আসামীর অনুকূল মানসিক অবস্থা পূর্বের ন্যায় বিপর্যস্ত করে দেবার আশঙ্কা কম ছিল। আমি এইখানে এসে দৃঢ় স্বরে আসামীকে জানালাম যে তার খুন সম্পর্কীয় বিবৃতিটি আদপেই সত্য নয়। এবার থানায় এসে খুন সম্পর্কে একটা মিথ্যা এজাহার দেবার জন্যে তাকে আমরা অভিযুক্ত করবো।' আমি এতক্ষণ আসামীর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ও তার হাবভাব লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম যে, 'সে নিশ্চয়ই একজন অপরাধ-রোগী হবে। প্রকৃত পক্ষে সে কোনও এক স্বাভাবিক নীরোগ অপরাধী ছিল না। খুন যদি সে করেও থাকে, তা'হলে তা সে তার তৎকালীন অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার কারণেই করেছে। যাই হোক আমার উপরোক্ত বাক্যবিন্যাস সময়োচিত হয়েছিল। এই সকল অপরাধ-রোগীদের কেহ কেহ খুন করেছে কেবল মাত্র পুলিশের কাছে বিবরণ দেবার উত্তেজনা উপভোগ করবার জন্য। অপরাধ-রোগীদের আবার বহু উপশ্রেণী আছে। এই আসামীকে একজন অপরাধ-রোগীরূপে বুঝলেও সে কোন্ উপশ্রেণীর অপরাধ-রোগী, তা আমি সে সময় বুঝতে পারি নি। এজন্য তাদের পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু এখুনি এই সব সংবাদ সংগ্রহ করার আমার সময় কোথায়? এখুনি এর নিকট হতে একটি বিবৃতি আদায় না করতে পারলে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ডাঃ প্যাটেলের ঐ শিশুপুত্রটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। কোনও নিরালা স্থানে বা বনানীতে ঐ হতভাগ্য শিশুটিকে যদি সে তার উন্মাদনার মধ্যে রেখে এসে থাকে, তা'হলে বেঁচে থাকলে ক্ষুধার তাড়নায় বা বন্যজন্তুর আক্রমণে সে নিহত হবে এবং সত্য সত্য নিহত হয়ে থাকলে শিয়াল প্রভৃতি জন্তুর হেঁচড়া হেঁচড়িতে তার মৃত দেহটা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমার এক কথার মারপ্যাচে আসামী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বহু স্বাভাবিক-মনা সাহিত্যিকদেরও তাঁদের আরম্ভ করা গল্পটি শেষ করবার সুযোগ না পেলে এইরূপ ভাবেই আমি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে দেখেছি। আমি জানতাম যে এই অস্বাভাবিক-মনা আসামী এই সম্পর্কে ক্ষুব্ধ তো হবেই, উপরন্তু সেই সঙ্গে তার মনের মধ্যে এক-প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণাও অনুভব করবে।

আমি তার কাহিনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা মাত্র সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বেশ বোঝা গেলো যে সম্পূর্ণভাবে কাহিনীটি ব্যক্ত না করে সে মনে শান্তি পাবে না। কিন্তু এও আমি জানতাম যে মনের শান্তি ফিরে পাওয়া মাত্র সে পুনরায় অবাধ্য হবে ও এই সম্পর্কে আর একটি কথাও প্রকাশ না করে মিথ্যার পর মিথ্যার অবতারণা করবে। তবু যতটা সংবাদ তার কাছ হতে সংগ্রহ করা যায়, তা মন্দের মধ্যে ভালো তো বটে। এরপর আসামী স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তার বিবৃতি বলে যেতে থাকে এবং আমিও মধ্যে মধ্যে সুচতুরভাবে বাক্‌প্রয়োগদ্বারা তার মনের এই উত্তেজনা অব্যাহত রাখবার চেষ্টা করি। তার মনটাকে এই ভাবে উত্তেজিত করে না রাখতে পারলে তার কাছ হতে এই ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ বিবৃতি আদায় করা সম্ভব হ'তো না। এই দিন সে খুন সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছিল তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার নাম অমুক———আমার পিতার নাম

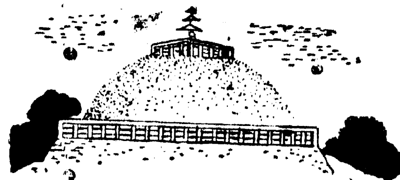
——। আমার আদি নিবাস গুজরাটের অমুক জিলার অমুক থানার অন্তর্গত অমুক গ্রামে। আমার বর্তমান বাসস্থান——নং সেণ্ট্র্যাল অ্যাভিনিউ, কলকাতা। আমার পেশা কম্পাউণ্ডারি। গত এক বৎসর যাবৎ আমি ডাঃ প্যাটেল নামক এক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর অধীনে কর্মরত আছি। ডাক্তার প্যাটেলও সপরিবারে ঐ বাড়ীতে বসবাস করেন। আমি তাঁর নিকট হতে মাসিক বেতন স্বরূপ ৭৫২ টাকা পেয়ে থাকি। আমি বোম্বের অমুক প্রতিষ্ঠান হতে কম্পাউণ্ডারির সার্টিফিকেট পেয়েছি। আমার সার্টিফিকেটের রেজিস্টার্ড নম্বর—বোম্বে ২৭৬৬। আমার স্বগ্রামে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ছাড়া আর কেউই বাস করে না। ঐ স্থানের জমিজমার আয় হতে তিনি সংসার-যাত্রা নির্বাহ করেন। কলিকাতা হতে তাঁর খাইখরচা বাবদ টাকা পাঠাবার আমার কোন দিনই প্রয়োজন হয় নি। ডাঃ প্যাটেলের গৃহের অন্দরে যাওয়ার পক্ষে আমার কোনও বাধাবিঘ্ন ছিল না, প্রকৃত পক্ষে তাঁদের সহিতই আমি আহারাদি করতাম। তাঁরা তাঁদের পরিবারভুক্ত ব্যক্তির মতই এযাবৎকাল আমাকে সম্মান দিয়েছেন। এই খুনের প্রারম্ভিক কারণের সহিত আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। এইজন্য প্রথমে আমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আপনাদের আমি অবহিত করতে চাই। আমি আমার বাপ-মার এক অবৈধ সন্তান। এর কারণ এই যে, আমার মাতা ও পিতা বিদেশে এসে স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করলেও শাস্ত্রসম্মত কোনও বিবাহ বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ হন নি। আমার পিতা একজন সরকারী অফিসার ছিলেন। আমার মা ছিলেন একজন হিন্দু নারী। মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। একই সরকারী কোয়ার্টারের দুইটি পরস্পর সংলগ্ন ভবনে অবস্থানের সময় ওঁদের নিজেদের মধ্যেও একটী অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বহুকাল পর্যন্ত আমি আমার এই পালিকা মাতাকে নিজের মা বলেই জানতাম।

আমি বড়ো হওয়ার পর বাড়ীর সকলে তাঁদের এক মুসলমান আত্মীয়ের সঙ্গে আমার সাদি দিতে চান। কিন্তু আমার মা (পালিকা মাতা) আমার এই বিবাহে কিছুতেই মত দেন নি। এই সময় তিনি আমার নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং আমাকে জানান যে আমি একজন হিন্দু। তিনি আমাকে আরও বলেন যে, তাঁর প্রিয়বান্ধবী আমাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছেন। তাঁর স্বর্গীয়া বান্ধবীর অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার বাগ্‌দত্তাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। নূতন পরিস্থিতিতে আমি বেশ একটু মনে আঘাত পাই। আমাকে তখন আমার সত্যকার পিতার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করলেও আমাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে স্থান দিতে সাহসী হন নি। এর পর তিনি আমাকে একটা ছোটো শহরের একটি বোর্ডিংএ রাখেন। এইখান থেকে আমি আমার পড়াশুনা সমাধা করতে থাকি। তবে আমার পালিকা মাতা আমাকে একেবারে ত্যাগ করেন নি। আমার খরচ-খরচার অধিকাংশই আমার পালিকা মাতাকেই বহন করতে হতো। এই নিহত শিশুটির মাতা ছিল তখন অবিবাহিতা বালিকা। তার তখনকার নাম ছিল লছমী দেবী। আমাদের বোর্ডিংএর পরের বাড়ীটাতে সে তার বাপ-মায়ের সঙ্গে বাস করতো। এদের এই পরিবারের মধ্যে সাহেবীয়ানার অত্যধিক প্রচলন ছিল। হাল ফ্যাশানের য়ুরোপীয়ভাবাপন্ন পরিবারের লোকদেরই সঙ্গে এঁরা বেশি মেলামেশা করতেন। এই সময় আমি মোসলেম ও হিন্দু আচার ব্যবহার এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দোটানায় পড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একদিন এদের এই পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে এসে আমি যেন আবার আমাকে ফিরে পাই। ধীরে ধীরে লছমীর সঙ্গে আমার এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আমি কতদিন আমার বোর্ডিংএর জানালা থেকে মুগ্ধ নয়নে লছমীর স্কুলের যাবার পথের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থেকেছি। এর কিছু কাল পরে লছমীর (শিশুটির মাতা) বিয়ে হয়ে যায় এবং সে তার শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। এর পর আমি মনে মনে ঠিক করে নি, যে লছমী হয়তো আমার মায়ের পেটের বোনই ছিল। তার প্রতি আমার অদম্য ভালোবাসা ভগ্নী-প্রতিম ভালোবাসাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এরপর বহুকাল পর্যন্ত লছমীকে আমি দেখি নি। কেবলমাত্র এক বৎসর আগে লছমীর সঙ্গে কলিকাতাগামী একটি ট্রেনের

কামরায় সহসা আমার দেখা হয়ে যায়। এখানে আমি ভাবি যে তার সঙ্গে আমার ঐ দিন দেখা না হলেই ভালো হতো। এরপর এই লছমীরই ইচ্ছায় ও উপদেশে কলকাতায় এসে তার স্বামীর কাছে আমি চাকুরী নিই। প্রথম প্রথম লছমী ও তার স্বামী আমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করেছে। কিন্তু সম্প্রতি তারা উভয়েই আমাকে বিশেষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে। এই ব্যাপারে আমি মনে বিশেষ ব্যথা পাই। এই জন্য ধীরে ধীরে আমার মনে প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে উঠে।

আমার এই প্রতিশোধ স্পৃহা আজ সকালে আমার মনে দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। আমি আজ সকাল আটটায় ঠাকুর দেখাবার অছিলায় তাদের খোকাকে কোলে করে বার হয়ে পড়ি। প্রথমে আমরা একটা রিক্সা করে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত আসি। তারপর ঐ রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে আমি ওখানকার ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তাতে খোকাটাকে নিয়ে উঠে বসে আমি ট্যাক্সি চালককে বারাকপুর স্টেশনে যাবার জন্যে নির্দেশ দিই। বারাকপুর স্টেশনে নেমে দেখি—খোকাটা খিদের জ্বালায় ভীষণ কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। আমি ছেলেটাকে খুবই ভালোবাসতাম। তাই স্টেশনের একটা দোকান থেকে দুধ কিনে তাকে আমি দুধ খাওয়াই। এরপর বারাকপুর থেকে ট্রেনে করে আমি কাঁচড়াপাড়ায় যাই। ঐ ছেলেটিকে কোলে করেই ঐখানকার স্টেশনারী দোকানে গিয়ে সেখান থেকে একটা ছোট পেনসিল কাটা ছুরি কিনে নিই। এরপর তাকে নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ট্রেনে করে শ্যামনগর স্টেশনে এসে সেখানে নেমে পড়ি। এইখানে ছেলেটা আবার তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে দিলে আমি তাকে আবার একটু দুধ কিনে খাওয়াই এবং তাকে ভোলাবার জন্য একটা লাল ফানুস রাস্তা থেকে কিনে তার চোখের সামনে তা মেলে ধরি—এই স্টেশনের একটি কুলিকে আমি আমার টিকিটটা কিনে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। এর কারণ, এই ফানুস ও দুধের গেলাস এবং তার সঙ্গে এই ছেলেটাকে নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঐ কুলিটা আমার এই অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে আমার জন্য একটা বারাকপুরের টিকিট কিনে এনেছিল। এরপর আমি ছেলেটাকে নিয়ে বারাকপুর স্টেশনে নেমে সোজা বারাকপুর ময়দানে গিয়ে উঠি। এই সময় প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বেজে গিয়েছে। এই মাঠের মধ্যকার বাগানের গাছগুলোর গোড়ায় গোড়ায় অন্ধকার ততক্ষণে জমাট বেঁধে নেমে এসেছে। আমি ডান পকেট হতে ছুরিটা বের করে দাঁত দিয়ে তার ধারালো ফলাটা খুলে ফেলি। বাম হাতের সাহায্যে খোকাটাকে কোলের উপর ধরে রাখার জন্যেই আমাকে ছুরি খুলতে দাঁতের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই সময় ছেলেটা তার কচি কচি হাত দুটো দিয়ে আমার গলাটা সজোরে জড়িয়ে ধরে আধ আধ স্বরে গুজরাটী ভাষায় বলে উঠলো—'মামা—মা।' কচি ছেলেটা সহসা আমার গলাটা এই ভাবে জড়িয়ে ধরে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল। আমি তখন অতি সন্তর্পণে তাকে একটা গাছের তলায় বসিয়ে দিই। আমি ছেলেটিকে সত্য সত্যই খুবই ভালোবাসতাম। এই জন্য আমি তার দিকে পিছন ফিরে ছুরিটা আন্দাজমত তার কচি গলাটার উপর সজোরে ঢুকিয়ে দিয়ে আর তার দিকে না ফিরে সোজা কলকাতায় চলে এসে এই বহুবাজার থানায় বিবৃতি দেবার জন্যে হাজির হয়েছি।"

ক্রমশঃ



রূপ ও রস

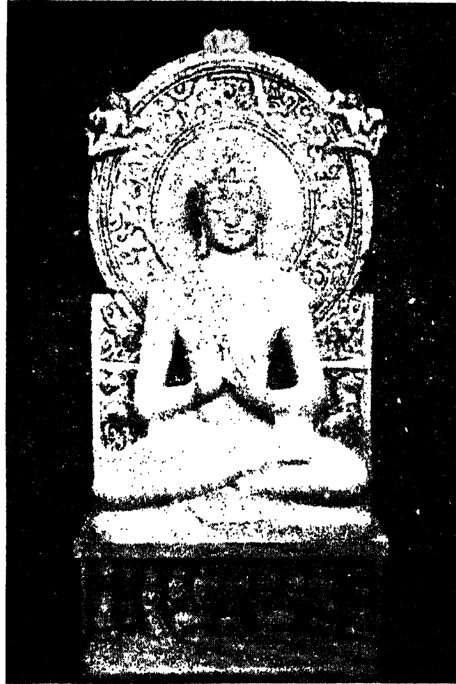
শ্রীশচীপতি রায়

সত্যাকার নিষ্ঠা থাকলে মানুষ কোন কাজেই তার সাধনা বা তার চেষ্টা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না—জীবনে প্রতিটি স্তরেই সাফল্য আসবেই। সভ্য সমাজে একদিকে যেমন আছে কৃষ্টি কলা ও শিল্পের সুষ্ঠু সমন্বয়, অপরদিকে তেমনি রয়ে গেছে অপরিচ্ছন্ন মনের পঙ্কিলতা—যা মানুষের শুভ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন এমনি নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছিলাম একজন বিখ্যাত ভাস্করের কাছে কলকাতার কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীটের মধ্যেই। একজন ... বৎসরের সৌম্য শিল্পী সেদিন তন্ময় হয়ে পাথরের গায়ে রামকৃষ্ণের আছেন—শিল্পীর হাতে এঁরা নবজীবন পেয়ে যেন বাঙালীর পুরাতন ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে আছেন।

বহু পুরাতনকেই শিল্পীর সাধনার ঘরে দেখা যাবে। কত দীর্ঘ বছর ধরেই না এই বিখ্যাত শিল্পীটি কর্মময় জীবনের অধ্যায়গুলিকে রূপে রসে সঞ্জীবিত করে আসছেন।

বাস্তবিক নিজের চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না—শিল্পীর বাস্তব চেতনা লুপ্ত···মাথার চুলে তেল নেই—দেহে বিশেষ জামা কাপড়ের অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই। তবে হাঁ, শিল্পীর হাত

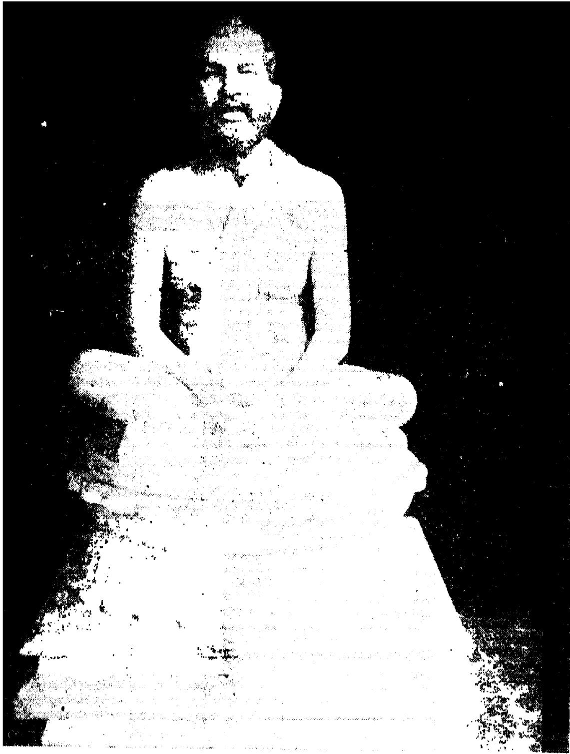


পাথরের বুকে দীর্ঘ দিনের সাধনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে —শিল্পী মণি পাল

সাধক বেশ ফুটিয়ে তুলছিলেন। বাঙলা দেশে এই শিল্প কাজের যে কয়েকটি স্টুডিও আছে তন্মধ্যে এই শিল্পীর স্টুডিওটা অন্যতম।

স্টুডিওর ভেতরেই রয়েছে বাঙালীর জনপ্রিয় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ আরো বহু সম্মানীয় গুণী ব্যক্তিরা। এঁরা সকলেই যেন জীবন্ত হয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কিন্তু চুপ করে নেই—সে ঠিক কাজ করে চলেছে একেবারে না থেমে। কোথাও এতটুকু ক্লান্তি নেই···রূপ পরিগ্রহ সত্যই করছে এই শিল্পীর তৈরী পাথরের মূর্ত্তিগুলিতে—তাই বোধ হয় শিল্পীকে ভগবানের দেওয়া উপহার বলে আমাদের সমাজ এতকাল দেখে আসছে।

শিল্পীর ব্যবসায়ী নাম শ্রীমণি পাল—এই নামেই সাধারণ সমাজ শিল্পীকে জানে। দেশে বিদেশে শিল্পী তাঁর কাজের নমুনা রেখে এসেছেন।



সাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্যই জীবন্ত শিল্পীর তৈরী

এই ছোট পাথরটিতে--

—শিল্পী মণি পাল

আজকের যুগ অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে ক্লিষ্ট। তাই সবাই যেন ব্যস্ত—কাজ ও অর্থ এই দুটোই হল আজকের প্রথম চিন্তাধারা—এরই সমস্যা রয়ে গেছে সমাজে। প্রতীকার হবে কবে জানি না—কেউ জানে না যে শিল্পের একটানা ভাবের দ্বন্দ্ব শেষ হবে কবে এবং তা কেমন করে?

বাঙলাদেশের মত এমন অনেক দেশ রয়েছিল যেখানে শিল্পীর এই অর্থনৈতিক চেহারাটা এত নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হত না—যা আজ আর গোপন নেই। এই যে শিল্পীর প্রতি সাধারণের মনের একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ, একটা সহজ সম্প্রীতি, একটা সুন্দর ভাবধারা দেখা যেত, তা হয়ত আজ একথা অস্বীকার করা যাবে না যে মানুষের মধ্যে শ্রীভগবান বিরাজমান সর্বসময়, তাই সাধারণ মানুষ আজ থেকে বহু বছর আগে পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী ছিল, তাই সে সময় সুধী সমাজে শিল্পীর অনাদর ছিল না।

আজ কিন্তু অনাদর না থাকলেও আর্থিক দিকটা পূর্বের মত তেমন করে কই আর সহানুভূতি প্রকাশ করে না।

মুঘল সম্রাট নবাব ওয়াজিদ আলী এখনও ঐতিহাসিক দিক হতে অমর হয়ে আছেন—তাঁর শিল্পী মনেরই ছবি আজও মনে করিয়ে দেয় পুরাতন যুগের কৃষ্টিকে—তিনি কিভাবে রাজকীয় মর্য্যাদায় উন্নীত করে রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ লাক্ষ্ণৌর সেই ইমামবাড়া, ভুলভুলী, অজন্তা, ইলোরা, কোণারক—এ সবই তো এখনো "স্মৃতি"র মাধুর্য্য ও শিল্পী মনেরই জয় ঘোষণা করে আছে।

শিল্পীর স্থান হোতো রাজা ও রাণীর মধ্যখানেই। তার মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হত ঐ মধ্য খানেই—যেখানে রাজা ও রাণী আজও পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে। কাজেই এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। তদানীন্তন যুগের স্থাপত্য আজও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বেঁচে রয়েছে।

পরাধীন ভারতেও সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি অসীম অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে দেশীয় রাজপুরুষদের কাছ হতে। কিন্তু তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা এতই একনিষ্ঠ ছিল যে, আজও বাংলা দেশে এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা সেই পূর্বের রাজপুরুষদের বদান্যতায় শিল্প-নৈপুণ্যকে বজায় রেখে আসছেন। তবে সংখ্যার অল্পতায় এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নিদারুণ চাপে আজ আর সেই সব সুযোগ সুবিধা হয়ত সকল সময় সহজ-লভ্য নয়। কিন্তু স্বাধীন ভারত "সৃষ্টির" উন্মাদনাকে স্বাগত জানাবে না কেন? গণতান্ত্রিকরাষ্ট্র কি সৌন্দর্য্যকে ভুলে থাকবে? না; তা সম্ভব নয়।

তাই মাঝে মাঝে এখনো নানা 'রকম শিল্প কাজের মেলা বসে—কাগজের পাতায় এরই সমালোচনা বেরোয়—শিল্পীরা খুসী হয়—সাধারণ লোকে এগিয়ে আসে শিল্পীর সৃষ্টিকে স্বাগতম জানাতে। কিন্তু এতেই কি শিল্পীরা এককভাবে তাদের স্বাভাবিক জীবনকে চালিয়ে যেতে পারবে



স্বামী বিবেকানন্দ ও বুদ্ধদেব এক সাথে শিল্পীর কাছে ধরা পড়েছে—

জনৈক বিশিষ্ট ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনিশীথ চক্রবর্ত্তী এই সব শিল্পের উন্নয়নের জন্য—অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন—এঁর সাথে যোগ দিয়েছেন আর একজন বিশিষ্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার জে, এন, মৈত্র। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কত খানি সাহায্য এঁরা দিতে পারেন? তাই সেই অর্থনৈতিক চেহারাটাই আজ সবার আগে পরিমার্জিত হওয়া দরকার। সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত এই সংস্কার সম্ভব নয়। শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আজ আর রাজপুরুষদের হাতে নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এদের জীবনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করবে। শিল্পী সাধনায় মগ্ন থাকবে—সৃষ্টি করেই তার আনন্দ—বিশ্রামের প্রাচুর্য্যে শিল্পী ঝিমিয়ে পড়বে না—আশা ও অণুপ্রেরণাই হবে শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান। সাধারণেরই সরকার নেবে শিল্পীর জীবনের সব কিছু দায়িত্ব।

ভাস্কর-শিল্পী মণি পাল আজ আর তাই একক নেই। এর সাথে রয়ে গেছে হাজার হাজার সহকর্মী—সেদিন এঁরই তৈরী মডেলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম—আর দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম যে সত্যি একটি মানুষ কি বিরাট নিষ্ঠার অধিকারী—পৃথিবীর বুকে এই মানুষটি হয়ত একদিন রেখে যাবে তার স্থাপত্য, তার একনিষ্ঠ অনুপ্রেরণা, আর রেখে যাবে সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব সমন্বয়।

শিল্পীর সাথে আলাপ করলাম—জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষা আছে কি না—শিল্পী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"হাঁ ইচ্ছা আমারও রয়েছে—কিন্তু জানি না আমার একার পক্ষে এতবড় একটা দায়িত্বের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে কি না। জীবন ভোর যে সাধনা আমি করে আসছি, আমি চাই তার জীবন্ত বাস্তব রূপ অন্য সকলেও গ্রহণ করুক। শিল্পীকে ভালবাসুক সবাই—শিল্পীর তৈরী কয়েকটি পরিচ্ছন্ন মডেলকে।



বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামকেও শিল্পী ভুলতে পারেন নি—তাই রূপ পরিগ্রহ করছে এই পাথরের মডেলটিতে—
—শিল্পী মণি পাল

আঁকা বাঁকা পিচ্ছিল পথ শিল্পীকে আটকে রাখবে না—শিল্পী মন যাদের তারা পাবে পথের সন্ধান—সেই আলো রেখে যেতে চাই আমি—"

বুঝলাম শিল্পীর ইঙ্গিত—তিনি একটা আর্ট গ্যালারীর প্রয়োজন উপলব্ধি করছেন। যেখানে তিনি রূপ ও রসের সমন্বয় ঘটাবেন। আনন্দে অভিভূত ভাস্কর শ্রীপাল সত্যই বুঝতে পেরেছেন—মানুষ কখনো খারাপ হতে পারে না—অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়লেও মানুষের মনের সেই সৌন্দর্য্যের মৃত্যু ঘটে না—তাই হাজার কষ্টেও প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতু-পরিবর্ত্তনে সেই ঝিমিয়ে-পড়া মানুষের মাঝেও তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়—পুরুষ ও প্রকৃতির সংস্পর্শে যেমন নতুনের সৃষ্টি, তেমনি ভোরের শিশিরে ভেজা "মহুয়ার" বুকে ভ্রমর যখন মিতালী করে তখন যেমন মহুয়ার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি শিল্পীর নতুন উদ্ভাবনায় শিল্পীও এক অনির্বচনীয় আনন্দে তৃপ্ত হয়ে উঠে। সৃষ্টির এই নব নব খেলায় শিল্পী শিশুর মতই খুশী হয়ে ওঠে। এই যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ, এখানেই মানুষ শ্রদ্ধা জানায়, অভিভূত হয়ে পড়ে—অন্তরের শুচিতা নিয়ে এই অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানুষ অভিনন্দিত করে। গুণীর প্রতি এই সহানুভূতি ও অসীম শ্রদ্ধা প্রকৃতির বুকেও স্পর্শ করে—তাই শিল্পী ও 'প্রকৃতি' এখানে এক হয়ে যায়—তাই আজকের ভেঙ্গে পড়া মানুষের তৈরী সমাজ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কখনো হারাতে পারে না। সাময়িক ভাবে যদিও আর্থিক অস্বচ্ছলতা সমাজকে পঙ্গু করে থাকে—একদিন এই পঙ্কিলতা দূর হয়ে যাবেই—সুন্দরের উপাসক মানুষ—সুন্দরের প্রতি সকলের আকর্ষণ, তাই সৃষ্টি বেঁচে আছে এখনো—বেঁচে থাকবে চিরকাল।

এই সৃষ্টিই দেবে শিল্পীকে অনুপ্রেরণা…সেই অনুপ্রেরণার উৎস নিয়ে শিল্পী এগিয়ে যাবে তার চলার পথে।

আজ তাই "আর্ট গ্যালারীর" প্রয়োজন, কিন্তু উপচারের অভাবে শিল্পীর জীবনের এই পরিকল্পনা আজ কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?—আর্ট গ্যালারীতে রূপ ও রসের যে সমন্বয়, আগামীকালকে তাই কি স্মরণ করিয়ে দেবে না? মানুষের কৃষ্টিশিল্প তবে কি চিরস্থায়ী হতে পারবে না? দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে শিল্পী তার জীবনের মাধুরী যা উৎসর্গ করে দেয়, এই পাথরের তৈরী মডেল গুলির মধ্যে,—তার সঞ্চয়, তার স্থাপত্য তবে কি কেবল একটু উপচারের অভাবেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

আর্থিক দিকটাই "আর্ট গ্যালারী" স্থাপনের একটা বিরাট সমস্যা—সরকারের সাহায্য ব্যতীত এই প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—শিল্পীকে সাহায্য করতেই হবে—নচেৎ প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য্য মানুষকে আর কখনো মোহময় করতে পারবে না—ঝিমিয়ে-পড়া মানুষ কত রকম অশান্তিতেই না কাল কাটায়—তবুও প্রকৃতির দেওয়া এই শান্তির নীড়ে মানুষের তৈরী আর এক সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের

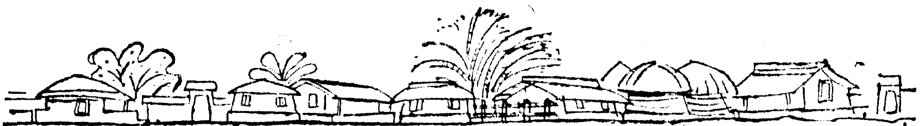


"রূপ ও রসের সমন্বয় ঘটছে—সৌন্দর্য্যের পূজারিণী "মহুয়া" ও "মিতালী"র তুলীর টানে—তাই এদের সৃষ্টি শাশ্বত থাকবে সকলের মনে"—

কাছে এই পরিশ্রান্ত মানুষ একটু আনন্দ পায়—সেই তৃপ্তিই বুকে নিয়ে আবার মানুষ এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পায়—

'মহুয়ার' ক্ষণস্থায়ী জীবনেও যেমন "অপেক্ষার'' পরিসমাপ্তি ঘটে, ভ্রমরের গুণগুণির এক মন-মাতানো আহ্বানে যেমন মহুয়ার পাপড়িগুলি উন্মেষিত হওয়ার জন্য আনন্দে মাতাল হয়ে ওঠে—ঠিক তেমনই মানুষের বুকেও যদি শিল্পী সেই পুরাতন সৃষ্টির মনো-মাধুরী ছন্দায়িত গতিতে ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ না পায়, তবে এই পরিশ্রান্ত মানুষ কি ঐ মাতাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় গভীর অতৃপ্তি নিয়ে অপেক্ষা করবে না? সৌন্দর্য্য ও সৃষ্টির সমন্বয় না ঘটলে এই মানুষ যে এক কঠিন পাষাণে পরিণত হবে—তাই মহুয়া ও ভ্রমরের প্রয়োজন।

—প্রকৃতি যেমন করে সৃষ্টি করে গেছেন তেমনি ভাস্কর মণি পালের স্বেচ্ছায় 'আর্ট গ্যালারী' তৈরীর জন্য, যে আন্তরিক প্রচেষ্টা—তা সফল করতে সরকারী সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন—সরকার যে সহযোগিতা করবেন এ বিশ্বাস আজ সাধারণেরও আছে—মহুয়ার বুকে ভ্রমরের মিতালি শাশ্বত হোক।



বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম, এ

সিংহাকি থেকে ভোরে যাত্রা করে দুপুরের নমাজের সময় সোয়ান নদী পার হয়ে শিবির স্থাপন করি। আমাদের দলের যারা পেছনে পড়ে ছিল তারা রাতের মাঝামাঝি সময়ে ক্রমে ক্রমে এসে হাজির হলো। আমাদের এই কষ্টকর লম্বা পথ চলাটা অসম্ভব দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়েছিল —আর সেটা এমন সময়ে যখন আমাদের ঘোড়াগুলো আগে থাকতেই পরিশ্রমে কাতর হয়ে রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। এই ধাক্কায় অনেকগুলো ঘোড়াই চলচ্ছক্তিহীন হয়েছিল। আর কতক রাস্তাতেই পড়ে গেল আর উঠলো না।

এখানে শিবির স্থাপন করার পর লেঙ্গার খাঁকে পাঠাই মালেক হেস্তকে আমার কাছে নিয়ে আনার জন্য। সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমার মহানুভবতা এবং আমি তাকে অনেক রকমে অনুগ্রহ দেখাব—এই সব কথা বলে তাকে বুঝিয়ে রাতের নমাজের সময় আমার কাছে নিয়ে এল। মালেক হেস্ত একটা সাজ সমেত ঘোড়া আমাকে নজর স্বরূপ দেওয়ার জন্য সঙ্গে এনে আমার বশ্যতা স্বীকার করলো। তার বয়স সে সময় মাত্র বাইশ তেইশ বছর।

আমাদের শিবিরগুলির চার পাশে অনেক ভেড়ার পাল ও দলে দলে বাচ্চা খচ্চর চরে বেড়াচ্ছিল। আমি যখন হিন্দুস্থান জয়ের সঙ্কল্প করেছি এবং যে দেশগুলোর মধ্যে এখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি সেগুলো অনেক দিন তুর্কিদের দখলে থাকায় সে দেশ আমারই রাজত্বের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে বলে আমি বিধান করায়, যুদ্ধ করেই হোক কিংবা শান্তি পূর্ণ উপায়েই হোক—তা অধিকার করার জন্য স্থির সঙ্কল্প করি। এইজন্য পাহাড়ের অধিবাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করাই উচিত হবে বলে ঠিক করলাম। আমি সেইজন্য এই আদেশ জারি করি যে এখানকার বাসিন্দাদের ভেড়া বা অন্য পশুর কেউ যেন কোনও ক্ষতি না করে, আর তাদের কাছ থেকে একটুকরো সুতো কিংবা একটা ভাঙ্গা ছুঁচও যেন কেউ না নেয়।

'বেহেরে'র মাতব্বরদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সম্পত্তির ওপর দুই লক্ষ টাকা কর ধার্য্য করা স্থির হয়। এই টাকা আদায়ের জন্য কয়েকজন আদায়কারী নিযুক্ত করি। আমি তারপর দেশটা ঘুরে দেখার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। কিছু সময় ঘোরাঘুরি করার পর একটা নৌকোয় উঠে কিছু সিদ্ধি পান করি।

পতাকাবাহী হায়দার আলেমদারকে বালুচিদের কাছে পাঠাই। বালুচিরাই 'বেহের' দেশটায় বসতি স্থাপন করেছে। তারা একটা বাদামি রংয়ের ঘোড়া নজর স্বরূপ নিয়ে এসে আমার বশ্যতা স্বীকার করে।

কয়েকজন সৈন্য 'বেহেরে'র অধিবাসীদের ওপর জোর জুলুম ও কুব্যবহার করেছে শুনতে পেয়ে আর একদল সৈন্যকে তাদের সন্ধানে পাঠাই। তারা কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে ধরে আনলে কয়েকজনকে প্রাণদণ্ড দিই। আর কয়েকজনের নাক বিদ্ধ করে সেই অবস্থায় শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়ে আনার আদেশ দিই।

কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে যদি কয়েকজন লোককে দূত স্বরূপ শান্তি ও বন্ধুত্বের বাণী বহন করে যে সব দেশ তুর্কিদের অধিকারে ছিল সেই সব দেশে পাঠানো হয় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। আমি ভেবে চিন্তে মোল্লা মুরসিদকে দূত আখ্যা দিয়ে সুলতান ইব্রাহিমের কাছে এই দাবী জানিয়ে পাঠাই যে প্রাচীন কাল থেকে যে দেশ বরাবর তুর্কি জাতির অধীনে ছিল তা আমার হাতে সমর্পণ করতে হবে। সুলতান ইব্রাহিমের কাছে ঐ ধরণের চিঠি ছাড়াও দৌলত খাঁয়ের নামেও চিঠি দিই। মোল্লা মুরসিদকে মৌখিক নানা উপদেশ দিয়ে দৌত্য কার্য্যে পাঠাই।

হিন্দুস্থানের লোকেরা বিশেষ করে আফগানরা এক অদ্ভুত নির্ব্বোধ জাত। তাদের না আছে কোনও চিন্তাশক্তি, না আছে দূরদৃষ্টি। তারা রোখ করে বীরের মত যুদ্ধও চালাতে পারে না, অথচ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ্যের মধ্যেও থাকতে চায় না। দৌলত খাঁ আমার দূতকে কিছুদিন লাহোরে আটকিয়ে রাখে। কিন্তু সে নিজে দূতের সঙ্গে দেখাও করে না, কিংবা তাকে সুলতান ইব্রাহিমের কাছেও যেতে দেয় না। ফলে, আমার দূত পাঁচমাস পরে কোনও উত্তর না নিয়েই কাবুলে ফিরে যায়।

এই সময়টায় এমন অঝোরে বৃষ্টি নামলো যে সমস্ত সমতলভূমি জলে ডুবে গেল। 'বেহেরে' ও পাহাড়ের মাঝখানে যেখানে আমাদের শিবির, তার কাছাকাছি একটা ছোট নদী ছিল। দুপুরের নমাজের সময় দেখা গেল যে নদীটা চওড়ায় একটা প্রকাণ্ড হ্রদের আকার ধারণ করেছে। বিকেল এবং সন্ধ্যার নমাজের মাঝামাঝি সময়ে জল কতদূর উঠেছে দেখবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেলাম। বৃষ্টি এবং বাতাস এমন জোর চলছিল যে ফেরবার সময় মনে হলো যেন আমরা আর তাঁবুতে পৌছতে পারবো না। নদীতে বন্যা হয়ে গিয়েছে। সেই নদী আমি সাঁতরিয়ে পার হয়ে এলাম। সৈন্যরা সেদিন খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে অশ্বারোহণে ভ্রমণ শেষ করে একটা নৌকায় উঠি। সেখানে সদলে সুরাপান চলে। নৌকায় যেদিকে দাঁড় থাকে অর্থাৎ সম্মুখ ভাগে খানিকটা জায়গা ছাদ দিয়ে ঘেরা ছিল। উপরের ছাদটা সমতল। আমি এবং আরও কয়েকজন সেই ছাদের ওপরে বসি। কেউ কেউ ছাদের নীচে পাটাতনের ওপর বসে ছিল। নৌকার হালের

দিকেও বসার জায়গা ছিল।—গেদাই ও নামান সেখানে বসেছিল। মধ্যাহ্নের নমাজের পর পর্য্যন্তও আমরা মদ্যপান করতে থাকি। তারপর মদে বীতস্পৃহ হয়ে ভাং খেলাম। নৌকার পেছনের দিকে যারা বসেছিল তারা বুঝতে পারেনি যে আমরা ভাং খাচ্ছি।—তারা সমানে মদ খেয়েই চলেছে। নমাজের সময় আমরা নৌকা থেকে নেমে আসি। ঘোড়ায় চড়ে অনেক রাতে আমরা শিবিরে ফিরে যাই।

নামান আর গেদাই ভেবেছিল যে আমি মদ ছাড়া আর কিছুই খাইনি। আমাকে খুব খুসী করবে বলে তারা এক কলসী মদ এক একজনের ঘোড়ায় পালটা পালটি করে তুলে অনেক কষ্টে আমার জন্য বয়ে আসে। মদের পাত্র আমার কাছে নিয়ে আসার সময় তারা মদোন্মত্ত অবস্থায় ছিল। তারা বল্‌লো—মদের কলসীটা অন্ধকার রাতেও আপনার জন্য কষ্ট করে এনেছি। দুইজন পালা করে এই কলসী বয়ে আনতে হয়েছে।

তাদের বলা হলো যে আমরা কিন্তু অন্য জিনিষ খেয়েছি। ভাংখোর আর মদ-খোরদের কিন্তু নেশা আলাদা রকমের। তারা একে অন্যকে বরদাস্ত করতে পারে না, পরস্পরের দোষ দেখে।

আমি বলি—দলের সৌহার্দ্য যেন নষ্ট করো না। যে মদ খেতে চায় সে মদ খাবে, আর যে ভাং খেতে চায় সে তাই খাবে। একদল যেন, আর এক দলকে এই নিয়ে কোনও কটু কথা বা মিছামিছি দোষারোপ না করে।

কয়েক জন মদ নিয়ে বসলো আর কয়েক জন ভাং নিয়ে। কিছুক্ষণ ভাল ভাবেই চললো। বাবাজান নৌকায় যায়নি।—আমরা শিবিরে ফিরে আসার পর তাকে ডেকে পাঠানো হয়। সে মদ্য পান করাটাই পছন্দ করে। তার্দি কিপচাককেও ডাকা হয়।—সেও মদ্যপায়ীদের দলেই ভিড়ে গেল। মদ্যপায়ী এবং ভাং-খোররা কখনই একদলে মিলে মিশে থাকতে পারে না। যারা মদ খাচ্ছিল তারা বেকুবের মত নানা কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ করলো ও ভাং-খোরদের সম্বন্ধে অশিষ্ট মন্তব্য করতে লাগলো। বাবাজানও মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বকতে সুরু করলো। মাতালরা এক এক গ্লাস মদ নিয়ে তার্দি মহম্মদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, সেও এক চুমুকে শেষ করছিল। অতিরিক্ত মদ খেয়ে সে অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে উঠ্‌লো। মাতাল হয়ে সকলে গণ্ডগোল ও ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করলো। আমি সকলকে শান্ত করার জন্য যতই চেষ্টা করি সবই বিফল হয়। দলটির ব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিজনক হয়ে ওঠে। শীগগিরই দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরে ঘোড়ায় চড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর নৌকায় উঠি। সেখানে সুরাপান চলতে থাকে, নৌকাতে রাত্রের নমাজের সময় পর্য্যন্ত হরদম মদ্যপান চলে। যখন সবাই পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে তখন নদীতীর থেকে প্রত্যেকে এক একটা জ্বলন্ত মসাল হাতে ঘোড়ার পিঠে একবার এপাশে আর একবার ওপাশে হেলে পড়তে পড়তে, জোর কদমে শিবিরে ফিরে আসি। আমি খুবই মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে যখন শুনি যে আমরা জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে শিবিরে এসেছি—সে কথা কিন্তু আমি কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। শিবিরে ফিরেই আমি প্রচুর বমি করে ফেলি।

কিছু পরে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে তারপর নৌকায় নদী পার হয়ে ওপারের বাগান গুলো দেখতে আসি। এইসব বাগানে আখের চাষ হয়। জমিতে জল সেচনের জন্য চরখি ও বালতির ব্যবহার পর্য্য-বেক্ষণ করি। চরখির চাকা ঘুরিয়ে জল তুলেও দেখি। তারপর, বাগানের লোকদের দিয়ে বারবার জল তুলিয়ে সেচের কাজ কেমন হয় তা দেখতে থাকি।

সেদিন বেরোবার সময়ও ভাং খেয়েছিলাম। বাগান দেখা শেষ করে নৌকায় ফিরে আসি। মানুচেহর খাঁ ভাং খেয়েছিল। কিন্তু এত কড়া ভাং সে খায় যে বরাবর দুই জন লোককে তার হাত ধরে থাকতে হয়েছিল—যাতে সে পড়ে না যায়।

আমরা নদীর মাঝখানে এসে নোঙ্গর ফেলে চুপ করে বসে থাকি। তারপর আবার নোঙ্গর তুলে স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিই। এই ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আবার আমাদের ইচ্ছা হলো যে নৌকা বেয়ে উজান ভেঙ্গে চলতে হবে। সে রাত্রিটা নৌকাতেই কাটাই। পরদিন ভোরে শিবিরে ফিরে আসি।

রবিয়ল মাসের দশ তারিখে শনিবারে সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে। সেইদিন দুপুরের নমাজ পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াই। তারপর একটা নৌকায় উঠে সুরাপান উৎসবে মেতে যাই। নদীর একটা বড় শাখা ধরে ভাটার টানে চলতে থাকি। তারপর, 'বেহেরে'র অনেকটা দূরে নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নেমে অনেক দেরীতে শিবিরে ফিরে আসি।

এই দেশের শাসন ব্যবস্থার একটা সুরাহা করে ফেলি—যাতে এখানে ভবিষ্যতে শান্তি বজায় থাকে। তারপর 'বেহেরে' থেকে কাবুলে ফিরে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ি। আমাদের যাত্রার দিনেও অসম্ভব বৃষ্টি হয়। শিবিরের তাঁবুর পেছন দিক দিয়ে রাত্রের নমাজের সময় পর্য্যন্ত ঝর-ঝর করে বৃষ্টির জল ঝরতে থাকে।

আফগানি সৈন্যরা পৌঁছে গেলে আমরা পরদিন সকালে সেইখান থেকে সসৈন্যে যাত্রা করে চার মাইল অগ্রসর হয়ে থামি। এইখানে উঁচু জমির ওপরে উঠে শিবিরের জায়গা পর্য্যবেক্ষণ করি। সৈন্যদের সঙ্গে কতগুলি উট আছে গুণে দেখতে নির্দ্দেশ দিই। গুণে দেখা গেল সাতশর মত উট আছে।

রণবাদ্য বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখান থেকে মার্চ করে মধ্যাহ্ন ভোজনের' সময় আটক গিরিসঙ্কটের নীচে থামি। দুপুরের নমাজের পর আমরা আবার চলা সুরু করে গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে নদী পার হয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে বিশ্রাম করি। তারপর আবার মাঝ রাতে বেরিয়ে পড়ি।

'বেহেরেতে' যাওয়ার সময় বেলা নটায় নদী হেঁটে পার হয়েছিলাম। সেই পথটা পরীক্ষার সময় শস্য বোঝাই একটা ছোট নৌকা নদীর মধ্যে

কাদায় আটকে আছে দেখা গেল। নৌকার লোকেরা চেষ্টা করেও নৌকোটাকে মুক্ত করতে পারলো না। সেই শস্ত আটক করে আমার লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিই। খুব প্রয়োজনের সময় শস্তটা পাওয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সিন্ধু ও কাবুলের নদীর সংযোগস্থলে এসে থামি; ছয়খানি নৌকা জোগাড় করে আমার দক্ষিণ ও বামদিকের এবং মাঝের সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলে তারা নদী পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। নদী পার হতে চারদিন সময় লেগে যায়।—

সূর্যোদয়ের সময় নদীতীর থেকে আবার মার্চ করা সুরু হয়। সেদিন আমি ভাং খেয়েছিলাম। ভাংয়ের গোলাপি নেশার প্রভাবের মধ্যে আমি কয়েকটি সুন্দর উদ্যান দেখেছিলাম।—উদ্যানের নানা কেয়ারি লাল, হলুদ রংয়ের আরখান ফুলে ঢাকা রয়েছে। একদিকের কেয়ারিতে হলুদ রংয়ের, আর একদিকের কেয়ারিতে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। অনেক জায়গায় আবার একই কেয়ারিতে সব রকমের ফুলই একসাথে জড়াজড়ি করে ফুটে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে—ফুলগুলোকে কেউ যেন ছুঁড়ে ফেলে ছড়িয়ে রেখেছে।

আমার শিবিরের কাছে একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপর বসে আমি এই ফুলের বাহার দেখছিলাম। এই উঁচু জায়গার চার পাশে সাজানো কেয়ারির মধ্যে ফুলগুলো যেন বাঁধা পড়ে ফুটে আছে। একদিকে পীত রংয়ের ফুল—আর অন্যদিকে লাল ত্রিকোণ কেয়ারিগুলিতে যেন সুবিন্যস্ত করে রাখা হয়েছে। আর দুই পাশে ফুলের সমারোহ যেন কিছু কম।—কিন্তু যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় একই রকমের মন মাতানো দৃশ্য ফুল বাগানগুলির। পেশোয়ারের কাছাকাছি জায়গাতে ফুল বাগানের দৃশ্য বসন্তকালে অদ্ভুত সুন্দর হয়।

পরদিন প্রত্যুষে শিবির তুলে ফেলে রওনা হই। যেখানে নদী থেকে রাস্তাটা পৃথক হয়েছে সেইখানে বাঘের ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল, বাঘটাও বেরিয়ে এলো। ঘোড়াগুলো বাঘের ডাক শুনে ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠে আয়ত্তের বাহিরে চলে গেল। তারা আরোহীদের পিঠে নিয়ে দিগ্‌-বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো। বাঘটা আবার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো।

একটা মোষ এনে টোপ হিসেবে জঙ্গলের মধ্যে বেঁধে রাখতে নির্দ্দেশ দিলাম—যাতে খাদ্যের লোভে বাঘটা বেরিয়ে আসে। বাঘটা আবার গর্জ্জন করতে করতে বেরিয়ে এলো। তখন চার দিক থেকেই তার ওপর শর বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। আমিও ওকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। খালওয়া তাকে বর্শার আঘাত করতেই বাঘটা বেঁকে দাঁড়িয়ে তার দাঁত দিয়ে বর্শার ফলাটা ভেঙ্গে বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার দেহের অনেক জায়গায় আঘাত পেয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। সেই সময় ইসেয়াওয়াল তরবারি বের করে এগিয়ে যেতেই যখন বাঘটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে সেই সময়েই তার মাথায় আঘাত করলো। তারপর, আলি সিস্তানি তার কোমরে আঘাত করতেই বাঘটা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদীর মধ্যেই ওটাকে মারা হয়। জল থেকে তুলে নিয়ে আসার পর আমি বাঘটার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিই।

পরদিন সকালে আবার মার্চ সুরু হয়। তারপর বেক্‌রামে এসে থামি। আমরা 'গুরু কাটার' পরিদর্শন করি। পৃথিবীর কোনও স্থানেই এখানকার মত সাধুদের জন্য অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত কুঠুরি দেখা যায় না। দরজার মধ্যে প্রবেশ করে দুই এক সিঁড়ি নেমে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে—তারপর সেই অবস্থাতেই বুকে হেঁটে তোমাকে এগোতে হবে। আলো না নিয়ে গেলে তোমার প্রবেশ করা অসম্ভব। মাথার অথবা দাড়ির চুল যা মানত স্বরূপ নানা ভক্তরা দিয়েছে—প্রচুর পরিমাণে সেগুলো চারিদিকে এবং গুহার কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে। চারিদিকেই কুঠুরি—ঠিক যেমন মঠে কিংবা শিক্ষায়তনে থাকে। কক্ষগুলির সংখ্যা অনেক।

এই দিনই আমার সবচেয়ে ভাল বাজপাখীটি হারাই। আমার প্রধান শিকারী সিখেমের তত্ত্বাবধানে সেটা ছিল। এই বাজটা খুব নিপুণভাবে বক ও সারস পাখী ধরতে পারতো। আগে দুই তিনবার এটা পালিয়েছিল। এমন অব্যর্থভাবে বাজটা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো যে তার এই গুণপনার জন্য আমার মত অনিপুণ লোকও ভাল পাখী শিকারী এই আখ্যা পেয়েছিল।

আমার সঙ্গী ছয় জন প্রধান আফগান সর্দ্দারকে হিন্দুস্থানের লুঠের মাল থেকে প্রত্যেককে একশ রৌপ্য মুদ্রা, একটি কোর্ত্তা, তিনটি বলদ এবং একটা করে মোষ দিই। আর সকলকেও মুদ্রা, কাপড়, বলদ এবং মোষ তাদের অবস্থানুযায়ী বিতরণ করি।

আমরা আলি মসজিদের ভূমিতে পৌঁছালে মারুফ নামে একজন লোক দশটি ভেড়া, দুই বোঝা চাল ও আট খণ্ড বড় আকারের পনির ভেট স্বরূপ নিয়ে আসে।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় আমি কাবুলে পৌঁছে যাই। আমি কাবুলের সেতুর কাছে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত কেউ আমার আসার কথা জানতে পারেনি। তখন আর হুমায়ুন আর কামরাণকে ঘোড়ায় চড়িয়ে আমার কাছে আনার সময় ছিল না। কাছাকাছি যে সব ভৃত্য ছিল তারাই তাঁদের কোলে করে নগর ফটক এবং দুর্গ ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য নিয়ে আসে। বিকেল বেলার নমাজের সময়ের কাছাকাছি নগরের কাজিকে সঙ্গে নিয়ে কাসিম বেগ এবং আমার যে সব সভাসদরা কাবুলে ছিল তারা এসে অভিনন্দন জানায়।

বৈকালের নমাজের পর আমাদের এক আনন্দজনক বৈঠক বসলো। আমি আমার নিজের পোষাকের আলমারি থেকে একটা পোষাক বের করে শা' হোসেনকে উপহার দিয়ে তাকে সম্মানিত করি।

পরদিন ভোরে একটা নৌকায় প্রভাতি উৎসব উদ্‌যাপন করি। এই উৎসবে নূর বেগ বাঁশী বাজায়। সে তখনও সাধুজনোচিত কঠোর-জীবন যাপন সুরু করেনি। দুপুরের নমাজের সময় আমরা নৌকা থেকে নেমে এসে পাহাড়ের উপর যে উদ্যান রচনা করেছিলাম সেখানে আমোদ

...করি। বিকালের নমাজের সময় বেগুনি বাগানে গিয়ে আমরা ...পাত্র নিয়ে বসি। দুর্গ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আমি দুর্গে ফিরে আসি।

সুলতান মির্জ্জার জ্যেষ্ঠাকন্যা কাবুলে এলেন। সেখানে তাঁর ...স্থান ঠিক হলে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাই। ঠিক ...মার বড় বোনের মত তাঁকে সম্মান দেখিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ...জন্য দেখিয়ে নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করি। তিনিও নত হয়ে ...ভবাদন করলেন। তারপর তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে পরস্পর ...লিঙ্গন করি। এরপর এই রীতিই বরাবর আমরা মেনে চলেছি।

সেদিন আমি উপবাস করেছিলাম। ইউনিস আলি ও আরও কয়েক ...ন বিস্ময় প্রকাশ করে বললো—আজ মঙ্গলবার। আজও উপবাস। ...শ্চর্য!

আমরা কাজির বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হই। সেই রাত্রে আমরা ...কটা আনন্দোৎসব করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কাজি আমার কাছে ...সে বলেন—আমার বাড়ীতে এমন ব্যাপার কোনও দিন দেখা যায় নি। ...রে আপনি যখন সম্রাট ও প্রভু, তখন আমার কি আর বলবার ...াছে।

আমাদের উৎসব পর্ব্বের জন্য সব রকম জোগাড় যত্নই করা হয়েছিল। ...স্তু কাজিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা সুরা পানটা বাদ দিই।

আমার বাগানে সমতল ভূমিয় কয়েকটি চারা ও ডুমুর গাছ রোপণ ...রি। দুপুরের নমাজের সময় সুরাপান উৎসব হয়। পরদিন নতুন ...রা জমিটার মধ্যে খুব ভোরে আবার সুরাপান চলে। দুপুরের ...র আমরা ঘোড়ায় চড়ে কাবুলে ফেরার জন্য রওনা হই। হামানের ...ড়ী পৌঁছিয়ে সুরার ঘোরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। আবদাল্লা ঘোর ...াতাল হয়ে তার গায়ের পোষাক সমেত জলের মধ্যে পড়ে যায়। এত ...তে জলে পড়ায় তার খুব সর্দ্দি লাগে। নড়তে চড়তে না পরায় যে ...মস্ত রাতটা কুতলুকের বাড়ীতে কাটিয়ে দেয়। পরের দিন সে লজ্জিত ...য়ে আমার সামনে এসে মাত্রা ছাড়িয়ে সুরা পান করার জন্য অনুতাপ ...কাশ করে বলে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে—আর সে মদ খাবে না।

আমি তাকে বলি—তোমার এই অনুতাপ আর মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা ...তদিন থাকে দেখা যাক। তোমাকে ছাড়তে হবে না। তুমি যেখানে ...নী মদ পেতে পার। তার প্রতিজ্ঞা সে কয়েক মাস রক্ষা করেছিল, ...রপর আর পারেনি।

আমি সবিরাম জ্বরে ভুগছি মনে হতে শরীরের কিছু রক্ত শোষন করে ...ফলি। সেই সময় দুইদিন—কোনও সময় তিন দিন অন্তর অন্তর জ্বরের ...াক্রমণ হচ্ছিল। প্রত্যেক বার ঘাম না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপ ...ঠত। ঘাম হলে তবে মুক্তি পেতাম। দশ বার দিন পর মোল্লা ...াজ্‌কা নার্দিসাদ ফুস মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে। আমি ...ই একবার খেলাম বটে, কিন্তু তাতে আমার কোনও উপকার ...লো না।

হাসানবেগ আমার কাছে একটা সুরাপান উৎসব করার জন্য অনুমতি চাইলেন। সে তার বাড়ীতে মহম্মদ আলি এবং আরও কয়েকজন সভাসদ বেগদের নিয়ে গেল। আমি তখনও জ্বরের জন্য সুরাপান করছি না। আমি বল্লাম—জীবনে কখনও প্রাজ্ঞের মত বসে থাকিনি, যখন আমার বন্ধুরা আমোদ আহ্লাদ করছে। যখন তারা ঢক ঢক করে মদ গিলছে আর ফূর্ত্তি করছে তখন আমি সে দৃশ্য ফ্যাল ফ্যাল করে দেখিনি। যাক, এখন তোমরা আমার কাছে বসেই মদ খাও, যাতে আমি সাদা চোখে যারা মাতাল হয় তাদের—আর যে মাতাল নয় তার বিভিন্ন ধরণের মনের গতি এবং হাব ভাব পর্য্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি।

ছবির গ্যালারির দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছোট ছোট তাঁবুর সারি ছিল। সেইখানে আমি মাঝে মাঝে বসতাম। বৈঠকটা এখানেই বসে। ভাঁড়ামিতে ওস্তাদ ঘিয়াস এসে উপস্থিত হলো। তাকে ওরা ঠাট্টা তামাসা করে দলের মধ্যে ভিড়তে দিচ্ছিল না। অবশেষে নানা রকমের ভাঁড়ামি দেখিয়ে সে জোর করেই দলের মধ্যে জায়গা করে নিল।

আমি কোনও রকম প্রস্তুত না হয়েই এই কবিতাটা তৎক্ষণাৎ রচনা করে ফেলি এবং সেটা ঐ দলের কাছে পাঠিয়ে দিই।

'যখন, বন্ধুরা সব ভুরি ভোজে ব্যস্ত
গোলাপ বাগের সুষমায় মন ন্যস্ত
আমি তখন একা সঙ্গীহীন,
ভাবছি বসে,
ওদের কেমন সুখে কাটছে দিন।
ভাবছি বসে,
লুঠছে ওরা হরেক মজা কত,
আমিই শুধু একা ভাগ্যহত।
লুটুক মজা। হিংসা করি না তো।
তাদের তরে মাগি আশিস্ শত।
হে ভগবান, কর ওদের 'দোয়া',
দুখের আঁচের পায়না যেন ছোঁয়া।'

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণের নমাজের মাঝামাঝি সময় সুরাপায়ী দলটি মূর্খের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। যখন তাদের এই রকম মত্তাবস্থা, আমি সেখান থেকে সরে পড়ি।

এর কয়েকদিন আগে আমি ওষুধ হিসাবে ফুল মেশানো মদ পান করি, কিন্তু তাতে রোগের কোনও উপশম না হওয়ায় আমি ওটা খাওয়া ছেড়ে দিই। আমার অসুখ প্রায় সেরে এসেছে এমন সময় আমি আপেল গাছের তলায় একটা উৎসবের আয়োজন করি। সেদিন কিন্তু আমি ওষুধ মেশানো মদ খাই।

হায়দার তর্কির বাগানে টেংরি বরদি কয়েকজন বেগ এবং তরুণ কর্ম্মচারীদের নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করে। রাতের নমাজের পর আমরা সেখান থেকে উঠে চলে আসি। তারপর বড় দরবার-তাঁবুতে সকলে একসঙ্গে সুরাপান করতে বসে যাই।

বৃহস্পতিবার মাসের পঁচিশ তারিখে আমার রোগ আরোগ্যের জন্য পবিত্র কোরাণ পাঠ করতে মোল্লা মহম্মদকে নিযুক্ত করা হয়।

শা' হাসেনের বাড়ীতেও আমি গিয়েছিলাম। সেখানে সুরাপান উৎসব চলে। সেই উৎসবে আমার অনেক সম্ভ্রান্ত আমির এবং সভাসদ যোগ দেয়।

একদিন বৈকালিক ও সান্ধ্য নমাজের মাঝামাঝি সময়ে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমরা পায়রা বাড়ীর ছাদে চলে যাই। সেখানেই সুরাপান করতে বসি। খানিকটা রাত হয়েছে, এমন সময় কয়েকজন অশ্বারোহীকে রাস্তা দিয়ে নগরের দিকে আসতে দেখা গেল। আমি স্থির নিশ্চয় করলাম যে এরা দরবেশ মহম্মদ ও তার দলের লোক। আমার ঠিক ধারণা হলো যে ওরা মির্জ্জা খাঁয়ের দূত হিসাবে আমার কাছে আসছে। দরবেশ মহম্মদকে ছাদের উপরেই ডেকে পাঠালাম। তাকে বল্লাম দূতিআলির আদপ কায়দা ফেলে রেখে আমাদের সঙ্গে উৎসবে মেতে যাও দেখি।

দরবেশ মহম্মদ আমার কাছে এসে কয়েকটি উপহার দ্রব্য যা সে সঙ্গে এনেছিল সেগুলো আমার সামনে রেখে আমাদের সঙ্গে বসে গেল। এ সময় সে সংযম পালন করছিল। তাই সে মদ্যপান করলো না। আমরা কিন্তু খুবই মাতাল হয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে যখন আমি দরবার কক্ষে বসি তখন দূত হিসাবে যে রকম আদব কায়দা ও সৌজন্য দেখানোর প্রথা আছে সেইভাবে দরবেশ মহম্মদ আমার সম্মুখে হাজির হলে—তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক-ভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর মির্জ্জা খাঁ আনুগত্য দেখিয়ে যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছে সেগুলো আমার সামনে ধরে দেয়।

আবদল রহমান আফগানরা গার্দেজের সীমার মধ্যে বসতি স্থাপন করলেও আমাকে কোনও কর দিচ্ছিল না। তারা শান্তিভঙ্গ করতেও সুরু করছিল। আসা যাওয়ার পথে তারা বিদেশী যাত্রী ও বণিকদের পীড়ন করেছিল। এই আফগানদের শিক্ষা দেওয়ার এবং তাদের বাস-স্থান তছনছ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সে রাত্রে আমরা পথ হারিয়ে পাহাড় আর পতিত জমির মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকি। কিছু সময় এইভাবে কাটার পর আবার আমরা পথ খুঁজে পাই। তারপর 'পুরে'র গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে ভোরের নমাজের সময় সমতল ভূমিতে নেমে সৈন্যদের দেশটা তন্নতন্ন করে শত্রুদের সন্ধান করতে পাঠাই। একদলকে লুঠতরাজ এবং আর একদলকে কিরমাস পাহাড়ের ধারে শত্রুদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলতে পাঠিয়ে দিই। একটা বড় গোছের দল উপত্যকায় লুঠতরাজ করতে এগিয়ে যায়।

এই শেষোক্ত দলটি খুব বড় বুঝতে পেরে তাদের চলে যাওয়ার পর আমিও পেছন পেছন যেতে থাকি। ওখানকার অধিবাসীরা অনেক দূরে এবং উঁচুতে থাকায় যে সব সৈন্যরা তাদের খুঁজে বের করতে গিয়েছিল তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করে ফেলে। তারা সামান্য জিনিষও লুঠ করে আনতে পারেনা।

সমতল ক্ষেত্রে চল্লিশ পঞ্চাশজন আফগানকে দেখা গেল। অগ্রগামী সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা আফ-গানদের দিকে ধেয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে তাড়া-তাড়ি এগিয়ে যাওয়ার কথা বলতে আমার কাছে ছুটে এলো। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু আমি পৌঁছানোর আগেই হুসেন হাসান অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া চালিয়ে আফগানদের মধ্যে পৌঁছে গেল। যখন সে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আস্ফালন করছে, সেই সময় তার ঘোড়া তীরবিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে উঠে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। সে মাটি থেকে উঠতে না উঠতেই পায়ে তরবারির আঘাত পেয়ে আবার মাটিতে পড়ে যায়। তখন আফ-গানরা তরবারির আঘাতে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমিররা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যায় না।

আমি এই সংবাদ পাওয়ামাত্র কয়েকজন পার্শ্বচর এবং বাছাই-করা সৈন্যকে অকুস্থলে তাড়াতাড়ি যেতে বলি। আমি নিজেও তাদের অনুসরণ করে দ্রুত চলে আসি। প্রথমেই মোমিন আতকে এগিয়ে গিয়ে বর্শা দিয়ে একজন আফগানকে আঘাত করে তার মাথা কেটে নিয়ে আসে। আবদল হাসান বর্ম্মপরা না থাকলেও সাহসভরে এগিয়ে যায়। যে রাস্তা দিয়ে আফগানরা মার্চ করে আসছিল সেইখানে উপস্থিত হয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আফগানদের আক্রমণ সুরু করে। তরবারির আঘাতে একজন আফগানের মাথা কেটে ফেলে সেটা জয়চিহ্ন স্বরূপ নিয়ে আসে। সে নিজেও দেহে তিন জায়গায় আঘাত পায়। তার ঘোড়াও জখম হয়। মহম্মদ কিপলিনও তরবারি হাতে বীরের মত অগ্রসর হয়ে একজন আফগানকে আক্রমণ করে। প্রথমে তাকে বন্দী করে, তারপর তার মাথা কেটে নিয়ে আসে।

আবদল হাসান ও মহম্মদ কিপলিন আগেও অনেকবার সাহসের কাজ দেখিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে তারা যে বীরত্বের নিদর্শন দেখায়—তার তুলনা হয় না। চল্লিশ পঞ্চাশজন আফ-গান যারা উপস্থিত ছিল—তাদের সবাইকেই একে একে হত্যা করা হলো। আফগান বধের পর আমরা একটা কর্ষিত জমির উপর বিশ্রাম করি। সেখানেই আফগানদের মাথার খুলি দিয়ে একটা স্তম্ভ তৈরী করা হয়।

আমি রাস্তার উপর এসে দেখতে পেলাম—যে সব বেগরা হুসেনের সঙ্গে ছিল তারা সেখানে এসে পৌঁচেছে। তাদের দেখে রাগে আমার শরীর জ্বলতে থাকে। তাদের উচিত শাস্তি দিতেও তখনই ঠিক করে ফেলি। তাদের বলি—তোমরা এতগুলো লোক সঙ্গে থাকতেও যখন আফগানরা একটি গুণবান তরুণকে অমন নৃশংসভাবে হত্যা করতে পেরেছে, আর তোমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য কাপুরুষের মত দেখেছো, তখন তোমাদের এই অকর্ম্মণ্যতার জন্য শাস্তি পেতেই হবে। এই অপরাধে তোমাদের সকলের মর্য্যাদা-চ্যুত করলাম। তোমাদের ওপর যে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল—তাও তোমাদের হাত থেকে তুলে নেওয়া হলো। তোমাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে ঐ হীন অবস্থায় তোমাদের সকলকে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে লোকদের দেখাতে হবে যে একজন যুবার অমূল্য জীবন ঘৃণ্য আফগানের হাত

থেকে রক্ষা না করার ফলে কি শাস্তি পেতে হয়। সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে তোমরা এই দৃশ্য দেখেছো, অথচ একটা আঙুলও তোমরা নাড়নি। এই তোমাদের শাস্তি।

যে সব সৈন্য কিরমাসের দিকে গিয়েছিল তারা কয়েকটা ভেড়া এবং কিছু লুঠের মাল নিয়ে এল। একজন আফগান তরবারি তুলে ধেয়ে আসছে দেখে দৃঢ়চেতা বাবা কিস্‌কে মাটিতে দাঁড়িয়ে একটুও বিচলিত না হয়ে ধনুতে তীর লাগিয়ে তাকে বিদ্ধ করে ধরাশায়ী করলো।

পরদিন ভোরে আমরা কাবুলে ফেরার জন্য রওনা হলাম। আমি 'আকা' গ্রামে গিয়ে থামি। সেখানে ভাং খাওয়ার পর কিছু মদ জলে নিক্ষেপ করে মাছদের মাতাল করে দিয়ে এইভাবে কিছু মাছ ধরা হয়।

কাবুলে পৌঁছানোর পর মহম্মদ ফজলি ও খসরুর কর্ম্মচারীদের নিলাব দুর্গের পতনের ব্যাপারে তাদের আচরণ সম্বন্ধে তদন্ত করি। তদন্তের পর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল যে তারা ঠিকভাবে কাজ করেনি। তারা সত্যই দোষী। তাদের সকলকেই শাস্তি স্বরূপ নীচু পদে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরের নমাজের কাছাকাছি সময় সমতলভূমির একটা গাছের নীচে সুরাপানের বৈঠক বসে। সেইখানে কিমকে মোগলকে একটা সম্মান সূচক পোষাক প্রদান করি।

ইসতালিফে একদিন সুরাপানের আড্ডার আয়োজন করা হয়। গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছিয়েছি—এমন সময় আমার দলের লোকেরা একটা বড় সাপ মারে। সাপটা লম্বায় একটা প্রমাণ মানুষের সমান ও মানুষের বাহুর মত মোটা। এই সাপের মুখ দিয়ে একটা সরু সাপ বেরিয়ে এলো। কিছু আগেই বড় সাপটা সেটাকে গিলে খেয়েছিল। ছোট সাপটার দেহের প্রত্যেক অঙ্গই অক্ষত আর সাপেটাও বেঁচে ছিল। ক্ষীণ সাপটা মোটা সাপটার চেয়ে লম্বায় কিছু ছোট ছিল। ক্ষীণ সাপটার ভেতর থেকে আবার একটা মোটা ইঁদুর বেরিয়ে আসে। আশ্চর্য্যের বিষয় সেটাও জীবন্ত এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অক্ষত ছিল।

আমি কতকগুলো চিঠি লিখে কিচ্‌কেনে তুর্কেতারের হাতে দিয়ে পাহাড়ের ওপাশের আমিরদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তাদের কাছে আমার এই ইচ্ছাটা জানাই—যেন তারা তাদের দেশের সমস্ত সেনাকে একত্র করে প্রস্তুত থাকে। আমি এ কথাও উল্লেখ করি যে আমার সেনারা অভিযানের জন্য তৈরী, তারাও যেন সৈন্য সজ্জা করে শিবিরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পরদিন সকালেও ঘোড়ায় চড়ে খুব বেড়াই এবং ভাং খাই। পারওয়ান নদী যেখানে রাস্তার পাশে মিলেছে সেখানকার জলে এ দেশের তৈরী একটা ওষুধ ফেলা হয়, যা জলের মাছকে অবশ করার জন্য এদিকে ব্যবহার হয়। এইভাবে আমরা অনেকগুলো মাছ ধরি। মির সা' বেগ আমাকে একটা ঘোড়া উপঢৌকন দেয়। একটা ভোজের ব্যবস্থা করেও আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে।

রাতের নমাজের পর সুরাপান বৈঠক বসে। দরবেশ মহম্মদও এই সময় উপস্থিত ছিল। সে বয়সে তরুণ ও একজন যোদ্ধা হলেও কোনও দিনই সে সুরাপান করেনি। সে কঠোর নিয়মে সুরা বর্জ্জন করে এসেছে। কুতলুক খাজা অনেকদিন আগে থেকেই সৈনিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে দরবেশ হয়েছে। তার বয়সও অনেক, দাড়িও পেকেছে। কিন্তু সে বরাবর সুরাপান উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মহম্মদ দরবেশকে আমি বলি—'কুতলুক খাজার পাকা দাড়ি দেখেও কি তোমার লজ্জা হয় না? সে বুড়ো, তার দাড়িও পাকা, অথচ সে কেমন মদ খায়। আর তুমি একজন যুবক, তারপর সৈনিক, তোমার দাড়িও কাঁচা—অথচ তুমি মদ খাওনা! এর কোনও মানে হয়?

আমার কখনও এমন নীতি নাই এবং আমি এটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলে মনে করি যে—যে লোক মদ খায়না ও যার মদ খাওয়ার ইচ্ছাও হয় না, তাকে জোর জবরদস্তি করে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করি। সুতরাং ওকে যে এতগুলো কথা বল্লাম সেটা শুধু আমোদ করার জন্য, পীড়াপীড়ি করে মদ খাওয়ানোর জন্য নয়।

ক্রমশঃ

চোখ গেল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল কবে ?
পোড়ালো চোখেরও মণি রূপ-বহ্নি কা'র ?
রূপানল—কালানল। পায় না নিস্তার
পতঙ্গেও ; হায় পাখি, পাখায় কি হবে।
অদাহ্য ট্রয়ের-ও দুর্গ ভস্ম হোলো ভবে।
চিতোরও পুড়িয়া গেলো রূপ-কামনার
জ্বলন্ত জহর-ব্রতে। মথিত আত্মার
সর্ব্ব-সার এই রূপই অনন্ত গৌরবে
অনির্ব্বাণ সূর্য্য-শিখা জ্বালায় জীবনে।
ক্রন্দন কিসের তবে! চোখ যাবে, যাক্।
হে বিহঙ্গ, কেড়ে লও জীবন-মন্থনে
সে অমৃত—রূপ যাহে রসে পরিপাক
হ'য়ে শেষে রোমে রোমে অজস্র নয়নে
রূপাতীত রূপ দেখে হয় হত-বাক্।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য তাসের দেশ

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

"তাসের দেশ"—আমাদের এই দেশকে লক্ষ্য ক'রে লেখা। আমাদের দেশে মানুষের নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানের আর অন্ত নেই। এমনি ক'রে নিয়ম আর আচার মানতে আমাদের বুদ্ধি গেছে অসাড় হয়ে। বুদ্ধির ধর্মই এই যে সে অবস্থা বুঝে ভালমন্দ বিচার করে কাজ করে। কিন্তু মানুষ যদি একবার বুদ্ধিকে নিরস্ত করে দিয়ে আচার মেনে কাজ করতে আরম্ভ করে, তাহলে তার বুদ্ধি ধীরে ধীরে নির্জীব হ'তে হ'তে একেবারে লোপ পায়। তখনই সে বেশ নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন পুরানো নিরর্থক নিয়ম মেনে চলতে আরম্ভ করে, বুদ্ধিকে চালনা করবার তার আর কোন দরকারই থাকে না, তখন আর মানুষ নিজে চলে না, তাকে চালায় নিয়ম। তখন সে নিজের মন-গড়া এক অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে বাস করে। মানুষ যদি একবার বুদ্ধিকে বিদায় দিয়ে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করে, তখন যে কত নিরর্থক অবাস্তব অদ্ভুত, কিম্ভুত-কিমাকার, বাস্তবের সংগে একেবারে খাপছাড়া, কত কী তার ঘাড়ে এসে ভর ক'রে—তার আর অন্ত থাকে না। তখন সে যে কাজ করে না তা নয়, কিন্তু তার কাজ গুলো সবই অকাজ। সে যে সমস্ত কাজ গম্ভীর মুখে ব্যস্ত হয়ে করতে থাকে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ তাকে দেখে না হেসে থাকতে পারে না। অথচ সে নিজে জানেই না যে তার কাজ-গুলো কত অদ্ভুত। তখন সে এই রকম খাপছাড়া হয়ে পড়ে বলেই নিজেকে সমস্ত সংসার থেকে আলাদা ক'রে রাখতে চায়। সংসারের কারোর সংগেই তার আর মেলে না। মানুষ যেখানে বুদ্ধি দিয়ে চলে সেখানে পরস্পর পরস্পরকে-বুঝতে পারে, সকলের সংগে নিজের একটা মিল অনুভব করতে পারে, কারণ মানুষ হিসাবে সবারই-প্রাণ-মনের প্রয়োজন গুলো এক রকমের। কিন্তু যদি কেউ অর্থহীন সংস্কার নিয়ে দিন কাটায়, তখন তার সংগে অন্য মানুষের মিলবে কী ক'রে, তখন সে ভাবে, সে একাই ঠিক করছে অন্য সবাই ভুল করছে। তাই সে তখন শুচিবাতিকগ্রস্ত হয়ে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে, তখন সে বিদেশী মাত্রকেই অশুচি বলে ভাবে। এমনি ক'রে তার জ্ঞানের পথ একে-বারেই বন্ধ হয়ে যায়। সে নিজের অন্ধকার গণ্ডীর মধ্যেই বাস করতে থাকে। তখন আর তার মধ্যে কোন দিনই কোন পরিবর্তন আসে না, একেবারে সনাতন নীতির পথে সে চলে। নিজের ভুল গুলোকে সে একে-বারে নির্ভুল বলে জেনে বসে, তার সংশোধনের আর কোন পথই থাকে না। তখন সে গম্ভীর চালে ওঠে বসে, তোলে নামায়, পিছনে আর সামনে ফেরে। কিন্তু নিজের দুদিকে কী আছে তা তাকিয়ে দেখে না—"বাঁয়ে চাইনে ডাইনে চাইনে।" তখন তার সব কিছুই সনাতন নিয়মে বাঁধা। অবস্থা অনুসারে দরকার বুঝে কোনোটা যে অন্য রকম হবে, উলটো পালটা ঘূর্ণি চালটার বেলায় সে বলে—ব্যস্ ব্যস্ ও সব চলবে না। চিরদিন যে নিয়ম চলে এসেছে তাই চলবে। তখন তার ওঠা বসা, ফেলা সবই চলে পুরানো নিয়ম মেনে—প্রয়োজনের তাগিদে নয়। তাই তার সেই কাজকর্ম দেখে সত্যিকারের প্রাণবন্ত মানুষ হেসে ওঠে। এই রকম চিরদিন নিরর্থক নিয়ম মেনে চলতে তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, অভ্যাসের জন্যে এতেই সে আরাম পায়। তার মন অসাড় হয়ে গেছে বলেই তার মনে কোন কিছু নিয়ে চিন্তাও নেই, অশান্তিও নেই; সে জানে তার জন্যে চিরদিনের বাঁধা রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে, তার আর ভাববার কিছু নেই, আবিষ্কার করবার কিছু নেই। শুধু বাঁধা পথে চলে যাওয়াটাই তার জীবনের চরম সার্থকতা। শুধু সাবধান হয়ে থাকতে হবে, বাঁধা পথের এতটুকু এদিক ওদিক না হয়ে যায়। তাই হৃদয়াবেগ বলেও কোন বালাই তার নেই। প্রাণের বেগেই মানুষ ভুলও করে—আবার ভুল শুধরেও নেয়, কিন্তু যার প্রাণ বলেই কোন বালাই নেই, যার প্রাণের বদলে কাজ করছে নিয়ম—তার পক্ষে ভুল করবারও কোন সুযোগ নেই—শোধরাবারও নয়। কিন্তু সে জানে না যে এই রকম মড়ার মত বেঁচে থাকাটাই একটা চরম বিড়ম্বনা। তাই সে কেবলই নিয়ম আঁকড়ে বাঁধা পথ ধ'রে পড়ে থাকে, পাছে কোন ভুল ক'রে ফেলে বলে। ভুলের মধ্য দিয়েই যে মানুষের সত্যিকারের শিক্ষা তা সে জানে না, তাই কোন রকম প্রাণের লক্ষণকেই সে ভয় ক'রে এড়িয়ে চলতে চায়, তাই রাজপুত্রের হাসি শুনে তাসেরা ক্ষেপে ওঠে, "লজ্জা নেই তোমাদের হাসি? নিয়ম মান না তোমরা হাসি?" তারা বলে—তুমি চলবে কেন? চলবে নিয়ম। তাদের কাছে নিয়মটাই প্রধান, মানুষের খেয়াল খুসী নিতান্তই খারাপ জিনিষ। তাদের কোন প্রশ্রয় দিতে নেই।

অথচ এই রকম নিয়ম-মানা মানুষের মনের খেয়ালের অন্ত নেই, নিজের স্বপ্নে ভোর হ'য়ে সে যে কত অসম্ভব কল্পনা করছে তা সে নিজেই জানে না—সে বলে "বাদুড়ে খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিনদিন চোখে কাজল পরলে তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাংগবে।" প্রাণের তাগিদে মানুষ যখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে, তখনই কাজের মধ্যে সজীবতা থাকে। কিন্তু যখন মানুষ নির্বিচারে নিয়ম পালন করে, তখন তার কাজ দেখে তার চলা ফেরা দেখে মনে হয় যেন—"মড়া দেহে ভূতের নৃত্য", এরকম মানুষের কোন কিছুতেই নিজের খুশী নিজের রুচির কোন পরিচয় নেই, তাই সবাই একই রকম চলে, একই রকম বলে, একই রকম পোষাক পরে, সবাই যেন একটা একটা ছাপমারা তাস,

একটা ছাপই সবার গায়ে, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বলতে কারো মধ্যে কিছু নেই। তাই একজন যে রকম, অন্য সবাই সেই একই রকম। তাই এরা যেন মানুষ নয়— যেন ছাপ-মারা রং-করা সব তাস, সবাই একটা একটা বিশেষ নিয়ম মেনে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, নিজেকে জানতেও পারছে না, ঐ ছাপের আড়ালে আসল মানুষটা একেবারে চাপা পড়ে গেছে, কিন্তু এটা মানুষের সত্যিকারের রূপ হ'তেই পারে না, বিধাতার বিধানে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের থেকে আলাদা। কি তার চেহারায়, কী তার রুচিতে বুদ্ধিতে প্রবৃত্তিতে। তাই এই নকল তাসগুলো ছাপের আড়ালে নিজের আসল মানুষটাকে লুকিয়ে রেখেছে, ঐ মুখোসটা খুলে দেখলেই দেখতে পাব নিজের বিচিত্র ইচ্ছা, রুচি শক্তি নিয়ে বিরাজ করছে জীবন্ত মানুষ তার স্বতন্ত্রতা নিয়ে, কিন্তু এমন করেই সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে চেপে রাখা হয়েছে—যে মানুষগুলো নিজেরাই যার বৈচিত্র্যহীন অস্তিত্বের অন্তরালে রয়েছে এক বিচিত্র মানব প্রকৃতি, জানে না যে তাদের বাইরে-সেই চাপা আগুন ফুঁ দিলেই বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু এই তাসেদের মাঝখানে কোনদিন কোথা থেকে এসে পড়ে রাজপুত্র, সেই রাজপুত্র, যে চারপাশের সাধারণের মাঝে একজন অসাধারণ, অসাড়তার মাঝখানে প্রাণের সঞ্চার করাই তার কাজ, তাই প্রতিদিনের নিরাপদ জীবনের বাঁধা ভোগের বরাদ্দে তার তৃপ্তি নেই। সে আরামকে কারাগার বলে জানে। সে নূতনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, না-জানা রাজকন্যার গলায় মালা দেবে বলে, অজানার পথে যাত্রা করতেই তার আনন্দ, বিপদের মাঝে তার আত্মোপলব্ধি, আবিষ্কারই তার কাজ, দেশ-জোড়া অসাড়তার মাঝখানে সে নিয়ে আসে প্রাণের স্পন্দন, তখন মানুষ তাকে গাল দেয়, তার নিন্দা করে—কিন্তু গোপনে গোপনে প্রাণের ছোঁয়া লেগে প্রাণ জেগে ওঠে, মানুষ গান গেয়ে ওঠে, মানুষ নিজের রুচিতে নিজের আনন্দে সাজে, দুর্গমের পথে মানুষ বেরিয়ে পড়ে, পথের বাধাই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, বাধা ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার নেশা তাকে লাগে, অর্থহীন দিন, প্রাণহীন রাত্রি, একই নিরাপদ বাঁধা পথে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে চলার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে, মানুষ প্রাণের পথে দুর্গমকে জয় করেছে, রাতের অন্ধকারে সে মশাল জ্বেলে পথ দেখিয়েছে, নরনারীর মিলিত জীবনে একে অন্যের জয়ধ্বজা বয়ে নিয়ে গেছে, প্রাণের পথে মানুষ নিরাপদে এগিয়ে আসেনি। দুর্গমকে সে সুগম করেছে। তার প্রাণের ইতিহাস পথের বাধা ভেঙে ফেলে এগিয়ে চলার ইতিহাস। তাই সেই দুর্গম পথ চলতেই মানুষের আনন্দ, তাতেই তার সত্যিকারের বাঁচা, শুধু প্রাণ বাঁচিয়ে চললেই সে বাঁচে না, মানুষ যখন একবার প্রাণের শক্তির পরিচয় পায় তখন তার কাছে—নিরাপদ নিয়ম আর অর্থহীন আচার গুলো একেবারেই অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন সে বলে, "ওগুলোর অর্থ কী?" যারা তাকে ধমকে বলে "অর্থের কথা ব'লনা, ও গুলো নিয়ম", তখন তাতে তারা আর ভয় পায় না, তারা বলে "নিয়ম ভেঙে আমরা বিপদের মধ্যে পড়তে চাই। দুঃসাহকে দুর্গমকে আয়ত্ত করতে চাই, তার সংগে লড়াই করতে চাই।" বিজ্ঞ মানুষ বলে "লড়াই করে কী হবে?" তারা বলে "এমনি করেই নিজের জীবন্ত প্রাণটাকে বুকের মধ্যে অনুভব করতে চাই, আমরা শান্তি চাই না, আমরা শান্তি ভংগ করব পণ করেছি।" আমাদের এই সনাতন দেশ ভারতবর্ষ এমনি শান্তির দেশ, এ শান্তি জীবনের নয়, এ শান্তি মরণের, আমাদের দেশ যেন অতল স্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগর, এখানে কারো কোন প্রাণের লক্ষণ প্রাণের চঞ্চলতা নেই, সব কিছুই চিরদিনের মত নিয়মিত হয়ে গেছে, আর ভাববার কিছু নেই, লাভ করবার, জয় করবার কিছু নেই, দূর করবার মত অমংগল কিছু নেই, মানুষের জীবনের যুদ্ধ যেন একেবারে থেমে গেছে, কিন্তু আসলে থেমে কিছু যায়নি, চারিদিক থেকে জীবন্ত সংসার আমাদের আঘাতের পর আঘাত হানছে, অন্নাভাব রোগ দুর্ভিক্ষ জলাভাব বিদেশী শত্রু সবাই এসে দুয়ারে হানা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা কারোকে কিছুমাত্র বাধা না দিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে, একেবারে নিজের ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে দিচ্ছি। দুঃখের আর অন্ত থাকছে না। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য যেন মৃতের নিশ্চেষ্টতা, কিছুতেই আর তা টলে না, তাই দিনের পর দিন সবার কাছে হার মেনে আমরা মৃতপ্রায় জীবনের বোঝা ব'য়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি। আমাদের শান্তি মানবাত্মার বিশ্ববিজয়ের পরেকার জিতে-নেওয়া শান্তি নয়, এ শান্তির নাম জীবনের কাছে হারমানা, এ যেন বুড়ো গাছের শান্তির মত, যেখানে আর পাতা গজায় না, হাওয়ার দোল লাগে না, যথেষ্ট বেঁচে নেই বলেই তার প্রাণহীনতাকে শান্তি বলে ভুল হচ্ছে, আমাদের শান্তিটাও তেমনি প্রাণহীনতা, এই শান্তিরসে আমাদের গায়ের রক্ত জমে হিম হয়ে গেল, এ আমাদের এমন নিশ্চেষ্ট ক'রে রেখেছে যে আমরা আর প্রাণধর্মের জোরে বাইরের কোন শত্রুকেই ঠেকাতে পারছি না, সবার হাতেই আত্মবিসর্জন করে বসে আছি, চাই সে বিদেশী শত্রুই হ'ক চাই সে জলাভাব বিদ্যাভাব অন্নাভাব আর বন্যা আর দুর্ভিক্ষই হ'ক, এই জন্যেই জীবনে আমরা অপমানিত, অথচ এরই মধ্যে যদি কারো মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে চারদিক থেকে বিজ্ঞ লোকেরা তাকে চোখ রাঙাতে আসে। বলে সনাতন ধর্ম লোপ হ'ল, বলে অশুচি হল, কিন্তু বিজ্ঞ লোকেরা বোঝে না যে নির্জীব হয়ে থাকার চেয়ে ভুল করাও ভাল—ভুল করাও মানুষের প্রাণের ধর্ম, ভুলের মধ্যে দিয়েই সে নিজে উপলব্ধি করে এবং অবশেষে পথ খুঁজে পায়। কিন্তু পাছে ভুল হয় বলে মানুষ যদি নির্জীবের মত অসাড় ভাবে দিন কাটায় তাহলে সেটাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে খারাপ, মনে থাকাটাই যে সবচেয়ে বড় অশুচিতা, মৃত দেহের চেয়ে বেশী অশুচি যেমন আর কিছু নেই তেমনি নির্জীবতার চেয়ে বড়ো পাপ বড়ো ভুল মানুষের আর হতে পারে না।

আবার সভ্য সমাজে মেয়েদের সাজ নিয়েও কবি বিদ্রূপ করেছেন। বিধাতা মানুষকে বিচিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে কেউ একজন অন্য একজনের মত নয়। মানুষ তার এই স্বতন্ত্র রূপেই সুন্দর। নিজের স্বাভাবিক রূপই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু অনেক মেয়েদের এমনই রুচির বিকৃতি যে তারা নিজের ঠোঁটের সহজ রংকে ঢেকে ফেলে, রংয়ের তুলি বুলিয়ে, নিজের নিজের ভ্রূর বৈশিষ্ট্যকে ডুবিয়ে

দিতে চায় কালো পেনসিল বুলিয়ে। তারা জানে না মানুষের নিজের রূপটাই তার জীবন্ত রূপ, তাতেই তার শ্রী, তারসৌন্দর্য। এঁকে, মেখে যে রূপ—সে তো প্রাণহীন মুখোস। এ যেন মানুষ হয়ে, তার মনুষ্যত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে রং-করা তাস সাজতে যাওয়া। মেয়েদের সুন্দর পা পুরুষের পুজ্য পেয়েছে। কবি এক জায়গায় বলেছেন (যোগাযোগ)—লক্ষ্মণ যে কী করে সীতার পায়ে চোখ রেখে চোদ্দটা বছর বনে কাটিয়ে দিলেন, এদেশের দেওরেরা তা বোঝে। এই সহজ সুন্দর পাকে খুরতোলা জুতো দিয়ে বিকৃত করাটা কবির প্রাণে বাজে। মেয়েদের দুটি পা ঘিরে শাড়ীর পাড়টি লুটিয়ে পড়েছে কবি এ ছবিটি বার বার এঁকেছেন।

"গৌরব বরণ তোমার চরণ মূলে
ফলসা বরণ শাড়িটি ঘেরিয়ে ভাল।"

মেয়েরা যে নিজের সহজ শ্রীটি ঘুচিয়ে দিয়ে রং মাখবে, নকল রঙে নিজেকে রাঙ্গাবে—এতে কবির বুকে বাজে। নারীর সহজ রূপ কবির মন ভুলিয়েছে তাই সেই রূপের বিকৃতি তাঁর সয় না।

আমাদের দেশের নিশ্চেষ্ট অলসতার জন্যেই আমাদের মনে স্বপ্নের ঘোর। যারা কাজ করে তারা স্বপ্ন দেখার সময় পায় না। কাজই তাদের মনকে জাগিয়ে রাখে। কিন্তু যারা কাজ করে না তাদের মনে প্রাণের রুদ্ধ গতি নিজের মধ্যেই স্বপ্ন রচনা করতে থাকে। মানুষ যে রকম আলস্য বশে হাই তোলে। আমাদের জীবনটাও সেই হাই তোলার ছন্দেই গড়া। তবে এই অকর্মণ্য দেশের মানুষ যেন বিধাতার হাই থেকে জন্মেছে। আমাদের জীবনের ছন্দ স্বপ্নের ঘোর লাগা। বাস্তব জীবনের সংগে তার মিল নেই। তাই আমাদের মানুষে মানুষে এত মনগড়া কাল্পনিক জাতিভেদ। আমাদের সাড়ে সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতি। মানুষের যে কত গাঁই গোত্র পুংক্তি পদ্ধতি তার আর অন্ত নেই। আমাদের হাতে কাজ কিছু নেই, জীবনের উদ্দেশ্য কিছুই নেই। শুধু জাত বাঁচিয়ে একটা কৃত্রিম শুচিতা রক্ষা করে চলাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজ পুত্র প্রশ্ন করে "শুচি থাকলে কি হয়?" তার উত্তরে আমরা বলি—"শুচি থাকলে শুচি হয়, বুঝতে পারছ না।" কিছু অর্থ নেই বলেই এই শুচিতার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। অর্থ যদি থাকত তাহ'লে জগতের সত্যের সংগে মিলিয়ে দেখতে পারতাম অর্থটা ঠিক কি ভুল। ভুল হলে বদলে অন্য রকম কাজ করতাম, কিন্তু যার অর্থ নেই—যা শুধু নিজেরই মনের স্বপ্ন রচনা, তাকে যাচাই করব কীসের সংগে? তাই নিজের স্বপ্ন নিজের কাছে একান্ত নির্ভুল বলে মনে হয়।

আমরা যেমন একই জায়গার একই পুরানো নিয়ম মেনে দিন কাটাই—তেমনি যে রাজপুত্র সে অসাধারণ, সে প্রাণের প্রাচুর্য্যে অস্থির হয়ে বেড়ায়। জলে ডুব দেয়, পাহাড়ের মাথায় চড়ে। কুড়ুল হাতে বনে বনে পথ কাটে। আমরা প্রশ্ন করি "এই অস্থিরতা কীসের জন্য?" সে উত্তর দেয় "তোমাদের এই নিরর্থক উঠা বসা, পাশ ফেরা পিঠ ফেরানো, মাটিতে গড়ানো এসব নিরর্থক আচরণ কীসের জন্য?" আমরা এ আমাদের নিয়ম।" রাজপুত্র বলে—"এ আমাদের ইচ্ছে।"

মানুষ তার বিচিত্র ইচ্ছার জন্যেই বিচিত্র কাজে নিযুক্ত হয়। যে বিধাতা মানুষকে এই বিচিত্র ইচ্ছা দিয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্য এই যে মানুষ বিচিত্র ইচ্ছার পথে নিজের জীবনের পরিচয় দিতে থাকবে। মানুষ ইচ্ছে করেই বাঁধন ছেঁড়ে আবার ইচ্ছে করেই বাঁধন পরে। সে যখন সং ছেড়ে দূর পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় ওঠে সেও তার ইচ্ছে, আবার যখন ঘরের মধ্যে বাঁধা পড়ে সেও তার ইচ্ছে। এই ইচ্ছাই মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে। কর্ম এনেছে। ইচ্ছা না থাকলে সবাই অলস হয়ে একই জায়গায় পড়ে থাকত, সমস্ত বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে সমস্ত একাকার হয়ে যেত। বিচিত্র ইচ্ছার জন্যেই মানুষ চঞ্চল হয়ে বেড়ায়। এই ইচ্ছার তৃপ্তিতেই তাঁর বেঁচে থাকবে আনন্দ। যদি মানুষের নিজের ইচ্ছা বলে কিছু না থাকে তাহলে সে বেঁচে থাকার আনন্দ হতেই বঞ্চিত হয়। তাহলে বেঁচে থাকা কীসের জন্য। এই ইচ্ছার তৃপ্তির জন্য মানুষ সাধ করে দুঃখ স্বীকার করে। কারণ এতেই তার জীবনের স্বাদ। তাঁর আত্মোপলব্ধি বিচিত্র ইচ্ছা মানুষকে বিচিত্র কর্মের মধ্যে ঠেলে দেয়—মানুষ বুঝতে পারে যে সে বেঁচে আছে। যেখানে ইচ্ছে নেই সেখানে চেষ্টা নেই—সেখানে জীবন বলেও কিছু নেই।

কিন্তু আমাদের এই শাস্ত্র-মানা দেশের শাস্ত্র পাকা নিয়ম বেঁধে দিয়ে যতদূর পেরেছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শেকল দিয়ে বেঁধেছে। আমরা নিজের ইচ্ছায় চলতে গেলেই হয় অপরাধ। আর শাস্ত্রের, পুঁথির ইচ্ছায় চলাটাই আমাদের ধর্ম। কিন্তু এ ধর্ম মানুষের ধর্ম নয়। আমরা ধার্মিক বলি তাকেই—যার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। যে বিনা দ্বিধায় পরের মতে চলতে পারে। আমরা পরাধীনতার শেকলকে বলি অলংকার। পরের মত মেনে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে চলাকে বলি ধার্মিকের লক্ষণ।

আচারের কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা আমাদের সমাজ, এখানে নিজের ইচ্ছায় কাজ করবার পথ বন্ধ, আমাদের মন এই সমাজে বাস করে এমনি অসাড় হয়ে গেছে যে এর দুর্ভাগ্যটা আমাদের আর দুঃখ দেয় না, আমরা বলি এই আমাদের সনাতন আশ্রয়। এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হ'তে আমরা চাইনে। আমরা জেলখানাকে বলি শ্বশুরবাড়ী, আমাদের আচার আমাদের শাস্ত্র মানুষের বুদ্ধির সংগে মেলে না, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝেনা তাকে বলে হেঁয়ালি। তেমনি আমাদের শাস্ত্রের নিয়মগুলোও বাস্তব বুদ্ধির সংগে সম্পর্ক শূন্য কতগুলো হেঁয়ালি, আমাদের ঈশান কোণে মুখ করে বসা আর বায়ু কোণ থেকে মুখ ফেরানো এই যে সব বিধি বিধান এর কোন কি অর্থ আছে? এগুলো সবই হেঁয়ালি।

জীবনের সমস্ত লক্ষণ সমস্ত চাঞ্চল্যকে ঘুচিয়ে দেওয়াই আমাদের সাধনা, আমরা বোবাকে বলি সাধু, মৌনব্রত ও আমাদের ধর্মাচরণের মধ্যে পড়ে, যে যত বোকা, সংসারের সত্য অবস্থার সংগে যার পরিচয় যত কম—আর জ্ঞান পুঁথির পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তাকে আমরা বলি পণ্ডিত। এমনি করে কর্মহীন, চিন্তাহীন হয়ে টিকে থাকাকেই আমরা বলি বাঁচা, কিন্তু আসলে চেষ্টাহীন জীবনই তো মৃত্যু।

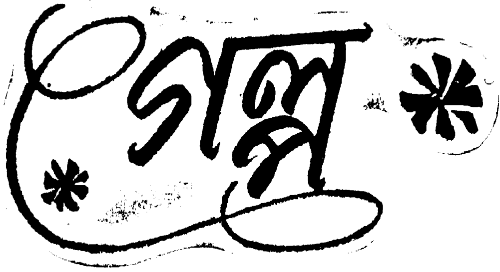
সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে স্খলনে পতনে উত্থানে মিলিয়ে মানুষের

য প্রাণের পরিচয় তাতেই মানুষের আনন্দ, সেই তো মানুষের স্বর্গ, কন্তু আমরা সেই স্বর্গকে বলি অপরাধ। বেঁচে থাকার আনন্দ হ'তে ক্কি‌ত হয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে চলাকেই আমরা বলি পুণ্য, দেশজোড়া এই ঢসাড়তার মাঝে যে প্রাণ নিয়ে আসে—তার পথে অনেক সময় সহায় য় নারী। পুরুষের অজ্ঞতার কঠিন দেয়াল ভাংগা বেশী শক্ত, কিন্তু নারীর প্রাণ বিপ্লবের আহ্বানে অনেক সময় সহজে সাড়া দেয়, সহজ বুদ্ধি তার অনেক সময় বেশী। তাই তাদের দেশের রাজারও হয়ত মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে রাণী হবে তার সহায়, পুরুষের গোঁড়ামোর ভিত যত বেশী পাকা মেয়েদের প্রাণে সাড়া লাগানো তার চেয়ে সহজ। তাই কবিও ভরসা করেছেন দেশের মেয়েরাই জীবনের বাণীকে বহন ক'রে আনবে এই মরা মানুষের দেশে, দেশের পুরুষকে তারাই এগিয়ে নিয়ে চলবে প্রাণের যাত্রা পথে।

পিক্‌নিক্



ফটো: রনেন্দ্রশেখর ঘোষ



হারানো সুর

জুল্‌ফিকার

দেবদারু গাছের ঘন পাতাগুলো কাঁপিয়ে বয়ে গেল উত্তরে বাতাস। আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ, চাঁদের আলো পাণ্ডুর, বিমর্ষ। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তার এ্যাসফল্টের উপর গ্যাসের আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

ফুটপাথের কোল ঘেঁসে নতুন তিনতলা বাড়ী। একতালার কতক অংশ সাবেকী আমলের সাহেবের বাড়ী ছিল, তাকেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তিনতলা ম্যানসান্ বানানো হয়েছে। ষাট ফিট চওড়া নতুন রাস্তার দৌলতে সামনের লনটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধু একজোড়া দেবদারু গাছ এখনও দাঁড়িয়ে।

নীচের তালার একটা ঘরে ওরা ক'জনা বসে—দিব্যেন্দু, মনোধীর, অমর, উৎপলাক্ষ ও রুমা দেবী। দিব্যেন্দু আর মনোধীর দিল্লী থেকে এসেছে বন্ধু উৎপলের বাড়ীতে। অমর ওদের সবারই বন্ধু, এই পাড়ার বাসিন্দা। রুমা ঘোষাল, অধুনা রুমা রায় রেডিওতে গান করে নাম করেছেন। সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে উৎপলাক্ষের সঙ্গে। উৎপল গ্রামোফোন কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরী করে।

সেই বৃষ্টির সময় থেকে অন্তত সাতখানা গান গেয়েছেন রুমা দেবী, স্বামীর বন্ধুদের অনুরোধে। এরা সবাই গানের ভক্ত। মনোধীর আবার গানের সত্যিকার সমজদার। রুমার গান তার ভালই লেগেছে। সিনেমাগন্ধী আধুনিক পাঁচমেশালী হাইব্রীড্ গান শুনলে ওর গা জ্বালা করে। রুমা রায় তাই ওর জন্য বিশেষ করে বেছে বেছে ক্ল্যাসিকাল ঢঙ-এর গানগুলো গাইলেন। সঙ্গীত-বিদগ্ধ মহলে গাইবার মত ভাল নতুন গানের পুঁজি তাঁর নিঃশেষ।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি, রাত্তির নটা বেজে গেছে। রাতের খাওয়া শেষ করে ওরা সবাই ড্রইং রুমে এসে বসেছে। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। ভিজে হিমেল বাতাস হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ছোট্ট একফালি রোয়াক, তারই সামনে হাস্নুহানার ঝাড়। হাস্নুহানার ঝোপের আড়ালে দুটো দেওয়ালের কোণ ঘেঁসে একজন পথচারী ভিক্ষুক ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।... দোতালার রেলিঙ ঘেরা বারান্দাটা মাথার উপর আচ্ছাদন মেলে আছে। ওধারে একটা বিলেতী ক্রিপার লতি[illegible] উপরে উঠেছে। লোহার রেলিঙের গায়ে জড়িয়ে ও[illegible] তার ঘন পত্রসজ্জা ও সর্পিল ডগাগুলো অনেকদূর অব[illegible] নীচে নেমে এসে একটা ছায়াকুঞ্জ রচনা করেছে। রাতে[র] আশ্রয় ভালই জোগাড় হয়েছে লোকটার। উত্ত[রে] বাতাসের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে একটা অব্যাহতি পাওয়া যাবে এ জায়গাটায়।

ভিক্ষে করতে বেরিয়ে আস্তানা থেকে বহুদূরে এ[সে] পড়েছিল। তারপর সন্ধ্যে হবার সাথে সাথে নামল [বৃষ্টি] বেশ একটু জোরেই। সেই বৃষ্টির সময় থেকে আশ্রয় নিয়ে[ছে] এখানে। ভাগ্যিস্ কম্বল গায় দিয়ে বেরিয়েছিল।

কাঁচের জানলা ভেদ করে ঘরের অত্যুজ্জ্বল নী[ল] আলোক ছটার কিছুটা বাইরে এসে পড়েছে। ফায়া[র] প্লেসে আগুন জ্বালা হয়েছে। সেকেলে সাহেবদের আমলে ফায়ার প্লেসটাকে অটুট রাখা হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়নি। ভেতরটা বেশ গরম, সুখপ্রদ।

মনোধীর জিজ্ঞাসা করল, 'পল্ (বন্ধু উৎপলকে [ও] পল বলেই সম্বোধন করে থাকে) সেকেলে রেকর্ড [নেই] দু' একখানা? তাই শোনা যাক্। যাই বল সেকা[লে] দু'একজন গাইয়ে ছিলেন যাঁরা সত্যিই জিনিয়াস।...রা[ত্তির] এখন সাড়ে নটাও বাজেনি। ঘুম আস্‌তে দেরী আছে।... অজয় আর তুমি এখনও ব্রীজ খেলা শিখলে না। হো[য়াট] এ পিটি!...পুয়োর সোলস্! ভদ্রসমাজে মিশবার উপয়

নও তোমরা !···দিব্যেন্দুর আর আমার রাত করে ঘুমোনোর অভ্যেস। সাড়ে দশটার আগে ত খেলাই ভাঙে না কোনোদিন। তা'ছাড়া তোমার মত আমাদের ত আর শয্যাসঙ্গিনী নেই···(হঠাৎ সলজ্জ ভঙ্গীতে হাত জোড় করে) রুমা দেবি ! দোষ নেবেন না কথার !

রূপোর ঘণ্টার মত একটা মিঠে হাসির তরঙ্গ জেগে উঠল রুমা দেবীর কণ্ঠে।

রেডিওগ্রামের স্ট্যাণ্ডের সংলগ্ন সেফটা খুলে একগোছা পুরোনো রেকর্ড বার করল উৎপলাক্ষ, মনোধীরের পাশে টেবিলে রাখল।

'এগুলো সংগ্রহ করেছি দাদামশায়ের ওখান থেকে। অনেকগুলো ভাল বিলেতী রেকর্ড আছে এতে। বেশীর-ভাগই বাজনার···ভায়োলীন, হাওয়াইয়ান গীটার। মুনলাইট সোনাটা, ব্লু ড্যানিউব ভোল্‌গা বোটম্যান্···শোঁপারও একখানা কম্পোজিশন আছে। বিলেত থেকে ফেরার সময় দাদু কিনে এনেছিলেন, পঞ্চাশ বছর আগে।

অবিশ্যি বেশী বাজানো হয়নি এগুলো। এ ছাড়া কয়েকখানা বাংলা গান আছে, বেশ ভাল। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের বেস্ট সেলার্স। 'আচ্ছা তা'হলে বাংলা গানগুলোই আগে শোনা যাক,' বল্ল দিব্যেন্দু, 'তারপর রাত হলে শোনা যাবে হাওয়াই গীটার। বিলেতী সুর গীটারেই জমে ভাল।'

প্রস্তাব মনোধীর অনুমোদন করল।

উৎপল খান চারেক রেকর্ড আলাদা করল। আরম্ভ হ'ল রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে, 'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা, বন্ধু হে আমার!' গেয়েছেন সে যুগের যশস্বিনী অভিনেত্রী ডালিমকুমারী। কেমন যেন থ্যাস্‌থেসে অস্বচ্ছ শব্দ। অনেকবার বাজানো হয়েছে রেকর্ডটা।

'থাক্, থাক!' অমর বলে উঠল।

এরপর একটা ভজন, আরম্ভটা মন্দ লাগলো না, কিন্তু মাঝে রেকর্ডের এক জায়গায় কাটা। 'মেরে কানাইয়া' বলতে গিয়ে, মেরে কা—না—না—না—না চল্ল একটানা।

'তাইত, ওটা যে কাটা সে কথা ত মনেই ছিল না', বল্ল উৎপল।

মধুর হাস্যধ্বনিতে রুমা দেবী ঘর ভরে তুললেন। এবার আর একখানা নতুন রেকর্ড—

'স্বপ্ন সাগর থেকে অতীতের বেলাভূমি পার হয়ে এলে'—বাঃ, চমৎকার একটুও ম্লান হয় নি সুরটা। আর কি অদ্ভুত দরদ গলায়।···রাগিণী পট-মঞ্জরী, রচনাও উচ্চ শ্রেণীর।

গান বেজে চলেছে। নিথর রাত্রির বুকে যেন একটা বোবা কান্না গুমরে উঠছে। একটা অব্যক্ত বিরহ বেদনা চতুর্দিক ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ওদের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

থেমে গেছে গান, তবুও তার রেশ সবার প্রাণে ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে।

'সবাস্', বলে উঠ্ল অমর।

'মাষ্টারলী,' দিব্যেন্দু অভিমত প্রকাশ করল। 'অপূর্ব! এই রকম গলা খুব কম শুনেছি জীবনে। নাম কি হে লোকটার ?, জিজ্ঞেস করল মনোধীর।

'রামকুমার দাস'।

—'কই, আগে নাম শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না।' উৎপলাক্ষ প্রাক্‌রেডিও যুগের বাংলার প্রায় সমস্ত গায়কদের (যাদের গান রেকর্ডে তোলা হয়েছে) পরিচয় সংগ্রহ করেছে। এ বিষয়ে তার জ্ঞান বিস্তৃত। 'শুন্‌বে কোত্থেকে! এ গান যখন রেকর্ড হয় তখন তোমার জন্মই হয় নি! তোমার ত সবে আটাশ বছর। এ রেকর্ডটা তোলা হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। ইংরেজী আঠাশ উনত্রিশ সালে কলকাতা জোড়া নাম ছিল রামকুমার দাসের। চার পাঁচ বছর ওকে নিয়ে সে কী মাতামাতি, লোফালুফি! কিন্তু তারপর সে কোথায় মিলিয়ে গেল বিস্মৃতির গাঢ় কুহেলিকায়,···কত শিল্পী, কত কবি, কত গায়ক এই রকম খ্যাতির আকাশে উল্কার মত ক্ষণিক দীপ্তিতে সবাইকে চকিত করে বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।···প্রায়ই দেখা যায় প্রতিভা ক্ষণজীবী।'

গানের সুর কানে এসে লাগতেই লোকটার তন্দ্রা টুটে গেল। একটা গভীর দুঃস্বপ্ন থেকে সে যেন জেগে উঠেছে।···সুরের স্রোতে স্নান করে ও যেন নবজন্ম পরিগ্রহ করল। নিজের সঙ্গে নতুন করে চেনা হ'ল ওর। একটা

কুৎসিত নির্মোক ওর দেহ থেকে খসে পড়ল। ওর ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠল অমর, জ্যোতির্ময় ভাস্বর এক আত্মা যে—'স্বপ্ন সাগর থেকে উঠে এল, অতীতের বেলাভূমি পার হয়ে'···ওই সুর কি তারই গলায় জেগেছিল একদিন? ওই গেয়েছে এই গান—বেলেঘাটার বস্তির ভিক্ষুক রামু?

বিস্মৃতির উর্ণজাল ছিন্ন করে অতীতের তমিস্র গুহা থেকে বেরিয়ে এল ত্রিশ বছর আগের দিনগুলো যখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে ছিল ওর স্থান। রেডিওর তখন সবে শৈশব, পুরো গ্রামোফোনের যুগ চল্‌ছে। সে যুগে আলমবাজার থেকে নতুন লেকের ধার পর্যন্ত ওর কণ্ঠের অপূর্ব সুর-মাধুরী বাতাসকে ধ্বনিত করে তুলেছে। ওর গান শিখবার জন্য মেয়েদের সে কী অধীর আগ্রহ! তার গানের কলি স্কুল কলেজের ছেলেদের গলায় গুঞ্জরিত হয়ে ফির্‌ত। পান সিগারেটের দোকানের ছোকরারা বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে তারই গান গেয়ে চলেছে,

"জল-ভেজা শ্রাবণের নিশীথ রাতে,
কাঁদন মুছিতে গিয়ে কাঁকন বাজে—"

নিত্য-নতুন মজলিসে আমন্ত্রণের জ্বালায় সে উত্যক্ত হয়ে উঠত।

গান গেয়ে প্রচুর অর্থ পেয়েছে সে, অনেক সমাদর। টাকা কিন্তু কখনও ওর হাতে জমতে পারে নি। পাওয়ার সাথে সাথে খেয়ে-দেয়ে ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ একদিন ঠাণ্ডা লেগে পড়ল নিমোনিয়ায়, বেশ কিছুদিন ভুগে বেঁচে উঠল বটে, কিন্তু শরীর একদম ভেঙে পড়ল। শেষে ধরল হাঁপানীতে। যা হাতে ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল চিকিৎসার খরচ জোগাতে। জিনিষ-পত্র বিক্রি কর্‌তে হ'ল—আসবাব, সোনার সিগারেট কেস, ঘড়ি, চেন, আংটি, শাল মায় মেডেলগুলো পর্যন্ত। দিন চলা ক্রমে ভার হয়ে উঠল। গান করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে। গলায় মাঝে মাঝে বিশ্রী একটা সাঁই সাঁই আওয়াজ ওঠে। নাম ভাঙিয়ে কয়েক মাস গানের মাস্টারী কর্‌ল বটে, কিন্তু পরে তাও আর জুটলো না। বন্ধু-বান্ধব আর কাঁহাতক, কতদিন ধার দেবে।

অনাথ শিশু, মানুষ হয়েছিল এক বাইজীর আশ্রয়ে, গানের হাতেখড়ি তার কাছেই। সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না ওর। যৎসামান্য লেখাপড়া শিখেছিল—না জানারই সামিল। শারীরিক শ্রমজনক কাজেও সে অপারগ। জীবিকা অর্জনের কোন পথই খোলা নেই ওর সামনে। অভাবের তাড়নায় শেষকালে ওকে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ল ভিক্ষা পাত্র হাতে। অত যে নাম ডাক, প্রতিষ্ঠা—বিস্মরণের অথৈ সমুদ্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল একদিন।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, মনে হয় এই ত সেদিন! সহস্র মুগ্ধ উৎকর্ণ শ্রোতার সম্মুখে গান গেয়ে চলেছে সে, ভক্তেরা ওর উদ্দেশে অকুণ্ঠ প্রশংসার অর্ঘ্য দান কর্‌ছে।···

* * *

রামু ভাবল, 'আচ্ছা, যদি বলি আমিই সেই রামকুমার দাস—যার গান শুনে তোমরা প্রশংসামুখর হয়ে উঠেছ, তবে কি একটু আশ্রয় মিলবে না ওদের উষ্ণ গৃহকোণে, এই শীতের রাতটার জন্য? একখানা কম্বল কি গোটা দশেক টাকা কি জুটবে না ওর ভাগ্যে?'

গান বেজে চলে।

রামকুমার যেন তার হারানো পুরাণো জগতে ফিরে এসেছে। ঘন অশ্রু-বাষ্পে ছল ছল করে ওঠে চোখ দুটো, জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর নিরুদ্ধ আবেগে দুলে ওঠে। হঠাৎ প্রবল কাসির বেগে সে যেন ফেটে পড়ল, 'খক্—খক্—খক্—খক্' কাসি আর যেন থামতেই চায় না।

'কে, কে ওখানে?' জানলার কাছে এসে বাইরের পানে উদ্দেশ করে শুধালো উৎপল।

'আমি,···খক্, খক্···আমি রামু', কাসির বেগ চেপে কোন রকমে উত্তর কর্‌ল রামকুমার।

'রামু? কে রামু?'

'রামকুমার দাস', শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে রামকুমার বল্‌ল। একটা সাঁই সাঁই শব্দের নীচে চাপা পড়ে ওর কথা ঘরের ওরা কেউ বুঝলো না ও কি বল্‌ছে।

'কে, কে বল্লে?'

রামু ততক্ষণে নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে। ওরা কি বিশ্বাস কর্‌বে ওর কথা? সব হারিয়েছে যে, তার আবার বিগত গৌরবের মোহ কেন?···

গলার জড়তা কাটিয়ে একটু জোর দিয়েই বলে উঠল সে, 'কেউ নই হুজুর, ভিখিরী।'

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

[অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার আন্তর প্রীতিশ্রদ্ধাঞ্জলি আমি নিবেদন করছি—অতি বাল্যকাল হতেই তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছিল। আর অন্যান্য যাঁদের নাম বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন—তাঁদেরও স্মৃতি-তর্পণ উদ্দেশ্যে আমার এই প্রবন্ধ।]

সবুজপত্রের লেখকদের মধ্যে রংপুর-গোষ্ঠী প্রমথবাবুকে চমৎকৃত করেছিল, আনন্দিত করেছিল। এক জায়গা থেকে একই সময়ে এতগুলি গুণী লেখকের উদ্ভব একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বৈ কি! লেখকদের নাম তবে করি, অনেকটা বয়সানুক্রমে: (১) অতুলচন্দ্র গুপ্ত, (২) নলিনীকান্ত গুপ্ত, (৩) বরদাচরণ গুপ্ত, (৪) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং (৫) আমি যোগ করতে চাই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ইনিও এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত, যদিও সবুজপত্রের লেখক হিসাবে ইনি দেখা দিতে পারেন নি—ঠিক সময়মত ও সুযোগমত সেখানে এসে পৌঁছিতে পারেন নি।

এই সমাগম দেখে স্মরণে আসে ফরাসী সাহিত্যে কবি-গোষ্ঠী প্লিয়াদিজ (Pleiades) * দের কথা। ফরাসী সাহিত্যে এই কবি-গোষ্ঠী তার নবজন্ম ও নবজীবন (Renaissance) সূচনা করেছিলেন। আমাদের এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী বঙ্গসাহিত্যে যে একটা নবজন্ম বা নবজীবন এনে দিয়েছিলেন তা হয়ত অতিশয়োক্তি হয়, কিন্তু তাঁরা এসেছিলেন একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে—একটা দুর্লভ বৈশিষ্ট্য নিয়েই—সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই আমার আজকার বক্তব্য।

যে স্থানে ও কালে এঁদের উদ্ভব হয়েছিল তা স্মরণ করলেই এই বৈশিষ্ট্যটি সহজেই ধরা পড়বে ও হৃদয়ঙ্গম হবে। কাল হল যা বিখ্যাত "স্বদেশী যুগ" নামে অর্থাৎ বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণ, আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ। আর স্থান হল রংপুর—যেখানে বিদেশীয় বিজাতীয় শিক্ষার আলয় ভেঙ্গে দিয়ে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল—শিক্ষার স্বাধীনতা ঘোষণা করে ছাত্রেরা নিজেরাই গড়ে তুলল এই প্রথম স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা-কেন্দ্র। এই জাতীয়-বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অতুল গুপ্ত—তিনি তখন প্রেসিডেন্সীতে দর্শনে এম এ পড়তেন, কি সবে পাশ করেছেন। বরদা গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, শচীন সেনগুপ্ত—এঁরা ত রীতিমত ছাত্র এবং এখান থেকেই পাশ করে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষালয়ে (National Council of Education) গিয়ে যোগ দিলেন। নলিনী গুপ্ত প্রেসিডেন্সীর ছাত্র হয়েও ঐ National Council-এর ক্লাসে উপস্থিত হতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে আরো দু'চার জনের নাম করা যায়—যাঁরা ছিলেন এঁদের সঙ্গী ও সতীর্থ—একই জীবন-যজ্ঞের সেবক ও পূজারী। প্রথম, সুরেশ চক্রবর্তীর বড় ভাই প্রফুল্ল চক্রবর্তী যিনি স্কুলে কোনদিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই—এবং অকালে (মানুষী দৃষ্টিতে) যিনি দেশসেবায় আত্মাহুতি দিলেন (বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে)—এই প্রফুল্লও চমৎকার লেখক হতে পারতেন, তাঁর একটি লেখা * যুগান্তরের পাতায় গুপ্ত ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমার স্মৃতিতে একটা উজ্জ্বল রেশ এখন পর্যন্ত রেখে গিয়েছে—ভাবে ও ভাষায় এত প্রদীপ্ত এত তেজোময়। প্রফুল্লর সহপাঠী ছিলেন আর দু'জন—উত্তরকালে তাঁরাও বেশ নাম করেছিলেন—একজন হলেন প্রফুল্লর সঙ্গে সমানে যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে

* Pleiades হল তারকা-গোষ্ঠী, আমরা বলি কৃত্তিকা বা সপ্তমাতৃকা—এখানেও আমরা গুণে' সাতজনেরই নাম করতে পারি।

* মনে আছে লেখাটিতে ছিল ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে স্পেনদেশের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের তুলনা—যাঁর অত্যাচার উৎপীড়ন হয়ত আধুনিক নাজীদের আদর্শ ছিল, যিনি Inquisition-এর উদ্ভাবক, যাঁর আর্মাডা (Armada) ইংরেজকে তটস্থ করে তুলেছিল এবং পরিণাম যাঁর প্রায় আধুনিক নাজীদেরই পরিণাম।

ছিলেন স্কুলজীবনে, নাম, মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন। আর একজন হলেন নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যিনি এদের সঙ্গে অধিকার করতেন তৃতীয় স্থান—জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ করে, পাশ করে যিনি আমেরিকায় হার্ভার্ডে পাঠ সমাপন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন এবং দার্শনিক হিসাবে নাম করেছিলেন। এ সকলের সঙ্গে নাম করতে হয় আর একজন বরণীয়কে, তিনিও রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে এঁদেরই সঙ্গী-সাথী ছিলেন—রক্তযুগের প্রথম শহীদ, প্রফুল্ল চাকী।

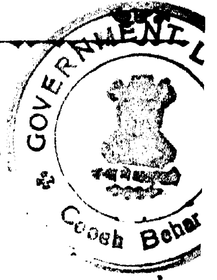
বললাম রক্তযুগ—কিন্তু শুধু রক্তযুগ নয়, এ হল উষার আরক্ত যুগ। নবজীবনের এই যজ্ঞাগ্নিতে উদ্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা—যাঁদের নাম দেওয়া যেতে পারে যজ্ঞসেনা—তাঁরা অন্তরে অধিকার করেছিলেন, স্পর্শ করেছিলেন সেই প্রজ্বলন্ত শিখা—যার কল্যাণে জীবন পায় অর্থ, হয়ে ওঠে সার্থক, আর যার অভাবে যাবতীয় বিত্ত থাকলেও জীবন নিরর্থক। আমি বলছি অন্তরাত্মার, অন্তঃপুরুষের, অন্তর্যামী দেবতার কথা। সেই জাগৃতি, সেই চেতনার নবোন্মেষের ফলে দেশও লাভ করেছিল তার অন্তরাত্মাকে, স্পর্শ করেছিল অন্তর্দেবতাকে। আর আমি যে গোষ্ঠীর কথা বলছি আজ তাঁদের বৈশিষ্ট্য ঠিক এইখানে—তাঁরাও সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের অন্তরাত্মাকে, উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অন্তরাত্মার নিরঙ্কুশ প্রেরণায়।

যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর কথা বলছি আমি, তাঁদের সাহিত্যিক জীবনেরও প্রতিষ্ঠায় ও উদ্ভবে রয়েছে এই যজ্ঞাগ্নির প্রসাদ—অর্থাৎ অন্তরাত্মার অবদান। তাঁদের সাহিত্য-সাধনায় তাঁরা এনে দিতে পেরেছিলেন তাঁদের নিভৃত ব্যক্তিত্ব থেকে, তাঁদের অন্তরাত্মা থেকেই উৎসারিত এক রসময়তা—এই জিনিসটিই দিয়েছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। রূপ যা হোক, বিষয় যা হোক—প্রকাশের বাহ্যিক আকার যা হোক—আত্মপ্রকাশের যে প্রকার যে ভঙ্গিমা, যে সুর ও ছন্দ তাই দিয়েছে তাঁদের বৈশিষ্ট্য; কারণ তারই মধ্যে ধরা দিয়েছে তাঁদের জাগ্রত অন্তশ্চেতনার আভাস একটা। একটা অপরূপ মাধুর্য, ঔজ্জ্বল্য, ঔদার্য। অতুল গুপ্ত পণ্ডিত দার্শনিক ছিলেন, তিনি ছিলেন গভীর স্থির চিন্তাশীল—তাঁর লেখায় পরিস্ফুট বুদ্ধির বৈদগ্ধ্য, যতির স্থৈর্য ও সংযম—সেখানে স্বভাবতই অভাব হতে পারত রসবত্তার—কিন্তু ঠিক রসশাস্ত্রই তাঁর আলোচনার বিষয়রূপে বেছে নিলেন, রসেরই পরিবেশনের জন্য—কারণ তাঁর আন্তর চেতনায় গোপনে জেগে উঠেছিল যার নাম ও পরিচয় হল 'রসো বৈ সঃ'। কাব্য-জিজ্ঞাসায় নিহিত যে রসের ফল্গুপ্রবাহ, আমার মনে হয় তা আর আপনাকে ধরে রাখতে পারেনি, তা আত্মপ্রকাশ করেছে, অন্তরাত্মার আহ্লাদ ফেটে পড়েছে তাঁর 'নদী পথে'। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হয়ে পড়েছিলেন 'নাটুকে শচীন'—তবে তাঁর নাট্য-প্রতিভা যা বা যতই হোক, তাকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে বা তার প্রধান অঙ্গ হয়ে যে বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে—তা হল ভাষার ঔজ্জ্বল্য ও খরগতি এবং ভাবের আদর্শপরায়ণতা, ঊর্ধ্বমুখিতা। শচীন্দ্রনাথের কৈশোরে লিখিত পত্রগুচ্ছ (?) আমাকে মুগ্ধ করেছিল—তার গায়ে মাখা ছিল অন্তরাত্মার এক বেপরোয়া সারল্য, পরিচ্ছিন্ন আবেগ, সহজশ্রী।

এঁদের অন্তঃপুরুষ আত্মপ্রকাশের একটা ধারা বেছে নিয়েছিল সাহিত্য-রচনায়, অনেকটা হয়ত প্রধান ধারা হিসাবে—কিন্তু তা ছাড়াও এঁদের একটা আত্মপ্রতিষ্ঠ সত্তা, অন্তর্জ্যোতি চেতনা দেখা দিয়েছিল। আমরা জানি, মানুষ কি করেছে তা দিয়ে মানুষের সত্যকার পরিচয় বা মর্যাদা নয়; সে অন্তরে কি হয়েছে তা দিয়েই হল তার যথার্থ পরিমাপ।* আর আজ যাঁদের নাম আমি করছি তাঁরা সকলেই যদি একবর্ণও কিছু না লিখতেন, তবুও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকতেন স্বে মহিম্নি।

শচীন্দ্রনাথ সারা জীবনই প্রায় কাটিয়েছেন দৈন্যের দুঃস্থতার দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে—কিন্তু তাঁর অন্তরের আলো তাতে এতটুকু ম্লান হয়নি, অন্তশ্চেতনার স্থিতি তাঁর এতটুকু বিচলিত হয় নি। পক্ষান্তরে অতুল গুপ্ত চিরকাল ছিলেন সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বরপুত্র, স্বচ্ছলতা

* হিটলার বাহ্য গৌরবে ইউরোপের প্রায় একছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন এক সময়ে—সমস্ত পৃথিবী কুক্ষীগত করবেন, এমন সম্ভাবনা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু তার অন্তরাত্মার পরিমাণ কি জানেন? শ্রীঅরবিন্দ বলতেন তার অন্তরাত্মা হল গাড়োয়ানের অন্তরাত্মা (a coachman's soul)!


GOVERNMENT L
Cooch Behar

ও সম্পদের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত ও পরিণত হয়েছেন—কিন্তু বিত্ত তাঁকে কখন মোহিত বা প্রলুব্ধ করেনি, তাঁর অন্তরাত্মার মাহাত্ম্য কখন ক্ষুণ্ণ করেনি। সত্যকার অন্তঃপুরুষ, আত্মা সব রকম বাহ্য অবস্থার দ্বৈতের দ্বৈধের উর্ধ্বে।

আজকালকার দিনে মানুষের পরিচয়, সে হল পারিপার্শ্বিকের দাস। তার মন চিন্তা করে, প্রাণ সক্রিয় হয়, দেহ সেবা করে একটা একান্ত বাহ্য স্থূল প্রয়োজনের বশী-ভূত হয়ে। অন্তঃপুরুষ তার ব্যথিত ক্লিষ্ট—অসহায়ভাবে চোখ-বাঁধা বলদের মত সে চলেছে দৈনন্দিনের ঘানি টেনে—এরই মধ্যে থেকে আত্মার স্বাতন্ত্র্য স্বাধিকার যাঁর আস্বাদন করেছেন এবং তারই মধ্যে যথাসাধ্য বসবাস করেছেন—সে রকম সুজন লাখে না মিলয়ে এক—তাঁর আমাদের নমস্ত।

লুইসা মে এ্যাল্‌কট

বইটি প্রকাশিত হবার পূর্বাহ্নেই পঞ্চাশ হাজার কপির অগ্রিম অনুরোধ প্রকাশকের কাছে। বইটির নাম 'লিটল মেন'। বইটির এত বেশী চাহিদা অন্য একটি বই-এর জন্যে। এই বইটির পূর্বে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল—'লিটল উওম্যান'। এই পরবর্তী বইটি বিশ্বখ্যাতি এনে দেয় বইটির লেখিকা লুইসা মে এ্যালকটকে।

'লিটল উওম্যান'-এর লেখিকা লুইসা মে এ্যালকট-এর জন্ম পেনিসিলভ্যানিয়ার জার্মান টাউনে, ১৮৩২-এর নভেম্বরে। পিতা ব্রনসন এ্যালকট ছিলেন শিক্ষক। আর্থিক অবস্থা শিক্ষকদের যেমন হয়ে থাকে ব্রনসনে'রও ছিল তেমনই। উদার ছিলেন ব্রনসন এ্যালকট। নিজের স্কুলে নিগ্রো ছেলেমেয়েদেরও প্রবেশাধিকার দিলেন তিনি। কিন্তু সমাজ তাঁর ঔদার্যকে অস্বীকার করায় ছাত্রসংখ্যা যখন শূন্যে নেমে এলো, তখন ১৮৩৯-এর ম্যাসাচুসেটস্‌-এ উঠে আসতে হলো তাঁকে।

ম্যাসাচুসেটস্‌-এর কনকর্ড-এ এসে শান্তি পেলেন ব্রনসন এ্যালকট। স্থানীয় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই ছিলেন চিন্তাবিদ। এমার্স'ন এবং থোরো থাকতেন কনকর্ড'-এ, আর থাকতেন হথর্ণ।

সেই সুন্দর পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন লুইসা মে এ্যালকট। 'লিটল উওম্যান'-এর চার-বোন চরিত্রের মতো তাঁরাও ছিলেন চার বোন। তিনি জ্যেষ্ঠ। তিনি পড়তে ভালোবাসতেন শেক্সপীয়র, গ্যেটে, এমার্স'ন এবং র্জ সানড।

লেখার আগ্রহ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। তাঁর প্রকাশিত কবিতার মধ্যে একটি লেখা যখন তাঁর বয়স মাত্র আট। ষোল বছর বয়সে একটি উপন্যাস লেখেন তিনি—'ফ্লাওয়ার ফেবলস'। সমালোচকরা বইটিকে কাঁচা হাতের লেখা বলে রায় দিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়স হতেই স্কুলে শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করেন লুইসা—তারপর বহুরকমের কাজ করেছেন তিনি—কখনও গভর্ণেস, কখনও সেলাই, আবার কখনও অসমর্থ শিশুদের দেখা শোনা।

উনিশ বছর বয়সে 'গ্লীসনস পিকটোরিয়াস'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ছোট গল্প। তার কয়েকমাস পরে 'বোস্টন স্যাটারডে গেজেট'-এ প্রকাশিত হয় 'দি রাইভাল প্রাইমা ডোনাস' নামের একটি ছোটগল্প। এই গল্পটি অভিনয়ের জন্যে একটি থিয়েটারের দল কেনেন, কিন্তু অভিনেতাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় আর হয়ে ওঠেনা অভিনয়। তারপর তিনি নিজেই অভিনয়ের জন্যে ঠিক করেন, কিন্তু টারের ম্যানেজারের পা ভেঙ্গে যাওয়ায় চুক্তি বাতিল করে দিতে হল।

স্যাটারডে ইভনিং গেজেট'-এ কয়েকটি লেখা প্রকাশের পর তিনি



লুইসা মে এ্যাল্‌কট

কিছু সুনাম অর্জন করেন। আর্থিক অবস্থাও কিছুটা স্বচ্ছল হয়ে ওঠে এ সময়। আর্থিক আকর্ষণে একমাসে প্রায় দশ বারোটা করে গল্প লিখে দিতেন। 'লিটল উওম্যান'-এর জো বলে একটি চরিত্রকে দিয়ে তিনি এই ধরণের রোমান্সধর্মী গল্প লেখার আকর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। সমালোচকদের এবং জীবনীকারদের মতে জো চরিত্রটি লুইসা মে এ্যালকট নিজে।

লুইসা মে এ্যালকটের পরবর্তী উপন্যাস 'মুডস'। এই বইটিও পূর্বেকার বইটির মতোই তেমন সাহিত্যকৃতি বলে মনে করা হয়না। লেখার আগ্রহ তবু নষ্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু তারপর বহুদিন আর উপন্যাস লেখেননি লুইসা।

তারপর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে লুইসা সোলজার-হাসপাতালে নার্সে'র কাজ করার মনস্থির করেন। নার্সে'র কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। তাঁর 'হসপিটাল স্কেচেস' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সনে। এই বছরই তিনি জার্মানী, সুইৎজারল্যাণ্ড, প্যারী এবং লণ্ডন পরিভ্রমণ করেন।

১৮৬৮ সনে ব্রনসন এ্যালকট লুইসার লেখা কয়েকটি গল্প নিয়ে একজন প্রকাশকের কাছে যান। কিন্তু প্রকাশক গল্পগ্রন্থ প্রকাশে তেমন উৎসাহ দেখান না এবং বলেন লুইসা উপন্যাস লিখতেই ভালো পারবে।

লুইসা মনে করেছিলেন যে তিনি পারবেন না। কিন্তু ১৮৬৮ সনে যখন তাঁর 'লিটল উওম্যান' প্রকাশিত হল তখন তিনি বিশ্বসাহিত্যিকদের একজন। তারপর যখন 'লিটল মেন' প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হলো তখন পূর্বাহ্নেই প্রকাশকের কাছে পঞ্চাশ হাজার কপির অগ্রিম চাহিদা এলো।

পরে লুইসা মে এ্যালকটের যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হলো—'স্প্রস্ স্ট্র্যাপস,' 'এ্যান ওল্ড ফ্যাশান্ড গার্ল,' 'আণ্ডার দি লিলাক্স,' ছয় ভলুমেরে-'আন্ট জোস স্ক্র্যাপ ব্যাগ', 'জ্যাক এণ্ড জিল'।

লুইসা মে এ্যালকটের মৃত্যু হয় ১৮৮৮ সনের ৬ই মার্চ, তাঁর পিতার মৃত্যুর ঠিক তিন দিন পরে।

দোমিংগো সারমিয়েনতো

সেনোরালরা প্রতিদিন দেখতেন ষোল বছর বয়সের ক্লার্কটি কাজের ফাঁকে ফাঁকে বই নিয়ে বসে। প্রচুর বই পড়ার নেশা ছেলেটির, বুঝে-



দোমিংগো সারমিয়েনতো

ছিলেন উনি। কিন্তু তখন কেউ ভাবতে পারেনি যে ছেলেটি এককালে সাংবাদিকতায়, সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে পৃথিবীখ্যাত হবে।

ছেলেটি দোমিংগো সারমিয়েনতো। আর্জেনটিনা'র সানজুয়ানে ১৮১১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওর জন্ম। দোমিংগো'র বাবা গরীব ছিলেন। তবুও ছেলেকে লেখাপড়া শেখানর জন্যে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। দোমিংগোর বাবা ধারধোর করে বা চেয়েচিন্তে যে সব বই আনতেন তাইতেই ওর শিক্ষার গোড়াপত্তন।

স্কুলে ভর্তি হবার পরও পাঠ্য পুস্তক পড়ে তৃপ্ত থাকা দোমিংগোর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সেই বয়সেই তিনি বাইবেল, লাইফ অব সিসেরো, ন্যচারাল থিওলজী এণ্ড এভিডেন্সেস অব ক্রিশ্চিয়ানিটি, দি ট্রু আইডিয়া অব দি হোলি সি, এবং রোম ও গ্রীসের ইতিহাস পড়ে ফেলেন।

পড়ার কোনও পরিকল্পনা ছিলনা ওঁর। এক কাকার থেকে ল্যাটিন শিখলেন উনি এই সময়ে। পনের বছর বয়সেই চাকরীতে ঢুকলেন এবং ষোল বছর বয়সে কেরানীর কাজ পেলেন একটা। কেরানীর কাজ করলেও সাহিত্যপ্রীতি তাঁর ছিল। এই সময় থেকেই একটু-আধটু লেখার অভ্যাস করেন তিনি এবং স্বগ্রামে একটি সাহিত্যের আসর স্থাপন করেন।

কিন্তু আর্জেনটিনার রাজনৈতিক পটভূমিকা দূরে থাকতে দিল না তাঁকে। রোসাস-এর একনায়কত্বে পরিচালিত হত আর্জেনটিনা'র রাজনীতি। যে কেউ রোসাস-এর বিরুদ্ধাচরণ করত, মৃত্যু ছিল তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। রোসাস-এর স্থানীয় প্রতিনিধি ছিল জুয়ান ফাকুন্দ কুইরোগা নামে একজন লোক।

একবার তাঁর প্রতি হুকুম হল কাজ ছেড়ে দেওয়ার এবং সৈন্য বাহিনীতে নাম লেখাবার। সরকারের এ আদেশ অমান্য করায় দোমিংগো'র দুবছরের জেল হয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি চিলি পালিয়ে গেলেন। তারপর বহু বছর ধরে তিনি একবার আর্জেনটিনা-আর একবার চিলি করেছেন।

কিছুদিনের জন্যে সান্তা রোজা ডি লস এ্যানডেস-এ শিক্ষকতা করেন। তারপর প্রোক্যুয়েতে হোটেল চালান একটি। তারপর কেরানী ছিলেন কিছুদিন ভালপারেইসোতে এবং পরে চানারসিলোর মাজোরদোমো খনিতেও কাজ করেন কিছুকাল। তবুও সবকাজের মাঝেই সাহিত্যের তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করতেন যখনই সময় পেতেন। খনিতে কাজ করার সময় ওয়াল্টার স্কট শেষ করেন দোমিংগো। এর কিছুকাল পরে

স্প্যানীশ ভাষায় অনুবাদ করেন স্কটের একটি বই। অন্যান্য ভাষার সাহিত্য জানবার আগ্রহে আঠার বছর বয়সে তিনি শেখেন ফরাসী, বাইশ বছরে ইংরিজি, ছাব্বিশে ইতালীয় এবং একত্রিশ বছর বয়সে পর্তুগিজ ভাষা।

১৮৩৯-এ সানজুয়ানে মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপন করেন তিনি। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মত আর্জেনটিনাতেও মেয়েদের লেখাপড়া করাটা খুব ভাল চোখে দেখা হত না সেকালে।

সেই বছরেই 'এল জোনদা' নামে একটি সংবাদপত্রের পত্তন করেন দোমিংগো। তারপর কিছুকালের মধ্যেই তিনি পুস্তিকাকারে গণতান্ত্রিক মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন।* কিন্তু তারপূর্বেই চিলি পালিয়ে যান তিনি। যাবার সময় সীমান্তের একটি পাথরে খোদাই করে লিখে দেন: Ideas cannot be killed."

চিলিতে এসে 'দি ন্যাশন্যাল'-এর সম্পাদনার কাজ পান তিনি। মাঝে মাঝে 'দি মারকারী'তেও লেখা পাঠাতেন দোমিংগো। তাঁর লেখার শক্তি 'দি মারকারী' কর্তৃপক্ষকে আকর্ষণ করে এবং কিছুকালের মধ্যেই মারকারীর সম্পাদকের দায়িত্ব পান তিনি।

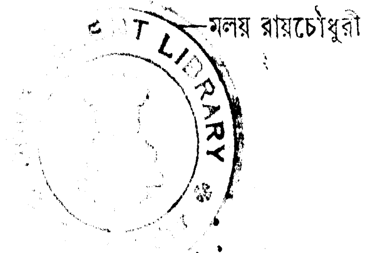
এরপর তাঁর বিখ্যাত লেখা 'ফাকুনদো—সিভিলাইজেশান এণ্ড বারবারিজম' প্রকাশিত হল। বইটি তাঁকে এত বেশী প্রচারিত করে দিল যে আর্জেনটিনা সরকার তাঁর সব বই বাজেয়াপ্ত করলেন এবং যে কেউ সারমিয়েনতো'র বই প্রকাশ করলে বা রাখলে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন? তবুও আগে যারা তাঁর লেখা পড়তনা তারাও পড়তে আরম্ভ করল তাঁর বই।

আর্জেনটিনা-সরকার চিলি সরকারের ওপর চাপ দিলেন দোমিংগোকে আর্জেন-টিনাতে ফেরৎ পাঠাবার জন্যে। সৌভাগ্যবশত চিলির শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দোমিংগো সারমিয়েনতো'র বন্ধু। মন্ত্রী মনৎ সারমিয়েনতোকে ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ দিলেন সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্যে।

ইউরোপে দোমিংগো গেলেন ফ্রান্স, ইতালী, সুইৎজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড। প্রতি দেশেই তিনি স্কুল—কলেজ—সাহিত্য-সংস্থা ভ্রমণ করলেন। ভ্রমণ থেকে লাভ হল তাঁর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে। ইংল্যাণ্ডে তিনি ম্যাসাচুসেটস্-এর শিক্ষা-কমিশনার হোরেসমান-এর 'সেভেনথ্ এ্যনুয়াল রিপোর্ট' দেখার সুযোগ পেলেন। রিপোর্টে তিনি তাঁরই মতামতের প্রতিচ্ছবি পেলেন।

হোরেসমান-এর সঙ্গে দেখা করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ল দোমিংগোর। হোরেসমান-এর সঙ্গে কথাবার্তার পর দোমিংগো অনুভব করলেন যে চিলি এবং আর্জেনটিনাতে শিক্ষার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন।

—মলয় রায়চৌধুরী



মুসাফির

চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়

আমি মুসাফির শুধু দুদিনের
জীবনের খেলা ঘরে
নিকট বাঁধনে বেঁধোনা আমায়
চেয়োনা আপন করে
ছেড়ে যেতে হবে এই মায়া তীর
মিলন রজনী ভোরে
নয়নে আমার প্রণয়ের আলো
হৃদয়ে রক্ত ঝরে।

ভাঙনের কূলে বাঁধা বাসা মোর
চিরদিন রবো একা
প্রিয় সাথী মোর যাবে গো হারায়ে
নিঠুর নিয়তি লেখা।
সাহারার মতো ব্যথা লয়ে তাই
আমি থাকি দূরে সরে
কণ্ঠে আমার মিলনের বাণী
বিরহ বক্ষ ভ'রে॥



(পূর্বানুবৃত্তি)

দুই

ডাক এল। ঠকে গেছি, এইটুকুই মাত্র খেয়াল হোল ডাক শুনে। ডাকের মত ডাক, ঠকার ডাক এল। কত রকমেই না মানুষ ঠকে! কতটা পাওয়ার ছিল, কতটা পেলাম না, এ হোল এক জাতের ঠকা। লোকসানটা পুষিয়ে উঠতে পারলে ঠকাটা তেমন গায়ে লাগে না। আর এক জাতের ঠকা হোল, যা ছিল আমার সম্পত্তি—আর একজন তা ভোগা দিয়ে ভোগ দখল করতে লাগল। এ ঠকায় জ্বালা থাকলেও যন্ত্রণাটা নেই। কিন্তু যা আমি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম তা যদি জানাজানি হোয়ে যায়, নিজের বোকামির জন্যে যদি ধরা পড়ে যাই, তা'হলে যে ঠকা ঠকে মরি, সে ঠকার যন্ত্রণা সামলাতে মনের গায়ে ফোসকা পড়ে যায়। সেই ফোসকা-পড়া মনটাকে ঢাকবার জন্যে সাদা দাঁতগুলোকে মেলে হাসবার চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কিছু করার উপায়ই থাকে না।

ঠকেই গেলাম। খড়খড়িগুলো সেঁটে বন্ধ হোয়ে আছে, অতএব ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নেই। পরম নিশ্চিন্তে সেই খড়খড়ি ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে চরম মুহূর্তে যা তা কাণ্ড একটা করার জন্যে প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে ভিজে মনটাকে একেবারে খুলে-মেলে শুকিয়ে ফেলতে গেলাম ঝড়-জলের উত্তাপে। মন ত' শুকলই, উপরন্তু একটু ফাউ লাভ হোল। মনের সঙ্গে চালাকি করার প্রবৃত্তিটাও ঘুচে গেল। শুকনো মন নিয়ে মন-গড়া পরিচয়টাকে আঁকড়ে থাকার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও আর রইল না।

ডাকতে এল যে ছেলেটি—তার মুখের ডাক তার চক্ষু দু'টির নীল আলোর তলায় তলিয়ে গেল। ডাকটা ভুলে গেলাম, কে ডাকছে কেন ডাকছে, এ সমস্ত প্রশ্ন একটি বারের জন্যেও উঁকি দিলে না। ছেলেটির চোখের তারা দু'টির পানে তাকিয়ে হঠাৎ যেন ঘুমিয়েই পড়লাম। ঘুম পাড়াবার শক্তি ছিল সেই তারা দুটির নীল আলোতে, নিবিড় অন্ধকারে ঐ জাতের আলোয় ঘুম পাড়িয়েই ফেলে। অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঐ জাতের নীল আলো অনেক দিন আগে প্রায়ই দেখতাম। সন্ধ্যে হোলেই পালিয়ে যেতাম নদীর ধারে। লুকিয়ে বসে থাকতাম মেঘনার চরে। আকাশে নদীতে মিশে গিয়ে সীমাহীন একটা আলাদা জগৎ তৈরী হোত। সেই জগতে তখন একমাত্র রাজা আমি, আমার রাজত্বে কোথাও কোনও ব্যাদড়ামি নেই। ভারী ভাল লাগত, নিজেকে নিজে সেই রাজত্বের অধীশ্বর কল্পনা করে বুঁদ হোয়ে বসে থাকতাম। তারপর, অনেকক্ষণ পরে আমার রাজত্বে দুটি নীল আলো ফুটে উঠত। অনেক দূরে, ডান দিকে একেবারে অন্ধকারের অন্তস্তলে ফুটে উঠত দু'টি নীল আলো। তাকিয়ে থাকতাম তখন সেই আলো দুটির পানে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসত আলো দুটি। আসছে ত আসছেই, আসতে আসতে একেবারে সামনে এসে পড়ল। তারপর চলতে লাগল বাঁ দিকে, যতক্ষণ দেখা যেত তাকিয়ে থাকতাম। শেষে যখন মিলিয়ে যেত আবার বাঁ-ধারের অন্ধকারে তখন আপনা-আপনি চোখ বুজে যেত। আর সেইখানেই ঢুলে পড়তাম।

রাত সাড়ে এগারটায় আসত সেই ষ্টীমারখানা আসাম থেকে, একদিন পরে পরে আসত। মাল টানা ষ্টীমার, কোথাও একটুও আলো দেখা যেত না। শুধু সেই ঘুম-পাড়ানিয়া নীল আলো দু'টিই দেখা যেত। ওই আলো দু'টি দেখবার লোভে মেঘনার চরে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকতাম।

অনেক দিন আগেকার সেই নীল আলো দু'টিকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম ছেলেটির দুই চোখের তারায়। দশ এগার বছরের ছেলে, অমন ছেলে-মেয়ের চোখে নীল আলো দেখা যায়। ঐটি হোল দশ এগার বছরের চোখের ধর্ম্ম, আর একটু বড় হোলে ঐ নীল আলো নিভে যাবে। ঘুলিয়ে যাবে আরও নানা জাতের আলোর মধ্যে। তখন চোখ লাল হবে, ফেকাশে হবে। তারপর আরও পুরণো হোলে চোখের তারা হলদে হোয়ে যাবে। তখন আর চোখে কোনও রঙই ধরা পড়বে না।

ছেলেটি আমার চোখে চোখ ফেলে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ত ঘুমিয়েই পড়লাম। সেই অবস্থায় কতক্ষণ কাটত, কে বলতে পারে। ভাগ্যে বিপিনবিহারীবাবুর পরিবারটি পাশেই ছিলেন। ওঁনার চিত্তে যত রকমের যত দোষ-গুণই থাকুক, আদিখ্যেতা নামক নেকা-পনাটি নাকি একেবারেই ছিল না। দুনিয়ার চোখের চাউনি, নাকের গড়ন-চলার ধরণ নিয়ে কস্মিনকালে উনি মাথা ঘামাবার ফুরসত পাননি। বোধ হয় নিজের চোখ নাক নিয়েই জন্ম থেকে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়েছিলেন। ফলে ওঁর নজর বেবাক রঙ-ছুট হোয়ে পড়েছিল। রঙ-ছুট নজরের মানুষ বেহদ্দ মুখছুট হোয়ে পড়ে। মানুষের স্বপ্ন দেখার সাধকে জবাই করবার জন্যে সদা-প্রস্তুত থাকে তাঁদের জবান। দু'টি মুহূর্ত্তও ঘুমিয়ে থাকতে পেলাম না, পাশ থেকে পরিবার-মহোদয়া তাঁর জবানের এক ঝাপ্টায় দিলেন সেই নীল-কান্ত মনি দুটিকে নিভিয়ে। বলে উঠলেন—আমাদের ডাকছেন! কেন? আমাদের সঙ্গে কি দরকার তোমার মায়ের? আমরা—আমরা—এখুনই চলে যাচ্ছি। জলটা কমে এসেছে, এখুনই না গেলে গাড়ী পাব না।

এতটুকু উত্তেজিত হোল না ছেলেটি, একটুও উৎকণ্ঠা বা উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল না তার কণ্ঠস্বরে। থেমে থেমে কেটে কেটে মুখস্থ পড়ার মত করে পড়ে গেল—গাড়ীর এখনও অনেক দেরী। এখনও সন্ধ্যেই হয়নি। আটটার আগে কোনও গাড়ী নেই। আর কলকাতা যাবার গাড়ী রাত দশটায়।

তাড়াতাড়ি তখন আমার জবানকেও মুক্তি দিতে হোল ছেলেটিকে আড়াল করার জন্যে। কে জানে ঠোঁটকাটা পরিবার আবার কি বলে বসেন।

বললাম—তাই নাকি! শুনেছিলাম যেন সন্ধ্যের পরেই গাড়ী পাওয়া যাবে। তা বেশ ত, চল। চল—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

আবার আমার চোখের পানে তাকালো ছেলেটি। আর একবার সেই নীল আলো দেখবার লোভে অনেকটা নুয়ে খুঁজতে গেলাম তার চোখ দু'টির মধ্যে। আর কি সে আলোর দেখা মেলে! পরিবারের পেঁচালো সুরের কারসাজিতে সে আলো নিভে গেছে। তার বদলে একটা ধোঁয়াটে হুঁশিয়ারি চকচক করছে চোখ দুটির কোণে। যেন ভেবেই পাচ্ছে না, খামকা ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি গাড়ী ধরার কথাটা বলে পালাতে চাইছেন কেন?

পালাতে চাইলেই পালানো যায় না। পায়ে পায়ে পেছন থেকে ফাঁসে টান পড়ছে, পালাবে কোথায়!

শুরুতেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করে ফেললেন তারকের মা। বললেন—"পালাবার মতলব করছিলে কেন ভাই? একটু আগে শুনলাম ঐ দালানেই বিছানা বিছিয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। হঠাৎ মত বদলাল কেন? দালানের চেয়ে ঘর অনেক ভাল। এতগুলো ঘর খালি পড়ে রয়েছে—"

যাঁকে বললেন কথাগুলো—তাঁর নাকের ডগা লাল হোয়ে উঠেছে তখন। খুবই অশুভ লক্ষণ। তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করা প্রয়োজন, নচেৎ সেই মুহূর্তেই আবার পথে নামবার ভয়। তখন নির্জ্জলা আমড়াগাছিই একমাত্র ভরসা। দাঁত বার করে ফেললাম একেবারে—হেঁ হেঁ, আপনি তা'হলে সবই আড়ি পেতে শুনেছেন—হেঁ হেঁ—

—আড়ি না পেতেই শুনেছি। ভদ্রমহিলা নিছক ভাল-মানুষী সুরে বলতে লাগলেন—আলাপটা ত আড়িপেতে শোনবার মত করে করা হয়নি। পাশে কোনও বাড়ী থাকলে সে বাড়ীর মানুষেও শুনতে পেত। তা' তাতে

আর কি এমন দোষ হোয়েছে, ওসব কথা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি নাকি? ওসব কি কাউকে বলা যায়?

কি কথা? ফোঁস করে উঠলেন পরিবার—কি শুনতে পেয়েছেন আপনি? কি জানতে পেরেছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন—ওসব আমার জানা ব্যাপার দিদি। ছেলেটাকে নিয়ে এই যে পড়ে আছি তেপান্তরের মাঠে, এও ঐ একই কাণ্ড। ঐ ছেলে এই এগারোয় পা দিলে, এগার বছর ধরে এই বনবাস করছি। কাউকে কখনও মুখ দেখাই না। এই বাড়ীটাকে সবাই পোড়ো বাড়ী বলে ভাবে। মা-বেটা দুটো প্রাণী এই ভূতের বাড়ীতে বাস করছি, বাইরে থেকে কেউ কখনও সন্দেহও করতে পারে না যে এখানে মানুষ থাকে। কত মানুষ আসে, বাইরের ঐ দালানে বসে, দাঁড়ায়, রাত কাটায়—আবার চলে যায়। কখনও কাউকে ডাকিনি। এগার বছরে এগারটা মানুষের সঙ্গেও কথা বলিনি। শুধু ঐ ছেলে আর এ বাড়ীর মালী মিঠুরাম, এই দু'জন ছাড়া কেউ আমার মুখও দেখতে পায় না। জীবনে আর কাউকে মুখ দেখাব না, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। আজ হঠাৎ প্রতিজ্ঞাটা ভেঙ্গে গেল। ছেলেকে দিয়ে ডেকে পাঠালাম—

—বেশ করেছ বোন—সুর একেবারে পালটে গেল পরিবারের। হঠাৎ তাঁর গলার মধ্যে কি যেন আটকে গেল। ধরা গলায় বলতে লাগলেন—বেশ করেছ বোন, বেশ করেছ। আমি যদি তোমার মত মুখ লুকিয়ে থাকতে পেতাম! ইচ্ছে করে না, এই পোড়া মুখটা নিয়ে জগতের সামনে ঘুরে মরতে, একেবারে প্রবৃত্তি হয় না—

এই মেরেছে! দিদিতে আর বোনেতে এক সুরে গাইতে বসল যে রে বাবা! সাধে কি আর লোকে বলে, স্ত্রী জাতের পেটে কথা থাকে না। রক্তচক্ষু করে একটি-বার সাবধান করতে গেলাম—খুব গোয়েছে, থাম এখন। মুখ পুড়িয়ে ঘুরে মরছ কেন দেশে দেশে? চল, বাড়ী ফিরে যাই।

বাড়ী ফিরব! আবার মুখে আনছ বাড়ীর নাম! লজ্জা করে না ফিরে যাবার কথা বলতে? ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে চিল চেঁচিয়ে উঠলেন পরিবার। পরমুহূর্তেই এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিদিকে বলতে লাগলেন—দেখলে দিদি—দেখলে? বাড়ী ফেরবার জন্যে মুখিয়ে আছেন একেবারে। ঝাঁটা মারি অমন বাড়ীর কপালে। সাতজন্ম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরব, তবু অমন বাড়ীর দরজা মাড়াব না।

দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন দিদিটি, বড় বড় চক্ষু দু'টিতে তাঁর হাবুডুবু খাওয়ার দশা ফুটে উঠল। পরিবার আর কালক্ষেপ করলেন না, এক নিঃশ্বাসে নিজের পোড়া কপালের কাহিনী আউড়ে গেলেন। গলা দিয়ে যেন ঠেলে উঠতে লাগল কান্না—পোড়া কপালের দুঃখু বলবই বা কাকে দিদি, শুনছেই বা কে। একে একে পাঁচটা কোলে এল, পাঁচটার মাথা খেলাম। ঐ বাড়ী, ও বাড়ী নিয়ে আমি সগ্‌গবাস করব। ঐ বাড়ী আমার সব খেলে। তাই ত, বেরিয়ে পড়েছি দিদি, বাবা বদ্যিনাথের দরজায় মাথা কুটে গেলুম। ঠাকুর দেবতাদের দরজায় মাথা কুটে কুটে এই ভাবে ঘুরে মরব দুজনে চিরকাল, এ জীবনে আর অমন বাড়ীর ছায়া মাড়াচ্ছি না।

পাঁচ পাঁচটি সন্তানের মাথা-খাওয়া জননীর বুক নিঙড়নো হা হুতাশ, শোনবার মত চিজ যাকে বলে। থ হোয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম মড়াঞ্চে পোয়াতির কান্না। কবে কোন সন্তানটি কি ভাবে টেঁসেছে, তার নিখুঁত বর্ণনা আঁচলের খুঁটে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আওড়ানো হোল। সমাপ্তির মুখে আর এক ঘা বসানো হোল আমার পিঠে—পাষাণ দিদি, একেবারে পাষাণ। বাছারা আমার এল আর গেল, তা বলে ও পাষাণের বুকে কোথাও একটু দাগ পড়েছে?

অতঃপর দাগ পড়ে না, এমন পাষাণ কোন পাহাড়ে আছে! সে রাতটার মত আশ্রয় মিলল। বাড়ীর ভেতর দিকে একখানা ঘরে থাকতে দেওয়া হোল আমাদের। সেই ঘরের পেছনে আর এক প্রস্থ বাগান। পেঁপে কুল পেয়ারা গাছের জঙ্গল। তারপর পাঁচিল, পাঁচিলের ওপারে লাল মাটি আর কাঁকরের টিলা টালা কয়েকটা। তারপর কি আছে দেখা গেল না। সন্ধ্যা পার হোয়ে গেছে তখন, পশ্চিমের সন্ধ্যা সূর্য ডোববার পরেও খানিকক্ষণ সবুর করে থাকে। বৃষ্টি থেমে গেছে, একটা রামধনুর মত কিছু উঠেছিল বোধ হয় আকাশে, সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে। যে ঘরটিতে আমাদের থাকতে দেওয়া হোল, তার পেছনের দরজা খুলে খোলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আসন্ন রাত্রিকে দেখতে পেলাম

যেন পেঁচানো পেঁচানো একটা খুব লম্বা কালসাপ ঘুমিয়ে রয়েছে পাঁচিলের ওপারে। রাত্রি নয় কালসাপ, কালসাপটা এবার জেগে উঠবে। একের পর এক পেঁচ খুলতে থাকবে। খোলা দরজার ভেতরে তাকালাম। একখানি চৌকি, সাড়ে তিনটে ঠ্যাঙওয়ালা একটা টেবিল, আর একখানা বেতছেঁড়া চেয়ার, রাত্রি যাপনের পারিপাটি পরিকল্পনা, পছন্দসই নিরিবিলি ব্যবস্থা। উদ্ধারণপুর থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত এমন ব্যবস্থা কোথাও জোটেনি। দু একটা করে অনেকগুলো রাত অনেক জায়গায় কাবার হোয়েছে। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, নিরিবিলিকে দু'জনেই পাশ কাটিয়ে গেছি। ভদ্র গৃহস্থ ঘরে ভদ্র গৃহস্থদের মেয়েদের সঙ্গে বাড়ীর ভেতর কোথায় শুয়েছেন পরিবার, তা' জানতে চাওয়াটাও নেহাত বেল্লিক-পনা দেখায়। নিজের কাছে—স্বয়ং পরিবারটির সামনে এবং আশ্রয়দাতার কাছে ত' বটেই, কারও কাছেই আলাদা একখানি ঘরে পরিবারের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে শোবার প্রস্তাবটি পেশ করার সাহস বা সদিচ্ছা প্রকাশ করা যায়নি। বোধ করি অমন বদখেয়ালটা উদয় হবারও ফুরসত হয়নি মগজে। কিন্তু সেই পোড়ো বাড়ীর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভিজে সন্ধ্যার ভিজে হাওয়ায় বুক বোঝাই করে নিতান্ত নির্জন ঘরখানির ভেতর তাকিয়ে মগজটা যেন কি রকম তেতে উঠতে লাগল। একটা জ্বালা জ্বালা ভাব টের পেলাম কান দুটোয় আর ঘাড়ের পেছনে। ওধারে পাঁচ পাঁচটি সন্তানের শোকে বদ্ধ-উন্মাদ জননীটি বাড়ীর ভেতর তাঁর দিদির কাছে মন উজাড় করে আরও কত শোকের ব্যাওরা বাতলাতে লাগলেন তার কি হিসেব নিকেশ আছে।

ছেলেটির নাম তারকনাথ। তারকনাথ এল গামছা দিয়ে একটা এলুমিনিয়ামের গেলাস দু'হাতে ধরে। অতিরিক্ত রকম গরম গেলাসটাকে মেঝেয় বসাতে গেল নিচু হোয়ে। এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে নিলাম গেলাসটা—বসাতে গেলে যদি উল্টে যায়। সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে তারকনাথ বললে—বড্ড গরম, আপনার হাত পুড়ে যাবে। বলতে যাচ্ছিলাম—পুড়ে পুড়ে হাতে কড়া পড়ে গেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। কথাটাকে ঘুরিয়ে বললাম—কই, তেমন গরম নয় তো। তোমার হাত দু'খানি নরম, তাই গরম সইতে পার না। আমার মত বুড়ো হবে যখন, তখন তোমার হাতেও ছেঁকা লাগবে না।

বেশ একটু আশ্চর্য হোয়ে গেল ছেলেটি, অনায়াসে গরম গেলাসটাকে ধরে মুখে তুলতে দেখে। শব্দ করে একটা লম্বা চুমুক টানলাম। মুখও পুড়ল না দেখে বলে ফেললে—আপনি খুব গরম খেতে পারেন। একদম ঠাণ্ডা না হোলে কিছু আমি খেতে পারিনা।

আর একটা চুমুক টেনে বললাম—তোমার নাম তা'হলে শীতলরাম। খুব ঠাণ্ডা ছেলে তুমি, আসল একটি শীতলরাম বাদলদাস তুমি—

শীতলরাম! চোখ দুটি আরও বড় হোয়ে উঠল ছেলেটির। বললে—শীতলরাম ত' বক্তিনাথের এক পাণ্ডা। আমার নাম তারক—শ্রীতারকনাথ উপাধ্যায়।

ধীরে সুস্থে আরও একটি চুমুক টানলাম চায়ে। বললাম—তাই বুঝি। তা'হলে ত' ঠিকই হোল। বাবা তারকনাথের মাথায় অষ্টপ্রহর কলসী কলসী গঙ্গা জল চড়ছে। বাবা তারকনাথ একটুও গরম সহ্য করতে পারেন না। একদম মিলে গেল।

তারকনাথ আরও আশ্চর্য হোয়ে উঠল। বললে—বাবা তারকনাথ আবার কে! আমি হোলাম শুধু তারকনাথ, আমার বাবার নাম আদ্যনাথ উপাধ্যায়।

গেলাসটাকে নামিয়ে বললাম—তারকনাথের বাবা ত আদ্যনাথ হবেই। তা তোমার বাবা কোথায়? তাঁকে ত দেখলাম না?

তারকনাথের চোখের পাতা নেমে গেল। খুব একটা লুকনো জায়গা ছুঁয়ে ফেলেছি ওর বুকের মধ্যে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে—আমার বাবা এখেনে থাকেন না। বাবা সাধু সন্নেসী হোয়ে গেছেন। সেই হিমালয়ে আশ্রয় করেছেন, সেখেনে বসে তপস্যা করছেন।

গলার স্বর একেবারে পালটে ফেললাম। যার বাবা সন্ন্যাসী হোয়ে তপস্যা করছেন, তার সঙ্গে কথা বলতে হোলে যথেষ্ট পরিমাণে সংযম এবং সম্ভ্রম দেখানো প্রয়োজন। বললাম—তাই ত' তোমার মতন ভাল ছেলে পেয়েছেন তিনি। যার বাবা তপস্যা করছেন তার কত পুণ্য। খুব

লেখাপড়া শিখবে তুমি, বড় হোয়ে খুব বিদ্বান হবে। সবাই তোমার নাম জানবে।

তারকনাথ বলল—কি করে শিখব লেখাপড়া? মায়ের কাছে যা শিখি তাই শেখা হয়। স্কুলে যাই না ত'। যার বাবা নেই সে কি করে স্কুলে যাবে? আমাদের ত' টাকা পয়সা নেই। তাই গান শিখছি মার কাছে। ভাল করে গান শিখতে পারলেও অনেক টাকা পাওয়া যায়। মা বলেছে, গান শিখলে লেখাপড়া না শিখলেও চলে।

খুবই উত্তেজিত হোয়ে উঠলাম। বললাম—গান শিখছ? বাঃ বাঃ বেশ। গানও বিদ্যে—লেখাপড়াও বিদ্যে। সরস্বতী ঠাকুরের এক হাতে বীণা, এক হাতে বই। তোমার মা ঠিক কথা বলেছেন। একটা বিদ্যে যদি পাও মা সরস্বতীর দয়ায়, তা'হলে আর কিছু লাগবে না। তা'হলে একটা গান শোনাও। শুনি তোমার গান, তারকনাথের মুখে গান শুনলে আমারও খুব পুণ্য হবে।

পুণ্য হবে! তারকনাথ আর একবার উচ্চারণ করলে—পুণ্য হবে! মা যে বলে, পাপপুণ্য কিছু নেই। পাপ পুণ্য নেই বলেই বাবা আমাদের দেখা দেয় না। আমি কিন্তু আরও বড় হোয়ে বাবাকে খুঁজতে বেরব। হিমালয়ে যাব, সব জায়গায় যাব। ঠিক খুঁজে বার করব বাবাকে। খুব অন্যায়, কি বলেন? আমি তাঁর ছেলে, আমাকে দেখা না দেওয়া খুব অন্যায় নয় তাঁর? আমি ত' কোনও দোষ করিনি—

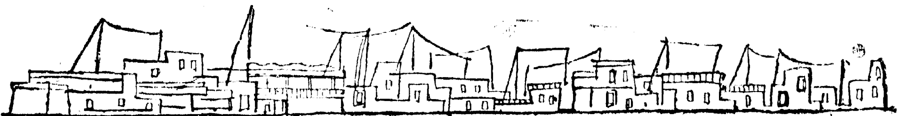
তারকনাথ আর মুখ তুলতে পারলে না, মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

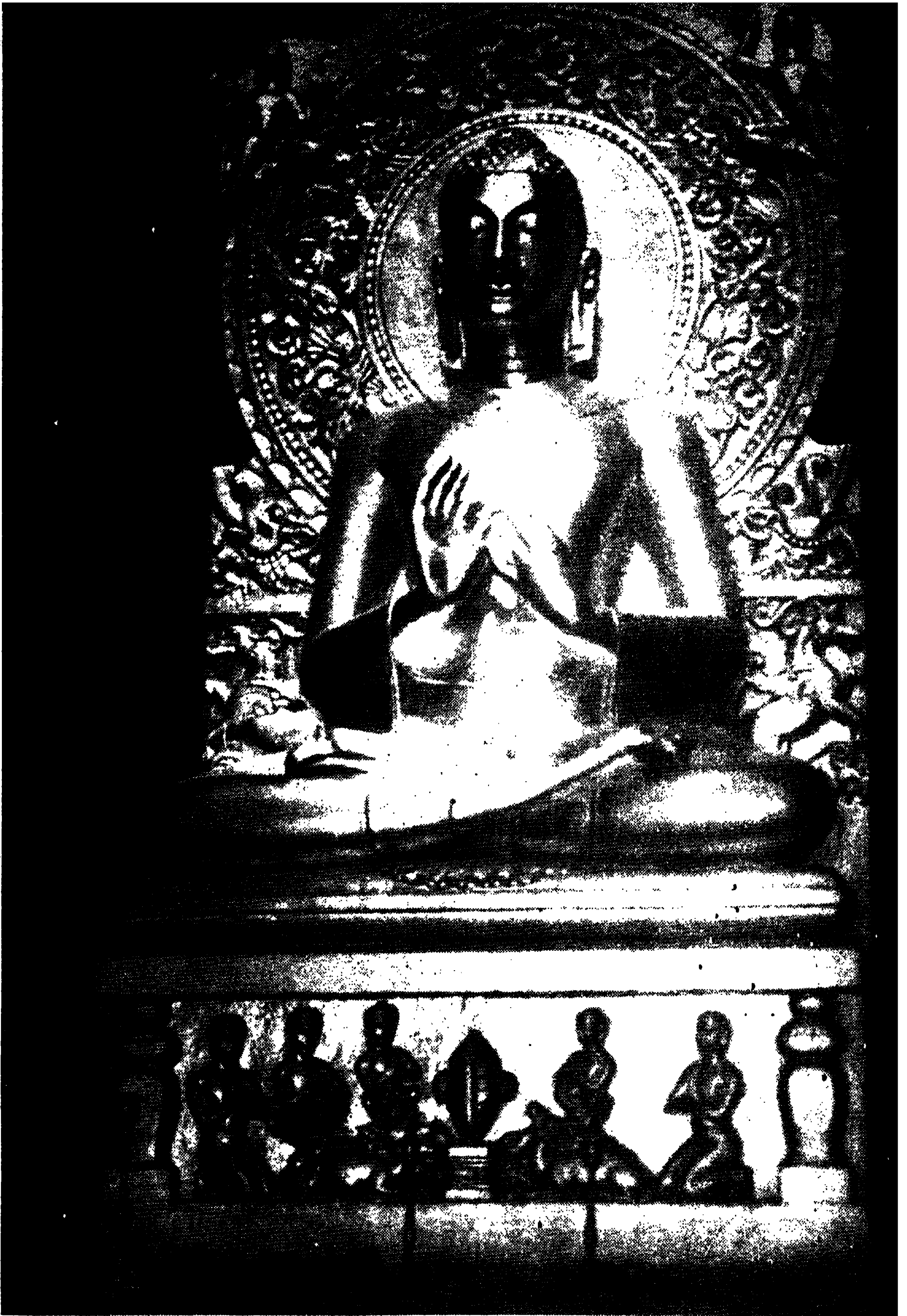
চুপ মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমিও। মীঠুরাম একটা আলো দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। আবার একটু একটু করে জোর বাড়ছে বাতাসের। পেঁপে গাছগুলো মাঝে মাঝে নেচে উঠছে। বেশ অন্ধকার হোয়ে উঠল জঙ্গলটা। মনে হোল, অনেক রকমের জীব, শরীরী নয় অশরীরী জীব সব, নাচছে পেঁপে পেয়ারার জঙ্গলে। ঘরের ভেতর থেকে তেরছা হোয়ে এসে এক ফালি আলো পড়েছে তারকনাথের মুখের এক পাশে। যে ধারটায় আলো পড়েছে সে ধারটা লাল দেখাচ্ছে, অপর ধারটা অন্ধকার। আলোয় আঁধারে গড়া ছেলেটা। দুনিয়ার স্বরূপ বুঝতে অনেক দেরী আছে ওর। দরকারই বা কি, ছাল-ছাড়ানো দুনিয়ার শিকে ঝোলানো আসল চেহারা চেনবার! যতদিন এই এগার বছরেরটি হোয়ে মায়ের কোলে লুকিয়ে থাকতে পারে থাকুক না, তাতে আর দুনিয়ার কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে। ওর মুখের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বহুদিন আগে ফেলে-আসা আমার সেই এগার বছরের দুনিয়াখানাকে মনে করবার চেষ্টা করলাম। সম্ভব নয়, চালাকি করতে করতে অনেক পথ পার হোয়ে এসেছি সেই এগার বছরের দুনিয়াকে পেছনে ফেলে। চালাকি-বিহীন দুনিয়াদারি—মোটে কল্পনাই করতে পারলাম না। কোনও রকমে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম—চল তারক, এবার ঘরের ভেতর গিয়ে বসি আমরা। একখানি গান শোনাও তুমি। তারকনাথের মুখে তারকব্রহ্ম নাম শুনি। তীর্থদর্শন আমার সফল হোক।

ঘরে ঢুকে সতরঞ্জি খুলে বিছানাটা বিছিয়ে ফেললাম চৌকির ওপর। তারকনাথকে পাশে নিয়ে বসলাম বিছানায় চড়ে। রাতের চিন্তাটা ভুলেই গেলাম তখনকার মত। একটু কেশে নিয়ে মুখখানি নুইয়ে উঁ উঁ করে একটু সুর ভেঁজে নিলে তারকনাথ। তারপর মুখ তুলে দরজার বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে গাইতে লাগল—

নয়না মেরে দরশ-ভিখারী
দরশন দো ভগবান।
ভগবান—দব
বিনতি মেরি শুনল স্বামী
তুম-হো-দয়া নিধান॥

ক্রমশঃ





'আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর'—
সারনাথের স্বর্ণ-বুদ্ধ)

ফটো : চঞ্চল মিত্র



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ রবীন্দ্রনাথ ফটো : অসীমকুমার বসু

"ভারত-ভাস্করম্"

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী

[রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কবির পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটকের একটি দৃশ্য। ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত]

স্থান—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কলিকাতার সদর ষ্ট্রীটস্থ বাটীর বারান্দা।

কাল—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রভাত—সূর্যোদয়।

রবীন্দ্রনাথ, জনৈক নির্বোধ অদ্ভুত ব্যক্তি,শ্রমিক, যুবক-দ্বয়, কাদম্বরীর দাসী, জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী]

রবীন্দ্রনাথ—আহা! অদূরে বৃক্ষ পত্রান্তরালে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন—কি অপূর্ব শোভা। দেখ :—

গগনের আঁকে বাঁকে সবুজ পাতার ফাঁকে
উচ্ছলিত আলোক-তরঙ্গ।
সে প্রবাহে ভেসে যায় মোর প্রাণমন কায়
অপরূপ রসরসরঙ্গ ॥

(হঠাৎ সোল্লাসে)

কি আশ্চর্য। কি অতুলনীয়। পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে, আমার মনের অন্ধকারও নিমেষে বিলীন হয়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যেই অকস্মাৎ আমার চক্ষের আবরণ যেন সরে গেল। কি অপূর্ব! কি অপরূপ। এতদিন আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তা আজ—নিমেষ মধ্যে—যেন ছিন্ন হয়ে গেল ; আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল বিশ্বের আলোক ধারায়। কি অচিন্ত্য-নীয়। কি অনির্বচনীয়।

আজ সেই পুরাতন বিশ্ব আমার নিকট নবরূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। আহা! কি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন! আহা! কি অপরিসীম আনন্দ ও সৌন্দর্যে তা' তরঙ্গায়িত।

আহা! আনন্দাতিশয্যে আমি নিজেকে সম্বরণ করতে পারছিনা! পরমেশ্বর আনন্দ-রসঘন, জগৎও তাই, আমিও তাই। কি অনুপম এই অনুভূতি।

আজ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হয়ে' বয়ে চল্‌ছে।—

(লিখে)

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ ॥

আহা! আজ সত্যই আমার প্রাণ-মন-জীবন জেগে উঠেছে! আজ বিশ্বের সকল বস্তু, সকল মানুষকেই ত মনে হচ্ছে আমার আত্মার আত্মীয়, অতি নিকট জন, পরম সখা।

জনৈক নির্বোধ অদ্ভুত ব্যক্তির প্রবেশ

সেই ব্যক্তি—মহাশয়! আমি কি আসতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ—(সাদরে) এসো, এসো।

(স্বগত)—কি আশ্চর্য! কাল পর্যন্ত এই নির্বোধ, অদ্ভুত রকমের লোকটাকে দেখলে আমি বিরক্তই হতাম। কারণ সে আমাকে মাঝে মাঝে এরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত—"মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরকে কখনো স্বচক্ষে দেখেছেন? আমাকে স্বীকার করতেই হত যে আমি দেখিনি। তখন সে বলত "আমি দেখেছি।" যদি জিজ্ঞাসা করতাম—"কিরূপ দেখেছ?" সে উত্তর করত "চোখের সম্মুখে' বিজ বিজ করতে থাকেন।" এরূপ লোকের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা ত সব সময়ে প্রীতিকর হতে পারেনা। কিন্তু আজ তাকেও দেখে ত আমার আনন্দ হচ্ছে, আজ তাকেও ত আমার পরমাত্মীয় বলে বোধ হচ্ছে।

(প্রকাশ্যে)—এসো, এসো। কি চাও?

সেই ব্যক্তি—আজ পুনরায় বলুন—আপনি কি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ—আজ পুনরায় বলি, শোন—

আনন্দরূপ তাঁরে দেখেছি আমি
দেখেছি পূর্ণ ভাবে ভুবনস্বামী।
জগল্লীন তিনি জগদতিরিক্ত
সর্ববিশ্ব তাঁরি সুধারসসিক্ত॥

এই আনন্দময় বিশ্বকে দেখেই ত আমি তাঁকেও দেখেছি।

সেই ব্যক্তি—কোথায়—কোথায় তাঁকে দেখেছেন ? তিনি ত আমাকে ক্রমাগত ইতস্ততঃ ঘোরাচ্ছেন। যদি আমি তাঁর সেই মহামহিমান্বিত, অখণ্ড সৌন্দর্যমণ্ডিত সত্য, শিবরূপ একবার দেখতে পাই, তাহলে আমি স্থানান্তরে যাবনা। আপনি যদি তাঁকে দেখে থাকেন ত, উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে বলুন—'আপনি স্থানান্তরে চলে যাবেন না। যদি যান, তাহলে আমরা উভয়ে প্রাণত্যাগ করব।' তাঁরই শ্রীচরণকমলে মন সন্নিবিষ্ট করে আমি সর্বদা তাঁকে পূজা করি। কিন্তু কেন সেই শিখিপুচ্ছধারী, যমুনাবিহারী নীলহরি আমাকে বঞ্চনা করে জলে স্থলে সর্বত্র বিচরণ করছেন ?

রবীন্দ্রনাথ—

কেন অকারণ খোঁজ সেই ধন
শাশ্বত যে নিধি
ত্রিভুবন মাঝে সে রূপ বিরাজে
তিনিই বিশ্ববিধি॥
গোপাল-লোলুপ ওরে ভক্তভূপ
হের তাঁরে আঁখি মেলি।
অণুতে রেণুতে মোহন বেণুতে
তাঁরি রূপ বিভাকেলি॥

হে রসরাজ রসপিপাসু! হাস্যোজ্জ্বল ব্রজসুন্দরের অনুসরণ কর। তিনি ত এদিক দিয়েই যাচ্ছেন।

সেই ব্যক্তি—(দৌড়ে যেতে যেতে)—তাহলে আমিও যাই। শ্রীকৃষ্ণরহিত আমি কোনোদিনও হবনা।

উন্মত্তবৎ প্রস্থান

রবীন্দ্রনাথ—(ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)

আহা! শিশুকাল থেকে কেবল চোখ দিয়ে দেখাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখতে আরম্ভ করলাম।

আহা! দেখ, রাস্তা দিয়ে কত মুটে মজুর হেঁটে যাচ্ছে; তাঁদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, মুখশ্রী আমার নিকট আজ কি আশ্চর্য বলে বোধ হচ্ছে। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়ে তরঙ্গলীলার মত বয়ে চলেছে।

ওহো! একজন ত এই দিকেই আসছে। (তাকে আহ্বান করে) ওহে মজদুর! একটু দাঁড়াও, একটু এগিয়ে এসো।

মজদুরের প্রবেশ

রবীন্দ্রনাথ—(সাদরে) ওহে শোন! তোমার কি এই জগৎকে ভাল লাগে ? সমস্ত বস্তুই ত আনন্দ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। সেজন্য সবই কি আনন্দময় নয় ?

মজদুর—(স্বগত) অনুপম বিভূতিময় কে এই মহাপুরুষ! স্বয়ং সূর্যদেবই কি মূর্তিধারণ করে আমার সম্মুখে বিরাজ-মান ? (প্রকাশ্যে)—দেব! অধম এই জনের প্রণামাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আমি ত আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। অতি ক্ষুদ্র দিনমজুর আমি। আমি আপনার মত মহৎ জনের কি করতে পারি ? আপনি কি অন্য কাউকে ভুল করে' আমাকে ডেকেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ—না, না, ভ্রাতঃ। তুমি কেন ক্ষুদ্র হতে যাবে ? ভগবান্ শ্রীহরি সকলের মধ্যেই সমভাবে বিরাজিত। বাইরের চক্ষু মুদ্রিত করে একবার অন্তরের চক্ষু মেলে দেখ। দেখবে, সর্বত্রই সেই একই ব্রহ্ম, সেই একই আনন্দ রসঘন ব্রহ্ম। সেজন্য, তুমিও যেমন, আমিও তেমনি, সেই একই আনন্দময় ব্রহ্ম।

মজদুর—প্রভু! যদিও আমি আপনার কথা ঠিক ভাবে বুঝতে পারছিনা, তবুও আমার মনে আজ হঠাৎ কি এক অবর্ণনীয় আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন উপরে নীচে, চারিদিকে, আনাচে কানাচে যে এক আনন্দ ধারা বয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ—আহা! এই মজদুরের মুখেও কি মধুর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছে। শাস্ত্র ত সত্যই বলেছেন—"মূকং করোতি—বাচালম্।" সেই শাশ্বতানন্দ স্বরূপকেই কোটি কোটি প্রণাম। কি অপূর্ব, কি অপূর্ব—

করুণাময় করুণা ধারা
ঝরিছে অঝোরে বর্ষাকারা
নিখিলে বিশ্বে বাঁধনহারা
সুখ সঞ্চারা অমৃতসারা॥
রবিশশী হাসে, তারাবলী
হাসে নদনদী বনস্থলী।
হাসে ঘাসে ঘাসে পুষ্পকলি
বিহগ করে মধু-কাকলী॥
প্রতি ধূলি গায় সুধা-গীতি
আনন্দ আজ বসুধা-স্থিতি।
তৃণ শিহরণে সুখ স্মৃতি
শিশির কণায় ভাসে প্রীতি॥

মজদুর—(স্বগত)—আহা! এঁকে কি আমি রোজ দেখতে পাবনা? (প্রকাশ্যে) প্রভু! আপনাকে কি রোজ সকালে দেখবার সৌভাগ্য আমার হবে না?

রবীন্দ্রনাথ—আনন্দময়ই তা' জানেন। তিনি যদি আমাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন, তাহলে কি করে আমাকে এখানে দেখবে? কিন্তু যিনি মহান্, বিভু, ভূমা, মহত্তম থেকেও মহীয়ান, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেয়ান, অথচ যিনি পৃথিবীর অণুতে পরমাণুতে নিত্যই বিরাজিত—তাঁকেই নিরন্তর দেখনা কেন।

আচ্ছা, কাল তুমি নিশ্চয় এসো। তোমাকে দেখেও ত আমার পরম আনন্দ হচ্ছে। তোমাকে দেখে আমি বিশ্বের সকলকেই যেন দেখতে পাচ্ছি। এরই নাম কি "ব্রহ্মদৃষ্টি, আত্মদৃষ্টি?" এ ত পরব্রহ্মেরই দান।

মজদুর—কি আনন্দ আমি পেলাম।

দেব! কাল নিশ্চয় আপনার দর্শন-লাভের জন্য আমি আসব। প্রণাম, শতকোটী প্রণাম।

প্রস্থান

রবীন্দ্রনাথ—[ইতস্ততঃ দেখে] কত লোক চলেছে, কত ঘটনা ঘটছে—তারা ত সামান্য লোক নয়, সে সব ত সামান্য ঘটনা নয়। "বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাচ্ছে, সেটাই যেন আজ দেখতে পাচ্ছি।"

গলাগলি করে, হাসতে হাসতে দুই যুবকের প্রবেশ

প্রথম যুবক—(উচ্চৈস্বরে হেসে)—

কি মজার কথা তুমি বলছ। অধ্যাপক-মহাশয় সত্যই এই কথা বল্লেন।

দ্বিতীয় যুবক—হ্যাঁ, রে, হ্যাঁ। শোন তবে আবার। পূজ্যপাদ কবি নবীনচন্দ্র সেনের সুবিখ্যাত "পলাশীর যুদ্ধে" প্রথম সংস্করণে একটি পংক্তি আছে:—

"বানর-ঔরসে—জাত রাক্ষসী-উদরে

এতে দেশশাসক ইংরাজগণ নিজেদের প্রতি কটাক্ষ ভেবে কবির বিরুদ্ধে মামলা আনেন। তখন মহামতি বিদ্যাসাগর কি মজার কাণ্ডই না করলেন।

উচ্চহাস্য

প্রথম যুবক—(হাসিতে যোগ দিয়ে) আরে, তুই যে হেসেই খুন। বল্না কি হল?

দ্বিতীয় যুবক—শোন্! বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পংক্তিটীকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলেন—

"বানর" কথার অর্থ হল—"বা নর" অথবা "বিশেষ নর", অর্থাৎ মহাপুরুষ। "রাক্ষসী" কথার অর্থ হল—"রক্ষতি যা সা" অথবা যিনি রক্ষা করেন। এই ভাবে, নবীনচন্দ্র বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন!

দুজনে (উচ্চহাস্য)—

আজ যেন মনে হচ্ছে সকলের সঙ্গে আলাপ করি।

রবীন্দ্রনাথ—আহা, কি আনন্দের চিত্র! (ডেকে) শুনুন! শুনুন! আপনাদের এই আনন্দের কারণ কি?

প্রথম যুবক—কারণ আর কি? আমরা যে পৃথিবীকে ভালোবাসি, পৃথিবীতে আনন্দ পাই।

দ্বিতীয় যুবক—নিশ্চয়! নিশ্চয় না হলে, জগতে আনন্দ না থাকলে, আমরা বাঁচতামই বা কি করে? নমস্কার—

প্রস্থান

রবীন্দ্রনাথ—কি সুন্দর কথাই না ওঁরা বল্লেন। ঠিক যেন উপনিষদের কথার প্রতিধ্বনি—

কো(হ) বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদে আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ”

“কেই বা—জীবনধারণ করত, কেই বা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করত, যদি এই আকাশে সেই আনন্দ বিরাজ না করত।”

ইতস্তত দেখে

“সামান্য কিছু কাজ করবার সময় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে গতি-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়, তাত আগে কোন দিন লক্ষ্য করিনি। এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গেই আমাকে মুগ্ধ করছে। তার মধ্যে আমি যেন এক “মহাসৌন্দর্যের” আভাস পাচ্ছি। ঐ যে, বন্ধুকে নিয়ে বন্ধু হাসছে, শিশুকে নিয়ে মাতা লালন করছে, একটা গরু আরেকটা গরুর পাশে দাঁড়িয়ে গা চাটছে—সে সবের মধ্যেই যে একটী “অন্তহীন অপরিমেয়তা”—তাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিচ্ছে।—

কি অপূর্ব এই অনুভূতি। আহা, কি আনন্দোৎসব, কি প্রভাতোৎসব আজ আমার—

(লিখে)

প্রভাতোৎসব

“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল
খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে—
কোলাকুলি।”

কাদম্বরীর দাসীর প্রবেশ

দাসী—ছোটবাবু! মা আপনাকে স্নানের জন্য ডাকছেন।

রবীন্দ্রনাথ—সত্যই ত। যিনি মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত জনকে স্নেহ সুধায় সিক্ত করে রেখেছেন, সেই বধূঠাকুরাণী-কে আজ এই আনন্দের দিনে স্মরণ করছি না কেন? তিনি কোথায়? দাসী—ঐ যে তিনি এইদিকেই ব্যস্ত হয়ে আসছেন। কিন্তু ঠাকুর, আপনাকে আজ এরূপ আনন্দিত দেখাচ্ছে কেন? রবীন্দ্রনাথ—ঠাকুর? ঠাকুর কে? একমাত্র পরম-ঠাকুরই ত আছেন—তাঁর জন্যই নদী সমুদ্রে কল্লোল উল্লসিত হচ্ছে, বৃক্ষলতায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছে, আকাশে সূর্য চন্দ্র উদ্ভাসিত হচ্ছে, দিনরাত্রি, শীত গ্রীষ্ম হচ্ছে। তোমারও মধ্যে তাঁরই আনন্দের প্রকাশ।

দাসী—(আশ্চর্যান্বিত ভাবে)—মা! এখানে আসুন। আপনার দেওর আনন্দে কি রকম করছেন।

কাদম্বরীর প্রবেশ

কাদম্বরী—আহা! কি হল?

দাসী—দেখুন, মা, ঠাকুরের দুই চোখ দিয়ে কিভাবে আনন্দাশ্রু পড়ছে! কেন মা?

কাদম্বরী—ওহে ভক্তবর! তুমি ত মনে হচ্ছে আনন্দ-সাগরে লীন হয়ে আছ। আমাদের একটু ভাগ দাও না।

রবীন্দ্রনাথ—বধূঠাকুরাণি! আমি আবাল্য স্নেহবঞ্চিত। আপনি আমাকে নিরন্তর সেই স্নেহদানে ধন্য করেছেন। কিন্তু তার অপেক্ষাও অধিক আনন্দ আমাকে উদ্বেল করছে। সে এক অবর্ণনীয় বস্তু। নিরন্তর সর্বত্র মধু ক্ষরিত হচ্ছে। আজ থেকে, আমার নিকট আপন-পর ভেদ থাকবে না। সম্প্রতি আমি তাঁকেই কেবল দেখছি যাঁর—

“আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি”,

যিনি—

“শান্তং শিবমদ্বৈতম্।”

কাদম্বিরী—কল্যাণ হোক। এরূপ আনন্দেই যেন চিরকাল থাক!

রবীন্দ্রনাথ—(আবৃত্তি করে—)

না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!”

সকলের প্রস্থান

১৯৬১-৬২ সালের রেলওয়ে বাজেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

শ্রীজগজীবন রাম হলেন ভারতের রেলমন্ত্রী। তিনি বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় লোকসভায় ১৯৬১-৬২ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটটি আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৬১-৬২ সালের রেলওয়ের উদ্বৃত্ত রাজস্বের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, ক্ষয়-ক্ষতি, সংরক্ষণ-তহবিল এবং সাধারণ রাজস্ব খাতে রেলওয়ে-কনভেনশান কমিটির ১৯৬০ সালের সুপারিশ অনুসারে অধিকতর অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই প্রকার অর্থ দিয়েও নাকি আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হবে। শ্রীজগজীবনরাম বলেছেন, রেলওয়ে সাধারণ রাজস্ব তহবিলে রাজ্যগুলোকে প্রদানের জন্য যে বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন সেটা নাকি যাত্রীদের কাছ থেকে যাত্রী-কর হিসাবে আদায় করা হবে।

ভারতীয় লোকসভায় রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে, এক হাজার একানব্বই কোটি চুরাশী লক্ষ আঠার হাজার টাকার সমস্ত বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে।

অনুমান করা হয়েছে, ১৯৬১-৬২ সালে যাত্রী ভাড়া এবং মালের মাশুল বাবদ রেলওয়ের যে আয় হবে সে আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে চারশত নিরানব্বই কোটি টাকা। রাজ্যগুলোকে এ থেকে যাত্রী-কর বাবদ নির্দিষ্ট হারে বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া হলে আয়ের পরিমাণ হবে চারশত ছিয়াশী কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের সংশোধিত হিসাবে এর পরিমাণ হয়েছে চারশত আটান্ন কোটি টাকা। রেলমন্ত্রী লোকসভায় বলেছেন, সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরে যাত্রীভাড়া বাবদ আয় হবে একশত ত্রিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ টাকা। মূল বাজেটে অনুমান করা হয়েছিল, এর পরিমাণ হবে একশত পঁচিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে অন্যান্য কোচ বাবদ আনুমানিক দু কোটি টাকা এবং বিবিধ খাতে প্রধানতঃ বিভাগীয় খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বাবদ এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা আয় বেড়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৯-৬০ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে মালের মাশুল বাবদ আয় মাত্র উনত্রিশ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য নাকি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটই প্রধানতঃ দায়ী। এখানে বলা দরকার, বাজেটে ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছিল একচল্লিশ কোটি টাকা। এজন্যই ১৯৬০-৬১ সালের সংশোধিত হিসাবে যাত্রী ভাড়া এবং মালের মাশুলের পরিমাণ চারশত আটান্ন কোটি ধরা হয়েছে, যদিও মূল বাজেটে অনুমান করা হয়েছিল, এর পরিমাণ দাঁড়াবে চারশত চৌষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন, ১৯৫৯-৬০ সালে যাত্রী-ভাড়া—এবং মালের মাশুল বাবদ যে আয় হয়েছে সে আয়ের মোট পরিমাণ হল চারশত বাইশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা। সংশোধিত হিসাবে নাকি এর পরিমাণ ধরা হয়েছিল চারশত বাইশ কোটি তিন লক্ষ টাকা। তাছাড়া ঐ বছরে কুড়ি কোটি বার লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। অথচ সংশোধিত হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল, এর পরিমাণ দাঁড়াবে চৌদ্দ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা।

১৯৬১-৬২ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করার সময় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম ঘোষণা করেছেন, ১৯৬১-৬২ সালে যাত্রী ভাড়ার কোনপ্রকার পরিবর্তন হবেনা। তাছাড়া সাধারণতঃ মাল মাশুলের হারেরও পরিবর্তন হবেনা বলে রেলমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। অবশ্য অল্প মালের উপর এখন শতকরা দশ হারে যে অতিরিক্ত সারচার্জ আদায় করা হয়ে থাকে সেটা বৃদ্ধি করে শতকরা কুড়ি করা হবে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পিছনে একটা কারণ আছে। কারণটি আর কিছুই নয়। সরকার রেলযোগে অল্প মাল প্রেরণে উৎসাহ দিতে চাইছেন না। কেন সরকার উৎসাহ দিতে চাইছেন না এই প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে যেহেতু রেলওয়েকে অল্প মাল পরিবহনের জন্য আয়ের তুলনায় বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সেহেতু সরকার রেলযোগে অল্প মাল প্রেরণে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী নন। জানা গেছে, একই কারণবশতঃ কয়লা পাঠাবার মাশুল আদায়ের জন্য এখন যে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার 'ন্যূনতম দুরত্ব বলে ধরা হয় সেটাকে আর বজায় রাখা হবেনা অর্থাৎ সত্তর কিলোমিটার ন্যূনতম দুরত্ব বলে ধার্য্য হবে। ফলে প্রতি মণ কয়লার মাশুল চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা থেকে বেড়ে পাঁচ টাকা হবে। অবশ্য এর ফলে রেলওয়ের আয় খুব কমই বাড়বে।

অনুমান করা হয়েছে ১৯৬১-৬২ সালে ভারতীয় রেলওয়ের সাধারণ পরিচালনা বাবদ যে খরচ পড়বে সে খরচের পরিমাণ হল তিনশত বত্রিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের সংশোধিত ব্যয়ের তুলনায় ছয় কোটি বাইশ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হয়েছে। আরো দেখা যাচ্ছে,' সংশোধিত বাজেটে সাধারণ পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কম ধরা হয়েছে।

অথচ মূল বাজেটে এর পরিমাণ ছিল তিন শত ছাব্বিশ কোটি নব্বই লক্ষ টাকা।

রেলমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৬১-৬২ সালে বার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হবে ভারতীয় রেলওয়ের নীট উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ। আমরা আগেই বলেছি, ক্ষয়ক্ষতি-সংরক্ষণ তহবিলে ১৯৬০-৬১ সালে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার পরিবর্তে ১৯৬১-৬২ সালে পঁয়ষট্টি কোটি টাকা এবং সাধারণ রাজস্বে অতিরিক্ত আট কোটি সত্তর লক্ষ টাকা দেওয়া হলে প্রকৃতপক্ষে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে আট কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৬০-৬১ সালে সংশোধিত বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ধরা হয়েছে চৌদ্দ কোটি তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু মূল বাজেটে অনুমান করা হয়েছিল, এর পরিমাণ হবে—আঠার কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা। রেলমন্ত্রী লোকসভায় বলেছেন, সংশোধিত বাজেটে নীট মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে দু শত সাঁইত্রিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মূল বাজেটের তুলনায় চৌদ্দ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, মালপত্রের ডেলীভারীর খরচ এবং পরিকল্পনার কাজের পুনর্বিন্যাসের দরুণ খরচ বেড়ে গেছে।

লোকসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় রেলওয়ের জন্য মোট একহাজার দুশত পঞ্চান্ন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পরিমাণ পাঁচশত চল্লিশ কোটি টন-মাইল থেকে বৃদ্ধি করে নয়শত ত্রিশ কোটি টন মাইল করবার কার্য্যসূচী গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, বছরে তিনশত নব্বই কোটি টন-মাইল বেড়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাফল্য অর্জ্জিত হয়েছে ঐ টন-মাইল বৃদ্ধি সে সাফল্যের দ্বিগুণ। তাই অর্থবরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রী বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংসদে ঘোষণা করেছেন, এর আগে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ভারতীয় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ পাওয়া গিয়েছিল সে ঋণের কথা বাদ দিলেও গত জুলাই মাসে ঐ ব্যাঙ্ক থেকে আরো সাত কোটি ডলার ঋণ পাওয়া গেছে। এছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ঋণ-তহবিল-কর্তৃপক্ষ নাকি পাঁচ কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজী হয়েছেন। অবশ্য এর মধ্যে এক কোটি ডলার হল আগেকার ঋণ। রেলমন্ত্রীর ভাষণ থেকে জানা যায়, রেলওয়ের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ চারশত পঁচিশ কোটি টাকা থেকে কমে তিনশত বত্রিশ কোটি টাকা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, রেলগাড়ী এবং অন্যান্য রেলসরঞ্জাম ভারতে উৎপাদনের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, রেলওয়ের তৃতীয় পরিকল্পনায় একশত ছিয়াশী কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে। ১৯৬০-৬১ সালে ব্রেক রেগুলেটার ইত্যাদি কতকগুলো দ্রব্য তৈরীর ক্ষমতা পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক সিগন্যালিং সরঞ্জাম নির্ম্মাণও সুরু হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কয়লার দাম বেড়ে যাবার দরুণ রেলওয়ে জ্বালানী দ্রব্যের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে খারাপ কয়লা সরবরাহের ফলে এই অবস্থা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে রেলওয়ে দপ্তর এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কয়লা পরীক্ষা করে গ্রহণ করা হবে। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনিগুলো যে কয়লা সরবরাহ করছে সেটার শ্রেণী বিন্যাস করে গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া যাতে জ্বালানী দ্রব্যের জন্য ব্যয় হ্রাস পায় সেজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা চলেছে। শ্রীঅশোক মেহতা ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, যদি সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রেলওয়ে কর্ম্মসূচী পরীক্ষা করা হয় তাহলে নিরুৎসাহ হবার কারণ নেই। তবে রেল এবং কয়লা দপ্তরের মধ্যে যে বিতর্ক চলছে তিনি সে বিতর্কের নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, রেল ও কয়লা উভয় দপ্তর এই নিন্দার্হ বিতর্কের জন্য দায়ী।

এ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন নূতন লাইন স্থাপনের জন্য একশত কুড়ি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এতে এক হাজার এক শত ষাট মাইল লাইন স্থাপন সম্ভব হবে বলে রেলমন্ত্রী আশা করেছেন। নূতন কয়লাখনি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দু শত মাইল এবং হলদিয়া বন্দরের জন্য পঞ্চাশ মাইল নূতন লাইন নাকি ঐ হিসাবে ধরা হয়েছে। তাছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এক হাজার সাতশত ইঞ্জিন, সাত হাজার আটশত গাড়ী এবং এক লক্ষ দশ হাজার ওয়াগন বৃদ্ধি করা কষ্টকর হবেনা। এছাড়া একশত ষাট হাজার মাইল বৈদ্যুতীকরণ হবে। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানায় চলতি বছরে একশত চৌষট্টিটি ইঞ্জিন এবং আগামী বছরেও সম-সংখ্যক ইঞ্জিন তৈরী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঐ কারখানায় বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনও নির্ম্মাণের কাজ সুরু হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর ষাটটি এই ধরণের ইঞ্জিন তৈরীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই সমস্ত ইঞ্জিনের মেকানিক্যাল অংশের সবটা নির্ম্মিত হবে চিত্তরঞ্জনে। শেষ পর্যন্ত ভূপালে হেভি ইলেকট্রিক্যালস বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরী এবং সরবরাহ করবে। এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ১৯৬১-৬২ সালে চিত্তরঞ্জনে কুড়িটি বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিন নির্ম্মিত হবে।

বিগত ১২ই মার্চ তারিখে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের একটা টেক্‌নিক্যাল মিশন নয়াদিল্লীতে এসেছেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, এই মিশন ভারতীয় রেলপথগুলোর উন্নয়নের বিষয় পর্য্যালোচনা করতে চাইছেন। স্বভাবতঃই রেলওয়ে সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে মিশন এবং ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে আলোচনা চলবে। আশা করা যাচ্ছে, রেলপথ গুলোর উন্নয়নের ব্যাপারে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে আরো কর্জ্জ পাওয়া যাবে কিনা এবং পাওয়া গেলে কতটা পরিমাণ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আলোচনা হবে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ভারতীয় রেলওয়েকে, বিশ্বব্যাঙ্ক যে অর্থ দিয়েছেন সে অর্থ কিভাবে খরচ করা হয়েছে সেটা দেখবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা

ভারতে এসেছেন। কোন প্রকার তদন্ত চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এঁরা ভারতে আসেননি।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় ১৯৬১-৬২ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করার সময় শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন, কলকাতা অঞ্চলে পূর্ব্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-রাণাঘাট এবং দমদম-বনগাঁ লাইন দুটোর বৈদ্যুতীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্ষেত্রে স্থাপনের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। শিয়ালদহের দক্ষিণ দিকের লাইনগুলোতেও সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এর কাজ চলছে। ইগাতপুরি-ভুনাডাস লাইনে সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ভারতীয় রেলপথ সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা হয়ত জানেন, এক হাজার চারশত মাইলেরও বেশী পথ বৈদ্যুতীকরণের সূচী নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় পাঁচশত মাইলের বৈদ্যুতীকরণ নাকি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে কয়লা এবং ইস্পাত অঞ্চলে যাওয়া আসা এবং মালপত্র পাঠান সুবিধাজনক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রেলমন্ত্রী লোকসভায় বলেছেন, মাদ্রাজ-তাম্বারাম-ভিল্লিপুরম সেকশানে পঁচিশ কিলোভোল্ট এ সি কারেণ্টে বৈদ্যুতীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় কাজ খুব দ্রুতগতিতে চলবে। তাছাড়া এর মধ্যে রাজখরশোয়ান-দাঙ্গোয়াপোষী এবং আসানসোল-গোমোর মধ্যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালু হয়েছে। ১৯৬১ সালের জুন মাসের মধ্যে দুর্গাপুর-আসানসোল, গোমো-গয়া এবং আসানসোল-সিনি-টাটানগর—রাউলকেলায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালু হবে। গয়া-মোগলসরাই এবং টাটানগর-খড়গপুর সেকশানে এই কাজ চলছে।

কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের মধ্যে সরাসরি রেল সংযোগের জন্য শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এইপ্রকার সরাসরি রেল সংযোগের দ্বারা—আসাম, দিনাজপুর এবং দার্জ্জিলিং এর বাণিজ্যিক ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষিত হবে। তাঁর দাবীর মূল কথা হল, উত্তর বঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুরের ভিতর দিয়ে রেল লাইন তৈরী করা দরকার। যেহেতু দেশবিভাগের দরুণ উত্তরবঙ্গ-রেললাইন থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেহেতু পশ্চিমদিনাজপুরের দাবী সকলের আগে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। অথচ এই দাবী পূরণ করার জন্য সরকার আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অবশ্য পশ্চিম দিনাজপুরে এই রেললাইনের জন্য বহু বার জরীপ হয়েছে। শুধু—তাই নয়। এই মর্ম্মে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাওয়া গেছে যে লাইনটি নির্ম্মিত হলে লোকসানের আশঙ্কা দেখা দিবেনা। এমনি কি প্রস্তাবিত রেললাইনের নকসা পর্য্যন্ত তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ঐ নক্সা পরিবর্তিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল নক্সায় দেখান হয়েছিল, প্রস্তাবিত রেললাইনটি পশ্চিম দিনাজপুরের ভিতর দিয়ে যাবে। কিন্তু পরিবর্তিত নক্সা-অনুযায়ী যে নয়া মালদহ-শিলিগুড়ি লাইন প্রস্তুত হচ্ছে সে লাইন পশ্চিন দিনাজপুরকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব-রেলপথের জেনারেল-ম্যানেজারের কাছে বারাসত—বসিরহাট রেল-যাত্রী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বারাসাত থেকে বসিরহাট-হাসনাবাদ পর্য্যন্ত ব্রডগেজের যে নয়া রেলওয়ে লাইন তৈরী করা হচ্ছে সেটাকে বারাসাত পয়েণ্টে বনগ্রাম লাইনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য দাবী জানান হয়েছে। বারাসাত-বসিরহাট রেল-যাত্রী ইউনিয়নের সভাপতি হলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হলেন দুজন। এঁদের নাম হল শ্রীশরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং অধ্যাপক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন—ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। এঁরা বিগত ৪ঠা মার্চ তারিখে পূর্ব্ব রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এঁরা জেনারেল ম্যানেজারকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, যদি নবনির্ম্মিত লাইনকে বারাসাত পয়েণ্টে বনগ্রাম লাইনের সাথে সংযুক্ত করা না হয় তাহলে ঐ লাইনটি শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক হবেনা। শুধু তাই নয়, জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন মিটবে বলে মনে হয়না।

শ্রীমতী পার্ব্বতী কৃষ্ণান এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে যাতে দক্ষিণ ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পনৈতিক প্রয়োজন মিটান যেতে পারে সেজন্য আরো রেলপথ খোলা দরকার। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত পাঞ্জাবের অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য রেল সংযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থার গুরুত্ব সহকারে একটা রেল সংযোগ তৈরী করার কাজ শুরু করার জন্য সর্দার বুধ সিং অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি রাজ্যসভায় জম্মু ও কাশ্মীরের সদস্য এবং জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি। সর্দার বুধ সিং বলেছেন, এই লাইন তৈরী করার জন্য তিনি বিগত ছয় বছর ধরে অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু যে রকম মন্থর গতিতে কাজ হচ্ছে তা'তে নিকট ভবিষ্যতে ওটা সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত। সর্দার বুধ সিং মনে করেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে রেল সংযোগ নির্ম্মিত হলে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রথমতঃ সৈন্যবাহিনীর জন্য সরবরাহ পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের চাহিদা সহজে মিটান যাবে।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীশীলভদ্র যাজী রাজ্যসভায় রেলওয়ে বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিলচর এবং ইম্ফলের মধ্যে একটা রেললাইন খোলার ব্যবস্থা করা দরকার।

শ্রী এস ডি রামস্বামী হলেন রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী। রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ১৩ই মার্চ তারিখে লোকসভায় বলেছেন, চারটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপে বিশেষ ধরণের অতিরিক্ত দু' হাজার কয়লাবাহী ওয়াগন তৈরী করার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সরকার আশা করছেন, এই প্রকার এক একটা ওয়াগনের পঞ্চান্ন টন কয়লা বহনের ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ একটা সাধারণ ওয়াগন যতটা পরিমাণ কয়লা বহন করে বিশেষ শ্রেণীর কয়লাবাহী ওয়াগন সেটার দ্বিগুণ

কয়লা বহন করতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়লা বহন করে প্রতি টন মাইল তিন দশমিক তেত্রিশ নয়া পয়সা আয় হয়, অথচ এর দরুণ ব্যয়ের পরিমাণ ব্রডগেজে তিন দশমিক আশী নয়া পয়সা এবং মিটার গেজে পাঁচ দশমিক উনআশী নয়া পয়সা।

শ্রীদয়াভাই প্যাটেল হলেন রাজ্যসভার স্বতন্ত্র সদস্য। তিনি রেলওয়ে বাজেটের-সমালোচনা করে বলেছেন, গোটা রেলওয়ে বাজেটটি প্রাক-নির্বাচনী বাজেট ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতানুসারে দেশের বিশেষ চাহিদা মিটাবার জন্য রেলওয়ে দপ্তর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হননি। শ্রীমহেশ শরণ এবং ডাঃ রঘুবীর সিং দুজনই হলেন রাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্য। অথচ রেলওয়ে বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে দুজনে দু-ধরণের মন্তব্য করেছেন। রেল বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শ্রীমহেশ শরণ রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে ডাঃ রঘুবীর সিং বলেছেন, যদিও বহু অনগ্রসর অঞ্চল বর্তমানে গুরুত্ব অর্জন করেছে তথাপি ঐ সব অঞ্চলে রেলওয়ে সুযোগ সুবিধা মোটেই বৃদ্ধি পায়নি। কলকাতায় সার্কুলার রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপর শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বিশেষ জোর দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তিনি শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের দাবী জানিয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়লার অভাব বিদ্যমান। যদি ওয়াগন সরবরাহে বিলম্ব এবং অন্যান্য বাধা দূর করার জন্য রেলওয়ে দপ্তর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে সমস্যার সমাধান হবেনা। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, রেলওয়ে বৈদ্যুতীকরণ এবং লাইন দ্বিগুণ করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি, যদিও সাধারণভাবে রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নতি চোখে পড়ছে এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও কিছুটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জ্জিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কুসুম-সম্পদ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শুধু গোটা কয় ফুল,—তাইতো আমার সম্পদ এ ধরায়;—
আমি আর বলো কিবা চাই!
এই পাতার কুটীর—তবু যেন ওরা উজল ক'রেছে হায়,—
আহা তার তুল্ কোথা পাই?
জানি নাহি গো অর্থ,—জীবন ব্যর্থ ভাবিয়াছ বুঝি তাই?
দীন তাই কিগো নিরুপায়?
সুন্দর যারে ফুল-সম্পদ যৌতুক দিল ভাই,—
তার সমান ধনী কে হায়!
এই কাঙালের ঘরে মণিকাঞ্চন হীরা ও পান্না কই!—
ওরে সামলানো বড়ো দায়!
মোরে এমনি রাখিস্ গরীব করিয়া পল্লী-জননী অয়ি,
তোর তালতেঁতুলের ছায়!
হেথা রক্তগোলাপ কতো যে প্রলাপ বকিছে দিবস ভোর,
মন ভুলায় গন্ধরাজ;
হোথা হের গো ডালিয়া দিয়েছে ঢালিয়া রূপের পশরা ওর,—
যেন আর নেই কোনো কাজ!
মোর অঙ্গনখানি রঙ্গন যেন রঙ্গে করেছে আলো,
কুঞ্জে স্মরায় কৃষ্ণকলি;
ওগো আজি অনিন্দ্য শুভ্র বসনে কুন্দ সেজেছে ভালো
বুঝি ভ্রমর আসিবে বলি'।

আজ কোন্ বঁধু লাগি' উঠেছে বিকশি' অতসী কুসুমরাণী?
হায়, কাহার সোহাগ-সুখে—
রজনীগন্ধা জাগিছে রজনী কি লাগিয়া নাহি জানি
এত মধু নিয়ে বুকে!
এই ফুলের আসরে ভাবে প্রজাপতি কোন্ বন হতে আসি'—
কারে চুম্বিবে কারে ফেলি';
হের কনকচাঁপার চাঁদমুখে আজ ফুটিয়াছে চাপা হাসি,
আতর মেখেছে মোতিয়া বেলী।
আমি এত সম্পদ কোথায় রাখিব বুঝিতে নাহিক পারি,—
এ যে সেরা সম্পদ ভাই!
বলো রাজার বিত্তে ভরে কি চিত্ত? এর কাছে যায় হারি',—
ফুল অতুলন ধন তাই?
মোর ফলের কামনা নাহি কভু মনে;—শুধু গোটা কয় ফুল
মোরে ভালবেসে দিল বিধি;
যদি ফুল চেয়ে কভু ভুল করে থাকি,—ভালো সেই মোর ভুল,—
সে যে গো পরম নিধি।
হায় ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করি বটে, তবু—তবু আমি ধনী!
মোর আর বলো কিবা চাই?
ফুল হতে বেশী ফলে আশা যার ধনী তারে নাহি গণি,—
আজ এ কথা জানায়ে যাই!



জীবনের বাণী

উপানন্দ

মানুষের জীবন বহু ঘটনার সমষ্টি। প্রতিদিন মানুষকে নানারকম প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। আর নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি, দ্বন্দ্ব সমস্যা। আশা-আশঙ্কা, দুঃখ সুখের মধ্যে এসে নিজেকে বুঝে চলতে হয়-একটু হিসাবের ভুল হোলে, আচার ও আচরণে গোলযোগ ঘটলে শেষে বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'বে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, অল্প হোলেও বহু সময়ে এমন সব ঘটনা ঘটে, যা থেকে বিপর্য্যয় আসে। এই সব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ভিতর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সংযম ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এজন্য মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে চরিত্র গঠন দরকার।

/ কথা হিসেব করে বলতে হয়। একবার কথা মুখ থেকে বেরিয়ে এলে তাকে আর ফিরিয়ে এনে অন্তরে প্রবেশ করানো যায় না। কথা যেখানে ক্রোধের উদ্রেক করে, সেখানকার আবহাওয়া ভয়ানক উষ্ণ হয়ে ওঠে, যে কোন রকমের অশুভ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কটু কথা বলা এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত গর্হিত। একটু ক্রোধ, একটু অপ্রিয় কথাই-একটা সোনার সংসার ধ্বংস করে ফেলতে পারে, একটা দেশ শ্মশান করে দিতে পারে, একটা জাতিকে সঙ্কট-দুর্য্যোগের মধ্যে টেনে এনে অস্তিত্ব লোপের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, সামান্য কথা থেকেই তো যুদ্ধ বাধে। মামলা মোকর্দ্দমায় মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়। দুর্য্যোধনের একটি কথা থেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটেছিল, আর ধ্বংস হয়েছিল কুরুবংশ। কর্কশভাষী মানুষ লোকের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পায় না, ঘৃণার পাত্র হয়।

যন্ত্রে যেমন তেল না দিলে ঠিক মত সে চলে না, মানুষের জীবন যন্ত্র ও সদ্গুণের তেল না পেলে বিকল হয়ে যায়। শিষ্টাচার আর সদ্ব্যবহারই হচ্ছে জীবনযন্ত্র পরিচালনার পক্ষে উত্তম ধরণের তেল, এ তেল সর্ব্বদাই মজুত রাখতে হয়। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকলে তার উপর বাতাস দিলে, অগ্নি কাণ্ডে সমস্তই ভস্মীভূত হোয়ে যেতে পারে। মানুষ খুব রেগে গেলে, তার ওপর পাল্টা রাগ প্রকাশ করলে, অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। তাই সকল দেশের সকল যুগের সকল জাতির ঋষি, দার্শনিক, আর পণ্ডিতেরা কেবলই বলে আসছেন—'রাগ সংযত করো যদি জীবনে শান্তি পেতে চাও'। এঁদের মত হচ্ছে—কেউ আঘাত করলে, পাল্টা আঘাত করে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করো না, বরং শিষ্টাচার দেখিয়ে তাকে আক্কেল দিও—' এজন্যই চরিত্র গঠন দরকার। কেননা বিপদাপদেই চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। একটি মাত্র দীপ থেকে যেমন অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে অসংখ্য স্থানের অন্ধকার দূরীভূত করে, তেমনি একটি ব্যক্তি ক্রোধোন্মত্ত না হয়ে যদি তপোবনের মত শান্ত সৌম্য থাকে, তাহোলে তার সুবিমল চরিত্র সহস্র সহস্র মানুষের চরিত্র নির্ম্মল করে থাকে। জগতে বড় হোতে হোলে জীবের প্রতি প্রেম, আর ভগবানের প্রতি অনুরাগ দরকার। এই দুইটী গুণের সম্যক বিকাশ না হোলে ধর্ম্ম-জীবনও অপূর্ণ থাকে। সংসারেও কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায় না।

প্রিয়ভাষিতাই মানুষের মহৎ গুণ, আর ক্রোধপরতন্ত্রতা অসদ্গুণ। যে সংসারে পিতামাতা সর্ব্বদাই বিরক্ত ও ক্রোধী, সে সংসারের ছেলেমেয়েরাও স্থির, শান্ত ও প্রফুল্ল হয় না, তারাও পিতামাতার অসদ্গুণগুলি নিয়ে নিজেদের সংসারে আগুন জ্বালায়। যে পরিবারে সর্ব্বদাই কলহ বিবাদ আর অশান্তি দেখা যায়, সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের মানুষ হওয়া সুসাধ্য নয়। ছেলে বেলায় মানসক্ষেত্রে যে সব অসৎ গুণের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারাই যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় কাঁটাগাছে পরিণত হয়ে সমস্ত হৃদয়ভূমি অধিকার করে বসে। সৎ স্বভাব বা অসৎ অভ্যাস, সৎকাজ বা অসৎকাজ মানুষের জীবনে ভালো মন্দ অবস্থা আনে, ফলে কারো জীবন মহিমান্বিত হয়ে ওঠে,

ইহলোক ও লোকান্তরে অমরত্ব লাভ করে, আর কারো জীবন যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ ইহলোকেই দুর্বিবহ যাতনায় ছট্‌ফট করে। এ জীবন যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় এই কামনাই সকলে করে থাকে। অতএব তোমরা ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত হ'য়ে ভদ্র জীবনযাপন কর্‌বার, চেষ্টা কর্‌বে। ক্রোধ পরিত্যাগ কর্‌বে, দুর্জ্জনকে পরিহার করবে আর নম্র স্বভাবের হ'বে। আড়ম্বরশূন্য জীবন আর উচ্চচিন্তা নিয়ে সংসারে চল্‌বার অভ্যাস করবে।

জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য—মহত্তম আদর্শ। আদর্শ ভিন্ন জীবনে সুখ ও উন্নতি অসম্ভব। কর্ত্তব্যসাধনই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা। তোমরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হয়ে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্ভীক হৃদয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করবে। প্রতিবেশী অপেক্ষা পিতা মাতার প্রতি, বিদেশীয় অপেক্ষা স্বদেশীয়দের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে তোমরা অধিকতর বাধ্য। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার প্রভৃতি কাজ আমাদের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এটা পালন করা না করা আমাদের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। যা সাধ্যায়ত্ত তাই আমরা কর্‌তে বাধ্য। নিজের শক্তি অতিক্রম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারসাধন সন্তরণপটু ব্যক্তির পক্ষে যে রকম কর্ত্তব্য, সন্তরণানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ নয়। নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তিগণের অভাব-মোচন করা ধনীর পক্ষে যেরূপ কর্ত্তব্য, নির্ধনের পক্ষে সেরূপ নয়। তজ্জন্যই যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জগদীশ্বর' যাকে যে পরিমাণ বিদ্যাবুদ্ধি বা ধন সম্পত্তি দিয়েছেন, তার দায়িত্ব ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন।

যার মধ্যে কাম, লোভ, ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রবল, সে কখন স্থির-ধীর হোতে পারে না, তার পক্ষে শান্তি পাওয়া অসম্ভব। এজন্য মনকে সংযত করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাবে। লেখাপড়াই তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এদিকে তোমরা প্রত্যেকে অবহিত হবে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ সহজসাধ্য নয়, বহু কঠোর সংগ্রাম করে তবে এটা লাভ করা যায়। অসৎ সংসর্গে যারা জীবন যাপন করে, তারা মনুষ্যত্ব লাভ করে না, বর্ব্বর হ'য়ে সমাজের বহু অনিষ্ট সাধন করে। ছেলেবেলা থেকে সংসর্গ দোষ ঘটলে তার সংশোধন করা কঠিন হ'য়ে ওঠে। যে সব অপরাধ আমাদের চারিদিকে ঘট্‌তে দেখা যায়, বাল্যকাল থেকে সংসর্গ দোষের ফলেই সেগুলির উদ্ভব হয়। মন্দ বালকবালিকারাই ভবিষ্যতে মন্দ নরনারী হয়ে সমাজের বহু ক্ষতি করে। তোমরা কখন মন্দ ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশ্‌বে না, একবার মিশ্‌তে সুরু করলে আর কখন এদের প্রভাব এড়াতে পারবে না। শেষে নিজেদের সমস্ত উচ্চ আশা আকাঙ্খা, বিদ্যাশিক্ষা আর উন্নত জীবন যাত্রার পথ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

যদি তোমাদের কেউ ভালো না বাসে, তাহোলে বুঝ্‌তে হবে কোথাও তোমাদের দোষ ঘটেছে। সেই সব দোষ সংশোধন করবার চেষ্টা করবে। স্নেহ ভালোবাসায় যথেষ্ট মূল্য আছে। জীবনে যে ব্যক্তি কখন স্নেহ ভালোবাসা পেলো না' সে প্রকৃত পক্ষে হতভাগ্য। স্বেচ্ছাচারী লোকেরাই মানুষের স্নেহ ভালোবাসা পায় না। স্বেচ্ছাচারদমন করতে হোলে কোন আদর্শবান ব্যক্তি বা পিতামাতা গুরুজনবর্গের আদেশানুসারে চল্‌তে হয়, যেমন চলে সৈন্যরা সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ মান্য করে। এ পৃথিবীতে স্বর্গ ও নরক দুই-ই আছে। যদি অপকর্ম্ম করো তাহোলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে, দুঃখেকষ্টে চোখের জল ফেলে দিনগুলি কাটাতে হবে, আর যদি সৎকাজ করো, তাহোলে পাবে স্বর্গসুখ। অলস কর্ম্মকুণ্ঠ মানুষ কোন দিনই সুখী হোতে পারে না। তোমরা এই সব কথা অনুধাবন করে নিজেদের-সুন্দর জীবন গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে।

কাল্‌টা কুকুর

সতীন্দ্রনাথ লাহা

কুকুর পোষা আমাদের বাড়ীতে কোন দিনই রেওয়াজ ছিল না আজও নেই। বাবার শুচি বাই-ই এর আসল কারণ। বাড়ীতে তিন চারটে পাখী আছে। এ নিয়ে কোন দিনই তিনি আপত্তি করেন নি। খাঁচায় পোষা পাখীদের তো ছোঁয়াছুঁয়ি করার কোন সুযোগ নেই।

পায়রাও তো পাখী,—তা'র বেলা কিন্তু অন্য নিয়ম, সে তো আর টিয়া চন্দনার মত খাঁচা বা দাঁড়ে থাকে না।—পায়ের কাছে এসে যখন ঘুর ঘুর করবে,—তখন?—তাই পায়রা পোষাও বারণ।

এ হেন শুচিবেয়ে বাড়ীতে বছর খানেকের জন্য একটা কুকুর পুষেছিলাম—বললে ভুল বলা হবে, পুষেছিল আমাদের ড্রাইভার। নাড়া-ঘাঁটা করতে করতে আমারও খানিকটা তার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল।

কয়েক যুগ আগেকার কথা, তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি, কিন্তু এখনও বেশ মনে আছে আমার। বন্ধু সুনীলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম পাতিপুকুরে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন বাড়ী ফিরছি, দেখি আমাদের গাড়ীর সামনের সীটএ একটা কালো কুকুর-বাচ্ছা ঝাড়নের ওপর বসান আছে। এতটুকু বাচ্ছা। দেড় বিঘতের বেশী হবে না, নিশ্চিন্ত মনে পিট্‌ পিট্‌ করে চাইছে।

—এটা আবার কি করে এখানে এলো? কুকুর-ছানা আবার কার জন্যে নিলে?—

—আমি ওটাকে পুষবো দাদাবাবু! একটু বড় হলে ওই কেমন পাহারা দেবে। যা' চোরের উপদ্রব বেড়েছে বাগানে—এই গত মাসে সন্ধে বেলা ম্যাগনোলিয়া গাছের ডালে একটা ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি কাপড় খানা হাওয়া হয়ে গেছে। আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না সেটার। এর আগেও ঘটি বাটি কয়েকটা চুরি গেছে। একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। এই দুর্দিনে আমার মত গরীবের যদি……

পরপর আরো কয়েকটা জিনিষ চুরির ফিরিস্তি দিয়ে বুঝিয়েছিল—কুকুর পোষা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

বাগানের কোণটায় গ্যারেজ বাড়ীতে ছেলে বৌ নিয়ে তাকেই আলাদা থাকতে হয়।

—কর্ত্তাবাবু আবার তোমার কুকুর বাচ্ছাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলে হয়। আমাদের বাড়ীতে যে কুকুর পোষার রেওয়াজ নেই, তা তো তুমি জান। কেউ কোন দিন পোষেও নি। পছন্দও করে না। ভাল কুকুর হলে তবুও না হয় একটা কথা ছিল, এটা আবার লেড়ি কুত্তা, দেখলেই তো গা ঘিন্ ঘিন্ করে।......

যা' হোক কুকুর তো গাড়ী চড়ে পাতিপুকুর থেকে আমাদের বাড়ীতে এলো।'

বাবা বিশেষ কোন আপত্তি করেন নি, কারণ ড্রাইভারের এলাকা বাড়ীর বাইরে—বাগানের এক কোণে। বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে।

বাবার কড়া হুকুম ছিল,—কুকুর যেন বাড়ীর মধ্যে কখন না ঢোকে। বাগানের এক কোণে থাকবে থাকুক, তা'তে কোন আপত্তির কারণ নেই।—বাড়ী ঢুকে ছোঁয়াছুঁয়ি না করলেই হল।

কিন্তু ঐ কুকুর এক পা এক পা করে যে বাড়ীর মধ্যে একদিন পা বাড়াবে—তখন তাঁর সে হুঁস্ ছিল না।



ড্রাইভার বললে—দাদাবাবু, কুকুরটা একেবারে লেড়ি কুত্তা নয়। এর বাপের বংশ উঁচু। খাস্ বিলিতি। দেখুন না—কান দুটো ঝোলা আর গলার আওয়াজ থেকেও বুঝতে পারা যায় এটা উঁচু জাতের।

ভাবলাম তা হতেও পারে। আমি আর কুকুর সম্বন্ধে জানব কি করে। কখনও তো কুকুর পুষিনি। ড্রাইভারকে বললাম,—গলায় নারকেল দড়ি বেঁধে রেখেছ কেন? পুষতে হয় তো ভাল ভাবেই পুষো।

ওর জন্যে একটা বগ্‌লস্ আর একটা চেন কিনে দিন না দাদাবাবু! আমি আর কোথায় পাব। সামান্য পাঁচ ছ'টাকা লাগবে।

আমার ট্যাঁক্ তো গড়ের মাঠ। টাকা কোথায় পাব! যা' দরকার তা' পেতাম। টাকা কখন হাতে পাইনি। শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে বলেছিলাম একটা চেন কিনে দেবার জন্যে, এবং তা' তিনি দিয়েছিলেন।

কুকুরের চেন্ হোল। পিঠ্ঢাকা গরম জামা হোল। শোবার চট হোল, আর খাবার ডিস্ এলো।

নাম দেওয়া হোল্ কাল্টা। কুকুরের খরচা বাবদ ড্রাইভারের মাইনে আরো পাঁচ টাকা বেড়ে গেল।

বাবার চোখের আড়ালে বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ওটাকে নিয়ে নাড়াঘাঁটা আরম্ভ করে দিলে।

কেউ ভাঁড়ে করে একটু চা খাইয়ে গেল। কেউ দিলে এক টুকরো একটু বিস্কুট, কেউ দুটি মুড়ি। এমনি আরো কত কি। কেউ না কেউ কুকুরের কাছে ঠিক হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে সব সময়।

আস্তে আস্তে বাগানের কোণ থেকে কুকুর সদর দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে। বাড়ীর ভিতরে ঢোকাটুকু এখনও বাকি। কিন্তু, আর বোধ হয় বেশী দেরী নেই।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কুকুরটা কিন্তু কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে আপনা থেকে ঢোকেনি। ঢুকলে কি কেউ ওর গলায় ছুরি বসিয়ে দিত··· না ড্রাইভারের চাকরি যেতো। কেমন যেন আপনা থেকে টের পেয়েছিল ওর বাড়ী ঢোকা কেউ পছন্দ করবে না। গলার 'চেন' ধরে বাড়ীর মধ্যে আনবার চেষ্টা করলেও আসতে চাইত না। বাচ্ছা হলে কি হবে, বুদ্ধি ছিল পেটে পেটে।

আমাকে দেখলেই ল্যাজ্ নেড়ে সামনের পা দু'টো উঁচু দিকে তুলে কিঁউ কিঁউ করে ডাকত। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তবে ঠাণ্ডা।

কার সঙ্গে কথা বললে আপনা থেকেই চুপ করে থাকত, আর পিট্ পিট্ করে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতো। কথা বলার লোক চলে গেলেই আবার ল্যাজ্ নেড়ে কুঁই কুঁই করে এগিয়ে আসতো। আদর পাবার জন্যে।

হয়ত স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেছি, কাল্টাও তক্ষুণি আমার কাছে এসে হাজির। যেই সদর দরজায় পা দিয়েছি কাল্টা থেমে গেল। আর এগলো না। আমিও কখন বাড়ীর ভেতরে নিয়ে আসিনি ওকে-বাবার ভয়ে। যেটুকু নাড়া-ঘাঁটা করতে পারছি কুকুর নিয়ে—তাও হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। যা চাই তা তো পাবার উপায় নেই। ওর লুটোপুটি লাফালাফি আমার বেশ লাগতো। ওকে বল নিয়ে খেলা করতে শিখিয়েছিলাম। বুকবাঁধা একটা ভাল ট্রেপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম বাবাকে বলে। দু'বেলা ওর খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখ্তাম। লুকিয়ে

লুকিয়ে আমার বিস্কুট ওকে দিতাম। ওকে নিয়ে রাস্তায় আরো পাঁচ জনের মত আমারও বেড়াতে ইচ্ছে হোত। কিন্তু উপায় নেই। বাগানে খানিকটা ওর সঙ্গে খেলা করেই ক্ষান্ত থাকতে হোত। বাবা দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না কাল্টাকে।—জানোয়ার নিয়ে অত মাতামাতি করতে নেই।—কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে। একদিন ঘটলোও তাই।

মাঘ মাস। বামুন বাড়ীতে পৈতের নিমন্ত্রণে যেতে হবে আমাকে। আমারই সহপাঠীর উপনয়ণ। যথারীতি সাজ গোজ সারা হোল। নিজের ইচ্ছা মত আমাদের সাজা চলত না। বাড়ীতে যেমন ভাবে বলে দেবেন, সেই ভাবেই আমাদের সাজতে হোত। কোন রকম আপত্তি করা বেআইনী।

ধুতি পাঞ্জাবী পরে বুড়োদের মত আমাদেরও পাটকরা জরির চাদর নিতে হোত কাঁধে। সোনার একটা "মফ্‌চেন" গলায় ঝোলাতে হোত। পায়ে থাক্‌ত পাম্পস্ জুতো। বাকীটা এখনকারই মত।

শীতকাল বলে চাদরের বদলে কাঁধে ঝোলাতে হয়েছিল একটা চওড়া পাল্লা ওয়ালা হাসিয়া শাল। তার পাল্লা দুটো দেড় হাত করে চওড়া, আর কল্‌কাগুলোও এক বিঘতের বেশী লম্বা। সে কালে এক ছোটে নিমন্ত্রণ যাওয়া নাকি বেমানান ছিল। বখাটে ছেলের লক্ষণ।

যাক্ ধড়া চুড়ো বেঁধে যখন নিমন্ত্রণে বেরোচ্ছি হঠাৎ কাল্টা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়ের ওপর। লুটোপুটি খেতে লাগল নানান কায়দা করে। কখন দশ হাত এদিকে চলে যাচ্ছে, কখন দশ হাত ওদিকে চলে যাচ্ছে। এতটা আহ্লাদ ওর আগে কখন দেখিনি। দেখলাম আদর ঘুষ না নিয়ে ছাড়বে না। তাড়াতাড়ির মুখে আবার ঝঞ্ঝাট বাধালে। দু'মিনিটের জন্তে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাঞ্জাবীর পকেট শুঁকতে লাগল,—বিস্কুট আছে কি না।

যখন দেখ্‌লে বিস্কুট নেই, তখন শালের কলকা নিয়ে খেলা সুরু করে দিলে।

পাল্লাটা একটু নাবিয়ে দিলাম। দু'পা উঁচু দিকে তুলে বেশ খেলা দেখাচ্ছে। কী যে হোল তার। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক কামড়ে দিলে খানিকটা ফাঁস্ করে ছিঁড়ে। নিমন্ত্রণ যাওয়া তখন ত আমার মাথায় উঠে গেছে। এই শাল ছেঁড়ার জন্তে কম বকুনি কি খেতে হবে বাবার কাছ থেকে! এইটি নাকি বাবার সব চেয়ে প্রিয় শাল। কত বলে কয়ে তবে আজকের মত কাঁধে ঝোলাবার হুকুম পেয়েছিলাম।

সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? কি কৈফিয়ৎ দেব বাবাকে?

আমারও মাথায় কি রকম যেন খুন চেপে গেল। এক মিনিটে সমস্ত দরদ উবে গেল। আমাকে কি কম কথা শুন্‌তে হবে? ওর আর কী! পাম্প্‌স্ জুতো খুলে মারলাম কাল্টার মাথায়, তারও মাথা খানিকটা কেটে গেল। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

মনে মনে ভাবলাম—বেশ হয়েছে, যেমন আমার শাল ছিঁড়তে আসা। হারামজাদা আদর পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে। সাধে বলে কুকুর কে লাই দিতে নেই।

কাল্টা আছড়ে পড়ল মাটিতে। তারপর কুঁই কুঁই করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল গ্যারেজ বাড়ীর দিকে।

রাগ কি শুধু ওর ওপরে হয়েছিল।

ড্রাইভারকেও বলেছিলাম,—কেন এনেছ এই জানোয়ারটাকে বাড়ীর মধ্যে। জানোয়ারের কি কোন বুদ্ধি সুদ্ধি আছে? যদি কামড়ে দিতো—তা' হলে?

এই সব ঝুট ঝামেলায় আমার খানিকটা দেরী হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। নটার মধ্যেই বাড়ী ফিরতে হবে। ছেঁড়া শাল ঘুরিয়ে পাট্ করে কাঁধে ফেলে নিমন্ত্রণ খেতে চলে গেলাম। শাল বদ্‌লাতে গেলে হয়ত নিমন্ত্রণ যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। কত বলে কয়ে তবে এই নিমন্ত্রণে যাবার হুকুম পেয়েছি।

পরদিন সকালে লেখা পড়া শেষ হতেই খুব খানিকটা গালাগাল শুনতে হল বাবার কাছ থেকে।

হাজার বার বলেছি কুকুর ছোঁয়াছুঁয়ি আমি পছন্দ করিনে—কেন যাও কুকুর নিয়ে খেলা করতে? গেল ত দামী শালটা? বুদ্ধি বিবেচনা আর কবে হবে—

একটানা বকে চলেছেন বাবা, আর পুতুলের মত দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে সব হজম করে যাচ্ছি। আমার মুখ থেকে একটি কথা বেরুলেই ত তিনি ফেটে পড়বেন।

কাল্টার কাছে দাঁড়ান আমার চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। কোন দিন কোন কারণে যেন কুকুরকে আদর করতে না যাই।—সব দোষ যেন আমারই।

কাকা এসে বাবার সামনে থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন। তা'না হলে আমাকে আরো ঘণ্টা খানেক শাস্তি পেতে হোত।

স্কুল যাবার মুখে একবার আড় চোখে দেখলাম কাল্টা কোথা? ত্রি-সীমানায় কাল্টার কোন সাড়া শব্দ নেই। হয়ত তার ছাড়া থাকা বরাবরের জন্তে বন্ধ হয়ে গেছে। কাল্টার মাথায় কতটা কেটেছে তাও একবার দেখতে পেলাম না।

রাত্তিরের রাগ সকালে মিলিয়ে গেছে। মনে হল জুতো ছুঁড়ে মাথায় না মারলেই হোত। শাল ছেঁড়াতে যে আমাকে বকুনি খেতে হবে তা' ও কি করে জানবে?—দোষ তো আমারই। আমিই ত শালের কল্‌কা দুলিয়ে ওর সঙ্গে খেলা করছিলাম। সেজে গুজে ওর সামনে না দাঁড়ালেই হোত। কুকুর যে আহ্লাদে ঝাঁপাঝাঁপি করে তা' তো আমার অজানা নয়।

স্কুল ছুটি হতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এলাম। কাল্টাকে জুতো মারার পর থেকে একটি বারও দেখিনি। তার কাছে আমার আর যাবার উপায় নেই। আদর করা তো দূরের কথা। একে ওকে বলে একটু আইডিনের ব্যবস্থাও তো করতে পারি। গাঁদা গাছ তো

বাগানেই আছে—এ ব্যাপারে গাঁদা পাতার রসও কাজে লাগে—কেউ না কেউ নিশ্চয় ওর মাথায় গাঁদা পাতার রস লাগিয়ে দেবে—

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে পৌঁছতেই বুঝতে পারলাম, কাল্টাকে দুপুরবেলা বাড়ী থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। শিবু মালী খালপারে ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। ড্রাইভারের কুকুর পোষা বরাবরের জন্যে বারণ হয়ে গেছে। তার নিজের এক্তিয়ারে কুকুর রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সে কুকুর বাড়ীর সদর দরজা অবধি আসবে কেন? বাগানের কোণে গিয়ে তো দাদাবাবু কুকুর নিয়ে খেলা করতে যায়নি—

মনটা খিঁচড়ে গেলেও মুখে বলেছিলাম—যাক্ যা হয়েছে বেশ হয়েছে।

এখান থেকে কাল্টাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে আমার দিকে কেউ চেয়ে দেখলে আমার অস্বস্তি বোধ হোত। কোন সহানুভূতিতে আমার দরকার নেই। আমার দুঃখ আমার—কাউকে তো ভাগ নিতে বলিনি!

বাগানে একটু দাঁড়াতেই ড্রাইভার এসে বললে—দাদাবাবু, আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, ওটা একেবারে লেড়ি কুত্তার বাচ্ছা। কোনদিনই ও পোষ মানতো না—গেছে ভালই হয়েছে—এবার একটা জাত কুকুরের বাচ্ছা নিয়ে আসবো। ততদিনে বড়বাবুর রাগ পড়ে যাবে—আমার কি দোষ বলুন! বাগানের কোণেই তো ওটাকে বেঁধে রাখতাম—পাঁচজনের বলাতেই ওটাকে ছাড়া রাখতে হোত।

—বড়বাবুর অত দামী শালটা……

—থাক থাক যা' হয়েছে, হয়েছে, এখন এখান থেকে যাও।

কাল্টার কথা কার মুখে শুনলেই আমার রাগ এসে পড়তো। কারও মুখে কাল্টার সম্বন্ধে একটি কথাও আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমি বেশ টের পেয়েছিলাম কাল্টার জন্যে কারও এতটুকু দরদ নেই। কাল্টা গেছে, সকলে বেঁচেছে। সকলে হাসছে, খেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে—এমন কি যার কুকুর সে পর্য্যন্ত। খালপারে না ফেলে দিয়ে আর কারও বাড়ীতেও তো দিয়ে আসতে পারতো। পাতিপুকুরে যার কাছ থেকে এনেছিল, তা'কেও তো ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারতো।

মাষ্টারমশাই বাড়ী ফেরার মুখে রাত্তির বেলা বাবাকে জানিয়ে গেলেন—দু'দিন ধরে আমার নাকি পড়াতে মোটেই মন নেই। বই খুলে চুপচাপ বসে থাকি—তিনি যা' বলে যান একবর্ণও নাকি আমার কানে ঢোকে না—ইত্যাদি—।

শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে নতি স্বীকার করে আমাকে বলতে হয়েছিল—তোর জন্যে একটা এ্যালসেসিয়ানের বাচ্ছা আনবার ব্যবস্থা হয়েছে—সপ্তাহখানেকের মধ্যে এসে যাবে—খুব ভাল জাতের বিলিতি কুকুর।

আমি বাবাকে বলেছিলাম—আমার কুকুর পোষার ইচ্ছা নেই—কুকুর পুষতে আমার ভাল লাগে না—কুকুর আনতে মানা করে দিন।

কাল্টাই যখন আর ফিরবে না তখন অন্য কুকুরে আমার দরকার নেই—হোক সে একশো টাকা দামের বিলিতি কুকুর-বাচ্ছা।



দু'দিনের মধ্যে শালকরের দোকান থেকে পাল্লাদার শাল মেরামতি হয়ে ফিরে এলো। কেউ বুঝতেও পারবে না শালটার কোথাও ছেঁড়া ছিল কিনা। যা' ছিল, তার চেয়ে এখন যেন বেশী চক্‌চকে হয়ে গেছে।

আর কাল্টার! তার মাথা কেটে যাওয়াতে তো কোন ব্যবস্থা হোল না। গাঁদা পাতা চোটকেও কেউ মাথায় একটু লাগিয়ে দেয়নি। কাজের ছুতো করে কেউ ত একবার খালপারটা ঘুরে এলো না। প্রতিদিন যাকে দুবেলা খেতে দেওয়া হয়েছে, সে আজ দুদিন না খেয়ে মরলো কি বাঁচলো সে খবরও ত কেউ রাখে না। যে ওর কাছ থেকে দরোয়ানী কাজ আদায় করতে চেয়েছিল সেও তো ওর এতটুকু খবর রাখে না। যা'ক, কাল্টা মরেছে—এরা তো বেঁচেছে।

তিনদিনের দিন প্রতিদিনের মত রাত্তিরে পড়াশুনা শেষ করে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। নতুনীও শুতো আমাদের ঘরে। আমার তিন বছর বয়স থেকে সেই আমাকে মানুষ করেছে। আমাদের খাটের পাশে মেঝেতে তার ছোট্ট বিছানা গোটান থাকত। আমাদের মশারী ফেলে দিয়ে সে চলে যেতো খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে। খানিকক্ষণ পরে সে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তো।

চোখে ঘুম ছিল না আমার। খাটে এপাশ ওপাশ করতে দেখে নতুনী বললে—রাত এগারটা বাজল, চোখে তোর ঘুম নেই কেন? চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শো', পিঠটা চুলকে দিই।

পাশ ফিরে শুলাম। খাটে বসে নতুনী পিঠ চুলকে দিতে লাগলো। কোন কিছু ওর কাছে লুকোনো মুস্কিল। আপনা থেকেই ও সব টের পেয়ে যেতো! রাত্রে কেন যে চোখে ঘুম নেই তা' ও জানতো। আমার কোন জিনিষটি কখন দরকার তা' ও মুখ দেখেই বুঝতে পারতো। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঠিক সেই জিনিষটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে আমাকে দিত। মনের খবর কেনই বা জানবে না। আমার তিন বছর বয়স থেকে ওই তো আমাকে এত বড় করেছে।

পিঠ চুলকোতে চুলকোতে নতুনী বল্লে—সামান্য একটা কুকুরের জন্য মন খারাপ করে না, চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা কর। কাল সকাল বেলা কাজ সেরে খালপার গিয়ে কাল্টাকে আমি ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবো। কিচ্ছু ভাবিস নে তুই।

চাপা কান্নায় আমার' তখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওর কথার কোন উত্তর দিতে পারিনি।

নতুনী আরো বলেছিল—বাবু তো কোন দিনই তোদের সখ আহ্লাদের দিকে নজর দিতে পারলে না—চির দিন নিজের শুচিবাই নিয়েই মত্ত। দেখতে পাচ্ছে ছেলেটা মন-মরা হয়ে আছে ভোরশু থেকে, তবুও তার কোন ব্যবস্থা নেই। আচ্ছা লোক যা' হোক—ঢের ঢের দেখেছি, বাপের জন্মে এমন দেখিনি কখনো।

কোন সাড়া না দিয়েই চুপ করে রইলাম। নতুনীও মশারী ফেলে দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঢং ঢং করে ঘড়িতে বাজলো বারোটা।

হয়ত খানিকটা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম……তা না হলে মাঝ রাত্রে হঠাৎ চমকে ধড়মড় করে 'খাটের' উপর উঠে বসলাম কেন?

ঠিক শুনতে পেলাম—ফটকের ধারে কুঁই কুঁই করে কাল্টা কাঁদছে। দারোয়ান ফটক খুলে দেয়নি।

নতুনীকে ডাকলাম—নতুনী, নতুনী! ওঠ, কাল্টা এসেছে—ঐ শোন কাল্টা কাঁদছে ফটকের কাছে। চুপি চুপি গিয়ে দরোয়ানকে বল, ফটকটা খুলে দেবে।

নতুনী উঠলো। ছাদের দরজা খুললে। ছাদ থেকেই ফটক নজরে পড়বে। ঐ খানে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারবে কাল্টা এলো কি না।

মিনিট পাঁচ পরে ছাদের দরজা বন্ধ করে নতুনী ঘরে ফিরে এলো। নিজের বিছানায় শুয়ে বললে—কোথায় কাল্টা! বাচ্চা কুকুর কখন এতটা পথ চিনে আসতে পারে! ও ফুটপাতে একটা হলদে কুকুর-ছানা চেঁচাচ্ছে। শুয়ে পড়……কাল সকালে আমি ঠিক খালধার থেকে নিয়ে আসব। ভাবিস নে।

নতুনী শুয়ে শুয়ে আপন মনে গজরাতে লাগল—এমন কুকুর কুকু বাইও দেখিনি কারো। কুকুর দেখলে বাপকে সাবান দিয়ে চোখ ধুতে হয়, আর ছেলের সারা রাত ঘুম নেই কুকুরের জন্যে……মরণ হয়েছে আমার!

রাত্তিরে বাচ্চা কুকুর ডাকলেই আমার মনে হোত কাল্টা ফিরে এলো। প্রতিবারই নতুনী দাবড়ানি দিয়ে আমাকে ঘুমোতে বলেছে আর বুঝিয়েছে—ও রাস্তার কুকুর চেঁচাচ্ছে। কাল্টা নয়।

সেদিন রাত্তিরে ভাল ঘুম না হওয়াতে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। একটু বেলা অবধি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নতুনীও আমাকে ডেকে দেয় নি।

সকাল সাতটা নাগাদ বিকট চেঁচামেচি শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম চোখেই আমি বারবাড়ীতে ছুটে নেমে এলাম।

সদর দরজার সামনে উঁচু দিকে মুখ করে নতুনী চেঁচাচ্ছে'—ছেলের মন আগে, না শুচিবাই আগে? তিন দিন ধরে ছেলেটা সারা রাত্তির চোখের জল ফেলছে। সেদিকে কি কা'র হুঁস নেই? কুকুর নিয়ে খেলা করতো, এই ছেলের দোষ—বলি তা'তে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বলা নেই কওয়া নেই ধাঁ করে কুকুরটাকে খালপারে পাঠিয়ে দিলে!

নতুনীর সঙ্গে ঝগড়া চলেছে বাবার। নতুনী সদর দরজায় আর বাবা বার-বাড়ীর দোতলার বারান্দায়। নতুনীর কথার কোন জবাব না দিয়ে বাবা এক মনে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন।

বাড়ীর চাকর দরোয়ানেরাও জটলা করছে সদর দরজার পাশে-বাগানের দিকে—যেখানে দাঁড়ালে বাবার নজর পড়বে না।

গোলমাল শুনে আমিও হাজির হলাম সদর দরজার কাছে।

সামনেই উঁচু হয়ে বসে আছে কাল্টা। আমাকে দেখেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। ভুঁইএ মুখ ঠেকিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। এই তিন দিনেই খুব নিস্তেজ আর রোগা হয়ে গেছে কাল্টা। মাথায় দগ্‌দগে ঘা। গাময় ধুলো কাদা। পিঠে হাত বুলোতেই দু একবার অদ্ভুত আওয়াজ করল।

উপর থেকে বাবার গলার গম্ভীর আওয়াজ এলো, আজ থেকে ও দক্ষিণের বারান্দার কোণটায় থাকবে। খানিকটা নতুন চট আর একটা কলাই করা ডিস্ যেন আনিয়ে রাখা হয়।

নতুনী চেঁচামেচি বন্ধ করে কখন যে অন্দরের দিকে চলে গেছে টের পাইনি। দরোয়ান চাকররাও এক এক করে যে যার কাজে চলে গেল।

শিবু মালী কাল্টাকে কোলে ক'রে দক্ষিণের বারান্দায় নিয়ে এলো।

কাল্টার জন্যে যা যা দরকার সবই তখুনি আনান হোল। বাবা দোতালা থেকে গামছা পরে নীচে নেমে এলেন আমাদের কাছে। সকালের মাষ্টারমশাই এসে ফিরে গেলেন। আর সে দিন সকালে আমাকে পড়তে হয় নি।

বৈকালের দিকে ভেটারিনারি কলেজের পরেশ ডাক্তার এলেন কাল্টার জন্যে। মাথায় লাগাবার মলম ও খাবার জন্যে একটা ওষুধ লিখে দিয়ে গেলেন।

ওষুধ দু'টো তক্ষুণি সামনের ডাক্তারখানা থেকে আনান হোল। মলমটা লাগিয়ে দেওয়া হোল কাল্টার মাথায়। খাওয়ার ওষুধ-টা কাল্টা খেলো না। কিছুতেই ওকে খাওয়ান গেল না।

ওষুধ খাওয়ান দূরের কথা……এক টুকরো দুধ-রুটিও তাকে খাওয়াতে পারা যায় নি।

এক দিনে কাল্টা যেন আরো অবশ হয়ে পড়লো। রোজ দুবেলা ডাক্তারবাবুর কাছে খবর পাঠান হোত। উত্তরে একবার তিনি লিখে পাঠালেন,—ভয়ের কোন কারণ নেই, আস্তে আস্তে সেরে উঠবে। দু' একদিন পরে আপনা থেকেই খাওয়া সুরু করবে। ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন, তখন হয়ত তাই-ই হবে। আমরা আর কি বুঝি এ সম্বন্ধে।

পরের দিন কাল্টা আপনা থেকে সত্যি একটু দুধ রুটি খেয়েছিল। ভাবনা থেকে রেহাই পেলাম—যাক কাল্টা খাওয়া সুরু করেছে।

শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারের কথা কিন্তু ফলেনি। সে মাত্র ঐ একবারই খেয়েছিল।

তিন দিনের দিন ভোর বেলা কাল্টার কাছে বড় বাড়ীতে নেমে এসেছি। দেখলাম কাল্টা নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুঁজে ঘুমোচ্ছে। দাঁড়িয়ে রইলাম কাল্টার পাশে। মলমটা এখনি একবার কাল্টার মাথায় লাগাতে হবে।

মলমের কৌটো নিয়ে নতুনী এসে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণের বারান্দায়। নতুনীও চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কাল্টাকে। নতুনীকে বললাম, ওষুধটা লাগিয়ে দে…কি দেখছিস ?

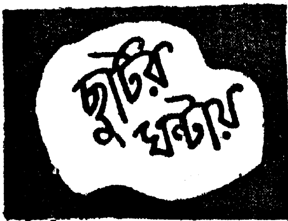
নতুনী আমাকে টেনে নিয়ে একটু সরে এসে দাঁড়াল।

শিবু মালীও কোন ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে। নতুনী শিবু মালীকে কী যেন ইসারা করে বললে। শিবু মালী ঠাকুর-ঘর থেকে ছুটে গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে এলো। ঢেলে দিলে খানিকটা কাল্টার মুখে।

নতুনী হাত ধরে টানতে টানতে বললে—এখানে আর দাঁড়াতে নেই, চল দোতালায় যাই। আমার মনটা যেন কেমন করে উঠলো। দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম কাল্টার দিকে চেয়ে।

দেখি শিবু মালী আবার একটা চটের থলে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। সেই থলেতে কাল্টাকে ভরে শিবু মালী ফটক থেকে বেরিয়ে গেল।

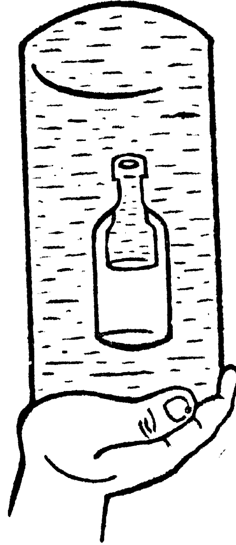
—



দেবশর্ম্মা

এবারে তোমাদের বিচিত্র একটি বিজ্ঞানের খেলার কথা বলবো। এটিও বেশ মজার খেলা! ভালো করে রপ্ত করে এ-খেলাটি তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে ঠিক মতো দেখাতে পারলে, তাঁদের বেশ তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। অথচ, এ খেলা দেখানোর জন্য সাজ-সরঞ্জাম যা প্রয়োজন, সেগুলি সংগ্রহ করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়…নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী—প্রত্যেক বাড়ীতেই অনায়াসেই এ সব জিনিষ মিলবে। বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটির নাম—'ডুবুরী-বোতল'! খেলাটি কিভাবে দেখাতে হবে এখন সেই কথাই বলি।

ডুবুরী-বোতল ঃ



পাশের ছবিতে যেমন দেখছো, তেমনি ধরণের একটি কাঁচের লম্বা 'বোয়েম্' বা 'জার্' (Jar) কিংবা চওড়া মুখ-ওয়ালা বোতল নাও… নজর রেখো, এই 'বোয়েম্' (Jar) বা বোতলটি চ্যাটালো না হয়—লম্বা, বড় এবং গোল আকারের হওয়া চাই। এবারে ঐ 'বোয়েম্' বা বোতলটিতে কাণায়-কাণায় জল ভরে নাও। 'বোয়েম' বা বোতলে জল ভর্ত্তি করার পর, ছোট একটি খালি বোতল (উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে) উল্টোমুখ করে (অর্থাৎ বোতলের মুখ থাকবে নীচের দিকে) ঐ 'বোয়েম' বা বোতলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। ছোট বোতলটিকে বড় 'বোয়েম্' বা বোতলের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফলে খানিকটা জল চোল্‌কে পড়ে যাবে এবং খালি ছোট-বোতলের মধ্যে কতকটা জল ঢুকবে—বোতলের উপরের অংশে জল ঢুকবে না—উপরের খালি অংশে থাকবে বাতাস এবং বোতলটি তখন ভাসবে 'বোয়েম' বা বড় বোতলের মধ্যে, মাঝামাঝি জায়গায়। এবারে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ঐ 'বোয়েম্' বা বড়-বোতলের মুখে বেশ 'টাইট' (Tight) করে হাত চাপা দাও। দেখবে, এভাবে হাত চাপা দেবামাত্র ছোট বোতলের উপরের দিকে ফাঁকা অংশে যে বাতাস ছিল, সে-বাতাস বেরিয়ে গিয়ে বোতলটি আগাগোড়া জলে ভরে ভারী হবে। তার ফলে ছোট বোতলটি তখন 'বোয়েম্' বা বড় বোতলের মধ্যে মাঝামাঝি না থেকে, একেবারে তলায় নেমে যাবে। আবার বোয়েমের বা বড়-বোতলের মুখ থেকে হাতের চাপ যেমনি তুলে নেবে কিম্বা আল্‌গা করবে, অমনি দেখবে, বোতলের উপর দিক থেকে বাতাস ঢুকে ছোট-বোতলের ভিতরকার জল সরিয়ে পুনরায় আগের মতো ফাঁকা জায়গাটুকু ভরে তুলবে এবং তার ফলে, ছোট বোতলটিও সঙ্গে সঙ্গে আবার 'বোয়েম্' বা বড় বোতলের মাঝামাঝি জায়গায় উঠবে। এই হাতের চাপ দেওয়া এবং

হাতের চাপ সরিয়ে নেওয়া বারবার করো—দেখবে, ছোট-বোতলটি 'বোয়েম' বা বড়-বোতলের জলের মধ্যে ওঠা-নামা করছে।

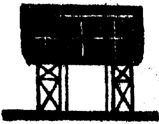
এ রকম হবার কারণ—চাপ পেলে বাতাস বেরিয়ে যায় এবং চাপ তুলে নিলে বাতাস ঢোকে। এই চাপের জন্য জলের অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না···তবে ঐ বাতাস-ভরা বোতলটিই শুধু হাতের চাপ পড়লে এবং সে চাপ সরালে জলের মধ্যে ওঠা-নামা করে। এ খেলার এই হলো রহস্য!

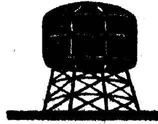
—

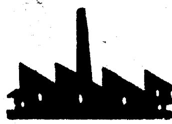
ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

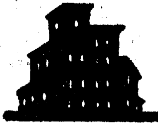
নূতন ধাঁধা


জল


গ্যাস


ইলেকট্রিক


বাড়ী


বাড়ী

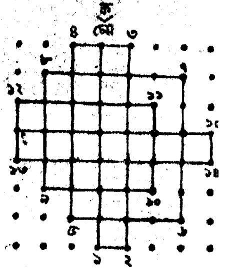

বাড়ী

উপরের ছবিতে সহরের তিনটি বাড়ী দেখছো—'ক', 'খ' আর 'গ'···বাড়ীগুলির মাথায় 'জল', 'গ্যাস' আর 'ইলেকট্রিক' সরবরাহের উৎস-কারখানা। তিনটি বাড়ীতেই জল, গ্যাস আর ইলেকট্রিক জোগানো চাই 'পাইপ' (Pipe) বা 'নল' সহযোগে। বাড়ীগুলিতে এই তিনটি জিনিষ সরবরাহের জন্য পাইপগুলি এমনভাবে বসাতে হবে যেন কোনো পাইপ না অন্য পাইপের গা স্পর্শ করে। এবারে একটি পেন্সিল নিয়ে এঁকে দেখাও দেখি, কিভাবে কারখানাগুলি থেকে পাইপগুলি প্রত্যেকটি বাড়ীতে লাগাতে হবে।

বৈশাখ মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। মোটরগাড়ীর ধাঁধার উত্তর :

মাথার ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে, কুণালবাবু কিভাবে মাত্র পনেরোটি মোড় ঘুরে মোটর চালিয়ে মোট ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। যে পথে তাঁর মোটর চলেনি, সে-পথের নিশানা-রেখা ছবিতে মুছে বাদ দেওয়া হয়েছে; এবং প্রত্যেকটি মোড় পর-পর যেমনভাবে ঘুরে মোটর চালানো হয়েছে, সেই হিসাবে উপরের ছবিতে



বিভিন্ন মোড়গুলিকে সংখ্যা চিহ্নিত করে দেখানো রয়েছে। একের পর এক, এইসব সংখ্যা অনুসরণ করে 'ক' চিহ্নিত স্থান থেকে 'মো' অর্থাৎ মোটরে চড়ে বেরিয়ে মাত্র পনেরোবার মোড় ঘুরে এবং একপথে দু'বার পরিভ্রমণ না করে, অনায়াসেই আবার 'ক' চিহ্নিত স্থানে অর্থাৎ যাত্রারম্ভের জায়গায় ফিরে আসা যাবে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালির উত্তর : আমড়া

চৈত্র মাসের "বুদ্ধির ধাঁধার" সঠিক উত্তর দিয়েছে :

১। নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি ২। উমা, দিগীন্দ্র, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধানবাদ, ৩। বাপ্পা ও পম্পা সেন কলিকাতা, ৪। সুব্রত পাকড়াশী, কানপুর ৫। অরিন্দম ও সুপ্রিয়া দাস, কৃষ্ণনগর ৬। সিদ্ধার্থশঙ্কর ঘোষ, কলিকাতা, ৭ বেণু ও রুনু চক্রবর্ত্তী জগদলপুর, ৮ তুলা ও কুন্তল চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ, ৯। বকুল ও ফুলদী মিত্র, কলিকাতা, ১০। নিখিলকুমার সাহা, বালুরঘাট, ১১। দীপ্তিতোষ, চন্দননগর, ১২। চিত্তরঞ্জন রায়, পুরুলিয়া, ১৩। রবীন্দ্রনাথ দিনুদা ও হেমন্তকুমার পুরাণশাস্ত্রী, মেদিনীপুর, ১৪। রণধীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী, কলিকাতা ১৫। স্বর্ণ, সন্তু ও খুকু, কলিকাতা, ১৬। খোকন, সন্টু, মানু, চানু রেশমী ও টোটন ধানবাদ, ১৭। সুভাষ গায়েন, মেদিনীপুর, ১৮। স্বপন দাস ইরা ও রাত্রি ঘোষ, কিষণগঞ্জ, ১৯। সুনীলকান্তি নাথ, ত্রিপুরা, ২০। লালু, গুলু ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লী, ২১। দেবাশীষ মৈত্র ও মা মণি, কলিকাতা।

বৈশাখ মাসের সভ্য-সভ্যাদের ধাঁধার সঠিক উত্তর যারা দিয়েছে—

১। সুমন্তকুমার বিশ্বাস, কলিকাতা
২। আলো, নীলু ও রঞ্জিত বিশ্বাস, কাশীপুর
৩। বেণু ও রুনু চক্রবর্ত্তী, জগদলপুর
৪। অপূর্ব্বকুমার সরকার ও অসিতকুমার বসু, কলিকাতা

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

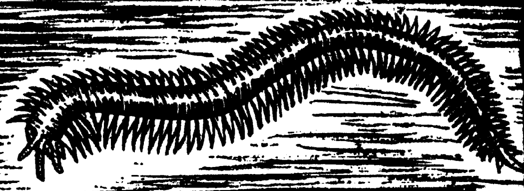
দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত



সামুদ্রিক শামুক-কীট:

এ এক বিচিত্র একধরণের সামুদ্রিক কীট-শামুকের জাত। নলের মতো অংশ হলো এদের পা এবং ফলের মতো অংশটি হলো শক্ত খোলার আবরণে ঢাকা এদের দেহ। খোলার বাইরে সরু শুঁড়ের মতো বহু হাত থাকে-এগুলি এরা প্রয়োজনমতো গুটাতে ও বার করতে পারে। এরা প্রায়ই জাহাজ-নৌকা ও তিমিমাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর গায়ে সেঁটে থাকে।

এ্যানোলাইড: এরা বিচিত্র সামুদ্রিক কীট-আকারে দু' তিন ইঞ্চি থেকে প্রায় তিন ফুট লম্বা হয়। এদের গায়ের রং সাত-রঙা-সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করে। দেহের দু' পাশে বিছার মতো কাঁটা দিয়ে নিশ্বাস নেয়।





গ্রীব পাখী: এরা হাঁসের নিকট আত্মীয় হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জীব। জলের ধারে ডাঙায় এদের বাস-জলে ভেসে বেড়াতে সুদক্ষ-তবে ডানা ছোট বলে উড়তে পটু নয় তেমন। মাছ আর পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারন করে। পশমের মতো নরম রূপালী পালক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোকে এদের শিকার করে। এরা শান্তিপ্রিয় ভীরু নিরীহ প্রাণী। এদের দেহ হালকা, তাই অনায়াসে জলে ভেসে বেড়াতে পারে



গান

তোমার মনের সুধাটুকুর আভাস পেলাম প্রিয়,
ঘুমিয়ে যখন পড়বে ভুবন—সেই সুধারে দিও।
পান করে তা' হবো অমর
বিধির কাছে চাই না ত বর
সে অমৃত তোমায় আমায় করবে রমণীয়!

তোমার প্রাণে সুধা:আছে, আমার আছে প্রীতি,
তোমার আমার দোঁহার সুরে জাগ্‌বে নতুন গীতি।
প্রদীপ জ্বেলে থাক্‌বো জাগি,
তোমার পায়ের ধ্বনির লাগি,
তুমি এসে আমার জীবন করবে বরণীয়॥

কথা : অখিল নিয়োগী

সুর ও স্বরলিপি : ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

II ণ্‌া দণা দা | পা মা | মা মা I মা জ্ঞা ঋা | জ্ঞা া | সা সা I
তো মা য়্ ম ০ নে র্ সু ধা ০ টু ০ কু র্

সা ণা দা | ণা -দা | দণা -দা I পা -মা া | -া -া | -া -া I
আ ভা স পে ০ লা ম্ প্রি য় ০ ০ ০ ০ ০

গা মা পা | দা া | পা পা I গা মা পা | দা -া | পা পা I
ঘু মি য়ে য ০ খ ন্ প ড় বে ভু ০ ব ন্

গা মা মা | পা -া | দা ণা I দা -পা -পা | পদা মদা | গা -া II
সে ই সু ধা ০ রে ০ দি ও ০ ০ ০ ০ ০

আভাস পেলাম ইত্যাদি...

II পা পা র্দা | ণা র্সা | র্সা র্সা I পা দা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্া | র্সা র্সা I
পা ন্ ক রে ০ তা ০ হ ব ও অ ০ ম র্

র্সা র্সা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা -র্া | র্সা র্া I ণা ধা ণা | পা ণদা | পা পা I
বি ধি র্ কা ০ ছে ০ চা ই না তো ০ ব র্

পা পা দপা | মা গা | মা মা I ণা দণা দা | পা মা | মা মা I
সে অ ম্ রি ০ ত ০ তো মা র্ আ ০ মা র্

পা পা দা | ণা ণা | র্স র্ঋর্সা I ণা ধা মা | ণা -দা | ণা -দা II
ক র্ বে র ০ ম ০ নী ও ০ ০ ০ ০ ০

আভাস পেলাম ইত্যাদি...

II মা জ্ঞপা মা | জ্ঞা সা | সা -া I সা ণ্দা ণ্দা | ণা সা | সা -া I
তো মা র্ প্রা ০ ণে ০ সু ধা ০ আ ০ ছে ০

ণ্সা সজ্ঞা ঋা | জ্ঞা -া | মা পমা I জ্ঞা মা মা | মা -া | -া -া I
আ মা র্ আ ০ ছে ০ প্রী তি ০ ০ ০ ০ ০

মা পমা জ্ঞা | মা পা | পা -া I পা মপা ণদা | ণা -া | পা মা I
তো মা র্ আ ০ মা র্ দোঁ হা র্ সু ০ রে ০

মা পা দা | র্সা -া | দণা দা I দপা মা -া | -া -া | -া -া I
জা গ্ বে সু ০ ত ন্ গী তি ০ ০ ০ ০ ০

পা পা দা | ণা র্সা | র্সা -া I পা দা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা -র্া | র্সা র্সা I
প্র দী প জ্বে ০ লে ০ থা ক্ বো জা ০ গি ০

র্সা র্সা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা -র্া | র্সা -া I ণা ধা ণা | পা ণদা | পা -া I
তো মা র্ পা ০ য়ে র্ ধ্ব নি র্ লা ০ গি ০

পা পা দপা | মা গা | মা মা I ণা দণা দা | পা মা | মা মা I
তু মি ০ এ ০ সে ০ আ মা র্ জী ০ ব ন্

পা পা দা | ণা ণা | র্সর্ঋর্সা I ণা ধা মা | ণা দা | ণা দা IIII
ক র্ বে ব ০ র ০ ণী ও ০ ০ ০ ০ ০

আভাস পেলাম ইত্যাদি...

সম্ভব হও তুমি এ যুগে আবার

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়



আজি হতে শতবর্ষ আগে—
উদ্ভাসিয়া শত সূর্য্যের
নবারুণ রাগে,
এসেছিলে তুমি কবি সাথে লয়ে
'মৃত্যুহীন প্রাণ'
তাহা আজিও অম্লান
যেন শিখা অনির্ব্বাণ
বিশ্বময় জাগে।

'চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই'—
এ কথা মন মানে না যে তাই,
খ্যাপা সম তোমার সে রূপ খুঁজে ফেরে,
আর শুধু চায়—
তোমার কণ্ঠ হতে জীবনের গান
করিতে আকণ্ঠ পান,
সে অমৃতেরে।

শান্ত ছায়াতলে বসি সরসির তীরে—
ব্যথা ভরা মন যবে তোমার স্মৃতিরে ঘিরে
কাঁদে ফিরে ফিরে,
সুরলোক থেকে যেন তোমার সে বীণাখানি
তোলে প্রতিধ্বনি,
উচ্ছল ছলছল
সরোবর নীরে।

দূর বনানীর ঐ নিঃসীম রেখায়—
কোন সে অদৃশ্য এক তুলির লেখায়,
ফুটে যেন ওঠে ধীরে তব রাজর্ষি রূপ।
মৃদু মন্দ্র কণ্ঠস্বরে সুললিত গানে গানে
শুনাও সবার কানে,
তোমার সে কাব্য গাথা
অতি অপরূপ।

ভেসে যেন আসে ঐ দূর হতে তব—
অমর সে বাণী যত কত নব নব।
সহসা বেসুর যেন ঠেকে সেই সুর
চরাচর হ'ল যেন বেদনা বিধুর।
আকাশের নীলিমায় শ্যামল বনছায়
স্বর তব ঝরে হয়ে
অশ্রু আকুল।
মানুষের আত্মারে উন্নত করিবারে
গেথেছ কবিতা মালা
ফোটায়েছ
কত কাব্য ফুল,
আজি কি ভাবিছ কবি
সৃষ্টি তব
সবই হল ভুল?

ভুল তব হয় নাই, হতে যে পারে না তাই—
তোমারি সে তোলা ফুলে
অর্ঘ্য সাজাই।
মেঘমুক্ত রবি মত তোমার সে সৃষ্টি যত,
'মূঢ় ম্লান মুখে' সব দেবে এনে ভাষা—
পতিত মানব মনে জাগে এই আশা।

সত্যদ্রষ্টা কবি তুমি মহাঋষি—
ভারত আত্মার মাঝে রহিয়াছ মিশি।
'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', চারিদিকে হাহাকার,
জন-গণ-মন তোমা চাহে বারবার।
সত্য-শিব-সুন্দরের গান
শোনাবার তরে তোমা
করি আহ্বান—
সম্ভব হও তুমি এ যুগে আবার।

রবি সন্দর্শনে

শ্রীঅনিলকুমার বক্সী

রবীন্দ্রনাথকে দেখবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—বন্ধুমহলে সে কথা ব'লেছিলাম। তারা আমাকে চেপে ধরল—তোমাকে দু'কলম লিখতে হ'বে। তাদের পক্ষে বলা যত সহজ, আমার পক্ষে লেখা তত সহজ নয়। তাছাড়া সে তো আজকের কথা নয়। যতদূর মনে পড়ে আমাদের তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার বছর। টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে, ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বাবা তখন কালিম্পংএর পোস্টমাস্টার। হঠাৎ একদিন বল্লেন—রবিঠাকুর আসচেন এখানে। কি রকম গেট সাজান হ'চ্ছে দেখেছিস। আমরা তাঁকে দেখতে পাব ঘরে বসেই।

যে রাস্তা দিয়ে তিনি আসবেন সেটা শিলিগুড়ি থেকে সাপের মত এঁকে বেঁকে একেবারে আমাদের পোস্টাপিসের ধার ঘেঁষে চলে গেছে। বলতে গেলে সহরের প্রবেশ পথেই পড়ে পোস্টাপিস। আর এইখানেই একটা বিরাট গেট সাজান হচ্ছে।

দেখতে দেখতে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে পড়ল। নদীর ধারের উঁচুনিচু পাড়গুলোর মত রাস্তার পাশের কাটা-কাটা পাহাড়গুলো। তারই মাথায় মাথায় লোক জড়ো হ'তে শুরু করেচে। রাস্তার কোল ঘেঁষে ছবির মত বাড়ীগুলো তার খোলা-জানলার চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। একদিকে নেমে গেছে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে পাহাড়ের পর পাহাড়—সেই স্বল্প-পরিসর জায়গাতে কতগুলো বলিষ্ঠ হাতে ফসল ফলানর চেষ্টা হ'চ্ছে—ধান—ভুট্টা নয়ত কোদো। চেরা বাঁশের সাহায্যে ঝরণার জল ছেড়ে দেওয়া হচ্চে সেই ক্ষেতে। আর একদিকে পাহাড়ের কঠিন নাগপাশে চির-বন্দিনী খর-

স্রোতা তিস্তা গভীর কোন অতলে দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত ক'রে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মৌচাকে মৌমাছির মত লোকের ভিড় হ'য়ে গেল গেটটার সামনে। সর্বদেশের এবং সর্বজাতির তীর্থ ক্ষেত্র। তারই একটানা গুঞ্জন ধ্বনিতে ভরে উঠল জায়গাটা। দূরপথে এক একটা মোটর দেখা দেয়, আর জনতা হর্ষধ্বনি করতে থাকে। কাছে এলে কবিকে দেখতে না পেয়ে তারা হতাশ হয়। সেই ঋষিপ্রতিম শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত বাল্মীকির মত চেহারা দেখলেই চিনতে পারা যাবে। ক্রমশঃ বেলা গড়িয়ে গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় মাথায় সোনালী রোদ এসে পড়ল। আলোয় আলোয় মাখামাখি, পেঁজাতুলোর মত মেঘগুলো এক জায়গায় এসে জড়ো হ'তে শুরু ক'রেচে। ছোট ছোট দল বেঁধে আর সারি গান গেয়ে বিচিত্র-পোষাক-পরা নেপালী মেয়েরা ফিরে আসচে—পিঠে তাদের ছেলে বাঁধা। তবু কবির দেখা নেই। অনেকগুলো মোটর একে একে পার হ'য়ে গেল—তারই মধ্যে একটা ন নাকি একটু ঢাকাঢুকি দেওয়া ছিল।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কবি কখন "গৌরীপুরলজে" উঠে গেছেন। জনতা প্রায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ছুটল সেদিকে। হাত জোড় ক'রে বোঝান হলো—পথে সামান্য অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'য়েচে তাদের। একটু সুস্থ বোধ করলেই দর্শন দেবেন সবাইকে। আমরা নিরাশ হ'য়ে ফিরে এলাম।

টাইগারহিলের সূর্যোদয়ের মতই অনুকূল আবহাওয়ার জন্যে আমাদের অপেক্ষা ক'রতে হ'লো—অর্থাৎ রাজার চাইতে রাজার পেয়াদারই জোর বেশি, তারা ঘিরে আছে সারাক্ষণ। সেই বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

অপ্রত্যাশিত এক সুযোগ পেয়ে গেলাম। পোস্টাপিসে কাজ করেন এক ভদ্রলোক—কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল—আলোকের আকর্ষণে পতঙ্গ যেমন ক'রে উড়ে এসে পড়ে। উদ্দেশ্য কবির একটা অটোগ্রাফ নেওয়া—অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা আর দেশ-ভ্রমণের একটা বাতিক আছে দেখলাম। আমার চাইতে বয়সে কিছু বেশী হ'বে। কলেজে পড়ে। নামটা যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় জ্যোতি—জ্যোতিপ্রকাশ মৈত্র। কলকাতার ছেলে, নাকে-মুখে-চোখে কথা। ফোটা ফুলের মত হাসিমাখা মুখ। এক মুহূর্তে আমাকে আপন ক'রে টেনে নিল।

জ্যোতি ব'ল্লে—অটোগ্রাফ একটা নিতেই হ'বে সেই-জন্যে তো আসা। শান্তিনিকেতনে কত চেষ্টা করলুম কিছুতে জোগাড় করতে পারলুম না—ওখানকার মত ভিড় নেই নিশ্চয়ই। কালই আমরা আক্রমণ করব।...

পরদিন। সর্পিল পথ। আমরা পাক খেতে খেতে "গৌরীপুরলজে" উঠে এলাম। পাহাড়ের মাথা ছেঁটে ফেলে অনেকখানি সমতল জায়গা। তার উপর পূর্ব-পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী। সদ্য-রঙকরা টিনের ছাদ। পাশ দিয়ে ব'য়ে গেছে ক্ষীণকায়া এক ঝরণা। লাফিয়ে লাফিয়ে ঝরে পড়চে নিচে। কায়া ক্ষীণ হ'লেও খাদের মত অনেকখানি জায়গা জুড়ে নেমে গেছে। তারই গায়ে গায়ে অজস্র বিচিত্র ফুলের সমারোহ। সূর্যাস্তের রঙীণ স্বপ্নমাখা পশ্চিমাকাশ। স্ফটিক জলতলে বর্ণালী মাছেদের মত আকাশের সুনীল হ্রদে দু'এক টুকরো মেঘের আনাগোনা। যে দিকে তাকাও—নীল আকাশের পটে ঢেউখেলান পাহাড়ের প্রাচীর। বিধাতার অদৃশ্য হাতের তুলির রেখায় রেখায় উত্তর দিকটা যেন আরও আচ্ছন্ন। এ যেন কালবৈশাখীর মেঘের ঘন জটাজাল—তারই বুক চিরে বিদ্যুৎ-শিহরণের মত দু'একটা ঝরণা লাফিয়ে পড়চে। মেঘের ঘোমটা সরিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারচে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমাদের মত সেও কি কবির দর্শনপ্রার্থী?

জ্যোতি নিঃসঙ্কোচে একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। মনে হলো অনেকগুলো ঘরের মধ্যে এটা একটা বাইরের ঘর। প্রথমে ঢুকতেই যে ব্যক্তিকে আমরা প্রণাম করলাম তিনি হলেন—রথীন ঠাকুর, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী, মুখে স্মিত হাসি। খুব মনোযোগ সহকারে সূর্যাস্তের ছবি আঁকছিলেন তিনি, বাইরের দৃশ্যপটেও সেই সূর্যাস্তেরই ছবি—পাহাড়ের কোলে ঢলে-পড়া অপস্রিয়মান সূর্যকে তুলির আঁচড়ে ধরে রাখছিলেন। আর একদিকে কয়েক-জন ভদ্রলোক মিলে তাস খেলছিলেন।

প্রণাম করতেই তিনি মুখ তুলে চাইলেন। বল্লেন—বাবার সঙ্গে আজ তো দেখা হ'বেনা।

জ্যোতি নিরাশ হ'লো, কিন্তু শুধু হাতে ফিরে যাবার

ছেলে সে নয়। ব'ল্লে—আপনার একটা অটোগ্রাফ দিন। ব'লেই সে তার ছোট খাতাখানা মেলে ধরল।

রথীন ঠাকুর হাসলেন। তাড়াতাড়ি নিজের নামটা লিখে দিলেন। ভাবটা এই যে আপদ বিদায় হ'লেই বাঁচি। জ্যোতিও ছাড়বার পাত্র নয়—ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার ক'রে রেখে গেল। বল্লে—বহুদূর থেকে আসচি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য—কবে এলে দেখা পাব?

উত্তরে তিনি মৃদু হাসলেন। ছবির দিকে মন দিলেন। আচ্ছা এস আর একদিন।

আমরা বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। হঠাৎ উপরের দিকে চোখ পড়ল। যা দেখলাম তাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যেন কোন দেবদূত। দোতালার জানলাটা যেন ফ্রেম—আর সেই ফ্রেমের মুখে তিনি। আকর্ণবিস্তৃত সুবিশাল চোখ—সে চোখে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি। পরচুলার মত সাদা চুল এলোমেলো ছড়ান—দু এক গুচ্ছ প্রশস্ত ললাটের উপর এসে পড়েচে। উন্নত নাক—তার নিচে সাদা রেশমের গুচ্ছ—ঠোঁট দুটোকেও যা প্রায় অদৃশ্য ক'রে দিয়েচে। রেশমের আবরণটুকু বাদ দিলে যা থাকে তা থেকে আপেলী আভা ছড়িয়ে পড়চে—এ যেন শরতের শুভ্র ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্রের সতেজ দীপ্তি।

জ্যোতি উপরের দিকে হাত তুলে নমস্কার করলে। তিনি তখন ধ্যানগম্ভীর গিরিমালার সঙ্গে একাত্মা। দৃষ্টি তাঁর কোন সুদূরে কে জানে—বোধহয় কাঞ্চন গিরিশৃঙ্গে—যার শিখরদেশ মেঘলোক ভেদ ক'রে মহাকাশে মাথা তুলে আছে। মহান একটা কিছু জন্ম নিচ্চে কিনা কে জানে। হয়ত আগেই জন্ম নিয়েচে—মিলিয়ে দেখছিলেন শুভক্ষণে!

"হে গিরি যৌবন তব বেগে
আপনারে উৎসরিয়া—
মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে"…

জ্যোতি ব'ল্লে—আজ থাক, কাল আমরা এটাক্ করবো। মাউন্ট এভারেস্টের পিক্ দেখে যে আনন্দ পেয়েছিলুম—কবিকে দেখে তার চাইতে কম আনন্দ পেলুম না। দূর থেকে দেখেই এত শান্তি, কাছে গেলে না জানি আরও কত কি পাব। হয়ত কিছুই পাবনা, তবু কি আকর্ষণ! পোকা-মাকড়গুলো আলোকের আকর্ষণে কেন যে মারা পড়ে এবারে বুঝলুম।

পরদিন আমরা বিনা বাধায় প্রবেশ করলাম। রথীন ঠাকুর আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন কবি। জলচৌকির উপর পা দুটো স্থাপিত। আলখাল্লার মত জামা পরণে—বাউল সন্ন্যাসীদের মত। পরিণত বয়সের সৌন্দর্য্যের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে গা থেকে—এ যেন অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম নিবেদন—পরিপূর্ণ বিকশিত হ'য়ে ঝরে পড়বার পূর্বমুহূর্তের গোলাপ। অনেক রথী-মহারথী ব্যক্তিগণ তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাতের পর চলে যাচ্চেন। আমাদের মত নাম-না-জানার সাথে তাঁরাও যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যাচ্চেন এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সামনে—সত্য শিব ও সুন্দরের উৎসভূমি থেকে—কোন সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার সাগর-সঙ্গমের মুখোমুখি এসে। তখন কি জানতাম নিজের জন্যে কবি নিজেই লিখে গেছেন—'গগন ব্যতীত তোমারে ধরিবে কেবা'—

আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম প্রায় কাড়া-কাড়ি ক'রে। জ্যোতি ব'ল্লে—কেমন আছেন আজকাল? সঙ্কোচহীন স্বচ্ছন্দে ব'ল্লে।

কবি মৃদু হাসলেন। শিশুর মত সরল হাসি। ব'ল্লেন—এখন তো ভালই আছি।…আরও সামান্য কথাবার্ত্তা হ'লো।

অতবড় দেহের তুলনায় গলার স্বরটা মিহি মিষ্টি। গলার অনেকখানি অভ্যন্তর থেকে যেন উঠে এল। স্বর নয়ত যেন সুর—সাধা গলার মত মাজিত মাধুর্য নিয়ে।

কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করার মধ্যে যার ভূমিকা—ছোটখাতাখানা মেলে ধরার মধ্যে তার আসল উদ্দেশ্য পরিস্ফুট—কবি দু'লাইনের একটা কবিতা লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর ক'রেছিলেন। তার ভাষা ও ছন্দ আজ আর মনে নেই—তবে তার ভাব যেন এই রকম—'ফুলের সৌরভ শুধু বায়ুর অনুকূলে প্রবাহিত হয়, তোমার গৌরব দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক।' জ্যোতির মুখে হাসি ফুটে উঠল।

আমিও একখানা খাতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্কোচ দেখে নিজেই মেলে ধরল খাতাখানা—সেই আমার প্রথম ও শেষ অটোগ্রাফ—

মিছে শুধু যেচে ফের আমার অক্ষর
বিপুলা ধরণী চাহে তোমার স্বাক্ষর।

সেই রাবীন্দ্রিক হরফে মুক্তাক্ষরী লেখা—যার অনুকরণ একদিন আমাদের পাগল ক'রে তুলেছিল। আবার আর একবার পা খোঁজার পালা। তাঁর আশিস্‌ধারা মস্তকে ধারণ করে বেরিয়ে এলাম। অমৃতের স্পর্শে মৃণ্ময় কি চিণ্ময় রূপ পেল হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে! পরক্ষণেই স্বপ্ন ভঙ্গ হ'লো। হীরকের স্পর্শে লোহা কি কোনদিন সোনায় পরিণত হয়! অমৃতলোক ত্যাগ ক'রে আমরা আবার দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনে ফিরে এলাম।…

অনুবাদ সাহিত্য



শেষ পাতাটি

অনুবাদক—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে একটি ছোট্ট শহর। একে শহর না বলে গ্রাম বলা বোধ হয় ভাল। লম্বা লম্বা পথ চলে গেছে ঐ গ্রামের মাঝখান দিয়ে অনেক দূরে দূরে। অতি মনোরম এর প্রাকৃতিক দৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড় আর নদী তার কোলে বয়ে চলেছে। চির বসন্তের রাজ্য।

শিল্প রুচিসম্পন্ন কোন লোক তাই এখানে এলে আর ফিরে যেতে চায় না কোনদিন। মন প্রাণ মেতে ওঠে তার। ছবি আঁকবার এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায়ও নেই।

এখানে ওখানে কতকগুলি পুরোণো বাড়ী। কোন সময়েই খালি থাকে না।

এই রকম একটা বাড়ীতেই এসেছিল মেয়ে দুটি। সিউ আর জন্সি। ওরা দুজনেই ছিল শিল্পী। ওদের দুজনের জানা-শোনা হয় এখানেই একটি হোটেলে। কথায় কথায় ওরা দুজনেই শিল্পী বলে পরিচয় পায়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা বাড়ী ভাড়া করে ফেলে ওরা। আর সেখানে খোলে এক ষ্টুডিও। যে সময় ওরা আসে তখন ছিল মে মাস। বেশ আনন্দেই ওদের দিনগুলি কেটে চলেছিল। ছবি এঁকে আর সময়-অসময়ে এখানে ওখানে বেড়িয়ে।

হঠাৎ নভেম্বর মাসে এক বিপদ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তুষারপাত শুরু হল—আর তার সঙ্গে দেখা দিল এক নতুন বিপদ। মহামারীর আকারে দেখা দিল নিউমোনিয়া। বহু লোক মারা গেল অসুখে।

শেষ পর্যন্ত জন্সিও আক্রান্ত হল রোগে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। সারাদিন ছটফট করে আর বলে মৃত্যুর ওর বেশীদিন দেরী নেই। ঘরের সামনেই জানালা। আর জানালার বাইরেই নিরেট দেওয়াল। জন্সি তাকিয়ে থাকে ঐ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে।

একদিন সকালে ডাক্তার সিউকে ডেকে বললেন জন্সির কথা। মৃত্যুর কথা বড় বেশী ভাবছে ও। রোগীকে মৃত্যুর চিন্তা না ছাড়াতে পারলে কোন চিকিৎসাই সফল হয় না। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—ওর কোন পুরুষ বন্ধু আছে কিনা যে কোন আঘাত ওকে দিয়ে থাকতে পারে, অথবা এমন কোন বাসনা যা পূর্ণ হয়নি।

সিউ বলল—না সে রকম কোন বন্ধু ওর নেই। তবে একদিন জন্সি বলেছিল ও নেপলস্ উপসাগরের একটা ছবি আঁকবে।

ডাক্তার আরও ভাল করে রোগীকে যত্ন করবার কথা বলে চলে গেলেন। ডাক্তার চলে গেলে সিউ ওর আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ও দেখতে পেল জন্সি আপন মনে জানালার দিকে তাকিয়ে বলে চলেছে "বার, এগার, দশ, নয়।"

"কি গুণছ জন্সি?" সিউ প্রশ্ন করে।

মুখ না ফিরিয়েই ও উত্তর দেয় আইভি লতার ঐ পাতা-গুলো। আগে আমি গুণেছিলাম একশটা পাতা। ক্রমেই বাতাসে ওরা ঝরে যাচ্ছে। আর মাত্র ৪টি আছে। আস্তে আস্তে ওরাও ঝরে যাবে। শেষ পাতাটি ঝরে গেলে আমিও মরে যাব। ডাক্তার তোমাকে বলেনি আর আমার বাঁচবার আশা নেই?

আবেগভরে সিউ বলে ওঠে "জন্সি প্রিয় আমার, ওকথা বোলোনা। ওরকম কুসংস্কার তোমারও আছে! ঐ পাতার সঙ্গে জীবনের কি সম্বন্ধ? ডাক্তার বলেছেন আর

কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কিছু খেয়ে নাও এবার। বাজে চিন্তা কোরোনা।"

"না না আমার সঙ্গে তুমি কথা বোলো না। আমাকে একা থাকতে দাও।" জন্সি বলে ওঠে।

"না, আমি তোমার কাছেই থাকব। তোমাকে ঐ গাছের দিকে আর তাকাতে দেব না। এখানে বসে আমি ছবি আঁকব। বুড়ো বারম্যানকে আমার মডেল হতে বলব। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি এখনই আসছি।"

সিউ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বুড়ো বারম্যান এক মজার মানুষ। সেও ছিল একজন শিল্পী। কিন্তু কোনোদিনই অঙ্কনে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আজ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌচেছে ও। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে সামান্য আঁকার কাজ করে, অথবা মডেল হয়ে সামান্য কিছু রোজগার করে বারম্যান। ওদেরই বাড়ীর একতলায় থাকে বুড়ো। সৌম্যমূর্তি, মুখে লম্বা দাড়ি, শ্বেত শুভ্র।

সিউ বারম্যানকে সব কথা খুলে বলে, আর ওকে অনুরোধ করে মডেল হওয়ার জন্য।

সিউ জন্সির কথাও খুলে বলে বারম্যানকে। বলে, কেমন করে ও তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ঐ আইভি পাতার কথা ভেবে। শেষ পাতাটি ঝরে গেলে ওরও জীবন-দীপ নিভে যাবে—এ চিন্তাটাই ওকে পেয়ে বসেছে।

বুড়ো বারম্যান সব কথাই শোনে। অবশেষে ও বলে—"ভারী আশ্চর্য্য কথা। এখনও এ কুসংস্কার আছে!"

বুড়ো রাজী হয় মডেল হতে শেষ পর্যন্ত।

ওকে সঙ্গে নিয়ে সিউ ঘরে ঢোকে। জন্সি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় আর তুষারপাত চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। সিউ বুড়ো বারম্যানকে বসিয়ে এঁকে চলে।

পরদিন সকালে সিউ ঘুম থেকে উঠে তখনও জন্সিকে সেই খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল।

জানালার পর্দাটা রাত্রে সিউ টেনে দিয়েছিল। ফিস ফিস করে তাই জন্সি বলল—"ঐ পর্দাটা টেনে সরিয়ে দাও।"

সিউ আস্তে আস্তে পর্দাটা টেনে সরিয়ে দেয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঐ প্রচণ্ড হাওয়া আর তুষারপাতের মধ্যেও সেই দেওয়ালের গায় তখনও আইভি লতার পাতাটি ঝুলে রয়েছে। এত দুর্যোগ ওকে ঝরিয়ে দিতে পারেনি।

"এই শেষ পাতাটি ঝরে গেলেই আমি মরে যাব।" জন্সি বলে ওঠে।

"প্রিয় আমার, ওকথা আর বোলো না। আমার কথা একবার ভেবে দেখ। তোমার মৃত্যু হলে আমার কি হবে?" সিউ বলে ওঠে আবেগপূর্ণ স্বরে।

কোনো উত্তর দেয় না জন্সি, আপন মনে তাকিয়ে থাকে পাতাটির দিকে।

সারাদিন কেটে গেল ঐ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়। এক সময় সিউ জোর করেই জানালার পর্দাটা টেনে দেয়।

রাত্রিবেলায় আবার জন্সি জানালার পর্দা সরিয়ে দিতে বলে। সিউ পর্দাটি টেনে খুলে দেয়।

এখনও সেই শেষ পাতাটি লেগে রয়েছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেল জন্সি। তখনই জন্সি ডাকে সিউকে—"বন্ধু, আমার অন্যায় হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয়ই মরতে দিতে চান না। না হলে ঐ শেষ পাতাটি কেন গাছে লেগে থাকবে। আমি আর মৃত্যুর কথা ভাবব না, তোমার সব কথা শুনব।"

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে জন্সি!

ডাক্তার আবার আসেন পরের দিন। তিনি পরীক্ষা করে আশ্চর্য্য হয়ে যান। বিপদের মেঘ কেটে গেছে। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে জন্সি। এখন দরকার শুধু ভাল দেখা-শোনা করা, আর জোরালো পথ্য। ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, তাঁকে নীচে আর একজন রোগীকে দেখতে হবে।

ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে ওঠে জন্সি।

একদিন সিউ জন্সিকে বলে—"বন্ধু, তোমাকে একটা কথা বলব। আমাদের বন্ধু সেই বুড়ো বারম্যান মারা গেছেন নিউমোনিয়ায়। কয়েকদিন আগে ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগে ওর অসুখ করে। একদিন সারারাত ও বাইরে ছিল। এই দুর্যোগের রাতে কোথায় কে জানে!

শুধু ওর ঘরে পাওয়া যায় একটা কাঠের মই, কিছু আঁকবার সরঞ্জাম, রঙ তুলি আর একটা জলন্ত লণ্ঠন। ঐগুলি নিয়েই বুড়ো বাইরে গিয়েছিল, ফেরেনি সারারাত।

সারারাত ধরে বুড়ো ঐ দেওয়ালের গায় এঁকেছে আইভি লতার একটি পাতা শেষ পাতাটি ঝরে যাওয়ার পর। তাই আমরা দেখেছি ঐ শেষ পাতাটি দেওয়ালের গায় সারাক্ষণ।

নিজের জীবন দিয়ে বুড়ো বাঁচিয়েছে তোমাকে, আর এঁকে গেছে ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি।"*

* ও, হেন্‌রির "The Last Leaf" গল্পের অনুবাদ।

স্কুল-ফাইনাল্ ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার অংশ হিসাবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি টি, ডি এস্ ই

স্কুল ফাইনাল্, আই এ, বি, এ, প্রভৃতি তথাকথিত Public Examination গুলি বহু দিন হইতেই চালু আছে বটে, কিন্তু এগুলিকে অনেকেই অনিবার্য্য দুর্ভোগ বলিয়াই মনে করেন। এই পাব্‌লিক্ পরীক্ষাগুলি অনিবার্য্য, কারণ এগুলির বিকল্প ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত তৈয়ারি হয় নাই; এগুলি দুর্ভোগ, কারণ পাব্‌লিক্ পরীক্ষাগুলির মৌলিক ত্রুটির জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় পরীক্ষার্থীদের। এই পরীক্ষাগুলির সফলাঙ্ক (score) সব ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য নহে, পরীক্ষকের রুচি-বিরাগের খামখেয়ালিতে ইহার বিচারটি প্রায়ই প্রভাবান্বিত হয়, ইহার আরও বহু ত্রুটি আছে।

পাব্‌লিক্ পরীক্ষার ত্রুটি

একটি নির্দ্দিষ্ট "সেশনের" (session) শেষে যে অন্তিম পরীক্ষাটি "পাব্‌লিক্ পরীক্ষা" হিসাবে গৃহীত হয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিয়া দেয়। অধিকাংশ ছাত্রই এইসব পরীক্ষার জন্য শিক্ষার পূর্ণতার চেয়ে প্রশ্নের সম্ভাব্যতার দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখে এবং "suggestions", "Possible questions," বা "important passages" প্রভৃতির জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য তোলপাড় করে। সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর ready-made উত্তর মুখস্থ করিয়া জোড়াতালি দেওয়া তথ্যের যে টুকু সঞ্চয় হয়, তাহাতে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, ভাগ্যবান পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় তথাকথিত "Common Question" বা আন্দাজ করা প্রশ্নগুলি পাইলেই প্রচুর নম্বর অর্জ্জন করে। কিন্তু এই ভাবে পরীক্ষায় যাহারা বেশী নম্বর পাইয়াছে, এমন অনেক ছাত্রই বাস্তব জীবনে তেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেনা; অনেক সময়েই দেখা যায় মার্কা-মারা ভাল ছেলেদের অনেকের মধ্যেই নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রেই না পাওয়া যায় বিদ্যার গভীরতা, না পাওয়া যায় বিদ্যার বিস্তৃতি।

শিক্ষা-বিজ্ঞানে যে জাতীয় পরীক্ষাকে "রচনাজাতীয় প্রশ্ন" (Essay type of test) বলা হয়, অর্থাৎ যে জাতীয় পরীক্ষা এখনও চালু আছে, তাহার অনিবার্য্য ফলই হইতেছে এইরূপ। ইহাতে সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্বন্ধে স্ফূর্ত্তি খেলায় (lottery) যাহারা জয়ী হয়, তাহারাই কৃতী ছাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাব্‌লিক্ পরীক্ষার অন্যতর ত্রুটিও আছে। এগুলি এক একটি নির্দ্দিষ্ট "সেসনের" পরিশেষে এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহীত হয়। একটি ভাল ছাত্রও ঠিক ঐ সময়টিতে হয়ত, অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে, ফলে সে হয়ত, তাহার কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয়টি দিতে সমর্থ হয় না। আধি ব্যাধির আক্রমণ, পারিবারিক অশান্তি, সাংসারিক দুর্ভোগের ঝামেলা, চিত্তবিক্ষোভ, অন্যান্য কাজ কর্ম্মের চাপ, প্রভৃতি নানা কারণেই হয়ত ঠিক ঐ সময়টিতে একটি ভাল ছেলেও তাহার পূর্ণ পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। ফলে তাহার বহু বৎসরের সার্থকতার পরিচয়ের চেয়ে গুরুভার হইয়া উঠে তাহার সাময়িক ব্যর্থতা, তাহার ক্ষণিকের ত্রুটি ব্যর্থ করে তাহার চিরাচরিত সাধনাকে।

এমন অনেক ছাত্র আছে যাহারা পাব্‌লিক্ পরীক্ষার নামেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে ভাল কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে না। আমরা জানি এমন অনেক গায়ক আছেন যাঁহারা রেডিও ষ্টেশন হইতে গান প্রচার করিতে ভয় পান। তাহা ছাড়া ইহাতে যে একটা তাড়াহুড়ার ব্যাপার আছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গান শেষ করিবার ব্যবস্থা আছে, সেই জিনিষটাই তাঁহাদের মনে এমন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে,

। তাহারা রেডিও মারফৎ তাঁহাদের গান প্রচার করিতে রাজী হন না, অথবা রাজী হইলেও তাহাতে ভাল কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। সময়ের অনুভূতি, বা সময়ের সহিত লড়াই করিয়া কাজ করিবার অনুভূতিটা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পী মনোভাবের বিরুদ্ধে কাজ করে। শিল্পীর লক্ষ্য বস্তু হইতেছে, সৌন্দর্য্য সৌষম্য ও সুসম্পূর্ণতা; উৎপাদনের বিপুলতা বা ক্ষিপ্রতা নহে; পরিমাণের চেয়ে গুণের দিকেই তাঁহার দৃষ্টিটা বেশী থাকে। তাড়াহুড়ার উত্তেজনার মধ্যে অনেক শিল্পীই তাঁহাদের শিল্প সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। পাব্লিক্ পরীক্ষায় যে সব ছাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের বিদ্যাবত্তাকে সাজাইয়া গুছাইয়া উপস্থাপিত করিতে পারে এবং বাহিরের অপরিচিত পরীক্ষককে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট অথবা বিভ্রান্ত করিতে পারে, তাহারাই বেশী নম্বর পায়। ভাল হস্তাক্ষর, ভাল লেখার ষ্টাইল, সার্থক উদ্ধৃতি, অথবা বিশেষ প্রকার মতবাদের সমর্থন, অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষকদের খুশী-খেয়ালকে পরিতৃপ্ত করে; ফলে পরীক্ষার সফলাঙ্ক (score) গুলি প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে।

অনেক ছাত্রই জানে—পাব্লিক পরীক্ষায় প্রথম লেখা উত্তরটির সাফল্যই অপরিচিত বহিঃ পরীক্ষকের মনে এমন একটা পরিচয়ের সৃষ্টি করে, যে তাহার প্রভাবেই অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরগুলিও তাহাদের বাস্তব মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য পাইয়া থাকে। অবশ্য এই সব তথ্যের জ্ঞান ও তাহাদের সার্থক প্রয়োগও একটা "আর্ট" বটে, তবে এই "আর্ট" টা অনেক শিল্পীরই অধিগম্য নহে। ফলে ঠিক পরীক্ষা দেওয়ার আর্টে যাহারা অভ্যস্ত নহে, এমন অনেক ছাত্রই তাহাদের গুণের গভীরতা সত্ত্বেও পরীক্ষার ভাল ফল লাভ করিতে পারে না।

পাবলিক পরীক্ষার ক্রটি সংশোধনের উপায়ঃ
(ক) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

এই সব ক্রটির প্রতিকারের জন্য প্রতিশোধ ব্যবস্থা হিসাবে অনেকে "নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার" (objective Tests) ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উপযোগিতা আজ তর্কের বিষয় নহে, তবে যতদিন না সমস্ত শিক্ষক ঐ জাতীয় প্রশ্নপত্র তৈয়ারী করিতে উপযুক্ত "ট্রেনিং" পাইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইবেনা। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য ছাপাখানার খরচটা এতটা বেশী বৃদ্ধি পাইবে যে তাহা বহু স্কুলের পক্ষেই সাধ্যাতীত হইয়া উঠিবে।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার আর একটা অসুবিধা হইতেছে যে ইহাতে কিছু জানা না থাকিলেও শুধু আন্দাজে ঢিল মারিয়া কিছু নম্বর তোলা যায়।

পরীক্ষার সময় ছাত্ররা অসাধু উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সুবিধাটা খুঁজে পাওয়া যায়। সামান্য একটা ইসারা বা ইঙ্গিতেই পাশের ছেলেটিকে উত্তর সঙ্কেত দেওয়া যায়; সেও সামান্য একটা টিক্ দিয়া বা রেখা টানিয়া উত্তর লিখিতে সমর্থ হয়। তবে আমেরিকার "আল্ফা টেষ্ট" যেভাবে হইয়াছিল, (অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ২৩.২৪ মিনিট সময়ে ১৮০|২০০টি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয় তাহাতে এই জাতীয় অসাধু উপায় অবলম্বন করিবার সুযোগ বা সময় থাকে না। তবে ঐ জাতীয় প্রশ্নগুচ্ছসমন্বিত প্রশ্নপত্র করিতে হইলে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নের জন্য একখানি করিয়া পুস্তিকা ছাপাইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ছাপানোর খরচ অনেক স্কুলের পক্ষেই সম্ভব নয়।

আর্থিক অসুবিধার কথা বাদ দিলেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার আর একটি ক্রটি হইতেছে ইহাতে তথ্যের উপস্থাপন ও গ্রন্থন-নৈপুণ্য, যুক্তির শৃঙ্খলা, চিন্তার পারম্পর্য্য, সৃজনী শক্তি, রচনার চমৎকারিত্ব প্রভৃতির পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। রচনা জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে এই সমস্ত গুণ-গুলির পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই রচনা জাতীয় পরীক্ষা, যাহা এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা রচনা জাতীয় পরীক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা নহে, অনুপূরক ব্যবস্থা মাত্র হওয়া উচিত। এখানেও একটি জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায়; শতকরা কতটা নম্বর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইবে?

একটি স্কুলের কথা জানি—সেখানে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক পরীক্ষায় শতকরা ২৫ নম্বর objective Test এর জন্য সংরক্ষিত ছিল। ঐ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্ররা রসায়নে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে বহু ছাত্রই রসায়ন বিষয়ে অকৃত-কার্য্য হইবে। কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গেল যে একটি ছাত্রও ঐ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয় নাই। ইহার কারণ কি? দেখা গেল যে objective test এর শতকরা ২৫ নম্বরের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই শুধু আন্দাজে উত্তর লিখিয়াই ১৫ হইতে ২০ নম্বর পাইয়াছে এবং এই নম্বরটির জন্যই তাহারা সহজেই পাশ নম্বর পাইয়া গিয়াছে। ষাণ্মাষিক পরীক্ষার সময় objective test এর জন্য অতটা নম্বর সংরক্ষিত ছিলনা, কাজেই Essay type of test এর মধ্যে তাহারা আন্দাজে টিক মারিয়া বা ঢেরা কাটিয়া নম্বর তুলিবার সুযোগ পায় নাই। ফলে তাহাদের পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই।

ক্রটি সংশোধনের উপায় (খ) আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে পাব্লিক্ পরীক্ষার ক্রটি সং-শোধন। এখন দেখা যাইতেছে "রচনা জাতীয় পরীক্ষাই" হউক অথবা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাই হউক, তাহাতে পাবলিক্ পরীক্ষার ক্রটিটি থাকিয়াই যায়। পাব্লিক্ পরীক্ষার আসল ক্রটি হইতেছে তাহাতে সারা "সেসনের" পরিচয়ের চেয়ে বড় হইয়া উঠে অন্তিম পরীক্ষার সফলতাটুকুর পরিচয়। ইহা একটি প্রকাণ্ড অসঙ্গতি। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সুরেশ মৃত্যুশয্যায় শুইয়া অন্তিম সময়েও মহিমের নিকট আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে পারিল না। তাহার বক্তব্য ছিল এই যে চিরদিন অন্যায় করিয়া আসিয়া অন্তিম সময়ে নাটকীয়ভাবে ক্ষমা চাহিলেই ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তিম

পরীক্ষা (Final Examinations) গুলি এই অন্তিম ক্ষমা চাওয়ার মতই জিনিস। সারা সেশান্ ধরিয়া যে ছেলে ক্লাশ আলাইয়া কাজে ফাঁকি দিয়া অপরের সারস্বত সাধনার ব্যাঘাত করে, সেই হয়ত অন্তিম পরীক্ষার কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া important বাছিয়া ফাঁকি দিয়া পড়া তৈয়ারী করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিল। অথচ মজার কথা হইতেছে এই যে, যে বিদ্যা উচ্চারণ করিয়া সে পরীক্ষায় পাশ করিল সেই বিদ্যাও পরীক্ষার দু চার দিন পরেই ভুলিয়া গেল। সুতরাং এই জাতীয় পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রদের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় বা দৈনিক কর্ম্ম-নিষ্ঠার পরিচয় নিছক পাবলিক পরীক্ষার দ্বারা পাওয়া যায় না।

যে বিদ্যার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নাই, তাহা স্থায়ী-ভাবে মনের মধ্যে থাকিতে পারে না। Cramming দ্বারা আহৃত বিদ্যা মুখস্থ হইবার পাঁচ মিনিট পরে শতকরা ২ ভাগ, কুড়ি মিনিট পরে ১১ ভাগ, ১ ঘণ্টা পরে ২৯ ভাগ, ১ দিন পরে ৩২, ১ মাস পরে ৮০ এবং তিন মাস পরে ৯৭ ভাগ ভুলিয়া যাইতে হয়। কাজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ক্র্যামিং করিয়া অধীত বিদ্যা, যাহার পরিচয় বর্ত্তমানের পাব্লিক্ পরীক্ষাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বিদ্যার প্রকৃত সমীক্ষণ হয় না। বিদ্যার প্রকৃত সমীক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইতেছে ছাত্রদের দৈনন্দিন সাধনার হিসাব রাখা—আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দ্বারাই তাহা সম্ভব। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার গ্রহণ ও পরিচালন করিবেন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। দৈনন্দিন জীবনে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা মেশা করিবার সুযোগ আছে তাঁহাদের, ছাত্রদের পরিচয় তাঁহারা যতটা জানেন, বাহিরের পরীক্ষকগণ ততটা জানেন না। কাজেই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মধ্য দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা সমীক্ষণের ফলগুলি ছাত্রদের বহিঃপরীক্ষার ফলের সহিত মিশাইয়া তবেই ছাত্রদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে; অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলগুলিকে পাব্লিক্ পরীক্ষার ফলের অংশ ও অনুপূরণ হিসাবে ধরিতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সম্বন্ধে আপত্তি

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা বড় আপত্তির কথা হইতেছে যে ইহার ফলগুলির সার্ব্বজনীন মূল্য বা সার্ব্বজনীন মান নাই। বিভিন্ন স্কুলে প্রশ্নপত্রের কাঠিন্যের পার্থক্য থাকিবে, পরীক্ষার কঠোরতাও বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন প্রকার হইবে।

অবশ্য পাব্লিক্ পরীক্ষাতেও সার্ব্বজনীন মূল্যমানও নিশ্চিত ভাবে পাওয়া যায় না; কারণ একই বিষয়ে বহু পরীক্ষক খাতা দেখেন; পরীক্ষক হিসাবে তাঁহাদের মূল্যায়ন একই ভাবে হয় না। তবে পাব্লিক্ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষকের নেতৃত্ব, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশ, পরীক্ষকদের "মিটিং" Scrutineer দের Scrutiny, প্রধান পরীক্ষকদের পুনঃ পরীক্ষা প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষকদের পরীক্ষার মান অনেকটা সার্ব্বজনীন হইয়া পড়ে। সাধারণ পরীক্ষকগণ ও প্রধান পরীক্ষক ও স্ক্রুটনিয়ারদের" পুনঃ পরীক্ষার ভয়ে ব্যক্তিগত খুশী খেয়াল অনুসারে নম্বর দিতে সাহস করেন না; সেখানে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা ব্যক্তিগত পরিচয় থাকেনা বলিয়া অন্যায় ভাবে বিচার করিবার প্রলোভনও থাকে না।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই সমস্ত প্রতিশেধক ব্যবস্থা নাই। কাজেই পরীক্ষা মানের সার্ব্বজনীনতা সেখানে দুর্লভ। প্রশ্ন উঠিতে পারে—পাব্লিক্ পরীক্ষায় যেমন প্রধান পরীক্ষক থাকেন, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেও তেমনই প্রধান শিক্ষক আছেন, যাঁহার তত্ত্বাবধানে সাধারণ পরীক্ষকগণের খুসি খেয়াল নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। খানিকটা পারে সত্য, কিন্তু সেটা পর্য্যাপ্ত নহে, কারণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞ নহেন; কাজেই তাঁহার তত্ত্বাবধান খুব কার্য্যকরী হয় না। এক একটা বিষয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়ার শিক্ষককে দিয়া তিনি খানিকটা কাজ করিতে পারেন বটে, তবে তাহাও ফলপ্রসূ হয় না। কারণ এই সব সিনিয়র শিক্ষকও প্রাইভেট টিউসনি প্রভৃতি করেন। নিজেদের খাতাগুলি দেখিবার পর অপরের খাতা Scrutiny করার সময় তাঁহাদের নাই।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার আর একটি অসুবিধা হইতেছে ইহাতে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রাখা কঠিন হয়। প্রতিদিনের অধ্যাপনার মধ্য দিয়া শিক্ষকদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রশ্নগুলি হয়ত বাহির হইয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ছাত্ররাও শিক্ষকদের রুচি বিরোগ সম্বন্ধে পরিচিত বলিয়া তাহারা সম্ভাব্য প্রশ্ন আন্দাজ করিতে পারে।

উত্তরের সমীক্ষণের দিক দিয়াও আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অসুবিধা আছে। এক্ষণে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী কেহই কাহারও অপরিচিত নহে। নানা সম্পর্কে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত, নানা বন্ধনে আবদ্ধ। ফলে বিদ্যাবত্তার বিচারের ক্ষেত্রে অন্যতর ব্যাপারে বিবেচনাও অনুপ্রবেশ করে এবং বিদ্যার সমীক্ষণটি প্রভাবান্বিত হয়। যে ছাত্রটি শান্ত, বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির, যে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল—সে হয়ত আর একটি উদ্ধত প্রকৃতির দুর্দ্দান্ত ছাত্রের সহিত একই রকম উত্তর লিখিয়াও বেশী নম্বর লাভ করিবে। ভাল আচরণের পুরস্কার যে একটা থাকা উচিত, তাহা অনস্বীকার্য্য। তাহা হইলেও সে পুরস্কারের ক্ষেত্র পৃথক হওয়া উচিত। পরীক্ষার সফলাঙ্কটি নির্জ্জলা বিদ্যাবত্তার ব্যাপারেই সীমায়িত থাকা উচিত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময় সব ক্ষেত্রেই তাহা হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয় থাকার জন্যই প্রীতি-বিরক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় পরীক্ষার বিচার।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ত্রুটি সংশোধনের উপায়

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অসুবিধা এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি অনেকখানি হ্রাস পাইতে পারে যদি আমরা ছাত্রদের বিশেষ একটি পরীক্ষার ফল না লইয়া সমস্ত পরীক্ষাগুলির গড় (average) গুলি গ্রহণ করি। একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষকগণ ছাত্রকে যে নম্বর দিয়া থাকেন তাহার গড় হিসাবের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীনতা এবং নির্ভরতা

থাকে। ব্যক্তিগত পরীক্ষকের খুশীখেয়ালের অনিশ্চয়তা এই গড় নম্বরের মধ্যে ততটা থাকে না।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অন্যতর অসুবিধা

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার আরও একটি অসুবিধা আছে। প্রাইভেট-ছাত্রদের যদি পাবলিক্ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তাহা হইলে প্রশ্ন আসে—"প্রাইভেট ছাত্রদের পাব্লিক্ পরীক্ষায় সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে কি?" আমাদের মনে হয় তাহা ঠিক হইবে না।

তবে এই প্রশ্নের সমাধান আছে। প্রাইভেট ছাত্রদের কাছে পরীক্ষার প্রতিযোগিতা বা ক্রমিক স্থান অধিকারের প্রশ্নটা ততটা বড় কথা নহে, যতটা হইতেছে পরীক্ষায় পাশ করা। কাজেই তাহাদের জন্য আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অনুপূরক অংশটির বিচার বাদ দিয়াই একটা পাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর জন্য আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অনুপূরকটুকু রাখিতেই হইবে।

বিহার প্রদেশে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পাব্লিক্ পরীক্ষার অনুপূরক হিসাবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সেখানে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন চলিতেছে। স্কুলপরিদর্শকদের দল স্কুল পরিদর্শনের সময় দেখিয়াছেন ছাত্রদের বাড়ীর কাজের (home work) খাতাপত্র ঠিকভাবে দেখা হয় না। ঠিকভাবে দেখা হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ খাতাপত্র ঠিকভাবে দেখিতে হইলে যতটা অবসরের (leisure) প্রয়োজন হয়, ততটাঅবসরের ব্যবস্থা কোনও স্কুলেই নাই। ছাত্রের অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা খুব কার্য্যকরী হইবে না।

উপসংহার

তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্ত কি হইবে? আমরা প্রথমে দেখিয়াছি পাব্লিক্ পরীক্ষার ব্যর্থতা। পরে দেখিলাম, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অসুবিধা।

তাহা হইলেও আমাদের মনে হয় প্রাথমিক অসুবিধা যতই হউক না কেন, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাকে পাব্লিক্ পরীক্ষার অনুপূরক হিসাবে একটা মর্য্যাদা দিতেই হইবে। সে পরীক্ষার বিধিটা "নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা" (objective test) হইবে যখন "প্রবন্ধ জাতীয়" (Essay type of test) পরীক্ষা হইবে তাহা বড় কথা নহে। পরীক্ষার প্রণালী যাহাই হউক না কেন, আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাকে বহিঃপরীক্ষার অংশ হিসাবে মনে করিতেই হইবে।

সেসনের শেষে বহিঃপরীক্ষার মধ্যে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের যে আকস্মিকতা (element of chance) আছে, তাহা হইতে প্রতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করা যায় না। এই আকস্মিকতা নানা দিক দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে; প্রশ্নপত্র রচনা, উত্তর লিখিবার সময় ছাত্রদের শরীর-মনের অবস্থা, সম্ভাব্য প্রশ্নের প্রস্তুতির কথা অবহেলা, পরীক্ষকের মানসিক অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণেই পরীক্ষার ফলটি প্রভাবান্বিত হইতে পারে। তাই আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তার ত্রুটি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দ্বারা অনেকখানি সংশোধিত হইতে পারে।

সারা সেসন ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার নম্বরের "গড়" (average) এর মধ্যে অনিশ্চয়তা বা আকস্মিকতার বিপদ নাই বলিলেই চলে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার একমাত্র অসুবিধা হইতেছে ইহার সার্ব্বজনীন মানের অভাব। অবশ্য সার্ব্বজনীন মান পাব্লিক্ পরীক্ষার মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কাজেই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মধ্যে সার্ব্বজনীনতা নাই বলিয়া তাহাকে সরাসরি অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার ভাল দিকগুলি কাজে লাগাইবার জন্য তাহার প্রবর্তন করাই বিধেয়। "আদর্শ ভালো" যদি অনধিগম্য হয় তাহা হইলে "যথা সম্ভব" ভাল লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সম্ভাব্য সুফল

পাব্লিক্ পরীক্ষার অনুপূরক হিসাবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রবর্তন করিলে ছাত্ররা তাহাদের প্রাত্যহিক পাঠে অধিকতর মনোযোগী হইবে এবং শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। বর্তমান ব্যবস্থায় ছাত্রদের মনে মনে একটা ধারণা আছে যে যদি পরীক্ষার পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তৈয়ারী করিয়া পাব্লিক্ পরীক্ষায় পাশ করিবার আশা থাকে, তাহা হইলে স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলেও চলে, দৈনন্দিন পাঠে মনোযোগী না হইলেও চলে। এই মনোভাবটি ছাত্রদের মধ্যে একটা স্পর্দ্ধার ভাব জাগাইয়া তুলে; ইহা নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলগুলি যদি পাব্লিক্ পরীক্ষার ফলের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে ছাত্রদের এই প্রতিস্পর্দ্ধার ভাব কাটিয়া যাইবে, তাহারা নিছক স্বার্থ-বোধেই শ্রদ্ধাশীল ও মনোযোগী হইবে।

অবশ্য এই স্বার্থ-বোধ জিনিসটা কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরা কাজকে ঠিক "ইনভেষ্টমেন্ট" হিসাবে গ্রহণ করে না। শাস্তি পুরস্কারের দ্বারা তাঁহাদের মর্ম্মও নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁহারা কর্ম্মযোগী গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই তাঁহাদের কর্ম্ম-ধারা। কিন্তু এই কর্ম্মযোগীর অবস্থাটা সকলের পক্ষে অধিগম্য নহে। কর্ম্মের প্রাথমিক স্তরে কোন লোকের পক্ষেই ইহা অধিগম্য নহে। শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের যুগে শাস্তি ও পুরস্কারই আমাদের কাজের প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা শাস্তি ও পুরস্কার উভয় দিক দিয়াই কাজ করিবে। এক দিক দিয়া ইহা নিছক স্বার্থ বোধের প্রেরণায় ছাত্রদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবে, অপর দিক দিয়া ইহা অমনোযোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করিবে। শ্রদ্ধা ও গুরু শুশ্রূষা যাহা বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সহায়, তাহ এই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা দ্বারা অনেকখানি পরিমাণে সৃষ্ট হইবে।

অবশ্য আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যে বিপদ নাই তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত ইহা অন্যায় আত্মীয়-বাৎসল্য, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষকদের সাধুতাকে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

তবে এই সম্বন্ধে যতটা ভয়ের আশঙ্কা করা হইতেছে, ততটা ভয়ের কারণ হয়ত নাই। প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধান, অন্যান্য শিক্ষকদের সতর্ক দৃষ্টি, ছাত্রদের স্বার্থহানিজনিত ঈর্ষা দ্বন্দ্বের সমালোচনা প্রভৃতির জন্য পক্ষপাতিত্বের অন্যায়টা ব্যাপক ভাবে করা সম্ভব হইবে না। এবং অন্যায় করিলেও তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা খুবই আছে।



যেখানে শেষ সেখানেই সুরু

অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র এম-এ

—'যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়—এক সঙ্গে খেতে বসবো'—জেবুন্নিসার কথাটি কানে এলো।

আল্লাবক্‌স তখন ঘরে ফিরেছে মসজিদ থেকে নামাজ সেরে। ও বল্‌লে—'দাঁড়াও মা, দম্ ফেলে নিই—'

—'একটুতেই এই বয়েসে হাঁপিয়ে উঠিস্'—আঠারো বছরেই এই রকম, এখন তো আস্তকাল পড়ে রয়েছে রে?'—

আল্লাবক্‌স মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেল। জেবুন্নিসা কিছু আগে ফিরে এসেছেন মাতৃসদন থেকে। এখানকার উনি উপসেবিকা। রোজই হাড়ভাঙা খাটুনি, তার ওপর আছে দায়িত্ব। বিশ বছর ধরে এই প্রসূতি-সদনে চলেছে একঘেয়ে কাজ। বৈচিত্র্য কিছু নেই, আছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ডিউটি সব সময়ে এক ভাবেই পড়ে না, কখন রাত্রে কখন বা দিনে। জরাজীর্ণ দেহের ওপর দিয়ে চলে গেছে অতগুলি বছর।...

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের দীপ-শিখাটি মিট্ মিট্ করে জ্বল্‌ছে। ব্রহ্মপুত্রের চরে দেখা যায় বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেত, সুপারিকুঞ্জ আর নলখাগড়ার বন। চেয়ে দেখেন দীপের প্যানে—এই দীপ, একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে! মানুষের জীবনও তাই। ক্রমে রাত্রির পদচারণা সুরু হোলো। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কোন রকম শব্দ কানে আসে না। স্তব্ধ নীরব পরিবেশ। তমসাচ্ছন্ন পল্লী। বাসি ফুলের মত দূরদিগন্তের চাঁদ পাহাড়ের কোলে গেল অস্ত। এটা ভারতের একেবারে পূর্বপ্রান্ত—ব্রহ্মপুত্র আর হিমালয়ের চলেছে লুকোচুরি খেলা।

পূর্ব্ববঙ্গ। এ গ্রামখানি তারই বুকে উঠেছে গড়ে। ছোট্ট কুটীর। জেবুন্নিসা আর আল্লাবক্‌স, তৃতীয় ব্যক্তি নেই কেউ। জেবুন্নিসার কত আশা আল্লাবক্‌স নামজাদা ডাক্তার হবে, প্রতিজ্ঞাও করেছেন—যেমন করে হোক ওকে ডাক্তার করতে হবে, নিজেকে তো ডাক্তারের তাঁবেদারী করেই পেট চালাতে হোলো। আল্লাবক্‌সের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিজের মনে বলেন—'এই আল্লাবক্‌স পরগাছা, ওকে টবে সাজিয়ে রেখেছি কিন্তু'...আর ভাবতে পারেন না। চোখের কোণে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

আল্লাবক্‌স মায়ের সঙ্গে খেতে বস্‌লো। জেবুন্নিসা বল্‌লেন—'হ্যাঁরে, কি একটা কথা শুনছি'—

আল্লাবক্‌স খেতে খেতে বল্‌লে—'কি শুনছ বলো তো? দাঙ্গা—কেমন? এই তো—'

'—ঠিক ধরেছিস্ তো, লক্ষ্মীটি! তুমি যেন এসব ব্যাপারে থেকো না—'

—'তা কি হয়? রক্তের বদলে রক্ত নিতে হবে, আজ আমরা সব এককাট্টা হয়েছি—'

জেবুন্নিসার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। ওঁর লক্ষ্য আল্লাবক্‌সকে মানুষ করা, ঘাতক করা নয়। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ওকে বুঝালেন, ও কিন্তু বেঁকে বসেছে। জেবুন্নিসা পেলেন মনে দারুণ আঘাত। নিজের মনে বল্‌লেন—'আগে তো কখন এ রকম ছিল না—সাতপুরুষ ধরে আমরা এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে আস্‌ছি, কিন্তু একি ব্যাপার? মানুষ হত্যা করে কখন—'

উনি আল্লাবক্‌সকে বল্‌লেন—'এই গ্রামে যা কখনও ঘটেনি, কেউ দেখেনি ঘট্‌তে, সেখানে হত্যায় মেতে উঠবে তোমরা, লজ্জার কথা নয় কি? সব মানুষ একই বিধাতার গড়া, একই দেশে মানুষ—'

জেবুন্নিসার কোন কাতরোক্তি আল্লাবক্সের মর্ম্মস্পর্শী হোলো না। ভোর না হোতেই ও বেরিয়ে পড়লো—

বেশ কিছুদিন ধরে সাম্প্রদায়িকতার ঝঞ্চাবর্ত্তে বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে—আল্লাবক্সের মাথায় খুন চেপেছে, বিধর্ম্মী হলেই রক্ষে নেই—প্রতিবেশীরা ওর ছুরির ফলা দেখে শিউরে ওঠে, ওর হাতে প্রাণ দেয়। গাঁয়ের সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন, বন্ধু প্রীতি সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। সারা দেশ জুড়ে চলেছে তাণ্ডব নৃত্য—ঘৃণা আর বিদ্বেষ। আল্লাবক্স বধ-যজ্ঞে অংশ নিলেও জেবুন্নিসার নারী-হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে উঠলো। আর্ত্ত-পীড়িতের সেবা করেই তিনি আস্ছেন। মুসলমান হোলেও তাঁর মধ্যে নেই জাতি-বিদ্বেষ। তিনি লক্ষ্য কর্‌ছেন আল্লাবক্স তাঁরই চোখের সামনে পৈশাচিক লীলায় উন্মত্ত। 'নাঃ ওকে আর মানুষ করতে পারলাম না'—কথাটা চাপা বেদনার মধ্য দিয়ে ওঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। ওর কাণ্ড-কারখানা দেখে আরও অবাক হয়ে গেছেন উনি। কিন্তু একদিন একটা পরিবারের সবাইকে হত্যা করে যখন মাতৃসদনের কাছে দু'মাসের শিশুকে কর্‌লো নৃশংসভাবে হত্যা—জেবুন্নিসা আর থাক্‌তে পার্‌লেন না। আল্লাবক্সের কাছে এসে বল্‌লেন—'শুনে যা, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে—'

আল্লাবক্স মায়ের ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা কর্‌তে পারলো না। বল্‌লে—'ডাক্‌ছ কেন ?—'

জেবুন্নিসা কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। আল্লাবক্স একটু কাতর হোলো। জেবুন্নিসা ওকে প্রসূতি-সদনের একটি নির্জ্জন ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন।

বললেন—'এম্নিভাবে মানুষ খুন কর্‌ছিস্ তুই, এমন একদিন এসেছিল সেদিন আমি না থাকলে তোরও ঐ বাচ্চাটার মত অবস্থা হোতো জানিস্—'

আল্লাবক্স বল্‌লে—'কথাটা ঠিক বুঝতে পার্‌ছিনে, একটু খুলে বলো তো—'

'—তবে শোন্—'

ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন জেবুন্নিসা। আল্লাবক্স ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে। তার-পর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌তে থাকেন—একটি মেয়ের কথা বলছি—তখন তার বয়েস বড় জোর কুড়ি-একুশঃ স্বামীকে হারালো, রইলো না পৃথিবীতে কেউ। তার নিজস্ব বল্‌তে ছিল রূপ আর যৌবন। সব-হারা তরুণী, আশ্রয় পেলো গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে—তাও চাকরাণীর কাজ। পেট চালাতে হবে তো ? জমিদারের ছোট ছেলেটির নজর এড়িয়ে যায় না, তারও বয়েস তাজা। সুন্দর সুপুরুষ। এলো কাছে, প্রলুব্ধ কর্‌লো নানাভাবে। কেমন ক'রে সংযমের বাঁধ দিয়ে রাখবে নিজেকে ! শেষে আর ঠিক থাকতে পারলো না। এদের অবৈধ প্রণয় কেউ জানলো না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো—'

এই পর্য্যন্ত বলেই জেবুন্নিসা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। তাঁর যেন শ্বাসরোধ হয়ে আস্‌ছিল। কোনও প্রকারে নিজেকে সংযত রেখে বল্‌তে থাকেন—'তারপর—হ্যাঁ, তারপর—ওর ভেতর মা হবার লক্ষণ সব প্রকাশ পেলো। ভ্রূণ নষ্ট করবার জন্যে সম্ভব-অসম্ভব সব রকম চেষ্টাই করা হোলো, কিন্তু সব বৃথা হয়ে গেল। জমিদারবাবু ভীত হয়ে পড়লেন, বের করে দিলেন বাড়ী থেকে পাছে দুর্নাম রটে যায়। এর কোন প্রতিকার নেই, ওর পক্ষে প্রতিকার করাও অসম্ভব, থামে ঢুঁ মারলে নিজেরই কপাল ভাঙে। সহায়-সম্বলহীনা তরুণী দাঁড়ালো এসে পথে। আমার সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা। দেখি একটা গাছের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মেয়েটি। বল্‌লাম—'বাছা, কি হয়েছে তোমার ?' —ওর রূপ দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আরও ওর প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পেলো। বল্‌লে—'যা হয়েছে আমার, তার জন্যেই এসে দাঁড়িয়েছি পথে'—ওর জীবনের ইতিহাসের কয়েকখানি পাতা খুলে দিলে আমার সাম্‌নে। বিস্মিত হলাম, ব্যথাও পেলাম। সে সময়ে শিক্ষানবিশী শেষ করে মাতৃসদনে সবেমাত্র নার্সের কাজে ঢুকেছি। আমার সম্বন্ধে ও জান্‌তে পেরে তাকে উদ্ধার করতে বল্‌লে —বললাম, নষ্ট করাটা অপরাধ—তা হয় না—আমার হাত-খানি চেপে ধরে কাতরোক্তি করলো, ক্রমে অনর্গল অশ্রুপাত কর্‌তে থাকে। নিষেধ কর্‌লাম, সান্ত্বনা দিলাম। কোন ফলই হোলো না। বল্‌লে—'জগতে আমাকে বাঁচতে হোলে, মুখ দেখাতে হোলে, যে ভাবেই হোক নিজের সন্তানকে নষ্ট করতেই হবে। জানি, এ আমার নাড়ীছেঁড়া ধন, এর ওপর আমার মায়া হওয়া উচিত—কিন্তু তা হয় না, একটা বোঝা—ভবিষ্যতের একটা বিরাট বোঝা, চাঁদের

কলঙ্ক—যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তা হোলেও কপালে আছে বিড়ম্বনা, বিরাট দুর্ভোগ—শুধু দুটো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষাটাও পর্য্যন্ত করা হবে না। বরং এখুনি নষ্ট করে দিন—'

ও সে সময়ে সমাজে একঘরে হয়েই আছে। নিয়ে এলাম আমার কাছে। আমার ঘরে দিলাম আশ্রয়। আশ্বাস দিলাম সন্তান প্রসব করলে আমিই মা হবো, লালন পালনের ভার আমারই। ভ্রূণ হত্যার পাপ থেকে ওকে দিলাম নিষ্কৃতি। প্রসবের পর ও যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে, দরকার বোধ করলে শিশুকে দেখেও যেতে পারে এমন কথা বল্‌লাম। যে তরুণী কেবলই চেষ্টা করেছে গর্ভ নষ্ট করতে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে দেখলাম অন্য প্রকৃতির। সন্তানকে মোটেই কাছ ছাড়া করে না। স্মরণ করিয়ে দিলাম পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি। সমস্যায় পড়লো। কিন্তু উপায় নেই। পালিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকে সন্তানকে সঁপে দিয়ে আমার হাতে।

আমার কুমারীহৃদয়ে ছিল একটা সন্তানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পেলাম তাকে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বাড়তে লাগলো। সেই আমার হোলো অবলম্বন। কিন্তু তার মা, সে নারী, নারী-জনোচিত সব রকমের দুর্ব্বলতা তার মধ্যে বর্ত্তমান—তার আছে রূপ যৌবন, আছে উদগ্র লালসা। বেরিয়ে পড়লো একটা পাটের কারবারের কর্মীর সঙ্গে, বিয়ে করবে তাকে স্থির করলো। সে চলে গেছে, রেখে গেছে স্মৃতি।

সেই সন্তান 'তুমি!' আমি তোমার প্রকৃত মা নই। ধরো তোমার যদি ঐ রকম অবস্থা হোতো?'

জেবুন্নিসা অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। আল্লা-বকসের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলি জট্ পাকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। এরপর আর তাকে ছুরি নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়নি।

শ্রীঅরবিন্দের উপনিষদ প্রসঙ্গ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এযে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্যপল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা উর্ধগামী হয়ে রয়েছে। এ হচ্ছে বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ বা সার। কথায় বলে যা নেই মহাভারতে তা নেই ভারতে, তেমনি সব বোধ ও বোধির মূল খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে উপনিষদে সুত্রাকারে। ভারতের সব দর্শন সব ধর্ম সব চিন্তার প্রবাহ উপনিষদকে স্বীকার করেছে—এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদও উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত। শুধু তাই নয়, ভারতের বাহিরে সুফীরা, বা চীনের তাও তত্ত্বাবলম্বীরা এবং আধুনিক ইউরোপের বহু মনীষাও তাঁদের মতবাদে উপনিষদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই উপনিষদ শুধু গভীর ধর্মশাস্ত্র নয়, বোধি দীপ্ত তত্ত্ব কথা নয়, চুলচেরা বিতর্ক নয়, অপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রতীক কাব্য নয়—সব মিলিয়ে সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের ইঙ্গিতও সেখানে মেলে। তাদের রচয়িতারা ছিলেন "কবয়ঃ সত্যশ্রু" "ঋষয়" "ধীরাঃ" তাঃ সত্যদ্রষ্টা, সত্যশ্রোতা, ধীমান, ভাবুক।

শ্রীঅরবিন্দের 'উপনিষদ প্রসঙ্গ' পড়তে পড়তে এই কথাগুলিই মনে হচ্ছিলো। শ্রীঅরবিন্দের ভাব ও ভাষাকে বাংলায় চমৎকার ভাবে রূপায়িত করেছেন পণ্ডিচারী আশ্রমেরই একজন নীরব সাধক ও নিরলস কর্মী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন মহাশয়। এর পূর্বে তিনি কেনোপনিষদ ও ঈশোপনিষদ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদের শিক্ষা কতো ব্যাপক, কতো উদার, কতো গভীর তার কথা বলতে গেলে উপনিষদের কথাই উদ্ধৃত করতে হয়—স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিতঃ—স্বে মহিম্নি।

তাই শ্রীঅরবিন্দের কথার অনুবৃত্তি করে লেখক বলছেন "বেদ-উপনিষদ কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শনের মূল নয়, ভারতের সমস্ত কাব্য-সাহিত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার সব ধারারও উৎস। যে আত্মা, যে চরিত্র, যে মনীষা তাতে গড়ে উঠেছে, তা থেকেই সব মহৎ দর্শনশাস্ত্র উৎকীর্ণ হয়েছে, ধর্মতত্ত্ব সব স্থাপিত হয়েছে, রামায়ণ মহাভারতে তারই যৌবনের বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে, পরিণত বয়সে শ্রেষ্ঠ কাব্যের যুগে সেই মনীষাই অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সব বিদ্যাবুদ্ধিগ্রাহ্য সূত্রে বেঁধেছে, জড়বিজ্ঞানে বহু মৌলিক আবিষ্কার করেছে, রসবোধ—জৈব ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার এমন উজ্জ্বল সম্পদ সৃষ্টি করেছে, আধ্যাত্মিক ও চেতসিক অভিজ্ঞতা তন্ত্রপুরাণে পুনরুজ্জীবিত করেছে, বর্ণ ও রেখা নিয়ে মহিমাও সৌন্দর্যের প্লাবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, পাথরে ও ধাতুতে তার চিন্তা ও সূক্ষ্মদর্শন রূপায়িত করেছে, পরবর্তী কালে সব প্রাদেশিক ভাষাতে নূতন প্রণালীতে নিজের আত্মাকে প্রকাশ করেছে, এখন আবার রাহুগ্রাসমুক্ত হয়ে, পার্থক্য সত্ত্বেও সেই একই রূপ নিয়ে, নূতন প্রাণের নূতন সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে জেগে উঠেছে।" লেখককে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় তাঁর এই সামগ্রিক দৃষ্টি খুলেছে, নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন সেই অপূর্ব রহস্যের ক্রমবিকাশ ও প্রকাশকে।

'অধ্যাত্মবেদেতদ' সেই তৎস্বরূপের কাছে উপনীত হতে হবে—তারই পন্থা নির্দেশ করলেন ঋষিরা উপনিষদে। 'আমাকে উপনিষদ উপদেশ দিন বলেছিলে তুমি, এই তোমাকে উপনিষদ বলা হল'—এইখানেই মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য—এইখানেই সংহিত অর্থাৎ সংগৃহীত সমস্ত মন্ত্র—এখানেই আবার আছে ক্রিয়াকাণ্ডের আখ্যায়িকা ও ব্যাখ্যা। তাই 'একমেবা-দ্বিতীয়ম' এই মহত্তম অনুভূতির পরিপূরক হিসেবেই যোগ দিতে হয় আর এক সত্যতম সিদ্ধান্ত—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। মুক্তি ও ভুক্তিকে এক করে না জানলে নির্বাণ ও ভবকে সম্যক রূপে পাওয়া যায়না। পরিপূর্ণ যোগের লক্ষ্য যে তাই। শ্রীঅরবিন্দ তাই বললেন—Life in its unfolding must also rise to ever new provinces of its own being. But if passing from one domain to another we renounce what has already been given us from eagerness for our new attainment, if in reaching the mental life, we cast away or belittle the physical life which is our basis or if we, reject the mental and physical in our attraction to the spiritual, we do not fulfil integrally nor satisfy the conditions of His self-manifestation.

তাই সামগ্রিক পরিবর্তন দরকার সেই অখণ্ড দিব্যজীবনের জন্য—সেই বিশুদ্ধ আধারেই যজ্ঞীয় সোমকে ধরা যায়। উপনিষদ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বললেন—ঋষিরা এই সত্যের অনুভূতিতে এসেছিলেন, যদিও তার সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়নি। ছান্দোগ্য প্রসঙ্গে এই কথাটা স্পষ্ট হয়েছে। উপনিষদ মাত্রেরই প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছান্দোগ্যের আরম্ভ থেকেই বোঝা যায় যে তার উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মের অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতিভূত যে বৃহৎ—তার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগের পথ প্রদর্শনই ঋষিদের কাম্য। এর একটি প্রতীক বা সিম্বল হল 'ওঁ'—এবং তার সঙ্গে যুক্ত হল, 'উদগীথ' ও 'উদগায়তি' শব্দ দুটি। ছান্দোগ্য শ্রীঅরবিন্দের মতে মানবচিন্তার একটি পরম গৌরবময় ও কৌতূহলোদ্দীপক যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের এই গভীর মর্মে প্রবেশ করেছিলেন—তাঁর কথায়—ছান্দোগ্য বলেছেন—মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলছে সেইখানে এই ওং। যেখানে একদিকে ঋক, একদিকে সাম, একদিকে বাক্য, একদিকে সুর, একদিকে সত্য, একদিকে প্রাণ, সেইখানেই পরিপূর্ণতার সংগীত ওং। মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয়নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে—অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয়, সূর্যে নয়, মানুষে নয়—অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে, যা কানে নয়, চোখে নয়, বাক্যে নয়—মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই পরিপূর্ণতাকে স্বীকার করাই উপনিষদের প্রথম শিক্ষা।

তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রবিষ্ট

উপনিষদের ব্রহ্ম শুধু নিমিত্ত কারণ নন, উপাদানকারণও বটে। যিনি এক, তাঁর বহু হতে ত কোন বাধা নেই। তাইত শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—সব যেন রসে রয়েছে—সচ্চিদানন্দ রসে। আমাদের মুস্কিল হয়েছে যে ভারতের

অধ্যাত্মদর্শনের ইতিহাসে শঙ্করাচার্যের অপূর্ব প্রভাব। সাধনা, মেধা ও মনীষার এক বিরাট সমন্বয় তিনি। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—জীব ব্রহ্ম বই নয়, মিথ্যা মায়াময় জগৎ পরিহার করে নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ—শঙ্করকে আমরা অনেকটা এইভাবেই গ্রহণ করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি আমরা ভুলে যাই যে সত্যই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা মায়ামাত্রই হয়—তাহলে যে অন্তঃকরণ দ্বারা আমি শ্রবণ, মনন, বিচার করছি সেটাও অজ্ঞান ও মিথ্যা। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বললেন, জ্ঞান যদি নিষ্ক্রিয়ই রইলো, তার তেজে যদি জগতের কিছু অন্ধকার দূর না হল বা দৈহিক জীবন আরও উন্নততর রূপ না নিল, তাহলে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের সার্থকতা কোথায়। শংকর অবশ্য কি বলতে চেয়েছিলেন সেই নিয়ে শঙ্কর ভাষ্যের বহু ভাষ্য হচ্ছে। অনেকেই বলছেন যে শঙ্করের কাছে জগৎ negated নয়, নতুনভাবে ব্যাখ্যাত—ব্রহ্মই জগতের ভিত্তি কিন্তু সে ব্রহ্ম জগত হতে ভিন্ন নয়। কিন্তু মায়াকে অঘটন ঘটন পটিয়সী বা সদসৎ না বলে ব্রহ্মকে যদি শঙ্কর তাই বলতেন অর্থাৎ logic of the Infinite যদি স্বীকার করতেন, তাহলে হয়ত তাঁর উপনিষদ ব্যাখ্যায় যে শূন্যতা থেকে গিয়েছে এবং যাকে পরিপূর্ণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ—তার বিচারের প্রয়োজন হতনা। অবশ্য তিনি পূর্ণ অদ্বৈতবাদী নন, বিশ্বের ব্যবহারিক সত্য তিনি স্বীকার করেছেন, মায়ায় উপহিত ব্রহ্মের বিশ্বেশ্বর দেবদেবীরূপও গ্রহণ করেছেন। লেখক হয়তো এই কথাটির উল্লেখ করলে শঙ্করের প্রতি সুবিচার করতেন। কারণ আজও ভারতের চিন্তার ইতিহাসে শঙ্করের প্রভাব অপরিসীম।

এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় গভীর মনন-সাধনলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী ও সুন্দর ভাষায় প্রকাশমহিমার পরিচয় দেয়। বেদ-উপনিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, উপনিষদের সাহিত্যশ্রী, বৃহদারণ্যকের 'অশ্ব' শব্দের জড়ধর্মী অথচ জড়াতীত ব্যাখ্যা এবং ঐতরেয়ের এক অধ্যায়ের একটি নূতন ও মৌলিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে উপভোগ্য।

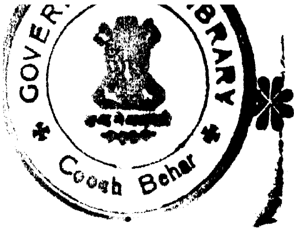
রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষ করি—দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে—ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি Personal না impersonal। প্রেমের মধ্যে এই না, হাঁ একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটি কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিকে বলে আমি আছি, আর একদিকে বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই, "আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনা। একদিকে বলা হচ্ছে—তাঁকে জানতে গিয়ে বাক্য ফিরে আসে, মন ফিরে আসে—একেবারে সাফ জবাব—আবার বলা হচ্ছে আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন, একবার জানো তাঁকে, সেই আনন্দকে—আর কিছু ভয় নেই। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম বিজ্ঞাতম অবিজানতাম—যিনি বলেন তাঁকে আমরা পাবনা—তার মধ্যে আমরা হব। ছাড়তে ছাড়তে, বাড়তে বাড়তে, মরতে মরতে বাঁচতে, বাঁচতে আমি কেবলই হব। 'পাওয়া' মানে এক অংশে পাওয়া। 'হওয়া' মানে সমগ্রভাবে হওয়া। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি আমাদের দুজনের মধ্যে লীলা চলছে, এই আমাদের পরম গতি, পরম সম্পৎ।

গন্ধরাজ

কৃতী সোম

সে অনেক সুরভি ছড়ায়
প্রতিদিন : যেন গন্ধরাজ।
অন্তরিত কথার ফেনায়
খুশি ঢালে হৃদয়ের মাঝ।
চেতনায় অপার বিস্ময়
আদি অন্ত বুঝেছি স্বরূপ ;

স্বপ্নিল বাসনার জয়
ভাবি আমি ; শান্ত, সাদা রূপ।
আকাশেতে আলোর আরতি :
পৃথিবীতে আমার প্রাণের।
সম্মিলনে কি এমন ক্ষতি
যদি ফোটে ফুল হৃদয়ের !



❋ মেয়েদের কথা ❋

লক্ষ্মী কেন চঞ্চলা ?

মহামায়া দেবী

আমার আগের একটি প্রবন্ধে আমরা মেয়েরা কত রকমে ভুল করে নিজেদেরই সাংসারিক ও সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলি, তারই কিছু আলোচনা করেছি।

শাশুড়ী, বধূ, মা, কন্যা, প্রতিবাসিনী বা বান্ধবী বিভিন্ন পর্য্যায়ে একই মেয়েজাতের বিভিন্নরূপ। সুযোগের বা ক্ষমতার অপব্যবহার যে মুহূর্ত্তে আমরা করছি সেই মুহূর্তেই সমস্ত মেয়েজাতের মর্য্যাদা ও উন্নতির গতিরোধ করে দাঁড়াচ্ছি। সংসার শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে না চললে সমাজ ও জাতির উন্নতি বা কল্যাণ কিছুতেই হতে পারেনা—এ বিশ্বাস কেবল আমার নয়, বহু মনস্বী ব্যক্তিরও এ ধারণা বদ্ধমূল ; তাই সকলের দৃষ্টি এই অতি-প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করাটাই আমার স্বধর্ম্ম মনে হয়।

আমার এই আলোচনাগুলির ফলে একটি সংসারও যদি আনন্দময় হয়ে ওঠে, কিছু চৈতন্যও যদি আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে জেগে ওঠে তাহলে আমার প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা বলে জানবো।

আসামের সাম্প্রতিক নারকীয় কাণ্ডাবলীর ও অন্যান্য নানা ঘটনার পর সতত: একটা কথা প্রায়ই মনে আসে, সারা ভারতের মধ্যে বিশেষ করে বাঙ্গালী জাতটার উপর মা লক্ষ্মী এত অকরুণ কেন !

বাঙ্গালী জাতটা যেন দিনের পর দিন দৈন্য, নিপীড়ন ও হতাশার মধ্যে ডুবে গিয়ে লক্ষ্মীছাড়া জাতে পরিণত হতে চলেছে।

মনে প্রশ্ন জাগে বাঙ্গালী জাতটার উপর মা লক্ষ্মীর কৃপা কেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে, কেন বাংলার ঘরে ঘরে এত কান্নার রোল, কেন এত হাহাকার, কেন এত অশান্তি ?

রাজনৈতিক কূটনীতির উপর দোষ চাপালেও অদৃষ্টবাদী হিন্দু আমরা, ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারিনা। বাঙ্গালীর ভাগ্যহীনতার মূলসূত্র খুঁজতে গেলে মনে হয় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নিজেদের পারিবারিক ঐক্যেরই এত অভাব যে—সে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অত্যাচার প্রতিরোধ করবার শক্তি ক্রমশঃ হারাচ্ছে।

পারিবারিক ঐক্য বলতে, বাঙ্গালী পুরুষরা তাঁদের প্রতি নির্ভরশীল, আস্থাশীল অসহায় স্ত্রী জাতির দায়িত্ব নিয়েও তার পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারছেন না। আমার কথার তাৎপর্য্য পরে ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করছি। আধুনিক যুগে বাইরে এর প্রকাশ খুব দেখা না গেলেও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীর অমর্য্যাদা ও তাদের দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জলই বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া আনছে।

বহুকাল যাবৎ উত্তর প্রদেশ ও বিহারে বসবাস হেতু এ দেশের পারিবারিক রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তুলনা মূলক ভাবে বিচার করে দেখেছি আমাদের বাঙ্গালী ঘরে মেয়েদের বিয়েতে যে উৎকট পণ-প্রথা আছে তা এদের মধ্যে প্রায় নেই। মেয়ে জামাইকে সাধ্যমত বস্ত্র অলঙ্কার আসবাবপত্র দেওয়া ও পাত্রের বাপের হাতে মোটা টাকা নগদ দেওয়া এক কথা নয়।

পাত্রের পিতা কিছু আজীবন পুত্রবধূর ভরণ পোষণের ভার নেননা, সে দায়িত্ব তাঁর পুত্রের, কিন্তু যেহেতু তিনি পুত্রকে খরচ করে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছেন সেই হেতু তাঁর অধিকার জন্মায় এই ভাবে সেই টাকা আত্মসাৎ করার অর্থাৎ পুত্রকে মানুষ করে তোলার কিছু বা পুরো অংশ মেয়ের বাপও নিক, অন্য বরাভরণ বা উপঢৌকন তো বাড়তির ভাগ। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন আসে মেয়ের মা-বাবা যে এই খরচের অংশীদার হবেন সেজন্য কি পুত্রর উপর দাবী তাঁরা কিছুমাত্র ছাড়েন বা পুত্রই কি

একবারও চিন্তা করে তাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার খরচ তার স্ত্রীর মা-বাপকেও বেশ কিছুটা বহন করতে হয়েছে ?

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে আজকাল-কার দিনেও শ্বশুরের 'সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র মেয়েকেও কেবলমাত্র বড়লোকের মেয়ে হওয়ার অপরাধে এবং পাছে সে পিতৃধনের গর্ব্বে অহঙ্কারী হয়ে ওঠে সেজন্য স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর সকলের তাকে দাবিয়ে রাখার নিরন্তর চেষ্টা। তার মর্য্যাদা-বোধকে ধূলিধূসরিত করাতে তাঁদের অপরিসীম উল্লাস।

চিরকালই পুরুষেরা ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, হাকিম, বিলাত-ফেরৎ বড় অফিসার ইত্যাদি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সদ্বংশজাত সুন্দরী বা সুশ্রী পাত্রী খোঁজ করে সামান্য অর্থের বিনিময়ে পুত্রের বিবাহ দেওয়া হতো। তখনকার দিনে অল্প বয়সে ছাত্র-অবস্থায় ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হতো, ছেলে যোগ্য হয়ে উপার্জ্জন করবার বহু পূর্ব্বেই সে হয়তো তিনটি সন্তানের পিতা হয়ে বসতো, সে ক্ষেত্রে বধূ সমেত ছেলের সংসার ও তার পড়াশুনার খরচ সবই তার বাপকেই চালাতে হতো। এখনকার দিনের মতো মেয়ের মা-বাপের মাথায় পণ বা আসবাবপত্রের গুরুভার চাপিয়ে নিজের সংসার গোছাবার চেষ্টা করতেন না তাঁরা। রূপের জোরে গরীবের মেয়ে ধনীর বধূ হয়েছে এতো আগেকার হামেশাই ঘটনা, কিন্তু এখন রূপ ও রূপোর চাঁদির পাল্লা দিতে দিতে মেয়েরা ক্লান্ত, অপমানিত ও মর্ম্মাহত।

এক্ষেত্রে পুরুষের দায়িত্ব কিছু নেই, বিশেষ করে আধুনিক যুবকদের—তা স্বীকার করা যায়না। সন্তানের জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দেওয়া ও তাকে বিবাহ দিয়ে স্থিতি করে দেওয়া প্রত্যেক মা বাপের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিটি শিক্ষিত ছেলে অনায়াসে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হাতে পারে তার বিবাহে নগদ অর্থ তার বাপকে সে নিতে দেবেনা ; কারণ এতে সে নিজেই তার পিতাকে ছোট করে ফেলছে। বিবাহ উপলক্ষে পাত্রপক্ষের তত্ত্ব-তাবাস ও ভোজের জৌলুস সেজন্য যদি কিছু কম হয় হোক তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু মেয়েরা তো পূর্ণ মর্য্যাদায় গৃহলক্ষ্মী রূপে আহুত হবে। পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন পিতা, তাকে উপযুক্ত ভাবে মানুষ করা তাঁর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য, ঠিক তেমনি কর্ত্তব্য মেয়ের বাপেরও তাঁর মেয়েকে সুসজ্জিত করে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো, কিন্তু এর মধ্যে নগদ অথবা পণ জিনিষটা মাথা তুলে দাঁড়ায় কেন ?

সেই বধূই তো একদিন তার সন্তানের জননী হবে, তার সাংসারকে সুখ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে তোলার জন্য সবরকমে নিজেকে সমর্পণ করবে, তবে কেন তাকে এই অসম্মানজনক পথ ধরে আনা হবে ? এই ভাবেই কি গৃহ-লক্ষ্মীকে বরণ করা যায় ? সেই জন্যেই তো আজ লক্ষ্মী চোখের জল ফেলে বাংলার ঘর থেকে বিদায় নিচ্ছেন।

এরপর আসে বিবাহিত পুরুষের নিজের গৃহলক্ষ্মীর প্রতি দায়িত্ব। আজকালকার ঠাট্‌বাট্, ড্রইংরুমে সোফাসেটির ঝলমলানি ও রুজ-লিপষ্টিকের ঘটায় বাঙ্গালী মেয়েদের চোখের জলের ঠিক মত হিসাব করা শক্ত। মেয়েরা এখন অনেক স্বাধীনতা পেয়েছে, চার হাত ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে থাকতে হয় না ইত্যাদি অনেক কিছু। এখন আর খুব শোনা যায়না। স্ত্রী মনোমত না হলেই নির্ব্বিকার-চিত্তে আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ বা বধূদের আত্মহত্যার খবর !

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও অসংখ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী আছেন, যাঁরা স্ত্রীর যথার্থ মূল্য দেওয়া কোন প্রয়োজন মনে করেন না। এখন আইনতঃ বাধে ও খানিকটা লোক-লজ্জার খাতিরে আরেকটি বিয়ে হয়তো করতে পারে না, তবে গোপনে মনতৃপ্তির ব্যবস্থা তাঁর ঠিকই আছে এবং তা তাঁর স্ত্রীর অগোচরেও নয়। মাথা গোঁজবার আশ্রয় ও সামান্য খাওয়া-পরার লোভটাই তো মেয়েদের বিয়ের উদ্দেশ্য নয়, যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, সে শান্ত সুখ-নীড় গড়ে তোলার লোভ মেয়েদের চিরন্তন, স্বামী নিজ হাতেই তা ধ্বংস করে নিজে অন্য স্ফূর্ত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সেখানে কি আশা করা যায় গৃহ-লক্ষ্মীর দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জলে সংসার আরও লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে ?

আরও এক জাতের পুরুষ আছেন যাঁরা অত্যন্ত হালকা প্রকৃতির। নারায়ণ-শিলা সাক্ষী করে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে অজস্র প্রতিজ্ঞা স্বীকার করে বধূকে গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার কোন মর্য্যাদা দেওয়াটা সম্পূর্ণ তাঁদের খেয়াল বা মর্জ্জির উপর নির্ভর করে।

একটি তরুণী মেয়ে তার আবাল্য পরিচিত ঘর, আত্মীয়-

স্বজন ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে, অচেনা ঘর করতে আসে কম্পিত হৃদয়ে—একমাত্র স্বামীর উপর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভালবাসা রেখে। স্বামীকে বিশ্বাস না করতে পারলে কোন মেয়েই এমন অনির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এই স্বামী যদি সত্যই তাঁর স্ত্রীর মর্য্যাদা রাখবার মত দৃঢ়চিত্ত না হন,তাহ'লে তাঁর বিয়ের মত একটি পবিত্র বন্ধনে না বাঁধা পড়াই ভাল মনে করি।

আবহমানকাল থেকে শ্বাশুড়ী-বধূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় ঘরে ঘরে চলে আসছে, এর মধ্যে যে গভীর মনস্তত্ব আছে তা অনেকেই জানেন, এবং আগের একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এতটুকু স্থিরবুদ্ধির লোক-মাত্রই এর মর্ম্ম বোঝেন, সে ক্ষেত্রে স্বামী যদি বুদ্ধিমান না হন, এই মনস্তত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রেখে tactfully না চলেন বা কান-পাতলা লোকের মত মা-বাপের কথামত বধূকে শাসন ও নির্য্যাতনের পথ ধরেন তা হলে সেই বধূর অবস্থা আর বর্ণনা করবার দরকার করে না। যেখানেই বধূ নির্য্যাতন সেখানে সাক্ষাৎভাবে ছেলের মাকে আমরা দায়ী করলেও, ছেলের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সে বধূকে নির্য্যাতন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কথা বর্ত্তমান যুগে দিনের আলোর মতই সত্য, কারণ মা-বাপের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী নাবালক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করার প্রথা আর নেই বললেই হয়। সাবালক, উপার্জ্জনক্ষম, শিক্ষিত স্বামীই নির্ব্বাচিত হন কন্যাপক্ষের দ্বারা তাঁর উপযুক্ত যৌতুকাদি সহ।

এক্ষেত্রে আমরা মেয়েরা কেবল স্বামীর মা-বাপকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে ক্ষান্ত থাকতে পারিনা, আমরা চোখের জল ফেলে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবো যে দেশে এমন পুরুষ থাকে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর কোন মর্য্যাদাবোধ থাকতে পারে বলে স্বীকার করে না, স্ত্রীর মা-বাপের প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে বলে ধারণা করতে পারে না, স্বামীর কঠোর শাসনে যে স্ত্রীর নিজের সংসার ও নিজের শিশু-সন্তানের উপর পর্য্যন্ত কোন জোর বা দাবী থাকে না, সেই পুরুষ বিয়ে করে লক্ষ্মীর কৃপা থেকে নিজেকে আরও বঞ্চিত করে কেন? তার আচরণে সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর মেয়েরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে, পুরুষ জাতের উপর কলঙ্কের বোঝা জমে উঠছে।

এ জাতীয় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সুন্দরী-কুৎসিতা, ধনী নির্ধন বা শিক্ষিতা-অশিক্ষিতার কোন তারতম্য নেই, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে স্বামী দেবতার বিবেক, ধর্ম্ম ও দায়িত্ব-বোধের খেয়ালখুশির উপর।

এখনও পরিত্যক্তা স্ত্রী, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা স্ত্রীরা লোক চক্ষুর আড়াল হয়ে কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে, তাদের সে দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের খবর, তাদের নষ্টনীড়ের সংবাদ, খবরের কাগজের পাতায় হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু আছে বেশীর ভাগ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গৃহ-লক্ষ্মীর রূপ।

এর পরও কি বিধাতার রুদ্ররোষ বাঙ্গালী জাতির উপর নেমে আসবে না? বাঙ্গালী পুরুষ স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক ও ঐক্যভাবের মূল্য দেয় না যেখানে, সেখানে জাতির জন্য সব বিভেদ ভুলে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা কোথায় পাবে? তাই তো বাঙ্গালীকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার সাহস অন্য প্রদেশ-বাসীর হয়েছে।

বাঙ্গালী পুরুষ নিজেদের দায়িত্ব ও তাঁদের উপর একান্ত নির্ভরশীল গৃহ-লক্ষ্মীর পূর্ণ মর্য্যাদা দিন, সংসারকে আনন্দ-খনির সন্ধান দিন, জাতিসৃষ্টিকারী তাঁর সন্তানের জননীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলুন। দেখবেন সুযোগ্য সন্তানের জন্ম দিয়ে এই গৃহ-লক্ষ্মীরাই আবার বাঙলা ও বাঙ্গালীকে লক্ষ্মীমন্ত করে তুলবে।

তবে আনন্দের কথা এখনও বাংলা দেশ ভদ্র শিক্ষিত উদার নির্ভীক পুরুষ শূন্য হয়ে যায়নি, এখনও বহু পুরুষ আছেন যাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, "যেখানে স্ত্রী-লোকের অসম্মান সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না", তাঁরা মেয়েদের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়তা করবার জন্য উদারভাবে এগিয়ে আসেন। তাই এত দুঃখ, এত নির্য্যাতনের ভেতরও বাঙ্গালী জাতির মৃত্যু হয় নি, তাঁদের সাধনাই বাংলা দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর এঁদেরই পদানুসরণ করা উচিত সব বাঙ্গালী পুরুষের। তবেই বাঙ্গালী আবার লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে—চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার অচঞ্চলা হবে।

শর্ব্বাণীর কপাল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

শর্ব্বাণীর যে এমন সৌভাগ্য হবে এমন কথা কে ভেবেছিল? তার কপালের সুখ ভেবে অনেকের যে ঈর্ষা হয় নাই এমনও নয়; তবে আনন্দের দিনে সে সব কথা না ভাবাই ভালো। তাতে গ্রামেরও যশ, লোকেরও শান্তি।

শর্ব্বাণী যে গ্রামে মানুষ, সেটা উত্তরবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রাম। আচারে-বিচারে বাঁধা সংস্কারের বেড়াজালে জড়িত সেখানকার প্রত্যেকটি পরিবার। তাই চৌদ্দ পার হ'য়ে যাবার পরেও যখন শর্ব্বাণীর বিয়ে হলো না, তখন গ্রাম্য সমাজের নেতারা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লেন। দু'একজন শর্ব্বাণীর বিধবা মায়ের কাছে মৃদু অনুযোগ ক'রতেও ছাড়্লেন না।

শান্ত ধীর সরলা বালিকা। মুখখানা বড়ো সুন্দর, রংটিও বেশ ফরসা—টানা টানা দু'টি চোখ। দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়! বয়ঃসন্ধি মুখে নবযৌবনের প্রথম তরঙ্গ কেবল মাত্র দেহের তীর ছুঁতে চলেছে। সব মিলিয়ে শর্ব্বাণীকে রূপসী বলাই চলে।

তবুও বড়ই দরিদ্র—এই ছিল মায়ের ভাবনা। এ পোড়া বাংলাদেশে বিনা পয়সায় কে মেয়ে নেবে? সম্বল যে কিছুই নাই—শুধু শ্বশুরের ভিটেখানি। তা' ছাড়া মায়ের আর একটা ভাবনাও ছিল। মেয়ের শুধু দেহটাই বেড়েছে। মনটা বাড়ে নি মোটেই। এখনও ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি উড়ায়, প্রথম বর্ষায় ফেলে মানুষের মত কাগজের নৌকা ভাসায়, সুবিধা পেলেই মাঝ-পুকুরে সাঁতার কেটে পদ্মফুল তোলে—তবে বেহায়াপনা তার নাই এই রক্ষা।

মা মাঝে মাঝে বলেন—"আমি ম'লে তোর কি যে হবে? এখনও তোর বিয়ে দিতে পারলেম না।"

মেয়ে ডাগর ডাগর চোখ চেয়ে বলে—"এই ত ভাল মা; তুমি আর আমি বেশ আছি। কি হবে বিয়ে দিয়ে?"

পাশের বাড়ির চক্রবর্ত্তী গিন্নি ফোঁড়ন দিয়ে বলেন—"কি ক'রে বিয়ে হবে? ভাঁড়ে যে মা ভবানী!"

তবুও মেয়ের বিয়ে হ'লো। সাঁতোরের বুড়ো রাজা একদিন বজরায় চেপে আত্রেয়ী নদী দিয়ে রাজধানীতে ফিরছিলেন, নদীর জলে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় এই চৌদ্দ বৎসরের মেয়েটির উপর তাঁর নজর প'ড়ল। চোখে না পড়ে' উপায় ছিল না। একটু আগেই নদীর ঘাটে "গেল-গেল-ডুব্‌ল-ডুব্‌ল" রব শুনে তিনি ঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এখন দেখ্লেন সুন্দর একটি কিশোরী একটি ছোট ছেলের হাত একহাতে ধ'রে অন্যহাতে সাঁতার কেটে কেটে হাবুডুবু খেতে খেতে পাড়ের দিকে চলেছে। তীরে পৌঁছিতেই ছেলেটির মা ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বুড়ো রাজা সমস্ত ঘটনাই দেখ্লেন, দেখে মুগ্ধ হলেন। বজরা তীরে ভিড়িয়ে কাছাকাছি কয়েকজনের কাছে খবর নিয়ে, সরাসরি শর্ব্বাণীদের বাড়ি গিয়ে তার মায়ের কাছে শর্ব্বাণীকে পুত্র রামকৃষ্ণের বধূরূপে প্রার্থনা করলেন। বিধবা মৃতস্বামীর কথা মনে ক'রে চোখের জল ফেল্লেন; চোখের জলে ভেসে বিয়েতে মত দিলেন।

গ্রামের লোক যখন একথা শুনলো, অবাক হলো। আর মেয়েরা শর্ব্বাণীর কপাল দেখে ঈর্ষায় জ্বলে মলো। কিন্তু মনের কথা মনে রেখে তারা সকলেই শর্ব্বাণীদের বাড়িতে এসে হুলুধ্বনি দিয়ে উঠ্লো।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি ঘটনা, অগ্রাণের গোড়াতেই বিয়ে হ'য়ে গেল। গ্রামশুদ্ধ সকলেই বর দেখে বল্লো—"আমাদের শর্ব্বাণীর যে এমন বর হবে, শর্ব্বাণী যে রাজরাণী হবে তা কে ভেবেছিল? সোনার বরণ বরের পাশে চেলী পরা, গহনা আর মালাচন্দনে সাজালে শর্ব্বাণীকে কি সুন্দরই যে দেখাচ্ছে। ঠিক যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।"

শর্ব্বাণীর বিধবা মা পরম তৃপ্তিতে ভগবানের নাম স্মরণ করলেন। শর্ব্বাণী মনের আনন্দ গোপন করার জন্য মাথা নীচু ক'রল।

বিদায়ের সময় গ্রামশুদ্ধ লোক বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করতে এলেন। গুরুজনদের পায়ের ধুলা নিয়ে মায়ের বুকে মাথা রেখে উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখের জলে মায়ের বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে শর্ব্বাণী বজরায় এসে উঠ্লো।

শর্ব্বাণী শ্বশুর-বাড়ি এল; শাশুড়ী রত্নালঙ্কারে মুখদেখে তাকে বরণ ক'রে ঘরে তুল্লেন। শাশুড়ীর মুখ দেখে শর্ব্বাণীর সদ্য-মাতৃবিরহিত মনে নিজের মার ছবি ফুটে উঠ্লো।

সাঁতোরের সে রাজপ্রাসাদ যেমন বিরাট, তেমনি প্রাচীন। সে প্রাসাদে সৈন্য কত, দাসদাসী কত,—আমলা বরকন্দাজই বা কত! তার এখানে হাতীশালায় হাতী, সেখানে ঘোড়াশালায় ঘোড়া, আর সেলেখানায় ক্ষুরের ধারের মত অস্ত্রশস্ত্রই বা কত! রাজসভায় নিত্য বিচার হয়। হাতে বেড়ী, পায়ে বেড়ী, চোর ডাকাতের দল কারাগারে আটক থাকে। অপরাধ যার বেশী তার কাটা মুণ্ড গড়াগড়ি যায়। শর্ব্বাণী সব কিছু দেখে শুনে অবাক হয়; ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীর কাছ ঘেঁসে বসে।

শাশুড়ী বলেন—"ভয় কি মা—আমি ত এখানেই আছি।"

শ্বশুরের বয়স হ'য়েছে। কিন্তু চেহারাটি ভারি সুন্দর, যেন টুকটুকে রাঙা পাকা আমটি। আগের দিনে নাই হোক, এখন কিন্তু শর্ব্বাণী পাশে বসে' পাখা নিয়ে বাতাস না ক'রলে যেন তাঁর খাওয়াই হয় না। তিনি মনের আনন্দে খান, আর অতীত ইতিহাসের গল্প করেন।

অনেক দিন আগে—সে প্রায় চারশ' বৎসরের কথা—হাজি সামস্-উদ্দিন ইলিয়াস শাহ ছিলেন বাংলার পাঠান সুলতান। তাঁর সঙ্গে যখন দিল্লীর বাদশাহের যুদ্ধ হ'লো, তখন তিনি বেগতিক দেখে রাজসাহী অঞ্চলের বীরযোদ্ধা শিখিবাহন সান্যালকে ডেকে বলেছিলেন—"সান্যাল মশাই! আপনি থাকতে বাংলার মান ধুলায় লুটাবে? শিখি-বাহন সেলাম ক'রে সুলতানকে বলেছিলেন—"আমরা থাক্‌তেই বাংলা জয়!

তা হ'তে দেবোনা। প্রাণ দিয়েও আমরা আপনার মান রাখবো।" সাণ্ডাল আর ভাদুড়ীদের চেষ্টায় সেদিন যে সৈন্য সংগ্রহ হ'য়েছিল, তাদের বীরত্বে দিল্লীর সম্রাটকে সেদিন ব্যর্থমনোরথ হ'তে হয়েছিল। গুণমুগ্ধ সুলতান চলনবিলের দক্ষিণ দিকটা শিখিবাহনকে জায়গীর দিয়েছিলেন। এই ভাবে সেদিন যে হিন্দু রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল তারই নাম ছিল সাঁতোল রাজ্য—সাঁতোর ছিল রাজ্যের রাজধানী।

শ্বশুরের মুখে গল্প শুনে শর্ব্বাণীর মন ভ'রে ওঠে। এত বড় বংশের বউ সে! এত তাঁর আদর! সে কি শ্বশুর বংশের যোগ্য হ'তে পারবে?

শর্ব্বাণী বিস্ময়ে গৌরবে পুলকিত হয়; ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে।

কিন্তু তার আরও একটি বিস্ময়ের বস্তু আছে এ প্রাসাদে। সে হচ্ছে শর্ব্বাণীর স্বামী রামকৃষ্ণ। ভারি সুন্দর সেই ঢলঢলে মুখখানি, কেমন টানা টানা চোখ—দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা করে। অবাক হয়ে শর্ব্বাণী তাকিয়ে থাকে সেই মুখের দিকে।

কত নির্জ্জন দুপুরে রামকৃষ্ণ হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে বলেছে—"কি দেখ্‌ছ অমন ক'রে?"

উত্তর দিতে পারে নি শর্ব্বাণী। তার কানের দু'পাশ লাল হ'য়ে উঠেছে; শুনে লজ্জায় চাপা-কৌতুকে মুখখানা নীচু ক'রেছে শুধু।

তা' শুধু কি শর্ব্বাণীই দেখে? ও-ও বুঝি দেখে না? কত রাত্রি তাদের বিছানা চাঁদের আলোয় ভেসে গিয়েছে। ঘুমের ভান ক'রে চোখ বুঁজে থেকেছে শর্ব্বাণী, মাঝে মাঝে মিটি মিটি তাকিয়ে দেখেছে—ও-ও তাকিয়ে র'য়েছে তার মুখের দিকে। এক এক দিন শর্ব্বাণী ধরাও পড়ে। ও-ওর কোমল মধুর চোখের দৃষ্টি দেখে মনের ভুলে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে ফেলেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা বুকে চেপে ধরেছে রামকৃষ্ণ। অমনি কেন যে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছে তা' বুঝতে পারে না শর্ব্বাণী। না,—ভয় নয়, রাগও নয়, ঘৃণাও নয়। তবু কেন যে এমন মনে হয়? মনে হয় একে না পেয়ে সে এতদিন কি ক'রে বেঁচেছিল; কেমন ক'রে তার দিন কেটেছিল?

মাঝে মাঝে অন্য দিনের কথাও তার মনে পড়ে। সেও এমনি কোন রাতের কথা। ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে—শ্রাবণ মাসের ধারা। আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে, আত্রেয়ীর তরঙ্গ কাঁদে! তখন মায়ের কথা শর্ব্বাণীর মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ ভ'রে জল আসে। শর্ব্বাণী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে। পিছন থেকে ব্যস্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"ওকী! কাঁদছ কেন?"

চমকে উঠে শর্ব্বাণী বলে—"মার জন্য বড্ড মন কেমন ক'রছে।"

অমনি হাসিভরা মুখ কালো ক'রে তার হাত দু'খানি চেপে ধরে' তাকে বিছানায় ব'সিয়ে রামকৃষ্ণ অনুযোগের সুরে বলে—"শুধু মার জন্যই মন খারাপ, আর কারু জন্য নয়?"

শর্ব্বাণীর মায়া হয়। এমন করুণ সুরে ও-ও প্রত্যেকটা কথা বলে যে সেগুলি তার বুকে গেঁথে যায়; অনুশোচনায় সে দুঃখ পায়—আবার আবেগে আনন্দে কেঁপে ওঠে।

রামকৃষ্ণ আদরে আদরে শর্ব্বাণীকে ভাসিয়ে দেয়, শর্ব্বাণীর দু'চোখ আবেগে মুদে আসে।

এমনি ক'রেই দিন যায়। যে দিন যাবার সময় হ'লো, শাশুড়ী সেদিন শর্ব্বাণীর হাতে স্বামী আর পুত্রকে স'পে দিয়ে স্বর্গে গেলেন। শর্ব্বাণী কেঁদে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌লো।

শাশুড়ীর মৃত্যুর কদিন পরেই দেশের লোককে কাঁদিয়ে বুড়ো রাজাও চলে গেলেন; শর্ব্বাণীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তবুও স্বামীর কথা মনে ক'রে চোখ মুছে উঠে বস্‌লো, দেখ্‌লো রামকৃষ্ণ উদাস নয়নে বাহির দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর সব কিছুই যেন শূন্য হ'য়ে গেছে। শর্ব্বাণী স্বামীর মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুলের ভিতর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

দিন যায়। কাল-ই শোকের তাপকে ভুলিয়ে দেয়—রামকৃষ্ণ বাপ-মায়ের শোক ভুল্‌লেন; ভুলে রাজসভায় গিয়ে বসলেন। দেখ্‌লেন, সাঁতোরের ঘরে ঘরে টোল, আর টোলে টোলে পড়ুয়া। আর গ্রামে গ্রামে পুকুর, আর ঘাটে ঘাটে দেউল। মরাই ভরা ধান, প্রজার ঘরে বাহিরে সুখ।

শর্ব্বাণী স্বামীর সেবার কাজ নিজের হাতে তুলে' নিল। কুটনো কোটা, রান্না করা, বাসন মাজা থেকে বিছানা পাতা, কাপড় গুছিয়ে রাখা পর্য্যন্ত যে কাজ-ই হোক না কেন, স্বামীর সেবায় সে আর অন্য কাউকে হাত দিতে দেয় না। তার বড় মায়া লাগে—আহা, মা নাই বাপ নাই; যত্ন না ক'রলে চ'ল্‌বে কেন?

মধ্যে মধ্যে দুইজনে আবার আগেকার মতো ছেলেমানুষ হ'য়ে ওঠে। তখন আবার দেখা যায় সেই দুষ্টু ছেলেটার কত রকমের খেয়াল! রামকৃষ্ণ নিজেই বসে তাকে সাজাতে;—সাজায় কাপড়ে গহনায়, রত্নভূষণে—কখনও বা ফুলে, মালায়।

"—দেখি, দেখি, ঐ শাড়িটা পরো। এই উড়নিটা নাও। উঁহু—হলো না, সিঁদুরের টিপটা আমিই পরিয়ে দিই। এদিকে তাকাও তো। আহা, এমন চোখ কি কাজল না দিলে মানায়? কাজল দাও—পরিয়ে দি।"

এমন আদর ক'রে বলে যে "না" করা যায় না। আর এত দুষ্টুমির ফন্দিও সে জানে। মাঝে মাঝে ধরে' বসে—"কাজের দিকে যাবে না,—দাসী রাঁধুনি ঢের আছে। তোমার কাজ হ'লো চুপ্‌টি ক'রে আমার কাছে ব'সে থাকা।"

শর্ব্বাণীর এমন মায়া হয়,—সব কাজ ভুলে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সকল কাজ ভুল হয়।

কেবল একটা কাজের বেলা শর্ব্বাণীর ভুল হয় না; সে কাজ সাঁতোরের কালী মন্দিরটি নিয়ে। বিয়ের পরই শ্বশুর ডেকে বলেছিলেন, "—আমার মা যাওয়ার পর থেকে মায়ের সেবা পূজার ত্রুটি হচ্ছিল, তাই তোমায় তিনি নিয়ে এসেছেন। মার সেবার ভার তোমার,—নিলে তো ভার?......বেশ। আমি আজ থেকে নিশ্চিন্ত।"

সেই থেকে শত কাজের মধ্যেও কালী মন্দিরের সকল ভার

শর্ব্বাণীর উপর। সকাল হ'লে শুচি হ'য়ে শর্ব্বাণী নিজেই অন্দরের বাগানে পূজার ফুল তোলে, দুর্ব্বা তোলে, রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে ফুলের মালা গাঁথে। সে মালা শ্যামা মায়ের গলায় উঠে—লহরের পর লহর নেমে থরে থরে থরে, তাঁর রাঙা চরণ জড়িয়ে ধরে।

পূজোর যোগাড় ক'রতে ক'রতে—চন্দন ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে কিম্বা নৈবেদ্য সাজাতে সাজাতে এক এক দিন স্বামীতে আর কালীতে একাকার হ'য়ে যায় ;—আহা, এর-ও মা-বাপ নাই, ওর-ও মা-বাপ নাই। দু'জনেরই কত কষ্ট ! শর্ব্বাণীর চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে ; স্বামীর জন্য তার মন স্নেহে করুণায় ভরে ওঠে।

যে দিন এ রকম মনের ভাব হয়, সেদিন সে কিছুতেই সাম্‌লাতে পারে না। তার বিচলিত ভাব দেখে রামকৃষ্ণ অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার আজ কি হ'য়েছে বলতো ! মন এত ভার কেন ?"

উত্তর দিতে পারে না শর্ব্বাণী, পাছে মনের কথা ধরা পড়ে। বেশী পীড়াপীড়ি ক'রলে চুপ ক'রে স্বামীর বুকে মুখ লুকায়। রামকৃষ্ণ পরম স্নেহে মুখখানা বুকে চেপে ধরেন।

এমনি করেই দিন যায়। ধীরে ধীরে মনের দুর্ব্বল ভাব দূর হয়। আবার হাসিতে, খেলায়, আদরে, কৌতুকে তাদের মন ভরে ওঠে।

ফুলের হাসি ক'দিন থাকে, আকাশের চাঁদ মেঘে ঢাকে। দুঃখও যেমন চিরদিন থাকে না, সুখও তেমনি চিরদিন রয় না। এ আসে ত ও যায়, ও আসে ত এ যায়।

শর্ব্বাণীর সুখের ঘর পূর্ণ হয়েছিল, এখন দুঃখের আঁধার নেমে এলো। বিনা রোগে, বিনা ভোগে এক দিন দেশের লোককে কাঁদিয়ে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মারা গেলেন। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠ্‌লো।

মাথায় সোনার কাঁকন হেনে শর্ব্বাণী অজ্ঞান হ'য়ে গেল। জ্ঞান হ'লে দেখ্‌লো—রামকৃষ্ণের সোনার বরণ দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ! চোখের জলে ভেসে, হাতের লোহা—শাঁখার বালা ভেঙ্গে ফেলে। কপালের সিঁদুর মুছে সে বিধবার সাজ পরলো। যে দেখে সেই বলে—"ও মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না।"

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে শর্ব্বাণী দেখ্‌লো—সাঁতোর রাজ্যের আয়-টন বিশাল—তার আয় বৎসরে চব্বিশ লক্ষ তের হাজার টাকা। মনের আগুন মনে চেপে রেখে সে রাজ্য রক্ষা ক'রতে লাগলো। কিসে প্রজার সুখ হয় শান্তি হয়—সেই চিন্তাই তার প্রধান হ'লো।

শর্ব্বাণী দেউল গড়ে তীর্থ করে—দেশের লোকের দুঃখে কাঁদে ; —পীড়ন করে খাজনা আদায় করা কাকে বলে তা জানে না। সুযোগ বুঝে অনেকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রলো। শর্ব্বাণী শুনে বলে— "আহা ওদের বড় অভাব—কিছুদিন সময় দাও।"

ক্রমে নবাব দরবারে খাজনা বাকী পড়্‌লে—খাজনার জন্য বাংলার নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ শর্ব্বাণীর নামে পরোয়ানা পাঠালেন। তখন শর্ব্বাণী সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু দেরী যা হবার তখন তা হয়েই গেছে।

বর্ষাকালের বানের নদী যেমন ধেয়ে চলে, কোন বাধাই মানে না, কোন থানেই থামে না, সৈন্য নিয়ে নবাবের নাত জামাই মহম্মদ তেমনি এসে সাঁতোর রাজ্যের উপর পড়লেন। পুরী গেল, গ্রাম গেল, ধন জন সকল গেল ;—মহম্মদ টাকার পর টাকা কুড়াতে লাগ্‌লেন। ঘোড়ার পিঠে, হাতীর পিঠে, গাধার পিঠে, মানুষের মাথায়, কেবল টাকা, মাথা বোঝাই টাকা, সে টাকা বাজতে লাগ্‌লো-ঝন ঝন্ ঝন্।

টাকার পর টাকা কুড়িয়ে সোনার গহনার লোভে মহম্মদ শেষে সাঁতোরের কালীবাড়িতে হানা দিতে চল্লেন।

চারিদিকে রব উঠ্‌লো—পালা-পালা-পালা !

দু'জন দাসী শর্ব্বাণীর কাছে ব'সেছিল। তারা একটু কাঁপা গলায় ডাকল—"মা !"

শর্ব্বাণী উত্তর দিল না ; কি যে সে ভাবছিল তা সেই জানে।

একটু পরে শর্ব্বাণী উঠে দাঁড়ালো ; দাসীদের ব'লল—"লোচন সর্দ্দারকে ডেকে দে।"

রাজপ্রাসাদের পাশেই আত্রেয়ী নদীর ধারে কালী মন্দির। মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, জোয়ান জোয়ান সৈন্য নিয়ে শর্ব্বাণী নিজেই মন্দির রক্ষা ক'রতে এসেছে। তার শ্বশুর যে ব'লে-ছিলেন—"মা তাঁর সেবার জন্য নিজেই তোমাকে নিয়ে এসেছেন। তুমি ভার নিলে—আমি নিশ্চিন্ত।"

বিদেহী আত্মার সে নিশ্চিন্ততায় কি বিঘ্ন ঘট্‌তে দিতে পারে শর্ব্বাণী ! আর সে, সেই দুষ্ট ছেলেটি,—যে তার নিজের অসুবিধা হ'লেও কোনদিনই মন্দিরের সেবায় বাধা দেয় নি ; তার কথাই কি ভুলতে পারে শর্ব্বাণী ? কিছুতেই না। সাঁতোরের সব কিছুই যে তার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—স্বপ্ন দিয়ে মাখা।

তার যেন মনে হ'ল, রামকৃষ্ণ বল্‌ছেন—"এই ত আমি র'য়েছি, ভয় কি ?"

না, ভয় পাবার কিছুই নাই শর্ব্বাণীর, আজ তার সকল জ্বালার অবসান। সেই দুষ্টু দামাল ছেলেটি যেন তাকে নিতেই এসেছে। শর্ব্বাণী মনে মনে বল্‌লো—"আস্‌ছি গো। আস্‌ছি ; আর একটু দাঁড়াও।"

বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হ'য়েছে, এমন সময় মোগল সেনা মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছিল, দেখল—মন্দিরের সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তারা দরজায় ঘা দিল, ঠেলাঠেলিও ক'রল ;—শালকাঠের সে কঠিন দরজা ভাঙ্গলোও না—খস্‌লও না। প্রাচীরের উপর থেকে বর্ষার বারিধারার মত—শর্ব্বাণীর সেনারা তীর ছুঁড়্‌তে লাগ্‌লো।

মোগল সেনা এগুতে গিয়েও পিছু হ'টে এলো।

ভেবে চিন্তে মহম্মদ হাতী পাঠালেন ;—অঙ্কুশের তাড়নায় ক্ষেপে গিয়ে মত্তহাতী মাথার চাপে দেউড়ি ভেঙ্গে ফেল্‌ল। মোগল সেনা গর্জ্জে উঠ্‌লো—"রে—রে—রে—রে···।"

শত্রু সেনার আক্রমণে শর্ব্বাণীর সেনারা একবার একটু নড়ে' উঠ্‌লো,

তারপর দাঁড়ালো যেন পাহাড়ের মত স্থির। তারা একে একে, দুইয়ে দুইয়ে মর্‌তে লাগ্‌লো। তারা মর্‌লো বটে, কিন্তু মরেই যেন জিত্‌লো। শর্ব্বাণীর হাতের অসিও শত্রুসেনার শোণিতে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো।

তখনও সন্ধ্যার আঁধার চারিদিক ছেয়ে ফেলে নি;—গাছের মাথায় শাখায় পাতায় কেবল আঁধার নেমে আস্‌ছে; অতি সামান্য সাঁঝের আলোয় মন্দির দ্বার ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। হিন্দুসেনার উষ্ণরক্তে পা ভিজিয়ে সেই দিকে এগিয়ে যেতেই মহম্মদ দেখ্‌লেন—শর্ব্বাণীর প্রাণহীন দেহ মন্দিরের সেই আলোয় আঁধারে মেশা দ্বারপথে পড়ে' আছে। তখনও তার ডান হাতে অসি, বাঁ হাতে বর্শা;—শুধু মস্ত একটা তীর তার বুকের মাঝখানে এফোড় ওফোড় হ'য়ে বিঁধে রয়েছে!

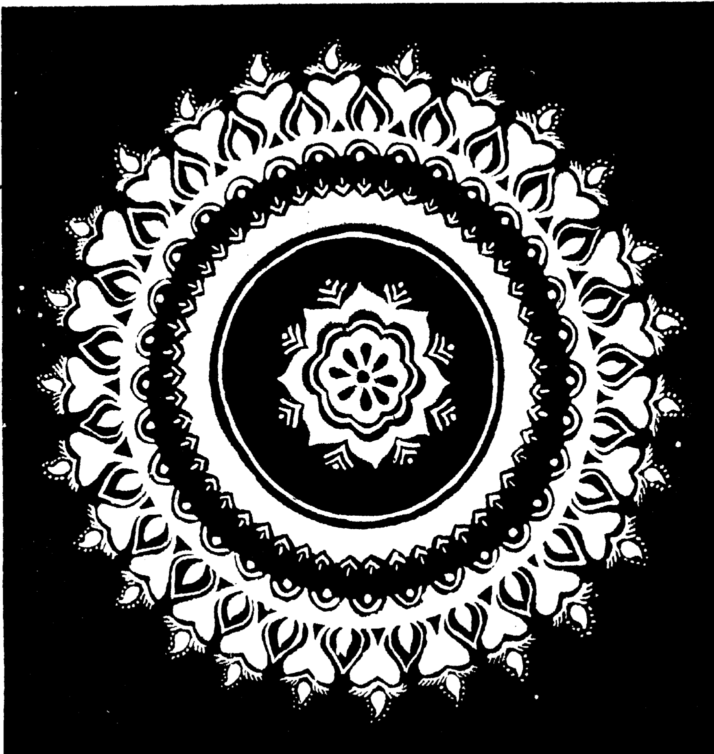
শর্ব্বাণীর দেহে প্রাণ নাই, কিন্তু মুখে তখন জেগে উঠেছে—প্রতিজ্ঞা পূরণের মধুর হাসি। মায়ের সেবার যে ভার শ্বশুরের কাছ থেকে সে নিয়েছিল তা' সার্থক ভাবে পালন ক'রে যেন সে কৃতকৃতার্থ। কোন অবহেলা সে করে নাই,—কোন ত্রুটি রাখে নাই। এখন তার কানে বাজ্‌ছে দয়িতের মধুর আহ্বান!

শর্ব্বাণীর প্রাণহীন দেহ দেখে মহম্মদের মন 'হায় হায়' ক'রে উঠ্‌লো। মহম্মদ কিছুক্ষণ একেবারে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; কিছুক্ষণ বিস্ময়ে যেন স্থাণুবৎ হ'য়ে গেলেন। তারপর হাতের তরবারি ফেলে দিয়ে, মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে' ধীরে ধীরে পিছু হ'টে এলেন।

মোগলসেনার আক্রমণে সেদিন সাঁতোর রাজ্য ধ্বংস হ'য়েছিল বটে, কিন্তু শর্ব্বাণীর আত্মদানে দেবমূর্ত্তি রক্ষা পেয়েছিল। আজিও সে কালীমূর্ত্তি সাঁতোর গ্রামে এক জীর্ণ কুটীরে পূজা পাচ্ছেন!

কুল-বিগ্রহ রক্ষা ক'র্‌তে অসি হাতে প্রাণ দিয়েছে, শর্ব্বাণীর মত এমন কপাল এদেশের ক'টা মেয়ের হ'য়েছে!

আল্পনা—



—ইন্দিরা বিশ্বাস

সাময়িকী



কলিকাতায় ১৯২৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে (মধ্যস্থলে) জে, এম, সেনগুপ্ত ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত দেখা যাইতেছে

মতিলাল নেহরু জন্ম-শতবার্ষিক—

গত ৬ই মে শনিবার দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে সর্ব ভারতের এককালীন শ্রেষ্ঠতম নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব পালিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে ৭ই মে সন্ধ্যায় কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে কলিকাতা কংগ্রেস ভবনে এক সভায় পণ্ডিতজীর জীবন ও কর্মের কথা স্মরণ করা হইয়াছে। মতিলালজী শতবর্ষ আগে ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সারাজীবন আইন ব্যবসা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। এলাহাবাদে তাঁহার 'আনন্দ ভবন' নামক বাসগৃহ তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও সংস্কৃতিবোধের পরিচায়ক। ৪০ বৎসর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সর্বস্ব দান করিয়া তিনি মুক্তি সংগ্রামে কাজ করেন। একমাত্র পুত্র শ্রীজহরলালও পিতার সহিত সর্বত্যাগী হইয়া কর্ম-যজ্ঞে আত্মাহুতি দেন। মতিলালের সে দিনের বিরাট ত্যাগ ও সর্বস্ব দান সারা ভারতের মানুষকে তাঁহার অনুগামী করিয়াছিল এবং মুক্তিসংগ্রামকে শক্তিমান করিয়াছিল। আজ সারা দেশে তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা এবং তাঁহার অপূর্ব জীবনের কথা মনে করা একান্ত কর্তব্য। মানুষ পুত্রের মধ্যে জীবিত থাকে, মতিলালজী পুত্র শ্রীজহরলালের মধ্যে সর্বদা জীবিত থাকিয়া সকলকে তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। এই উৎসব উপলক্ষে মতিলালজীর জীবনী ভারতের সকল রাজ্যের ভাষায় প্রকাশিত হইয়া এ যুগের তরুণ দেশবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হইলে তদ্বারা দেশ লাভবান হইবে। আমরা এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার কর্ম জীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি তাঁহার আদর্শ দেশের সর্বত্র মানুষ জীবনে গ্রহণ করুক।

তিস্তা বাঁধ নির্মাণের কাজ আরম্ভ—

জলপাইগুড়ি হইতে পশ্চিম দিনাজপুর হইয়া মালদহ এবং তথা হইতে প্রস্তাবিত গঙ্গাবাঁধ পর্য্যন্ত একটি নাব্য খাল খনন ও উপরোক্ত তিনটি জেলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য তিস্তা বাঁধ নির্মাণের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুরে তিস্তা নদীর উপর এই বাঁধ হইবে। তিস্তা বাঁধ নির্মাণে ফরাক্কা বাঁধ অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হইবে। এই বাঁধ নির্মাণে পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিতও প্রাথমিক আলোচনা শেষ হইয়াছে। হলদিবাড়ীর নিকট পাকিস্তান তিস্তা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিতেছে—তাহার কাজও আরম্ভ হইয়াছে। এই তিস্তা বাঁধ নির্মিত হইলে ও সঙ্গে সঙ্গে ফরাক্কা বাঁধ হইলে উত্তরবঙ্গের সহিত নিম্নবঙ্গের সংযোগ ঘনিষ্ঠ হইবে—মাল চলাচলের সুবিধা হইবে ও ব্যবসা বাণিজ্য অনেক বাড়িয়া যাইবে। সে জন্য উত্তরবঙ্গবাসীরা এই কাজটি সত্বর সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন।

মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ—

সরকার কর্তৃক কয়বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে সব জমিদারী গৃহীত হইলেও ক্ষতিপূরণ দান ব্যবস্থা আশানুরূপ হয় নাই। সম্প্রতি ২রা মে জানা গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মধ্যস্বত্বভোগীদের মোট ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হইবে। তন্মধ্যে ২০ কোটি টাকা নগদ ও ৪০ কোটি টাকা হস্তান্তরযোগ্য বণ্ডে পরিশোধ করা হইবে। ২৫ বৎসরের মেয়াদে কিস্তীবন্দী হিসাবে ঐ টাকা দেওয়া হইবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। তন্মধ্যে অধিকাংশ ছোট জমিদার—তাহাদের মধ্যে আবার বহুলোক মাত্র ৫।১০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইবেন। যাহাদের আয় ছিল বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা—তাঁহারা ক্ষতিপূরণ পাইবেন ৬ লক্ষ টাকা। নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী, তরুণ ও উৎসাহী কর্মী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইলে বহু প্রাক্তন জমিদারের দুঃখকষ্ট দূর হইবে।

মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ—

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, সুপণ্ডিত ও সুলেখক মুর্শিদাবাদ কান্দি-রাজপরিবারের সন্তান, বিমলচন্দ্র সিংহ গত ১৭ই এপ্রিল রাত্রি দশটার সময় মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। তিনি ছাত্রাবস্থা হইতেই 'ভারতবর্ষে'র লেখক ছিলেন এবং তাঁহার বহু প্রবন্ধ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন—তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার পূর্বে মৃত্যু হইয়াছে। বিমলচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ও জামাতা বিলাতে আছেন—একমাত্র পুত্র শ্রীমান অতীশচন্দ্রও বিলাতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিলেন—তবে মৃত্যুর দিন দ্বিপ্রহরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনচন্দ্র বর্তমান। কয় বৎসর পূর্বে তিনি পাইকপাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ গৃহে বাস করিতেছিলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অসাধারণ মেধাবী বিমলচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন এবং সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালে বিধানসভার সদস্য হইতে তিনি ১৯৫২ পর্য্যন্ত ও পরে ১৯৫৭ হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিহার ও আসামের অংশ বিশেষ পশ্চিমবাংলার সহিত যুক্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন—এ সম্পর্কে তিনি যে পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক দলিল বলিয়া স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক উপলক্ষে তিনি বিরাট উৎসব ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। পরাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বক্তৃতা করিয়া তিনি সারা বাংলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি সমাজসেবক ছিলেন এবং বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজকে যুক্ত রাখিয়া কাজ করিতেন। অমায়িক, বন্ধুবৎসল, সহৃদয় বিমলচন্দ্রের কথা সহজে ভুলিবার নহে। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু তাঁহার পরিবারবর্গের নহে, সমগ্র দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

সাহিত্যিকগণকে পুরস্কার দান—

গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা গ্র্যাণ্ড-হোটেলে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে

এক সাহিত্যসভায় নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণকে পুরস্কৃত করা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর পক্ষ হইতে (১) সুরেশচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার—সৈয়দ মুজতবা আলি—১০০১ টাকা (২) প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—৫০০১ টাকা। (১) অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের পক্ষ হইতে শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—১০০১ টাকা (২) মতিলাল ঘোষ পুরস্কার—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১০০১ টাকা। মৌচাকের পক্ষ হইতে শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৫০১ টাকা, উল্টোরথের পক্ষ হইতে কবি দীনেশচন্দ্র দাশ ৫০১ টাকা, মিত্র ও ঘোষের পক্ষ হইতে ডাক্তার শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৫০১ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। সভাপতির ভাষণে ডাক্তার রায় বলেন—তাঁহার বিশ্বাস, সাহিত্য একাডেমীর বাংলা সাহিত্য বিচার ক্ষমতা নাই এবং একাডেমীর কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্য বোঝেন কিনা সন্দেহ। বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকে যতই দাবাইবার চেষ্টা হোক না কেন, যেখানে শক্তির প্রকাশ সেখানে তাহাকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

ডাক্তার রায় বলেন—পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য, নাট্য, সঙ্গীত একাডেমীটিকে কেন্দ্রীয় একাডেমীর শাখারূপে অনুমোদনের চেষ্টা বারবার হইয়াছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঐ প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কারণ তিনি মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গের ঐ একাডেমীতে যাহা হইয়াছে এবং তথায় যাহা রূপ দিবার পরিকল্পনা আছে তাহা কেন্দ্রীয় একাডেমীর পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেক বড়। পশ্চিমবঙ্গের একাডেমী অফ ফাইন আর্টসকেও জাতীয় ললিতকলা একাডেমীর শাখারূপে গণ্য করার চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। ডাক্তার রায় মনে করেন, রাজ্য সরকারের এই মনোভাব কেন্দ্রীয় সরকার সুনজরে দেখেন নাই।

সাহিত্য সভায় ডাক্তার রায়ের এই সকল উক্তি বিশেষ অনুধাবন যোগ্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গকে দিল্লীর তাঁবেদার করিয়া রাখার যে চেষ্টা চলিতেছে, ডাক্তার রায়ের মত ধীর ও স্থির প্রকৃতির লোক তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দ্দিনে ডাক্তার রায়ের পরামর্শ মত আন্দোলন ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

হাওড়া মিউনিসিপালিটী—

গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার হাওড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। ২৪—৬ ভোটে বিরোধী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া কংগ্রেস দলের শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় পৌরপতি ও ডাঃ সুশীল ঘোষ উপ-পৌরপতি নির্বাচিত হন। নির্মলকুমার হাওড়ার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর—তিনি ব্যবসায়ী ও ১৯৩৬ সাল হইতে হাওড়া পৌরসভার সদস্য। ডাক্তার ঘোষের বয়স ৫৫ বৎসর—তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছিলেন ও ১৯৪২ সাল হইতে হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার আছেন।

বালী মিউনিসিপালিটী—

৩০শে এপ্রিল রবিবার বালী মিউনিসিপালিটীর সভায় ১১—৫ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া ইউ-সি-সি দলের শ্রীবিমল মান্না চেয়ারম্যান ও শ্রীসত্যকিঙ্কর গাঙ্গুলী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

বেড়াচাঁপায় পলিটেকনিক—

গত ৩০শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমাউন কবির ২৪পরগণা জেলার বসিরহাটের পথে বেড়াচাঁপায় দেবালয় গ্রামে ১শত বিঘা জমির উপর একটি নূতন পলিটেকনিক স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পশ্চিমবাংলায় উহা লইয়া ১৯টি পলিটেকনিক স্কুল হইবে। স্থানটি হাবড়া হইতে ৯ মাইল, বারাসত হইতে ১৪ মাইল, বসিরহাট হইতে ১৩ মাইল ও টাকী হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। আগামী জুলাই মাসে তথায় শিক্ষারম্ভ হইবে এবং সিভিল, মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল বিভাগে ৬০জন ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। এক বদান্য ব্যক্তি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য ১০ বিঘা জমি দান করিয়াছেন। ঐ দিন মন্ত্রী শ্রীকবির ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গে শুধু বালিকা শিক্ষার্থীদের জন্য শীঘ্র একটি পলিটেকনিক স্কুল খোলা হইবে। নূতন বিদ্যালয়ের নাম হইবে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যালয়। তিন বৎসরের কোর্সে মোট ১৮০জন ছাত্র পড়িবে ও তাহা ছাড়া স্থানীয় ৬শত শিক্ষার্থীকে তথায় নিজ নিজ জীবনের শিল্পে প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্য শিক্ষাদান করা হইবে।

অফিসে বাঙ্গালী বিতাড়ন—

গত ২রা মে কলিকাতায় বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বলেন—কলিকাতার বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে বাঙ্গালী বিতাড়ন বন্ধ করিবার জন্য পরিষদ যে প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে সরকার প্রায় অসহায়। মুখ্যমন্ত্রী গত কয় বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন নাই। বেসরকারী উদ্যোগের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় সরকার হস্তক্ষেপ করিলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়! কিন্তু এ কথা সত্য, যে পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত কারখানাসমূহে বাঙ্গালীদের প্রায় কোন কাজ দেওয়া হয়না। সরকারী সাহায্য ও ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে বাঙ্গালী ধনী বা ব্যবসায়ীদের চেষ্টা কম—সেখানে অবাঙ্গালীদের চেষ্টা অধিক—কিন্তু অবাঙ্গালীরা নানা কারণে বাঙ্গালীকে কাজ দিতে চান না। এ বিষয়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হওয়া উচিত। একমাত্র তিনিই এই অসুবিধার প্রতীকার সাধনের শক্তি ও বুদ্ধি রাখেন।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ—

গত প্রায় এক মাস ধরিয়া কলিকাতা ও সহরতলীতে প্রত্যহ কোন না কোন পল্লীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকিতেছে। ডি-ভি-সি হইতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আসার কথা, তাহা না আসায় এই অসুবিধা হইতেছে। সহরের একাংশ ৫।৭ ঘণ্টা অন্ধকার হইয়া থাকিলে কর্মব্যস্ত সহরবাসীর জীবন কি ভাবে বিপন্ন হয়, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে, বহু লোক বেকার হইয়া পড়িতেছে বা কম পরিমাণ বেতন পাইতেছে। শুনা যায়, একদল কর্মী যন্ত্রগুলি অকেজো করিয়া দেওয়ায় এই অবস্থার উদ্ভব হয়। ইহার মধ্যে কাহার স্বার্থ আছে জানি না—তবে সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। মোটের উপর এ জন্য মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু তাহাদের কথা কে চিন্তা করিবে?

কলিকাতার নূতন মেয়র—

কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার এইবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার রূপে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৌত্র



শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার

এবং তাঁর পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের নামও কলিকাতাবাসীর অজানা নয়। শ্রীরাজেন্দ্রনাথও কলিকাতা হাইকোর্টের বিশেষ সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠাবান সলিসিটর। এবারেও তিনি তাঁর কেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই ও প্রার্থনা করি তিনি এই সমস্যা-কণ্টকিত শহরের উন্নতি-সাধনে সাফল্যলাভ করুন।

বাঙ্গালী চিকিৎসকদের চাহিদা—

উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র ও হিমাচল রাজ্যের কর্তৃপক্ষ প্রায় এক হাজার বাঙ্গালী ডাক্তারকে নিজ নিজ রাজ্যে চাকরী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ঐ সকল ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাঁহাদের প্রাপ্য বেতনাদি ঐ সকল রাজ্য সরকারের

নিকট গ্রহণ করিবেন। নব-নিযুক্ত ও পুরাতন—সকল শ্রেণীর ডাক্তারকে বাংলার বাহিরে যাইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। অসুবিধা থাকিলেও সকলের এই সুযোগ গ্রহণ করা কর্তব্য। এক হাজার ডাক্তার সপরিবারে বাংলার বাহিরে গেলে বাংলা নানাভাবে উপকৃত হইবে। অবশ্যই বেতনের হার অধিক হইবে এবং বাহিরে থাকার সময় ডাক্তারগণ বহুপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বাংলার বাহিরে বাংলার সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রচারের সহায়ক হইতে পারিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে ২।৪ জন করিয়া নিম্নতম কর্মচারী লইয়া গেলে তাহারাও উপকৃত হইবে। আজ বাঙ্গালীর বেকার সমস্যার দিনে এ সংবাদে সকলে আশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগের 'সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি অধ্যাপক' ও খ্যাতিমান সাংবাদিক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন গত ৩রা মে সকাল ৭টায় ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর কোটালীপাড়ার অধিবাসী—হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর ১৯৩৬ সালে পি-এচ-ডি হন। তিনি সার্ভেন্ট, ফরোয়ার্ড, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি ইংরাজি দৈনিকপত্রসমূহে দীর্ঘকাল সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র এক বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছিল। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন ও শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুই ভ্রাতা বর্তমান।

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু—

১৯৬০ সালে যে ৭ জনকে লেনিন শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে, এফ্রো-এসিয়া ভারতীয় সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু তাঁহাদের একজন। কিউবার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর এস্ট্রো এবং গিনির রাষ্ট্রপতি সেকনটোর ঐ শান্তি পুরস্কার পাইয়াছেন।

বৃটেন হইতে ভারতে ঋণ—

গত ১লা মে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারত সরকারকে ৫৩ কোটি টাকা ঋণ দানের এক চুক্তি নয়া দিল্লীতে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তৃতীয় যোজনার রূপায়ণ ও ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিংএর পরিমাণ হ্রাসের জন্য এই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর কারখানার সম্প্রসারণের জন্য বৃটেন আরও ২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিবে। পূর্বে গৃহীত ঋণের ৪০ কোটি টাকা ২৫ বৎসরে শোধ করিতে হইবে। সম্প্রতি গৃহীত ৫৩ কোটি টাকা (১) ভূপালে ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা সম্প্রসারণ (২) আসামে নাহার-কাটিয়ায় সার কারখানা স্থাপন (৩) হোসাঙ্গাবাদে কাগজের কল স্থাপন ও (৪) রূপনারায়ণপুরে কেবল কারখানা সম্প্রসারণ কাজে ব্যয় করা হইবে।

কলিকাতায় কালবৈশাখী—

গত ৩০শে এপ্রিল হইতে পর পর ৪ দিন ও পরে কয়দিন কলিকাতা সহর, সহরতলী ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ প্রভৃতি স্থানে ঝড় ও বৃষ্টির ফলে যেমন প্রচণ্ড গরম কমিয়াছে, তেমনই পাট প্রভৃতি চাষের সুযোগ হওয়ায় সাধারণ বাঙ্গালী আনন্দিত হইয়াছে। অবশ্য কোন কার্য্যের ফলে শুধু ভাল হয় না—ঝড়ে বহু চালাঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মানুষ মারা গিয়াছে, লোকের কাজ-কর্মের সাময়িক ক্ষতি হইয়াছে, আম পড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বৃষ্টিকে বাঙ্গালা দেশ সাদরে ও সোল্লাসে অভিনন্দিত করিয়াছে। দেশে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি হোক, মানুষ পর্য্যাপ্ত খাদ্য সুলভে লাভ করুক—আজ সকলেই এই প্রার্থনা করে।

শ্রীনেহরুর উপদেশ—

গত ৩০শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দেশবাসী সকলকে এই ৪টি নীতি সর্বদা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন—(১) সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাইবেন না (২) ভাষা লইয়া বৃথা তর্ক করিবেন না (৩) সমাজতন্ত্রবাদ ও পাঁচশালা পরিকল্পনা সম্পর্কে পড়া-শুনা করিবেন এবং (৪) পরিবর্তনশীল বিশ্ব-পরিস্থিতির কথা মনে রাখিবেন।



স্থান-কাল-পাত্রভেদে দশা বিচার সম্বন্ধে মন্তব্য

উপাধ্যায়

পরাশর প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা গ্রহগণের কেন্দ্র, ত্রিকোণ ও স্ববর্গাদি অবস্থান ও অধিপতি ভেদে দ্বাদশ ভাবে অবস্থানানুসারে দশা ও অন্তর্দ্দশায় যত প্রকার ফল হোতে পারে, সবই বলে গেছেন। কোষ্ঠী-বিচারকালে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ঐ সব ফলগুলির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের কোষ্ঠীতে গ্রহের অবস্থান ও বলাবল দেখে তদনুসারে বিচার করে ফল-নির্ণয় করতে হয়। শুভ গ্রহের দশায় শুভ ফল, আর পাপগ্রহের দশায় অশুভ ও কষ্টদায়ক ফল হয়ে থাকে, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস বা ধারণা দূরীভূত হয়েছে তাঁদের, যাঁরা রীতিমত কোষ্ঠী বিচার করতে শিখেছেন—আর শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব অবগত হয়েছেন। অবস্থা, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই গ্রহসংস্থানের ফল একরূপ হয় না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ জ্যোতিষকে শাস্ত্রের অর্থ করতে হবে, সকলস্থানেই শাস্ত্রের একমাত্র বাহ্যিক অর্থ অবলম্বনে ফল নির্ণয় করতে গেলে ফল মিলবে না। পরাশর বলেছেন—'বলং জ্ঞাত্বা ফলং বদেৎ।' বহুদর্শিতা, বিশিষ্ট বিচারশক্তি, শাস্ত্রাভ্যন্তরে সূক্ষ্মদৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যাত্ম-শক্তি ও বিচারবুদ্ধি ব্যতীত কোষ্ঠী দেখে সঠিক ফল বলা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

যেখানে সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে 'ধনধান্য লাভ' সেখানে ঐ কথাটি সকলের পক্ষে প্রযোজ্য হোতে পারে না। হয়তো এমন এক ব্যক্তির জন্ম পত্রিকা বিচার করতে হচ্ছে, যার সঙ্গে ধান্যের সঙ্গে সংস্রব নেই। সেক্ষেত্রে ফল বলতে হবে ধন লাভ, অথবা গ্রহের কারকতানুসারে মূল্যবান কোন দ্রব্যলাভ কল্পনা করে নিয়ে তার কথা জানিয়ে দিতে হয়। যেখানে রাজ্যলাভের কথা আছে, সেখানে সামান্যজমি থেকে সুরু করে তালুক পর্য্যন্ত বুঝাবে। আর সে ব্যক্তি যদি কোন রাজার ছেলে হয় বা দেশের অধিনেতা হয় তার পক্ষে দেশ, জমিদারী, রাজ্য প্রভৃতি কল্পনা করা যেতে পারে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক ভেদে।

গ্রহগণের অবস্থান অনুসারে বিচার করে হোক, অথবা অন্য কোন প্রকারেই হোক যাঁর কোষ্ঠী বিচার করা হচ্ছে, তাঁর অবস্থা আগে জেনে ফল নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। দশাবিচার কালে দেখা গেল উল্লেখ আছে 'মাতার মৃত্যু'। এক্ষেত্রে দেখতে হবে জাতকের মাতৃবিয়োগ হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তাহোলে দেখতে হবে আলোচ্য সময়ে মাতার মৃত্যু হওয়ার যোগ আছে কিনা—মায়ের কোষ্ঠীতে যদি আয়ু দীর্ঘ হয়, তাহোলে বড় রকমের একটা অসুখ হয়ে তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন। এজন্যে মাতৃবিয়োগ না বলে মাতৃরিষ্টি বলাই ভালো। এমনিভাবেই পরীক্ষায় পাশ ফেল, বিবাহ, সন্তান-জন্ম, স্ত্রী-বিয়োগ প্রভৃতি জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিকে রীতিমত বিচার করে বলতে হয়। দশাপ্রকরণে পুত্রজন্ম, বিদ্যালাভ প্রভৃতি লেখা থাকে কিন্তু যার অপুত্রক যোগ আছে, বিদ্যাহীনতা যোগ আছে—তার ফল বিচারেরসময় দশাপ্রকরণে উক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য হবে না। ফল কথা, নিজের প্রজ্ঞা আর ধীশক্তি না থাকলে যথোপযুক্ত জীবনের ঘটনাগুলিকে তুলেধরা সহজসাধ্য নয়। ভাব বিচারকালে ও কারকতাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের যে রকম ফলাফল লিখিত হয়েছে, গ্রহগণ স্ব স্ব অন্তর্দ্দশাকালে তার মধ্যে কোন্ কোন্ গুলি ফল দেবে—তাই যে সঠিক বিচার করে বলতেপারবে সেই খাঁটি জ্যোতিষী। গ্রহগণের বল নির্ণয় করবার জন্যে বিদগ্ধতোষিণী নামক গ্রন্থে বহু পদ্ধতি বলা হয়েছে, যে যে ভাব স্বীয় অধিপতি, শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতি দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়—আর অন্য কোন গ্রহকর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট না হয় সেই সেই, ভাবো ফল শুভ হয়ে থাকে। শুভ গ্রহের অর্থ যে গ্রহ সুখদায়ক। যে গ্রহ দুঃখ দেয় তাকে পাপগ্রহ বলে। যে সুখ বা দুঃখ কিছুই দেয় না তাকে সমগ্রহ বা উদাসীন গ্রহ বলে। শুক্র প্রভৃতি শুভ গ্রহই হোক বা রবি অশুভ গ্রহই হোক—সকল গ্রহই নীচস্থ ও শত্রু গৃহগত হোলে যে ভাবে থাকেন সেই ভাবের হানি করে থাকেন। কিন্তু যদি মূল ত্রিকোণ-গত বা তুঙ্গী হন, তা হোলে হানি না করে বরং ভাবের শুভ ফলের বৃদ্ধি করে থাকেন।

শুক্র মীনে তুঙ্গস্থ হয়। জ্যোতি বাচস্পতি 'কোষ্ঠী দেখার' ভেতর বলেছেন—'গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক, একাধিক গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত

(কোষ্ঠী দেখা—পৃঃ ১২৩) কার্য কারক ও চরিত্রকারক গ্রহ শুক্র তুঙ্গস্থ হোলে সে কেবলই লাম্পট্য দোষ আনবে—আর গুপ্ত প্রেমের দিকে ঝোঁক বা একাধিক গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত করবে? তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা [illegible] চরিত্র বিশুদ্ধই হবে, [illegible] রাহু, মঙ্গল, প্রভৃতি [illegible] থাকলে [illegible] পারে ঐ সব ফল বলা যেতে পারে [illegible] এবং [illegible] অশান্তি। কিন্তু শুধু শুক্র মীনে থাকলে পাপ গ্রহের সঙ্গে অবস্থিত বা পাপ দৃষ্ট না হোলে জ্যোতিবাচস্পতির লিখিত ফলের কথা বললে তা মিলবে না জাতকের জীবনে।

বৃহৎ পরাশর বলেন যে চতুর্থ ও দশম বিশেষতঃ সুখসংজ্ঞক। পঞ্চম নবম বিশেষতঃ ধনসংজ্ঞক। এজন্যে কোন ভাবাধিপতি বলবান হয়ে চতুর্থে দশমে, পঞ্চমে ও নবমে থাকলে সর্ব্বোত্তম ফল হয়।

যদি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে তাহোলে কিরূপ হবে এরকম প্রশ্ন মনে উঠতে পারে। এর উত্তর এই যে, ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশের অধিপতি যে ভাবে থাকে সেই ভাবের হানি হওয়ায় ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশ ভাবের ও হানি হবে। সেই জন্য জাতকের শুভফল লাভ হবে। কারণ ষষ্ঠ ভাব থেকে শত্রু, অষ্টম থেকে মৃত্যু আর দ্বাদশ ভাব থেকে ব্যয় বিচার করা যায়। শত্রু, মৃত্যু, ও ব্যয়ের হানি হোলে অবশ্য জাতকের পক্ষে ফল শুভই হবে। কোনও মতে ভাবাধিপতি স্বক্ষেত্র থেকে সপ্তমে এলেও নীচস্থ গ্রহের মত ভাব ফল বিষয়ে ঝঞ্ঝাট উৎপ করে। কোনও ভাব পাপমধ্যগত হোলেও সেই ভাবের শুভ ফলের হ্রাস হয়। কখন ও কখন দেখা যায় যে বিচার্য্য ভাবের সপ্তমস্থান পাপমধ্যগত হোলেও ভাবের অনিষ্ট হয়ে থাকে।

লগ্ন থেকে সপ্তম ও দ্বিতীয়াদি নিজের মারক স্থান। সেই রকম চতুর্থ ভাব থেকে গণনায় দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থান মাতার মারকস্থান। নবম থেকে উক্তস্থান দুটী পিতার মারক স্থান। এই ভাবে যে ভাবের বিচার করতে হবে সেই ভাবকে লগ্ন স্বরূপ কল্পনা করতে হয়। রবির প্রভাব যার কোষ্ঠীতে যত বেশী, তার ভেতর তত বেশী স্নায়ুর-সবলতা। উচ্চস্থ গ্রহ শুভফলপ্রদ আর নীচস্থ গ্রহ অশুভফলপ্রদ। দুই বা ততোধিক গ্রহ স্বচ্চাংশস্থিত হোলে সে সময়ে জাতক উচ্চপদ, যশ, ও সম্মানাদি লাভ করে থাকে। আর দুই বা ততোধিক গ্রহ নীচাংশগত হোলে সে সময়ে জাতক ভাগ্যহীন হয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে। জন্ম বা প্রশ্নাদি কালের দশম স্থান স্থিত গ্রহকে তাৎকালিক উচ্চস্থ গ্রহ বলা যায়। দশমস্থ সমস্ত গ্রহই ফলপ্রদ। পাপ গ্রহগণ শুভযুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হয়ে ঐ স্থানে অবস্থান করলে শুভ ফল দেয়। বিংশোত্তরী দশা বিচার কালে অষ্টোত্তরী দশার ফলাফল বিচার্য্য নয়। কার্য্যক্ষেত্রে সকলের সম্বন্ধে বিংশোত্তরী দশার ফলাফল ঐক্য হোতে দেখা যায়। যদি কোন ভাবে বলবান শুভগ্রহ থাকে, আর সেই ভাবাধিপতি দুঃস্থানে অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভাবে থাকে, শত্রুগৃহগত বা দুর্ব্বল হয় তাহোলে শুভফলের আশা নেই। যদি কোন ভাবের অধিপতি তুঙ্গী, মূলত্রিকোণস্থ বা স্বগৃহী হ'য়ে শুভগ্রহ যুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে কেন্দ্র বা ত্রিকোণ গত হয় তাহোলে সে ভাবের খুব শুভফল হয়। ভাবাধিপতি বিশেষ বলশালী বা শুভদৃষ্ট না হোলে ও ফল অশুভ হয়না, তবে বিশেষ শুভও হয় না, আর অস্তগত বা নীচস্থ হয়ে কেন্দ্রত্রিকোণগত হোলে অতি বিঘ্ন বাধার পর কিছু ফল লাভ হয়। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশপতি শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিহীন যে ভাবে থাকে তার হানি করে সুতরাং অশুভ। ভাগ্যাধিপতি কেন্দ্র গত হোলে প্রথম বয়সে ভাগ্যোদয়, ত্রিকোণ বা তুঙ্গগত হোলে মধ্য বয়সে ভাগ্যোদয়, ত্রিকোণ বা তুঙ্গগত হোলে মধ্যবয়সে ভাগ্যোদয়, কেন্দ্র ত্রিকোণ ভিন্ন অন্যত্র স্বক্ষেত্রগত কিম্বা মিত্রক্ষেত্রস্থ হোলে শেষ বয়সে ভাগ্যোন্নতি হয়। ষষ্ঠস্থানে শুভাশুভ যে গ্রহই থাকুক না কেন অশুভফল দাতা হবেই। দশা ও অন্তর্দ্দশানুসারে বিচার করে ফলাফল বলবার সময় এই সব দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। নতুবা কোন ফলই মিলবে না।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

ভরণী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট ভোগ দেখা যায় না, কিন্তু অশ্বিনী ও কৃত্তিকার পক্ষে কিছু দুর্ভোগ আছে অর্থাৎ নিম্নোক্ত অশুভ ফলগুলি প্রকাশ পেতে পারে। নানা বিষয়ে বাধা ও বিলম্ব, ক্লান্তিপ্রদ ভ্রমণ, শারীরিক কষ্ট, মর্য্যাদা হানি, আশঙ্কা ও উদ্বিগ্নতা, স্বজন বন্ধু বিরোধ, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্যজনিত মনস্তাপ, অপবাদ, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন, স্থানচ্যুতি, সম্পত্তির গোলযোগ প্রভৃতি অশুভ ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। মোটামুটি সাফল্য, কিছু বিলাস-ব্যসন ভোগ, বিদ্যা শিক্ষায় সাফল্য এবং কৃতিত্ব অর্জ্জন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক কষ্ট। মাসের প্রথম দিকে উদর, হৃৎপ্রদেশ, ফুস ফুস প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রে রোগাধিকার। যারা পুরাতন রোগী, তাদের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে ঘরে বাইরে অশান্তি। অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বিগ্নতা ভোগ। মনোমালিন্য থেকে শত্রুতা দেখা দেবে, নষ্ট হবে শান্তি শৃঙ্খলা। আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূলনয়। উদ্বিগ্নতা ভোগ। সারাটি মাস যাবে অর্থের চিন্তায়। জাল জুয়াচুরি প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষতি অসম্ভব নয়। কোন প্রকার নব প্রচেষ্টার দিকে অগ্রসর হওয়া অনুচিত। ভ্রমণের সময়ে ক্ষতি। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। জমি কেনা বেচার সঙ্কল্প স্থগিত রাখা আবশ্যক, বড় বড় পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ ব্যর্থতাব্যঞ্জক। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী বিশেষ খারাপ হবে না যদি ও উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা আছে। বেকার ব্যক্তির কর্ম্মে নিযুক্ত হবার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী শুভ। স্ত্রী-লোকের পক্ষে মাসটী সংঘাত নয়। প্রণয়াসক্তি ও সামাজিক ব্যাপার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি

করবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সমাবেশ। আহার বিহারে সংযম আবশ্যক। শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির দোষ হেতু পীড়ার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

বৃষ রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, রোহিণীর পক্ষে মধ্যম এবং কৃত্তিকাশ্রিতগণের পক্ষে অধম। উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, বিলাস দ্রব্য প্রাপ্তি, সুখ প্রচেষ্টায় সাফল্য, নূতন পদ মর্য্যাদা, পারিবারিক শান্তি, মোটামুটি আয় বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, প্রভৃতি শুভ যোগ। শত্রু দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া, ভ্রমণে বিপত্তি, ক্ষতি, স্বজন বিচ্ছেদ, দুঃখ কষ্ট ভোগ, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি অশুভ ফল। গোচর ও অন্তর্দ্দশা যাদের পক্ষে প্রতিকূল, তারা বিশেষ ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হ'বে—নানা অপবাদ সহ্য করতে হ'বে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো বলা যায়। জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে শুভ নয়, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, হৃদ্‌রোগ ও বক্ষ পীড়া। পারিবারিক শান্তি স্বচ্ছন্দতা ও ঐক্য। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়দের জন্য কিছু কষ্ট ভোগ, কলহ বিবাদে পরিণতি অসুখকর হবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা ও সুখসুবিধা মোটের উপর সন্তোষজনক। নানা উপায়ে লাভ। অর্থ প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে। শেষার্দ্ধে অত্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি। বন্ধুদের আনুকূল্যে কষ্ট দূরীভূত হবে। স্পেকুলেশনে অর্থাগম। রেস খেলায় জয়লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী ভালো নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে মন্দ যাবে না, তবে মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা আছে। ব্যবসায় ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি মন্দ যাবে না। কর্ম্মোপলক্ষে এদের ভ্রমণ ঘটবে। প্রকাশক, লেখক প্রভৃতি ব্যক্তিদের পক্ষে সময়টী বিশেষ ভাবে ভালো যাবে। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বিবাদ-প্রিয় হয়ে নানা অশান্তি ঘটাবে। অবৈধ সংসর্গ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতার অন্যতম কারণ হবে। সময়ে সময়ে অসৎ লোকের সংস্পর্শে আসতে হবে। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে চলা ফেরার পরিণাম অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী উত্তম, আর্দ্রা জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। লাভ, সাফল্য, উত্তম সংসর্গ ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, আশা আকাঙ্খা সিদ্ধি, বিলাস ব্যসন, সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি শুভযোগ। স্বাস্থ্যহানি, ক্ষতি, উদ্বেগ, কলহ বিবাদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, নীচ সংসর্গ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ এবং অশুভ ঘটনার মাধ্যমে মামলা মোকর্দ্দমার অশুভ পরিণতি ও তজ্জনিত অপমান ও লাঞ্ছনা। বায়ুপিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া। ভ্রমণ হেতু ক্লান্তি ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। ঘরে বাইরে অশান্তি। অকারণে স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য, এমন কি কোন কোন বন্ধু গুপ্ত শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। অর্থাগমের পক্ষে মাসটী বিশেষ আশাপ্রদ নয়। সময়ে সময়ে অর্থাগম আশানুরূপ হোলেও অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যয় বৃদ্ধির জন্যে চিন্তার কারণ ঘটবে। কোন নূতন পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অনাদায়ী টাকা আদায় করার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হোতে পারে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। সম্পত্তি সংগ্রহের পক্ষে অশুভ ফল। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি নৈরাশ্যজনক। প্রথমার্দ্ধে চাকুরীজীবীর সময়টি মন্দ যাবেনা কিন্তু শেষার্দ্ধে অশুভজনক পরিস্থিতি। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়া ও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপচেষ্টাজনিত কুফল ভোগ করার সম্ভাবনা আছে। কোনরকমে কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত হওয়া বা ছুটি নেওয়া চলবে না। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে এমাসে কোনপ্রকার অসদ্ব্যবহার বর্জ্জনীয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। কলহ বিবাদ ও তর্কবিতর্ক হেতু মানসিক কষ্টভোগ, দুর্ণাম বা কলঙ্ক রটাবার চেষ্টা করবে শত্রুরা। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তির উদ্ভব হবে। ভ্রাতাভগ্নী বা সম্পর্কীয় ভ্রাতাভগ্নী, পাড়া প্রতিবেশী চাকুরীর ক্ষেত্রে উপরওয়ালা প্রভৃতির সঙ্গে কোন প্রকার বিবাদ করা চলবেনা। সামান্য বিরক্তিকর ঘটনাগুলির দিকে নজর দেওয়া বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়।

কর্কট রাশি

পুষ্যা ও অশ্লেষাজাত ব্যক্তিদের পক্ষে পুনর্ব্বসু অপেক্ষা শুভ। লাভ পসার প্রতিপত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, বিলাসিতা, নূতন পদ মর্য্যাদালাভ ও সম্মান বৃদ্ধি, প্রচেষ্টায় সৌভাগ্যলাভ, সুখ, শত্রুজয়, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, নূতন বিষয়বস্তু অধ্যয়ন, জ্ঞান বৃদ্ধি, বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতি প্রভৃতি যোগ আছে। প্রচেষ্টায় বাধা বিপত্তি, স্বাস্থ্যহানি, স্বজনবন্ধু-বিরোধ, শত্রুপীড়া ক্ষতি, অপমান, মামলায় পরাজয়, কষ্টকর ভ্রমণ, রেসে পরাজয় প্রভৃতি অশুভ ফল. সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। রক্ত দুষ্টি, পিত্ত প্রভৃতি জনিত পীড়া। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ, শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে পারিবারিক ক্ষেত্রে। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুকূল অবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্য, বৃত্তি ও সরকারী সংশ্লিষ্ট কাজে বিশেষ লাভ। নব প্রচেষ্টায় সাফল্য। বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্যাতি ও লাভ। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। রেসে লাভ। ভ্রমণ, এমন কি সমুদ্র যাত্রা যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। কর্ম্মক্ষেত্র অতীব উত্তম, চাকুরিজীবীর পদমর্য্যাদা লাভ, পদোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে ও মাসটী উত্তম। সৌভাগ্য বৃদ্ধি ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য ও লাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, উত্তরফল্গুনীর পক্ষে মধ্যম, আর মঘার পক্ষে অধম ফল। সৌভাগ্যবৃদ্ধি, প্রভাবপ্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তির সংসর্গ ও বন্ধুত্ব লাভ, আকাঙ্খিত বস্তু লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, শত্রুজয়, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সম্মান ও সন্তোষ লাভ, প্রিয় জনের সমাগম, নূতন বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ প্রভৃতি শুভ ফলের আশা করা যায়। স্বজন বিরোধ, ভুল ধারণা, ক্ষতি, ব্যয় বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি। পুরাতন চক্ষুপীড়াগ্রস্ত ও পিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু কষ্টভোগ, বয়োজ্যেষ্ঠদের সহিত শত্রুতা, স্বজন বন্ধু বিচ্ছেদ,' স্ত্রীর সহিত কলহ, ঘরে বাইরে অসুবিধা ও দুঃখ কষ্ট, স্ত্রীলোকের সহিত মনোমালিন্য, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি আশঙ্কা করা যায়। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ ও শত্রুতা, ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক বিষয়ে বন্ধুরা বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাহায্য করবে। আকস্মিক সৌভাগ্য বৃদ্ধি। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। রেস খেলায় লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধাজনক নয়। সম্পত্তি হানি বা হস্তান্তর আর মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয় ঘটতে পারে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ, উপরওয়ালার প্রীতি ও আনুকূল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী-মিশ্র ফলদাতা। দৈনন্দিন কার্য্যগুলিতে সাফল্য সূচিত হয়। গার্হস্থালীর পক্ষে অনুকূল। বাহিরের ব্যাপারে শুভ নয়, এজন্য পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ বর্জ্জনীয়। অবৈধপ্রণয়ে লিপ্তা নারীর উত্তম সময়। এমাসে কোর্টসিপ, প্রণয়াসক্তি বা প্রণয়ে পড়বার জন্যে প্রচেষ্টা, বাক্‌দান ও পরপুরুষের সান্নিধ্য প্রভৃতি লাভের কারণ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু অশান্তি ঘটতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তির হ্রাস। প্রণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য ও আনন্দ সম্ভোগ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রজাত গণের পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে মধ্যম, আর উত্তর ফল্গুনীর পক্ষে অধম। এমাসে অধিকাংশ সময়ই ভালো যাবে। লাভ, উত্তম স্বাস্থ্য, আনন্দ উপভোগ, বিলাস ব্যসন দ্রব্য, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শুভ ঘটনা শত্রু জয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে। স্ত্রীলোকের হেতু কষ্ট ভোগ, উদ্বিগ্নতা, মামলা মোকর্দ্দমা, দুঃসংবাদ, মিথ্যা অপপ্রচারজনিত খ্যাতিপ্রতিপত্তির কিছু হ্রাস ও মর্য্যাদাহানি ঘটবে। স্বাস্থ্যোন্নতি। বিশেষ পীড়াদি যোগ নেই, তবে কিছু রক্তের চাপবৃদ্ধি। পারিবারিক সুখ শান্তি লাভ। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে, এতদ্‌সত্ত্বেও আর্থোন্নতির বৃদ্ধি। পাইকারী দ্রব্য বিক্রেতা ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে অতীব উত্তম সময়। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেস খেলায় লাভ। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক পরিস্থিতি। চাকুরিজীবীর পক্ষে শেষার্ধটি অতীব উত্তম। উপরওয়ালার মন জয় ও অনুগ্রহ লাভ, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজয়, বিদ্যার্জ্জনে অসাধারণ সাফল্য প্রভৃতি ঘটবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সুযোগ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার আসবাবপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয়ে আনন্দ লাভ করবে। আচার ও আচরণে ভদ্রতা, সৌজন্য ও প্রীতি প্রকাশ হেতু প্রশংসা অর্জ্জন, চাকুরিতে উন্নতি, অবৈধ প্রণয়ে বিশেষ লাভ ও উত্তম সুযোগ। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম এবং বিশাখার পক্ষে অধম। স্বাতীর পক্ষে মধ্যম। কারো পক্ষে মাসটী বিশেষ শুভ নয়। মানসিক উদ্বেগ ও অস্বচ্ছন্দতা, অপমান, স্বাস্থ্যহানি, ভ্রমণে অসুবিধা, স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত কলহ, প্রচেষ্টায় বাধা বিপত্তি, অসৎসংসর্গ, মামলা মোকর্দ্দমা, স্ত্রীলোকের জন্য নানা লাঞ্ছনাভোগ। মাসের মাঝামাঝি সময়ে কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দতা ও সাফল্য লাভ। অজীর্ণ, আমাশয়, গুহ্য দেশে পীড়া, তাপজনিত রক্তের চাপ বৃদ্ধি, ভ্রমণে দুর্ঘটনা, স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি, নানা প্রকারে পারিবারিক অশান্তি, ঐক্যের অভাব, দুঃসংবাদপ্রাপ্তি, স্বজনহানি, কলহ বিবাদ। অর্থহানি, জিনিষ পত্র চুরি, ব্যয়বৃদ্ধি, মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি সূচিত হয়। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী অশুভ। অগ্নিকাণ্ডে বা দুর্ঘটনায় সম্পত্তি হানির আশঙ্কা। টাকা লেন দেন ব্যাপারে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। চাকুরিজীবীর পক্ষে ও মাসটী মন্দ। নানাপ্রকার অশান্তি, অপমান ও কলহ বিবাদের কারণ ঘটবে। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে পদে পদে বাধা ঘটবে, এতদ্‌সত্বেও এদের পক্ষে অনেকটা ভালো বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারের কাজ নিয়ে থাকা উচিত। গার্হস্থালি ব্যাপারের বাইরে কোন প্রকার কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। চাকুরিজীবী মহিলাদের পক্ষে নিজের কাজ ছাড়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত বা মন্তব্য প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রণয়ের ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। পর-পুরুষের সংস্পর্শে আসার পরিণাম অশুভব্যঞ্জক। বাইরে একা চলাফেরা করা অনুচিত, আবশ্যক হোলে সঙ্গী নিয়ে যাতায়াত করতে হবে, অবশ্য সে সঙ্গী আপনার জন বা শুভানুধ্যায়ী হওয়া চাই। পরীক্ষার্থীর ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখার অপেক্ষা অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির সময় ভালো। জ্যেষ্ঠার পক্ষে অনুরাধার চেয়ে কিঞ্চিৎ সময় খারাপ। বিশাখা জাত গণেরই দুর্ভোগ বেশী। মাসটী সকলের পক্ষে মিশ্রফল দাতা, শেষার্দ্ধে অবনতি ঘটবে। শুভফলগুলি যথা—উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রু জয়, সুখ ও লাভ, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি, প্রচেষ্টার সাফল্য, মোটামুটি অনুকূল ভাগ্য, প্রিয়-জনের আগমন, প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে

মাসের প্রথমার্দ্ধে। শেষার্দ্ধে অপমান ও কলহ, ক্ষতি ও উদ্বিগ্নতা, বন্ধু-হানি, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ও কষ্টপ্রদ ভ্রমণ আশঙ্কা করা যায়। দীর্ঘ ভ্রমণ যোগ আছে, এ ভ্রমণে বিশেষ লাভ হবে না, বরং ক্ষতিও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের অবনতি! ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দুর্ঘটনা। জীবনীশক্তির হ্রাসজনিত দুর্ব্বলতা। উদর ও গুহ্য প্রদেশে পীড়া ও প্রদাহ। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে মনোমালিন্য ও পারিবারিক অশান্তি সূচিত হয়। আর্থিকক্ষেত্রে ভালোমন্দ দুইই আছে—কখন অর্থাগম, কখন বা অর্থকৃচ্ছ্রতা লাভ ও ক্ষতি সমান ভাবে চল্‌বে। অপরের অসাধুতার ফলে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে গোলযোগের সৃষ্টি হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে কোন শুভ সূচনা দেখা যায় না, বরং দুর্ভোগই দেখা যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সময়টী একভাবেই যাবে, কোন প্রকার বৃদ্ধি ঘট্‌বে না। স্ত্রীলোকের মন ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার দিকে অগ্রসর হবে, বহুলোকের মধ্যে থেকে ও মনে হবে নিজেকে অসহায় ও একক। একটা বৈরাগ্য ভাব অন্তরে দেখা দেবে, ফলে অন্যদিকে মন যাবে না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী নৈরাশ্যজনক।

ধনু রাশি

ধনুরাশিজাত সকল ব্যক্তির পক্ষে একই রকম ফল। মাসটী মিশ্র-ফলদাতা। সাংঘাতিক রকমের কোন কিছু ঘটনা ঘটবে না, তবে কিছু কিছু মানসিক উদ্বেগ, শত্রুদের অপপ্রচেষ্টা, মনস্তাপ, স্বজন বন্ধুর সঙ্গে কলহ ইত্যাদি সম্ভব। মোটামুটি কর্ম্মে সাফল্য, উত্তম স্বাস্থ্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সৌভাগ্য, নূতন পদমর্য্যাদা, সুসংবাদ, সুন্দর ভ্রমণ, উত্তম বন্ধু-লাভ প্রভৃতি দেখা যায়। ক্ষত পীড়া, রক্তের হ্রাস, জ্বর, শরীরে আঘাত প্রাপ্তি। পারিবারিক শান্তি থাক্‌বে। সৌভাগ্য লাভ, ধনবৃদ্ধি ও সাফল্য লাভের সুযোগ আছে। সঞ্চয়ের ব্যাঘাত ঘট্‌বে। কর্ম্মের চাপ পড়্‌বে। উন্নতির পথে অগ্রসর হবার সকল সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। দুর্ঘটনা, চুরি প্রভৃতি থেকে কিছু ক্ষতি হবে, এজন্যে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারেও অর্থাগম। চাকুরিজীবীরা উপরওয়ালার সুনজরে পড়্‌বে ও কর্ম্মদক্ষতার জন্যে প্রশংসা অর্জ্জন কর্‌বে॥ প্রতিযোগিতামূলক ও বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। মাসটী চাকুরিজীবীদের পক্ষে অতীব উত্তম। রেসে লাভ। স্পেকুলেশনে ও কিছুলাভ ঘট্‌বে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে, বিশেষতঃ চিকিৎসক-দের পক্ষে মাসটী খুব ভালো যাবে। স্ত্রীলোকেরা সকলক্ষেত্রেই আশাতীত সুযোগ পাবে। অবৈধ প্রণয় ও কোর্টশিপ অত্যন্ত সুখকর। যে সব স্ত্রীলোক ধর্ম্মসাধনায় রত, তারা নানাপ্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ কর্‌বে। সঙ্গীত, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নিয়ে যে সব মহিলা চর্চ্চা ও সাধনায় রত, তাদের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, সুযোগসুবিধা, সমাদর ও প্রেরণা লাভ হবে। যে সব লোকের মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক, তাদের সঙ্গ বর্জ্জনীয়। পরীক্ষার্থীর ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে সর্ব্বোত্তম সময়, শ্রবণার পক্ষে উত্তম, আর উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। স্বজনবন্ধুর সঙ্গে কলহ বিবাদ, মানসিক আঘাত ও অস্বচ্ছন্দতা, সকল প্রচেষ্টায় বাধা ও ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য হানি, ব্যর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি সূচিত হয়। কতকগুলি শুভ ঘটনাও আশা করা যায়—যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর পরাজয়, ভ্রমণ ও শীকারে আনন্দ, প্রভাব প্রতি-পত্তির বৃদ্ধি, বিলাসসম্ভোগ। ক্লান্তি ও সামান্য শারীরিক দুর্ব্বলতা, আর হজমের গোলমাল ঘট্‌বে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কলহ বিবাদ, মনোকষ্ট ও নৈরাশ্য ভোগ। পরিবারবহির্ভূত আত্মীয় স্বজনেরা কলহের সূত্রপাত কর্‌বে। অর্থকৃচ্ছ্রতা যোগ আছে। কোন প্রকার প্রচেষ্টা বা স্পেকুলেশন কর্‌লে ক্ষতি হবে। মধ্যে কিছু অর্থ লাভের যোগ আছে। রেসখেলায় জয়লাভ। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটের উপর মন্দনয়, কিন্তু চাকুরিজীবীদের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা ও দুর্ভোগ দেখা যায়। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া ও অকারণ ভৎর্সনায় মানসিক আঘাত পাওয়া অসম্ভব নয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে দুঃসময়, বহু বাধা বিপত্তি ও বিরক্তির সম্মুখীন হোতে হবে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী ঈষৎ অশুভ। শিল্প, কলা, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি নিয়ে যে সব স্ত্রীলোক সময় অতিবাহিত করে, তাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। অবৈধ প্রণয়ে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ও লাভ। সামাজিক ক্ষেত্রের বিস্তৃতি। পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দ লাভ। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা দুঃখের কারণ হবে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম।

কুম্ভ রাশি

উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীজাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ-জাতগণের পক্ষে অধম। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ সকলের পক্ষে বিশেষ শুভ হবে। উত্তম পদমর্য্যাদা, প্রভাবপ্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, উত্তম স্বাস্থ্য, সাধারণ সাফল্য, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়, বিলাসব্যসন ভোগ, লাভ, সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বাড়ীতে বিবাহোৎসব, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠা। সামান্যরূপ উদ্বেগ, কষ্ট ও অশান্তিভোগ আছে। প্রথমার্দ্ধে শত্রু দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা। সন্তানদের পীড়া। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আত্মীয় স্বজনের সদ্ব্যবহার, সম্প্রীতি ও আনুগত্য। পরিবারে নবজাত সন্তানের সম্ভাবনা। অর্থের প্রাচুর্য্য ঘটবে। লাভ যোগ, চুরির জন্য সামান্য ক্ষতি, স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, রেসে অর্থাগম, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। ভূম্যাদি ক্রয়, গৃহাদি নির্ম্মাণ, দানের আনুকুল্যে ভূসম্পত্তি লাভ। চাকুরির ক্ষেত্র বিশেষ শুভ, উন্নতির একাধিক সুযোগ। উপরওয়ালার উত্তম ধারণা হেতু পদোন্নতির সম্ভাবনা, বেতন বৃদ্ধি, নূতন পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রাপ্তি, বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ, অস্থায়ী পদে নিযুক্ত ব্যক্তির স্থায়ী পদে অধিষ্ঠান। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অসাধারণ সুযোগ ও আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকেরা এমাসে

প্রচুর আনন্দ লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সুখ সম্ভোগ, উপহার ও অর্থপ্রাপ্তি, কোর্টসিপে সাফল্য। সামাজিক, পারিবারিক ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। প্রণয়িণীরা এমাসে অত্যন্ত লাভ করবে ও মর্য্যাদা পাবে। অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ, কর্মীমহিলাদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র অপেক্ষা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ও রেবতী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের সময় ভালো। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণ রেবতীজাতগণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম ফললাভ করবে। মীনরাশিজাত সকল ব্যক্তির পক্ষে মাসটি সম্পূর্ণ শুভ। উত্তম পদমর্য্যাদা প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব, উত্তম স্বাস্থ্য, মোটামুটি সাফল্য, প্রতিদ্বন্দীর পরাজয়, বিলাসিতা ও আরাম ভোগ, লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিবাহাদি উৎসব, বিত্তার্জ্জনে সাফল্য লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিবাহাদি উৎসব, বিত্তার্জ্জনে সাফল্য সর্ব্বপ্রকার উপভোগ, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ। সামান্য দুঃখকষ্ট। সন্তানদের পীড়া। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছন্দতা। আত্মীয়স্বজনবন্ধুগণের সহিত প্রীতি। গৃহে সন্তান জন্ম সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্র অতীব শুভ, লাভ ও আয়বৃদ্ধি। কিছু বস্তু চুরি যাওয়ার জন্য সামান্য ক্ষতি। মাসের শেষার্দ্ধ অতীব উত্তম, স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে মাসটী অতীব শুভ। ক্রয়, দান অথবা অন্য উপায়ে ভূমি লাভ। বাড়ী ও সম্পত্তি কেনাবেচাতেও লাভ। গৃহাদি সংস্কারের মাধ্যমে বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করে আয়ের পথ প্রশস্ত হোতে পারে। চাকুরিজীবীরাও শুভ ফল পাবে। নানাপ্রকার সুযোগপ্রাপ্তি, নূতন পদমর্য্যাদা লাভ ও উন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, বেকার ব্যক্তির কর্মলাভ, অস্থায়ী পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা স্থায়ীপদ পাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর অতীব উত্তম সময় ও সন্তোষজনক পরিবেশ। মহিলাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে এমন কি দুঃসাহসিক কার্য্যেও সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সিদ্ধি লাভ এবং প্রচুর উপঢৌকন, বিলাস দ্রব্য ও দানসামগ্রী করায়ত্ত হবে ও প্রণয়ী বশীভূত হয়ে থাকবে। কোর্টসিপেও বিশেষ সাফল্য, সর্ব্বত্র সমাদর—কোনপ্রকার কলঙ্ক বা অপবাদের দরুণ লোক সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হবে না। অবিবাহিতাদের বিবাহযোগ। সামাজিক পারিবারিক, প্রণয়ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের কর্ম্মসিদ্ধি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। চাকুরিজীবী নারীর প্রতিপত্তি লাভ। পুরুষেরা আনুগত্য স্বীকার করবেই। রেসে বিশেষ জয় লাভ। শিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীদের উত্তম সময়।



ব্যক্তিগত লগ্নফল

মেষলগ্ন

দৈহিক স্বাস্থ্যের অবনতি, নানা পীড়ার সম্ভাবনা বিশেষতঃ বায়ু প্রকোপ ও উদরঘটিত পীড়া। ভাগ্যোদয়ে বাধাবিপত্তি ও কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা। সন্তানের পীড়া। ব্যয় বৃদ্ধি। পিতামাতার জন্য দুঃখ। পরিবর্ত্তনশীল আর্থিক অবস্থা, দুশ্চিন্তা, প্রতারকের দ্বারা অর্থনাশ। গার্হস্থ্য ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীলোকের পক্ষে মানহানি ও অপবাদ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ সময়।

বৃষলগ্ন

শিরঃপীড়া, উত্তরাধিকার নিয়ে বাদ বিসংবাদ। পরিচ্ছদে আড়ম্বর। লেখাপড়ার কাজে প্রশংসালাভ, আত্মীয়ের জন্য অপবাদ ও কষ্ট, প্রেমের ব্যাপারে অপবাদ, বায়ুরোগ, ভ্রাতৃপীড়া, বিশৃঙ্খল আবেষ্টন, মামলা-মোকর্দ্দমা, কর্ম্ম ব্যাপারে অকস্মাৎ অবনতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ে সাফল্য, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

মিথুনলগ্ন

যন্ত্রশিল্প থেকে অর্থাগম, আড়ম্বরপ্রিয়তা, ভ্রাতাভগ্নীর জন্য মনোকষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ, লেখাপড়ায় বাধা বিঘ্ন, স্ত্রীর দ্বারা ক্ষতি, স্বপ্নে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, ফৌজদারী ব্যাপারে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা। কর্ম্মের ব্যাপারে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা।

কর্কটলগ্ন

অসংযত প্রবৃত্তি, প্রণয়ে অপবাদ, দন্তরোগের প্রবণতা, আর্থিক ব্যাপারে ওঠাপড়া, বিদেশে সাফল্য, স্ত্রীর পক্ষ থেকে দুঃখ, পারিবারিক সুখের অভাব। হৃৎপিণ্ডের পীড়া, ঋণ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

সিংহলগ্ন

স্বাস্থ্যহানি, স্ত্রীর জন্য মানসিক কষ্ট। আমোদ প্রমোদের জন্যে কর্ত্তব্যে অবহেলা, অধীরতা, ধনোপার্জন। যকৃতের দোষ, অজীর্ণতা, আশাভঙ্গ, গুরুজনহানি, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যা লগ্ন

সন্তানজনিত চিন্তা, বিষয়বুদ্ধির সাহায্যে উন্নতি, অর্থহানি, ভৃত্যের জন্য ঝঞ্ঝাট, দাম্পত্য সুখ, লেখাপড়ার ব্যাপারে খ্যাতি, উন্নতির সুযোগ প্রাপ্তিতে বাধা, কোন বন্ধু ঘোর শত্রু হ'য়ে উঠবে, সন্তানদের জন্যে কিছু অশান্তি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

তুলা লগ্ন

অপব্যয়, সম্পত্তিহানি, স্ত্রীপুত্রের জন্য দুর্ভোগ, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আশাভঙ্গ, পিতৃপক্ষ থেকে দুঃখ ভোগ, চক্ষুপীড়া ও হৃদ্‌রোগের প্রবণতা, সহোদরের জন্য চিন্তা, মনোকষ্ট, কর্মস্থানে শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবনতির আশঙ্কা। অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট, বন্ধু ও অনুচরের দ্বারা চুরি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

বৃশ্চিক লগ্ন

কর্মোপলক্ষে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ, আত্মীয়স্বজনের জন্যে ক্ষতি, দুর্ঘটনা প্রণয়ে সাফল্য, বিবাদে পরাজয়, পারিবারিক অশান্তি। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য, মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা, কন্যার বিবাহযোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টা অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মধ্যম।

ধনুলগ্ন

দায়িত্বপূর্ণ কাজে অর্থোপার্জ্জন। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। গৃহে উৎসবাদি। ব্যয়বৃদ্ধি, পড়াশুনায় কৃতিত্ব প্রকাশ। ভাগ্যোন্নতিতে বাধা, মিত্র লাভ, ভূসম্পত্তির ব্যাপারে বিবাদ বিসংবাদ। নাড়ীমণ্ডলে ব্যাধির প্রবণতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকর লগ্ন

কূটবুদ্ধির দ্বারা সাফল্য। আত্মীয়ের দ্বারা অপবাদ প্রচার। অনর্থক দুশ্চিন্তা, ফুসফুসের পীড়ার আশঙ্কা। পিতামাতার ব্যাপারে আশাভঙ্গ। শারীরিক অশান্তি। ধনভাবের ফল মধ্যবিধ। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভ, ভ্রমণে অর্থব্যয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা। চাকুরি বা পদোন্নতি লাভের আশা। বিদ্যালাভে অন্তরায়। ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা। ফৌজদারী ব্যাপারে জড়িত হয়ে অপদস্থ হোতে হবে। পারিবারিক ব্যাপারে পরিবর্ত্তন। প্রদাহমূলক কোনরকম ব্যাধির প্রবণতা। অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মীনলগ্ন

বুদ্ধি কৌশলে সম্পত্তি লাভ। লেখাপড়া বা শিল্পকলার ব্যাপারে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। অর্থের ব্যাপারে অংশীর সঙ্গে বিরোধ। সহোদর ভাব শুভ। ভাগ্যোন্নতির যোগ। অধ্যাপনা কার্য্যে সুনামের আশা। বিদেশ ভ্রমণ যোগ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

পূর্বপ্রকাশিতের পর

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের কাছে যাওয়া বন্ধ করল অভয়। তার বন্ধুদের জমায়েত যেখানে হয়, সেই ইউনিয়ন অফিসে সে আর যেতে পারল না। কয়েক দিন আগে, অনাথের মুখের ওপর রূঢ় কঠিন কথাগুলি বলে, ইউনিয়ন অফিসকে তার দূর মনে হচ্ছে। শৈথিল্য অনুভব করছে আত্মীয়তায়।

শুধু অনাথকে রূঢ় কথা বলার জন্য নয়। কয়েক দিন আগের সেই দিনটি তাকে বিমূঢ় করেছে ভিতরে ভিতরে। একটি বিস্মিত স্তব্ধতায় সে যেন থমকে রয়েছে। অনাথের সঙ্গে কথা, আধো অন্ধকারের এক বিচিত্র, যেন শরীরহীন পরিবেশের মধ্যে জীবন চৌধুরীর সেই রোগক্লিষ্ট আশ্চর্য কথামালা, আর সুবালার সান্নিধ্য। সব মিলিয়ে, একটি সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, তার ভিতরে ভিতরে অনেক জায়গায় কেঁপে গেছে, চিড় খেয়েছে, ধ্বস্ নেমে গেছে।

অনাথকে কথাগুলি বলে সে অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেল না। জীবন চৌধুরীর কথায় তার আয়ত্ত হল না নিরহঙ্কার দুঃখদীর্ণ বিশ্বাসের অটলতা। সুবালা তাকে সব থেকে বেশী অসহায় করেছে। নিজের প্রতি আচ্ছন্ন সে সংশয়ে।

আপন জীবন-চিন্তায় যেখানে তার স্বাতন্ত্র্যের বিন্দুমাত্র ছায়া ছিল না, তারই প্রবেশ ঘটল, অদৃশ্য 'পাতালের রন্ধ্র চুঁইয়ে। কবি এবং গায়ক বলে, এতদিন বাইরের জগত তাকে যে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছিল, তাতে তার মধ্যে স্বতন্ত্র চিন্তার উদয় হয় নি। বাইরের জগতের কাছে যখন তার পরিচয় নিশ্চিত ভাবে অভয়-কবি বলে চিহ্নিত হল, তখন, নিজের অজ্ঞাতে, সে প্রশ্ন করল, আমি কী চাই? আমার এ জীবনটা কী?'

জবাবে, অন্ধকারের মধ্যে একটি জটিল আবর্ত সশব্দে পাক খেতে লাগল। তার মধ্যে কতগুলি বিচ্ছিন্ন কথা শুনতে পেল সে। 'মানুষ সবাই খেয়ে পরে সুখে বাঁচুক, এই ভেবে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছি।' পরমূহূর্তেই আবার শুনল, 'এ কথা সত্য নয়।' সত্য নয়, কারণ জীবন সে কোথাও উৎসর্গ করে নি। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে সে কোনো উত্তর পেল না। তার ভয় হল। প্রশ্ন করে সে সরে এল। যেন অতল জলের শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকার থেকে ভেসে উঠল সে। নিজের কাছ থেকে জবাব আদায়ের ক্ষমতা নেই তার এবং অতল জলের ওপরে, সবচেয়ে কাছের সহজ মাটি আঁকড়ে ধরল সে। ছেলের প্রতি আরো যত্নশীল হল। আরো কাছে কাছে, আরো বেশী সময় ধরে রইল ছেলে নিয়ে। কথায় কথায় নিমে নিমে বলে ডাকতে লাগল।

আরো বেশী নজর দিল দোকানের দিকে। কেনা-বেচার হিসেবে আরো হিসেবী হয়ে উঠল। পাল্লার কাঁটার প্রতি নজর তীক্ষ্ণ করল আরো। নতুন গানের চিন্তায় ডুবিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। নতুন গান, লোক-শিল্প সম্মেলনে গাওয়ার জন্যে। সেজন্য সন্ধ্যাবেলাটা হাতে রাখতেই হল। কিন্তু ইউনিয়ন অফিসে নয়। মুচীপাড়ার বস্তিতে।

মালীপাড়ার শেষে যেটা কোনো এক কালে ছিল গঙ্গায় আসার খাল, কালক্রমে সেটা শহরের সুবৃহৎ নর্দমায় পরিণত হয়েছে। শহরের ময়লা মুক্তিদাত্রী নালী বিশেষ। সেই

খালের ধারে মুচীপাড়ায় বাজনদার চুক্তি করতে গিয়ে, গানের মহড়া চলল সেখানেই।

পাড়া চেনা ছিল আগেই। অধিবাসীরাও সকলেই কম বেশী পরিচিত। মেলা মেশা ছিল না। এখন সন্ধ্যা হলেই অভয় মুচীপাড়ায় আসে। মুচীপাড়ার লোকেরাও খুশি। হারু বায়েনের বাড়িতেই আসল বৈঠক। হারু-ই বাজাবে অভয়ের সঙ্গে। কলকাতায় যাবে, লোকশিল্প-সম্মেলনে। কাঁসী বাজাবে হারুর ছোট ভাই। সন্ধ্যা হলেই হারুর উঠোনে মুচীপাড়ার সকলের ভিড় লেগে যায়।

অভয় এলোমেলো যা খুশি তা গাইতে থাকে। সময়ে সময়ে কথা অর্থহীন হয়। মিল থাকে না। এ গান যে সম্মেলনের প্রস্তুতি, আসরের সবাই জানে না। অমিল এবং অর্থহীন কথার ত্রুটিও বোঝে না সব সময়। যখন ভালো লাগে, তারিফ করে। ভালো না লাগলে চুপ করে থাকে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থাতেও সবাই দোলে দুই বায়েন ভাইয়ের ঢোলক কাঁসীর তালে তালে।

কথা খুঁজে খুঁজে, বাঁধতে বাঁধতে, এলোমেলো রাশি রাশি ভুলের জন্য, সেখানে কোনো সংকোচ হয় না অভয়ের। লজ্জা করে না।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আন-মনা হয়ে ওঠে অভয়। সে যা ভাবতে চায় না, তাই এসে বুড়বুড়ি কাটে তার সামনে। অভয় হাল ছাড়ে না।

তার এ ভাবান্তরটা চোখে পড়ল সুরীনের। কিন্তু বলবার বিশেষ খুঁজে পেল না। কেবল এই ভেবে সে অবাক, যে দোকান নিয়ে অভয় আরো বেশী বজ্র আঁটন কষছে, সেই দোকানের লাভের খাতায় ক্রমে কেন ফসকা গেরোর সংখ্যা বাড়ে। আঁটন-কষণ কিছুই না করে, সে যেমন দোকানের হিসাবে স্বচ্ছন্দ, অভয় তাতে শুধু গরমিল বাড়ায়। কথাও যেন কম বলছে অভয়। কেন? দোকানের ব্যাপারে, অভয় কি খুশি নয় সুরীনের ওপর? সুরীনের হিসেবের ওপরেও অভয় হিসেব করে। হঠাৎ সে এত উঠে পড়ে লেগেছে কেন? সুরীন খুড়োকে সে অবিশ্বাস করছে নাকি?

সুরীনের এই মনোভাব অভয় যদি এক বারটিও জানতো! আসলে সে দোকান নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোটা, পদে পদে নিজের কাছেই প্রমাণ করতে চাইছিল। বেশী মনোযোগ দিতে গিয়ে ভুল করছিল বেশী।

আর ভামিনীর চোখে পড়ল মুচীপাড়া যাওয়া-আসা। ওটা তার পছন্দ নয়। রাস্তা আর উঠোন যাদের শুয়োরের বিষ্ঠায় ভরতি, সেখানে গিয়ে বসতে, মাথামাথি করতে ঘেন্না করে না অভয়ের? জাত না হয় না-ই মান গেল।

গিনি সেটাও মানতে রাজী নয়। জাত-ই বা মানবে না কেন অভয়। তার এই অল্প বয়সের গ্রামীণ অভিজ্ঞতায় সে জানে, মানুষ মাত্রেরই জাত আছে এবং থাকবেও। বায়েন মুচীর বাড়িতে শুয়োরের খাঁচার পাশে বসে পোহর রাত অবধি কাটিয়ে আসাটা আবার কেমন-তরো কথা। মুচীর ঘরে নাকি আবার খাওয়া যায়! ছি!

গিনি এখন প্রায় গিন্নি। হাসি মুখ হলেও, অভয়কে তার শাসন মানতে হয়। ছেলে নির্মল, অর্থাৎ নিমে যদিও ভামিনীকে মা বলে জানে, গিনির অনুরক্ত সে বেশী। গিনিকে সে দাই দাই (দিদি) বলে ডাকে বটে, হাপা পোহাবার বেলা মায়ের চেয়ে কম নয়। রান্না-বান্না থেকে, যাবৎ এখন গিনির মাথায়। তাই, সে মুচীপাড়ায় যাওয়া আটকাতে পারে না বটে, ধমক দিয়ে উঠোনে দাঁড় করিয়ে, গঙ্গাজলের ছিটা না দিয়ে ছাড়ে না।

অভয় একটুও জানে না, এ সংসারে গিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু অভয় কেন, অভয় তো সুরীনও লক্ষ্য করে না গিনির পরিবর্তন। একটি সংসারে নিয়মিত পরিশ্রম, নিয়মিত খাওয়া-পরা এবং মোটামুটি নিঃশঙ্ক জীবনযাত্রায় গিনির মধ্যে একটি স্বাভাবিক নারীর প্রকাশ ঘটেছে। সে ছেলে কোলে করে ঘুম পাড়ায়, ছেলে সাজায়, শাসন করে। বাড়ির প্রায় কর্তা গিন্নি, সুরীন ভামিনীকে খাইয়ে সে রাত্রির অন্ধকারে অভয়ের জন্য জেগে বসে থাকে। জেগে থেকে কষ্ট হলে, অভয়কে জানতে দিতে চায় না। যদিও মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাগ প্রকাশ করা মুশকিল। কারণ অভয়ের ঢালাও হুকুম আছে, ভাত বেড়ে রেখে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বে। কিন্তু, অভয়ের আগে গিনি খেয়ে শুয়ে পড়বে, ভাবতে পারে না। এ যে শুধু তার নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য,

তা নয়। অভয়ের অধীন সে। তার রক্ষাকর্তা, এ কথাটি একেবারে ভুলতে পারে না। তার ধারণা, সংসারে কতগুলি যেমন-ভাল-মন্দ বলে জিনিষ আছে। এ কি কথনো সম্ভব যে, অভয়ের আগে সে নিজের সব পাট মিটিয়ে, এলিয়ে আয়েশ করবে। তা ছাড়াও অভয়কে সে মানুষ হিসেবে অনেক বড় মনে করে। শ্রদ্ধা করে, ভক্তিও করে। অভয় তার কাছে থেকেও অনেক দূরের মানুষ। চেনার মধ্যেও অচেনা। কৌতূহল তার অনেক।

তাই, এ সংসারে, একজন মানুষের স্মৃতি গিনি নিশ্চিহ্ন করতে পারে না বটে, প্রত্যহের মধ্যে, সকলের সব অভাব ভুলিয়ে রাখতে কশুর করে না।

তবুও এক একটি সময় আসে। যখন কাজ নেই, যখন অন্ধকার ঘিরে থাকে চারিদিকে, যখন সবাই ঘুমায়, তখন অচেনা বাতাসের ঘূর্ণী ওঠে তার বুকে। তার স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী জীবনের পাল ছিঁড়ে পড়তে চায় সেই বাতাসে। তার কষ্ট হয়। এ হেন অনিবার্য, তবু অবুঝ সেই কষ্টে, এক এক সময় তার কান্না পায় এবং কান্না পেলে নিজের ওপর সে বিরক্ত হয়। এর কোনটাই তার কাছে, কোনো স্পষ্ট অর্থবহ হয়ে ওঠে না।

কোন্ এক আবদ্ধ স্তব্ধতা থেকে, তার দেহ আরো দৈর্ঘে বেড়েছে। সঙ্কুচিত মগ্নতা থেকে, এক মৌন উল্লাসে সর্বাঙ্গ ঢল ঢল হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের নির্জন একাকীত্ব তাকে এই দেহের লজ্জায় দাঁড় করিয়ে, তার অবোধ কষ্টকে রক্তে রক্তে অনুরণিত করে।

কিন্তু এ কষ্টের জন্য, সংসারে কাউকে সে দায়ী করে না। এ তার একলার, আর সব দিকে সে হেঁকে ডেকে, বকে ঝকে সংসার করে।

অভয় গিনির গঙ্গাজল মেনে নিয়েছে। ধমকধামকগুলি খেতেও আপত্তি করেনি। কিন্তু মুচীপাড়ায় যাওয়া তার ঠেকানো গেল না। হয় তো গিনির জাত বেজাতের বিশ্বাসের ওপর অভয় তাকে কিছু বলত। কিন্তু তার মনের সে অবস্থা নয়।

মালীপাড়ায় প্রস্তুতি পর্ব জমে উঠল। লোকশিল্প সম্মেলনে যাবার দিন এল ঘনিয়ে। ঠিক এমনি সময়েই, এক শনিবারের রাত্রে সুরীন জানাল, এবার সে তার নিজের ঘরে ফিরে যেতে চায়।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। এত রাত্রে সুরীনকে জেগে বসে থাকতে দেখেই একটু অবাক হল অভয়। ভামিনী পাশেই, বারান্দায় শুয়েছিল। গিনির সঙ্গে গল্প করছিল সুরীন। গরমের সময় নয় যে, এত রাত অবধি বারান্দায় বসে গল্প করবে সবাই।

অভয় বলল, এখনো শোওনি কাকা। সুরীন হাই তুলে বলল, এই এবার যাব। কাল রোববার, তাই একটু বসে আছি। গিনি তাড়াতাড়ি উঠে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিল। অভয় যেন লক্ষ্য করেও করল না। ঘরের পিছনে ঘাটে নেমে গেল গামছা নিয়ে। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। গিনিকে জিজ্ঞেস করল, সুরীনকাকা খেয়েছে?

গিনির মুখের অবস্থাও খুব স্বাভাবিক নয়। চুপচাপ, গম্ভীর। বলল, হ্যাঁ।

অভয় আর কিছু না বলে, খাওয়ায় মনোযোগ দিল। কিন্তু, যাকে ঘুমন্ত মনে হয়েছিল, সেই ভামিনীর গলা শোনা গেল বারান্দায়। ব্যাপারটা এমন কিছু অদ্ভুত নয়। কিন্তু, ভামিনী খুড়ি জেগে ছিল, অথচ বাড়িতে ঢোকার সময় একটি কথা বলল না, এমন তো হয় না। খেতে খেতে সে শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভামিনীর কথা বোঝা গেল না। অস্পষ্ট চুপি চুপি ভাব যেন। অভয় তাকাল গিনির দিকে। গিনি আজ তার স্বভাবের বাইরে, একেবারে নীরব।

খাওয়া শেষ করে বারান্দায় এল অভয়। সুরীন বলল, খেলে?

—হ্যাঁ।

একটু চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ যেন জোর করে উচ্চারণ করল সুরীন, বলছিলুম কি, বুঝলে অভয়, এবারে ভাবছি, ও বাড়িতে ফিরে যাব।

অর্থাৎ সুরীনের নিজের বাড়িতে। অভয় জেলে যাওয়ার পর থেকে, সুরীন ভামিনী এ বাড়িতেই আছে। এমন কিছু অদ্ভুত কথা নয়। তবু অভয় যেন অবাক হয়ে বলল, ফিরে যাবে?

—তা হ্যাঁ—ফিরে যেতে হবে না? অনেকদিন তো হল। বছর কাবার হয়ে গেছে কবে। ও বাড়ি তে' পোড়ো

হয়ে গেল প্রায়। এবার যাওয়া দরকার। তাই ভাবছি, তোমার খুড়িকে নিয়ে কালই যাব, বুঝলে?

এমন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অভয়ের বুকের দুপাশে একটা যন্ত্রণা কেমন যেন স্তব্ধ করে রাখল তাকে। সে কেবল শব্দ করল, হুঁ।

ভামিনী উঠে বসল। নিজের গায়ে আঁচলটা চাপা দিয়ে বলল, অবিশ্যি গিনি থাকবে। সংসার দেখাশোনা গিনিই করবে। ওদিকে তোমাকে কোনোদিন কিছু দেখতে হবে না। পয়সা কড়ি ঠিক মতন পেলে, সব চালিয়ে নেবে। তা ছাড়া আমরা তো রয়েছিই।

অভয় বলে উঠল, তা বেশ তো, যেও। আর সুরীন-কাকা কি তা হলে আর সন্ধেয় দোকানে বসবে না কাল থেকে?

সুরীন ভেবে রেখেছিল সেইরকম। কিন্তু অভয়ের ভাবভঙ্গি দেখে বলতে সাহস করল না। বলল, না, দোকানে বসব বৈ কি। ও বাড়িতে ফিরে যাওয়াটা দরকার, সেইটাই—

অভয় বলল, তা তো যাবেই। আর কতদিন ঘর ছেড়ে থাকবে।

কেউ আর কোন কথা বলল না। সব চুপ। কেবল রান্নাঘরে ভাত বেড়ে নিয়ে হাত তুলে বসে রইল. গিনি। তার একমাত্র ভয়, অভয় বলবে, 'তবে গিনিকেও নিয়ে যাও তোমাদের কাছে'।

কিন্তু পুকুরের পাড় থেকে কেবল ঝিঁ ঝিঁর একটানা শব্দ আড়ষ্ট স্তব্ধতার গায়ে বৃথাই করাত চালাতে লাগল।

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্র সংগীত

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

এ জীবনে বড় বেশী জগতের আছে জড়বাদ,
সূর্য ভাবে এখানে কি কঠিন আবাদ?—
তবুও তো আকাশের সোনা রোদ ঝরে—
ঝরে আর ঝরে শুধু হাজারো সংগীত এই চরে।
একটি নদীর মাঝে জীবনের যেন
শুনছিই গানগুলো কত প্রকারেণ;
কতই বিচিত্র এই স্বীকৃতির ঋণ
বেড়ে গেছে শতাব্দীর প্রতি দিন দিন।
হৃদয় যন্ত্রণা নিয়ে যদি এসে দেখি
মন নয় মেকি;—
সূর্য-সংগীতেও মাটি কাছে আছে বুঝি,
প্রশস্ত সড়কে যাত্রা, চাই না খুঁজতে গলি ঘুঁজি।
সূর্যের আশায় দিনে পথ চিনে চলি,
পথ চিনে আমরাই আশা-কথা বলি;—
সে আশা সূর্যের এক জীবনে বুঝেছি,
বুঝি কত সূর্যমুখী হয়তো হয়েছি।
যদি দুঃখ হৃদয়েই যায় দিন গুণে
ভুলি কিছু তার তাপ একটি ললিত গান শুনে;—
হাওয়ার প্রলেপে করি স্নান
যখনই শুনি সুর, আনন্দের গান।

বাণী রূপ

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

এসেছিল রবি এ-মর জগতে,
রেখে গেছে ভাব ছন্দ!
তাহার সৃষ্টি তাহারি প্রতীক,
ফুলে হয়ে আছে গন্ধ।
বিশ্বেরে ভাল বেসেছিল কবি,
পেয়েছে বিশ্বপ্রীতি।
আকাশে বাতাসে সে প্রীতি ধ্বনিছে,
নিত্য কালের গীতি।
হর্ষ-বিষাদ, আশা ও হতাশা,
ক্রন্দন হাসি যত,
কবির বীণায় সুরে সুরে বাজে,
ঝঙ্কারে অবিরত।
সারা জীবনের লেখনী কবির,
যে বাণী রাখিয়া গেল,
যুগোত্তরের মানুষ তাহাতে,
অমৃতের স্বাদ পেল।
ভাব-সাগরের অসীমতা মাঝে
বিশ্ব ডুবিয়া যায়।
নশ্বর দেহ বাণী রূপ ধরি
শাশ্বত নীতি গায়।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ তিন কন্যা ॥

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্প অবলম্বনে শ্রীসত্যজিৎ রায় "তিন কন্যা" নামে যে চলচ্ছিত্রটি নির্ম্মাণ করেছেন তা রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকীর সময় মুক্তি লাভ করে দর্শক মনে প্রভূত আনন্দদান করেছে। "মণিহারা", "পোষ্টমাষ্টার" ও "সমাপ্তি" কবিগুরুর এই তিনটি ছোট গল্পকে পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর এই চলচ্চিত্রটির জন্য বাছিয়া নেন। মনোনয়ন যে উপযুক্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং এই তিনটি গল্পের তিনটি বিপরীত-ধর্ম্মী কন্যার চরিত্রে যে তিনজন অভিনয় করেছেন তাঁদের অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে বলা চলে,—বিশেষ করে "পোষ্টমাষ্টার" ও "সমাপ্তিতে"-তে যথাক্রমে কুমারী চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্তর অভিনয় যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পোষ্টমাষ্টারের গৃহ-কার্য্যে নিযুক্তা অনাথিনী রতনের ভূমিকায় ছোট্ট মেয়ে চন্দনার অভিনয় প্রাণ-



'মণিহারা' চিত্রের মণিমালার ভূমিকায় কণিকা মজুমদার



'মণিহারা'য় ভীতি-বিহ্বল কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্পর্শী হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না, আর "সমাপ্তির"-র পাগলী মেয়ে মৃন্ময়ীর ভূমিকায় অপর্ণা দাশ-গুপ্ত তাঁর অভিনয়-প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। "মণিহারা"-য় মণিমালার ভূমিকায় শ্রীমতী কণিকা মজুমদার তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন,—তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। তিনটি গল্পের তিনটি প্রধান পুরুষ চরিত্রে যথাক্রমে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুযায়ী হয়েছে বলতে পারা যায়। আর সবচেয়ে যা সুন্দর হয়েছে তা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা। এই 'তিন কন্যা'-র মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণিত হল যে তিনি ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক। তবে পরিচালনা যে একেবারে ত্রুটিহীন তা বলা চলে না। বিশেষ করে একটি বিষয়ে এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না। সেটি হচ্ছে 'মণিহারা' চিত্রটির অতিমন্থর গতি। চিত্রটির প্রথম দিকে দর্শকমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে চিত্রের শ্লথ গতিতে। বাংলা চিত্রের গতি এমনিতেই মন্থর, আর এই শ্লথ গতি বাংলা চিত্রের একটি বিশেষ ত্রুটি। কিন্তু শ্রীরায়ের মত অভিজ্ঞ পরিচালকও এই ভুলটি করলেন কেন? তিনি কি ঐ গতি মন্থরতার মধ্য দিয়ে চিত্রের কোনও ভাবকে ফোটাতে চাইছিলেন? তা যদি হয় তাহ'লে বলব—তাঁর উদ্দেশ্য সফল তো হয় নি, উল্টে অতি মন্থর গতি চিত্রের মাধুর্য্যকে ব্যাহত করেছে। কথকের মাধ্যমে গল্পটিকে পরিস্ফুট

করা হয়েছে এবং এই আঙ্গিকটি যথোপযোগীই হয়েছে। ধ্বনি ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শেষের দিকের কয়েকটি দৃশ্য প্রশংসনীয়ভাবে দেখান হয়েছে। তবে গল্পের অতি-প্রাকৃত রূপটিকেই শেষে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মানবীয় আবেদনটুকুকে নষ্ট করে। (রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" চিত্রেও পরিচালক তপন সিংহ এই ভুলটিই করেছেন !) "পোষ্টমাষ্টার"ও "সমাপ্তি" চিত্র দুইটির পরিচালনা প্রায় ত্রুটীহীন বলা চলে। বিশেষ করে এই চিত্র দুইটির মধ্য দিয়ে গ্রাম্য পরিবেশস্থষ্টিতে শ্রীরায় দেখালেন তিনি ভারতে অদ্বিতীয়। তবে গল্প তিনটির অনেক স্থানে তিনি অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেছেন চিত্রোপযোগী করার জন্য। এ ব্যাপারে হয়ত অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে একমত না হতে পারেন ; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে চিত্রের মাধুর্য্য নষ্ট যে হয়নি বরং বেড়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে "পোষ্টমাষ্টা"-রে বিশে-পাগলার ভূমিকাটি উপভোগ্য হলেও এর আবশ্যক বিশেষ ছিল না। 'সমাপ্তি'-কে রবীন্দ্রনাথ প্রণয় রসে মধুর করে সমাপ্ত করেছেন, কিন্তু সত্যজিৎ শেষ দৃশ্যটি ঠিক সেভাবে না দেখালেও মাধুর্য্যটি বজায় রেখেছেন —এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। নেপথ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও চিত্রটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। কয়েক স্থানের নেপথ্য-সঙ্গীতের কাজ অপূর্ব্ব হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনার ভারও পরিচালক শ্রীরায় গ্রহণ করে ছিলেন. এবং এ বিভাগেও তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিলেন।



'পোষ্টমাষ্টার' চিত্রে রতনের ভূমিকাটি জীবন্ত করে তুলেছে এই ছোট্ট মেয়ে চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ "রবীন্দ্রনাথ" ॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীসত্যজিৎ রায় নির্ম্মিত প্রামাণ্য চিত্র "রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধেও বলা চলে যে প্রামাণ্য বা ডকুমেণ্টারী চিত্রের ক্ষেত্রেও শ্রীরায় একটি অপূর্ব্ব স্থষ্টি করলেন। প্রামাণ্য চিত্রও যে তাঁর হাতে কিরূপ সজীব ও চিত্তাকর্ষক হতে পারে সত্যজিৎ রায় তা দেখালেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনই ঐরূপ, তবুও শ্রীরায়ের স্থষ্টির বিশেষত্ব হচ্ছে তাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলাই শুধু নয়, তাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে পরিবেশন করায়। একটি বিরাট কাব্যময়, কর্ম্মময়,

ধর্ম্মময়, আদর্শ জীবনকে মাত্র পাঁচ হাজার ফিটের মধ্যে একটি কাব্যের মতন অথচ তত্ত্বসমন্বিত করে ধরে রাখা সত্যই প্রশংসনীয়, আর যথার্থ শিল্পী-মনের ও শিল্প-চাতুর্য্যের একটি প্রকৃত প্রমাণ। নেপথ্য-ভাষণও (কমেন্টারী) শ্রীরায়ের এবং তাঁর বচন ভঙ্গীও সুন্দর। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে আরও দেখালে যেন ভাল হত, যেন অপূর্ণ রয়ে গেল, সব যেন দেখা হল না! কিন্তু বিশ্বকবির বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিময় জীবনকে খুঁটিয়ে দেখাতে গেলে পাঁচ হাজার ফিট্ কেন পঁচিশ হাজার ফিটেও শেষ হবে না! ছবি দেখতে দেখতে আর একটি কথা মনে হয়েছে যে চিত্রটিকে কি রঙ্গিন করা যেত না? খরচ অবশ্য বেশীই হত, কিন্তু তা যথোপযুক্ত হত। পরিচালক শ্রীরায় এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে চিত্রটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। আর একটি বিশেষ ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে থাকা যায় না, সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ভারতের জন-গণ-মন-অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা! এ নীরবতার অর্থ বোধগম্য হল না। শ্রীসত্যজিৎ রায় কী এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন? যাই হোক, যে সৃষ্টি তিনি করেছেন তা অনবদ্য এবং শ্রীসত্যজিৎ রায়কে এই সার্থক সৃষ্টির জন্য জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

॥ অর্ঘ্য ॥

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিবেদন হচ্ছে এই "অর্ঘ্য" নামক চলচ্চিত্রটি। চিত্রটির পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসু। কবিগুরুর অবিস্মরণীয় চারটি কবিতা—'পূজারিণী', 'অভিসার', 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য', অবলম্বনে নির্ম্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের চারটি চিত্রকে একত্র করে এই "অর্ঘ্য" রচনা করা হয়েছে। বিশ্ব-কবির সৃষ্ট চরিত্র, খ্যাতনামা পরিচালক ও সরকারী প্রচেষ্টা—এই তিনের সমন্বয়ে যে সার্থক সৃষ্টির আশা মনে ছিল, দুঃখের বিষয় সে আশা পূর্ণ হয়নি। 'পূজারিণী'-র শ্রীমতী, 'অভিসার'-এর বাসবদত্তা ও উপগুপ্ত, 'দুই বিঘা জমি'র উপেন এবং 'পুরাতন ভৃত্য'-র কেষ্টা—বিশ্ব-কবির অনবদ্য সৃষ্টি এই চরিত্রগুলি ভেবেছিলাম জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠবে পর্দায়, কিন্তু তা হয়নি। যদিও সুকণ্ঠে গীত রবীন্দ্র-সঙ্গীত, শোভন-সুন্দর নৃত্য, উপযুক্ত দৃশ্য-পট—সবই ছিল, কিন্তু তবুও সার্থক হল না এ সৃষ্টি। কেন হল না তা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি চিত্রটির প্রধান কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করে। পাত্র-পাত্রীর মুখে কবিতার কলির সঙ্গে গদ্যের ব্যবহার কর্ণপীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। কবিতার প্রতি চরণের বর্ণনাগুলিকে দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা রসগানিকরই শুধু নয়, এক এক সময় যেন ছেলে-মানুষি-পনার পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে। নেপথ্য-সঙ্গীতের প্রয়োগেও রসবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে—সময় সময় পীড়াদায়কও হয়ে উঠেছে সুপ্রযুক্ত হয়নি বলে। চরিত্র সৃষ্টিতেও যথেষ্ট ত্রুটি রয়ে গেছে। 'অভিসার'-এ উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার চরিত্র মোটেই ফোটেনি। 'দুই বিঘা জমি'র উপেনও মনে ছাপ ফেলতে পারেনা। "পুরাতন ভৃত্য"-র কেষ্টা স্থানে স্থানে হয়ে পড়েছে অতি-নাটকীয়। আর 'পূজারিণী'-র শ্রীমতী ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি কাব্যানুরূপ ভাব ফোটাতে অক্ষমতাই প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য পূজারিণী চরিত্রটি অনেকটা ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে ও সুষ্ঠু নৃত্যে। এই 'পূজারিণী' চিত্রটিতেই পরিচালক ভাব ও রসকে কিছুটা ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের সুকণ্ঠে গীত "ক্ষম হে ক্ষম" সঙ্গীতটি ও তৎসহ মঞ্জুশ্রীর নৃত্য এই চিত্রটির বিশেষ আকর্ষণ। 'পূজারিণী' চিত্রটির দৈর্ঘ্য আরও বাড়াবার অবকাশ ছিল, যদি পরিচালক—"নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইয়া পদ-নখ-কণা তাঁর"—কবিতাটির এই গোড়ার থেকে আরম্ভ করে বিম্বিসারের স্তূপ নির্ম্মাণ, রাজপুরবাসিনীদের স্তূপে অর্ঘ্য দান, অজাতশত্রুর রাজা হওয়া ও বৌদ্ধ স্তূপে অর্ঘ্য রচনা দণ্ডনীয় করে আদেশ প্রচার, প্রভৃতি দেখাতেন। দৈর্ঘ্য বাড়াবার অক্ষম প্রচেষ্টা এই চারটি চিত্রের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যেখানে এর সুযোগ ছিল পুরামাত্রায় পরিচালক তা গ্রহণ করেননি।

যাই হোক, বিশ্বকবির কবিতাকে চিত্রে রূপায়িত করবার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে একটি নতুন পরীক্ষা হিসাবেই আমরা ধরে নিচ্ছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে সার্থক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হবে।

॥ কাঞ্চন মূল্য ॥

স্বরূপমণ্ডল অনেকদিন থেকেই অনেক গল্প শুনিয়েছে। তামাকের ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রতে করতে তার কাহিনী সুরু করে রাখাল স্বরূপ আজ বার্ধক্যের দ্বারে পৌঁছেও অতীত দিনের কথা আজও ভোলেনি।

জীর্ণ তরীর হাল ধরে চলছিলেন অনাদি ঠাকুর, কিন্তু কাল-বৈশাখীর ঝড়ে হঠাৎ তিনি বেসামাল হয়ে পড়লেন। সে ঝড় হল



রাজীব ঘোষাল রূপে বিকাশ রায়

স্বরূপ মণ্ডল,—"আপনি ব্রাহ্মণ সজ্জন মনিস্যি দা ঠাকুর, ভরসা করে কিছু বলতে পারিনে, কিন্তু বর-ক'নে না হলে বিয়ে হবে না, কৈ, এমন কথা শাস্তোর তো কোথাও ধ'রে দেয় নি।"

'সোনার অভাবে যদি মূল্য ধরে দিয়ে শাস্ত্রীয় কাজ সমাধা করা যায় তাহলে ক'নের অভাবে বিবাহের কাজ কেন চলবেনা?' নিজের যুক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে স্বরূপ মেলে ধরে 'মসনে' গাঁয়ের অতীত ইতিহাস,—যার পাতায় লেখা রয়েছে কত বিচিত্র কাহিনী। অনাদি ঠাকুর ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলে কি হবে, নির্বিরোধী-ভাল মানুষটিবলে লাঞ্ছনাও তাকে কম সইতে হত'না। এই অনাদি ঠাকুরের বন্ধ্যা গাইএর পালক বিদ্যাসাগর মশাইর বিধবা বিবাহ আন্দোলন। 'মসনে' গাঁয়ে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দিল। বিধবাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হল, আর সমাজপতিরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বিধবা পার্টি ও সধবা পার্টির প্রতি-যোগীতায় গ্রামখানা আন্দোলিত হতে লাগল, এমন কি চৌধুরীদের জমিদারী পর্য্যন্ত ভাগাভাগি হয়ে গেল দশ আনা ছ আনাতে। কাকা নিশিকান্ত ভাইপো দেবনারায়ণকে দিলেন আলাদা করে, কারণ দেব-নারায়ণ বিধবা পার্টির পক্ষে প্রচার করে বেড়াত। এমনি সময় অনাদি ঠাকুরের পৌরোহিত্যে গ্রামের প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আর যায় কোথা,—সধবা পার্টির সমর্থকেরা, তার বাড়ী ঘেরাও ক'রল।



ছিরু ঘোষাল ও তার সাকরেদ চরিত্রে ভানু ও অনুপ



স্বরূপ মণ্ডল ও অনাদি ঠাকুর রূপে

মাঃ গৌতম ও ছবি বিশ্বাস

একটা প্রলয় বুঝি তখনই ঘটে যেত কিন্তু নেপথ্য থেকে ভেসে আসে,—'হয়ো রে! কোথায় গেলি রে!!' সেই বিকট মরাকান্না শুনে সবাই যেন আঁতকে উঠলো! গরুর গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল চুড়োবাঁধা এক বিরাট বপু,—ওজনে প্রায় তিনমণ! 'বলি কাণ্ডখানা কি?—বাড়ি যেন মাহেশের রথতলা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! লাঠি ঠ্যাঙা!...কাণ্ডখানা কি? ...অনাদি কোথায়? বলি অ অনাদি! কোথায় গো? ব্রেজে এলুম।' এমনি ভাবে আবির্ভূত হলেন ব্রেজ ঠাকুরণ,—অনাদি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা। আর নাটকের মোড় ও ঘুরে গেল। ঘটনা শুনে বলে উঠলেন,—'ব্রেজো বামনী তার বোনায়ের সঙ্গে বিধবা বিয়ে করতে যাচ্ছে যে মন্দ হবে এসে বাগড়া দিক্।' কথা শুনেই যায়গা সাফ্—আর অনাদি ঠাকুরও অন্তর্ধান হলেন বিধবা বিবাহের ভয়ে।

কিন্তু ঘর থেকে অন্তর্ধান হলেও অন্য বিপদ তাকে জড়িয়ে ধরল নানা দিক থেকে। স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারে তাকে টাকা ধার করতে হয়েছিল হাড়কেপ্পন রাজীব ঘোষালের কাছ থেকে। সুদখোর রাজীব ঘোষালের দৃষ্টি কিন্তু টাকা ফেরৎ পাওয়ার চেয়েও অনাদির ষোড়শী কন্যা নেত্যর প্রতিই বেশী ছিল। নিজের ছেলে গুলিখোর ছিরুর সঙ্গে নেত্যর বিবাহের জন্য ভিতরে ভিতরে ফন্দী আটছিলো।

এই সময় ঘটে আর এক ঘটনা। দেবনারায়ণ একদিন ঘোড়ায় চড়ে ঝড় জলের রাতে আশ্রয় নিল অনাদিঠাকুরের গৃহসংলগ্ন পুরোনো মন্দিরে। বালক স্বরূপের কাছে সে কাপড় চাইলো ভিজে পোষাক বদলাবার জন্য। সুযোগ বুঝে স্বরূপও তার দিদিমণির শাড়ী এনে দেয়, আর বিপদ ঘনিয়ে আসে অন্যপথে। শাড়ী ফেরৎ দিতে গিয়ে ভুল করে একখানা জমিদার বাড়ীতেই থেকে যায়।

সুদের টাকা যতই বেড়ে ওঠে রাজীব ঘোষালের দাবীও তীব্রতর



নেত্য, স্বরূপ, অনাদি ও ব্রেজ ঠাকুরণ চরিত্রে

বাসবী, গৌতম, ছবি, রাজলক্ষ্মী

হয়। এখনই একটা কিছু ক'রতে হবে। নিরূপায় অনাদি শেষ পর্য্যন্ত বিবাহে সম্মতি জানায়।

কিন্তু ক'নে কোথায়? বিয়ের সময় দেখা গেল ক'নে নেই। ক'নে কোথায় গেল? এগিয়ে এলেন ব্রেজঠাকুরণ, 'বলি ঘাটের মড়ারা, এতগুলো একত্তোর হয়েছে, আর এটুকু কারুর মাথায় সেঁদুল না? সোনা নেই, তার জায়গায় কাঞ্চন মূল্য দিয়ে বড় বড় কাজ সারা হয়ে যাচ্ছে—ক'নে নেই, তা হয়েচে কি? মূল্যটা ধরে নিয়ে মন্তর প'ড়ে মালাবদল বরে নেও না,......

এই হল চিত্রে রূপায়িত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তি-প্রতীক্ষিত "কাঞ্চন মূল্য" গল্পের সারাংশ।

প্রযোজনা : রূপভারতী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ ও নির্মল মিত্র

পরিচালনা : নির্মল মিত্র

সঙ্গীত : নির্মল চৌধুরী

—রূপায়নে—

ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল, ভানু, অনিল, তুলসী, অনুপ, বাসবী, রাজলক্ষ্মী, গীতা দে, অপর্ণা ও মাঃ গৌতম ইত্যাদি।

পরিবেশক : আর, ডি, বি, এণ্ড কোং

***

শিল্পীর কথা

সংগীতাচার্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারেশ ভট্টাচার্য

বাঙলাদেশের বিষ্ণুপুর সংগীত সাধনার পীঠস্থান। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ঘরাণা এবং তাঁদের সংগীত সাধনার আছে একটা বৈশিষ্ট্য। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সুরেন্দ্রনাথ। ইনি ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র এবং প্রবীণ সংগীতসাধক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণিষ্ঠ ভ্রাতা। বাল্যে ইনি ছিলেন খুব দুরন্ত। পাঁচ বছর বয়সের সময় পিতা মারা যান। ভীষণ দুরন্তপনার মধ্যেও বালক সুরেন্দ্রনাথের জন্মগত সংগীত-



শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে সবাইকে কোরত বিস্মিত, বিমুগ্ধ। অগ্রজ ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ছাত্রদের সংগীত শিক্ষা দিতেন তখন পাঁচ বছরের বালক সুরেন্দ্র নিকটেই খেলা করতে করতে ছাত্রদের বেতাল বা বেসুর শুনে তাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন। তারপর থেকে বিশেষ যত্নে অগ্রজ তাঁকে সংগীত শিক্ষা দিতে থাকেন। এবাদিক্রমে সাত-আট বছর তাঁর কাছে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষা করেন ইনি। তারপর মেজদা গোপেশ্বর সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন বর্ধমানে। গোপেশ্বরবাবু তখন ছিলেন বর্ধমানের মহারাজার সভাগায়ক। মহারাজা সুরেন্দ্রনাথের গানবাজনা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে ত্রিশটাকা মাসিক বৃত্তি দেন। সে সময় থেকে কয়েকবছর ধরে ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি ও যন্ত্রে সেতার, এস্রাজ ও সুরবাহারে মেজদার কাছে তালিম নিয়ে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন সুরেন্দ্রনাথ।

বিশ বৎসর বয়সে বর্ধমান থেকে সুরেন্দ্রনাথ আসেন কোলকাতায়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে গান-বাজনা শুনিয়ে বিশেষ মুগ্ধ করেন ইনি এবং তাঁর

ইচ্ছাক্রমে দরবারে নিযুক্ত হন গায়করূপে। এ সময় উক্ত মহারাজার সংগীতাচার্য, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সংগীত-গুরু গদাধর চক্রবর্তীর পৌত্র নীলমাধব চক্রবর্তীর নিকট সুরবাহারের দুরূহ ক্রিয়া সকল সংগ্রহ করেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখানে চার বছর থাকার পর মহারাজার মৃত্যু হওয়ায়, পটলডাঙ্গার প্রখ্যাত জমিদার উপেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে সংগীতগুরুর পদ নিয়ে চলে এলেন তিনি। কয়েক বছর পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে সংগীতাচার্যের পদ লাভ করেন এবং আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়করূপে নিযুক্ত হন সুরেন্দ্রনাথ। এ সময় হতে ইনি উপেন্দ্রনাথ রায় (ইউ, রায়) মশাইকে সংগীত শিক্ষা দেন এবং তাঁর কন্যারাও সংগীতশিক্ষা করতে থাকেন তাঁর কাছে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্রীদের মধ্যে লেডী অবলা বসু, মিসেস্ প্রমদা চৌধুরাণী, মালতী বসু, সাহানা দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বরলিপির জন্যে শান্তিনিকেতনে অনেকবার ডেকেছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে। তিনি বহু গানের স্বরলিপি করেছিলেন। স্বরলিপিতে সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত দক্ষতা দেখে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—'সুরেন, তুমি সত্যিই স্বরলিপির যাদুকর।' রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপি-পুস্তক 'গীতলিপি' সুরেন্দ্রনাথেরই কৃত সুরেন্দ্রনাথের সুরবাহার শুনে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—'তোমার মধ্যে খুব বড়দরের সংগীত-প্রতিভা আছে সুরেন।' কবিগুরুর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একদিন তাঁকে সুরবাহার শোনালেন সুরেন্দ্রনাথ। সেই অপূর্ব সুরবাহার শুনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন—'অনেকদিন পরে শুনে খুব ভাল লাগল। শুদ্ধ রাগ-রাগিণী আজকাল বড় একটা শুনতে পাওয়া যায় না। আবার শোনবার আগ্রহ আমার রইল।'

সুরেনবাবুর মত উদারহৃদয়, নিরহংকার, নির্ভীক ও আত্মমর্যাদাপরায়ণ ব্যক্তি সংগীত সমাজে একান্ত বিরল। নাম ও যশের মোহ কোন দিন তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। তিনি হচ্ছেন প্রকৃত সংগীত-সাধক। নিভৃত-নিরালায় নিতান্ত প্রাণের আবেগে সুরব্রহ্মের সাধনাই তিনি করেছেন এবং এখনও করছেন অনলসভাবে। এ যুগ প্রচারের যুগ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বহু শিল্পী আজ আত্মপ্রচারের মোহে মুগ্ধ—নাম ও যশের কাঙাল। আর ঠিক এই কারণে সস্তায় হাততালি আর বাহবা পাওয়াটাই যেন তাঁদের লক্ষ্য—প্রকৃত সাধনা তাঁদের লক্ষ্য নয়। এজন্যেই বাঙলার সংগীত জগতে প্রকৃত সংগীতশিল্পীর বা সাধকের সংখ্যা দিন দিন বিরল হতে চলেছে। সুরেনবাবুর মত এত বড় গুণীর পরিচিতি বর্তমানে যথাযোগ্যভাবে নেই, এটা অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। আটাত্তর বছরের এই বৃদ্ধগুণীর সান্নিধ্যলাভ করলে অন্তরে এক গভীর শ্রদ্ধা ও অপূর্ব ধারণা না এসে পারবে না।

এঁরই প্রচেষ্টায় ও প্রমদা দেবীর সম্পাদনায় কোলকাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিশুদ্ধ সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান 'সংগীত সম্মিলনী' নামে প্রথম স্থাপিত হয়। এখানে সুরেনবাবু পঁচিশ বছর ধরে প্রধান অধ্যাপকের কার্যে ব্রতী ছিলেন। তখনকার দিনে এঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী উপযুক্ত সংগীত শিক্ষা করে লাভ করেছিলেন বিশেষ খ্যাতি ও যশ। উচ্চ ইংরাজী ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান সংগীত শিক্ষকের পদও ইনি বহু বৎসর ধরে অলংকৃত করেন। কবি অতুলপ্রসাদ সেন প্রথমত সুরেনবাবুকে দিয়েই তাঁর গানগুলির স্বরলিপি করিয়েছিলেন। পরে তাঁর ছাত্রী সাহানা দেবী সেগুলি প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোলকাতায় বোমা পড়ায় ইনি বিষ্ণুপুরে চলে আসেন। সেই সময় থেকেই তিনি স্বগ্রামে বাস করছেন এবং স্থানীয় সংগীতমহাবিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থেকে সংগীতের উন্নতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। বর্তমানে আটাত্তর বৎসর বয়সেও রয়েছে তাঁর অফুরন্ত উদ্যম ও উৎসাহ। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত 'গীত পরিচয়', 'সেতার শিক্ষা', 'এস্‌রাজ মুকুল' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত ও শিক্ষার্থীদের পরম উপযোগী।

এক সময়ে সুরেনবাবুর কাছে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ সংগীত ও বাদ্য শিক্ষা করতেন। তাঁদের মধ্যে কোলকাতা হাইকোর্টের জজ্ উডরুফ সাহেব, মিসেস্ আরকুহার্ট (স্কটিশচার্চ কলেজের প্রিন্সিপালের স্ত্রী) প্রভৃতির নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উডড্রফ সাহেব খুব পছন্দ করতেন সুরবাহার বাজনা। ভোরের রাগ যখন ফরমাস করে শুনতেন তিনি, তখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে নিতেন। বহু বিশিষ্ট বিদেশী ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসতেন, তখন সুরেনবাবুর সাদর আহ্বান আসত সুরবাহার বাজনা শোনাবার জন্যে। তাঁরা শুনে বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হতেন। সুরেনবাবুর ভাইপো প্রবীণ সংগীতজ্ঞ সত্যকিংকরবাবু কথায় কথায় সেদিন বলছিলেন, প্রখ্যাত চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে তাঁর বি, টি রোডের বাড়ীতে গিয়ে সংগীত বিষয়ে নানা কথাবার্তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ সেজকাকার সম্বন্ধে বলেছিলেন—'সুরেনের পরিচিতিই আমাদের বংশে সংগীতজ্ঞ হিসেবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে।'

১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ বহুদিন পরে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। ইন্দিরা দেবী সে সময় তাঁর সুরবাহার শুনে বলেছিলেন—'অনেকদিন ধরে আকাংখা কোরছিলাম যেন খুব ভাল গান ও বাজনা শুনি। আজ সে আশা পূর্ণ হয়ে মনে খুব তৃপ্তি পেলাম।' শান্তিনিকেতনের একজন হাঙ্গেরীয় মহিলা বলেছিলেন—'এমন সুন্দর বাজনা আমি কথনো শুনিনি।'

সুরেনবাবুর সন্তানের মধ্যে একমাত্র সন্তানহীনা বিধবা কন্যা আছেন। ইনিও কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতে লাভ করেছেন বিশেষ অধিকার এবং বিষ্ণুপুর সংগীত মহাবিদ্যালয়ের বর্তমানে ইনি একজন শিক্ষিকা।

সুরেনবাবুর ন্যায় একজন প্রকৃত গুণী ব্যক্তির, প্রকৃত সাধকের আদর্শজীবন হোক শান্তিময়, হোক মধুময় ও সুদীর্ঘ, ভগবানের কাছে এই কামনাই আমরা করি।

ছুটির দিনে



ফটো: সত্যপ্রকাশ বালা






সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ডেভিস কাপ ঃ

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম জাপানের পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। এরপর ভারতবর্ষ খেলবে আমেরিকান-জোন বিজয়ী দেশের সঙ্গে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই জয়লাভ খুবই গৌরবের হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় ভারতবর্ষের থেকে অনেক আগেই জাপান সুনাম অর্জ্জন করে। ১৯২১ সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে জাপান খেলেছিল। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপান ছাড়া অন্য কোনদেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার সম্মানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া জাপান দু'বার (১৯২৬ এবং ১৯২৭) ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এ যোগ্যতাও এশিয়া মহাদেশের অপর কোন দেশ দেখাতে পারেনি। আলোচ্য পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে প্রথম দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় জাপান জয় লাভ ক'রে ১—০ খেলায় এগিয়ে যায়। ২য় এবং ৩য় দিনের বাকি চারটি খেলায় (৩টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডাবলস) ভারতবর্ষ জয় লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

আৎসুসি মিয়াগি (জাপান) ৬—২, ৯-৭, ২-৬, ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) ৪—৬, ৬-৩, ৬-৩, ৬-৩ গেমে ইসিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান এবং প্রেমজিৎলাল (ভারতবর্ষ) ৬—৪, ৬—৩, ৬-৪ গেমে আৎসুসি মিয়াগি এবং নাগসাকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান (ভারববর্ষ) ৬-৪, ৬-১, ৬-৪ গেমে আৎসুসি মিয়াগিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

আখতার আলী (ভারতবর্ষ) ৪-৬, ৬-৪, ৬-০, ২-৬, ৬-৪ গেমে ইসিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

বেটন কাপ ঃ

১৯৬১ সালের বেটন কাপ ফাইনালে উঠেছিল দুটি বহিরাগত দল—সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (বোম্বাই) এবং পাঞ্জাব পুলিশ। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ২-১ গোলে জয়ী হওয়াতে, এক বছর পর পুনরায় বেটন কাপ বাংলার বাইরে চলে গেল। সেণ্ট্রাল রেলদলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং প্রথম বেটন কাপ জয়। ১৯৫৯ সালে বেটন কাপ জয়ী হয়েছিল বহিরাগত কোর অব্ ইঞ্জিনিয়ার্স দল (কিকি); ১৯৬০সালে মোহনবাগান। কোয়ার্টার ফাইনালে বহিরাগত দলগুলিই প্রাধান্য লাভ করে; মোট ৮টি দলের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল মাত্র ২টি, মোহনবাগান এবং কাস্টমস।

সেমি-ফাইনালের চারটি দলের মধ্যে বহিরাগত দল ছিল তিনটি এবং স্থানীয় দল হিসাবে মোহনবাগান। সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশ ১—০ গোলে মোহনবাগানকে এবং সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিল। স্থানীয় নামকরা দলের মধ্যে ৩য় রাউণ্ডে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলের কাছে এবং কাস্টমস ২—১ গোলে সেণ্ট্রাল রেলদলের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হ'লে স্থানীয় দর্শক সাধারণের একটি বৃহৎ অংশের খেলা দেখার আগ্রহ কমে যায়। প্রতি-যোগিতায় দুটি সেমি-ফাইনাল খেলাই দর্শকসাধারণকে হতাশ করে—খেলা মোটেই দর্শনীয় হয়নি। সেই তুলনায় ফাইনাল খেলাটির মধ্যে উত্তেজনা বেশী ছিল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন।

বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলের পক্ষে আরম্যান ২টি গোল দেন এবং বিজিত পাঞ্জাব পুলিশ দলের পক্ষে একটি গোল শোধ করেন দর্শন সিং। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে দলই প্রথমার্দ্ধের খেলার ১৩ মিনিটে প্রথম গোল দেয়। পাঞ্জাব পুলিশ দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার ৩য় মিনিটে গোলটি শোধ করে। খেলার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই আর গোল দিতে না পারায় অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের খেলার ৫ম মিনিটে রেলওয়ে দল জয়-সূচক গোলটি করে। এ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের চারটি দল রোভার্স কাপ জয়ী হ'ল—বোম্বাই কাস্টমস (১৯৩৬), টাটা স্পোর্টস ক্লাব (১৯৪৯—৫০ এবং ১৯৫৩—৫৪), ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে (১৯৫৫ সালে ইউ পি একাদশের সঙ্গে যুগ্মভাবে) এবং সেণ্ট্রালরেলওয়ে (১৯৬১)।

এফ এ কাপ ঃ

ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপ প্রতিযোগিতার ১৯৬১ সালের ফাইনালে প্রথম বিভাগের লীগ বিজয়ী (১৯৬১) টোটেনহাম হটস্পার দল ২—০ গোলে লিস্টার সিটি দলকে পরাজিত ক'রে একই বছরে ফুটবল লীগ কাপ এবং এফ এ কাপ জয়লাভের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এ পর্য্যন্ত মাত্র তিনটি দল এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছে—১৮৮৯ সালে প্রেস্টন নর্থ এণ্ড, ১৮৯৭ সালে অস্টন ভিলা এবং ১৯৬১ সালে টোটেনহাম হটস্পার। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮৮৯ সালে এবং এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৮৭২ সালে।

টোটেনহাম হটস্পার দল এই নিয়ে ৩য় বার এফ এ কাপ জয়ী হ'ল। ১৯০১ এবং ১৯২১ সালে তারা এফ এ কাপ পায়।

লক্ষ্মীবিলাস হকি ফাইনাল ঃ

ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩—০ গোলে গ্রীয়ার স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের বালু 'হ্যাট-ট্রিক' করেন।

ল্যাগডেন হকি শীল্ড ঃ

ফাইনালে মোহনবাগান ৭—১ গোলে ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুলিস দলকে পরাজিত করে। মোহনবাগানের পক্ষে মহাজন 'হ্যাট-ট্রিক' করেন।

আগা খাঁ হকি ঃ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন সভাপতির দল ২—০ গোলে মাদ্রাজ একাদশকে পরাজিত করে। প্রথম দিনের খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র যায়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৬১ সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগি-তার ফাইনালে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা জয়লাভ করেন। দীপু ঘোষ তিনটি অনুষ্ঠানে জয়ী হন।

পুরুষদের সিঙ্গলসে দীপু ঘোষ; পুরুষদের ডাবলসে দীপু ঘোষ এবং প্রণব বসু; মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস এস কাউর; মিক্সড ডাবলসে মিস এস কাউর এবং দীপু ঘোষ।

হকি লীগ ঃ

দ্বিতীয় বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পোর্ট কমিশনার্স দল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। রানার্স আপ খেতাব পেয়েছে ভবানীপুর ক্লাব। আগামী বছর থেকে এই দুটি ক্লাব প্রথম বিভাগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

বোম্বাই গোল্ড কাপ হকি ঃ

মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ (বাঙ্গালোর) ৩য় দিনের ফাইনালে ২—০ গোলে শক্তিশালী ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেসনের সভাপতির একাদশদলকে পরাজিত ক'রে নিজ দলের পক্ষে প্রথম গোল্ড কাপ জয়ী হয়েছে।

২য় দিনের খেলাটি গোল শূন্য ভাবে ড্র যায়। প্রথম দিনের খেলায় কোন পক্ষই গোল দিতে পারেনি।

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

প্রজাতন্ত্র চীনের পিকিং সহরে অনুষ্ঠিত ২৬তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্র চীন অসামান্ত সাফল্য লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রজাতন্ত্র চীন একাই ৬টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলে ৩টি অনুষ্ঠানে জয়ী হয় এবং ৪টি অনুষ্ঠান রানার্স-আপ খেতাব পায়। জাপান ৪টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে উঠে ৩টি অনুষ্ঠানে জয়ী হয়। রুমানিয়া মাত্র মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে উঠেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করেছিল। হাঙ্গেরী ২টি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেলেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করতে পারেনি। প্রজাতন্ত্র চীনের একাধিপত্যের আর একটি দৃষ্টান্ত, পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার-ফাইনালের খেলায় ৮জন খেলোয়াড়-দের মধ্যে ৬জন ছিলেন প্রজাতন্ত্র চীনেরই খেলোয়াড়। ফাইনালে দু'জন খেলোয়াড়ই ছিলেন প্রজাতন্ত্র চীনের। প্রজাতন্ত্র চীন উপর্য্যুপরি গত পাঁচ বছরের সোয়েথলিং কাপ (পুরুষদের দলগত বিভাগের পুরস্কার) বিজয়ী জাপান-কে প্রতিযোগিতার ফাইনালে পরাজিত ক'রে জাপানের একটানা একাধিপত্য খর্ব্ব করে। মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে জাপান ৩—২ খেলায় প্রজাতন্ত্র চীনকে পরাজিত ক'রে কোর্বিলন কাপ জয়ী হয়। ইতি-পূর্ব্বে জাপান এই পুরস্কার লাভ করেছে ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে। এ বছরে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের রেকর্ড করেন ব্রেজিলের দা কোস্টা। তিনি ৪র্থ রাউণ্ডে প্রতিযোগিতার ১নং বাছাই খেলোয়াড় এবং গতবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জাং কুয়ো-তোয়ানকে (প্রজাতন্ত্র চীন) ৩—২ সেটে পরাজিত করেন। বাছাই খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় স্থান না পেয়ে ফাইনালে উঠেছে এবং তালিকার নীচের দিকে স্থান পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত ফাইনালে জয়ী হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আলোচ্য বছরের খেলাতেও পাওয়া গেছে। প্রজাতন্ত্র চীন জয়ী হয়েছে তিনটিতে—পুরুষদের দলগত বিভাগের পুরস্কার সোয়েথলিং কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মহিলাদের সিঙ্গলস। জাপানও জয়ী হয়েছে তিনটিতে—মহিলাদের দলগত বিভাগের পুরস্কার কোর্বিলন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস। রুমানিয়া জয়ী হয়েছে একটিতে—মহিলাদের ডাবলস।

ত্রিশটি দেশের প্রায় তিনশতের বেশী খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র কয়েকদিন আগে ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ ঃ

ভারতবর্ষ সফররত অষ্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস দল ভারত-বর্ষের বিপক্ষে ৩টি টেষ্ট খেলায় যোগদান ক'রে ২—০ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে। ক'লকাতার প্রথম টেষ্ট খেলাটি ড্র যায়। বাকি দুটি টেষ্ট খেলার প্রত্যেকটিতে অষ্ট্রেলিয়া ৩—২ খেলায় জয়ী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডাবলস খেলার ফলাফলের উপরই অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। সিঙ্গলস খেলার ফলাফল উভয় দেশের পক্ষে সমান-সমান দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান একটা সিঙ্গলস খেলাতেও হার স্বীকার করেননি।

ভারতবর্ষের পক্ষে খেলায় যোগদান করেছিলেন রমা-নাথন কৃষ্ণান, প্রেমজিৎলাল এবং জয়দীপ মুখার্জি।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন ফ্রেড স্টোলী, বব্ হিউইট, নিউকম্বে এবং কেন ফ্লেচার। এঁরা সকলেই অষ্ট্রেলিয়ার ভাবীকালের ডেভিস কাপ খেলোয়াড়—সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতবর্ষের পরাজয় কোন অগৌরবের হয়নি।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

	বিজয়ী	বিজিত
পুরুষদের সিঙ্গলস :	চুয়াং সে তুং (প্রঃ চীন)	লী ফু জাং (প্রঃ চীন)
পুরুষদের ডাবলস :	নবুয়া হোসিনো এবং কোজি কিমুরা (জাপান)	ফেরেন্স সিডো এবং জে বার্জিক (হাঙ্গেরী)
মহিলাদের সিঙ্গলস :	চুই চাং হুই (প্রঃ চীন)	ইভা কক্জিয়ান (হাঙ্গেরী)
মহিলাদের ডাবলস :	মেরিয়া আলেকজাণ্ড্রু এবং সিটা পিটিকা (রুমানিয়া)	চিউ চাং লুই এবং সান মেই ইয়ং (প্রঃ চীন)
মিক্সড ডাবলস :	ইচিরো ওগিমুরা এবং কিমো মাৎসুজাকী (জাপান)	লী ফু জাং এবং হান উ চেন (প্রঃ চীন)

হকি লীগ :

ক'লকাতার হকি মরসুমের প্রধান আকর্ষণ দুটি খেলা, প্রথম বিভাগের হকি লীগ এবং বেটন কাপ প্রতিযোগিতা। ১৯৬১ সালের বেটন কাপ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে; কিন্তু ১৯৬১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের নিষ্পত্তি লীগ খেলার ফলাফল বিচার ক'রে হয়নি। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ মহল ইস্টবেঙ্গল এবং কাস্টমস ক্লাবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, এবছরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নাকচ করা হয়েছে। হকি লীগের মোট ১৮টি খেলায় ইস্টবেঙ্গল এবং কাস্টমস দল সমান ৩৩ পয়েন্ট করে। চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ণয়ের জন্যে তখন দুই দলের মধ্যে একটি খেলার প্রয়োজন হয়। খেলার দিন ধার্য্য করা হয় ২২শে এপ্রিল। কিন্তু কাস্টমস ক্লাব ঐ দিনের খেলায় যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে প্রদর্শনী খেলার দিন ধার্য্য করার বৈধতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ২২শে তারিখেই প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের দুপুরবেলায় হকি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে খেলা হবেনা ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ মহল তাঁদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে আর অটল থাকতে পারেননি। খেলায় যোগদানের জন্যে যথারীতি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠে উপস্থিত থাকে; ঐ দিনের খেলায় নিযুক্ত দুজন আম্পায়ারও উপস্থিত ছিলেন। খেলা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে জানানো হয়নি। অবশ্যি কর্তৃপক্ষমহল পরে পত্রদ্বারা এই ত্রুটির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ানসীপ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নতুন ক'রে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।



সাহিত্য সংবাদ

কাজলা বিলের সাপলা ঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক কবিতার ধারাটিতে হয়তো উপল-মুখরতা নেই, কিন্তু উদ্দাম স্রোতও ঠিক নেই। বহতা আছে ঠিক, কিন্তু গভীরে গহনে, কোথাও বা অন্ধকারে আপন মনে বয়ে-যাওয়া সেই স্রোত সর্বত্র পারাপারের সুযোগও দেয় না। কিছুটা জটিলতা, কিছুটা ঐতিহ্য হীনতার বাধা আছে। ফলে পরিধি বা দেশকাল যতই বিস্তৃত হোক না কেন, এক অপরিচয়ের মুখোস তার মুখে। মানুষের জীবনের ধারাও অবশ্য পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জীবনের গভীর সত্য—তার স্নেহ প্রেম ভালবাসা আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি তেমনই আছে—একথাও সত্য। তাই জীবনবাদী কবি জীবনের গভীর সত্যের উপলব্ধিতে কাব্য রচনা করেন। ভাষা তাঁর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত।

আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলিতে শেষোক্ত কবির সাক্ষাৎ পাই। একদিকে গ্রাম বাঙলার মানুষের সুখ দুঃখ, অন্তর্বেদনা, অন্যদিকে সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের পটভূমিকায় মানব গোষ্ঠির স্বমহিমায় উত্তরণ উভয় চিন্তাই কবির মানসলোকে বিরাজ করছে।

নাম কবিতাটিতে—প্রকৃতির রুঢ়তায় কাজলা বিলের শাপলা কেমন করে মানুষের অস্পৃশ্য হয়ে গেল। অদৃষ্টের পরিহাস—একটি মর্মন্তুদ ব্যথার অভিব্যক্তি। 'বেবীর কুকুর'—বেবীকে স্বামী হারানোর দুঃখ ভুলিয়েছে। 'শতাব্দীর দুঃখ' কবিতায়—অভিমানাহত কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। 'জন্মদিন' আর একটি ভালো কবিতা। এখানে কবি সকল ক্ষয়ক্ষতির পর শান্তির প্রত্যাশা করেছেন। শেষ কবিতা নদীতে কবি তাঁর লিরিকধর্মী মনের শেষ ছোঁয়াটুকু দিয়েছেন অতি নৈপুণ্যে অতি সহজ কথায় অতি গভীরভাবে।

কবির ভাষা স্থানে স্থানে কিছুটা অমসৃণ হলেও কোথাও প্রসাদ গুণ হারায়নি। আর প্রাঞ্জলতা তো কবির একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

[প্রকাশিকা—সাধনা দেবী। শক্তিপুর, পোঃ আগরপাড়া,
প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিঃ—৬।
মূল্য '৭৫—বাঁধাই ১'৫০ নঃ পঃ]

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আকাশ-পিপাসা (কবিতা গ্রন্থ) **ঃ** রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

গ্রন্থকারের 'মিছিমন' কাব্যগ্রন্থখানি ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাদর লাভ করেছে। আলোচ্য গ্রন্থেও কবিঃখ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। রমেন্দ্রনাথের লিখন শৈলীর বৈশিষ্ট্য আছে, স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল। রোমান্টিক ধর্ম্মী কবিতাগুলি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে দীপ্তিমান। কোন কবিতাই অস্পষ্ট বা দুরূহ নয়। সাম্প্রতিক কালে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়, সে ধারার পরিচিতি আলোচ্য গ্রন্থে সম্যক্ ভাবেই বিদ্যমান। বিচিত্র অনুভূতিররঙে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে এর ভেতরকার ছাপান্নটী কবিতা। জীবন ও জগতের সঙ্গে কবি তাঁর বাধাকে যত অধিক জড়িত করবেন ততই গভীর হয়ে উঠবে তার আকর্ষণ ও অভিব্যক্তি। গ্রন্থখানি পড়ে খুব তৃপ্তি পাওয়া গেল, কাব্যামোদিগণ পড়ে তৃপ্তি লাভ করবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক—সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬। দাম—২৲ টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পথের পরিচয় ঃ জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী বীর জীতেশবাবু। দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন যাঁরা, সংগ্রাম করেছেন, আজীবন, মেনে নেন নি পরাজয়কে, তাঁদের অনেকের পরিচয় জীতেশবাবুর পথের পরিচয়ে পাওয়া যাবে। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

[প্রকাশক—শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী। নমসি প্রকাশ মন্দির।
৮২ গোপ লেন। কলিকাতা—১৪। মূল্য—দেড় টাকা মাত্র]

অশ্বিনীকুমার দত্ত ঃ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল মহাত্মা নিঃশেষে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁদের অন্যতম। ডক্টর সেন বিরচিত অশ্বিনীকুমারের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত বিশেষ সমাদর লাভ করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ। ২৭ ল্যান্স ডাউন টেরেস, কলিঃ।
দাম—১৲ টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।